ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌-এ

সূচীপত্র

চতুস্ত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৫৩—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী মাসানুক্রমিক

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণি গাঙ্গুলী

ওমর খৈয়াম

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

পৌষ—১৩৫৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

মূলধন প্রথার উৎপত্তি

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

প্রথমেই দেখতে হয় মূলধন (Capital) ও মূলধনপ্রথা (Capitalism) কি ? কেবল জমানো টাকা বা যাকে বলা হয় পুঁজি তাই মূলধন বা Capital নয়। প্রাচীনকাল হ'তেই টাকা বা টাকার সমকক্ষ মূল্যবান প্রস্তর ও ধাতু লোকের সিন্দুকে জমেছে ; কিন্তু তখন মূলধনের উদ্ভব হয় নি। জমানো টাকা হাতে না থাকলেও মূলধনপ্রথা (Capitalism) চলতে পারে এবং ধনপতি (Capitalist) হ'তে পারে। সাধারণ ভাবে বলা যায়—অর্থ বা তার সমকক্ষ বকেয়া (credit) বা বাজারের মাল (marketable goods) বা কাঁচামাল (raw materials) বা যান্ত্রিক ন্যস্ত সম্পদ ; যাদের বলা হয় "স্থিত মূলধন" (Fixed Capital)—অর্থাৎ যে সবটার মধ্যে মানুষের শ্রম ব্যয়িত ও সঞ্চিত হয়েছে এবং যা থেকে মুনাফা হতে পারে—তাই মূলধন (Capital)। মানুষের শ্রম-স্পর্শহীন ভূমিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এই হিসাবে মূলধন নয়।* এই দৃষ্টি-কোণ হতে দেখলে—আর্থিক ব্যবস্থার অন্য জীবিকাহীন লোকের শ্রমকে অর্থের বিনিময়ে বেশ ব্যাপক ভাবে ক্রয় ক'রে ও খাটিয়ে তা থেকে মুনাফা করা যায়, সেই ব্যবস্থাকে মূলধনপ্রথা (Capitalism) বলা চলে। এই মূলধনপ্রথার প্রকৃত উদ্ভব হয় উনবিংশ শতাব্দীতে ; কিন্তু এর সূচনা হয় মধ্যযুগে—যখন থেকে ইউরোপীয় জাতিসমূহ প্রাচ্যে ও আরবরাজ্যে সঞ্চিত অর্থ-লুণ্ঠন ও শোষণ করতে সুরু করে। এর উৎপত্তির পিছনে এই কয়টি Condition বা পূর্বাবস্থার প্রয়োজন হয়েছে :—

(১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ (wealth) সৃষ্টি

* যেমন অনাবাদি জমি (Virgin soil), স্বভাবজাত জঙ্গল (Virgin forest) অব্যবহৃত জলস্রোত-শক্তি (Untapped water power) প্রভৃতি…। এসবকে মূলধনে রূপান্তরিত করতে হলে মানুষের শ্রমের সংযোগ দরকার হয়।

—যার ফলে সমাজের প্রয়োজন মিটিয়েও সম্পদ সঞ্চিত হ'তে পারে। (২) স্বাধীন জীবিকা নেই এমন একদল শ্রমিক (proletariat) যারা নিজ শ্রম-শক্তি (labour power) বিক্রি করেই জীবিকা উপার্জন করতে বাধ্য হয়। (৩) উৎপাদন প্রথার বা ইণ্ডাষ্ট্রির প্রথার মধ্যে যন্ত্রের প্রচলন—যার ফলে স্বাধীন উৎপাদন মূল্যবান যন্ত্র-সাপেক্ষ হয় এবং ঐ যন্ত্র সকলের সামর্থ্যাধীন নয়। (৪) যান্ত্রিক উৎপাদনের দ্রব্যসমূহ বেচবার মতো বাজার ও ক্রয় করার মতো অর্থ-সম্বল সম্পন্ন লোক থাকা চাই। (৫) ধনপতির বুদ্ধি (Capitalist sense)—অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থকে মুনাফায় খাটাবার বুদ্ধি ও শক্তি থাকা চাই।

ভারতবর্ষে কয়েক বছর পূর্বেও ঠিক ঠিকভাবে মূলধন-প্রথার সৃষ্টিও হয় নি; ইহা নিতান্তই ইউরোপীয় মাল এবং ইংরাজ-শাসনের ফলে আমাদের দেশে এসেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আমাদের দেশে ছিল এবং ইউরোপের তুলনায় অনেক বেশী ছিল। সম্পদ-সৃষ্টির মৌলিক ক্ষেত্র হ'ল জমি—জমির কৃষিজ, ধনজ ও খনিজ সম্পদ—ইহাই হ'ল মানুষের প্রথম ও মৌলিক সম্পদ। এরপর আসে জমির খাজনা—বিশেষ ক'রে শহুরে জমির খাজনা—যা জমির পূর্বোক্ত তিনটি মৌলিক সম্পদের বাইরে। ভারতবর্ষে জমির—কৃষিজ বনজ ও খনিজ সম্পদও যেমন ছিল—শহরের ও গ্রামের জমির কর ও খাজনা থেকে প্রাপ্ত সম্পদও তেমনি ছিল। অথচ Capitalism-এর সৃষ্টি হয় নি এবং এর উৎপত্তি হয়েছে স্বল্প আয়ের ইউরোপে—যেখানে এই চতুর্বিধ সম্পদ-উৎপত্তিই খুব শীর্ণধারায় হয়েছে। এই পার্থক্যের কারণ বুঝতে হ'লে—ইউরোপে মূলধনপ্রথার উদ্ভবের ইতিহাস দেখতে হয়।

ইউরোপের মধ্যেও ছোটো পরিসরের দেশে বা রাষ্ট্রেই প্রথম মূলধনপ্রথার সূচনা দেখা দেয়—অর্থাৎ যেখানে রাষ্ট্র অর্থাৎ নাগরিক জনকেন্দ্রের পশ্চাতে গ্রাম্য কৃষির জমি কম বা যেখানে জমির মৌলিক তিনটি সম্পদের সম্ভাবনা খুবই কম। একেবারে প্রথম এর সূচনা দেখতে পাই—মধ্যযুগের নগর রাষ্ট্রসমূহে—ভেনিস জেনোয়া মিলনে, ঘেণ্ট ব্রুজেন্স প্রভৃতি এবং লণ্ডন ও প্যারির বিলাসী সমাজে। এই সব শহরের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐ জমির যারা মালিক ছিল—যারা এতদিন ঐ জমির কৃষিজ সম্পদের উপর নির্ভর করত তারা তাদের পূর্বজীবিকা হ'তে বঞ্চিত হয়ে শহুরে বাউণ্ডে (loafer) ও ফড়িয়া (middleman) হ'ল এবং তাদের প্রধান অবলম্বন হ'ল শহরের জমির খাজনা। শহরের বাড়ী ঘর রাস্তা মাঠ কারখানা প্রভৃতির পুরাপুরি মালিক না হ'লেও এরাই কতকটা মাতব্বর (boss) ও কর্মকর্তা (manager) হ'ল। ইটালী ও উত্তর সাগরের উপকূলে পাশাপাশি অনেক সমৃদ্ধশালী শহরের উৎপত্তি হ'ল; এবং এরা আরবদের সংশ্রবে এসে প্রাচ্যের বিলাস দ্রব্যের সন্ধান ও স্বাদ পেল। আরব প্রভাবের তখন পতন সুরু হয়েছে। আরবগণ প্রাচ্যের দ্রব্যাদি ইউরোপের বাজারে এনে প্রচুর লাভ কোরত; এই ব্যবসায় এখন গেল ঐ সব ইউরোপীয় শহরের হাতে। একথা বলা চলে যে, সর্বপ্রথম মূলধন ব্যবসায়ে খাটানো (Capitalist investment) হ'ল ইটালি,ডাচ প্রভৃতি নগররাষ্ট্রের প্রাচ্যাভিমুখে নৌ-অভিযানে (Naval expedition) এবং এরও গোড়া রয়েছে ক্রুসেডের (Crusade) যুগে। ইউরোপের সম্মিলিত সামরিক বলের যে স্ফুরণ ক্রুসেডের মধ্যে পর পর দেখা দিয়েছিল তার নিকট প্রত্যক্ষতঃ পরাজিত না হ'লেও পরক্ষভাবে এর মধ্যেই আরব সাম্রাজ্যের পতনের বীজ রয়েছে।

এই সব ক্রুসেডের সময় ইউরোপীয় ভবঘুরে আপদাচারীর (Advanturer) দল প্রাচ্যের সম্পদ ও সমৃদ্ধির সন্ধান পায়। আরবদের নিকট হ'তে তারা আরও দু'টি জিনিষের সন্ধান পায়—অভিজ্ঞ কারিগর ও বহু সংখ্যক বিদেশী দাস, বিশেষ কোরে নিগ্রো দাস। লেভাণ্ট (Levant) বা ভূমধ্যসাগরের প্রাচ্য অংশের তীরে ও দ্বীপে প্রাচ্য বিলাস-দ্রব্যের লেন দেন বাজার (Exchange market) ছিল এবং ঐ সব স্থলে নানা বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন হ'ত। ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি ইটালিয় নগর রাষ্ট্র যেমন ঐ সব অঞ্চল দখল করল, তেমনি তারা আরবদের বাণিজ্য ও উৎপাদন প্রথা অভিজ্ঞ কারিগর ও ক্রীতদাসসহ—কেবল যে গ্রহণ করল তা নয় অনেকটা বাড়িয়েও নিলো। এতদিন ইউরোপীয় সমাজে শ্রম থেকে যে বাড়তি সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে—তা অর্থের রূপ নিতে পারে নি। কারণ ইউরোপ মূল্যবান ধাতুর বিষয়ে বিশেষ সৌভাগ্যবান নয়। যা কিছু সোনা রূপা তার হাতে আসত, তা প্রায় প্রাচ্যের

বিলাস দ্রব্য—সুগন্ধি, রেশম, তুলার বস্ত্র, মসলা প্রভৃতি ক্রয় করতেই ব্যয় হ'ত। প্রাচ্যের এই সব ভূখণ্ড ও আরব সমৃদ্ধির উৎপত্তি স্থলের মালিক হ'য়ে তারা কাঁচা টাকারও মালিক হ'ল। দেশের কাঁচা মাল ও দেশের কারিগরের শ্রমে উৎপন্ন-দ্রব্য যতদিন দেশে-ই ব্যয়িত ও ব্যবহৃত হয়, ততদিন সমাজের বাড়তি সম্পদ অর্থের রূপ নিতে প্রায়ই পারে না। বাড়তি অর্থ জমাবার জন্য বিশেষ সাহায্য করে—অপর দেশের সম্পদ-শোষণ। এই শোষণ নানাবিধ উপায়ে হতে পারে—সামরিক অভিযান ও লুণ্ঠন। অন্য দেশের শ্রমকে মুনাফার ক্রীতদাস হিসাবে বা অল্প মূল্যে খাটানো এবং অসম বাণিজ্য—যা প্রায়ই নির্ভর করে সামরিক শক্তির উপর। ভূমধ্য সাগরের পূর্বপ্রান্তে—এসিয়ার কূলে এবং দক্ষিণ প্রান্তে আফ্রিকার কূলে—ইউরোপীয় সামরিক নাবিকগণ ও বণিকগণ যে বিদ্যা শিখল তার ব্যাপক প্রয়োগ সুরু হ'ল—স্পেন পর্তুগেল ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের মারফৎ আমেরিকায়, ভারতে ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। এই যে অর্থ সমাগম ও ক্রীতদাসমূলক শ্রম এদের আয়ত্তে এল, তা থেকেই সুরু হ'ল এদের capitalism বা মূলধন প্রথা।

যে শ্রমের শোষণ থেকে এই নূতন অর্থ ব্যবস্থা সুরু হ'ল তা প্রথমে এরা পেল বিদেশে ও বিদেশীর কাছে। সর্বপ্রথম ইউরোপীয়গণ এই সুলভ ও শোষণযোগ্য শ্রম পেল, আফ্রিকা লেভাণ্ট প্রভৃতি আরব অধ্যুষিত দেশসমূহে। তারপর এল আমেরিকা। আমেরিকায় এরা পেল প্রচুর সোণা রূপা কিন্তু তার চেয়েও বড় সম্পদ পেল ওখানকার লোহিতাঙ্গ লোকদের শ্রমে। পশুর মতো তাদের খাটিয়ে ইউরোপীয় বাসিন্দারা সুরু কোরল চাষ-আবাদ। (Plantation)—প্রধানত; তুলা, তামাক, কলা প্রভৃতির। এর পর এল নিগ্রো ক্রীতদাস। ইউরোপীয় সভ্যতার বা মানব সভ্যতার ইতিহাসে—এমন কলঙ্কজনক অধ্যায় আর আছে কিনা সন্দেহ। পশুর পালের মতো জঙ্গল থেকে এদের ধরে নিয়ে যেত; আটলান্টিক সাগর পার হ'তেই জাহাজের দুর্ব্যবস্থায় অর্দ্ধেক বা তারও বেশী নিগ্রোদাস মারা যেত। পোপ ফতোয়া দিলেন—"লোহিতাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রোরা মানুষ নয়। এরা আদমের বংশধর নয়—তাই এদের উপর অত্যাচার করলে ধর্মের চোখে কোন পাপ হয় না।" ধর্মের এমন অপপ্রয়োগ বিশ্বের ইতিহাসে নেই। লক্ষ লক্ষ লোক এই ক্রীতদাস ব্যবসায়ে প্রাণ হারিয়েছে এবং খৃষ্টধর্মের প্রধান নেতা ফতোয়া দিলেন—এতে কোন পাপ নেই।

ইউরোপের দেশসমূহে এইভাবে অর্থ ও ব্যবহার দ্রব্যের (use-values) বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সমাগম হ'তে লাগল। বৈদেশীক কৃষির উপর নির্ভর করার প্রয়োজন কমে গেল। আর তার অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে—দেশের একদল লোক ভূ-সম্পত্তিহীন, জীবিকাহীন হ'য়ে—শ্রমজীবীতে পরিণত হ'ল—যাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হ'ল—নিজেদের শ্রম বিক্রী। এই জিনিস প্রথম সুরু হয় ইংলণ্ডে এবং তার মূলে রয়েছে ওলন্দাজ শহরসমূহের উলের চাহিদা। উলের চাহিদার ফলে কৃষি থেকে উল উৎপাদন—অর্থাৎ ভেড়া পালন বেশী লাভজনক হ'য়ে উঠল। তাই কৃষির সাধারণ জমিতে (commons) ক্রমে ঘেরা পড়তে লাগলো—ভেড়া পালবার জন্যে ঘেরা দেওয়া জমির প্রয়োজন, এর পর এল rotation crop—ক্রমিক ফসল—এক এক ঋতুতে এক এক ফসল। এই সব ফসল খাদ্যের নয়—কারখানার কাঁচা মালের জন্য। বিদেশ থেকে তখন খাদ্যদ্রব্য আনাই বেশী লাভজনক হ'য়ে উঠেছে। কৃষির উন্নত প্রণালীও এই সময় সুরু হয়। কৃষি তখন ব্যয়সাধ্য ও লাভজনক হ'তে লাগল। তাই শহরের ধনীরা সাধারণ চাষের জমি নিজেরা ঘিরে আত্মসাৎ করতে লাগল। এই জমি-বিচ্যুত গ্রাম্য জনতা তখন সমাজ ও রাষ্ট্রের চোখে হয়ে উঠল—"বদমাস ও ভবঘুরে" (rogues & vagabonds) এই বদমাস ও ভবঘুরের দল তখন শহরের রাস্তা ঘাটে, গ্রামের অন্ধ পল্লীতে সামাজিক আবর্জনা হ'য়ে উঠল। রাষ্ট্র আইন করে এদের এনে কারখানা গৃহে (work house) ও দুঃস্থ-আবাসে (Poor-house) আবদ্ধ করতে লাগল। এখান থেকে সুরু হ'ল স্বদেশী লোকদের ক্রীতদাসের মতো মুনাফায় খাটিয়ে তাদের শ্রমকে শোষণ করে নূতন উৎপাদন প্রথা। ইহাই হল মূলধন প্রথার (capitalism)এর সঙ্গে ইণ্ডাষ্ট্রীয়বাদ(industrialism)এর উৎপত্তি। এ সময় হতে শোষণযোগ্য শ্রম বা শ্রমিক এরা দেশেই প্রচুর পেত। জমি-বিচ্যুত কৃষকের দল জীবিকা-বিহীন হয়ে শ্রমশক্তি বিক্রয় করে জীবিকা চালাতে বাধ্য হল।

একদিকে কৃষি হ'ল ব্যয়সাধ্য—উন্নত প্রণালীর প্রবর্ত্তনের

সঙ্গে। অপরদিকে আমেরিকা এ প্রাচ্য ভূখণ্ড থেকে কৃষিজ দ্রব্য ইউরোপে—প্রধানত ইংল্যাণ্ডে,হল্যাণ্ডে ও স্পেন পর্তুগালে প্রচুর আসাতে দেশে উৎপন্ন কৃষি দ্রব্যের চাহিদা কমে গেল। দেশে উৎপন্ন কৃষিজ দ্রব্য বিদেশ হতে আগত কৃষিজ মালের সঙ্গে দরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠত না। কাজেই গরীব চাষীরা জমি ছাড়তে বাধ্য হল—কৃষি আর তাদের জীবন-রক্ষার পক্ষে পর্যাপ্ত রইল না। শ্রমজীবি (proletariat) সৃষ্টির ইহাই হ'ল গোড়ার কথা এবং সমাজের অর্থ-ব্যবস্থা যখন এমনিভাবে ভেঙে পড়ে, অর্থাৎ যখন একদল লোক—প্রধানত কৃষিজীবীরা বেকার ও জীবিকা-হীন হ'য়ে পড়ে, তখন-ই শ্রমজীবি হবার উপাদান দেশে সুলভ হয় এবং তখনই মূলধন প্রথার (capitalism) অর্থ-ব্যবস্থা সম্ভব হয়। ভারতের এইভাবে একদল কৃষি-জীবী জীবিকা হারিয়ে জমি-বিচ্যুত হ'য়ে শ্রমজীবী হবার অবস্থায় কখনও আসে নি—ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে। ইউরোপের মধ্যযুগে যেমন বহু ছোটো ছোটো রাষ্ট্র জন্মেছিল ভারতে বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের পর আর তেমন হয় নি। আমাদের দেশের ছোটো রাষ্ট্র ইউরোপের বহু বড় রাষ্ট্রের চেয়েও বড়। মোগল যুগের পতনের পর বা মহারাষ্ট্র শক্তির ক্ষণিক উত্থানের পিছনে অনেক ছোটো রাষ্ট্র দেখা দিয়েছিল—যার জের এখনও উড়িষ্যা মধ্যভারত কাথিওয়াড়ে ও বোম্বাই অঞ্চলের অতি ক্ষুদ্র বহু করদ রাষ্ট্রে দেখা যায়। কিন্তু ভারতের বৃহত্তর জীবনে এরা কোন দিনই প্রভাব প্রতিপত্তি সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে নি। জাতির খরস্রোতে ভাঁটায় টান-জমিতেই এরা প'ড়েছিলো এবং এই অবস্থার সূত্রপাতেই ইউরোপীয় প্রধানতঃ ইংরাজ প্রভাব-এ দেশে স্থাপিত হ'ল। এর সঙ্গে ইউরোপীয় অর্থ-ব্যবস্থাও ভারতের ঘাড়ে চেপে বসল। তখন তাদের প্রয়োজনেই এখানকার কৃষিকে স্বাবলম্বী রাখা এদের দরকার হ'ল। এখানকার কুটীর-জাত ইণ্ডাষ্ট্রিকে ধ্বংস করে তাদের উন্নত প্রণালীতে উৎপন্ন দ্রব্যকে এখানে চালাবে এবং এখানকার কৃষিজ দ্রব্য তারা কাঁচা মাল হিসাবে নিয়ে দেশের শোষণযোগ্য শ্রমশক্তির নিয়োগে পণ্য দ্রব্যে রূপান্তরিত করে এখানেই আবার তা চালান দেবে—এই ছিল তখনকার ইংরাজের শাসননীতি। তাই এখানে কৃষিকে বাঁচিয়ে রাখা তাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

ঠিক এই নীতি আয়র্ল্যাণ্ডে ও আমেরিকার উপনিবেশ-সমূহও অবলম্বন করেছিল। তাই ঐ সব অঞ্চলে কৃষি ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্যের উৎপাদন নিষিদ্ধ ছিল। ভারতের বস্ত্র উৎপাদনের ধ্বংসের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

ভারতে ও প্রাচ্য দেশে মূলধন প্রথার (capitalism) উদ্ভবের পক্ষে আর এক অন্তরায় হল—এই সব অঞ্চলের সহজ ও সুলভ জীবিকা। ইউরোপের তুলনায় এশিয়ার দেশসমূহ আকারে বিরাট এবং জমি অনেক উর্বর, ইউরোপে—বিশেষ করে উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপে প্রকৃতি যেমন কৃপণ, তেমনি নিষ্ঠুর। শীতপ্রধান দেশে অশনবসনের প্রয়োজন বেশী; অথচ কৃষি ও অন্য প্রকার ভূমিজ সম্পদ ইউরোপে ছিল কম। তাই সাধারণ জীবিকার জন্যও ইউরোপীয়দের মধ্যে সর্বদাই একটা ছট্‌ফটানি (restless-ness) ছিল। এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক দেশেই জীবিকা ছিল সহজ এবং মোটামুটি গ্রাম্যপ্রধান দেশ বলে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনও ছিল কম—যথা বস্ত্রাদি ও গৃহাদির প্রয়োজন শীত-প্রধান দেশ থেকে গরম দেশে অনেক কম। এই সব দিক থেকে জাপান এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে স্বতন্ত্র; দেশ ছোট, ভূমিজ সম্পদ পর্যাপ্ত নয় এবং শীত-প্রধান—তাই এখানে নূতন অর্থ ব্যবস্থার প্রেরণা সহজেই লোকের মনে আসে—যা চীন, ভারত ও অন্যান্য দক্ষিণ এশিয়ার দেশে আসে না।

প্রধানতঃ এই কারণে এবং কতকটা ধর্মগত ও সমাজগত ধারণা ও আদর্শ হ'তে এশিয়ার লোকদের মধ্যে বৈষয়িক উদ্ভাবন-বৃত্তি (enventive power) বেশী খেলতে পারে নি। আধ্যাত্মিক বিষয়ে এরা যে তীক্ষ্ণ মননশক্তি ও বিচারের পরিচয় দিয়েছে বৈষয়িক ব্যাপারে তা দেয় নি। তাই কোন যান্ত্রিক উদ্‌ভাবন আমাদের দেশে প্রায় হয় নি—যা হবার তা হয়েছিল আর্য উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বে বা অল্প পরে; যেমন গাড়ী প্রভৃতির চাকী, কুমারের চক্র, জলসেচন প্রথা, তূলা দিয়ে কাপড় বুনবার প্রথা প্রভৃতি। আর্য সমাজ যখন ভারতে শিকড় গেড়ে বসল—যখন খণ্ডরাজ্য থেকে সার্বভৌম রাজ্য গড়তে আরম্ভ করল, তখন থেকেই তাদের বৈষয়িক উদ্ভাবন বৃত্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল। মূলধন প্রথার উৎপত্তির পক্ষে এই সব যান্ত্রিক উদ্‌ভাবন বিশেষ প্রয়োজনের। যান্ত্রিক উদ্‌ভাবনের ফলে যেমন একদিকে

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন হ'য়ে পড়ে ব্যয়সাধ্য, যার ফলে সকলে এই কাজে স্বাধীনভাবে নিয়োজিত হতে পারে না এবং অনেকে বৃত্তিহীন হ'য়ে পড়ে, অপরদিকে অল্প পরিশ্রমে বেশী উৎপন্ন হওয়ার জন্য—সমাজের প্রয়োজন সহজেই মিটে যায় এবং সকলের পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না—তাই অনেক লোক বেকার হতে বাধ্য হয়—যার ফলে বৃত্তিহীন লোকদের বেকার দুঃস্থ অবস্থার সুযোগে তাদের শ্রম-শক্তিকে মুনাফায় খাটিয়ে শোষণ করা চলে এবং প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন খরচের উপর অতিরিক্ত মূল্য (surplus value) ধনপতিরা আদায় করতে পারে। ইংল্যাণ্ডেই যে প্রথম এই মূলধন প্রথার উৎপত্তি হয় তার অনন্যতম কারণ ইংলণ্ডের যান্ত্রিক উদ্ভাবন। মানুষের বুদ্ধি স্বভাবতঃই তার নিত্যকার প্রয়োজন মিটাবার দিকে-ই প্রথম প্রবাহিত হয়—তাই ইংল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডে প্রথম যান্ত্রিক উৎপাদন সুরু হয়—গমপেশা ও বস্ত্রবয়নের জন্য। এই দুই বিষয়েই মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী এবং এই দুই বিষয়ে শ্রমলাঘব যন্ত্র প্রথম সে প্রবর্তন করে। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য—এর-ও পূর্বে বা সমসময়ে জার্মেনীতে প্রথম শ্রমলাঘব যান্ত্রিক উদ্ভাবন হয়েছিল—পুস্তক মুদ্রণ ও কাগজ তৈরি বিষয়ে। মানুষ যে কেবল ডাল-ভাত দিয়ে-ই বেঁচে থাকে না— man does not live by bread alone—এই উক্তি এতে সমর্থিত হয়। কিন্তু মানুষ যে একটি অর্থনীতি জীব—an economic animal—এই উক্তি প্রমাণিত হয় তার সমাজ ব্যবস্থার ক্রমবিকাশে। পুস্তক মুদ্রণ নিয়ে যান্ত্রিক উদ্ভাবন—যত আগেই হয়ে যাক সেটা তার মনের বিলাসের জন্য—তার নিত্যকার জীব-ধর্মের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নয়, তাই তার ভিত্তিতে তার নূতন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি। তা গড়ে উঠেছে—তার ভাত কাপড়ের সমস্যা নিয়ে—তার অশন-বসনের উৎপাদন প্রথা নিয়ে বরং এই উৎপাদন প্রথায় যখন এমন অবস্থা এল যে শ্রমিকদের শ্রম-শক্তিকে কাজে লাগাবার সহজ পথ বন্ধ হ'ল—অর্থাৎ তাদের নিজ আয়ত্তে যখন উৎপাদন উপকরণ ও উৎপাদন যন্ত্র রইল না, তখন-ই তারা শ্রম-শক্তি বিক্রি ক'রতে বাধ্য হ'ল—জীবিকা অর্জনের জন্য। মুনাফায় উৎপাদনও এখান থেকে-ই সুরু হ'ল—অর্থাৎ ব্যবহার দ্রব্যের বদলে পণ্য দ্রব্যের উৎপাদনও সুরু হ'ল—এখান থেকে। মূলধন প্রথার সূত্রপাত-ও এখানে-ই দেখা দিল।

সার্বজাতিকতা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

(৬)

খাসিয়া পরিবারের অভ্যর্থনায় পরিতুষ্ট হ'ল অমিয়। সে যে-সব তথ্যগুলা সংগ্রহ করেছিল, হোটেলের শয্যায় শুয়ে তাদের আলোচনা করলে। কিন্তু প্রধান কথাটা তার সকল আলোচনার রঙীন পটভূমি! তাতে আঁকা মোহিনীমূর্ত্তি—ধীর, শান্ত হাস্য-মুখ,কোমলতার পূর্ণ-বিকাশ। খৃষ্টীয়ধর্মী হ'লেও জেকব পরিবারের চাল-চলন আদি বাসীদের অনুরূপ। নিজের জননী সম্বন্ধে এলসী জননী বলেছিলেন—তিনি ভগবানের ঘরে সুপারী খাচ্চেন—অর্থাৎ তিনি স্বর্গীয়া। এমন কথাবার্ত্তায় এলসী আনন্দ পায়। জন লজ্জা পায় না, সরল ভাবে পরিভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেয়। অথচ প্রতি রবিবারে এরা সপরিবারে গির্জায় যায়, এলসী এবং মিনী ইংরাজি সুরে খাসিয়া ভাষায় গান গায়।

আবার ঘুরে ফিরে সে ভাবে এলসীর কথা, এলসী তো তার উচ্ছ্বসিত প্রেম নিবেদনের সোজা জবাব দেয় না। সেটা লজ্জা। আচ্ছা মিনী কি জনের প্রেমিকা? নিঃসন্দেহ। এলসী বলে, বিবাহ হলেই বেচারা জনকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে শ্বশুর-বাড়ি। কি উল্টা নিয়ম? বধূ যায় না শ্বশুরবাড়ি। বরকে যেতে হয় শাশুড়ির বাড়ি বাস করতে। আচ্ছা এলসী?

সে নিজের মার কথা ভাবে। এলসীকে বিবাহ করলে তার জননী কোনো কথা জানবেন না, কারণ সে থাকবে

তার জননীর কাছে, অমিয় থাকবে কর্মস্থলে যদিও তার বাসস্থান হ'বে মিসেস জেকবের ঘর।

আবার তার চিত্ত-বিক্ষোভ হয়। ধর্ম, সমাজ, পরিবার, মায় মান্ধাতার আমলের রীতিনীতি কৃষ্টি! কিন্তু তখনই ঝড় প্রশমিত হয়, যখন এলসীর চাঁদমুখ ভেসে ওঠে তুফানে। সত্যই তো প্রেম বড়। আর সব ভেসে যায় প্রেমের বন্যায়। সে শয্যায় উঠে বসে, দেখে ভাসমান জননী ভগ্নী, প্রাচীন আচারের খোসা যার উপর মাত্র প্রাচীনতার ছাপ আছে, প্রাণ নাই। সেই প্লাবনের মাঝে এক সোনার তরী যার মাঝে সে আর এলসী।

সুতরাং সে সিদ্ধান্ত করলে পরদিন চেরা-পুঞ্জিতে মিস্‌মী না ঐ রকম নামের কি একটা জলপ্রপাতের ধারে সে শ্রীমতী এলসী জেকবের কর প্রার্থনা করবে। এ সঙ্কল্পের পর অবশিষ্ট রাত্রিটুকু অমিয় সুখে কাটালে বিরাম-দায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে।

(৭)

কিন্তু প্রেমের পথ মসৃণ নয়। চেরাপুঞ্জির পথে এক লরী লোক। আর দৃশ্যপট মারাত্মক। আঁকা-বাঁকা পাহাড় পথ। কোথাও দুটা পাহাড় কাছাকাছি এসেছে, নীচের স্রোতস্বতীর শব্দ অবধি শোনা যাচ্চে। প্রতি মোড়ে যেমন চোখের ভিতর দিয়ে মরমে পুলক পৌছে চিত্তকে উদ্বেলিত করে, তেমনি সহজ আত্মরক্ষার সংস্কার মনের মাঝে ভীতি সঞ্চার করে। দেহ এবং মনে রোমাঞ্চ, তার উপর রোমান্স, পাশে বসে শ্রীমতী এলসী—যার সঙ্গে একত্র ভ্রমণ পুষ্পক-রথে স্বর্গযাত্রার সমান হর্ষবর্দ্ধক।

তারা যখন পৌছিল চেরাপুঞ্জি, ডাক-বাঙ্‌লা এবং তার সম্মুখের প্রাঙ্গণ কলেজের ছাত্রী এবং অধ্যাপিকায় পূর্ণ। এ মিলনে সমারোহ বাড়ল কিন্তু অমিয়র অন্তরাত্মা ব্যথিত হ'ল নিরাশার সঙ্কেতে। মানুষমাত্রেই স্থান মাহাত্ম মানে। বিবাহ, বিশেষ সার্ব্বজাতিক উদ্বাহ একটা গুরুতর ব্যাপার। জীবনের এ পরীক্ষার প্রথম স্থলটা হওয়া উচিত রোমান্টিক। সত্যই চেরাপুঞ্জির মিস্‌মী জলপ্রপাত এক সৃষ্টিছাড়া সুন্দর ভূমি। পাহাড়ের প্রান্ত হ'তে দেখা যায় সুরমা উপত্যকা—রম্যকাননের মত। তার মাঝে আঁকা-বাঁকা শুভ্র নদী, শ্যামল ক্ষেত্র বন উপবন গ্রাম ও গোচারণের মাঠ—যেন অপরূপ শিল্পির হাতের রূপায়তন, অপূর্ব ছবি। সে তো মাত্র পটে আঁকা ছবি নয়। প্রেমের আশীর্বাদে তার প্রসারিত চিত্তে সে চিত্র প্রাণবন্ত। কিন্তু অবসর মিললো না প্রেমিক অমিয়র—ভরাপ্রাণের প্রেম-নিবেদন ক'রে খাসিয়া যুবতীর পাণি-ভিক্ষার।

কারণ কলেজের মেয়েগুলা যত গোল করে, তার দ্বিগুণ বিদ্রূপ করে দুএকজন নবীনা শিক্ষয়িত্রী। মিস গুপ্ত বল্লে—মিঃ সেন আপনি আর উৎখার থাকবেন না। নংপোশিনের শানিত রূপার অস্ত্রের পক্ষে আপনার দেহ অপবিত্র গণ্য হবে না।

অমিয় বল্লে—মিস গুপ্ত আমার দুর্ভাগ্য এই যে আমি গ্রীক ভাষা শিখিনি। অতএব আপনার সদুপদেশ পাহাড়ের হাওয়ায় উড়ে গেল।

মিস্ মৈত্র এঁদের মধ্যে প্রবীণতার দাবী করেন, বয়স যদিও তাঁর মাত্র এককুড়ি পাঁচ। তিনি গৌহাটির এক নারী-সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্ত্রী। মিস মায়া মৈত্র দরদী। তিনি সারা সকালটা লক্ষ্য করলেন বেচারা অমিয় সেনের উপর কুমারীদের অভিযান। মোটামুটি তিনি পরিহাসের মূল কারণের সন্ধান পেয়েছিলেন—বাঙ্গালী অধ্যাপক মিঃ অমিয় সেনের খাসিয়া কুমারী শ্রীমতী এলসী প্রীতি। ব্যাপারটা হৃদয়বৃত্তি হলেও আন্তর্জাতিক। এমন প্রেম ব্যক্তি ও জাতীয় বিস্তৃতির উপায়। তবে যে লাফ দেবে তাকে বোঝান উচিত, উল্লম্ফন মার্গের চরম অবতরণের স্থানটির অবস্থা।

তাই মৃদুস্বরে মিস্ মায়া মৈত্র বল্লেন—মিঃ সেন আপনি খাসিয়া জাতি সম্বন্ধে সকল তথ্য অবগত হয়েছেন?

অমিয় বল্লেন—যখন বাঙ্গালী এমন কি বৈদ্য-জাতি সম্বন্ধে সকল তথ্য জানা নেই তখন আর খাসিয়ার তত্ত্ব-কথা জানব কেমন করে?

মিস্ ছায়া সেন বল্লেন—বাঙ্গালী বা বৈদ্যতত্ত্ব এখন পুরাতত্ত্ব।

অমিয় একথার উত্তর দিল না। তার চিত্তের গভীরে একটা প্রত্যুত্তর উঠে আপনি বিলীন হ'ল—অন্ততঃ বৈদ্য-সম্প্রদায় এলসীর মত সরলতা ও সৌন্দর্য্যের দাবী করতে পারে না।

মিস জেকব গাছ হ'তে সদ্য ছেঁড়া একটা কমলা লেবু নিয়ে শ্রীমতী কমলা বেজবরুয়ার সাথে মল্লযুদ্ধের মত একটা

কায়িক প্রতিযোগিতায় নিযুক্ত ছিল। মায়া ও ছায়ার আহ্বানে সে এলো। এক হাতে লেবু অন্য হাতে পরাজিতা কমলাকে নিয়ে।

মায়া জিজ্ঞাসা করলেন—এলসী তুমি তোমার বন্ধুকে থেলনের গল্প বলনি ?

সে বল্লে—আমাদের সময় কাটে আনন্দের কথায়, বিভীষিকার সমাচার দেবার অবকাশ হয়নি।

সকলে তুষ্ট হ'ল তার উত্তরে। ইত্যবসরে কমলা তার হাত থেকে কমলা লেবুটা কেড়ে নিয়ে ডাকঘরের দিকে ছুটলো। তার পিছনে ছুটলো এলসি। তার পিছনে ছুটলো আরও কয়েকটি কুমারী। ডাকমুন্সীর গুর্খা স্ত্রী হাসিমুখে তাদের আনন্দের সাক্ষ্যরূপে দাঁড়িয়েছিল ডাক-ঘরের দ্বারে। বয়স এদেরই মত। কিন্তু একটি শিশু হাতে, অন্যটি কাঁকে।

মায়া, ছায়া নলিনী ও রজনীগন্ধা সবাই মিলে অমিয়কে সাপ-পূজার বর্বরতার গল্প শোনালে। বাঙলার পিছনে একটা টিপির উপর কাত হয়ে শুয়ে জন্ মিনীকে প্রেমের কথা শোনাচ্ছিল—যার ভাষা জাতীয়তা ভেদে বিভিন্ন কিন্তু ভাব আন্তর্জাতিক।

(৮)

চেরার অনতিদুরে এক গুহায় প্রকাণ্ড এক অজগর বাস কর্ত্ত। তার ভোজ্য ছিল মানুষ। এক বুদ্ধিমান খাসিয়া তাকে তুষ্ট করেছিল ছাগল ভেড়া খাইয়ে। তাই সে আর নর-মাংস খেতো না। কিন্তু চিরদিন থেলনকে ভেড়া খাওয়ানো এক আপদ। উসুইদনো দেবতার নির্দ্দেশে সেই ব্যক্তি একদিন তপ্ত লোহার শলাকা পুরে দিলে থেলনের পেটের ভিতর—যখন সে তার সঙ্কেতে মুখ ব্যাদন করলে। মৃত সর্প-রাক্ষসের মাংস টুকরা টুকরা করে খাসিয়ারা ভক্ষণ করলে। অবশ্য তার সঙ্গে ক্লঙ্ ক্লঙ্ মদ্যপান ক'রে থেলন বধের উৎসব সম্পাদন করলে। ক্লঙ্ শুকনো অলাবুর পানপাত্র।

কিন্তু মানুষ যতই করুক অদৃষ্ট ঘটান্ দগদদ্ধা। একটুকরা থেলনের মাংস অদৃশ্য অভুক্ত হয়ে পড়েছিল কোথায়। তা' হ'তে শত শত থেলন শাবক জন্মে, বহু খাসিয়ার ঘরে বিরাজ করে—বাস্তুদেবতা হিসাবে। পারিবারিক বিপত্তি কাটে ক্রুদ্ধ গৃহ-দেবতাকে নরশোণিতের নৈবেদ্যে তুষ্ট করলে।

গল্পটা মুখরোচক হলেও বীভৎস, সে কথা ব্যক্ত করলে শ্রোতা। এটা ইতি-কথা ইতিহাসের কথা নয়।

মিস্ মায়া বল্লে—হ'তে পারে কিন্তু আজও নঙ্শোহনো বা নরঘাতক রাত-বিরাতে মানুষ খুন ক'রে, তার নাকের রক্তর নৈবেদ্য দেয় থেলনকে।

মিস্ ছায়া বল্লে—থেলনকে লোহার শলা বিঁধে মেরেছিল ব'লে নংশোহনোরা রূপার শলা দিয়ে নাকের রক্ত বার করে।

একজন রসিকা বল্লে—যদি ফাঁসি যেতে হয় তা হলে রেশমের দড়িতে ঝুলে পড়া ভালো।

মিস্ গুপ্ত বল্লে—আমাদের কিন্তু ভয় নাই আমরা উৎখার।

—তারা কারা ?—জিজ্ঞাসিল মিঃ সেন।

শ্রীমতী রজনীগন্ধা বল্লেন—খাসিয়া সম্প্রদায়ের বাহিরের লোক উৎখার। তারা অপবিত্র। বিধর্মীকে ঘৃণা করে সকল জাতি।

শ্রীমতী গুপ্ত বল্লেন—তবে তাদের মেয়ে বিয়ে করলে, তাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া যায়। তখন সে নঙ্শোহ্নোর বধ্য।

অমিয় অনির্দ্দিষ্ট ভাবে চাহিল কুমারীর দিকে কিন্তু তার কথার উত্তর দিল না।

যখন জন্ এলো তাদের মাঝে তখনও তাদের থেলনের কথা হ'চ্ছিল। জন বল্লে—এক একটা বংশ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে তাদের গৃহে থেন আছে। কিন্তু তাকে কেহ দেখেনি।

অমিয় বল্লে—আমাদের বাস্তুসাপের মত। কিন্তু এখনও কি নরবলি হয় ?

জন্ বল্লে—দু একটা সন্দেহজনক নরহত্যা হয়। লোকের বিশ্বাস থেলন পূজা।

তারপর হেঁসে বল্লে—বেচারা খাসিয়া ধরা পড়েছে। নাগাদের কালীপূজায় পূর্ব্বে নরবলি হত। আর ক্ষমা করবেন, প্রবাদ আছে, বহু পূর্ব্বে কামাখ্যায়ও নাকি নরবলি হত। তিনি হিন্দু জাতির আরাধ্যা দেবী।

(৯)

বন-ভোজন হল একত্র। সারাদিন কত পশলা যে বৃষ্টি পড়ল, কে তার ইয়ত্তা করে। বৃষ্টির সময় এরা ছুটে ঘরে

ঢোকে, জল-পড়া থামলে এরা বাহিরে আসে। কেহ বলে এ দেশের আকাশ ফুটো, কেহ বলে সূর্য্য দেবতা তাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করছেন। অমিয় সেনের মন বলে—আজকের দিনটা তো নিস্ফল হ'ল। পরে হবে শুভ প্রস্তাব।

কিন্তু ভাগ্য-দেবতা খাম-খেয়ালী। শরতের বৃষ্টির ধারার মত তাঁর ইচ্ছা কখন নেমে আসে ভূতলে, সে কথা বোঝবার উপায় নাই। যখন বাহিরে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়ছে, ঘরে ও বারান্দায় প্রগলভতা নিরুদ্বেগ। এক কোণের নিরুপদ্রব শান্তি ভাঙ্‌লেন শ্রীমতী মায়া মৈত্র।

—এলসী তোমার ডাক্তারী পড়ার কি হল?

সে বল্লে—এখনও কলকাতা থেকে উত্তর আসেনি। মিঃ সেন বলছেন, কোনো ভয় নাই, আমাকে ওরা কলেজে নিশ্চয় ভর্ত্তি করবে।

মিঃ অমিয় সেন সে কথা সমর্থন করলে।

মিস নলিনী মিত্র বল্লেন—তা হলে তোমাকে তো কলকাতায় থাকতে হবে।

মিস্ সেন বল্লে—মিঃ সেনের তত্ত্বাবধানে।

মিষ্টার সেনের হৃদয়ের অভ্যন্তরে গুরু গুরু শব্দ হল।

মিস্ জেকব সোৎসাহে বল্লে—হাঁ, ওঁর তত্ত্বাবধানে থাকব। সেটা কম্ কথা নয় বিদেশে।

একজন রসিকা বল্লে—ওঁর বাড়িতে?

এলসী বল্লে—তার সুবিধা হবে না উভয় পক্ষেরই।

মিস্ গুপ্ত বল্লে—আমাদের দিক থেকে সেটা প্রথা হলেও, তোমাদের দিক্ থেকে সেটা রীতি-বিরুদ্ধ।

এলসী বল্লে—বুঝলাম না সমাজ-নীতির গবেষণা।

মিস্ গুপ্ত বল্লে—শ্বশুরবাড়িতে তো খাসিয়ারা বাস করে না।

—ভাইয়ের বাড়িতে করে।—নিরুদ্বেগে বল্লে খাসিয়া মহিলা।

শ্রীমতী ছায়া বল্লে—ওঃ! পাশ ক'রে বিয়ে করবে?

এলসী গম্ভীর হল। অমিয়র মুখ ফ্যাকাশে হ'ল। প্রতীক্ষার মুহূর্ত্তটা হল সাঙ্ঘাতিক।

এলসীর কণ্ঠস্বরে রূঢ়তা ছিল না, অথচ গম্ভীর এবং দৃঢ়। সে বল্লে—আজ কদিন পথে ঘাটে শৈলে কান্দারে আমরা এই জঘন্য রসিকতাটা শুনছি। আপনারা বয়সে বড়, কেহ কেহ আমার শিক্ষয়িত্রী, কিন্তু—

অমিয়র বুকে হাতুড়ী পিটছিল কোন্ অসুর। তার প্রাণ চাইছিল শুনতে—এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।

কুমারী একটু দম নিয়ে বল্লে—ক্ষমা করবেন। আপনারা শিক্ষিতা হলেও পরদা ঢাকা সমাজের মেয়ে। এই প্রথম বাহিরের আলোক দেখছেন। যুবক যুবতীর বন্ধুত্বে মাত্র একটা নির্দেশ দেখেন—বিবাহ।

এরা অপ্রতিভ হল। কমলা অত বোঝেনি। সে বল্লে—মিঃ সেনের মত স্বামী পাওয়া কিন্তু সৌভাগ্য।

বান্ধবীর সরল কথায় এলসীর স্বরের কঠোরতা লুপ্ত হল। আবার সে হাসলে। বল্লে—নিশ্চয়। আমি ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করি। কিন্তু উনি যদি নিজেকে ভুলে, মার বুকে গুলি মেরে বিধর্মীকে বিবাহ করেন, উনি শ্রদ্ধা হারাবেন। উনি আমার অগ্রজের মত।

সভায় সকলে উভয়ের দিকে তাকালো। এলসীর হাবে ভাবে বা ভাষায় চাতুরীর সঙ্কেত ছিল না। স্বপ্নোত্থিতের মত মিঃ সেন তার দিকে তাকালেন।

বৃষ্টি বন্ধ হল। এলসী তার হাত ধরে বল্লে—চলুন আপনাকে আমার মার বাড়ি দেখিয়ে নিয়ে আসি। আমার কলিকাতার অভিভাবক ভাই, আমাদের ঘর বাড়ি দেখা প্রয়োজন।

সে তাকে টেনে নিয়ে গেল। মহিলাবৃন্দ শাস্তি-পাওয়া ছাত্রীর মত মর্মবেদনায় নীরব রহিল।

পথে যুবতী বল্লে—মিঃ সেন আপনি কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছিলেন সারাদিন। এবার আমরা নিরালায়।

সেনের মনে যে কবিতা গুমরে উঠ্‌ছিল, মুখ ফুটে বল্লে—

ভেবেছিলাম সইবে না আজ লুকিয়ে রাখা
বদ্ধ বাণীর অস্ফুটতায় সে কথা মোর অর্দ্ধাবরণ ঢাকা।
ভেবেছিলাম বন্দীরে আজ মুক্ত করা সহজ হবে
ক্ষুদ্র বাধায় দিনে দিনে রুদ্ধ যাহা ছিল অগৌরবে।

সুন্দরী বল্লে—বুঝলাম না।

সেন বল্লে—একটা প্রশ্ন ছিল। কিন্তু উত্তর পেয়েছি এলসী। সত্য—

—নিছক সত্য। আমি আপনার অন্য একটি বোন্। স্নেহ সর্বজাতিক। আমি খাসিয়া বোন এলসী। কেমন?

সে মোহিনী চাহনী। নির্ভীক সরল প্রশ্ন। তর্কের অবকাশ নাই—উচ্ছ্বাসের স্থান নাই।

আন্তরিকতা ফুটে উঠ্‌লো অমিয়র উত্তরে—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

বিরাজ-বৌ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিরাজ-বৌ সম্বন্ধে আমার আলোচনা হইয়াছিল, শরৎচন্দ্রের সবে মাত্র তখন উদয় হইয়াছে—আমি তখনও ছাত্রদশা উত্তরণ করি নাই। আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম—স্বামীর উপর অভিমান করিয়া বিরাজ-বৌএর আত্মহত্যাই করিবার কথা—আত্মহত্যার জন্য জলে সে ঝাঁপও দিল—মাঝ হইতে জমিদার পুত্রের বজরায় তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার সতী ধর্ম্মকে ক্ষুণ্ণ করিলেন কেন? Psychologyর বিধি অনুসরণ করিতে করিতে Pathologycal Conditionএর সাহায্য লইলেন কেন? শরৎচন্দ্র যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহার ভাবার্থ এই—উপন্যাসের মূল তথ্যটাই বোঝ নাই। পারিবারিক অশান্তির জন্য হিন্দু নারীর আত্মহত্যার চিত্র অঙ্কনই আমার উদ্দেশ্য নয়। নারী অভিমানে আত্মহত্যা করে—অতিরিক্ত অভিমানিনী ও অতি বিড়ম্বিতা নারী অভিমানে তাহারও বেশি করিতে পারে—সতীর পক্ষে প্রকৃত আত্মহত্যা তাহার সতীব্রতের হত্যা। আমি তাহাও ত করাই নাই, মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় অভিমানিনী লাঞ্ছিতা সতী ভুল করিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইবা মাত্র তাহার অন্তর্নিহিত সতীধর্ম্ম তাহাকে ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করে। আমি তাহাই দেখাইতে চাহিয়াছি। আর তুমি যে Pathologyর কথা বলিলে—তাহা Psychologyরই অন্তর্গত। যেমন সুস্থ অবস্থা আর ব্যাধিত অবস্থা দুইই জীবনের অন্তর্গত। মন যাহার আছে মনের ব্যাধিও তাহার আছে—উপন্যাস গল্পে মনের সজীবতার স্থান আছে—মনের ব্যাধির স্থান নাই, ইহা আমি মনে করি না। তাহা ছাড়া, মানব চরিত্র অত্যন্ত জটিল। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বিচিত্র মানব চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় হইলে দেখিবে যাহা আজ অস্বাভাবিক মনে হইতেছে—তাহা স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকার করিবে—যাহাকে Pothologycal Condition বলিয়া মনে হইতেছে—দেখিবে তাহা Psychologyর গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। মানব সংসারে আমি যাহা নিজের অভিজ্ঞতায় জানি না—কথা সাহিত্যে তাহার ঠাঁই দিই না। ইহাই আমার প্রধান সমর্থন।

বিরাজ-বৌএর শেষ পৃষ্ঠায় আছে—"সব কথার মধ্যে অত্যুগ্র একাগ্র পতিপ্রেম মুহূর্ত্তের ভ্রমে কি করিয়া সতী সাধ্বীকে দগ্ধ করিয়াছে তাহাই।" সমগ্র উপন্যাসখানির মর্ম্মগ্রন্থি ইহাই। কাজেই পরম পতিব্রতা বিরাজ-বৌকে জমিদার পুত্রের বজরায় লইয়া যাইতে হইয়াছে। ঐ 'ভ্রম' কথাটির বদলে আমি 'উদ্‌ভ্রান্তি' কথাটি কেবল বসাইতে চাই।

সমগ্র উপন্যাসের পূর্ব্বাংশের আয়োজন কেবল ঐজন্য—উত্তরাংশ শুধু দাহনের প্রায়শ্চিত্ত।

প্রথমেই শরৎচন্দ্র শান্তিময় সতীতীর্থের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। এই তীর্থের উপরে নীলাকাশ—তাহাতে মেঘের বা ঝটিকার চিহ্ন মাত্র নাই।

বিরাজ-বৌএর অসামান্য সতীত্ব শরৎচন্দ্র কেবল আচরণে প্রকাশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই—বিরাজ-বৌ মুখেও বলিতেছে—"ভাই বল, আর বাপ-মাই বল, মেয়ে মানুষের স্বামীর মত আর কেউ নয়। ভাই বাপ মা গেলে দুঃখ কষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্ব্বস্ব যায়। * * আমি ত তা হলে একটি দিনও বাঁচতুম না। সিঁথের এ সিঁদুর তোলবার সঙ্গে সিঁথে পাথর দিয়ে ছেঁচে ফেলতুম। শুভ যাত্রা ক'রে লোকে মুখ দেখবে না, শুভকর্ম্মে লোকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে না। এ দুটো শুধু হাত লোকের কাছে বার করতে পারব না। লজ্জায় এ মাথার আঁচল সরাতে পারব না। ছি ছি সে বাঁচা কি আবার একটা বাঁচা? সেকালে যে পুড়িয়ে মারা হত সে ছিল ঠিক কাজ। পুরুষ মানুষে তখন মেয়ে মানুষের দুঃখ কষ্ট বুঝ্‌ত। এখন বোঝে না।"

বিরাজ বৌএর কাছে অসতী নারী একটা অদ্ভুত বস্তু। সে বলিতেছে—"আচ্ছা শুনি সংসারে অসতী সতী দুইই আছে, অসতী মেয়ে মানুষ কখনো চোখে দেখি নি—আমার বড় দেখতে সাধ হয়, তারা কি রকম।"

বিরাজের ঘরেই অসতী সুন্দরী বিরাজ করিতেছিল—কিন্তু সরল বিশ্বাসিনী সতী তাহা বুঝিতেও পারেন নাই। বিরাজ অহঙ্কার করিয়া বলিতেছে—

(সাবিত্রী) হলেনই বা দেবতা। সতীত্বে আমিই বা তার চেয়ে কম কিসে? আমার মত সতী সংসারে আরো অনেক থাকতে পারে, কিন্তু মনে জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে—এ কথা মানি নে। আমি কারো চেয়ে এক তিল কম নই, আর তিনি সাবিত্রীই হোন আর যেই হোন। এ সকল উক্তির দ্বারা শরৎচন্দ্র নিয়তিকে হাসাইয়াছেন—নিয়তির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটা চক্রান্ত ইহাতে সূচিত হইয়াছে।

যে কোন কুলবধূকে নায়িকা স্বরূপ গ্রহণ করিলে শরৎচন্দ্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না। সতীর মতিভ্রংশ দেখাইতে শরৎচন্দ্রকে অসামান্য সতীর আশ্রয় লইতে হইয়াছে। যেরূপ সতীর পক্ষে পদস্খলন বা মুহূর্ত্তের ভ্রমও অপ্রত্যাশিত—সেরূপ সতীর চরিত্র অঙ্কন করিতে হইয়াছে এবং একটু বেশি Emphasis দিতে হইয়াছে।

যে দশায় বিপর্য্যয় ও ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া অসামান্যা সতীরও সতীস্বর্গচ্যুতি ঘটে শরৎচন্দ্রকে একে একে তাহার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। বিরাজ-বৌকে সন্তানহীনা করিতে হইয়াছে, তাহাকে অসামান্য সুন্দরী করিতে হইয়াছে—স্বামীটিকে করিতে হইয়াছে সংসারে উদাসীন, অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত স্নেহার্ত্ত, উপার্জ্জনে অক্ষম ও মূর্খ।

দেবর পৃথক হইল, দেবর-বধূর সহিত ঘনিষ্ঠতা নাই। ননদটির বিবাহ হইয়া গেল। দাসীটি পর্য্যন্ত বিতাড়িত হইল—বাড়ীর আশে পাশে প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগ নাই। এই যে স্বামী-স্ত্রীর সংসার এখানে অশান্তির সৃষ্টি করিতে হয়। কিন্তু অশান্তি আসে কোথা হইতে? কাজেই দারিদ্র্য চাই।

এ দারিদ্র্য নানাভাবেই আসিতে পারিত। শরৎচন্দ্র অভিনব উপায়ে দারিদ্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বামী নীলাম্বর ভগিনীর বিবাহ দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। ভগিনীর বিবাহ দিয়া যাঁহার টাকা পাইবার কথা, তিনি বড় ঘরে ভগিনীর বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। নীলাম্বর মহার্ত্তির এই দণ্ড বরণ করিয়া গৃহে অশান্তির সৃষ্টি করিলেন। এজন্য সর্ব্বস্ব গেল, ঋণও হইল। তাহাতেও নিশ্চিন্ত না হইয়া শরৎচন্দ্র উপরি উপরি তিন বছরের অজন্মার সাহায্যও লইয়াছেন। এইভাবে সংসারে দারুণ অভাবের সৃষ্টি হইল। নীলাম্বরের উপার্জ্জনে প্রবৃত্তি নাই। এদিকে বিরাজ বৌএর শুধু সতীত্বের অভিমান নয়। দীনতার অভিমানও প্রচুর—নারীত্বের অভিমান ও পারিবারিক মর্য্যাদাবোধও অতিরিক্ত। কাহারও এমন কি নিজের জা মোহিনীর সহায়তা লইতেও সে অসম্মত। এই নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও সতী সাধ্বীর সহিত স্বামীর ব্যবধান ঘটিবার কথা নয়। শরৎচন্দ্র এখানে পৌরাণিক সাহিত্যের মত তাঁহার রচনায় নারদকে স্মরণ করিয়াছেন। তুচ্ছ কথা, অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার লইয়া শরৎচন্দ্র কলহ বাধাইতে ওস্তাদ। রস-কলহই হউক, আর বিষ কলহই হউক, কলহ ছাড়া শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য জমে না। বাক্‌কলহের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র তাঁহার আখ্যান বস্তুর পরিপুষ্টি সাধন করেন।

দাম্পত্য কলহ ও মান অভিমানের পালা চলিতে লাগিল। কথায় বলে একহাতে তালি বাজে না—কিন্তু এখানে তিনি একহাতেই তালি বাজাইয়াছেন।

কলহের ও মনোমালিন্যের বহ্নির প্রধান ইন্ধন আত্মগোপন। যে কথাটি বলিলে সমস্ত নির্ম্মল হইয়া যায়, বিবাদের একটি নিষ্পত্তি বা মীমাংসা হয়, মনের মালিন্য কাটিয়া যায় সেই কথাটি অভিমানবশেই হউক আর জেদের বশেই হউক আর রাগের বশেই হউক, এক জন বলিবে না। তাহার ফলে একটা অনর্থ ঘটিবে। ইহাই শরৎচন্দ্রের টেকনিক।

এক্ষেত্রে বিরাজ-বৌ কিছুতেই বলিল না যে ঋণের জন্য চাউল চাহিতে চাঁড়াল বাড়ী গিয়াছিল—বলিলে আর অনর্থ ঘটে না। নিদারুণ অভিমান জন্যই বিরাজ-বৌ একথা গোপন করিয়াছিল।

নীলাম্বরের মতিভ্রংশ ও বিরাজ-বৌএর মতিভ্রংশ দুইই মিলিয়াছে যে মুহূর্ত্তে—শরৎচন্দ্র সে মুহূর্ত্তটিকে অতি সন্তর্পণে বাণীরূপ দিয়াছেন। তিনদিন আগে নীলাম্বর শিষ্যবাড়ী কিছু অর্জ্জনের জন্য গিয়া এক অন্তর্জ্জলী করা মুমূর্ষুর পাশে কাটাইয়া দিল এবং তাহাকে সৎকার করিয়া ফিরিল। এদিকে জনপ্রাণিশূন্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার স্ত্রী একা। ঘরে দুশ্চিন্তায় অনাহারে মৃতকল্প, সমস্ত যামিনী শুনিয়াও তাহার স্বামী বাহিরে পরোপকার করিতে নিযুক্ত। সেই হতভাগিনীর বলিবার বা কহিবার আর কি বাকি আছে? আজ তাহার অবসন্ন বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাকে বারংবার দৃঢ়স্বরে বলিয়া দিতে লাগিল—বিরাজ, সংসারে তোর কেউ নাই—স্বামীও নাই। * * * ভাঁড়ারে চাল নাই, গোলায় ধান নাই, বাগানে ফল নাই, পুকুরে মাছ নাই, সুখ নাই, স্বাস্থ্য নাই, বাড়ীতে ছোটবৌ নাই, সকলের সঙ্গে আজ তাহার স্বামীও নাই।

নীলাম্বর গ্রামে আসিয়াছে শুনিয়া এই অবস্থাতেই বিরাজবৌ শয্যা-ত্যাগ ক[illegible] টলিতে টলিতে চাঁড়াল বাড়ী গেল চাল ধার করিতে—কারণ তাহার স্বামীর সারাদিন খাওয়া হয় নাই। ইতিমধ্যে নীলাম্বর গৃহে আসিয়া দেখিল, বিরাজ-বৌ গৃহে নাই। নীলাম্বরের মনে জাগিল সন্দেহ। বিরাজ-বৌ কোথায় গিয়াছিল কিছুতেই বলিল না—নীলাম্বরের প্রশ্নের মধ্যে সন্দেহ কি কি দিতেছিল বলিয়া। বিরাজ-বৌএর অভিমান ক্রমে জেদে পরিণত হইল। কেবল তাহাই নয় অপ্রকৃতিস্থা বিরাজ-বৌ বলিয়া বসিল—

"সাধুপুরুষ রোগা স্ত্রীকে ঘরে একা ফেলে রেখে কোন্ শিষ্যের বাড়ীতে তিন দিন ধরে গাঁজার উপর গাঁজা খাচ্ছিলে।" ইহাতেই নীলাম্বরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া সে পানের ডিবা ছুঁড়িয়া বিরাজকে মারিল। রক্তপাত দেখিয়াও নীলাম্বর বলিল—তুই দূর হ সুমুখ থেকে—ও মুখ আর দেখাস্ নে—অলক্ষ্মী দূর হয়ে যা।

বিরাজ-বৌএর মত সতীও এই নির্য্যাতন ও অপমান সহ্য করিতে পারিল না—আত্মহত্যার জন্যই বাহির হইয়া গেল। শরৎচন্দ্র নীলাম্বরকে একেবারে পাথরে পরিণত করিয়াছেন—সে ফিরাইতেও গেল না।

এই যে ব্যাপারটা হইয়া গেল তাহা দুইজনেরই দেহমনের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। বইএর গোড়ায় ভাবিয়াছিলাম—শরৎচন্দ্র নীলাম্বরকে গাঁজাখোর করিলেন কেন? তখন ভাবিয়াছিলাম, স্বামী গাঁজাখোর হইলেও বিরাজের পাতিব্রত্যে কোন বাধা হয় নাই—ইহাই বোধহয় শরৎচন্দ্রের উদ্দিষ্ট। এইখানে গাঁজা খুব কাজে লাগিয়াছে। নীলাম্বরকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়াছে ঐ গাঁজা। যে সন্দেহকে সে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় বুদ্ধি ও স্বাভাবিক উদারতা বলে দমন করিয়াছিল—অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাহা জাগিয়া উঠিল।

ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় বিরাজ যে প্রলোভন দমন করিয়াছিল—অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাহা দমন করিতে পারিল না। বিরাজ সরস্বতী-তীরে গিয়াছিল জলে ডুবিয়া মরিতে—কিন্তু সে মনে করিল কেবল আত্মহত্যা করিলে স্বামীকৃত অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিশোধ লওয়া হইবে না—সতীত্বের হত্যা করিলেই যথেষ্ট প্রতিশোধ দেওয়া হইবে। এই Tranceএর মুহূর্ত্তে সে গেল সুন্দরীর বাড়ীতে। তারপর গেল বজরায়। বজরায় গিয়া তাহার প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়া আসিল। যেমনই ফিরিয়া আসিল—অমনি বিরাজের অন্তর্নিহিত সতীধর্ম্ম গর্জ্জিয়া উঠিল—সে জলে ঝাঁপ দিল। এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থাকেই আমি বলিয়াছি Pathological Condition.

তারপর বিরাজ-বৌএর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। শরৎচন্দ্র তাহার পর যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন তাহা অসতীর প্রাপ্য নয়, সতীরই প্রাপ্য। অসতীর জন্য এত দণ্ড কোন শিল্পীর হাতে নাই। তবু বলিতে হয়—শরৎচন্দ্রের হাতে পাপের তুলনায় প্রায়শ্চিত্তের, দোষের তুলনায় দণ্ডের মাত্রাটা বড় বেশী হইয়া পড়ে। পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের ভার-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না—এখানেও হয় নাই। বিরাজ-বৌ দরদী শরৎচন্দ্রের গভীর সহানুভূতি হইতে কোথাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু তাহার দণ্ড অবলার দণ্ডকেও অতিক্রম করিয়াছে।

তারকেশ্বরের পথে নীলাম্বরের সঙ্গে তাহার যে মিলন ঘটাইয়াছেন—তাহা নাটকীয়, কথাসাহিত্য-সম্মত নয়। বিরাজবৌ মৃত্যুশয্যায় বলিয়াছে 'দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ।' একথাটা নীলাম্বর অন্য কোন সাক্ষীর মুখ হইতে শুনিতে পায় নাই—শুনিবার উপায়ও ছিল না। নীলাম্বরের গভীর বিশ্বাস ছিল বিরাজ তাহার সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবে না—সুন্দরীর মুখে বজরায় গমনের সংবাদ পাইয়াও। নীলাম্বর সেই অটল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বিরাজের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল এবং সাদরে মুমূর্ষু পত্নীকে গৃহে বরণ করিয়াছিল। অর্থ সংঘটনের খুব বড় একটা উপকরণ হইতে পারিত—পরস্পরের প্রতি সন্দেহ। নিতাই গাঙ্গুলী সুন্দরী সম্পর্কে নীলাম্বরের চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ রটাইয়াছিল। বিরাজবৌ তাহা বিশ্বাস করে নাই—তাহার মনে সন্দেহের রেখাপাতও করে নাই। তাহা করিলে বিরাজ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সে কথার উল্লেখ করিত। এদিকে বিরাজ সম্বন্ধে যে সন্দেহ পীতাম্বর জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহাতেও নীলাম্বরের মনে সন্দেহ জন্মে নাই—কারণ, এই দুই ক্ষেত্রেই শরৎচন্দ্র খোলাখুলি নিষ্পত্তি ঘটাইয়াছেন। আর যদি বিরাজ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে, তাহা হইলে একা বাড়ীতে বিরাজকে ফেলিয়া তিন দিন ধরিয়া উধাও হইবে কেন? পাশের বাড়ী ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ পর্য্যন্ত ছিল না। তারপর কয়েক মিনিট আগে বিরাজ শুক্‌না কাপড় নীলাম্বরের জন্য পাঠাইয়াছে। বিরাজ যখন ফিরিল—চাউল সে গোপন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু বিরাজের কেশেবেশে বাসে ও দেহের শক্তি-সামর্থ্যে যে অভিসার গমনের কোন চিহ্ন নাই—তাহা নীলাম্বরের উপলব্ধি করার কথা। তাহা সত্ত্বেও সে যে বিরাজকে অসতী বলিয়া গালি দিল—ইহা নিছক গাঁজা ও গোঁয়ারতুমি। শরৎচন্দ্র গোড়াতেই বলিয়াছেন নীলাম্বর গোঁয়ার ছিল। স্ত্রীর সঙ্গে আচরণে বা অন্য কাহারও সঙ্গে আচরণে শরৎচন্দ্র নীলাম্বরের গোঁয়ারতুমির চিহ্নমাত্র দেখান নাই। ভ্রাতার সঙ্গে যেটুকু আচরণের কথা দেখানো হইয়াছে—তাহা উদারপ্রকৃতি বড় ভাইএর ইতর ছোটভাইকে তিরস্কার মাত্র! অনাহার, অনিদ্রা, দারুণ পরিশ্রম, দারিদ্র্য, নৈরাশ্য তাহাদের সঙ্গে গাঁজার সংযোগ হইয়া নীলাম্বরের প্রচ্ছন্ন গোঁয়ারতুমিকে জাগাইয়া তুলিয়াছে! নীলাম্বরের কটুকথাগুলো কোন দৃঢ়নিবদ্ধ সংশয় প্রকাশের জন্য নয়—কেবল আত্ম-গ্লানি ও সহসা দীপ্ত কোপপ্রকাশের নিরর্থক বাগ্‌দণ্ড মাত্র।

এরূপ অস্বাভাবিক কটুবাক্য বিরাজ জীবনে কখনও শোনে নাই। মাঝে মাঝে শোনা অভ্যাস থাকিলে চরমপন্থা সে গ্রহণ করিত না। যে সতীত্বের গর্ব্বই তাহার একমাত্র সম্বল—সেইখানে সদাশয় স্বামীর এই আঘাতে বিরাজের সতীত্বের উপরই ক্রোধ জন্মিয়া গেল।

নীলাম্বরের অনর্থপাতের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী আচরণের সঙ্গে বিরাজ-বৌএর চরম নির্য্যাতনের সামঞ্জস্য হয় না। একমাত্র গাঁজাই এই অসামঞ্জস্যের দুর্ব্বলতা হইতে নীলাম্বরের চরিত্রকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে।

সুন্দরী নীলাম্বরের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাকে তাহার সম্বল অর্পণ করিল। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী আচরণে সামঞ্জস্য হয় না। অবশ্য চরিত্রের পরিবর্ত্তন হইতে পারে—চরিত্রের পরিবর্ত্তন ঘটিলে বিরাজ-বৌকে সে রাত্রে তাহার ফিরাইয়া আনা উচিত ছিল। নীলাম্বরকে আদর্শ ব্রাহ্মণ বলিয়া যে পূজা করিত—সেই নীলাম্বরের সর্ব্বনাশ কেন সে করিবে? নীলাম্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদন কোন অপ্রকৃতিস্থ মুহূর্ত্তেরই কাজ।

শরৎচন্দ্র আর একটি সতী ও মহতী নারীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—বিরাজবৌএর পাশেই; এ চরিত্র মোহিনীর। মোহিনী সতীত্বাভিমানিনী বিরাজ-বৌকেও স্তম্ভিত করিয়াছে। এই চরিত্রটিকে পূর্ণস্ফুট করিবার জন্য শরৎচন্দ্র স্বামীর শাসন হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়াছেন। এজন্য তিনি অন্যের সহায়তা লইয়াছেন। এই ভাবে অপ্রধান চরিত্রের অপসারণ দূষণীয় নয়।

বিরাজ-বৌ শরৎচন্দ্রের অল্পবয়সের রচনা। ইহাতে স্থলে স্থলে সংযমের অভাব আছে—অনেক স্থলে ভাবাকুলতার আতিশয্য দেখা যায়।

গান

শ্রীযূথিকা মুখোপাধ্যায়

সব হারানোর অতল দরিয়ায়
ভাসিয়ে দেরে তরী এবার
অসীম অজানায়।
মায়ার বাঁধন ফেল্‌রে খুলে
আর কতদিন রইবি ভুলে
মিথ্যা মোহের অলীক আলেয়ায়।
মিছে চোখের জলের ধারে
ঝাপসা আকাশ করিস নারে
মিছেই আশার জাল বুনে তুই
জড়ালি মায়ায়।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

২১

রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু অমল তবুও কেন যেন একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিল। বাহিরে একটু শীত পড়িয়াছে অমল তবুও উঠানে একটা ডেকচেয়ারে বসিয়াছিল—গৌরী ঘুমাইয়া আছে মনে করিয়া সে দেরী করিতেছিল। এতদিন লক্ষ্য করে নাই আজ উপরের ঝুলবারান্দাটা সে লক্ষ্য করিল—দুইটি লোক জ্যোৎস্নায় বসিয়া আছে। সম্ভবতঃ অজিত ও অপর্ণা।

অতীতের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি আজ অকস্মাৎ সুপ্তোত্থিত হইয়া প্রবল শক্তিতে অমলের মনটাকে আলোড়িত করিয়া দিয়াছে। বিদায় দিনের সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকারের বুকে ধীরে ধীরে অপর্ণার স্বল্প-উন্মুক্ত বাতায়ন চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে দ্বার আর উন্মুক্ত হইবে না—সে অমল আর আসিবে না।

বিগত দিনের সেই নিরুদ্ধ অভিমান আজ যেন শতগুণ বেগে অমলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। নিজের অক্ষমতার ও দৈন্যের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণার নিষ্ফল আক্রোশে সে আপনা-আপনি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ভাবিল—আজকার এ অপর্ণাকে সে ত চাহে নাই। আজকার এই পরিতাপ এই অনুশোচনা একেবারে মূল্যহীন। কলেজের সেই স্বচ্ছতোয়া পার্ব্বত্য ঝর্ণার মত কুমারী অপর্ণাকে সে চাহিয়াছিল আপনার করিয়া, এ তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র। সে অপর্ণা আজ তাহার কল্পনা বিলাসের সামগ্রী—সে অপর্ণা আজ মৃত।

একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া অমল উঠিয়া দাঁড়াইল। নিঃশব্দে ঘরে গিয়া শুইতে যাইতেছিল—গৌরী পুত্রকে কোলে করিয়া নিশ্চয়ই পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া আছে,কিন্তু গৌরী অকস্মাৎ আলো জ্বালাইয়া উঠিয়া বসিল।

কিছু বলিবার মত মানসিক অবস্থা অমলের ছিল না, সে শুইয়া পড়িল। গৌরী প্রশ্ন করিল—তোমার মন আজ খুব খারাপ না?

—না। তুমি ঘুমোও নি যে!

—ঘুম পায় নি। মিথ্যে কথা ব'লো না—সেই পুরোণো দিনের মাঝে অপর্ণার কথা ভাবছিলে না?

অমল একটু হাসিয়া কহিল—কেন হিংসে হ'ল। আমি কি ভাবি তাও তুমি বলে দিতে পারো?

—পারি। সত্যি করে বল না—

—যদি বলি ওর কথাই ভাবছিলাম, তবে তুমি ত দুঃখ পাবে নিশ্চয়ই, আর কাল এলে অভদ্রতা ক'রবে কেমন?

গৌরী পরিহাস করিল—তোমার অপর্ণা, তাকে অনাদর ক'রতে পারি?

—ছিঃ গৌরী, সে পরস্ত্রী, তার সম্বন্ধে এ কথা বল্‌লে পাপ হয়।

গৌরী কহিল—যাক্ পাপপুণ্য জ্ঞান যে তোমার খুব টনটনে তা বুঝেছি, তবে নিজের স্ত্রীর কাছে সব গোপন করাটাও পাপ ত? না সেটা যুধিষ্ঠিরের কাছে পাপ নয়?

অমল কোন কথা বলিল না, কিছুক্ষণ পরে শুধু কহিল—ও নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। রাত্তির হ'য়েছে, চল এখন ঘুমুই।

—গৌরী কথাটার গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল তাই কহিল—আচ্ছা ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুমি খুব খুসী হতে না?

—না। তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যতখানি সুখী হ'য়েছি ততখানিই হতুম।

—আমার জন্যে তুমি ত অসুখী—

অমল দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—তুমি হয়ত বুঝবে না গৌরী, মানুষের মনকে মানুষে তৃপ্তি দিতে পারে না, তোমাকে সুখী হ'তে হ'লে আমাকে অসুখী করতে হবে—তোমার চাওয়ার বস্তু, চাওয়ার প্রণালী সবই অন্য, সকলের থেকে বিভিন্ন, কাজেই আমরা চলি একসঙ্গে বটে কিন্তু মন আমাদের গগন সঞ্চারী ব্যভিচারী।

গৌরী বিশেষ কিছু বুঝিল না, কেবল প্রতিবাদ করিল—সকলের মনই ত আর তোমার মত নয়।

—তোমার মনে যদি এই ব্যভিচার বৃত্তি না থেকে থাকে তবে ব'লবো তুমি স্বাভাবিক নয়—তোমার মন মৃত—

গৌরী নারীসুলভ ভঙ্গিতে কহিল—মন মরেই যাক্, ওকে আর জ্যান্ত হয়ে কাজ নেই। গৌরী অমলের বুকের মাঝে মুখ লুকাইয়া শুইয়া রহিল—এই বক্ষের তপ্ততার মাঝে সে যেন সমস্ত দুঃখ সুখ ভাবনাকে নিবেদন করিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তে নির্ভর করিয়া আছে।

অমল অনুভব করিল, গৌরীর নিশ্বাস ধীরে ধীরে গাঢ়তর হইয়া আবার হাল্কা হইয়া আসিল। তাহার সুকোমল বাহুর স্পর্শ অমলের সর্ব্বাঙ্গে গৌরীর অস্তিত্বের বার্ত্তা ঘোষিত করিতেছে। সে ভাবে—অপর্ণার দেহ যদি এমনি কোমলতায় তাহার দেহকে আচ্ছন্ন করিত তবুও কি এই মন পরম নিশ্চিন্তে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইতে পারিত—তাহার গগনসঞ্চারী মন কি স্তব্ধ হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়া দাঁড়াইত—কিন্তু আজিকার এই অপর্ণা, ইহাকে সে ত চাহে নাই। তেমনি করিয়া সে যদি আবার কলেজে যাইতে পাইত—বিগত যৌবনকে ফিরাইতে পারিত তবেই হয়ত সম্ভব হইত।

হয়ত গৌরী জানে না—তাহার দেহের মাঝে অমল কাহাকে পাইতে চাহিতেছে।

সেদিন রাত্রে অপর্ণা একাকী ঝুলবারান্দায় বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে আবিষ্কার করিল—গৌরীর স্থানটি, তাহার ওই স্বামী ও পুত্র, অনাবিল আনন্দময় সংসারযাত্রা তাহার অজ্ঞাতে যে তাহাকে এমনি প্রলুব্ধ করিয়াছে, এমনি আকর্ষণ করিয়াছে তাহা একান্তই ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত। ওই স্বামীপুত্র ও গৃহ সে পাইতে পারিত, কিন্তু একটু সাহসের অভাবে তাহা হয় নাই। আজ অমল পুনরায় যেন তাহার কাছে বড় আপনার বলিয়া বোধ হইতেছে। অমলের বিদায় দিনের সেই নিরুদ্ধ অভিমান আজও তাহার অন্তরকে যেন বারম্বার কাঁটার ক্ষতে রক্তাক্ত করিয়া দেয়।

কিন্তু সে একবারও ভাবিয়া দেখিল না, তাহার অবস্থিতি অমলের গৃহকে এইরূপই করিয়া তুলিতে পারিত কিনা। গৌরীর মত একান্ত নির্ভাবনায় সে অমলের বুকে মুখ লুকাইতে পারিত কিনা!

অজিত আসিয়া প্রশ্ন করিল—অপর্ণা আজ তোমাকে এত বিমনা বোধ হ'চ্ছে কেন?

—বিমনা? না। এখন বিমনা ভাব দেখলে কোথায়?

—কি ভাবছিলে? ঘরে এসে দাঁড়িয়েছি তা জানতেই পারলে না।

—ও তাই!

—ও বাড়ীতে গেছিলে নাকি?

—হ্যাঁ। ওটা কার বাড়ী জানো?

—জানা সম্ভব নয়।

—ওটা হ'চ্ছে সাহিত্যিক—মানে গল্প লিখিয়ে অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। তার অনেক গল্পই ত তুমি পড়েছ?

—হ্যাঁ। জান্‌লে কি ক'রে?

—জানলুম কি ক'রে? ওর স্ত্রীর কাছেই, তার পরে তার সঙ্গেও আলাপ হ'ল।

—কি আলাপ?

—সাহিত্য সম্বন্ধে। তার পর ওর স্ত্রীর অভিযোগ যে তাকেই নাকি তিনি প্রতি গল্পে গালাগালি করেন। অপর্ণা সমস্ত ঘটনাই বর্ণনা করিল, কিন্তু একটি কথা সে গোপন করিয়া গেল—অমল যে তাহার সহপাঠী এবং পূর্ব্বপরিচিত সে কথাটা প্রকাশ করিতে পারিল না। মনের কোন অজ্ঞাত কোণে যে তাহার এই দুর্ব্বলতাটুকু এতদিন ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিল না।

অজিত কহিল—যা হোক, সাহিত্যিক সন্দর্শনে আজ বেশ ভাবাকুল হ'য়েছ, এটা ভাল কথা, কিন্তু কাল রবিবার—আমরা ত একটা অভিযানে যাচ্ছি কাল শিবপুর, তুমি যাবে ত?

শিবপুর? না ভালো লাগে না। তোমরাই যাও, আমি কাল একটু বালিগঞ্জে যাবো, মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছে না।

—কখন যাবে?

—যখন যেতে দেবে।

আমরা ত সকালেই যাচ্ছি, তুমিও তাই যেও—সন্ধ্যায় ফিরবে, কেমন?

অপর্ণা আঁখি-ভঙ্গি করিয়া কহিল—যেমন আদেশ!

অজিত অপর্ণাকে কি যেন বলিতে যাইয়া থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী সহধর্ম্মিণী!

সকালে অজিত বাহির হইয়া গেলে অপর্ণাও বালিগঞ্জ যাইবার জন্যে প্রস্তুত হইয়া গাড়ী বাহির করিতে বলিল। চাকর ও সোফারকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া সে ওই বাড়ীটার পানে চাহিয়া ভাবিল—অমলের কাছে কয়েকটি কথা বলিবার ইচ্ছা তাহার মাঝে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, কাল তাহা বলা সম্ভব হয় নাই। অপর্ণা ভাবিল, আজ বালিগঞ্জে নিমন্ত্রণ করিলে, সেখানে অমলকে হয়ত সে প্রশ্ন করা যাইবে। অপর্ণা ঝিকে ডাক দিয়া অমলের বাড়ীতে উপস্থিত হইল—

অমল বাজার করিয়া আসিয়াছে—উঠানে কয়েকটি জীবন্ত কই মৎস্য কানে হাটিয়া এদিক ওদিক ছিটকাইয়া গিয়াছে। অমল কি যেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে পত্নীকে বুঝাইয়া দিতেছে। পুত্র খোকা ধাবমান একটি কই মৎস্যের ল্যাজ ধরিয়া অত্যন্ত সাবধানে মাতার কোঁচড়ের মধ্যে রক্ষা করিল। বলাবাহুল্য পুত্রের এই সঞ্চয় প্রবৃত্তিতে মাতা বিশেষ আনন্দিত হইলেন না। খোকা একটি চড় খাইয়া এক পাশে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকটে মাতার এই অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ অভিযোগ করিল।

উঠানে কই মৎস্য সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছিল। অপর্ণা ডাক দিল—অমল। মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে বালিগঞ্জে যাচ্ছি। মা তোমার কথা অনেকদিন বলেছেন কিন্তু দেখা ত হয়নি। সম্ভবতঃ তিনি বেশীদিন আর বাঁচবেন না—তুমি যাবে দেখা করতে—

অমল কহিল—নিশ্চয়ই যাবো। কি হয়েছে?

অপর্ণা হঠাৎ কোন রোগের নাম খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল—ব্লাডপ্রেসার।

—ওঃ, তুমি এখনই যাচ্ছো?

—হ্যাঁ। ক'টায় যাবে? আমি না থাকলে তোমার হয়ত অসুবিধে হবে এতদিন পরে।

—পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা, কেমন?

—আচ্ছা, চললুম। তুমি যেও। গৌরীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে আমার মায়ের অসুখ তা ও যাবে কেন, তাই না?

গৌরী জবাব দিল না, কেবল সবিস্ময়ে এই শিক্ষিতা ধনীগৃহবধূর পানে চাহিয়া রহিল।

—আমরা যখন একসঙ্গে পড়তুম, তখন ও আমাদের ওখানে প্রায়ই যেতো, মাও ওকে খুব স্নেহ করতেন; মাঝে মাঝে অমলের কথা বলেন। কেমন আপনি ছুটি দেবেন ত?

গৌরী হাসিয়া ফেলিল। ছুটি দেওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই হাস্যকর, তাই বলিল,—আপনি বুঝি ছুটি দেওয়ার মালিক? আমার তেমন ভাগ্য হয় নি।

অমল পরিহাস করিল—এটা মিথ্যা কথা গৌরী। আমি তোমার ছুটি না নিয়ে কোথাও গেছি?

খোকা এতক্ষণ চোখ পাকাইয়া পাকাইয়া এ সমস্ত শুনিতেছিল—একটা কোথাও যাওয়া হইবে সেটা সে অনুধাবন করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে গাড়ী চড়াও অবশ্যই হইবে। তাই সে পিছন হইতে বলিয়া উঠিল—আমি যাবো বাবা!

অপর্ণা কহিল—এস খোকা এস, নিশ্চয়ই যাবে। ওকে নিয়ে যেও অমল।

অমল কহিল—ঐ গুরুতর দায়িত্ব আমি বহন ক'রতে নারাজ। শ্রীমান কখন কোন অনর্থ ক'রবেন তা জানা নেই। ও সামলাতে পারবো না।

—আমি সাম্‌লাবো। তুমি নিয়ে যেও। খোকা তুমি যেও তোমার বাবার সঙ্গে। চকোলেট দেব, আর এত বড় একটা ঘোড়া দেব। যাবে ত?

খোকা স্মিতহাস্যে কহিল—যাবো।

অপর্ণা অপেক্ষা করিল না। অত্যন্ত ব্যস্ততার অভিনয় করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল।

অমল একাকী সাড়ে পাঁচটায় উপস্থিত হইল।

অতি পরিচিত বাড়ী—ঠিক তেমনি রহিয়াছে, কোথাও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। অথচ অত্যন্ত সংক্ষেপে সাতটি সুদীর্ঘ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীটার রং বোধ হয় শীতাতপে বৃষ্টিতে একটু ফিকে হইয়াছে, কাঁকর দেওয়া রাস্তাটার পাশে চারাগাছগুলি একটু বড় হইয়াছে, ফটকের উপরের লতাটা বহু শাখা-প্রশাখা মেলিয়া আপনাকে বিস্তার করিয়াছে—রেলিং-এর রংটা একটু চটিয়া গিয়াছে।

দ্বিতলের সে জানালাগুলি বন্ধ। মনে হয় আজ দীর্ঘ সাত বৎসর তাহারা রুদ্ধ হইয়াই আছে। অমল অত্যন্ত ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, কেহ

কোথাও নাই। সামনের ওই অলিন্দে অপর্ণা একদিন তাহার হাতখানা ধরিয়া কি বলিয়াছিল, ওই গৃহে বসিয়াই অপর্ণা সাশ্রুনেত্রে তাহাকে বিদায় দিয়াছে।

অপর্ণা ডাকিল—এস অমল।

সামনের কক্ষে অপর্ণা, তাহার মাতা ও করুণা বসিয়া আছে। বালিকা করুণা আজ শতদলের মত পাপড়ী মেলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অমল তাহার মাতাকে নমস্কার করিয়া কহিল—করুণা যে এত বড়টি হ'য়েছে এ যেন ভাবা চলে না।

মাতা কহিলেন—এস বাবা অমল, ক'লকাতায়ই আছ, অথচ দেখা নেই কত কাল। একেবারেই ভুলে গেছ—

অমল একটু হাসিয়া কহিল—আসা হয়নি—ছাত্র জীবনে অবসর ছিল, বন্ধু ছিল, আত্মীয় ছিল, কিন্তু আজ আফিস আর সংসার ছাড়া কিছুই নেই জগতে—

—তোমার ছেলে-পুলে ?

—একটি ছেলে।

—তাকে নিয়ে এলে না কেন ? কত বড়—

অপর্ণা কহিল—সুন্দর ছেলেটি মা, বারবার আন্‌তে বললুম তা আনলে না। কি মিষ্টি তার কথা—বছর পাঁচেক বয়েস।

মাতা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—অপর্ণার ছেলেটিও ত বেঁচে থাকলে অত বড়টি হ'ত।

অমল কহিল—করুণা কি পড়ছে আজকাল ?

—ওর ত এবার থার্ড-ইয়ার।

অমল করুণার দিকে চাহিয়া কহিল—তুমি বলায় অসম্মান বোধ ক'রলে কিনা জানি না, তবে তোমায় খুব ছোটকালে তুমি ব'লতাম।

করুণা লজ্জিত অবনত চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—না, অসম্মান বোধ ক'রবো কেন ?

অপর্ণা পরিচয় করাইয়া দিল—তোর হয়ত মনে আছে, আমার এম-এর সহপাঠী উনি, বহুদিন তুই ওঁকে চা দিয়েছিস্—বর্ত্তমানে উনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়—

করুণা স্মিতহাস্যে কহিল—ও আপনি লেখক অমলবাবু! আপনার 'একা' গল্প নিয়ে যে সেদিন কলেজে খুব তর্ক আমাদের মধ্যে—

অমল গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিল—তর্কের ফলাফল ?

—আপনার পক্ষে খুব প্রশংসা নয়—সকলেই আমরা একমত যে আপনি দাম্পত্য জীবনে সুখী নন।

অমল প্রশ্ন করিল—ও, তা হ'লে তর্কটা গল্প নিয়ে নয়, তর্কটা হ'য়েছে জীবনী নিয়ে ?

—প্রায়, তবে আমাদের অভিমত—

—সত্য কিনা ? তার উত্তরে ব'লতে পারি, যাঁরা আপনার অন্তরকে চেনে এবং সত্যিই ভালবাসে, তারা কখনও দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়। মানুষের মন বাস্তব নিয়ে কখনই সুখী হ'তে পারে না।

অমল লক্ষ্য করিল, করুণার বলার ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি অপর্ণার বিগত দিনেরই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অপর্ণা যেন সহসা নবজীবন লাভ করিয়া করুণার মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দেখিতেছিল—করুণা তাই নতদৃষ্টিতে কহিল—কথাটা সর্ব্বক্ষেত্রেই সত্য!

—না, যাদের মন সূক্ষ্ম অনুভূতিহীন, তারা সত্যিই খুসী।

আলোচনা চলিতেছিল, মাতা হঠাৎ উঠিয়া কহিলেন—করুণা তোমরা ত খুব তর্ক আরম্ভ ক'রলে, একটু চা'র বন্দোবস্ত করবে না ?

করুণা বলিল—হ্যাঁ, এক্ষুণি নিয়ে আস্‌ছি—

উভয়ের প্রস্থানে ঘরে অকস্মাৎ একটা নির্জ্জনতা যেন মৃত্যু-শোকাকুল গৃহের মত অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল। পুঞ্জীভূত কথার আবেগে উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অপর্ণা কহিল—তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি কেন, তা বোধ হয় জানো না। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। বহুদিন ভেবেছি তোমার সঙ্গে যদি কখনও দেখা হয় তবে সে প্রশ্নের সমাধান ক'রবো।

অমল অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে কহিল—সে সমস্যা সমাধান হয় না অপর্ণা। আমিও ভেবেছি তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবো—কত কি; কিন্তু জানি সমস্যা বেড়ে যাবে, কিন্তু সমাধান হবে না।

অপর্ণা চিন্তা করিয়া জবাব দিল—না হোক, কথা কয়টা যদি বলা হয়, তবে সেই পরম লাভ। না-বলার দুঃসহ ব্যথা আজ সবচেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে।

অমল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অপর্ণা কহিল—যেদিন এই বাড়ী থেকে, অত্যন্ত আহত অবস্থায় তুমি চলে গিয়েছিলে সে দিন কিছুই তোমাকে ব'লতে পারিনি। যে দু'ফোঁটা চোখের জল তোমার জন্যে পড়েছিল তার কি অর্থ তুমি করেছ জানি না, কিন্তু সে-দিন যা বলবার ছিল তার কিছুই বলা হয় নি।

অমল রুদ্ধ অভিমানে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে কহিল—আজ বলে লাভ?

—লাভ লোকসান বিচার ক'রতে চাই না, তবে যা বলবার তা ব'লতে চাই। তবে উত্তর অপ্রয়োজনীয় মনে ক'রলে দিও না।

অমল একটু হাসিয়া কহিল—বল।

—তুমি মনে মনে আমাকে ক্ষমা ক'রেছ কিনা জানাবে?

অমল আবার হাসিয়া কহিল—আজ সে কথা অবান্তর। আজ তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ কি তা বুঝিয়ে না ব'ললেও তুমি জানো। আজ আমার ক্ষমা করা না করায় তোমার জীবনের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই—সে কথা শুনেও লাভ নেই—তা ছাড়া আজ তোমার পক্ষে তার প্রতিবিধান করাও সম্ভব নয়, সেকথা ভেবে দেখেছো?

অপর্ণা করুণকণ্ঠে কহিল—আমাকে আঘাত করার প্রলোভন আজও তোমার আছে; কিন্তু যে আত্মসমর্পণ করেছে তা'কে আঘাত ক'রে তোমার লাভ? আমাদের যে তফাৎ সেটা যদি আজ মনে ক'রতুম, তবে সমস্ত উপেক্ষা ক'রে তোমাকে এমনি ভাবে ডাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কথাই বেড়ে যাচ্ছে—আমার কথার উত্তর দাও নি—

অমল কহিল—তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রেছি ব'ললে মিথ্যা কথা বলা হবে, তবে আজ এটুকু বুঝেছি যে আজকার একাকীত্ব তোমাকে পেলেও এতটুকু ক'মতো না, কাজেই অভিযোগ ক'রে লাভ নেই—দুঃখটা ঠিক সেজন্যে নয়। আমার আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা সম্ভবের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেকথা মনে ক'রে আজ অনুশোচনা ক'রেও লাভ নেই। তবে আমার মনে এই প্রশ্ন এখনও রয়ে গেছে—তুমি নিজে আমাকে বিদায় না দিয়ে অন্যের মারফৎ আমাকে বিদায় দিলে কেন? তুমি যদি ব'লতে যে অসম্ভব—তবেই আমি বোধ হয় হাসিমুখে বিদায় দিতে পারতুম।

অপর্ণা কহিল—তুমি ত জানো না, তখন চারিপাশের অবস্থা কেমন করে আমার কণ্ঠরোধ ক'রেছিল। সংসারের বাধা-নিষেধের প্রাচীর ভেঙ্গে আসবার সাহস ছিল না, আপনার অন্তরকে চিনতাম না, ভাসমান তৃণের মত দশজনে আমাকে নিয়ে চললো স্রোতের সঙ্গে। কিন্তু মানুষকে ত্যাগ করে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স গ্রহণ ক'রে ত সুখী হইনি—এ পরিতাপ জীবনে অক্ষয় হ'য়ে আছে। আজ ফিরবার পথ নেই, অথচ গৃহকে সুন্দর ক'রে তুলবারও শক্তি নেই—

—ফিরে এসে যা চেয়েছ তা পাবে না, সমস্ত শক্তি দিয়ে গৃহকে সুন্দর ক'রে তোলো।

—তুমি যেমন ক'রে তুলেছ? কিন্তু তা কি সম্ভব? তুমি অভিনয় করনি, আমাকে ক'রতে হবে। যাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনি—

—পারো নি—

অপর্ণার নিরুদ্ধ অশ্রু অকস্মাৎ উৎসারিত হইয়া চোখ দুইটি ভরিয়া দিল। কম্পিত সিক্তকণ্ঠে বলিল—না। সেই হ'য়েছে আমার জীবনের চরম অভিশাপ। আমাকে ক্ষমা ক'রো, এ ভুল—

অপর্ণা আর বলিতে পারিল না, থামিয়া গেল। অমল মাথা নত করিয়া কেবল ভাবিল আপনার কথা—এত অর্থ-বিত্ত আড়ম্বরের মাঝেও সে কি কেবল তাহারই জন্যে একাকী? অমল কি যেন একটি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, করুণা চা লইয়া ফিরিল এবং উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া যেন বিস্মিত হইয়া গেল।

অমল অভিনয় করিল—যা হোক্‌, চা তোমার হাতে আর একবারও খেতে হ'ল? সৌভাগ্য ব'লতে হবে—

করুণা ব্যঙ্গ করিল—আপনার বিনয় প্রশংসাযোগ্য।

—সেই বোধ হয়, সাত বৎসর আগে চা খেয়ে গেছি, পুনরায় ফিরে আস্‌বো এ ভাবতে পারিনি তাই—

করুণাও বিনয় প্রকাশ করিল—আপনার মত খ্যাতনামা লোকের পরিচয় গৌরবের বিষয়।

—অবশ্যই, তবে খ্যাতনামা কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়।

করুণা তাহার দিদির দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইল—এমন

বিমর্ষ মলিনমুখে বসিয়া থাকিতে সে কথনও তাকে দেখে নাই, তাই কহিল—তোমার কি হ'য়েছে দিদি, তোমার বন্ধু এলেন আর তুমিই কথা ব'লছো না—

অপর্ণা হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—ও কর্ত্তব্যটা তোমারই।

অবান্তর আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চা পান শেষ হইল। করুণা কহিল—এখনই যাবে দিদি ?

—হ্যাঁ, গাড়ী এসেছে ?

—অনেকক্ষণ।

—ও তবে—তুমিও যাবে ত অমল ? চল ঐ মোটরেই যাই।

—ক্ষতি নেই, যেতে পারি। তবে গেলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

—অনেকক্ষণ এসেছ না ?

অমল বিস্মিত হইল, অপর্ণার মুখে এই নারীসুলভ ঈর্ষার কথাটি যেন একেবারেই বেমানান। সে কহিল—না, বাজার ক'রে ফিরতে হবে, তাই।

মোটর চলিয়াছিল সোজা শ্যামবাজারের দিকে—

অপর্ণা সোফারকে কহিল—মাঠ দিয়ে ঘুরে যাও।

অমল বারণ করিল না। অপর্ণার দেহের একটি অংশ তাহার দেহ ছুঁইয়া আছে—এই স্পর্শ আজও যেন মোহময়। অপর্ণা অমলের হাতখানি অত্যন্ত সন্তর্পণে উঠাইয়া লইয়া কহিল—আমার কথার জবাব দিলে না ?

অমল কহিল—সেই ক্ষমার কথা ত ?

—হ্যাঁ।

—আমি ক্ষমা ক'রেছি ব'ললেও তুমি কিছুমাত্র নিশ্চিন্ত হবে না। কল্পনা-বিলাসী মানব মনের এই ব্যভিচারের শেষ নেই—কিন্তু আমাদের মাঝে ব্যবধানের যে প্রাচীর রয়েছে তা কোনদিন যাবে না। গৌরীর স্থানে আজ তুমি যদি অধিষ্ঠিতা থাকতে, তা হ'লেও না।

—হয়ত তাই, কিন্তু তোমাকে বিমুখ ক'রার অনুশোচনা তার মাঝে থাকতো না। আজ সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে হয়ত তুমি ভেবেছ কেবলমাত্র অর্থের মোহে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি—

—না, অপর্ণা। আমি তোমাকে ফেলে রেখে গিয়েছিলাম তোমারই জন্যে। আমি জানতুম আমি আকর্ষণ ক'রলে তুমি আমার হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারতে না, কিন্তু আমার ওই অস্বচ্ছল গৃহে তোমার স্থান সত্যিই নেই। সেখানে তোমাকে পেয়ে আমি সুখী হ'তে পারতুম না।

অপর্ণার রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া কপালের উপর পড়িতেছিল, সে আনমনা হইয়া কি যেন ভাবিয়া যাইতেছিল। মৃদুকণ্ঠে কহিল—নইলে তোমার খোকা আমাকে এমনিভাবে আকর্ষণ ক'রতে পারতো না। আমার অজ্ঞাতে ভাগ্য আমাকে আবার তোমারই কাছে টেনে এনেছে, তাই তোমার কাছে আজ মিনতি ক'রে আমি সন্তাপ-অনুশোচনা মুক্ত হতে চাই।

অমল অপর্ণার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—মুক্তি নেই অপর্ণা, মুক্তি নেই। সে দেহাতীত রাজ্যে আজ তুমি একাকী, সেখানে আমিও একাকী। সেখানে আমরা ব্যভিচারী, সে ব্যভিচারই আমাদের পরিতৃপ্তি, তাই গৌরীকে বুকের মাঝে নিয়ে ভাবি সে হয়ত তুমি। তোমাকে সমগ্র বিশ্বে খুঁজি, কাব্যে, সাহিত্যে খুঁজি, কিন্তু তুমি নেই কোথায়ও, দিলে না কোনদিনও—

অপর্ণা কহিল—হ্যাঁ, তাই এই ব্যভিচার জীবনের সঙ্গী, কিন্তু আমার ত কাব্য সাহিত্য নেই আমি কেবল অতীতের দীর্ঘশ্বাস-বেদনাতুর শূন্য গৃহে নিজেকে নিজে অপরাধী ক'রে বারবার অনুশোচনা করি। কোথা এর শেষ ?

—এর শেষ নেই অপর্ণা। বৃথা চেষ্টা—আপনার গৃহকে আপনার ক'রে নিও—সেখানে পরিপূর্ণ গৃহে একাকী জীবন কাটাতে হবে—এই বিচিত্রমানব মনের প্রাপ্য।

বৈকালে কি যেন একটা ভীষণ কার্য্যে খোকা ব্যস্ত ছিল এবং সে অমূল্য কাজের সমাধানকল্পে টবের উপরে উঠিয়া দাঁড়ান অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কিছুক্ষণ কার্য্য চলিবার পরে খোকা অকস্মাৎ পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে হাতের কব্জি ফুলিয়া উঠে এবং খোকা সেই যে কান্না আরম্ভ করিয়াছে তাহা আর থামে নাই। গৌরী অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে মাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছে—খোকা ত এমনি কাঁদে না কখনও, ভিতরে কি হাড় ভেঙ্গে গেল ? বাড়ীতে ত কেউ নেই কি ক'রবো—

মা ব্যস্ত হইয়া শুধু বলিলেন—কেমন ক'রে ব'লবো? অমল এতক্ষণ আসে না কেন?

গৌরী শুধু জানিত যে জলপটি দিতে হয়, সে তাহাই দিয়া একান্ত অসহায়ের মত বার বার জানালা দিয়া দেখিতেছিল—অমল আসে কিনা? এমনি দুঃসময়ে কি করিতে হয়—সে তাহা জানে না, কেবল উৎকণ্ঠায়, নিজের অসহায় অবস্থায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারে—

সন্ধ্যা হইয়া গেল, অমল তবুও আসে না। অমলের অবিবেচনায়, উৎকণ্ঠায়, ক্রোধে, অভিমানে গৌরী কাঁদিয়া ফেলিল—বিছানায় শুইয়া খোকা যাতনায় কাঁদিতেছে, সে দৃশ্য এবং সদাপ্রফুল্ল খোকার এই বেদনাতুর মুখখানি একেবারে অসহনীয়। গৌরী বার বার রাস্তার পানে চাহিতেছিল—

একখানা মোটর আসিয়া থামিল। গৌরী স্পষ্ট চিনিল, —অপর্ণা অমলকে নামাইয়া দিয়া আবার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যাইবার সময় সিডানবডি কারের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কি যেন বলিয়া গেল।

একটা দুর্জ্জয় অভিমানে গৌরীর অন্তর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল—এমনি বিপন্ন, এমনি উদ্বিগ্ন সময়ে অমল নির্ভাবনায় অপর্ণার মোটরে চড়িয়া হাওয়া খাইতে গিয়াছে।

অমল আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—খোকা কাঁদছে কেন?

গৌরী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল—তা দিয়ে তোমার দরকার? যেখানে গিয়েছিলে সেখানেই থাক্‌লে হ'ত। আমি আর খোকা দুজনে যে অসহ্য হ'য়ে উঠেছি তা জানি, দয়া করে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও—

অমল কোন কথা বলিল না, কেবলমাত্র গৌরীর মুখের পানে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মাতা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিলেন—আমাদের সুকুমারকে একটু ডেকে আন, যদি হাড়ের কোন কিছু হ'য়ে থাকে!

অমল নিজে একটু পরীক্ষা করিয়া, কিছু বরফ আনিয়া মা'কে সেটা লাগাইতে বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুকুমার ডাক্তার যথাসময়ে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া অভয় দিয়া গেলেন—কোন ভয় নাই। খোকাও ঘুমাইয়া পড়িল।

গৌরী কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে ভাত দিয়া রান্নাঘরে অপেক্ষা করিতেছিল। অমল মায়ের মারফতে কিছু খাইবে না জানাইয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু ঘুমাইল না।

অমল যে অপর্ণার মোটর হইতে নামিয়াছে তাহা সে গোপন করিতে চাহে নাই, গৌরী সমস্তই জানে এবং সাত বৎসর সে তাহার সহিত ঘরকন্না করিয়াছে তবুও সে আজ অকস্মাৎ এমনি ভুল বুঝিল কেমন করিয়া! গৌরী রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিল নিশীথরাত্রে এবং নিঃশব্দেই শুইয়া পড়িল। অমল বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করিল—তোমরা আজ অকস্মাৎ অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?

—খোকার এমনি হ'ল, অথচ তুমি ত তোমার অপর্ণাকে নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ!

—তোমার কাছে ত কিছুই গোপন নেই, তবুও এ বাক্যবাণটা ছাড়লে কেন?

গৌরী জবাব দিল না, অপর্ণার প্রতি সঙ্গে সঙ্গে অমলের প্রতিও একটা বিজাতীয় অভিমানে চুপ করিয়া রহিল। অমলও আর কিছু বলিল না। ক্ষণিক অপেক্ষা করিয়া গৌরী কহিল—যদি দু'জনে এত ভালবাসা তবে কেন বিয়ে ক'রলে না ওকে? আমাকে দয়া ক'রে বিয়ে ক'রে এ প্রবঞ্চনা কেন করেছ?

—প্রবঞ্চনা?

—হাঁ।

—আজ এতদিন পরে একথা মুখে আন্‌তে তোমার বাধ্‌লো না? বিয়ের পরে এই সাত বৎসরের মাঝে তুমি কোনদিন এমনি ক'রে ভাবনি। আজ অপর্ণা এসেছে কেবল তাই, না? তোমার মনের এ ক্ষুদ্রত্ব কেমন ক'রে আত্মগোপন ক'রেছিল জানি না, তবে আজ তার প্রকাশে আনন্দিত হ'লাম।

—আনন্দিত ত হবেই, আমি ত তোমায় বাধা দেই নি।

অমল আবার চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আফিস থেকে আমাকে চিটাগং আফিসে পাঠাতে চেয়েছে। যাবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু যেতে হবে তোমার জন্যে।

—কেন? অপর্ণা সেখানে যাবে বুঝি?

অমল অত্যন্ত ক্লান্তভাবে ফিরিয়া শুইল। ক্ষণিক বাদে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গায়ের চাদরটা টানিয়া দিল। মনে মনে সে কেবল ভাবিল—এই ভালবাসা! যা একটিমাত্র দুর্ঘটনায় ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়! এই গৌরী একদা বৎসরাধিক কেবল তাহারই জন্য দিন গণিয়া কাটাইয়াছে। কুমারী জীবনের সে বিশ্বাস সে প্রণয় আজ অন্তর্হিত।

ক্রমশঃ

রাসায়নিক দেহ

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

মনুষ্য শরীর একটা প্রকাণ্ড রাসায়নিক কারখানা। প্রায় ২১টী মৌলিক এ কারখানায় ক্রিয়া ক্ষেত্র রচনা করিয়াছে। উহাদের অবস্থান ও প্রক্রিয়া অনুধাবন করিতে পারিলে দুনিয়ার প্রধানতম রহস্যময় পরদার উন্মোচন হয়। জীবদেহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাসায়নিক গবেষণার ক্ষেত্র। আমাদের মুণিঋষিগণ দর্শন ভিত্তিতে গবেষণা করিয়া চমৎকার ফল পাইয়াছেন। এখন রাসায়নিক ভিত্তিতে দেহের চুলচেরা গবেষণা হইলে দর্শনের সঙ্গে রসায়নের একটা অপরূপ যোগাযোগ মিলিতে পারে।

বর্ত্তমান রসায়নীগণ দেহের সর্ব্ববিধ গঠন সমস্যার পর্য্যালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তাহারা দেখিয়াছেন, দেহেতে শতকরা ৬৫ ভাগ অক্সিজেন (Oxygen)। ইহা একটি বায়বীয় উপধাতু। বায়ুর ½ অংশ অক্সিজেন। দেহেতে ইহা মুক্তাবস্থায় নাই। অন্যান্য মৌলিকদের সঙ্গে রাসায়নিক ভাবধারা রক্ষা করিয়া ইহা দেহেতে অবস্থান করে। দেহের যুক্তপদার্থদের মধ্যে জল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই, অক্সিজেন যখন জলের শতকরা ৮৮ ভাগ তখন ইহার পরিমাণ যে দেহতেও খুব বেশী হইবে ইহাতে আর সন্দেহ কি? অক্সিজেনের পরে অঙ্গার (Carbon) পরিমাণের মাত্রায় দেহেতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে (শতকরা ১৮ ভাগ)। দেহে যে অঙ্গার আছে তাহার প্রমাণ সম্ভবতঃ আমরা অনেকেই পাইয়া থাকি। হাড়, রক্ত পোড়াইয়া অঙ্গার প্রস্তুতির ব্যবস্থা আছে। আবার দেহ দগ্ধ হইলে যে অঙ্গার অবশিষ্ট থাকে তাহার প্রমাণ সম্ভবতঃ কাহাকেও দিতে হইবে না। অঙ্গারের পরে হাইড্রোজেনের (Hydrogen) স্থান (শতকরা ১০ ভাগ)। ইহা একটি মৌলিক উপধাতু। গ্যাস দেহ মধ্যে যুক্তাবস্থায় থাকিয়া জল ও অন্যান্য জটিল পদার্থের রূপ দিয়া থাকে। দেহতে জল আছে কাজেই হাইড্রোজেনের অবস্থান ইহাতে প্রমাণিত হয়। হাইড্রোজেনের পরবর্ত্তী মৌলিকটীর নাম নাইট্রোজেন (Nitrogen) (শতকরা ৩ ভাগ)। ইহাও একটি মৌলিক উপধাতু গ্যাস। বায়ুতে ⅘ ভাগ বর্ত্তমান। দেখা যায় বায়ুর দুইটী প্রধানতম গ্যাসই আমাদের দেহপুষ্টির শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। প্রকৃতপক্ষে, এই অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অভাবে শরীর ধারণ অসম্ভব। নাইট্রোজেন দেহেতে নানাংশে বর্ত্তমান। প্রোটীন জাতীয় পদার্থের নাইট্রোজেনই প্রাণ। ইহা যে দেহতে বর্ত্তমান তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রস্রাবের ইউরিয়া (Urea) হইতে। ইউরিয়া একটা নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব পদার্থ। প্রস্রাবের স্থানে প্রায়শঃ যে এমোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায় তাহাও নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন ঘটিত পদার্থ। নেত্রজানের পর আমরা ক্যালসিয়ামের (Calcium) স্থান দেখিতে পাই (শতকরা ২'২ ভাগ)। ইহা একটি ধাতু পদার্থ। মনুষ্য শরীরের পুষ্টির ব্যাপারে ইহার স্থান অতি উচ্চে। শরীর সামান্য দুর্ব্বল হইলেই এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ ক্যালসিয়াম ইনজেক্‌সনের (Injection) ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ক্যালসিয়াম হাড়ের একটি প্রধান উপাদান। শরীরস্থ শতকরা ৯৯ ভাগ ক্যালসিয়াম হাড়ের মধ্যে বর্ত্তমান। ইহার দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়। রক্তের মধ্যেও ক্যালসিয়াম আছে। পরিমাণের দিক দিয়া ক্যালসিয়ামের পরে ফস্‌ফরাসের (Phosphorus) স্থান (শতকরা ১'২ ভাগ)। দেহ পুষ্টি ব্যাপারে সম্ভবতঃ ইহার স্থান সর্ব্বোচ্চ। ইহার কর্ম্মক্ষেত্রও অনেক। হাড় ও দাঁতের প্রায় ৯৯ ভাগই ফস্‌ফরাস্। ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস্ যে দেহতে বর্ত্তমান তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় হাড় কাটিয়া। হাড় পুড়িলে ক্যালসিয়াম ফসফেট হয়—একটি ক্যালসিয়াম ফস্‌ফরাস ও অক্সিজেন ঘটিত লবণ। উক্ত ক্যালসিয়াম ফসফেট্ সার হিসাবে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ফসফেট আবার প্রায়শঃ আমাদের প্রস্রাবের সঙ্গে বাহিরে আসে। মস্তিষ্কের প্রধান রাসায়নিক উপাদান ঐ ফসফরাস।

মৌলিকদের মধ্যে অক্সিজেন, অঙ্গার, হাইড্রোজেন, নেত্রজান, ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের মনুষ্য-শরীরে প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু সেজন্য অপরগুলিও অবহেলার নয়। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের যেমন প্রয়োজন ও মূল্য আছে, তদ্রূপ শরীরস্থ প্রত্যেকটী মৌলিকের যথাস্থানে অবস্থানেরও একটা তাৎপর্য্য আছে। কাহাকেও যদি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে চ্যুত করা হয়, তৎক্ষণাৎ দেহযন্ত্র পরিচালনায় বাধা উপস্থিত হয়। পটাসিয়াম (Potassium) ও সডিয়াম (Sodium) নামক দুইটী উগ্রধাতু মনুষ্য শরীরে বর্ত্তমান আছে। পরিমাণে কম হইলেও উহাদের দেহগঠনে ও উহার পুষ্টিতে যথেষ্ট দান আছে। দুইটাই সাধারণতঃ ক্লোরাইড (Chloride) লবণ ভাবে দেহেতে অবস্থান করে। মাংস পেশী, রক্ত, কোষ ইত্যাদি প্রত্যেক জটীলাংশে ইহারা বর্ত্তমান। বিশেষজ্ঞের মতে উহারা সর্ব্বত্র অস্‌মটিক প্রেসার (Osmotic pressure) রক্ষা করে। পটাসিয়াম ও সডিয়াম হৃৎপিণ্ডে বর্ত্তমান। অনেকে বলেন উহার স্পন্দনের শৃঙ্খলারক্ষা হয় ঐ সমস্ত ধাতুদের দ্বারা। শরীরে উহাদের উপস্থিতির প্রমাণ রাসায়নিক পদ্ধতিতে দেওয়া যায়। ঘর্ম্মের সঙ্গে লবণ প্রায়শঃ বহির্ভাগে আসে।

পটাসিয়াম ও সডিয়ামের প্রায় সম পরিমাণ—গন্ধক ('২৫ ভাগ) এ দেহতে বর্ত্তমান আছে। ইহাকে পুষ্টিকারক উপধাতুদের মধ্যে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইন্‌সুলিন (Insulin) থাইওনিন্ (Thionine) প্রভৃতি কতকগুলি সারাংশে গন্ধক পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ গাছ গাছড়ার মধ্য দিয়া ইহা দেশে প্রবিষ্ট হয়। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে নেত্রজান ও গন্ধক উভয়ে উহাদের পরিমাণানুযায়ী হজম ক্রিয়াক্ষেত্রে সমান অংশ গ্রহণ করে।

দেহতে ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium) ধাতুর অবস্থান শতকরা '০৫ ভাগ। দেখা গিয়াছে সমস্ত শরীরে যতটুকু ম্যাগনেসিয়াম আছে তাহার শতকরা ৭১ ভাগ হাড়েতেই বর্ত্তমান। পেশীতে ক্যালসিয়ামের চেয়ে ম্যাগনেসিয়াম বেশী আছে।

লৌহের পরিমাণ যদিও দেহতে পূর্ব্বোক্ত ধাতুদের চেয়ে অনেক কম—তথাপি কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রাধান্য উপলব্ধি করা যায়। লৌহ রক্তের একটি প্রধান রাসায়নিক মৌলিক, এবং অক্সিজেনকে বহন করিবার জন্যই সেখানে ইহার অবস্থান। রক্ত আমাদের শরীরের শতকরা ৭ ভাগ মাত্র, কিন্তু এই ৭ ভাগের মধ্যে ৭০ ভাগ লৌহ। রক্ত বিশ্লেষণ করিলে লৌহের পরিচয় পাওয়া যায়।

ম্যান্‌গানিজ (Manganese) নামক অপর একটি ধাতু পদার্থ দেহতে পরিমাণে শতকরা মাত্র '০০০৩ ভাগ পাওয়া যায়। ম্যান্‌গানিজ কোন কোন উদ্ভিদ খাদ্যে বর্ত্তমান। সেখান হইতে ইহা আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হয়। যে সমস্ত উদ্ভিদ খাদ্যে লৌহ বেশী, তাহারাই আবার ম্যান্‌গানিজ পছন্দ করে। যকৃৎ (Liver), অগ্ন্যাশয় (Pancuas) ও বৃক্ক (Kedney) প্রভৃতি যন্ত্রগুলিতে ম্যান্‌গানিজ পাওয়া যায়। নগণ্য পরিমাণ ম্যান্‌গানিজ পেশী ও বস্তিতে বর্ত্তমান। পুষ্টিসাধক মৌলিকদের মধ্যে ইহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তাম্র ('০০০১৫ ভাগ) রক্ত প্রস্তুতির ব্যাপারে সংযুক্ত আছে। সম্ভবতঃ ইহার কাজ অনুঘটকের মত (Catalytic), অনুঘটন বিষয়টী পুষ্টি ব্যাপারে বিরাট সহায়ক। সুতরাং তাম্রকেও পুষ্টিবর্দ্ধক ধাতুদের মধ্যে স্থান দিলে ভুল হয় না।

আইডিন (Iodine) উপধাতুটী গলদেশে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড (Thyroid gland) অতি সূক্ষ্মাকারে বর্ত্তমান। ইহা সাধারণতঃ প্রাকৃতিক জলীয় পদার্থ হইতে দেহে প্রবিষ্ট হয়। শুনা যায়, ইহার অভাবে গলায় গণ্ডগোল হয়।

কোবল্ট (Cobalt) ও দস্তা (Zino) অতি সূক্ষ্মাংশে দেহে অবস্থান করে। আজ পর্য্যন্ত উহাদের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং উহাদের ক্রিয়াক্ষেত্র কোন দিকে প্রসারিত বলাও কঠিন। পুষ্টির ব্যাপারে উহাদের প্রয়োজন আছে—এ ধারণা কোন কোন বৈজ্ঞানিক পোষণ করেন।

দেহতে যে ফ্লোরিণ (Fluorine) ও সিলিকণ (Silicon) নামে দুইটী উপধাতু আছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শরীরের কঙ্কাল ভাগের কাঠিন্য রক্ষা করিতে ইহাদের প্রয়োজন আছে। কেহ কেহ বলেন ফ্লোরিণ দাঁতের একটি উপাদান। কিন্তু উহারা উভয়েই সর্ব্বত্র অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে বর্ত্তমান।

মনুষ্য শরীরের রাসায়নিক মৌলিকদের কথা বিবেচনা করিলে একটি কথা স্বতঃই মনে হয়। মৌলিকদের বরাবরে জীব দেহ ও পৃথিবীর মধ্যে কি একটি যোগাযোগ সম্ভবতঃ বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়—মাটি, জল ও বায়ুর সঙ্গে মনুষ্য দেহের একান্ত ভাবে একটা রাসায়নিক সঙ্গিত আছে। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নেত্রজান, অঙ্গার, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি দেহের সবগুলি মৌলিকই পৃথিবীর আওতায় পাওয়া যায়, এবং মানুষ প্রায়শঃ ঐ সমস্ত প্রাকৃতিক ভাণ্ড হইতেই দেহ পুষ্টি সাধন করে। এজন্যই সম্ভবতঃ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন "মাটির শরীর মাটিতেই লয় পায়"। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ৯০টী মৌলিক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র ২১টীর অবস্থান দেহতে দেখা যায়। ইহার কারণ কি? স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুগুলি কেন দেহকে ছলনা করিল? উহারা কি অতি সূক্ষ্মাবস্থায় দেহতে লুক্কায়িত আছে? এ প্রশ্নের জবাব ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে।

পাড়ার গেজেট

আলেয়া

চিরকাল তাকে সবাই কাপড় বিক্রী করতে দেখে আসছে ···মেয়ে মহলে তাকে সবাই কাপড়উলি মাসী বলেই জানে · ছেলে মহলে বলে পাড়ার গেজেট।

সকাল আটটা নটার সময় চারটি পান্তা খেয়ে সে কাপড়ের বোঁচকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে···সদর রাস্তায় এসে সে বাড়ীর দিকে সাম্নে করে হাত দুটো একবার কপালে ছোঁয়ায়। তারপর আর কোনদিকে তাকায় না···হন্ হন্ করে চলতে থাকে।

এ-পাড়া সে-পাড়া ঘোরাঘুরি ক'রে বেলা তিনটে নাগাদ সে বাড়ী ফেরে। ফেরবার পথে বোসেদের বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলে—"কই গো বৌমা!"

ভেতর হতে উত্তর আসে—"কে? কাপড়উলি মাসী।"

—"হ্যাঁ মা, একটু জল দিতে পার···বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।"

বোসেদের বাড়ীর বৌ বেরিয়ে এসে বলে—"ব'স মাসী, জল আনি।" তারপর খান চারেক বাতাসা আর একঘটি

জল এনে তার হাতে দেয়, জল খেয়ে সে একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়ে।

বোসেদের বৌ বলে—"হ্যাঁ মাসী, রঙিণ ডুরে আছে? মেয়েটা কদিন ধ'রে ডুরে কাপড় ডুরে কাপড় ক'রে পাগল ক'রে দিচ্ছে।"

—"তা আর নেই" বলে মাসী তার বোঁচকা থেকে ডুরে কাপড় বার করে দেখায়।

বৌ বলে—"লাল ডুরে নেই?"

—"না মা, দুটো দিন সবুর করো—পরের হাট থেকে এনে দেবো। এই লাল ডুরে নিয়ে সেদিন মুখুজ্যেদের গিন্নী কি কাণ্ডটাই করলে। মুখুজ্যেদের চেন না···ওই যে বড় রাস্তার ওপর সেদিন বাড়ী করেছে···হঠাৎ বড় লোক হ'লে যা হয় মা···আমার কাছ থেকে লাল ডুরে নিলি···বেশতো দেখে নিবি তো···তা? না তখন সাউখুড়ি ক'রে বলা হ'ল 'ওমা, তোমার কাছ থেকে কাপড় নেব তা আবার দেখে নিতে হবে!'···হায় কপাল, তারপর তিনদিন পরে সেই ডুরে কাপড় ছেঁড়া বলে ফেরৎ দিলে! তাও মা ফেরৎ দিলে কথা ছিল না, বলে কিনা 'আমরা দেখে নিইনি বলে মাসী আমাদের ঠকিয়ে গেল,' হ্যা মা একি একটা কথা! তা আমি বলেছি ওই জন্যেই লোকে বেচা-কেনার সময়ও বনেদি ঘর দেখে··· এই না যেই বলা—গিন্নীর দুই মেয়ে যেন আমায় মারতে এলো···একে তো ওইরূপ, তার ওপর আবার—" বোসেদের বৌএর আর শোনবার ধৈর্য্য থাকে না; মাঝ পথে বলে—"ওকথা থাক, এখন ওই পিঁয়াজি ডুরেখানা কতয় দেবে বল?"

"নাও না মা, তোমার সঙ্গে আর কি দর করব, কোনদিন কি দর করেছি?" বলে ডুরেখানা বৌএর পায়ের কাছে ফেলে দেয়।

তারপর বলে—"দর করতে পারে মা দত্তদের বিমলি।"

বৌ জিজ্ঞাসা করে—"বিমলি? এই সেদিন তো তার বিয়ে হ'ল···এখন কোথায়? এখানে না কি?"

মাসী উৎসাহ পেয়ে একটু চাপা স্বরে বলে—"এখানে থাকবে না তো যাবে কোথায়? কালও তো ওদের বাড়ী গিছলুম···শ্বশুর বাড়ী আর কোন লজ্জায় যাবে; তারা নিলে তো··· জান তো সবই কি গুণের মেয়ে। তাই বলি সেদিনের মেয়ে, তার পেটে পেটে এতও ছিল। অত বড় ভাইটা···ভাল চাকরী করত মা, কি যে হ'ল—মাথা গেল, মাথা গেল, করতে করতে মারা গেল···সংসারে পাপ ঢুকলে কি আর রক্ষে আছে···হ্যাঁ, তা বৌমা কাপড়খানা—পাঁচ টাকা দিও।"

বৌ বলে—"পাঁচ টাকা বড্ড বেশী হ'ল না মাসী?"

"বেশী আর এমন কি বৌমা · ঝাড়া দশ হাত···সেদিন ওই কাপড়ের একখানা হরিচরণবাবু নিলে নিজের নাত-বৌএর জন্যে···দেখনি বৌমা···বৌ বলি তো ওকে, যেন জগধাত্রী···যেমন রূপ, তেমি গুণ···একেই বলে বৌ ভাগ্যি।"

বৌ জিজ্ঞাসা করে—"কার কথা বলছ, মাণিকের বৌএর কথা তো? তাকে আবার দেখিনি···বৌভাতে নেমনতন্ন খেয়ে এলুম।"

মাসী বলে—"তা দেখবে বৈ কি বৌমা · তোমাদের কত বড় বনেদি বংশ · তোমাদের বাদ দিয়ে কি কারও কোনও কাজ করবার উপায় আছে।"

—"তা কত দেব মাসি, একটা ঠিক দর বলে দাও।"

—"থাক বৌমা পৌণে পাঁচ টাকা দাও।"

—"না মাসি ওই পুরাপুরি সাড়ে চার দেব।"

—"তা আর কি বলব, তাই দাও · তবে আমার কিছু ওতে রইলো না।···হ্যাঁ বৌমা, ও পাড়ার খবর কি?··· কাল রাত্রে তো খুব চেঁচামেচি হচ্ছিল · শোন নি।"

বৌ বলে—"কই না···কিছু তো শুনিনি।" মাসী বলে "আর মা কালে কালে কতই দেখব—বেনেদের দাশু কাল বুড়ো বাপকে ধরে ঠেঙ্গিয়ে দিলে না; বাপের অপরাধ ছেলেকে ঝগড়ার মুখে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিল··· ভদ্রলোকের পাড়া সহ্য করবে কেন? তারপর জন কতক ছেলে দাশুকে দিলে উত্তম মধ্যম করে···সুপুত্তুর হ'য়ে তখন বাপের পায়ে ধরে মাপ চেয়ে রেহাই পায়। কি গুণেরই ছেলে।···তা দামটা এখন দেবে না থাকবে?"

"এখন নয়, মাস কাবারের মুখ—আসছে সপ্তাহে নিয়ে যেও কেমন।"

মাসী বলে—"তা থাক না, তোমাদের কাছে পাওনা থাকা আর আমার সিন্দুকে থাকা সমান।···হ্যাঁগা বৌমা, ছেলেদের যে আজ বাড়ীতে দেখছি—স্কুলে যায়নি? স্কুল বন্ধ

বুঝি?···স্কুল তো বারমাসই বন্ধ···ছুটি লেগেই আছে। তার ওপর লম্বা পূজোর ছুটি, গরমের ছুটি···এতদিন করে ছুটি দেবে, কিন্তু পোড়ারমুখো মাষ্টারদের মাইনেটা ঠিক চাই।···হ্যাঁ বৌমা, ছুটি যদি রইল তার আবার মাইনে নেওয়া কেন?”

বৌ বলে—“মাষ্টারদের মাইনে দিতে হবে তো···ছুটিতে তো তারা উপোস করে থাকবে না?”

মাসী বলে—“তা যেন থাকবে না, কিন্তু পড়াবার তো ওই ছিরি···সেদিন দেখি দত্তদের অত বড় ছেলে এ বি সি পড়ছে—আমার সাত বছরের নাতিও এ বি সি পড়ে। দত্তদের ছেলে শুনি এ বছরে পাশ দেবে···এখনও যদি এ বি সি পড়ে তাহলে এতদিন মাষ্টাররা পড়ালে কি?”

বৌ বলে—“দত্তদের ছেলে Geometry পড়ে···ওতেও এ বি সি পড়তে হয়।”

মাসী বলে—“জিমিত্তির কি বল্লে মা বুঝি না···এ বি সি ছাড়া তাহ’লে এংরিজিতে আর কিছু পড়ার নেই···ওর চেয়ে আমার বাংলা লেখা পড়া ঢের ভাল।··আমার নাতি কদিনই বা স্কুলে যাচ্ছে··কেমন রামায়ণ মহাভারত সব পড়ে। আচ্ছা বৌমা আজ তাহলে আসি।” বলে সে বোঁচকা নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে।

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

টাকার বিনিময় হার

ভারতবর্ষ আয়তনে বিশাল হইলেও পরাধীনতার জন্য ইহার মুদ্রানীতি ব্রিটেনের মুদ্রানীতির উপর নির্ভরশীল। ভারতের বহির্বাণিজ্যের হিসাবে টাকা ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়-হার স্থিরীকরণে ব্রিটিশ ষ্টার্লিং মধ্যস্থতা করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থায় ভারতীয় মুদ্রা প্রতিটি টাকা ১ শিলিং ৬ পেন্সের সমান।

টাকার এই বিনিময় হার ১৯২৭ সাল হইতেই পাকাপাকি ভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহার পূর্ব্বে ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে টাকার বিনিময় মূল্যে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইত। ১৮৭০ সালে টাকার বিনিময় মূল্য ছিল ২ শিলিং, ১৮৯২ সালে ইহা দাঁড়ায় ১ শিলিং ৩ পেন্স। ১৮৯৮ সালে আবার প্রতি টাকার বিনিময় মূল্য ১ শিলিং ৪ পেন্সে পৌঁছায়। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় ভারতের আর্থিক বনিয়াদ বহুলাংশে বিপর্য্যস্ত হয়, দিশাহারা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১৯১৯ সালে নিযুক্ত বেবিংটন স্মিথ কমিটি টাকার বিনিময়-মূল্য ২ শিলিংয়ে তুলিয়া দিয়া চূড়ান্ত অবিবেচনার পরিচয় দেন। এই অবিবেচনার ফলে এদেশে বিদেশী পণ্য সস্তায় বিক্রীত হইতে থাকে এবং অন্তর্দ্দেশীয় পণ্যমূল্যবৃদ্ধির জন্য ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য প্রভৃত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে প্রায় বানচাল করিয়া দেয়। অবশেষে নিরুপায় ভারতসরকার বাধ্য হইয়া বেবিংটন স্মিথ কমিটির ত্রুটি সংশোধনের জন্য ১৯২৫ সালে এদেশের মুদ্রানীতি সম্পর্কে নূতন করিয়া অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে হিল্টন ইয়ং কমিশন নামে আর একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির সুপারিশে এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের সমর্থনে ১৯২৭ সাল হইতে টাকার বাট্টাহার ১ শিলিং ৬ পেন্স হিসাবে চলিয়া আসিতেছে। ১৯৩১ সালে ব্রিটেন যখন অসহায়ভাবে স্বর্ণমান ত্যাগ করে, তখন টাকার বিনিময় মূল্য পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু ভারতের বহির্বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় কর্ত্তৃপক্ষ এ সময় টাকার বাট্টাহারে কোন পরিবর্ত্তন করেন নাই। এই ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত ভাবে এখনও চলিতেছে।

বলা নিষ্প্রয়োজন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ সোজাসুজি জড়াইয়া পড়িবার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক বনিয়াদ পুনরায় সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছে। যুদ্ধের খরচ জোগাইতে ভারতবর্ষ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার প্রায় ১৮ শত কোটি টাকা অকেজো ষ্টার্লিং-পাওনা রূপে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ব্রিটেনে আটক পড়িয়া আছে। মুদ্রাস্ফীতি,

পণ্যাভাব, কলকারখানার যন্ত্রপাতির অভাব প্রভৃতিতে ভারতবর্ষ এখন বিপর্য্যস্ত। মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া এই চরম দুঃসময়ে যদি কিছুটা স্বস্তিলাভ করা যায়, ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে এখন সে সুযোগ গ্রহণ কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়।

এদিক হইতে এখন টাকার বাট্টাহার পরিবর্ত্তনের একটা সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে বলা চলে। তাছাড়া এই পরিবর্ত্তনের কথা বিবেচনার আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষ ব্রেটন উডস পরিকল্পনানুসারে গঠিত আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও ব্যাঙ্কের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছে। এই আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের পরিচালক কমিটি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্য দেশগুলি কিরূপ আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থির করিতে চান, তাহা কমিটিকে আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে জানাইতে হইবে। সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সহিত টাকার বিনিময় মূল্য কিরূপ হইবে, তাহা ভারতসরকারকে এখনই স্থির করিতে হইবে। অবশ্য ষ্টার্লিং হইতে টাকাকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া লওয়ার এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই, কাজেই এখনও টাকার বাট্টাহার স্থির করিতে হইলে ষ্টার্লিংয়ের হিসাবেই তাহা প্রকাশ করিতে হইবে।

যাঁহারা ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াইতে চান তাঁহারা স্বতঃই টাকার বিনিময় মূল্য বর্ত্তমানের তুলনায় কমাইবার পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে ভারতের সাম্প্রতিক ভয়াবহ পণ্যাভাব দূরীকরণে উৎসুক কেহ কেহ সস্তায় ভারতের বাজারে বিদেশী পণ্যাদি আনাইতে টাকার বাট্টাহার বাড়াইয়া দিতে ইচ্ছুক। তবে যেরূপ লক্ষ্য করা যাইতেছে, ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের এবং সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের অনেকেই চাহিতেছেন টাকার বর্ত্তমান বাট্টাহার অপরিবর্ত্তিত রাখিতে। বলা বাহুল্য, আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডারের নিয়মাবলী অনুসারে এবং যুদ্ধোত্তর এলোমেলো অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এখন যেকালে টাকার আন্তর্জ্জাতিক বিনিময় মূল্য স্থিরীকরণের নূতন সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন এ সম্বন্ধে ভারতসরকারের যথেষ্ট বিবেচনবোধ ও দূরদর্শিতার একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের মতে কিন্তু ভারতের ন্যায় বিরাট সম্ভাবনাময় দেশের টাকার বাট্টাহার পরিবর্ত্তনের জন্য যে পরিস্থিতির উদ্ভব দরকার, ভারতে এখনও ঠিক ততখানি জটিল পরিস্থিতি দেখা দেয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন অনিশ্চিত কতকগুলি সূত্রের উপর ঝুলিতেছে। যুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতবর্ষের আর্থিক বনিয়াদ বিপন্ন হইয়াছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধকালীন অভাবনীয় পরিস্থিতিতে ভারতের অর্থাগম, পণ্য উৎপাদন, শ্রমনিষ্ঠা প্রভৃতির যে বিপুল সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে, যুদ্ধোত্তরকালে তদ্দ্বারা এই দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্ত্তনও অসম্ভব নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ব্রিটেনের বৈদেশিক বাণিজ্য লইয়া যত প্রবল প্রতিযোগিতাই চলুক এবং ভারতের বাজারে সেই প্রতিযোগিতা যেরূপ আলোড়নই সৃষ্টি করুক, মোটের উপর ভারতবাসীর যুদ্ধকালীন শিল্পপ্রবণতা, অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মনৈপুণ্য একেবারে ব্যর্থ হইতে পারে না। যুদ্ধোত্তর আর্থিক পুনর্গঠনের পক্ষে ভারতসরকারের বর্ত্তমান অর্থাভাব প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেছে সন্দেহ নাই, তবে একথাও ঠিক যে ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা যে আঠারো শত কোটি টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার লণ্ডন শাখায় পচিতেছে, তাহার একটা সুরাহা হইয়া গেলে পরিস্থিতি অবশ্যই অনেকটা সরল ও সহজ হইয়া যাইবে। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে যথেষ্ট ঋণ দিতেছে, ভারতের পক্ষ হইতে আবেদন জানাইলে মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ সেই আবেদনে সাড়া দিবেন বলিয়াই আশা করা যায়। বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিবিদ এবং জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ডাঃ লঙ্কাসুন্দরম সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে এক হাজার কোটি ডলার ঋণ পাইলে আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার পক্ষে স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করা কঠিন হইবে না। ডাঃ লঙ্কাসুন্দরমের এই অভিমতের মূল্য অনস্বীকার্য্য। এইভাবে টাকার জোগাড় হইলে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই পণ্ডিত নেহেরু পরিচালিত নবগঠিত জাতীয় সরকারের অধীনস্থ ভারতবর্ষ আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিতে পারে। কাজে কাজেই সম্ভাবনা যখন এত বিপুল, তখন বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনশীল পরিস্থিতির মধ্যে টাকার বাট্টাহারের উপর হস্তক্ষেপ ফলপ্রসূ হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

ভারতবর্ষ এতকাল কাঁচা মাল রপ্তানী করিয়া আসিয়াছে, যুদ্ধোত্তরকালে সেই রপ্তানীনীতির পরিবর্তন না হইলে এদেশের শিল্পপ্রগতি অবশ্যই প্রতিরুদ্ধ হইবে। সুতরাং টাকার বাট্টাহার কমাইয়া ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই বলা চলে। ভারত-বাসীর সাধারণ জীবনযাপনের মান ভদ্রোচিত করিয়া তুলিতেও এখনও কয়েক বৎসর এদেশের সম্প্রসারিত শিল্পজাত পণ্য শুধু ভারতবাসীর ব্যবহারের জন্যই এদেশে আটকাইয়া রাখিতে হইবে। অপর পক্ষে সম্প্রতি এদেশে যে নিদারুণ পণ্যাভাব দেখা দিয়াছে, তাহা মোটামুটি দূর করিতে যদিও বিদেশী মাল না আনাইয়া উপায় নাই এবং যতটা সস্তায় সম্ভব সেই মাল পাওয়া গেলে ভাল হয়, তথাপি সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, এই বিদেশী পণ্য-আমদানীনীতি একান্তভাবে বিপদকালীন সাময়িক নীতি। কাজেই টাকার বাট্টাহার বাড়াইয়া পাকাপাকিভাবে আমদানী বাণিজ্য সম্প্রসারণের সর্ব্বনাশা ব্যবস্থা এই দুঃসময়েও অনুমোদনযোগ্য নহে। টাকার ১৮ পেনী বিনিময় মূল্য যে চূড়ান্তভাবে ভারতের স্বার্থরক্ষার পক্ষে অনুকূল, সেকথা বলা অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, যুদ্ধবিরতির পর এখনো যেকালে দেশে কোনদিক হইতেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে নাই, তখন বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার মধ্যে টাকার বাট্টাহার পরির্ত্তবনের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বোধহয় সমীচীন হইবে না। এতকাল আমলাতান্ত্রিক বিদেশী গভর্ণমেণ্ট ভারতের স্বার্থ সম্বন্ধে লজ্জাকর উদাসীনতা দেখাইয়া আসিয়াছেন, পণ্ডিত জহরলাল পরিচালিত জাতীয় সরকার সেই দুর্নীতির অবসান ঘটাইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। টাকার বিনিময় হার নির্দ্ধারণের ব্যাপারেও আমরা আশা করি অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার বর্ত্তমানের দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিরাট সুযোগ সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করিয়া সুচিন্তিত ও ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

চিনি

ভারতবর্ষ চিনির দিক হইতে স্বাবলম্বী নয়। কৃষিপ্রধান এই দেশে ইক্ষু উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা প্রচুর থাকিলেও কতকটা কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতায় এবং কতকটা জনসাধারণের অজ্ঞতায় এদেশে প্রয়োজনানুযায়ী ইক্ষু বা চিনি উৎপন্ন হয় না। ভারতবর্ষে মাথাপিছু চিনি ব্যবহৃত হয় মাত্র ৭ পাউণ্ড হিসাবে এবং গুড় ব্যবহৃত হয় ২০ পাউণ্ড হিসাবে। এইভাবে ভারতবর্ষের লোক ২৭ পাউণ্ড হিসাবে গুড় ও চিনি ব্যবহার করিলেও চিকিৎসকদের মতে বৎসরে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক লোকের অন্ততঃ ৪৬ পাউণ্ড চিনি ও গুড় ব্যবহার করা করা দরকার। সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবে দেখা যায়, ব্রিটেন, মার্কিণ, যুক্তরাষ্ট্র ও হল্যাণ্ডের লোকেরা বৎসরে মাথাপিছু যথাক্রমে ১০৬ পাউণ্ড, ৯৭ পাউণ্ড ও ১১৬ পাউণ্ড চিনি ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ১৪৫টি আন্দাজ চিনির কলে ঠিকমত কাজ হইতেছে, অবশ্য ছোটখাট আরও কয়েকটি ভারতীয় কারখানায় চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কলগুলিতে ১৯৪৫-৪৬ সালে (অক্টোবর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত এই আট মাস চিনির কল চলে) মোট ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮শত টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। এই উৎপাদন পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় প্রায় ১০ হাজার টন কম। ভারতে উৎপন্ন মোট চিনির অর্দ্ধাংশের বেশী যুক্ত-প্রদেশে উৎপন্ন হয়, যুক্তপ্রদেশের পরেই বিহারের স্থান। বাঙ্গলায় ইক্ষু উৎপাদন ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর এবং সে হিসাবে এই প্রদেশে চিনির উৎপাদনও নগণ্য। ১৯৪৫-৪৬ সালে বাঙ্গলার ৭টি কলে মাত্র ২২ হাজার ৬শত টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল।

বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে অন্ততঃ ২০ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন করা আবশ্যক। বিশেষজ্ঞরা বলেন এদেশে এই পরিমাণ চিনি উৎপন্ন করা একেবারেই অসম্ভব নয়। এতদিন ভারত সরকার শর্করা শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রতি মোটেই নজর দেন নাই, আশার কথা সম্প্রতি এদিকে তাঁহাদের একটু দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় শর্করা শিল্পের যুদ্ধোত্তর উন্নতি-সাধন সম্পর্কে মতামত প্রকাশের জন্য ভারত সরকার একটি শর্করা-শিল্প-কমিটি বা প্যানেল নিযুক্ত করেন। এই কমিটি জানাইয়াছিলেন যে এদেশে চিনির কল বাড়ান ছাড়া শর্করা শিল্পের উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। তাঁহারা বর্ত্তমান ১০ লক্ষ টনের স্থানে ভারতে ১৬ লক্ষ টন চিনি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ১৫টি নূতন কল স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। তাহাদের প্রস্তাবানুসারে বাঙ্গলায় ৩টি, মাদ্রাজে ৩টি,

বোম্বাইয়ে ২টি, পাঞ্জাবে ২টি এবং আসাম, সিন্ধু ও উড়িষ্যায় ১টি করিয়া নূতন চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা ছিল। সম্প্রতি এই কমিটি ভারতের শর্করা সমস্যার সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতে এখন সাড়ে আঠারো লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির পরিপূরক হিসাবে কমিটি এখন ভারতে ২০টি নূতন চিনির কল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করিয়াছেন। প্রস্তাবিত এই সব কলের প্রত্যেকটিতে প্রত্যহ কম বেশী ৯০০ টন আখ মাড়াই করা চলিবে। প্রকাশ, কমিটির অনুমোদনক্রমে ভারত সরকার শর্করা উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে এদেশে এই কুড়িটি ছাড়া আরও নূতন ২৫টি চিনির কল বসাইবার সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতে অন্তর্ব্বর্ত্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সহজেই আশা করা যায় যে, অন্যান্য নানা প্রকার শিল্পের ন্যায় শর্করা শিল্পের দিক হইতেও ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে ভারত সরকার এইবার সচেষ্ট হইবেন। আর কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে ইক্ষু উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার সহজ বলিয়া এদেশে শর্করা শিল্পের উন্নতিসাধন মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়। তবে ইচ্ছা থাকিলেও এখন এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে যন্ত্রসমস্যা। ভারতে এখনই যে চিনির কলগুলি আছে, সেগুলির বিকল যন্ত্রসমূহ মেরামত করিতে ৪০।৪৫ হাজার টন যন্ত্রপাতি দরকার, ইহার উপর নূতন কলগুলির জন্য প্রয়োজন আরও ৫০ হাজার টন আন্দাজ যন্ত্রপাতি। ডলার সমস্যা বর্ত্তমান থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই সব যন্ত্র আমদানী করা সহজ নহে, অথচ ব্রিটেনের কারখানা-সমূহে যন্ত্রপাতির জন্য এত বেশী অর্ডার জমিয়া যাইতেছে যে সমস্ত অর্ডার অনুসারে যন্ত্রাদি জোগানো রীতিমত সময় সাপেক্ষ। এ অবস্থায় ভারতের নিম্নতম প্রয়োজন যথাসম্ভব মিটাইবার জন্য ভারত সরকারের আগ্রহ বা উৎসাহই যে সর্ব্বাগ্রে দরকার তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য ভারতের অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার তাঁহাদের অল্পদিনের কার্য্যকালে যে কর্ত্তব্যানুরক্তি ও কর্ম্মনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, ভারতের শিল্প-ভবিষ্যতের দিক হইতে তাহা নিঃসন্দেহে আশাপ্রদ।

১৮।১১।৪৬

দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

"সাজাহান" কীর্ত্তি তব, কল্পনাবিলাসী
হে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল! তব ভাব রাশি
অমর করেছে তারে নাটকে তোমার
মধুর বাণীর রসে। যবে দেখি তার
অভিনয় রঙ্গমঞ্চে নীরব সন্ধ্যার
মুগ্ধ হয় মোর প্রাণ। মোর চিত্তে হায়
ধীরে ধীরে উঠে জাগি আগ্রার সে ছবি!
বন্দী সম্রাটের দুঃখ বল বল কবি
কেমনে শুনিলে তুমি! তার হাহাকার
কেমনে খুলিলো তব ভাবের দুয়ার!
তিনশো বছর পরে কেমনে শুনিলে
সেদিনের ব্যথা তার। তাই কি লিখিলে
বলে কবিদের লোকে ত্রিকালজ্ঞ গুনি?
বন্দী সম্রাটের ব্যথা তোমাতেই গুণী
উঠিল প্রথম ফুটি। সেদিন আগ্রায়
বুঝে নাই কেহ যার, তীব্র বেদনায়
প্রাসাদ কারার মাঝে, শুধু সে বেদন
বুঝেছিল দুটি প্রাণী,—প্রেম নিকেতন
স্বপ্নময়ী তাজ আর কন্যা জাহানারা।
কাল-স্রোতে জাহানারা হইয়াছে হারা
বিচ্যুত-তারার সম। প্রেম শুভ্র তাজ
মৃত্যুরে করিয়া জয় করিছে বিরাজ
আজিও কবির চিত্তে জাগাইতে স্মৃতি!
তুমি বুঝি শুনেছিলে সে তাজের গীতি
বিষাদ আপ্লুত প্রাণে। তাই তার ব্যথা
লভি তব মৃত্যুহীন গীতি, ভাব, কথা
প্রকাশিত করিয়াছে শোকী সাজাহানে
তোমার প্রতিভা মুগ্ধ বিশ্বের নয়ানে।

পশমের অনুকল্প

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কবে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম !

লণ্ডন-প্রবাসী জনৈক ভারতীয় তুলার প্রয়োজনে সেখানকার দোকানে দোকানে 'কটন' আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া হতাশ হইয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহার বিস্ময় লাগিতেছিল এই ভাবিয়া যে লণ্ডন শহরে তুলা পাওয়া যায় না ! ইতিমধ্যে একজন ইংরাজবন্ধুর সঙ্গে দেখা, তিনি তাঁহার কাছে নিজের বিপত্তি নিবেদন করিলেন। ইংরাজ ভদ্রলোক তাহাকে বলিলেন, বন্ধু তুমি ভুল করিয়াছ, এখানকার সাধারণ লোকে 'কটন' চেনে না, তোমার বলা উচিত 'কটন-উল'। অতঃপর ভারতীয় ভদ্রলোক 'কটন-উল' সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিনা বর্তমান প্রসঙ্গে তাহা অবান্তর। হয়ত বা এটা নিছক গল্পই, তবুও এই গল্পের ভিতর একটা ইতিহাসের আভাস পাইয়াছিলাম। 'কটন-উলে'র তর্জমা করিলে শব্দটির অর্থগত রূপ দাঁড়ায় 'গেছো পশম'। একটা অদ্ভুত কথা বটে। কি করিয়া এই শব্দের উৎপত্তি ?

কয়েক শত বৎসর পূর্বে, তখন কেবলমাত্র বাণিজ্য বিনিময়ের সূত্রে প্রাচ্যপ্রত্যাগত বণিকদলের মুখে রহস্যভরা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অনেক গল্পই য়ুরোপীয়েরা স্বদেশে বসিয়া শ্রবণ করিত। বহুবিধ আজগুবী কাহিনীর মধ্যে এই রকম একটা কথাও প্রচারিত হইয়াছিল যে, 'ভারতবর্ষে গাছের শাখায় পশম মেলে'। কথাটি হঠাৎ শুনিলে আজগুবী মনে হইবে সন্দেহ নাই এবং হয়ত সঙ্গে সঙ্গে তখন এই প্রশ্নও অনেকের মনে আসিত যে, গাছের শাখায় যদি পশম মেলে তবে কি গাছের ফলে মেষের জন্ম হয় ? (কোন একটা বিলাতী বইতে এমন একটা ছবিও দেখিয়াছিলাম যে কার্পাস গাছের ডালে ডালে মেষ ঝুলিয়া রহিয়াছে)।

তদানীন্তনকালে পশুর দেহ ভিন্ন বস্ত্রের জন্য তন্তু সংগ্রহ করিবার অন্য কোন উপায়ের কথা য়ুরোপের লোকের কল্পনায় আসিত না। বহুকাল পর্যন্ত দুই গোলার্ধে বস্ত্রের উপাদানের মৌলিক পার্থক্য ছিল। শীতপ্রধান দেশে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে জন্তুর পশমে বস্ত্র তৈয়ারী করিয়া শীত ও লজ্জা নিবারণ করা হইত, পক্ষান্তরে গরমের দেশের লোকেরা গাছের বাকল ছাড়িয়া উদ্ভিদের ফলে তন্তুর সন্ধান পাইয়া তাহার ব্যবহার বিধি আবিষ্কার করিল। কার্পাস ও রেশম দিত প্রাচ্যের বস্ত্রের যোগান, পাশ্চাত্যের লোকেরা তখনও কার্পাসের খবর রাখে না—পশুর পশমই তাহাদের তন্তু সংগ্রহের একমাত্র অবলম্বন। পশম ভিন্ন সূতা তৈয়ারী করা যে সম্ভব এটা হয়ত তাহাদের কল্পনায় আসিত না। তাই গাছের শাখায় বস্ত্রের উপাদান সংগ্রহের খবরই সে দেশে 'গাছের শাখায় পশম মেলে' বলিয়া প্রচারিত হইয়া বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গেই তুলার নামের সঙ্গে বস্ত্রের উপাদান অর্থে 'উল' (পশম) শব্দটি জড়িত হইয়া রহিল—কার্পাস তন্তুর নাম দেওয়া হইল 'কটন-উল'। তারপর বহুশত বর্ষ কাটিয়া গিয়াছে—রেশম, পশম ও কার্পাস তন্তু সর্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে ; তবে তুলার নামের বৈচিত্র্যটুকু ইংরাজী ভাষার ভাণ্ডারে রহিয়াই গিয়াছে। কিন্তু বহুকাল পরে এতদিনে প্রকৃতই গাছের দেহ হইতে পশমী তন্তুর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। কার্পাস তন্তুর সঙ্গে পশম তন্তুর কোন সাদৃশ্যই নাই, কেবলমাত্র ইংরাজী ভাষার নামের গোজামিলটুকু ছাড়া। এখন উদ্ভিদের উপাদানে এমন এক কৃত্রিম তন্তু নির্মিত হইয়াছে যাহা সর্বাংশে পশম তন্তুর সমকক্ষ ও মূলত অভিন্ন। 'গেছো পশম' এতদিনে বাস্তবরূপ পাইয়াছে কিন্তু ভারতে নয় ইংলণ্ডে। এবার আমাদের আবার পাল্টা সেই বিস্ময়কর আবিষ্কার কাহিনী শুনিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

চীনাবাদাম, তন্তু, সূতা ও জামা।

তরল পদার্থকে তন্তুতে পরিণত করিবার স্পীনারেট যন্ত্র

প্রাকৃতিক উপাদান হইতে তন্তুসংগ্রহ মানুষকে চিরকাল খুসী রাখিতে পারে নাই। কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদানে বস্ত্রের জন্য তন্তু উৎপাদনে যত্নবান হইয়া বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম রেশম ও পশম তৈয়ারী করিতে সক্ষম

হইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে কাঠ, কয়লা, কাচ, দুধ প্রভৃতি উপাদান ব্যবহৃত হইতেছে। অধুনা পশমী কাপড়ের অনুকল্প নির্মাণ করিবার জন্য নূতন এক উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে। চীনাবাদাম (পী-নাট, গ্রাউণ্ড-নাট) হইতে শীতবস্ত্র তৈয়ারী করিবার তন্তু সংগ্রহ করা হইতেছে।

প্রাকৃতিক তন্তু দ্বিবিধ—প্রাণীজাত ও উদ্ভিদজাত। রেশম ও পশমের তন্তু প্রাণীজাত ও কার্পাস সূত্র উদ্ভিদ হ'তে প্রাপ্ত। প্রাণীজাত তন্তুর মূল উপাদান নাইট্রোজেন ঘটিত প্রোটিন নামক জৈব পদার্থ, আবার উদ্ভিদজাত তন্তু নির্মিত হয় কারবন ঘটিত কারবোহাইড্রেট নামক মৌলিক পদার্থের উপাদানে। কারবোহাইড্রেট লইয়া তাহা হইতে কার্পাস বস্ত্রের অনুরূপ তন্তু কৃত্রিম উপায়ে তৈয়ারী করা যায় কিনা সেই বিষয়ক প্রচেষ্টা হইতেই রেয়নের বা তথাকথিত কৃত্রিম রেশমের জন্ম। একথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যদিও রেয়নকে কৃত্রিম রেশম বলা জিনিষে প্রাপ্ত প্রোটিন সর্বতোভাবে অভিন্ন নহে, কারণ উহাদের মধ্যে উক্ত এসিড কণিকার সংখ্যা ও সমাবেশ একপ্রকার থাকে না। ভেড়ার খাদ্য ঘাসপাতা প্রভৃতি উদ্ভিদজাত দ্রব্য। উদ্ভিদজাত প্রোটিন ভেড়ার দেহে আত্মস্থ হইবার পর দেহাভ্যন্তরীণ লেবরেটরীতে রূপান্তরিত হইয়া পশমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা ও কায বড়ই মন্থর। পশম সংগ্রহের জন্য মানুষ মেষের দেহস্থ লেবরেটরীর দীর্ঘসূত্রী ব্যবস্থায় নির্ভর করিতে চাহিল না। তাই প্রচেষ্টা হইল উদ্ভিদজাত প্রোটিনকে মেষের দেহে না পাঠাইয়া বিজ্ঞানীর লেবরেটরীতে তন্তুতে পরিবর্তন করা সম্ভব কিনা। আরও একটা কারণে কৃত্রিম তন্তুর প্রয়োজন একান্তভাবে অনুভূত হইতেছিল।

পশুর পশম, রেশমকীটের সূত্র বা কার্পাস তন্তু ইহাদের কোনটিই মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি তৈয়ারী করিবার

সূতার জন্য কাচ সংগ্রহ

কাচের কাপড় (এই কাপড় তাপনিরোধক)

হয়, প্রকৃতপক্ষে রেয়ন কার্পাস তন্তুরই সমগোত্রীয়; কারণ প্রাণীজ প্রোটিনে তৈয়ারী রেশমের সঙ্গে উহার বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকিলেও উহার উপাদানগত ঐক্য রহিয়াছে কার্বোহাইড্রেটে প্রস্তুত কার্পাস তন্তুর সঙ্গেই।

গাছের দেহ হইতে কার্বোহাইড্রেট সংগ্রহ করিয়া তদ্দারা যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তন্তু তৈয়ারী করিবার সাফল্যের পরে প্রোটিন হইতে পশমী তন্তুর অনুকল্প উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল। দশ বার বৎসর আগে দুগ্ধ হইতে কেসীন সংগ্রহ করিয়া সেই প্রোটিনে ল্যানিটাল নামে অভিহিত কৃত্রিম পশম তৈয়ারী হইয়াছিল। কিন্তু এই 'পশমী'-বস্ত্র জলের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যাইত বলিয়া উহা বহুল প্রসার লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ভেড়ার লোম রাসায়নিক বিচারে প্রোটিনের তন্তু। প্রোটিন-অণুর গঠন খুবই জটিল, মোটামুটি পরিকল্পনা করেন নাই। ইহাদের সকলগুলিই স্ব স্ব প্রয়োজনে নির্মিত, তাই ইহাদের গুণপণা, ধর্ম ও কাযকারিতা সবই সীমাবদ্ধ ও বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। ভেড়ার লোম টেকসই হইবার উপযুক্ততা থাকিবার প্রয়োজন নাই, কারণ কোন একটি বিশেষ পশম অকর্মণ্য হইয়া পড়িলেই উহার স্থান গ্রহণ করিবে নবোদগত অপর পশম। রেশমের গুটিকা বা কার্পাসের বীজকে রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাত হইতে সাময়িকভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন হয়, যে পর্যন্ত না উহারা উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সকল বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে এই প্রাকৃতিক তন্তুগুলি মানুষের বিলাসী প্রয়োজনের বহুবিধ দাবী মিটাইবার পক্ষে উপযোগী না হওয়াই সম্ভব। সেইজন্য মানুষের প্রয়োজন হইল এমন তন্তুর উদ্ভাবন, যাহা তাহার পক্ষে সমগ্রভাবে বাঞ্ছনীয়।

কার্বোহাইড্রেট সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে তন্তু নির্মাণ করিবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সকল প্রকার তন্তু তৈয়ারীর ব্যাপারে দুই প্রকার কার্য আছে। প্রথমে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেটকে এমন একটি দ্রাবকে গলাইয়া লইতে হয় যাহাতে কার্বোহাইড্রেট আঠালো রসে পরিণত হয়। এই আঠালো রসকে তন্তুতে রূপান্তরিত করা সম্ভব। মাকড়সার জাল বা গুটিপোকার সুতা তৈয়ারীর কৌশল লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে তরল পদার্থ বাহির করিয়া ক্রমাগত টানিয়া গেলে বাতাসের সংস্পর্শে তরল দেহে রস শুকাইয়া সুতায় পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অনুসরণ করিয়া মানুষ কৃত্রিম তন্তু নির্মাণের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিয়াছে। তরলীকৃত কার্বোহাইড্রেটকে সূক্ষ্ম ছিদ্র মুখে বাহির করিয়া দিয়া উহাকে সঙ্গে সঙ্গে জমাট করিবার ব্যবস্থা করিলে উহা তন্তুতে পরিণত হইয়া থাকে।

উপযুক্ত প্রোটিন সংগ্রহ করিয়া উহাকে তরল করিয়া লওয়াই

সমপরিমাণ পশম ও আর্ডিলে তৈয়ারী মহিলাদের শীতের জামা

কৃত্রিম পশম তন্তু তৈয়ারীর মূল সমস্যা ছিল। লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রীজ নামক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের চেষ্টাতে এই সমস্যার সমাধান হইয়াছে। চীনা বাদামের ভিতর শতকরা ৫০ ভাগ থাকে তৈলজাতীয় উপাদান, ২০ ভাগ প্রোটিন, ১১ ভাগ কার্বোহাইড্রেট ও বাকীটুকু জল ও লবণ জাতীয় পদার্থ। চীনাবাদামের খোসা ছাড়াইয়া উহা হইতে তিল ও গোরুর খাদ্য এক জাতীয় পদার্থ বাহির করিয়া লইবার পর যে অংশ থাকে উহাতে শতকরা ৯ ভাগ থাকে নাইট্রোজেন। এই অংশ হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিন উদ্ধার করা হইয়া থাকে—এই প্রোটিনের নাম 'আর্ডিন'। তারপর কষ্টিক সোডা দ্রাবকে দ্রবীভূত করিয়া প্রাপ্ত আঠালো পদার্থকে অতঃপর স্পীনারেট যন্ত্রের ভিতর দিয়া চালাইলে সূক্ষ্ম তন্তু পাওয়া যায়। এই তন্তু হইতে ইচ্ছামত সুতা তৈয়ারী করা যাইতে পারে। এই তন্তুর নাম 'আর্ডিল'।

আর্ডিলের গুণাগুণ বিচার করিলে দেখা যায় উহা পশমের অনুকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার স্বাভাবিক বর্ণ বাদামের শাঁসের মত সাদা, কিন্তু উহা যে কোন বর্ণে রঞ্জিত হইতে পারে। আর্ডিল দেখিতে পশমের মত এবং পশমের মতই নরম ও গরম। কিন্তু পশমের চেয়ে এক হিসাবে ইহা ভাল, কারণ পশমের মত উহা জলে ধোয়ার পর কুচকাইয়া খাট হইয়া যায় না। যদিও খাটি পশমের চেয়ে আর্ডিলের জলশোষণ করিবার ক্ষমতা বেশী, তবুও উহা কম সংকোচনশীল।

আর্ডিল প্রধানতঃ খাটি পশম, রেশম রেয়ন ও কার্পাসের সঙ্গে মিশ্রিত হইলে ভাল কাজ করে। খাটি পশমের সঙ্গে মিশাইয়া আর্ডিলের সুতা তৈয়ারী করিলে উহা বেশী টেকসই হইয়া থাকে। চোখে দেখিয়া বা ব্যবহার করিয়াও খাটি পশমের এবং আর্ডিল মিশ্রিত পশমের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় না। আর্ডিলের আরও একটি বিশেষ গুণ আছে। উহা পোকায় কাটে না—খাটি পশমের যেটা অন্যতম দুর্বলতা।

আর্ডিল তৈয়ারীর খরচা পশমী তন্তুর চেয়ে কম, এই হিসাবে ইহার উপযোগিতা অনতিক্রম্য। একটন চীনা বাদামে পাঁচ শত পাউণ্ড আর্ডিল তন্তু পাওয়া যায়। চীনা বাদাম ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা, আমেরিকা, ও বোর্ণিও অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়। সুতরাং কাচামালের অভাবে কোন কালেই আর্ডিলের উৎপাদন ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা নাই। আর্ডিল আবিষ্কারের পর ইহা সম্ভব মনে হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে পশমী কাপড়ের ব্যবহার বিষয়ে নূতনত্ব ও ব্যাপকতা দেখা যাইবে।

মানব ইতিহাসের শৈশবদশা কাটিয়া যাইতেছে। মানুষ এতদিনে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইবার যোগ্যতা পাইয়াছে, বলিতে পারি সে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। শিশুকে সকল কাজই পরের দান ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। তারপর এককালে সে বড় হইয়া নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিজেই সংগ্রহ করে, অপরের ভরসা করে না। এতকাল মানুষ প্রকৃতির দেওয়া দ্রব্য সম্ভারে নিজ প্রয়োজন মিটাইত। কিন্তু এখন সে দিন আর নাই, এখন মানুষ নিজের বুদ্ধির দৌলতে স্বকীয় প্রয়োজনের সামগ্রী তৈয়ারী করিয়া লইতে সক্ষম। গাছের পাতায়, প্রাণীর দেহে, জলেস্থলে, আকাশে বাতাসে নিপুণ কারিগর বিশ্বকর্মার যে অগণিত কর্মশালা রহিয়াছে তাহারই অনুকরণ করিয়া এতদিনে সাবালক মানুষ নিজে সৃজনী শক্তি অর্জন করিয়াছে। প্রকৃতির কৃপণ দানের উপর একান্ত নির্ভরশীল থাকিতে সে আর ইচ্ছুক নহে। বিশ্বামিত্রের সাধনার মতই বিজ্ঞানী তাপস কৃত্রিম পৃথিবী তৈয়ারী করিবার উন্মত্ত উল্লাসে বিভোর হইয়া রহিয়াছেন, তাই মানুষ হইয়াছে আজ বিধাতার প্রতিস্পর্ধী।

মৎস্য-পুরাণ
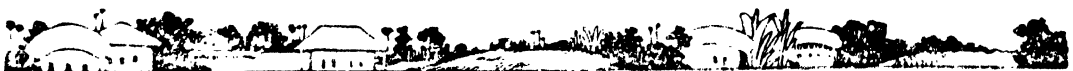
শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় বি-এল

"বলি তো হাস্‌বো না, হাসি রাখ্‌তে চাহি তো চেপে,
কিন্তু ব্যাপার দেখে থেকে থেকে যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে।"

(দ্বিজেন্দ্রলাল)

গত রবিবার সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় কয়লাঘাটা নূতন বাজারের প্রশস্ত চাঁদনীতে জুনিয়ার ফিশ্‌ এ্যাসোসিয়েসনের এক সভা আহুত হয়। অল্‌-বেঙ্গল ফিশ্‌ এ্যাসোসিয়েসনের সিনিয়ার সভ্যদিগের সহিত জুনিয়ার সভ্যদিগের যে মতানৈক্য বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল এবং যাহার ফলে অল্‌-বেঙ্গল ফিশ্‌ এ্যাসোসিয়েসন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া জুনিয়ার ও সিনিয়ার এই দুইটি দলে পরিণত হয়, উক্ত সভায় এই পুরাতন দলাদলির একটি চরম বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। অল্‌-বেঙ্গল ফিশ্‌ এ্যাসোসিয়েসনে এতদিন সিনিয়ার ও জুনিয়ার—এই দুইটি দল ছিল। সিনিয়ার অর্থাৎ রুই, কাতলা, মৃগেল, ভেটকী, গলদা চিংড়ী, ইলিশ, কই ইত্যাদির সভ্যেরাই এতদিন এ্যাসোসিয়েসনের একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। অবস্থা এতদূর দাঁড়াইয়াছিল যে তাঁহারা জুনিয়ার অর্থাৎ খয়রা, বেলে, খলসে, ট্যাংরা, বাগ্‌দা, ঘুষো ইত্যাদির সভ্যদিগের সহিত এক দোকানে পর্য্যন্ত বিক্রীত হইতে অস্বীকার করিতেন। যদি কেহ কালিয়ার জন্য রুই ক্রয় করিয়া বড়ার জন্য সামান্য কিছুও ঘুষো একই থলিয়াতে লইতেন, তাহা হইলে থলিয়ার মধ্যে কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়া যাইত এবং তাহার ফলে ক্রয়কারী বাটি পৌছিয়া দেখিতেন যে ঘুষো একটিও নাই। পাচক ব্রাহ্মণ বা চাকরগণ কিছুতেই জুনিয়ার ও সিনিয়ার এই দুই বিভিন্ন প্রকার মৎস্য একই দিনে বাজার হইতে আনিতে স্বীকৃত হইত না, কারণ দুই দলের রেশারিশির ফল এমন দাঁড়াইয়াছিল যে বাটি পৌছিয়া গৃহস্বামীর নিকট একে অন্যের যথার্থ দাম বলিয়া দিয়া ক্রয়কারী ঠাকুর বা চাকরকে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত করিত। গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর এই অবস্থা একেবারে চরমে উপস্থিত হয়, যখন সিনিয়ারগণ তাঁহাদের এক গুপ্ত সভায় এক রিজলুসন করেন যে তাঁহারা যখন মৎস্যদিগের মধ্যে অভিজাত সম্প্রদায়, তখন তাঁহারা যাহার তাহার ঘরে আর যাইতে অনিচ্ছুক, এজন্য মিলিটারী, সিভিল সাপ্লাই, পুলিশ, রেল—ইহা ভিন্ন আর কাহারও ঘরে তাঁহারা যাইবেন না। তবে এই ডেমোক্রেসির যুগে স্পষ্টভাবে ওরূপ রিজলুসন্‌ সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করার বাধা আছে, এজন্য অ্যামেণ্ডমেণ্ট্‌ স্বরূপ—সাহারী ও নিরাহারী হাকিম, গভর্ণমেণ্ট খেতাবধারী, ধান্য ও বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং মিলিটারী কণ্ট্রাক্টর—এই কয়টি নাম উক্ত লিষ্টে পরে জুড়িয়া দেওয়া হয়।

জুনিয়ারগণ এই রিজলুসনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া বহু সভা সমিতি ও আন্দোলন করেন এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট মেমোরিয়াল্‌ পাঠান। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে বিজ্ঞ আইনব্যবসায়ীগণের পরামর্শ লইয়া তাঁহারা গত রবিবার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার ফলে অল্‌-বেঙ্গল ফিশ্‌ এ্যাসোসিয়েসন্‌ একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাহার স্থলে জুনিয়ারগণ একতাবদ্ধ হইয়া অল্‌-বেঙ্গল জুনিয়ার ফিশ্‌ এ্যাসোসিয়েসন্‌ নাম ধারণপূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা অতঃপর নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিবেন অর্থাৎ self-determination নীতি অবলম্বন করিবেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন, তাহার মধ্যে জনসাধারণের জ্ঞাতব্য নিয়মগুলির চুম্বক আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

(১) পূর্ব্বের দামে আর কেহই জুনিয়ার ফিশ্‌ এ্যাসোসিয়েসনের সভ্যদিগকে পাইবেন না। ঋতুভেদে তাঁহাদের একটা সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। যতদিন মূল্য নির্দ্ধারণ না হয়, ততদিন মৎস্য ব্যবসায়ীরা যাহার নিকট হইতে যত বেশি দাম লইতে পারে তাহাই লইবে। সর্ব্বনিম্ন মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য কয়েকজন প্রধান সভ্যকে লইয়া একটি সাব্‌-কমিটি গঠিত হইয়াছে। সাব্‌-কমিটি ইচ্ছা করিলে মিউনিসিপ্যাল হেল্‌থ্‌ অফিসার বা স্যানিটারী-ইন্‌স্পেক্টরদিগের মধ্যে কাহাকেও সভ্য হিসাবে co-opt করিয়া লইতে পারিবেন।

(২) জুনিয়ার ফিশ্ এ্যাসোসিয়েসনের সভ্যদিগকে কেহ আর মুদির দোকান হইতে ভিক্ষালব্ধ ছেঁড়া কাগজ বা পথপার্শ্ব হইতে আহরিত কলাপাতার ঠোঙায় বট পাতা চাপা দিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না—রীতিমত চটের থলিয়ার মধ্যে লইতে হইবে।

(৩) সাধারণতঃ কেহ একই দিনে একই বেলায় সিনিয়ার মৎস্যের কালিয়া ও জুনিয়ারগণের অম্বল, বড়া বা চচ্চড়ী রন্ধন করিতে পারিবেন না। তবে বৃহৎ ভোজের বাড়ীতে জুনিয়ার ফিশ্ এ্যাসোসিয়েসনের অনারারী সেক্রেটারীকে জানাইয়া ও তাঁহার লিখিত অনুমতি লইয়া এ নিয়মের ব্যতিক্রম চলিবে।

(৪) জুনিয়ারগণকে কেহ আর মুখ বাঁকাইয়া—খল্‌সে, পুঁটি, ঘুষো ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতে পারিবেন না। অতঃপর তাঁহাদিগের নূতন নামকরণ যাহা হইল তাহা ভিন্ন অন্য কোন নাম বা নম্বর চলিবে না। নিম্নলিখিত সিডিউল্ অনুযায়ী নামকরণ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইবে।

(সিডিউল্)

পূর্ব্বনাম	নূতন আখ্যা
খয়রা	অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ ইলিশ ;
পুঁটি	সাব্ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইলিশ ;
বাগ্‌দা	সাব্ গল্‌দা ;
ঘুষো	অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব্ গল্‌দা ;
রয়না	ডেপুটী কই ;
খল্‌সে	সাব্ ডেপুটী কই ;
পায়্‌সে	অ্যাডিসন্যাল্ মিরগেল ;
ভোলা	ডেপুটী ভেট্‌কী ;
বেলে	সাব্ ডেপুটী ভেট্‌কী ;

মন্তব্য—(ক) অত্র সিডিউল সম্পূর্ণ নহে। আবশ্যক ও বিচার অনুযায়ী এ্যাসোসিয়েসন্ ক্রমে ইহাতে আরও নূতন নামকরণ যোগ করিতে পারিবেন।

(খ) সাহেব ও অন্যান্য অভিজাত শ্রেণীর ভোগ্য বলিয়া তপ্‌সে জুনিয়ার ফিশ্ এ্যাসোসিয়েসনের সভ্য হইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে তিনি সিনিয়ার এ্যাসোসিয়েসনের সভ্য হইবেন। পূর্ব্বে তিনি তামাক খাওয়ার সময় ব্যতীত সর্ব্বদাই সিনিয়ারদিগের ঘরে বসিতেন ও নাম সই করিয়া M.Sc., B.L. লিখিতেন। শীঘ্রই তিনি তাঁহার মত ও অভ্যাস পরিবর্ত্তন না করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে disciplinary action লওয়া হইবে সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

এই ব্যবস্থায় আমাদের অবশ্য কিছু বলিবার নাই। ইভলুসন বা ক্রমবিকাশের নিয়মই এই যে এক ক্রমে বহু হয়। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি এবং আধুনিক বিজ্ঞান উভয়েই এ বিষয়ে একমত। বাইবেল বলেন—In the beginning there was darkness, অর্থাৎ আলো গোড়ায় ছিল না, উহা পরেকার সৃষ্টি। হিন্দুশাস্ত্র বলেন—পরমেশ্বরই বহু হইয়া ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকাশ ও তাহা হইতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিতে হইলে বলা যাইতে পারে, যেমন বৃটিস্ এম্পায়ার হইতে ডোমিনিয়ন ও কমন্‌ওয়েল্‌থ্ ফ্যাকড়াগুলি ; যেমন All-Bengal Teachers' Association হইতে All-Bengal College Teachers' Association ; Indian National congress হইতে Liberal Federation, Muslim League ও হিন্দু মহাসভা ; All-Bengal students' Federation হইতে Muslim students' Federation (ইহার পর Scheduled caste students' Federation, Girl students' Federationও হইবে আশা করা যায় ; এমন কি Primary school students Federation প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'গান্ধী মহালাদ্ কি দয়'—স্লোগানে রাস্তা-ঘাট মুখরিত হইতেও পারে)। এবং ইহাও সত্য যে এক বহু হইয়া পরস্পরের মধ্যে যে দন্ত-নখর প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দেয়, তাহারই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, শিক্ষা, যুদ্ধবিদ্যা, রসতত্ত্ব, যৌনতত্ত্ব ইত্যাদির জন্ম ও ক্রমোন্নতি লাভ করে এবং জগৎ সভ্যতার পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে থাকে। আমরা সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে আসুন সকলে মিলিয়া সমস্বরে একবার বলি—All Bengal Junior Fish Association কি—জয়।

কংগ্রেস-লীগ সংগ্রামের পটভূমিকা

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

পরিবর্তনশীল আমাদের এই পৃথিবী। মহাকালের যাত্রাপথে আমাদের সমাজও অহর্নিশ বদলে যাচ্ছে। স্থির ও নিশ্চল হয়ে কিছুই নেই এখানে। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে সুরু করে সব কিছুই দিবারাত্র ছুটে চলেছে। এর পিছনে রয়েছে বিরোধী শক্তির অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বই যুগে-যুগে মানুষের সমাজকে বিবর্তন বা বিপ্লবের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। আজকের দিনে ভারতবর্ষের রংগমঞ্চে কংগ্রেস-লীগ সংগ্রামের যে মূর্তি প্রকটিত, তাও সামাজিক শক্তিগুলির দ্বন্দ্বের পরিণতি-মাত্র। আপাতদৃষ্টিতে বুঝি মনে হয় এই অভূতপূর্ব বিরোধেরমূর্তি আকস্মিক ঘটনামাত্র বা ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীতে অনুষ্ঠিত; কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানী জানে এর মূলে রয়েছে বিপুল আর্থিক সংঘাত। বিষয়টা বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন ভেঙে ফেলার সংকল্প ও দেশের বুকে স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের আকাঙ্ক্ষা এর ভেতর পাওয়া যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সংগঠিত হলো "নিখিল ভারত কংগ্রেস"। ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে কংগ্রেস নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দেশের ভিতর বিবর্তিত হয়ে উঠেছে। এদিকে দেশের বুকে একটা খুব প্রকাণ্ড ধরণের বুর্জোয়া (অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ও পুঁজিপতি) শ্রেণীও গড়ে উঠেছে। কংগ্রেস হলো মোটের উপর এই বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সাম্যবাদী ইত্যাদি বিচিত্র ধরণের উপাদান কংগ্রেসের ভিতর থাকলেও, বুর্জোয়া কর্তৃত্ব এবং পরিচালনাই এতে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড। কাজেই জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসকে বুর্জোয়া সংঘ আখ্যা দিলে আদৌ অসমীচীন হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী নীতির সংগে দেশোদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীর আর্থিক নীতির অন্তর্বিরোধ অতি সাংঘাতিক। তাই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার সংকল্প জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া কংগ্রেসের সবচেয়ে বেশী প্রবল। এই প্রসংগে একথা সকলেরই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই বুর্জোয়া কংগ্রেস বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংঘ। শ্রমিক আন্দোলন বা কমিউনিজিমের মাপকাঠিতে বুর্জোয়া চালিত স্বাধীনতার আন্দোলন হয়তো অসম্পূর্ণ বা প্রতিক্রিয়াশীল; তবুও ঐতিহাসিক বিবর্তনের অন্যতম ধাপে (যেমন ভারতীয় সামন্ততন্ত্র এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আবহাওয়ায়) বুর্জোয়া স্বাধীনতার জাতীয় আন্দোলন নিশ্চয়ই প্রগতিশীল বা বিপ্লবাত্মক। ভারতের রাষ্ট্রিক রংগমঞ্চে বর্তমানে সেই বুর্জোয়া স্বাধীনতার আন্দোলন চলেছে। নেতৃত্ব করছে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। এই কংগ্রেস একদিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘ, আবার অন্যদিকে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের শক্তি-বিকাশ ও প্রতিষ্ঠানতাই সাম্রাজ্যবাদ বা সামন্ততন্ত্র,—কারো পক্ষেই কাম্য নয়। অথচ নিখিল ভারত কংগ্রেসের বহুবর্ষব্যাপী সাধনা ও সংগ্রামের ফলে দেশের ভিতর এক প্রকাণ্ড জাতীয়তাবাদী শক্তি গড়ে উঠেছে। আজাদ্-হিন্দ্ বাহিনীর বিচার উপলক্ষে এবং নেতাজীর তপস্যাপূতঃ স্মৃতিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী শক্তি আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। অর্থাৎ কংগ্রেসের পরিচালনায় আজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংহতিই সবচেয়ে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে এবং বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের দিকে অতিক্রত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। যুদ্ধোত্তর যুগের বিশ্বজোড়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সাম্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার বিপুল শক্তির বিকাশ ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তি-অভিযানেও প্রচণ্ড প্রেরণা যোগাচ্ছে।

অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে। ১৯৩৯ সনের ইংল্যাণ্ড আজ ১৯৪৬ সনে আর সেই পুরাণো অবস্থায় নেই। আজকের ইংল্যাণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ ঘরবাড়ী ভস্মীভূত বা ভগ্নস্তূপে পরিণত। ইজিপ্ট এবং কানাডা-অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডোমিনিয়ান থেকে ব্রিটিশ পুঁজি (British Capital) আংশিক বা সমগ্রভাবে অপসারিত। তাছাড়া, নানাদেশের শ্রমিক-আন্দোলন ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়ার কল্পনাতীত সামরিক শক্তির বিকাশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে নিদারুণভাবে কম্পিত করে তুলেছে। সেই আসন্ন ধ্বংসের কবল থেকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে নিরুপায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সংগে সজ্ঞানে-অজ্ঞানে চক্রান্ত করে চলেছে। ভারতবর্ষে মুস্লিম লীগের সংগে সজ্ঞান সহযোগিতা হলো এসবের মধ্যে অন্যতম দৃষ্টান্তমাত্র। এই সাম্রাজ্যবাদী-লীগ চক্রান্তের উদ্দেশ্য হলো ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে বিফল, পংগু ও ব্যর্থ করা। চক্রান্তের এই গুপ্ত রহস্য আজ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

মুস্লিম লীগের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হলো আসলে একটা ফিউডাল বা সামন্তসংঘ। একথা সত্য, এর গঠনে বহু ধরণের চিন্তা ও আদর্শস্রোত রয়েছে, তথাপি যে শক্তি একে অপ্রতিহতভাবে বর্তমানে শাসন করছে তা হলো এ যুগে অচল অথচ মধ্যযুগ থেকে বহন-করে-আনা জীর্ণ ফিউডাল শক্তি। লীগ নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নবাব, জমিদার ইত্যাদি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং সামন্ত শক্তির প্রতিনিধি। বর্তমানকালীন বিশ্বজগতের গণতন্ত্রের পথে দ্রুত অগ্রগতি এবং ভারতবর্ষের রংগমঞ্চে তার দিগন্তব্যাপী অভিযান সামন্ত শক্তিকে টলটলায়মান করে তুলেছে। ভারতের এই সন্ত্রস্ত ও ভীতি-বিহ্বল সামন্ত শক্তিই মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছে লীগের মধ্যে। যুদ্ধোত্তর

যুগের বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং সাম্যবাদের নিদারুণ চাপে লীগের অবস্থা পূর্ব্বেকার চেয়েও আজ শোচনীয়। প্রগতিশীল শক্তির আঘাতে সন্ত্রস্ত সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডের মতো মুস্‌লিম লীগও বর্তমানে মরীয়া হয়ে উঠেছে এবং পারস্পরিক স্বার্থে পরস্পরে হাত মিলিয়ে প্রগতিশীল শক্তিকে ভারতবর্ষের বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার আগ্রহে আজ ব্রতবদ্ধ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রগতি ধ্বংসের অভিযানে ইতিহাসে বারে বারে নেমেছে, আর বিশেষ করে যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে তাদের এই সমারোহ আরও বেড়ে গেছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের পটভূমিকায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সেই সংঘবদ্ধ অভিনয় চলেছে। এতে গভীর বেদনার কারণ থাকলেও ঐতিহাসিক বিচারে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

আজ এই যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রত্যেক আদর্শবাদী তরুণ-তরুণীর সংঘবদ্ধ হয়ে কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সকলের আগে পাড়ায়-পাড়ায় গড়ে তুলতে হবে শান্তি সমিতি এবং রক্ষীবাহিনী। প্রথম সমিতির উদ্দেশ্য হবে, হিন্দু মুসলমান জনসাধারণের ভেতর গঠনমূলক কাজ করা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী লীগ চক্রান্তের শৃংখল থেকে তাদের মনকে মুক্ত করা এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং সামন্ততন্ত্র বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করা। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হবে, নিজের এলাকায় দাংগাহাংগামার পুনরভিনয় বন্ধ রাখা এবং চক্রান্তকারী বহিরাগত দলের আক্রমণ ব্যর্থ করা। এজন্য সর্ব প্রথমেই দরকার সাহস ও সংগঠন। সংগঠন ও সমবেত সাধনা ছাড়া বাঁচবার আর কোনো পথ নেই। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি যতটা পরিমাণে সংঘবদ্ধ, প্রগতিশীল ও বিপ্লবাত্মক শক্তিগুলিকে তার চেয়েও বেশী সংঘবদ্ধ করার ঐতিহাসিক প্রয়োজন আজ এসেছে। আজও যদি আমরা সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা করি, তবে চক্রান্তকারী দলগুলি আমাদের বিপুল চাপে ভেঙে পড়তে বাধ্য; আর যদি আজও আমরা সংঘবদ্ধ না হয়ে ব্যক্তিগত নিরাপদ আরামের অভ্যস্ত সহজ পথকেই বেছে নিই, তবে ষড়যন্ত্রকারীদের দারুণ চাপে আমরাই হয়ে যাবো বিধ্বস্ত ও পরাজিত। অবস্থার এই কঠিন গুরুত্ব উপলব্ধির সময় আজও কি আমাদের আসে নি?

প্রমীলাসুন্দরীর প্রতি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তবস্তন শতদলে আজোকি রঞ্জিত দেবি! শরতের বালার্করাগ!
তব বিম্বাধর-সুধা পান করিবারে আজো আসে কোনো চিত্ত-চক্রবাক্?
তব মৃগ নয়নের ইন্দ্রজালে এখনো কি যৌবনের প্রেমের পথিক
ঘুরে মরে হারাইয়া দিক?
হে সুন্দরি! প্রমীলা আমার!
নয়নের অন্তরালে মম পেতেছ সংসার;
বন্দনার গীতিগুচ্ছ রেখে গেলে পিছে,
এ দুঃখ কহিব কারে? এ অন্তর মৃত প্রণয়ের সমাধির নীচে।
নাহি অপরাধ—নাহি তব অপরাধ—ভুলকরে' দুঃখ পাই নিজে।
একান্ত আপন ক'রে চেয়েছিলে প্রতিদিন বরণ করিতে মোরে
পরের ঘরণি!
মনের বাসনা তব ধরিতে পারিনি দেবি! ভাগ্যদোষে বিষাক্ত ধরণী।
ফাল্গুনের পুষ্পবনে
ভাবিনি স্বপনে
অন্তরের জাগাইবে ভাব
দক্ষিণের সমীরণে গানে গানে করি' রসালাপ।
চন্দ্রালোকে তন্দ্রাহারা রাতে
প্রেমের প্রপাতে
করিবে তোমার সিনান করাবে দেবি! কত অনুরাগে,
অভিসারে—মিলন সোহাগে!
অতনুর উপচার সাজাইয়া অলস মন্থরা!
এলে ত্বরা—বক্ষে মোর দিতে এলে ধরা—
তব অবগুণ্ঠনের সরম রক্তিম বাস ফেলে দিয়ে দূরে।
মম মনোহরণের প্রণয় কবিতা খানি শুনাইলে সুরে;
দেহ-দেউলের নগ্ন বক্ষে পারি নাই দিতে বহ্নধারা—
বিফলে ফুরালো রাত,
পারি নাই হে প্রমীলা, পুরাইতে তব সাধ,
এ'ল অবসাদ।
স্তব্ধ হয়ে' চেয়েছিল আকাশের লক্ষ লক্ষ তারা,
ব্যথাহত অভিমানে গেলে চলে রেখে অশ্রুধারা।
কোথা শান্তি! কোথ তৃপ্তি! হেরি আমি তবরূপ যেদিকেতে চাই,
চারুকরপল্লবের পেলব পরশ তব ভুলি নাই—আজো ভুলি নাই।
অতীতের স্মৃতি দীপ জ্বেলে দেবি! বসে আছি একা,
আলিঙ্গন দিতে মোরে দিবে নাকি দেখা!
হে সুন্দরী! প্রমীলা সুন্দরী! স্বর্গপরী সম তুমি,
এ শূন্য ভবন পথে আসিবে কি হৃদয় কুসুমি'?

শঙ্কর ও রামানুজ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

উপনিষদের যে ব্যাখ্যা বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত আছে তাহা শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা। শঙ্করাচার্য্য প্রধান উপনিষদগুলির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। রামানুজাচার্য্য সেরূপ করেন নাই বটে, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিবার সময় রামানুজ বিভিন্ন উপনিষদের প্রধান বাক্যসকল উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা অনেক স্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যা হইতে ভিন্ন এবং কতকগুলি ব্যাখ্যা আমার নিকট অধিকতর সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইয়াছে। রামানুজের সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ রামানুজের মত অনুসরণ করিয়া প্রধান প্রধান উপনিষদগুলির ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। রঙ্গরামানুজ কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন, নারায়ণ ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন, কূরনারায়ণ মাণ্ডুক্য উপনিষদের ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছেন। পুণার আনন্দাশ্রম হইতে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

শঙ্কর এবং রামানুজের ব্যাখ্যার প্রভেদ দেখাইবার জন্য আমি কয়েকটি উপনিষদ বাক্যের আলোচনা করিব।

ঈশোপনিষদের ৯ম ও ১১শ শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ :—

"যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করে। যাহারা বিদ্যাতে রত তাহারা আরও অন্ধকারে (প্রবেশ করে)" (৯) (ক)

"যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ের উপাসনা করে সে অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করে।" (১১) (খ)

শঙ্কর শ্লোক দুইটি এই ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—অবিদ্যা শব্দের অর্থ শাস্ত্র-বিহিত-কর্ম (যথা যজ্ঞ); বিদ্যা শব্দের অর্থ দেবতা-বিষয়ক-জ্ঞান, অমৃতত্ব অর্থাৎ স্বর্গ।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াংরতাঃ॥ ঈশ—৯
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥ ঈশ—১১

কোনও ব্যক্তির যদি দেবতাবিষয়ক জ্ঞান না থাকে, তিনি যদি কেবল যজ্ঞাদি কর্ম করেন তাহা হইলে তাঁহার ভাল গতি হয় না। অপর পক্ষে যদি তাঁহার দেবতাবিষয়ক জ্ঞান থাকে কিন্তু যজ্ঞাদি কর্ম করেন না, তাহা হইলে তাঁহার আরও মন্দ গতি হয়। দেবতাবিষয়ক জ্ঞানের সহিত যজ্ঞ করিলে সংসার অতিক্রম করিয়া স্বর্গে যাওয়া যায়। স্বর্গে দীর্ঘকাল থাকিতে পারা যায় বলিয়া ইহাকে অমৃত বলা হইয়াছে। এখানে মোক্ষ লাভের কথা হইতেছে না।

রামানুজ ব্রহ্ম সূত্র ১-১-১এর ভাষ্যে এই উপনিষদবাক্যগুলি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে এখানে মোক্ষ লাভের উপায়ই বলা হইয়াছে। অমৃতত্ব শব্দের যে মুখ্য অর্থ মোক্ষ তাহাই এখানে গ্রহণ করিতে হইবে, মুখ্য অর্থ ছাড়িয়া স্বর্গ এই গৌণ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক হইবে না। অবিদ্যা শব্দের অর্থ শাস্ত্রবিহিত কর্ম, এ বিষয়ে তিনি শঙ্করের সহিত একমত। কিন্তু বিদ্যা শব্দের অর্থ তিনি বলেন ব্রহ্ম জ্ঞান। তাঁহার মতে শ্লোক দুইটির অর্থ এইরূপ হইবে :—"যাহারা ব্রহ্ম-জ্ঞানের চর্চ্চা করে না, কেবল যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্ম করে, তাহারা অন্ধকার-ময় স্থানে যায়। যাহারা কেবল ব্রহ্ম জ্ঞানের চর্চ্চা করে, যজ্ঞাদি শাস্ত্রীয় কর্ম করে না, তাহারা আরও অন্ধকারে যায়।" (৯)

"যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত শাস্ত্রীয় কর্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন।" (১১)

কোনও কর্ম করিলে তাহার ফলে চিত্তে একটি সংস্কার উৎপন্ন হয়। ভাল কর্ম করিলে ভাল সংস্কার হয়, মন্দ কর্ম করিলে মন্দ সংস্কার হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে চিত্ত নির্মল করা প্রয়োজন, অর্থাৎ ভাল এবং মন্দ সকল সংস্কার চিত্ত হইতে দূর করা প্রয়োজন। শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল অনাসক্ত এবং নিষ্কাম ভাবে সম্পাদন করিলে চিত্ত নির্মল হয়, অর্থাৎ চিত্ত সকল প্রকার সংস্কার হইতে মুক্ত হয়। এ জন্য শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা মনীষী ব্যক্তিদের (যাঁহারা কর্মের ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না তাঁহাদের) চিত্ত শুদ্ধ করে।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং। গীতা—১৮।৫

কর্মফল ভোগ করিতে হয় বলিয়া আমাদিগকে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যদি কর্মজনিত সকল সংস্কার দূর হয়, যদি আর কর্মফল ভোগ করিতে না হয়, তাহা হইলে আর মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে হইবে না। সৎকর্ম নিষ্কামভাবে করিবার ফলে আর মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন, "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা"। ব্রহ্ম উপাসনা না করিয়া কেবল সৎকর্ম করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়, কিন্তু স্বর্গ ভোগের পর পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, জন্মগ্রহণ করিলেই অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন হইতে হয়, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, যাহারা কেবল কর্ম করে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, যাহাদের ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের উপযোগিতা নাই, তাহারা কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্ম-জ্ঞানের চর্চা করিলে কোনও সুফল হয় না। কেবল-কর্ম-কারী তবুও কিছুদিন স্বর্গসুখ ভোগ করেন। কেবল জ্ঞান-সাধকের তাহাও হয় না। প্রত্যুত বিহিত কর্ম অবহেলা করিবার ফলে তাহাকে নরকে যাইতে হয়।

এ জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে কর্ম অবহেলা করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানের সাধনা করে তাহাদিগের গতি কেবল-কর্ম-কারীর গতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নিম্নলিখিত কারণগুলি হইতে মনে হয় এ স্থলে শঙ্করের ব্যাখ্যা অপেক্ষা রামানুজের ব্যাখ্যা শ্রেষ্ঠ :—

(১) অমৃতত্ব শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেছে ব্রহ্মলাভ বা মোক্ষ। কারণ মোক্ষ লাভ করিলেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। স্বর্গলাভ করিলে কিছুকাল পুনর্জন্ম (এবং মৃত্যু) বন্ধ থাকে, কিন্তু পরে আবার জন্ম মৃত্যুর প্রবাহে পতিত হইতে হয়। এ জন্য অমৃতত্ব শব্দের মুখ্য অর্থ স্বর্গলাভ হইতে পারে না। ইহা গৌণ অর্থ। শঙ্করের ব্যাখ্যায় শব্দটির মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

(২) শঙ্কর ৯ম শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন এই শ্লোকের উদ্দেশ্য এই যে, দেবতাবিষয়ক জ্ঞানের সহিত যজ্ঞাদি কর্ম করা উচিত। কেবল যজ্ঞাদি কর্মের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নহে। কেবল দেবতাবিষয়ক জ্ঞানের নিন্দা করাও উদ্দেশ্য নহে। কারণ শ্রুতি অন্যত্র বলিয়াছেন যে কেবল যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা পিতৃলোক যাওয়া যায়।

কর্মণা পিতৃলোকঃ

এবং কেবল দেবতাবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা দেবলোক যাওয়া যায়।

বিদ্যয়া দেবলোকঃ

সুতরাং শঙ্করের ব্যাখ্যা হইতে ইহা বোঝা যায় না—কেন শ্রুতি বলিলেন যে যিনি কেবল বিদ্যার চর্চা করেন তাঁহার গতি—যিনি কেবল কর্ম করেন তাঁহার গতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। রামানুজের ব্যাখ্যা হইতে ইহা বোঝা যায়। কারণ রামানুজের মতে এখানে কেবল-কর্মের অর্থ ব্রহ্মকে উপাসনা না করিয়া কেবল শাস্ত্রীয় কর্ম করা এবং তাহার ফল স্বর্গ, এবং কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থ যে ব্যক্তির ব্রহ্ম জ্ঞান লাভের উপযোগিতা নাই তাঁহার কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিয়া কেবল ব্রহ্ম জ্ঞানের চর্চা (যথা কোনও ব্যক্তি অবৈধ বিষয় সুখে লিপ্ত হইয়াও উপনিষদের চর্চা করেন—অথচ সক্ষম হইয়াও পিতার দুঃখ দূর করেন না)। ইহা বোঝা দুরূহ হয় না—এক্ষেত্রে কেবল-কর্ম-কারী ব্যক্তি অপেক্ষা কেবল ব্রহ্মজ্ঞান-চর্চা-কারী ব্যক্তির গতি নিকৃষ্ট হইবে।

(৩) ইহা বলা যায় না যে এখানে রামানুজ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তাঁহার সম্প্রদায়েরই (শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই) মত। বস্তুতঃ এই মত সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন। মতটি এই যে শাস্ত্রীয় কর্ম নিষ্কাম ভাবে সম্পাদন করিয়া অগ্রে চিত্ত শুদ্ধ করিতে হইবে, পরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব। শঙ্করাচার্য্যও এই মত অনেক স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে আমরা শঙ্করের উপনিষদ্ ভাষ্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—"যতক্ষণ না ব্রহ্মজ্ঞান হয় ততক্ষণ নিয়ম পূর্বক শ্রুতি ও স্মৃতি বিহিত কর্ম সকল অনুষ্ঠান করা উচিত, ইহা দোষ কাটাইবার উপায়। দোষ দূর হইলে এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান আবির্ভাব হয়। স্মৃতি গ্রন্থে আছে—তপস্যার দ্বারা পাপ বিনষ্ট করা হয় এবং বিদ্যার দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়। এ জন্য বিদ্যা উৎপত্তির জন্য কর্ম করা প্রয়োজন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পর কর্মের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।"

> প্রাগ্ ব্রহ্মাত্ম বিজ্ঞানাৎ নিয়মেন কর্তব্যানি
> শ্রৌত স্মার্তানি কর্মাণি। * * পুরুষ সংস্কারার্থত্বাৎ।
> সংস্কৃতস্য হি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্যাত্মজ্ঞানমঞ্জসেবো-
> পজায়তে। "তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃত—
> মশ্নুতে" ইতি হি স্মৃতিঃ। * * অতো
> বিদ্যোৎপত্ত্যর্থমনুষ্ঠেয়ানি কর্মাণি। * * উদিতায়াং
> হি ব্রহ্মবিদ্যায়াম্ কর্মনৈষ্কিঞ্চন্যং
> দর্শয়িষ্যতি। * * মন্ত্রবর্ণাচ্চ "অবিদ্যয়া মৃত্যুং
> তীর্ত্বা বিদ্যয়া ঽমৃতমশ্নুতে" ইতি।

বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই প্রসঙ্গে শঙ্কর এই শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই স্থলে শঙ্কর এই বাক্যটি মোক্ষ লাভের উপায় প্রতিপাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (অর্থাৎ রামানুজের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন) কিন্তু ঈশোপনিষদ ব্যাখ্যা করিবার সময় ইহা দেবত্ব লাভের উপায় বলিয়াছেন।

(৪) রামানুজ শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন। শ্রুতি বাক্য,—যথা, "ধর্ম কর্ম দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়।"

ধর্মেন পাপম্ অপনুদতি

পুনশ্চ "ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান ও তপস্যার দ্বারা এই ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করেন।"

> তমেতং ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন
> তপসা অনাশকেন

স্মৃতিবাক্য, যথা, "(রাজা জনক) জ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যা আশ্রয় করিয়া বহু যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন,—তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল কর্ম দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করা।"

> ইয়াজ যজ্ঞান্ সুবহূন্ সোঽপি জ্ঞান ব্যপাশ্রয়ঃ।
> ব্রহ্মবিদ্যামধিষ্ঠায় তর্তুং মৃত্যুমবিদ্যয়া॥

বিষ্ণুপুরাণ ৬।৬।১২

পুনশ্চ "যজ্ঞ, দান ও তপস্যা মণীষিগণের চিত্ত শুদ্ধ করে।"

> যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং

গীতা ১৮।৫

এই সকল কারণে বোধহয় যে এই উপনিষদ্ বাক্যের রামানুজ কৃত ব্যাখ্যা শঙ্কর কৃত ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিক সন্তোষজনক হইয়াছে।

অপর যে সকল উপনিষদ বাক্যের ব্যাখ্যায় শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে মতভেদ আছে, বারান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই গল্পের শেষ

শ্রীপ্রভাতদেব সরকার

এখন অবশ্য আপনাদের একটু সজাগ হ'য়েই চলা ফেরা ক'রতে হ'বে। পায়ে পায়ে না জড়ালেও আপনার বাড়ী থেকে গাড়ী ঘোড়ার রাস্তার মাঝ পথে এক জায়গায় না এক জায়গায় এদের সাক্ষাৎ আপনি পাবেনই। আপনার চোখ্‌কে ফাঁকি দেবার মত জায়গায় এরা এখনো সরে যায় নি।

রাস্তার মোড়ে বেরিয়ে এলে ডান হাতি পান বিড়ির দোকানটা পড়ে, তার পর মল্লিকদের নোনা লাগা একটা আস্তাবল—এখন অবশ্য সেখানে ঘোড়া থাকে না, উটকো মানুষজন বাসা বেঁধেচে—সেটাও বাঁ হাতি ফেলে এগিয়ে এলে দেখা যায় একফালি বেওয়ারিশ জমি··· গত দশ পনের বছর ধরে এমনি পড়ে আছে: এখানে ওখানে স্লিট ট্রেঞ্চ এঁকে বেঁকে তার বুক জুড়ে রয়েচে, আর আছে দুর্ভিক্ষের পঙ্গপালের সাময়িক নীড় বাঁধার কিছু কিছু চিহ্ন। গোটা দুই ভুসো-পড়া মেটে হাঁড়ি, টিনের তেড়াবেঁকা কৌটা, ছেঁড়া গোড়া ধুলি বালি কাদায় কিছুটা গলিত মাদুরের ঝরে পড়া কাটি কতকগুলো।

জমিটার দু'পাশে পাঁচিলের মত পাকা ইমারত খাড়া আছে। একদিকে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে দৃষ্টির সিধে পথে একটা খাটাল—গোটা দুই মহিষ ও গুটিচার গরু।

এদের আস্তানাটা ঐ খাটালের গা ঘেঁসে—পাকা ইমারত একটার কোণ নিয়ে। কাকের বাসার মত যেমন তেমন করে' মাথাটা চাপা দেওয়া—ছেঁড়া কাগজের টুকরো, জুতোর বাক্স, ছেড়া পিজবোর্ড, অব্যবহার্য্য চটাওঠা ওয়েল-ক্লথের টুকরো, মরচে পড়া টিনের টুকরো, ছেঁড়া জুতোর শুকতলা!

রাস্তার ওপর থেকে আপনি স্বচ্ছন্দে দেখতে পাবেন এদের বেআব্রু গৃহস্থালীর মাঝখানে বসে পুরুষটা হয় হুকো নিয়ে রাস্তার দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে' চেয়ে আছে। নয় তো ছেঁড়া চটের ওপর চিৎ হ'য়ে শুয়ে বুকে হাত দিয়ে মাথার ওপর ছাউনিটার ছিদ্র পথে ওপারের আকাশের ইঙ্গিত-রহস্যটা কখনো বা চোখ বুজে কখনো চোখ খুলে বুঝতে চেষ্টা করচে।

এ সংসারের ঘরণী, যে যামিনী রায়ের ছবির মত ভোঁতা মার্কা—কালো কোলো গোল গাল আঁট সাঁট চেহারা এক মনে ইট পাতা উনুনে কুটোর জ্বাল যুগিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে হলদে ধোঁয়া খাচ্চে আর চোখ মুছচে। ছেলে দুটো দৃশ্যতঃ এদেরই বংশধর, ট্রেঞ্চের ধারে বসে ধুলো নিয়ে রান্না বাড়া করচে। খাটালে বাঁধা গরুগুলো বেড়ার ফাঁকে ঘাড় গলিয়ে এদের লক্ষ্য করচে—মাথা নাড়চে, ল্যাজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্চে।

শুয়ে শুয়েই পুরুষটা বললে, ছেড়ে দেনা—আপ্‌নি জ্বলবে'খন। চোকটাকে খাবি শেষে?

মেয়েটা কোন কথার জবাব দিলে না। দপ্‌ করে' আগুন জ্বলে উঠল।

হুকো হাতে করে' রতিকান্ত উঠে এসে উনুনের ধারে বসল। কল্‌কেতে আগুন তুলে জিগ্যেস করলে, আচ্ছা চপলা, এমনি ধারা সংসার তুই কদ্দিন কচ্চিস?

—কে জানে, কে তার হিসেব রেকেচে!

—তবু একটা আন্দাজ আছে তো!

—জনম ভোর। তা কুড়ি তিরিশ বছর হ'বে।

রতিকান্ত আঁৎকে ওঠে, যেন অবিশ্বাস্য কিছু একটা শুনে ফেললে: বলিস্‌ কি, এদ্দিন? এই এমনি ধারা ধোঁয়া খেয়ে উনুন ঠাঙাচ্চিস্‌! ভাল লাগে তোর?

হঠাৎ চপলা মুখ ফিরিয়ে রতিকান্তর মুখের ওপর চেয়ে ভাবে, মদ্দটা বলে কি! এ কথা আবার জিগ্যেস ক'রতে হয় নাকি! মুখে ব'ললে, না লাগলে করচি কি!—ছাড়চে কে?

রতিকান্ত হাপরের মত শ্বাস টেনে টেনেও হুকোর গা থেকে এক ছিটে ফোঁটা ধোঁয়া বার ক'রতে পারলে না। মাথা নেড়ে বললে, তা বটে!

—অতো কষ্ট করেও তোমার তামাক খেতে ইচ্ছে হয়? বলে, চপলা হেসে ফেললে।

রতিকান্ত কল্কের আগুন খুঁচিয়ে দিতে দিতে বললে, শালার আগুন আর ধরে না! টেনে টেনে বুকে ব্যথা ধরে গেল!

চপলা মুখ টিপে বললে, অতো কষ্টের তামাক নাই বা খেলে! ভালোও লাগে?

এতক্ষণে রতিকান্তর খেয়াল হ'ল চপলা তাকে ডিঙ্গিয়ে গেচে। চপলাকে ঠেলে দিয়ে বললে, নাঃ, তোর বুদ্ধি আছে স্বীকার করি! কিন্তু—

হঠাৎ চোখ দুটো বুজিয়ে বল্‌লে, একটা বড্ড দামী কথা বলে ফেলেচিস্‌। উঃ বড্ড ভারি কথা!

ঠেলা সামলে নিয়ে চপলা বললে, আঃ ঠেল কেন—উনুনে পড়ে যাব যে! পাগল হ'লে নাকি!

আচ্ছা, নেশা ছাড়া যায় না ইচ্ছে করলে? বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে রতিকান্ত জিগ্যেস করলে।

কেন যাবে না, কি আর শক্ত! তাচ্ছিল্যের স্বরে চপলা বললে।

তা হ'লে কিনা আগে তোর ঐ উনুনে জল ঢেলে দে, আর আমি হুকোটাকে আছাড় মেরে ভেঙ্গে দিই। দেখ্‌, পারি কি না—

বলেই হুকোটা আছাড় দেবার ভঙ্গিতে উঁচিয়ে ধ'রলে।

বাধা দিয়ে চপলা বললে, যাক্, ঢের হ'য়েচে !—হার স্বীকার ক'রচি।

তারপর সপ্রশংস দৃষ্টিতে রতিকান্তর দিকে চেয়ে চপলার মনে হয় লোকটার কি বুদ্ধি! আর একজনের কথাও ঐ সঙ্গে মনে হয়, তার মৃত স্বামীর কথা। দুর্ভিক্ষের প্রথম চোটেই মারা গেল বোকার মত—এতটুকু বুদ্ধি খাটালে না! শহরে এসে ভাল মানুষের মত মেগে খেতে গিয়েই মারা পড়লো। ক্ষিদে পেলে বোবা হ'য়ে যেত—চোখ বেয়ে জল গড়াত, মুখে কথা ফুটতো না বেচারার। আর এই রতিকান্ত? অতো আভাস্তরের মধ্যে কেমন ডাঁটো হ'য়ে আছে দেখ না। সঙ্গীরা বলতো রতিকান্ত চোর! তা হোক সে বুদ্ধিমান, ফিকিরে। পুরুষ মানুষ অমন চোর হয় হুঁ! অতো সাধুগিরির কাল নয় এটা।

চোখের ওপর স্বামীর মৃত্যুর ছবিটা ভেসে ওঠে; ফুটের ওপর চিৎ হ'য়ে পড়ে, চোখ দুটোকে উল্টে আকাশ পানে চেয়ে দু'চারটে খাবি খেয়েই শেষ হ'য়ে গেল। এত আকস্মিক যে চপলা ভাল করে' কাঁদতে পর্য্যন্ত পারলে না। খাওয়া ছেড়ে উঠে আসতে না আসতেই সরকারী সৎকার-গাড়ীখানা হুস্ করে' বেরিয়ে গেল। এঁটো হাতে গাড়ীটার পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে যেতে যেতে দেখলে ফুটের একমাথায় বসে' রতিকান্ত হুঁকো হাতে তার দিকে কেমন করে' চেয়ে আছে যেন। মরা স্বামীর পাওনা কান্নাটা গলায় আটকে গেল। চপলা ফিরে এসে রতিকান্তের দিকে পিছন করে' বসলে—মনে মনে লোকটাকে শাপান্ত ক'রলে। একবার পিছন ফিরে দেখলে, রতিকান্ত হাসচে। হাসির আঁচে চপলার গা জ্বলে গেল—মরণ মিনষের!

ক'দিন পরে জাল-ছেঁড়া মাছের মত ঘুরতে ঘুরতে দুজনের আবার দেখা সাক্ষাৎ হ'তে রতিকান্ত জিগোস ক'রলে তুই যে গেলিনে বড়—দলের সবাই গেল?

চপলা বললে, আমার ইচ্ছা। গেলেই হ'লো অমনি, কোথাকে যাব শুনি! কোন চুলোটা আছে?

বিজ্ঞের মত রতিকান্ত বললে, কেন সরকারের আস্তানায়?—তোফা থাকতিস খেতিস-দেতিস্।

চপলা জবাব দিলে, তবে তুমি যাও নাই কেন? তোমারেও তো বাদ দেয় নাই!

হেসে রতিকান্ত বললে, ঘরামির কাজ করি আমি—আমার ফিরে গিয়ে লাভ! দেশ-গাঁয়ে কি ঘর আছে যে ঘর ছাইবো!

আমারও বুঝি সব আছে, না? চাষার মেয়ে গতর খাটিয়ে খাব, কাজ নাই অমন সরকারী আদরে!

চপলার মেজাজে রতিকান্ত মুগ্ধ হ'য়ে গেল, কুঁড়ে মানুষের বুদ্ধি এমনি—একটা কাজের মানুষকে আশ্রয় করে থাকতে চায়। আর মেয়ে মানুষের গতর পুরুষের আওতা না পেলে তেমন খোলে না।

এদিকে রতিকান্ত ভাবচে নেশার কথা।

চপলা কেমন বুঝিয়ে দিলে জলের মত; রান্না খাওয়াটা নেশা, আবার তামাক খাওয়াটাও নেশা। ছাড়তে পারলে দুটোই ছাড়া যায় অক্লেশে, নয়তো কোনটাই ছাড়া যায় না। দূর, তা কেন? ভাত না খেয়ে থাকা যায় যেন? অতোগুলা লোক অমনিই মরে গেল কিনা মজা করতে!! কিন্তু তামাক না-খেলেও তো চলে না—পেট ফোলে, হাই ওঠে—শরীরে আর পদার্থ থাকে না। দুটোই সমান নেশা। ও লোক-গুলোর মড়ক লেগেছিল, মরবে না তো কি?

হুঁকোর গা থেকে বস্ বস্ করে' ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। পাজি নেশাগুলো যদি ছাড়া যেত! ভাবলে রতিকান্ত, কে কার ধার ধারতো তাহলে।

আড়চোখে চেয়ে দেখলে, চপলা ভাতের হাঁড়ির কানা ধরে ফেন গালচে। শাদা পুঁযের মত ঘন ফেন—লোকগুলো যদি বেঁচে থাকতো খেয়ে বাঁচতো!

হঠাৎ রতিকান্ত হুঁকো ফেড়ে একটা বাটি হাতে উঠে এল। বললে, উঁহুঁ ফেন টোকা ফেলে দিস্ না—আমায় দে।

চপলা একবার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে বাটিতে ফেনটা ঢেলে দিলে।

ফেনের বাটিটা মুখের কাছে তুলে রতিকান্ত বললে, জানিস্ উরি মধ্যি আমাদের জানটা আছে—তুই ফেলে দিচ্ছিলি আমার জানটা ধড়্ফড়্ কচ্ছিলো রে। বুকে হাত দিয়ে দেখ!

শেষ পর্য্যন্ত ফেন আর খাওয়া হয় না! বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুখ গলিয়ে একটা গরু বড় বড় চোখ বার করে' তার দিকে চেয়ে আছে। রতিকান্তর মনে পড়ে যায়; এই কিছুদিন আগে গেরস্থ বাড়ীর দরজার সামনে তারা টিনের বাটি হাতে অমনি করেই চেয়ে বসে থাকতো।

আহা, অবলা! খা তুই-ই খা! জানোয়ারগুলো ঠিক ঐ মানুষের মত অসহায়—ক্ষিদে পেলে ফ্যল ফ্যল করে' চেয়ে থাকে। মানুষের মত ওরাও কি ভগবতীর বাচ্চা? কে জানে!

দুপুর বেলাটা চপলার ভারি খারাপ লাগে, দেশে থেকে এসে অসহায়ের মত আহারের জন্যে রাস্তায় রাস্তায় টো-টো ক'রে ঘুরে এত খারাপ লাগতো না। এক এক সময় মনে হয়, দেশে ফিরে গেলে ভাল ক'রতো সে। এক একদিন আবার এমনিই মনটা হু-হু করে' ওঠে। আকাল খাওয়া গ্রামটা কি তাদের জীবনের মতই লণ্ডভণ্ড হয়ে গেচে! তার ভোরের আকাশের রঙ, কি সেই আগের মতই আছে? সন্ধ্যের আকাশ কি তাদের খিড়কির ঘাটে আগের মতই ছাওয়া করে' থাকে? পথের ধুলোয় গ্রাম-দেবতার পায়ের ছাপ পড়ে নাকি আজো!

ভাবনার পিঠে ভাবনা, একবার চৈত্রমাসে চপলাদের ঘর পুড়ে গিয়েছিল। অমন নিকোনা-মোছা ঘরগুলার আগুন খেয়ে কি ছিরিই না হ'য়েছিল। আগুন নিবতে কিছুতেই মনে ক'রতে পারলে না, এসব তাদেরই ঘরদোর—যেন কত দূরে আর কোথাও তারা এসে পড়েচে। তাদের গ্রামখানা সেই রকম হয়ে আছে নাকি?...ভোরের দিকে ঢেঁকীতে পাড় দেবার শব্দে গ্রামখানা কি আগের মতই মুখর হয়ে ওঠে?...কার সঙ্গেই বা কথা কইবে—আছেই বা কে! কথা-কওয়াবার লোক যারা

তারা তো শহরে এসে সাবাড় হ'য়ে গেল। বোবা গ্রামের বোল ফোটাবে কে ?

রতিকান্ত সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—রোজই রোজগারের ফন্দি-ফিকির করে। শহরবাসী কোন ভদ্রলোকের চাকর-বাকর দরকার হ'লে রাস্তা থেকে তার ডাক পড়ে। সব কথা ধৈর্য্য ধরে' শুনে রতিকান্ত বলে, তা আপনারা কত দিবেন ?

তুমিই বল না হে একটা, রফা করার সুরে গৃহস্বামী বলেন।

আর একবার করণীয় কাজগুলো আউড়ে নিয়ে রতিকান্ত বলে, আজ্ঞে ঐ বাসন-মাজা কাজটা পারবো না—উ কাজটা বাদ দেন। আর দশটা করে টাকা বেতন দেবেন না-হয়—পরাটাও দেবেন বছরে দুখানা কাপড়, একটা গামছা !

যত বোকা ভাবা যায় ততো বোকা নয় এরা। চোখ ছানাবড়া করে' গৃহস্বামী বলেন, বল কি হে ! না বাপু পথ দেখ… স্কাউনড্রেল সব, খেয়ে-দেয়ে তিলিয়ে গেচে !

পথ তার দেখাই ছিল—বলার অপেক্ষা। চাকরী না-হওয়ায় রতিকান্ত বিশেষ খুশীই হয়। মনে মনে বলে, হুঁ বুড়ো বয়েস আবার চাকরী। এখনো তো নাইন আছে ভাবনাটা কি !

চপলা দুটো বাসন-মাজার কাজ করে। রতিকান্ত দালালী করে' বেড়ায়। চপলার ইচ্ছে একটা ঢাকাঢুকি ঘর—মনের মত করে' সংসার সাজায়। বেদের মত হাটে বাজারে নরলোকের চোখের ওপর সংসার পাতা সরমে লাগে।

নিজে চেষ্টা করে' দেখে, রতিকান্তকেও তাড়া দেয়—যেমন তেমন একটা ঘর !

রতিকান্ত চপলার সখ দেখে হেসেই অস্থির বলে, গরীবের ঘোড়া-রোগ দেখ ! কেন এ ঘর তোর পসন্দ হয় না—এমন হাওয়া বাতাস খেলায় !

এই আবার ঘর ! রাজ্যের লোক নজর দিচ্চে, ছেঁড়া চটে সামনেটা ঘিরতে ঘিরতে চপলা বলে।

রতিকান্ত বলে, খেপেচিস্ তুই—মুখের কথা কিনা, ঘর পাওয়া অমনি সোজা—ইয়া ইয়া বাবুরা তাই হেরে যাচ্চে !

চপলা চুপ করে' যায়। ও লোকের সঙ্গে কে পেরে উঠবে। রোজগারের নাম নাই—বসে বসে থাকেন একটা উপকারও করতে পারে না, সাতবুড়ি কথা শিখে রেকেচেন ইদিকে !

চপলা অন্যপথ ধরে। বলে, বাবুরা কি বলছিল জান, যারা রাস্তাঘাটে ঘরকন্না করবে তাদের পুলিশে ধরে চালান দিবে।

ভয়ের কথা, ভয় পাওয়ার মত করেই বলতে হয়।

রতিকান্ত বিশেষ ভয় পায় বলে মনে হয় না। বলে, তুই ভুল শুনেচিস্। পুলিশের আর কাজ নাই—সে তারা আগে দিত এখন আর দেয় না। সেই যেরে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে ছোটা-ছুটি মনে পড়ে না !

তবুও খবরটার গুরুত্ব টেমে বাড়াতে চেষ্টা করে চপলা; ঠাট্টা নয়, মাইরি বলচি বাবুরা বলছিল—লাটসাহেব নাকি হুকুম দেবে আবার—যাকে সামনে পাবে চালান দেবে।

ফুৎকার দিয়ে রতিকান্ত বলে, ও শালা বাবুদের কথা বাদ দে;—দিলেই হ'লো অমনি, তাই দিক্না দেখি ভয়টা কি !

মানুষ ধরা গাড়ীটা যেন এ পাড়ায় ওপাড়ায় ঘোরাঘুরি ক'রচে, এমনি তর ভয় পেয়ে বলে, কাজ কি অতো হাঙ্গামে, একটা ঘর দেখে চলে গেলেই হয় !

এতক্ষণে রতিকান্ত বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। বলে, মেয়েমানুষের সব তাতেই ভয়। আগে থেকে চলে গেলে তোর চার হাত গজাবে। দেখগে যা, সব লোক অমনি ঘরে বাস করচে তোর কথায় !

কুঁড়ে লোককে বোঝান দায়—সব জেনে বসে আছে। চপলা রাগ করে' বলে, আমার কি, আমি গিয়ে বাবুদের বাড়ীতে থাকবো—সংসারে আমার গরজ ? বাবুরা বলে সাধ্য-সাধনা ক'রচে !

রতিকান্ত বলে, আর আমাকে বুঝি সাধচে না মনে করিস্ ! ইচ্ছে করে' যাচ্চি না তাই—এবেলা ওবেলা ডাকাডাকি ক'রচে, গিন্নীমা, কত্তাবাবা, কত্তার ছেলে, তেনার বৌ ! আর শুনচি খেতে দেবে, থাকতে দেবে পরতে দেবে আর মাইনা দেবে তা জানিস ! ভারি চাকরির গরম দেখাস্, অমন চাকরি আমি টেঁকে গুঁজে রাখি !

চপলা বলে, তাই করগে যাও—মোরোদ তো কত্তকের জানা আছে ! মেয়েমানুষের রোজগারে বসে' বসে' মদ্দমানুষে খায়—ঘেন্নার কথা !

রতিকান্তর পৌরুষে বোধ হয় আঘাত লাগে। টেনে টেনে বলে, ছুঁচোর গোলাম চাম্‌চিকে, তার দাম চোদ্দ সিকে !—তোর রোজগারের আমি ভরসা রাখি ? একটু থেমে বলে, বুঝিনা রে, দোসরা আদ্‌মী জুটেচে, আমার সঙ্গ ভাল লাগবে কেন !

চপলা ফেটে পড়ে—কেন জুটবে না, একশ'বার জুটবে—তোকে দেখে ভয় নাকি !

কাছে সরে এসে রতিকান্ত বলে, খবরদার তুই-তাকারি করিস্ না বলচি—একটা বিপরীত কাণ্ড হ'য়ে যাবে !

মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চপলা বলে, কেন মারবি না কি ? ক্ষেমতাটা দেখাই যাক—হুঁ মগের মল্লুক পেয়েচে !

চোখ বুজিয়ে ধাঁ করে' রতিকান্ত চপলার গালে এক চড় মেরে দৌড় মারলে।

ভয় পেয়ে ছেলে দুটো চেঁচামেচি করে মার কাছে সরে আসে—সঙ্গে সঙ্গে ঘা দুই চড় খেয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে থাকে।

দিন পাঁচেক পরে একদিন গভীর রাত্রে রতিকান্ত ডেরায় ফিরল। ঠিক সেই সময় পাকা ইমারতের একটীতে আলো জ্বলে উঠে থাকবে—তারই চোলাই করা আলোয় দূর থেকে রতিকান্ত দেখলে: চপলা ছেলে দুটোকে আঁকড়ে ধরে ঘুমুচ্চে, পথের ধারে নেড়ী কুত্তাগুলো এমনি করে বাসা আগলে পড়ে থাকে !

বিদ্যুৎ চমকের মত একটা চিন্তা রতিকান্তের মাথায় এল: সে যদি এই রতিকান্ত না-হ'য়ে আর কেউ হ'য়ে একটা কাণ্ড করে বসতো

তা হ'লে কে কি করতো ? ছেলেগুলো চেঁচাতো ? কুকুর বাচ্চা অমন চেঁচালে কার কি ! ওরা অমন কাঁদেই।

চপলার ঘরের জন্তে আগ্রহ এখন রতিকান্ত সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। আব্রু না থাকলে মেয়েমানুষের ইজ্জোত থাকে না—রাখাও যায় না !

চুপি সাড়ে রতিকান্ত একপাশে ধাপটি মেরে শুয়ে পড়লো।...

দুপুর বেলায় রতিকান্ত গায়ে পড়ে কথা বললে, কথা বলচিস্ না যে বড় !

চপলা চুপ করে' রইল—জবাব দিলে না। ভেবেছিলি আপদ গেচে, বাঁচা গেচে ! উত্তরের আশায় মুখের দিকে তাকায় রতিকান্ত।

তবুও চপলা উত্তর দেয় না।

রতিকান্ত উঠে আসে তার কাছ গোড়ায়। হাত দিয়ে চপলার মুখটা তুলে ধরে।

—আরে কাঁদিস্ যে, কি হ'লো আবার ! চপলা ফুঁপিয়ে উঠলো : গালটা এম্‌নি করে' দিলি কেন ?

মুখটাকে কাঁচুমাচু করে রতিকান্ত বলে, মাইরি বলচি দোষ হয়েচে—কিছু মনে করিস নি !

—না মনে করবে না বইকি।

—যাক্ যাক্, ও কথা ছাড়ান দে, কাজের কথা ক'। একটা ঘর দেখে এসেচি, যাবি দেখতে ?

রতিকান্ত অবাক হ'য়ে গেল, ঘরের জন্তে চপলা বিশেষ উৎসাহ দেখালে না। মুখে শুধু বললে, দেখি সময় ক'রতে পারি তো !

ইতিমধ্যে চপলার দুটো ছেলে একসঙ্গেই লরি চাপা পড়ে মারা গেল। অনেকদিন পরে চপলা কেঁদে ফুরোতে পারলে না। রতিকান্ত ভয় পেয়ে গেল—এমনি ধারা কাঁদতে সে চপলাকে কোনদিন দেখে নি, নানা ভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। তবু ও প্রবোধ মানে না—সময়ে অসময়ে ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে।

রতিকান্ত বলে, কেঁদে কি করবি বল—তুই তো আর ইচ্ছে করে' মারিস্‌নি তাদের ! মিলটারীদের ওপর কে কথা কইবে ? আমার কথা শোন, উঠে হেঁটে বেড়া সব ভুলে যাবি। হুঁ কত শোক খেলি তার ঠিক নাই, ঐ দুটো রক্তের ঢেলার জন্তে আবার ! কাঁদতে পারলে তো অমন তুচ্ছ কারণে জনমভোর কাঁদতে হয় !

এক সময় চপলা কান্না থামিয়ে চুপ করে' বসে থাকে। রতিকান্তর কথাগুলো কানে যায় কিনা কে জানে।

চপলাকে অন্তমনস্ক ক'রতে রতিকান্ত উঠে এসে তার পিছন দিকটায় বসে। টান মেরে চপলার চুলের গোছাগুলো পিঠময় ছড়িয়ে দিতে দিতে বলে, ইঃ দেখদিকি ক'দিনে চুলের কি ছিরিটা হ'য়েচে !

চপলার পিঠের শিরদাঁড়াটা হঠাৎ শির শির করে' ওঠে।

চপলার মাথাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে রতিকান্ত চুল চিরে চিরে উকুন বাছতে থাকে।

চপলার আরামই হয়। ঘাড়টাকে শক্ত করে' মাথাটাকে পিছন ঠেলে ধনুকের ডগের মত করে' ফেলে চুপটি করে' থাকে—নড়েও না চড়েও না।

উকুন বাছার আগ্রহ রতিকান্তর এত বেড়ে যায় যে চপলার চুলগুলো উলটানো ছাতার মত পিঠময় খেসিয়ে দেয়।—বটের ঝুরি নামার মত চুলগুলো নাকে-মুখে-পিঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রতিকান্ত যেন খেলা পেয়েচে।

যত আরামই লাগুক না কেন চপলার কিছুক্ষণ পরে মনে হয়, মদ্দমানুষে মেয়েমানুষের উকুন বাচবে ! কেন ? আর কম্ম নাই কিছু ! মেয়েমানুষের কাজ মদ্দ বেটা ছেলেকে মানায় না—ছি ! তাদের গেরামে ভিকিরী যুগীটা অমনি ধারা মেগের কন্না করতো—পা টিপে দিত কিনা কে জানে। মেয়েমানুষের মতন কথাও কইতো। রতিকান্তর কথাগুলো তেমনি সুরে বাজচে যেন। মদ্দটার আর পদার্থ নাই !

ভালমানুষ তবু ভাল, মেয়েমানুষের স্বভাবের মদ্দমানুষ মোটেই ভাল নয়। চপলা ভেবে দেখলে, এমনি একটা পুরুষকে আশ্রয় করে' লাভ নেই—পেঁকাটীর মত ভেঙ্গে পড়বে—কারণে অকারণে খেঁকি কুকুরের মত কামড়ে দেবে। এতদিন পরে চপলার নিজেকে ভারি অসহায় মনে হয়। ভেবে দেখলে, দুঃসময়ে তার মুখচাইবার আর কেউ নেই। আকাল পড়ে তাকে যা না ক'রতে পারলে এখন তাই হ'লো—'আপু বন্ধু' সব মরে গেচে, তার কেউ নাই !

মাথা চাড়া দিয়ে চপলা উঠে দাঁড়াল, ছি ছি পুরুষ মানুষে রাস্তার ওপর বসে মেয়ে মানুষের চুল খুলে উকুন বাচবে ! মাদী-মুখো মদ্দর ঘেন্না !

হঠাৎ রতিকান্ত ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না, আচমকা টানের চোটে হাতের মুঠোয় ক'গাছা চুল থেকে যায়।

চপলা কিছু বলে না। উঠে গিয়ে পিঠের কাপড় সামলে শুয়ে পড়ে।

ছেঁড়া চুলে গেরো দিতে দিতে রতিকান্ত ভাবে, মেয়েমানুষের স্বভাব মেঘ-রদ্দুরের মত—দণ্ডে দণ্ডে বদলাচ্চেন।

চপলা আজ কদিন ফেরেনি, রতিকান্ত এদিক ওদিক খোঁজ করে' দেখলে—কোন খবরই নেই। তা হ'লে মেয়েমানুষটা পালিয়ে গেল নাকি ? কিন্তু কেন ? কি অসুখটা হচ্ছিল তার ! তাই যাবি যাবি বলা-কওয়া করে' কোন যা, তা নয় লোককে আতান্তরে ফেলা ! আর যাবেই বা কোথায় ! দেখো গে যাও, জুটেচে কোন মানুষের সঙ্গে। দুদিন যাক, ফষ্টি-নষ্টি করুক তারপর লাথি খেয়ে ফিরে আসুক, শিক্ষা হোক ! এই দুদিন আগেও শোক হচ্চিল ! মেয়ে-মানুষ জাতটাকে বিশ্বাস নেই, ক্ষণে ক্ষণে নানানখানি ! ঢেরশিক্ষা হয়েচে, আর মেয়েমানুষের সংশ্রবে নয় বাবা। হারামজাদি বড্ড ভোগা দিয়েচে ! একবার হাতের কাছে পাইতো ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে' লাথি মেরে পিঠ ভেঙ্গে দিই—বুকের ওপর উঠে বসে' জিভটাকে টেনে বার করি।

মনের ইচ্ছেগুলো কিন্তু মনেই থেকে যায়—চপলা ভুলেও আর এরাস্তা

মাড়ায় না। সে রতিকান্তকে ত্যাগই করে' গেচে, পালিয়েচে। তবু আশা ছাড়ে না রতিকান্ত, সারাক্ষণ রাস্তার ওপর নজর ফেলে বসে থাকে।

এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল। রতিকান্ত সবে ঘুম থেকে উঠে তামাকের আয়োজন করচে। একখানা মস্ত গাড়ী জমিটার সামনে এসে দাঁড়াল—সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচ জন ভদ্রলোক নেমে এলেন। গজ ফিতে ফেলে জমিটাকে মাপ-জোপ ক'রতে লাগলেন। রতিকান্ত পিট্ পিট্ করে চেয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলে। ক্রমে ক্রমে বাবুরা ফিতে নিয়ে রতিকান্তর আস্তানার কাছে এগিয়ে এলেন। বাবুদের একজন রতিকান্তকে ধমকে জিজ্ঞেস করলেন, এই, এসব কার?

রতিকান্ত সহজে জবাব দিতে পারলে না। আম্‌তা আম্‌তা ক'রতে লাগলো।

—বাপের জমিদারী পেয়েচিস্ সব—সম্পত্তি খেলিয়ে বসেচিস্! এক্ষুণি সরিয়ে নে, না তো টান মেরে সব ফেলে দেবো!

সাহস করে রতিকান্ত চোখকান বুজিয়ে জিগ্যেস করলে, এখানে কি করবে বাবু আপনারা?

—তোমাদের শ্রাদ্ধ হবে। জায়গাটাকে করে' রেখেচে দেখ না! বেরো এখান থেকে।

বিনা খবরেই ইতিমধ্যে পাড়ার কয়েক জন পতিত জমিটার ওপর এসে জড় হ'য়েচেন। মাতব্বর গোছ একজন গদ গদ হ'য়ে জমির মালিককে জিগ্যেস করলেন, এদ্দিনে বুঝি গরীবের কথা মনে পড়লো! আমরা তো ভেবেছিলুম জমিটা আর কাউকে বেচেই দিয়েচেন।

জমির মালিক গোকুলবাবু সবিনয়ে বললেন, একরকম বিক্রীরই সামিল—জমি কিনেই কাৎ হ'য়ে পড়েছিলুম! যুদ্ধ্‌টা লেগে আর আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে যা হোক দু পয়সা হাতে এসেচে, তাই ভাবলুম সময় থাকতে একটা কিছু কুঁড়ে মত খাড়া করে নিই। লক্ষ্মী আবার বড়ই চঞ্চলা।

মাতব্বরটী বল্লেন, তা যা বলেচেন—মানবের দশ দশা—এই রাজা এই ফকির, এই ফকির এই রাজা! তা 'মেটিরিয়ল' যোগাড় করলেন কি করে'?

গোকুলবাবু অর্থপূর্ণ হেসে বল্লেন, সে ব্যবস্থা একটা করেচি।

পাড়ার আর পাঁচজন মনে মনে জমির মালিকের অর্থোপার্জ্জনের একটা মোটা অঙ্ক আন্দাজ করতে লাগলেন, আর মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে গোকুলবাবুর উন্মুক্ত সিগ্রেটের টিন থেকে সিগ্রেট নিয়ে মুখে পুরতে লাগলেন।

এদিকে রতিকান্তর তামাকটা ধরে নি—তার ওপর সকালবেলায় এই সব কাণ্ডকারখানা! এখন জিনিষপত্তর নিয়ে সে কোথায় যায়? মাগীটা যদি এখন থাকতো!—দেখ দেখি কি মুস্কিলে ফেল্লে!

চুপি সাড়ে উঠে এসে রতিকান্ত গোকুলবাবুর সামনে মাথা নীচু করে' দাঁড়াল। গোকুলবাবু সাগ্রহে জিগ্যেস করলেন, কি হে, কিছু বলবে না কি?

রতিকান্ত মাথা চুলকে ব'ললে, আজ্ঞে না, তামাকটা ধরচে না

মুচকি হেসে গোকুলবাবু বললেন, তাই একটা সিগ্রেট চাই? বুঝেচি। আচ্ছা, এই নাও।

উপস্থিত সকলে আপত্তি করে' উঠলেন: যত সব নুইসেন্স, ভাত জোটে না সিগ্রেট খাবার সখ!

গোকুলবাবু হাসতে লাগলেন। বললেন, দেখ তোমার ওগুলো আজ কি কালকের মধ্যে নিয়ে যেও—পরশু থেকে আমার লোকজন কাজ ক'রতে আসবে। বুঝলে?—

মাথা নেড়ে রতিকান্ত পিছন ফিরলে। গোকুলবাবু পিছু ডাকলেন, আর শোন, এই কটা টাকা তুমি রাখ—মালপত্তর সরাতে তো তোমার খরচ আছে! কিন্তু দেখ—কালকের মধ্যে যেন সব চলে যায়!

রতিকান্ত চালাটার ভিতর এসে চুপটি করে বসল। চপলাটা গিয়ে এস্তক কি খোয়ারটাই না হ'চ্চে! হারামজাদীর কি যে নষ্ট বুদ্ধি হলো!

ঘুরতে ঘুরতে গোকুলবাবু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে জমিটার এক মাথায় এসে দাঁড়ালেন। পায়ের কাছে মাটীর উপর কিসের একটা দাগ দেখে অন্যমনস্ক ভাবে জুতোর ডগা দিয়ে ঘসতে লাগলেন। অদ্ভুত দেখাচ্চে দাগটা—হলদেও না, লালও না—দুটো মিশিয়ে ফ্যাকাশে কেমনতর একটা রঙ।

কিসের দাগ বল দেখি? গোকুলবাবু সঙ্গের বিলেত-ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে জিগ্যেস করলেন।

ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ভাল করে' নিরীক্ষণ করে' বললেন, জমিটার এই জায়গাটা দিয়ে হিট্ এাবসর্ভ করেচে, তাই এই রকম রঙ্ খুলেচে।

একজন বললেন, জল বসে' বসে' এমনতারা হ'য়েচে। দেখচেন্ না পলিমাটির মত রঙ্!

—এত উঁচু জায়গায় জল বসবে কি করে'? একটা কিছু রহস্য আছে।

—বোধ হচ্চে কেউ লুকিয়ে পাঁটা ফাঁটা কেটে থাকবে। তারি সেই রক্ত, রোদ জল খেয়ে খেয়ে এমনি দাঁড়িয়েচে আর কি!

—কিন্তু আশ্চর্য্য রঙটা মাটির সঙ্গে একেবারে মিশে গেচে!

ইঞ্জিনীয়ার সাহেব পাণ্ডিত্য করে' বললেন, আল্‌ট্রা ও ইনফ্রারের কারসাজি—সূর্য্যের রঙ্‌টা মাটি চোলাই করে' নিয়েচে!

এ সকল ব্যাখ্যা গোকুলবাবুর কিন্তু মনঃপূত হ'ল না। হঠাৎ তাঁর মাথায় খেলে গেল, মাটির তলায় কোন মূল্যবান খনিজ পদার্থ নেই তো? থাকা বিচিত্র কি! তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে বাড়ী ফাঁদার প্ল্যান নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

দুর্ভিক্ষের দিনে দান খয়রাতী খিচুড়ী ভোগের কথা এঁরা কেউ মনে রাখেন নি—মনে রাখবারও কথা নয়। যে জানে সে ঐ দূরে সরে' বসে আছে। এঁদের দিকে চেয়ে ভাবচে এক চোট কাঁদবে কি না!

চপলা, আজকের দিনে তুই থাকলে পারতিস্!—এমনি করে' কি মানুষটাকে ছেড়ে চলে যেতে হয়!!

ভারতে জার্ম্মাণ বাণিজ্য প্রচেষ্টা*

অধ্যাপক শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম-এ

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, দিনেমার ও ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরা ভারতবর্ষে বাণিজ্যসূত্রে অধিকার ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতেছিল, তখন ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিগুলির ও দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ভারতের সহিত বিপুল লাভজনক বাণিজ্য এবং কামধেনুর সহিত তুলনীয় ভারতের অক্ষয় ভাণ্ডারের খ্যাতি সমগ্র ইউরোপকেই ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

ভৌগোলিক কারণে জার্ম্মানী বহির্বাণিজ্য এবং উপনিবেশ স্থাপন ব্যাপারে ফরাসী, ইংরাজ, ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতির তুলনায় অনগ্রসর। এই কারণে তাহারা সপ্তদশ শতাব্দীতে বহির্বাণিজ্যে ইউরোপীয় অন্যান্য জাতিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে পারে নাই। কিন্তু ফ্রেডরিক রাজগণের চেষ্টায় প্রুসিয়ার আভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি হইবার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে প্রুসিয়ার পক্ষ হইতে ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টা হয়। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মানীর Empden নগরের কতিপয় ধনী বণিক বঙ্গদেশের সহিত বাণিজ্য প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে এক কোম্পানী সংগঠন করেন। ইহার নামকরণ হয় The Bengalische Hendells Gessellschaft। ইহার দুই বৎসর পরে রাজকীয় সনদ লইয়া Royal Prussion Bengal Company স্থাপিত হয় এবং বাংলা দেশ অভিমুখে তাহাদের যাত্রা আরম্ভ হয়।

এদিকে ভারতবর্ষে যদ্যপি ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ইংরেজগণ হুগলী নদীর কূলে নিজ নিজ কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য চালাইতেছিলেন, তথাপি তাহাদের কাহারও আধিপত্য বিস্তার হয় নাই। তখনও তাঁহারা মোগল সম্রাট এবং বাঙ্গালার নবাবকে ভয় করিয়া চলিতে বাধ্য থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন ইহাদের পরস্পরের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং শত্রুতা ছিল। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে অপর এক ইউরোপীয় জাতিকে অবতীর্ণ দেখিয়া তাহারা স্বভাবতঃই জার্ম্মান কোম্পানীর প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লণ্ডনস্থ ডাইরেক্টরবর্গ কোম্পানীর কলিকাতার কাউন্সিলকে জার্ম্মাণ কোম্পানীর বাণিজ্য পোতের কলিকাতা আগমন সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন এবং কলিকাতার কাউন্সিল ও বিলাতের বোর্ড অব ডিরেক্টরসএর নিকট ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বরের এক পত্রে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে তাঁহারা তাঁহাদের কোম্পানীর Pilots, mates প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মচারীকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে তাঁহারা যেন জার্ম্মাণ বণিকগণকে কোনরূপ সাহায্যদানে বিরত থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় ইংরাজ ও ফরাসীগণ পরস্পর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিয়াও এ বিষয়ে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া মন্ত্রণা করিয়াছিলেন। চন্দননগরের ফরাসী ডিরেক্টর কলিকাতায় ইংরেজ কাউন্সিলকে ২৭এ আগষ্ট (১৭৫৪) এক পত্র লিখিয়া প্রতিশ্রুতিপ্রদান করিয়াছিলেন যে জার্ম্মাণগণের বাংলা দেশে অবস্থিতির বিরুদ্ধে তাঁহারা যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

মোগল সম্রাট এবং বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাও আর একদল ইউরোপীয়ের আগমনকে সুনজরে দেখিলেন না। ইউরোপীয়গণ সম্পর্কে তাঁহাদের আশঙ্কা এবং বিরক্তি ক্রমশঃই ন্যায্য কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলা বিরক্তি দমন না করিতে পারিয়া ইংরেজ কাউন্সিলে লিখিয়া জানাইলেন যে যদি এই জার্ম্মানগণ সত্য সত্যই বাংলায় পদার্পণ করে তাহা হইলে সমস্ত ইউরোপীয়গণের সর্ব্ববিধ বাণিজ্য তিনি বন্ধ করিয়া দিবেন। নবাবের সহিত ইংরেজগণের চিরবিরোধ থাকা সত্ত্বেও এই সময় তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য দেখা দিল। ইংরেজ কাউন্সিল নবাবকে লিখিয়া পাঠাইল যে জার্ম্মানগণ যাহাতে না আসিতে পারে তাহার চেষ্টা করা হইতেছে এবং যদি সত্যই তাহারা আসিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহারা হয় মগ্ন, নতুবা ভগ্ন বা বিনষ্ট হইবে ("either sunk, broken or destroyed")

অভ্যর্থনার এইরূপ আয়োজন হওয়া সত্ত্বেও Prince Henry of Prussia প্রভৃতি জার্ম্মাণ কোম্পানীর জাহাজগুলি বাংলা দেশে পৌঁছিল এবং তাহারা ফরাসী চন্দননগরের অনতিদূরে Fort Orleansএর এক মাইল দক্ষিণে কুঠী নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল। বিস্ময়ের বিষয় এই কুঠীর অধ্যক্ষ হইলেন John Young নামক একজন ইংরাজ। পরে ইনি ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছিলেন। নবাব খুব সম্ভব ইংরাজগণের উপর এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে ইহাদের বিরুদ্ধে তিনি জার্ম্মাণগণের সহায়তা লাভ করিবেন এই আশায় জার্ম্মাণ কোম্পানীকে কুঠী নির্ম্মাণ ও বাণিজ্য প্রচলনের জন্য সনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি না দিলেও আবাস গৃহ, গুদাম প্রভৃতি নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিবার সময় নবাব উক্ত কোম্পানীর নিকট হইতে ৫০০০৲ মুদ্রা আদায় করিয়া উক্ত অনুমতি দান করিয়াছিলেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ জার্ম্মাণ কোম্পানী চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিকূলতা ও অসহযোগের সম্মুখীন হইয়া বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়

* ১৯১৬ সালের Statesman পত্রিকার এক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। B. D. Basu রচিত Rise of the Christian Power in India দ্রষ্টব্য।

নাই। স্বদেশ হইতেও সুযোগ্য নায়ক ও রণসম্ভার এবং অর্থ সাহায্য না পাইয়া ক্রমশঃ তাহারা হীনবল হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদের প্রধান জাহাজ Prince Henry of Prussia কয়েক মাস পরে হুগলীর মোহানায় প্রবেশ পথে বিধ্বস্ত হইয়া পড়ায় স্বদেশের সহিত সংযোগ রক্ষা এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ব্যাঘাত হইল। ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লণ্ডনস্থ ডিরেক্টরবর্গ জার্ম্মানগণ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্ত থাকিতেন। তাঁহারা কলিকাতার কাউন্সিলে নির্দ্দেশ পাঠাইলেন যে কোম্পানী যেন জার্ম্মাণগণের সহিত কোনরূপ বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ না হয় এবং কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ যেন খাদ্য পানীয় দ্বারা সাহায্য ব্যতীত (assistance of water. provisions and real necessaries) অন্য কোন প্রকারে জার্ম্মাণগণকে কোন সাহায্য না করে। এই ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া জার্ম্মাণ কোম্পানী অবশেষে পাততাড়ি গুটাইতে বাধ্য হয়। John Young নামক জার্ম্মাণ কোম্পানীর ইংরাজ অধ্যক্ষ উহার সংশ্রব পরিত্যাগ করেন এবং ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২১এ আগষ্ট এক পত্র লিখিয়া রয়াল প্রুসিয়ান বেঙ্গল কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। এই ভাবে ভারতে জার্ম্মাণ বাণিজ্য প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়।

মহাত্মাজী

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

নিখিলের ব্যথা বাজিল বক্ষে কাঁদিয়া উঠিল তোমার প্রাণ।
ছুটিয়া আসিলে অমৃত হস্তে মৃতেরে করিতে জীবনদান।
কণ্ঠে তোমার প্রেমের কণ্ঠী, সত্য তোমার বুকের ধন।
অহিংসাতেই হিংসাকে জয় করলে হে বীর অরিন্দম।
ঘৃণা ও হেলায় পড়েছিল যা'রা যুগ-যুগ ধরে অন্ধকারে,
মানুষ হইয়া ছিল বঞ্চিত মানুষের যত ন্যায়াধিকারে,
সমাজ বিধির অপ-বিধানেতে ছিল যাহাদের ধুলায় স্থান,
তোমার উদার হস্ত তাদেরে টানিয়া তুলিল, করিল ত্রাণ।
তুমিই তা'দেরে দিলে অধিকার মানুষের যাহা জন্মগত।
তোমার দরদী প্রলেপে শুকা'লো যুগ-যুগ-জমা ঘৃণার ক্ষত।

নারায়ণ জ্ঞানে রাখিলে যাদেরে আদরে বুকের অন্তঃপুরে,
'হরিজন' নামে চিহ্ন আঁকিয়া কে বলে, তাদেরে রেখেছ দূরে?
বুঝা'লে সবারে, একই অন্নে, একই বায়ুতে সবাই বাঁচে।
বিশ্ব মানব সবাই সমান, মানুষের দাবী—সবারই আছে।
শিক্ষা দিলে গো, নাহি কোন ভেদ হিন্দু কিংবা মুসলমানে,
সকলের প্রতি সমজ্ঞান তব—পার্শী কি শিখ খিরিশ্চানে।
সকল ধর্ম্মে একই ঈশ্বর, তাঁহারি প্রকাশ—সবার প্রাণে;
সকল নদীই চলেছে ছুটিয়া একই মহান্ সিন্ধু পানে।
কালায় গোরায় নাহিক বিশেষ, ধনী নির্ধনে নাহিক ভেদ।
প্রচারিলে এই মহান্ সত্য—নিখিল বিশ্ব-সাম্য বেদ।

দেখেছি তোমাকে হে রাজকুমার! কপিলাবাস্তু প্রাসাদতলে—
মানবের দুখে ভরা তব বুক বিষাদ-বেদনা অশ্রু জলে!
আবার তোমায় নদীয়ার মাঝে মহাপ্রভুর পার্শ্বে হায়—
দেখি জর-জর শত্রু আঘাতে রুধিরাপ্লুত সর্ব্ব কায়!
প্রেমালিঙ্গনে প্রেমের ঠাকুর, পাপীরে দিলে গো পুরস্কার।
তারেই আদরে টেনে নিলে বুকে, ঝরা'লো বুকে যে রক্তধার।
গত জনমের যত সহচর এবারেও আছে তোমারে ঘিরে;
'নিবাস', 'শ্রীবাস', সেই 'হরিদাস'—এবারো তোমার সঙ্গে ফিরে।

বিরাট তোমার কর্ম্মক্ষেত্র, মর্ম্ম-বীণায় মৈত্রী-বাণী।
পাপের তাপের জ্বালা জুড়াইলে তপের প্রতাপে শক্তি আনি।
বিশ্বজগৎ মোহিত হইয়া লুটা'য়ে পড়িল তোমার কাছে।
শত্রু যাহারা, তা'রাও মুগ্ধ, স্তব্ধ চমকে চাহিয়া আছে।
দানব যাহারা, তাহারা তোমায় শ্রদ্ধার ভরে ভক্তি করে।
দানব যাহারা, তা'দের সবার 'ভয়েতে ভক্তি' তোমার 'পরে।
সিন্ধুর মত বিশাল তোমার জীর্ণ ওই যে বক্ষখানি,
ভিতরে তাহার প্রেম ও সত্য বহিছে নিত্য দিবস যামি।
বিশ্বের দুখে কাঁদে তব প্রাণ, নিঃস্বের তুমি চির সহায়।
এ-যুগের তুমি যুগাবতার গো, মূর্ত্ত তুমি গো মানবতায়।

ভারতের এই তপোবনে তুমি মহা তপস্বী রাজাধিরাজ।
গলায় তোমার লতার মালিকা, মাথায় তোমার পুষ্প-তাজ।
কোটি হৃদয়ের খাঁটি সোনা-গড়া তোমার দিব্য সিংহাসন।
প্রেম ও শ্রদ্ধা, তোমার পূজায়—তুলসী, পুষ্প সচন্দন।
অমিত তেজের আধার হ'য়েও শান্ত তুমি হে তাপসবর।
মুক্তি পথের ভক্ত পথিক, শক্তিতে তুমি পুরন্দর।
সাধনার বলে লভিলে দৈব-পুরস্কার ও পুরুষকার।
বীরের মতই বরিলে বৈর-নির্য্যাতন ও অত্যাচার।
হেলায় ত্যজিয়া ভোগের প্রাসাদ, ত্যাগের কুটীরে দাঁড়ালে আসি'।
কুটীর হইল তীর্থক্ষেত্র, দলে-দলে আসে বিশ্ববাসী।
দুঃখ-দৈন্যে সবে দিশাহারা, দেশের বক্ষে জমেছে তম;
পুণ্য আলোকে নাশ সে-তিমির, ওগো মহাত্মা নরোত্তম।
প্রতিমার মাঝে সুপ্ত দেবতা, লুপ্ত পূজারী, ভগ্ন মঠ;
তোমারি পূজায় জাগিল দেবতা, তুমিই জীয়া'লে তীর্থ-বট।
তোমার মহান পুণ্যমন্ত্রে কেটে যায় যেন এ কাল নিশি।
প্রণাম তোমায়—প্রণাম তোমায়—ওগো ভারতের নব্য ঋষি।
মহা-বেদসম জীবনী তোমার; লেখনীর মম শক্তি নাহি
লিখিতে সে সব; মনের আবেগে দুইচারি কথা শুধুই গাহি।
শ্রদ্ধাসিক্ত দু'চারিটি ফুলে ক্ষুদ্র অর্ঘ্য রচিনু আজি।
দীন ভক্তের লহ উপহার! জয় জয় জয় মহাত্মাজি!

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—পূর্বরঙ্গ—

সম্রাট বললেন, বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ গ্রহণ করলাম।

আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য মথিত করে উল্কার মতো তাঁর বিজয়-রথ ছুটে গিয়েছিল। লৌহচক্রের নীচে নিষ্পিষ্ট হয়েছিল অগণিত জনপদ, রক্ত-কর্দমে পিচ্ছিল পথে সুরু হয়েছিল মহারাজ চক্রবর্তীর দুর্জয় দ্বাণবার অভিযান। হত্যার যে কলঙ্কিত অধ্যায় দিয়ে সম্রাট তাঁর জীবনের ইতিহাস সূচিত করেছিলেন, তার উপসংহার হল ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শান্ত সমাহিত নির্মলতায়। রাজছত্র ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল, রাজডঙ্কার নির্ঘোষণ স্তব্ধ হয়ে গেল, রক্ত-রঞ্জিত তরবারি ভেঙে গঠিত হল ধর্মচক্র, ঘৃণা ও হিংসায় কঠিন কুটিল মুখ শীল-সমাধি-নিরোধের আলোয় ভাস্বর হয়ে উঠল।

রাজ-রাজেশ্বর নয়, মুণ্ডিত-শীর্ষ কাষায়-বসন দরিদ্র ভিক্ষু স্তূপের সামনে বসলেন জানু পেতে। যুক্ত করে অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, বুদ্ধ, থমতু মে—

বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। শুধু শ্রমণ সংঘ নয়, শুধু বৌদ্ধ সংঘ নয়—মানব-সংঘ। দেশে দেশে যুগে যুগে কুসংস্কারজর্জরিত অবলাঞ্ছিত মানুষ। সম্রাটের রত্নছত্রের ছায়া যেখানে পৌঁছোয়না—যেখানে পাটলী-পুত্রের পুরবধূদের শিঞ্জিনী ঝঙ্কার শোনা যায়না, যেখানকার সন্ধ্যা মুখর হয়ে ওঠেনা বিট-কামুক ও আসবমত্ত ঐশ্বর্যপুষ্ট নরনারীর কলোচ্ছ্বাসে; যেখানে তমসা-জাহ্নবীর তীরে ব্রাত্য-মন্ত্রহীন দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাসে আকাশ আকুল হয়ে উঠছে—বিলাস-বৈভবের যবনিকা সরে গিয়ে সেই বিচিত্র বিশ্ব সম্রাটের চোখের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে উঠল।

সংঘের শরণ গ্রহণ করলাম। 'দেবানমপি পিয়দর্শী লাজা' সেই শরণ-মন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করলেন পূর্বসীমান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে, উদয়াচল থেকে অস্ততীর্থে, উদীচি থেকে দক্ষিণের কন্যাকুমারীর শৈল-মালায়। কালজয়ী পাষাণের অমরপ্রাকারে অনুলিখিত হল সংঘের কল্যাণবাণী। —হ্‌ রাজগরী, মানসেরা, কালসী, ধৌলী, গীর্ণার—শত শত, সহস্র সহস্র।

যুগ থেকে যুগান্তর, কাল থেকে কালান্তর। কালজয়ী পাষাণেও জরার ছোঁয়া লাগল—হিংসার উন্মত্ত-প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে গেল কল্যাণের বাণী, প্রেমের অনুশাসন। বিহার-সংঘারামে লুটিয়ে পড়ল বৌদ্ধের রক্তাক্ত শবদেহ—বিক্রমশীলা, নালান্দা, জগদ্দল শুধু বেঁচে রইল প্রত্নতত্ত্বের কৌতূহলের ভেতরে।

পর্বত প্রাকার ক্ষয় হয়ে গেছে, শত শত, সহস্র সহস্র শিলালিপি চূর্ণ হয়ে ধূলি-কণার সঙ্গে বৈশাখী ঝড়ের দীর্ঘশ্বাসে উড়ে বেড়ায়। পাষাণ অমর নয়।

সংঘের শরণ গ্রহণ করলাম। সংঘের মৃত্যু নেই—মৃত্যু নেই নিখিল মানবতার। সংঘ অমর—শিলালিপি অমর। জড় পাষাণ নয়, চেতন মানুষের বক্ষোপটে অগ্নিদীপ্ত রক্তাক্ত অক্ষর কালপুরুষের চিরঞ্জীব বাণীকে ঘোষণা করছে: সংঘং শরণং গচ্ছামি।

এক

ইস্কুল পালানোর সুবুদ্ধিটা প্রথম বাতলে দিল বাদল।

ভয় যে না করছিল তা নয়। বাড়ীতে কড়া শাসন—একেবারে নিখুঁত ভালো ছেলে করে গড়ে তোলবার চেষ্টায় ত্রুটি নেই কারো। বিশেষ করে বাবার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাবার কল্পনাও করতে পারে না রঞ্জু। বাইরের বারান্দায় তাঁর চটির শব্দ পেলেই অন্তরাত্মা একেবারে শুকিয়ে যেতে থাকে। অপরাধের অনেকটা তো সারাদিনে নেহাৎ মন্দ জমা হয়ে ওঠে না। ছোটছেলের ঝুঁটি ধরে টেনে দেওয়া, তেঁতুল গাছে উঠে টক কাঁচা তেঁতুল চিবোনো, ঠাকুরমার আচার অপহরণ, গদাযুদ্ধ করতে গিয়ে বালিশ ফাটানো, পড়ার সময় বল খেলা এবং যথানিয়মে সে বলের রান্নাঘরে ডালের গামলায় অবতরণ। সন্ধ্যাবেলা বাবার চটির শব্দে আদালতের পরোয়ানা বয়ে আনে এবং ফাঁসির আসামীর মতো ম্লান মুখে বসে থাকে রঞ্জু। সময়মতো ঠাকুরমা যদি কপালগুণে এসে পড়েন সে যাত্রা রক্ষা মেলে, নইলে দুচার ঘা অনিবার্য এবং দৈনন্দিন।

কিন্তু ইস্কুল পালানো! সে ভয়ঙ্কর, সে কল্পনাতীত। বাবা যদি টের পান তা-হলে পিঠের চামড়া সেলাই করতে যে মুচি ডাকতে হবে এ নিঃসন্দেহ। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে রঞ্জু বললে, না ভাই।

—দূর বোকা তুই, খালি ভয় পাস। তোর বাবা জানবে কী করে? আমি তো রোজই ইস্কুল পালাই, কই কাকা তো টের পায়না।

—না আমার ভয় করে।

—তবে তোর ভয় নিয়ে তুই বসে থাক—বাদল বিরক্ত হয়ে উঠল : আমি খরগোস মারতে যাই।

—খরগোস মারতে যাবি!—এতক্ষণে রঞ্জুর মুখে বিস্মিত কৌতূহল দেখা দিল : কী করে মারবি ভাই? কোথায় পাবি?

বাদল ততক্ষণে বসে পড়েছে বকুল গাছের ছায়ার নীচে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে অজস্র ফুল—একটা মিষ্টি করুণ গন্ধ ভাসছে বাতাসে। একটু দূরে আত্রাই। তার খাড়া পাড়ির ওপরে শিমুল গাছের ন্যাড়া ডালগুলো রাঙা টকটকে ফুলে আলো হয়ে আছে—আত্রাইয়ের নীল নির্মল জলে পাল তুলেছে পাঁচশো-মনী ধানের নৌকো, চলেছে কাঁটাবাড়ীর গঞ্জের দিকে।

মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলে রঞ্জু, একবার তাকিয়ে দেখল সোনারতলী ইস্কুলে যাওয়ার রাঙা রাস্তাটা, রবিশস্যের ঐশ্বর্যে ভরপুর সোনালি বড় মাঠটার ভেতর দিয়ে যেটা এঁকে বেঁকে ঈশানপুকুরের বটগাছতলায় গিয়ে হারিয়ে গেছে। তারপর বাদলের মুখের দিকে একটা চোরা-চাউনি ফেলে নিজেও ঘাসের ওপরে বসে পড়ল।

বাদল নিশ্চিন্ত আরামে বকুল গাছটায় হেলান দিয়ে বসেছে। ছিঁড়ে নিয়েছে চোর কাঁটার একটা লম্বা ডাঁটা, অখণ্ড মনোযোগে চিবিয়ে চলেছে সেটাকে। আধবোজা চোখে দুষ্টুমিভরা একটা ভঙ্গি করে বললে, কই, গেলিনে ইস্কুলে?

—আগে বল, কোথায় খরগোস মারতে যাবি?

বাদল বললে, কেন বলব? তুই তো আমার সঙ্গে যাবিনা। বরং ইস্কুলে গিয়ে আমার নামে লাগাবি, আর পণ্ডিত আমাকে ধরে ঠেঙিয়ে দেবে।

—সত্যি বলছি কাউকে বলবনা।

—যাবি আমার সঙ্গে?

রঞ্জুর বুক কেঁপে উঠল : কিন্তু বাবা—

—ধ্যাৎ—চিবোনো চোর-কাঁটাটা ফেলে দিয়ে বাদল বিরক্তিভরে উঠে পড়ল : তোকে বলাই আমার ভুল হয়েছে। ভীতুর ডিম কোথাকার।

—না ভাই, তবে আমাকেও নিয়ে চল।

—কাউকে বলবিনা তো?

—ইস্ কক্ষণো না।

বাদল বললে, তবে আয়।

* * * *

খরগোস মারবার আয়োজন সত্যিই তৈরী। বাদলের বুদ্ধি দেখে রঞ্জুর তাক লেগে গেল।

ছোট আমবাগানটা পেরিয়ে দুজনে এল চণ্ডীবাড়ীতে। গ্রামের বারোয়ারীতলা এই চণ্ডীবাড়ী। দুর্গাপূজা কালীপূজার সময় এখানে চালী তোলা হয়, প্রতিমা আসে, বাজনা বাজে, লোকের ভিড় জমে। তিন রাত যাত্রাগান হয়। তারপর সারাটা বছর পড়ে থাকে অনাদৃত হয়ে, এলোমেলো আগাছা গজায়, সাপের আমদানি হয়, শেয়ালের আসর বসে। বোধনের বড় বেলগাছটা থেকে অসংখ্য কাঁচা পাকা বেল চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু কেউ কুড়োতে যায় না—লোকে বলে ওখানে ব্রহ্মদৈত্য আছে। নিঝুম রাত্রে চারদিকের পৃথিবী যখন থমথম করে, চণ্ডীবাড়ীর আগাছা জঙ্গলের আনাচে কানাচে ঝিঁঝিরা যখন ঝিঁ ঝিঁ করতে থাকে, শেয়ালের সাড়া পেয়ে গাঁয়ের কুকুরগুলো যখন ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে—তেমনি সময়, ঠিক তেমনি সময় আচমকা জেগে ওঠে একটা অদ্ভুত খট্ খট্ শব্দ; কে যেন খড়ম পায়ে দিয়ে হেঁটে চলেছে, তাকে দেখা যায়না শুধু তার শরীরের অতি-বিশাল একটা ছায়া অন্ধকার দিগ্‌দিগন্তের ওপর দিয়ে পিছলে চলে যায়।

চণ্ডীবাড়ীতে ঢুকতে রঞ্জুর পা আর ওঠে না।

—এখানে কেন এলি বাদল?

—বাঃ রে, এখানেই তো খরগোস।

—ব্রহ্মদৈত্য আছে ভাই, আমি যাবনা।

—ব্রহ্মদৈত্য না তোর মুণ্ডু। সব বাজে কথা—

এক লাফে বাদল উঠে পড়ল চণ্ডীমণ্ডপে। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করলে একদল চামচিকে, পাখা ঝটপট্ করে তিন চারটে উড়ে চলে গেল বাইরে। রঞ্জুর সমস্ত শরীরটা ছমছম করে উঠল। বড় বেলগাছটা দুলছে—কখন ওখান থেকে খড়ম পায়ে ব্রহ্মদৈত্য নেমে আসবে কে বলতে পারে।

ততক্ষণে বাদল নেমে এসেছে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে। হাতে করে এনেছে দুটো ধনুক, আর একরাশ প্যাঁকাটির তীর। তীরগুলোর মাথায় ছোট ছোট পেরেক বসিয়ে একেবারে মোক্ষম করে তৈরী করা হয়েছে। একবার লাগলেই আর দেখতে হবেনা—খরগোসের পতন ও মৃত্যু।

—বাঃ চমৎকার হয়েছে।

—চমৎকার হবে না?—অসীম আত্মতৃপ্তিতে বাদল হেসে উঠল: কাল সারা দুপুর বসে বসে বানিয়েছি। একেবারে রামের ধনুক হয়েছে—হয়নি রে?

—তাতো হয়েছে। কিন্তু এখান থেকে এখন চল ভাই—

—আঃ গেল যা। তুই যে ভয়েই মরে যাচ্ছিস। জানিস হাতে তীর ধনুক রয়েছে, রামচন্দ্রের নাম করে যেই বাণ ছুঁড়ব, অমনি ব্রহ্মদৈত্য একেবারে ঠাণ্ডা।

—ব্রহ্মদৈত্য আর মারতে হবেনা, কোথায় খরগোস আছে দেখাবে চল।

চণ্ডীবাড়ীর একেবারে গা ঘেঁষেই সুরু হয়েছে কবিরাজের বড় আমের বাগাম। একটা পায়ে চলার সরু পথ ঠাণ্ডা ছায়ার ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়েই রওনা হল দুজনে।

ফাল্গুন মাস। কবিরাজের আমবাগান মুকুলে মুকুলে ছেয়ে গেছে। শুকনো পাতারা ছড়িয়ে আছে সমস্ত বাগানময়, তাদের ওপর ঝির ঝির টপ টপ করে ঝরছে মৌ। মধুর গন্ধে বাতাসের যেন নেশা ধরে গেছে, ঠাণ্ডা মিষ্টি ছায়াটা আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে আছে। পুরোনো আমগাছের শ্যাওলা ধরা মোটা গুঁড়িতে জড়িয়ে উঠেছে পরগাছা, হালকা নীল রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল ধরেছে এখানে ওখানে। জংলা বাগান, মাঝে মাঝে গুলঞ্চের লতা দুলছে, পায়ের নীচে রাশি ভুঁইচাপা। আর উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে পাহাড়ী মৌমাছি, উড়ে বসেছে মধুভরা মুকুলে, আকাশী-রঙের অর্কিড গুচ্ছে, আর ভুঁইচাপার পাতলা বেগুনী পাঁপড়িতে।

বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে ভালো লাগছে রঞ্জুর। ইস্কুল পালিয়েছে—বাড়ীর রূঢ়তম শাসনের ভয়কে অস্বীকার করেই বেরিয়ে পড়েছে দুপুরের এই রোমাঞ্চকর অভিযানে। নিষিদ্ধ আনন্দের উত্তেজনা ঝিনঝিন করে বাজছে রক্তের মধ্যে। ওদিকে এতক্ষণে ক্লাস নিচ্ছে ধনঞ্জয় পণ্ডিত। টেবিলের ওপরে জোড়া বেত, মুখে বাঘের মত গর্জন। সমস্ত ক্লাসটা আতঙ্কে কাঁপছে—মধ্যপদলোপী আর বহুব্রীহি সমাস বিভীষিকার মতো রাজত্ব করছে।

আর এই বাগান। ঘুমের মতো ঠাণ্ডা। পায়ের নীচে মধুতে চট্‌চটে শুকনো পাতাগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে—জড়িয়ে যাচ্ছে স্নেহের মতো। ইস্কুলের পথটা চলে গেছে শর্ষেফুলের সোনালি রঙে ভরা উজ্জ্বল মাঠের ভেতর দিয়ে, কিন্তু এখানে ছায়া, এখানে মিষ্টি গন্ধ আর পাহাড়ী মৌমাছির গুঞ্জন যেন আর একটা দেশের—আর একটা পালিয়ে যাওয়া জগতের সন্ধান দিচ্ছে।

—কোথায় তোর খরগোস ভাই?

—আর একটু দাঁড়া না, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

বাগান ছাড়াতেই খানিকটা নীচু জমি। বর্ষায় আত্রাইয়ের জল আসে—তখন নজীপুরের সীমানা পর্যন্ত টানা একটা বিল হয়ে যায়, থই থই করে ঘোলা জলে, মেঠো পিঁপড়েতে ভরা দামঘাসের শিস্‌গুলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোলা খায়। তারপরে জল নেমে গেলে, থকথকে কাদায় আর একটু টান ধরলে জন্মায় বিশল্যকরণীর জঙ্গল। এদেশে বলে 'বিশ্‌লা'।

বিশ্‌লার জঙ্গল। জঙ্গল বললে ঠিক হয় না, কালচে সবুজ আর লালের একটা বিশাল সমুদ্র যেন। এদিকে লোকের যাতায়াত বড় নেই, একটু দূরের ভাগাড়ে মরা গোরু ফেলার উপলক্ষে যা দু চারজন আসে যায়।

বাদল বললে, এর ভেতরে খরগোস আছে।

—এই জঙ্গলে!

—হ্যাঁ, এই বিশ্‌লার বনে। অনেক আছে, বুঝলি? সাঁওতালেরা এসে সেদিন তিন চারটে মেরে নিয়ে গেল। তাই দেখেই তো আমি তীর ধনুক তৈরী করলাম।

—কিন্তু খুঁজে পাবি কী করে?

—দ্যাখ্ না। তুই জঙ্গলের ভেতরে হৈ হৈ করে ছুটে যাবি, আমি তীর-ধনুক বাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। তাড়া খেলেই ব্যাটারা বেরিয়ে আসবে আর আমি তীর দিয়ে পটাপট্ মেরে ফেলব। সাঁওতালেরা সেদিন অমনি করেই মারল কি না। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শিখে নিয়েছি।

—আচ্ছা। কিন্তু যা জঙ্গল, যদি সাপ থাকে?

—দূর বোকা—বাদল হো হো করে হেসে উঠল: সাপ থাকবে কেন?

—বাঃ, জঙ্গলে সাপ থাকবে না?

—আরে, এ যে বিশ্‌লা।

—বিশ্‌লা তো কী হয়েছে?

—ধ্যাৎ, কিচ্ছু জানিস না তুই—রঞ্জুর অজ্ঞতায় বাদল আশ্চর্য হয়ে গেল : এর আসল নাম কী জানিস ? হুঁ হুঁ, এ বাবা বিশল্যকরণী। রামায়ণের গল্প পড়িসনি ?

রঞ্জু মাথা নেড়ে জানালে সে পড়েছে।

—লক্ষ্মণকে যখন শক্তিশেল মেরেছিল ইন্দ্রজিৎ, তখন হনুমান গন্ধমাদন বয়ে বিশল্যকরণী নিয়ে এল না ? আর তাইতেই তো লক্ষ্মণের প্রাণ বেঁচে গেল। তবে ?

রঞ্জু তবু বুঝতে পারল না, তাকিয়ে রইল।

—বিশ্‌লার বনে সাপ থাকতে পারে না, গন্ধেই পালিয়ে যায়। কোনো ভয় নেই, তুই ওদিক থেকে তাড়া দে। এক্ষুণি কান উঁচু করে দৌড়ে বেরিয়ে আসবে'খন। তারপর তুই তীর মারবি, আমিও মারব, দেখি ব্যাটারা পালায় কী করে।

অসীম আত্মবিশ্বাসভরে একটা ছোট টিলার ওপরে, তীর-ধনুক বাগিয়ে দাঁড়ালো বাদল। নিতান্তই বাঁকারির ধনুক আর প্যাকাটির বাণ, নইলে মনে করা যেতো অর্জুনের মতো এই মুহূর্তে বাদল একটা ভয়ঙ্কর এবং প্রলয়ঙ্কর কিছু ঘটিয়ে বসতে পারে।

—কোন্‌দিক থেকে তাড়া দেব ?

ধনুকটা আরো জুৎসই করে বাগিয়ে নিয়ে বাদল বললে, যেদিক থেকে খুশি। তুই বড্ড বকাস রঞ্জু। ওদিকে আবার দেরী হয়ে যাবে, সে খেয়াল আছে তো ?

তা বটে। ইস্কুল ছুটির সময়টা নাগাদ বাড়ি পৌছুতেই হবে যেমন করে হোক। নইলে হাতে-নাতেই ধরা পড়তে হবে এবং তার পরিণতি যে কী ঘটবে সেটাও অনুমান করা শক্ত নয় একেবারে।

—দে-দে, তাড়া দে। ওই ওদিক থেকে—হৈ-হৈ—হায়—উৎসাহের আধিক্যে বাদলও টিলার ওপর থেকে লাফিয়ে জঙ্গলের মধ্যে নেমে পড়ল। আর ব্যাপারটাও ঘটল ঠিক সেই সময়ে।

—কক্—কক্—কক্—

জঙ্গলের ভেতর থেকে উঠল একটা বিশ্রী বেখাপ্পা শব্দ। এতো খরগোসের আওয়াজ নয়। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

—কক্—কক্—কক্—

আচমকা বিশ্‌লার বন তোলপাড় করে, প্রবল ঝটপট্ আওয়াজ তুলে বেরিয়ে এল একটা বিকট বিভীষিকা। একটা পাখী বটে, কিন্তু রাক্ষুসে পাখা। দেড়হাত লম্বা মিশ্‌কালো একটা ন্যাড়া গলা, দুটো ছোট ছোট চোখ পিট্ পিট্ করছে। মস্ত বড় ঠোঁট দুটোকে ফাঁক করে সে তেড়ে আসছে ওদের দিকে, তার পাখার ঝাপটে খণ্ড-প্রলয় উপস্থিত হয়েছে বিশলার বনে। বিশল্যকরণীর জঙ্গলে সাপ না হয় নাই থাকল, কিন্তু বক রাক্ষস যে বাস করতে পারবে না এমন কথা রামায়ণে লেখা নেই।

—ওরে বাপ্‌রে, হাড়গিলা পাখী—

বীর ধনুর্ধর বাদলের দুর্জয় গাণ্ডীব হাত থেকে খসে পড়েছে, জঙ্গল ভেঙে উর্ধশ্বাসে আমবাগানের দিকে ছুটেছে বাদল। রঞ্জু যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, ভয়ে তার পা সরছে না, শুধু সম্মোহিতের মতো পাখীটার লাল টকটকে মস্ত বড় হাঁ-টার দিকে তাকিয়ে আছে।

চমক ভাঙল বাদলের আর্তনাদে।

—পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়। হাড়গিলা পাখী, এক্ষুণি হাড়টাড়শুদ্ধু গিলে ফেলবে—

—ওরে বাবা—

কোথায় রইল তীর ধনুক, কোথায় রইল ব্রহ্মদৈত্য-বধের কঠিন সংকল্প। দুজনে প্রাণপণে ছুটতে সুরু করলে। এখনও বুঝি পাখীটা কক্ কক্ করে পেছন পেছন তেড়ে আসছে। চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতে বাদল অদৃশ্য হয়ে গেল, আর একটা লাটা ঝোপের কাঁটাবনে জামা কাপড় জড়িয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল রঞ্জু। মুখ থেকে বেরিয়ে এল কাতর কান্নার একটা প্রবল শব্দ।

একটু দূরে জঙ্গলের ভেতরে গুলঞ্চের লতা সংগ্রহ করছিলেন অবিনাশবাবু। রঞ্জুর কান্নার শব্দ তিনি শুনতে পেলেন। চমকে তাকাতেই চোখে পড়ল কাঁটাবনের ভেতরে একটি ছোট ছেলে ছটফট্ করছে। কী সর্বনাশ সাপে-টাপে কামড়াল নাকি।

অবিনাশবাবু দ্রুত ছুটে এলেন।

—একি, রঞ্জন !

রঞ্জু জবাব দিল না, ব্যথায়, লজ্জায় আর ভয়ে দুচোখ দিয়ে তার টপটপ করে জল পড়ছে। হাতমুখ ছড়ে গেছে কাঁটায়, গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। চারদিকে ছড়িয়ে আছে বই, খাতা, শ্লেট, পেন্‌সিল।

—সর্বনাশ, একি হয়েছে! এই জঙ্গলেই বা ঢুকেছিলে কেন?

তবু জবাব নেই। দুঃখের পাত্র পূর্ণ হয়ে গেছে। বাবার কাছে খবরটা আর চাপা থাকবে না। ইস্কুল পালিয়েছে, জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে, রক্তারক্তি হয়ে গেছে সমস্ত শরীর। খড়মের বাড়িতে পিঠের একখানা হাড়ও আস্ত থাকবে না আজকে—একবার রাগলে বাবার মেজাজ বাঘের চাইতেও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। রঞ্জুর বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন বরফের মতো জমাট বেঁধে গেল। হাড়-গিলা পাখীটা যদি হাড়-মাসশুদ্ধ তাকে টপ করে আস্ত গিলে ফেলত, এর চাইতে ঢের ভালো হত সেটা।

স্নেহে করুণায় অবিনাশবাবুর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। দুখানি বলিষ্ঠ হাতে রঞ্জুকে তিনি তুলে আনলেন বুকের মধ্যে, কুড়িয়ে নিলেন বইখাতাগুলো। বললেন, দুষ্টু ছেলে! এই ভরদুপুরবেলা এমন জঙ্গলের ভেতরে আসতে আছে কখনো!

অবিনাশবাবুর বিশাল বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল রঞ্জু। ক্রমশঃ

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের সীমান্ত-নীতি

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এম-এ

ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের যে বিস্তৃত অঞ্চলে উপজাতিদের বাস তাহা এক দুর্গমপর্বতমালা বেষ্টিত গভীর অরণ্যময় দেশ। দক্ষিণে গোমল পাশ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত এই সমস্ত এলাকাটিতেই ওয়াজিরি, আফ্রিদি, মঙ্গল, মোমন্দ, মাহ্‌সুদ, বুনিখেল প্রভৃতি উপজাতিসমূহের বাস। ইহারা সকলেই ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী পাঠান। আফগান, তুর্কী, ইরাণী, তাতার, ভারতীয় প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণে এই সকল জাতির উৎপত্তি। বর্ত্তমান সভ্যজগৎ হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়াই এই উপজাতিগুলি পর্বতভূমে বাস করিয়া আসিতেছে। অরণ্য ও পর্বতের মধ্যে বাস করে বলিয়া ইহাদিগকে কঠোর পরিশ্রম সহকারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। তদুপরি বর্ত্তমানে ইহাদের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থসঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে।

এই পার্বত্য উপজাতিগুলি নিজেদের জীবন অপেক্ষাও স্বাধীনতাকে মূল্যবান বলিয়া গণ্য করিয়া আসিতেছে, তাই সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের নিকটে ইহারা বরাবরের এক সমাধানহীন সমস্যা। সারা ভারতবর্ষ ক্রমে ক্রমে ইংরাজের নিকটে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, আফগানিস্থান এবং মধ্যপ্রাচ্যের নানাস্থানেও ইংরাজের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছে, কিন্তু সীমান্তের এই উপজাতিগুলি বৃটিশের নিকটে কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করে নাই। ইংরাজ তাহার সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ নীতির দ্বারা ইহাদিগকে বশে আনিবার বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিবারেই ইহারা সেইসকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। উপজাতিদের দমন করিবার জন্য আকাশ হইতে তাহাদের উপরে বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে, ঘরবাড়ী বোমা ফেলিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তবুও ইহারা দমে নাই। বোমাবর্ষণের ফলে গৃহ হারাইয়া পাহাড় খুঁড়িয়া গৃহ নির্মাণ করিয়াছে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সম্মুখ যুদ্ধও করিয়াছে। দমনের পথে নিরুপায় হইয়া অবশেষে বৃটিশ এইসকল উপজাতিদের বহুসংখ্যক ছেলেকে ইংরাজী-শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া সভ্য করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তবু ইহারা সভ্য হইয়া উঠে নাই।

এই সকল দুৰ্দ্ধর্ষ উপজাতিগুলির জন্য বৃটিশ গবর্ণমণ্ট বহুবার নূতন করিয়া সীমান্তনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আফগানযুদ্ধের সময় ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ড যে নীতি ঘোষণা করেন তাহাতে বলা হয়—ওয়াজিরিস্থানে সৈন্য মোতায়েনের ঘাঁটি করা হইবে। বড় বড় রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে যাওয়ার সুবিধা করা হইবে। খাইবার পাশের মধ্যদিয়া আফগানিস্থানের সীমান্ত পর্য্যন্ত ভারতীয় রেল লাইনকে জামরুদ হইতে বিস্তৃত করা হইবে। কিন্তু এই নীতিতেও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাহ্‌সুদ বিদ্রোহের পর ভারত সরকার পুনরায় সীমান্ত নীতির পরিবর্ত্তন করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে উপজাতিদের নেতা ইপির ফকির বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলে ইংরাজ সরকার ইহা দমনের জন্য বহু সহস্র সৈন্য নিয়োগ করেন কিন্তু তবুও ইহাদের বশে আনিতে পারেন নাই।

বৃটিশ তাহার সম্প্রসারণনীতির জন্য এই উপজাতিগুলির সহিত কোনদিনও আপোষ করিতে পারিলেন না; অধিকন্তু ভারতের জাতীয় নেতাদেরও ইহাদের সহিত মিলিত হইবার সুযোগ দিলেন না। কংগ্রেস এই উপজাতি অঞ্চলে বহুবার শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু বৃটিশ সরকার প্রতিবারই তাহাতে বাধা দিয়াছেন। মিশন প্রেরণের অনুমতি দেন নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে লীগের অনুচরেরা এই সকল অঞ্চলে গিয়া ঠিক নিজেদের প্রচার চালাইবার সুযোগ পাইয়াছে। ইহারা হিন্দু ও শিখদের বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য সরকারের নিকট হইতে বাধা না পাইয়া বরং উৎসাহ পাইয়াছে।

এই পার্বত্য জাতিগুলি মানুষের বিশেষ বিশেষ উপজীবিকার কোন সুযোগ পায় নাই। খুন, জখম, ডাকাতি, মনুষ্য অপহরণ করিয়া মুক্তিমূল্যের আশায় তাহাকে আটক করিয়া রাখা প্রভৃতি ইহাদের একপ্রকার ব্যবসায়। অবশ্য এই হিন্দু ও শিখদের উপর খুন ও অপহরণে বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টদের হাত কম নাই। তাহারা ভাড়াটিয়া গুণ্ডার দ্বারা এই সকল কার্য করাইয়া ইহাদের উপর ভারতীয় জনসাধারণের মন বিষাক্ত করিবার চেষ্টা করেন।

গত আগষ্ট মাসে ওয়াজিরিস্থানের একজন বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেন্টকেই অপহরণ করায় ইংরাজ সরকার ওয়াজিরিদের শাস্তিদান করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদের উপর বোমা বর্ষণ করেন। ২রা সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ভারতের অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করিয়াই এই বোমা বর্ষণ বন্ধ করিবার আদেশ দেন। অন্তর্বর্তী সরকারের নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ঘোষণা করেন—এই সকল উপজাতিদের জন্য নূতন করিয়া নীতি অবলম্বন করা হইবে। বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব লইয়াই এই উপজাতিদের প্রশ্ন আলোচনা করিতে হইবে। খুন, জখম, ডাকাতি, মনুষ্য অপহরণ আর সহ্য করা চলে না। ইহাদের জীবনযাত্রার জন্য অন্য পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। বন্ধ্যা পার্বত্য অঞ্চলগুলির সংস্কার করিয়া সম্পদ সংগ্রহের উপযোগী করা হইবে। বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল প্রভৃতিও স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পণ্ডিত নেহরু উপজাতিগুলির সহিত ভারতের সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য শীঘ্রই উক্ত অঞ্চল পরিদর্শনের কথাও প্রকাশ করেন; এবং বলেন যে, সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর, আফগান সরকার ও উপজাতি নেতাদের সহিত আলোচনা করিয়া সীমান্ত নীতি নির্দ্ধারণ করা হইবে।

ইহার কিছুদিন পরেই শিবাজী পাহাড়ে মাহসুদ, ওয়াজির, বুবিখেল, সিনওয়ানি, মঙ্গল, আফ্রিদী ও মহামণ্ড প্রভৃতি উপজাতিসমূহের এক সভা হয়। এই জির্গায় সভাপতিত্ব করেন উপজাতিদের নেতা ইপির ফকির। ভারতে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন করার জন্য পণ্ডিত নেহরুকে অভিনন্দন জানাইয়া সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহিত হয় এবং ওয়াজির-স্থানে বোমাবর্ষণ বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়ার জন্য পণ্ডিত নেহরুর প্রশংসা করা হয়। সম্মেলনের সভাপতি ইপির ফকির বলেন—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আমরা গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করি। হিন্দু এবং শিখদিগকে আমরা ভাই-এর মত দেখি। বৃটিশ ভারত হইতে তাহাদিগকে অপহরণ করিবার জন্য আমি আমার অনুচরদিগকে কখনও বলি নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির কারণেই এই সকল অপহরণ কার্য ঘটিয়া থাকে। আমরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছি। পণ্ডিত নেহরু পররাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য হওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট হইতে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহারই আশা করি এবং এ বিষয়েও আমরা নিঃসন্দেহ যে তিনি উপজাতিদের অনগ্রসর অবস্থা দূরীকরণের জন্য সচেষ্ট হইবেন। অতঃপর ইপির ফকির মুসলিমলীগকে বৃটিশের তাঁবেদার পোষকতায় প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আত্মমর্যাদা সম্পন্ন দেশপ্রেমিক মুসলমানদিগকে লীগের সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে নিষেধ করেন।

পণ্ডিত নেহরু উপজাতিদের উপর বোমাবর্ষণ নিষেধের আদেশ দিলেও লীগের অনুচরেরা এই সময় উপজাতিদের মধ্যে মিথ্যা করিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিল যে কংগ্রেসই বোমা বর্ষণের আদেশ দেয়। এইরূপ প্রচারের উদ্দেশ্য ইহাদিগকে অধিকতর হিন্দু ও শিখ বিরোধী করিয়া তোলা, কারণ লীগ তখনও কংগ্রেসের সহিত অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করেন নাই। মোমন্দ উপজাতির নেতার পুত্র হজরৎ বাদসাগুল লীগের এই মিথ্যা প্রচার বুঝিতে পারিয়া বলেন—স্বার্থান্বেষী দলের বিভ্রান্তকারী প্রচারে কংগ্রেসের প্রতি প্রথমে আমার মন বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়াছিল, এখন সে ভ্রম দূর হওয়ায় বুঝিতে পারিয়াছি যে কংগ্রেসের হাতেই মুসলমানদিগের সমস্ত স্বার্থ নিরাপদ।

২১শে সেপ্টেম্বর সাবকাদার দুর্গ হইতে মালিক সমর খান, মালিক আতা খান, মৌলানা গোলাম মহম্মদ, মালিক মীর আকবর প্রভৃতি পণ্ডিত নেহরুকে অভিনন্দন জানাইয়া এক তার করেন এবং তাঁহারা ভারতবাসীদের প্রতিবেশী ভাই হিসাবে বৃটিশের অপেক্ষা ভাল ব্যবহার আশা করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এই তারের উত্তরে জানান যে উপজাতি অঞ্চলের মঙ্গল সাধন করা এবং তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সাহায্য করাই হইবে অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

ইহার পর অন্তর্বর্তী সরকারের নেতা ও ভাইস প্রেসিডেণ্টরূপে পণ্ডিত নেহরু ১৬ই অক্টোবর তারিখে সীমান্ত সফরে বাহির হন। ঐ দিন মধ্যাহ্নে তিনি পেশোয়ার বিমান ঘাঁটিতে গিয়া উপস্থিত হইলেই, উপজাতিরা প্রায় দুই মাস পূর্বে কোহাট জেলায় সাকারদার নিকটে যে ৫ জন হিন্দুকে অপহরণ করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। অনেকেই ইহাকে পণ্ডিত নেহরুর সীমান্ত সফরের শুভ লক্ষণ বলিয়া সূচনা করেন।

পরদিন ১৭ই তারিখে পণ্ডিত নেহরু বিমানযোগে পেশোয়ার হইতে মিরণশাহে গিয়া পৌঁছান। ২।৩ দিন যাবৎ উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজির-স্থান ভ্রমণ করিয়া এবং উপজাতিদের বিভিন্ন জির্গায় বক্তৃতা করিয়া ১৯শে তারিখে পেশোয়ার প্রত্যাবর্তন করেন। ভ্রমণকালে ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা কয়েকটি স্থানে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিলেও বহু স্থানেই পণ্ডিতজী বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন। পেশোয়ারে প্রত্যাবর্তন করিয়াই পুনরায় তিনি উপজাতি অঞ্চল দর্শনে বাহির হন। ২০শে সকালে খাইবার পাশ হইতে পেশোয়ারে ফেরার পথে পণ্ডিত নেহরুর মোটর লক্ষ্য করিয়া কয়েকজন বিরোধীদলীয় উপজাতি রাইফেল ছুঁড়িতে থাকে। পণ্ডিতজীর রক্ষীবাহিনী খাইবার রাইফেল দলের সহিত ইহাদের পাঁচ মিনিট যুদ্ধ হয়। পুনরায় বিমানযোগে রিসালপুর যাইয়া তথা হইতে মালকন্দে যান। ২১শে মালকন্দের এক জির্গায় বক্তৃতা শেষ করিয়া পেশোয়ার ফিরিবার কালে পথের মধ্যে কয়েকটি লরী-ভর্ত্তি বিক্ষোভকারী দল দেখিতে পাইলেন। তাহারা এমনিভাবে পথ আটকাইয়া রাখিয়াছিল যে তাঁহার অগ্রসর হইবার কোনও উপায় ছিল না। বিক্ষোভকারীরা পণ্ডিতজীকে দেখিতে পাইয়াই পাথর ছুঁড়িতে

থাকে, ফলে মোটরের কাঁচ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি ও তাঁহার সঙ্গী খান-ভ্রাতৃদ্বয় সামান্য আহত হন।

বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেণ্টদের প্ররোচনা ও সাহায্যেই পণ্ডিতজীর ভ্রমণের আগাগোড়া বাধাদানের চেষ্টা করা হইয়াছিল। এ সম্পর্কে খান আব্দুল গফুর খানের অভিমত এই যে, রাজনৈতিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় ব্যক্তিদের মোটেই ইচ্ছা নয় যে পণ্ডিত নেহরু এই সকল উপজাতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পণ্ডিতজী ভ্রমণের স্পর্দ্ধা রাখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের এইরূপ অপচেষ্টা।

পণ্ডিত নেহরু পেশোয়ার আসিয়া তাঁহার উপজাতি অঞ্চল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেন, গত ৫।৬ দিন ধরিয়া উপজাতিদের সহিত মিশিয়া অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতাও অর্জন করিয়াছি। উক্ত অঞ্চল পরিদর্শনে আমাকে অনেকে নিষেধ করিলেও উহা আমার কর্তব্য মনে করিয়া আমি ভ্রমণে বাহির হই। শুভেচ্ছার বাণী লইয়া উহাদের মধ্যে গিয়াছিলাম, এবং তাহাতে আমি যথেষ্ট সাড়াও পাইয়াছি।

বৃটিশ সরকার এতদিন তাঁহার সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণ নীতির দ্বারা উপজাতিদের বশে আনিতে পারেন নাই, অধিকন্তু সীমান্তে এক গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে ডাকাতি, খুন-জখম, মনুষ্য অপহরণ একপ্রকার লাগিয়াই রহিয়াছে। ভারতে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ায় তাঁহাদের সহৃদয় প্রচেষ্টায় এবার এই সকল বন্য ও পার্বত্য উপজাতিগুলি সভ্য মানুষের গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই স্বাধীনতাপ্রিয় পার্বত্য জাতিগুলির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা ও সুযোগ দান করিলে এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের পথ দেখাইয়া দিলে পৃথিবীর বহু অসভ্য জাতি যেমন সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিয়াছে ইহারা ও তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না।

বৃটিশ পলিটিক্যাল এজেণ্টদের প্ররোচনায় এবং লীগের প্রচারকদের প্রচার সত্ত্বেও অধিকাংশ উপজাতিই পণ্ডিত নেহরুর শুভেচ্ছা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে এবং কংগ্রেসের উপর তাহাদের আস্থা যে কতখানি তাহাও বেশ বুঝা গিয়াছে, তাহাদের নেতা ইপির ফকিরের স্পষ্ট ভাষণ হইতে। তিনি বলিয়াছেন—উপজাতির লোকজন সকলেই একান্তভাবে কংগ্রেসের সমর্থক। উপজাতিরা তাই তাহাদের অনগ্রসর অবস্থা দূরীকরণে কংগ্রেস তথা অন্তর্বর্তী গভর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য লাভের জন্য আগ্রহান্বিত।

যুদ্ধোত্তর ভারত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হইল, তখন সমস্ত পৃথিবীতেই একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বাঙলা দেশের ক্ষুদ্র এক মফঃস্বলের সহরে বাস করিয়াও আমি তাহা অনুভব করিয়াছিলাম। আমার পরিবার হইতে আমার অনাথা কন্যা উষা গেল ডাক্তার হইয়া যুদ্ধের কাজে; আর আমার ভ্রাতুষ্পুত্র গেল, Pilot, পাইলট্ হইয়া। অবশ্য ইহাতে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্র ও আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতির মত ছিল না। ইহারা দুইজনেই ছিল কংগ্রেসের সেবক-সেবিকা। সাম্রাজ্যবাদী বৃটীশের জন্য ভারতবাসীর যুদ্ধে যাওয়া ইহাদের মত ছিল না। কিন্তু দেশের লোক কংগ্রেস ও লীগ কাহারো মত মানিল না। আমিও যুদ্ধে যাওয়াটা যুদ্ধে না যাওয়ার চেয়ে ভালো মনে করিয়া বাধা দিলাম না। তা ছাড়া আমার পুত্রকন্যাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ আমি করি নাই। আমার স্ত্রী যতদিন ছিলেন, হয় তো কিছু করিতেন। আমি কখনও তাহা করা প্রয়োজনীয় মনে করি নাই।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যখন হিট্‌লারের বিজয়ীবাহিনী অপ্রতিহত গতিতে তাহাদের অভিযান সুরু ও শেষ করিল, তখন এদেশের লোক বিস্মিত, স্তম্ভিত হইল। অনেকে বলিল, "হিট্‌লার কল্কি অবতার। পৃথিবী ধ্বংস করিতেই আসিয়াছে।" অশ্রুতপূর্ব্ব, অদৃষ্টপূর্ব্ব সমর-বিজ্ঞান দেখাইয়া জার্ম্মানী জগৎকে স্তম্ভিত করিল। ইতালি ও জাপান যে জার্ম্মানীকে অপরাজেয় ভাবিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীর অপরাজেয়ত্ব সম্বন্ধে অনেকেই প্রায় নিঃসংশয় ছিল। রুষ ও আমেরিকা একদিকে, ও জাপান অন্যদিকে এই য়ুরোপীয় যুদ্ধে যোগ দেওয়াতে বিশেষ কিছু পার্থক্য প্রথমত বুঝা গেল না। তবে জাপান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে ভারতে একটা বেশী রকম সাড়া পড়িয়া গেল। পূর্ব্বাঞ্চলকে war zone বলিয়া প্রচার করা হইল। যুদ্ধের জন্য সাজসাজ শব্দটা চারিদিকে বেশী করিয়াই উঠিল। সরকার বলিলেন, "total war effort" চাই।

আমার বন্ধু হরনাথ আসিয়া বলিল, "রূপ (আমার নাম রূপনারায়ণ) দেশ গরম হোয়ে উঠেছে। একবার দেখতে ইচ্ছে করে দেশের লোকের মনের অবস্থাটা কি? তাদের জীবনযাত্রার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে কিনা। যাবে একবার?" ভাবিলাম, "হাঁ যাই। চিরকাল সরকারী চাকরিতে শুধু ফাইলের ভিতর দিয়াই দেশকে দেখেছি, না হয় সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া। দেশের লোককে দেখি নাই। গ্রামের সহিত আমার সম্বন্ধ গেছে উঠে; সহরের সঙ্গে ভাল কোরে সম্বন্ধ কখনো পাতাতে পারি নি।" তাই বন্ধুকে বলিলাম, "চলো। কবে ডাক পড়বে পরপার থেকে জানি না। তার আগে যে দেশে জন্মেছি, তার লোকগুলির সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আহরণ করা ভালো। সত্যই তো যখন বড় বড় সমস্যার পূরণ করি কাগজে কলমে, দফ্‌তরে-টেবিলে বসে, তখন কাদের সমস্যা তা তো ভাবি নি। নিরবয়ব ও নির্ম্মম সমস্যারই পূরণ কোরেছি, বুদ্ধি দিয়া, সম্ভব না বুঝিয়া, যেমন লোকে অঙ্কশাস্ত্রের অঙ্ক কষে। চলো একবার দেখি গিয়ে সে সমস্যা কাদের?"

বন্ধু হাসিলেন। উকীল মানুষ তিনি। আমার মত দেশে তাঁহার Academic interest নাই। বলিলেন, "কিন্তু ক্ষতি যা কোরেছো তার

তো পূরণ হবে না তাতে, রূপ ? তোমাদের সরকারী ব্যবস্থা রুগীকে না দেখে, জেনে, রোগের চিকিৎসা।"

যাইব তো বলিলাম। তবু কিছু বিলম্ব হইল যাইতে। তাহার কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, আমার কনিষ্ঠা কন্যা সুমিতা (বয়স ১৭।১৮) একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ করিয়া বসিল। কোন এক অজ্ঞাত নামধাম লেফ্‌টেনান্টের সহিত গোপন প্রণয়ের ফলে সন্তান-সম্ভাবিতা হইল। সে কলিকাতার প্রাইভেট্ হোষ্টেলে থাকিত। সংবাদ পাইয়া গিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে হইল। হোষ্টেল হইতে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাকে নরেন্দ্রের কলিকাতার বাসায় রাখিবার বন্দোবস্ত করিলাম। নরেন্দ্র বাসা বাঁধিয়া কোন একটি কলেজের লেকচারারের কাজ করিত, আর সময়ে অসময়ে কংগ্রেসের জন্য বক্তৃতা করিত।

দ্বিতীয় কারণ ছিল ১৯৪২এর আগষ্ট-এর হাঙ্গামা। এই দুইটির—একটা সমাধান হইলে, আমি ও হরনাথ বাহির হইলাম। প্রায় ছয়মাস ঘুরিয়া সকল রকম লোকের সহিত মিশিয়া দেখিলাম যে যুদ্ধ কি ও কিসের জন্য, তাহা কেহই বিশেষ জানে না। যুদ্ধে গিয়াছে লোকে সরকারের হুকুম বলিয়া, আর কিছু অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইবে বলিয়া। দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় ঠিক সুখী না হইলেও, দুঃখী নয়। যুদ্ধে তাহাদের কেউ না কেউ সৈন্যদলে গিয়া কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতেছিল। মধ্যবিত্তদেরও সেই অবস্থা। ধনীরা নূতন ধনাগমের সুযোগ পাইয়া আনন্দিত। আসলে যুদ্ধটা সাম্রাজ্যবাদীর না ভারতের আত্মরক্ষার জন্য, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখে নাই। তবে লক্ষ্য করিলাম যে ভয় কোথাও কাহারও নাই। জাপান ব্রহ্মদেশে ভারতের পশ্চিম দ্বারে আসিয়া পড়িলেও, কেহ বিশ্বাস করিতেছিল না, জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ বা জয় করিবে। জাপানী শক্তির প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাবই দেখিয়াছি। এমন কি প্রথম যখন কলিকাতায় বোমাবর্ষণ হয়, তখন লোকে ভয়ে পলায়ন করে নাই; হতাশেই করিয়াছিল। আমরা তখন কাণপুরে, অবশ্য নানারূপ গুজব উঠিয়াছিল। কিন্তু কেহই সেসব খুব seriously নেয় নাই।

তবে দেখিলাম, বিব্রত হইয়াছেন সরকারই। একটা অচিন্তনীয়, কল্পনাতীত অবস্থাতে পড়িয়া দিশাহারা হইয়াছেন। যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছিল পুরা—কিন্তু তাহার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। লোককে তাঁহারা বুঝান নাই কি জন্য ও কিসের জন্য total war effort হইবে। শুধু D. I. R. দিয়া এই আয়োজন পুরা করা হইতেছিল। আর সেটা ঠিক সুষ্টু উপায় ছিল না। অথচ প্রকৃত কথা বুঝাইবার সময় ছিল যথেষ্ট। একটু ভাবিবার পরিশ্রম করিলে উপায়ও উদ্ভাবিত হইত,—এমন উপায় যাহাতে দেশের লোকের অসুবিধার পরিমাণ কম হইত। এই অব্যবস্থার ফলে হইয়াছিল এই যে, লোকে সৌখীন জিনিস পয়সা দিয়া যথেষ্ট পাইত, কিন্তু আবশ্যকীয় কিছু পাইত না অনেকেই। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ও ১৯৪৫-এর বস্ত্রাভাব তাহার প্রমাণ। এই ত্রুটী সারিতে আবার যে control ও rationএর ব্যবস্থা হইল, তাহাতে লোকের দুঃখ বাড়িল বৈ কমিল না। নানা কারণে নানা অব্যবস্থা ঘটিল; আর দেশের চতুর লোকেদের মধ্যে লোভটা বাড়িয়া গেল অসামান্য রূপে।

৬।৭ মাস পরে আমরা কলিকাতায় ফিরিলাম। তখন অন্নকষ্ট ভীষণ আকার ধরিয়াছে বাঙলা দেশে। দেখিলাম নরেন্দ্র গিয়াছে জেলে একটা বক্তৃতার জন্য; আর সুনীতির খোঁজ নাই। আসন্নপ্রসবা সুমিতা একলা বাসায়। নরেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া আনিলাম। তাহার চাকরি গিয়াছিল, অন্য কোথাও চাকরি বড় জুটিল না। তাই দয়ালকে মানাইয়া একটা কারখানা খুলার ব্যবস্থা করিতে হইল ও ঠিক হইল, দয়াল ও নরেন্দ্র ওই কারখানার ভার লইবে। দয়াল নরেন্দ্রকে শিখাইয়া লইবে।

এই দয়াল ও তাহার স্ত্রী উমাকে পাইয়াছিলাম দৈবক্রমে পথে। কিন্তু উভয়ে ছিল পুত্র কন্যারই সমান। আরো একটি মেয়েকে পাইয়াছিলাম বোম্বেতে—শ্রীকে। শ্রী—উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ভদ্রঘরের মেয়ে, বোম্বেতে একটি মেয়ে স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিল। হঠাৎ একদা তাহার সহিত আলাপ হয়। আলাপের ফলে স্নেহ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। শ্রী তখন Revolutionary Communist Partyর সহিত সংযুক্ত। অথচ স্কুলে সে সংবাদ জানিতে পারিলে তাহার চাকরি তখনই যাইবে। অবশ্য Partyর উপর তার শ্রদ্ধা কমিয়াছিল। কিন্তু Party তাহাকে মুক্তি দিতেছিল না। তা' ছাড়া শ্রী একজন Communist যুবককে ভালবাসিয়াছিল। তখন তাহাকে বুঝাইতে পারি নাই। কিন্তু তাহাকে আমি বলিয়াছিলাম, "শ্রী, যার যা জীবন, তাকে তা নির্দ্ধারিত পথে চালাতে হবে। তোমার সমস্যা আমার উপদেশে পূরণ হবে না। তবে যদি কখনো দরকার মনে কর উপদেশের, তবে এসো আমার কাছে। আমি তোমার পিতৃস্থানীয়। তোমাকে স্নেহ করি। আমার কাছে তোমার স্থান চিরকাল থাকবে।"

শ্রী পরে আসিয়াছিল।

নরেন্দ্রের মুখেই শুনিলাম, তাহার জেল হইতে মুক্তি পাওয়ার অব্যবহিত পরেই, সে সীতাকে বিবাহ করিয়াছিল। সীতাকে তাহার বাসায় দুই একবার দেখিয়াছিলাম। কেমন একটু অহঙ্কারী আত্মসুখী বিলাস-প্রিয়া বলিয়াই তাহাকে মনে হইয়াছিল। তবে শুনেছিলাম যে—সে কংগ্রেসের জন্য বক্তৃতা দেয়; একজন জানাশোনা ভাবী-অধিনায়িকা। শুধু তাই নয়—মজুরদেরও সভাতে সে মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিত। আমাকেও একদিন শুনাইয়াছিল কিছু। আমি তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিয়াছিল "আমার পরিচয়ে আপনার কি দরকার তা ত বুঝ্‌তে পারছি না। আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেলামেশা আছে, তাতে আপনার দিকে পরিচয় নেবার অধিকার কি রকমে হয়?" ইহার পর আমি আর কিছু প্রশ্ন করি নাই। সেই সীতাকেই নরেন্দ্র বিবাহ করিয়াছিল গোপনে। কিন্তু বিবাহের পর দুজনের বনিবনা হয় নাই। তারপর নরেন্দ্র যখন জেলে, তখন সীতা কোথায় কোন আত্মীয়দের বাড়ীতে গিয়াছিল। নরেন্দ্রের খোঁজ নেয়ও নাই, নিজের খোঁজ দেয়ও নাই।

নরেন্দ্র বলিল, "ভালোই হয়েছে, বাবা। নিজেদের ভুল আমরা বুঝতে পেরেছি।" কিন্তু আমি অস্বস্তি অনুভব করিলাম। অথচ আমার করিবার কিছুই ছিল না।

ইহার কিছু পরে আমি যখন পূর্ব্ববঙ্গ কুমিল্লায় গিয়াছিলাম তখন সেখানে দেখা পাইলাম অপ্রত্যাশিতভাবে সুনীতির। সে একটা মেয়ে স্কুলে কাজ করিতেছিল ও সহরে একটা বাড়ী লইয়া একটি মেয়ের সহিত একত্র বাসা বাঁধিয়াছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে কাজ করিত Revolutionary Communismএর। আমায় বলিল, "এর একটা technique আছে। Congressএর কাজের কোনো technique ছিল না।"

আমি এবং হরনাথ তাহাকে ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে বলিল, 'এখন ফিরে যেতে পারবো না। মাঝ পথে আছি।' শেষ দেখ্‌তে চাই।"

তাহাকে কহিলাম, শেষ তুমি দেখবার সুযোগও অবকাশ পাবে না। আমি কোনোদিন তোমাদের কোন বিষয়ে নিষেধ করি নি। কিন্তু আজ কোরছি। তুমি জান না, কি অসম্ভব কার্য্যে তুমি ব্রতী।

সে শুধু হাসিয়া উত্তর দিল, "অসম্ভব ও সম্ভব হয় একদিন বাবা, ইতিহাসে এই কথাই বলে, তুমি যা বলেছো হয়তো সত্যি। কিন্তু আমি দেখেছি। এ technique-এ কাজ সিদ্ধ হোতে পারে। যেদিন বুঝ্‌বো হবে না, তোমার কাছে ফিরবো।"

সে রহিয়াই গেল।

* *

কলিকাতাতে ফিরিলাম। মফঃস্বলে যাইবার কোনো ইচ্ছা আর যেন ছিল না। সুমিতার একটি মৃত সন্তান হওয়ার পর উমার পরামর্শে তাহাকে আবার কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া দিলাম। যে অভিজ্ঞতা তাহার হইয়াছিল, হয়তো সহজে সে ভুলিবে না ; তবে তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে—এ আশা ছিল।

ইহারই মধ্যে একবার ঊষা আসিল, ছুটিতে। কিন্তু সঙ্গে তাহার আসিল একজন সমব্যবসায়ী ডাক্তার। ঊষার সহিত দেখিলাম ডাক্তারের ঘনিষ্ঠতা খুবই। অথচ ডাক্তার বিবাহিত, পুত্রকন্যার পিতা। ঊষাকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেই সে বলিল, "আমার ভালমন্দ আমি বুঝি। এসব ব্যাপারে আমি কারো হস্তক্ষেপ করার অধিকার স্বীকার করি না—তোমারও না।" তার পর সে বাড়ি ছাড়িয়া হোটেলে গিয়া উঠিল। আমি কিছু বলিতে যাই নাই ; বলার প্রয়োজনও দেখি নাই।

যুদ্ধে পৃথিবীর জাতীয়জীবনে অনেক বিপর্য্যয় বাধাইয়াছে ; আবার অনেক পরিবারের ব্যক্তিগত জীবনেও। আমার সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ আমি করি না।

সুনীতি, ঊষা, সুমিত্রাকে প্রায় হারাইয়াছি। নরেন্দ্রও বদলাইয়াছে। তাহাদের সকলের নিজের নিজের জীবন-যাত্রায় তাহারা ব্যস্ত। আমি তাহাদের দলে থাকিয়াও নাই। আমার মনে হয় যদি যুদ্ধটা না বাধিত তবে হয় তো এমন হইত না।

কিন্তু অন্যদিকে লাভ হইয়াছে। দয়াল ও উমাকে পাইয়াছি। শ্রীকেও শীঘ্র পাইলাম।

শ্রী আসিয়া বলিল, "আপনার কাছেই এলুম। চাকরি রাখতে পার্‌লুম না। Communism সহ্য হোলো না।"

আমি কহিলাম, "বেশ তো। এইবার কিছুকাল বিশ্রাম নাও!" বিশ্রাম সে লইল। কিছুদিন পরে নরেন্দ্র আসিয়া বলিল, "বাবা, শ্রীর অমত নেই। তাকে আমি সব কথা বলেছি। আপনার অনুমতি হোলে আমি তাকে বিয়ে করতে পারি।"

ব্যাপারটা যেন খুব শীঘ্র ঘটে গেল। আমি একটু বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কিন্তু—। আচ্ছা ভেবে দেখি।"

ভাবিয়া দেখিলাম, আমার আপত্তির কিছু নাই। সীতাকে লইয়া নরেন্দ্র কোনদিন ঘর করিবে না। সীতার জন্য তাহার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করারও অর্থ হয় না। তা ছাড়া সীতা ফিরিবে কি না তাহারও ঠিক নাই। মত দিলাম।

কিন্তু যখন বিচারের পূর্ব্বে সীতা আবার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা দিল, তখন অস্বস্তির সীমা রহিল না।

সীতা জানাইল, সে থাকিবে এবং বাড়িতেই থাকিবে। কিন্তু যদিও সে বাড়িরই একটা ঘর দখল করিয়া রহিল, তথাপি কিছুদিন সে আমাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনই রহিল। তার পর হঠাৎ একদিন আমার কাছে আসিয়া বলিল, "দেখুন, আমি চাই না নরেন্দ্র আমার জন্য অসুখী হয়। সে স্বচ্ছন্দে বিবাহ করুক, সুখী হোক। আপনি তাকে বোলবেন যে আমার দিক থেকে কোনো উৎপাত হবে না। আমি যুদ্ধের একটা কাজ পেয়েছি। তাইতে শীগ্‌গীরই চলে যাবো।" তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিলাম, সীতা সত্যই ভাগ্যহীনা। মনটা নরম হইয়া গেল।

বলিলাম, "না গেলে চল্‌বে না, মা ?"

সেও যেন বিস্মিত হইল, কহিল, "না, এখন সব ঠিক হোয়ে গেছে, বাবা। তা ছাড়া থাক্‌বোই বা কোথায় বলুন ?"

কহিলাম, "চলো আমার সঙ্গে। আমার মফঃস্বলের বাড়িতে। সেখানে আমরা শান্তিতে থাক্‌বো।"

সে একটু ভাবিয়া কহিল, "নাঃ! তা আর হয় না এখন। আমাকে যেতেই হবে। যদি ফিরি তখন যাবো আপনার কাছে।"

বলিলাম, "তখন তো বড্ড দেরী হোয়ে যেতে পারে! বলা তো কিছুই যায় না।"

সে উত্তর দিল, "না, দেরী হবে না, বাবা। আর যদি হয়ই, তা হোলেই বা কি ? আপনারও বিশেষ ক্ষতি হবে না ; আমার ক্ষতি আমি তো বেশীই কোরেছি—এটুকুও সহ্য হবে।" তাহাকে রাখিতে পারিলাম না।

* * *

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইরকমে চলিল। যুদ্ধের পরিসর ও উত্তেজনা আর বাড়ে নাই। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দেই তাহা প্রায় চরম হইয়া ছিল—সুতরাং তাহার পর যে প্রবাহ চলিতেছিল তাহা স্তিমিত না হইলেও প্রখরতর

হইয়া উঠে নাই। উলটা মনেহ ইতেছিল, এইবার স্রোতের মুখে ফিরিতেছে। আফ্রিকার যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল। ইতালিতে মিত্র শক্তি হানা দিয়াছে। রুশের এইবার পিছুহটা শেষ হইয়াছে; রুশ আক্রমণ করিতে উদ্যত। কোথাও হিট্‌লারের সব আয়োজন ও পরিকল্পনার ত্রুটী ছিল, কালক্রমে সে ত্রুটী বড় হইয়া উঠিবে হয় তো। কিন্তু এখনই তাহা যেন বেশ বুঝা যাইতেছিল। যে অগ্রসর হওয়াই জীবন মনে করিত; পিছুহটা যাহার পক্ষে ছিল পরাজয়ের লক্ষণ। সেই হিট্‌লারের জবাবদিহিতে একটা ব্যর্থতার আভাস। সে তেজ, সে আত্মপ্রত্যয়, সে দম্ভ আর নাই।

আর ভারতে? ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের কথাও ভাবিবার সময় নাই। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব জনসাধারণের কিছুই লক্ষ্য করিবার সুযোগ সুবিধা নাই। total war efforts চলিতেছে। শুধু তাই নহে। বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্যরা আসিতেছে। মার্কিণের পক্ষে ভারতের পরিচয় এইবার বাড়িতেছে। আমেরিকানরা আসিয়া অনেক কিছু দেখাইল, দেখিল। তাহাদের চলাফেরার ভিতর একটা নূতন জাতির নূতন জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আমেরিকান্ যুদ্ধের সহিত আসিয়াছে, যুদ্ধ শেষ হইলে চলিয়া যাইবে। তাহাদের যে স্মৃতি থাকিবে, তাহা যে বিশেষ স্থায়ী হইবে তাহাও নহে। সেটা শুধু যুদ্ধের একটা নূতন অভিজ্ঞতার অচির স্থায়ী স্মৃতিমাত্র।

মনের প্রকৃতি ও ধর্ম্মভাব

রায়বাহাদুর শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

(২)

মগ্ন চেতনা বা অচেতনার প্রহেলিকা আমাদের দৈনন্দিন অভ্যস্ত কার্য্যগুলির মূলে কিরূপে বিরাজ করে তাহা বুঝিতে হইলে আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের আলোচনা আবশ্যক। স্ফুট-চেতনার ক্ষেত্র (field of consciousness) সঙ্কীর্ণ—মনযোগের বিষয়ীভূত অল্প সংখ্যক বস্তুই চেতনা-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। আমার টেবিলের উপর ছোট একটি ঘড়ি টিক্ টিক্ করিতেছে, আমার মন কিন্তু লেখার মধ্যে নিমগ্ন, ঘড়ির শব্দ আমি শুনিয়াও শুনিতেছি না। আমি যে শুনিতেছি, তাহার প্রমাণ—ঘড়িটি বন্ধ হইয়া গেলে অমনি সেদিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। ঘড়ির শব্দ আমার মগ্ন-চেতনার মধ্যে এমন ভাবে অবস্থান করিতেছে যে উহার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে বিষয়টি অমনি আমার স্ফুট-চেতনার আমলে আসিয়া পড়ে। আমাদের হাঁটা-চলা কথাবার্ত্তা প্রভৃতি অভ্যাসের কাজগুলি অনেক পরিশ্রম করিয়া শিখিতে হয়, শিশুর হাঁটি হাঁটি পা পা আধ-আধ বুলি উহাই প্রমাণ করে। অভ্যাস হইয়া গেলে ঐ সব কাজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি আপন হইতে করিয়া যায়, তখন সেদিকে কাহারো দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন হয় না। জীবনের অভিজ্ঞতা যে-সকল নূতন ভাবের সৃষ্টি করে, নূতন বিষয়-বস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটাইয়া দেয়, মনের তন্ত্র-যন্ত্রের ঐ ভাব ও বস্তুসমূহ টানা-পড়েনের মত বোনা হইয়া যায়। মনস্তত্ত্ব উহাকে বলে ভাবের সংযোগ (association of ideas)। ইহার ফলে আমাদের ভাব ও চিন্তাগুলি পরস্পরের সহিত অথবা কোন বিষয় বস্তুর সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়াইয়া পড়ে যে, স্ফুট-চেতনার ক্ষেত্রে উহার একটি আসিয়া দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় যুগপৎ মনে পড়িয়া যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্—আমার পরলোকগত বাল্য বন্ধুর কথা এখন আর তেমন মনে পড়ে না; কিন্তু দীর্ঘ প্রবাসের পর গ্রামে ফিরিয়া স্কুল-ঘরের পিছনের প্রাঙ্গনে আম গাছটি দেখিবামাত্র হঠাৎ কত কথাই মনে পড়িল। একদিন ঐ গাছ হইতে পড়িয়া বন্ধুর হাত ভাঙিয়া গিয়াছিল, তার পর কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, পরবর্ত্তী জীবনের ভ্রম প্রমাদ, ট্রাজেডি! আমার মগ্ন চেতনার গর্ভে সকল বৃত্তান্ত এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া ঘুমন্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল, এক্ষণে বন্ধুর বিস্মৃত-প্রায় স্মৃতির একটি টুকরা যেমন দেখা দিল অন্য টুকরাগুলিও তেমনই পর পর মাথা চাড়া দিয়া উঠিল।

ভাবের সংযোগ association-এর মধ্যে আমরা যে স্মৃতি শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উহা একটি পরম সহায়, কেননা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়াই মানুষ কর্ত্তব্য কর্ম্মে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু উহার একটি বিপরীত বৃত্তিও মন-প্রকৃতির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ভাবের শুধু সংযোগই ঘটে না, বিয়োগও (dissociation) ঘটিয়া থাকে, তাই কোন একটি ভাব মূল ঘটনা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে, তখন উহার আদি কারণের কথা আর মনে থাকে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হিপ্‌নটিক-নিদ্রাকালে যে ঘটনা ঘটে পাত্রের স্মৃতি হইতে তাহা একেবারে মুছিয়া যায়, অথচ সেই সময় যে সব অনুদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই মত কাজ সে জাগ্রত অবস্থায় করিয়া থাকে। হিপ্‌নটিক অবস্থার সহিত অনুজ্ঞাগুলি মূলত সংযুক্ত থাকিলেও, অচেতনার অন্ধ গহ্বরে উহারা মূল সূত্র হারাইয়া বসে, এবং উহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ (dissociation) ঘটিয়াছে বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গে পাত্রের কর্ম্ম প্রেরণা স্বতন্ত্র ভাবে দেখা দেয়। মানুষের সাধারণ জীবনেও এমন ঘটনা বিরল নহে, যাহার স্মৃতি মাত্র অবশিষ্ট নাই, অথচ উহার প্রভাব জীবন ভোর রহিয়া গেছে। শিশুকে অন্ধকারে ভূতের ভয় দেখাইলে, বড় হইয়া তাহার ঐ বিশিষ্ট দিনের স্মৃতি মনে থাকিবার কথা নয়, কিন্তু তাহার অন্তরে

যে ভীতির সঞ্চার হইল তাহা হয়ত কোন দিনই সে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। উন্মাদের কথায় ও ব্যবহারে যে-সব অসঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষ্য করা হয়, মনোবিজ্ঞান ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দ্বারা দেখাইয়াছে যে অচেতনার অতল-সিন্ধুর উহারা কতিপয় বুদ্বুদ মাত্র। যে প্রবৃত্তি সুপ্ত নিরুদ্ধ, যে আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ, যে উদ্যম আগ্রহ-বিকল অসিদ্ধ—পাগলের প্রলাপোক্তির মধ্যে উহারাই সব আদি কারণের নোঙ্গর ছিঁড়িয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

ভাব জগতে বিচ্ছিন্নতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা দ্বি ব্যক্তিত্বের (double personality) মধ্যে পাইয়া থাকি। ষ্টিভেনসনের বিখ্যাত কাহিনী Dr. Jokyl and mr. Hyde অনেক পাঠকের সুপরিচিত —একই মানুষের দুইটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা, ইহার নাটকীয় ভাব আমাদের মনে স্বভাবত একটু চমক লাগাইয়া দেয়। কিন্তু সত্যকার জগতেও দ্বি-ব্যক্তিত্ব বিরল নহে, উইলিয়ম জেম্‌স্ বর্ণিত রেভারেণ্ড আনসেন বোর্ণের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া কলাপ হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি রেভারেণ্ড আনসেন বোর্ণ নামক জনৈক ধর্ম্মযাজক প্রভিডেন্‌স্ নগরে একটি ব্যাঙ্ক হইতে কিছু টাকা তুলিয়া একটি ট্রাম গাড়িতে চড়িয়া বসেন। ইহার পরে যে কি ঘটিল আর তাহার মনে রহিল না। তিনি সে দিন বাড়ি ফিরিলেন না, দুই মাস পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদও কেহ পাইল না। ১৪ই মার্চ্চ সকালে পেনসিল ভেনিয়ার অন্তর্গত নরিস টাউনে এক ব্যক্তি ঘুম হইতে উঠিয়া বিষম হৈ চৈ কাণ্ড বাধাইয়া দিল। সে নিজেকে ব্রাউন নামে পরিচয় দিয়া মাত্র ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র মনিহারি ও মিষ্ঠান্নের দোকান খুলিয়াছিল। এক্ষণে সে ত্রস্ত ভীত হইয়া স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, এ কোন্ স্থান, সে এখানে আসিল কিরূপে? সে বলিল, তাহার নাম বোর্ণ, সে একজন পাদ্রী, দোকানদারীর কিছুই সে জানে না—এবং শুধু এইটুকু তাহার মনে আছে যে গতকল্য সে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ভাঙাইয়া আনিয়াছে।

মনের এক অংশ অপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, অবচেতনায় অন্তরালে উভয়ের পাশাপাশি অবস্থান করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ নাই বলিয়া স্ফুট চেতনার ক্ষেত্রে উহার একটি অংশ মাত্র দেখা দেয়। ভাব-প্রণালীর দুই অংশ যদি সমান প্রভাবশালী হইয়া উঠে, তবে একটির পর আর একটি অংশ সমভাবে চেতনার বিষয়ীভূত হইলে তখনই উহা দ্বি-ব্যক্তিত্বের রূপ ধারণ করে। আর যখন বিচ্ছিন্ন অংশটি ক্ষুদ্র, সুতরাং সারা মন অধিকার করিবার মত শক্তি উহার নাই, ঐ বিযুক্ত চিন্তাখণ্ডই তখন স্বতন্ত্র ভাবে গড়িয়া উঠে, কিন্তু মূল ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ লুপ্ত হয় না। ইহারাই চরম পরিচয় আমরা পোষ্ট-হিপ্‌নটিক অবস্থায় পাইয়া থাকি।

মনোবৃত্তি নিগ্রহের (repression) ফলে নানাবিধ মানসিক বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত হয়, মনোবিজ্ঞানের ইহা একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার। সামাজিক রীতি নীতি ও শিক্ষা শৈশব হইতে মানুষের মনকে এমন করিয়া গড়িয়া তোলে যে সমাজ-বিরুদ্ধ কোন চিন্তা জাগিলে তাহার চিত্তে আত্ম-ধিক্কার জন্মে। কিন্তু স্বভাব-বৃত্তিগুলি স্বয়ং-সিদ্ধ নীতিধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে উহারা নীতিবিগর্হিত। তাই যখন নীতি বিরুদ্ধ বৃত্তিগুলি চেতনা-ক্ষেত্রে ঠেলিয়া উঠিতে চায়, মানসিক বিচার-যন্ত্র (mechanism of censor) তখন উহাদের পথ বন্ধ করিয়া দেয়—ফলে উহারা অবচেতনা বা অচেতনার বদ্ধ দুষ্ট কারাগৃহে আটক থাকিয়া নানা অনর্থের সৃষ্টি করে। মনের অন্তস্তলে স্বভাব-বৃত্তির সহিত নীতির এই যে শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাই যখন চেতনা ক্ষেত্রে দেখা দেয় এবং দ্বৈরথ-দ্বন্দ্বে নীতিই বিজয়ী হইয়া উঠে, আমরা তখন উহার মধ্যে বিবেকের সন্ধান পাইয়া থাকি, হয়ত বা ঈশ্বরের বাণীও শুনিতে পাই। কিন্তু অবচেতনা বা অচেতনার অন্ধকার অন্তর্বিরোধকে প্রচ্ছন্ন রাখিলেও, উহার ফাঁক দিয়া গলিয়া কখনো কোন স্বভাব-বৃত্তি রূপ বদলাইয়া চেতনার মঞ্চে আসিয়া দাঁড়ায়—কখনও বিকৃত আকারে কখনো বা উন্নীয়নের (sublimation) আশ্রয় লইয়া—তখন উহার স্বরূপ বুঝিয়া উঠা কঠিন হইয়া পড়ে। নিমন্ত্রনে বসিয়া কেন যে এক ব্যক্তি অপরের পাতে দই দিতে বলে, এবং বন্ধুর বিবাহে অনূঢ় যুবকের হঠাৎ কেন অতিরিক্ত উৎসাহ দেখা যায়—উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখিলে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য সহজেই ধরা পড়িবে। এক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতের দই খাইবার লোভ ও যুবকের বিবাহ করিবার অভিরুচি বিকৃত আকারে দেখা দিয়াছে। তেমনই নীতি বিগর্হিত ভাব গুলিকেও উন্নীয়নের আশ্রয় লইয়া স্ফুট আলোকে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়—যেন উহাদের মধ্যে দুর্নীতির গন্ধের লেশমাত্রও ধরা না পড়ে। ধর্ম্মের সুর-সপ্তকে অরোহণ করিয়া যৌন-বৃত্তিও ভগবৎ প্রেমের আবেগ মূর্চ্ছনার উচ্ছ্বাসে ফাটিয়া পড়ে—কুৎসিত কদর্য্য পঙ্কে পদ্ম বিকচ শোভায় ফুটিয়া উঠে, ইহা প্রাকৃতিক বিধান নহে, মন-প্রকৃতির মত সত্য।

প্রবৃত্তির তাড়নাকে সমূলে বিনষ্ট করিবার চেষ্টায় শুধু নিগ্রহের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটে না। বাহুশক্তির বলে বিদ্রোহ চূর্ণ হইলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। ন্যায়পরায়ণ স্থিরবুদ্ধি রাজা যখন বিদ্রোহী প্রজামণ্ডলীর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তখনই রাজ্যে শান্তির মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠে। তেমনই মনকে স্বাস্থ্যবান ও সবল করিতে হইলে, মনের আড়ালের দুষ্প্রবৃত্তিগুলিকে চেতনার ক্ষেত্রে টানিয়া তুলিয়া উহাদের সহিত কোনরূপ আপোষ-রফা করিতে হয়। নানা প্রকার যুক্তি দেখাইয়া উহাদের নিরস্ত্র করাও সম্ভব, এবং এখানে উন্নয়নের (sablimation) অমোঘ কৌশল আমাদের অনেক প্রকারে সাহায্য করিতে পারে। এইরূপ প্রণালী অবলম্বনের ফলে আমরা ভয় ও স্বার্থকে দেশপ্রেমে রূপান্তরিত হইতে দেখিতে পাই—যৌনবৃত্তি ভালবাসায়, প্রতিহিংসা ক্ষমাধর্ম্মে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ পরার্থপরতায় পরিণত হইয়া মনকে শান্ত সমাহিত সাধু ভাবাপন্ন করিয়া তোলে।

স্থূলভাবে মনস্তত্ত্বের যে রহস্যগুলির আলোচনা হইল এক্ষণে মানুষের ধর্ম্মভাবকে উহারই আলোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এই

প্রসঙ্গে মনের দুইটি বৃত্তি—অন্তর্মুখী (introvert) ও বহির্মুখী (axtrovert) বিষয়ে কিছু আলোচনাও আবশ্যক। অন্তর্মুখী মন বিষয়-বস্তু হইতে আপন অনুভূতিকে পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম। বস্তুগুলির পরস্পর সম্বন্ধ এবং সেই সঙ্গে আপনার সহিত উহাদের যোগসূত্র ধরিয়া অনুভূতিকে বিচার করা অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন দার্শনিকের মনোবৃত্তি। পক্ষান্তরে বহির্মুখী মন বাহিরের বস্তুর সহিত আপন অনুভূতিগুলিকে জড়াইয়া অথণ্ড বাস্তব জগতের সৃষ্টি করে। মনের ভিতর অনুভূতিগুলির যে একটি স্বতন্ত্র স্থান ও মূল্য আছে তেমনই বাহিরের বস্তুগুলির সত্তা ও অনুভূতি নিরপেক্ষ—এরূপ বিচার বিশ্লেষণ বহির্মুখী চেতনার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাই ঐ প্রকৃতির মানুষ বস্তু-জগতের কর্ম্ম-যজ্ঞে আপন অনুভূতিকেই আহুতি দিয়া বসে। অধ্যাপক ম্যাক্ ডাউগেলের ভাষায় এই দুই বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি যখন অতিমাত্রায় প্রকাশ পায় তখন মদ্যপান ও আফিম সেবনের দুই বিপরীত গুণ-ধর্ম্ম আমরা উহাদের মধ্যে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। মাতালের মনে চিন্তা ও কর্ম্মের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, মনের উচ্ছ্বাস ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া কার্য্যের অদম্য উৎসাহে পর্য্যবসিত হয়—বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিও অনেকটা এইরূপ। কিন্তু অন্তর্মুখী মন আফিমখোরের মত মশগুল হইয়া অনুভূতির সম্ভোগ ও আত্মরতিক্রিয়ায় নিমগ্ন থাকে।

শামুকের মত যাহারা মনকে সংহৃত করিয়া অনুভূতির বিচার বিশ্লেষণ ও সম্ভোগে রত হইয়া থাকেন, আর যাহারা মাকড়শার মত কর্ম্মজগতে অপরিসীম উদ্যম ও উৎসাহের সহিত নিরন্তর জাল বোনার ব্যস্ততায় অন্তরের অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য ও অর্থ হারাইয়া বসেন—এই দুই প্রকৃতির মানুষ একত্র বসবাস করিলেও কেহ কাহারও ভাষা বুঝিতে পারিবেন না। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই। অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী চিত্তবৃত্তির মূলে বংশক্রমের প্রভাব থাকিলেও উহাই একমাত্র বা প্রধান হেতু নহে। শিক্ষা ও আবেষ্টন উভয়ে মিলিয়া মনকে যে ক্ষেত্রে যেমন ঠিক তেমনি করিয়া গড়িয়া তোলে। যেখানে কর্ম্মক্ষেত্র, সুবিস্তীর্ণ, সুযোগ সুবিধার অন্ত নাই, প্রাণবন্ত শিক্ষা সেখানে কর্ম্মপথ ধরিয়া মানুষকে কর্ম্মবীর হইতে প্রবৃত্ত করিবে, ইহা স্বাভাবিক। আর ঐরূপ অবস্থার অভাবে কর্ম্মহীন জীবনের অসারতার মধ্যে মন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে ইহাও বিচিত্র নহে। তবু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মনোবৃত্তি নিছক অন্তর্মুখী বা বহির্মুখী নহে, সকলের মধ্যে উভয় বৃত্তি অল্পবিস্তর আছে, এবং অন্তর্মুখী মন যেমন সহজে বহির্মুখী হইতে পারে, বহির্মুখীরও তেমনই অন্তর্মুখী হইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। এই দুই বৃত্তির সমভাবে অনুশীলন ব্যক্তির জীবনকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। কিরূপ প্রণালী ও উপায় অবলম্বন করিলে এই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, বর্ত্তমান জগতে প্রকৃত শিক্ষার উহাই একটি সমস্যা।

মানব প্রকৃতির ধর্ম্মভাব সব ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী বৃত্তির বিকাশ মাত্র নহে। ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানগুলি জাঁক জমক, শোভাযাত্রা, পূজার আড়ম্বর, এমন কি মন্ত্রের আবৃত্তি—এ সব বহির্মুখী চিত্তের বাহিরের কর্ম্মকুশলতার পরিচায়ক, অন্তরের অনুভূতি বাহিরকে আশ্রয় করিয়া উহারই মধ্যে ডুবিয়া আছে। মন তখন নিজের অনুভূতি লইয়া বিজনে বসিয়া নাই, আত্মরতি বা অনুভূতির সম্ভোগ নাই—বহির্মুখী মন বাহিরের বস্তুকেই অনুভূতিময় করিয়া তুলিয়াছে। তাই যেমনই কেহ ঐ সব অনুষ্ঠানের বিঘ্ন ঘটাইবার উপক্রম করে অমনি ঝগড়া বিবাদ এমন কি দাঙ্গা বাধিতেও দেখা যায়।

হিপনটিজমের আলোচনা প্রসঙ্গে অনুদেশের (suggestion) কথা বলা হইয়াছে, অবস্থা বিশেষে উহাই মানুষের মনে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তোলে কিরূপে, একটু বিবেচনা করিলে বোঝা কঠিন হইবে না। শৈশবে মানুষের মন স্বভাবত কোমল থাকে, তাই বিনা বিচারে যে কোন অনুদেশ গ্রহণ করিতে সে দ্বিধা বোধ করে না। সমাজের লৌকিক ধর্ম্মের বিধান, সংস্কৃতিগত আচার পদ্ধতি, ধর্ম্মমূলক কাহিনী ও অনুশাসনগুলি সবই সে সত্য বলিয়া মানিয়া লয়। এইরূপে আবেষ্টন ও শিক্ষা আপ্তবাক্যে বিশ্বাসের ভূমিরূপে মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখে। পরিণত বয়সে যুক্তি তর্ক যদি বা কখনও মাথা খাড়া করিয়া উঠিতে চায়, সে তখন বিশ্বাসের সমর্থন কল্পে কতিপয় মন গড়া যুক্তির অবতারণা করে—অথবা বিশ্বাসকে যুক্তি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া মনের এক প্রান্তে 'যুক্তির মানুষ' ও অপর প্রান্তে 'বিশ্বাসের মানুষ' এমনই একপ্রকার দ্বি-ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করে যে, ব্যক্তির উভয় অংশের মধ্যে আদান প্রদান প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। হিপ্‌নটিক পাত্রের মত বিচার-বুদ্ধির নির্ব্বাসন দ্বারা মনকে অনুদেশ গ্রহণের যোগ্য আধাররূপে পরিণত করে সে নানাবিধ উপায়ে—ধূপ ধুনার গন্ধ, মন্ত্রের ধ্বনি, স্তিমিত আলোক, উপবাস সবগুলি মিলিয়া তাহার অন্তর মধ্যে সম্মোহন সৃষ্টি করে। সেই মায়া-মরীচিকার বাষ্পসিক্ত কুহেলী আবরণের অন্তরালে প্রস্ফুটিত ভক্তি বিশ্বাসের অপার্থিব পারিজাতগুলি আমাদের কাছে ধর্ম্মভাব বলিয়া পরিচিত।

পাপোঽহম্ পাপকর্ম্মাঽহম্—পাপের এই অনুভূতি হইতে নিষ্কৃতি লাভের ব্যগ্রতা মনের ভিতর অনেক সময় প্রকৃত ধর্ম্মভাব আনিয়া দেয়। ঐরূপ ধর্ম্মভাব একদা দস্যু রত্নাকরের মনে জাগিয়াছিল, তেমনই অনুতাপ ও অনুশোচনার প্রভাব লম্পট বিল্বমঙ্গলকে ধর্ম্মপথের সন্ধান দিয়াছিল। পাপ পুণ্যের আলোচনার স্থান এখানে নহে, শুধু এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সমাজের বিধি অনুশাসনের সঙ্গে পাপ পুণ্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ট, তাই সামাজিক বিষয়ে খুঁটি-নাটি নিয়ম ভঙ্গ হইতে নরহত্যা পর্য্যন্ত সব কিছুই মনের ভিতর পাপের ছাপ অঙ্কিত করিতে পারে। কিন্তু নীতিবোধ যাহার মধ্যে সচেতন এমন সমাজ ধর্ম্মভীরু লোকের অন্তরেই পাপের অনুভূতি প্রখর ভাবে জাগে। বংশক্রম বা অন্য কারণে বদ্ধ-প্রকৃতি চোর বা ডাকাতের মনে নীতিবোধ যথেষ্ট জাগ্রত নহে বলিয়া অনুতপ্ত ভাবের আবেগে ধর্ম্মের স্মরণ লইতে তাহাকে কদাচিত দেখা যায়।

কিন্তু নিষ্কৃতি চায় মানুষ শুধু পাপের অনুভূতি হইতে নহে—মুক্তির আকাঙ্ক্ষার মূলে গভীর দর্শনতত্ত্বের কারণও থাকিতে পারে। শিশুকাল হইতে সে বাহ্য বস্তুর সহিত নিজেকে জড়াইয়া বাহিরের মধ্যে অন্তরের বাসা বাঁধে, আপন সত্তাও রচনা করে বাহিরকে লইয়া—সংসারের কাজে

ও চিন্তায় সুখ দুঃখ আশা নিরাশার সঙ্গে বহির্মুখী মনের একাত্মবোধ জন্মে। বাহিরের জিনিসগুলি তাহার আপন হইয়া উঠে, অন্তরের দেবতাটি কিন্তু অসাড় শূন্য মন্দিরে গুমরিয়া কাঁদিয়া মরে। আপনার এই অন্ধকূপ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার জন্য, ধর্ম্ম-সাধনা বহু যুগ ধরিয়া বহু জাতির মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে—যুগে যুগে সাধকের মন অন্তরের আকাশে মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত বিচরণ করিয়াছে।

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি, অরূপ রতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরবো না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

শিল্প ও কাব্যের অনুরূপ এই মত মনোবৃত্তি লইয়া সাধক সংসার লোকের অন্তরালে যে বিচিত্র ভাব রাজ্যে প্রবেশ করেন, সম্মোহনের বুটা আনন্দ ও ভূয়া পরিতৃপ্তির স্থান সেখানে আছে সত্য—কিন্তু যুগ-যুগান্তের সাধনা প্রচুর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আনিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়াছে। তাই একাগ্র সাধনার বলে প্রমাদ ও মোহ কাটাইয়া সাধকের চিত্ত সমগ্র বিশ্ব-সত্তার অব্যক্ত অনুভূতি আপন অন্তরে ধারণ করিয়া জীবনকে পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর মধুময় করিয়া তুলিতে পারেন, সে-বিষয় সন্দেহের অবকাশ নাই।

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট এম-এ

৬

কিন্তু সিংহাসনারূঢ়া দেবীর কর্ণে তা পৌঁছায় নি। সে ত মানবী বটেই; কতক্ষণ আর জড়পুত্তলীর মত নির্ব্বাক্ গম্ভীর ও হাস্যহীন হয়ে থাকা যায় এ অবস্থায়, হোক্না নূতন শ্বশুরালয়? স্বামীর বন্ধুর দল প্রাণরসে উচ্ছল কৌতুক রহস্যে উৎসারিত হয়ে নূতন জগতে পদার্পণের পথে শুভ সম্ভাষণ জানাচ্ছে। এদের কি একটুও সাড়া দেবে না বা দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে সে? হাজার হোক্ মানবী ত? একপক্ষ কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণের দ্বিধাহীন বিচারহীন আনন্দপ্রসাদে অবিরাম মুখর হয়ে চলবে; অপর পক্ষের মুখ কতক্ষণই বা এ অবস্থায় মূক হয়ে থাকতে পারে? নববধূর অধরপ্রান্তে মাত্র একটু হাসির হেমাভা ফুটে উঠছে এমন সময়ে কে বলে উঠল, দেবী, অবধান করুন। আপনার রাজসভার সভাকবি বানভট্টকে আপনার সিংহাসন সমীপে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবার। এর নাম হচ্ছে নীহারিকা—প্রদ্যুম্নের সব চেয়ে বড় বন্ধু।

হঠাৎ বজ্রপাত হলেও এ বাড়ীতে এত তোলপাড় হত না। বধূর মুখ মুহূর্ত্তে বিপন্ন হয়ে গেল আর চারিদিকে অন্তরালে কৌতূহলী নেপথ্যচারিনীদের চক্ষুগুলি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। প্রতিবেশিনী কে একজন চট করে ছুটে গেল মোক্ষদা সুন্দরীর কানে এই মোক্ষম খবরটী তুলে দিবার জন্য। সব আলো সব হাসি সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল, থেমে গেল পুরনারীদের শত কলকাকলী। মোক্ষদা সুন্দরীর প্রসন্ন মুখের তৃপ্ত হাসি তপ্ত অক্ষিগোলকের কেন্দ্রস্থলে অব্যক্ত বেদনার সঙ্গে মিশে মুছে চলে গেল। আমার ছেলের সবচেয়ে বড় বন্ধুর নাম—নীহারিকা। আর এই বিয়ে বাড়ীতেই ছেলেদের ভীড়ে সে এসেছে? কি নাম? নীহারিকা?

বন্ধুদের কলকাকলীই শেষ পর্য্যন্ত সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। নববধূও ত কচিসংসদ পড়েছে। সেও ত জানে যে বাঙ্গালীর কোমল নমনীয়তা ও বন্ধুসুলভ রহস্যপ্রিয়তা কি পরিণাম দাড় করতে পারে। সামনে দাড়িয়ে নীহারিকা অথ পিতৃদত্ত নাম শোভিত নীহাররঞ্জন যুক্ত করে নমস্কার করছে দেখে তার অধর প্রান্তে ধীরে ধীরে হাসির আভাস আবার ফুটে উঠল। শুষ্ক রসহীন মরুভূমির এক প্রান্তে যেন নির্ঝরধারার একটী ক্ষীণ জলস্রোত বয়ে আসতে লাগল। নিশ্চলা নিরনুভবা প্রতিমা চঞ্চলা অনুভবময়ী প্রাণমূর্ত্তি হয়ে উঠল।

নীহারিকার উপহার একটী রূপার উপর মিনার কাজ করা সিন্দুরকৌটা—ভ্রমরের আকৃতি। পাড়ার একটা পরিপক্ক ছেলে রসাধিক্য বশত এই দলের ভিতরে ঢুকে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাকে কেহ পরিচয়ও করিয়ে দেয় নি বা

তার দিকে দৃষ্টিও দেয় নি। বেচারা আজকের দিনেও যদি নববধূর দৃষ্টি প্রসাদ না লাভ করতে পারে তবে পাড়ার ছেলেদের কাছে তার মহিলানবীশ বলে নাম রক্ষা করা শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। সে এতক্ষণে একটা সুযোগ পেয়ে নীহারিকার উপহারটীর দিকেই যেন লক্ষ্য রেখে হঠাৎ গেয়ে উঠল, আপন মনে

'ঘরেতে ভ্রমর এল গুণগুণিয়ে'

সঙ্গে সঙ্গেই সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে দেখল যে দরজা অবরোধ করে দাড়িয়ে আছেন বিরাট্‌কায়া ডিনামাইট ফাটানোন্মুখ শ্রীমতী মোক্ষদা সুন্দরী।

৭

কলেজের ছাত্রের শত্রু সবাই এ বিশ্বসংসারে।

পার্কের কোণায় গাছের ছায়ায় ক্লাস পালান মন্ত্রণা-মণ্ডলী বসেছে আর এই ফতোয়াটা দিয়েছে কেশব।

সবাই একবাক্যে মাথা নেড়ে সমর্থন করল। সবাই শত্রু; শত্রুপুরীতে এক একটী অভিমন্যু আটকিয়ে পড়েছে। উত্তরা ত ছিল না তাদের কারো—রণবেশে সাজিয়ে দেবার জন্য; তাই উত্তর দিতে পারে নি অধ্যাপকের সপ্রশ্ন আক্রমণের। পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে সময় কাটিয়েছে —যাতে তার মুখের দিকে তাকাতে না হয়। তাতেও শান্তি নেই। তিনি ওদের দলকে দল চুপ করে থাকতে দেখে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—বেশ আছ তোমরা। একজন লিখছে কবিতা, কেহ গাইছে গান; আড্ডা, বখে যাওয়া সবই চলছে শুধু পড়াটা বাদে। সবারই পরকাল হবে ঝরঝরে। ফেল পড়বে তোমরা পৌষের ঝরা পাতার মত তা জেনে রেখো।

ওরা তখন অবশ্য সবাই চুপ করেছিল; কিন্তু ক্লাস পালিয়ে সবাই এখন মুখ খুলেছে। কেশব বলে চলল— কলেজের ছাত্রের শত্রু সবাই এ বিশ্ব সংসারে। যদিও আমরা—জেণ্টেলম্যান য়্যাট লার্জ প্রফেসার গুপ্ত বলেন দড়ি ছেঁড়া গরু। আরে বাবা, দড়িটা ছিঁড়তে দিচ্ছ কোথায়? পার্শেণ্টেজের নাগপাশে ত দিনগুলি বাঁধা, আবার তড়ি ঘড়ি টিউটোরিয়ালও আছে। নবীনবাবু অবশ্য বয়সে প্রাচীন, কিন্তু অর্ব্বাচীনের মত পড়া নিতে চান।

"যা বলেছ"—বলে উঠল হরিহর—যা বলেছ একেবারে নিয্যস সত্যি কথা। বাড়ীতে আবার মামা ভাবছে কবে পড়ার খরচ শেষ হবে আর আয় হবে সংসারে। যেন ছাই পাশ পাশ করলেই চাকরী স্বয়ংবরা হবে বলে বসে আছে। দুটো মন্তর ঝাড়লেই হল।

বঙ্গম্যান বলল—শুধু তাই নয়। ওই তোমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় না বিশ্বহত্যালয় কি তোমরা বল, ওটা আয়ত্ব করেছে সব চেয়ে বড় অস্ত্র আমাদের বধ করবার জন্য। কি কুক্ষণে একজন ইংরেজীতে বই লিখেছিল সাইন অব দি ক্রশ আর হলিউডে তার ছবি তুলেছে। আমাদের

"সাইন অব দি ক্রশ"

কলিউডের ইউনিভার্সিটির কাছে ওটা আর নতুন কিছু নয়। বছর বছরই ত ও ছবিটার পুনরাভিনয় করে যায়। তবে চালাক লোকের কারবার, তাই পয়সা খরচ করে কাঠের ডাণ্ডায় মানুষ না লটকিয়ে শুধু নামগুলো কেটে ফেলে টাঙ্গিয়ে দেয়, তা-ও নিজেদেরই নিখরচায় পাইকিরি দেওয়ালে।

হরিহর বলে উঠল—বা বা, মনে করিয়ে দিয়েছ খুব। কবছরের পরীক্ষাসমরে হতাহতের সংখ্যা বড় বেশী হয়েছে। আমাকে ঘায়েল করলে মামা 'বয়েল' হয়ে উঠবে। তার চেয়ে এবার থেকে একটু ঠিকমত পড়া যাক; আর পড়া নিতে চাইলেই ক্লাস পালানটা বন্ধ করতে হবে এবার থেকে।

প্রদ্যুম্ন পড়ুয়া ছেলে। তবে বেশী পড়া আর ভাল লাগে না তার। সে বলল—একটা খুঁত রয়ে গেল তোমার মতলবে। সেটা হচ্ছে যে ঠিক কতখানি পড়লে একটু

মাঝারি গোছের পাশ করা যাবে অথচ একবারের পরীক্ষাতেই তিনবার ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়ে রয়াল ক্লাশের ত্র্যহস্পর্শের ছোঁয়াচ এড়ান যাবে তা না ঠিক করতে পারা পর্য্যন্ত আমার পড়তেই ইচ্ছা হচ্ছে না।

কথাটায় কেশবের আঁতে ঘা লাগল। সাংসারিক ভদ্রব্যক্তিরা সবাই তাকে বিপদ্‌বান্ধব সমিতি নিয়ে মাতামাতি থামাতে বলছে পরীক্ষার ভয় দেখিয়ে। সে একটু গরম হয়ে বলল—আর একটু ওপরের দিকে পাশ করেই বা স্বর্গটা পাচ্ছ কি? পড়ে শুনে কি আর সংসারে কেউ বড় হচ্ছে আজকাল? পড়ার দিন মারা গেছে। যদি ডাক্তার হতে চাও পেটেণ্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন পড় ছেলেবেলা থেকে আর ষ্টেথিসকোপটা কেনার খরচা চেয়ে চিন্তে যোগাড় করে রেখো। মিটকেলের পাশের চেয়ে কম্বলের পাশের পশার বেশী আর আদি ও অকৃত্রিম হাতুরোপ্যাথার ডাক্তার কামাই করে আরো বেশী। আরে, সহস্রমারী কথাটা বদনাম নয়। অতগুলি রুগী পয়সা খরচ করে এসেছিল বলেই ত চিকিৎস ওদের মারতে চান্স পেয়েছিল।

রাজীবের মনে ধরল কথাটা। রাজনীতি করতে করতে পড়ার সময় বা মন দুই-ই হওয়া শক্ত হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। সে বলল—আমিও তাই বলি। যদি উকিল মোক্তার হতে চাও ত বক্তৃতা হৈহয় সংঘ এসব করতে লেগে যাও আমার মত। পরীক্ষা-টরীক্ষা রেখে দিয়ে সভা সমিতি কর আমার মত। তাতে হয়ত টাকা বাড়বে না কিন্তু নাম বাড়বে অর্থাৎ তুমি বড় হবে। ভবিষ্যতের চৌকস মানুষ দেখবে গড়ে উঠেছে পলিটিক্সের ভিত্তিতে। তাই পুঁথি পুতে রাখ কলেজের ভিতের তলায়। তুমি কি বল, নীহারিকা?

ক্লাসে কবিতার উপর কটাক্ষ করায় সে খুবই মর্ম্মাহত হয়েছিল। সে-ও সম্পূর্ণ একমত পড়াশোনার ব্যর্থতা সম্বন্ধে। সে বলল—আর পড়েই বা কি হবে? তাতে বড় জোর বেগ বরো য্যাণ্ড কোম্পানীর আজীবন দাসখত লেখানো একটা চাকরী জুটতে পারে। তা-ও অবশ্য চাকরীটা যদি টেকে এবং তুমি যদি টেক অর্থাৎ পটল লীগ্‌গিরি না তোল। বি-এ পাশ করে অনার্সের রাজহংস হয়ে যদি মিষ্টার ধনেশ্বর আঢ্যের অফিসে একটা কেরাণী-গিরি পাই কোনমতে তাহলে হয়ত দেবে ত্রিশ টাকা। তা-ও যদি সে আমায় বেশীদিন রাখে কারণ প্রবেশন খাটিয়েই ঘাড়ে ত্রিশূলের খোঁচা লাগাতে পারে। কিন্তু যদি তার বাড়ীতে প্রভু জগড়নাথের দেশের বেয়ারা হই কোন্ না কোন্ কম সে কম চল্লিশ টাকা কামাব আর সে আমায় রাখবে না আমিই তাকে রাখব তা প্রায়ই ভেবে দেখতে পারব। আর গিধোড় থেকে এসে যদি ড্রাইভার সেজে বসি তবে শুধু যে পচাশ রুপেয়ার জন্য হাঁকব তা নয় আঢ্য সাহেবের সন্ধ্যার আড্ডা তার পারিবারিক জগন্নাথের রথ সবই মুখ চেয়ে থাকবে আমার সময়মত হাজিরার উপর। হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস শুনলেই হুজুরে হাজির হওয়া না হওয়া আমারই হাতে থাকবে।

একটু থেমে নীহারিকা আবার বলে চলল—আমাদের শিক্ষার জন্য যে স্বার্থত্যাগ, কৃষ্টির জন্য যে কষ্ট স্বীকার তার দাম দেশ কিছুতেই দিতে চাইছে না এ যুগে। এসব যেন ভেসে এসেছে সংসারে আর সংএর মতই অসার আমরা ভেসে যাচ্ছি দারিদ্র্যের দরিয়ায়।

হরিহর এই কথার মাঝখানে বলে ফেলল—সত্যিই চাকরি পাওয়া কি দুঃসাধ্য ব্যাপার। একেবারে উমার তপস্যা যেন, তাই না?

নীহারিকা উত্তর দিল—তপস্যা তুমি করতে পার কিন্তু বর পাবে না একথা বলে রাখছি। তুমি হচ্ছ কাঠ হিন্দু। তোমার হচ্ছে দুর্গতিবিপরাকাষ্ঠা; কারণ কাঠ উচানই রয়েছে সকলের তোমার মাথার উপর। তা দোষও নেই। কাঠ হিন্দু প্রায় কাঠ মেরে গেছে এত দিনে, নেই প্রাণ নেই অনুভব বা নমনশীলতা। হিন্দু যেন একেবারে বৌদ্ধ হবার পণ করেছে। নির্ব্বাণের আর বেশী বাকী নেই তার। বোধিসত্বের মত সব ত্যাগ করতে রাজী, সব সত্বেবোধই তার লোপ পেয়ে এসেছে বহু জায়গায়। তোমার চেয়ে একজন কুলী বেশী কামায়। বিশেষ করে শিক্ষিত লোকের ছেলে-মেয়েরা পড়াশোনায় খরচ করবে যে সময়টা, অশিক্ষিত লোকের ছেলেমেয়ে সে সময় কাজ করে। তোমার চেয়ে তার অভাব কম কিন্তু আয় বেশী। তার বিলাস অবশ্য কম কিন্তু ব্যসন বেশী। তবু তার জন্য দরদে অশ্রুপাত করছে সবাই—করাটাই আবার ফ্যাসান। বিশ্বাস না হয় রাশ্যান রশুনের গন্ধ মাখানো আধুনিক সাহিত্য পড়ে দেখ। আর

সে সাহিত্য লিখছে কারা ? যাদের আপনার খেতে ঠাঁই নেই, শঙ্করাকে ডাকে তারা। নিজের মনকে চোখ ঠেরে নিজের দিকে না তাকিয়ে নিম্নমধ্যবিত্তরা তাদের চেয়ে যারা কষ্ট কমই পায় তাদের সাফাই গাইতে লেগেছে আজকাল। তুমি ভদ্রলোক, তোমার নিজের চুলো জ্বলে না, কিন্তু চাল বজায় রাখতে গিয়ে চুলোতেই চলেছ। তা নিজের অভাবকে ভদ্রভাবে ভুলে থাকবার চেষ্টা কর ক্ষতি নেই, কারণ নিজের দুঃখের কাঁদুনী গাইতে নেই। সেটা রেস্‌পেক্টেবল নয়। সভ্য ভব্য বুর্জোয়া তুমি, নিজে যে ভবধাম বর্জন করতে বসেছ তাতে কিছু যায় আসে না। দুনিয়ার মজদুরের জন্য দরদ দেখিয়ে তোমার বিশ্বপ্রেম প্রচার করো। দরকার নেই আমার পলিটিক্সে, দরকার নেই পড়াশুনোয়। ডিমোক্র্যাসীর ডিমে তা দিতে দিতে যখন একদিন তা ক্র্যাস করবে, তখন তা থেকে কি যে ফুটে বের হবে সে কথা কেউ ভাবছে না।

ভাবের আবেগে নীহারিকা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তার স্বভাবসুন্দর চোখ দুটী জ্বলে উঠল প্রতিভার প্রভায়। কিন্তু সে বিনা বাক্যব্যয়ে এমন বন্ধুদের ছেড়ে উঠে চলে গেল। অনুগমন করল প্রদ্যুম্ন।

বন্ধুদের মন্ত্রণা আবার আরম্ভ হল।

কেশব বলল—ভাই, এখানেই শত্রুর শেষ হয় নি। কলেজের ছাত্রের আর একটা শত্রু হচ্ছে বিবাহ। প্রথম যৌবন জাগার সঙ্গে কত স্বপ্ন কত কল্পনা রচনা করি আমরা, যা সংসারের ঊষর দিনগুলির আগেকার উষাকে সাজিয়ে স্নিগ্ধ করে দিয়ে যায়। হোক না তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সেই ক্ষণিক আনন্দটুকুরই বা মূল্য কম কি ? গোপন স্বপনচারিণী মানসী—আহা তার কথা ভাবতেও ভাল লাগে। কিন্তু বিয়ে করলেই স্বপ্নভঙ্গ অনিবার্য্য। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ নয়, স্বপ্ন নির্ঝরের ভঙ্গ।

জগবন্ধু বলে উঠল—এই দেখ না প্রদ্যুম্নর যা হবে বলে আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। যা একখানা বাড়ী, একেবারে কারাগার। জটিলা-কুটিলার দল ঠায় পাহারা দিচ্ছে। যা একখানা মা; বিয়ে যেন ওর সঙ্গেই হয়েছিল বৌয়ের। দেখে নেব কোথায় স্বপ্ন টেকে, আর কোথায় ভাঙ্গে নির্ঝর।

কেশব পছন্দ করল না কথাটা। চাপা দিতে চাইল বন্ধুর ব্যক্তিগত সুখ বা দুঃখের আভাসের কথা, যদিও জানে যে বৌভাতের পর থেকেই কলেজে সবাই এ নিয়ে বড় মেতে উঠেছে। কথাটার মোড় ঘুরাবার জন্য সে বলল—দেখ, আমার চেনা একজনের বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু পারছে না—অবস্থায় কুলোচ্ছে না বলে। তাকে কি পরামর্শ দিয়েছি জান ?

সবাই নূতন রসের ইঙ্গিত পেয়ে লালায়িত হয়ে উঠল।

কেশব বলে চলল—বললাম, সাহিত্যিক বিয়ে কর ভায়া, সাহিত্যিক বিয়ে। সে ত প্রথমে বুঝতেই পারল না। একটু নাচিয়ে বিয়ে-পাগলাকে সমঝিয়ে দিলাম সব। গরীব হও ক্ষতি নেই। তাতে বিয়ে আটকাবে না—বরং সুবিধেই হবে। গরীব—ভদ্রতা করে অথবা মনকে চোখ ঠেরে আমরা বুঝাই যে মধ্যবিত্ত—শিক্ষিত বাঙ্গালী ছেলের একটা বড় ভরসা আছে।

হরিহর হাঁটু চাপড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—সাবাস কেশব, সাবাস—ভরসা দিলে এই বরবাতেই আমি ছানার-ডানলা আর ছাদনা-তলার বন্দোবস্ত দেখব নিজের জন্য। বলে যাও ভায়া।

কেশব হেসে বলল—একটু বিলিতি ছাদের লভ কর, ছাদনা তলায় স্থান লাভ নির্ঘাত হয়ে যাবে। শিক্ষিতা তরুণী ধনী কন্যারা শুধু গরীবদেরই প্রেমে পড়ে; পড়তে বাধ্য, কারণ আধুনিক বাংলা গল্প উপন্যাসে নজীর দিয়ে গেছে। কারণটা খুব সোজা। গরীব ছেলে নিশ্চয়ই তার চেয়ে অবস্থাপন্ন ও সংসারে বেশী সফল বা ভাগ্যবান্ ছেলের চেয়ে বেশী মেধাবী, মধুর বাক্যবাগীশ ও মনোহর ব্যবহার-সম্পন্ন বলে দেখা যায়। এ অবস্থায় যাকে অভাব বোধ করতে হয় নি, সে স্বভাবকেই বেছে নেবে।

জগবন্ধু বলল—শুধু সাহিত্যকে দোষ দিচ্ছ কেন ? মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানশাস্ত্র দুই-ই ত ঘোষণা করেছে যে বিষমের প্রতিই আকর্ষণ হয়; বিকর্ষণ হয় সমানে সমানে।

রাজনীতিক রাজীব একটু খুশী হয়ে উঠেছিল, কথা গুলি একটু শ্রেণী বিভাগের দিকে ঘেঁষে আসছে দেখে। সে যোগ করে দিল—কিন্তু তা বলে ভেবো না যে ধনী মেয়ে বিয়ে করে জামাই বুর্জোয়া হয়ে উঠবে। সে সাধে বাদ সেধেছে আধুনিক উপন্যাস। ফতোয়া দিয়েছে যে—এ অবস্থায় তন্বী তরুণী ধনী পিতৃগৃহ ত্যাগ করে দরিদ্র প্রণয়ীর

হাত ধরে অজ্ঞাত অনন্তের মুখোমুখী হয়ে বাইরে চলে আসবে। পিছনে রেখে আসবে অন্ধকার ও প্রাচীনতার প্রতীক সুখ ও বিলাসের সৌধ, নাগরিক সভ্যতার সভাস্থল।

তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠল কেশব—হ্যা, আর সামনে দেখা যাবে ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে আসা ভবিষ্যতের শূন্যতা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ফর্সা। বাস্তব জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব কিছুরই অবিরল বিরলতা। আমাদের দেশের প্রাচীন মুনিঋষিরাও দিব্যজ্ঞানে এই বার্ত্তাই প্রচার করে গিয়েছিলেন—ত্যাগেই সুখ, ভোগে নাস্তি। যদিও প্রেমের সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা সব ত্যাগ করে সংসার ভুলে থাকতে চায়, পাওনাদার কিছুই ত্যাগ করে না, তাগাদা দেওয়া ভুলে থাকতে চায় না। মুদী ধার দেয় না, বাড়ীওলাও ভাড়া ছাড়ে না, দরজী রাস্তায় পেলে জামা ছাড়িয়ে নিতে যায়।

জগবন্ধু টীপ্পনী কাটল—ইনকাম-ট্যাক্সের বালাইও সম্ভবত থাকে না।

হরিহর রেগে গেল—থাকবে কি করে? ঘোড়ার সামনে গাড়ী, জমির আগে বাড়ী। ইনকাম হতেই দাও আগে।

এমন সরস আড্ডাটা ভাঙ্গতে ইচ্ছা হচ্ছে না কারো। বঙ্গম্যান আর কিছু বলতে না পেয়ে বলে উঠল—আচ্ছা কেশব, বিয়ে না করেও যে লোকে বয়ে যায়, তার কি হবে?

কেশব বলল—আরে, উড়বার জন্যই ত এই ধূলির ধরণী। হয় মানসলোকে, না হয় বানরলোকে। কিন্তু বর্ষার নদীর জলের শুধু রং দেখে বিচার করলে চলবে না। তার প্রসার আর প্রবাহও দেখতে হবে। সে রংও ত অল্প বয়সে কম সোনালী বলে মনে হয় না! বিশেষত আধুনিক-সাহিত্য-পড়া তরুণের কাছে।

আমার বুড়ো দাদু বলেন ভাল। মনস্তত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও তীক্ষ্ণ বিলোড়ন পড়তে পড়তে তিনি লজ্জায় দ্বিধায় বিব্রত ও বিমর্ষ—এবং গোপনে স্বীকার করতে ভয় নেই, একটু পুলকিত এমন কি কণ্টকিত হয়ে ওঠেন; লেন, তবে কি আমিও প্রেমে পড়েছিলাম না কি? কই তে দিন পর্য্যন্ত ত সে কথা মনেই আসে নি? আহা! কার, কোন্ সুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছি? কে সে নাগরী? কই, প্রৌঢ়া গৃহিণীকে ত কোন দিনই তিনি বয়ে মনে হয় নি। হায় হায়, জীবনটা তা হলে এত দিন বৃথাই গেছে।

তবে মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা আশ্বাস দিয়েছে। মা ভৈঃ, কোন দিনই দেরী হয়ে যায় না। সময় চিরকালই আছে। এখনো আছে। যৌবন নেই? তাতে তোমার লোকসানটা কি? ভালবাসা—সে ত ইন্‌টেলেক্টের জিনিষ। এ যুগে ভালবাসতে হবে ব্রেণ দিয়ে; সূক্ষ্ম প্রেম করতে হবে কি না। বিয়েটা বড়—যাকে বলে—ভালগার। ওটার সম্মানের আসন অর্থাৎ রেস্‌পেক্টেবিলিটি বহুদিন হল চলে গেছে। চাই না আমরা মা লক্ষ্মী; মানস লক্ষ্মীতেও আর চলবে না। আসুর বিবাহ চলত লৌহ যুগে; গান্ধর্বটা প্রশস্ত ছিল কাব্য যুগে। প্রজাপতির দৌলতে গৃহলক্ষ্মীরা রাজত্ব করেছে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত। মানসলক্ষ্মী বিংশ শতাব্দীকে ভূমিষ্ঠ করিয়েই বুড়িয়ে গেছে। ব্রেণ-লক্ষ্মীর যুগ চলছে এখন।

একজন ব্রেণ পন্থী ত সে দিন ইংরেজী সাহিত্যের ক্লাসে অধ্যাপক আসবার আগে বোর্ডে একটা কবিতাই লিখে ফেলল এই নূতন দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে। সারাটা ঘর উচ্চ করতালিতে মুখর হয়ে উঠেছে, এমন সময়ে এসে ঢুকলেন অধ্যাপক। তিনি এই অনুপম কাব্য প্রতিভার অঙ্কুরোদ্গম দেখে বেত্রপন্থী হয়েছিলেন কিনা তা কলেজের ইতিহাসে লেখা নেই—সম্ভবত ওদের সঙ্গে তাল রেখে আধুনিকতার সুবিধাগুলি পাবার লোভ ছিল লেখকেরও। কে জানে অধ্যাপক নিজেও লুকিয়ে লুকিয়ে সে কথা ভাবতে সুরু করেছিলেন কিনা।

রসহীন গৃহকোণে পড়ে আছে Shelley Byron,
ইন্টেলেক্ট প্রেম মর্ম্ম বুঝিতে ত পারে নাই তারা;
এ সব বাস্তব কথা মাঝে কিগো ওঠে মম মন?
ব্রেণ দিয়ে ভালোবাসা—সূক্ষ্ম প্রেমে যাই আমি মারা;
তব স্থূল দেহে মম ছিল না ত মায়া,
ওগো ব্রেণকায়া।
Lawrence এর ভালোবাসা—সে ত শুধু সাধারণে চায়,
মম মাথে তপ্ত ঘৃতে জাগে তব নিরাকার রূপ,
ব্রেণ খানি বিশ্ব জুড়ে সর্ব্বনারী পায়েতে লুটায়—

কবি আমি ; এ জগৎ মোর কাছে নহে আর কূপ।
এমন উপায়ে আমি ভালবাসি' বিশ্ব
চাপা পড়ি রিক্‌শ।
পিতা গৃহে দেয় তাড়া, পরীক্ষায় হই যদি ফেল
সহ্য করি র'ব সব ; প্রেমের মহিমা সব জয়ী,
খালি তব ব্রেণ wave পাঠাইয়া দিয়ো প্রতি mail—
এ টুকু অন্তত দয়া করো তুমি, ওগো ব্রেণময়ি ;
না হলে জিতিয়া যাবে কবিতার shield
john masefield।

(ক্রমশঃ)

রেখা-চিত্রের জন্ম-কথা

শ্রীকানাই লাল সাহা

পঞ্চাশ বাট হাজার বছর আগে পৃথিবীর বুকে যখন চতুর্থ হিম-যুগ (Ice-Age) সুরু হয় সেই সময় ইউরোপের মাটিতে যে-সব মানুষ বাস করতো তাদের শরীরের সংগে এখনকার মানুষের যথেষ্ট তফাৎ। কয়েক হাজার বছর ধরে এরা ইউরোপের ওপর আধিপত্য করার পর হঠাৎ একদল লোক মধ্য এশিয়া বা আফ্রিকা থেকে গিয়ে ওদের বহু দিনের বাসস্থান থেকে তাড়িয়ে দিলে। এই ঔপনিবেশিকরা শরীর ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে ছিল ওদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। অনেকের মতে এরাই বর্তমান মানবের অতি-পূর্ব-পুরুষ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা এই অতি-আদিম যুগের মানবদের দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম যুগের মানব বা মানবেতর জীবগুলিকে বলা হয়েছে প্যালিওএ্যান্‌থ্রপিক (Palaeo-anthropic), আর পরের যুগের মানবদের বলা হয়েছে নিওএ্যান্‌থ্রপিক (Neo anthropic)।

জাভা মানব, পেকিং-এর সিনান্‌থ্রপাস্ (Sinanthropus), রোডেশিয়া মানব, হিডেলবার্গ মানব, নিয়ানডারথেলের মানব প্রভৃতি পড়ে প্যালিওএ্যান্‌থ্রপিক পর্যায়ে।

বর্তমান সময় থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে আধুনিক যুগের মানবের মত যে মানবদল নিয়ানডারথেলের অধিবাসীদের আদিম বাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারা হ'লো নিওএ্যান্‌থ্রপিক পর্যায়ভুক্ত।

নিয়ানডারথেলের অধিবাসীদের মত এরাও গুহায় বাস করতো, আর জীবনধারণ করতো বনের পশু শিকার করে। শীতকালটা ওরা কাটাতো গুহার ভেতরই। বছরের অন্য সময় শিকার করতে করতে ওরা চলে যেত অনেক দূরে। কিছু দিন পর পর ওরা আবার গুহায় ফিরে আসতো, শিকার করা পশুর চামড়া, হাড় প্রভৃতি নিয়ে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে এরা পুরাতন প্রস্তর যুগের লোক। এই নামের এইজন্যে সার্থকতা আছে যে, পশু শিকারের জন্যে ওরা যে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো তা' তৈরী হ'তো পাথর ও জীব-জন্তুর হাড় থেকে। ইউরোপের অনেক পুরাতন গুহার ভেতর ওদের ব্যবহার করা অনেক পাথরের ও হাড়ের জিনিষ পাওয়া গেছে। অতি-আদিম যুগের এই সব শিকারীরাই রেখা-চিত্রের জন্মদাতা। ওরা ছবি আঁকতো পাহাড়ের গায়ে ও গুহার নির্জন প্রদেশে।

ওদের আঁকা ছবিও ব্যবহার-করা অস্ত্রশস্ত্র প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের চোখের সামনে থেকে অতীতের একটি ঘন-কাল পর্দা সরিয়ে ওঁদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে—অতি-আদিম মানবদের জীবনের একটি অধ্যায়।

গবেষকরা বলেন : প্যালিওএ্যান্‌থ্রপিক মানবদের কোন গুহায় কিন্তু রেখা-চিত্রের আভাষ মাত্র পাওয়া যায় না। এরা চলতো শুধু অনুপ্রেরণার বশে। তাই বোধ হয় পৃথিবীর সৌন্দর্য ওদের মনে এমন কোন ভাবের সৃষ্টি করেনি যার অভিব্যক্তি পেয়ে বদ্‌লাতে পারে ওদের মনকে। তা' ছাড়া ওদের মনোবৃত্তিও এমন উন্নত ছিল না, যে আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের প্রতিকৃতি রঙ্ ও রেখায় প্রকাশ করবার মত আগ্রহ জাগাতে পারে।

পরের যুগের মানবদের বুদ্ধি-বৃত্তি প্যালিওএ্যান্‌থ্রপিকদের চেয়ে কিছু উন্নত হলেও ওরা যে সৌন্দর্য-বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছবি আঁকতো এমন প্রমাণও কিছু কোথাও পাওয়া যায়নি। প্রথম অবস্থায় ওরা ছবি আঁকতো এক অন্ধ-প্রেরণার বশে এবং আঁকিবার সময় মনে করতো এবটা খুব বড় কাজ করছে। এর পেছনে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাংখা প্রচ্ছন্ন থাকা বিচিত্র নয়। তবে ওদের আঁকা ছবিগুলো একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে ওদের উদ্দেশ্য ও প্রেরণাটুকু কিছু কিছু বোঝা যায়।

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের এই সব রেখা-চিত্রের অনুশীলনে সেই সময়ের চিত্র-শিল্পের আদি-রূপ (Primitive stage) থেকে চরম বিকাশ পর্যন্ত একটা ধারণা জন্মাতে পারে। এই চরম বিকাশও হয়েছিল কিন্তু প্রস্তর-যুগে।

এই যুগের রেখা-চিত্রের প্রাথমিক ছবিগুলি ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়—কোনটি আঁকা হয়েছে অন্যমনস্কভাবে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি, কোনটি আবার আঁকা হয়েছে অতি যত্নে নিখুঁতভাবে। কোন কোন ছবি দেখে মনে হয়, অবসর বিনোদনের জন্য শিল্পী অত্যন্ত খেয়ালীর মত কয়েকটি আঁকা-বাঁকা রেখার টানে জীব-জন্তুর ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছে। শিল্পীর এই অসতর্কতার জন্যেই সম্পূর্ণ ছবিটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কাঁচা হাতের ছাপ।

ছোট ছেলেরা ছবি আঁকবার সময় যেমন অ-সমঞ্জস রেখা টানে, অতি-আদিম যুগের প্রথম অবস্থার ছবি কতকটা সেই রকমের। ওদের

সখ ও পেশা ছিল শিকার করা, তাই ওদের মন ভরাট হয়ে থাকতো বনের পশুর আকার ও আকৃতিতে। সেই জন্তেই বোধ হয় ওদের রেখার টানে ফুটে বেরুতো জীব-জন্তুর ছবি।

প্রথম যখন ছবি আঁকবার প্রবৃত্তি ওদের মনে জাগে, তখন আঁকবার সময় যে জীবটির ছবি ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌তো তাই প্রকাশ
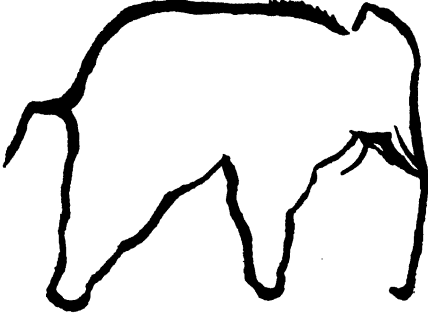
১ নম্বর ছবি

করবার চেষ্টা করতো বেষ্টনী-রেখা (outline) দিয়ে। এই সব জীবের পা আঁকা হতো মাত্র দু'টি। ভেতরের দিকের পা দু'খানি আঁকা বোধ হয় সম্ভবপর হ'তো না ওদের পক্ষে। এই ধরণের ছবিগুলো প্রায়ই কিন্তু অ-সমঞ্জস হ'তো জীবন্ত জীবটির সংগে। শিল্প-চাতুর্য তাতে কিছু নেই, রেখার টান থেকে কোন রকমে শুধু বোঝা যেত কোনটি কোন জীবের

২ নম্বর ছবি

ছবি। কোন জন্তুর ছবিতে আবার আসল জীবটির শরীরের তুলনায় মাথাটি বেশ একটু ছোটই হ'তো, কখনো বা শরীরের তুলনায় মাথাটি হয়ে উঠ্‌তো অত্যন্ত বড়। এই অসামঞ্জস্যতার প্রথম ও প্রধান কারণ—এই শিকারী শিল্পীদের রেখার অনুপাত জ্ঞান ছিল না বলে।

ছোট ছেলেরা ছবি আঁকবার সময় কাগজের ওপর রেখাগুলিকে যেমন খুব মোটা করে তোলে, প্রাথমিক যুগের ছবিগুলোর বেষ্টনী-রেখাগুলো হ'তো সেই রকম গম্ভীর। এই সব গম্ভীর রেখা-পাতের একটা কারণও আছে। একটা কথা বলে রাখা ভাল—ওরা ছবি খোদাই করতো পাহাড়ের গায়ে। সরু-মোটা রেখা যে ছবির নতুন রূপ আনতে পারে সে-জ্ঞান বোধ হয় ওদের ছিল না। তা' ছাড়া সরু একটা পাথরের যন্ত্র দিয়ে ওরা যখন পাহাড়ের গায়ে ছবি আঁকতো, তখন হাতের চাপ দিতে হ'তো বেশ একটু জোরেই। পাথরের ওপর হাল্‌কা হাতে হাল্‌কা রেখা-পাতের সুযোগও পেত না এবং সে-কায়দাটুকুও আয়ত্ত করতে পারেনি।

ক্রমে রেখা-পাতে ওরা যতই অভ্যস্ত হতে লাগলো ততই নিখুঁত হতে লাগলো ওদের আঁকা ছবিগুলি। ধীরে ধীরে ওরা আয়ত্ত করলে জন্তুদের চারখানি পা আঁকবার কায়দা-টুকু এবং ওদের গায়ে লোম আঁকা সুরু করে দিলে
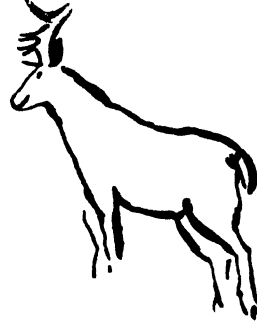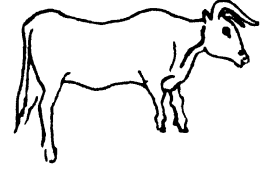
৩ নম্বর ছবি

৪ নম্বর ছবি

ছোট বড় সরল-রেখা দিয়ে। এক সংগে দু'টি পশুর ছবি আঁকার চেষ্টাও হয়েছিল এই সময়। এই রকম ছবিতে পশু দু'টিকে চিনে
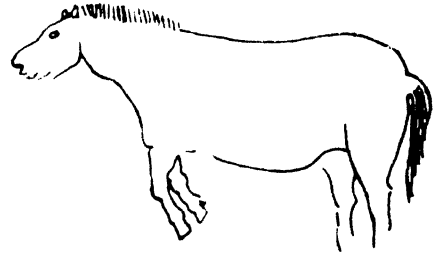
৫ নম্বর ছবি

নিতে বেশ একটু কষ্ট হয়। এই রকম ছবি আঁকবার উদ্দেশ্য কি, তা' এখনও সঠিক জানা যায়নি।
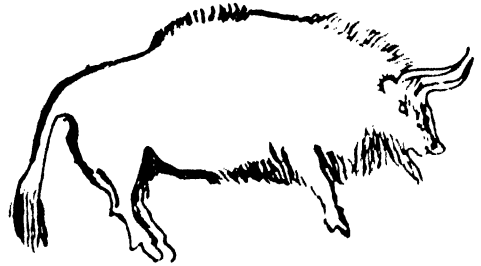
৬ নম্বর ছবি

এতদিন ওরা বেষ্টনী রেখা দিয়ে যে-সব জীব জন্তুর ছবি এঁকেছিল তাদের না ছিল চোখ, না ছিল কান। রেখা-শিল্প ধীরে ধীরে যতই উন্নত হতে লাগলো, ওদের আঁকা জীব-জন্তুর ছবিগুলোরও অমনি দেখা যেতে লাগলো চোখ, নাক, কান এবং পায়ের খুর পর্যন্ত। অবশ্য ওরা চোখ আঁকতো ফুটকি (Dots) দিয়ে, আর কান আঁকতো মাথার ওপর দু'টি খাড়া রেখা দিয়ে। এই রেখাগুলোই কানের আভাষ দিত মাথার ওপর।

শিকারী শিল্পীদের ছবি আঁকবার প্রবৃত্তি যতই প্রবল হ'তে লাগলো ততই ওরা মশ্‌গুল হয়ে উঠ্‌লো নতুন নতুন আংগিকের (Technique)
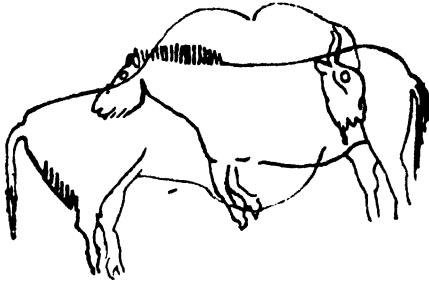
৭ নম্বর ছবি

উদ্ভবে। এই সব আংগিকের একটি স্তর হ'লো পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা ছবির ভেতরটি রঙ্‌ দিয়ে ভরাট করা। এই আংগিককে
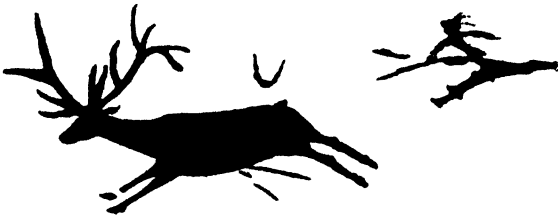
৮ নম্বর ছবি

ইংরিজিতে বলা হয়েছে সিলুয়েট্ (Silhuette)। এই রঙ্‌-লেপা ছবির আবির্ভাবের সংগে সংগেই বোধ হয় মানুষের ছবি আঁকবার প্রবৃত্তি জাগে।

ইউরোপের গারগাস্ (Gargas) ও হটেস্-পিরেনিজ (Hautes-Pyrenees) গুহায় প্রায় ১৩৮টি এই রকম কালী-লেপা ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সব ছবির ভেতর নানা রকম হাতের ছাপও আছে। এই হাতের ছাপগুলির মাঝখানটিতে কোন রঙের চিহ্ন-মাত্র নেই।

৯ নম্বর ছবি

আঙুলের চারপাশে শুধু কালী ছিটানো। এই সব হাতের ছাপের মধ্যে কোন কোনটির আবার সব ক'টি আঙুল নেই। কোন হাতের ছাপে একটি আঙুল নেই, কোনটিতে আবার দু'টি নেই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা বলেন: অতি-আদিম যুগে দেবতার কাছে রক্ত দেওয়ার প্রথা ছিল বোধ হয় এবং এই রক্ত দেওয়া হ'তো হাতের আঙুল কেটে।

কোন কোন গবেষক বলেন: ওগুলি ঠিক হাতের ছাপ নয়, স্টেনসিল (Stencil) নয়। আঙুলে বা লম্বা একটি কাঠিতে রঙ্‌ লাগিয়ে হাতের পাতার মত ওই সব আঁকা-বাঁকা রেখা টানা হয়েছে।

কেউ আবার বলেন: ওগুলি মোটেই মানুষের আঁকা ছবি নয়। গুহা-ভালুকরা (Cave-Bear) পাহাড়ের গায়ে থাবা শান দেবার সময় এই ছাপ গুলি পড়েছে। এই মতামতের স্বপক্ষে একটি যুক্তিও আছে। ক্রো-ম্যাগনন্ (Cro-Magnon) গুহার অধিবাসীরা ভালুকদের বেশ একটু ভাল চোখেই দেখতো। ওরা গয়না তৈরী করতো
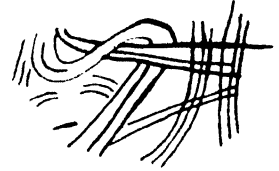
১০ নম্বর চিত্র

ভালুকের দাঁত দিয়ে। ওদের একটা অন্ধবিশ্বাসও ছিল—ভালুকদের থাবার ছাপে নিশ্চয়ই কোন যাদু আছে। তাই তারা সযত্নে রক্ষা করতো এই চিহ্নগুলি। গুহার ভেতর রোদ বা বৃষ্টির উপদ্রবও নেই, তাই কয়েক হাজার বছর পরেও এই সব চিহ্নের এখনো কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

কোন কোন পাহাড়ের গায়ে ও গুহার ভেতর কতকগুলি আঁকা-বাঁকা রেখার সমষ্টি দেখা যায়। খুব নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য করেও দেখা গেছে এই সব রেখার টানে কোন জীব-জন্তু বা মানুষের ছবি আঁকবার চেষ্টা করা হয়নি। এগুলি শুধু রেখারই সমষ্টি। এই আঁকা-বাঁকা রেখাগুলিকে যদি শিল্প হিসেবে ধরে নেওয়া যায়, তা' হ'লে বলতে হবে এগুলি খেয়ালী শিল্পীদের অবসর বিনোদনের খেলা। নানা গুহার গায়ে প্রচুর পরিমাণে এই রেখা-জাল দেখে কিন্তু মনে হয়, এগুলি শুধু খেয়ালির খেলা নয়, কোন গোপন উদ্দেশ্য হয়তো ছিল এই সব রেখা-পাতের পেছনে। হয়তো বা এগুলি গুহা-মানবদের যাদু-বিদ্যার একটি অংশ।

এই ভাবে রেখা-চিত্রের শিক্ষানবিশি করতে করতে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে জন্ম নিয়েছে চিত্র-শিল্প (Painting)। মধ্য ইউরোপের

১১ নম্বর ছবি

যে সব গুহার ভেতর চিত্র-শিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে সেই সব গুহায় এমন অনেক ছবি দেখা যায় যা' বর্তমানের যে-কোন নামজাদা শিল্পীর গর্বের বিষয় হতে পারে।

কোন কোন গুহার ভেতর খোদাই-করা ছবির ওপর অতি যত্নে রঙ্ দেওয়া হয়েছে। এই সব ছবির ভেতর এক-রঙা ছবিও আছে, আবার নানা রঙের ছবিও আছে। এত যত্নে ও নিপুণতার সংগে রঙ্ ছোঁয়ান হয়েছে যে বর্তমানের শিল্পীর চোখে তা' বিস্ময়ের বস্তু। কোন কোন ছবিতে এমন হাল্কা হাতে (Light Touch) রঙ্ ছোঁয়ান হয়েছে যা' দেখে তাজ্জব বোধ হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, গুহার ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে শিল্পী কেমন করে অমন হাল্কা হাতে রঙের ছোঁয়াচ দিয়েছে। এই সব দেখে শুনে বেশ বোঝা যায়, সুদীর্ঘ অনুশীলনে শিল্পীরা কত নিপুণ হয়ে উঠেছিল।

আরও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে, সেই যুগাতীতকালে শিল্পীরা যে সব রঙ্ ব্যবহার করেছিল, তা' আঁকবার সময় যেমনটি ছিল এখন প্রায় ঠিক তেমনটিই আছে। কয়েকটি গুহার ভেতর সেই সময়কার শিল্পীদের খোদাই যন্ত্র, আঁচড় কাটবার যন্ত্র, হাড়ের রঙের নল প্রভৃতিও পাওয়া গেছে। এই গুলি পরীক্ষা করলে বোঝা যায়—ওদের শিল্পানুরাগ ছিল কত গভীর।

কোন কোন গুহার গায়ে রংগ চিত্রও (Caricature) দেখা গেছে। এই সব রংগ-চিত্রের অধিকাংশই মুখোস-পরা মানুষের ছবি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন: রংগ-চিত্রের উদ্ভব প্রাচীন স্পেনে (Spain)। এইখানকার কৃষ্টি আফ্রিকার উত্তরে টিউনিস্ (Tunis) প্রদেশের ওপর দিয়ে সাহারা প্রদেশের পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন আফ্রিকার উত্তরপশ্চিম ভাগ স্পেনের সংগে সংযুক্ত ছিল বলেই এই বিস্তার সম্ভবপর হয়েছিল।

বর্তমান ইউরোপে যে সব পুরাতন গুহার ভেতর বা অন্ধকার সুড়ংগ-পথে অতি আদিম যুগের মানবদের আঁকা ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে সেই সব ছবি দেখে একটি প্রশ্ন মনে জাগে। সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে ওরা ছবি আঁকতো কেন? বাইরের গোলমাল থেকে সরে গিয়ে মনটিকে তন্ময় করে তোলা হয়তো একটি কারণ হতে পারে। এই তন্ময়তা যে ওদের ছবিগুলিকে নিখুঁত করবার সাহায্য করতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গবেষকরা বলেন: জনহীন স্থানে বসে ছবি আঁকার একটি গোপন উদ্দেশ্যও ছিল।

অতি-আদিম যুগের মানুষরা ডাকিনী-বিদ্যার (Witchcraft) অনুরাগী ছিল। ওদের ধারণা ছিল, যে জীব বা মানুষকে ওরা নিজ আয়ত্তের মধ্যে আনতে চায় সেই সব জীব বা মানুষের ছবি এঁকে বা মূর্তি গড়ে পুজো করলে খুব সহজেই তার নাগাল পাওয়া যায়। তাই শিকারে বেরুবার আগে ওরা নানা রকম জীব-জন্তুর ছবি এঁকে বা মূর্তি গড়ে পুজো করতো। অনেক ছবি ও মূর্তির গায়ে অস্ত্রের দাগ দেখে এই যুক্তির সত্যতাটুকু স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগের এই সব শিকারী-শিল্পীদের ডাকিনী-বিদ্যা বা যাদু-মন্ত্রের সংগে কতকগুলি করণ-কারণ ছিল যা' তারা সাধারণের চোখের সামনে করতে চাইতো না। ওরা মনে করতো দ্বিতীয় লোক ওদের প্রক্রিয়া দেখলে কোন ফলই ফলবে না। তাই শিকারে যাবার আগে ওরা চলে যেত নির্জন গুহার সুড়ংগ-পথ দিয়ে গুহার নিভৃততম অংশে।

বর্তমানে অতি-আদিম যুগের লোকদের ব্যবহার-করা যে সব গুহা আবিষ্কার হয়েছে তা'র অনেকগুলি অত্যন্ত দুর্গম। অন্ধকার সুড়ংগ-পথে কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর হয়তো দেখা গেল প্রকাণ্ড একটি পাথর ঝুলে বন্ধ করে দিয়েছে গুহার ভেতরে যাবার পথ, আর সেই পাথরের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে অন্তঃসলিলা একটি নদী। এই সব নদীর জল বরফের মত ঠাণ্ডা। বর্তমানের গুহা আবিষ্কারকেরা জীবন বিপন্ন করে সাঁতরে এই জলভাগটুকু পার হয়ে চলে গেছেন গুহার সুদূর প্রান্তে। সেইখানে তাঁরা দেখতে পেয়েছেন অতি-আদিম যুগের মানবদের শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

এই সব দেখে গবেষকদের ধারণা হয়েছে: শিকারে যাবার আগে প্রায় সব শিকারীই কিছু-না-কিছু গোপন ক্রিয়া করতো এবং এই গোপন ক্রিয়ার সহচর ছিল কৃচ্ছ্র সাধন। এই সব গোপন ক্রিয়ারই ফল স্বরূপ আমরা পেয়েছি অতি-আদিম যুগের শিল্পের নিদর্শন।

এই শিকারী-শিল্পীদের ক্রমে ধারণা হয়—যার ছবি বা মূর্তি যত নিখুঁত হবে শিকারে সে হবে তত কৃতী। তাই ধীরে ধীরে ছবি ও মূর্তি-গুলিকে নিখুঁত করবার একটা ঝোঁক চেপেছিল ওদের ওপর। এই ঝোঁকের বশেই ক্রমে উন্নত হতে লাগলো ওদের আঁকা ছবি ও কাদার মূর্তিগুলি।

সে আর আমি

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। সে এসেছিল আমাদেরই বাড়ীতে একটা ফলের থালা হাতে নিয়ে, হয়ত নারায়ণের প্রসাদই হবে।

বাড়ীতে ঢুক্‌তে তার সাহস হয়নি, অচেনা বাড়ী, কেউ কিছু বল্‌তেও ত পারে।

কেউ কিছু বল্‌তে পারে না, পূজার প্রসাদ বিতরণ, এতে দোষেরই বা কি আছে? তবু সে ভয় পেয়েছিল, বাড়ীতে প্রবেশ কর্‌তে চাইছিল না। তাই সে তার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে জোর করে বলছিল—তুই ছোট, তোর লজ্জা কি শুনি?

দৈবের কল বাতাসে নড়ে। পড়লো আবার আমারই

নজরে। ফিরছিলাম ও পাড়ার বিশুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, রীতিমত ঘেমে ও প্রচুর ক্ষিদে নিয়ে। প্রথমটা ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম এ অতি চেনা, অতি সুপরিচিত—বিশেষত আমার।

প্রশ্ন করলাম—আপনারই বা কি লজ্জা শুনি। নিজের যেতেই বা কি দোষ।

মুখটা একটু রাঙা হয়ে গেল তার। একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লো—না, লজ্জা আর কি তবে—

বাধা দিয়ে বল্‌লাম—আর তা ছাড়া এত কি হ'বে?

এর উত্তরে সে বল্‌লে—না, বিশেষ কিছুই নয়। বিশেষত আপনার কাছে এ অতি সামান্যই—বলেই একটু হাস্‌লো।

আমার ভোজন সম্বন্ধে ওর এমন ধারণা কি করে হ'লো তা বুঝতে পারলাম না। মনে একটু রাগও হ'লো।

বল্‌লাম—চলি, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।

সে বল্‌লে—আপনাদের এ প্রসাদটা নিয়ে যাবেন কি?

উত্তর দিলাম—যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে বাড়ীতে দিয়ে যেতে পারেন, আপত্তি নেই।

আচ্ছা চলুন—বলে সে সোজা বাড়ীতে এসে হাজির—একেবারে মার কাছে।

আমি তখন উপরে নিজের কাজে ব্যস্ত।

কয়েক মিনিট বাদেই মার কথা কানে এল। মা বেশ জোরেই বৌদিকে বল্‌ছেন—বেশ মেয়ে ত, চমৎকার। তোকে ত কোনদিন দেখিনি মা, চিন্‌বোই বা কি করে, আর ছাই চোখের কি সে জ্যোতি আছে! তবে জান বৌমা, আমার ঝন্টুর যদি বিয়ে দিতে হয় ত এই রকম মেয়েই আন্‌বো। নামটি কি মা তোর?

আমার নাম 'অণিমা' সে বল্‌লো। আমরা এই গলির ঐ ও-ধারের যে একটা গেটওয়ালা বাড়ী রয়েছে না, সেইটাতে থাকি।

মা বল্‌লেন—কি ক'রে জান্‌বো মা, পোড়া চোখই আমার সব খেয়েছে। তোরা ক ভাই বোন্ মা?

আমারা সব শুদ্ধ চারজন। সে বলে—আমার বড় ভাই ডাক্তার। মেজ ভাই ব্যবসা করে, ঐ যে ওধারে দোকান রয়েছে। ছোট ভাই এখনও পড়ছে। আমি আপনাকে বেশ চিনি। আপনি ত রোজ গঙ্গাস্নান যান—আমাদের ওধার দিয়ে। আপনাকে রোজ দেখি। আচ্ছা আজ যাই, আবার আস্‌বো।

মা বল্‌লেন—আচ্ছা মা আসিস মাঝে মাঝে। ওরে ও ঝন্টু, যা বাবা দরজাটা দিয়ে আয়, যা সব চোরের উপদ্রব।

অগত্যা আমাকে নিচে নাম্‌তে হ'লো। দরজার কাছে গিয়ে দেখি সে তখনও দাঁড়িয়ে, বোধ করি আমারই অপেক্ষায়।

বল্‌লাম—কিছু বল্‌বেন কি?

উত্তর এল—না, চলি—বলেই মুচকে হেসে আমার দিকে তাকাল।

আমিও চাইলাম তার দিকে; সেও চেয়ে রইলো—কয়েক সেকেণ্ড মাত্র।

অদৃশ্য দেবতা কি মতলব এঁটেছেন তা জানি নে। তাঁর কঠোর নিয়মে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি ঠিক করেছেন তাও জানি নে। তবে সেদিনকার সেই স্মৃতি আমার হৃদয়ে চিরদিন থাকবে। উপরে সেই শুভ্র চাঁদ ছিল আমাদের সাক্ষী। আর নিচে ছিল তারই দেওয়া জ্যোৎস্না-ধারা, তার তলেই ছিল দুটী প্রাণী, আমি আর সে। সে ত্বরিতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করলে।

আর আমি······

মাস তিনেক পরের কথা। মনটা ভাল ছিল না। College-এ কোন গতিকে classটা করে বাড়ী ফিরছিলাম ওধার দিয়েই। বাড়ীটা লক্ষ্য করলাম। বারান্দায় সত্যিই কেউ ছিল না। 'নাই থাক্ গে'! নানা কথা ভাবতে ভাবতে সোজা নিজের বাড়ীর দিকে আস্‌তে লাগলাম। হঠাৎ মাথার উপর বেশ খানিকটা জল পড়লো। মাথাটা ত ভিজলোই, উপরন্তু জামাটাও। বেশ রাগও হলো। আজ খানিকটা বকুনী দিতে হ'বে মনে মনে আঁচলাম। সেই উদ্দেশ্যে 'রমেশদা' আছেন—বলে বাড়ীর কড়া নাড়া সুরু করে দিলাম। রমেশদার বদলে অণিমা এল বেরিয়ে। বেশ একটু গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লো—কি দরকার·বলুন ত sir। কি দরকার বুঝতে যেন বাকী আছে। না, না, এ আমি পছন্দ করি না—রীতিমত রাগের ভাব দেখালাম। কে ফেলেছে আগে শুনি। উত্তর হল, যদি বলি আমিই ফেলেছি।

আমি তার উত্তরে বল্‌বো—কাজটা ভাল করনি। কেনই বা ফেলেছ, যদি রাস্তার পথিক হ'তো তাহলে?

সে জবাব দিল—আজ্ঞে না sir, লোক দেখেই ফেলা হ'য়েছে। আজকাল এখান দিয়ে যাওয়া হয় অথচ এখানে আসা হয় না। এই হ'লো তার শাস্তি।

এতক্ষণে তার জল ফেলার কারণ বুঝতে পারলাম। তবে দোষের তুলনায় শাস্তি যেন একটু বেশি পেতে হয়েছিল এই যা।

অগত্যা বল্‌লাম—এর উপায় কি হ'বে একটা গামছা দাও অন্তত। অণিমা একটু হাস্‌লে।

খানিক পরে বললে একটু শাসনের সুরে—ভবিষ্যতে attendance সম্বন্ধে গণ্ডগোল হ'লে এ রকম ব্যাপার আবার ঘটতে পারে। আমি তখন গা-মাথার জল মুছে চেয়ারে বসে একটা বইয়ের পাতা উল্‌টাতে সুরু করেছি।

সেদিন অণিমা নরেনকে দিয়ে আমাদের বাড়ীতে বলে পাঠাল—আজ ছোটবাবু ওখানেই থাকবে। পরে শুনলাম, ওরা নাকি আমাকে এর আগেই নিমন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু আমি বাড়ী ছিলাম না।

রাত্রে রমেশদা ফিরলেন এবং বললেন—কিরে ঝণ্টু এসেছিস। তোর বাবাও আস্‌ছেন। আমি তোদের বাড়ী থেকেই আস্‌ছি।

কিছু পরে বাবাও এলেন। অণিমার বাবা বিনয়বাবু বল্‌লেন—আপনার ঘরে আমার মেয়ে যাবে সে ত আমার পরম···

বাবা বাধা দিয়ে বললেন—আর তাছাড়া খরচার জন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হ'বে না, সবই manage হয়ে যাবে।

তাঁদের আলোচনা সলজ্জে অধোবদনে অথচ উৎকর্ণ হয়েই আমি শুনতে লাগলাম।

হঠাৎ নরেন এসে বল্‌লে—ওঘরে একবার আসুন, দিদিমণি ডাকছেন।

গিয়ে দেখি সেখানে এক জোরালো খাওয়ার আয়োজন। অণিমার মা সস্নেহে বললেন—এস বাবা বস।

তারপর · তারপর।

সেদিন ছিল শরতের পূর্ণিমা। আমার কাছে সে এল, বললে—পূজোর ফল খাইয়েছি কেমন দেখ্‌লে। আজ আমার সকল পূজা সার্থক হলো।

আমি গোলাপের গন্ধে নিজেকে অন্যমনস্ক করে হৃদয়ের আনন্দাবেগ দমনের চেষ্টা করতে লাগ্‌লাম।

জ্বালাময় পরাজয়

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

ঘাতকের ছুরি ছোরা গুণ্ডাদের দাণ্ডা লাঠি
ভীতিপ্রদ হ'তে পারে সাময়িক অত্যাচারে ;
হয়ত মারিতে পারে নিরীহেরে ;
প্রতিপক্ষ প্রতিরোধ উঠিতে কি পারে আঁটি ?

হত্যা করা বৃত্তি যার, হিংসা বিষে প্রাণে দীন
শক্তি তার কোথা প্রাণে ? দানব সে, মরা-মন ;
অসতর্ক আক্রমণ করি করে পলায়ন,
শিশু, নারী, দুর্ব্বলেরে হত্যা করে অস্ত্রহীন।

কাপুরুষ নরঘাতী, এ বিশ্বের অভিশাপ ;
অমঙ্গল আনে ডাকি' নিজে মরে তারি ফলে ;
যে তারে তাতায়েছিল চিনে নেয় সেই খলে ;
অশান্তি আধার ঘৃণ্য—বেঁচে থাকা পরিতাপ।

কোনো দিকে নাহি তার তিলমাত্র কোনো জয়
জ্বালাময় পরাজয় আমরণ আনে ভয়!

'বীরবল'-স্মরণে

ভাস্কর

ওহে বীরবল! তব তরুণ পরাণ
মরতের মায়া ছাড়ি গিয়াছে চলিয়া,
ওপারে নন্দনবনে দেবগণ বুঝি
পরম আদরে কোলে নিয়েছে তুলিয়া।

তোমার সবুজ মন চিরদিন ধরি
সবুজ তৃণের মত নয়ন জুড়ায়,
তোমার সবুজ লেখা বাঙালীর মনে
সবুজ স্বপন সাথে পুলক জাগায়।

কত চিন্তা কত শ্লেষ, কত মৃদু হাসি
কত সূক্ষ্ম তত্ত্ব, কত লঘু করতালি
সহজ আপন-ভোলা মুখের ভাষায়
রসিক মনের সাথে করিছে মিতালি।

গেছ তুমি চিরতরে। বাঙালীর প্রাণ
তোমা' স্মরি' গাহে আজ অশ্রুভরা গান।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

বাংলার নদী ও খাদ্য সমস্যা

বর্দ্ধমান জেলার গলসীতে অবস্থিত 'বাংলার নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট' খাদ্য-ফসল বাড়াইবার অভিযানে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। বর্তমান বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্য ঘাটতির দিনে এই শুভ প্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষেই আশাপ্রদ। এই প্রতিষ্ঠানটি তিন বৎসর পূর্বে একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান কাজ—যে সকল নদী মজিয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে, সেই সকল নদী ও ছোট ছোট খাল-নালা প্রভৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা। সেই সংগে পলি পড়িয়া যে সব নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া যাইতেছে তাহারও প্রতিবিধান সাধন করা। এই প্রচেষ্টার সুফল অবশ্যম্ভাবী সন্দেহ নাই। ইহার দ্বারা যে অঞ্চলে জল নিকাশের কোনরূপ ব্যবস্থা নাই সেখানে সুব্যবস্থার আশা করা যায় এবং সেচের অভাবে যে সব অঞ্চল পতিত ও অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া আছে সে সমস্ত অঞ্চলও আবাদী জমিতে পরিণত হইবে বলিয়া মনে হয়। বাংলা দেশে এরূপ জমির সংখ্যা অল্প নয়। উপযুক্ত দৃষ্টি দিলে এবং এই খাদ্য সংকটের দিনে সেই সকল অনাবাদী জমিগুলিতে খাদ্যশস্য উৎপাদনে যত্ন লইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণই সাধিত হইবে।

এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান করিতেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'সৌর' পরিকল্পনার পরীক্ষামূলক কার্যের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে সব মোটা মোটা বালীতে নদী মজিয়া যায় তাহা দূর করার জন্য এবং বন্যার সময় ক্ষতির হাত হইতে নদীর বাঁধ রক্ষার নিমিত্ত ও বাঁধের ভালো স্থান নির্ণয় করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটি কয়েকটি পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান ইতিমধ্যেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

দামোদর নদী সংক্রান্ত আরও একটি পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান চলিতেছে। নদী কিংবা খালে বালী প্রবেশ করিলে তাহার অবস্থা কিরূপ হয়, ইহাতে সেরূপ পরীক্ষাও করা হইতেছে। অন্যান্য বিষয়েও এই প্রতিষ্ঠান গবেষণা করিতেছে। বাংলার খাদ্য সমস্যার সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে—কুড়িগ্রামের ভাঙন সমস্যা, ফরিদপুর জেলার চন্দনা নদীর জল নিকাশ সমস্যা, কলিকাতার দক্ষিণস্থ পিয়ালী নদী ও কাঁথি মহকুমায় জল নিকাশের সমস্যা লইয়া গবেষণা চলিতেছে।

খাদ্য সমস্যা এখন অসংশয়িতরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। কর্মক্ষমতা, স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির একটি নির্ধারিত মান বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ও বিশেষরূপে খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে বিবেচনার সময় আজ আসিয়াছে। গত ২৫ বৎসরে দেশের জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সুতরাং আহার্যের সমতা ও পুষ্টি বিচারের প্রয়োজনও বাড়িয়াছে।

বর্তমানে খাদ্যের অভাব ভারতে অত্যন্ত প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে। বৎসরে প্রায় আড়াই হইতে তিন কোটি টন খাদ্য-শস্যের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় এবং এই কারণে প্রচুর আমদানীরও প্রয়োজন হয়।

সমগ্র ভারতে কর্ষণযোগ্য বহু পতিত জমি অব্যবহৃত পড়িয়া আছে। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের প্রচেষ্টায় যদি সেই সকল জমির উৎকর্ষ সাধন করা হয়, তাহা হইলে সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত আর সুজলা সুফলা ভারতকে পরানুগ্রহের প্রত্যাশী হইতে হইবে না।

সোনাগী খাল পুনঃ-খনন

বারাসাত মহকুমার সোনাগী খাল পুনঃ খননের ফলে ৬২ বর্গ মাইল পতিত জমি চাষ আবাদের যোগ্য হইয়াছে। ইহাতে উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ ১ লক্ষ ১৯ হাজার মণ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। সোনাগী খাল যমুনা নদী হইতে বাহির হইয়া কলিকাতার ২৫ মাইল দূরবর্তী গুমা ষ্টেশন ও যশোহর রোডের নিকট বেংগল আসাম রেলপথ এবং বেলিয়াঘাটায় বারাসাত বসিরহাট রেলপথ অতিক্রম করিয়াছে। শেষ প্রান্তে স্থানে উহা তেলিয়ার হেড়োগাঁ খালে পতিত হইয়াছে। খালটির মোট ৩৬ মাইল পুনঃ খনন হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২৪ মাইল প্রধান খাল এবং অবশিষ্ট ১২ মাইল শাখা খাল। এই খালটি নীচু বিলের জল নিকাশের পক্ষে বিশেষরূপে সহায়তা করিবে।

যথাযোগ্য স্থানে পুল নির্মাণের ব্যয় সমেত মোট সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা এই পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় হইয়াছে। কৃষি ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জলপথে গমনাগমনের অধিকতর সুবিধা দানের ব্যবস্থার দ্বারা পরিকল্পনাটি এক ক্ষয়িষ্ণু এলাকার কৃষককুলের মহোপকার সাধন করিবে।

অধিক ফল উৎপাদন কল্পে আন্দোলন

বংগীয় কৃষি-বিভাগ ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে আন্দোলন চালাইতেছেন, তাহা জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের জুন ও জুলাই মাসে কৃষ্ণনগর কৃষি ফার্মের বাগান হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ চারা ও কলম বিতরণ করা হইয়াছে :—

আমের কলম—১,২০০ ; লিচুর গুটি—১,৩০০ ; লেবুর চারা—৪০০ ; লেবুর গুটি—১৫০ ; পেঁপের চারা—৪,০০০ ; আতার চারা—৫০ এবং পেয়ারার চারা ৫০।

অধিক খাদ্য-শস্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা

'অধিক খাদ্য-শস্য ফলাও' আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পনা বাবদ ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলা সরকার মোট ১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আউশ ও আমন ধান্যের বীজ ক্রয়ের জন্য ২৬,৬৫,০০০৲ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। বিভিন্ন রবি-শস্যের বীজের জন্য ১২,৯০,০০০৲ টাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ২,৮৪,০০০৲ টাকা মূল্যের গবাদির খাদ্য-বীজ অর্ধ মূল্যে কৃষকদের দেওয়া হইবে। ১,৩০,৪০০৲ টাকা মূল্যের ৪ শত মণ ধনিচা ও ১০ হাজার মণ শণ সবুজ সারের জন্য বিনা মূল্যে বিলি করা হইবে। খাদ্য ক্ষেত্রের সারের জন্য ১০,৫০,০০০৲ টাকা দামের ৭,৫০০ টন এমনিয়াম সালফেট ও অন্যান্য সারের জন্য ৯,২০,০০০৲ টাকা মূল্যের ৪ হাজার টন গুঁড়া হাড় আধা দরে বিতরিত হইবে।

অপরাপর পরিকল্পনা বাবদ নিম্নোক্ত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে :—

দুর্ভিক্ষকালে সস্তা খাদ্য বিতরণ—৪,৩৮,০০০৲ টাকা ; কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য—৬০০০ টন লৌহ ও ইস্পাৎ ক্রয় মূল্যে বিলি—২০,৯২,০০০৲ টাকা ; প্রদেশের প্রধান কেন্দ্র সমূহে ২২৬টি বীজ-ভাণ্ডার সংরক্ষণ—৭,০০,০০০৲ টাকা ; কম্পোষ্ট সার উৎপাদন—২,২২,৮০০৲ টাকা ; শহরের আবর্জনা সারে পরিবর্তন—১,০২,০০০৲ টাকা ; শীতকালীন শাকসব্জীর বীজ ও চারা বিতরণ—২,২৬,১১০৲ টাকা ; ফলের গাছ, শাকসব্জী ও আখের ক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহারের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কম মূল্যে এমনিয়ম ফসফেট—২,২৯,৫০০৲ টাকা ; দ্রুত বর্ধনশীল ফল চাষের প্রসার সাধন ও ফলের বাগানের উন্নয়ন—৩,০০,০০০৲ টাকা ; এবং বে-সামরিক সরবরাহের জন্য আলুর উৎপাদন—৬৮,০০০৲ টাকা।

কোভার ঘাস

কোভার জাতীয় ঘাসের সার জমির পক্ষে ভাল। ইহার দ্বারা জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ে এবং ফসফেটের পরিমাণ কমে। এই সার প্রয়োগ করিলে জমিতে ভুট্টা ও গমের উৎপাদন বাড়ে। কোভার ঘাস গো-মহিষাদির বিশেষভাবে দুগ্ধবতী গাভীর উত্তম খাদ্য। রাজকীয় কৃষি গবেষণা মন্দিরে পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, এই ঘাসের সার প্রয়োগ করিলে জমিতে নাইট্রোজেন-এর পরিমাণ বাড়িবে। বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন এই ঘাস লইয়া পরীক্ষা করিয়া ভারতে এই চাষ করার চেষ্টা চলিতেছে এবং এই ঘাসের সার দিল্লীর মাটীতে কিরূপ কাজ দেয়, তাহাও পরীক্ষা করা হইতেছে।

নিকষা

প, ন, ল

আমি কলেজে পড়ি। নাম নিকষা। বড়লোকের একমাত্র কন্যা। যুবতী। সচরাচর যা হয়ে থাকে আমার বেলাতেও ঠিক তাই হল। অর্থাৎ একজন সহপাঠী আমার প্রেমে পড়ল। নাম সমর। মেধাবী ছাত্র কিন্তু গরীবের সন্তান। বহুপ্রকারে সে আমাকে তার প্রেম নিবেদন করল। আমি কিন্তু কোন সাড়া দিলাম না। একদিন সে আমাকে একটি চিঠি দিয়ে সরে পড়ল। বাড়ী এসে পড়ে দেখলাম সে চিঠিটা Sentimental rubbish দিয়ে ভরা। এরকম চিঠি আমি অনেক পেয়ে থাকি। সমর আমাকে বিয়ে করতে চায়। আমি বিয়ে করব সমরের মত এক নগণ্য ছাত্রকে! বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চায়। পুরুষের যা কিছু কাম্য আমার সবই আছে—রূপ, যৌবন এবং পিতার প্রচুর অর্থ। আমি যাকে বিয়ে করব সে অন্তত I. C. S. হবে। পরদিন driver-এর মারফৎ সমরের চিঠির জবাব পাঠালাম। লিখলাম—"তুমি একটি ইডিয়ট্।"

তিন বছর পর। একদিন খবরের কাগজে পড়লাম যে সমর রায় I. C. S. পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সেই দিনই তাকে চিঠি লিখলাম। তার তিন বছর আগের আবেদন মঞ্জুর করে। কয়েকদিন পরে জবাব পেলাম, তাতে লেখা আছে—"তুমি একটি ইডিয়ট্।" ইতি—বীণা (মিসেস্ সমর রায়)। অসহ্য অপমানে শরীর ও মন জ্বলে উঠল। কিন্তু উপায় কি? সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে, সমর তার প্রেমের প্রথম অর্ঘ আমাকেই দিয়েছিল। বীণা যা পেয়েছে তা Second hand। এই সান্ত্বনা মনের গ্লানিকে অনেকটা লাঘব করল। এই সব ভাবছি, এমন সময় বোনঝি এসে আমাকে জিগেস করল—মাসীমা! Grapes are sour-এর বাংলা কি? তাকে ধমকে তাড়িয়ে দিলাম। গ্লানি বেড়ে গেল।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১০

ক্ষণকাল পরে আর্য্যপালক আসিলেন। তিনি সকল কথা শুনিলেন এবং পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া আমাদিগের উভয় গৃহের সকলকে পালাক্রমে রাত্রিজাগরণের ও সতর্ক থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল যে দুইটি গৃহই সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ আমাদিগের গৃহ-দুইটি এরূপ ভাবে পরস্পর সংলগ্ন যে একটির মধ্য দিয়া কিম্বা ছাদের উপর দিয়া আর গৃহে প্রবেশ করা অনায়াসসাধ্য। উভয় গৃহের ভৃত্যগণকে সশস্ত্র হইয়া অতি সতর্কতার সহিত থাকিতে আমরা আদেশ করিলাম। তাহারা পালাক্রমে উভয় গৃহের রুদ্ধ প্রবেশ দ্বারের পশ্চাতে সজাগ ও সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল এবং প্রজ্ঞা ও আমি উভয়ে, উভয় গৃহের ছাদে, প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে দস্যুদিগের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

নগরপ্রাকার হইতে তৃতীয় প্রহর বিজ্ঞাপিত হইল। প্রজ্ঞার ও আমার ধারণা যে সম্ভবতঃ দস্যুগণ ফিরিয়া আসিবে। তাহারা জানিতে পারে নাই যে আমরা জাগিয়াছিলাম এবং এখনও তাহারা জানে না যে তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়া আছি। আমরা যে সোপানের মূল রজ্জুটা কাটিয়া দিয়াছিলাম তাহা তাহাদিগের নিকট এখনও অজ্ঞাত। বোধ হয় তাহারা অনুমান করিয়া থাকিবে যে তাহাদের এই কার্য্যবিপর্য্যয় একটা আকস্মিক দৈববিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু তাহাদের দুষ্কার্য্যের প্রারম্ভেই এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহারা যে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সে যাহাই হউক, আজ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া আমাদের দুইজনকে, সজাগ ও সতর্ক হইয়া সশস্ত্র অবস্থায় গৃহছাদে প্রচ্ছন্নভাবে দস্যুদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। দস্যুদিগের যদি ধারণা থাকে যে কেহ তাহাদিগকে ও তাহাদিগের দুর্বৃত্তি লক্ষ্য করে নাই তাহা হইলে পুনরায় তাহাদিগের প্রত্যাগমন অত্যন্ত সম্ভব। আমরা উভয়ে বাটীর ছাদের উপর হইতে উভয় গৃহের চতুর্দ্দিকের সংলগ্ন উদ্যানে, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ও রাজপথে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া রহিলাম, অথচ আমরা অত্যন্ত সতর্ক থাকিলাম যেন আমাদের প্রচ্ছন্ন অবস্থিতি বাহির হইতে কেহ না জানিতে পারে।

অনেকক্ষণ আমরা বসিয়া, দাঁড়াইয়া, ইতস্ততঃ পাদচারণ করিয়া, গল্পে ও অবিন্যস্ত কথায় কাটাইলাম। যামিনী তখন তৃতীয়াংশের শেষপাদে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। পূর্ণিমার চন্দ্র তখন পশ্চিমে ঢলিয়াছে। জ্যোৎস্নালোক তখন অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে এবং কুহেলিকা স্বল্প ঘণতর হইয়া ক্ষীণায়মান চন্দ্রালোক অধিকতর অপরিস্ফুট ও আবিল করিয়াছে। মনে হইল যেন আমাদিগের বাটীর সম্মুখে একটি উদ্যান-বৃক্ষতলের ঘনান্ধকারে কয়েকজন লোক দাঁড়াইয়া আছে এবং অস্ফুটস্বরে কথা কহিতেছে। ইতিমধ্যে তাহারা কখন উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। উদ্যানের বহির্দ্দিকের প্রবেশ দ্বার অরক্ষিতই ছিল। উদ্যানের বহির্প্রবেশদ্বার আততায়ীর বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করা একপ্রকার অসম্ভব এবং ইতিপূর্ব্বে তাহা করিবার প্রয়োজনও উপলব্ধি হয় নাই। গৃহের প্রবেশ দ্বারই আমরা সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আর্য্য-পালকের গৃহ সম্বন্ধেও এই একই প্রথা অবলম্বিত হইয়াছিল। আমরা মৌন হইয়া অতি মনোযোগের সহিত এই কয়টি মানবকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তাহারা বৃক্ষতলের অন্ধকারময় আশ্রয়ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক বাটীর দিকে অগ্রসর হইল এবং পূর্ব্বোক্ত নিম্ববৃক্ষতলে সকলে আসিয়া জুটিল।

উহাদিগের মধ্যে একজন ছাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—

"ছাদে কেহ আছে না কি ?—ছায়ার মত যেন কেহ নড়িতেছে বলিয়া মনে হইতেছে—ভাল করিয়া দেখ দেখি !"

—"কই ?—আমি ত কিছু দেখিতে পাইতেছি না।"

—"সোপানরজ্জু ছাদে ফেলিবার জন্য এই বৃক্ষে ত উঠিতেই হইবে—উপর হইতে ছাদটা ভাল করিয়া দেখিয়া তবে সোপান ছাদে ফেলিবে।"

—"কিন্তু ছাদে যদি কেহ থাকে সে কি নিরস্ত্র থাকিবে ? আমাকে গাছে উঠিতে দেখিলে কি সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে ? আর গাছের উপর হইতে ছাদের সবটা কি দেখিতে পাওয়া যাইবে ?"

—"গাছের পাতার অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে ভাল করিয়া দেখিতে বা লক্ষ্য করিতে পারিবে না।—তোমার প্রাণে বড় আতঙ্ক হইয়াছে না ?"

—"তাহা আর কাহার না হয় ?—তোমার হয় নাই ?—এই ত দেখিলে, এই ব্যাপারে তিনজন লোক ইহার মধ্যেই বৃথা মারা গেল।"

—"ওহে সেটা নিয়তি।"

—"তবে নিয়তির কাজটা আমার উপর দিয়া পরীক্ষা না করিয়া একবার নিজের উপর দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কি সুবিধা হয় না ?"

—"আচ্ছা তাহাই হইবে—আমিই বৃক্ষে উঠিব।"

এই লোকটা আর কথা না বলিয়া রজ্জুসোপানের একপ্রান্ত হস্তে ধারণ করিয়া বৃক্ষে অত্যন্ত তৎপরতার সহিত আরোহণ করিতে লাগিল। বানরের ন্যায় এমন সহজভাবে এবং সত্বর বৃক্ষে আরোহণ করিতে আমি কোনও মানবকে আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। সে বৃক্ষে উঠিয়া শাখা হইতে ছাদের দিকে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল। প্রজ্ঞা ও আমি তৎক্ষণ ছাদের এক কোণে প্রাচীরের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে বসিয়া ঐ লোকটার কার্য্যতৎপরতা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। সে শাখায় দাঁড়াইয়া উপরের একটা শাখা বাম হস্তে ধরিল, অপর হস্তে পূর্ব্বের ন্যায় সোপানের লৌহশলাকাযুক্ত প্রান্ত ছাদে ফেলিল এবং টানিয়া যখন দেখিল যে উহা প্রাচীরগাত্রে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়াছে তখন সে সোপানটি নিম্নে ঝুলাইয়া দিয়া বলিল—

—"নাও! কে উঠিবে ওঠ! আমাকে পিপীলিকা ধরিয়াছে। কাকগুলা বাসা হইতে বাহির হইয়া আমাকে ঠোক্‌রাইতেছে। আমি আর এখানে থাকিতে পারিতেছি না। যতদূর দেখিতে পাইতেছি তাহাতে ছাদে কেহ আছে বলিয়া ত মনে হয় না—কাহাকেও ত দেখিতেছি না !"

লোকটা যেরূপ সত্বর বৃক্ষে উঠিয়াছিল তেমনি অবরোহণে ও তাহার অধিক সময় লাগিত না। কিন্তু ইহার মধ্যেই পিপীলিকায় তাহার দেহকে অধিকার করিয়া দংশন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল—এবং কাকসকল চীৎকার করিতে করিতে তাহার মস্তকে ও দেহে ভীষণভাবে ঠোকরাইতেছিল। পিপীলিকার দংশন এবং বায়সকুলের কলকোলাহল ও চঞ্চুবিলিখন লোকটাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। সত্বর নামিতে গিয়া তাহার পদস্খলন হইল ও সে সশব্দে বৃক্ষতলে পড়িয়া গেল। তাহার কাতরোক্তিতে ও তাহার সঙ্গীদিগের কথায় বুঝিলাম যে তাহার পদে আঘাত লাগিয়াছে এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা হইতেছে। পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে একজন আহত ব্যক্তিকে স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। দলের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ ছাদে উঠিয়া গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি করিতে সচেষ্ট হইল।

একবার মনে হইয়াছিল যে বাহিরে আসিয়া উহাদিগকে প্রহার করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম যে তাহাতে সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধাই অধিক। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীগণের গোপন দস্যুতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অস্ত্রধারণ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে না। প্রকাশ্যভাবে অস্ত্রধারণ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে হয়ত তাহারা ক্ষত্রপের সম্মুখে বিদ্রোহরূপে উহা চিত্রিত করিবে এবং তাহাদের বিবরণ মিথ্যা প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এই ব্যাপারের মূলে যে রাজকর্ম্মচারীগণ আছেন ও তাঁহারা যে এই গোপন দস্যুতার ব্যপদেশে আমাদিগকে একটা বিপদে ফেলিবার সুবিধা অনুসন্ধান করিতেছেন তাহা আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

প্রজ্ঞা ও আমি সাবধানে আপনাদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া

প্রাচীরাবদ্ধ রজ্জুসোপানের শলাকার নিকট গিয়া বসিলাম এবং নিম্নে উহাদিগের কার্য্যাদি গোপনে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আমাদিগের হস্তের নিকট শাণিত অসি, ছুরিকা ও শূল রক্ষিত ছিল।

দস্যুদিগের মধ্যে দুইজন, পূর্ব্বের মত সোপানের দুই দিক দিয়া আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল।

উঠিতে উঠিতে একজন বলিল, "এবারও আবার কি হয় দেখ।"

অপর ব্যক্তি বলিল, "এবার হয়ত কিছু হইবে না।"

—"কেন?—এবার তুমি উঠিতেছ বলিয়া না কি?"

—"গতবার গ্রন্থির নিকটে রজ্জু হয়ত কিঞ্চিৎ অদৃঢ় বা কতকটা অসংলগ্ন ছিল।"

—"অথবা কেহ বোধ হয় কাটিয়া দিয়া থাকিবে—তাহাও ত অসম্ভব নয়।"

—"অসম্ভব ত কিছুই নয়।"

—"এখন কি হইতে পারে বা না হইতে পারে তাহা লইয়া বৃথা তর্ক করিবে, না কাজ করিবে?—আর বিলম্ব করিও না!—চল—উঠ।"

অপর একজনের কণ্ঠে শুনিলাম, সে বলিল "তোমার যদি এতটুকু সাহস না থাকে তবে আসিলে কেন? পুরস্কার কি অমনি পাইতে চাও?—নিশ্চিন্ত হইয়া, নিরাপদে কুসুম-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিয়া তুমি ভাবিয়াছ বুঝি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তোমার উপার্জ্জন হইবে?—ক্ষত্রপ শ্যালকের সুবর্ণ-দীনারের সুমধুর নিক্কণ শুনিয়াছ ত?—লও, এখন উঠিয়া পড়!—আর বিলম্ব করিও না।"

রজ্জু সোপানের আন্দোলনে বুঝিলাম যে সোপনের দুইদিক দিয়া দুইজন উঠিতেছে।

অপর একব্যক্তি সোপানাশ্রিত দুইজনকে বলিয়া দিল, "দেখিও অত্যন্ত সাবধানে কাজ করিবে! যেন কোনও প্রকারে একটা বড় রকমের গণ্ডগোল করিয়া অপর নাগরিকগণকে এ বিষয়ের কিছু না জানিতে দেওয়া হয়।—ইহাই নগরপালের আদেশ। গোলযোগ বাধাইলে তোমরা বাধা পাইবে—হয়ত ধৃত হইবে—তখন আর নগরপাল বা ক্ষত্রপ শ্যালক রাজদ্বারে বা ধর্ম্মাধিকরণে তোমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। এখন অতি সতর্ক হইয়া উভর বাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে সম্মুখের দ্বার খুলিয়া দিবে। তাহার পর আমরা সকলে মিলিয়া অতি সাবধানতার সহিত পালকের পুত্র এবং ঋষভদত্তের পুত্র ও কন্যাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিব। যতটা সম্ভব শান্তিরক্ষা করিয়া ও নিঃশব্দে এই কাজ শেষ করিতে হইবে।"

—"যতটা সম্ভব—কেমন?—তাহাই হইবে।—বাটীর লোকেরা সব চুপ করিয়া সহ্য করিবে না তাহা বোধ হয় জান। যতটা সম্ভব—কেমন?"

—"তর্ক বা বিদ্রূপের সময় নাই—যাহা বলিতেছি তাহা শুনিয়া রাখ—সেইরূপ সাবধানে কাজ করিবে।"

—"আচ্ছা,—তাহাই হইবে—কিন্তু ঋষভদত্তের কন্যার কথা কেহ বলে নাই!"

—"হাঁ—হাঁ—বলা হইয়াছিল—তুমি মন দিয়া শুন নাই।"

—"আমি সকল কথাই শুনিলাম—আর ঋষভদত্তের কন্যার কথা শুনিলাম না? এত ভুল আমার হয় না, বন্ধু!"

—"শুনিয়াছ, হয় ত তোমার মনে নাই।"

—"সকলেই ত নগরপালের উপদেশ শুনিয়াছিল—কাহারও মনে নাই?"

—"যাহাই হউক, হয়ত কাহারও ভুল হইয়া থাকিবে—বলিতেই হউক বা শুনিতেই হউক।—আমি এখন আবার তোমাদের মনে করিয়া দিতেছি যে ঋষভদত্তের কন্যাকে লইয়া যাওয়া আমাদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য।"

—"প্রধান-অপ্রধান আমরা বুঝি না। আমরা যাহা শুনি নাই, তাহা আমরা করিব না।"

—"করিবে না কেন? পুরস্কার ত বড় সামান্য নয়।"

—"না, সে হইবে না। যে কথা হইয়াছে তাহার বেশী আমরা করিব না।—পুরস্কার এমনি বা কি বেশী? এত অল্প অর্থে এতগুলি কাজ আদায় করিতে পারিবে না, বন্ধু!"

অপর এক ব্যক্তি বলিল, "বুঝিয়াছি, বন্ধু, ঋষভদত্তের কন্যার উপর তোমারই দৃষ্টি পড়িয়াছে।—তবে অর্থ ছাড়—সুবর্ণ-দীনারের সংখ্যা বিবেচনা করিয়া বৃদ্ধি করিয়া দাও—এক সহস্র স্থানে সার্দ্ধ দুই সহস্র কর—আমরাও কার্য্য সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া দিব।—আমাদের হস্তে অর্থ আসিবে—আর তোমারও কামনা পূর্ণ হইবে।"

—"আচ্ছা, তাহা দেখা যাইবে।"

—"আমাদের মতও তাহাই—আচ্ছা, দেখা যাইবে।—

অর্থের কথা অগ্রে বলিতে হইবে—কিঞ্চিৎ কিংবা সব অর্থটাই অগ্রে দিতে হইবে—নতুবা কাজ অগ্রসর হইবে না।—দেখিলে না, নগরপাল অগ্রে আমাদের হস্তে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিলেন এবং প্রতিশ্রুত রহিলেন যে কার্য্য সফল হইলে আরও এক সহস্র মুদ্রা দিবেন—তুমি অন্ততঃ দেড় সহস্র স্বর্ণ-দীনার অগ্রে দাও, পরে কাজের কথা বলিও।"

ততক্ষণ দুইজন সোপান বাহিয়া ছাদের অতি সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইয়াছে।—আমরা নিম্নের কথা আর শুনিবার অবকাশ পাইলাম না। হস্তে ছুরিকা লইয়া প্রস্তুত ছিলাম—সোপান-রজ্জুর শলাকাবদ্ধ গ্রন্থি কাটিয়া দিলাম। উভয়ে সোপানসহ সশব্দে নিম্নে পড়িয়া গেল। একটা অস্ফুট কাতরকণ্ঠে চিৎকার উঠিল "উঃ।"

পূর্ব্বের একটা পরিচিতকণ্ঠে কে বলিল, "আবার, এ কি হইল?"

—"যাহা হইবার তাহাই হইল—এখন ইহাদের লইয়া চল!"

—তাহাই ত!—এখনও কি জীবিত আছে?—না—সব শেষ হইয়া গিয়াছে?

—বুঝিতে পারিতেছি না।—নিশ্বাস পড়িতেছে বটে!

—তবে বোধ হয় এখনও জীবিত আছে।

—বলা যায় না। পথে যাইতে যাইতে যেটুকু আছে তাহাও হয়ত শেষ হইয়া যাইবে।

—আর কাজ নাই ভাই সুবর্ণ দীনার—এখন চল ইহাদিগকে লইয়া যাওয়া যাক্!

তাহারা কথায় কথায় আর বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া মৃত বা অর্দ্ধমৃত দুইটা লোককে স্কন্ধে উঠাইয়া উদ্যান পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

একজন বলিল, "কিন্তু কাজ ত কিছুই হইল না। নগরপালকে কি বলা যাইবে? অর্দ্ধেক টাকা ত অগ্রেই তিনি দিয়াছেন।"

—সে জন্য যাহা করা হইয়াছে তাহা যথেষ্টই হইয়াছে। এতগুলো লোক যে, কেহ মারা গেল, কেহ বা অর্দ্ধমৃত হইল, তাহাদের জীবনের মূল্য এত কম নহে। প্রতিশ্রুত সব টাকাই দিতে হইবে। তাহা না হইলে ধর্ম্মাধিকরণে সব প্রকাশ করিয়া দিব।

—আর যদি কেহ মরিয়া যায় বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে—তাহাদের জন্য অন্যবিধ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

—কি অন্যবিধ ব্যবস্থা?

—সে তোমাকে কি বলিব?—যাহাকে যাহা বলিতে হইবে বা কোথায় কি করিতে হইবে তাহা আমরা জানি!

—এখন কি করিবে? তুমি কি আমাদের সহিত যাইবে—না এখানে থাকিয়া অবশিষ্ট কাজটুকু শেষ করিবে?—তাহাই কর—আরও পুরস্কার পাইবে!

তাহারা আর অপেক্ষা না করিয়া উদ্যান পার হইয়া রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরাও ইতিমধ্যে ছাদ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সম্মুখের দ্বার খুলিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে অতর্কিতভাবে, পথের সম্মুখে আমাদিগের একটি উদ্যান-বৃক্ষের ছায়ার অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলাম! তাহা হইতে জ্যোৎস্নালোকে আমরা দস্যুদিগকে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিতে সুযোগ পাইয়াছিলাম। দেখিলাম উদ্যানের বাহিরে তাহাদের জন্য আরও অনেক লোক অপেক্ষা করিতেছিল। আমরাও সশস্ত্র ছিলাম।

প্রজ্ঞা বলিল, "উহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে আমরা সতর্ক আছি—তাহা হইলে উহারা আজ রাত্রে আর আমাদিগকে বিরক্ত করিতে পুনরায় আসিবে না। ধনুতে শর সংযোজনা কর।"

প্রজ্ঞাবর্দ্ধন এই বলিয়া তাহার ধনুতে শর-যোজনা করিল এবং আমিও করিলাম এবং জনতার দুই পার্শ্বে দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগের শর জ্যামুক্ত করিলাম। দুইজনেই আমাদিগের অব্যর্থ সন্ধানে আহত হইয়া পড়িয়া গেল এবং আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

এই অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ঘটনায় দস্যুগণ বোধ হয় কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিবে। তাহারা অগ্রসর হইতে বিরত হইয়া কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল, এবং এই গুপ্ত ও আকস্মিক আক্রমণ কোন দিক হইতে হইল তাহা নির্ণয়ের জন্য চতুর্দ্দিক অত্যন্ত মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু এই ম্লান জ্যোৎস্নায় বোধ হয় বিশেষ কিছু দেখিতে পাইল না। তাহারা তাহাদের এই অদৃশ্য আততায়ীর অনুসন্ধানে ব্যর্থকাম হইয়া আর সে স্থানে অপেক্ষা করিল না—হয়ত তাহাদের সাহসেও আর কুলাইল না। তাহারা তাহাদের

হত বা আহত সহকর্ম্মীগণকে কোনওরূপে তুলিয়া লইয়া দৌড়াইতে লাগিল—পশ্চাতে চাহিয়া আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার অবকাশ বা সাহস তাহাদের ছিল না।

আমরা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে পিতা এবং আর্য্যপালক আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় অন্তপুর প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন। তাহাদের দুইজনের হস্তে দুইখানি মুক্ত শাণিত তরবারি ছিল। কখন যে তাঁহারা অস্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না। পিতা আমাদিগকে বাটীর বাহির হইতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া, আমাদিগকে সশস্ত্র হইয়া বাহিরে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা তাঁহাকে দস্যুদিগের প্রত্যাগমন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের পুনরায় পলায়ন পর্য্যন্ত সকল ঘটনা অবগত করিলাম। পিতা বলিলেন, "দস্যুগণ দুইবার পলাইয়া গিয়াছে—আর হয়ত নাও আসিতে পারে—কারণ তাহারা বুঝিয়াছে যে আমরা সতর্ক আছি!—কিন্তু হয়ত তোমাদের শরনিক্ষেপ করা যুক্তি-যুক্ত হয় নাই। তাহারা তাহাদের দস্যুতার বিষয় গোপন করিয়া তোমাদের স্কন্ধে সকল অপরাধ চাপাইবার চেষ্টা করিতে পারে। যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আর তাহার বৃথা আলোচনায় কোনও ফল নাই। যাও! এখন তোমরা বিশ্রাম কর! এখন পালক ও আমি শেষ রাত্রিতে সজাগ ও সতর্ক থাকিব।

নগরপ্রাকার হইতে তখন চতুর্থ যাম বিঘোষিত হইল।

আর্য্যপালক ও পিতা প্রাঙ্গণে বসিয়া রহিলেন। প্রজ্ঞাবর্দ্ধন তাহাদিগের বাটীতে প্রত্যাগমন করিল এবং সম্ভবতঃ বিশ্রামের জন্য শয়ন করিয়াছিল।

আমিও আমার কক্ষে গিয়া অস্ত্রাদি যথাস্থানে সুবিন্যস্ত-ভাবে রাখিয়া দিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম এবং কতক্ষণ মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিত দস্যুবিতাড়ন
নামক দশম বিবৃতি। (ক্রমশঃ)

জাতি-সঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধি

শ্রীঅতুল দত্ত

নিউ ইয়র্কে জাতি-সঙ্ঘের অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিরা সর্ব্বপ্রথম আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির আসরে ভারতীয় প্রতিনিধির উপস্থিতি এই প্রথম নহে। পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরা আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে উপস্থিত হইতেন। কিন্তু সেখানে তাঁহাদের বক্তব্যে ভারতবাসীর অন্তরের কথা থাকিত না—তাঁহাদের অনুসৃত নীতির সহিত ভারতবাসীর চিন্তা ও আদর্শ ছিল নিঃসম্পর্কিত। ভারতের বৈদেশিক শাসক আন্ত-র্জ্জাতিক আসরে নিজের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে চিরদিনই সেখানে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে ভারতের প্রতিনিধি সাজাইয়া লইয়া উপস্থিত হইতেন। বৈদেশিক শাসকের মনোনীত এই প্রতিনিধিরা আন্ত-র্জ্জাতিক বৈঠকে যাহা বলিতেন ও করিতেন, তাহাতে ভারতবাসী লজ্জায় অধোবদনই হইত। এই সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসী আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে তাহাদের প্রকৃত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গর্ব্ব অনুভব করিল; তাঁহাদের মুখ দিয়া বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্ম্মবাণী ব্যক্ত হওয়ায় আনন্দিত হইল।

নিউ ইয়র্কে জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি-মণ্ডলের নেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সদস্যদিগকে শোনান, It is for the first time that an Indian delegation to an international assembly is speaking in the name of a National Government—এই সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় প্রতিনিধিরা জাতীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে কথা বলিতেছেন। তিনি জানান, এতদিন পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবাসীর কোনও স্বাধীনতা ছিল না—বৈদেশিক সম্বন্ধ স্থাপনে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

তাহার পর, পরাধীন ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিগুলি যাহা মনে প্রাণে অনুভব করে, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী তাহারই প্রতিধ্বনি করেন। তিনি বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি, শান্তি ও স্বাধীনতা অবিভাজ্য; বিশ্বের কোনও জাতি স্বাধীনতায় বঞ্চিত থাকিলে বিরোধ ও সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী।" সান্ ফ্রান্সিস্কোয় নূতন জাতি সঙ্ঘের পরিকল্পনা রচনার সময় সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ মলোটভ্ সর্ব্বপ্রথম এই কথা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রতিনিধি আবার এই অমোঘ সত্য সারা-বিশ্বের প্রতিনিধিদিগকে শুনাইলেন। কতকগুলি জাতিকে পরাধীন ও অনুন্নত রাখিয়া তাহাদিগকে শোষণ করিবার জন্য

প্রবল জাতিগুলির যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহা হইতেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধ ও সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। যতদিন সারা বিশ্বে স্বাধীন ও পরাধীন জাতি থাকিবে, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাতিতে জাতিতে বিরাট পার্থক্য যতদিন ঘুচিবে না, ততদিন বিশ্বে অশান্ত অবশ্যম্ভাবী—যুদ্ধ অনিবার্য্য ; ততদিন একদিকে প্রবল জাতিগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অন্যদিকে পরাধীন জাতিগুলির অদম্য স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা কিছুতেই জগতে শান্তি আসিতে দিবে না।

স্বাধীনতাকামী জাতিগুলিকে নামমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতায় বিমূঢ় রাখিয়া তাহাদিগকে অর্থ নৈতিক নাগপাশে বাঁধিবার যে যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রতিও ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলের নেত্রী জাতি-সঙ্ঘের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি ঘোষণা করেন, "ভারতবাসীর দৃঢ় বিশ্বাস—জগতের কোথাও যে কোনও শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক অথবা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা জাতিসঙ্ঘ এবং উহার সনদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের বিরোধী।" বস্তুতঃ যুদ্ধোত্তর জগতে অর্থ নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ নূতন আশঙ্কার সৃষ্টি করিতেছে ; এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে অদূর ভবিষ্যতে ধরাবক্ষ আবার কোটী মানুষের রক্তে কর্দ্দমাক্ত হইবার লক্ষণ আজ সুস্পষ্ট। মধ্য প্রাচ্যের কোনও রাষ্ট্রকে বৃটেন বা আমেরিকা দৃশ্যতঃ রাজনৈতিক পরাধীনতা শৃঙ্খল পরাইতেছে না বটে, কিন্তু সেখানকার সর্ব্বপ্রধান সম্পদ্ খনিজ তৈলের জন্য তাহাদের আগ্রহাতিশয্যের ফলে ইতিমধ্যেই সেখানে আগুন জ্বলিবার লক্ষণ দেখা দিতেছে। প্যালেষ্টাইনে, পারস্যে ও মিশরে এখন যে সমস্যা বড় হইয়া উঠিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-চিন্তাই ইহার মূল। মধ্য-প্রাচ্যের তৈল সম্পদ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। গ্রীসে বৃটেন প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রভুত্ব চাহে না। তবে, তাহার সাম্রাজ্যের সহিত যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গ্রীসের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তাহার মনঃপূত হওয়া চাই। অথচ যুদ্ধোত্তর বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রধানতঃ অর্থ নৈতিক। আমেরিকা চীনকে নিজের রাজনৈতিক প্রভুত্বাধীনে আনিতে চাহে না ; কিন্তু চীনের অর্থনীতিক্ষেত্রে মার্কিন কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সেখানকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সে উদাসীন নহে। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে যে অগ্ন্যুৎপাতের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে প্রধানতঃ অর্থ নৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার নূতন প্রচেষ্টা।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সম্পর্কে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে জাতি-সঙ্ঘে অভিযোগ করা হইয়াছিল। নিউ ইয়র্কের অধিবেশনে এই অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। গত ২৫শে অক্টোবর জাতি-সঙ্ঘের জেনারল কমিটীতে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবামাত্র ধূর্ত্ত কূটনীতিক ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌স্ এই যুক্তির বলে প্রসঙ্গটি চাপা দিতে চান যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা সেই দেশেরই নাগরিক ; তাহাদের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্ন নিতান্তই দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ব্যাপার ; সুতরাং সে সম্পর্কে জাতি-সঙ্ঘে আলোচনা চলিতে পারে না। প্রসঙ্গটি চাপা দিবার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন যে, উহা আইন সংক্রান্ত কমিটীতে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হউক। তাঁহার সমর্থক ছিল ভারতের শাসকশক্তি বৃটেন্। এই প্রস্তাবের সর্ব্বপ্রধান বিরোধী ছিল বহু নিন্দিত সোভিয়েট রুশিয়া। তাহার পক্ষ হইতে বিখ্যাত আইনজ্ঞ মঃ ভিসিনস্কি বলেন, "This question is not an internal problem. It is an international one. Actually it represents a breach of agreement between two states"—"ইহা আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন নহে—ইহা আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্ন ; ইহাতে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তিভঙ্গ সূচিত হইয়াছে।" মঃ ভিসিনস্কি জাতি-সঙ্ঘের সনদ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, জাতি সঙ্ঘ এই প্রশ্ন উপেক্ষা করিতে পারে না। সঙ্ঘের সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে—জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের মূল স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করাই জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষের প্রস্তাবের প্রতি মঃ ভিসিনস্কির এই অকুণ্ঠ সমর্থনে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে বিচারপতি চাগলা বলেন, "মঃ ভিসিনস্কি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ, তাঁহাকে আমি এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আজ তাঁহার অনুসৃত নীতির কথা সমগ্র ভারত স্মরণ রাখিবে।" ভারতের প্রতিবেশী চীনও তাহার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছিল। চীনের প্রতিনিধি মিঃ ওয়েলিংটন কু বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় চীনা—তথা সমস্ত এশিয়াবাসীর প্রতিই বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হয়। জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে ভারতের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা পণ্ড করিবার জন্য ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌সের অপকৌশল ব্যর্থ হয়।

গত ২১শে নভেম্বর জাতি-সঙ্ঘ পরিষদে ভারতের অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই দিনও ফিল্ড মার্শাল আলোচনা বন্ধ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ভারতের অভিযোগ সত্য কিনা তাহা বিবেচনা করিবার জন্য প্রশ্নটি রাজনৈতিক কমিটীতে উত্থাপন করা হউক এবং এই "ঘরোয়া" ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা জাতি সঙ্ঘের আছে কিনা, তাহা বিবেচনা করিবার ভার আইন সংক্রান্ত কমিটীর উপর দেওয়া হউক। এই দিন শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ওজস্বিনী ভাষায় ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌স্‌কে যোগ্য উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন—এই জাতিগত বৈষম্যের ফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ; ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সারা বিশ্বে ইহার প্রতিক্রিয়া ঘটিবে। তিনি জানান—ভারতীয়দিগকে পৃথক্ করিয়া রাখার নীতি অনুসরণ করিয়া মানুষের মূল অধিকারেই আঘাত করা হইয়াছে। মিশর, পারস্য, ইউক্রেণ ও চীনের প্রতিনিধিরা ভারতবর্ষের অভিযোগের যৌক্তিকতা সমর্থন করিয়া প্রসঙ্গটি জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে আলোচনা করিতে চান। চীনের প্রতিনিধি মিঃ ওয়েলিংটন্ কু দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থাকে বিশ্বের রাষ্ট্রদেহে দুষ্ট ক্ষতস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন।

আলোচনায় এখনও কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারের সহিত ভারতবর্ষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইলেও ইহা শান্তিকামী মানুষ মাত্রের পক্ষেই নীতিগত প্রশ্ন। এতদিন

শ্বেতজাতিগুলি অশ্বেত জাতিগুলিকে ঘৃণা করিয়াছে, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগকে অবাধে শোষণ করিয়াছে। এই জাতিগত বৈষম্য শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। জাতিগত কৌলীন্যের কথা ফ্যাসিস্টরা প্রথম বলে নাই; জগতের সমস্ত শোষণকামী জাতি ও শ্রেণীই জাতিগত বৈষম্যের সমর্থক। উগ্রতম সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্টরা উহাকে নূতনভাবে প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিল মাত্র। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যেমন সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের বিলোপ একান্ত প্রয়োজন, তেমনি সকল প্রকার শোষণের আদি ভিত্তি জাতিগত বৈষম্যের অবসানও অত্যাবশ্যক। মানুষ মানুষকে ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিবে, অথচ জগতে অখণ্ড শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে—ইহা দিবাস্বপ্ন মাত্র। বস্তুতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসঙ্গ জাতি-সঙ্ঘের পক্ষে অগ্নি-পরীক্ষা। এই প্রসঙ্গ চাপা দিবার সিদ্ধান্ত যদি জাতি-সঙ্ঘে গৃহীত হয়, তাহা হইলে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের পক্ষে সঙ্ঘের চরম অক্ষমতাই প্রতিপন্ন হইবে।

অদৃষ্টের পরিহাস—দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসঙ্গ আজ যে দেশে বসিয়া আলোচিত হইতেছে, সেই দেশের কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা এখনও মানুষের অধিকারে বঞ্চিত; সে দেশের ধূলিকণা এখনও নিরীহ নিগ্রোর তাজা রক্তে কর্দমাক্ত। বর্ণবৈষম্যে শীর্ষস্থানীয় এই দেশটি যখন শান্তির বুলি আওড়ায়, সকল মানুষের সমান সুযোগের মহিমা কীর্তন করে, তখন তাহা নিষ্ঠুর পরিহাসের মতই শুনাইয়া থাকে।

অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি স্যার মহারাজা সিং জাতি-সঙ্ঘে ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌সকে সমুচিত শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মুরুব্বি বৃটেনের অনুগ্রহে দক্ষিণ আফ্রিকা তৎকালীন জাতি-সঙ্ঘের নিকট হইতে দক্ষিণপশ্চিম আফ্রিকার উপর ম্যাণ্ডেটারী ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা এখন ঐ অঞ্চলটি নিজের কুক্ষীগত করিতে চায়। ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌স্ জাতি-সঙ্ঘকে বুঝাইতে চান—দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাণ্ডেটারী সুশাসনে পশ্চিম আফ্রিকাবাসীরা এতই মুগ্ধ হইয়াছে যে, তাহারা স্বেচ্ছায় দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে চাহিতেছে। এই সম্পর্কে পশ্চিম আফ্রিকাবাসীর তথাকথিত আবেদন-পত্রও তিনি জাতি সঙ্ঘে উপস্থাপিত করেন।

স্যার মহারাজা সিং দক্ষিণ আফ্রিকার তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌সের ভণ্ডামীর মুখোস সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করেন। আফ্রিকাবাসীর প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার কর্তৃপক্ষের অসঙ্গত ব্যবহার তিনি আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন। মার্শাল স্মাট্‌স ক্ষিপ্ত হইয়া অপ্রাসঙ্গিকভাবে ভারতবর্ষে জাতি-ভেদ প্রথার কথা এবং বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের কথা উল্লেখ করেন এবং আফ্রিকাবাসীর জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা কি করিয়াছে, তাহার এক লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করেন। স্যার মহারাজা সিং উত্তরে বলেন যে, ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা আইনগত সমর্থন লাভ করে নাই। ভারতবাসী প্রাণপণ শক্তিতে এই বৈষম্য দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে; পক্ষান্তরে, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণগত বৈষম্য আইনের সাহায্যে স্থায়ী করা হইতেছে। তিনি সদস্যদিগকে জানাইয়া দেন—আফ্রিকাবাসীর জন্য মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত কয়েকটি বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিয়া ফিল্ড মার্শাল স্মাট্‌স বাহবা লইতে চেষ্টা করিতেছেন। আইন পরিষদে আফ্রিকাবাসীদের প্রতিনিধি পাঠাইবার সীমাবদ্ধ অধিকার আছে বটে; কিন্তু কোনও কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি আফ্রিকাবাসীর প্রতিনিধি হইবার অধিকার নাই।

পশ্চিম আফ্রিকার ভাগ্য সম্বন্ধে স্মাট্‌স্ এণ্ড কোম্পানীর এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে স্যার মহারাজা সিং-এর বক্তৃতায় বিশেষ কাজ হইয়াছে। একমাত্র মুরুব্বি বৃটেন ছাড়া এই ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকার কোনও সমর্থক জোটে নাই।

ভারতবর্ষ স্বস্তি পরিষদের সদস্য হইতে চাহিয়াছিল। স্বস্তি পরিষদের মোট সদস্যসংখ্যা এগার। ইহার মধ্যে বৃটেন, আমেরিকা, রুশিয়া, ফ্রান্স ও চীন—এই পাঁচটি শক্তি ঐ পরিষদের স্থায়ী সদস্য। ইহা ছাড়া প্রতি দুই বৎসর অন্তর ছয়টি শক্তি জাতি-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক স্বস্তি পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হয়। ভারতবর্ষ এবার অস্থায়ী সদস্যপদের জন্য প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু সে নির্ব্বাচিত হইতে পারে না।

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বর্ত্তমানে জাতি-সঙ্ঘ পরিষদের অধিকাংশ সভ্যরাষ্ট্র বৃটেন ও আমেরিকার অনুগৃহীত অথবা তাঁহাদের তাঁবেদার। অন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর যাহারা খোঁজ রাখেন, তাঁহাদের স্মরণ থাকিবে—যুদ্ধ শেষ হইবার অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে অনেকগুলি রাষ্ট্র ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জাতি-সঙ্ঘের সদস্য হইবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছিল। জার্ম্মানীর গোপন সমর্থক তুরস্ক, এমন কি আধা-ফ্যাসিস্ট আর্জেন্টিনা পর্য্যন্ত তখন ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে একটি সৈন্য, একটি গুলি অথবা একটি পয়সা ব্যয় করিতে হয় নাই। আয়ার এই ভণ্ডামী করে নাই বলিয়া এখন পর্য্যন্ত সে জাতি-সঙ্ঘের সভ্য নহে; এবারও নিউইয়র্কে জাতি-সঙ্ঘের অধিবেশনে তাহার আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর প্রত্যেক বুদ্ধিমান পর্য্যালোচকের নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে, বৃটেন ও আমেরিকার অনুগৃহীত রাষ্ট্রগুলিকে জাতি-সঙ্ঘে যাইবার সুযোগ দিবার জন্যই তখন এই ব্যবস্থা হয়। তাহারাই আজ জাতি সঙ্ঘ পরিষদে সংখ্যা-গরিষ্ঠ। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারত, জাতি বৈষম্যের বিরোধী ভারত, বিশ্বের নিপীড়িত ও শোষিত জাতির মুখপাত্র ভারত যে তাহাদের সমর্থন পাইবে না, তাহা ত জানা কথা।

জাতি-সঙ্ঘ পরিষদে গোপনে ভোট দেওয়ার প্রথা। কাজেই, কে ভারতবর্ষের পক্ষে ভোট দিয়াছে এবং কে দেয় নাই, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জয়ঢাক রয়টার গবেষণা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, সোভিয়েট রুশিয়া ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিল। অথচ রয়টারের প্রতিনিধি ভারতবর্ষের পক্ষে বৃটিশ কমনওয়েলথের ৬টি ভোটই ধরিয়াছেন। অর্থাৎ জাতি-সঙ্ঘের সোভিয়েট প্রতিনিধিদের সহিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া

বেসামাল রয়টার-প্রতিনিধি ভারতবাসীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, উদারতার অবতার দক্ষিণ আফ্রিকাও ভারতবর্ষকে সমর্থন করিয়াছিল।

ইহার পরও ভারতের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বৈদেশিক সৈন্যের হিসাব দাখিল সম্পর্কে সোভিয়েট প্রতিনিধির প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। বৃটেন এই প্রস্তাবের আলোচনা চাপা দিতে চাহিয়াছিল। সে বলে—নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাবের সঙ্গে উহা আলোচনা করিলেই চলিবে। ইন্দোনেশিয়ায়, গ্রীসে, ইরাকে, মিশরে, চীনে প্রগতিপন্থী আন্দোলন দমন করিবার জন্য কি ভাবে বৈদেশিক সৈন্য ব্যবহৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা ভারতবাসী ভাল করিয়াই জানে। ভারতবাসী ইহাও বোঝে—ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিবার যে প্রতিশ্রুতি শোনান হইয়াছে, ভারতভূমি হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারিত না হইলে সে প্রতিশ্রুতি অর্থহীন। প্রতিক্রিয়াপন্থী বৃটিশ আমলার দল যে সাম্প্রদায়িক বিরোধে ইন্ধন যোগাইয়া ভারতবর্ষে স্থায়িভাবে বৈদেশিক সৈন্য রাখার ফন্দী খুঁজিতেছে, তাহা প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর নিকট সুস্পষ্ট।

স্বস্তী পরিষদের ৫জন সদস্যের "ভিটোর" অধিকার জাতি-সঙ্ঘের বর্ত্তমান অধিবেশনে প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সম্পর্কে ভারতের নীতি সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। জাতি-সঙ্ঘের রাজনীতিক ও স্বস্তি কমিটিতে অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ কে, পি, এস্ মেনন্ বলিয়াছেন, "The Indian delegation feels that the veto, however undemocratic it may seem in theory, is in essence a reflection of the realities of the international situation. —ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডল মনে করেন, ভিটো প্রথা যতই গণতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া মনে হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে উহা বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিরই দ্যোতক।

ভিটো প্রথার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা আর কিছুই হইতে পারে না। বর্ত্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতিতে বৃহৎ ৫টি শক্তির ঐক্যমত্যের উপরই জগতের শান্তি নির্ভর করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কোনটিকে বাদ দিয়া ভোটের জোরে স্বস্তি-সঙ্ঘে কোনও প্রস্তাব পাস হইলে অশান্তির বীজই উপ্ত হইবে; সেই বীজ ক্রমে বিরাট বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া সারা বিশ্বের বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। ২৬।১১।৪৬

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মহেন্দ্রবাবুর বাটীর সদর দরজার সম্মুখস্থ পথ। নেপথ্য হইতে এক ভিখারীর গান শোনা গেল, ক্রমে গানের শব্দ দূরে চলিয়া গেল। পথিক ও ফেরিওয়ালা কয়েকটি চলা-ফেরা করিতেছে। রাধা ও বিক্রম প্রবেশ করিল। রাধা দরজার কড়া নাড়িল।

বিক্রম। বাড়ী এসে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, না?

রাধা। (মৃদু হাসিয়া) সত্যিই তাই। কী রকম করে চায় লোকগুলো দেখেছেন? আর আমি বেরোব না।

বিক্রম। যে লোকগুলো চায় সে লোকগুলো চিরকালই ঐ রকম করে চায়।

রাধা। তা হোক, বাবা তো ভাল হয়েছেন এখন।

বিক্রম। তা হয়েছেন।

ভিতর হইতে দরজার খিল খোলার শব্দ হইল। দরজা অল্প খুলিয়া মধু মুখ বাড়াইয়া ইহাদের দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। ইহারা ভিতরে প্রবেশ করিলে দরজা আবার বন্ধ হইল। যেমন কলিকাতার সকল রাস্তায় দেখা যায়, পথিক ফিরিওয়ালা ও ভিখারী আসিল ও গেল। দুই ব্যক্তি এই বাটীর দরজার অদূরে দাঁড়াইল। একজন অতি উগ্র সৌখীন যুবক, ঘাড় কামানো দীর্ঘ-টেরীকাটা মাথা, আদ্দির পাঞ্জাবি ও লপেটাজুতা, কোমর বাঁধিয়া ধুতি-পরা, হাতে সিগারেট। অপরটি এক প্রায়-বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, কৃষ্ণবর্ণ মুখের উপর গালে ও কপালে মেচেতার কালিমা, পরিধানে সাদা ধুতি ও স্কন্ধে লাল গামছা, হাতে একটি এটাসি কেসের ধরণের টিনের বাক্স। স্ত্রীলোকটি ঘটকী নিস্তারিণী, যুবক এই পাড়ার, নাম পাঁচু।

পাঁচু। এই বাড়ী, দেখলে তো? নম্বরটা হোলো—

নিস্তারিণী। নম্বর তুমি জপ করগে বাবা, আমার অত নম্বর-সম্বরে কাজ কী? আমি তো আর পত্তর লিকতে যাচ্ছি নে।

পাঁচু। না, না, ওটা লিখে নাও না। পাঁচ জায়গায় ঘোরো—

নিস্তারিণী। নাচ জায়গার কথা তুলোনি বাবু। তিন কোন পিরথিমি এই দুটো পায়ের নিচে, তুমি নাচ জায়গা দেখাচ্ছ।

পাঁচু। বলছি, যদি ভুলে যাও—

নিস্তারিণী। (তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া) হেঃ, নাচ নক্ষ বাড়ী যেতেছি এসতেছি, কিন্তু একবার যে বাড়ী দেখব তা নাকি আবার ভুলে যাব! ঐ যে বল্লুম তিন কোন পিরথিমি নিস্তার ঘটকির মাথার মধ্যে ঘুরছে, কিন্তু পোড়া পিরথিমিই ঘুরে মরছে, নিস্তারের মাথা ঠিক বসে আছে প্যাঁট হয়ে।

পাঁচু। (আর কথা না বাড়াইয়া অতি আগ্রহে সকল কথা মানিয়া লইল) তা তো বটেই, তোমাকে না জানে কে। তা দেখ, ঐ নগদ পঞ্চাশ টাকাটা আমি নিজে দেব। তারপর দুবাড়ী থেকে তোমার পাওনা থোওনা যা, সে তো আছেই। তুমি বলবে ছেলের অবস্থা—

নিস্তারিণী। এইবার তুমি আমাকে চটালে বাবু। কী বলতে হবে তা আজ নিস্তার ঘট্‌কিকে তোমার কাছে শিখতে হবে?

পাঁচু। (অপ্রতিভ হইয়া) না, তাই বলছি।

নিস্তারিণী। তা বলবে বই কি। তোমরা কালকের ছেলে, দেখলেই বা কী, আর জানবেই বা কোত্থেকে। জিজ্ঞেস কোরো দিকি তোমার বাবাকে, তেনার বে কে দিইছিল? আমি কি আজকের নোক রে বাবা। যা বলবার আমি ঠিকই বলব। আর তাও বলি,—ও মেয়ে যদি নাই হয়। মেয়ের রঙ তো শুনছি ফরসা নয়—

পাঁচু। তা হোক্, চাউনিটা বড় প্যাথেটিক, মানে ক্লাস্‌ক্ল্যাস, মানে—সে তুমি বুঝবে না।

নিস্তারিণী। ঝ্যাঁটা মারো অমন চাউনির মাথায়। আবার মেয়ের বড় বোনের ব্যাপারও তো তুমি ঐ বল্লে; আর দেখলুমই তো চোখে—নাই হোলো ও মেয়ে। মেয়ের ভাবনা? ঐ পাথুরেঘাটার কৈলেশ দত্ত—পরমা সুন্দরী মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি—

পাঁচু। সে থাক। তুমি এখানেই—

নিস্তারিণী। আহা সে তো হচ্ছেই গো, এখেনে তোমার বে হয়েই গেছে ধর না কেন। নিস্তারকে বলাও যা, আর টোপর মাথায় দিয়ে পিঁড়িতে বসাও তা। বলছি একটা কথার কথা, মেয়ের জন্যে ভাবনা কী? বেটাছেলে, একবার মুখের কথা খসালে কত গণ্ডা আসবে। বলে মাঠে গরু পড়লে আবার শকুনকে ডাকতে হয় নাকি?

পাঁচু। আচ্ছা, আমি চল্লুম। ঐ যে মোড়ের চায়ের দোকানটা, ঐখানেই আমি থাকব। তুমি বলে যেয়ো কী খবর হয়।

নিস্তারিণী। ওমা, এখন কী খবর দেব বাবা? এখন আমার বলে মরবার সাবকাশ নেই। এখনও তিনটে বাড়ী যেতে হবে। বলে, বাঘের ডাকে এ পাড়ায় এনু, ঐ ঘোষালদের সেজগিন্নি, নিত্যি নোক পাঠাচ্চে, গাড়ীভাড়া পাঠিয়ে দিয়েচে দারোয়ান দিয়ে—

পাঁচু। আচ্ছা, তা নয় একটু পরেই যেয়ো। আমি কিন্তু ঐ চায়ের দোকানেই বসে থাকব। বুঝলে? ঐ মোড়ে—

নিস্তারিণী। হ্যাঁ গো দেকিচি। তাই বসো গে—

ভিতর হইতে দরজা খোলার শব্দে চমকিয়া পাঁচু দ্রুত স্থানত্যাগ করিল।

নিস্তারিণী। বেহায়া-মানুষ চারকালই আছে। কিন্তু আজকালকার ছোঁড়াগুনোর মতন এমন হাড়-বেহায়া আমার চোদ্দপুরুষে দেখে নি। ছি ছি ছি—

দরজা খুলিয়া মধু বাহিরে আসিল, তাহার হাতে বাজার করিবার ধামা।

মধু। কে গা? কী চাই?

নিস্তারিণী। আমি নিস্তার গো নিস্তার।

মধু। নিস্তার? কে নিস্তার? এ বাড়ীতে কি—

নিস্তারিণী। এ বাড়ীতে আর আমাকে দেখবে কোত্থেকে বাছা? তোমরা কি আর তখন হয়েছ? তোমার বাপ-খুড়োরা থাকলে চিনতো।

মধু। (অতি বিস্মিত হইয়া) তারা তো নেই, তা এখন্ কাকে দরকার?

নিস্তারিণী। আমার দরকার কারুর সঙ্গেই নেই বাবা, আমাকেই দরকার সকলের। সকলেই খোঁজে নিস্তার ঘট্‌কিকে—

মধু। ঘট্‌কি?

নিস্তারিণী। কিন্তু খুঁজলে কী করব? একটা মানুষ তো আর দশটা হতে পারিনে, কী বলনা গো? তাই বলি, আরও তো দশ গণ্ডা ঘটক-ঘট্‌কি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে মরচে, তাদের ডাকো না। না, তা হবে না। এই নিস্তারকে নইলে আর নিস্তার নেই।

মধু। ঘটকালি? তা, এখন কি দিদিমণির বিয়ের কথা হবে? কে কথা কইবে? বাবুর যে ব্যেরাম চলছে—

নিস্তারিণী। সে কথা তুমি আমাকে বলে দেবে বাছা? আহা, ঐ ব্যামো শুনেই তো এনু গো তাড়াতাড়ি। নইলে শ্যামপুকুরের মাসী এসে বাড়ীতে বসে আছে। বলি, থাক বসে। তোর বাবুই তো এক আমার মক্কেল নয়। সবাইকেই দেখতে হবে। কী বল না বাবা? বলে কল্লেদায়—কী বল না?

মধু। তা তো ঠিকই। কিন্তু এখন মেয়ের বে'র কথা কইবে কে? বাবুর ব্যায়রাম কিনা—

নিস্তারিণী। ওমা, ব্যামো বলে মেয়ের বে দেবে না? শোনো কথা। শরীল গতিকের তো এই অবস্থা। বলে পদ্মপত্তরে জল। আর মেয়েও কচিটি নয়। বে আবার কবে দেবে গো? তার ওপোর বড় মেয়েটি এই রকম, বল না? বলি, নিস্তার ঘটকীর আর জানতে বাকী কী? মেয়ের বে আর দেরী করা চলে? চলে না। ছেলে আছে আমার হাতে, খুব ভাল ছেলে—

মধু। তা দেখ, তোমার বরাত। আমি যাই, দোকানের দেরি হয়ে যাচ্ছে—

নিস্তারিণী। হ্যাঁ, তুমি যাও বাছা। এ সব আমার পুরোনো ঘর, আমি কি আজ আসছি এ বাড়ীতে। তুমি যাও।

মধু। তাহলে তুমি বড় দিদিমণির সঙ্গে কথা কও, ভেতরে যাও—

নিস্তারিণী। ওমা সে কী কথা? কত্তার এই রকম অসুখ—এখন কি বে'র কথা কওয়া ভাল দেখায়। আর তোমার বড় দিদিমণির সঙ্গেই বা কী কথা কইব? তবে তুমি বলছ যখন, তা দেখি, সময় করে উঠ্‌তে পারি যদি, আসবখন, কত্তাবাবুকে বোলো কোনো ভাবনা নেই। নিস্তার ঘটকি ঘটকালি করে বটে, কিন্তু বাজে কথা কয় না। আসব'খন এর পর।

মধু। তা এসো। মধুর প্রস্থান

নিস্তারিণী অন্য পথে চলিয়া যাইতেছিল, পাঁচু প্রবেশ করিয়া ডাকিল—

পাঁচু। এই যে ঘটক ঠাকরুণ, একটা কথা বলছিলুম—

নিস্তারিণী। কী গো বাবু, আর তর সইছে না? আবার কী কথা

পাঁচু। না কিছু নয়, এই বলছিলুম—যদি ধর আমার সঙ্গে—মানে যদি এই সম্বন্ধ—মানে যদি তোমার কথায় রাজী না হয়, তাহ্লে—

নিস্তারিণী। না হয় তো ভয়টা কী বাছা? ওরা না রাজী হলে লোকের বে হবে না নাকি? ওরাই কি লাট সায়েব, না প্যাগম্বর এসেছে? চলো না দেখি, এই দণ্ডে তোমার যদি বে না দিতে পারি তো—হুঁঃ, বলে কত গঙ্গা ঘাটের মড়াই পার করে দিলুম আর তোমারই হবে না? ওদের মেয়ের সঙ্গে বে না দেয়, আমি তো আছি।

পাঁচু। না তাই বলছি। বলছি—, মানে, তুমি একটু ওদিকে চল না, এখানে এদের বাড়ীর সামনে খালি খালি কথা কওয়াটা, মানে, এর পরে লোকে বলতেও পারে যে আমি বুঝি সেধে সেধেই বিয়ে করেছি। একটু ওদিকে গিয়েই—

নিস্তারিণী। কিসের ভয়? বলি ভয়টা কিসের শুনি? পুরুষমানুষ, বেটাছেলে, বে করবে বই আর তো কিছু নয়। একটা ছেড়ে দশটা বে করবে, তার আবার কথা।

পাঁচু। তা না তো কী। ওরা যদি একেবারেই না বলে তো তুমি—তুমি সেই যা বলেছি, একদম হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবে। বলবে—

নিস্তারিণী। সে আর তুমি শিকিও না বাছা আমাকে। এই করে চুল পাকালুম, যা বলবার আমি সব বলব। হ্যাঁ, সে ছোঁড়ার কী নাম বল্লে?

পাঁচু। জয়ন্ত বোস। শ্যামবাজারের অবনী বোসের ছেলে।

নিস্তারিণী। পোড়া কপাল নামের। ও আবার কী নাম? ও নাম আবার মানুষ মনে করে রাখতে পারে? ঠাকুর দেবতার নাম হয় তো মনে থাকে। তা দেখ, তুমি লিকে দাও তো বাবু। বাপের নাম, ঠিকেনা, মাতামোর নাম, কত মাইনে পায়, সব লিকে দাও তো—

পাঁচু। মাতামো ফাতামো অত সাত গুষ্টির খবর কে রাখে। আর ওসব লিখেই বা কী হবে?

নিস্তারিণী। ওমা, তা না লিকলে চলে? বে বলে কথা—

পাঁচু। ধেৎ। তার তো আর বিয়ে হচ্ছে না। অত সাত সতেরো—

নিস্তারিণী। কেন বে হবে না? বেটাছেলে,—বলে সোনার আংটি, তার আবার বাঁকা আর সিদে। বে'র ভাবনা কী?

পাঁচু। তা হয় হোক, কিন্তু তুমি তো তার সম্বন্ধ করতে যাচ্ছ না, ভাঙতে যাচ্ছ, তোমার অত শত দরকার কী?

নিস্তারিণী। দরকার নেই? ওমা, এ ছেলে কী বলে শোনো। এখেনে নয় ভাঙ্গব, তা বলে অন্তরে করতে হবে না? না বাবু, তুমি সব লিকে দেবে তো দাও, নইলে আমি পারব না।

পাঁচু। ভাল জ্বালাতন। তা চল, যা জানি, সব লিখে দিচ্ছি। তুমি ঐ চায়ের দোকানেই চল, একটা কাগজ কলম চেয়ে নিয়ে—

নিস্তারিণী। তাই চল। আর অমনি এক বাটি চা দিতে বোলো বাছা। ভাল করে চিনি দেয় যেন। আর দুধ ভাল করে—

পাঁচু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই দেবে চল। উভয়ের প্রস্থান

গান গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুক প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রবাবুর দ্বারে গান গাহিতে লাগিল, ক্ষণকাল পরে রাধা আসিয়া মুষ্টি-ভিক্ষা দিল।

গান

যে জ্বালা দিয়েছ মাগো, সে কি তব আছে মনে?
তুমি কি বুঝিবে দেবি, জ্বলেছে যে সে-ই জানে।
সুখনীড় ভেঙ্গে দেছ, ঘুচায়েছ সব আশা,
এ হিয়া করেছ মরু, রেখেছ অনন্ত তৃষা,
জীবনে ভুলেছ মোরে, ভাল মা'র ভালবাসা!
মরণে স্মরণ কোরো, শরণ নি ও চরণে॥

ক্রমশঃ

যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদীয় পাতিপুকুর যক্ষ্মা চিকিৎসাগার

কবিরাজ শ্রীঅমরভূষণ রায়

"তত্রাপরিক্ষীণ মাংস শোণিতোবলবান জাতারিষ্ট:
সর্ব্বৈরপি শোষ লিঙ্গৈরূপদ্রুত: মধ্যোজ্জ্বেয়:॥"

অর্থ:—"সেই রাজযক্ষ্মাও সাধ্য জানিবে, যে রোগীর সমুদয় শোষ-রোগের লক্ষণ প্রকাশ থাকা সত্ত্বেও, যদি রক্ত মাংসের ক্ষয় না হয়, শরীর বলবান থাকে এবং কোন অরিষ্ট লক্ষণ (নিশ্চিত মৃত্যুজ্ঞাপক লক্ষণ) প্রকাশ না পায়।

অতএব দেখা যাইতেছে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় রাজ যক্ষ্মা (Pulmonary Tuberculosis) সাধ্য ও আরোগ্য হয়। একদা যামিনীভূষণ মৃত্যুকালে তাঁহার অর্জ্জিত সকল অর্থ ও ভূসম্পত্তি ভারতের আর্ত্ত-জনগণের কল্যাণ সাধনে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার উন্নতি কল্পে দান করিয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১২ বিঘা জমি সহ পাতিপুকুর ২৯নং শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব রোডস্থ বাগান বাটী অন্যতম। তখন কে জানিত যে, আজ অনশনক্লিষ্ট ভারতের জনগণের মধ্যে এই করাল

ব্যাধি অতি ব্যাপকভাবে প্রবেশ করিবে ও অচিরে তাহাদের ছিন্নমূল করিয়া ফেলিবে। বোধ করি এই কথা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসাবে চিন্তা করিয়া যামিনীভূষণের সহকর্ম্মী ও তৎকালীন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালার কর্ত্তৃপক্ষ মনোমোহন পাণ্ডে, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, কুমারকৃষ্ণ মিত্র একটী আয়ুর্ব্বেদীয় যক্ষ্মা চিকিৎসাগারের বিরাট অভাব অনুভব করিয়া যামিনীভূষণ প্রদত্ত পাতিপুকুর বাগানবাটীতে উহা স্থাপনার পরিকল্পনা করিলেন। তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য তৎকালীন খ্যাতনামা কণ্ট্রাক্টর পি, সি, কুমার মহাশয় বিনা লাভে আরোগ্যশালার বাটী নির্ম্মাণ কার্য্যে সর্ব্ববিধ সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলেন। বাটী নির্ম্মাণ কার্য্যের ব্যয়ের জন্য কলিকাতা পৌর সভার নিকট আরোগ্যশালার

পাতিপুকুর যক্ষ্মা চিকিৎসাগার

কর্ত্তৃপক্ষ এককালীন ২৫০০০৲ টাকা দানের জন্য আবেদন করিলেন এবং ১৯৩২ সালে কলিকাতার তদানীন্তন প্রধান নাগরিক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহোদয় কর্ত্তৃক আরোগ্যশালা বাটীর ভিত্তি স্থাপিত হইল। ১৯৩৩ সালের জুন মাসে ৪০ জন রোগীর বাসোপযোগী ত্রিতল বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইল। স্থির হইল যে বাগান বাটীতে অবস্থায়ী বৈদ্য (Resident Physician and Surgeon's quarter) ও আচারিকা বৃন্দের (Nurses quarter) বাসভবন রূপে ব্যবহৃত হইবে। ৪০ জন রোগীর শয্যা মধ্যে ২৮টী বিনাশুল্ক ও স্ত্রী রোগীদের জন্য ১২টী শয্যা নির্দ্দিষ্ট হইল। কর্ত্তৃপক্ষের মনে আশা ছিল যে, ভবিষ্যতে কলিকাতার পৌর সভা, জনসাধারণ ও আয়ুর্ব্বেদসেবিগণের প্রচেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় উন্মুক্ত উদ্যানে আরোগ্যশালার অন্ততঃ পক্ষে ১০০ শত জন রোগীর বাসোপযোগী পরিবর্দ্ধন অচিরেই সম্ভব হইবে। শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব রোডের স্থানে স্থানে বর্ষাকালে জল জমিয়া চিকিৎসকদের ও রোগীদের আত্মীয়বর্গের পক্ষে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার গুহ ও অন্যান্য সভ্যবৃন্দের প্রচেষ্টায় রাস্তাটী সংস্কার হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১৯৩৩-৩৪ সালে কলিকাতার পৌর সভা আরোগ্যশালার ব্যয়ভার বহন করার জন্য বাৎসরিক ১২০০০৲ টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহা আজ ৫০ জন রোগীর শয্যা ব্যবস্থা করায় বাৎসরিক ২১৭৫০৲ টাকায় পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় রাজ-

পাতিপুকুর যক্ষ্মা চিকিৎসাগারের বারান্দায় রোগীগণ

যক্ষ্মা আরোগ্য হয়—যদি রোগীকে সময় মত চিকিৎসাধীনে রাখা যায়। বর্ত্তমান সময়োপযোগী ও যামিনীভূষণের আমরণ আদর্শানুযায়ী চিকিৎসা-ক্ষেত্র এই আরোগ্যশালার উদ্দেশ্য নহে—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রভাব বিমুক্ত রাখা। বরঞ্চ দেখা যায় রাজযক্ষ্মা চিকিৎসায় পাশ্চাত্য শল্য পদ্ধতি নিরাময়ক হিসাবে পৃথিবীর সর্ব্বজনসমাদৃত হইয়াছে। এই দুই চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ও প্রাচ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যাপক অনুসন্ধান এবং গবেষণার দ্বারা রোগক্লিষ্ট মানবের প্রভূত কল্যাণ সাধন করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে যামিনীভূষণ নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি অষ্টাঙ্গ

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও আরোগ্যশালা অক্লান্ত পরিশ্রমে স্থাপন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালানুযায়ী থুতু, রক্ত ও মল মূত্রাদি পরীক্ষার দ্বারা এই রোগ নির্ণয়ের পক্ষে অশেষ সুবিধা হইয়াছে। তদনুযায়ী কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল পরীক্ষার সুবিধার জন্য নব নির্ম্মিত কুটীরে একটী বিস্তৃত শারীর পরিচয় ব্যবস্থাগার (Pathological Laboratory) স্থাপন করিয়াছেন

একটী কুটীর—পাতিপুকুর যক্ষ্মা আরোগ্যশালা

এবং এই কার্য্যে সাহায্যের জন্য American Friends' Ambulance unit একটি নূতন অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যসম্ভার দান করিয়া বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। এ কার্য্যে রঞ্জন-রশ্মিরও প্রয়োজনীয়তা বড় কম নহে। মুক্তাগাছার স্বনামধন্য মহারাজা ৺শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য চৌধুরী একটি আধুনিক রঞ্জন রশ্মির যন্ত্র যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ের জন্য দান করিবেন—এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তদনুযায়ী কর্ত্তৃপক্ষ Victor X'ray Corporation (India) লিঃ এর নিকট অর্ডার প্রদান করিয়াছেন। আশা করা যায় উহা শীঘ্রই কর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত হইবে ও যক্ষ্মা আরোগ্য-শালার ভর্ত্তির জন্য আবেদনকারী রোগীদের সুবিধার্থে সাধারণ আরোগ্যশালা ভবনে স্থাপিত হইবে। এতদ্ভিন্ন সদাশয় শ্রীযুক্ত শুভকরণ জালান মহাশয় Fluroscopic পরীক্ষার জন্য একটি ছোট যন্ত্র দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং উহারও অর্ডার দিয়া জালান মহাশয় অগ্রিম ১০০০৲ (এক সহস্র) টাকা উক্ত কোং-কে প্রদান করিয়াছেন। উহা আসিলে যক্ষ্মা আরোগ্যশালা ভবনেই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বর্ত্তমানে কর্ত্তৃপক্ষ রোগী বিশেষে এই রোগে শল্য চিকিৎসার আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া অন্যূনপক্ষে ১৫টী রোগীর শয্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল শয্যার রোগীদিগকে লঘু শল্য চিকিৎসা যথা:—Artificial Pneumothorax (উর আধ্মাপানা), Phronic Evulsion (অনুকণ্ঠিকা নাড়ী ব্যবচ্ছেদ) এবং বৃহৎ শল্য চিকিৎসা যথা:—Thoracoscopy (উর স্থাপকর্ষণ), Thorocoplasty (পর্শুকা-খণ্ডন) সাহায্যে ও মৌখিক আয়ুর্ব্বেদীয় ভেষজ ও ধাতব ঔষধের প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকলেই ব্যাকুল চিত্তে আশা করিতেছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসার সমন্বয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি সবশে আনিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য করিতে সক্ষম হইব।

'বড়দিন'

ক্যাপ্টেন্ শ্রীরামেন্দু দত্ত

করিলাম বড়দিন—
হেরি দু'টি অনাহারক্ষীণ,
মুখে শুষ্ক মাতৃস্তন,
দিঠি সকরুণ, শিশু—নারায়ণ!
মিলিটারী ক্যাপ্টেন, চলিয়াছে কবি
প্রবাস—বিরক্ত মনে আঁকি স্নিগ্ধ ছবি
নিজ কুটীরের—
নিজ শিশুদের
তরে ক্রীত ফল, মিষ্টান্ন কত না;
হিন্দুগৃহে "বড়দিন" করিতে রচনা।
(পথে বা প্রবাসে নয়)
কিন্তু একি হয়
ভিখারী বালক, বালা; অস্থি চর্ম্ম সার
ভীড় ক'রে পথ মাঝে করে হাহাকার
ক্ষুধা শীতাতুর!
তাহাদের কিছুমাত্র কষ্ট হবে দূর
এই ভেবে বসে কবি পেটিকাটি খুলে
কমলা লেবুর সাথে 'নলেন্' পাটালী দিল হাতে-হাতে তুলে।
উল্লাসের খুলে গেল দ্বার!
হাস্যরোলে হারাইল আর্ত্ত হাহাকার—
হাল্কা হ'ল ঝুড়ি;
'সের' হ'ল পোয়াটেক্ 'শত' হ'ল কুড়ি।
আপনার ছোট ঘরে 'ছোট দিন' হবে
রাজপথে বড়দিন স্মরণীয় র'বে।

বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসঙ্কট

এস্-বি

যুদ্ধের মধ্যে এদেশে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে। এই মুদ্রাস্ফীতির সুযোগে শাখাপ্রশাখাসহ বাঙ্গলায় অনেকগুলি ছোটবড় নূতন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ পুরাতন ও সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক নানা স্থানে নূতন নূতন শাখা খুলিয়াছে। যুদ্ধকালীন ফাঁপা বাজারের টাকা আমানত হিসাবে সংগ্রহ করা এইরূপ কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই কঠিন হয় নাই। তবে ইহারই মধ্যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক যে সন্দেহজনকভাবে পরিচালিত হইতেছিল, তাহা ব্যাঙ্কগুলির অন্যায় প্রতিযোগিতামূলক ভাবভঙ্গি, আমানতের জন্য অসম্ভব বেশী সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি এবং অনিশ্চিত শেয়ারাদিতে টাকা লগ্নী করার আগ্রহ হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে। এ ছাড়া কোন কোন ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ নিজেদের পকেট ভর্ত্তির লোভে ব্যাঙ্কের টাকায় এখন এক বা একাধিক যৌথ কোম্পানী খুলিয়াছেন, সেগুলির আর্থিক নিরাপত্তা বা ভবিষ্যত নাই বলিলেই চলে। দেশের কিছু লোক এই ধরণের দায়িত্বহীন ব্যাঙ্কের লোভনীয় বিজ্ঞাপনের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও অনেকেই ইহাদের বিপজ্জনক ফাঁদে পা দেন নাই। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের সময় বাঙ্গলায় যতগুলি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাদের সবগুলির পরিচালকবর্গেরই যে ব্যাঙ্ক পরিচালনার অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা ছিল, একথা জোর করিয়া বলা যায় না। তাছাড়া আদায়ী মূলধনের দিক হইতেও সুদৃঢ় আর্থিক বনিয়াদের ইঙ্গিত সব ব্যাঙ্ক দিতে পারে নাই। যুদ্ধ শেষ হইবার আগে এই সব ব্যাঙ্কের আমানতকারীরা টাকা তুলিয়া লইবার জন্য কোনরূপ গা করেন নাই, বলিতে গেলে তাঁহাদের এই মনোভাবই কয়েকটি ব্যাঙ্কের এতদিন টিকিয়া থাকিবার কারণ। অবশ্য গত কয়েক বৎসর যাবৎ যুদ্ধের সম্মুখবর্ত্তী ভূভাগ বাঙ্গলা দেশের টাকার বাজারে যে প্রাচুর্য্য দেখা গিয়াছে, তাহাতে মোটামুটি সুপরিচালিত হইলে কোন ব্যাঙ্কেরই বিপন্ন হইবার কথা নয়, বরং যুদ্ধোত্তরকালে অভিজ্ঞতা, আর্থিক সংস্থান ও জনপ্রিয়তার দৌলতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া ইহারা দেশের শিল্প-বাণিজ্য তথা আর্থিক পুনর্গঠনের প্রভূত সহায়তা করিতে পারিত।

যাহা হউক, মোটের উপর যুদ্ধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গলার গুটিকয়েক ব্যাঙ্ক সুপরিচালিত হয় নাই। যুদ্ধ শেষ হইবার পর কয়েক মাস অতীত হইলে দেশে ফাঁপা টাকার বাজারে যখন ফাটল ধরিল, তখন স্বভাবতঃই এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের দায়িত্বহীন স্বরূপ ধীরে ধীরে ধরা পড়িতে লাগিল। যে ব্যাঙ্কগুলি অধিক লাভের আশায় বা স্বার্থগত খাতিরে পড়িয়া ডুবন্ত অথবা নিরাপত্তাহীন ব্যবসাদিতে আমানতের টাকা লগ্নী করিয়াছিল, যুদ্ধাবসানে অন্যান্য আয় সঙ্কুচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কের হিসাবের প্রতি আমানতকারীদের দৃষ্টি পড়ায় তাহাদের অবস্থা ক্রমেই কাহিল হইয়া পড়িতে লাগিল। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ধর্ম্মঘট ও ডাক ধর্ম্মঘটের জন্যও অনেক দেশী ব্যাঙ্ক প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৬ই আগষ্ট ও তৎপরবর্ত্তী দেশজোড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ব্যবসা বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ হয় এবং সেই সঙ্গে অনেক ব্যাঙ্কেরও অপরিমেয় ক্ষতি হয়। এইভাবে যুদ্ধ শেষ হইবার পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই বাঙ্গলার কয়েকটি ব্যাঙ্ক ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। বহুসংখ্যক শাখা খুলিবার জন্য হয় তো সাময়িকভাবে ইহাদের আমানতের পরিমাণ বাড়িয়াছে, কিন্তু এই অবিবেচনার ফলে পরিচালনার ব্যয়ভার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক নিরাপত্তা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এদিকে দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে টাকার বাজারের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কাজেই এইরূপ ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিতে অনিচ্ছুক হওয়া এখন জনসাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দেশে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি অল্পে অল্পে এইবার ফিরিয়া আসিবে। এই সময় ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনায় যথেষ্ট বিবেচনাবোধের প্রয়োজন। তবে এখনো বাঙ্গলার কোন বড় ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় নাই, যেগুলি বিপন্ন হইয়াছে তাহারা হয় লোন অফিস, আর না হয় ক্ষুদ্রাকার অ-তপশীলী বা নন-সিডিউলড ব্যাঙ্ক। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

আইন অনুসারে কেবলমাত্র সিডিউলড ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনা ব্যবস্থার প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লক্ষ্য রাখিয়া থাকে, নন্‌-সিডিউলড ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনা নীতি তত্ত্বাবধানের ভার জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রারের উপর ন্যস্ত। বলা বাহুল্য, এই বিধান সুষ্ঠু বা শোভন নয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যখন ৭৪টি বড় তপশীলী ব্যাঙ্ক ও তাহাদের ২৩২১টি শাখার তত্ত্বাবধান করিতে পারে, তখন ক্ষুদ্রায়তন ৬৩৫টি অ-তপশীলী ব্যাঙ্ক ও তাহাদের দুই হাজার আন্দাজ শাখার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে এমন কিছু কঠিন হইতে পারে না। এই সব অ-তপশীলী ব্যাঙ্কে দেশবাসীরই টাকা গচ্ছিত থাকে এবং ছোট ব্যাঙ্কই কালক্রমে বড় ব্যাঙ্কে পরিণত হয় বলিয়া এই নন-সিডিউলড ব্যাঙ্কগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখানো দেশের লোকের কর্ত্তব্য। মূলধন বা আমানতের দিক হইতে বড় না হইলেও এই সব প্রতিষ্ঠান মোটামুটি সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কারবার করিয়া থাকে। এই হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দিক হইতে উপযুক্ত পরিমাণ সক্রিয় সহানুভূতি লাভ করিলে এই অ-তপশীলী ব্যাঙ্কগুলি সহজেই বড় হইয়া উঠিতে পারে। বাঙ্গলার অ-তপশীলী কয়েকটি ব্যাঙ্ক আজ যে দুরবস্থায় পৌছাইয়াছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদের পরিচালনা নীতির তত্ত্বাবধান করিলে অবস্থা কখনোই এরূপ শোচনীয় হইতে পারিত না। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সম্মুখে রাখিয়া ঘটনাচক্রে দুর্নাম রটিলেও এই সব ব্যাঙ্ক অনায়াসেই সেই দুর্নাম কাটাইয়া উঠিতে পারিত।

কয়েকটি অ-তপশীলী ব্যাঙ্কের আর্থিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার সংবাদ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসাক্ষেত্রে বিপর্য্যয় সুরু হইয়া যায়। বাঙ্গলার উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক-ব্যবসা ধ্বংস করিতে অবাঙ্গালী ব্যাঙ্কব্যবসায়ীদের উৎসাহ যথেষ্ট, বাঙ্গালীদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষ্যাভাবের অভাব নাই। কয়েকটি ছোট ব্যাঙ্কের অবস্থা খারাপ হওয়ার সংবাদের সুযোগ লইয়া স্বার্থবাদীর দল বাঙ্গলার বহু সুপরিচালিত ব্যাঙ্কের নামে যা তা বদনাম রটাইতেছে। কয়েকটি ছোট ব্যাঙ্কের অবস্থা কাহিল হইয়া পড়ায় জনসাধারণ একেই বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির সম্বন্ধে কিছুটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে, ইহার উপর স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে নানা সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক সম্বন্ধেও নানা প্রকার গুজব শুনিয়া এবং চোখ কান বুঁজিয়া সেই গুজবে বিশ্বাস করিয়া জনসাধারণ সেই সব ব্যাঙ্কের দুয়ারে টাকা তুলিয়া লইবার জন্য ভিড় করিতেছে। ছোট ছোট ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস তো এমনিই কমিয়াছে, সুপ্রতিষ্ঠিত একাধিক তপশীলী ব্যাঙ্কও তাহাদের অকারণ আতঙ্কের ধাক্কায় বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বড় ব্যাঙ্কের কথা আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, অ-তপশীলী যে সব ছোট ব্যাঙ্কের নামে গুজব রটিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের সম্বন্ধেও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দিক হইতে কোনপ্রকার অভিযোগ শুনা যায় নাই। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ এম এস ভার্গব গত ২৫শে নভেম্বর তপশীলী ব্যাঙ্কগুলির সুপরিচালিত হইবার কথা ঘোষণা করিয়াছেন, জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রারের অনুমোদনক্রমে সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহারে সক্রিয় অ-তপশীলী ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক নিরাপত্তার কথাও ঘোষিত হইয়াছে। ব্যাঙ্কে যদি অকারণে রাণ হয়, সেই ব্যাঙ্ক যত সুপরিচালিত হউক, তাহার বিপন্ন হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। সকলেই জানেন, ব্যাঙ্কের টাকা ঘরে বসানো থাকে না। আমানত মূলধন প্রভৃতি মোট দায়ের একাংশ মাত্র নগদ টাকায় বা সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি প্রভৃতিতে আটকাইয়া রাখিয়া বাকী টাকা ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃপক্ষ লাভজনক উপায়ে খাটাইয়া থাকেন। এইভাবে দেশের বহু শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া কাজ কারবার চালায়। গুজবে বিশ্বাস করিয়া আমানতকারীরা যদি আতঙ্কিত হইয়া হঠাৎ জমা টাকা তুলিয়া লইবার জন্য ব্যাঙ্কের দরজায় ভিড় করে, পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত নহে এমন কোন ব্যাঙ্কের পক্ষেই এ অবস্থায় তাহাদের দাবী মিটান সম্ভব নয়। বাঙ্গলার কয়েকটি ছোট বড় ব্যাঙ্ক সম্প্রতি এইরূপ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। ছোট ব্যাঙ্কের পক্ষে বড় তপশীলী ব্যাঙ্কের সাহায্য এবং বিপন্ন তপশীলী ব্যাঙ্কের পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য এরূপ ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য। বিশেষ ক্ষেত্রে অ-তপশীলী ব্যাঙ্কগুলির বেলাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তত্ত্বাবধান ও অর্থ সাহায্য একান্ত দরকার। অত্যন্ত দুঃখের কথা, সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ যেমন ব্যাঙ্কসংক্রান্ত মিথ্যা ব্ল্যাকলিষ্টের সৃষ্টিকারী দুর্ব্বৃত্তদের গ্রেপ্তারের বিশেষ চেষ্টা করে নাই, এ পর্য্যন্ত বিপন্ন ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও

বিশেষ কিছু করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মিঃ ভার্গব গত ২৯শে নভেম্বর ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতঃপর ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি বিপদ-কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাইবে। বলা বাহুল্য, মিঃ ভার্গবের এই আশ্বাসবাণী ব্যাঙ্ক পরিচালকবর্গ ও আমানতকারীদের মনে বিপুল আশার সঞ্চার করিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দিক হইতে এতদিন এইরূপ কোন সুস্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হয় নাই বলিয়াই সম্প্রতি বাঙ্গলার নিজস্ব একাধিক বড় তপশীলী ব্যাঙ্কে স্বার্থবাদীদের প্রচারিত বাজে গুজবের ফলে আমানতকারীরা টাকা তুলিয়া লইবার জন্য ভীষণ ভিড় করেন। বাহিরের সাহায্য সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া না গেলে এবং আর্থিক ভিত্তি খুব দৃঢ় না হইলে এইরূপ রানের অনিবার্য্য ফল ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়া যাওয়া বা এই ধরণের বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের কোন সমৃদ্ধ অবাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের সহিত একত্রীভূত হওয়া। একদল কর্ম্মীর সাধনায় এবং দেশবাসীর দীর্ঘকালীন অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও স্বার্থত্যাগে এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, আজ অকারণ আতঙ্কে এইরূপ ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব বিপন্ন করা তথা বাঙ্গালার শিল্প-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত করা বাঙ্গালীর পক্ষে একপ্রকার আত্মহত্যারই সামিল।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার যদিও আশ্বাস দিয়াছেন যে, বিপদের সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করিবে, তথাপি বর্ত্তমান দুঃসময়ে বাঙ্গলার ব্যাঙ্কসমূহের কর্ত্তৃপক্ষের উচিত, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করিবার একটি সুসমঞ্জস নীতি নির্দ্ধারণ করা। শুধু ভারতের নয়, আমেরিকার মত বিত্তশালী দেশেও বর্ত্তমানে যে ভাবে শেয়ার বাজারে স্তিমিত ভাবের সঞ্চার হইতেছে, তাহাতে যুদ্ধোত্তর ব্যাপক মন্দাবাজার সুরু হওয়ার আর বিলম্ব নাই বলিয়াই মনে হয়। বাঙ্গলার ব্যাঙ্কগুলির সর্ব্বনাশ করিয়া এই প্রদেশের অর্থনৈতিক বাজার গ্রাস করিবার জন্য অবাঙ্গালীদের আগ্রহ সুস্পষ্ট। এ সময় শুধু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনিশ্চিত সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া বাংলার ব্যাঙ্কসমূহের কর্ত্তৃপক্ষকে সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে আত্মরক্ষার উপায় স্থির করিতে হইবে। এইভাবে নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে বাঙ্গলার ব্যাঙ্কগুলির সুপরিচালিত হইবার যেমন সম্ভাবনা, তেমনি ইহাদের উপর জনসাধারণের নির্ভরশীলতাও অবশ্যই বাড়িয়া যাইবে। সম্প্রতি বহুপ্রচারিত ব্ল্যাকলিষ্টে এমন কতকগুলি ব্যাঙ্কের নাম আছে, যেগুলি ১৯৪৪-৪৫ সালের আগেই সাধারণ ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজ কারবার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের নামে বদনামের কথা শুনিয়াই বাঙ্গালী আমানতকারীরা যে পাইকারী হারে বাঙ্গলার ব্যাঙ্কগুলির উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিল, তাহার কারণ তাহারা জানে যে একটি ব্যাঙ্কের বিপদে আর একটি প্রতিযোগী ব্যাঙ্ক নিজের তহবিল লইয়া আগাইয়া আসিবে না। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসার সম্মুখে আজ যে দুর্দ্দিন আসিয়াছে তাহাতে বিশেষ কোন একটি ব্যাঙ্কের বিপদ একান্তভাবে সেই ব্যাঙ্কেরই একার বিপদ নয়, পরিচালিত একটি বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক মার খাইবার পর আর একটি বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের উপর নিঃসন্দেহে একই রূপ আঘাত আসিয়া পড়িবে। সরকারী বিবৃতিসমূহ প্রকাশিত হইবার পর স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে বাঙ্গলার ব্যাঙ্কগুলিকে ধ্বংস করিতে স্বার্থবাদীরা একটি জটিল চক্রান্তজাল সৃষ্টি করিয়াছে। এই চক্রান্তের পরিচালক যাহারা তাহাদের অর্থস্বাচ্ছল্য ও শক্তি উপেক্ষার বস্তু নয়। কাজেই আজ বাঙ্গালী আমানতকারীদের সহানুভূতি ও বিবেচনাবোধের প্রয়োজন যতখানি, এই চক্রান্তজাল ছিন্ন করিতে বাঙ্গলার ব্যাঙ্কগুলির সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রয়োজন তদপেক্ষা এতটুকু কম নয়।

দলিত

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

মানুষ দলিয়া যায় দূর্ব্বা পদতলে,
মনেতে গরব তারি পিষিয়া দুর্ব্বলে ;
ভাবে মনে, কি নির্ব্বোধ হীন এই জাতি,
দলি পায়ে তবু হেরি শান্ত স্থির মতি !
মৃদু হেসে কহে দূর্ব্বা, নাহি কি গো মনে—
মাথে তব আশীষের ধারা ধান্ত সনে ?

মীরাট কংগ্রেস

গত ২৩শে নভেম্বর হইতে যুক্তপ্রদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সহর মীরাটে আচার্য্য কৃপালনীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসের পর দীর্ঘ সাড়ে ৬ বৎসর পরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসিয়াছিল। বিরাট মহাযুদ্ধ, আগষ্ট আন্দোলন ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনাসমূহ, ভীষণ দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির জন্য এই কয় বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন সম্ভব হয় নাই। এই মীরাট সহরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম সিপাই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। সেই মীরাটেই নেতারা নূতন বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে সমবেত হইয়াছিলেন।

২১শে নভেম্বর বেলা ৩টার সময় মীরাটে কংগ্রেসের বিষয় নির্ব্বাচনী সমিতির অধিবেশনের মধ্য দিয়া কংগ্রেসের কার্য্যারম্ভ হয়। সেই দিন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু আচার্য্য কৃপালনীকে রাষ্ট্রপতির কার্য্যভার বুঝাইয়া

কংগ্রেস-নগরে নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক জাতীয় পতাকা অভিবাদন

দেন। সেই দিনই সকালে আচার্য্য কৃপালনী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দিল্লী হইতে মীরাটে যাইয়া উপস্থিত হন। বেলা ১টার সময় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। মাত্র ২ ঘণ্টাকাল ওয়ার্কিং কমিটির সভা হইয়াছিল।

১৯শে নভেম্বর ও ২০শে নভেম্বর দিল্লীতে মিঃ আসফ আলির বাড়ীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভা হইয়াছিল। মীরাটে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেগুলি প্রথমে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীতে আলোচিত হইয়াছিল।

২৩শে নভেম্বর সকালে রাষ্ট্রপতি কৃপালনী মীরাটস্থ কংগ্রেস নগরের মধ্যস্থলে পতাকা অভিবাদন উৎসব সম্পাদন করেন। ঐ নূতন নগরের নাম 'প্যারীলাল নগর' রাখা হইয়াছিল। সন্ধ্যায় কংগ্রেস আরম্ভ হয়। প্রতিনিধি ও দর্শকসমেত মোট ১০ হাজার লোক সভামণ্ডপে উপবেশন করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য মীরাট জেলা চঞ্চল, সে কারণে সকল অনুষ্ঠানিক ব্যাপার বন্ধ করা হইয়াছিল।

এবারে যিনি নূতন রাষ্ট্রপতি হইলেন, তাঁহার জীবনী নানা কারণে আলোচনার যোগ্য—আমরা নিম্নে তাহা প্রদান করিলাম।

কংগ্রেস নেতাদের সভামণ্ডপে গমন

রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পরে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীজীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনী সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদের এক মধ্যবিত্ত আমিল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কাকা ভগবানদাস একজন গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার সাতপুত্র ও এককন্যা। শ্রীজীবৎরাম তাঁহার ষষ্ঠ সন্তান। কাকা ভগবানদাসের দ্বিতীয় এবং পঞ্চম পুত্র ইস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সপ্তমপুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করেন, কাকা ভগবানদাসের সন্তানদের মধ্যে—বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি কৃপালনী ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী লীলাবেন মাত্র জীবিত আছেন।

জীবৎরাম বোম্বাইএ উইলসন কলেজ এবং ডি-জি-সিন্ধ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করিয়া পরবর্ত্তীকালে ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম-এ পাশ করেন।

এম-এ পাশ করিবার পর শ্রীজীবৎরাম সক্করে এক বিদ্যালয় স্থাপন

রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী

করিয়া শিক্ষকতা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে এই বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে তিনি মজঃফরপুরের সরকারী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা কার্য্য গ্রহণ করেন। এখানেই চম্পারণ সত্যাগ্রহের সময় তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন এবং চম্পারণ সত্যাগ্রহে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই আন্দোলনের পর তিনি পুনরায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং কিছুদিন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রাইভেট সেক্রেটারীরও কাজ করেন। তারপর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিয়া তিনি খাদি ও পল্লী-সংগঠন কাজের জন্য কাশীর শ্রীগান্ধী আশ্রমে যোগদান করেন। এই সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি কারাবরণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী সবরমতীতে গুজরাট বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিলে অধ্যাপক জীবৎরাম গান্ধীজীর আহ্বানে বিদ্যাপীঠের আচার্য্য নিযুক্ত হন। তখন হইতেই তিনি আচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। এখানে তিনি ১৯২২ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাজ করিয়া মীরাটে গিয়া

বিদায়ী সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল এবং নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি আচার্য্য কৃপালনীর পতাকা অভিবাদন

খাদি ও চরকা প্রচারের জন্য আশ্রম স্থাপন করেন। এই সময় পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন করিয়া কারাবরণ করিলে সরকার তাঁহার আশ্রমকে তছনছ করিয়া দেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে আচার্য্য কৃপালনী উক্ত পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাস পর্য্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পাদকের কার্য্য করেন। ১৯৪২এর আগষ্ট আন্দোলনে তিনি কারাবরণ করিয়া ১৯৪৫ খৃঃ মুক্তি লাভ করেন।

আচার্য্য কৃপালনী এইবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সরকারীভাবে সভাপতি বলিয়া ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি মুসলীমলীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে পূর্ব্ব-বাঙলায় যে অমানুষিক অত্যাচার চলে, তাহাতে বিচলিত হইয়া দুর্গতদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ান। তিনি বিধ্বস্ত অঞ্চল বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়া এই বর্ব্বরোচিত অত্যাচারের কাহিনী দৃঢ় ভাষায় জগতের সমক্ষে প্রকাশ করেন।

আচার্য্য কৃপালনী মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা আদর্শে দীক্ষিত এবং তাঁহার একজন প্রিয় শিষ্য। তিনি তাঁহার গুরুর আত্মনির্ভর নীতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া কাপড় কাচা হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সাংসারিক কার্য্যও নিজে করিয়া থাকেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির জন্য তিনি পরিচিত মহলে "দাদা" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; তিনি কাব্য ও সঙ্গীত ভালবাসেন। রসিকতা করিতেও তিনি বিশেষ পটু।

আচার্য্য কৃপালনী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীসুচেতা কৃপালনীকে ১৯৩৭ সালে বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রী শুধু তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গিনীই নহেন, তিনি তাঁহার কর্ম্ম-সঙ্গিনীও বটে। তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু।

কংগ্রেস নগরের প্রধান প্রবেশ দ্বারে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ

রাষ্ট্রপতি কৃপালনীর সহধর্ম্মিণী বাঙ্গালী মহিলা। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। শ্রীমতী সুচেতাও দীর্ঘকাল কংগ্রেসের তথা জাতির সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা নিম্নে কয়েকটি কথা প্রদান করিলাম।

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার পাঞ্জাব মেডিকেল সার্ভিসে পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সুচেতা দেবীর পিতামহ দীননাথ মজুমদার ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি নদীয়া ছাড়িয়া বিহার প্রদেশে যান। তদবধি তাঁহারা প্রবাসী।

সুচেতার অল্প বয়সেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সুচেতার পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা শ্রীযুক্তা প্রেমবালা মজুমদারের উপরে

কন্যাদের শিক্ষার ভার পড়ে। সুচেতা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই-এ, ও বি-এ এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইতিহাসে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পাশ করেন। এম-এ পাশ করিয়াই তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকার পদ গ্রহণ করেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য কৃপালনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। লাভ করিয়া নিখিল ভারত কস্তুরবা স্মৃতি-ভাণ্ডারের অর্গানাইজিং সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার সংগঠন শক্তি অসাধারণ এবং এই কার্য্যে তিনি যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেন। তিনি গণপরিষদের সদস্যা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্তা আছেন। নারী হইয়া নারীর দুঃখ তিনি

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী ফটো—তারক দাস

বিবাহের পরেও দুই বৎসর তিনি অধ্যাপনা করেন। তাহার পর ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার স্বামীর কর্ম্ম সঙ্গিনী হন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার নিকট হইতে কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কারাবরণ করেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনী শেষবার কারাবাস হইতে মুক্তি

গভীর ভাবেই অনুভব করেন। সম্প্রতি নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় নারীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলে তাহাতে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া ওঠে। তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনে যান। তাঁহার স্বামী অন্য কর্ম্মব্যপদেশে সেখান হইতে চলিয়া আসিলেও তিনি একা সেখানে থাকিয়া যান এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অবরুদ্ধ

নারীদের গুণ্ডাদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে থাকেন। তাঁহার অপূর্ব্ব কর্মশক্তি, সাহস ও গুণাবলীর জন্য তিনি আপামর সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। এই বাঙ্গালী কন্যা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এবারকার কংগ্রেস অধিবেশনে কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না। গত ১৫ই আগষ্টের পর হইতে দেশে যে ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে কোন ভারতবাসীর জীবনে কোনপ্রকার আনন্দ উৎসবের স্থান নাই। তাই যাঁহারা শুধু কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ও সেবক, তাঁহারাই জাতির এই মহাদুর্দ্দিনে মীরাটে সমবেত হইয়া দেশবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কংগ্রেসে বহু প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, আমরা তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র নিম্নে প্রদান করিলাম। কংগ্রেসের গত ৬০ বৎসরের সংগ্রামের ইতিহাস আজ আর কাহারও অবিদিত নহে। কাজেই

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী

পুনরুক্তি সম্ভাবনায় তাহার আলোচনায় আমরা বিরত থাকিলাম। কংগ্রেসের আজিকার আহ্বানে দেশের সকলকে সাড়া দিতে হইবে—নচেৎ আমরাই আমাদের দেশ ও জাতির ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া দিব।

প্রস্তাবসমূহ

অতীত পর্য্যালোচনা—যুদ্ধ, বিপ্লব ও ভীতির মধ্যে অতিবাহিত করিয়া সাড়ে ছয় বৎসর পর কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছে। যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জন্য স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে যাঁহারা দুঃখবরণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই কয় বৎসর সমস্ত প্রচণ্ডতার সহিত দুর্ব্বার গতিতে বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছিল; ভারতবর্ষে এক বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অস্ত্রবলে স্বাধীনতার মূলতত্ত্ব ও স্বাধীনতা অর্জনে ভারতবাসীদিগের ঐকান্তিক কামনাকে চূর্ণ করিতে চেষ্টা করে।

ভারতবাসী এই আক্রমণ প্রতিহত করে এবং দুর্দ্দশা ও যন্ত্রণা ভোগের মধ্য দিয়া দেখাইয়া দেয় যে, স্বাধীনতা অর্জনে তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প। একটি সেকেলে শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং লক্ষ লক্ষ লোক ইহার করাল গ্রাসে পতিত হইল।

বিশ্ব-যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে জগতের শান্তি আসে নাই এবং ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রস্বরূপ আণবিক বোমার আবির্ভাব হওয়ার পর এক চরম সঙ্কট দেখা দিয়াছে।

মানব সভ্যতা যদি সাম্রাজ্যবাদ ও পররাজ্য লোলুপতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা ও মানুষের মূল্য স্বীকৃতির উপর নিজের প্রতিষ্ঠা না করে তবে মানব সভ্যতার লোপ পাইবারই সম্ভাবনা।

যেমন অন্যত্র তেমনই ভারতবর্ষেও পুরাতন যুগ হইতে নূতন যুগে প্রবেশের পথ বিপদসঙ্কুল এবং সর্ব্বত্রই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি শান্তি ও স্বাধীনতার উৎস নূতন বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে বাধা দিতেছে।

লালকোর্ত্তা প্রতিনিধিগণ শোভাযাত্রা সহকারে কংগ্রেস-মণ্ডপে যাইতেছেন

এই কংগ্রেস সর্ব্বদাই জাতিসমূহের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা এবং জাতিতে জাতিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের দাবী করিয়া আসিতেছে। পরাধীন জাতিসমূহের সমস্যায় ভারতবর্ষের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়া আছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির উপর এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানের অগণিত লোকের মুক্তি নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের উপর পৃথিবীর শান্তি ও প্রগতি নির্ভর করে।

সুতরাং কংগ্রেস পুনরায় ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইবার দৃঢ়সঙ্কল্প ঘোষণা করিতেছে। যতদিন না ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিতেছে এবং সর্ব্বত্র শান্তি, স্বাধীনতা ও প্রগতি প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন জাতিরূপে সমান অধিকারের ভিত্তিতে অন্যান্য জাতির সহিত সহযোগিতা করিতে পারিতেছে ততদিন এই সংগ্রাম চলিতে থাকিবে। ভারতবর্ষের অতীত, বর্ত্তমান এবং তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিচার করিলে ভারতবর্ষ বিশ্বের জাতিপুঞ্জের মধ্যে কোন অপ্রধান স্থানে থাকিতে পারে না।

৬০ বৎসরের অধিককাল যাবৎ কংগ্রেস ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে এই আদর্শ পরিচালিত করিতেছে এবং সংগ্রাম ও গঠনমূলক

কার্যাবলীর ভিতর দিয়া ভারতীয়দিগকে শক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে। কংগ্রেস নিজেকে উচ্চ আদর্শের উপর স্থাপন করিয়াছে এবং যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও লোকের সম্মুখে উচ্চ নৈতিক-আদর্শ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। কারণ কংগ্রেস এই দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে, সে একমাত্র সম্মুখে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া এবং শ্রেষ্ঠ জাতির যোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ করা যায়।

বর্তমানের এই আত্মকলহ এবং আদর্শের অবনতির দিকে কংগ্রেস পুনরায় ভারতবর্ষের আত্মমর্যাদা ও আদর্শের প্রতি তাহার আস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। ভারতবর্ষের যাহা আদর্শ এবং কংগ্রেস যাহার উপর আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছে, তাহা ভারতীয়দিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। কোন দুর্বলতা, আত্মতুষ্টি বা স্বাধীনতার সরল পথ হইতে যদি বিচ্যুতি ঘটে, তবে ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করিতেছে এবং যাহা এখন তাহাদের হাতের ভিতর আসিয়াছে, সেই স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন ঘটিতে পারে।

অভ্যর্থনা সমিতির সহ-সভানেত্রী শ্রীযুক্তা কমলা দেবী কর্তৃক নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতিকে মাল্য-দান

সুতরাং কংগ্রেস জনসাধারণকে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব হইতে বিরত হইয়া অতীতে তাঁহারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্ত যে মনোবৃত্তি লইয়া সংগ্রাম করিয়াছেন, সেই মনোবৃত্তি লইয়া ঐক্যবদ্ধভাবে ভিতরের ও বাহিরের বিপদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্ত আহ্বান করিতেছে।

কংগ্রেসের লক্ষ্য—স্বরাজের মূল ভিত্তি সম্পর্কে কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে যে নীতি ও কর্মসূচী বর্ণিত হইয়াছে, কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিতেছেন। কংগ্রেসের অভিমত এই যে, যে পর্যন্ত না গণতান্ত্রিক নীতি রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়, যে পর্যন্ত না বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী জনসাধারণের অধিকাংশকে শোষন করিতে সমর্থ হয়, অথবা যে পর্যন্ত বর্তমানের মত গুরুতর, সামাজিক বৈষম্য বিদ্যমান না থাকিতে পারে এরূপ কোন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা না হয় সে পর্যন্ত জনসাধারণের পক্ষে স্বরাজ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না।

কংগ্রেস মণ্ডপের বহির্দেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণ শ্রবণরত বিশাল জনতা

এ জাতীয় সামাজিক সংস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সমান সুযোগ এবং প্রত্যেক নাগরিকের আত্মবিকাশের উপযোগী পরিপূর্ণ সুবিধা থাকিবে।

কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের সংশোধন—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বিপুল বিস্তার ঘটায় এবং নূতন অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় কংগ্রেসকে যথাসাধ্য ব্যাপকভাবে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক করিয়া তোলার এবং জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্ম উহাকে অধিকতর কার্যোপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে নিয়োক্ত নীতির ভিত্তিতে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের সংশোধন ও পর্যালোচনার জন্ম কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মিঃ ডাঃ রাষ্ট্রীর সমিতির

বিষয় নির্বাচনী সভায় বক্তৃতারত আচার্য্য কৃপালনী। মৌলানা আবুলকালাম আজাদ পার্শ্বে দণ্ডায়মান

উপর ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন। যথা :—(ক) চার আনার সদস্যপদ লোপ করিতে হইবে এবং উহার পরিবর্ত্তে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের অনুরূপ ভোটাধিকার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, (খ) প্রত্যেকটি সক্রিয় কংগ্রেস কমিটিতে গঠনমূলক, সংগঠনগত, আইন পরিষদ সম্পর্কিত ও অপরাপর জাতীয় কর্মতৎপরতায় নিযুক্ত কর্মীদিগকে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং (গ) প্রতি তিন বৎসর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা—কলিকাতা, পূর্ববঙ্গ ও বিহারে যে সকল শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে, কংগ্রেস তাহার জন্ম বিশেষ বেদনা, আতঙ্ক ও উদ্বেগ অনুভব করিতেছে। পুরুষ মহিলা ও শিশুদের প্রতি যে সমস্ত জঘন্য পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিই লজ্জা ও অপমান বোধ করিবেন। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক গোলযোগ যে নূতনরূপে দেখা দিয়াছে, তাহা পূর্বেকার সমস্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ছোরা দেখাইয়া ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। নারী অপহরণ, নারীর সতীত্ব নাশ করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে বলপূর্বক বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। স্পষ্টতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার নিরাপত্তার মনোভাবের সমাধি হইয়াছে। এই সকল কার্য্যাবলী ভারতের শান্তি নিরাপত্তা ও অগ্রগতির পরিপন্থী।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিদ্বেষ ও হিংসামূলক কার্য্যে উস্কানী দান এবং ধর্মের নাম ভাঙ্গানর ফলেই এইরূপ ব্যাপক নারকীয় কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে বলিয়া ভান করেন, কিন্তু সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্বেও সেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইয়াছেন এবং ঘটনাবলীকে সহ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যাইতে দিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল কার্যাবলীর জন্ম অবশ্যই দায়ী।

হিংসামূলক কার্য ও বিদ্বেষ প্রচারণার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সজাগ করিয়া দেওয়া কংগ্রেসের কর্ত্তব্য। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে ব্যবধান বিদ্যমান এই উপায়ে তাহার সমাধান হইবে না। কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়েই উহাদের সমাধান হইতে পারে। কংগ্রেস যত বারই সাম্প্রদায়িক সমস্যার শান্তিপূর্ণ ও যথার্থ সমাধানে উদ্যোগী হইয়াছে, ততবারই মুসলিম লীগ তাহা ব্যর্থ করিয়াছে। হিংসামূলক কার্যের সমর্থন ও হিংসামূলক কার্যের আশ্রয় গ্রহণের ফলে সমগ্র দেশের এবং সম্প্রদায়ের স্বার্থের হানি ঘটে। কংগ্রেস সকল সম্প্রদায়কেই প্রতিশোধ গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করিতেছে। এইভাবে প্রতিহিংসা গ্রহণ চলিতে থাকিলে, আমরা জাতির বাহিরের ও আভ্যন্তরিক শত্রুর হাতে ক্রীড়নক সাজিব। নিরাপত্তার মনোভাব ফিরাইয়া আনা এবং যে সকল গৃহ ও গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথায় পুনর্বসতি স্থাপন করাই প্রধান সমস্যা। যে সকল নারী অপহৃতা ও বলপূর্বক বিবাহিতা হইয়াছেন তাঁহাদের পুনরায় তাঁহাদেরই গৃহে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বলপূর্বক ব্যাপকভাবে যে সকল ধর্মান্তরিতকরণ হইয়াছে, তাহার কোন মূল্য নাই, কিংবা সিদ্ধও নহে এবং ইহার ফলে যাঁহারা নির্যাতিত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার ও স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ দিতে হইবে।

কংগ্রেস পুনরায় এই কথাই ঘোষণা করিতেছে যে, বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতালাভই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় এবং স্বাধীনতা লাভের এই শেষ ধাপে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যে মাতিয়া জাতীয় সংগ্রামকে ব্যর্থ না করিবার জন্ম কংগ্রেস দেশবাসীর নিকট আবেদন করিতেছে।

দেশীয় রাজ্য—কংগ্রেস সর্বদাই ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের সমস্যাগুলিকে সমাধানের পথে আনিয়াছে ও ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্তে এই সমস্যা নূতনভাবে গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে এবং এই স্বাধীনতা

লাভের পরিপ্রেক্ষিতেই ইহার সমাধান করিতে হইবে। কতিপয় ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্তা দেশের দ্রুত পরিবর্তন অনুধাবন করিতে পারিয়াছেন এবং নিজেরা এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেস দুঃখের সহিত জানাইতেছে যে, এখনও পর্য্যন্ত ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের বহু শাসনকর্তা ও তাঁহাদের মন্ত্রিগণ শুধু যে, তাহাদের স্ব স্ব রাজ্যের শাসন ব্যবস্থাকে প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান ও শাসন ব্যবস্থায় জনগণের নিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ততটুকু ব্যবস্থাই প্রবর্তন করেন নাই, পরন্তু প্রজা সাধারণের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এইরূপে দেশীয় রাজ্যের প্রজা-সাধারণ, তথা সমগ্র ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার যে আকুল আগ্রহ দেখা দিয়াছে তাহার সহিত তাঁহাদের সঙ্ঘর্ষ বাধিয়াছে। ভারতের কোন কোন বৃহত্তর দেশীয় রাজ্য, যাহাদের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়া উচিত ছিল, বিশেষভাবে তাহারাই এইসব প্রতিক্রিয়াশীল ও দমনমূলক কার্য্য-কলাপের জন্য দায়ী।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিদর্শনরত পণ্ডিত জহরলাল ও আচার্য কৃপালনী,

রাজনৈতিক বিভাগ এখনও সরাসরি রাজপ্রতিনিধির অধীন এবং ভারত সরকারের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাহিরে। এই বিভাগ দেশীয় রাজ্যসমূহের জন-সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য পরিচালনা করিতেছে। কংগ্রেস রাজনৈতিক বিভাগকে ভারত সরকারের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। ভারত সরকার এই বিভাগের সকল কার্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

সভার প্রারম্ভে জাতীয় সঙ্গীত—বন্দেমাতরম গীত হইতেছে

কংগ্রেস আশা করে যে, যত শীঘ্র সম্ভব এইরূপ অবস্থার অবসান হইবে।

ভারত সরকারকে বাদ দিয়া দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণ-মেণ্টের স্বার্থরক্ষার জন্য রাজপ্রতিনিধি হিসাবে বড়লাটের কার্যকলাপ কংগ্রেস আদৌ সমর্থন করিতে পারে না। সংশ্লিষ্ট প্রজাগণের সম্মতি ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহকে বৃহত্তর রাজ্যের সহিত জুড়িয়া দেওয়া বা যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা কংগ্রেস সমর্থন করে না। প্রজাদের অজ্ঞাতসারে রাজনৈতিক বিভাগ কর্তৃক প্রায়ই গোপনে এইসব কার্য করা হইয়া থাকে। ইহা ভারতীয় জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী। কংগ্রেসের দৃঢ় অভিমত এই যে, দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত এবং তাহাদের মতের বিরুদ্ধে যে সব সিদ্ধান্ত করা হইবে, তাহা বৈধ অথবা বাধ্যতামূলক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বিশেষ করিয়া দেশীয় রাজ্যের যে সব প্রতিনিধি গণপরিষদে যাইবেন, তাঁহারা রাজ্যের প্রজাগণ কর্তৃক নির্বাচিত হওয়া উচিত। দেশীয়

রাজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কটহেতু কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে, দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের বৃহত্তর সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য যে চেষ্টা করিতেছে তাহার সহিত কংগ্রেসের সহানুভূতি আছে।

কাশ্মীর সম্পর্কে প্রস্তাব—কাশ্মীর রাজ্যের কর্তৃপক্ষ গত কয়েক মাস প্রজাদের উপর অত্যাচার করায় এবং তাহাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা অস্বীকার করায় ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ব্বে তাঁহাদের কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই সব ব্যাপারের তদন্তের জন্য ওয়ার্কিং কমিটি কাশ্মীরে একটি প্রতিনিধিদল পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং এই কার্য্যে সহযোগিতা করার জন্য রাজ্যের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নাই এবং ভারতের বিভিন্ন অংশের পরিস্থিতির জন্য পূর্বের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হয়। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কাশ্মীর কর্তৃপক্ষ রাজ্যের পরিষদের অবাধ নির্বাচনে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন এবং কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের নির্বাচনী কমিটির সভাপতি ও সদস্যদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। জনসাধারণের মতামত অগ্রাহ্য করায় এবং আগামী নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হইতে পারে এইরূপ কর্মতৎপরতা অবলম্বন করায় কমিটি ইহা গুরুতর বলিয়া মনে করে। কমিটি তাঁহাদের প্রচেষ্টা শীঘ্রই কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করিবেন।
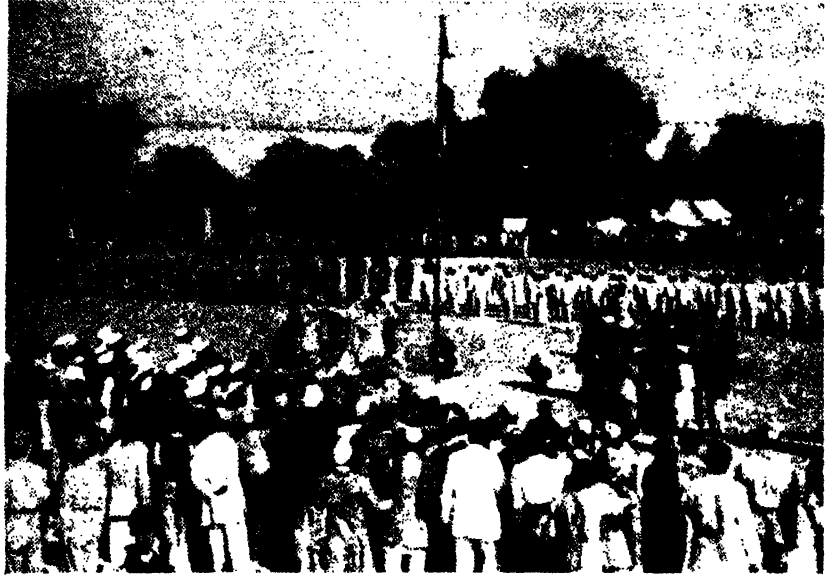
কংগ্রেস নগরের অভ্যন্তরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ

সভাপতির ভাষণ

রাষ্ট্রপতি কৃপালনী সভাপতি হিসাবে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকৃত কর্মীর মনোভাবের কথাই সকল দিক দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ কর্মনিষ্ঠা তাঁহাকে আজ জাতির সর্ব্বোচ্চ সম্মানিত আসনে আনিয়াছে। আমরা তাঁহার অভিভাষণে সেই কর্ম-প্রচেষ্টার বিবরণ, প্রকৃতি ও ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশের সন্ধান পাই। তিনি বলিয়াছেন—আজ কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বহনের জন্য ভারতের জনসাধারণকে সংগঠিত করিয়াছে। আমাদের দেশবাসীরা বহু বৎসর যাবৎ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রামে কংগ্রেস কর্তৃক সংগঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে। এরূপও হইতে পারে যে কংগ্রেস একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্ত্তে পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারে। * * * কংগ্রেস কেবল জাতির সেবার জন্য ভারতের জনগণকে সংঘবদ্ধ করিবার প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য ঐক্য ও শৃঙ্খলা অত্যাবশ্যক।

তাহার পর রাষ্ট্রপতি মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার আদর্শের কথা বিস্তৃতভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—হিংসা উহার চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। ইহা রোগের সহিত রোগীকে বিনাশ করিবার উপক্রম করিয়াছে। অপর কোন উপায় বাহির করিতে হইবে। ভারত ঐ উপায় খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং বহু শতাব্দীর পর একবার আবির্ভূত হন এরূপ এক নেতার নেতৃত্বে কয়েকটি উদ্দেশ্যে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

২৩শে নভেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হইলে রাষ্ট্রপতি কৃপালনী তাঁহার উপসংহার বক্তৃতায় বলেন—শোক প্রস্তাব তালিকায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম না থাকায় লোক সে সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি বলিব—সর্ব্বভারতীয় নেতাকে কেহ যেন কোন বিশেষ দলীয় নেতা বলিয়া দাবী না করেন। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ফরোয়ার্ড ব্লক, আজাদ-হিন্দ-ফৌজ বা অন্য কোন চরমপন্থী দল বিশেষের নেতা নহেন—তিনি সর্ব্বভারতের নেতা। ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনই তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং আমি আশা করি, এই ব্রত সাধনের নিমিত্ত তিনি এখনও বাঁচিয়া আছেন। আমি যদি অহিংস মতবাদী না হইতাম, তবে সুভাষবাবু যাহা করিয়াছেন, ঠিক তাহাই আমিও করিতাম। ইহাতে আমি লজ্জা বোধ করিতাম না, বরং গর্ব্বই বোধ করিতাম।

২৩শে নভেম্বর সকালে মীরাট মিউনিসিপাল বোর্ডের পক্ষ হইতে আচার্য্য কৃপালনী, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রভৃতিকে মানপত্র প্রদান করা হইয়াছিল।

যে পণ্ডিত প্যারীলাল শর্ম্মার নামে কংগ্রেস নগরের নাম প্যারীলাল নগর রাখা হইয়াছে, তিনি কংগ্রেসের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ধৃত হইয়া তিনি ৩ মাস পরে পরলোকগমন করেন।

মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালী পরিদর্শন

শ্রীগোরা

১৬ই আগষ্ট কবে কাটিয়া গেল, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্তও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জের মিটিল না। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই সংগ্রাম ছোট বড় আকারে এক প্রকার লাগিয়াই রহিল। গত ১০ই অক্টোবর হইতে সপ্তাহাধিক কাল ধরিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালার নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলায় এই সংগ্রাম যে ব্যাপকরূপ ধারণ করে, কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মারকীয় হত্যাকাণ্ডও ইহার নিকটে ম্লান হইয়া যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মান, প্রাণ, ধন, ধর্ম্ম যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের যাহারা দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে কোনরূপে রক্ষা পায়, তাহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শুধু প্রাণ লইয়া দেশ দেশান্তরে পলায়ন করে।

বাঙ্গালার এই মর্ম্মান্তিক সংবাদে ভারতের অবাঙ্গালী জাতীয় নেতারাও স্থির থাকিতে না পারিয়া নানা স্থান হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ মহাত্মা গান্ধীকে বিচলিত করিয়া তুলিল। নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড, বিশেষ ভাবে নারীদের উপর অত্যাচারে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনিও সদলবলে বাঙ্গালায় ছুটিয়া আসিলেন।

২৯শে অক্টোবর তিনি কলিকাতায় পৌঁছাইয়াই প্রথমে বাঙলার লাটের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের হাঙ্গামা সম্পর্কে আলোচনা করেন। সোদপুর আশ্রমে তিনি কয়েকদিন অবস্থান করিয়া বাঙ্গালার সরকারী ও বেসরকারী মহলের নেতৃবৃন্দের সহিত এ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত আলোচনা করেন। তারপর ৬ই নভেম্বর প্রাতে এক স্পেশাল ট্রেণ যোগে সদলবলে পূর্ব্ববঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি বলিয়া যান—উপদ্রুত অঞ্চলে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরিয়া আমি উপদ্রবের স্বরূপ উপলব্ধি করিব এবং দুর্গতদের চোখের জল নিজ হাতে মুছাইব।

সোদপুরে মহাত্মা গান্ধীর অবস্থানকালে, বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী কখন একা, কখনবা সদলে মহাত্মাজীর নিকটে গিয়া কয়েকদিন

গোয়ালন্দ ঘাটে ষ্টিমার হইতে গান্ধীজীর বক্তৃতা

ফটো—তারক দাস

নোয়াখালীর একটি বিধ্বস্ত কুটীর পরিদর্শনে মহাত্মা গান্ধী

ফটো—তারক দাস

ধর্ম্ম দেন এবং তাঁহার নিকট হইতে হাঙ্গামার গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়া মহাত্মার পূর্ব্ববঙ্গ সফরকালে তিনি বাঙ্গালার শ্রম ও বাণিজ্য সচিব মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ ও অপর কয়েকজনকে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্রেরণ করেন।

ঐদিন রাত্রি সাড়ে আটটায় গান্ধীজী চাঁদপুরে উপস্থিত হইয়া তথায় রাত্রে অবস্থান করেন। পরদিন সকাল ১০টায় স্পেশাল ট্রেণে করিয়া চাঁদপুর হইতে চৌমুহানী যাত্রা করেন এবং দ্বিপ্রহরে তথায় উপস্থিত হন। অপরাহ্নে চৌমুহানীর মদনমোহন স্কুলের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে হিন্দু মুসলমানের মিলিত এক বিরাট জন-সভায় মহাত্মা গান্ধী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—শুনিতেছি নোয়াখালীর কোন হিন্দুনারীই এখানে বাস করায় নিজেকে আর নিরাপদ মনে করিতেছেন না। এ ক্ষেত্রে এখানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়েরই বলা উচিৎ যে, হিন্দু নারীর নিজেকে বিপন্ন মনে

নোয়াখালীর গ্রামাপথে মহাত্মাজী ফটো—তারক দাস

করার কোন কারণ নাই। তাহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করা এবং দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়েরই কর্ত্তব্য। শান্তি স্থাপনের জন্য পুলিশ বা মিলিটারী ডাকিতে হইলে, ইহা হিন্দুদের বিশেষ করিয়া মুসলমানদেরই লজ্জার কথা। অবশেষে মহাত্মা গান্ধী হিন্দুদিগকেও নির্ভীক হইতে উপদেশ দেন।

৮ই নভেম্বর চৌমুহানীতে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় প্রায় ২৫ হাজার হিন্দু মুসলমানের সমাবেশ হয়। এই সভায় বাঙ্গালা সরকারের শ্রম ও বাণিজ্য সচিব মিঃ সামসুদ্দীন আমেদ বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমানে যে অরাজকতা ঘটিয়াছে, মোগল কিংবা পাঠান আমলেও সেরূপ ঘটে নাই, কোন গবর্ণমেণ্টই এরূপ অত্যাচার বরদাস্ত করিতে পারেন না। ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার মুসলমানদিগের নিকটে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের মান-সম্মান ও ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি আবেদন জানান।

৯ই তারিখে মহাত্মা গান্ধী রামগঞ্জ থানার গোপেরবাগ গ্রাম পরিদর্শন করেন। গুণ্ডারা ১০ই অক্টোবর তারিখে এই গ্রামের একটি বাড়ীতে ২২জন পুরুষের মধ্যে ১৯জনকে হত্যা করে। গোপেরবাগ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি দত্তপাড়া ও গোপালপাড়া গ্রামও পরিদর্শন করেন। গোপালপাড়ার এক বাড়ীতে ২০জন পুরুষকে হত্যা করিয়া বাড়ীর উঠানে পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল।

১০ই তারিখে মহাত্মা গান্ধী চৌমুহানী হইতে লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত দত্তপাড়ায় তাঁহার শিবির স্থানান্তরিত করেন। পরদিন রামগঞ্জ থানার এলাকাধীন নয়াখোলা, সোনাচাকা, ও খিলপাড়া এবং ১২ই নভেম্বর গোয়াতলী ও ১৩ই নন্দীগ্রাম পরিদর্শন করেন। এই ভাবে বহু গ্রাম ভ্রমণ করিয়া তিনি স্বচক্ষে ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করেন এবং উপদ্রুতদের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করেন। প্রায় একমাস পূর্ব্বে হত্যাকাণ্ড ঘটিলেও ভ্রমণকালে তিনি বহু স্থানেই মৃত ব্যক্তিদের অস্থি-পঞ্জর দেখিতে পান। মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বত্রই রক্তপিপাসু দুর্ব্বৃত্তদের নিকটে মানবতার আবেদন লইয়া উপস্থিত হন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠদের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেন।

১৪ই নভেম্বর তারিখে দত্তপাড়া হইতে ১২ মাইল দূরে রামগঞ্জের নিকটে কাজিরখিল গ্রামে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হেডকোয়ার্টার স্থানান্তরিত করিলেন। এখানে অবস্থান করিবার জন্য তিনি একটি পরিত্যক্ত গৃহ নির্ব্বাচন করেন। এই বাড়ীর গৃহস্বামী ও অপর দুইজনকে হত্যা করা হইয়াছিল। এখানে আসিয়া তিনি পরদিন নন্দনপুর, ১৬ই তারিখে করপাড়া, ১৭ই চণ্ডীপুর ও দাসপাড়া পরিদর্শন করেন।

অবশেষে মহাত্মা গান্ধী অহিংসার কর্ম্মপদ্ধতি পরীক্ষা করিবার জন্য ২০ নভেম্বর বেলা ১১টায় সময় তাঁহার সঙ্গীদের কাজিরখিলে রাখিয়া সেখান হইতে চার মাইল পশ্চিমে শ্রীরামপুর নামক একটি গ্রামে অবস্থান করিবার জন্য একা রওনা হইলেন। শুধুমাত্র সঙ্গে রহিল তাঁহার ষ্টেনোগ্রাফার পরশুরাম ও দোভাষী অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু। ৭৮ বৎসর বয়সে পরিণত বার্দ্ধক্যে একা চলিয়াছেন কঠোর সাধনায়। দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য এই যে তাঁহার সাধনা,

ইহাতে হয় তিনি কৃতকার্য্য হইবেন, নতুবা মৃত্যুবরণ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প। এই সময়ে প্রায় ২০ দিন ধরিয়া তিনি পাকাশয়ের গোলযোগের জন্য অর্দ্ধাহার গ্রহণ করিতে ছিলেন। শরীরের ওজন তাঁহার অনেক কমিয়া গিয়াছিল। দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঠাণ্ডায় কাশি দেখা দিয়াছে। গায়ে ছোট ছোট গুটিকা হইয়াছে, তবুও তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি মৃত্যুপণ করিয়া কর্ত্তব্য সাধনে একা রওনা হইলেন। আশ্রমবাসীদের নিকট হইতে তাঁহার এই বিদায় গ্রহণ এক মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য। বিদায়কালে একমাত্র মহাত্মা ব্যতীত অপর সকলেরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীর নৌকাখানি যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল, আশ্রমবাসীরা তীর হইতে বাষ্পাকুল নেত্রে শুধু সেইদিকেই চাহিয়া ছিলেন। পরে মহাত্মাজীরই নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহারাও একজন দুইজন করিয়া এক এক গ্রামে ছড়াইয়া পড়েন।

মহাত্মা গান্ধীর এই শ্রীরামপুর অভিযানকে জনৈক সাংবাদিক বার্দ্ধক্যে টলষ্টয়ের শেষ যাত্রার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এক ভয়ঙ্কর ঝড়ের মধ্যে মহামতি টলষ্টয় যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আর ফেরেন নাই, মহাত্মা গান্ধীও তেমনি এক মহা রাজনৈতিক দুর্য্যোগের মধ্যে বাহির হইলেন, কিন্তু এই খানেই তাঁহার তুলনার পরিসমাপ্তি। প্রসিদ্ধ ডাণ্ডি অভিযান কালে তিনি যেমন একগাছি বাঁশের লাঠি লইয়াছিলেন, এবারেও সঙ্গীহীন অবস্থায় গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণের সময় ভরদিয়া হাঁটিবার জন্য একটি বাঁশের লাঠিমাত্র সঙ্গে লইলেন।

শ্রীরামপুরে আসিয়া মহাত্মা গান্ধী চারিদিকে ধানক্ষেতের মধ্যে অবস্থিত একটি ছোট টিনের ঘরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বাজার-পোষ্ট অফিস প্রভৃতি সেখান হইতে বহুদূরে অবস্থিত। মহাত্মা গান্ধী পুত্রকন্যার ন্যায় প্রিয় আশ্রমবাসীদের ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে প্রথম দিন বড় অসুবিধা বোধ করেন। তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তিনি যথা সময়ে পাইতেছিলেন না। এখানে আসিয়া রান্না, বিছানা প্রস্তুত প্রভৃতি সকল কাজই প্রায় তাঁহাকে নিজেকেই করিয়া লইতে হয়। যদিও শ্রীযুত নির্ম্মল বসু ও পরশুরাম তাঁহার সঙ্গে থাকেন তাহা হইলেও মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের উপর অল্প কাজের ভার দেন।

শ্রীরামপুর গ্রামে ১৩ শত মুসলমানের বাস। হিন্দু যাহারা এখানে বাস করিত তাহারা সংখ্যায় ইহাদের নিকটে অতি নগণ্য। মহাত্মা গান্ধী এখানে উপস্থিত হইয়াই স্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি মুসলমানদের বাড়ীতে বাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা ও সহনশীলতার বাণী প্রচার করিতে থাকিলেন। এইভাবে মানবতার আবেদন লইয়া তিনি বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্থানীয় মুসলমানরা অনেকেই মহাত্মাকে নিজেদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে এবং তাঁহার নিকটে নিজেদের দুঃখ কষ্টের কাহিনী বর্ণনা করে। মহাত্মাজী শান্তির বাণী প্রচার করিতে থাকিলেও সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতিরও চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি রুগ্ন ও দুর্গত মুসলমানদের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শিষ্যা ডাঃ সুশীলা নায়ার শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির রোগীদের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করেন। মহাত্মার উপদেশে গ্রামবাসীরা পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে নলকূপ খননের ও আয়োজন করিতে থাকে।

গ্রামের পথ সাধারণতঃ কোথাও সুগম নহে। মহাত্মাজী সেই দুর্গম পথ সমূহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুসলমানদের বাড়ীতে বাড়ীতে যাইতে লাগিলেন। একদিন এক মুসলমানের বাড়ী হইতে ফিরিবার কালে বৃষ্টি হওয়ায় পথ পিচ্ছিল হইয়া যায়। আধমাইলেরও বেশী সেই পিচ্ছিল পথ তিনি লাঠিতে ভর দিয়া হাঁটিয়া কুটীরে ফিরিলেন। গ্রামে নদী নালা থাকায় বহুস্থানেই সামান্য বাঁশ বাঁধিয়া পুল করা হইয়া থাকে। এই সকল পুল পার হওয়া যেমনি কষ্টকর তেমনি বিপজ্জনক। একটু অসাবধান হইলেই জলে পড়িয়া যাইবার বেশী রকম সম্ভাবনা। এই পুলও মহাত্মাজীকে ভ্রমণকালে অতিক্রম করিতে হয়।

নোয়াখালীর শান্তি সংঘের এক সভায় গান্ধীজী, পার্শ্বে বঙ্গ্‌ভারত ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডায়মান ফটো—তারক দাস

২২শে নভেম্বর রামগঞ্জ ডাক বাংলোয় মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের লইয়া এক সভা হয়। সভায় দুই সম্প্রদায়ের সমান সংখ্যক ব্যক্তি লইয়া প্রতি ইউনিয়নে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা এবং যে সকল হিন্দু গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনাই হইল এই সকল শান্তি কমিটির প্রধান কর্ত্তব্য।

রামগঞ্জ হইতে দুই মাইল নৌকা যোগে যাইয়া মহাত্মা গান্ধী চণ্ডীপুরে তাঁহার প্রার্থনা সভায় আশ্রয় প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, শান্তি কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, আশ্রয়প্রার্থীদের এবার গ্রামে ফিরিয়া যাওয়া উচিত এবং কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে উক্ত কমিটিতে জানান আবশ্যক। নৌকাযোগে চণ্ডীপুর যাইবার পথে মহাত্মাজীর কয়েকবার ভেদ বমি হয়, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই কর্ত্তব্য বোধে চণ্ডীপুর গমন করেন এবং এই শীতের রাত্রে বিপ্রহরের সময় তিনি সেখান হইতে শ্রীরামপুরের কুটীরে ফিরিয়া আসেন।

২৪শে নভেম্বর তারিখে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধীর কুটীরে গিয়া সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন—বাঙ্গালাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাকে যদি একাই সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হয় তথাপি আমি চালাইয়া যাইব। আবশ্যক হইলে পূর্ব্ববঙ্গেই আমি আমার দেহরক্ষা করিব।

নোয়াখালী জেলায় বহুদিন মহাত্মাজীর অবস্থান এবং তাঁহার হিন্দু-মুসলীম মৈত্রী-সাধনে ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশঃ বিশ্বাস ফিরিয়া আসে। শরণাগত শিবির হইতে আশ্রয়প্রার্থীরা ক্রমশঃ স্ব স্ব গ্রামে ফিরিতে থাকে। একদিন সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী যখন ধানক্ষেতের মধ্যদিয়া তাঁহার কুটীরে ফিরিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি হিন্দুদের মন্দির হইতে শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি শুনিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হন। দুই মাস পরে গ্রামের মন্দিরগুলিতে এই প্রথম পূজারত ও শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি হয়। এই সকল মন্দিরের পূজা এতদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মহাত্মার আগমনে হিন্দুরা অনেকেই সাহসে ভর করিয়া গ্রামে ফিরিয়া আসে।

যে সকল হিন্দু তাহাদের গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, সেই সব গৃহে কিছুদিন পূর্ব্বে যে নির্ম্মম অনাচার ও নিষ্ঠুর অত্যাচার ঘটিয়াছিল তাহার স্মৃতি হয়ত তাহাদিগকে পাগল করিয়া তুলিবে। তাহাদের পূর্ব্বের সে মনোবল আজ আর নাই। সাংসারিক জীবনের ভিত্তিও আজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তবুও একথা বলিতে পারা যায় যে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র স্পর্শে আসিয়া এই সকল দুর্গত তাহাদের মনের বল ফিরিয়া পাইতে অনেকটা সক্ষম হইবে এবং মহাত্মার পুণ্য সংস্পর্শে আসিয়া তাহারা নবজীবন লাভ করিবে।

৩০।১১।৪৬

বিস্মরণ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আমারে ভুলিয়া,—যদি একা পথ পানে
চাও তবু মনে মোর স্মৃতি নাহি হানে
বেদনার কাঁটা, উৎসবের নিশি ভোরে
যদি বা জাগিয়া হের বিচ্ছেদের ঘোরে
শুধু জ্বলে ম্লানালোক প্রদীপে স্মৃতির।

কি হবে রাখিয়া মনে পরাণে প্রীতির
উৎস যদি যায় শুকাইয়া? কত বার
কত জনে দিবে কত হৃদয় সম্ভার,
ফেলিবে আপন ছায়া তোমার মুকুরে
তার মাঝে ক্ষীণকোণে সুপ্তপ্রায় দূরে
পারিব না রহিতে মলিন। রাজরাজ রূপে
না যদি হেরিতে পাও, উপচারে ধূপে
না যদি দেউল সাজে,—মম চিরপ্রিয়,
মিছে রাখিয়ো না মনে, আমারে ভুলিয়ো।

নাবিক

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

স্তব্ধ কর কণ্ঠভার, ব্যর্থ তিরস্কারে
রূঢ় ভাষী কোলাহলে মিছা হাহাকারে
নাহি প্রয়োজন। হয়ত কাহারো দোষে
তরণী হয়েছে ফুটা, কিংবা বিধি রোষে!

নাহি তার প্রতিকার; ভাগ্যের বিধান
মেনে লও হোক তিক্ত; যায় যাক প্রাণ
নিষ্ঠুর সাগর জলে। ধীর চিত্তে আজ
মরণের মুখোমুখি হ'য়ে কর কাজ।

আর্ত্ত শিশু দুর্ব্বলেরে দাও বাঁচিবারে;
কঠোর নির্ম্মম চিত্তে রাখো আপনারে
শৃঙ্খলা বন্ধনে বাঁধি। তিল তিল করি
মৃত্যুরে পাইয়া কাছে উঠো না শিহরি।
বীরপনা নাহি হয় মিথ্যা আস্ফালনে
অপরের নিন্দা বাদে বিপদের ক্ষণে।
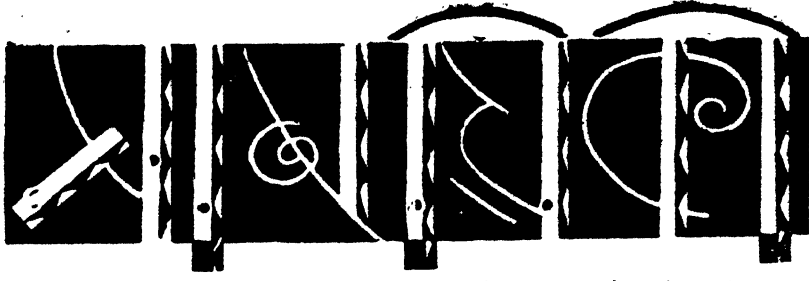
গণ পরিষদের অধিবেশন—

গত ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীতে ভারতীয় গণ পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে ডাক্তার সচ্চিদানন্দ সিংহ অস্থায়ী সভাপতি মনোনীত হন। তাহার পর ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই অধিবেশনে মুসলেম লীগ যোগদান করেন নাই। শুধু কংগ্রেস দলের ২০৫ জন সদস্য যোগদান করেন; তন্মধ্যে ৯ জন ছিলেন মহিলা।

১৯৩৪ সাল হইতে কংগ্রেস গণ পরিষদ গঠনের দাবী জানাইয়াছিল। বর্ত্তমানে যে গণ পরিষদ গঠিত হইয়াছে, তাহা কংগ্রেস পরিকল্পিত পরিষদের তুলনায় অনেক খর্ব। তথাপি কংগ্রেস ইহা মানিয়া লইয়া ইহার মধ্য দিয়াই নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিতে বদ্ধপরিকর।

ফ্রান্সের এক রাজা একবার নিজের অভিরুচি মত এক গণ-পরিষদ আহ্বান করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের জনসাধারণের প্রতিনিধিরা রাজার অভিরুচিমত কাজ না করিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিয়া ফ্রান্সের জন্য একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা রচনা করেন। শেষ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের উক্ত রাজাকে হত্যা করা হয়। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর এক সভায় এই উদাহরণটির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, গণ-পরিষদের পিছনে যে দৃঢ় জনমত আছে, তাহাই দেশ হইতে স্বেচ্ছাতন্ত্র দূর করিবার শক্তি জোগাইবে।

বিলাতে গোল টেবিল বৈঠক—

মুসলেম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিয়াও গণপরিষদে যোগদান করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় বড়লাট লর্ড ওয়াভেল নিজে সমস্যা সমাধানে অসমর্থ হইয়া কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শিখ নেতা সর্দার বলদেব সিং এবং লীগ নেতা মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁকে সঙ্গে লইয়া বিলাত যাইয়া বৃটীশ মন্ত্রিসভার সহিত পরামর্শের ব্যবস্থা করেন। কংগ্রেস প্রথমে বড়লাটের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই—পরে বৃটীশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর বিশেষ অনুরোধে পণ্ডিতজী ও সর্দারজী বিলাত গমন করিয়াছিলেন। তথায় কয়দিন আলোচনার পর ৬ই ডিসেম্বর এক গোল-টেবিল বৈঠকে ভারতীয় সমস্যার আলোচনা শেষ হয়। ৭ই পণ্ডিতজী ও সর্দারজী বিলাত ত্যাগ করিয়া ৮ই ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গণপরিষদে যোগদানের জন্য তাঁহারা বিলাতে অধিক সময় থাকিতে পারেন নাই। ৬ই গোল-টেবিল বৈঠক সম্বন্ধে বিলাতের মন্ত্রিসভা যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ—মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মে তারিখের বিবৃতির ১৯ অনুচ্ছেদের ৫নং ও ৮নং উপধারার ব্যাখ্যা লইয়া মুসলেম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছিল। বৃটীশ মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে মুসলীম লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসের অভিমত অন্যরূপ। কাজেই এখন ভারতীয় ফেডারেল আদালতে বিষয়টি বিবেচিত ও স্থিরীকৃত হইবে। বৃটীশ মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানাইবার জন্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে বিলাতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অযথা হায়রাণ করার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা সাধারণ-বুদ্ধির অগম্য।

জাতিসংঘে ভারতের জয়লাভ—

গত ৩০শে নভেম্বর নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতি সংঘের বৈঠকে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত-বাসীদের প্রতি অবিচারের জন্য সেখানকার গভর্ণমেণ্টের নিন্দাসূচক যে প্রস্তাব আনা হইয়াছিল, তাহা বৃটেন ও তাহার সহযোগীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে—দক্ষিণ আফ্রিকা যে পাণ্টা প্রস্তাব আনিয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই জয়লাভ সমস্ত জগতের মুক্তিকামী জনসাধারণের বিজয়।

ইহার ফলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বর্ণবিদ্বেষের দোহাই দেওয়া দূরীভূত হইতে পারে।

ধানবাদের সন্নিকটে ডিগওয়াদির ফিউএল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের শ্রম ও খনি-সচিব মিঃ সি-এইচ্ ভাবা

নোয়াখালি ও শ্রীযুক্ত ঠক্কর—

দিল্লীর হরিজন সেবক সংঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত এ-ভি-ঠক্কর নোয়াখালি সম্বন্ধে গত ১লা ডিসেম্বর এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি গত ৭ই নভেম্বর মহাত্মা গান্ধীর সহিত নোয়াখালি গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—গান্ধীজি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য তাঁহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে নানা কারণে বাধার সৃষ্টি হইতেছে—(ক) এখনও অরাজকতা চলিতে থাকায় স্বীয় নিরাপত্তার জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সভ্য ব্যক্তিরা দুর্বৃত্তের নাম প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। (খ) হিন্দু নেতৃবৃন্দ এখনও শাসকবর্গের আন্তরিকতার উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া শান্তি কমিটীতে যোগদান করিতেছেন না। (গ) সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অভিযোগ আনিতেছে। (ঘ) সশস্ত্র বাহিনী অপসারণের জন্য মন্ত্রীদের নিকট মুসলমান নারীদের উপর অত্যাচার হইতেছে বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে। (ঙ) গান্ধীজি ও মন্ত্রীসভা উভয়ই বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পুলিস ও সৈন্য বাহিনী অপসারণের জন্য উৎসুক—কিন্তু উভয়েরই দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্নরূপ। সৈন্যদল এখনও থাকা আবশ্যক—কারণ তাহারা যদি বিভিন্ন দলে উপদ্রুত অঞ্চলে ছড়াইয়া না থাকিত, তবে এই আংশিক স্বাভাবিকতাও ফিরিয়া আসিত না। এখনও চারিদিকে হত্যাকাণ্ড চলিতেছে এবং গুণ্ডাদল প্রকাশ্যে বলিতেছে যে, সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ চলিয়া গেলে যাহারা নালিশ করিয়াছে, তাহাদের উপর প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

নোয়াখালির সমস্যা ভারতের সমস্যা—

গত ২২শে নভেম্বর মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালির শ্রীরামপুরে এক কর্ম্মী-সম্মিলনে নিম্নলিখিতরূপ কথা বলিয়াছেন—লোক বিনিময় প্রসঙ্গ একটি অবান্তর যুক্তি। আজ নোয়াখালিতে ইহা সুরু হইলে অন্যান্য জেলা ও প্রদেশে ইহা সংক্রামিত হইবে। ইহা সমগ্র দেশের পক্ষে আত্মঘাতী নীতি। সভ্যতা, শৌর্য্য, বীর্য্য ও ত্যাগে বাঙ্গালীই অগ্রদূত—আজ তাহারা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া যাইবে, ইহা ভাবিতেও দুঃখ বোধ হয়। উপরন্তু বর্ত্তমান সমস্যা কেবল নোয়াখালির সমস্যা নহে, ইহা সমগ্র বাংলা তথা ভারতের সমস্যা। কাজেই আমি এরূপ প্রস্তাবে কোন মতেই সম্মতি দিতে পারি না।

চাঁদপুর রিলিফ সেণ্টারে ভারত-সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মীবৃন্দ কর্ত্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত মহিলা ও পুরুষগণ

অত্যাচারিতা মহিলাদের দুরবস্থা—

গণপরিষদের সদস্য ও খ্যাতনামা দেশকর্ম্মী শ্রীমতী লীলা রায় নভেম্বর মাসে কয়েকদিন নোয়াখালিতে ছিলেন তিনি প্রত্যহ ১৫ মাইল পদব্রজে যাইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের অবস্থা দেখিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু মহিলা ও শিশুকে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে এখনও বহু স্বেচ্ছাসেবক প্রেরণ করা প্রয়োজন। লোকে

দুর্দ্দশার সীমা নাই। তিনি কলিকাতাবাসীদিগকে ঐ অঞ্চলের জন্ত চিড়া, গুড়, বিস্কুট প্রভৃতি খাদ্য, তাঁবু, ত্রিপল প্রভৃতি গৃহ-নির্ম্মাণ দ্রব্য, বস্ত্র, গরম জামা প্রভৃতি প্রেরণ করিতে আবেদন জানাইয়াছেন।

বাঙ্গালায় সংবাদপত্রের বিপদ—

সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের অভিযোগে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার বহু দৈনিক সংবাদপত্রের নিকট জামানত তলব করিয়াছেন। কয়েকখানি সংবাদপত্রের জামানত বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় এখন এক সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত সচিবসংঘ কাজ করিতেছে। কাজেই অপর সম্প্রদায়ের সংবাদপত্রগুলি যে অধিক বিপন্ন হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? বিশাল-ভারত নামক হিন্দী মাসিক পত্রের নিকটও ৪ হাজার টাকা জামানত তলব করা হইয়াছে। পরাধীন দেশে সংবাদপত্রের এইরূপ বিপদ স্বাভাবিক।

কর্পোরেশনের নূতন কর্ত্তা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুত শৈলপতি চট্টোপাধ্যায়ের

মেজর জেনারাল এ সি চ্যাটার্জী

কার্য্যকাল বর্ত্তমান ডিসেম্বরের ২৪শে শেষ হইবে। তাঁহার স্থানে মেজর জেনারেল শ্রীযুত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫ বৎসরের জন্ত মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। অনিলচন্দ্র বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন—পরে আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অর্থসচিব হইয়াছিলেন। তিনি সারা ভারতে সর্ব্বজনপরিচিত।

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্কল্প—

গত ৩০শে নভেম্বর নোয়াখালি শ্রীরামপুরে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করিয়াছেন যে—উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি পূর্ব্ববঙ্গে থাকিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে তিনি সারা জীবন পূর্ব্ববঙ্গে থাকিবেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পূর্ব্বের মত ঐক্য স্থাপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। মানুষ কেবল চেষ্টাই করিতে পারে, ফলাফল ঈশ্বরের হাতে।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

ফটো—ইউনাইটেড আর্টিষ্ট—বালিগঞ্জ

শ্রীসচ্চিদানন্দ সিংহ—

বিহারের খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও দেশসেবক ডক্টর শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ সিংহ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন। তিনি একাধারে প্রবীণতম সাংবাদিক,

শিক্ষাব্রতী, আইনজ্ঞ, শাসনতত্ত্বাভিজ্ঞ ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্। তিনি সারাজীবন বহু কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার মনোনয়নে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

সেনাবাহিনীতে যোগদানের আবেদন

ভারতের সশস্ত্র বাহিনীকে জাতীয় বাহিনীতে রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে দেশের সর্ব্বদল ও সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ তরুণদিগকে কমিশনের জন্য আবেদন করিতে উৎসাহ দানের অনুরোধ জানাইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সহকারী সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও দেশরক্ষাসচিব সর্দ্দার বলদেব সিং এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—"যাহাতে সশস্ত্র বাহিনী ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদান লইয়া গঠিত হইতে পারে এবং স্বাধীন ভারতের প্রকৃত সেনাবাহিনীরূপে কার্য্য করিতে পারে সে জন্য এই জাতীয় ব্রতে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।"

মদনমোহন মালব্যের শোভাযাত্রা

ফটো—জলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

সীমান্তে বড়লাট সম্বর্দ্ধনার রহস্য—

গত ১৯শে নভেম্বর দিল্লীর পথে লাহোরে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে সীমান্ত-নেতা খান আবদুল গফুর খাঁ জানাইয়াছেন—উপজাতীয় অঞ্চলে পণ্ডিত নেহরুর ভাগ্যে প্রস্তর জুটিয়াছে—আর লর্ড ওয়াভেলের ভাগ্যে জুটিয়াছে ফুলের মালা। কারণ পণ্ডিত নেহরু গিয়াছিলেন, স্বাধীনতা, শান্তি ও ভালবাসার বাণী লইয়া, আর লর্ড ওয়াভেল গিয়াছিলেন, দাসত্বের শৃঙ্খল লইয়া। ইহাকেই অদৃষ্টের পরিহাস বলে এবং ইহাতেই বুঝা যায় যে, যে সকল মালিক ওয়াভেল-সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রকৃত রূপ কি? এই সব ঘটনা দিবালোকের মত স্পষ্ট—সমস্তই সাজান, সমস্তই পলিটিকাল এজেন্টদের কারসাজি।

বাঙ্গালায় নূতন মন্ত্রী নিয়োগ—

বাঙ্গালায় মিঃ সুরাবর্দ্দী চালিত মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা এতদিন ছিল ৭ জন। গত ২১শে নভেম্বর নিম্নলিখিত নূতন ৪ জন মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে—(১) শ্রীতারকনাথ মুখোপাধ্যায় (২) শ্রীনগেন্দ্র নারায়ণ রায় (৩) শ্রীদ্বারকানাথ বারোরী ও (৪) মিঃ ফজলুর রহমান। এখন মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা হইল ১১ জন।

মদনমোহন মালব্যের শবানুগমন

ফটো—জলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের দৃঢ়তা—

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিবারণের জন্য জন-নিরাপত্তা অর্ডিনান্স জারি করিয়াছেন। ঐ বিষয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শের জন্য ২০শে নভেম্বর তিনি দিল্লী আসিয়াছিলেন। তথায় তিনি বলিয়াছেন—পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট পাঞ্জাবে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা পাঞ্জাবে সামরিক আইন ঘোষণা করিতেও দ্বিধা করিবেন না।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সফর—

বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু প্রায় এক পক্ষ কাল ধরিয়া বাঙ্গালার বহু স্থান পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী, শ্রীযুত চপলাকান্ত

ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুত দেবনাথ দাস তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি প্রথমে কয়েকদিন নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন ও মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আর্ত্তত্রাণের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পরে তিনি নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, মৈমনসিংহ, স্বাধীন ত্রিপুরার আগরতলা প্রভৃতি স্থানেও গমন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় আজ উপযুক্ত নেতার একান্ত অভাব। বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত বিভিন্নমুখী কর্ম্মধারাকে সংহত করিয়া দেশকে সুপথ প্রদর্শনের বিশেষ প্রয়োজন। শরৎচন্দ্রই সেই নেতৃত্ব-ভার গ্রহণের যোগ্যতম ব্যক্তি।

বিদেশে বাঙ্গালী ছাত্রের কৃতিত্ব—

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দে এম-এ এবার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষায় এক সঙ্গে গণিতশাস্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ট্রাইপোস্ পরীক্ষায়

শ্রীশিবচন্দ্র দে

সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গত বৎসর তিনি ট্রিনিটি কলেজের বাৎসরিক প্রাইজম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি পাটনার উকীল শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র দে'র পুত্র।

পরলোকে ফণীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

খ্যাতনামা বিপ্লবীনেতা ও নেতাজীর সহকর্ম্মী শিক্ষাব্রতী ফণীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় গত ২৮শে নভেম্বর পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি হুগলী জনাইএর অধিবাসী হইলেও ২৪ পরগণার খড়দহ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল।

সাধুজন পাঠাগারের যুগজয়ন্তী—

গত ২৮শে আশ্বিন যশোহর জেলার বনগ্রামের সাধুজন পাঠাগারের যুগজয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। যুগান্তর সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় উৎসবে পৌরোহিত্য করেন ও শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার ও স্থানীয় বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠাগারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সাধু পাঠাগারটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কবিরাজ মণীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত—

সিংহল গভর্ণমেণ্ট সিংহলে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা ও প্রচারের জন্য সম্প্রতি যে তদন্ত কমিটী গঠন করিয়াছেন, কলিকাতার
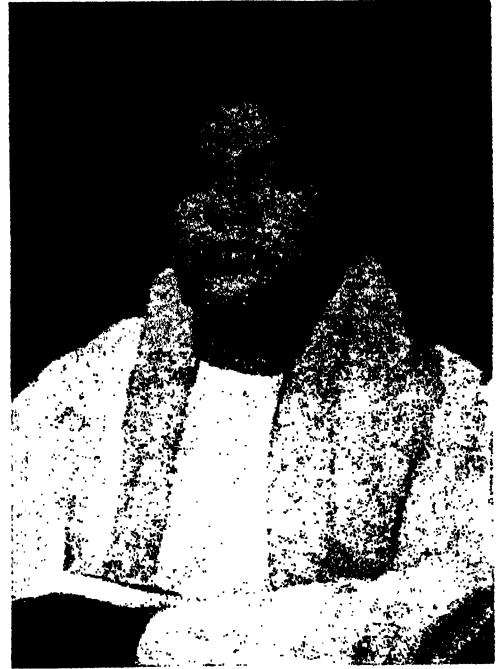
কবিরাজ মণীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত

খ্যাতনামা কবিরাজ, যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত এম-এ, এম-বি, মহাশয় তাহার সভাপতি হইয়া সিংহলে গমন করিয়াছেন; মণীন্দ্রবাবু ঢাকা জেলার গাউপাড়া গ্রামের স্বর্গত কবিরাজ রাজেন্দ্রলাল দাসগুপ্তের পুত্র ও বঙ্গীয় ষ্টেট্ ফ্যাকালটী অব্ আয়ুর্ব্বেদের কাউন্সিলের সদস্য। একজন বাঙ্গালীর এই সম্মান লাভে বাঙ্গালীমাত্রই আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

পরলোকে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ—

কলিকাতার প্রসিদ্ধ কাগজ ব্যবসায়ী, ঘোষ পেপার হাউসের পরিচালক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সম্প্রতি মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। উচ্চশিক্ষা

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

লাভের পর তিনি চাকরীর প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া কাগজের ব্যবসায় শিক্ষালাভ করেন ও তাহাতে সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলে কাগজ ব্যবসায়ে নানা বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হইয়াছিল।

নূতন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী—

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী নিম্নলিখিত ১৪ জন সদস্য লইয়া নূতন ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিয়াছেন—(১) মৌলনা আবুলকালাম আজাদ (২) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু (৩) সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল (৪) শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু (৫) ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ (৬) খান আবদুল গফুর খাঁ (৭) শ্রীশরৎচন্দ্র বসু (৮) শ্রীরাজাগোপালাচারী (৯) শ্রীশঙ্কর রাও দেও (১০) শ্রীমতী কমলা দেবী (১১) শ্রীরফি আমেদ কিদোয়াই (১২) শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ (১৩) শ্রীপ্রতাপ সিং (১৪) শ্রীযুগল কিশোর। শ্রীশঙ্কররাও দেও ও শ্রীযুগল কিশোর সাধারণ যুগ্ম-সম্পাদক এবং সর্দ্দার পেটেল কোষাধ্যক্ষ হইবেন।

বাঙ্গালী হিন্দুর ব্যাঙ্ক—

বাঙ্গালী হিন্দুর ব্যাঙ্কে প্রায় আশী কোটি টাকা জমিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লীগ সচিব-সঙ্ঘ বঙ্গীয় মহাজনী আইন ও বঙ্গীয় চাষী খাতক আইন প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুর প্রায় একশত কোটি টাকা নষ্ট করিয়া দেন। এই আইন দুইটির জন্য বঙ্গদেশে সাধারণ উপায়ে ঋণ দান প্রায় অসম্ভব হইয়াছে ও তাহার ফলে বহু লক্ষ হিন্দু-মুসলমান কৃষককে গত দুর্ভিক্ষে জমী বেচিয়া ফেলিতে হইয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুর টাকা লগ্নী করিবার মোড় ঘুরিয়া ব্যাঙ্কে আসিয়াছে। সম্প্রতি কোনও কোনও স্বার্থান্ধ শ্রেণীর প্রচারের ফলে এই সকল ব্যাঙ্কে 'রাণ' অর্থাৎ এক সঙ্গে টাকা তোলার হিড়িক হইয়াছিল। তাহাতে মাত্র তিনটি ব্যাঙ্ক টাকা লেনদেন বন্ধ করিয়াছে। নেতাজীর অগ্রজ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু যে সকল আমানতকারী টাকা তুলিয়াছেন তাহাদিগকে ফেরৎ জমা দিতে বলিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র এক সঙ্গে টাকা তুলিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহাতে এই হিড়িক অনেক কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই সময়ে ইংরেজ বণিক সমাজের মুখপত্র 'ক্যাপিটাল' এমন সব কথা লিখিতেছেন যাহাতে অল্পবুদ্ধি লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইতে পারে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে ইংরেজ ও ভারতবাসীর দ্বন্দ্ব অর্থনীতিক্ষেত্রে যত অধিক এমন অন্য কোথায়ও নহে। বোম্বাইয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ইংরেজকে যেরূপ কোণ ঠাসা করিয়াছে কলিকাতাতেও তাহা হওয়া বিচিত্র নহে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রচারের ফলে বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্যে গত দশ পনর বৎসরে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে। গত যুদ্ধে এই অগ্রগতি সুপরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার মূলে আছে ব্যাঙ্ক। কোনও ব্যাঙ্কের অবস্থা ভিতরে মন্দ হইলে তাহার উপর 'রাণ' করিলে সে তখনই ডুবিবে; বরং তাহাকে সময় দিলে সে বাঁচিয়া উঠিতে পারে। সন্দেহস্থলে আমানতকারীরা সমিতি (Depositors' Association) গঠন করিয়া ব্যাঙ্কের খাতা-পত্র দেখিয়া কার্য্য করিলে বাঙ্গালী জাতিরও উন্নতি হইবে।

অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—

বরিশাল জেলার মাহিলাড়া নিবাসী কলিকাতা স্কটীশ চার্চ্চ কলেজের বাঙ্গালার প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীর

কুমার দাশগুপ্ত সম্প্রতি "কাব্যশাস্ত্রের মৌলিক তত্ত্বসমূহের বিচার" বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এচডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি গত ১৭ বৎসর অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন; তৎপূর্ব্বে ১২ বৎসর কাল তিনি দেশ ও সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া-

শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দাসগুপ্ত এম-এ,পিএচ ডি

ছিলেন। তাঁহার নূতন গ্রন্থ পরীক্ষকগণের সর্ব্বসম্মত প্রশংসালাভ করিয়াছে। অন্যতম পরীক্ষক কাশীনিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ গ্রন্থকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুধীরবাবুর অন্যান্য গ্রন্থও বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

বাঙ্গালী অধ্যাপক সম্মানিত—

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার বন্ধুগণ ৮০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধ্যাপক রাধাকুমুদ তাঁহার জীবন শিক্ষা দান ও গবেষণায় উৎসর্গ করিয়াছেন। সামাজিক ও রাজনীতিক কর্ম্মক্ষেত্রেও তিনি অক্লান্তভাবে দেশসেবা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ওয়াশিংটনে খাদ্য ও কৃষি সম্মিলনে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

পরলোকে পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর—

খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় গত ১৮ অক্টোবর কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি হুগলী জেলার ভদ্রকালীর অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫৭ সালে তাঁহার জন্ম হয় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া তিনি বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও পরে
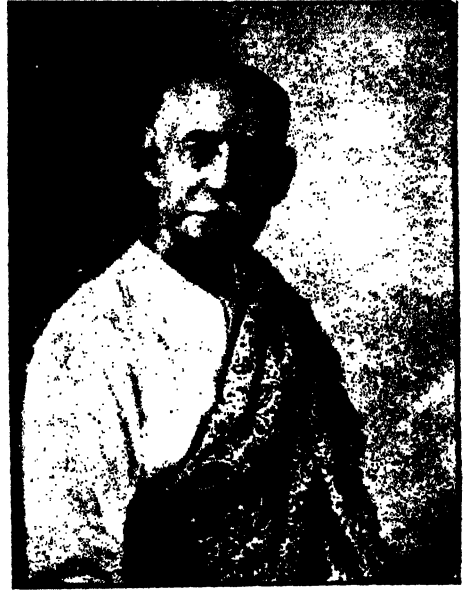
৺পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর

আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। বহু সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা সংগ্রহ করিয়া ও সেগুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তিনি কাশী হইতে উদ্ভটসাগর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

মাহেশ-বল্লভপুরে সাহিত্যবাসর—

গত ৮ই অগ্রহায়ণ হুগলী—মাহেশ উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সুলেখক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে উক্ত বিদ্যালয় গৃহে সাহিত্য বাসরের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ সেন, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি যোগদান করিয়াছিলেন। অতিথিরা স্থানীয় সকল দেবমন্দির দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

প্রথম টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া : ৬৪৫
ইংলণ্ড : ১৪১ ও ১৭২

এবছর অষ্ট্রেলিয়া আর ইংলণ্ডের প্রথম 'টেষ্ট ম্যাচ' খেলায় অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৩৩২ রাণে ইংলণ্ডকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। অষ্ট্রেলিয়া আর ইংলণ্ডের শেষ টেষ্ট ম্যাচ হয়েছিল ১৯৩৮ সালে, তারপর পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের দরুণ এই ঐতিহাসিক টেষ্টম্যাচ বন্ধ ছিল। আজ দীর্ঘ আট বছর পর অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের ক্রিকেট টীম 'এ্যাসেস' বিজয়ের উদ্দেশ্যে মিলিত হ'য়েছে। পৃথিবীর ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট-ম্যাচ যতখানি গুরুত্বপূর্ণ অন্য কোন দেশের ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ততখানি নয়। শুধু এই দুই দেশের জনসাধারণ উদ্বেগ উত্তেজনায় খেলার অবস্থা অনুকরণ করে না, পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তের সভ্য দেশের ক্রীড়ামোদীরাও অধীর আগ্রহে এই দুই জাতির টেষ্ট ক্রিকেট খেলার শেষ ফলাফল জানবার জন্য অপেক্ষা করে।

যুদ্ধের দরুণ ক্রিকেট খেলার বেশী ক্ষতি হয়েছে অষ্ট্রেলিয়ার। ঐ সময় ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলা চলেছিল কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় খেলা এক রকম বন্ধই ছিল। ফলে অষ্ট্রেলিয়ায় নতুন ক্রিকেট খেলোয়াড় তৈরী সম্ভব হয় নি। আবার ১৯৩৮ সালের এবং পূর্ব্বের খ্যাতনামা টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়রা আজ ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। মাত্র তিনজন পূর্ব্বের টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়া দলে এবার খেলেছিলেন। ইংলণ্ডের ভাগ্য এই দিক থেকে খুবই ভাল। তাদের দলে পুরাতন টেষ্ট খেলোয়াড় রয়েছেন সাতজন।

পূর্ব্বাপর বছরের তুলনায় এ বছর ক্ষমতাশালী বোলারের সংখ্যা দুই দলেরই কম এবং তাঁরা প্রাক্তণ বোলারদের সমকক্ষও নন।

২৯শে নভেম্বর ব্রিসবেনে ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার ৬ দিন ব্যাপী প্রথম টেষ্ট-ম্যাচ আরম্ভ হয়। টসে ব্র্যাডম্যান জয়লাভ ক'রে প্রথম ব্যাট করতে পাঠালেন এ মরিস ও এস বার্ণেসকে। সূচনা ভাল হ'ল না। মাত্র দলের ৯ রাণে মরিস ২ রাণ ক'রে আউট হলেন। এর পর ব্র্যাডম্যান তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে ব্যাট করতে নামলেন। বার্ণেস নিজস্ব ৩১ রাণ ক'রে আউট হলেন। এ এল হ্যাসেট ব্র্যাডম্যানের জুটী হলেন। এই তৃতীয় উইকেটের জুটী ১৯৩৬ সালে অষ্ট্রেলিয়ার ফিঙ্গলটন ম্যাক্‌ক্যাবের তৃতীয় উইকেটের ৭৭ রাণের রেকর্ড ভঙ্গ করলো। পরে ১৯৩২ সালের উডফুল রিচার্ডসনের প্রথম উইকেটের ১৩৩ রাণের রেকর্ড অতিক্রম করে উভয় দলের রেকর্ড হলো। ব্র্যাডমান তাঁর নিজস্ব ৯৭ রাণের মাথায় বাউণ্ডারী করে শতরাণ পূর্ণ করলেন। এই নিয়ে ব্র্যাডম্যানের ৯৬ সেঞ্চুরী করা হল, টেষ্ট ক্রিকেট ম্যাচে হ'ল ২২; ইংলণ্ডের ক্যাপটেন হ্যামণ্ডের সমান। দিনের শেষে পাঁচঘণ্টা ব্যাট করায় অষ্ট্রেলিয়ার ২ উইকেটে ২৯২ রাণ উঠলো। ব্র্যাডম্যান উইকেটে ৪¾ ঘণ্টা ছিলেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে বাউণ্ডারী করেন ১৫। হ্যাসেট ৪ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে ব্র্যাডম্যানের অর্দ্ধেক ৮১ রাণ করেন, তাঁর বাউণ্ডারী ছিল ৬। ব্র্যাডমান ও হ্যাসেট যথাক্রমে ১৬২ এবং ৮১ রাণ করে সেদিনের মত নট্ আউট রইলেন।

ব্র্যাডম্যানের নিজস্ব ২৮ রাণের মাথায় এ্যাকিন 'ক্যাচের' জন্ম আবেদন জানান কিন্তু আম্পায়ার বোরউইক ব্র্যাডম্যানকে 'নট্ আউট' বলে অভিমত প্রকাশ করেন। বলটি ব্র্যাডম্যানের ব্যাট ছেড়ে মাটি সত্যিই স্পর্শ করেছিলো কিনা এই নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ হয়েছিলো। প্রথম টেষ্টম্যাচের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ব্রিসবেন মাঠে স্থাপিত পূর্ব্বের অনেকগুলি রেকর্ড ভঙ্গ হ'ল।

ব্র্যাডম্যান দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভের কিছু পর ১৬৯ রাণ ক'রে ব্রিসবেনে ১৯২৫ সালে হেণ্ডাসনের (ইংলণ্ড) স্থাপিত রেকর্ড রাণের সমান করলেন। ১৬৯ রাণই ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলায় এ পর্য্যন্ত সর্ব্বোচ্চ হিসাবে গণ্য হয়েছিল। ঐ দিনেই ব্র্যাডম্যান মোট নিজস্ব ১৮৭ রাণ ক'রে পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করে নতুন রেকর্ড করলেন।

ব্র্যাডম্যান হ্যাসেটের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ২৫০ রাণ উঠলে পর ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মেলবোর্ণে স্থাপিত ব্র্যাডম্যান ম্যাকক্যাবের তৃতীয় উইকেটের ২৪৯ রাণের পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ হ'ল। ১৯২৮-২৯ সালে মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলায় হ্যামণ্ড জার্ডিনের তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ২৬৩ রাণ ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলার রেকর্ড হয়েছিল তাও ভঙ্গ হ'ল। ব্র্যাডম্যান হ্যাসেট তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ২৭৬ ক'রে নতুন রেকর্ড করলেন। ব্র্যাডম্যান নিজস্ব ১৮৭ রাণ ক'রে এডরিচের বলে 'বোল্ড' হন। প্রথম ইনিংসে তাঁর ১৯টী বাউণ্ডারী ছিল। দ্বিতীয় দিনের খেলায় ব্র্যাডম্যান তাঁর বিগত দিনের ক্রিকেট খেলার দক্ষতা যেন ফিরে পেয়েছিলেন এবং উইকেটের চারিপাশে তাঁর দর্শনীয় 'ষ্ট্রোক'গুলি হ্যাটনের সর্ব্বোচ্চ ৩৬৪ রাণের রেকর্ড ভঙ্গ করবে বলে দর্শকদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিল।

এ এল হ্যাসেট ১২৮ রাণ ক'রে বেডসার বলে ইয়ার্ডলি হাতে আটকে পড়েন। টেষ্ট খেলায় এই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। টেষ্ট খেলায় তাঁর সর্ব্বোচ্চ রাণ উঠেছিল ৫৩, ১৯৩৮ সালে। হ্যাসেট ৬½ ঘণ্টা উইকেটে ছিলেন, তাঁর বাউণ্ডারী ছিল ১০টী। কে-মিলার ৭৯ রাণে আউট হন। দিনের শেষে ৫ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ার ৫৯৫ রাণ উঠে। সি-ম্যাককুল ও আই জন্সন যথাক্রমে ৯২ ও ৪৭ রাণ করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলায় তিনজন আউট হন— ব্র্যাডম্যান, হ্যাসেট ও মিলার। বেডসার ও রাইটস সমান ৩৭ ওভার বল দিয়ে ২টো করে উইকেট পান। এডরিচ ব্র্যাডম্যানের উইকেট পান। সারাদিন ইংলণ্ডের বোলাররা পরিশ্রম ক'রে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। হ্যামণ্ড এবং বেডসার হ্যাসেটের ক্যাচ ফেলে দেন। তৃতীয় দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ৬৪৫ রাণে শেষ হ'ল। ১৯২৮ সালে সিডনিতে ইংলণ্ড ৬৩৬ তুলে রেকর্ড ক'রেছিলো। ম্যাককুল পাঁচরাণের জন্ম সেঞ্চুরী করতে পারলেন না। জনসনের ৪৭ এবং লিণ্ডওয়েলের ৩১ রাণ উল্লেখযোগ্য। রাইট সর্ব্বসমেত ৪৩'৬ ওভার বলে ৪টী মেডেন পান এবং ১৬৭ রাণ দিয়ে ৫টী উইকেট পেলেন। এডরিচ ৩ উইকেট এবং বেডসার ২টী উইকেট পান। এক্সট্রা—৫ বাই, লেগ বাই ১১, ওয়াড—২, এবং নো-বল ১১টী।

লাঞ্চের ১৫ মিনিট আগে ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন হ্যাটন ও ওয়াসব্রুক। লাঞ্চের আগে তিন ওভার বলে ইংলণ্ডের আট রাণ উঠলো। ল্যাঞ্চের পর হ্যাটন সাত রাণ ক'রে মিলারের বলে বোল্ড হলেন। লাঞ্চের পর থেকে ১৩ বল খেলা হলে বৃষ্টি নেমে খেলা বন্ধ ক'রে দেয়। ২৩ মিনিট পর আবার খেলা আরম্ভ হল। এদিকে খেলার সময় আলোরও অভাব দেখা গেল। দশ মিনিট খেলার পর বৃষ্টি আবার খেলা বন্ধ করলো। ব্যাটসম্যানরা আলোর অভাবে খেলা বন্ধ রাখার বারম্বার আবেদন জানালেন ৫-২০ মিনিটের সময় খেলা সে দিনের মত বন্ধ রাখা স্থির হ'ল। ইংলণ্ডের ১ উইকেটে ২১ রাণ তখন উঠেছে।

চতুর্থ দিনে বৃষ্টির দরুণ খেলা অনেক দেরীতে আরম্ভ হ'ল। ঐ দিনের খেলায় ইংলণ্ডের ৫ উইকেটে ১১৭ রাণ উঠার পরে খেলা বন্ধ হয়। বৃষ্টির জন্ম মাঠের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যায়। প্রবল বারিপাতের দরুণ খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে প্যাভিলিয়নে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং ১৮ মিনিট পর পুনরায় খেলতে থাকে। চতুর্থদিনের খেলায় ইংলণ্ডের বাকি পাঁচটা উইকেট মাত্র ২৪ রাণে পড়ে যায়। এই দিন ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ৪৩ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল এবং প্রথম ইনিংসে মোট ১৪১ রাণ উঠল। মিলার ২২

ওভার বলে ৪টা মেডেন নিয়ে ৬০ রাণ দিয়ে ৭টা উইকেট পান। টসাক ১৬ ওভার বলে ১১টা মেডেন নিয়ে ১৭ রাণ দিয়ে ৩টে উইকেট পেলেন।

ইংলণ্ড ৫০৪ রাণে পিছিয়ে থেকে 'ফলো অন' করতে বাধ্য হ'ল। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা মোটেই ভাল হ'ল না। মিলারের প্রথম বলেই কোন রাণ না করেই হাটন আউট হলেন। ২য় উইকেট ১৩ রাণে, ৩য় উইকেট ৩৩ রাণে, ৪র্থ উইকেট ৬২ রাণে, ৫ম ও ৬ষ্ঠ উইঃ ৬৫ রাণে পড়ে গেল। কম্পটন, হ্যামণ্ড এবং ইয়ার্ডলের উইকেট মাত্র ৩ রাণের মধ্যে পড়ে যায়। একমাত্র এ্যাকিনই দলের সর্ব্বোচ্চ ৩২ রাণ করেন ৪৫ মিনিট খেলে; তাঁর রাণে ৫টা বাউণ্ডারী ছিল। ইংলণ্ডের ১৫টা উইকেট ১৯৬ রাণে পড়ে যায় ৩½ ঘণ্টার খেলায়। এ বিপর্য্যের কারণ বারিপাত এবং অষ্ট্রেলিয়ার বোলার মিলার ও টোসাকের মারাত্মক বোলিং। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৭২ রাণে শেষ হয়ে যায়। মিলার ১১ ওভার বলে ১১টা মেডেন নিয়ে মাত্র ১৭ রাণে ২টো উইকেট আর টসাক পান ৬টা উইকেট—৮২ রাণে ২০.৭ ওভার ২টো মেডেন দিয়ে। এই নিয়ে ব্রিসবেনে ইংলণ্ড—অষ্ট্রেলিয়ার চারটি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হ'ল এবং এইবারই অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম গৌরবজনক বিজয়।

এবার অষ্ট্রেলিয়ার এই বিজয়লাভে প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ অনেকখানি সহায়তা করেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে দশ বছর আগে ১৯৩৬-৩৭ সালে ইংলণ্ড এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সহায়তায় অষ্ট্রেলিয়াকে ব্রিসবেনে প্রথম টেষ্ট ম্যাচে ৩২২ রাণে হারিয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস সে বার মাত্র ৫৮ রাণে শেষ হয়ে যায়।

অষ্ট্রেলিয়া দলের লিণ্ডওয়াল ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের মাঝখান থেকে অসুস্থ অবস্থায় মাঠ ত্যাগ করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে আর যোগদান করেন নি। তাঁর স্থানে মিউলম্যান নেমেছিলেন ফিল্ডিং করতে। অষ্ট্রেলিয়ার বোলার মিলার ও টসাক উভয় ইনিংস নিয়ে ৯টি ক'রে উইকেট পান যথাক্রমে ৭৭ ও ৯৯ রাণ দিয়ে। কিথ মিলার ইংলণ্ডের ল্যাঙ্কাসায়ার লীগে খেলবেন বলে জানা গেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব-সম্পাদিত গল্প-সংকলন "কথাশিল্প"—৩।০
শ্রীজগদীশ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "প্রশ্ন"—২।০
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "অ-ক্রুর সংবাদ"—১৸০
শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মানে না মানা"—২।০
শ্রীশীতাংশু মৈত্র কর্তৃক মোপাসাঁর গল্পানুবাদ "মোপাসাঁ থেকে"—২৲
শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ প্রণীত "কংগ্রেসের পথ"—১।০
শ্রীআশুতোষ সান্যাল প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "সন্ধ্যামালতী"—১৸০
শ্রীরণজিৎকুমার সেন প্রণীত দর্শনসাহিত্য-সংকলন "সমাজদর্শন"—১৲
শ্রীচিত্ত রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীরাম দত্ত কর্তৃক গল্পানুবাদ "কন্টিনেন্টের গল্প" (১ম খণ্ড)—২৲
মনোরঞ্জন হাজরা প্রণীত উপন্যাস "মহানগরে দাবানল"—১।০
শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত "The Indian Revolution and the Constructive Programme"—২৲

"ভারতবর্ষের" গ্রাহকদের প্রতি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ডাকের গোলযোগের জন্য যে সকল গ্রাহকদের কাগজ হারাইয়া যাইতেছে, তাঁহাদিগকে পুনরায় কাগজ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। নিরাপদে কাগজ পাইবার জন্য তাঁহারা প্রতি সংখ্যায় অতিরিক্ত তিন আনা হিসাবে রেজেষ্ট্রী ফি জমা দিলে, আমরা রেজেষ্ট্রী করিয়া কাগজ পাঠাইয়া দিব।

নিবেদক

ম্যানেজার—ভারতবর্ষ কার্য্যালয়

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
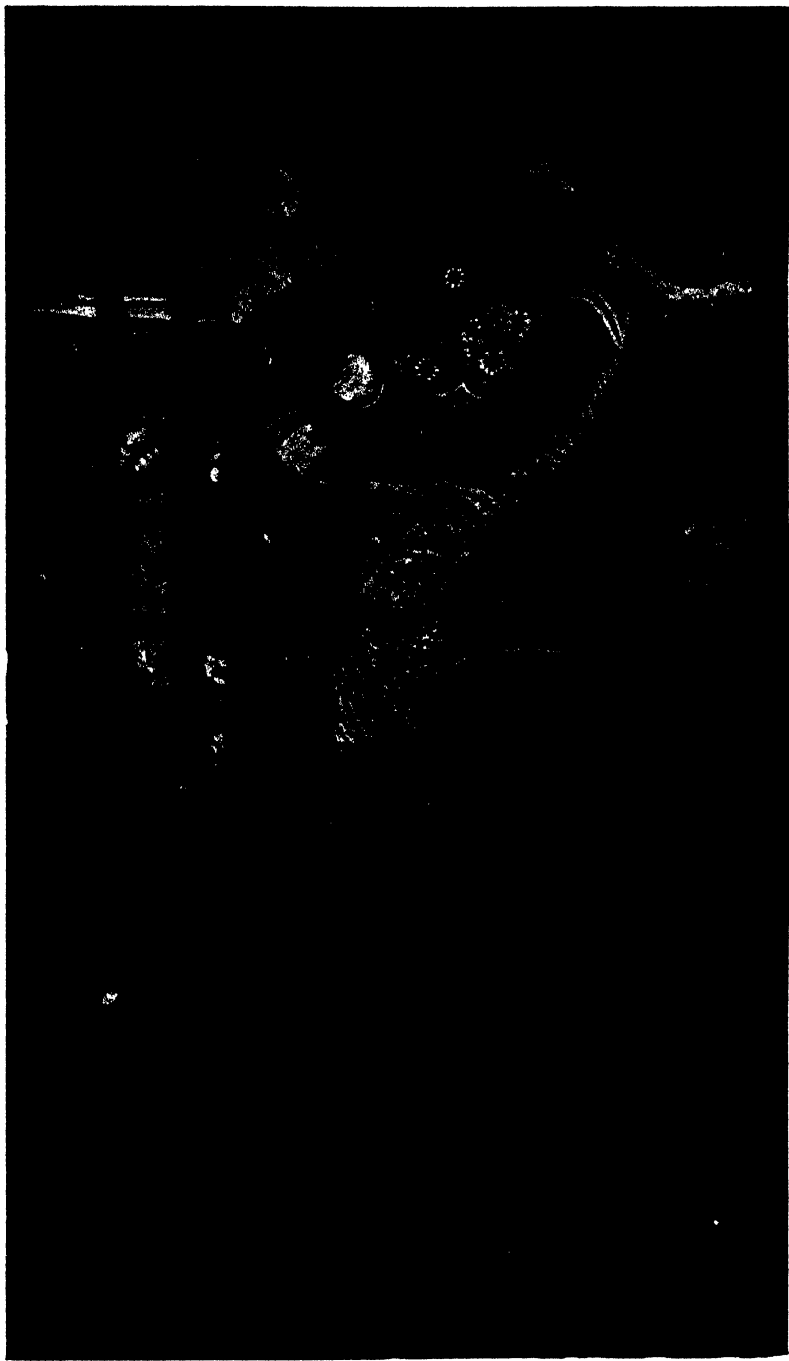
শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুশীল মুখোপাধ্যায় নৃত্য-পরা ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

মাঘ—১৩৫৩

দ্বিতীয় খণ্ড	চতুস্ত্রিংশ বর্ষ	দ্বিতীয় সংখ্যা

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রভাব

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পুরাণরত্ন, এম-এ, এম-এল

বাঙ্গলা-সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে তাহার অনবদ্য মাধুর্য্যের সৌরভে ও অন্তর্নিহিত সম্পদের প্রভাবে। দেশের নাড়ির সহিত যে সাহিত্যের টান থাকে সেই সাহিত্যই দেশের ও বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গণমনের সহিত যে সাহিত্যের সম্পর্ক নাই সে সাহিত্য কখনও স্থায়ী হয় না। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সাহিত্য একদিন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ও রসজ্ঞ ব্যক্তির আলোচনার বিষয় ছিল। সাধারণের জীবন সমস্যা তখন সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয় নাই। কিন্তু সাহিত্যের পুষ্টিলাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলি যখন সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে লাগিল তখন জনসাধারণ নিজেদের সাহিত্যকে ভালভাবে চিনিতে পারিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই দেখিতে পাই যে, সাহিত্যে দেশের ও সমাজের সমস্যাগুলি স্থান পাইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর লেখনীদ্বারা সেই সমস্যাগুলিকে আরও ভালভাবে দেশের নিকট ধরিতে পারিয়াছিলেন। সেই অবধি বাঙ্গালা সাহিত্য উত্তরোত্তর পরিপুষ্টি লাভ করিযাছে এবং বর্ত্তমানে এই সাহিত্যে দেশের সুখ দুঃখের ও বহুবিধ সমস্যাগুলির সুন্দর ও যথার্থ আলেখ্য দেখা যায়।

১৩৫০ সালে বাঙ্গালাদেশে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহা এই নিপীড়িত ও দুর্ভাগ্য প্রদেশে বহু নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই মহামন্বন্তর বাঙ্গালাদেশকে বিধ্বস্ত করিয়া দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে বিরাট ও গভীর বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিয়াছে তাহার প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর বিশেষভাবে পড়িবে সন্দেহ নাই। এই মহামারী কিরূপে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে মৃত্যুর কবলে টানিয়াছে ও ক্ষুধিতের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে বাঙ্গালার আকাশ বাতাসকে কি ভাবে মুখরিত করিয়াছে তাহা

সকলেই অল্পবিস্তর জানেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সভ্য-জগতে এই মহামারী কিরূপে সম্ভব হইল এবং কি ভাবেই বা ইহার প্রভাব অলক্ষ্যে দেশের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক জীবনকে পলে পলে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে তাহা উদ্ঘাটন করিবার দায়িত্ব কেবল রাজ-নীতির নয়—সাহিত্যেরও। সাহিত্যিক তাঁহার লেখনীমুখে দেশের এই সমস্যাগুলিকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই সমাজের নেতৃবৃন্দ সেই সমস্যাগুলির সমাধান করিতে সচেষ্ট হইবেন। ইহা সাহিত্যিকের গুরু দায়িত্ব এবং সাহিত্যের এক বিশিষ্ট দান। যাঁহারা মনে করেন যে সাহিত্য কেবল কল্পনার সামগ্রী তাঁহারা সাহিত্যকে ক্ষুদ্র করিয়া দেখেন। যাঁহারা সাহিত্যে কেবল আদর্শবাদের ব্যাখ্যা চান তাঁহারাও সাহিত্যের একটী দিকই দেখেন। কারণ সাহিত্য কেবল আদর্শবাদ নয়, কিংবা কেবল কল্পনা নয়। পরন্তু সাহিত্য দেশের যথার্থ চিত্র—দেশের মূল সমস্যাগুলির সুন্দর ও যথাযথ আলেখ্য। সাহিত্য কেবল realistic নয় কিংবা কেবল idealistic নয়। ইহা একাধারে realistic এবং idealistic। সাহিত্যে realism ও idealismর যে বিবাদ তাহা কাল্পনিক। কারণ বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি সবই কমবেশী realism ও idealismর সমন্বয়।

পঞ্চাশের মন্বন্তর বাঙ্গালীর এক দারুণ অভিশাপ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে বাঙ্গালাদেশের যে দুর্দ্দশার সূচনা হইল তাহার পরিণতি হইল এক মহামন্বন্তরে। এই মহামারীর জন্য দায়ী কাহারা? বিদেশী শাসক-সম্প্রদায় ও তাহাদের শাসনপ্রণালী, জাপানের আক্রমণে উদ্‌ভ্রান্ত ইংরাজের অদূরদর্শী নীতি—এই মন্বন্তরের জন্য যথেষ্ট দায়ী। কিন্তু শুধু কি তাহাই? দেশের ধনিক সম্প্রদায় কি ইহার জন্য কিছুমাত্র দায়ী নয়? ইহা বলিলে কি অসঙ্গত হইবে যে মুষ্টিমেয় মুনাফালোভী বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর অসংখ্য অসহায় নরনারীর রক্তপান করিবার অস্বাভাবিক প্রয়াস এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ? কেন এরূপ হয়? কি জন্য দেশের আজ এই অবস্থা? কেন প্রায় দুইশত বৎসর পাশ্চত্য-সভ্যতার আলোক পাইয়াও বাঙ্গালাদেশ এই দুর্ভিক্ষকে রোধ করিতে পারিল না? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার সাহিত্যের এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর পঞ্চাশের মন্বন্তরের ইহাই প্রভা[illegible]

দেশব্যাপী এই মন্বন্তরের পর দেশকে ও সমাজ[illegible] কি ভাবে পুনর্গঠন করিলে পুনরায় দেশ দাঁড়াইতে পারি[illegible] তাহাও নির্দ্ধারণ করিবার ভার সাহিত্যের। যথ[illegible] সাহিত্যিক যিনি তিনি দ্রষ্টা। সেইজন্যই সাহিত্যি[illegible] তাঁহার ভূয়োদর্শনের প্রভাবে সমাজের মূল সমস্যাগুলি কেবল আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন না, পরন্তু সেগু[illegible] সমাধানের ইঙ্গিত করেন। সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া রাজনীতিকগণ নূতনভাবে রাষ্ট্রগঠন করিয়া থাকেন সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রগঠনের মূলেও সাহিত্যিকে[illegible] সাধনা বিদ্যমান ছিল। যুগে যুগে দেখা গিয়াছে যে সাহিত্যিকগণ নূতন পথের সন্ধান দিয়া কর্ম্মীকে ক[illegible] প্ররোচিত করিয়াছেন। পঞ্চাশের মহামন্বন্তরের প[illegible] আজ যখন বাঙ্গালাদেশের সামাজিক, নৈতিক ও অর্থ[illegible] নৈতিক জীবনে এক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে তখন সাহিত্যি[illegible] তাঁহার দূরদৃষ্টির প্রভাবে সে বিপর্য্যয় কিভাবে রোধ কর[illegible] যায় তাহা দেখাইয়া দিবেন। বাঙ্গালার মুমূর্ষু পল্লীকে কি ভাবে রক্ষা করা যায় তাহা দেখাইয়া দিবার ভা[illegible] সাহিত্যের।

বিশ্বসাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সেরা সাহিত্য কেবল দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার চিত্র দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় না; পরন্তু তাহার মূল উৎপাটন করিয়া কিরূপে দেশের ও মানবসমাজের কল্যাণ সাধিত হয় তাহারও ইঙ্গিত দিয়া থাকেন। রাশিয়ার নবজাগরণের মূলে সাহিত্যের যে বিরাট দান ও প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহা অনেকেই জানেন। ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বের ও পরের সাহিত্য যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে সাহিত্যের উপর দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের প্রভাব কত অসীম। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব শুধু ফরাসী সাহিত্যের উপরই পড়ে নাই—ইংরাজি ও অন্যান্য সাহিত্যের উপরও যথেষ্টভাবে পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ ফরাসী-বিপ্লবের পর ইউরোপের সাহিত্যেও এক বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং সাহিত্যে এক নবযুগের সূচনা হয়। ইহার কারণ কী? ইহার একমাত্র কারণ একদিকে ফরাসী বিপ্লবের বীভৎস অত্যাচারের মধ্যে ও অন্যদিকে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীর ভিতরে ইউরোপের সাহিত্যিকগণ

তখন মানব চরিত্রের ও মানব সমাজের এক নূতন রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্য-সাধককে মানবচরিত্রের ও মানবসমাজের এক নূতনরূপ দেখাইবে সন্দেহ নাই।

তেরশো পঞ্চাশের মন্বন্তর লইয়া বহু কুশলীলেখক বহু গল্প লিখিয়াছেন। ঐ সমস্ত গল্পগুলিতে মুনাফা-লোভীদের জীবনের অন্ধকার দিক—পরাধীন জাতির অসহায় অবস্থা—ধনিকশক্তির প্রাধান্য—বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ছলনাময় অভিনয়—প্রভৃতি নির্ম্মমভাবে অন্তরে আঘাত দেয়। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের প্রভাব সাহিত্যে এই-খানেই শেষ নয়। সাহিত্যে ইহার প্রভাব দূরপ্রসারী ও বহুকালস্থায়ী হইবে, কারণ পঞ্চাশের মন্বন্তরের কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত ঘটনার মধ্য হইতে যে নবযুগের আবির্ভাব হইবে সেই নবযুগের ইঙ্গিত বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যেই মিলিবে।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রবীন্দ্রোত্তর বাঙ্গালা সাহিত্যে যে কয়জন সুনিপুণ সাহিত্যরসিক আছেন তাঁহারা তাঁহাদের ভূয়োদৃষ্টির ও প্রতিভার দ্বারা মহামন্বন্তরের মধ্য হইতে যদি সেই নবজাগরণ আনিতে পারেন তবেই বাঙ্গালা-সাহিত্যের যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা হয়। মহামারীর পর হইতে বাঙ্গালার আকাশে যে ঘন মেঘের সঞ্চার হইয়াছে তাহাকে অপসারিত করিবার গুরুদায়িত্ব কেবল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নয়—সাহিত্যিকগণেরও। আজ বাঙ্গালীর—

"সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট"।

বাঙ্গালা সাহিত্য যদি এই দৈন্যের মধ্য হইতে বিশ্বাসের ছবি আঁকিতে পারে—যে বিশ্বাস আবার বাঙ্গালার জাতীয় জীবনকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে—তবেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সার্থকতা এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর পঞ্চাশের মন্বন্তরের ইহাই প্রভাব।

হারজিত

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী

নতুন-বৌ লতিকা স্বামীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে বন্ধু-দম্পতির সঙ্গে আলাপ করে ফেললে। মিসেস বোস্ একটু গায়ে-পড়া ভাবেই আলাপটা করেছিলেন। "এই যে ভাই, আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে, কোথায় বাড়ী আপনাদের?" এইভাবে তাদের আলাপের সূত্রপাত। তারপর বন্ধুভাবে আসা যাওয়া। বান্ধবী বটে লতিকা, কিন্তু স্থূলাঙ্গী মিসেস বোস মিহিরের সঙ্গেই সময়টা অধিকক্ষণ অতিবাহিত করতেন। মুগ্ধ চোখে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতেন। সেকাল ও একাল মিসেস বোসের ছিল আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু। এসব কথার মধ্যে তিনি লতিকাকেও কটাক্ষ করতে ছাড়তেন না। মিঃ আনন্দ বোস কিন্তু তাঁর ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন লতিকার দিকে। মাঝে মাঝে পিয়েনোর "তোমার পূজার ফুল—"লতিকা কোনও আলোচনাতেই বিশেষ যোগ দিত না, অতিথিদের আদর আপ্যায়ন নিয়েই ব্যস্ত থাকত। মিসেস্ বিমলা বসু সেদিকে মিহিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন: "দেখুন মিহিরবাবু, মিসেস ভাদুড়ী শুধু হাঁড়ির চিন্তাতেই মগ্ন!"

সেদিকে অবজ্ঞা ভরে তাকিয়ে মিহির বললে: "সেই-জন্যই ত আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, যদি ওর গায়ে একটু—"

উৎসাহিত হয়ে বিমলা বললেন: "সত্যি মিসেস্ ভাদুড়ী, আপনি বৃথাই বি-এ পাশ করেছেন!"

আমতা আমতা করে আনন্দ বলেন, "কিন্তু ওঁর হাতের মিষ্টি 'চা' না খেলে গল্প জমেনা ভাল, শুকনো পেটে প্রগতি টেঁকেনা বেশীক্ষণ।"

ডুবে যাক—মিষ্টি চা খেলেই তোমার চলবে তা জানি, কিন্তু—"

"হ্যাঁ আমি এবার উঠি তা হলে—"বলে আনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বিমলার তীব্র দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করলেন।

লতিকা মৃদু হেসে বললে: "চলুন আপনাকে দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি—"

ক্ষণেকের জন্য বিমলার কালো মুখ লাল হয়ে উঠল, মুহূর্ত্তের জন্য গোল চক্ষু দুটি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হোল। মিহির সে সময় তার রুমাল দিয়ে ঘন ঘন মুখ মুছতে লাগল। লতিকা প্রায় ১৫ মিনিট পরে ঘরে ফিরে এল। বিমলা প্রস্তাব করলেন, লেকের ধারে হাওয়া খেতে গেলে বেশ হয়। লতিকা মাথা ধরার অজুহাতে সে প্রস্তাবে রাজী হোল না, "চলুন আমরা দুজনেই তবে যাই, সময়টা কাটবে ভাল।"

বিমলা কটাক্ষে একবার লতিকাকে দেখে নিয়ে বললেন, "পথ থেকে কি মিঃ বসুকে ডেকে দেব মিসেস ভাদুড়ী, তাতে আপনার মাথা ধরা সারবার কিছু সাহায্য হতে পারবে—"আলস্য ভরে আরাম কেদারায় পা এলিয়ে দিয়ে লতিকা বললে, "তাই না হয় দেবেন···সত্যি কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব—"

মিহির ও বিমলা প্রস্থান করলেন। লতিকার রুদ্ধ হাসি এতক্ষণে বাঁধ ভাংল।

মিহির উপন্যাসখানা খুব মন দিয়ে পড়ে। "বিমলা দেবীর নারীর জীবন খুব ভাল লাগছে বুঝি?"—লতিকা মিহিরের বইখানার ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করে। বিরক্ত স্বরে মিহির বলে, "আঃ ব্যস্ত কর না—" অভিমানে লতিকার ঠোঁট কাঁপতে থাকে। বিমলা দেবীর ওপর রুদ্ধ রাগ তার দ্বিগুণরূপে বৃদ্ধি পায়। এতদিন পরে সে মনের কথাটা বলে ফেলে:

"দেখ তোমার বাড়াবাড়িটা আমি আর সহ্য করতে পারছি না!"

গম্ভীরমুখে মিহির বললে, "আমিও ওই অভিযোগ করতে পারি মনে রেখ—"

চক্ষু বিস্ফারিত করে লতিকা বলে, "মানে!"

"মানে, মিঃ বোসের সঙ্গে মাথামাখিটা তুমি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ—"

"কি বলছ তুমি! আমি মাত্রা ছাড়িয়েছি, না শুধু মিসেস বোসকে জব্দ করবার জন্যে অভিনয় করেছি!"

মিহির ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থাকে; হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল: "সত্যি? আমি যে তোমায় ভুল বুঝে তোমারই মতন উল্টো পথ ধরেছিলুম—"

লজ্জায় লতিকার মুখ টুকটুকে লাল হয়ে উঠল। অনেকদিন পরে দুজনে যেন দুজনকে কাছে পেলে!

মিহির বললে: "উঃ কি ভুলটাই আমরা করেছিলুম লতি! কিন্তু জিত আমাদেরই—কি বল? হার হয়েছে বসু দম্পতির—"

লতিকা স্বামীর হাতখানি মুঠার মধ্যে নিয়ে বললে, "সত্যি, কি ভয়টাই হয়েছিল আমার!"

ঐকত্রিক ভোজন বা জাতীয়তা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

ঐকত্রিক ভোজন বা পংক্তি ভোজনের কথা উঠিলেই বৈষ্ণবদিগের মহোৎসবের কথা মনে আসে। মহোৎসব দৈনন্দিন ব্যাপার নহে, কোন পর্ব্বোপলক্ষে কিম্বা বিশেষ কারণে ধর্ম্মমণ্ডলীর অসাম্প্রদায়িক ভোজনকে ঐকত্রিক ভোজন বা পংক্তি ভোজন বলা যায়। বস্তুতঃ য়ুরোপীয় ঐকত্রিক ভোজনের নিত্য নৈমিত্তিক আবহাওয়া আমাদের দেশে কোনও কালে ছিল না। সুদূর ঐতিহাসিক যুগে ফিরিয়া আসিলে দেখিতে পাই, বৌদ্ধমন্দিরে বা সংঘে আশ্রমবাসীদের একত্র ভোজনের আদর্শ ব্যতীত সামাজিক নরনারীদের মধ্যে ঐকত্রিক ভোজনের কথা জানিতে পারা যায় না। বৌদ্ধমন্দিরের ঐকত্রিক ভোজনের ধারা এখনও কোন কোনও স্থানে জীবন্মৃত ভাবে বাঁচিয়া আছে। ইহার পরে ঐকত্রিক ভোজনের পরিচয় শিখদিগের লঙ্গরখানায় ইতিহাসে। নবম গুরু তেগ্‌বাহাদুরের মৃত্যুর পরে যে সকল শিখ গুরুগোবিন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিল তাহারা খালসা নামে পরিচিত। দশম গুরু দেখিলেন, শিখদিগের ধর্ম্মসংঘকে জীবন্ত রাখিয়া বৈদেশিক রাজন্যদিগের স্বেচ্ছাচারীর বিরুদ্ধে বাঁচিতে হইলে সমস্ত শিখদিগকে একপ্রাণ, একমন ও এক জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। এইজন্য তিনি শস্যপূর্ণ সমতল ভূখণ্ড ছাড়িয়া অনুন্নত শিবালের সহিত পর্ব্বতের অভ্যন্তরে দুর্গমদেশে চলিয়া গেলেন। তিনি সকলের মধ্যে একতা আনিবার জন্য সাধারণ রন্ধনশালার ব্যবস্থা

করিলেন। তখন শিখদের মধ্যে ভারতীয় সকল ধর্মের শিষ্য ব্যতীত বৈদেশিক মুসলমান শিষ্যও ছিল। যাহাতে পূর্ব্বের আশ্রমের বিভেদ নূতন ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে সংক্রামিত না হয় সেই জন্য সাধারণ রন্ধনশালায় সকলের প্রবেশ বাধ্যতামূলক এবং আহার্য্য রন্ধনপাত্র সকলেই একবার করিয়া নাড়িয়া দিবেন ইহা নিয়ম করিলেন।

সাধারণ্যে পরিচয় দেওয়ার জন্য সকলের উপাধি হইল সিংহ। ধর্ম্মে, ব্যবহারে ও আচারে এই একত্ব হইতে শিখজাতির মধ্যে যে বীর্য্যের সৃষ্টি হইল তাহা সকলেই অবগত আছেন। বৌদ্ধ ও শিখের এই ঐকত্রিক ভোজনের আদর্শ ক্রমে সকল ভারতীয় অগ্রগতিমূলক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আদর্শ হইলেও দৈনন্দিন জীবনে ইহা গৃহীত হয় নাই। এমন কি চৈতন্যদেব ধর্ম্মে ও সামাজিকতায় এক দারুণ বিপ্লবী যুগের সৃষ্টি করিলেও তাঁহার প্রিয় শিষ্য অনুশিষ্যগণের মধ্যে প্রিয়তম যবন হরিদাসকে অন্যান্য শিষ্যের সহিত সামাজিক ভোজের সময় একত্র বসাইতে সমর্থ হন নাই।

পুরাকালে নগরে বাজারে, কিম্বা রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী উল্লেখযোগ্য স্থানে চটী বা সরাই থাকিত। এই সকল স্থানে আজকাল যেরূপ ভোজনালয় থাকে পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না, সকল চটীতেই আহার্য্যদ্রব্য ও তৈজসপত্র ভাড়া মিলিত। যাত্রীগণ নিজনিজ ব্যবস্থা করিয়া লইতেন। ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির রন্ধনের জন্য পৃথক পৃথক রান্নাঘর থাকিত। একমাত্র মুসলমান বিজয়ের পরে মুসলমানদের জন্য সরাইখানায় খানাপিনার ব্যবস্থা হইয়াছিল, সাধারণ হিন্দু এই প্রথা যাবনিক দোষ দুষ্ট বলিয়া গ্রহণ করে নাই। পরন্তু ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে স্বপাক আহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় একই বংশের মধ্যে একত্রভোজন অচল। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত বেশী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণ আলাদা আলাদা খাওয়া এবং পৃথক পৃথক চলা ফেরা করা। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, অতীতযুগ হইতে ভারতীয় হিন্দু স্বতন্ত্র রাজবংশের জন্য বহু সংগ্রাম করিয়াছে কিন্তু সমগ্রভাবে জাতীয়তার স্বপ্ন কখনও দেখে নাই। একই কারণে হিন্দু রাজন্য ও সেনানীগণ ব্যক্তিগত ভাবে বহু বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করিয়াও সমবেত প্রচেষ্টার অভাবে সাধারণ বৈদেশিক প্লাবন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার উল্লিখিত বহুবিধ কারণের মধ্যে ধর্ম্মে বিভিন্নতা, জাতিতে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বসনে আহারে পার্থক্য প্রধানতম কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। একদেশ, একধর্ম্ম, একসংঘের কল্পনা মহান সম্রাট অশোকের সময় জন্মলাভ করিলেও তাঁহার তিরোভাবের পরে বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই এবং মহান অশোকের সর্ব্বস্বত্যাগমূলক নেতিবাচক আদর্শ সংসারী মানুষের মধ্যে বিকৃত হইয়া জাতীয় ক্ষাত্রশক্তির অবনতির কারণ হইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা, মিশর কিম্বা পারসীক সভ্যতার ন্যায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। তাহার কারণ ভারতীয় সভ্যতার জীবন কাঠি তাহার গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে দৃঢ়মূল হইয়াছে। গৃহের অচ্ছেদ্যবন্ধন গ্রামীণ সভ্যতাকে সকল রকম নাগরিক ও বৈদেশিক প্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতায় ক্ষুদ্র গৃহ ক্রমে পরিচয় লাভ করিয়া পরিবার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, আবার কতকগুলি পরিবার ক্রমে প্রবর, প্রবর ক্রমে গোত্র রচনা করিয়াছে। এই ধারা আজও কোন অতীত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। রণঝঞ্ঝা, বৈদেশিক প্লাবন, ধর্ম্মান্দোলন, এই গ্রাম্য গোষ্ঠীকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিলেও ঝড়রাতের পরে শান্ত স্নিগ্ধ উষার ন্যায় আবার জোড়াতালি দেওয়া গোষ্ঠী নূতন নূতন রূপে আবির্ভূত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার গ্রামীণ সভ্যতা ও পারিবারিক রন্ধনশালার প্রভাব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। সকল দেশে সর্ব্বযুগেই পারিবারিক রন্ধনশালা গ্রামীণ সভ্যতায় এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পরিবারস্থ সকল নারীর মিলনক্ষেত্র এই রন্ধনশালা। ভারতীয় নারী তাঁহার সেবাধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সুযোগ পাইয়া থাকেন এই জায়গায়। সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সংসারের সকল কাজের কেন্দ্র এই রান্নাঘর। কর্ম্মক্লান্ত পুরুষের "ক্লাবঘর" অন্দর গৃহের এই নগণ্য অংশে। নববধূ স্বামিগৃহে প্রবেশের পরেই পাকস্পর্শের মধ্য দিয়া শ্বশুর গৃহের আত্মীয় পরিজনের মধ্যে সামাজিকভাবে গৃহীত হইবার প্রথার কারণ এইখানে। এইরূপে রান্নাঘর পরিবারের পিতাপুত্র, ভ্রাতাভগ্নী ও আত্মীয় স্বজনের মনোবিকলনের স্থান পূর্ণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সভ্যতায় মনকে গ্রামছাড়া সহরমুখো করা সত্ত্বেও রন্ধনশালার সুস্থ আবহাওয়া পারিবারিক মিলনের ভারকেন্দ্ররূপে বর্ত্তমান। "গুড-আর্থের" লেখিকা পার্লবাকের প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারা যায়, সাধারণ আমেরিকান সমাজ ও জাতীয় জীবনে নিজস্ব বাড়ী ও রান্নাঘরের প্রচণ্ড প্রভাব বিদ্যমান। ভারত অথবা চীনদেশের ন্যায় ভৃত্য রাখা সাধারণ আমেরিকান জীবনে শুধু সাধ্যাতীত নহে, পারিবারিক ভৃত্যতন্ত্র আমেরিকান সভ্যতায় বিরোধী আদর্শ। ইহা সত্ত্বেও গৃহে প্রাতঃকালীন ভোজন কিম্বা রাত্রির আহারের ব্যবস্থা গৃহস্থ আমেরিকান সভ্যতায় একটা প্রয়োজনীয় বিলাসিতা। ঐ দেশে মেয়ে পুরুষ সকলেই কাজ করে বলিয়া প্রাতঃকালীন আহারের পরেই যে যাহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া যায়; কাজেই দুপুরের খাওয়া কার্য্যস্থলের সংলগ্ন "ক্যান্টিন" কিম্বা হোটেলে সারিয়া লইতে হয়। তারপরে কাজের শেষে যে যাঁহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন, বাড়ীর গৃহিণী "ডিনার" তৈয়ারীর সময় পরিবারস্থ সকলেরই সাহায্য পাইয়া থাকেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে "Fire place এর" চারিধারে ডিনার টেবিলে "ডিনার" খাওয়া ও সকলে মিলিয়া মিশিয়া গল্পগুজব করাও একটা পারিবারিক বিলাসের মধ্যে তাঁহারা গণ্য করেন। এই সময়ে পরিবারের পিতামাতা ভ্রাতা-ভগ্নী সকলেই সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্যের বিনিময় হয়। পার্লবাক বলেন, বৃহত্তর সহরের বিলাসী নাগরিক ব্যতীত সাধারণ আমেরিকান সভ্যতাও অল্পবিস্তর গৃহমুখীন; তিনি আরও বলেন, যাহাদের বাড়ীতে ডিনারের ব্যবস্থা নাই তাহারাই ক্লাবে আড্ডা দিয়া সময় কাটাইয়া থাকে।

এই চিত্রের অপর পার্শ্বে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালী পরিবারের ভৃত্যরাজতন্ত্র সমন্বিত রন্ধনশালার কথা উপাদেয় হইতে পারে। বর্ত্তমানের রন্ধনশালার অধিষ্ঠাত্রীদেবীর—আমাদের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের জননী কিম্বা

দুনিয়ার ন্যায় এখন কোন রাঁধুনী বাবুর্চি কিম্বা খানসামার করতলগত। কাহারও ইঙ্গিতের প্রাধান্য অনুযায়ী ব্রজভানু কিম্বা পুত্তলির চতুঃপার্শ্বে কোনরূপে ঘুরাইলেই তিনি পারদর্শী রাঁধুনী বলিয়া স্বীকৃত। স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসা কেন্দ্রচ্যুত হওয়ায় পারিবারিক জীবনের ভারসাম্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইদানীং অনেক পরিবারেই শোনা যায়, পিতাপুত্রে কদাচিৎ সাক্ষাৎ হয়। আজকালকার রান্নাঘর যেন সরকারী লঙ্গরখানা, পরিবারে যার যখন খুসী খাওয়ার কাজ সারিয়া যায়। পারিবারিক জীবনের এই ছন্নছাড়া পরানুকরণ জাতীয় জীবনকেও ভাসাভাসা করিয়া তুলিয়াছে। জাতীয় প্রাণতরঙ্গেই যখন ভাটা আসিয়া যায়, সহস্র রকম "স্লোগান" কি তখন গভীরতর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়? এই সম্বন্ধে একটী চমৎকার উপাখ্যান আছে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাতে অবস্থানকালীন একদা ডাঃ নিউম্যান সাহেবের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হন। সস্ত্রীক নিউম্যান সাহেবের সহিত আলাপ করিতেছেন এমন সময় সাহেব তাঁহার স্ত্রীকে শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে বলিয়া গৃহের বাহির হইয়া যান। কিয়ৎক্ষণ যায়, সাহেব ফিরিতেছেন না দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বিরক্তি বোধ করেন ও নিউম্যান সাহেবের অনুসন্ধান করেন। নিউম্যান পত্নী শাস্ত্রী মহাশয়কে সেই বাড়ীর উপর গাছ ডাকিয়া লইয়া দরজা ঠেলিয়া ভিতর দেখিতে অনুরোধ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় অবাক হইয়া বিস্ময়-পুলকিত-অন্তরে দেখিতে পান যে সাহেব ৪।৫টী ছেলেমেয়ের সহিত খেলা করিতেছেন একটী ছেলে সাহেবের পিঠে চড়িয়া "ঘোড়া" "ঘোড়া" খেলিতেছে। পরে তিনি নিউম্যান দম্পতির নিকটে জানিতে পারেন যে এই সময় তাঁহার সন্তানদের সহিত খেলা করিবার জন্য নির্দিষ্ট। এই খেলার মধ্য দিয়া সন্তানেরা তাহাদের সারাদিনের কাজের হিসাব ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে, তিনিও খেলার মধ্য দিয়া উৎসাহ কিম্বা প্রয়োজন হইলে ভৎর্সনা দিয়া থাকেন। এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় কি, তাহা নিশ্চয়ই বিশদ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

ইসলামীয় জাতির সহিত যুদ্ধে ভারতীয় হিন্দুর রাজনৈতিক পরাজয় হইয়াছিল কিন্তু য়ুরোপীয় সমাজের সংঘর্ষে আসিয়া আমাদের সমাজজীবনের অনিবার্য একান্নবর্ত্তী পরিবারপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে। এই পুরাতন ও নূতনের সংঘর্ষে যাহা হারাইয়াছি তাহার জন্য রোদন না করিয়া নূতনের সহিত যোগাযোগে সুস্থ সমাজজীবনের ভিত্তি গঠন করাই সকল হিতৈষীর বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন। এই বিষয়ে নূতন পৃথিবী আমেরিকা কিম্বা পুরাতন দুনিয়ার রাশিয়া যে রাশিয়া তাহার নূতন আলোর অসাধ্য সাধন করিয়াছে, এই দুই-এর কোন আদর্শ আমাদের উপযোগী ও গ্রহণীয়, তাহা বুদ্ধি সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদবোধ লইয়াই স্থির করিতে হইবে। দেখিতে গেলে আমাদের দেশের অবস্থা এখন ঠিক রাশিয়ার বিপ্লবের পূর্ব্বাবস্থা; ঘরে বাহিরে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা, শতাধিক বৎসরের দুঃশাসনের প্রকৃত আবর্জ্জনায় পথ পিচ্ছিল ও দুর্গম। সারা দেশে হাহাকার, অর্থবল ও সততার সামান্য। পঞ্চাশের মন্বন্তর আবার মাথা উঁচু করিয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় বিনা উপকরণে দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইলে চাই সাধনা, চাই সাহস। রাশিয়া ঠিক এই অবস্থায় কি করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ "রাশিয়ার চিঠিতে" তাহা ওজস্বিনীভাষায় বলিয়াছেন, "বছর দশেক আগেই এরা আমাদেরই দেশের জনমজুরদের মতোই নিরক্ষর, নিঃসহায়, নিরন্ন ছিল। তাদেরই মত অন্ধসংস্কার ও মূঢ় ধার্ম্মিকতা, দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুড়েছে, পরলোকের ভয়ে পাণ্ডাপুরুতের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারের হাতে, যারা এদের জুতা পেটা করতো তাদের সেই জুতা সাফ করা এদের কাজ ছিল...কটা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার, অক্ষমতার পাহাড় নাড়িয়ে দিলে যে কি করে—সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বলো।" বিপ্লবের পূর্ব্বে রাশিয়ার রন্ধনশালার অবস্থা আমাদের মতই ছিল। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ যেমন, রাশিয়ায় তেমনি ক্যাথলিক, ইহুদী, আর্ম্মেনিয়ান ও মুসলমান শাদা রাশিয়ান ও কালা তুর্কোমেন উজবেকের মধ্যে আমাদের দেশের চেয়ে ও বেশী মারামারি কাটাকাটি অস্পৃশ্য অনাচ্ছ ভাব ছিল। কোন যাদুমন্ত্রে ২০ বছরের মধ্যে এক দেহ এক প্রাণে শাদা রাশিয়ান কালা তাতার এক অর্দ্ধ সভ্য তুর্কোমেন নগণ্য মুচির বংশে জাত ককেশীয়ান স্তালিনের নেতৃত্বে তাজা রক্ত দিয়া স্তালিনগ্রাদ রচনা করিল তাহাও কি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়া পথ কি, তাহা বুঝাইয়া দিবে না? সত্যই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "রাশিয়ার সমস্ত দেশ প্রদেশকে, জাতি উপজাতিকে সক্ষম ও শিক্ষিত করে তোলবার জন্য এত বড়ো সর্ব্বব্যাপী অসামান্য অক্লান্ত উদ্যোগ আমাদের মতো ব্রিটিশ সাবজেক্টের সুদূর কল্পনার অতীত। এতটা দূর পর্য্যন্ত হোতে যে সম্ভব এখানে আসবার আগে কখনো আমি তা মনেও করতে পারি নাই।" উপরে উদ্ধৃত কবির পথ নির্দ্দেশ আমাদের সর্ব্বযুগের কর্ম্মিদের আরাধ্য বস্তু। রান্না ঘরের সহিত একটী জাতির উত্থান ও পতন কতদূর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাহা নিম্নের ঐতিহাসিক ঘটনায় অনেকটা পরিষ্কার হইবে।

সে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বের কথা, পাণিপথের প্রান্তরে ভারতের ভাগ্য পুনরায় পরীক্ষা হইতেছে। উত্তর ভারতের অধিকাংশ মুসলমান রাজন্যমণ্ডলী আফগানিস্তানের আহম্মদশাহ আবদালীকে হিন্দুস্থানের "হিন্দু পদ-পাদশাহী" আদর্শের গৌরব ম্লান করিবার জন্য পঞ্চমবার আমন্ত্রণ করিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ হিন্দু শক্তি পেশোয়া বালাজী বাজীরাও-এর পাদশাহী ছাতার বিপুল সাহসের সহিত দণ্ডায়মান, পুরাতন পাণিপথে পুরাতন ইতিহাসের নূতন অধ্যায় রচিত হইল। প্রথম দিনের যুদ্ধে ভীষণ ভাবে পর্য্যুদস্ত আহম্মদশাহ আবদালী পাণিপথের অদূরে একটি টিলার উপরে বৈকালীন উপাসনা সাঙ্গ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করিতেছিলেন, হঠাৎ নীচ হইতে উত্থিত ধূম্র কুণ্ডলীর দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত হয়। বিখ্যাত রোহিলাপতির নিকট হইতে জানিতে পারেন যে মারাঠা শিবিরের বিভিন্ন রন্ধনশালায় ধূম আকাশে উত্থিত হইয়া এক বিরাট ধূম্রকুণ্ডলী সৃষ্টি করিয়াছে। শিবিরের সর্ব্বস্থান হইতে ধূম্র উঠিবার কারণ অনুসন্ধানে তিনি জানিলেন মারাঠা দলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর

রাজপুত, জাঠ, মারাঠা জাতীয় মারাঠা এবং পাঠান, তুরানী ও বিজাপুরী মুসলমানের অবস্থিতির জন্য সকল বৃহ বাবস্থা স্থাপন করিতে হইয়াছে। আহম্মদশাহ অস্থির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, খোদাকে ধন্যবাদ, মৃত্যুর দুয়ারে আসিয়াও যাহারা বুকে বুক মিলাইতে পারে নাই, অশুচি ও অস্পৃশ্য দুই অন্তঃকরণের মাঝখানে বাসা বাঁধিয়াছে, পরাজয় তাহাদের অনিবার্য্য। পরদিন যেন ঐশ্বরিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ আফগানী সৈন্য মারাঠার গতিরোধ করিয়া তাহার খাদ্য ও জল সরবরাহের পথ বন্ধ করিল। বিপুল শক্তিতে ও বিনা খাদ্যে মারাঠার ২ লক্ষ সৈনিক সেনাপতি সদাশিবরাও, বিশ্বাসরাও এবং ইব্রাহিম খাঁর সহিত বীরের কাম্য মৃত্যুশয্যা রচনা করিয়াও বিজয়লক্ষ্মী অঙ্কশায়িনী করিতে অসমর্থ হইলেন।

আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে স্বামী বিবেকানন্দ ছুৎমার্গ সম্বন্ধে বলিতেছেন "কেবল ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না, ধর্ম্ম ঢুকেছে তোদের রান্না ঘরের হাঁড়ির ভিতরে, আসলে তোরা নিজেরাই আচারভ্রষ্ট আচার-ভ্রষ্টের আবার ধর্ম্ম কি? পরিষ্কার রাঁধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই, পরিষ্কার মনোরম পাত্রে পরিষ্কার স্থানে খাওয়া চাই—কিন্তু এই কথা শুনবে কে? গলী গলী গোরস ফিরে মদিরা বৈঠি বিকায়। সতীকো ধোতী না মিলে কস্‌বিন্ পহিনে খাস।" *

এখন ব্যক্তিগত রান্নাঘরের অর্থনৈতিক দিকের আলোচনা করা যাউক। পুরাকালের ধনধান্যে ভরা বাংলা দেশ এখন ঐতিহাসিক বস্তু। উঠান ভরা গোলা, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ কবে ছিল এবং সত্যিই ছিল কিনা, ভবিষ্যৎ সন্তানদের ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার বিষয়। আমাদের সামনে প্রশ্ন এই যে, বাংলা দেশে যে খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয় তাহাতে আমাদের চলে না। এতকাল বর্ম্মা মুলুকের চাউল আসায় এই নিষ্ঠুর সত্য নাকি আমাদের অজানা ছিল। ১৩৫০ সালের মন্বন্তরে ৫০ লক্ষ ভাই বোনের জীবন্ত আহুতিতে এবং বর্ত্তমানের ঘন ঘন সরকারী ঘোষণা সত্ত্বেও মৃত্যুর করাল জিহ্বার লক্‌লকে চাহনীর চরম তথ্য বুঝিতে খুব অসুবিধা হইতেছে না।

ভাবী কালের নরনারী বিশ্বাস করুক আর নাই করুক দেশের খাদ্যের এই দুরবস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও ছিল না। বাংলার মানচিত্রের দিকে তুলনামূলক দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, গত ৫০ বৎসরের মধ্যে উত্তর মধ্য ও পশ্চিম বাংলার নদ নদীর কত পরিবর্ত্তন। উত্তরে ত্রিস্রোতার জলধারা আত্রেয়ী, করতোয়া, মহানন্দা, পুনর্ভবা প্রভৃতি নদ নদীর মাতৃস্তন্য স্বরূপ ছিল, আর এই মাতৃস্তন্যে পুষ্ট বরেন্দ্র ভূমি ধন ধান্যে মৎস্য ও স্বাস্থ্যে জমজমাট ছিল। বারংবার ভূমিকম্পে ও ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে ত্রিস্রোতার বারিরাশি ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া যমুনার পথে পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে বরেন্দ্রের নদ নদী মৃতকল্প হইয়া পড়ে। * কোথায় বিলীন হইল রাঢ় দেশের ত্রিবেণীর ত্রিধারা, শুধু ভাগীরথী কেবল সাক্ষ্য দিবার জন্য হাজির। অথচ বঙ্কিমবাবুর জীবন কালেও ত্রিবেণীর অদূরে পাণ্ডুয়া, সপ্তগ্রাম সুখ স্বাস্থ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রতাপাদিত্য, সীতারাম ও কৃষ্ণচন্দ্রের শস্য শ্যামলা মধ্য বঙ্গ মৃত নদনদী, খাল বিল এবং অরণ্যসঙ্কুল হিংস্র শ্বাপদের আবাসভূমি। প্রাতঃস্মরণীয় বীর ভুঁইয়াদের বাস্তু ভূমি আজ ম্যালেরিয়া ও মহামারীতে আচ্ছন্ন। যে কারণেই হউক বাংলার এই চেহারা শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হওয়ার আশা নাই। রাশিয়ার মতন জবরদস্ত সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইলেও শত বর্ষের পঙ্কোদ্ধার করিতে খুব কম দশ বিশ বৎসরের সুতীব্র সাধনা প্রয়োজন। মন্বন্তর কি এই দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া পথ চলার সাথী হইয়া থাকিবে? বাঁচিতে হইলে যে খাদ্যদ্রব্য এখনও এই দেশে উৎপন্ন হয় তাহা প্রয়োজন অনুযায়ী সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। খাদ্য স্বল্প কিম্বা প্রাচুর্য্য দুই কারণেই মানুষের জীবনহানি দ্রুততর হয়। নিয়মিত স্বল্পাহারে জীবনী শক্তির অপচয় না হইয়া দীর্ঘ হইবার সাক্ষ্য আমাদের দেশের নৈষ্ঠিক বিধবা-দিগকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

(আগামীবারে সমাপ্য)

* গলিতে গলিতে দুগ্ধ ফিরি করিতে হয়, কিন্তু সুরা এক স্থানে বসিয়াই বিক্রয় হয়। সতী নারীর পরিধানের বস্ত্র জোটে না, অসতী সুবেশ পরিধান করে, ধন্য কলি যুগের প্রভাব— মহাত্মা তুলসীদাস।

* ১৭৬৪ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রেণেল সাহেব সার্ভে করিয়া এক মানচিত্র প্রস্তুত করেন। তাহাতে বর্ত্তমান প্রবলা যমুনা নদীর পরিবর্ত্তে এক ক্ষুদ্র নামহীন স্রোতস্বতীর অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরের উঠান ও দালান। উঠানের উপর নিস্তারিণী আসিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও না দেখিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—

নিস্তারিণী। কই গো বাছা, মেয়েরা সব গেলে কোথা? ও মা, এরা কি আবার ঘুমোলো নাকি? , আর ঐ ছোঁড়ার ওদিকে ঘুম হচ্ছে না। কী বেহায়াই হয়েছে সব। কোথায় গো, অ মেয়ে—

অনুরাধার প্রবেশ

অনুরাধা। কে গো? কাকে খুঁজছ? দিদিকে?

নিস্তারিণী। এই মেয়ে বুঝি? অ মা, এ যে বেশ কালো মেয়ে গো। তুমিই তো কর্ত্তার ছোট মেয়ে?

অনুরাধা। (সবিস্ময়ে) হ্যাঁ, তুমি কাকে খুঁজছ?

নিস্তারিণী। না বাছা, খুঁজব আবার কাকে? আমাকেই লোকে

খুঁজে পায় না। দেখি গো, অ মেয়ে, একবার পেছন ফিরে দাঁড়াও তো মা।

অনুরাধা। (আরও বিস্মিত হইয়া) কেন ?

নিস্তারিণী। যা বলচি শোনো না মা। চুলটা খুলে দাও দিকি—

অনুরাধা। চুল খুলে দেব ? কেন ? চুল খুলব কেন হঠাৎ ?

রাধা। (নেপথ্য হইতে) কার সঙ্গে কথা কইছিস রে অনু ? (প্রবেশ করিয়া) কে ?

অনুরাধা। (কাছে গিয়া চুপি চুপি) কী জানি দিদি, পাগল না কী, বলে চুল খুলে পেছন ফিরে—

রাধা। থাম। তুমি কে গা ?

নিস্তারিণী। (এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাধাকে নিরীক্ষণ করিয়া) তুমিই বড় বোন ? এস মা। আর মা, তোমরা আর নিস্তারিণীকে দেখলেই বা কবে, আর চিনবেই বা কোত্থেকে বল ? মা বুঝি নেই ? আহা ! তা বেশ গেছে মাগী, সোয়ামীকে রেখে বেঠের তোমাদের রেখে গেছে ড্যাংডেঙিয়ে, বেশ গেছে। ভাই বোন তো আর নেই। কে আছে আর বাড়ীতে ?

রাধা। বাবা আছেন, আর কেউ নেই। কিন্তু তোমাকে—আপনাকে—

নিস্তারিণী। (দালানের উপর উঠিয়া হাতের বাক্স রাখিল, রাধা একখানা আসন দিল, আসনে বসিয়া বলিল) এই দুটি বোনে একলাটি থাক ? আহা ! তবে তোমার সঙ্গেই কথা কই মা। হাজার ছেলে মানুষ হও, তবু বড় বোন তো বটে। মা মাসীপিসী নেই ঘরে, বাপের তো ঐ অবস্থা, এখন ছোট বোনের বে তোমারই দায় বই কি। যাও মা, তুমি যাও এখান থেকে। নেকা-পড়া কর গে যাও। নিজের বে'র কতা কি নিজেকে দাঁড়িয়ে শুনতে আছে ? তা নেই। যতই ইংরিজি মিংরিজি পড় মা, শাস্তর বলে একটা কতা আছে। বাঙ্গালীর মেয়ের যা নেম্‌কম্ম—' কী বল গো মেয়ে ?

অনুরাধা প্রস্থান করিল। তাহার দিকে চাহিয়া—

এ যে দিব্যি বড় হয়ে উঠেছে মা। পেছন থেকে দেখলে কে বলবে—, এ যেন—(চোখ ফিরাইয়া) থাক্। বল বোনের বে'র ব্যবস্থা কী করছ গো ? এইবার দেখে শুনে যার হোক হাতে গছিয়ে দাও। বলে বাঙ্গালীর মেয়ে, কুড়ি পেরোলেই বুড়ি।

রাধা। হ্যাঁ, বিয়ে এইবার দিতে হবে বই কি।

নিস্তারিণী ইতিমধ্যে টিনের বাক্স খুলিয়া নানা আকারের নানা রঙের পাকানো ও ভাঁজ করা কাগজের রাশি বাহির করিতেছে।

নিস্তারিণী। হবেই তো মা। আর দেরি করা কি চলে ? একটা দিন চলে না। থাকতো মা, তো তার গলা দিয়ে ভাত উঠতো না মেয়ের পানে চাইলে। বাপ পুরুষ মানুষ, তার কি আর অত হুঁশ হয়।

রাধা। বাবার বড় অসুখ কি না।

নিস্তারিণী। আহা, তা আর জানি না। আমি সব খবর রাকি মা। কত্তার অসুখ শুনেই আরও ছুটে এনু যে। বলি বুড়োমানুষ, নিজের ব্যামোর কথা ভাববে, না মেয়ে পারের কথা ভাববে ? আর, আমি বলি শোনো, হাজার হোক বাপের পেরাণ তো, ঐ অত বড় মেয়ের পানে চাইচে আর বুকের রক্ত ভেবায় হিম হয়ে যাচ্ছে। আমি কি বুঝি না ? অসুখ করবে না ? কেবল মেয়ের চিন্তে করেই অসুখ, বুঝলে ? আর কিছু না।

নিস্তারিণী যে অর্থে বলিল সে অর্থ মিথ্যা বলিয়া রাধা প্রতিবাদ করিতে চাহিল, কিন্তু অন্য দিকে কথাটা কত নির্মম ভাবে সত্য, তাহা বুঝিয়া সে প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

রাধা। না, তা,—বাবা ভালই ছিলেন। হঠাৎ ক'দিন—

নিস্তারিণী। ও সব জানি মা, সব জানি। এই করে করে, এই নোকের কন্তেদায় দেখে দেখে মাথার চুল পাকালুম। ও কি কম জ্বালা মা ? লজ্জায় ঘেন্নায় মানুষে গলায় দড়ি দেয়, তা অসুখ ! তুমি ছেলে মানুষ, তোমার কাছে আর কী বলব বল। থাক, এই বলি শোনো, কোনো চিন্তে কোরো না। খুব ভাল ভাল ছেলে আছে আমার হাতে। কত্তাকে আমি সব বলে করে নিশ্চিন্দি করে তবে যাব। কোনো চিন্তে নেই। আহা, বুড়ো মানুষ, মরেও শান্তি পাবে।

রাধা। (এই অকল্যাণের কথায় অস্বস্তি বোধ করিল) না, না, বাবা ভাল আছেন অনেকটা।

নিস্তারিণী। ভাল থাকবে বই কি। আমি যখন এসেচি। (কাগজ খুলিতে খুলিতে) ছেলে সব রকমই আছে, রাজকন্তের জন্তে রাজপুত্তুর আছে, মন্তির কন্তের জন্তে মন্তির পুত্তুর আছে। ছেলে কি একটা। উকীল ছেলে বল, ডাক্তার ছেলে বল, ব্যালিষ্টার ছেলে বল,—ঐ যে বলুম যেমন গুড় ঢালবে তেমনি মিষ্টি হবে। দেখ তো মা, এই কাগজটায় কী নিকেছে, জমিদারের ছেলে, এক ছেলে—, এই দেখ—

রাধা। ও থাক, ঘটক ঠাকরুণ, অত বড়লোকে কাজ নেই। আমাদের জানাশোনা একটি ছেলে—

নিস্তারিণী। ঠিক বলেছ মা। বড়নোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করে সুখ নেই। তা আছে, জানাশোনা ছেলেও আছে। যেমন কত্তার ছেলে নেই তেমনি ছেলের মতন, বাড়ীর কাছটিতে হবে, ছুট্ বলতে আসবে যাবে, এই তো ? তা আছে,—এইটে ধর—এই নাও। (রাধা লইল না, তখন নিজেই চশমা বাহির করিয়া চোখে লাগাইয়া পড়িতে লাগিল) দোগাছি, ৺সত্যরাম গাঙ্গুলীর—, উঁহু, এটা কেন। এই যে, এইটে—(আর একটা কাগজ বাহির করিয়া) নন্দ—নন্দরাণী—দূর, দূর। চোখে ঠাহর নেই, আর কী পারি মা। কী করব, নোকে তো ছাড়ে না। (বলিতে বলিতে আর একটি কাগজ বাহির করিয়া) এই পেয়েচি। এই যে—পিতে হরমোহন দে, পিতেমো নন্দলাল দে, পাত্তর পাঁচকড়ি দে—

রাধা। পাঁচকড়ি ?

নিস্তারিণী। জানবে বৈ কি মা। জানাশোনা ঘর তোমাদের। মস্ত বড় ঘর মা, সাতক্ষীরের ঘোষেদের দৌত্তুর। মস্ত চক মিলোনো বাড়ী দেশে, দোল-দুর্গোচ্ছব সব ছিল, জমিদার বল্লেই হয়—

রাধা। আমরা গরীব মানুষ, ঘটক ঠাকরুণ, ও থাক।

নিস্তারিণী। তার জন্তে আটকাবে না মা, তার জন্তে কিছু আটকাবে না। তবে আর নিস্তার বামনী কিসের তরে রয়েছে? অতি সজ্জন লোক। আর আমাকে ভারি মান্তি করে।

রাধা। বাবার অসুখ এখন—

নিস্তারিণী। সে আমি যদি বলি তাহলে খালি পুরুতটি আর নাপতেটি নিয়ে এসে তোমাদের দায় উদ্ধার করে দিয়ে যাবে, কোনো গোলমাল করবে না। বাপ মস্ত কম্ম করে কোম্পানীর আপিসে, এইবার ছেলেকে বসিয়ে প্যান্সন্ নেবে—

রাধা। আমরা ও ছেলেকে—

নিস্তারিণী। ছেলে বলে ছেলে? খাসা ছেলে, যেমন চেহারা, তেমনি স্বভাব চরিত্তির। কাছে পিঠে, এই তোমাদের পাড়াতেই ঐ যে মোড়ের মাথায়—

রাধা। না ঘটকঠাকরুণ, ও ছেলের সঙ্গে আমরা দিতে পারব না।

নিস্তারিণী। খুব পারবে মা। তবে আর নিস্তার বাম্'ন মাঝখানে দাঁড়িয়েছে কেন? দেওয়া থোওয়া, সে যেমনটি আমি বলে দেব, বুঝলে? কত্তা কথাটি কইবে না। ছেলে বিয়ে করতে চায় না, অনেক বলে—

রাধা। ও ছেলেকে আমরা চিনি ও ছেলে ভাল নয়।

নিস্তারিণী। ও ছেলে ভাল নয়? ও মা—

রাধা। না, ও ছেলের স্বভাব ভাল নয়। ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়ের দিকে—যাক সে কথা। ও ছেলের সঙ্গে আমরা বিয়ে দেব না। তোমাকে বুঝি ওই পাঠিয়েছে? বলে দিও, হবে না।

নিস্তারিণী। মস্ত বড়লোক, কোনও চাল নেই, বাপ বড় চাপা, তাই অমন সাদাসিধে রকম থাকে। আমি বলছি—

রাধা। হোক বড়লোক, রাজা হলেও ওর হাতে মেয়ে দেব না আমরা।

নিস্তারিণী। মেয়ে দেবে না? তবে আর কী বলব বল। তা বেশ, তবে অন্ত ছেলের কথাই বলি—

রাধা। না ঘটকঠাকরুণ ছেলে একটি ঠিক করা আছে—

নিস্তারের আর সহ্য হইল না। সে চিবাইয়া চিবাইয়া বলিল—

নিস্তারিণী। ঠিক করা আছে; নয়? তা ঠিক করা থাকবে না কেন মা, মেয়ে বড় হয়েছে, ইস্কুলে কালেজে পড়ছে, পুরুষমানুষকে ধাক্কা মেরে বুক চিতিয়ে টেরামে বাসে উঠছে, ঘুরিয়ে কাপড় পরতে শিকেচে। আর ঘটক ঘটকি দরকার নেই, নিজেরাই কত্তা। ছেলে ঠিক করবে না কেন বল?

রাধা। (বিরক্ত হইয়া) কী বলছ তুমি ঘটকঠাকরুণ?

নিস্তারিণী। না, বলছি এ ছেলে তাহলে চলবে না?

রাধা। না।

নিস্তারিণী। তা বেশ মা। তবে বুড়ো মানুষের কথা যদি শোনো, যেখানে ঠিক করেছ তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও, বুঝলে? কতই দেখলুম আরও কতই দেখব। আমি আজকের নয়। এই দেখ না, ঐ দর্জিপাড়া,—না শ্যামবাজারের এটুর্নি আমার কাছে নিত্যি লোক পাঠা চ্ছ, বলে এই মাসেই ছেলের বে দিয়ে দাও নিস্তার। কেন গো? এত তাড়া কেন? না, কোথায় নাকি কাদের মেয়ের সঙ্গে ভাবসাব করেছে, কে জানে কী ব্যাপার—

রাধা। থাকগে, ওসব কথায় আমাদের কাজ কী?

নিস্তারিণী। কাজ আছে বলেই বলছি মা। বাজে কথা বলবার লোক নিস্তার নয়, সে কথা দেশসুদ্ধ মানুষ জানে। তা, ছেলে যাই করুক, বাপ মা শুনবে কেন ওসব হাইপাশ ভাবসাবের কথা। বাপ ডাকসাইটে এটুর্নি—কী নাম যেন, দাঁড়াও এই নাল কাগজখানা বুঝি, (পড়িয়া) পিতে অবনী বোস—

রাধা। (চমকিত হইল) অবনী বোস?

নিস্তারিণী। হ্যাঁ গো মা, এই দেখ না—

রাধা নিস্তারের হাত হইতে কাগজ লইয়া পড়িয়া দেখিল

নিস্তারিণী। ছেলের নামটা কী নিকেচে পড় তো বাছা—জয় জয় না কী?

রাধা। জয়ন্ত—

নিস্তারিণী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জয়ন্ত—। কী সব নাম রাখাই হয়েছে আজকাল যেন ভিক্ষে চাইচে। জয় হোক মা!

রাধা। এ ছেলের জন্তে তোমাকে সম্বন্ধ দেখতে বলেছে ঘটকঠাকরুণ?

নিস্তারিণী। তা না বলে আর কী করে বল বাছা। বাপ যে খবর নিয়েছে গো—সে হল এটুর্নি, নাটসায়েবের হাঁড়ীর খবর ওদের নখদপ্পনে। (হঠাৎ গলা নামাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—) সে মেয়ের বড় বোন নাকি সোয়ামীর ঘর করে না, সোমত্ত মেয়ে বাপের ঘাড়ে পড়ে আছে। সোয়ামী নাকি আসেও না, উদ্দিশও নেয় না। কী দোষ টোস দেখেছে কে জানে বাপু? একেবারে বিনিদোষে কি সোমত্ত পরিবারকে ত্যেজ্যি করে? তা পরিবারের ভ্রুক্ষেপও নেই, দিব্যি গান বাজনা, বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়ানো চেড়ানো, পাড়াশুদ্ধু লোক দেক্‌চে।

রাধা। (বিবর্ণমুখ) তুমি এখন এস ঘটকঠাকরুণ।

নিস্তারিণী। সেই দিদির বোন তো, কাজেই ছেলের বাপ বলেছে এই মাসের মধ্যে ছেলের বে দেব তবে আর কাজ। যাক্‌গে মা, পরের কথায় কাজ কী। তাহলে যে ছেলেটির কথা বলছিলুম—সে আর দেখবে না তো? বাড়ীর কাছে—আর বড় ভাল ছেলেটি মা, নইলে আমার গরজ কিসের?

রাধা। ও কথা থাক। তুমি যাও এখন—

নিস্তারিণী। তা তো যাবই মা। আমার কি আর বসে গল্প করবার সময় আছে। তবে বলছি কেন? না, তোমাদের ভালর জন্তে। মাথার ওপর মা নেই, সেই দুটো বোনের মতন তোমরাও একলা দুটি বোনে আছ। অত বড় মেয়েকে আর যার তার সঙ্গে মিশতে দিও না। বদনাম একবার হলে আর তার চারা নেই—বেটাছেলের কী বল না, সে হ'ল সোণার আংটি—

অনুরাধার প্রবেশ

অনুরাধা। দিদি, বাবা যে তোমাকে—(রাধার মুখ দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া) কী হয়েছে দিদি? কী হয়েছে তোমার?

নিস্তারিণী। কিছু হয় নি মা, কিছু হয় নি। বলছি সাবধানে থেকো, মেয়েমানুষের নামে একবার—

রাধা। কিছু হয় নি, তুমি যাও এখন ঘটকঠাকরুণ, দরকার হয় আর একদিন এসো, আজ কথা কইবার সময় নেই। আয় অনু—

অনুরাধার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

নিস্তারিণী। চঙ! ফুলের ঘায়ে মুচ্ছো যান! (কাগজগুলি গুছাইয়া বাক্সে তুলিতে তুলিতে) ছোঁড়াটা পঞ্চাশটা টাকা দেবে বলেছিল গা! কী দজ্জাল মেয়ে মা, টেরাম ভাড়ার পয়সাটাও দিলে না। আচ্ছা!

ক্রমশঃ

জওহরলাল নেহরু

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

বড় বাপের ছেলেও বড় হইয়াছে এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। সম্রাটের পুত্র সম্রাট, রাজার ছেলে রাজা, ধনবান তনয়ের ধনবান হইতে আদৌ বাধা নাই; কিন্তু প্রতিভা উত্তরাধিকার দান করে না; প্রতিভার বন্ধ্যাত্ব সর্বত্র স্বীকৃত ও প্রত্যক্ষ সত্য। প্রতিভা অত্যন্ত কৃপণ ও কঞ্জুস—তাহার হাত দিয়া জল গলে না।

আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে আমরা একটি সম্মানজনক ব্যতিক্রম দেখিতে পাইয়াছি। হিন্দুর পবিত্র তীর্থ প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গম সন্নিধানে, পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাসের ন্যায়, প্রতিভা অকৃপণ করে ও অকুণ্ঠচিত্তে উত্তরাধিকারসূত্রে সর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছে; প্রতিভা ঠাকুরাণী এখানে স্বর্ণপ্রসবিনীরূপে বন্দিতা হইয়াছেন। মনস্বী মতিলাল নেহেরুর পুত্র যশঃস্বী জওহরলাল পিতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন অথবা পুত্র গৌরবে পিতার যশোবৃদ্ধি হইয়াছে, এই প্রশ্ন আজ অনাবশ্যক হইলেও একদিন মানুষকে সনাতন ও স্বাভাবিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে এ কথা আমরা অসঙ্কোচে বিশ্বাস করি। আবার জওহরলাল ত একাকী নহেন। প্রয়াগের পুণ্যক্ষেত্রে প্রতিভারাজ্ঞীকে পুরাণের রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত যথাসর্বস্ব দান করিয়া নিঃস্ব ও রিক্ত হইতে হইয়াছিল। একা একা চুপে চুপে জওহরকে প্রতিভাসমৃদ্ধ করিয়া পলায়নের ইচ্ছাই তাঁহার ছিল; কিন্তু জওহরভগিনী বিজয়লক্ষ্মী দ্বার ধরিয়া দণ্ডায়মানা। অগত্যা কুবেরের ঐশ্বর্য্য নিঃশেষে শেষ করিয়াই প্রতিভাদেবীকে প্রয়াগ ত্যাগ করিতে হইল। জওহরলালকে 'ভারতের জওহর' আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন, আর বিশ্বের নির্য্যাতীত মানব বিজয়লক্ষ্মীকে বিজয়িনী বিজয়লক্ষ্মীর আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইয়াছে। পণ্ডিত মতিলাল যখন পুত্রকন্যার নামকরণ করিয়াছিলেন তখন প্রতিভার প্রেরণাই ভাষায় মূর্ত্ত হইয়াছিল, এ কথা বলিলে কি অন্যায় অথবা অসঙ্গত হইবে?

সোনার চামচ (এস্থলে ঝিনুক?) বলিয়া একটা কথা আছে। এলাহাবাদের আনন্দভবনের আনন্দের ধন জওহরলাল যে ঝিনুকে দুগ্ধ পান করিতেন, সেই সোনার ঝিনুকখানি হীরা-মুক্তা-মণি-মাণিক্যে মণ্ডিত ছিল। পণ্ডিত মতিলালের ধনৈশ্বর্য্য ও বিলাস ব্যসনের কাহিনী ভারতবর্ষে প্রবাদের মত চলিয়া গিয়াছিল। আনন্দভবন আনন্দেরই প্রস্রবণ এবং সংযুক্তপ্রদেশের সুধীজন নিরবধি তথায় আনন্দ সুধা পান করিয়া ধন্য হইতেন।

বিত্তশালী সমাজে প্রচলিত রীতি অনুসারে মতিলাল একমাত্র পুত্র বালক জওহরলালকে শিক্ষালাভার্থ বিলাত প্রেরণ করিলেন বটে, কিন্তু এই কার্য্যেও আনন্দভবনের বৈশিষ্ট্য এমন ভাবে ফুটিয়া উঠিল যে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বিরত হইল না। ইংলণ্ডের উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পাঠার্থীরা হ্যারোয় প্রেরিত হয়; আমাদের দেশের ধনবানগণ হ্যারো সাধারণের বহির্ভূত বলিয়া মনে করিতেন (এখনও করেন)। কিন্তু বালক বয়সে জওহরলাল সেই হ্যারোতেই প্রবিষ্ট হইলেন।

হ্যারোর বিশেষত্ব, হ্যারো উঁচু দরের পাকা সাহেব তৈয়ার করে। বলা বাহুল্য পিতা মতিলালের তাহাই ছিল অভিপ্রেত এবং প্রিয়দর্শন পুত্রেরও তাহাতে অরুচি ছিল না। ভারতের সমুন্নত এরিষ্টোক্রেসীর সহিত ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত এরিষ্টোক্রেসীর সংমিশ্রণে যে অভিনব অবদান সৃজিত হইতে চলিয়াছিল, কে তাহার গতিরোধ করিল, কিসে ও কেমন করিয়া স্রোত ভিন্নমুখে প্রধাবিত হইল তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইতে হয়। হ্যারো যখন সুকুমার জওহরকে খাঁটি ইংরাজ বানাইতেছিল, সে যে তখন অন্তরে অন্তরে ইংরাজের স্বাধীনতার বর্ণে তাহার স্বদেশ, মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে রঞ্জিত করিয়া কল্পনালোকে এক অভিনব দেশ রচনা করিতেছিল, তাহার খবর কে রাখিয়াছিল? পুরা দস্তুর সাহেব সাজিয়া সে যখন কেম্ব্রিজে ডিনার খাইতেছে, তখন কে আশা করিতে পারিয়াছিল যে তদানীন্তনকালের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দল—মডারেটদের মেরুদণ্ডহীন ভিক্ষাবৃত্তি ও দীনতায় তাহার আহারের রুচি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইয়াছিল? সেই মডারেটদল, যাহারা করযোড়ে ভিক্ষা করে, লাটবেলাটের সমীপস্থ হইয়া দেহি পদ পল্লবম্ করে, তাহাদের সহিত তাহার পিতার সহযোগ সেই বয়সেই পুত্র কর্ত্তৃক তীব্র ভাষায় নিন্দিত হয়।

পিতা মতিলালের অতুল ঐশ্বর্য্য, অমিত প্রভাব, আদালতে একচ্ছত্রাধিকার। কাজেই পুত্র জওহরলালের প্রীফের জন্য বৃক্ষতলাশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল না। হাইকোর্ট ও মক্কেল সমাজ সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিল এবং অল্পকাল মধ্যে লোকেও বুঝিল, অপাত্রে আদর অর্পিত হয় নাই। বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ সিংহ একটি মামলায় জওহরের নিকট পরাজিত হইয়া আসিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, জওহর বাপের নাম রাখিবে। সিংহ মহাশয় তখনকার দিনে এলাহাবাদের অন্যতম প্রধান এ্যাডভোকেট ছিলেন। ডক্টর স্যার রাসবিহারী ঘোষও জওহরের অত্যুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। ঘোষ সাহেবের মেজাজ ভাল ছিল না; নামজাদা উকীল ব্যারিষ্টারগণও তাঁহার সান্নিধ্য পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু জওহরের অবারিত গতি। এক সময়ে জওহরকে নিজের কাছে রাখিয়া আইন পুস্তক রচনায় ব্রতী করিবার বিশেষ আগ্রহ ঘোষ সাহেব ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

বিশাল ভারতবর্ষের প্রথম গভর্ণমেন্টের সহকারী সভাপতির সম্বন্ধেও একটা অশ্লীল উপমা প্রয়োগ করিতে হইতেছে বলিয়া আমি ঈষৎ লজ্জিত; তবে বলিয়া কহিয়া, মৌনং সম্মতি লক্ষণম্ বুঝিয়া করিতেছি এবং প্রতি-শব্দ জানা না থাকাতেই তাহা করিতেছি। পাঠিকা ঠাকুরাণী মাসিকাগ্রে

নীল শাড়ীর অঞ্চল চাপিয়া এই করছত্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইবেন এই অনুরোধ করিয়া রাখিতেছি। হুড়কো বধূর যেমন শ্বশুর ঘরে মন বসে না, স্বামীতে মন ওঠে না, সদাই পালাই পালাই ভাব, ব্যারিষ্টার জওহরেরও সেই দশা। মতিলাল ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন; মতিলালের পুত্র বলিয়া ইহা হাইকোর্টের জজেদেরও নজরে পড়িয়াছে; একজন চীফ জষ্টিশ উপদেশ বিতরণও করিয়াছেন; কিন্তু স্বভাব কি যায়? হুড়কো বধূকে কত ধর্ম্মোপদেশই ত গোষ্ঠীবর্গ দেয়; কিন্তু হুড়কো খুলিয়া পালাইতে পারিলে সে কি নিরস্ত হয়? অনেকের নিকট জওহরের আচরণ ক্ষোভের কারণ হইলেও, আজিকার বিশ্রুতকীর্ত্তি স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু কিন্তু আশার আলোক দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, জওহর রাজনীতির দিকেই ঝুঁকিয়াছে। তেজ বাহাদুর সানন্দে ইন্ধন দান করিতে লাগিলেন। যদিচ রাজনীতি তখন প্রবীণ ও বিত্তশালীগণের অবসর বিনোদনের বৃত্তিমাত্র, তথাপি জওহরের মত সুদর্শন ও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক যদি রাজনীতিতে প্রবেশ করিতে চাহে, সে ত আনন্দের কথা। তেজ বাহাদুর সভাসমিতিতে এই লাজুক, বাক্‌হীন আনাড়ীটিকে লইয়া যাইতে লাগিলেন। জওহর যদি নিতান্ত ঘরোয়া সভাতেও চক্ষু মুদিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া দশটা কথাও বলিত, তেজ বাহাদুর স্নেহবশতঃই হৌক বা উৎসাহপ্রদানোদ্দেশ্যেই হৌক, প্রশংসার প্রস্রবণ বহাইয়া দিতেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ভুল ভাঙ্গিল; তেজ বাহাদুর বুঝিলেন, বৃথা শ্রম; জওহরের প্রাণের স্পন্দন নাই। চিত্তরঞ্জন দাশও একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, জওহরের শোণিত বরফ-শীতল; তাতে না। নোয়াখালির পৈশাচিক তাণ্ডব ও বিহারের হত্যাকাণ্ডের অন্তঃস্থলে দণ্ডায়মান পণ্ডিতজীকে আমি—বিজয়রত্ন মজুমদার—আমি দেখিয়াছি, নির্ব্বাৎ, নির্ব্বিকার, নিষ্কম্প, নির্ব্বিচার! ইহা কি কোল্ড ব্লাডের লক্ষণ? না, অতলান্ত মহাসাগরের নিস্তরঙ্গ রূপ?

পাঠিকাকে এইখানে মনে করাইয়া দিতে চাহি যে আমি ১৯১২ হইতে ১৯১৫ সালের কথা বলিতেছি। গান্ধী-রাজনীতি আসিতে তখনও অনেক দেরী। তখনকার রাজনীতি বৃটিশের মন রাখা বাছা বাছা ভাল ভাল ইংরাজী শব্দ প্রয়োগদ্বারা চাকুরী বৃদ্ধি, আইন সভায় আসন বৃদ্ধি কামনা করিয়াই কর্ত্তব্যের শেষ করিত। যে লোক নাতিদীর্ঘকাল পরে বিশাল ভারতবর্ষের চিত্তে দাবানল প্রজ্জ্বলিত করিবে, স্থলে জলে অন্তরীক্ষে পর্ব্বতে প্রান্তরে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত স্বাধীনতার উদ্দীপনাময়ী সঙ্গীত লহরীতে আকাশ বাতাস ও ধরণী একই সঙ্গে প্রকম্পিত করিবে, হায় স্যার তেজ, তাহাকেই আপনি সোনার খাঁচায় বসাইয়া রাধা নামের সাধা-বুলি শিখাইতে চাহিয়াছিলেন?

মিসেস এ্যানি বেশান্তের হোম রুল লীগের ভারি বোল্ বোলা। কাশী ও প্রয়াগ কাছাকাছি অবস্থিত। মিসেস বেশান্ত আনন্দ ভবনে গমনাগমন করেন। জওহরের মনে হইল, মডারেট রাজনীতি বড় আলুনী, হোমরুল লীগে তবু কিছু পদার্থ আছে। জওহর লীগে যোগ দিলেন; শ্রীমতী বেশান্তের বড় আনন্দ। কিন্তু কিছুদিন না যাইতেই জওহরের আগ্রহের তেজ মন্দীভূত হইয়া পড়িল; অন্তর যেন তৃপ্তি পায় না। সাগর যাহার সাধনা, সরোবরে তাহার কি তৃপ্তি?

এলাহাবাদ হইতে বহুদূরে, বিহারের চম্পারণে নীলকরদিগের আবাসে এই সময়ে আগুন জ্বলিয়াছিল। এলাহাবাদ হইতে তাহার ধূমান্বিত শিখা দেখা গিয়াছিল; বুঝি তাহার উত্তাপও অনুভূত হইয়াছিল। যে অহিংস সত্যাগ্রহ একদিন আসমুদ্র হিমাচল আলোড়িত করিবে, বিহারে তাহারই অবতরণিকা। তখনকার সংবাদপত্রে দেশীয় লোকের সংবাদ বড় ছাপা হইত না (সংবাদপত্রের সংখ্যাই বা কত ছিল? আর বেশীর ভাগ পত্রই সাহেবলোগ কর্ত্তৃক পরিচালিত। তাঁহাদের নিকট দেশী লোকের মূল্যই বা কি?) বিহারের চম্পারণের সংবাদও পত্রস্থ না হইবার কথা; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসিয়া গান্ধী নামক একটি লোক ঐ চম্পারণে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্য করিয়াছে, হুজুর ধর্ম্মাবতার যেখানে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন সেইখানে গিয়াছে, এমনই তাহার—বেয়াকুফের

পণ্ডিত জহরলাল

স্পর্দ্ধা! এই অবজ্ঞদমিতব্য স্পর্দ্ধার উপর তীব্র আলোক সম্পাত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ তুচ্ছ সংবাদও সংবাদপত্রে স্থান পাইয়াছিল। শান্ত, স্নিগ্ধ, প্রিয়দর্শন ও শীতল শোণিত জওহরের অভ্যন্তরে যে অশান্ত, ক্ষুব্ধ ও অগ্নিময় জওহরটি সুপ্ত ছিল, জাগ্রত হইয়া সেই কলরব করিয়া উঠিল, এতদিন পরে এই ত মানুষ আসিয়াছে।

১৯১৬ সালের কথা। বাসন্তী রঙে রাঙা বসন্ত পঞ্চমী তিথিতে দিল্লীতে কমলার সহিত জওহরলালের বিবাহ হইল। রাজার দুলাল, বিলাত-ফেরত, প্রথামত, নবদম্পতি মধুচন্দ্র যাপন করিতে হিমালয়ে ছুটিলেন। প্রকৃতির পার্ব্বত্য বংশে উভয়ের জন্ম, পর্ব্বতের আকর্ষণ অনন্তসাধারণ; পাহাড় যেন হাতছানি দিয়া ডাকে; পর্ব্বত তাহার পার্ব্বতীয় ভাষায় কথা কহে। ১৯৪৬ সালেও দেখিয়াছি, রাষ্ট্রনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝেও তিন দিনের ছুটী মঞ্জুর করাইয়া পণ্ডিত পাহাড়ে ছুটিয়াছেন। পণ্ডিতজী

স্বয়ং আমাদের বলিয়াছেন, যে-উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে শ্যাম জাতীয় মেষ ভিন্ন কেহ অধিরোহণ করিতে পারে না, সেইখানে উঠিতেই তাহার আনন্দ। কমলারও ঐ কথা, সে'ও কাশ্মীরের কন্যা, পর্ব্বতের দুহিতা।

প্রকৃতির সুরম্য লীলানিকেতন, অসীম অনন্ত হিমাচলের অনন্তবিসর্পিত অমলধবলতুষার তরঙ্গের মাঝে ঝাউদেবদারুপরিশোভিত পিককূজনকূজিত নিকুঞ্জবনের কুঞ্জকুটীরে ফেনিলোচ্ছল যৌবনান্দোলিতহিয়া পার্ব্বত্য কপোত-কপোতীর সুখস্বপ্নের মদিরাস্রোতে কেন যে কোথা হইতে যে পঙ্কিল শৈবাল-ভাসিয়া আসে, কেন যে সদাজাগ্রত সতর্কদৃষ্টি পর্ব্বতপ্রহরীরক্ষিত শুভ্র নীলাকাশ কৃষ্ণ মেঘে ভরিয়া যায়, ক্ষণে ক্ষণে তুষারকিরীট হিমাদ্রি-শিখর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, কমলা তাহা ভাবিয়া পাইত না। আনন্দোজ্জ্বল স্বর্গরাজ্য কাহার অভিশাপে এমন মলিন হয় ভাবিয়া তাহার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিত। সে-যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া দয়িতের চিত্তবিনোদন করিতে চাহে, দুটি প্রেমসুকোমল ভুজালিঙ্গনে বাঁধিয়া নিখিল বিশ্ব ভুবাইয়া দিতে চাহে; কিন্তু কেন পারে না, কেন তাহার সকল যত্ন বিফল হয়? কমলার কল্পনাতীত সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা করিয়া কে যেন উজ্জ্বল দীপ ম্লান করিয়া দেয়! এই কচি বয়সে, নিষ্পাপ দেহে কেন এই অভিশাপ! কমলার প্রণয়দুর্গ দুর্ভেদ্য নহে, কোন্ অজ্ঞাত রন্ধ্র পথে অজ্ঞাত শত্রু আসিয়া দুঃস্বপ্নের ছায়াপাত করিয়া যায়, এ দুঃখ কমলার আমরণের। সারা জীবন কমলা এই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছে এবং হয়ত সমস্যা মীমাংসিত হইবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। তাহার স্বামীর যে "কিছুতে নাহি তোষ, সে-ও তো মহাদোষ"—আমরণ কমলা তাহার কারণ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে। এবং যেদিন কারণ সন্ধান করিতে পারিয়াছে, হায়! সেইদিনই পরপারের আহ্বান কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কমলা তাহার সোনার সংসার, বিশ্ববন্দিত বীরেন্দ্র স্বামী, নয়নানন্দ কন্যা ইন্দিরা, সব ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে! সে কথা আমি পরে বলিব।

তিলক মহারাজ গান্ধীজীকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ও পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া গান্ধীজী যেন তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ না করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ও সাফল্যমণ্ডিত সত্যাগ্রহের সংবাদে ভারতবর্ষ ভরিয়া গিয়াছে এবং সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর নামে জয়ধ্বনিতে ভারত ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে; গান্ধীজীও সভাসমিতিতে আসিতেছেন কিন্তু গুরুবাক্য লঙ্ঘন করিবার বাসনা না থাকায় নীরব দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে সেই শীর্ণ-দেহ কদাকার ব্যক্তিটিকে কেন্দ্র করিয়া বহু কল্পিত অকল্পিত, সত্য ও মিথ্যার আখ্যান মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে; কোথায়ও দেবত্ববাদ, কোথায়ও বা অবতারবাদ গড়িয়া উঠিতেছে এবং মানুষটিকে দেখিবার, তাহার কথা শুনিবার আগ্রহ দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছে; তথাপি গান্ধীজী নিঃশব্দ। পূর্ণ একবৎসর কাল গান্ধীজী ভারতের নগর নগরী গ্রাম গণ্ডগ্রাম পরিভ্রমণ করিলেন। ততদিনে বায়ু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের রাজনীতির গতি প্রকৃতি যে রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে তাহা বুঝিয়া একটি শ্রেণী বিচলিত, আর একটি শ্রেণী সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশের আম্ দরবারে খাস-দরবারে আবেদন নিবেদন 'কার্য্যকাণ্ডে' করিয়া যাঁহারা রাজনীতিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, 'বেকার' হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা বিষম বিব্রত; আর যাহারা এই কুৎসিত কৃশকায় ক্ষুদ্রদেহ মানুষটির অত্যুজ্জ্বল তীক্ষ্ণ ও তীব্র নয়ন, দৃঢ় ও কঠোর চরণক্ষেপ লক্ষ্য করিল, তাহারাই আশার আলোকে পুলকিতচিত্তে সাগ্রহে এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারে মনে মনে তাহাকেই অনুসরণ করিতে লাগিল। তরুণ জওহরলাল তাহাদেরই একজন। তারপর ভারত পরিক্রমা শেষ করিয়া মৌনস্তম্ভে যেদিন লোকটি মুখ খুলিল সেদিন ভারতবর্ষের চিন্তারাজ্যে যেন একটা প্রভঞ্জন বহিয়া গেল। লোকে সাশ্চর্য্যে ও সাতিশয় বিস্ময়ে তাহার পানে চাহিতে দেখিল, সে এক বিপর্য্যয় কাণ্ড! তাহার ভাষায় ভিক্ষুকের কাকুতি নাই; নয়নে প্রার্থীর করুণ যাচ্ঞা নাই; আবেদন কম্পিত সংযুক্ত কর তাহার নহে। গান্ধীজীর ক্ষীণ কণ্ঠ কিন্তু বজ্রকঠোর ভাষায় স্বাধিকার জ্ঞাপন করিতেছে; আরক্ত উজ্জ্বল নয়ন দাবী প্রতিষ্ঠা করিতেছে; ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে রথোপরি দণ্ডায়মান নারায়ণের ন্যায় প্রসারিতবাহু উত্তোলন করিয়া বিশাল ভারতবর্ষকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, আর দাসত্ব নয়; ওঠো, চলো। মানুষ হইয়া জন্মিয়াছ, মানুষের অধিকার অর্জ্জন করিতে হইবে, এসো।

বায়ু ছিল অনুকূল, স্রোত ছিল অনুকূল, ঘটনাপ্রবাহও আনুকূল্য করিল। প্রথম বিরাট যুদ্ধজয়ী গর্ব্বোদ্ধত বৃটিশ রাজ্য-পরিচালনায় পদে পদে ভুল করিতে লাগিল। পবিত্র ইসলামের প্রতীক খলিফার উচ্ছেদসাধন করিয়া পৃথিবীর মুসলমানকে বিরক্ত ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ভারতবর্ষের মুসলমানগণও ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন। রাউলাট আইন নাম দিয়া একটা অনাবশ্যক আইন রচনা করিয়া ভারতবর্ষের ভদ্র-সমাজকেও উত্ত্যক্ত করিল। ইহারই অব্যবহিত পরে, রাজার মুকুটে কোহিনুর সদৃশ জালিয়ানওলাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড! হুতাশনকুণ্ডে ঘৃতাহুতি পড়িল। জালিয়ানওলাবাগের পৈশাচিক বর্ব্বরতার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসেও মেলা দায়। প্রধানতঃ গান্ধীজীর উদ্যোগেই কংগ্রেসের পক্ষ হইতে একটি তদন্ত সঙ্ঘ গঠিত হয়। পণ্ডিত মতিলাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি ধুরন্ধর আইনজ্ঞগণ ডায়ার-ওডায়ার অনুষ্ঠিত হত্যালীলার কারণ অনুসন্ধানে চলিলেন; এতদিনে জওহরলাল মনের মত একটি কাজ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেলেন। এই তদন্ত সঙ্ঘের কার্য্যব্যপদেশে গান্ধীজিকে চিনিবার জানিবার ও বুঝিবার যে সুযোগ মিলিল তাহাই উত্তরকালে উভয়কে অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন সখ্য বন্ধনে বদ্ধ করিল। জওহর দেখিলেন, এই লোকটি সকলের অপেক্ষা কম কথা বলে এবং যাহা বলে তাহাই অদ্ভুত ও উদ্ভট বোধ হয়; কিন্তু এমনই অভ্রান্ত ও অকাট্য তাহার যুক্তি যে শিরোধার্য্য না করিয়া গত্যন্তর থাকে না। তদন্তে প্রকাশ পাইল—ডায়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল যে সারা অমৃতসহরকে কেন্নোর মত বুকে হাঁটাইয়া পরে তোপের মুখে উড়াইয়া দিবে। বৃটিশ পার্লিয়ামেন্ট সভা ডায়ারের সাহসিকতার প্রশংসা করিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে বৃটিশের ভিত্তি নড়িয়া উঠিল।

ভারতের রূপ আমূল পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছিল। পরিবর্ত্তন যে কিরূপ গভীর ও কল্পনাতীত তাহা লিখিয়া বুঝাইবার সময় বোধ হয় এখনও আসে নাই ; কারণ প্রক্রিয়া এখনও গতিশীল। তবে যেদিন সে ইতিহাস লিখিত হইবে পৃথিবীর মানুষ সেদিন বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া সেই কটিবাসপরিহিত অর্দ্ধ উলঙ্গ ক্ষুদ্র ও শীর্ণদেহ মানুষটির কথাই চিন্তা করিবে। কেতাবে পড়িয়া মোটামুটি একটা ধারণা হইয়াছিল, বুদ্ধদেবের সময়ে এমনই একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল। সেদিনও কবির ভাষায়—"রাজা জাগি' ভাবে বৃথা রাজ্যধন, গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন" এদিনও ঠিক তাহাই। এই পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুপরিচিত আর একটি দৃষ্টান্ত দিই, চিত্তরঞ্জন দাশ। আরও একটি বরণীয় নাম স্মরণ হইতেছে—দিল্লীর হকীম আজমল খান। মোগলসম্রাট দেখি নাই, মোগল বিলাসের কথা শুনিয়াছি। লোকে আজও বলে, আজমল খান নাকি তাহারই সহিত তুলিত হইতেন। আবার আহ্বান আসিবামাত্র সেই বিলাস-বিলাসী আজমল খানও নাঙ্গা বাবা! গান্ধীজী ভারতের ইতিহাস জ্ঞাত ছিলেন ; ভারতের মৃত্তিকার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইতিহাসে ভরিয়া আছে, সর্ব্বত্যাগীর কাহিনী ; মৃত্তিকায় মিশিয়া আছে, বুদ্ধ-চৈতন্যের চরণের রেণু। আর তাহাতেই আপ্লুত ভারতের চিত্ত ও বিত্ত। দূরদর্শী ঋষি গান্ধী সেই সনাতন পুরাতনেরই পুনরভ্যুত্থান ঘটাইলেন। গান্ধী-যুগে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধনই ভবিতব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ কাহারও ছিল না। সেতারের সপ্ততারে সঙ্গীত লুপ্ত ছিল, নিপুণ শিল্পী গান্ধীজী, করস্পর্শে মূর্চ্ছনা জাগরিত করিলেন ; স্বাধীনতা সঙ্গীত ধ্বনিত হইতে লাগিল। ভারতের নর নারী—হিন্দু মুসলমান উৎকর্ণ হইয়া সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিল।

মতিলাল সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। আনন্দভবন বেষ্টন করিয়া কুলুকুলু-নাদিনী বিলাস-স্রোতস্বিনীর শুষ্ক স্রোত গতি হারাইয়া ফেলিয়াছে ; অযত্নে ও অনাদরে আনন্দভবনের শোভা সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়াছে। মতিলাল স্বেচ্ছাদারিদ্র্যে কাতর নহেন, কিন্তু একমাত্র পুত্র জওহরলাল যে দ্রুতগতিতে কারাগারের দিকে ধাবিত হইতেছে পিতার স্নেহার্দ্র হৃদয়ে তাহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ ? ঐশ্বর্য্যপালিত জওহর কারাগারের অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সহিবে কেমন করিয়া ? নিষেধ করিবারও উপায় নাই, বাধা দেওয়াও সম্ভব নহে। সমগ্র দেশের সমস্ত মানুষকে স্বাধীনতা দানের ব্রত গ্রহণ করিয়া নিজের ছেলের স্বাধীনতার হন্তারক হওয়া সাজে না। রাত্রে পুর নিশুতি হইলে মতিলাল সকলের অলক্ষ্যে বিনা উপাধানে ভূতল শয্যায় শয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। জওহর ত কারাগারে অজিন শয্যাতেই শয়ন করিবে। কিছুকাল ধরিয়াই পরীক্ষা চলিতেছিল। অকস্মাৎ একদিন জওহরজননী স্বরূপরাণী ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিতেই দেখিলেন, এই কাণ্ড! উভয়ে উভয়ের পানে চাহিলেন। দু'খানা মেঘেই বিদ্যুৎ ভরা ছিল, এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। পিতার এই সযত্ন প্রস্তুতি ও সস্নেহ অনুভূতির সংবাদ জওহরও শুনিল, বলা বাহুল্য তাহার চক্ষুও শুষ্ক রহিল না।

কিন্তু তখন যুদ্ধ বিঘোষিত হইয়াছে ; রণদামামা ঘোর রবে বাজিয়া উঠিয়াছে, পশ্চাদপসরণের প্রশ্ন উঠে না। পিতা পুত্রকে, মাতা সন্তানকে, ভগিনী ভ্রাতাকে, পত্নী পতিকে নয়নের জল দিয়াই বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিল। কে আগে গেল কে পরে, কে গেল না, পড়িয়া রহিল, কে ফিরিল দেখিবার অবসর নাই—সকলেই ছুটিয়াছে—ভগীরথের পশ্চাতে সগর বংশ ছুটিয়াছে—পুণ্যকামী নরনারী কাতারে কাতারে কুম্ভস্নানে চলিয়াছে! হায় বিলাসী-সম্রাট মতিলাল, একদিন দেখা গেল, নাইনীর অন্ধকারায় পিতা-পুত্রের অপরূপ মিলন। এই মহা শুভদিনে জওহরের মনের কথা বলি, শুনুন : জওহর বলিলেন, জেলের মেঝে বসিয়া লিখি, পড়ি, তাঁত চালাই, সতরঞ্চ বুনি, বাগানের মাটী কাটি, স্বহস্তে সেল্ ঝাড়ু দিই ; কিন্তু তবু যেন সময় কাটে না। আঃ, আজ বাঁচিলাম। ছ'মাসের দণ্ডাদেশ ঘাড়ে করিয়া বাবা আসিয়াছেন! বাবার কাপড় কাচিব আমি, বাবার কম্বল রৌদ্রে দিব আমি, বাবা চির-সুখী জন, তাঁহার সেবার সুযোগ পাইয়া জীবন ধন্য হইল। কে জানিত বৃটিশের ঘৃণিত কারাগারও স্বর্গের রূপ ধারণ করিবে!

পণ্ডিত জহরলাল ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় —প্রতীপ সিংহের সৌজন্যে

১৯২১ সালে সেই যে কারাতীর্থ গড়িয়া উঠিল, পঁচিশ বৎসর গত হইলেও, আজও তীর্থের সিংহদুয়ার সমভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে। সাম্রাজ্য-রক্ষকগণ যেদিন যে মুহূর্ত্তে ইচ্ছা করিয়াছেন, বাসনা প্রকাশমাত্র কংগ্রেস বিনা আপত্তিতে তীর্থযাত্রা করিয়াছে। আদালতে ন্যায়ের তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া বিচারক বসিয়া আছেন, কংগ্রেস বিচার চাহে নাই, দণ্ড চাহিয়া লইয়াছে এবং হাসিমুখে উদগতঅশ্রু সবলে গোপন করিয়া প্রিয়জন-বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া দুর্গম যাত্রা করিয়াছে। তীর্থে কত মরিয়াছে, কত হৃতস্বাস্থ্য হইয়া জীবনে মরণের স্বাদ অনুভব করিয়াছে ; তবু যাত্রীর অভাব হয় নাই। যখন পুরুষ নিঃশেষ হইয়াছে, তখন নারী তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। তা' যদি না হইবে ত মতিলাল নেহেরুর পুত্রী, পুত্রবধূ, পৌত্রীই বা কারাবাস করিতে আসিবে কেন ?

কমলার নিঃসঙ্গ দিনগুলি আর কাটে না। আত্মীয়পরিজন সব কারান্তরালে। নারীর সর্ব্বস্ব স্বামী, তিনি ত তাঁতের মাকুর মত সারাজীবনই কারাগার ঘর করিতেছেন। দশদিন যদি ঘরে থাকেন, দশ মাস থাকেন কারাগারে। যে কয়দিন তিনি গৃহবাস করেন গৃহে আনন্দ দীপ জ্বলে, নিশাবসানের পূর্ব্বেই প্রদীপ নিবিয়া যায়, স্বপ্নভঙ্গে দেখা যায়, তিনি নাই। এমন করিয়া কি ভাল লাগে, না সংসারে মন বসে? অনন্তকাল ধরিয়া আসা পথ চাহিয়া চাহিয়াই ত জীবনের গণা দিন শেষ হইতে চলিল, তবে আর জীবনের পূর্ণতা হইবে কবে?

দেশে তখন পুরুষ বলিতে কেহ নাই; কংগ্রেসও নির্ব্বাণদীপ। কমলা কংগ্রেসের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিল। মরা গাঙে বান ডাকিল—বর্ষার নদী কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। নিস্তেজ, নিঃশব্দ কংগ্রেস পুনশ্চ কর্ম্মমুখর হইয়া সরকার বাহাদুরকে সচকিত করিয়া তুলিল। পণ্ডিত জওহরলাল তখন দেরাদুন জেলে। একদিন একখানা 'আখবর' সুখবর আনিয়া দিল যে কমলা নেহেরু দেড় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জওহরলালের দুই চোখে সহস্রধারা বহিল। দুইটি চক্ষু মুদিয়া ক্ষণেকের তরে অন্তরের অন্তহীন অবগাহন অন্তঃস্থলে করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, কমলা! কমলা! আমার কমলা!

দীর্ঘকালের অভিমান ছিল, কমলা তাহার বিরাটপুরুষ স্বামীকে একান্ত আপনার করিয়া পায় নাই। স্বামীর কাজকে সে শ্রদ্ধা করিত; কংগ্রেসকে সে পূজা করিত; দেশকে সে দেবীজ্ঞানে ভক্তি করিত; তাহার স্বামী যে দেশের কাজে তনুমনধন উৎসর্গ করিয়াছেন তাহাতে অন্তরে তাহার গর্ব্ব ও গৌরবের সীমা ছিল না; কিন্তু তাহার অন্তরনিবাসিনী স্বামীসঙ্গসুখপ্রার্থিনী নারীটি যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গুমরিয়া মরিত, তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে যে সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছিল। বাঁশে যে ঘুণ ধরিয়া গিয়াছিল।

জওহরলাল কি তাহা বুঝিতেন না? যে বিশাল প্রেমময় হৃদয় চারিশত কোটী নরনারীর চিন্তায় কাতর, এই একান্তনির্ভরশীল ক্ষুদ্র লতিকাটি কি সেই বিশাল শাল্মলী অঙ্গে স্থান পায় নাই? দৈবাৎ বা ভ্রমবশে এ কথা মনে করিলেও অবিচার করা হইবে। এই বরেণ্য পুরুষটিকে জানিবার সৌভাগ্য যাহার হইয়াছে সেই জানে হৃদয়খানি স্নেহের সমুদ্র; আবর্ত্তিত তরঙ্গনিয়ে প্রেম ও প্রীতির প্রবাহ তথায় সতত উদ্বেলিত। জওহরলালের নয়নের পানে চাহিলে দেখিবে, করুণার নির্ঝর মানবকল্যাণ তরে সদাই সচঞ্চল। তাই ত সারাজীবনভোর অনন্ত দুঃখ ও অনন্ত বিচ্ছেদ সহিয়াও, সাধ্বী-সতী সীতার মত অন্তিম শয্যায় নারীর অনন্ত কালের কামনাই কমলা জানাইয়া গিয়াছেন, এ জন্মে আশা মিটিল না; পরজন্মে যেন তোমাকেই পাই।

সুইট্‌জারলণ্ডে লসেন্ নামক ক্ষুদ্র পল্লীর স্বাস্থ্যনিবাসে কমলার ক্ষীণ জীবনদীপ ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছে, সরকার বাহাদুর কৃপাপরবশ জওহরলালকে কারামুক্তি দিলেন, জওহর সেইদিনই বিমানে দূর যাত্রা করিলেন। কমলা যেন চাঁদ হাতে পাইল; বলিল, এইবার সারিয়া উঠিব। জওহরলাল বলিলেন, তুমি ভাল হও কমলা, আমরা তিনজনে ঐ খাউ দেবদারুর বনে একখানি কুটীর বাঁধিয়া বাস করিব। কন্যা ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীও কাছে ছিল, জল্পনা কল্পনায় আশা ও আশঙ্কায় দিনগুলি কাটিতে লাগিল। অকস্মাৎ একদিন কমলা ভয় পাইয়া বলিল, কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে; কে যেন তাহার চারি পাশে ছায়া ফেলিয়া বেড়াইতেছে। কমলা জিজ্ঞাসা করিল, কে বল ত? ভারতের পুলিশ নয় ত? জওহরলাল হাসিলেন। কমলা বলিল, দেখ আবার আমি জন্মিব, আবার তোমাকে পাইব, কিন্তু ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তবে যেন আমাদের জন্ম হয়; তাহা হইলে আর সারাজীবন বিচ্ছেদ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না। স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীকে কেহ দূরে রাখিবে না।

সেই দিনই কমলা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কন্যা ইন্দিরাকে শিক্ষালাভার্থ ইয়োরোপে রাখিয়া, ক্ষুদ্র একটি কৌটায় কমলার শেষ-চিহ্নটুকু লইয়া জওহরলাল দেশে ফিরিলেন। ইংলণ্ডে তখন তাঁহার জীবনচিত্র মুদ্রিত হইতেছিল, কায়রো হইতে গ্রন্থের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় তারবার্ত্তা প্রেরিত হইল—"যে কমলা আর নাই, আমার সেই কমলার উদ্দেশে"।

পৃথিবীর বিদ্বজ্জনমণ্ডলী প্রায় একবাক্যে বলিয়াছেন, জওহরলাল যেন ভারতবর্ষের ফটোগ্রাফ। ভারতবর্ষের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, তাহার বাসনা ও কামনা ঐ একটি মাত্র লোকের মধ্যে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য যে তুলনারহিত, জওহরের চিন্তাধারায় তাহাই প্রতিফলিত; ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, জওহর-লালের উৎসর্গীকৃত জীবনী হইতে তাহাই প্রমাণিত হইতেছে; ভারতবর্ষ আর যে বৃটিশের দয়া দাক্ষিণ্য ও সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে প্রস্তুত নহে, পরন্তু সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দুর্ব্বার বেগে স্বাধিকার অর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প, ঐ লোকটির ভাষার ভিতর দিয়াই চারশত কোটী নরনারীর আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিতে পাই। ভারতবর্ষ যে ভীরু ও কাপুরুষের দেশ নহে, জওহরলালকে দেখিলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়; দেশের কোটী কোটী নরনারীর সাহসই না তাঁহার সাহসের উৎস? ভারতবর্ষ যে স্মরণাতীত কাল হইতে সর্ব্ব-জনে সমভাব নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বজনীন উদারতাকেই তাহার রাষ্ট্রনীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, জওহরলালের বৈদেশিক নীতিই তাহার প্রমাণ।

সকলে হয় ত না জানিতে পারেন, কংগ্রেস মূলতঃ পণ্ডিত জওহরলালের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ১৯২৩ সালে বৈদেশিক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। এই দপ্তর পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই গঠিত হয় এবং দেখা গিয়াছে পৃথিবীতে যখনই কোন প্রবল শক্তি দুর্ব্বলের প্রতি অন্যায় ও রূঢ় আচরণ করিয়াছে ভারতবর্ষীয় কংগ্রেস তখনই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, পীড়ন যখন যেখানে হইয়াছে, শান্তিকামী কংগ্রেস তখনই তাহার বিরুদ্ধে কঠোরতম ভাষায় নিন্দা প্রকাশ করিয়াছে—দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে কংগ্রেস তাহারই বিপক্ষতা করিয়াছে।

ইটালী ইথিওপিয়ার উপর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যভিচার করিয়াছিল।

:লণ্ড, আমেরিকা—এক কথায় বিশাল বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়া সে দৃশ্য পভোগ করিয়াছিল এবং প্রতিবাদ করা দূরে থাক্, সুসভ্য ও রত্বাভিমানী ইয়োরোপ মুসোলিনীর চরণতলে মনে মনে ভয়মিশ্রিত র্ঘ্যাই নিবেদন করিয়াছিল। কিন্তু এই পরাধীন ভারতের প্রতিনিধি ওহরলাল নেহেরু মুসোলিনীর খাস তালুক রোমের হোটেলে বসিয়া মুসো-নীর সাদর আমন্ত্রণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করিবার সাহস দেখাইয়াছিল। রাবে ক্ষোভে অপমানে মুসোলিনী আহত শার্দ্দুলসম গর্জ্জন করিয়াছিল, থাপি অসহায় আবিসিনিয়ার শোণিতরঞ্জিত করধারণে জওহরলালকে ম্মত করাইতে পারে নাই। নাৎসীনায়ক হিটলার তাহার খাস কামরায় টিশ মহামন্ত্রী ছত্রধারী নেভিল চেম্বারলেনকে একটি চুরুট খাইতে নুমতি দেওয়ায় লণ্ডনের সংবাদপত্রজগতে পৌষমাসের পিঠে পার্ব্বণের ানন্দস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, আর জওহরলাল নাৎসী-নীতিকে এমনই পার চক্ষুতে দেখিতেন যে নাৎসী-জার্ম্মানীর 'স্বনামে, বেনামে, স্ব-বেশে থবা পরকীয় বেশে' জার্ম্মানী ভ্রমণের সসম্মান আহ্বানও অবজ্ঞাভরে ফরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কি সুবিচার! নাৎসীজম্ ও ফ্যাসিজম্ দমনে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াই, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সর্ব্বাগ্রে সেই লাককেই কারাগারে পূরিল, নাৎসী হিটলার ও ফ্যাসিস্ত মুসোলিনীকে য ব্যক্তি মনঃপ্রাণ দিয়া ঘৃণা করিয়াছে, তাহাদের কলুষ ছায়া স্পর্শে কলঙ্কিত হইতে চাহে নাই, তাহাকেই কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া াৎসীজম্-ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ পরিচালিত হইল। আমেরিকায় রলসফোর্ড ঠিকই লিখিয়াছিলেন, ইংলণ্ড, আমেরিকা, মস্কোতে সাহসী লাক নাই এমন নহে; কিন্তু ভারতের জওহরলাল নেহেরুর চরণস্পর্শের যাগ্যতা কাহারও নাই।

প্রতিভা বন্ধ্যা এবং উত্তরাধিকার আইন মানকরে না, তাহাও যমন বলিয়াছি, বর্ত্তমানক্ষেত্রে যে তাহার সম্মানজনক ব্যতিক্রম সে থাও তেমনই বলিয়াছি। পঞ্চনদীর সজলছল পাঞ্জাবে প্রতিভাবান পিতা প্রতিভাধিকারী পুত্রের হস্তে যেদিন পরাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতিত্ব র্পণ করিলেন সেদিনের কথা আমরা ভুলিব না। ১৯২৮ ালে কলিকাতা কংগ্রেসে জওহর-সুভাষকে কেন্দ্র করিয়া তরুণের ক্তির পরিচয় পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়; ১৯২৯ সালে লাহোরে বীণ মতিলাল নবীন জওহরলালকে 'কণ্টক মুকুট' দান করিলেন। ংগ্রেস সেইদিন, সেই সর্ব্বপ্রথম প্রচ্ছন্ন স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ রিল। যজ্ঞানলে পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইল। তাহারই এক মাস পরে, ৯৩০।২৬এ জানুয়ারী নবনির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতি জওহরলালের কণ্ঠে রিত তাহার স্বাধীনতার সঙ্কল্প মন্ত্র উচ্চারণ করিল। তদবধি ভারতের ষ্ট্রধর্ম্মগৃহপঞ্জিকায় ২৬এ জানুয়ারী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া হিয়াছে।

আজ শুনি, আমরা স্বাধীনতার মন্দিরদ্বারে উপনীত। রুদ্ধদুয়ার লিয়া প্রবেশ করিবামাত্র আমরা মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী ভারতমাতার স্বর্ণময়ী তিমা অবলোকন করিতে পারিব। ২৬এ জানুয়ারীর পুণ্য অনুষ্ঠান রিয়া যে ব্যক্তি আমাদিগকে স্বাধীন ভারতই একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই জওহরলালই বলিতেছেন, আমরা মন্দিরের সিংহদ্বারে উপনীত হইয়াছি। তবু, কি জানি কেন বিশ্বাস করিতে সাহস হইতেছে না। চারিপাশে দেখিতেছি বৃটিশের পুলিশ, বৃটিশের আইন, বৃটিশের লাট, বৃটিশের ফৌজ; চারিধারে শুনিতেছি দৈন্যের হাহাকার, আতুরের আর্ত্তনাদ, অভাবের ক্রন্দন; সেই ভেদাভেদ, সেই সাম্প্রদায়িক কলহ, স্বার্থের সংঘর্ষধ্বনি, সেই হানাহানি! তবে কেমন করিয়া বুঝিব যে স্বাধীনতার স্বর্ণমন্দির আমাদের সম্মুখে? হয়ত আমরা অন্ধ, নয়ত আমাদের দুর্ভাগ্য, শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের সম্মুখে দাঁড়াইয়াও আজিনার পুঁই মাচাই দেখিতেছি, অসম্ভব নহে! নয়নে দুইশত বৎসরের পরবশতার অঞ্জন লাগিয়া রহিয়াছে, দৃষ্টিবিভ্রম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বুঝি সেইজন্যই মনোমোহিনী মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে গিয়াও দেখিতে পাই নাই!

কিন্তু মন্দিরের সন্ধ্যারতির দীপশিখা দেখিয়াছি; মন্দিরবিচ্ছুরিত আলোক ছটায় দিগন্ত আলোকিত হইতে দেখিয়াছি; কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়াছি; ঢাকঢোল কাড়া নাকাড়ার বাদ্য শুনিয়াছি; আর শুনিয়াছি, শান্ত, স্নিগ্ধ, সুমধুর কণ্ঠের সামগান! ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক শান্ত সন্ধ্যায় এই ভারতের রাজধানী দিল্লী হইতে মন্দিরের পূজারী রাশিয়ায়, আমেরিকায়, চীনের উদ্দেশে বেতারে প্রেম, প্রীতি ও শুভেচ্ছার বাণী প্রেরণ করিতেছেন। স্বাধীন সোভিয়েটকে শুভেচ্ছা প্রেরণের অধিকার স্বাধীন ভারতেরই আছে এবং বৃটিশের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল সে বাণী প্রেরণ করেন নাই, ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত, গান্ধীর উত্তর-সাধক পণ্ডিত জওহরলালই পৃথিবীর সমস্ত দেশ, সমস্ত নরনারীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, অস্ত্রমুখে নহে, বম্বার বিমানের দ্বারাও নহে, সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াও স্বাধীন ভারত প্রেম ও ভালবাসা দিয়াই পৃথিবীর সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিতে চাহে!

সোভিয়েট রাশিয়া, দুর্দ্ধর্ষ রাশিয়া, বিশ্বের ত্রাস রাশিয়া বাচিঁতি সে আহ্বানে সাড়া দিয়াছে; ধনকুবের আমেরিকা দূত বিনিময়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছে; ডি-ভ্যালেরা আয়র্লণ্ড হইতে ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করিয়াছেন। আজ আর চার্চ্চিল নহে, ট্রুমান নহে, জিন্নাও নহে, পৃথিবীর মনুষ্যজাতি ভারতবর্ষের স্বচ্ছ মানচিত্রের উপরে প্রতিবিম্বিত ঐ একটি মানুষের শান্ত সৌম্য সুন্দর মুখের পানে দৃষ্টি রাখিয়াই ভারতের সহিত ভবিষ্যৎ সম্পর্ক রচনা করিতেছে। গান্ধীজীর যোগ্য মন্ত্রশিষ্য জওহরলাল, অসীম বিশ্বাসভরে বিশ্ববাসী তাহার ভাষণ শুনিতেছে; ভারত ভারতেই সম্পূর্ণ! ভারত কাহারও উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে না; কাহারও স্বাধীনতা হরণেও তাহার আগ্রহ নাই। ভারতের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল মানুষ এক—অভিন্ন ও অবিভাজ্য! পৃথিবীর ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছি, এই নির্লোভ, নিষ্কাম মনুষ্যত্ব ভারত-বর্ষেরই সম্ভব এবং ভারতবর্ষেও কেবলমাত্র তাহার দ্বারাই সম্ভব, সারা-জীবন অনলসকর্ম্মা অনন্তব্রত যে সাধক ভারতের মুক্তি সাধনাই করিয়াছে। জওহরের জাতি নাই, বর্ণ নাই, গোত্র নাই, সম্প্রদায় নাই, বুঝি ধর্ম্মও

নাই। আজ মনে পড়ে মনস্বী মৌলানা মহম্মদালির কথা। তিনি জওহরকে গালি দিতেন, বলিতেন, জওহর, তুমি যদি একটুও ধার্ম্মিক হইতে! জওহর প্রতিবাদ করিতেন না, হাসিতেন। মহম্মদালি সাহেবের সহিত ধর্ম্ম-তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া যে কিরূপ বিপজ্জনক, তরুণ যুবক হইলেও জওহরলাল তাহা জানিতেন; তাই দীর্ঘদিন তাঁহার সহকর্মী থাকা কালেও সর্ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন, ঐ একটি বিষয়ে আমরা তর্ক করিব না। ধর্ম্ম মানুষের অন্তরের স্বীকৃতি, তর্কের বিষয় নহে! ভারতবর্ষের জাতি যেমন ভারতবর্ষ, জওহরলাল নেহেরুর জাতি ধর্ম্মও তেমনই ভারতবর্ষ।

আজ তাঁহার জীবনের ৫৮তম জন্ম দিবসে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিতে বসিয়া একটি কথাই শুধু ভাবিতেছি. ইতিহাসে চিরজীবী এই চিন্তানায়ককে জাতিধর্ম্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভারতবর্ষ শ্রদ্ধার স্বর্ণ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছে, তাঁহার জীবন কি ইতিহাসেরই বিবর্ত্তন নহে? শ্রীভগবান যেদিন গীতা রচনা করিয়াছিলেন, শ্রোতারূপে পার্থকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল—ইহা ইতিহাস; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুক্তিমার্গ সার্থক করিবার জন্য কায়স্থকুলের নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দ রূপ ধারণ করিতে হইয়াছিল—ইহাও ইতিহাস; অবনত ও অবজ্ঞাত ভারতে স্বাধীনতার যুদ্ধরথে গান্ধীর সারথ্য করিতে হইয়াছে, জওহরলালকে। ইহাও প্রত্যক্ষ ইতিহাস। আবার এই ইতিহাসের প্রয়োজনেই জীবন ধারণ। জওহরলাল কেবল ভারতবর্ষের ইতিহাস নহে, পৃথিবীর ইতিহাসকে নিজের জীবনোপকরণ দ্বারা সুসমৃদ্ধ ও সঞ্জীবিত করিয়াছেন, ইহাও ইতিহাস। ইংরাজ তদ্রচিত পুস্তক সমালোচনায় আত্মীয়তা আরোপ করিয়া বলে "An Englishman speaks". আমেরিকায় জওহরতন্বী বিজয়লক্ষ্মী ইতিহাসের কণ্ঠে বিজয়মাল্য অর্পণ করিয়াছেন, সেও ত আমরাই দেখিয়াছি।

যে জীবন বৃটিশের অন্ধ কারাগারেই অতিবাহিত হইয়াছে, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ, আত্মীয়বিয়োগ, শত সহস্র দুর্নিবারমনোলোভা প্রলোভনেও কঠোরতম ব্রত পালনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই, আজ বৃটিশের আহ্বানে মন্ত্রণাসভায় তাহার যোগদান, ইহাও ইতিহাসের বিবর্ত্তন। আজিকার ভারতবর্ষ অতীতের বিরোধ, বর্ত্তমানের অবসাদ ও ভবিষ্যতের আশা—ইতিহাসের এই ত্রিবেণী সঙ্গমে উপনীত হইয়া নূতন ইতিহাস সৃজন করিতে চলিয়াছে। ১৯২০ সালের সেই দীন ক্ষীণ জীর্ণশীর্ণ শোষণক্লিষ্ট প্রপীড়িত ভারত আজ ১৯৪৭ সালে বিশ্ববাসীর সম্মুখে রত্নালঙ্কারবিভূষিতা অনন্তরূপ-লাবণ্যশালিনী জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তিতে প্রতিভাত। চির-উপেক্ষিত, বিশ্বের অবজ্ঞাত ভারতের পানে আজ বিশ্বের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ। গান্ধীজীর সার্থক জীবন, সার্থক তাঁহার সাধনা।

কিন্তু ভারতের সাধনার সমাপ্তি আজও বহু দূরে। জওহরলাল বলিয়াছেন, ভারত বিশ্বের নেতৃত্বের অধিকারী। ভারতের অফুরন্ত ধন-রত্ন, অজেয় তাহার জনবল, মনোবল, নির্লোভ, নিষ্কাম তাহার চরিত্রবল—বিশ্বনেতৃত্বের অধিকার একমাত্র ভারতেরই আছে। সে নেতৃত্ব যুদ্ধ বিগ্রহের দ্বারা নহে, পরস্বাপহরণের পথে নহে, অপরের স্বাধীনতা হরণেও নহে! হিংসার পথ ভারতের নহে, বিদ্বেষের বাণী ভারতের নহে! ভারতবর্ষ ভালবাসা দিয়াই পৃথিবীর ভালবাসা অর্জ্জন করিবে; প্রেমের বিনিময়ে প্রেমই তাহার কাম্য।

ভারতের মনের কথা ভারতের প্রতিচ্ছবি জওহরের মুখ দিয়াই উচ্চারিত হইয়াছে:

"জগতে ঢালিব প্রাণ গাহিব করুণা গান;
উদ্বেগ অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া—
সে প্রাণ মিশাব আর সে গান করিব শেষ।"

ভুলিব না

শ্রীজগন্নাথ বিশ্বাস

স্কুলের পণ্ডিতমশাই মাধববাবু বলিলেন, "আসবেন না মশাই এ লাইনে, বড্ডো 'লো'—সুখ নেই।" উত্তরে একটু হাসিলাম।

আমি তখন সবে বি-এ পরীক্ষা দিয়া গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষকতা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি। বন্ধুগণ আমাকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সুযোগ পাইলেই বক্রভাবে সে কথা জানাইয়া দিতেছে। সখ করিয়া এবং খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যেই আমি শিক্ষকতার সংস্পর্শে আসিলাম। বেতন যাহা তাহাতে একজন রাঁধুনী বা আজ্ঞাবাহী ভৃত্যও পাওয়া যায় না।

স্কুলের মাষ্টার মশাইরা বিরস বদনে কোনক্রমে ছাত্র ঠেঙাইয়া হাজিরা দিয়া যান, উহাই যথেষ্ট। ছাত্রের মাষ্টারদের ভয়ে জড়সড়।

কমলবাবু অঙ্ক কষান, আমার পরিচিত। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "হেঁ হেঁ ওয়েলকাম্, হাউ হ্যাপি কাম!" কমলবাবু সুবিধা পাইলেই বাইবেলো

খাঁটি ইংরাজী ঝাড়িয়া বসেন, "বেশ বেশ চায়ের অর্ডার হোক টিফিনে" তিনি শেষ কথাটুকু যোগ করিয়া দিলেন।

দু'চার দিনের মধ্যেই আমাদের দেশে শিক্ষার যে কি অবস্থা তাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়া গেল। আমি শুধু এই ভাবিয়া আশ্চর্য হইয়াছি যে এইরূপ শিক্ষা ও আবহাওয়ার পরও দেশে কিছু কিছু ভাল মানুষ ও প্রতিভাবান মানুষ বাহির হইতেছে কি করিয়া!

পণ্ডিতমশাই বলিলেন, "বড্ডো 'লো' মশাই। এই ভাবে মানুষ বাঁচতে পারে? তবে কি জানেন, ছোট ছেলেদের ওপর কেমন একটা মায়া প'ড়ে গেছে যে, মাষ্টারী ছেড়ে আর কিছু করবো তা' যেন ভাবতেই পারি না। নইলে এ বাজারে চাকরীর অভাব কি বলুন?" কথাটি নির্জলা সত্য। "যা বলেছেন" হরেনবাবু বলিলেন "'পে'টা যদি অন্ততঃ আমাদের পেট ভরানোর মতও হতো, তবে কি আর 'এই সংসার' ছেড়ে যাই?" হরেনবাবু এই স্কুলের জন্ম হইতে আজ সাত বৎসর যাবৎ মাষ্টারী করিতেছেন। ইহাকে তিনি অপত্যস্নেহে গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আপাততঃ যুদ্ধ ও চোরাবাজারের যুগে মাষ্টারীর সামান্য বেতনে জীবনধারণই দুঃসাধ্য, তাই তিনি সম্প্রতি সাপ্লাইয়ের একটি কাজে ঢুকিতেছেন। হরেনবাবুর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল, আমরা সকলে একটা বেদনা অনুভব করিলাম। কমলবাবু বলিলেন, "ত্যাট ইজ ট্রু; দিনটা বড়ো 'কাম্ব্রাস্' যাচ্ছে, চা আনা হোক্, ওরে"...আরবী শিক্ষক রহিম সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

বিকালে আমার স্কুল জীবনের সতীর্থ জিতেনের সহিত দেখা। টেকনিকাল পাশ দিয়া আসিয়াছে, অচিরেই কোন মাড়োয়ারীর মিলে প্যাক্ট করিয়া ইঞ্জীনায়ার বনিবে এবং মাড়োয়ারীর কর্কশ গালি শুনিয়া ভূতের মত খাটিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে। জিতেন করুণার হাসি হাসিয়া "কিরে মাষ্টারমশাই" বলিয়া এমন একটা গা-জ্বালানো ইংগিত করিল, যে আমি নেহাৎ খানিকটা সাহিত্যিক কাল্চার আয়ত্ত করিয়াছি বলিয়াই চুপ করিয়া গেলাম। কিন্তু উত্তর দিল অমিয়। বলিল, "ছাখো, তুমি যে বাবার টাকায় ধরাকে সরা জ্ঞান করছো তা' কোত্থেকে আসছে শুনি? তোমার বাবাকে যদি ঐ শিক্ষকরাই তৈরী করে না দিতেন তবে তোমায় আজ লাঙল ঠেল্তে হ'তো জানো?" জিতেন এতটা আশা করে নাই।

পরদিন স্কুলে এই প্রসঙ্গ তুলিলাম। পণ্ডিতমশাই বলিলেন, "আর বল্বেন না। তিন টাকার স্যুটের দৌলতে আজ কুলী, কেরাণী, আর ব্ল্যাক্মার্কেটাররাও সায়েব বন্ছে, দেশকে বিদেশ বলে ঠাওরাচ্ছে। এই আমরাই...আর বল্বেন না, বড্ডো 'লো' মশাই। তারপর হরেনবাবু, কবে যাচ্ছেন? আপনি বাঁচলেন দাদা, আমরাই...।" রহিম সাহেব কিছু বলিলেন না; তাহার কপালের রেখা তিনটি স্থায়ী হইয়া গিয়াছে।

* * *

পূজার বন্ধের পর পণ্ডিতমশাইকে আর স্কুলে দেখিলাম না। পরদিন না, তারপর দিনও না। শুনিলাম জুট রেগুলেশনে চাকুরী পাইয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য চাপা লোক। হরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হরেনবাবু?" "না ভাই আর সাপ্লাইয়ে গেলাম না। শুধু চাকরী তো নয়, ওই সংগে আরও অনেক কিছু বিছেও চাই। আর মাষ্টারী ক'রে ওটা কিছুতেই ধাতে আসবে না দেখলাম। কি করি? হ্যাঁ আমাদের ডিয়ারনেস এলাউন্স পাঁচ টাকা করে মঞ্জুর হ'য়ে গেছে শুনেছেন?"

পণ্ডিতমশাইকে ষ্টেশনে দেখিলাম একদিন। ট্রেণে কোথাও যাইতেছেন। হাফপ্যাণ্ট, শার্ট ও শোলার টুপি পরিয়া তাঁহাকে অন্য রকম লাগিতেছে। হাসিয়া বলিলেন, "নমস্কার অনিলবাবু, ভালো তো? মাদারীহাটে পোষ্টেড হ'য়েছি। বড্ডো 'লো' মশাই..." আর কিছু শুনিতে পাইলাম না, ট্রেণ চলিয়া যাইতেছে।

হরেনবাবুই স্কুলকে ভুলিতে পারেন নাই।

ওস্তাদ কাশিম আলি

শ্রীগুরুদাস সরকার

বিহ্‌জাদীয় চিত্রকর-গোষ্ঠির সম্পর্কে ওস্তাদ কাশিম আলির নাম না করিলে সমকালীন চিত্রশিল্পের বিবরণ একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি হিরাট শিল্পকেন্দ্রের একজন সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর চিত্রকর বলিয়াই পরিগণিত ছিলেন। একাধিক ক্ষেত্রে তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত চিত্র বিহ্‌জাদের তুলিকাসম্ভূত বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে। কোনও কোনও পুঁথির চিত্রণকার্য্য বিহ্‌জাদ ও কাশিম আলি উভয়ে মিলিয়াই সমাপ্ত করিয়াছেন, নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাদের নামাঙ্কিত বিভিন্ন চিত্র পুঁথিমধ্যে নিম্নিবিষ্ট রহিয়াছে। আবার কোনও কোনও চিত্রে এরূপও দেখা যায় যে উভয়েরই নাম একত্রে স্বাক্ষরিত রহিয়াছে। সহকর্ম্মীরূপে একই চিত্রশালায় নিযুক্ত না থাকিলে এরূপ সহযোগিতা সম্ভব ছিল না। তৈমুরের তৃতীয় পুত্র মিরণসাহের অন্যতম বংশধর সুলতান আলি বের্লাস নামক সমরকন্দের শাসনকর্তার জন্য ১৪৯৪-৯৫ খ্রীঃ অব্দে, নিজামীর কাব্যগ্রন্থে যে সুন্দর ও সুচিত্রিত পুঁথিখানি (Or. Ms. 6810) লিখিত হয় তাহা এক্ষণে ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। উহাতে বিহ্‌জাদের স্বাক্ষর-যুক্ত চিত্রের সহিত মিরেক ও কাশিম আলির চিত্রও স্থান পাইয়াছে। এ চিত্রগুলি যদি গ্রন্থলিখনের সময়েই অঙ্কিত হইয়া থাকে তাহা হইলে বিহ্‌জাদ ও কাশিম আলি উভয়েই যে তৎকালে হিরাট নগরে সুলতান হোসেন বাইকারার অধীনে চিত্রীরূপে নিয়োজিত ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুলতান হোসেন বাইকারার রাজত্বকালে ১৪৮৭ হইতে ১৫০৬ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত। ডাঃ এফ্., আর, মার্টিন (F. R Martin) ও সার্ টমাস্ আর্ণল্ড কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত পুঁথিখানির বিবধ চিত্রের যে একরঙা (monochrome) প্রতিলিপি অঙ্কিত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ১২, ১৯, ২০, ২১, ২২ ও ২৪ নং চিত্র (plates) হইতে শুধু যে কাশিম আলির চিত্রকলার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নয় বিহ্‌জাদের সহিত তাঁহার সহযোগিতারও যথেষ্ট সন্ধান মিলে। ২৪ নং চিত্রখানিতে দেখান হইয়াছে যে ইস্কান্দার (আলেকজান্দার) কোনও গুহাসন্নিধ্যে সন্ন্যাসীসন্দর্শনে সমাগত। ইহাতে ইস্কান্দাররূপে রূপায়িত সুলতান হোসেন বাইকারার যে প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে তাহা বিহজাদ্‌ অঙ্কিত একখানি মূলচিত্রেরই অনুলিপি। মূল চিত্র স্থান পাইয়াছে বেলিনি আল্‌বাম্ (Bellini Album) নামক মুরাক্কা বা সংগ্রহ পুস্তকে। ১২ নং প্রতিলিপিতে দেখিতে পাই লয়লাও মজ্‌নুন্ বৃক্ষতলে পাঠনিরত ছাত্রছাত্রীদিগের মধ্যে উপবিষ্ট। ১৭ নং প্রতিলিপি লয়লার সমাধির উপর মজ্‌নুনের দেহত্যাগের দৃশ্য। ১৯ নং প্রতিলিপির বিষয়বস্তু বাহ্‌রাম গোর কর্ত্তৃক ড্রাগন বধ। ২০ নং চিত্রে নিজামীর কাব্যে উল্লিখিত বশর্ নামক জনৈক ব্যক্তি বৃক্ষশাখার সাহায্যে তাঁহার জলমগ্ন বন্ধুর দেহ অনুসন্ধান করিতেছেন। ২১ নং চিত্রে অনবগুণ্ঠিতা রূপসীর দল উদ্যানস্থ এক জলাশয়ে অবগাহনে ব্যাপৃতা, বিস্ময়-বিমুগ্ধ উদ্যানস্বামী, হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যদর্শনে স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ২২ নং প্রতিলিপি যে চিত্রখানি হইতে গৃহীত হইয়াছে তাহাও কাশিম আলি কর্ত্তৃক অঙ্কিত বলিয়া অনুমিত। এ চিত্রে ইস্কান্দার ঋষিপ্রতিম সপ্ত বিবুধের সহিত আলোচনায় নিরত রহিয়াছেন। ১৯ ও ২১ নং অনুলিপির মূলচিত্রে কাশিম আলির নাম যেন উল্লেখন (scratch out) করিয়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাহার আদেশে এবং কেনই বা এরূপ করা হইল তাহা বুঝা যায় না। অপর চিত্রগুলিতে কাশিম আলির নামের সহিত বিহ্‌জাদের নাম যেন কোনও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তাক্ষরে লিখিত (written in a quite inexperienced hand)। ইহা হইতে অনুমিত হইয়াছে যে এই চিত্রগুলি সাঙ্গ করার ভার বিহ্‌জাদ কোনও ছাত্রের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

খুলাসাৎ-অল্-আখ্‌বার্ গ্রন্থে খোয়ান্দামীর যে ওস্তাদ আলির নামোল্লেখ করিয়াছেন তিনি এই কাশিম আলি ব্যতীত আর কেহই নহেন। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে মুখচ্ছবি অঙ্কনে কাশিম আলির বিশেষ দক্ষতা জন্মিয়াছিল এবং সুদৃশ্য চিত্রাদি রচনায় তিনিই ছিলেন সকলের অগ্রণী। চারুশিল্পে এই পারদর্শিতা তিনি নাকি লাভ করিয়াছিলেন সুলতান হোসেন বাইকারার চিত্রশালিকায় চিত্রকর্ম্মে নিযুক্ত থাকা কালীন। কথিত আছে যে রাজকীয় গ্রন্থাগারে স্বয়ং সুলতান হোসেনের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া তিনি চিত্রবিদ্যায় এরূপ বুৎপন্ন হইয়াছিলেন যে এক বিহ্‌জাদ ব্যতীত সমসাময়িক সকল চিত্রীকেই তিনি কৃতিত্বে ও গুণপনায় অতিক্রম করিতে সমর্থ হইতেন। খোয়ান্দামীর হবিব্-উস্ সিয়ার গ্রন্থে কারুশিল্পে অভিজ্ঞ, সিস্তানে অধ্যাপকপদে বৃত, সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবিশিষ্ট (১) যে সুপণ্ডিত ও যশস্বী মৌলনা কাশিম আলির উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ও ওস্তাদ কাশিম আলি যে ভিন্ন ব্যক্তি তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কাশিম আলি যে নিরবচ্ছিন্নভাবে সুলতান হোসেন বাইকারের কর্ত্তৃত্বাধীনেই চিত্র-শিল্পীরূপে নিয়োজিত ছিলেন এ কথা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

---

(১) Arnold's Painting in Islam. Chap X. P. 139 ff.

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

কাটা জায়গাগুলো বেশ করে ধুয়ে আইডিন লাগিয়ে দিলেন অবিনাশবাবু, তারপর পেছন দিকের জানলাটা খুলে দিলেন। আত্রাইয়ের বুক থেকে এক ঝলক ভিজে বাতাস এসে রঞ্জুর সর্বাঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—তা হলে বলো, দুপুরবেলা জঙ্গলে ঢুকেছিলে কেন?

রঞ্জু নতমস্তকে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, জবাব দিলে না।

—ইস্কুল পালিয়েছিলে, কেমন?

রঞ্জু তেমনি নিরুত্তর।

—তা হলে তোমার বাবাকে খবর পাঠিয়ে দিই, কী বলো?

রঞ্জু কেঁদে উঠল।

অবিনাশবাবুর একখানা মস্তবড় হাত সস্নেহে রঞ্জুর পিঠের ওপরে নেমে এল। স্নিগ্ধ গলায় বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার বাবাকে খবর দেব না। কিন্তু কী করেছিলে, বলো।

—বাবাকে বলবেন না তো?

—তুমি যদি সত্যি কথা বলো, তা হলে এ যাত্রা তোমায় বাঁচিয়ে দেব। ওখানে কেন গিয়েছিলে?

—ওই বাদল।

—হুঁ, এক নম্বর বাঁদর ছেলে। তা বাদল কী করেছে?

পাংশুমুখে রঞ্জু ঘটনাটা বিবৃত করে গেল।

—ছিঃ, ছিঃ, এমন কাজ কখনো করতে আছে! এইটুকু বয়েস থেকেই মিথ্যা বলতে শিখছ, এখনও তো সমস্ত জীবনটা সামনেই পড়ে রয়েছে! অন্যায় দিয়ে সুরু করলে সারাটা জীবনই যে অপরাধের বোঝা টেনে কাটাতে হবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

রঞ্জু চমকে অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকালো। সে মুখে রাগের চিহ্নমাত্র নেই, চোখের দৃষ্টিতে একটুখানি কৌতুকের আভাসই বরং উঁকি দিচ্ছে। তবু রঞ্জুর মনে হল, বাড়ীর নিষ্ঠুর শাসনের চাইতেও কঠিন একটা নির্মমতা লুকিয়ে আছে অবিনাশবাবুর কণ্ঠস্বরে, অবিনাশবাবুর ধিক্কারের জ্বালাটা যেন ধনঞ্জয় পণ্ডিতের জোড়া বেতের চাইতেও তীব্রবেগে ওর পিঠের ওপরে এসে পড়েছে।

—কী বলো, এমন আর করবে কখনো?

বাষ্পাবিল গলায় রঞ্জু জবাব দিলে, না।

অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ রঞ্জুর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিতে রইলেন। আস্তে আস্তে বললেন, বেশ, খুসি হলাম। অন্যায়কে চিনতে শেখো, তাকে স্বীকার করতে শেখো। আমি আরো বেশি খুশি হবো, যদি তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে যা করেছ সব খুলে বলতে পারো: আমি অন্যায় করেছি, শাস্তি দিন আমাকে।

—বাবা তাহলে মেরে ফেলবেন।

অবিনাশবাবু হাসলেন, না মারবেন না। আর যদি মারেন, তাহলে তোমার পাওনা শাস্তি হিসেবেই সেটা তোমার মেনে নেওয়া উচিত। কেমন, তাই না?

রঞ্জু মাথা নীচু করে রইল। বোঝা গেল, সাত আট বছরের একটি ছেলের মধ্যে অতটা সৎসাহস এখনো সঞ্চারিত হয়ে ওঠেনি। রঞ্জুর মুখের ওপর থেকে অবিনাশবাবু দৃষ্টিটা দেওয়ালের ওপরে সরিয়ে নিলেন।

বিচিত্র লোক এই অবিনাশবাবু। সকলের মাঝখানে থেকেও তিনি সকলের চাইতে আলাদা, তাঁর চারদিকে একটা রহস্যের জাল যেন কুয়াশার মতো ঘিরে রয়েছে। গ্রামের প্রান্তে একটা ছোট টিনের বাড়িতে একা বাস করেন তিনি। এ দেশের লোক নন তিনি, তাঁর দেশ কোথায় কেউ জানে না। হঠাৎ যেন আকাশ থেকে একদিন নেমে এসেছেন অবিনাশবাবু। তিনি স্বদেশী, তিনি কংগ্রেসের কাজ করেন।

কংগ্রেস। একটা স্বপ্নের মতো নাম, রূপকথার মতো অপূর্ব বস্তু একটা। রঞ্জু মাঝে মাঝে বাবার মুখে শুনেছে

কথাটা। কংগ্রেসের নামে বাবার মুখের ওপর যেন মেঘের ছাপ পড়ে, চিন্তার রেখা দেয় কপালে। বাবা পুলিশের দারোগা, এখানকার থানার বড়বাবু। একদিন মাকে বলেছিলেন, কংগ্রেসীরা বড় গণ্ডগোল পাকাচ্ছে, ওদের নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হবে একদিন।

অবিনাশবাবু কংগ্রেসী। বাবার সঙ্গে পরিচয় আছে, রঞ্জুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে তিনি না আসেন এমন নয়। তবু রঞ্জুর মনে হয়, বাবা যেন কেমন ভয় করেন অবিনাশ-বাবুকে, হয়তো এড়িয়ে চলতে পারলেই খুশি হন তিনি।

ওদের ইস্কুলে ক্লাশ সিক্সে পড়ে অশ্বিনী। ধেড়ে ছেলে, পাঁচ বছর ধরে মাইনার পরীক্ষা দিয়ে আসছে, পাশ করবার আশা তার নিজেরও নেই, মাষ্টারদেরও নেই। হাডুডু খেলার মাঠে সেই অশ্বিনী একদিন নীচু গলায় অনেকগুলো কথা বলেছিল ফিস ফিস করে।

—জানিস, অবিনাশবাবু স্বদেশী।

আর একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, স্বদেশী তো কী হয়েছে?

—কী হয়েছে?—বিজ্ঞের মতো মুখ করে তাচ্ছিল্যভরা গলায় অশ্বিনী বলেছিল, স্বদেশীরা কী করছে জানিস কিছু? না ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বেত খেয়ে কর্মধারয় সমাস মুখস্থ করছিস খালি?

শ্রোতারা জবাব দেয়নি।

—ক্ষুদিরামের নাম শুনেছ কেউ?

—না ভাই। কে ক্ষুদিরাম?

—হুঁ হুঁ!—অশ্বিনীর গলার স্বর আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছিল: নিখিলিস্ট্ কাদের বলে বুঝিস? (রঞ্জু পরে জেনেছিল, কথাটা নিহিলিস্ট্)

সবাই জানিয়েছিল, কেউ বোঝে না।

—তাহলে শোন—চোখ দুটো বড় বড় করে অশ্বিনী তেম্‌নি ফিস্ ফিস্ করে বলে গিয়েছিল: তারা সব বোমা আর কামান তৈরী করে। মাটির তলায় তাদের বড় বড় কারখানা আছে—সেখানে সব তৈরী হচ্ছে। ক্ষুদিরাম সেই বোমা দিয়ে লাটসায়েবকে মেরে ফেলেছিল।

—কেন ভাই?

—বাঃ—মারবে না। ওরা যে—অশ্বিনীর গলা আরো নেমে এসেছিল, আরো অনেকগুলো কথা বলেছিল তেম্‌নি চাপা ভয়ঙ্কর গলাতে। রঞ্জুর মনে আছে স্বাধীনতা বলে শব্দটা শুনেছিল সেই প্রথম।

—তাহলে স্বদেশীরা—

—ওই বোমা তৈরী করবার দল।

—আর অবিনাশবাবু? কংগ্রেস?

—সব এক।

মনে আছে, সারাটা রাত একটা অশ্রান্ত আশ্চর্য উত্তেজনায় ঘুম আসেনি রঞ্জুর। সমস্ত রাত শুয়ে শুয়ে ভেবেছিল স্বদেশী নিখিলিস্টদের কথা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল কাঁচের জানালার ওপারে থরে থরে অন্ধকার, আর বাইরে আত্রাইয়ের বাতাসে দোলা-লাগা কৃষ্ণচূড়া গাছটার ছায়ানৃত্য। মাটির তলার বোমা আর কামানের কারখানা। যেখানে মখমলের মতো সবুজ আর নরম ঘাস গুচ্ছে গুচ্ছে মাথা তুলেছে, যেখানে ছায়ায় ঘেরা বকুল বনের ভেতরে টুপ টুপ করে শিশির পড়বার মতো শব্দ করে ফুল ঝরে পড়ছে—সেইখানে, সেই নিশ্চিন্ত মাটির তলায় কামান আর বোমা তৈরী হচ্ছে। হঠাৎ একদিন, কেউ বলতে পারে না সে কবে—সেই মাটিতে ভয়ঙ্কর শব্দে চিড় খাবে একটা—রাশি রাশি ধূলোবালি উড়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে, ঘাসের চাঙাড় আর গাছ-পালাগুলো যেন ঝড়ের মুখে শোঁ শোঁ করে উড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে আত্রাইয়ের ক্ষেপে ওঠা নীল জলে, বেরিয়ে আসবে ক্ষুদিরামের কামান। তার পর—

তারপর আর ভাবতে পারেনি রঞ্জু। অশ্বিনী আরো বলেছিল, শুধু মাটির নীচে নয়, সমুদ্রের জলের ভেতরেও সে কারখানা আছে। সমুদ্রের কাছে যারা থাকে, তারা বলে মাঝে মাঝে নিথর নিস্তব্ধ রাত্রে আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে ক্ষুদিরামের কামান গর্জন করে ওঠে। সে শব্দ ভয়ানক, সে শব্দ শুনলে তালা ধরে যায় কানে। ক্ষুদিরামের কামান উঠে আসবে একদিন, উঠে আসবে একদিন মাটির তলা থেকে—সমুদ্রের অতল থেকে। সেদিন—

আজ অবিনাশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল রঞ্জুর। সে কারখানার খবর জানেন অবিনাশবাবু, জানেন সেই রহস্যভরা পাতালপুরীর কথা। আলিবাবার গল্পে শুনেছিল চি-চিং ফাঁক মন্ত্রটা উচ্চারণ করলেই পাহাড়ের মুখ দু-ভাগ হয়ে যেত, খুলে যেত দস্যুদের

রত্ন সঞ্চয়ের চোরা ভাণ্ডার। তেমনি অবিনাশবাবুও একটা আশ্চর্য মন্ত্র জানেন, যার বলে এই সবুজ ঘাস আর বকুল বনের আবরণটা সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ, পাতাল পুরীতে ক্ষুদিরামের কারখানায় যাওয়ার রাস্তা।

অবিনাশবাবুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রঞ্জু ভাবছিল কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করবে নাকি।

আর অবিনাশবাবু তাকিয়েছিলেন দেওয়ালের একখানা ছবির দিকে। তিনি কী ভাবছিলেন তিনিই জানেন, কিন্তু হঠাৎ মুখ ফেরালেন রঞ্জুর দিকে।

—ওই ছবিটা কার জানো? ওই যে চরকা কাটছেন?

—না।

—জানোনা? ওঁর নাম মহাত্মা গান্ধী।

রঞ্জু মন দিয়ে ছবিটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু আকৃষ্ট হওয়ার মতো কিছু তার চোখে পড়ল না।

—এ যুগে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সত্যবাদী মানুষ উনি। যা কিছু মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, অত্যাচার, দুঃখ সহ্য করছেন। হতে পারবে ওঁর মতো?

রঞ্জু লজ্জিত হয়ে মাথা নত করে বসে রইল।

অবিনাশবাবুর স্বর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল, ছলছল করে উঠল তাঁর চোখ। বললেন, শোনো রঞ্জন, বাড়িতে বাবার শাসনের ভয়ে তুমি একটা সত্যি কথা বলতে ভয় পাও, কিন্তু অসংখ্য শাসন, অসহ্য নির্যাতনও ওঁকে সত্যের আশ্রয় থেকে এক তিল নড়াতে পারেনি। তাই আজ উনি এত বড়—তাই যাঁরা ওঁকে শাস্তি দিতে চায়, তাঁরাও মনে মনে ওঁকে দেবতা বলে প্রণাম করে।

—উনি বুঝি স্বদেশী?

—হ্যাঁ, স্বদেশী বইকি।—অবিনাশবাবুর গলা কাঁপতে লাগল: নিজের দেশে আমরা এতকাল পরদেশী হয়ে ছিলাম, আজ দেশের মধ্যে উনি আমাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমস্ত জীবন দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে। তুমি এই গানটা শুনেছ কখনো?—

হঠাৎ গুন্ গুন্ করে গাইতে সুরু করলেন অবিনাশবাবু:

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে
এ দেশ তোদের নয়—
এই যমুনা গঙ্গা নদী,
তোদের ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে গোরা সৈন্যে
জাহাজ কেন বয়—

রঞ্জু বিহ্বল হয়ে বসে রইল। অবিনাশবাবুর কথা সে বুঝতে পারছে না, ধরতে পারছে না তাঁর ব্যবহারের একটা সঙ্গত ও শোভন অর্থ। সবই তার কাছে বিচিত্র বিস্ময়কর বলে বোধ হচ্ছে।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল অবিনাশবাবুর। এতটুকু একটা ছেলের সামনে এই ভাবে খানিকটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়েছেন তিনি। সামলে নিয়ে বললেন, তুমি গান গাইতে পারো রঞ্জন?

—ভালো পারি না।

—আমি তোমাকে গান শেখাব। শিখবে? অনেক ভালো ভালো গান, নতুন নতুন গান।

—শিখব।

বাইরে বেলা পড়ে আসছিল। আত্রাইয়ের নীল জলে লাল-রোদের ঝিলিমিলি। নদীর ওপারের বাগানগুলোর ওপর দিয়ে বকের ঝাঁক উড়ে চলেছে। অবিনাশবাবুর খেয়াল হল।

—আজ আর নয়, অন্যদিন হবে। চলো, বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসি তোমায়।

কিন্তু রঞ্জুর মনের মধ্যে উদগ্র কৌতূহলটা থেকে থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। বাড়িতে শাসনের ভয়টা মন থেকে যে মুছে গেছে তা নয়, বুকের ভিতরেও দুর দুর করছে এখনো, তবু ভরসা আছে অবিনাশবাবু একটা কিছু উপায় করে দেবেনই। কাজেই ভয়ের চাইতে একটা কৌতূহলের পীড়নই এখন বেশি তীব্র বলে বোধ হচ্ছে।

—আচ্ছা, অবিনাশকাকা?

—কী বলছিলে?

—আপনি—দ্বিধা জড়িত ভাবে রঞ্জু থেমে গেল।

—আমি কী?—সস্নেহ কৌতুকে অবিনাশবাবু বললেন, কী জিজ্ঞাসা করছিলে?

—আপনি ক্ষুদিরামের কারখানায় একদিন আমাকে নিয়ে যাবেন।

—ক্ষুদিরামের কারখানা! সে কী?

—বাঃ, সেই যেখানে বোমা আর কামান তৈরি হয়? মাটির তলায়, সমুদ্রের জলে—

অবিনাশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

—এসব কথা তোমায় কে বলেছে?

রঞ্জু বুঝতে পেরেছে একটা বোকামি করে ফেলেছে কোথাও। ক্ষীণ স্বরে বললে, আমি শুনেছি।

কৌতুক-প্রফুল্ল-মুখে অবিনাশবাবু বললেন, আর কী শুনেছ?

—আপনি তাদের খবর জানেন, আপনি তাদের দলের—

হেসে উঠতে গিয়েও হঠাৎ কেন যেন অবিনাশবাবু থেমে গেলেন। শান্ত কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জুর দিকে। বললেন, তুমি এখনো একেবারে ছেলেমানুষ—এসব কথা এখন বুঝতে পারবে না। শুধু একটা জিনিস মনে রেখো। আজ যাঁর ছবি তোমাকে দেখালাম, তিনি স্বদেশী বটে, কিন্তু এ দলের নন। তিনি বলেন, বোমা কামান দিয়ে কখনো অন্যায়কে জয় করা যায় না, তাকে জয় করা চলে ত্যাগে, জয় করা যায় অহিংসায়। আমি সেই মন্ত্রের সাধক, ক্ষুদিরামের কারখানা যদি কোথাও থাকে, তার সন্ধান নেওয়ার অধিকার আমার নেই।

রঞ্জুর চোখমুখে অবিশ্বাসের ছায়া স্পষ্ট হয়ে আসে—কথাটা বোঝেও নি, গ্রহণও করতে পারে নি। মৃদু হেসে অবিনাশবাবু বললেন, চলো, এবার বাড়িতে তোমাকে জিম্মা করে দিয়ে আসি।

শিলালিপিতে আঁচড় পড়ল সেই প্রথম। ক্রমশঃ

আমার শৈশবের পাঠশালা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমাদের পূর্ব্বে গ্রামের পাঠশালায় গুরু ছিলেন—'রাম মশায়'। তাঁর বিদ্যাসাধ্যি বেশী ছিল না—তাঁর ছাত্রগণের মধ্যে কেহই তেমন শিক্ষিত হইতে পারেন নাই—একমাত্র ৺যতীন্দ্রনাথ মল্লিক মাতুল মহাশয় Executive Engineer হইয়াছিলেন। তাঁহার মত প্রতিভাবান সুদক্ষ খাঁটি লোক কেন আরও বড় হইতে পারেন নাই? জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হাসিয়া বলিতেন 'রাম মশায় হাতে খড়ি দিয়াছিলেন, এতদূর যে কি করে উঠেছি আমি তো তাই ভাবি—আমার সহপাঠীদের মধ্যে কেউই দ্বিতীয় ভাগের উর্দ্ধে ওঠে নাই।'

'লেখা পড়া করিবে মরিবে দুখে
মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে'

ইহাই তখনকার গ্রামের ছেলেদের শাস্ত্র বচনের ন্যায় পালনীয় ছিল।

লেখা পড়া করে যে
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে।

ইহার কোনো সার্থকতা ছিল না—কারণ গাড়ী ঘোড়া দেখিবারই সৌভাগ্য অনেকের ছিল না।

রাম মশায়ের গদীতে যিনি বসিলেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী রায়—তাঁহার বাড়ী ছিল 'তিল্‌তিনে গোপালপুর'—সে স্থান কচু ও পুঁইএর জন্য বিখ্যাত। একটী বিবাহে পণ্ডিত মহাশয় শ্রীখণ্ডে বরযাত্রী গিয়াছিলেন; সেখানে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—পুঁই কচুতে কি সমাস? পণ্ডিত মহাশয় উত্তর দিতে পারেন নাই। আমাদের গ্রামের হাস্যরসিক বৃদ্ধ গোপাল বড়াল তাদিকে বলিয়াছিলেন 'এটা আর জান না বাপু—সুপসুপেতি।'

পণ্ডিত মহাশয় ভালই পড়াইতেন, তাঁহার পড়া শুনা ছিল। যদুগোপালের তিন ভাগ 'পদ্যপাঠে' তিনি অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন—ঐ তিনখানি পুস্তক হইতে এত সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করিতেন যে আমরা শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম।

আমি ৯।১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার পাঠশালে ছিলাম। তিনি একটু প্রগতিশীল লোক ছিলেন—'ইঁটেখাড়া' 'গোপালনাড়ু' প্রভৃতি শাস্তির পক্ষপাতী ছিলেন না—যদিও তাহার বিভীষিকা তখনো পূর্ণমাত্রায় ছিল। কচিৎ কখনো দাঁড় করাইতেন—তবে বেত ব্যবহার করিতেন। খড়ি বা তালপাতায় কম দিন লিখাইয়াছিলেন—ভাঁজ করিয়া কাগজে লিখাইতেন এবং মক্স করাইতেন।

'কথামালা' পড়িয়া জানিয়াছিলাম—সিংহ পশুরাজ, শৃগাল ধূর্ত্ত, গাধা নির্ব্বোধ—সারস পিতৃমাতৃ ভক্ত। বাঘ ও মেষ-শাবকের গল্প পড়িয়া বাঘ না দেখিলেও তাহার উপর চটা ছিলাম, আরও চটিয়া গেলাম।

পণ্ডিত মহাশয় "ওই যে বিটপী শ্রেণী হেরি সারি সারি" কবিতাটী এমনি অনুরাগ ও আগ্রহের সহিত পড়াইতেন যে আমরা তরুর সহিষ্ণুতা ও মহানুভবতায় অভিভূত হইলাম।

"যখন মানব কুল ধনবান হয়
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ—
অহঙ্কারে উচ্চশির না করে কখন।
ফল শূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত
নীচ প্রায় কারো ঠাঁই নহে অবনত।

এই প্রসঙ্গে বৃক্ষ ছেদনকারীকেও ফল ও ছায়া হইতে বঞ্চিত করে না। চন্দন-তরু সুগন্ধ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দেয় এবং আনুসঙ্গিক নানা কথা বলিয়া পাঠকে মনোজ্ঞ ও মধুর করিতেন।

"কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি
সকল সময়ে বন্ধু সকলের তিনি"

এবং

"সাবধান, সাবধান, ওরে মূঢ়মতি
সতত জাগ্রত রন জগতের পতি।"

এমনি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে পড়িতেন—যে তাহাতে তাঁহার ঈশ্বর বিশ্বাস মূর্ত্ত হইয়া উঠিত।

'সন্ধ্যা' কবিতায় "সাধপুরে তানপুরা ঝিঁঝিঁতে বাজায়" এখনো ঝিঁঝিঁর ডাকে তানপুরার আওয়াজ আনিয়া দেয়। "দেবালয়ে নিনাদিত হতেছে কাঁসর" উহার স্বর কর্কশ নহে, কেন উহা শান্ত রস মনে আনিয়া দেয় তাহা তাঁহার বর্ণনা গুণে স্মরণীয় হইয়া আছে।

যদুগোপালের একটা কবিতায় আছে—

'প্রাতঃস্নান করিতেন মাতা পুণ্যবতী'

কবির স্নানরতা পুণ্যবতী জননীর মূর্ত্তি পণ্ডিত মহাশয় আমাদের চক্ষে ফুটাইয়া তুলিতেন।

'যমের অত্যাচার' পড়িয়া চোখে জল আসিত। আর যমের উপর বারতর রাগ হইত। রাবণ রাজা যমকে অশ্বশালায় সহিস করিয়া রাখিয়াছিলেন শুনিয়া আনন্দ পাইতাম।

"পিঞ্জরে বসিয়া শুক মুদিত নয়ন'

আমাদের মনে ব্যথা দিত। পালিত হরিণের "এই যে গলায় রজ্জু রয়েছে বন্ধন" প্রভৃতি পংক্তি হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া তুলিত। আবার

'গুড় জন্মে ইক্ষু হইতে মূলে কিম্বা ফলে
ধান হতে বহির্গত তণ্ডুল কি ফলে?
খাইতে নিপুণ বটে অন্ন রুটি ডাল,
কি সে জন্মে জিজ্ঞাসিলে ঘটিবে জঞ্জাল।'

যখন পড়াইতেন তখন আমরা খুব হাসিতাম—সে হাসি ঠিক তাঁহার হাসি দেখিয়াই হাসা নয়। কবিতা পড়াইতে পণ্ডিত মহাশয় তন্ময় হইয়া যাইতেন, তাঁহার মুখে চোখে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিত। কখনো আনন্দে কখনো বিষাদে তাঁর চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইত।

"পর পদাঙ্কিত মার্গে করিতে গমন
কল্পনা কৌতুকী কভি ভাবে অপমান।"

এ ছত্র দুটীর কত ভাবেই ব্যাখ্যা করিতেন—সে বয়সে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, তাঁহার পাণ্ডিত্যে অবাক হইতাম।

যদুগোপালের একটী কবিতা—

'কুব্জ পৃষ্ঠ মুব্জ দেহ সারি সারি উট
চালকের ইঙ্গিত মাত্রেই দেয় ছুট'

এ দুটী লাইন পণ্ডিত মহাশয় মোটেই পছন্দ করিতেন না—উহা প্রায়ই উপহাসের সহিত আবৃত্তি করিতেন।

এই পণ্ডিত মহাশয়ই যখন পাটীগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি ও শুভঙ্করী পড়াইতেন তখন তাঁহাকে যণ্ডামার্কের মত ভয়াল মনে হইত। চৌবাচ্চার দুটী নলের অঙ্ক আমার অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। কেন চৌবাচ্চাটী পূর্ণ বা খালি করিতে হইবে? কত সময় লাগিবে তাহা জানার কি দরকার?—আমি কিছুই ধারণা করিতে পারিতাম না। ইউক্লিডের জ্যামিতি নামটাই এত বিশ্রী ও কাটখোট্টা যে উহা স্পর্শ করিতেই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। রেখাগুলোকে লৌহশলাকার ন্যায় মারণাস্ত্র মনে হইত। 'সম্পাদ্য' 'উপপাদ্য' 'স্বতঃসিদ্ধ' এই কয়টী দুর্জ্ঞেয় কথা মাত্র আমি শিখিয়াছিলাম। শুভঙ্করীর আর্য্যা একেবারে অখাদ্য। চিনিতে বুলানো কুইনিন পিল্—অতিরিক্ত তিক্ত।

পরিমিতি খুলিয়া পড়িই নাই। ছোট বালকদিগকে তখন কেন এই সব কঠিন বিষয় দেওয়া হইত জানি না। পাঠশালা হইতে প্রথম দর্শনেই অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি আমার বৈরীভাব। উহা চিরদিনই ভীম ছিল, কখনো কান্ত হয় নাই। কেবল এফ্-এ পড়িবার সময় রিপণ কলেজে অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের যাদুস্পর্শে এই গণিতই কাব্যের ন্যায় মধুর ও মনোরম হইয়াছিল। ইহার যত কিছু কাঠিন্য ও কর্কশতা গিয়া—সকল কাঁটা গোপন হইয়া ফুটিয়াছিল।

আর একটা বই 'শরীর পালন' আমার পক্ষে বড়ই অস্বাস্থ্যকর ছিল, পড়িলেই জ্বর আসিত। এক বৎসর ওই বই পাঠ করার পর আমি মাত্র শিখিয়াছিলাম—"আলু পটোল কচু কাঁচকলা অতি উপকারী তরকারী।"

ব্যাকরণকে ভাল বই বলিয়া মনে হইত না—ঐ সকল বই যাঁহারা লিখিতেন তাঁহাদের সম্বন্ধে মনে হইত "আহা কি নির্দ্দয়! উহাদের কি কেহ অভিভাবক নাই যে ঐ সব পুস্তক লিখিতে নিষেধ করে?"

বিখ্যাত ব্রহ্মমোহন মল্লিক, পি, ঘোষ প্রভৃতির মর্য্যাদা আমি তখন বুঝিতে পারিতাম না।

ঐ সকল পুস্তকের মলাটের রঙ ও আকার আমার অপ্রীতিকর ছিল। ঐ সকল পুস্তকের অধিকাংশ তখন "হেয়ার প্রেসে" ছাপা হইত, তাই সেখানকার ছাপা কোনো বই পড়িতেই ভয় পাইতাম। এ ভয় বহুদিন ছিল। কলিকাতায় গিয়া যখন স্কুলে পড়ি তখনো

চন্দ্রশেখর কর প্রণীত 'অনাথ বালক' নামক সুন্দর পুস্তকখানি ঐ প্রেসে ছাপা বলিয়া প্রথমে পড়িতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু পড়িয়া বিপুল আনন্দ পাই এবং প্রেসের উপর হইতে আমার Ban উঠাইয়া লই—ধারণার পরিবর্ত্তন হয়।

যখন পাঠশালে পড়িতাম, তখন স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। তবু "স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" এই কবিতাটী পণ্ডিত মহাশয় ভাল পড়াইতেন এবং স্বাধীনতার গৌরব বুঝাইয়া দিতেন। আমরা যে পরাধীন জাতি সেই প্রথম শুনিলাম। আর 'কথামালার' গৃহপালিত কুকুরের বগ্‌লস ও শিকলের দাগ আমাদের বালক হৃদয়েও ব্যথার দাগ রাখিয়াছিল।

অসীম বুদ্ধিমান বালক ছিলাম না, মনোযোগীও ছিলাম না—দুর্ব্বল হইলেও দুরন্ত ছিলাম, তজ্জন্য অনেক প্রহার খাইয়াছি। একবার দেহে রক্তপাতও হইয়াছিল। ঝুলঝাপ্পুর খেলিতে গিয়া দুইবার গাছ হইতে পতন ও মূর্চ্ছা হয়। দিদিমাকে বহু দুশ্চিন্তা ও অর্থব্যয় করাইয়াছি। একবার তো যমরাজের সঙ্গে প্রায় 'চথোচোখী' করিয়া ফিরিয়াছি।

পাঠশালে আমার উপরে যাহারা পড়িতেন তাহার মধ্যে শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও মণীন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় দুই জনেই আমাকে শেষ পর্য্যন্ত সমভাবে অগাধ স্নেহ ও আদর করিয়া গিয়াছেন। এমন সুখে দুখে সমভাগী সহৃদয় আত্মীয় কমই পাইয়াছি।

আমার নানা দোষ সত্ত্বেও পণ্ডিত মহাশয় ভালবাসিতেন এবং 'বয়স বুদ্ধি খুলবে' এই আশ্বাস বাণী দিতেন। বোধহয় আমার মহীয়সী মাতামহীকে তুষ্ট করিবার জন্য।

পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া আবার উপনয়নের পর আমার মাতার জ্ঞাতি ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের নিকট কলিকাতা যাই—দিদিমা সঙ্গে যান। মাতুল মহাশয় আমাকে Mr. D. N. Das এর Century Shoool এ ভর্ত্তি করিয়া দেন। ৪ঠা আষাঢ় বোধ হয়, ইংরাজী ১৮৯৫ কি ৯৬ সালে যাই। সে সব কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

পাঠশালায় বহু কষ্ট ও অসুবিধা ছিল কিন্তু বীণাপাণির মন্দিরের এই প্রথম সোপান আমার বড় ভাল লাগিত। কত উচ্চ আকাঙ্খা জাগিত, কত বৃহৎ বৃহৎ সম্ভাবনা মনে উঁকি মারিত—

রুই মাছ এসে ঠোকর দিত
পুঁটী মাছের বড়শীতে।

সব কিছুরই পরিবর্ত্তে

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল

'সীতা' ক্যাম্পে প্রবল ঝঞ্ঝাবাত হইয়া গিয়াছে। একটি সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট উচ্চ পর্ব্বতচূড়ার উপর এই ক্যাম্পটি অবস্থিত। যে সহস্র সহস্র হতভাগাদের দল শুধু প্রাণটুকু মাত্র সম্বল করিয়া শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার আশায় উর্দ্ধশ্বাসে ব্রহ্মদেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে তাহাদের অধিকাংশই আসিয়াছে টামু-ওয়ানজিং পথে, চুয়াম্ন মাইল ব্যাপী ভয়সঙ্কুল গিরিবর্ত্ম পার হইয়া। সীতা ক্যাম্প এই পথের সর্ব্বোচ্চ পাহাড়ের শীর্ষদেশে।

সে রাত্রে আকাশের বুকে যেন ঝড়ের বান ডাকিল। রুদ্র দেবতার ধোঁয়াটে জটার এক একটা গুচ্ছ গড়াইয়া ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে দক্ষিণ হইতে উত্তরে ছুটিয়া গেল। মহাশূন্যের বুক চিরিয়া আগুনের হল্কা ছড়াইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ করাল আট্টহাসি এবং তুহিন শীতে তীক্ষ্ণ খর বারিপাত। এক ঝাঁক জঙ্গী বোমারু যেন লক্ষ লক্ষ বরফের গুলি নিক্ষেপ করিয়া গেল।

উপরের খড়ের চালটা দড়ি ছিঁড়িয়া উড়িয়া যাইতেই অমরেশ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। পার্শ্বে তাহার স্ত্রী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অমরেশ তাহাকে ঝাঁকানি দিল, বীণা সাড়া দিল না, একটা জড় পিণ্ডের ন্যায় পড়িয়া রহিল মাত্র। বুকে তার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা স্বস্তি। অমরেশ কন্যাটিকে একবার মাত্র স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারিল যে স্বস্তির প্রাণবায়ু ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরের পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া মহা অনন্তে মিশিয়া গিয়াছে। ওর নির্জ্জীব দেহটাকে কোনরূপে বীণার বুক হইতে কাড়িয়া পাহাড়ের গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে পারিলেই বাঁচা যায়।

সে প্রায় যুগাধিকের কথা। সদ্যবিবাহিতা বীণা আর প্রৌঢ়া জননীকে লইয়া অমরেশ সাগর পাড়ি দিয়াছিল, সেদিন ছিল তার প্রাণে অফুরন্ত মাতৃপ্রেম, অপূর্ব্ব মাতৃনিষ্ঠা। জননীই ছিল একমাত্র আরাধ্য দেবতা—তাহার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। শাশুড়ীর প্রতি বীণার অনন্যসাধারণ ভক্তি ও নিষ্ঠা অমরেশের সংসারে স্বর্গের সুরভি বহাইয়াছিল। কাত্যায়নী আজ বৃদ্ধা, কোনক্রমে পথের যন্ত্রণা সহ্য করিয়া

'সীতা' পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছেন। আশা, শুধু আশা—বাঁচিবার অদম্য আশায় স্খলিত চরণে কম্পিত বক্ষে কাত্যায়নী অমরেশের সঙ্গে চলিয়াছেন মানবেতিহাসের এই বিরাট অভিযানে—ব্রহ্মের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে সুরু করিয়া ভারতের উত্তরপশ্চিম সামা পেশোয়ার পর্য্যন্ত যে মহাপথ বিস্তৃত। অতীতের ইতিবৃত্তে এ ক্রুসেডের তুলনা নাই।

টর্চ্চ জ্বালিয়া অমরেশ দেখিল, সাড়ে চারিটা বাজিয়াছে। ঝড়ের বেগ অনেকটা প্রশমিত। পূব-আকাশের গা বহিয়া মেঘ-পুঞ্জগুলি তখনো ছুটাছুটি করিতেছিল। ডিসেম্বরের 'অমাবস্যার' এট্‌ল্যান্টিকের উপর ভাসমান আইসিক্লিসের সম ঝাপসা ঠেকে উহাদের। সকাল হইবার আর দেরী নাই।

ধীরে ধীরে বন্যার বাহু-অর্গল হইতে স্বস্তির হিম-শীতল দেহটিকে অমরেশ উঠাইয়া লইল। পার্শ্বে তাহার বৃদ্ধা জননী একটা কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছেন—আর তাঁহার কণ্ঠসংলগ্ন নিথর হইয়া পড়িয়া আছে অমরেশের একমাত্র পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র প্রশান্ত।

বীণা মূর্চ্ছিতা, আর্ত্তনাদ করিবার মত জ্ঞান তাহার নাই। পাশেই অল্প দূরে একটা নগ্ন চূড়া—অমরেশ ধীরে ধীরে তাহার শিখর দেশে উঠিতে লাগিল। মনে পড়িল, ঠিক তিন দিন পূর্ব্বে এমনি সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা মিনতিকে ভারত ব্রহ্মের সীমান্ত সঙ্গমে এক খরতোয়া পাহাড় চারিণীর করাল গহ্বরে স্বহস্তে নিক্ষেপ করিয়াছে। বীণা এবং জননী কেহই সে কথা জানিতেন না—জানিত শুধু অমরেশ, আর কালকূট উদ্‌গারী প্রলয় দেবতা···কী মারাত্মক, কী বিষাক্ত এই বিসূচিকা··

স্বস্তির মুখের উপর টর্চ্চ ফেলিয়া অমরেশ শিশু-কন্যাটিকে বোধহয় দেখিয়া লইয়া, তার শীর্ণ মৃত্যুশ্যাম ওষ্ঠে একবার চুম্বন করিয়া দেহটিকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া নীচে নিক্ষেপ করিল। পূর্ব্বাকাশে সপ্তাশ্বের হ্রেষারব বহন করিয়া দু একটা রশ্মিছটা জমাট মেঘের ফাটল দিয়া উঁকি দিয়া গেল। অমরেশ আজ আর সবিতৃদেবকে প্রণাম জানাইল না। অব্যক্ত একটা অনুভূতির শিহরণ তাহার সর্ব্ব দেহে ও মনে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। মসীকৃষ্ণ পাহাড়ের গহ্বর প্রদেশে নিশ্চল স্থাণুবৎ তাকাইয়া রহিল শুধু। পার্শ্বের গুল্মরাজি তাহার দুঃখে অশ্রুমোচন করিল, কিন্তু অমরেশের নয়নে বাষ্পটুকু পর্য্যন্ত নাই।

আকাশ এইবার রক্তরাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। বেলা নয়টা। প্রশান্তও রোগাক্রান্ত হইয়াছে।

দুর্য্যোগবিধ্বস্ত ক্যাম্পের ডাক্তার জানাইলেন, তাঁহার সমস্ত ঔষধপত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইনজেক্‌সনের টিউবগুলি সব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রশান্তর অবস্থা তখনো অতটা খারাপ হয় নাই। তাড়াতাড়ি করিয়া নয় মাইল পরের ক্যাম্পে পৌছাইতে পারিলে ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে। আর তাহা ছাড়া সীতার সব অঙ্গাবরণ গত রাত্রে দস্যু লুট করিয়াছে, ডাক্তার পরিহাস করিলেন। ঠোঁট বাঁকাইয়া অমরেশ কহিল, এ দুঃখ আজ শুধু একা সীতারই নয়, ডাক্তারবাবু—

অনেক চেষ্টাতেও ডুলি পাওয়া গেল না। বিসূচিকার রোগীকে কে বহন করিবে? প্রশান্তর অবস্থা এখনো খারাপ, কাঁধে বহিয়া ঘণ্টাকয়েকের রাস্তা যাওয়া চলিবে না। অবশেষে বেলা এগারোটার সময় অমরেশ প্রশান্তকে কাঁধে করিয়া বাহির হইয়া পড়িল, পশ্চাতে শীর্ণা বীণা আর বৃদ্ধা কাত্যায়নী। সকলের হাতে একটি করিয়া লাঠি। বাতাস বেশ ঠাণ্ডা তাই রক্ষা, নচেৎ ভাবিতেও ভয় হয়। চড়াই, আবার চড়াই, এ যেন যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ। বীণার মনে হয়—তাহার মিনতির, তাহার স্বস্তির সূক্ষ্মদেহ তাহাকে ঘিরিয়া তাহারই চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন হাত বাড়াইলেই উহাদের ধরা যায়। ভাবে, আরো-আরো আরো একটু উঠিলেই সে নিজেও সূক্ষ্ম হইয়া যাইতে পারে। বাতাস এত হাল্কা, দেহ ও মন তাহার এত হাল্কা যে অমরেশ মরিয়া গেলেও তাহার কোন কষ্টই হইবে না।

প্রশান্ত যন্ত্রণায় কাঁদিয়া উঠে।

অমরেশের শীর্ণ হাড়ে উহার কষ্ট হইতেছে, তাই।

প্রশান্ত নিথর হইয়া আসে, চোখের পাতা বুজিয়া যায়। অমরেশের ক্ষিপ্ত হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিয়া পড়ে—জোরে—জোরে, আরো জোরে, এখনো যে তিন মাইল বাকী—

বীণাকে ধমকাইয়া উঠে, এসো না তাড়াতাড়ি, এটাও যে যায়—

বীণা দ্রুত আগাইয়া আসে।

পিছন হইতে কাত্যায়নী বলেন—ও বৌমা, দাঁড়াও বাছা আমি যে আর হাঁটতে পারি না, একটু আস্তে চল মা। দেহটার উপর কী অদ্ভুত প্রগাঢ় মায়া!

অমরেশ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সে দৌড়াইয়া চলে, পায়ের সমস্ত গ্রন্থি তাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে সবল হইয়া উঠে—ঐ, ঐ—শেষের চড়াইটা, আর ভয় নাই, প্রসূন প্রসূন তোকে বাঁচাবোই বাবা, যে করেই হোক, আর বেশী দেরী নেই, এলাম বলে, এলাম বলে, আর একটু কষ্ট করে থাক মাণিক আমার।

শেষের চড়াইটায় অমরেশ যখন পৌঁছাইল, বেলা তখন চারটা। বীণার পাখার ডানা গজাইয়াছে; প্রশান্তকে যে বাঁচাইতেই হইবে, তাহার যে আর কেহ নাই, মিনতি—স্বস্তি—উঃ মাগো···না না প্রসূন আছে ত! বাছা আমার, মাণিক আমার, বড্ড কষ্ট হচ্চে বাবা?

এইবার নামিবার পালা।

প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফিট উচ্চতা হইতে দেড় হাজার ফিটে নামিতে হইবে। পাহাড়ের গাত্র বহিয়া যেন একটা সুদীর্ঘ সরিসৃপ পড়িয়া রহিয়াছে, পৃষ্ঠ তাহার মসৃণ ও পিচ্ছিল। তাহার পিঠ বহিয়া কোন অতলে নামিতে হইবে কে জানে।

অমরেশ লাফাইয়া উঠিল, আর দেরী নেই, ঘণ্টা দুয়েকের ভেতরেই ক্যাম্পে পৌছান যাইবে, তারপর ডাক্তার—ইনজেকশন, একটু বার্লি—সুনিদ্রা, প্রশান্ত ভাল হইয়া উঠিবেই—প্রশান্ত ভাল হইবেই—

—বীণা, বীণা, আর ভয় নেই। প্রসূনকে বাঁচাবোই বীণা—ভেবোনা আর···

অমরেশ নামিতে লাগিল, বীণা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া চলে। পশ্চিম গগনে সূর্য্য হেলিয়া পড়ে, দৃষ্টি আর কোথাও নাই উহাদের—শুধু সম্মুখের বিসর্পিল পথ ছাড়া।

কাত্যায়নী দ্রুত নামিতে পারেন না, স্খলিত চরণ শিথিল হইয়া পড়ে, জানুদ্বয় থর থর করিয়া কাঁপে, মাথা ঘুরিয়া উঠে। চীৎকার করেন, বৌমা দাঁড়াও মা, আমি যে পড়ে যাচ্ছি মা—

বীণা অমরেশের হাত ধরিয়া বলে, ওগো মা যে আসতে পারচেন না, কি হবে গো?

অমরেশ তাহার হাতে ঝটকা মারে—বলে, প্রসূনকে চাই বীণা, প্রসূনকে বাঁচানো চাই। কণ্ঠস্বর তাহার নির্ম্মম হইয়া উঠে।

—মা যে আসতে পারচেন না······

—না, না, প্রসূন আমার—আর একটুখানি বাপ—বীণা চীৎকার করে—ওগো মা যে বসে পড়লেন······ওগো শুনচ······মা কি ভাববেন?

অমরেশ তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে—দুনিয়াতে আর কেহ নাই—শুধু প্রসূন, প্রসূন তার একমাত্র জীবিত সন্তান প্রশান্ত। মা কি ভাবিবেন, তাহা বিশ্লেষণের সময় তাহার নাই। কর্ত্তব্য, নিষ্ঠা, ভক্তি? ও সমস্ত বুজরুকি—ও শুধু ভাণমাত্র—প্রাণ চাই, প্রশান্তর প্রাণ চাই—

বীণা ছুটিতে ছুটিতে বলে, দাঁড়াও, ওগো দাঁড়াও····

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে দুইটি বাঙ্গালী তরুণ যুবক পথ বাহিয়া চলিয়াছে। পথের পার্শ্বে এক করুণ আর্ত্তনাদে সচকিত হইয়া উহারা চমকিয়া দাঁড়াইল।

কাতর কণ্ঠে কাত্যায়নী কহিলেন—কে বাবা তোমরা? বাঙ্গালী কি?

—হ্যাঁ মা, আপনি কে?

বৃদ্ধা আদ্যোপান্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বৃদ্ধার আক্রোশ—বীণা কেন দাঁড়াইল না? উঃ পেটের মেয়ে হলে কি এমনি করে বাঘ ভালুকের মুখে ফেলে যেতে পারে? এযে পরের মেয়ে, তাই অনায়াসে শাশুড়ীকে পথের মাঝে মরতে রেখে গেল।

যুবকদ্বয় তরুণ, নিষ্ঠুর পুত্রবধূ এবং নির্ম্মম পুত্রের কর্ত্তব্য-হীনতায় বিরক্ত হইয়া যথেষ্ট অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য জ্ঞাপন করিল।···তাহারা টর্চ্চ জ্বালিয়া চলে, বৃদ্ধা সেই আলোকে নিজের পথ চিনিয়া লয়।

বহু খোঁজাখুঁজির পর অমরেশের সন্ধান পাওয়া গেল, কৃষ্ণা দ্বাদশীর চন্দ্র সবেমাত্র উঠিয়াছে তখন। সংক্রামক রোগগ্রস্ত রোগীর স্থান ক্যাম্প হইতে বহুদূরে—

ক্ষীণ একটি প্রদীপের পার্শ্বে, দুইটি অসহায় নরনারী—একটি শিশুকে সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া আছে, চোখে তাহাদের সর্ব্বহারার উদাস দৃষ্টি। প্রথম যুবকটি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—আচ্ছা

ভদ্রলোক ত আপনি মশাই, বুড়ো মাকে জঙ্গলের ভেতর ফেলে দিয়ে খুব সন্তানের কাজ করেছেন—ভুলে গেছেন যে দশ মাস দশ দিন মা পেটে ধরে আপনাকে পৃথিবীতে এনেছেন—উঃ কী অপদার্থ আপনি······

নিদারুণ করুণ নয়নে বীণা তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল—মর্মরসম অপলক নিষ্কম্প দৃষ্টিতে। স্পন্দনহীন ডাগর দুটি চোখ—চাহিয়াই রহিল শুধু। কাণে তাহার ঐ কথা-টাই বাজিতেছিল, 'দশমাস দশদিন পেটে ধরে পৃথিবীতে এনেছেন ?'

অমরেশ হাতে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল, প্রত্যুত্তর দিবার মত ইচ্ছা বা শক্তি তাহার ছিল না, শুধু একবার জননীর পানে রক্তাক্ত নয়নে তাকাইয়া দৃষ্টি নত করিল। নীচের প্রদীপের বুক চড় চড় করিয়া উঠিল, বোধ হয় অমরেশের নিরুদ্ধ হৃদয় কয়েক ফোঁটা অশ্রুতে সমস্ত উত্তর জানাইয়া দিল।

—কি নিষ্ঠুর তুই অমর ? কি করে মাকে তোর ফেলে চলে এলি ?

প্রাণসর্ব্বস্ব বৃদ্ধার তখন অন্য কোন লক্ষ্যই নাই। তাহার নিজেকে বাঁচাইতেই হইবে যে কোন প্রকারে—দুনিয়ার সব কিছুরই পরিবর্ত্তে ? হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিতে লাগিলেন, এই ছেলে দুটি যদি না আমাকে······

বীণা আর স্থির থাকিতে পারিল না, ভূলুণ্ঠিতা হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল, ওরে প্রসূন আমার, কি করে মাকে তোর ফেলে চলে গেলি······

প্রশান্তর নিস্পন্দ মৃতদেহটিকে বীণার বাহু বেষ্টন হইতে ছিনাইয়া লইয়া উর্দ্ধশ্বাসে অমরেশ বাহির হইয়া গেল।

পাশের বনে পাখার গা ঝাড়া দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। পূর্ব্বাকাশে তখন নিশীথিনীর নীলঘন শাড়ীর চুমকিগুলি ফ্যাকাশে হইয়া আসিতেছে।

ললিতা সখী

শ্রীজনরঞ্জন রায়

বর্ত্তমান সময়ে বৈষ্ণব সমাজে সিদ্ধ-সাধকগণের মধ্যে ললিতা সখী অন্যতম ছিলেন। বরং বলা চলে যে, তাঁহার অপূর্ব্ব সাধন ধারায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন। সখীভাবে-সাধন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে একটি চরম লক্ষণ। শ্রীগৌরাঙ্গ-রামানন্দ মিলনে তাহা এই ভাবে উক্ত হইয়াছে—

"অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা—

* * * সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাহি গতি ;

'সখী ভাবে' যেই তাঁরে করে অনুগতি,

রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায় ;

সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়।

(চৈঃ চঃ মধ্য—৮ পঃ)

এখানে 'গতি' অর্থে বোধ (grasp)। অর্থাৎ—সখীভাব না হইলে রাধাকৃষ্ণের গূঢ়লীলার গাঢ় অনুভূতি হয় না।

ললিতা ও বিশাখা, অষ্ট সখার মধ্যে প্রধানা। যে সাধকের যে প্রধানা সখার সহিত ভাবসাম্য থাকে, সেই সাধক সেই প্রধানা গোপীর অনুগত হইয়া ভজন করিবেন। —ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্রে গোপীভাবে ভজনের বিধান। সুতরাং ব্রজের সর্ব্বপ্রধানা সখা ললিতার সহিত ভাবসাম্য থাকায় তাঁহার শ্রীগুরুদেবের অনুমতি অনুসারে এই সাধকপ্রবর 'ললিতা সখী'—এই নাম গ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘকাল নবদ্বীপ-ধামে 'মঠবাড়ি' নামক আশ্রমে সুষ্ঠুভাবে নিজ ভজন সাধন করিয়া আসিয়াছেন।

শুনা যায়, এক রাত্রে হরিশ্চন্দ্র বসু মহাশয়ের পুরীধামস্থ রামচন্দ্র সাহীর বাটীতে চারিজন গুরুভাই—রাধাবিনোদ দাস, করুণাকর দাস, শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং জয়গোপাল ভট্টাচার্য্য, গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া রাসের অভিসার কীর্ত্তন করিতেছিলেন। করুণাময়—কৃষ্ণের বেশে সজ্জিত ছিলেন, রাধাবিনোদ—রাধারাণীর বেশে সজ্জিত, জয়গোপাল—ললিতার বেশে এবং শরৎ—বিশাখার বেশে সজ্জিত। রাস কীর্ত্তনের পর প্রথামত 'অলস' শয়ন করা হইল।

প্রসঙ্গতে প্রত্যেকে এত আবিষ্ট যে, কৃষ্ণের বামে রাধা এবং পর-পর ললিতা এবং বিশাখা শয়ন করিলেন। প্রাতে যখন ঘুম ভাঙিল তখন অন্য তিন জনের আবেশ ছুটিয়া গিয়াছে, তাঁহারা দ্বার খুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু জয়গোপাল আর বাহির হইলেন না। দ্বার বন্ধ করিয়া তিনি ঘরের মধ্যেই রহিয়া গেলেন। তাহাতে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। জয়গোপাল তখন ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছেন···ললিতার ভাব যেন তাঁহার ধাতে লাগিয়া গিয়াছে। বাবাজী মহাশয় (ললিতা সখার গুরুদেব শ্রীমৎ রাধারমণ-চরণ দাস) দ্বার খুলিবার জন্য বাহির হইতে শাসন

শ্রীমতী ললিতা সখী

বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। কিন্তু হঠাৎ যেন একটা দৈববাণী শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন! বাবাজী মহাশয়কে যেন কে বলিতেছেন—"ওগো, তোমার যেন হয় নি···তা' বলে' ওর কি হ'তে নেই ?···এখন তোমার (গুরুর) কাজ হচ্ছে ওর (শিষ্যের) ভাবকে বাড়িয়ে তোলা।" ইহার পর হইতে জয়গোপাল শুধু ললিতা—নামই গ্রহণ করিলেন না, গুরুদেবের অনুমতি মত তিনি সখাবেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন হইতে নিজেকে 'ললিতা দাসী' বলিয়া অভিহিত করিতেন। লোকে তাঁহাকে 'ললিতা সখী' এবং 'ললিতা দিদি' বলিয়াও ডাকিত।

এই সময় তিনি যুবক। বোধ হয় ত্রিশ বৎসর তাঁহার বয়স। বস্তু প্রভাবে তিনি এতই ডুবিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি আর ব্রজমায়ীর-বেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। ভাবের সহিত বেশের এরূপ সামঞ্জস্য রক্ষা করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে কদাচিৎ সম্ভব হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রে, বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব সিদ্ধান্তগ্রন্থে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই তাঁহার পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি বিনয়ের সঙ্গে বলিতেন—আমি কিছুই জানি না···আমি মূর্খ গোয়ালার মেয়ে! গোপীভাব যে নাম সংকীর্ত্তনে প্রবল প্রেরণা দেয়, ইহা তাঁহার জীবনে যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গভীর ভাবে যদি কেহ কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে—তবে সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে পারে "An intense anticipation transforms possibility into reality···our desires being often but the precursors. of things which we are capable of performing."

—ইহাই তাঁর সত্যকার চরিত্র কথা, তাঁহার সাধক-জীবনের ইতিহাস্। পূর্ব্বাশ্রমে তিনি কি ও কে ছিলেন, তাহার বিবরণ তাঁহার গুরুভ্রাতারাও বড় একটা জানেন না। যতটুকু জানা যায় তাহা এই যে, তিনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১২৭৮ সালে আষাঢ়ী পূর্ণিমায় (গুরু পূর্ণিমার দিন) তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার গুরুভাই প্রসিদ্ধ রামদাস বাবাজী মহাশয়ের অপেক্ষা তিনি প্রায় সাড়ে চারি বৎসরের বড় ছিলেন (রামদাস বাবাজীর জন্ম ১২৮৩ সালের ২২শে চৈত্র)। বরিশাল জেলার হরিসনা গ্রামে ললিতা দাসীর জন্ম হয়। দেশনেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের বাড়ির নিকটে এই গ্রাম। তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। প্রথম যৌবনেই ব্রহ্মচারী অবস্থায় তিনি ছাত্রভাবে নবদ্বীপ আসেন। এখানে চৈতন্য-চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিত ব্রজরাজ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করেন। পরে কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন। তৎপরে ঐ চতুষ্পাঠীতে খ্যাতনামা পণ্ডিত শিবগোবিন্দ ভারতীর নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও বিদ্যারত্ন উপাধি প্রাপ্ত হ'ন। ১৩০৩ সালে তিনি পুরীধামে যান। ঐ সালে পাণিহাটী হইতে শ্রীমৎ রাধারমণ-চরণ দাস বাবাজী (তাঁহার

অন্যতম প্রধান শিষ্য রামদাস বাবাজী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া পুরীতে যান। তাঁহারা তথায় গিয়া জয়গোপাল ভট্টাচার্য্যের সাক্ষাৎ পান। তখনও জয়গোপাল, রাধারমণ বাবাজীর নিকট দীক্ষা পান নাই। পুরীধামে জয়গোপাল, বাবাজী মহোদয়ের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। এইখানেই জয়গোপালের পরম ভাবস্ফূর্ত্তি হয় ও তিনি ললিতা দাসী নাম গ্রহণ করেন। গত ৫ই অগ্রহায়ণ সন্ধ্যা ৭-৩৫ মিনিটের সময় জ্বর বিকারে ৭৫ বৎসর বয়সে নবদ্বীপ মঠ-বাড়িতে তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। ঐ স্থানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে। তাঁহার অভাবে বৈষ্ণব সমাজের একটি অপূরণীয় ক্ষতি হইল এবং আমরাও একজন স্নেহশীল পরমহিতৈষী পথপ্রদর্শককে হারাইলাম। ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩, নবদ্বীপ মঠ বাড়িতে তাঁহার তিরোধান মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

২২

খোকার আহত হওয়ার সংবাদ যেমন করিয়াই হোক অপর্ণার কাছে পৌছিয়াছিল—দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া একটি স্প্রিং-এর 'দোলখাওয়া খোকা' লইয়া সে উপস্থিত হইল।

গৌরী সেলাই রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিল। অপর্ণা একটু ব্যস্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করিল—খোকা কেমন ?

—ভালই।

খোকা আজ অপেক্ষাকৃত শান্ত। ভাঙা বাম হাতটা ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাহায্যে যাহা করা সম্ভব তাহা করিতেছিল। দেয়ালের গায়ে কোন সিনেমা অভিনেত্রীর ছবিওয়ালা একখানা ক্যালেণ্ডার ঝুলিতেছিল; খোকা মাতার প্রস্থানের পরে তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পিতৃদেবের কলমের সাহায্যে অভিনেত্রীর মুখে একটি গোঁফ আঁকিতেছিল এবং আপনার শিল্প চাতুর্য্য বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। অপর্ণা পিছন হইতে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। খোকা ঈষৎ বেয়াকুব হইয়া কহিল—গোঁফ দিলাম—

অপর্ণা কহিল—বেশ ক'রেছ, কিন্তু কেন দিলে ?

—বাবার গোঁফ আছে যে!

—সেটা একটা অমোঘ কারণ বৈ কি ? এই ছাখো তোমার জন্যে কেমন খোকা এনেছি।

স্প্রিংএর খোকা দোল খাইতেছিল—খোকা এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া আনমনে কহিল—বাঃ বেশ ত!

—কাল তোমার হাতে খুব লেগেছিল ?

—হুঁ।

—কেন ওখানে গেলে ?

খোকা এ সকল অবান্তর প্রশ্নের জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া সংক্ষেপে কহিল—কাজ ছিল।

—আর যেও না, কেমন ?

—হুঁ।

গৌরী এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই। এতক্ষণে কহিল—আপনি শুনলেন কি ক'রে ?—তা এত দামী খেলনাই বা আনলেন কেন ? এ ত এক্ষুণি ভেঙে ফেল্‌বে—

—খেলনা চিরদিনই ত ভাঙবার জন্যে। আপনার খোকা আমাকে যেন বাঁধবার চেষ্টায় আছে।

গৌরী অর্থব্যঞ্জক ভাষায় কহিল—আমার খোকা বলে ত নয়, ওর বলে—

অপর্ণা আশ্চর্য্য হইল, তাহার এই আসা-যাওয়া হয়ত গৌরীর অভিপ্রেত নয়। সে কহিল—খোকা যে অমলের ছেলে, তা জানবার আগেই ত ও টেনে এনেছে।

—খোকার ভাগ্য। নইলে আপনি আমাদের মত লোকের বাড়ীতে আসবেন কেন ?

—ও কথা রোজ রোজ বলে লাভ নেই ভাই।

গৌরী একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিল। প্রসঙ্গান্তরে সে কহিল—কোথায় গিয়েছিলেন কাল ?

—বালিগঞ্জে বাপের বাড়ী।

—তারপরে ? একসঙ্গে এলেন কি ক'রে ?

—ও, আমি এলাম তাই আমার গাড়ীতেই নিয়ে এলাম।

—মাঠে যান নি হাওয়া খেতে ?

—হ্যাঁ, গড়েরমাঠ ঘুরেই এলাম।

—গৌরী মুখ টিপিয়া কহিল—ও তাই !

—তাই কি ?

—আস্‌তে দেরী হ'ল। খোকাকে নিয়ে ভেবে মরি !

খোকা সাক্ষ্য দিল—মাও কাঁদলে, আমিও কাঁদলুম।

অপর্ণা হাসিয়া উঠিল—খোকার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া। কহিল—তুমি ভারি দুষ্টু।

খোকা মাকে দেখাইয়া কহিল—মা দুষ্টু।

—কে বলেছে ?

—বাবা।

অপর্ণা কহিল—দুষ্টুই; যে অমল সকলকে কথায় জব্দ করে উনি তাকে জব্দ ক'রেছেন এমনি তার ক্ষমতা।

গৌরী প্রতিবাদ করিল—না না, আপনার কাজেই ও জব্দ।

অপর্ণা কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর খোকাকে নূতন খেলনার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইল, কিন্তু আজ সে সংশয় লইয়া ফিরিল। গৌরী হয়ত তাহার এই যাওয়া-আসা ও অমলের সহিত বন্ধুত্বের পরিচয়কে সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে মনে মনে হাসিল—অমলের কতটুকু সে পাইয়াছে—তবুও তাহাই হারাইবার ভয়ে সে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি নিয়া যক্ষের মত আগলাইয়া আছে! সে চাহিয়াছে সামান্য, তাই তাহার গৃহ আজ পরিপূর্ণ—কেবল আপন অতৃপ্তিকে অভিনয় দিয়া অমল ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

খোকা দুর্নিবার আকর্ষণে অপর্ণাকে টানিলেও তাহার গমনাগমন কিছু সংযত হইয়া উঠিল। খোকাকে নিজের গাড়ীতে লইয়া মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইত, কখনও একান্ত একাকী—এমন কি একটিমাত্র চাকর না লইয়াও নিজে নিজে গাড়ী চালাইয়া ফিরিত।

কয়েকদিন হইল অজিত কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল—অপর্ণা অত্যন্ত উদাসীনভাবে বিকালে মোটর চালাইতে গিয়া কি একটা অস্বস্তি তাহাকে যেন অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল—অমলের সহিত সামান্য আলোচনার পরে অপ্রকাশ্য কি যেন একটা বেদনা তাহার মাঝে বেগবান হইয়া উঠিয়াছে। বিদায় দিনের সেই বিষাদার্ত্ত মুখখানি তাহার স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে কেমন করিয়া বিদায় দিবে—অমলের জীবনের এই দারিদ্র্য সে কেমন করিয়া দূর করিবে। আপনাকে লাঞ্ছনা করিবার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাচুর্য্যের প্রলেপে যাহা চাপা পড়িয়াছিল আজ অমলের প্রত্যক্ষ জীবন তাহাকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে—বিগতদিনে ফিরিয়া যাইবার দুর্দ্দমনীয় লোভ তাহাকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টানিতেছে—

আনমনে গাড়ী চালাইতেছিল, শিয়ালদহের মোড়ে কে যেন একটা লোক চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল, ব্রেক দুটি নেহাত খুব ভাল তাই। অপর্ণা চাহিয়া দেখে অমল। অমল তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। অপর্ণা ডাকিল—অমল এসো—

—কোথায় ?

—বেড়িয়ে আসি, চল।

—নিরপরাধ পথিককুলকে চাপা দেওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছে যেন তোমার মাঝে রয়ে গেছে—

—কিন্তু তোমার মত কবি সাহিত্যিকের পক্ষে এ রকম হেঁটে চলাটা ত খুব মঙ্গলকর নয়। যাক্—চল। অমল উঠিয়া অপর্ণার পাশে বসিল। অপর্ণা কহিল—কোনদিকে যাবো ?

—যেখানে খুশী—ইচ্ছে হয় জাহান্নমে—

—আজ যাওয়া চলে—না ? অপর্ণা মাঠের দিকে দ্রুত গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল।

মোটর বেগে চলিতেছে। অপর্ণা হঠাৎ কহিল—একটা ঠুকে দিলে কেমন হয়, দুজনে শেষ একসঙ্গে।

—হয়, তবে বড়ই ইন্‌আর্টিষ্টিক ডেথ্‌ হবে। আর একটু ভদ্রভাবে মরার ইচ্ছে হয়—

—আলাই বালাই ষাট্‌, তোমার মরার ইচ্ছে হবে কেন ? স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসার ধর্ম্ম কর—

—ত্রুটি রাখিনি।

মাঠের মাঝে একটা নির্জ্জন রাস্তায় গাড়ী থামাইয়া অপর্ণা অমলের মুখের পানে চাহিয়া কহিল—তোমাকে কেন এনেছি জানো ?

অমল একটু চিন্তা করিয়া কহিল—জ্যোতিষ শাস্ত্র কিছু কিছু পড়েছি তবে এতদূর আয়ত্ত করতে পারি নি।

—সেদিন তোমার সঙ্গে ও-কটা কথা আলোচনা ক'রে কথারও শেষ হয়নি নেই, বরং কথা যেন বেড়ে গেছে—

—জানি, সে সমস্যা আরও বেড়ে যাবে। সাত বৎসর দেখা না হওয়ায় হয়ত বা সে সমস্যা কিছু কমেছিল আজ তা আবার বেড়ে গেছে। আজ আশায়, সংশয়ে উত্তেজনায় তা যেন আবার জীবনে গুরুত্ব নিয়েছে।

অপর্ণা কহিল—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে যেন একটা ছন্নছাড়া ভাব আমাকে আত্মার বিরুদ্ধে চালিত ক'রছে। এত অর্থ, এই মোটর, ওই বাড়ী সব যেন আজ জীবনে একেবারেই অবান্তর বলে মনে হয়। এর সব কিছুই বাদ দিয়েও ত জীবন আজ চল্‌তে পারতো—

অমল একটু হাসিয়া কহিল—যেমন আমার চল্‌ছে, কোন জায়গায় কোন গোল নেই, বাইরে থেকে তোমার মত দর্শকরা দেখে হিংসা করে, যেমন আমি তোমার মটর ও বাড়ী দেখে ঈর্ষা করি।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, যেন অকস্মাৎ তাহার কর্তব্য অত্যন্ত অস্থানে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অতি ধীরে সন্তর্পণে অমলের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সে কহিল—আমার বিরুদ্ধে কি তোমার কোন অভিযোগ নেই ? তোমার একক জীবনের জন্যে কি আমাকে কোন সময় দোষারোপ করনি !

অমল হাসিয়া কহিল—না।

—অত সহজেই না ব'ললে তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না।

—অনেকদিন অনেক ভেবেছি তাই উত্তরটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। যদি অভিযোগ থেকে থাকে তবে তার খানিক আছে নিজের বিরুদ্ধে, খানিক আছে ভাগ্যের বিরুদ্ধে। আজ মনে মনে বিশ্বাস করি ভাগ্য বলবান।

—তোমার নিজের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে ?

—আমি ভুল ক'রে ছিলাম, নিজের আশা কল্পনা আকাঙ্ক্ষার কোন সংযম ছিল না, নইলে তোমাকে আমার জীবনে আশা করেছিলাম। অন্ততঃ আজ সেটা হাস্যকর বলেই মনে হয়।

অপর্ণা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, অত্যন্ত সত্য কথা বলে মনে করি।

চৌরঙ্গীর বাড়ীগুলিতে দুই একটি করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মাঠের বুকে অন্ধকার ধীরে নিঃশব্দে কালো কুয়াশার মত জমিয়া উঠিতেছে। দুই একখানি আরোহীপূর্ণ মোটর রক্তচক্ষুতে তাকাইয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। জগতের পথ পার্শ্বে অত্যন্ত একাকী এই দুইটি প্রাণী যেন তপ্তশ্বাসে সবুজ মাঠের বুক তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর এই উৎসব, এই কোলাহল যেন আজ অত্যন্ত অপ্রয়োজনায়—আলোক যেন অসহ্য।

অপর্ণা ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—আমার কাছে চাইবার কি তোমার কিছুই নেই ?

অমল হাসিয়া উঠিল। অপর্ণা তাহার কাঁধের উপর বাম হাতখানি তুলিয়া দিয়া পুনরায় তাহার প্রশ্ন জানাইল। অমল মৃদু শান্ত কণ্ঠে কহিল—আমি যদিই চাই কিছু, তবে তা দেওয়ার কি ক্ষমতা তোমার আছে আজ ? বৃথা প্রবোধ দিয়ে লাভ কি বল—যা আজ গত তা গতই, তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না অপর্ণা। তোমার এ অনুশোচনা নিষ্ফল !

অপর্ণা ক্লান্তভাবে তাহার মাথাটা অমলের শীর্ণ স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া কম্পিত অস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল—অমল, তুমি জানো না, আজ তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আমি সর্ব্বস্ব পণ করেছি—এ অভিনয় আমার আজ অসহ্য হ'য়ে উঠেছে—

অমল কি যেন ভাবিল, তার পরে কঠোর কণ্ঠে কহিল—তুমি যেতে পারো আমার সঙ্গে যেখানে আমি নিয়ে যাবো তোমাকে ? দূরে—সমস্ত আভিজাত্য সংস্কার নীতিকে পেছনে ফেলে ?

অপর্ণা মাথাটা তুলিয়া দৃঢ়তরস্বরে কহিল,—পারি অমল, পারি। সে দিন হয়ত পারি নি—কিন্তু সে সাহস আজ আমার আছে।

—আছে ?

—হ্যাঁ।

—ভেবে দেখেছ ?

—কি ভাববো বল? সংবাদপত্রে হয়ত বেরুবে, "অমুক ব্যারিষ্টার পত্নীর অমুক সাহিত্যিকের সহিত গৃহত্যাগ?" দু'দিন লোকে আমাকে হয়ত তিরস্কার ক'রবে, তার পর ভুলে যাবে—ও হয়ত দুঃখিত হবে তার পর আবার গৃহ রচনা ক'রবে—অমল অপর্ণার কাঁধের উপর হাত তুলিয়া দিয়া মৃদু আকর্ষণে তাহাকে নিকটে আনিয়া কহিল—কিন্তু আমি আজ যা চাই—তুমি যার জন্যে আজ সমস্ত ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত তা আজ দেওয়া তোমার এবং আমার উভয়ের পক্ষেই একেবারে সাধ্যাতীত। যা পাওয়া যায় না কোনোদিন, তার জন্যে কেন এ অনুশোচনা—

—কেন পাওয়া যায় না?

অমল কহিল—ভেবে দেখেছি, তোমার এ দেহকে আজ ইচ্ছা ক'রলে আমি করায়ত্ত ক'রতে পারি। কিন্তু আমি ত তোমাকে চাই নি অপর্ণা—আজকার তোমাকে। আমি যাকে চেয়েছিলাম সে অপর্ণা আজ তোমার মাঝে মৃত, তুমি যাকে চেয়েছ সেও আজ আমার মাঝে নেই—এই দীর্ঘ সাত বৎসরকে পিছনে ফেলে যদি আবার আমরা সেই উন্মুখ যৌবনে ফিরে যেতে পারতুম তবে হয়ত সম্ভব হত, কিন্তু আজ? দেহাতীত কল্পনাচারী সেই উচ্ছল উজ্জ্বল অপর্ণাকে আমি চাই কিন্তু সে আজ পাব কোথা? তোমার দেহ ত আজ সে কল্পনাকে শান্ত ক'রতে পারবে না—জানি না তখনও তোমাকে পেয়ে এ বিলাসবৃত্তি তৃপ্তি হ'ত কিনা! তুমি আমার অপর্ণার অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ মাত্র—

অপর্ণা সংক্ষেপে কেবল বলিল—হয়ত তাই।

—আমরা যদি একত্র হ'তামও তবু মনে হয় দেহকে দিয়ে সে দেহাতীতকে পেতাম না—দুঃখ ক'রো না অপর্ণা। ফিরে যাও—মানুষের যতদিন কল্পনা আছে ততদিন সে একক। তোমার মত আমার মত তারা অশ্রুর প্রলেপে মানুষকে একাকী রেখে দেয়—গৃহ তাই কেবল গৃহই তার বেশী কিছু নয়। সেখানে পরিতৃপ্তি নেই—

অপর্ণা কহিল—হ্যাঁ তাই।

—তোমাকে তোমার জন্যেই আজ আরো একবার ত্যাগ ক'রে যাবো। চিটাগাং ট্রান্সফার তাই আমি মেনে নিয়েছি। অপর্ণা কথা কহিল না। সেদিনের মত আজও অত্যন্ত নীরবে নিঃশব্দে অন্ধকারের মাঝে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অমল জানিল না—অপর্ণা আজ কেন এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে মোটরে ষ্টার্ট দিয়া কহিল—তবে তাই হোক্—অমল।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রায় বাইশ বৎসর পরের কথা—

অমল আজ পক্ক কেশ বৃদ্ধ। বৃদ্ধমাতা বহুকাল পূর্ব্বে গত হইয়াছেন, গৌরীও আজ কয়েক বৎসর হইল অমলকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। খোকা আজ শিক্ষিত আধুনিক যুবক—এম্-এ তে ফার্ষ্ট' ক্লাস পাইয়া বি-সিএস এ ফার্ষ্ট হইয়া ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই। আজীবন কুমার থাকিয়া লেখাপড়া করিবার একটী বাতিক তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে—অন্ততঃ অমলের মত এইরূপ। অমল আজকাল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক-গণের একজন, শীঘ্রই একটী জয়ন্তী উৎসব তাহার হইবে, সে জন্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তোড়জোড় চলিতেছে।

দীর্ঘদিন বিদেশে থাকিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে—পুত্রের চাকুরীস্থলে যাইবার ইচ্ছা বিশেষ নাই। মনোমত একটি পুত্রবধূ খুঁজিবার জন্যে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। খোকা বার বার অমলকে তাহার চাকুরীস্থলে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিল কিন্তু এখন অভিমান করিয়া আর লেখে না। অমল একাকা মাঝারী রকমের একটি হোটেলে থাকে আর কলিকাতা আসিবার পর হইতে প্রায়ই ট্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। বয়েস গুণে একটি দুরারোগ্য ব্যাধিকেও সংগ্রহ করিয়াছে—সেটি বাত। মাঝে মাঝে ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

দৈনন্দিন জীবন তাহার অতি সাধারণ। সকালে ও সন্ধ্যায় কতকগুলি তরুণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আসিয়া ভীড় করে, গভীর রাত্রের সঙ্গী কয়েকখানা দার্শনিক তত্ত্বের পুস্তক এবং বিনিদ্র দ্বিপ্রহরে আছে ভ্রমণ। সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়া সে দেশে একটি বাড়ী করিয়াছে এবং দেওঘরে আর একটি। রোহিণী রাস্তার ধারে নির্জ্জন পথ পার্শ্বে ছোট্ট একটি বাড়ী—তাহা সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু গৃহ প্রবেশ হয় নাই। অমলের ইচ্ছা নব পুত্রবধূ লইয়া একবার দেশে যাইবে তাহার পর বাকী দিন দেওঘরেই কাটাইয়া দিবে।

খোকাকে সে বার বার পত্র দিয়া বিবাহে মত করাইতে চাহিয়াছে, কিন্তু খোকা সংক্ষেপে জানাইয়াছে বিবাহ আপাততঃ সে করিবে না। কাজেই স্বচ্ছন্দ মনে সে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতে পারে নাই—খোকা এমন অবাধ্য নয় যে জোর করিলে পিতার কথা সে অবহেলা করিবে; কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে সে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। বর্ত্তমানে অন্ততঃ তাহার মত এইরূপই।

সেদিন শীতের দ্বিপ্রহরে মোটা বেতের লাঠিটা হাতে করিয়া অমল ট্রামের মাসিক টিকিটটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ট্রাম চলিয়াছিল কলেজষ্ট্রীট দিয়া—কলেজ স্কয়ারে গিয়া সে নামিয়া পড়িল। অতি পুরাতন স্থান, অতি পরিচিত এই ইউনিভার্সিটিতে সে পড়িয়াছে কত যুগ আগে, এইখানে অপর্ণার সহিত কতদিন সে—

অমল ধীরে ধীরে ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল, —সবই ঠিক তেমনটি রহিয়াছে। তেমনি যুবক ছাত্রগণ যাইতেছে আসিতেছে—ছাত্রীরা তেমনি গর্ব্বিত পদক্ষেপে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লিফ্‌টটা ঠিক তেমনি করিয়া ওঠা-নামা করিতেছে। জীবনের দীর্ঘ তিরিশটি বৎসর যেন অতি সংক্ষেপ, অতি অল্পপরিসর, দুইটি সরল রেখার মত ব্যবধান সামান্য, কিন্তু সমান্তরাল রেখা দুইটি কখনও মিশিবে না। অমল আপন মনে হাসিল—কেবল তাহার চুলগুলি আজ শুভ্রতা লাভ করিয়াছে। আজ বিগত সেই যৌবন যেন নূতন করিয়া আবার আসিয়াছে—আপন মনে সে কহিল চমৎকার। এই জীবনে আর সে আসিবে না, আর সে এমনি করিয়া উচ্ছলতা লাভ করিবে না, অশক্ত পা দুটি ধীরে ধীরে অকর্ম্মণ্য হইয়া নীরব হইবে।

অমল দ্বিতলে উঠিল—এখানে প্রতি ঘরে, প্রতি ধূলিকণায় অতীতের স্মৃতি যেন শিশিরের মত টলমল করিতেছে, যৌবনকে মুহূর্ত্তে সে যেন ফিরিয়া পাইয়াছে। এই সিঁড়ির মাঝে অপর্ণার সহিত তাহার প্রথম পরিচয়—কত লোকের কত জীবনের কাহিনী এই ইটকাঠময় নীরব বাড়ীটার অঙ্গে সঞ্চিত হইয়া আছে—লাইব্রেরীতে সঞ্চিত নীরব কাব্য পুস্তকের মত, কত বেদনাই হৃদয়ের কারাগারে প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। যে জানে, যে পড়িতে পারে হৃদয়মথিত সমুদ্রের আকুলতায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে—

একটি কোণে একটি ছাত্র একটি ছাত্রীর সহিত আলাপ করিতেছে—যৌবনের সেই উন্মত্ত দিনের অর্থহীন বাক্যাবলী। এমনি করিয়া অপর্ণার সহিত সে লোকচক্ষুর অন্তরালে কত কি কহিত। অমল হাসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আর্ত্তকণ্ঠে যেন কহিল—নাই নাই, সে আর নাই—আর আসিবে না।

অমল লাঠি ভর দিয়া আর একতলার উপরে উঠিল—সেই কক্ষ—যেখানে বসিয়া সে পড়িয়াছে, নালাম্বরী পরিয়া অপর্ণা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত ঘুরিয়া বেড়াইত। আজকার এই ছাত্রীগণের মাঝে সেই অপর্ণাই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বিদ্যুল্লতার মত, নানাভাবে নানা আকারে। দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ অপর্ণা যেন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে যৌবন উচ্ছ্বসিত বিশ্বের মাঝে ছড়াইয়া দিয়াছে। তাহার সেই মন আজও তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়—যেমন করিয়া আজ এঁরা খুঁজিয়া ফিরিতেছে; কিন্তু তাহারা পাইবে না, তাহারই মত ব্যর্থ হইয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিবে—নির্জ্জন এই ধরিত্রী, এখানে কেবল প্রস্তর, প্রাণ নাই। পাইবে না, তাহাকে পাইবে না—

কে একজন তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিল—আপনি এখানে?

—হ্যাঁ, দেখ্‌ছি, এখন কেমন চ'ল্‌ছে। একদিন আমিও পড়েছি ত!

—আসুন, কোথায় যাবেন?

—অনির্দ্দিষ্ট।

ঘুরিতে ঘুরিতে লাইব্রেরী কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে দেখিল—ঠিক তেমনি পাঠ-নিরত পাঠক-কুল। দেখিতে দেখিতে পাঠকক্ষে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল, লাইব্রেরীয়ান নিজে অমলকে অভ্যর্থনা করিলেন। অমল প্রতিনমস্কারে কহিল—তিরিশ বৎসর আগে আমি ছাত্র ছিলাম এখানে, সেদিন আর আজ এর মাঝে যেন কোন তফাৎ নেই—তেমনি সব ছাত্র। বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে হয় না—আমি বুড়ো হ'য়েছি—

ছাত্রছাত্রীগণের চকিত চাহনির মাঝে অমল অগ্রসর হইল। তেমনি সমস্ত ছাত্রী পড়িতেছে—সে যেখানে বসিত সেখানে তাহারই মত একটি অমনযোগী ছাত্র চোখের কোণে যেন কোন সহপাঠিনীকে লক্ষ্য করিতেছে। অপর্ণা যেখানে বসিত, সেখানে তেমনি একটি মনোযোগী

ছাত্রা—তাহারই মত তন্বাতনু, কপালের উপরে চূর্ণ-কুন্তল পাখার বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। অপর্ণার মতই প্রশান্ত শান্ত দুইটি চোখ তাহার পানে পরম বিস্ময়ে চাহিয়া আছে।

অমলের হৃদয় যেন সহসা আলোড়িত হইয়া উঠিল। মনে হয় হারানো অপর্ণা যেন অকস্মাৎ তাহার সাম্‌নে আসিয়া সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া দিতেছে। জরাক্লিষ্ট দেহে যেন যৌবনরস সঞ্চারিত হইয়া সহসা তাহাকে অতীতে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে—অপর্ণা যেন তেমনি দুর্ব্বার আকর্ষণে তাহাকে টানিতেছে।

অমল ছাত্রীটির নিকটবর্ত্তী হইয়া মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলিতে হইল না। মেয়েটি তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহার সাম্‌নে একটা অটোগ্রাফের খাতা খুলিয়া ধরিল—সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকখানি জড়ো হইয়া গেল।

অমল প্রশ্ন করিল—তোমার নাম?

মেয়েটি মাথা নীচু করিয়া কহিল—নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়।

—কিসে পড়ছো? ইংরিজিতে?

—হ্যাঁ।

অমল হাসিয়া লাইব্রেরিয়ানকে কহিল—দেখেছেন, রেস্‌পেক্টেবল লেডিজ, অভ্যাসদোষে তাদের তুমি ব'লে ফেলেছি। বুড়ো হ'লে কাণ্ডজ্ঞান যেন ক'মে আসে। তুমি নিশ্চয়ই মনে করেছ—

নন্দিতা বাধা দিয়া কহিল—না না, আপনি ব'ল্‌লে তাতেই দুঃখিত হ'তাম। আমার পরম সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে আজ পরিচয় হ'লো। কত গল্প ক'রবো গর্ব্বের সঙ্গে—

—বেশ, আমি একটা গর্ব্বের বস্তু হ'য়েছি তা হ'লে! যাক্‌ কর্ম্মজীবনের অবসানে একটা সান্ত্বনা। তোমার বাবার নাম? কি করেন?

—রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এ্যাটর্ণী।

—ও—দেশপ্রিয় পার্ক রোডে বাড়ী? সে ত আমার ক্লাস্‌ফ্রেণ্ড। কি চমৎকার রেসিডেন্স! তোমরা ক' ভাই ক' বোন?

—তিন ভাই, চার বোন।

—তুমি?

—সেজো।

—ও, তোমার বাবাকে ব'লো আমার কথা। তোমাদের ওখানে যাবো একদিন, এই ধর পরশু—

নন্দিতা স্মিতহাস্যে কহিল—সত্যি যাবেন?

—নিশ্চিত যাবো, রবির সঙ্গে আজ প্রায় দশ বছর দেখা হয় না। ক্লাস-পালানো শিক্ষার গুরু সে আমার, তার দেখা-পাওয়া একটা ভাগ্য।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অমল কহিল—মিথ্যা নয়, এ ত সেদিনের কথা। রবির কি চুল পেকেছে আমার মত? বাত কি অমনি একটা কিছু হ'য়েছে—

নন্দিতা কহিল—আপনার মত অত চুল পাকে নি। আপনি যাবেন? ব'লবো বাবাকে যে পরশু যাবেন—

—হ্যাঁ ব'লো, আমার ত কর্ম্ম কিছু নেই। একটা আশ্চর্য্য কথা ভাবছি, অজ্ঞাত একটা আকর্ষণ তোমার কাছে কেন আন্‌লো আমাকে? নিশ্চয়ই একটা যোগ-সূত্র আছে। তোমরা মান্‌তে পারবে না কিন্তু আমরা মানি—রবির মেয়ে বলেই হয়ত সম্ভব হ'য়েছে—শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে তুমি বি-এতে ফাষ্টক্লাস অনার্স পেয়েছিলে।

নন্দিতা একটু হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ পেয়েছিলুম।

—ছাখো, আমাদের মনের মাঝে ওগুলো আপনা আপনি ভেসে ওঠে—যে অজ্ঞাত আকর্ষণ আমাকে তোমার কাছে টেনে নিগেছে, সেটা তোমরা বিশ্বাস করো না কিন্তু একদিন ক'রবে—

অটোগ্রাফের খাতাগুলি সই করিতে করিতে অমল আনমনে লাইব্রেরীয়ানকে কহিল—অপরিচিত থাকার একটা মোহ আছে। আপনারা যতক্ষণ চিন্‌তে পারেন নি, ততক্ষণ একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ ক'রছিলাম; এখন এই কৌতূহলী দৃষ্টির মাঝে যেন সংযত হ'য়ে পড়েছি।

লাইব্রেরীয়ান কহিলেন—যদি অনুগ্রহ করে এসেছেন তবে চলুন আমাদের ঘরে একটু—চলুন—

(ক্রমশঃ)

মোতির মাতা

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শুক্তির গর্ভে মুক্তার উৎপত্তি—দুর্দৈব তার সূচনা, পরম বিস্ময় তার পরিণতি। কারখানা ঘরে নানা প্রক্রিয়ায় তাপ ও তড়িতের প্রসাদে বিজ্ঞানী হীরক তৈয়ারী করিতে পারে, কিন্তু মুক্তা তৈয়ারী করা আজও তার অসাধ্য। হীরকের সৃষ্টি খনির অভ্যন্তরে চাপ ও তাপের প্রভাবে, কিন্তু মুক্তা প্রাণীজ পদার্থ। শুক্তির পেটে নিছক এক দুর্ঘটনার সূত্র ধরিয়া যে মুক্তা জন্মলাভ করে তাহাতে শুক্তি অনিচ্ছুক কর্মী মাত্র, মনের আনন্দে শুক্তি মুক্তা নির্মাণ করে না—প্রয়োজনের তাড়নায় মুক্তার সৃষ্টি—যাহার মূলে রহিয়াছে দুর্দৈব ও দুর্বিপাক।

ঝিনুক বা শুক্তিজাতীয় প্রাণীর দেহ শক্ত একটি খোলসে আবদ্ধ থাকে, এই জাতীয় প্রাণীর নাম কম্বোজ বা মলাস্ক। ইহারা প্রায়শ সামুদ্রিক প্রাণী। সমুদ্রের জল হইতে চূর্ণজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে দেহের খোলস তৈয়ারী করিবার ক্ষমতা কম্বোজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আহার্য গ্রহণার্থ শুক্তি যখন মুখব্যাদান করিয়া সমুদ্রজল গ্রহণ করে তখন সেই সঙ্গে ক্ষুদ্রাকৃতি কোন কীটাণু বা বালুকাজাতীয় কোন পদার্থকণিকা শুক্তির দেহাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিতে পারে। বহিরাগত এই কীটাণু বা পদার্থের অনধিকার প্রবেশকে শুক্তি বরদাস্ত করে না। প্রায়শ ইহাদের পুনরায় দেহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু সকল সময়ে ইহাদিগকে বাহির করিয়া দিতে সমর্থ হয় না—ইহারা হয়ত খোলস ও দেহের চামড়ার আবরণের মধ্যবর্তী স্থানে আটকা পড়ে। তখন শুক্তি এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। বহিরাগত পদার্থের উপস্থিতির জন্য শুক্তির দেহাভ্যন্তরে অস্বস্তিকর অনুভূতির উদ্রেক হয়। হয়ত তাহারই ফলে দেহযন্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী শুক্তির দেহনির্গত রসপদার্থ (nacre) দ্বারা ক্রমাগত উহার উপর আবরণ পড়িতে থাকে। স্তরে স্তরে ঐ পদার্থ কণিকার উপর আবরণ জমে, যাহার ফলে অনতিকাল মধ্যে ঐ প্রাণী বা পদার্থ আবদ্ধ হয় কঠিন কারাগারে এবং ধীরে তাহার সমাধিস্তূপ রচিত হয় সুবিন্যস্ত স্তরীভূত চূর্ণের উপাদানে, ঐ অনধিকারপ্রবেশকারীর সমাধি-সৌধই মুক্তা—অনবদ্য সৌন্দর্যসম্ভার লইয়া উদ্ভাসিত হয়। সংখ্যাতীত স্বচ্ছ স্তরে সূর্যরশ্মি পতিত হইয়া বারংবার বিশিষ্টরূপে প্রতিফলনের জন্য বিচিত্র বর্ণসম্ভারে চিত্রিত হয়। শুক্তির গর্ভে এইরূপে মুক্তার উৎপত্তি দৈবাধীন ও দুর্ঘটনাঘটিত। আহার্যের সঙ্গে পদার্থকণিকা বা কীটাণুর প্রবেশলাভ কদাচিৎ কখনও ঘটিতে পারে, তাহাও অধিকাংশ সময়ে দেহযন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি বিভিন্ন উপায়ে প্রায় স্বাভাবিক নিয়মেই শুক্তিদেহে বহিরাগত পদার্থ স্থান পায় এবং সেখানে অবস্থিতি করে।

শুক্তির গর্ভকোষে যে ডিম্বাণু থাকে, কখনও কখনও অনিষিক্ত তাহারই দুই একটি দেহ হইতে বিমুক্ত না হইয়া দেহাভ্যন্তরেই থাকিয়া যায়। দেহজাত ও দেহাংশ বলিয়া উহা ধীরে ধীরে দেহরসে পুষ্ট হইতে থাকে; ফলে উহা শুক্তির অস্বস্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। স্বভাবজ রীতিতে তখন ঐ ডিম্বাণুর উপর চূর্ণরস জমিতে থাকে—অর্থাৎ উহা মুক্তাতে রূপায়িত হয়। প্রাণের পরশ পাইয়া যে ধন্য হইল না—কামিনীর কণ্ঠভূষায় স্থানলাভ করিয়া সে সার্থক ও অমর হইল। এবম্প্রকারে সৃষ্ট মুক্তাগুলি বর্তুলাকৃতি হয় এবং এইগুলি খুব বেশী মূল্যবান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

আরও এক কারণে শুক্তির দেহমধ্যে পরাসক্ত একপ্রকার জীব স্বতই আশ্রয় গ্রহণ করে। ফিতাকৃমি জাতীয় একপ্রকার প্রাণী আছে

শুক্তি

যাহাদের জীবনের তিনটি অবস্থা বা স্তর তিনটি বিভিন্ন জীবের দেহে অতিবাহিত হয় ও পরিপুষ্টি লাভ করে। প্রথমে উহাদের ডিম্ব হইতে যে শূক বাহির হয় উহারা আশ্রয় লয় শুক্তির দেহে। শুক্তি আবার ফাইল মাছের খাদ্য। কাজেই শুক্তির দেহাভ্যন্তরে স্থান করিয়া লইবার পর উহারা প্রায়শ ফাইল মাছের পেটে যায় এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফাইল মাছ আবার ট্রাইগণ মাছের খাদ্য। ফাইল মাছের সঙ্গে ফিতাকৃমিগুলি স্থান পায় ট্রাইগণ মাছের দেহমধ্যে। এখানে আসিয়া ফিতাকৃমি ডিম দেয়—সেই ডিম জলে ফিরিয়া আসে। পরজীবী ফিতাকৃমির জীবনপ্রবাহ এমনি করিয়া বিভিন্ন প্রাণীর দেহে চক্রাকারে চলে। বাঁচিবার অনুপ্রেরণায় ফিতাকৃমি শূকের স্বভাবগত ধর্ম শুক্তির দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, কারণ শুক্তিদেহে স্থানলাভ করিতে না পারিলে ফিতাকৃমির জীবনকুসুম অকালে শুকাইয়া

মরে। তাই সাধারণ নিয়ম হিসাবেই শুক্তিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ও অজ্ঞানে ফিতাকৃমির শূককে দেহমধ্যে আশ্রয় দিতে হয়। যে শুক্তিদেহে ফিতাকৃমির শূক প্রবেশ করিয়াছে সেটি যদি কাইল মাছ কর্তৃক ভক্ষিত হয় তবে শুক্তির জীবনান্ত হয় বটে, কিন্তু ফিতাকৃমির জীবনধারা অগ্রসর হইয়া চলে। কিন্তু যদি শুক্তি কাইল মাছের পেটে না যায় তবে শুক্তিদেহেই শূকের জীবনান্ত ঘটে। শুক্তি তখন ঐ শূকের মৃতদেহকে ঢাকিয়া দেয় মর্মরের ক্ষুদ্র এক আবরণে। ক্ষুদ্র এক জীবাণুর শবের উপর রচনা করে অনবদ্য 'তাজমহল'—অনধিকার প্রবেশকারী শত্রুর স্মৃতিস্তম্ভ অথবা শুক্তির বিজয় গৌরবের সঙ্গে প্রকটিত হয় স্বীয় শিল্পশক্তির অনুপম নিদর্শনী।

শক্ত খোলসবিশিষ্ট কম্বোজ অর্থাৎ ঝিনুকজাতীয় প্রাণী মাত্রেই এই প্রকার মুক্তা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও প্রকৃত মুক্তা দুই একটি শ্রেণীর শুক্তি ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না। সাধারণত উষ্ণ সমুদ্রের শুক্তিতেই

শুক্তির অভ্যন্তরে মুক্তা

মুক্তা পাওয়া যায়, যদিও সেখানকার সহস্রের মধ্যে একটিতে হয়ত মুক্তা মেলে। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরেই মুক্তা পাওয়া যায়। মুক্তার লোভে মানুষ সাগর সেচিয়া সহস্র সহস্র শুক্তি তুলিয়া আনে—কিন্তু তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি হয়ত মুক্তাফলে সমৃদ্ধ। এই ব্যর্থ শ্রম মানুষকে দুরাকাঙ্ক্ষী করিয়া তুলিল। শুক্তিকে মুক্তা তৈয়ারী করিতে বাধ্য করা যায় কিনা সেই বিষয়ে প্রচেষ্টা চলিতেছিল প্রাচীনকাল হইতেই। বহু শত বর্ষ পূর্বে চীনদেশীয়েরা নাকি শুক্তির ভিতর কাঠের টুকরা বা অন্য কোন পদার্থ প্রবেশ করাইয়া ইচ্ছামত মুক্তা তৈয়ারী করিত। এই আবিষ্কারের সঙ্গে সাত শত বৎসর পূর্বেকার ইউ-জেন-ইয়াং নামক চৈনিকের নাম জড়িত রহিয়াছে। সে কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা জানা যায় না। জাপানী বিজ্ঞানী মিকিটো এই বিষয়ে আগ্রহশীল হইয়া চেষ্টা করিতে থাকেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া বিশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি শুক্তির দেহে ইচ্ছামত মুক্তা তৈয়ারী করিবার রহস্যের সন্ধান পান। প্রথমে তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন শুক্তির অভ্যন্তরে ধাতব কোন পদার্থের স্পর্শ লাগিলেই শুক্তির মৃত্যু ঘটে। এই প্রকারে তিনি হাজার হাজার শুক্তি বিনাশ করেন, কিন্তু সিদ্ধকাম হইলেন না। তৎপর তিনি শুক্তির উপরকার খোলসের ভিতর ছিদ্র করিয়া সেই পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ প্রবেশ করাইয়া দিতেন। কিন্তু দেখা গেল ইহাতেও মুক্তা তৈয়ারী হইতেছে না। তারপর উপরকার শক্ত খোলস ও অভ্যন্তরের মাংসল আবরণ—ইহাদের ফাঁকে পদার্থকণিকা প্রবেশ করাইয়া দেখিলেন শুক্তি এইগুলি দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতেছে। বৎসরের পর বৎসর ধৈর্য ধরিয়া এমনি নানা রকম প্রচেষ্টা করিবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন যে অপর কোন শুক্তির মাংসল আবরণের (mantle) ভিতরে পুরিয়া একটু ঝিনুকের (mother of pearl) কণিকা শুক্তির দেহের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলে উহা দেহের ভিতরে থাকিয়া যায় এবং কালক্রমে উহা হইতে মুক্তা তৈয়ারী হয়। কিন্তু এই প্রকারে ঝিনুক-কণিকা শুক্তির দেহে প্রবেশ করান অতিমাত্রায় দক্ষতার কার্য। দীর্ঘকাল যাবত শিক্ষা ও অভ্যাসের ফলে একজন সুদক্ষ কারিগর প্রতিদিনে মাত্র ষাটটি শুক্তিতে এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিতে পারে।

মিকিমোটোর এই আবিষ্কারের পর এই প্রকার মুক্তা তৈয়ারী করিবার ব্যবসা জাপানে দ্রুত প্রসার লাভ করিয়াছে। সেখানে শুধু মিকিমোটোর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ কোটি শুক্তিকে এই ভাবে মুক্তা তৈয়ারীর উপযুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। শত শত শ্রমিকেরা সমুদ্রের স্থানে স্থানে পাঁচ হইতে পনর ফ্যাদম গভীর জল হইতে শুক্তি সংগ্রহ করে। যেখানে শুক্তি জন্মে সেখানে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া শুক্তির জন্মের হার বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হয়। শিশু অবস্থায় সংগ্রহ করিবার পর ছোট শুক্তি বড় বড় তারের খাঁচায় সমুদ্রের ভিতর ছাড়িয়া দেওয়া থাকে। ইহাদিগকে অতি যত্নে পালন ও পোষণ করিবার প্রয়োজন আছে। শুক্তি শিশুর তিন বৎসর বয়স হইলে তখন পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়। তার পর আবার খাঁচায় পুরিয়া সমুদ্রে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বৎসরে দুইবার করিয়া ইহাদের উঠাইয়া লইয়া দেহের খোলসের উপরিভাগ পরিষ্কার করিয়া দিবার নিয়ম আছে, ইহাতে শুক্তির সুচারু পুষ্টির ব্যবস্থা হয় এবং সুপুষ্ট শুক্তিতেই ভাল মুক্তা মেলে। ছয়সাত বৎসর এই ভাবে রাখিয়া দিবার পর ইহাদিগকে মারিয়া মুক্তা বাহির করিয়া লওয়া হয়। এবম্প্রকার ব্যবস্থাতেও শতকরা চল্লিশটি শুক্তিতে মুক্তার উৎপত্তি হয় না এবং শতকরা মাত্র চার পাঁচটিতে এমন মুক্তা পাওয়া যায় যাহাকে মূল্যবান জিনিষ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

জাপানে সাধারণত মেয়েরাই এই ব্যবসায়ে ডুবুরীর কার্য করে। ইহারা জলের নীচে ডুব দিয়া শুক্তি সংগ্রহ করে, খোলস পরিষ্কার করিয়া দেয়, অকটোপাস বা অপরাপর মৎস্যাদি শত্রুর হাত হইতে শুক্তিকে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করে। মুক্তা-উৎপাদন ব্যাপারে প্রধান প্রতিবন্ধক সমুদ্রের শীতল ও লোহিত স্রোত। শীতল স্রোতে শুক্তি

শিশুর মৃত্যু হয়—লোহিত স্রোতে বাহিত রোগজীবাণু শুক্তির দলে মড়ক লাগায়।

এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন সহস্র সহস্র মুক্তা বাজারে বিক্রয় হইতেছে। যদিও ভারতবর্ষের দক্ষিণে সিংহলাঞ্চলে মুক্তা সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে—কিন্তু এই প্রকারে মুক্তা উৎপাদন জাপানীদের একচেটিয়া ব্যবসা। অনেকে এই উপায়ে প্রাপ্ত মুক্তাকে 'ঝুটা' বলিয়া আখ্যা দিলেও খাঁটি মুক্তার সঙ্গে ইহার উপাদানগত কোন পার্থক্য নাই, গঠনেও কোন প্রভেদ নাই—থাকিবার কথাও নয়, কারণ উভয় জিনিষই শুক্তির দেহে শুক্তিদ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। একমাত্র পার্থক্য এই যে প্রাকৃতিক মুক্তার অভ্যন্তরে রহিয়াছে একটি বালুকা কণা, অথবা কোন পরজীবী কীটের মৃতদেহ, পক্ষান্তরে তথাকথিত কৃত্রিম মুক্তার অভ্যন্তরে রহিয়াছে ঝিনুকের কণিকা। এতদ্ব্যতীত বাহ্যত বা গুণের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু তবুও মানুষের আভিজাত্যবোধের বিচিত্রতায় প্রাকৃতিক মুক্তা বাজারে অনেক বেশী দামে বিক্রয় হয়। কৃত্রিম মুক্তার চেয়ে প্রাকৃতিক মুক্তার দাম চার পাঁচ গুণ বেশী। মুক্তার মূল্য নিরূপিত হয় আকৃতি, বর্ণ, ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতির বিচারে।

সম্ভবামি যুগে যুগে

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'চেতাবনি' প্রতারিত হইয়াছেন—অর্থাৎ—

নারায়ণ 'চেতাবনির' সহিত স্বভাব-সুলভ চাতুরী খেলিয়াছেন। কথা ছিল—রাজপুতানায় জন্ম লইয়া তিনি চীন দেশে শস্ত্র-বিদ্যা শিখিতেছেন—কিন্তু—

তিনি জন্ম নিয়েছেন কলিকাতা সহরতলীর মিত্তির পরিবারে।

ভক্তগণ হতাশ হইবেন—কিন্তু উপায় কি?—এবার ভূমি অন্যভাবে প্রস্তুত—এবার আর অস্ত্রের প্রয়োজন নাই। মানুষ বহু যুগের সাধনায় এইবার দরিদ্র নারায়ণের স্তরে গিয়া পৌছিয়াছে। তবে—'চেতাবনি' কথিত বাংলা দেশই এ কৃপার বিশেষ অধিকারী।

চাল চল্লিশ টাকা হইয়াছে। মিত্তির পরিবারে মাসিক আয় পঞ্চাশটি টাকা।...

চারিটি পর পর কন্যা সন্তান আগমনের পর, নারায়ণের আবির্ভাব সম্ভাবনায় সকলে শঙ্কিত হইয়াছিলেন—কিন্তু না—

এবার নারায়ণই আসিলেন।

মাতা আনন্দাধিক্যে অৰ্দ্ধমূর্চ্ছিতা—পিতার স্কুল কামাই হইল—পিসীমা আঁচলে চোখ মুছিলেন।...

ইহা আজ তের বৎসর পূর্ব্বের কথা—অর্থাৎ—

আজ নারায়ণের বয়স তের বৎসর।

সেদিন প্রথম নারায়ণ দর্শন করিলাম কণ্ট্রোলের লাইনে। হাতে চালের থলে লইয়া এদিক ওদিক তাকাইতেছিলেন, হঠাৎ সামনের লোকটার পকেটে সন্তর্পণে হাতটা প্রবেশ করাইয়া দিলেন। আমার চোখে চোখ পড়িতেই বিনা দ্বিধায় হাসিয়া কহিলেন—'আমি নারায়ণ।'

আগেই বুঝিয়াছিলাম—সুতরাং হাসিলাম।

পূর্ব্ব লীলার স্মৃতি—তবু এবার স্কুলের চৌকাট মাড়াইয়াছিলেন।...

—'বাবা কাপড় ছিঁড়ে গেছে'—বড় মেয়ে নমিতা। মধ্যবিত্ত ঘরে নারায়ণের বোনের নাম নমিতাই হয়। সুভদ্রার স্বপ্ন তাদের ইচ্ছে করেই ভুলে যেতে হয়। লজ্জা সরমই তাদের একমাত্র অলঙ্কার—তারই ভারে আজ তারা নমিতা—এবং সত্যই নমিতা হয়ে সার্থক।

—'কাপড়—এনে দিতে হবে'—কথাটা আর সে বলিতে পারে না—কারণ বাজার দর তাহার জানা। ইহার পূর্ব্বে অন্ততঃ বার তিন চার সে কাপড়ের জন্য অনুরোধ করিয়াছে।

পিতা স্থানীয় স্কুলের হেড-মাষ্টার—একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মাষ্টারী ভঙ্গিতে মেয়ের দিকে তাকান—নমিতা আর সেখানে দাঁড়াইবার প্রয়োজন আছে বোধ করে না।

অন্তঃপুরে মায়ের গলা শোনা যায়—'অপূর্ব্ব পড়তে আসে—অত অপূর্ব্ববাবু—অপূর্ব্ববাবু করিস—আর এ সামান্য কথাটা জানাতে পারিস না?'—কথার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা ইঙ্গিত দেবার প্রয়াস পান!

নমিতা সবটা না বুঝিলেও খানিকটা বুঝিতে পারে। মায়ের শেষের ভঙ্গিটায় শরীরটা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—ঘৃণায়

আপনার মধ্যে মিশিয়া যাইতে চায়।—তবু—কাপড়টা কিন্তু ভয়ানক ছেঁড়া!—

অপূর্ব্ববাবু নারায়ণের পিতার ছাত্র। বি-এ পড়েন এবং নারায়ণের বাড়ীতেই পড়িতে আসেন। নারায়ণ অপূর্ব্ববাবুর হাত ধরিয়া টানেন।—'চলুন না ভেতরে—বড়দি আছে—আজ আর বড়দি রাগ করবে না—'

সেদিন হঠাৎ অপূর্ব্ববাবু নমিতার বস্ত্রাঞ্চল দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন—কিন্তু সুবিধা হয় নাই।—আরও কিছুদিন ইহাদের নির্জ্জলা উপবাস দেওয়া দরকার—এখনও ইহারা একবেলা খাইতে পায়।

অপূর্ব্ববাবু ক্ষোভ করেন—ইহাদের এখনও 'মর‍্যাল' ভাঙে নাই!

নারায়ণের হর্ষোল্লাসে তিনি শঙ্কিত হন। মা না আবার শুনিতে পান—মহা 'বিচ্ছু' লোক তিনি।

নারায়ণ অপূর্ব্ব তৎপরতার সহিত অপূর্ব্ববাবুর পকেট হইতে গোটা দুই সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া সরিয়া পড়ে—দিয়াশলাই যেখান হইতে হোউক জুটিবেই……

মিত্তিররা সপরিবারে নির্ব্বাণের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হন। সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাণে ইহাদেরই অধিকার—নারায়ণ ইহাদের বংশই ধন্য করিয়াছেন। অতএব নারায়ণের পিতা একাগ্র-চিত্তে শয্যা লইলেন। নারায়ণ আজকাল আর প্রায়ই বাড়ী থাকিবার সময় পান না। একটা ময়লা পেণ্টালুন ও ছেঁড়া গেঞ্জী পরিয়া সারাদিন পথে পথে কাটান—হয়ত কোন স্থানে বৃন্দাবন-লীলার পুনরভিনয় ঘটাইবার কথা চিন্তা করেন। বাড়ীর ভোগে তাঁহার পেট ভরে না। বাড়ী ঢুকিলেই তিনি শুনিতে পান—মা প্রতিবাসীর সহিত তর্ক জুড়িয়াছেন—কাঁকর শুদ্ধ চাল তাঁর বাড়ী সাত জন্ম ঢোকে না—এখনও তাঁহারা ভাল চালের ভাত কাঁড়ি কাঁড়ি কুকুরকে দিচ্ছেন।—

নারায়ণ মায়ের কথায় ঈষৎ হাস্য করেন—এবার আর অংশাবতার নয়—সুতরাং বুঝিতে পারিয়া নীরবে ফিরিয়া যান।

বাহিরে একদল লোক রিলিফ কমিটি হইতে ভিক্ষা করিতে আসিতেছিল। নারায়ণ তাহাদের দলে যোগ দিয়া গান গাহিতে গাহিতে দেখেন—মা দু-আনা পয়সা ভিক্ষার ঝুলিতে ফেলিয়া দিয়া স্মিত হাস্য করিতেছেন।

খিড়কির দুয়ারে সবিতা অর্থাৎ মেজ মেয়ের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। সে রায় বাড়ী হইতে তিনদিনে শোধ দিবার কড়ারে পাঁচ সের চাল ধার করিয়া আনিয়া অবিশ্রাম দোর ঠেঙ্গাইতেছে। খিড়কীর দোরটা আবার বন্ধ।…

…সারে সারে দরিদ্র নারায়ণের দল চলিয়াছে ফ্রি কিচেনের পথে। কুব্জ-খঞ্জ—রুগ্ন—পিঠে পরমার্থের বোঝা। সবার আগে চলিয়াছেন নারায়ণ—শরীরের অপেক্ষা বড় মাথাটি এধার ওধার দুলিতেছে।—দায়িত্বপূর্ণ মাথা!—

এবার সকলকে অতি পবিত্র ভাবে 'শুদ্ধ' করিয়া লইবেন—সকলকে এক সঙ্গে অন্ন পান খাওয়াইবেন—তাই আজ তিনি পৃথিবীর দরিদ্র নারায়ণের দলে কৌশলে মিশিয়া গিয়াছেন।

ফ্রি-কিচেন পুরাকালের তপোবন প্রথানুযায়ী সম্মিলিত সাধনার স্থল।

সকলে সারি দিয়া বসিয়া পড়ে। নারায়ণ বসিলেন সকলের মধ্যস্থলে—শীর্ণ পা দুইটাকে ভিতরে অদ্ভুতভাবে মুড়িয়া পদ্মাসনের আকৃতি করিলেন।

অপূর্ব্ব দৃশ্য!—অবশেষে নারায়ণ অযুত দরিদ্র নারায়ণের সাথে—অমৃত নয়—ফেন খাইতে লাগিলেন—পরম তৃপ্তিতে!—

চোখে জল আসে বৈ কি!—সান্ত্বনা—এও তাঁর লীলা।

অনেকদিন পরে নারায়ণের বুকটা ভরিয়া গেল। আজ হইতে নিত্য ফেন মিলিবে।—অবশ্য বাড়ীর জন্য লইয়া যাওয়া চলিবে না।—বার দুয়েক নারায়ণ এধার ওধার তাকাইলেন—কেহ দেখে নাই ত!—তারপর বাড়ীর দিকে পা চালাইলেন।…

…গলিটার মোড় ঘুরিতেই একটা টিনের ঘর। নারায়ণ হঠাৎ সেখানে দাঁড়াইলেন—তারপর নিম্ন স্বরে ডাকিলেন—দিদি—দিদি—

এদিকটায় ত তাহারা থাকে—যাহারা সৃষ্টির স্রোতকে অন্তর্মুখী হইতে বহির্মুখা করিয়া সমাজকে প্রাণঘাতী চোরা-ঘূর্ণি হইতে রক্ষা করে।—নারায়ণ তবে কি পরকীয়া সাধনার সম্ভাবনা এ জীবনেও দেখাইবেন!—

—'আজ এই বারো আনা পয়সা হয়েছে—বেশী কেউ দিতে চায় না রে'—নারায়ণের বড়দিদি নমিতা পয়সা

উপায়ের—অন্ততঃ পেট ভরাইবার—সহজ উপায় বাহির করিয়াছে।—যাহাই হউক—ইহারই জন্ম মিত্তির পরিবারে আজও কেহ মরে নাই—ইহাতে উপায় আছে—মূলধন লাগে না।—বাবা কেমন আছেন রে?—নমিতা বাড়ীর খবর নেয়।

—'গেলেই হয়—মরে না এই বড় আশ্চর্য্য'—সরল অকম্পিত উত্তর।—এবার আর অংশাবতার নয়—মায়ামুক্ত শিব!—

……নারায়ণের ভবিষ্যৎ বাণী ফলিতে বেশী দেরী হয় না। বাড়ীতে প্রবেশ করিতেই মা কাঁদিয়া ওঠেন—ওরে—ডাক্তার ডাক শিগ্‌গিরি—কত্তা কেমন কচ্ছে—

কর্ত্তা ঠিকই করিতেছিলেন! আধ ঘণ্টাটাক খাবি খাইয়া, মাষ্টার সুলভ দুইবার গর্জ্জন করিয়া তিনি নেহাৎ প্রাণটাকে অনিচ্ছায় দেহ ছাড়া করিলেন।

ডাক্তার না পাইয়া নারায়ণ লক্ষ্যহীন ভাবে বাড়ীরই পথে ফিরিতেছিলেন। হঠাৎ সুদর্শন চক্র যেন ছুটিয়া আসিয়া নারায়ণকে লুফিয়া লইল।—লরীটা চলিয়া গেল—নিছক সাত্ত্বিকভাবে রক্তহীন নরম দেহটা রাস্তার এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিল।

বাড়ীতে যখন নারায়ণের অপেক্ষায় 'কর্ত্তার' দেহ 'কাঁধ' পাইতেছিল না—নারায়ণ তখন 'হিন্দু সৎকার সমিতির' ট্রেচারে উঠিয়া বৈকুণ্ঠাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

তিনি দয়াময়—মিত্তির পরিবারে আপাততঃ অন্নের অভাব হইবে না—

নমিতার গৃহত্যাগ নারায়ণের বিনা সাহায্যে সম্ভব হইত না। এইবারকার লীলার এইখানেই রহস্য!—তবে নারায়ণ প্রতারিত হইয়াছিলেন।

নমিতার গৃহত্যাগের প্রস্তুতি মা বহু পূর্ব্বেই টের পাইয়াছিলেন।

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে নারী

শ্রীধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নারী হচ্ছে জাতির জীবনের প্রগতি ও উন্নতির রথের চাকা। ঐশ্বর্য্য, শক্তি এবং বিদ্যাই একমাত্র জাতির উন্নতির পরিচায়ক নয়। জাতির উন্নতির পরিচয় তার নারী জাতির পরিচয়ে। জাতি জাগে—যখন নারী তার জেগে ওঠে। জাতির ভিতরে তখনই বীর সন্তান সৃষ্টি হয়, যখন নারীর ভিতরে প্রকৃত মা সৃষ্টি হয়। নারীর গতি যেখানে থেমে যায়, জাতির উন্নতির প্রবাহে সেখানে ভাঁটা পড়ে।

নারী হচ্ছে জাতির শিক্ষয়িত্রী। মায়ের কোল থেকেই জাতি গড়ে ওঠে। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান শিক্ষিত হয় মায়ের শিক্ষায়। নারী আপনাকে ক্ষয় করে সৃষ্টি করে। আপনাকে বিসর্জ্জন দিয়েই সে সংসার গড়ে তোলে।

গান্ধীজী এই নারী জাতির মধ্যে দেখেছেন ত্যাগের মূর্ত্ত প্রতিমা, অহিংসার শ্রেষ্ঠ রূপ। তাঁর কাছে নারী দুঃখ ও কষ্টের যেন এক বাণীময় রূপ। এক প্রশান্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে নারী যেন ধরিত্রীর দুঃখবেদনাকে বহন করে নিয়ে চলেছে। নারী তার ত্যাগের জন্ম কোন প্রতিদান চায় না, দুঃখের জন্ম কখনও সমবেদনা ভিক্ষা করে না।

গান্ধীজী এই নারী জাতির উপর তার শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে বলেছেন, "নারী ত্যাগ এবং দুঃখের মূর্ত্ত-প্রতিমা।"

নারী যেন এক ধৈর্য্যের হিমালয়—নারী দুঃখ ও কষ্ট স্বীকার করে শুধু পুরুষের জীবনকে সুখী করবার জন্ম। এই দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেই তার আনন্দ, সে সৃষ্টির সহায়ক। এই সৃষ্টির পথে, যে ত্যাগ যে কষ্ট, সে স্বীকার করে, তা মানব-সম্প্রদায়কে ধরণীর বুকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রতিদিনের জীবনে রয়েছে তার সেই ত্যাগ।

গান্ধীজী বলেন, "নারী অহিংসার মূর্ত্তপ্রতিমা। অহিংসার অর্থ অনন্তপ্রেম। পুরুষের চেয়ে জননী এই ক্ষমতাকে বেশী করে দেখাতে পারে যখন সে শিশুকে গর্ভে ধারণ করে, লালন করে এবং এই কষ্টের মধ্যেই আনন্দ পায়। এমন কোন্ কষ্ট আছে যা নারীর প্রসব বেদনাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে? কিন্তু সৃষ্টির আনন্দে সে তা বিস্মৃত হয়।"

সন্তান পালনের যে কষ্ট নারী প্রতিদিনের জীবনে বহন করে নিয়ে চলে, তার জন্ম তার কোন বেদনা নেই। সন্তানের জন্ম নারী আপনাকে দান করে। এই ত্যাগই নারীর নারীত্বকে দেবীত্বে পরিণত করেছে। এই ত্যাগের মধ্যেই গান্ধীজী দেখেছেন নারী জীবনের মহত্ব। এই মহত্বের বেদীমূলে তিনি তাঁর অন্তরের অর্ঘ্য প্রদান করেছেন।

তাঁর কাছে নারী হয়েছে জগন্মাতারই অংশ। ধৈর্য্যে, ক্ষমায়, স্নেহে, ত্যাগে ও তিতিক্ষায় সে মহিয়সী। পুরুষের সে জননী।

গান্ধীজী বলেন "ঈশ্বরের মহত্তম সৃষ্টিকে আমাদের লালসায় বস্তু করে, নিজেদের পশুর চেয়ে অধম করার চাইতে মানুষ জাতি লোপ হয়ে যাক্, আমি তাই দেখতে চাই"।"

তিনি নারীকে দেখেছেন পুরুষের সহচরীরূপে। একে অন্তকে সাহায্য করবে। একের অযোগ্যতার পূরণ হবে অন্তের যোগ্যতা দিয়ে।

প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ম্ম পরিধির মাঝে পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করবে, নারী পুরুষের সঙ্গে সমভাবে সর্ব্ব স্বাধীনতা উপভোগ করবে। তিনি নারী ও পুরুষের সম্পর্ককে একে অন্যের অধীন করে দেখেন নি।

গান্ধীজী বলেন "নারী হচ্ছে পুরুষের সঙ্গিনী। পুরুষের সমান তার মানসিক যোগ্যতা রয়েছে। পুরুষের কর্ম্মের অতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তার হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে, এবং পুরুষের সঙ্গে তার সমান স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। পুরুষের মত তাঁর কর্ম্ম পরিধির মাঝে তার সর্ব্বোচ্চ স্থান পাবার অধিকার রয়েছে।"

কিন্তু নারী সে অধিকার পায় না। গান্ধীজী বলেন যে সমাজের সর্ব্বনেশে প্রথার জন্য অশিক্ষিত, অযোগ্য লোকও নারীর উপর কর্তৃত্বের অধিকার পায়। তিনি দেখেছেন যে নারী জীবনের উপর এই প্রভুত্বের অভিশাপ, নারী জীবনকে কত খর্ব্ব করে ফেলেছে। নারী তার জীবনকে প্রসারিত করতে পারে না। বিধিনিষেধের উপল খণ্ডে লেগে তার অগ্রগতির পথ আর খুঁজে পায় না।

গান্ধীজী মনে করেন যে একজনের ক্ষমতা খর্ব্ব করলেই আর একজনের ক্ষমতা খর্ব্ব হবে। একের জীবন বিস্তারের পথ না পেলে অন্যের জীবন বিস্তারের পথ পাবে না। একজনের শক্তিহীন ক্ষমতা, অন্যের জীবনের অগ্রগতির পথে বাধা জন্মাবে।

তিনি বলেন, "নারী ও পুরুষ একই পর্য্যায়ের কিন্তু একরূপ নয়। তারা এক অনুপম যুগল। একে অন্যকে পূরণ করে। একে অন্যকে সাহায্য করে, যাতে একজনকে ছাড়া অন্যের অস্তিত্বও ভাবা যায় না। তাই এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যা কিছু এদের একজনেরও ক্ষতি করে তাতে দুজনারই ক্ষতি আনে।"

নারী যেখানে পুরুষের জীবনে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে পুরুষের জীবনের অগ্রগতির পথে বন্ধন পড়ে। তাই নারী যেখানে তার যোগ্য অধিকার পায় না, নারীর ক্ষমতা যেখানে খর্ব্ব হয়ে আছে, সেখানে সমস্ত জাতির উন্নতির পথে এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর দাঁড়িয়ে থাকে। গান্ধীজীর মতে প্রত্যেককেই একে অন্য যোগ্যতার অংশ নিয়ে আপন আপন জীবনকে পূর্ণ করবে। নারী ও পুরুষের সম্মিলিত জীবনের পূর্ণতায় জাতির জীবন পূর্ণ হবে।

তিনি মনে করেন যে নারীর জীবনেও একটি ব্যক্তিত্ব রয়েছে। নারীর জীবনে তার নারীত্ব রয়েছে এবং এই নারীত্বের একটা মর্য্যাদা আছে। নারী জীবনের এই স্বাতন্ত্র্যবোধ, নারীকে তার বিবাহিত জীবনে আপন অধিকার দেবে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধই তাকে বিবাহিত জীবনে পুরুষের অন্যায় অনাচার থেকে রক্ষা করবে।

গান্ধীজী বলেন, "আমার কাছে অন্য সকল শৃঙ্খলার মত বিবাহিত জীবনেও একটা শৃঙ্খলা আছে। জীবন একটা কর্ত্তব্য, একটা পরীক্ষা। বিবাহিত জীবন উভয়ের, এ জীবনে এবং পরের জীবনের মঙ্গল সাধনের জন্যই। বিবাহিত জীবন মনুষ্যত্বের সেবাও বুঝায়। যখন যুগলের একজন নিয়মভঙ্গ করে, তখন অন্যের চুক্তিভঙ্গ করবার অধিকার জন্মে। এই চুক্তিভঙ্গটা দৈহিক নয়, নৈতিক। এই চুক্তিভঙ্গ ডাইভোর্স হতে দেবে না। যে উদ্দেশ্যের জন্য তারা মিলিত হয়েছিল, তার থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়।"

গান্ধীজী বিবাহিত জীবনের মধ্যে নারীকে কখনও তার নারীত্বকে বিসর্জ্জন দিতে বলেন নি। নারীর নারীত্বের মর্য্যাদা যেখানে ক্ষুণ্ণ হবে, সেখানে নারী বিদ্রোহ করবে। কিন্তু সে বিদ্রোহ হবে নৈতিক, দৈহিক নয়। তিনি মনে করেন যে নারী হবে পুরুষের জীবনের সহধর্ম্মিণী। তিনি বলেন যে ভারতের শাস্ত্র নারীকে অর্দ্ধাঙ্গ বলেছে। শাস্ত্র নারীকে বলেছে দেবী। তাই নারী কখনও তার স্বামীর অপরাধের অংশীদার হতে পারে না। যেখানে অন্যায় রয়েছে, যা নীতি বিগর্হিত, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার নারীর রয়েছে। শুধু স্বামী বলেই তার অন্যায়ের পোষকতা নারী কখনও করবে না। নারীর পত্নীত্বই তার জীবনের সব নয়, নারীত্বও তার সঙ্গে রয়েছে। গান্ধীজী এইখানেই নারীর নারীত্ব ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করেছেন।

গান্ধীজী বলেন, "স্বামীর কাছে স্ত্রীকে অধিকতর অধীন করে হিন্দুশাস্ত্র ভুল করেছে, এবং স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে ফেলতে হিন্দুশাস্ত্র জোর দিয়েছে। এর ফলে স্বামী সময় সময় তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে এবং তা তাকে পশুর পর্য্যায়ে নামিয়ে নিয়ে ফেলে।"

স্বামীর এই কর্তৃত্বের অহমিকা স্ত্রীর জীবনকে অনেক সময় দুর্ব্বিসহ করে তোলে। অনেক সময় নিকৃষ্ট পর্য্যায়ের স্বামী, অধিকতর উন্নতমনা স্ত্রীর উপরে কর্তৃত্বের শাসন চালিয়ে স্ত্রীর জীবনের আনন্দ এবং সুখকে হত্যা করে। গান্ধীজী এই প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কোন আইন করতে বলেন নি। তিনি বলেন যে, নারী যোগ্য শিক্ষা লাভ করে তার নারীত্বকে উপলব্ধি করতে শিখুক, শিক্ষা দ্বারা সে তার অন্তরের শক্তিকে বর্দ্ধিত করুক। কারণ গান্ধীজী মনে করেন যে, নারী যদি এই শক্তি লাভ করে, তবে সে তার অন্যায়ের প্রতিবিধান আপনা থেকেই করতে পারবে। তিনি বলেন যে, স্ত্রী যেখানে স্বামীর দ্বারা নির্য্যাতিত হয় সেখানে স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করে, বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন না করে, ভিন্ন হয়ে বাস করবে। স্ত্রী তখন মনে করবে যে তার কোনদিন বিয়ে হয় নি।

কিন্তু গান্ধীজী স্ত্রীকে সেখানে স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ কখনও ভ্রষ্ট জীবনযাপন করতে বলেন নি। স্ত্রীর বিচ্ছিন্ন জীবন হচ্ছে অন্যায়ের প্রতিবাদ, নিপীড়িত নারীত্বের মুক্তি। স্বামীর অনাচার, পঙ্কিলতার বিরুদ্ধেই তার বিদ্রোহ। তাই স্বামীর নৈতিক অধঃপতনে, স্ত্রীও তার প্রতিবাদ স্বরূপ আপন জীবনে নৈতিক অধঃপতন আনবে না। স্বামীর ভ্রষ্ট জীবন স্ত্রীকে কখনও ভ্রষ্টা করবে না। অত্যাচার এবং মিথ্যাচার হতে নারী শুধু তার নারীত্বকে রক্ষা করবে।

গান্ধীজী নারীর এই বাধ্যকে সমর্থন করতে গিয়ে বলেন, "স্ত্রীর নিজের পথ গ্রহণ করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং যখন সে নিজেকে ঠিক বলে জানবে এবং যখন তার প্রতিরোধ মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য হবে তখন সে শান্তভাবে এর পরিণামের সম্মুখীন হবে।"

গান্ধীজী মনে করেন যে, স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি নয়। নারী হচ্ছে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ, তার জীবনের সঙ্গিনী। স্বামীর ইচ্ছাই স্ত্রীর ইচ্ছা নয়।

উভয়ের সম্মিলিত ইচ্ছাই উভয়ের ইচ্ছা। তিনি নারীর নারীত্বকে পুরুষের কর্ত্তৃত্বের কাছে কখনও বিসর্জ্জন দেন নি। নারী ও পুরুষের জীবনকে গান্ধীজী একই মানে দেখেছেন। তার মধ্যে ব্যবধানের কোন সীমা রেখা নেই। সেখানে পার্থক্যের কোন বৈষম্য নেই।

তিনি বলেন, "ছেলে এবং মেয়েকে আমি সম্পূর্ণ সমভাবে দেখি।"

গান্ধীজী মেয়েদের, ছেলেদের মতই শিক্ষা দিতে বলেছেন। মেয়েরা ছেলেদেরই মত শিক্ষিত হয়ে উঠবে। তাদের মতই একসঙ্গে লালিত-পালিত হবে। পুত্র ও কন্যার স্বার্থকে সেখানে তিনি ভিন্ন করে দেখেন নি। তিনি মনে করেন যে পুত্রের অধিকারের মধ্যেও কন্যার অধিকার রয়েছে। সেখানে কোন স্বার্থের ক্ষুদ্রতা থাকা উচিত নয়।

মানুষের জীবনে সর্ব্বস্তরে গান্ধীজী নারীকে কখনও পুরুষের চেয়ে কোন অংশে ছোট করে দেখেন নি। তিনি নারীর মধ্যে দেখেছেন মহামায়ার অংশ। সে শক্তি ধ্বংসও করে সৃষ্টিও করে। সে নারী দুর্ব্বল নয়, তার শক্তি অসীম। তার ক্ষমতা অপার।

গান্ধীজী বলেন, "নারীকে দুর্ব্বল জাতি বলা একটা অপরাধ। এটা নারীর উপর পুরুষের অবিচার। যদি শক্তির অর্থে পশুশক্তি বুঝায়, তবে বাস্তবিকই নারী পুরুষের চেয়ে কম পশু। যদি শক্তির মানে অর্থ-নৈতিক শক্তি বুঝায় তবে নারী পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ।"

ত্যাগে, ক্ষমায়, ধৈর্য্যে ও সহিষ্ণুতায় গান্ধীজী নারীকে অধিকতর শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই ক্ষমতাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা। এই ক্ষমতাই নারীকে গরীয়সী করেছে। নারী তাই দুর্ব্বল নয়। অন্তরের ঐশ্বর্য্যে সে শ্রেষ্ঠ। নৈতিক ক্ষমতার সে অধিকারিণী। তাই সে বলশালিনী।

গান্ধীজীর কাছে নৈতিক শক্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তি। এই পথেই মানুষের জীবনের সত্য অনুভূতির প্রথম প্রকাশ হয়। এই নৈতিক শক্তিই মানুষকে তার জয়ের আসন দেয়।

তিনি বলেন, "যদি নারী আঘাত করতে দুর্ব্বল হয় তবে সে দুঃখভোগে সবল।"

গান্ধীজীর কাছে এইখানেই রয়েছে নারী জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই তাঁর কাছে নারী অবলা হয় নি। নারীর মধ্যে পশুশক্তির প্রাবল্য নেই। তার মধ্যে রয়েছে নৈতিক শক্তির দুর্গ। কারণ নারী তার জীবনে দুঃখ, কষ্ট, শোক সহ্য করে। এই সহ্য করার মধ্যে গান্ধীজী দেখেছেন নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাকে।

গান্ধীজী মনে করেন যে, নারীর এই নৈতিকশক্তিই নারীকে পুরুষের লালসার গ্রাস হতে রক্ষা করছে। পুরুষ চিরকাল নারীর সম্মান রক্ষা করে আসে নি। নারী নিজেই তার নিজের সম্মান রক্ষা করে এসেছে। তিনি বলেন যে, রাম রাবণের কাছ থেকে সীতার সম্মান রক্ষা করে নি, সীতাই তার আপন সম্মান রক্ষা করেছে। পঞ্চপাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদী আপন সম্মান আপনিই রক্ষা করেছে। সে ক্ষমতা রয়েছে নারীর ঐ নৈতিক বলে।

গান্ধীজী বলেন, "যেখানে অহিংসার অবস্থা রয়েছে, যেখানে স্থায়ীভাবে অহিংসার শিক্ষা রয়েছে, সেখানে নারী আপনাকে অধীন, দুর্ব্বল অথবা অসহায় বলে মনে করবে না। যখন সে সত্যি সত্যিই পবিত্র হয়, তখন সে সত্যিই অসহায় নয়। তার পবিত্রতাই, তার শক্তি সম্বন্ধে সজাগ করে। আমি সব সময় মনে করেছি যে, একজন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করা দৈহিকভাবে অসম্ভব। পুরুষ নারীর উপর তখনই ধর্ষণ করতে পারে যখন নারী ভয় পায়, অথবা যখন সে তার নৈতিক ক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে না। যদি নারী ধর্ষণকারীর দৈহিক শক্তির সঙ্গে লড়তে না পারে তবে তাকে ধর্ষণ করার পূর্ব্বেই, তার পবিত্রতা তাকে মরার সাহস দেবে।"

এই পবিত্রতাই নারীর জীবনের ঐশ্বর্য্য। এই পবিত্রতাই তার নৈতিক শক্তি। এই শক্তিই নারীকে পুরুষের কামাগ্নির হস্ত থেকে রক্ষা করবে। গান্ধীজী নারীকে বলেছেন জীবনে এই পবিত্রতা অর্জ্জন করতে। সম্মান কখনও নিজে রক্ষিত হয় না, সম্মানকে রক্ষা করতে হয়। নিজের সম্মান নিজে রক্ষা করতে না পারলে, অপরে কখনও সে সম্মান রক্ষা করতে পারে না।

গান্ধীজী বলেন, "এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নির্ভীক নারী জানে, যে তার পবিত্রতা হচ্ছে তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাকে কেউ কখনও আত্মসম্মান-হীন করতে পারে না। মানুষ যত পশুই হোক্ না কেন, সে তার প্রদীপ্ত পবিত্রতার শিখার কাছে লজ্জায় মাথা নত করবেই।"

(আগামীবারে সমাপ্য)

শূন্য সাহারা

শ্রীবাণীকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায়

তোমারে সরায়ে দিয়া আপন ইচ্ছায়
কাঁদিতেছি বিরহের শূন্য সাহারায়!
আসিতে প্রত্যহ কাছে আনন্দ-প্রতিমা।
দেখিয়াছি নারীত্বের আশ্চর্য্য মহিমা।
সুরের অমৃত তব কণ্ঠ হ'তে ঝরি

কানায় কানায় চিত্ত তুলিয়াছে ভরি
স্বর্গের আনন্দ-রসে। দু'জনে মিলিয়া
কাব্য-সুধারসে তৃপ্ত করিয়াছি হিয়া।
জ্ঞানের নক্ষত্রলোকে করেছি ভ্রমণ।
সেদিনের সত্য হায় আজিকে স্বপন!

* * *

ভালোই হয়েছে, বঁধু—তুমি কাছে নাই।
বাসনা অনলে প্রেম হয়ে যেতো ছাই।
এত ব্যথা—তবু সুখী। জানি অশ্রুজল
প্রেমেরে রাখিবে চির-কিশোর শ্যামল।

যুদ্ধোত্তর ভারত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যখন সম্মিলিত জগত (United Nations) য়ুরোপের ভূমিখণ্ডে অবতরণ করিলেন, তখন তাঁহারা যে দুঃসাধ্য কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কাহারো বড় একটা সন্দেহ ছিল না। বহুদিন হইতেই শুনা যাইতেছিল যে Germany শুধু Siegfrid Line এর পিছনেই দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করে নাই, তাঁহার বহিঃপ্রাকারও Atlantic wall তৈয়ার করিয়াছিল। অবশ্য আজ এখন এই Atlantic wall বা দুর্গ সম্বন্ধে লোকের মনে হয় যে সে সমস্তই গুজব মাত্র। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহা নহে। শুধু সম্মিলিত শক্তি যথেষ্ট আয়োজন করিয়াই, সমস্ত কিছুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই Second front এর উদ্যম করিয়াছিলেন।

এইরূপ একটা মহাযুদ্ধের কল্পনা করাও সাধারণ লোকের পক্ষে কঠিন। অতীতের সমস্ত যুদ্ধের ব্যাপার এই যুদ্ধের কাছে নগণ্য। প্রায় দুই বৎসরের অধিক ইংলণ্ড ও আমেরিকার সমবেত সর্ব্বতোমুখী আয়োজনের ফলে তবে এই second front সম্ভব হইয়াছে। যেখানে একসঙ্গে হাজার বারশো মাইল ব্যাপিয়া যুদ্ধের বিস্তার ও যেখানে যুদ্ধের অগ্রগতি দিন ৪০।৫০ মাইল, সেখানে কত জিনিসের প্রয়োজন তাহার হিসাবও রাখা দায়। Scale of operations অসম্ভব রকমে বাড়িয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, হালের first world warও এই মহাযুদ্ধের তুলনায় কতকগুলি খণ্ডযুদ্ধের সমষ্টি মাত্র। নেপোলিয়নের অসাধারণ প্রতিভাসত্ত্বেও য়ুরোপ বিজয় হইয়াছিল ১০।১৫ বৎসরে। হিটলারের সে জায়গাতে লাগিল ৫।৭ বৎসর মাত্র। মনে হয় ইহাও আশ্চর্য্যজনক। যেভাবে সামরিক বিজ্ঞান ও উপকরণ বাড়িতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধও দুই বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হইবে না। মার্কিনের একজন পণ্ডিত হিসাব করিয়াছেন যে, এইরূপ একটা বড় রকম কিম্বা ইহার চেয়েও কিছু বড় একটা যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে লাগিবে প্রায় বছরখানেক কি বছর দেড়েক, যুদ্ধ আসলে চলিবে ৩ মাস হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত। তবে প্রথমদিকটা যে ধ্বংস হইবে, তাহা মারাত্মক হইতে পারে। সে ধ্বংসের পরিমাণ পুরাণোদিনের ১০০টা যুদ্ধের ধ্বংসের সমান হইতেও পারে।

উদ্যোগপর্ব হইতেই তাহা বুঝা যায়। এ যুদ্ধে বাহুর শক্তি প্রয়োজন হয় না, মস্তিষ্কের উদ্ভাবনাশক্তি ও উৎপাদন-শক্তির পরীক্ষাই হয়। সৈন্য অবশ্য চাই। কিন্তু লোকবল গৌণ, মুখ্য নহে। চাই উপযুক্ত সহস্র রকমের উপকরণ; চাই ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানবিৎ; চাই শ্রমিক ও ধনীর সম্মিলিত পরিশ্রম; চাই লক্ষ লক্ষ জাহাজ, বিমানপোত, মোটর গাড়ি, এইসব। আর চাই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ, বিলম্ব সহিবে না। সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনমরণ মুহূর্ত্তের দেরীর উপর নির্ভর করে ও করিবে। কোনো পক্ষ আর অনিশ্চিত কিছু লইয়া যুদ্ধোদ্যম করিবে না। যতটা সম্ভব সুনিশ্চিত হওয়া চাই। এই সুনিশ্চয় ছিল না বলিয়াই হিটলার পরাজিত হইল।

ভাবিতেছি, এইরূপ যুদ্ধের ফলে ক্ষতিটা এখন কম হইবে, লাভটা হইবে বেশী। ভবিষ্যতের যুদ্ধটা হইবে পাকা খেলোয়াড়ের সতরঞ্চ খেলার মত। দু' চার চাল খেলিয়াই বুঝা যাইবে, কাহার হার বা কাহার জিৎ। তখনই খেলা শেষ হইবে। অনর্থক সময় নষ্ট কেহ করিবে না। যদি তার পরও কেহ খেলায় লাগিয়া থাকে, তবে সে শুধু আত্মহত্যার নেশাতে। এ প্রকার যুদ্ধে surprise এর অবকাশ নাই। ইহার ভিতর এমন কিছু ঘটিবে না যাহাতে a defeat will be turned into a victory শেষ মুহূর্ত্তে। তাই সময়মত পরাজয় স্বীকার করিলে লোকসান অনেক বাঁচিয়া যাইবে। তা যদি ঘটে, তবে ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণ এইরূপ যুদ্ধোদ্যম হইতে বাড়িবে। আজ তাহা বুঝা যাইতেছে। Atom Bomb পড়িবার পর যুদ্ধ আর চলিল না। যে যুদ্ধ বৎসরাধিক চলিবে মনে হইয়াছিল, তাহা এক সপ্তাহে শেষ হইল।

সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের সমগ্র নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা কমিবেই। এ বিষয় মতভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু সম্ভাবনা কমারই। মানুষের প্রতি মানুষের বিদ্বেষ সম্বন্ধ ভবিষ্যতের যুদ্ধে কম হইবে। সংঘর্ষ ও পরীক্ষা হইবে শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তির। দৈহিক শক্তির নহে। যে আদিম প্রবৃত্তি এইরূপ নিষ্ঠুরতা বা নৃশংসতাতে উল্লাস পায়, বুদ্ধির পরীক্ষাতে, বিজ্ঞানশক্তির পরীক্ষাতে, তাহার সম্ভব স্থান থাকিবে না। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও কমিবে। যুদ্ধের জন্য কি মহাশক্তি, কি ছোট শক্তি, কেহই বড় উদ্‌গ্রীব হইবে না।

* * * * *

Normandy হইতে মিত্রশক্তি যতই ভিতরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই বেশ বুঝা যাইতেছে যে যুদ্ধের মোড় ফিরিয়াছে। চারি বৎসরের যুদ্ধের উত্তেজনা ও ধ্বংসের ফল জার্ম্মাণ বাহিনীতে যেন সুস্পষ্ট হইতেছে। Atlantic wall ভাঙ্গিয়া পড়িতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। France যে পৌঁছিবার রাস্তাগুলিতে যে সমস্ত ঘাটী ছিল, মিত্রশক্তি পূর্ব্ব হইতেই তাহা সরাইয়াছিলেন। তারপর প্রথমটা একটু মুস্কিল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অপ্রত্যাশিত নহে। ফ্রান্সের যুদ্ধও বেশীদিন চলিল না। রমেল জীবিত থাকলেও war on two fronts বন্ধ হইত না, দুই front এ এই যুদ্ধটা এইবার জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধেই চলিয়াছে। পিছুহঠা বিপদ।

বিশেষত যে আগাইয়াছে তাহার পক্ষে। কে জানে জার্ম্মাণ অধিনায়করা কি ভাবিতেছেন। কিন্তু আর যুদ্ধ চালনা আত্মঘাতী হইবে বলিয়াই মনে হয়। আজ সম্ভব দুনিয়ার বিনিময়েও কেহ হিট্‌লার হইতে চাহিবে না। ভাগ্য পরিবর্ত্তন এত দ্রুত হইল যে এদেশে অনেকেই সে-কথা যেন বিশ্বাস করিতে চাহে না। ভাবে হিট্‌লারের হাতে এখনও এমন কিছু আছে, যাহার দ্বারা হিট্‌লার শেষ মুহূর্ত্তেই মিত্রশক্তির বাজি মাত করিতে পারে।

নরেন্দ্রনাথ কহিল, "জাপানই জিতুক আর জার্ম্মানীই জিতুক, কিংবা মিত্রশক্তিই জিতুক, ভারতবাসীর যে ঘাসজল সেই ঘাসজল। হয় ত তাও মিল্‌বে না। যা মিল্‌বে তা প্রকাণ্ড একটা গোলোযোগ। যুদ্ধ যতক্ষণ চল্‌ছে ভালো, থাম্‌লেই মহামুস্কিল।"

কথাটা মিথ্যা নয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার ব্যবসা কেমন চল্‌ছে?"

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "দয়ালই জানে বাবা। আমি শুধু শুনি আর আদেশ পালন করি। এখনো রঙ্‌ চিন্‌তে শিখিনি, বাজার দর কি তাই জান্‌তে শিখ্‌ছি, আর ক্রেতা বিক্রেতা কি তাই দেখছি। তবে সম্ভব চল্‌ছে। দয়াল তো খুব ব্যস্ত, দিনরাত ফন্দি-ফিকির কোরছে কত রকমের।"

শ্রী বল্‌লে, "ফন্দি-ফিকির না কোরলে ব্যবসা চলে না।"

নরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "যেমন সব ব্যবসাদার, তেমনি পরিভাষা ব্যবসার। আগে লোকে ব্যবসা কোরতে চাইত সাধুতা, সততা; এখন চায় ফন্দি-ফিকির। যুদ্ধে আমরা অনেক কিছু শিখ্‌লুম!"

আমি বলিলাম, "ব্যবসা তো আমরা করি না; আমরা জানি দোকানদারি, যুদ্ধের চাহিদাতে দোকানদারির ভিতর এসেছে লোভ। যুদ্ধ জিনিসটা immoral; কিন্তু তৎসংক্রান্ত সব কিছুই হয় immoral, অনেক কোরে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় morality গড়তে হয়! যুদ্ধে তা একদিনে নষ্ট কোরে দেয়। যুদ্ধের মত সমাজেও দুর্দৈব আর কিছু নেই। যদিও রাষ্ট্রশক্তি তাতে লাভবান্ হয়।"

নরেন্দ্র মন্তব্য করে, "এ যুগে লোকে চায় টাকা, সম্ভোগ, বিলাস এই সব। এটা Marx এর যুগ; লোকে Marx নিয়ে মেতেছে। এটা capitalism এর শেষ যুগ সম্ভব। তাই তার last kickটা পাবো। এইটা লক্ষ্য করা গেছে যে এখন ধনী নির্ধনী, যাদের এতটুকু জ্ঞান হোয়েছে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে, সবাই চায় বিলাস। থিয়েটার সিনেমা রেস্তোরাঁতে কুলি মজুর পানওয়ালা সবাই গিয়ে ভিড় কোরছে। দামী কাপড় কিন্‌ছে চাষাভুষার দল। আর যতই এই সৌখীনতা বাড়ছে, ততই ধনীর বিরুদ্ধে ধনহীনের হোচ্ছে আক্রোশ ও বিদ্বেষ, যুদ্ধান্তে সম্ভব এটা বাড়বে।"

শ্রী বলিল, "সেটা খারাপ কি? ধনীরাই সমস্ত জীবনটা ভোগ কোরবেন, প্রয়োজনাতীত সব কিছু আহরণ করবে, এটা ঠিক ন্যায়-সঙ্গত। সমাজ বা জাতি যে অধিকতর উপার্জ্জন কোরছে, তার মানে শুধু এ নয় যে কতকগুলি ধনীর ঐশ্বর্য্য বাড়ছে।" শ্রীর ভিতরের communism এর উক্তি! communism এর একটা প্রচণ্ড appeal আছে জনসাধারণের কাছে। কিন্তু ইহার শেষ পর্য্যন্ত ত্রুটী কোথায় তা কেহ ভাবিয়া দেখে না। communism এর ভিতর যা আছে, অর্থনীতিশাস্ত্রে তাহা পাওয়া যায় না। অন্ততঃ এখনো পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অথচ এ দেশে নয় শুধু, অনেক দেশেই communism নিয়ে ছেলেরা মেতেছে, সেদিন একটা ছেলের মুখে এই নিয়ে বড় বড় অনেক কথা শুন্‌লুম। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারলুম না তারা কি বোল্‌ছে। তারা কি চায় যে, এমন একটা কিছু ব্যবস্থা হবে যাতে সবাইকে সব কিছু সমান ভাবে বণ্টন কোরে দেওয়া হবে? আচ্ছা সেটা কি রকম ব্যবস্থা। কর্ত্তৃপক্ষ থেকে সব কিছু উৎপাদন হাতে নিয়ে Ration কোরে দেওয়া ছাড়া—দর-দস্তুর না কোরে অন্য উপায় তো-দেখি না, তা হোলে আবার সে কর্ত্তৃপক্ষ যেমন বোল্‌বেন সব বিষয়ে তেমনিই কোরতে হবে। তা না হোলে তাঁরা সেটা manage কোরতে পার্ব্বেন না। কিন্তু সে রকম একটা ব্যবস্থা মেনে নিতে কি পারা যায়? যে সাম্যবাদ আমাদের মনে আছে, সেটা ideal, তার প্রকৃত ও বাস্তব রূপ কি, তা আমরা এখনো কল্পনা কোরতে পারি না। তবে এটা বুঝতে নিশ্চয় কারো দেরী হবে না যে, জোর কোরে সকলকে সমান করা যায় না। কোরলেও তার ফলটা যে খুব ভালো হবে তা নয়। অবশ্য যারা সমাজের বা রাষ্ট্রের দোষে দুঃস্থ, তাদের একটা ব্যবস্থা চাই। দারিদ্র্যটা এ যুগে অশোভন। নানা রকমে তাহা পীড়াদায়ক। সেই দারিদ্র্য দূর করার একটা পথ খুঁজে বার কোরতেই হবে। কিন্তু ভারতের সমস্যা বড় কম নয়। সেদিন কে নাকি বোল্‌ছিল যে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষটা "was not quite a success." শুনে চম্‌কে উঠেছিলুম। দুর্ভিক্ষটা নিয়ে নাটক নভেল প্রবন্ধ অনেক লেখা হোয়েছে বটে; বুভুক্ষু নর-নারীর হাহাকার ও আর্ত্তনাদ একদিকে, অর্থলোলুপ ব্যবসায়ী ও অপটু কর্ত্তৃপক্ষ অন্যদিকে মিলিয়া যে দৃশ্য তৈয়ারী করিয়াছিল তাহা এখনও সম্ভব অনেকেই ভুলিতে পারে নাই। কিন্তু এর অন্য-দিকও আছে, এই যে দেশে অসম্ভব রকমে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই কোটি কোটি লোকের জীবন যাপনের ব্যবস্থার কি উপায় হবে? একেতো উৎপাদন শক্তি কিছুই নাই বলিলেই হয়। তার উপর অতিরিক্ত এই লোক সংখ্যার pressure, ইহাতে যতই কেন সাম্যবাদ করি, communism করি, কিছুই হবে না। লোকে আসল কথাটা সম্মুখে রাখে না; তাই অনেক গোলযোগের সৃষ্টি। সাহিত্যও যে আসল কথাটা না বুঝে ভাব বিলাসী হোয়েছে, তাতে ক্ষতি বড় কম হোচ্ছে না।

শ্রী বলিল, "দেশের চিন্তা-শক্তি ভাব-বিলাসে রুদ্ধ হোয়ে, আবর্ত্তিত হোয়ে, আবিল হোয়ে ওঠে। একটা কিছু হোলেই তার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ হোয়ে যায়। তা ছাড়া এ দেশের নাটক নভেলে একটা চর্ব্বিত চর্ব্বণ করার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ও প্রকটিত। কি জানি কেন এ রকমটা দাঁড়ায়। বোধ হয় শক্তির অভাবে। শক্তি, চিন্তাশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি একটু আধটু না থাক্‌লে শুধু ভাবুকতার জোরে কখনো সুসাহিত্য হয় না।"

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যে তুমি কথাটা ঘরের মধ্যে আমাদের কাছে বোসে বোল্‌ছো। তা না হোলে যদি সত্যিকারের কোনো সাহিত্যিকের সাম্‌নে বোল্‌তে, তোমাকে মজা দেখাতো।"

এমন সময় দয়াল ও উমা আসিয়া পৌঁছিল। দয়াল সম্ভবত নরেন্দ্রের শেষের কথাগুলি শুনিয়াছিল, তাই প্রবেশ করিয়াই বলিল, "এই যে আমি এসেছি সুসাহিত্যিক। শুনি একবার আমার নামে কি বলা হোচ্ছিল!"

শ্রী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রশ্ন করিল, "আপনি সুসাহিত্যিক? বাবো কোথায়?" সে উমার দিকে চাহিল যেন নিরুপায় হইয়া।

দয়াল উত্তর দিল, "কোথায়ও যেতে হবে না ঘরে সুসাহিত্যিক থাক্‌তে। আমি দেখ্‌ছি কাগজ কলম কালি যত মাগ্যি হোচ্ছে, লেখার চাড় তত বাড়ছে। হবারই কথা। এই রকমই হয়। ছেলে-বেলাতে যখন বাপ মা পড়তে বোল্‌তো, তখন পড়াশোনা ভালো লাগ্‌তো না। আর যদি বোল্‌তো আজ পড়িস্‌ নি, সরস্বতী পুজো, অমনি মনে হোতো পড়াশোনা আজ না কোরলেই নয়। তাই এই দুর্দ্দিনে আমার সুসাহিত্যিক হবার ইচ্ছেটা অত্যন্ত প্রবল হোয়েছে।"

নরেন্দ্র বলিল, "লেগে যাও তবে। আজকাল সাহিত্যিক প্রেরণা Black market Service-এ, Civil supplyএর দফতরে। সুতরাং তোমার লাইনেই এসেছে সাহিত্য।"

দয়াল মাথা চুল্‌কাইয়া কহিল, "কিন্তু বানানটা দুরস্ত হয় নি—"

নরেন্দ্র হাসিয়া উত্তর দিল, "আট্‌কাবে না। নানারকম বানানের experiment হোচ্ছে, তোমারটাও একটা experiment হিসেবে উতরে যাবে, চাই কি বাহবাও পাবে।"

দয়াল উল্লসিত হইয়া বলিল, "তবে মেরে দিয়েছি। Matter আমার কাছে আছে বহুত। Tons! শুধু কায়দা কোরতে পারছিলাম ঐ না বানানের জন্যে। এইবার—" সে শ্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝাইতে চাহিল, এইবার তাহাকে রুখা দায়।

উমা বলিল, "চিরকাল রঙের দালালি কোরে এলে, এখন আবার কি সাহিত্যের দালালি কোরবে নাকি? রক্ষে কর। এমনিতেই তো ব্যবসা বুদ্ধির ঠেলাতে দিনরাত স্বস্তি নেই আমাদের!"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "হয় তো সাহিত্যের দালালিতে স্বস্তি পাওয়া যাবে। কিন্তু এদেশে মজুরি পোষাবে না, দয়াল।"

দয়াল বলিল, "দালালি নয়, একেবারে manufacturer হয়ে বোসবো জ্যাঠামশা'য়! দেখ্‌বেন তখন! শতাব্দী সিরিজ; চক্ষুকর্ণ বিবাদী সিরিজ; গণতন্ত্র সিরিজ; নেড়ানেড়ি সিরিজ; চাষী কৈবর্ত্ত সিরিজ; শ্রমিক-মজদুর সিরিজ; সিরিজে সিরিজে অন্ধকার ছুটিয়ে দেব। তখন অবাক হয়ে দেখবেন কি রকম productionটা হয়!

উমা বলিল, "ভগবান রক্ষা করুন!"

তার কথা বলার ভঙ্গিমাতে আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

নরেন্দ্র একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, যুদ্ধের ভিতর বাঙলা সাহিত্যটা দেখ্‌ছি জনগণের ব্যাপার নিয়ে খুব মেতেছে, কিন্তু সেটার সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক তো বেশী নেই। যুদ্ধটা কি কাকেও inspire কোরতে পারলে না। দুর্ভিক্ষটা আর যুদ্ধটা বিফল হোলো সাহিত্যের দিকে!"

আমি উত্তর দিলাম, "হবার কথা। আমি তো দেখেছি যুদ্ধ সম্বন্ধে এদেশে বেশী লোকেরই পরোক্ষ জ্ঞানও অত্যন্ত অস্পষ্ট—ধারণা করার মত অভিজ্ঞতা জন্মে নি। আর এর পরিসর এতটা বেশী যে, ব্যক্তির মনের পক্ষে এর কল্পনাও সম্ভব নহে। তাই কোনোও দেশে যুদ্ধকালীন সাহিত্য হয় নি। যা' হোয়েছে তাতে জার্ম্মাণ কি জাপানীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষও প্রকাশিত হোয়েছে। সত্যিকারের সাহিত্য হয় নি। সম্ভব এর প্রভাব সমগ্রভাবে কোনো সাহিত্যে এখন কিছুদিন রূপ নিতে পারবে না।"

দয়াল বলিল, "আমি লিখ্‌বো, জ্যাঠামশা'য়! দেখুন না। Manufacture কোরতে কত কষ্ট আর হবে। দু চারটে বড় বড় জেনারেল কি কাপ্তেন ধোরে বোল্‌বো লেখো। সাময়িক পত্রে তো পাওয়া যাবে মালমসলা। কোথায় কোথায়ও সাহিত্যিক রূপও আছে।"

উমা বলিল, "রঙের ব্যবসা কি চল্‌ছে না?"

দয়াল উত্তর দিল, "চল্‌বে না কেন? তবে অনেকগুলো কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি নিলে সুবিধে ব্যবসার দিকে।..."

(ক্রমশঃ)

সাংখ্য ও বেদান্ত

স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ

মুনী ঋষিগণের রচিত সাংখ্য মত সম্পর্কিত গ্রন্থ ব্যতীত সাংখ্য মতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ যাহা আজকাল পাওয়া যায় তাহা আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত আর্য্যা নামকছন্দে ৭২টী শ্লোকের সাংখ্যকারিকা নামক অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার উপর বহু টীকা ভাষ্যাদি রচিত হইয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীনকালেও চীন প্রভৃতি ভাষাতে ইহার অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। সাংখ্যমত সম্বন্ধে অপরাপর কথা এই গ্রন্থের ভূমিকা মধ্যে কতকটা বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সে সব কথার কিয়দংশ অন্য পত্রে কয়েক মাস ধরিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের মূলের ব্যাখ্যা এবং তাহাকে অনুষ্টুপ্‌ছন্দে পরিণত করিয়া সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। আর্য্যাচ্ছন্দের শ্লোকের অর্থবোধ অপেক্ষা

অনুষ্টুপচ্ছন্দের শ্লোকের অর্থবোধ সহজে হয়। এতদ্ব্যতীত ব্যাখ্যা মুখে প্রাচীন সাংখ্যমত যে বেদান্ত মত হইতে অভিন্ন, ইহাও প্রদর্শন করা এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

সাংখ্যকারিকার শ্লোক যথা—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসাতদপঘাতকেহেতৌ।
দৃষ্টে সাঽপার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ॥১

অন্বয়—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ তদপঘাতকে হেতৌ জিজ্ঞাসা (কর্ত্তব্যা)। দৃষ্টে সা অপার্থা চেৎ? ন, একান্তাত্যন্ততঃ অভাবাৎ।১

পদার্থ—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ—দুঃখানাং ত্রয়ং—দুঃখত্রয়ং, তেন অভিঘাতঃ দুঃখত্রয়াভিঘাতঃ, তস্মাৎ—দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ। দুঃখত্রয় বলিতে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ বুঝায়। আধ্যাত্মিক দুঃখ বলিতে শরীর সম্বন্ধীয় দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ বলিতে ভূত বা ভৌতিক সংক্রান্ত দুঃখ এবং আধিদৈবিক দুঃখ বলিতে দেবতা সংক্রান্ত দুঃখ বুঝায়। অভিঘাত অর্থ প্রতিকূল সম্বন্ধ। সুতরাং অর্থ হইল—ত্রিবিধ দুঃখের সহিত আমাদের প্রতিকূল সম্বন্ধ আছে বলিয়া—

—তদপঘাতকে হেতৌ—তস্য অপঘাতকে—তদপঘাতকো ইহা হেতৌ পদের বিশেষণ। সুতরাং অর্থ হইল—সেই দুঃখত্রয়ের অপঘাতক অর্থাৎ বিনাশক যে "হেতু" সেই হেতু বিষয়ে—জিজ্ঞাসা (কর্ত্তব্যা)—জিজ্ঞাসা করা উচিত। অর্থাৎ দুঃখত্রয়ের বিনাশের হেতু কি, তাহা আমাদের জানিবার ইচ্ছা করা উচিত।

—দৃষ্টে—দৃষ্টবিষয়ে অর্থাৎ মণি মন্ত্র মহৌষধি প্রভৃতি লৌকিক উপায় দ্বারা সেই দুঃখত্রয়ের বিনাশ হইতে পারে বলিয়া—সা—তাহা, অর্থাৎ সেই জিজ্ঞাসা—অপার্থা চেৎ—অপার্থ হয় যদি বলি, অর্থাৎ দুঃখবিনাশের লৌকিক উপায় অনেকই আছে বলিয়া সেই জিজ্ঞাসা ব্যর্থ হয় যদি বল—তাহা হইলে বলিব—ন, একান্তাত্যন্ততঃ—না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, একান্তভাবে এবং অত্যন্তরূপে—অভাবাৎ—অভাব হয় বলিয়া। অর্থাৎ সেই দুঃখনাশের অভাব হয়। অর্থাৎ দৃষ্ট উপায় দ্বারা সেই দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত অপঘাত অর্থাৎ বিনাশরূপ অভাব হয় না। সুতরাং সমগ্রের অর্থ হইল—ত্রিবিধ দুঃখের সহিত আমাদের প্রতিকূল সম্বন্ধ আছে বলিয়া সেই ত্রিবিধ দুঃখের অপঘাতক অর্থাৎ বিনাশক যে হেতু সেই হেতু বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা উচিত। দৃষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ মণি মন্ত্র মহৌষধ প্রভৃতি লৌকিক উপায় দ্বারা সেই দুঃখত্রয়ের বিনাশ হইতে পারে বলিয়া সেই জিজ্ঞাসা অপার্থ অর্থাৎ ব্যর্থ হয়, ইহা যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না, কারণ দৃষ্ট উপায় দ্বারা সেই দুঃখের একান্তভাবে এবং অত্যন্তরূপে অভাব হয় না। ইহার অনুষ্টুপচ্ছন্দে পরিণতি যথা—

দুঃখত্রয়াভিঘাতিত্বাজ্জিজ্ঞাসা তন্নিবৃত্তয়ে।
একান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ ন দৃষ্টে তদপার্থতা ॥১

অর্থ স্পষ্ট। এ জন্য অন্বয়াদি প্রদর্শন আর করা হইল না। এক্ষণে দেখা যাউক এই প্রথম কারিকায় যাহা বলা হইল তাহার সহিত বেদান্ত সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ কিরূপ—প্রথমতঃ দেখা যায় দুঃখত্রয় বিনাশ বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্তে কোনও মতভেদ নাই। সাংখ্য মতে ন্যায় মতের ন্যায় দুঃখত্রয়ের বিনাশই মুক্তি। বেদান্ত মতে কিন্তু দুঃখত্রয়ের বিনাশ এবং পরমানন্দ প্রাপ্তি উভয়ই মুক্তি বলা হয়। কিন্তু এই মতভেদ বস্তুতঃ মতভেদই নহে। কারণ, দুঃখাভাব ও পরমানন্দপ্রাপ্তি ভিন্ন বস্তু নহে। ইহার কারণ, বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু সবই ব্রহ্মে কল্পিত। আর কল্পিতের যে অত্যন্তাভাব তাহা অধিষ্ঠান স্বরূপ বলা হয়। সুতরাং পরমানন্দ পদবাচ্য যে ব্রহ্ম, তাহাতে কল্পিত যে জগৎ সংসার এবং সুখ দুঃখাদি তাহার অত্যন্ত নিবৃত্তি অর্থাৎ অত্যন্তাভাব হইলে ব্রহ্ম স্বরূপই থাকিয়া যায়। অতএব সাংখ্যাদি মতের যে দুঃখ নিবৃত্তি এবং বেদান্ত মতের যে দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি—এই উভয় মতই অভিন্ন মতবাদ মাত্র। যদি বলা যায় তবে বেদান্ত মতে দুঃখ নিবৃত্তির সঙ্গে পরমানন্দপ্রাপ্তি এতদুভয়ই মুক্তিতে হয় ইহা বলিবার তাৎপর্য্য কি?

ইহার উত্তর—মুক্তিতে দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি এই উভয়ই হয় ইহা বলিবার উদ্দেশ্য সাংখ্য মতের কতকটা প্রতিধ্বনি যে বৌদ্ধমত, সেই বৌদ্ধ মতে প্রবেশের শঙ্কা নিবৃত্তি করিবার জন্য। বস্তুতঃ বৌদ্ধ মত যে সাংখ্য মতের কতকটা প্রতিধ্বনি, তাহা ভগবান বুদ্ধদেবের সাংখ্যাচার্য্য আরাড় কালমের শিষ্যত্ব ছয় বৎসর কাল করিয়াছিলেন—এই প্রসিদ্ধ কথা হইতে কল্পনা করা যাইতে পারে। এই কারণে দুঃখত্রয়ের অভাবই মুক্তি, এই প্রাচীন মতের পর বৌদ্ধমত প্রবল হইলে অর্থাৎ মুক্তিতে আনন্দস্বরূপতা নাই, শূন্য মাত্র অবশেষ হয়, ইত্যাদি মতবাদ প্রবল হইলে, সেই প্রবেশ শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ আচার্য্যগণ দুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি এই উভয়কেই মুক্তি বলিয়াছেন, বস্তুতঃ ইহারা পৃথক্ বস্তু নহে। যেহেতু বেদান্তের সিদ্ধান্ত কল্পিতের যে নিবৃত্তি অর্থাৎ অভাব, তাহা তাহার অর্থাৎ যাহাই দুঃখ নিবৃত্তি তাহাই পরমানন্দ প্রাপ্তি, অন্য কিছু নহে। এই কারণ এ বিষয়ে সাংখ্য এবং বেদান্ত মতের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই।

দ্বিতীয় কথা এই যে, কারিকায় বলা হইয়াছে—"দৃষ্টে সা অপার্থা চেৎ" অর্থাৎ দৃষ্ট বিষয়ে সেই জিজ্ঞাসা ব্যর্থ হয় ইহা যদি বল। ইহার অর্থ দৃষ্ট উপায় থাকায় সেই জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন ইহা যদি বল।

এই কথা হইতেও বুঝা যায় সাংখ্য মতের সহিত মূলতঃ বেদান্তের কোন ভেদ নাই। দুঃখনাশের দৃষ্ট উপায় বলিতে মণিমন্ত্র মহৌষধি প্রভৃতি বস্তুকে বুঝায়। কিন্তু এই মণিমন্ত্র মহৌষধি দ্বারা দুঃখের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি সম্ভবপর হয় না। কারণ, ইহাদের দ্বারা যে ফল হয়, তাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সংক্রান্তই হয়। কিন্তু কারণ শরীরে যে অজ্ঞান, তাহা, মণিমন্ত্র মহৌষধি দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না। অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে হইলে জ্ঞান প্রয়োজন। জ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞান নষ্ট হয় না।

একথায় বেদান্ত ও সাংখ্যে এক মত। কারণ, সাংখ্য বলেন প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞান হইলে মুক্তি হয়, আর বেদান্তও বলেন, ব্রহ্ম ভিন্ন সব মিথ্যা, আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। সাংখ্য বলিয়াছেন এই জ্ঞানের জন্য নাহং নাধিনমে, (৬৪ কারিকা দ্রষ্টব্য) ইহার অভ্যাস করিতে

হইবে, আর বেদান্ত বলিয়াছেন "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই ভাবের অভ্যাস করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে উভয় মতেই জ্ঞানেই মুক্তি হয়। জ্ঞান ভিন্ন অন্য সাধন মুক্তির নাই।

যদি বলা হয় অষ্টাঙ্গযোগ উপাসনা নিষ্কাম কর্ম্ম প্রভৃতিও মুক্তির সাধন, উভয় মতেই তাহা বলা হয়। অতএব বেদান্ত ও সাংখ্য এই বিষয়ে একমত কি করিয়া বলা হয়?

ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞান অজ্ঞান নাশের জনক কারণ, আর যোগ উপাসনাদি "প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি রূপ" কারণ বলা হয়। জনককারণতার দৃষ্টিতেই জ্ঞানকেই মুক্তির উপায় বলা হইয়া থাকে। জনককারণকেই মুখ্য কারণ বলা হয়। প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিকে কারণ বলা ব্যবহার মাত্র। উহা যথার্থ কারণপদবাচ্য নহে। অতএব জ্ঞানে মুক্তি এ বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত মধ্যে মতভেদ নাই।

তাহার পর দৃষ্ট উপায়ে মুক্তি হয় না, অর্থাৎ দুঃখের সর্বতোভাবে নাশ হয় না বলিয়া অদৃষ্ট উপায়ে তাহা হয়, ইহা প্রকারান্তরে বলা হইল। এই অদৃষ্ট উপায়কে এস্থলে পরবর্ত্তী শ্লোকে আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক উপায় বলা হইয়াছে। ইহার অর্থ—বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রভৃতি যে উপায়, তাহার দ্বারাও মুক্তি সাধিত হয় না, অর্থাৎ দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। কারণ, তাহার ক্ষয়োদয় আছে, ইত্যাদি। বস্তুতঃ এ বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত একমত। কারণ বেদান্তী এজন্য শ্রুতি প্রদর্শন করিয়া বলেন—

"যথা ইহ কর্ম্মচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে এবম্ অমুত্র পুণ্যচিতঃ লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদি। "নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন" ইত্যাদি।

কিন্তু ইহার পর যে কথা বলা হয় তাহাতে সাংখ্য ও বেদান্তের মতভেদ দেখা যায়। কারণ, সাংখ্য অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণ বলে জগৎ কারণ নির্ণয় করিয়া মুক্তির জন্য যে বিবেক সাধন আবশ্যক বলেন, তাহাও অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণ গণ্যই হয়। বেদান্ত এস্থলে বলেন—তাহা নহে, অনুমানাদি লৌকিক প্রমাণসহ কৃত শ্রুতি প্রমাণ দ্বারাই মুক্তি ও তাহার সাধন নির্ণীত হইতে পারে। শ্রুতির কারণ গ্রহণ না করিলে মুক্তি সম্ভবপর হয় না। অতএব এ বিষয়ে সাংখ্য ও বেদান্ত ভিন্ন মত। অনুমানাদি মুখ্য প্রমাণ নহে, শ্রুতিই মুখ্য প্রমাণ।

কিন্তু এই বিরোধের মীমাংসা আমরা মহাভারতে কথিত সাংখ্য মতের দ্বারা করিতে পারি। তথায় ২১৮ অধ্যায় পঞ্চশিখ ও জনদেব জনক সংবাদে বেদের প্রামাণ্যকেই অধিক বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য বহুস্থলে এমন কথা আছে যে সাংখ্য মতের প্রাচীন ও নবীনভেদ করা আবশ্যক হয়। এজন্য উক্ত বিরোধ নবীন সাংখ্যের সহিত বেদান্তের বিরোধ বলিয়া একটা মীমাংসা করিতে পারি। কালবশে প্রাচীন সাংখ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া এই মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে—এইমাত্র।

বস্তুতঃ অনুমানাদি প্রমাণও দৃষ্ট উপায়ের মধ্যে গণ্য হয়। কারণ, দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপ্তি গৃহীত হইলে অনুমান হয়। এজন্য সাংখ্য মূলতঃ বেদান্তের সহিত ভিন্নমত নহেন।

এতদ্ব্যতীত মুক্তির দ্বারাও বুঝা যায় যে জগৎ কারণরূপ অলৌকিক বিষয়ের নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান লাভ অসম্ভব। কারণ, জগৎ ও জগৎকারণ হইতে আমি অনুমাতা যদি পৃথক্ থাকিতে পারি, তবে "জগতের কারণ ইনি" এইরূপ অনুমান সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু অনুমাতা যে আমি, তাহা জগতেরই অন্তর্গত বস্তু। অতএব এস্থলে অনুমান নিঃসন্দিগ্ধ হয় না। বস্তুতঃ দৃষ্ট উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তি সর্বতোভাবে হয় না ইহা বলায় প্রাচীন সাংখ্য অনুমানকেও ত্যাগ করিয়াছেন।

যদি বলা যায় জগতের অন্তর্গত বস্তুর স্বভাব দেখিয়া সমগ্র জগতের স্বভাব নির্ণয় করিব আর তাহার সঙ্গে জগৎকারণও নির্ণীত হইবে। যেহেতু কারণ বস্তু কার্য্যের মধ্যে অনুস্যূত থাকে। সূত্র যেমন বস্ত্রে, মৃত্তিকা যেমন ঘটে ব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ জগতের অন্তর্গত বস্তুর স্বভাব দেখিয়া জগৎকারণের স্বভাব নির্ণয় নিঃসন্দিগ্ধ হইবে না কেন?

কিন্তু একথাও বলা যায় না। কারণ, কারণ বস্তুর সমগ্র স্বভাব তাহার কার্য্য মধ্যে আগমন করে না, এজন্য কার্য্য দেখিয়া কারণের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করা যায় না। এই কারণে অনুমান দ্বারা আমরা কি জগৎকারণ নির্ণয়, অথবা কি মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ কিছুই সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতে পারি না। নবীন সাংখ্য স্বাধীন ভাবে এই কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহাকে অশব্দ অর্থাৎ অবৈদিক বলিয়া বেদান্তে ব্যাসদেব কর্ত্তৃক খণ্ডন করা হইয়াছে। প্রাচীন সাংখ্যে এই দোষ নাই। এইজন্য সাংখ্য ও বেদান্ত মূলতঃ অবিরুদ্ধ। বস্তুতঃ মহাভারতে প্রায় নয় প্রকার সাংখ্যমত বর্ণিত হইতে দেখা যায়।

আর তাহা হইলে "দৃষ্টে সা জিজ্ঞাসা অপার্থা" অর্থাৎ দৃষ্ট উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা ব্যর্থ হইলেও বেদান্তজ্ঞানরূপ অদৃষ্ট উপায়ের জিজ্ঞাসা যে ব্যর্থ হয় না তাহা বলা হইল। পরবর্ত্তী শ্লোকে যে আনুশ্রবিক নামক অদৃষ্ট উপায়কেও ব্যর্থ বলা হইয়াছে তাহা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের যাগযজ্ঞাদি উপায়কে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আনুশ্রাবিক শব্দের অর্থের মধ্যে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। নচেৎ দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তির উপায়ের জিজ্ঞাসা বিষয়ে শ্রুতি অর্থাৎ বেদান্তকে ব্যর্থ বলা হয় নাই—ইহাই বলিতে হইবে। সুতরাং "দৃষ্টে সা অপার্থা নচেৎ ন" ইত্যাদি বাক্যেও বেদান্তের সহিত প্রাচীন সাংখ্যের অর্থাৎ আসল সাংখ্যের বিরোধ নাই। যাহা বিরোধ তাহা নবীন সাংখ্যের সহিতই বিরোধ। এই নবীন সাংখ্যই বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্রে খণ্ডন করিয়াছেন। এবং মহাভারতে বহুবিধ সাংখ্য মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

এইবার এই কারিকার তৃতীয় কথাটী আলোচ্য। ইহাতে বলা হইয়াছে "ন একান্তাত্যন্ততঃ অভাবাৎ" অর্থাৎ দৃষ্ট উপায়ে দুঃখ নিবৃত্তি একান্তভাবে ও অত্যন্ত রূপে হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায়, সাংখ্য মতে তদুক্ত উপায়ে, দুঃখের একান্তভাবে ও অত্যন্ত রূপে নিবৃত্তি হয়—ইহা স্বীকার করা হয়।

এ কথাতেও বেদান্ত মতের সহিত সাংখ্য মতের কোন বিরোধ নাই ইহাই বুঝা যায়। কারণ, দুঃখের সর্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হইতে গেলে দুঃখকে এবং তাহার কারণকে মিথ্যা বা ভ্রম বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। যাহা, ভ্রম জ্ঞান এবং তাহার বিষয় হয় তাহার জ্ঞান দ্বারা যে নাশ, তাহাই সর্বতোভাবে সম্পূর্ণরূপে নাশপদবাচ্য হয়। ঘট পট মঠ

[প্রকৃ]তির যে নাশ, তাহা নিরবশেষ নাশ নহে। মিথ্যার নাশই নিরবশেষ [না]শ। ঘট ভঙ্গ করিলে তাহার ধূলিকণা থাকে, কিন্তু স্বপ্নের ঘট ভাঙ্গিলে [ত]াহার ধূলিকণা কিছুই থাকে না। এইজন্য এইরূপ নাশকে নিরবশেষ [না]শ বলা হয়। আর তজ্জন্য দুঃখের যাঁহারা নিরবশেষ নাশ স্বীকার [ক]রেন তাঁহারা দুঃখ ও দুঃখের কারণকে প্রকারান্তরে মিথ্যাই বলিয়া [থা]কেন। এই কারণে এই কারিকায় বস্তুতঃ বেদান্ত মতই স্বীকার [ক]রা হইয়াছে।

যদি বলা হয় দুঃখের কারণ অজ্ঞান। অর্থাৎ সক্রিয় প্রকৃতি এবং [নি]ষ্ক্রিয় পুরুষের মধ্যে যে ভেদ আছে, তাহার জ্ঞান না থাকাই দুঃখের [কা]রণ। সাংখ্য মতের তত্ত্বাভ্যাসাদি করিলে এই অজ্ঞান নষ্ট হয় বলিয়া [দু]ঃখ দূর হয়। নচেৎ বেদান্ত মতে যেমন দুঃখের নাশের জন্য, দুঃখের [কা]রণ প্রভৃতি যাবৎ দ্বৈত বস্তুর নাশ স্বীকার করা হয়, সাংখ্য মতে সেরূপ [স্ব]ীকার করা হয় না। তন্মধ্যে দুঃখও সত্য, অজ্ঞানও সত্য, দুঃখের যে [য]াবদ্ দ্বৈতবস্তু তাহা সত্য। অর্থাৎ প্রকৃতি ও তজ্জাত বস্তু সবই সত্য [পু]রুষও সত্য; কেবল তাহাদের যে অবিবেক তাহাই মিথ্যা, অর্থাৎ [ত]াহাই বেদান্তের ন্যায় জ্ঞান নাশ্য বলা হয়। অতএব বেদান্ত ও সাংখ্য [ম]তের বিরোধ দূরপনেয় ইত্যাদি?

তাহা হইলে বলিব এ কথা সঙ্গত নহে। কারণ প্রকৃতি ও তজ্জাত [য]াবদ্ বস্তু যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দুঃখ আর জ্ঞাননাশ্য হইতে পারে [ন]া। যাহার যথার্থ সত্ত্বা থাকে তাহা আর জ্ঞাননাশ্য হয় না। দুঃখের [ক]ারণ অজ্ঞানের নাশের সঙ্গে অজ্ঞান ও তজ্জাত যাবদ্ বস্তুরই নাশ হয়। [অ]জ্ঞান ও প্রকৃতিকে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিয়া অজ্ঞানের নাশ হইবে [আ]র প্রকৃতির নাশ হইবে না—এ কথা বলা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা [হ]ইলে দুঃখের নিরবশেষ নাশ হইবে না, কারিকার কল্পিত দুঃখের নাশ একান্তভাবে ও অত্যন্তরূপে হইতে পারে না। কল্পিতের নাশই নিরবশেষ [ন]াশ হয়। এই কারণ দুঃখরূপ ভ্রম এবং সেই ভ্রম জ্ঞানের বিষয় যে দুঃখ [ত]াহাদের উভয়েরই নাশ হইলে নিরবশেষ নাশ সম্ভব হইবে। পুরুষ থাকিবে এবং প্রকৃতি থাকিবে, কেবল তাহাদের মধ্যের যে অবিবেক অর্থাৎ যে ভ্রম, তাহার নাশ হইবে এ কথা বলিলে দুঃখের একান্ত এবং অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না।

ইহার কারণ পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে অবিবেক অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষ অপৃথক্ এই যে ভ্রম, সেই ভ্রমের আবির্ভাব যদি প্রকৃতি ও পুরুষ নিমিত্তক হয়, তবে প্রকৃতি ও পুরুষ সত্য বস্তু হইলে, সেই প্রকৃতিপুরুষের একবার অবিবেক নষ্ট হইলেও পুনর্বার আবির্ভূত হইবে না কেন? সমুদায় কারণ থাকিলে কার্য্য ত থাকিবেই থাকিবে।

আর যদি বলা হয়, এই প্রকৃতিপুরুষের অবিবেক বা তদাত্ম্য ভ্রমটীও সেই প্রকৃতিপুরুষের ন্যায় অনাদি বস্তু। অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষ ভিন্ন যে ভ্রম বা অজ্ঞান বস্তু তাহা পূর্ববর্ত্তী ভ্রম বা অজ্ঞানের ফলে উৎপন্ন হয়। একটী [ভ্র]ম বা অজ্ঞান কারণ হয়, সেই ভ্রম বা অজ্ঞান হইতে আর একটী অজ্ঞান [ব]া ভ্রম উৎপন্ন হয়, আর সেই দ্বিতীয় ভ্রম বা অজ্ঞান হইতে তৃতীয় ভ্রম বা [অ]জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপে ভ্রম বা অজ্ঞানের ধারা অনাদি। সুতরাং প্রকৃতিপুরুষের অবিবেক অনাদি, আর তজ্জন্যই দুঃখও অনাদি হয়। তবে ভ্রমটী জ্ঞাননাশ্য বলিয়া তাহা পুনর্বার আবির্ভূত হয় না। এই জন্য অনাদি দুঃখের নাশের সম্ভাবনা আছে। অবিবেকজাত দুঃখ একবার সম্পূর্ণরূপে নাশপ্রাপ্ত হইলে আর পুনর্বার হইবে না?

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, ইহাতে দুইটী দোষ হয়। প্রথম সাংখ্য মতে জগতের কারণ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটী স্বীকার করিয়া আবার একটী অনাদি ভ্রম বা অজ্ঞান বস্তু স্বীকার হইল। ইহাতে সাংখ্যের প্রতিজ্ঞা হানি দোষ হয়।

দ্বিতীয়—এই অজ্ঞান সত্য কি মিথ্যা? যদি সত্য হয়, তবে সত্যের নাশ অসম্ভব হয়। যদি মিথ্যা হয় তবে দুঃখ ও দুঃখহেতু জগৎ ও মিথ্যা হয়। আর তাহা হইলে বেদান্ত মতে প্রবেশ হইল। ইহার স্বপক্ষ ত্যাগ রূপ দোষ হইল। অথবা অজ্ঞান যদি প্রকৃতির অন্তর্গত হয় তাহা হইলে অজ্ঞান প্রকৃতি ভিন্ন হইল। আর যদি প্রকৃতি ভিন্ন হয় তাহা হইলে তিনটী বস্তু স্বীকারের স্বপক্ষ হানি হইল।

তৃতীয় দোষ—কল্পনা গৌরব হয়। একবস্তু পুরুষ বা আত্মা ও অনাদি মিথ্যা ভ্রমরূপ অজ্ঞান স্বীকার করিলেই যখন জগৎ জন্মাদি ব্যাখ্যাত হয় তখন পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুইটী সত্য বস্তুর স্বীকারে কি প্রয়োজন? দুইটী সত্য বস্তু স্বীকার অপেক্ষা একটী সত্য ও অপরটী মিথ্যা বলিয়া স্বীকার কি লাঘব হয় না? অতএব প্রকৃতি এবং পুরুষও মিথ্যা অনাদি ভ্রম বা অজ্ঞান এই দুইটী স্বীকার করিয়া জগৎ জন্মাদির ব্যাখ্যা যে সাংখ্য মতে করা হয়, তাহা নির্দ্দোষ মত হইতে পারে না। মিথ্যার দ্বারা সত্য অদ্বৈত বস্তুর দ্বৈতাপত্তি হয় না।

যদি বলা হয় ভ্রম স্বীকার করিতে হইলে কোথাও তিনটী সত্য বস্তুর স্বীকার আবশ্যক হয়, আর কোথাও বা দুইটী সত্য বস্তুর স্বীকার করা আবশ্যক হয়। যেমন রজ্জুতে যে সর্প ভ্রম হয় সেস্থলে দ্রষ্টা, সর্প ও রজ্জু এই তিনটী সত্য বস্তুর স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ আত্মাতে বা নিজেতে যে ভ্রম স্বীকার করা হয় সেখানে নিজ স্বরূপ আত্মা এবং ভ্রমের বিষয়রূপ অপর একটী সত্য বস্তু স্বীকার হয়। যেমন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিজেকে হরিণ বলিয়া স্বীকার করিবার কালে ভ্রম হইয়াছিল। অতএব ভ্রম হইতে গেলে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটীর সত্ত্বা অন্ততঃপক্ষে স্বীকার করা আবশ্যক হয়। কেবল এক অদ্বৈত আত্মাতে ভ্রম হইবার সম্ভাবনাই নাই। অতএব সাংখ্য সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত? বেদান্তের অদ্বৈতবাদ অভ্রান্ত নয়।

কিন্তু এ কথাও সঙ্গত নহে। কারণ, ভ্রম কালে ভ্রমের অধিষ্ঠান আত্মা, এবং রজ্জুতে সর্পস্থানীয় যে আরোপ্য জীব ভাব ও জগদ্ ভাব, তাহাদের জ্ঞানমাত্র বা সংস্কার মাত্র আবশ্যক হয়। তাহাদের সত্ত্বার আবশ্যকতা হয় না। যেমন সর্প না থাকিলেও রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয়। এই সর্পজ্ঞান বা সর্প জ্ঞানের যে সংস্কার তাহার মূলই বেদান্ত মতের অজ্ঞান বা মায়া বা প্রকৃতি বলা হয়। সাংখ্যের প্রকৃতির যেমন একটী স্বাধীন সত্য সত্ত্বা স্বীকার করা হয়, বেদান্তে সেরূপ করা হয় না। উহা আত্মসত্ত্বার অধীন, মিথ্যা এবং জ্ঞান দ্বারা নাশ্যই বলা হয়। এই কারণে বেদান্ত মতে এক অদ্বৈত আত্মবস্তুই তত্ত্ব, নিত্য ও সত্য অজ্ঞান বা মায়া

মিথ্যা। উহার দ্বারা অদ্বৈতহানি হয় না। এই কারণে সাংখ্য মত অভ্রান্ত নহে, কিন্তু এক অদ্বৈত মতই অভ্রান্ত মত।

যদি বলা হয়, প্রপঞ্চাভাব দ্বারা অদ্বৈত ভাব বস্তুতে দ্বৈতত্বাপত্তি হইবে না কেন? অভাব জ্ঞানটী তাহার প্রতিযোগীর জ্ঞান সাপেক্ষ, আর আর প্রতিযোগীর সত্তা থাকিলে প্রতিযোগীর জ্ঞান হয়। এজন্য প্রপঞ্চাভাব দ্বারা অদ্বৈতভাব বস্তুর লক্ষণ নির্বাহ করিতে পারা যায় না। অতএব অদ্বৈত সিদ্ধ হয়না? প্রপঞ্চাভাব বিশিষ্ট ব্রহ্ম কখনই অদ্বৈত হয় না, ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে বলা হয়, প্রপঞ্চাভাবটী অদ্বৈত ভাব-বস্তুর লক্ষণ নহে, কিন্তু উপলক্ষণ। উপলক্ষণটী লক্ষ্যে নিয়তভাবে না থাকিয়াও লক্ষ্যকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। লক্ষণটী বিশেষণ স্বরূপ হইয়া লক্ষ্যের বা বিশেষ্যের নির্দ্দেশ করে—লক্ষ্যে সর্ব্বদা থাকে। উপলক্ষণ কখনও থাকে। এজন্য বিচারকালে প্রপঞ্চাভাবটী ব্রহ্মে থাকিয়া ব্রহ্মের নিত্য ও স্বরূপতঃ অদ্বৈতভাবের ব্যাঘাত করিতে পারে না। এ জন্য বলা হয় অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রপঞ্চাভাব উপলক্ষিত মাত্র। প্রপঞ্চাভাব বিশিষ্ট নহে। প্রতিযোগীর জ্ঞান প্রতিযোগীর সত্তাপেক্ষা সর্বত্র নহে। কখন প্রতিযোগীর সত্তা প্রতিযোগীর জ্ঞানসাপেক্ষও হয়। যেমন ভ্রমণকালে হয়। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্যের সময়, মণ্ডনমিশ্র মহাশয় ব্রহ্মে প্রপঞ্চের অভাব আছে বলিয়া ভাবাদ্বৈত সিদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে সুরেশ্বরাচার্য্য হইতে মহাত্মা মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় প্রভৃতি পর্য্যন্ত ব্রহ্মকে প্রপঞ্চাভাব উপলক্ষিত বলিয়া ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব উপপাদন করিয়াছেন। এ কারণ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ভ্রমপ্রদর্শন সম্ভবপর নহে।

এই কথাই প্রাচীন সাংখ্য মতে পাওয়া যায়। ইহার প্রমাণ মহাভারত। আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য মত মধ্যে এই প্রাচীন সাংখ্যের নিদর্শন বহু পাওয়া যায়। বস্তুতঃ উপরে যে তিনটী কথা বলা হইল তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে সাংখ্যকারিকা বেদান্ত মতের বিরোধী নহে। পরবর্ত্তী কারিকা মধ্যে এই বিষয়টী যথাসম্ভব প্রদর্শিত হইবে।

যদি বলা হয় ভ্রমের জন্য যখন অধিষ্ঠান যেমন আত্মা এবং আরোপ, যেমন জীব জগদ্ভাব প্রয়োজন অর্থাৎ যেমন রজ্জু ও সর্প প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ সাংখ্য মতে অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুইটী বস্তু প্রয়োজন হয়, আর বেদান্ত মতে আত্মা ও অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান অর্থাৎ সংস্কার সমষ্টি রূপ দুইটী বস্তুর প্রয়োজন হয়। সুতরাং সাংখ্যের দ্বৈত মতই বেদান্তে স্বীকার করা হইল? সাংখ্যর ভ্রান্ত মত হইবে কেন? অভাব, উপলক্ষণ হইলেও তাহাও একটা কিছু বটে?

ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যের আত্মা বহু হইলেও আত্মরূপে একটী বস্তু বলা হইয়া থাকে এবং প্রকৃতি নিত্য পরিণামী হইলেও তাহা নিত্য ও সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে। অনাদি অবিবেক এই দুইটাকে অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক রূপে চলিয়া থাকে। এইরূপে প্রকৃতিপুরুষ ভিন্ন অবিবেক স্বীকার করায় সাংখ্য মতে কল্পনা গৌরব প্রভৃতি হয়। অলৌকিক বস্তুতে কল্পনা গৌরবটী দোষ। লৌকিক স্থলে সব এক দোষ না হইলেও অলৌকিক বিষয়ে ইহা দোষ: অবিবেক সম্বন্ধে অন্য কথা পরে আলোচ্য।

বেদান্ত মতে এই দোষ নাই। কারণ, তন্মধ্যে প্রকৃতিই উক্ত অজ্ঞান অর্থাৎ অবিদ্যা বা সংস্কার সমষ্টি সুতরাং অবিবেক রূপ। এজন্য ইহাতে দুইটী মাত্র বস্তু স্বীকৃত হইলেও, সেই অজ্ঞান বা অবিবেকের সত্তা নাই। উহা সৎ অসৎ এবং সদসৎ ভিন্ন বস্তু। উহা মিথ্যা, নিত্য বা সত্য নহে। এজন্য ভাব ও অভাব স্থলে যেমন ভাব বস্তুতে দ্বৈতাপত্তি হয় না, তদ্রূপ আত্মবস্তুতেও দ্বৈতাপত্তি হয় না। মিথ্যার দ্বারা সত্য বস্তু দুইটী হয় না। সাংখ্য মতে প্রকৃতি সত্য বলিয়া তত্ত্ব বস্তুতে দ্বৈতাপত্তি অনিবার্য্য, এজন্য সাংখ্যের কল্পনা গৌরব দোষ অনিবার্য্য হয়। এতদ্ব্যতীত স্বপক্ষ হানি প্রভৃতিও হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রাচীন সাংখ্য মতে প্রকৃতির পুরুষে লয়ের কথা স্বীকার করা হয়, এজন্য প্রাচীন সাংখ্য মতের সহিত বেদান্তের কোনও ভেদ নাই। নবীন সাংখ্যেই এই বিরোধ। নবীন সাংখ্যই ব্রহ্মসূত্রে মহর্ষি ব্যাসদেব খণ্ডন করিয়াছেন। আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাতে দুই মতের সমাবেশ আছে, ইচ্ছা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা কারিকার সকল শ্লোকেই ইহা প্রদর্শন করিব।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

দিনটা নানা কথায় কেটে গেল। ডাক্তার মাণিককে বললেন, কালই নিজের নিজের কাজ সারতে বেরিয়ে পড়তে হবে, এখানে মিছে বিলম্ব করে ফল নেই।

মাণিক। দেখছি একবার যেতেই হবে, সেই কথাই ভাবছি।

বিনোদ। কেনো? অমন ভাবে বললে যে? বাড়ী যাবার একটা আনন্দও তো থাকে!

মাণিক। ঠিক কথা Sir—আনন্দই তো বাড়ী যাবার সঙ্গী হো'ত—এবার চিন্তা নিয়েই চলছি। আপনি সব জেনে শুনে ওকথা তুলছেন কেনো?

ডাক্তার। তুমিও তো সব শুনেছ—

মাণিক। তারপর সে গ্রামে থাকা আর কি সম্ভব?

ডাক্তার। কে বলছে? কিন্তু আশার নজর ছোট করতে নেই, তার বাড় বড়র দিকে। ও চিন্তা এখন ছেড়ে

দাও, অবস্থাটা কেবল দেখে এসো। কেউ না কেউ প্রাপ্ত লোক আছেনই—কিছু শুনতেও পারো।

মাণিক। আমি সেই আশাতেই যাচ্ছি, নিবারণ রায় আছেন, তাঁকে গ্রামের মাতব্বরেরা—নিবে পাগলা, নিবে পাগলা বলেন। তিনি কারো মুখ চেয়ে কথা কন না, যা সত্য বলে' জানেন—তাই বলেন, মতলবের মধ্যে থাকেন না। তিনি আমায় ভাইয়ের মতই ভালবাসেন, যদি শোনবার কিছু থাকে, তাঁর কাছেই পাবো।

ডাক্তার। তুমি আমাকে যে ভয় দেখালে হে। একটা কথা আমার সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে, ভুলতে পারি না। নিবারণ নামের আমি কয়েকটি পাগল দেখেছি। বললে না—এঁকেও লোকে পাগলা 'নিবে' বলে। শুনে আমি হতাশ হচ্ছি যে। ঠিক্ চেনো তো? নইলে ঘাঁটিও না।

মাণিক হেসে বললে—"ইনি তা নন হুজুর, বড় ভাল লোক, সত্যটা স্পষ্ট বলেন বলে, 'মতলবি'রা পছন্দ করেন না—'পাগল' বলেন। সাহস করে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না, তামাক সাজতেই বলেন। জিজ্ঞাসা না করলে তিনিও কারো কথায় থাকেন না।

ডাক্তার। বুঝেছি, কিন্তু সাবধান হয়ে কথা কোয়ো। স্পষ্ট কথা বা সত্য কথা কম দোষের নাকি? তাকেই তো লোকে নির্ব্বোধ বলে। পাগল আর সুবোধ কবে? সত্য কথার চেয়ে ভয়ঙ্কর কথা নেই, বুদ্ধিমানে কবে আবার সত্য কথা কয়? তাদের নাম-ডাক খাতির প্রতিপত্তি যে তাতেই! ওটাও বড় আর্ট জেনো, কিন্তু শিখে কাজ নেই। তোমার নিবারণকে তুমিই জানো। যা ভাল হয় কোর'। সর্ব্বাগ্রে পন্থার বক্তব্যটা শুনো। এ যাত্রায় সকলের সঙ্গে প্রীতি সদ্ভাবের মাত্রা ঠিক রেখে ফিরো, পরে যা হবার হবে। এখন দোলায় উঠে দোল খাও গে, কাল মাছের ঝোল খেয়ে দুর্গা বলে যাত্রা। মিছে দুর্ভাবনা রেখো না।

মাণিক। আপনার কথা ভুলবো না হুজুর। কিন্তু ও কয়দিন যে কি করে কাটবে জানি না।

ডাক্তার। কেনো, খুড়ো আছেন, খুব কাটবে। তাঁর সব কথায় 'যে আজ্ঞে' বললেই হবে। ওর চেয়ে সহজ কিছু নেই। আমার অবস্থা তোমার চেয়ে যে সঙ্গীন হে! আমি যে কি করতে কাশী যাচ্ছি ভেবে পাই না; না ধর্ম্ম করতে, না অধর্ম্ম ঢাকতে। এই দুই কারণেই তো লোক কাশী যায়। ডিটেলে কাজ নেই। ভাল লোককেও হতাশ হতে দেখেছি। ওখানে চট্ পট্ মরতে পারলেই জিত, অন্ততঃ সুনাম।

এ আমার পিসীমার দৌলতে যাওয়া। যাঁদের আন্তরিক কিছু থাকে, তাঁদের সুবিধে হয়ে যায়। ভদ্রেশ্বরের রামদত্ত রামপ্রসাদের প্রসাদ পেয়েছিলেন, গাইয়ে বাজিয়ে লোক ছিলেন। সুরসংযোগে মগ্ন মনে মায়ের নাম করতেন। কাশী এলেন আর গেলেন, অষ্টাহেই শেষ, ফিরলেন না।

মাণিক। থাক মশাই, এইখানেই ছুটী কাটানো যাক্।

ডাক্তার। (সহাস্যে) ভয় পেও না—সে ভাগ্যও নেই—ভয়ও নেই। অ-সুরদের সে সুর নেই।

মাণিক। সুর বাইরের জিনিস, সকলের থাকে না। অন্তরটাই তো সব। পিসিমাকে আমি নিরস্ত করতে পারবো—কাজ নেই মশাই—

ডাক্তার। একছড়া হারের কাছেই হার মেনেছি

মাণিক। যাক্ ও কথা। এখন যা বলি তা শোনো। আমার মন বলছে—সাহেব সত্বরই ফিরবেন। আমাদের দুজনের যাত্রারম্ভটা একদিনে হলেও, ফেরবার দিনের ঠিকানা নেই। আগে ফিরলে আমাকে উপোসের মুখ চেয়েই ফিরতে হবে। মুড়ি চিঁড়েনোই ভরসা—

মাণিক। কেনো—"কামিজ-কিশোরী" রয়েছেন তো।

ডাক্তার। এই দেখো, আমি ভেবেই মরছিলুম। তুমি না থাকলে আমি অচল।

মাণিক। ভাববেন না, আমি আগেই আসবো।

ডাক্তার। আচ্ছা, এখন ঝুলে পড়ো—দোল খাও গে। দোল খেতেই জন্ম, ওটা রপ্ত রাখা চাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পর্ব্বের মধ্যে ওইটাই পছন্দ করেন। বিনা মতলবে অনর্থক কিছু করেন না, ভয়ঙ্কর চতুর ছেলে। যাও, ঝোলায় যাও।

মাণিক ভাবতে ভাবতে তার যথাস্থানে গেল।

(১৯)

সকালে—ঝোল ভাত খেয়ে উভয়ে ষ্টেশনে হাজির। কারো মুখে কথাবার্ত্তা বড় নেই, চোখো-চোখিও কম্। মাণিক টিকিট কিনতে গেল। কোথা থেকে সেই ফাঁকে যুধিষ্ঠির—একটা ছোট থলি তার হাতে দিয়ে বললে—"টাকা দশেকের খুচরো রেজকী আছে, পথে বড় দরকার। ওঁর অসুবিধে হতে পারে।" বলেই সরে গেল।

টিকিট কেটে এসে—মাণিক টিকিট আর থলিটি ডাক্তারবাবুকে দিলে। "টাকা দশেকের change আছে, পথে বড় দরকার।"

"তাইতো, ও কথাটা মনেই ছিল না—বেশ করেছ।"

মাণিক আমতা আমতা করে বল্লে—আজ্ঞে আমি নয়, সে দাঁড়ালো না……

মাণিককে না দুঃখ দেওয়া হয়, মনোভাবটা চেপে ডাক্তার বললেন—"তাতে আর কি হয়েছে—এখন দরকারও তো রয়েছে, বেশ করেছ। সেই মহাভারতের সত্যবাক্ "হীরে" বুঝি? লোকটা সত্যই বুদ্ধিমান—যদি না মদের টান থাকে। যাক্ ও থেকে তুমিও কিছু সঙ্গে রেখো। হ্যাঁ, আজ বেস্পতিবার না? দেখচো, তাতে আমাদের ভুল হয় না! ভেব না—লক্ষ্মী আমাদের প্রতি বিষম সদয় হে," বলে' হাসলেন।

গাড়ী দাঁড়িয়েই ছিল, শেষ ঘণ্টা দিলে। দুজনেই উঠে বসলেন। মাণিকের মুখ থেকে স্বতই বেরুলো—"জয় বাবা বিশ্বনাথ।" নিজের কথা তার এল না, ডাক্তারের জন্তই তার চিন্তা।

আবার চুপচাপ্। মাণিক আর থাকতে পারলে না, মাথা চুলকে বললে, "একটা কথা বলতে সাহস হচ্ছে না, কিন্তু আপনাকে না বলে কোন কাজ করতেও চাই না।"

ডাক্তার। এমন কি কথা মাণিক? অনায়াসে বলতে পার।

মাণিক। আমরা হিঁদুর ছেলে, অনেক কুসংস্কারও থাকে। তারির একটা। অনেক গোলমালের মধ্যে রয়েছি কি না। জ্যোতিষ শাস্ত্রটায় বিশ্বাস রাখি, তাতে ফিরতে একটু বিলম্ব হতে পারে। নচেৎ বিলম্বের আমার অন্ত কোনো কারণ নেই।—আমার এক মহাজ্যোতিষীর সঙ্গে জানাশোনাও আছে। তিনি যাই যাই করে বেঁচেও আছেন। আর বোধ হয় থাকেন না, মকরধ্বজ ও মিলছে না। শীঘ্রই এ জীর্ণবাস বদলাবেন। যদি থাকেন তাঁকে একবার Consult করতে ইচ্ছা হয় হুজুর। শ্রীযুক্ত খুড়োমশাই, গ্রহের মত পশ্চাতে ফিরচেন কিনা, কিছুতেই সুখ নেই—তাই…

ডাক্তার কষ্টে হাসি চেপে বললেন—"বেশ তো—যাবে, এ আর বড় কথা কি'—একমাস সময় রয়েছে। আমার কোন আপত্তি নেই; আমিও তো হিঁদুর ছেলে হে—জ্যোতিষী তো একজনই আছেন—যাঁকে অদ্বিতীয় বলে জানি। সেই বাঁড়ুয্যেমশাই নন তো?"

মাণিক অবাক হয়ে ডাক্তারের পায়ের ধুলো নিলে। "আপনার দেখছি কিছুই অজানা নেই Sir—"

ডাক্তার। দুর্ভাগাদেরও সান্ত্বনার স্থানটী না থাকলে যে চলে না! আর জ্যোতিষীদেরই বা চলবে কিসে, তা হলে যে শাস্ত্রলোপ পায়। তারাই তো তাঁদের মক্কেল বা ভরসা। খুব যাবে, যেও। পরে আমি চেষ্টা পাবো।

মাণিক খুব খুশী হল। তার বিমর্ষ ভাবটা অনেকখানি কেটে গেল।—"এইবার আমার নাববার ষ্টেশন মাণিক। কোন চিন্তা রেখ না, মা সব ভালই করে দেবেন। আমি এসে সব শুনবো।"

মাণিকের মুখ আবার শুকিয়ে গেল।—"কাশীতে আপনি কিন্তু খুব সাবধানে থাকবেন। বেশী বেরুবেন না, থলি সঙ্গে রাখবেন না। আনা আষ্টেকের বেশী সঙ্গে নেবেন না। একদিনেই অতিষ্ঠ করে দেবে। যাদের দেখবেন বেশ নধর চেহারা, প্রাতঃস্নান করে decent ফোঁটা কেটে চুল ফিরিয়ে বেড়াচ্ছে, পানের দোকান পেলেই দুটো তুলে মুখে দিচ্ছে, দোকানী জরদা এগিয়ে ধরছে, তারা বিশ্বনাথের দাওয়ান, কাশী তাদের জমিদারী। কারো দরকার হলে, মানুষ বুঝে পাঁচশো টাকাও বার করে দেয়—'বলে এসব তো আপনাদেরি জন্তে, যখন সুবিধা হবে' ইত্যাদি। টাকাকড়ি চায় না। কেবল খাতাটায় লিখে দিতে হয়। সে লেখার সোধও নেই সুদও নেই, পুরুষানুক্রমে চলে। অমন সুবিধের বিপদও আর নেই, গরীবের কথাটা মনে রাখবেন—ও কাজটী করবেন না—যতই অভাব হোক। তাদের মন্দ বলছি না—বিপদে অমন সাহায্য কে করে বলুন। তবে সেটা চিরস্থায়ী হয়ে থেকে যায়। সে সাহায্য নেবেন না। আর দিনে একবারও অধমের…আমার আর কেউ নেই, "বলে কেঁদে ফেললে।

"ওকি! তোমার প্রত্যেক কথা আমার মনে থাকবে, ভেব না। কটা দিন বইতো নয়।—আচ্ছা," নেবে পড়ি। ভয় কি, মা আছেন হে।"

"আমার মাকে, আর লেডি ডাক্তারকে আমার প্রণাম

জানাবেন। মার সঙ্গে চাকরটিকে দেবেন।" পায়ে মাথা ঠেকালে। "ওঠো ওঠো, গাড়ী ছাড়ছে।"

এক চোখ জল নিয়ে মাণিক উঠলো—"জয় বিশ্বনাথ, তুমি রইলে।" গাড়ি ছেড়ে দিলে।

বিনোদ ডাক্তার চোরের মত নিজের কোয়ার্টারে গিয়ে ঢুকলেন। রাণীকে ও পিসিমাকে প্রস্তুত হতে বললেন। Lady Doctor তখন তাঁর dutyতে কাজে ছিলেন। অন্য কারো সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা ডাক্তারের ছিল না। বাসাতেও দু'চার কথার বেশী কথা নয়।—কেউ কোনো প্রশ্ন করতেও সাহস পেলেন না।

রাণী কেবল বললেন—কাপড় ছেড়ে মুখহাত ধুয়ে চা খাও।

বিনোদ। এ বেলা আর কিছু করতে হবে না, আমি খেয়ে বেরিয়েছি, কেবল চা-টা খাবো।

Boy চা আর পাপরভাজা তাঁর সামনে রাখলে। রাণী বললেন, "ও বড় বিমর্ষ হয়ে পড়েছে, কেবল কেঁদে কেঁদে মরছে—"

"কেন রে, তুই তোর মার সঙ্গে যেতে চাস?" সে সবেগে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

"তবে তোর মার কাছে তিনটাকা নিয়ে জামা, গেঞ্জী যা দরকার, পছন্দ মত কিনে নে।" সে তার মার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

রাণী বললেন—"ও সত্যি যাবে নাকি?"

"যাবে না, ছেলে নেবে কে—বাহন চাই তো?"

"আঃ পিসিমা শুনতে পাবেন!"

"দুদিন পরে দেখতেও তো পাবেন" বলে ডাক্তার এই প্রথম হাসলেন। মেয়েদের অলক্ষ্যে শোনা আর না-চেয়ে দেখার শক্তি অদ্ভুত।

তিনি যেন কাজে যাচ্ছিলেন, বললেন—"কিছু খাবে না বাবা, এখনি হয়ে যাবে।"

বিনোদ। না পিসীমা—এ বেলা আর নয়, মাণিক বড় খাইয়েছে।

পিসিমা। বড় ভালো ছেলে, যেন এই বাড়ীরই কেউ। তাকে দেখতে পাচ্ছি না যে···

"সেও তার বাড়ীর বন্দোবস্ত করতে গেল।"

(হাসতে হাসতে লেডী ডাক্তারের প্রবেশ)

"তারও বন্দোবস্তর পালা পড়লো নাকি? ভালই হয়েছে।"

বিনোদ চোখ টিপে চুপ করতে বললেন।

"ভয় নেই, রাণী সব শুনেছে।" (অর্থাৎ মামলা ও জেলের কথা।)

"তবে, ডাইভোর্সের পালাও আছে?" বলে বিনোদ হাসলেন।

রাণী সরে গেলেন। লেডী ডাক্তারের সঙ্গে ৫।৭ মিনিট কথা চললো। হাসি তামাসাও বাদ গেল না।—"আচ্ছা, এইবার সিভিলসার্জ্জেনের সঙ্গে দেখাটা করে আসুন। কালই যাওয়া স্থির?"

"হ্যাঁ, কিন্তু দেখা আর কারো সঙ্গে নয়, কেনই বা?"

"না, না, এমন ভুল করতে আছে কি? এক কম্পাউণ্ডে বাস। তাছাড়া আমি জানি, তিনি আপনার জন্য কিরূপ ভাবছেন। কালও বলেছেন—'এলে যেন খবরটা পান।' আপনি নিশ্চয়ই দেখা করবেন। তিনি পদে ও বয়সে আপনার বড়। আমি বেশ জানি, তিনি আপনাকে কি ভাবে দেখেন।" ইত্যাদি—

একটু নীরব থেকে বিনোদ শেষ হেসে বললেন—"আমি লেডিদের কথায় বিশেষ শ্রদ্ধা রাখি, আপনার কথা নিশ্চয়ই শুনবো।"

"সুমতি হোক্, শুনবেন বইকি। বাড়ীতে যে লেডিশিপ স্বয়ং রয়েছেন।" বলে' হাসলেন।

"নাগো—সত্য কথাই বলছি। আচ্ছা যাচ্ছি, যাচ্ছিই বা কেনো—এখুনিই যাই" বলে উঠলেন।

"সেই ভালো" বলে লেডী ডাক্তার রাণী মন্দিরে ঢুকলেন।

"লেটা মেটানই ভালো।" বলে', ডাক্তার কর্ত্তার সিটিংরুমে গিয়ে দেখা দিলেন।

"এই যে বিনোদ—এসো এসো। তুমি এসেছ সে খবর পেয়েছি, তাই অপেক্ষা করছিলুম—বোস।"

বিনোদ নমস্কার করে বসলেন।

"দেখলে তো, যা তখন সন্দেহ করে বলেছিলুম, শেষ তাই ঘটলো। অবস্থার অতিরিক্ত হলেই দোষের হয়।—চাকরী-স্থল কিনা।"

"স্বীকার করি, কিন্তু ক্ষমা করবেন, আমিও তো বলেছিলুম, আমি ও-সবের কিছুই জানতাম না, এখনও ভাল জানি না Sir—বিশ্বাস করেছিলেন কিনা—জানি না।"

"ওর মধ্যে আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের মূল্য নেই। তবে, তোমার না জানাটাও যে দোষের হয়েছে—"

"তা'হলে আমার বলবার আর কিছু নেই—Sir—সাজা সইতেই হবে"—

"সেটা যে কেবল চাকরির ওপরদে না যেতেও পারে।"

"উপায় কি মশাই। মন্দ সময় যদি এসে থাকে, তাকে রুখবে কে?"

"কেনো, ভগবান তো মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছেন। একবার মাপ চাইলে যদি মিটে যায়, ক্ষতি কি? জেলসি বই তো নয়, তোমাকে সকলেই চেনেন—তাতে তুমি ছোট হয়ে যাবে না। বড়কে সম্মান দিতে শাস্ত্রও বলেছেন।"

"কথা কয়ে আপনার মত আমার শুভকামীর নিকট ধৃষ্টতা বাড়াতে চাই না, ক্ষমা করবেন। ভেবে পরে বলবো, "বড়" কথাটার অর্থ এখনো ঠিক বুঝতে পারিনি Sir"—

আপিসের বড় হে। যাক্, আমি খুশী হয়েছি—তুমি ভেবেই বোল'। ভাবলেই বুঝবে—

বড় মানে বড়—যে বিপদে ফেলতে পারে—ফেলেও থাকে। বলে হাসলেন। "যাও—আমি খেতে চললুম।"

বিনোদ নমস্কার করে বাঁচলেন।

বাসায় ফিরে হাসি শুনতে পেলেন। ভালই হয়েছে—লেডি ডাক্তার এখনো আছেন। "কি গো আসতে পারি কি?"

"আসবেন বই কি, আপনার জন্যেই বসে আছি। এত সত্বর রেহাই পেলেন কি করে?"

"ভগবানের দয়া, সার্জেন খেতে উঠলেন। তবে—সংক্ষেপে কাজের কথা একপ্রকার সেরেই উঠেছেন। বাকি যা আছে, আপনি বললেই হবে।"

"সে আবার কি? ওসব কথা দুবার হয় না, দুবার—হলেই কলহের সূচনা হয় যে!"

"এমন সুন্দর অর্থপূর্ণ কথাটি মেয়েদের কাছে এই শুনলুম। সাধে কি বলি—এখন মেয়েদের যুগ এসেছে মাণিক। আমার আশা ভরসা এখন ওঁরাই। পুরুষেরা defeated, দেশ যে কি জিনিস তা কোনোদিন তাঁরা ভাবেননি, এখনো ভাবেন না। যা দেখান্ সেটা অনেকটা অভিনয়। নিজেদের টাকাটা নিজেরা হাতাতে পারলেই পরম লাভ ভাবেন! করছেনও তাই।"

"ও সব কি বলছেন? খবরটা বলুন—সব ভালো তো?"

বিনোদ (লজ্জিতভাবে)—মাপ করুন, ছি ছি! কয়মাস মাণিকের সঙ্গে ছিলুম। আমি যেন তার সঙ্গে কথা কইছিলুম। মনটাও বিক্ষিপ্ত ছিল, হুঁশ ছিল না। ছি ছি, মাপ করবেন।

"কোন মন্দ কথা তো হয়নি—মাপ আবার কিসের। সেখানে মাণিক ছিলেন, এখানে আসল মুক্ত। যত ইচ্ছা কইবেন্।—এখন আমার প্রশ্নটার"

"হাঁ, এই যে—তিনি সম্মানী লোক, আমার ভালই চান—অর্থাৎ চাকরী ও বিপদ দুই যাতে বাঁচে। সেকালের ভাল লোক। চাকরা থাকলেই সব রইল। সেকরাদের ফুঁ বজায় থাকলেই—গড়ন হয়। অগ্নিদেবতা, তিনি না নিবলেই হ'ল।"

"অর্থাৎ চাকরীই প্রধান—তা বুঝেছি। তারপর?"

"দয়া করে আমাকে একটু ভাবতে দিন—বলেছি। তিনি খুশী হয়ে খেতে গেলেন।" বলে বিনোদ হাসলেন।

"তবে তো সবই বলে' এসেছেন, আবার আমাকে কেনো?" তিনি সবই বুঝেছেন, না হলে খেতে উঠতেন না। ডাক্তারদের খাবার সময় অসময় আছে নাকি। আমার বলবার অপেক্ষা আর নেই। তবে—অখুশী হয়ে ওঠেন নি—এ আমি বলতে পারি।

ডাক্তার—"তা হলেই আমি শান্তি পাই। তবে একটা কথা তাঁর জানা বড় দরকার। সেইটুকু কেবল জানিয়ে দেওয়া; এক জায়গায় সত্যটা একবার বলেছি, তারপর এ অসত্য চলে না। দু'জায়গায় দু'রকম কথা কওয়া হবে। সে অশান্তি চাকরী না থাকলেও আমার থাকবে। তাঁকে আপনি কেবল আমাকে সত্যিকার ক্ষমা করতে বলবেন।"

"বেশ তাই হবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ভাববেন না। একটা গোপন কথা বলি, মেয়েদের পেটে কথা থাকে না—জানেন তো?"

"আগে তা ভাবতুম বটে—মাপ করবেন" বলে' বিনোদ হাসলেন।

রাণু সেটা আমার কাছে রেখে দিয়েছে—অবশ্য খুব গোপনে। এইবার সেটি আপনি—

"না দেবী, সেটি হবে না, সে ওই সোনার সিন্দুকেই থাকবে। আমি বড় খুশী হলুম—রাণী ভুল করেন নি। যাক্—ও কথা আর নয়। থাকতেও আজ পাড়াগাঁয়ে। হবে ও যেমন আছে, তেমনি গোপনেই থাক্।"

"তাই তো—কবে আবার—"

"খুব সত্বরই।—আমাদের ছেলে দেখবেন না?"

"ওঃ তবে আর কি! সকালেই আমার ডিউটী, প্রণামটা করে' যাই—কি জানি যদি—"

ওর জন্যে আর ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

তিনি রাণীর সঙ্গে দেখা করেই আর দাঁড়ালেন না। চোখ মুছতে মুছতে চলে গেলেন।

"কি মিষ্টি এই জাতটি, ওঁরা না থাকলে জগত একটা নীরস জনতা হয়েই থাকতো!"

বিনোদ রাণীর বিছানায় গিয়ে বসলেন। স্বামী-স্ত্রীর কথায় আমাদের অধিকার নেই; শুনেও কাজ নেই।

আগষ্ট সংগ্রামের সেনানী

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪২ সাল ভারতের জাতীয় জীবনে মহাস্মরণীয় বৎসর। দ্বিতীয় মহাসমরের প্রচণ্ড আঘাতে বৃটীশ শক্তির বনিয়াদ তখন টলে উঠেছে। ইউরোপের রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণীর সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্যে জাপানের বিজয় অভিযান চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। প্রশান্ত মহাসাগরের ঘাঁটিগুলি জাপানের করতলগত। ব্রহ্মদেশ জয় করে তারা ভারত সীমান্তে এসে পৌঁচেছে। ইংরাজরাজ প্রমাদ গণলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে ভারতই মিত্রশক্তির প্রধান ঘাঁটি। ভারতকে তাই হাতে রাখা প্রয়োজন। এদিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতারা বাক্সর্ব্বস্ব বৃটীশের 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার' যুদ্ধকে ভারতের জনযুদ্ধ বলে মানতে চাইলেন না। তাঁরা মিত্রপক্ষের লম্বা-চওড়া বুলিকে যাচাই করতে চাইলেন। ধূর্ত্ত বিদেশী শাসক পাঠালেন স্তর ষ্টাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতের নেতাদের ঠকিয়ে কাজ আদায় করবার জন্য। ক্রিপ্‌স সাহেব যে প্রস্তাব নিয়ে এলেন জাতীয় নেতৃবৃন্দ তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁরা বৃটীশের ফাঁদে পা দিলেন না। ইংরাজ মনে মনে চটে রইল।

মিত্রশক্তির সাম্য মৈত্রী বুলির প্রকৃত অর্থ বুঝতে আর বাকী রইল না। বিখ্যাত অতলান্তিক সনদে ভারতবর্ষের কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত করা হল না। কর্ত্তারা বললেন, ওটা নাকি ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। পরে আবার বলা হয় যে এই ধরণের সনদের কোন অস্তিত্বই নেই। সাম্যের বাণীই বটে!

মিত্রশক্তিবর্গের এইরূপ বিরূপ মনোভাবের ফলে সমগ্র ভারতে নৈরাশ্য ও বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠে জাতির মর্ম্মবাণী ঘোষিত হয়। 'হরিজন পত্রিকায়' তিনি বৃটীশ কর্ত্তৃপক্ষকে ভারত ছেড়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। সমগ্র ভারতে এই বাণী প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। জাতির এই মর্ম্মবেদনার ফলে আসে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক আগষ্ট প্রস্তাব "ভারত ত্যাগ কর।" ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাইতে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে ক্রুদ্ধ শাসকশক্তি কংগ্রেসের এই দাবীকে সহ্য করতে পারলেন না। ৯ই আগষ্টের অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হল। বিক্ষুব্ধ জনগণ তখন আরম্ভ করলে তাদের মুক্তি-সংগ্রাম। এই আন্দোলন পরাধীন জাতির স্বাধীনতার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলন। দেশের স্বাধীনতাকামী কোন নর-নারীই এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকতে পারলে না। দুরন্ত সাহস ও দুর্জ্জয় সঙ্কল্প নিয়ে সকলেই এগিয়ে এল। উত্তরে হিমাচল থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা এবং পশ্চিমে আরব সাগরের তীর থেকে পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল এই আন্দোলন। অপ্রত্যাশিত এই গণ-অভ্যুত্থানে হতচকিত বৃটীশশক্তি বর্ব্বর দমননীতির আশ্রয় নিয়ে রোধ করতে চাইলে জাতির এই প্রাণ-তরঙ্গকে। কিন্তু মুক্তিপিপাসু গণ-শক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন কোন অস্ত্র আজও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বে-পরোয়া নিপীড়ন ও নির্য্যাতন চালিয়েও বৃটীশশক্তিকে ভারতের এই মহাবিপ্লবের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

অতর্কিতে নেতৃবৃন্দকে বন্দী করে কর্ত্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন যে তাঁরা আন্দোলনের পথ মেরে দিলেন। কিন্তু তাঁদের এই দুরাশাকে চূর্ণ করে জোয়ারের বেগে প্রবাহিত হল জাতির অভিযান। এমনই দুর্দ্দিনে, জাতির জীবনের এইরূপ বিরাট পরীক্ষার সময় বিভ্রান্ত জনগণকে পরিচালিত করবার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নিলেন ভারতের কয়েকটি বীরসন্তান। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের শ্রীমতী অরুণা আসফআলি, শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া ও শ্রীঅচ্যুত পটবর্দ্ধন

সরকারের সন্ধানী দৃষ্টির অন্তরালে আত্মগোপন করে থেকে ভারতের এই অভূতপূর্ব আন্দোলনকে ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবে পরিণত করবার জন্ম এগিয়ে এলেন তাঁদের বিরাট মনস্বিতা ও বিপুল সংগঠন শক্তি নিয়ে। সুবিশাল ভারতের ৪০ কোটি নর-নারীর কল্যাণে তাঁরা নিজেদের যথা-সর্বস্ব ত্যাগ করে, অনন্ত বিপদের সম্ভাবনাকে বরণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এই মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্ম তাঁদের দীর্ঘকাল পুলিসের চক্ষে ধূলি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হয়েছে। শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দারা তাঁদের সন্ধানে ফেরে, সরকার তাদের ধরবার জন্ম মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন, আর চাতুর্য্য সহকারে তাঁরা সরকারের সমস্ত আয়োজনকে ব্যর্থ করে জনগণকে পরিচালিত করতে থাকেন।

পরাধীন জাতির দুর্ভাগ্য এই যে, দেশকে ভালবাসলে দণ্ড পেতে হয়। তবে বিদেশী শাসকের দণ্ড দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এনে দেয়। শাসকের চক্ষে বিপজ্জনক বলে' প্রতিভাত হলেও অরুণা, জয়প্রকাশ, অচ্যুত ও রামমনোহর তাই আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। দেশপ্রেমের অগ্নিশিখায় এদের অন্তরলোক সর্ব্বদা উদ্ভাসিত। নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও তাই এরা পথ করে নিতে পারেন। পরাজয়ের মনোভাব এদের কাছে পরাজিত। অদম্য উৎসাহ ও অমিততেজ নিয়ে এরা চলেন জয়যাত্রার পথে। নির্য্যাতন ও নিপীড়নের কাঁটা পায়ে ফুটলেও মুখে এদের অম্লান হাসি। সাধারণ জীবনে সরল, সহজ ও অমায়িক এই লোকগুলির রাজনৈতিক জীবনের কাহিনী রোমাঞ্চকর উপন্যাসের মতই। ভারতের স্বাধীনতা-ইতিহাসে আগষ্ট বিপ্লবের সাথে বিপ্লবের এই নায়ক-নায়িকাদের কাহিনীও স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

অরুণা আসফ আলি

অরুণা—দেশপ্রেমের নবারুণরাগ রঞ্জিতহৃদয় অরুণা বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ভারতের এই তরুণী বিদ্রোহিনীটি কোন ধাতুর মেয়ে ভাবতেও বিস্ময় লাগে। মুখে কঠোরতার এতটুকু ছাপ নেই, সহজ স্বচ্ছন্দভাব। যৌবনশ্রীমণ্ডিত মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। ওষ্ঠে আপ্যায়নের স্মিত হাস্য। বাঙালী মেয়ের কোমল কমনীয়তার কোথাও ব্যতিক্রম নেই। আভিজাত্যের মাধুর্য্যটিও সুপরিস্ফুট। অথচ অন্তরে তার আগ্নেয়গিরির তাপ। দুইটি বিপরীত ধারার অদ্ভুত সমন্বয়।

কিন্তু আশ্চর্য্য লাগলেও অরুণা একাধারে অভিজাত ঘরের সুবেশ, সুরুচি ও কমনীয়তার সঙ্গে প্রকৃত বিপ্লবীর দুর্জ্জয় আগ্রহ ও সাহসের অধিকারিণী। আন্তরিকতা অরুণার চরিত্রের প্রধান গুণ। এই একটি কথাতেই অরুণার স্বরূপ প্রকাশ করা যায়। জীবনের প্রতিটি কার্য্যে তার এই আন্তরিকতার পরশ লাগে। যেটা তার কাছে ভাল মনে হবে, তার থেকে কেউ তাকে টলাতে পারবে না। আগষ্ট বিপ্লবের পর তাঁর খ্যাতি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেলেও অরুণা রাতারাতি বিপ্লবী হন নি। বাল্যকাল থেকেই এক বিদ্রোহিনী নারীর আত্মা তাঁর অন্তরে বাসা বেঁধে আছে। সুযোগ পেলেই সে আত্মপ্রকাশ করে।

মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সের সময়ই অরুণাকে আমরা এই বিদ্রোহিনীর রূপে দেখতে পাই। অরুণার পিতা উপেন গাঙ্গুলী মেয়েদের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। অরুণাকে তিনি লাহোরের এক কনভেন্টে ভর্ত্তি করে দেন। তিনি নিজে সপরিবারে কানপুরে থেকে ডাক্তারি করতেন এবং সুচিকিৎসক হিসাবে প্রবাসী বাঙালী মহলে সুপরিচিত ছিলেন। কিছুদিন লাহোরে পড়বার পর অরুণা পিতাকে জানালেন যে সে খৃষ্টীয় যাজক বৃত্তি নেবে। পিতা অনেক করে বুঝিয়েও কন্যার মত পরিবর্ত্তন করতে না পেরে লাহোরের স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন। বিদ্রোহিনীর সেদিনকার তর্কযুদ্ধ দেখে পিতা মুগ্ধ হয়েছিলেন। এর পর তিনি দুই কন্যাকেই—অরুণা ও পূর্ণিমা—নৈনীতালের কনভেন্টে ভর্ত্তি করে দিলেন এবং নিজের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় কানপুরের বসবাস তুলে নৈনীতালেই বাস করতে লাগলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

অরুণার মাতা দুই কন্যাকে নিয়ে প্রমাদ গণলেন। এই সময় একটি সুপাত্র পেয়ে তিনি অরুণার বিয়ে দেবার উদ্যোগ করলেন। অরুণা আবার বিদ্রোহ করল। মাকে সে জানিয়ে দিলে যে চিরকুমারী থাকাই তার অভিপ্রায় এবং কারুকে কিছু না বলে একেবারে কলকাতায় উপস্থিত। কলকাতার গোখেল মেমোরিয়াল বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা নিয়ে সে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করতে থাকে।

ওদিকে পূর্ণিমা এলাহাবাদের বিখ্যাত আইনজীবী প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ হয়ে এলাহাবাদে মাকে নিয়ে যায়। অরুণা এক ছুটীতে আসে পূর্ণিমার কাছে। সেইখানেই তার পরিচয় হয় মিঃ আসফআলির সঙ্গে। এই পরিচয় ক্রমে প্রেমে পরিণত হয় এবং মা, ও বোনকে তার মনের কথা জানায়। বাড়ীতে প্রবল আপত্তি উঠে। বামুনের মেয়ে হয়ে মুসলমানকে বিয়ে এবং তাও আবার মিঃ আসফআলির মত চল্লিশ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ়কে! কিন্তু অরুণার যা কথা তাই কাজ। আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের প্রবল আপত্তি সত্বেও এই বিদ্রোহিনী মিঃ আসফ আলিকেই স্বামীত্বে বরণ করে।

দিল্লীতে স্বামীগৃহে এসে স্বামীর সঙ্গে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করে সে। ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালের আন্দোলনে অরুণা কারাবরণ করে। তারপর ১৯৪২ পর্য্যন্ত রাজনীতিক্ষেত্রে অরুণার বিশেষ কোন কার্য্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় না। এই সময় অরুণা গভীর অধ্যয়ন ও কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির বিশ্লেষণে নিমগ্ন থাকে। এর ফলে অরুণাকে আমরা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী রূপে দেখতে পাই।

তারপর আসে ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস। অরুণা চলে স্বামীর সঙ্গে কংগ্রেসের এই যুগান্তকারী অধিবেশনে যোগ দিতে। কংগ্রেসমণ্ডপে অরুণা সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়ায়। স্মিতহাস্যে পুরাতন বন্ধুদের সংবাদ নেয়, নূতন বন্ধু সংগ্রহ করে, যেন স্বপ্নে ভরা-রঙীণ প্রজাপতি। সেদিন অরুণাকে দেখে কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই মেয়েটিই পরের দিন থেকে বিপ্লবের অধিনায়িকা রূপে দেখা দিবে।

দীর্ঘ দশ বৎসরের আত্মপ্রস্তুতি অরুণার সার্থক হল ৯ই আগষ্ট তারিখে। মিঃ আসফ আলিসহ ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যগণ কিছুক্ষণ

পূর্ব্বেই বন্দী হয়েছেন। কংগ্রেস মণ্ডপস্থলে এক বিরাট জনতা সমবেত হয়েছে এবং বেড়ে চলেছে প্রতিক্ষণে। অরুণা সেই বিরাট জনসমুদ্রের মাঝখানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলে। লাঠি, রাইফেল ও কাঁদুনে গ্যাস নিয়ে পুলিস জনতাকে আক্রমণ করেছে। নিরীহ নর-রক্তে ধরণী রঞ্জিত, তবুও পুলিসের নিষ্ঠুর আক্রমণের বিরাম নাই। অসহায় জনগণের এই নিরর্থক রক্তপাত তাকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা দিলে। নিজের বিপদের কথা ভুলে গেল সে। "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" বাণীতে জনগণকে উৎসাহিত করে অরুণা নেতৃহারা দেশবাসীকে পরিচালনার দায়িত্ব নিতে কৃতসঙ্কল্প হল।

চতুর্দ্দিকের ধরপাকড়ের মাঝখানে অরুণা অদৃশ্য হয়ে গেল। আত্মগোপন করে বিপ্লবের আলোকবর্ত্তিকা হাতে নিয়ে এই বিদ্রোহিনী মেয়েটি সেই থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বেড়াতে লাগল। পুলিসের চর চলে পিছে পিছে, আর অরুণা চলে তাদের ফাঁকি দিতে দিতে—আজ এখানে, কাল সেখানে, পরশু আর একস্থানে। এইভাবে কাটে দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর কাল। ভারত সরকারের সেরা সেরা গোয়েন্দা হার মানে এই তেজস্বিনী নারীর কাছে। আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত বিকশিত হয়ে উঠে তার জীবনে। স্বামীর রোগপার্শ্বে উপস্থিত হতে পারে নি সে—মাতার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। তবুও চলে তার অভিযান। আগুন জ্বালায় সে দিকে দিকে, বিদেশী শাসকের লৌহপ্রাসাদ পড়ে গলে'।

পলাতকার প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটে পরম উদ্বেগে। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যাবার বহু কাহিনী আজ শোনা যায়। সেগুলি যেমনই রোমাঞ্চকর, তেমনই সাহসিকতাপূর্ণ। একবার পুলিসের আগমনবার্ত্তা পেয়ে অরুণা ট্যাক্সি করে ইউরোপীয়ান মহল্লায় গিয়ে জনৈকা ইংরেজ মহিলার পেইং-গেষ্ট হয়ে থাকে। একবার গোয়েন্দাকে বাড়ী ঘেরাও করতে দেখে ভিখারিণীবেশে কলকাতার রাজপথে নেমে পড়ে সে। এমনই বহু বিচিত্র ঘটনার মায়াজাল রচিত হয়েছে এই রহস্যময়ী নারীটিকে ঘিরে।

অবশেষে একদিন বিজয়িনী বেশে বেরিয়ে এসে সমগ্র জাতিকে বিস্ময়াভিভূত করলে সে। ১৯৪৬ সালের স্বাধীনতা দিবসে দিল্লীর কমিশনার অরুণার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করলেন। পরদিন কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনতার সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করে অরুণা বিপ্লবীর জীবন সার্থক করলে।

পরাধীন ভারতের ঘরে ঘরে যেদিন অরুণার মত মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে সেদিন স্বাধীনতার জয়যাত্রা সফল হবে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সূদান—বিরোধের সূত্র

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

সূদানকে কেন্দ্র করিয়া যে মতবিরোধ ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনায় দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য। বাহ্যত বিরোধটিকে এমন ভাবে দেখানো হইয়াছে যে ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনা একমাত্র সূদানের রাজনৈতিক ভবিষ্যত লইয়াই ইহা ফাঁসিয়া গেল। কিন্তু রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষকগণের নিকট বিষয়টি তত সহজ মনে হইতেছে না। সূদানের উপর যে ইঙ্গ-মিশরীয় যৌথ রাজনৈতিক প্রভুত্ব চাপানো হইয়াছিল, তাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিপূর্ব্বে কোন সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। বরং যাহা আছে তাহা তেমনি থাকুক মনে প্রাণে তাহাই অনুমোদন করিয়া আসিয়াছে। পরিবর্ত্তন যে আজ মিশর সম্বন্ধে হইতে চলিয়াছে, তাহা কোন বিশেষ আদর্শবাদের অনুপ্রেরণায় নহে, পৃথিবীব্যাপী যে পরিবর্ত্তনের সাড়া পড়িয়াছে তাহার অংশ হিসাবে মিশরের ভাগ্যেও কিছু জুটিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজের স্বার্থে না বাধিলে সে কোথায়ও স্বেচ্ছায় কিছু করিয়াছে তাহার প্রমাণ নাই। আজ যে বড় মিশরের জন্য মায়া তার কারণ কি? তাহার কারণ এই নয়, যে স্বার্থ ডিজরেলির আমল হইতে ব্রিটিশ জাতিকে পুষ্ট করিয়াছে তাহাতে তাহাদের বিষাদ বোধ হইতেছে। আসল কথা হইল নব্য বিজ্ঞান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের অনেকটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বিজ্ঞান এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিষ্ঠার আসনে বসাইয়াছে, সে বিজ্ঞানই আজ কালের পথে রূপান্তরিত হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিরাপত্তার সৌধ শিথিল করিয়া দিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শুরু করিয়া যে জাতি নিছক বাণিজ্যিক বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের দানকে স্ব-খাতে বহাইবার দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে আজ তাহাকে স্বেচ্ছায় নয়, এক রকম দায়ে পড়িয়াই ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে বুদ্ধি ও দক্ষতার বলেই প্রভুত্ব রক্ষা করা যায় না। বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করিবার অধিকার একমাত্র ব্রিটিশ জাতিরই একচেটিয়া নহে। মার্কিন জাতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। রণনৈতিক চাতুর্য্য, নৌবহরের বিরাটত্ব ও প্রভুত্ব দেখাইয়া ব্রিটিশ জাতি অনেক পাশার দান খেলিয়াছে ও জিতিয়াছে। কিন্তু শকুনীর কপট পাশা যেমন শেষ পর্য্যন্ত কুরুকুলকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই, তেমনি ব্রিটিশ জাতিকেও তাহার নৌ-বহর অনেকটা কপট পাশারই মত শেষাশেষি রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। ইতিহাসের অনিবার্য্য সক্রিয় গতি ব্রিটিশ জাতির বিরুদ্ধে চলিয়া গেল। স্পেন সাম্রাজ্যের নৌ-বহরকে টক্কর দিয়া যে জাতির নৌ-বহর নিজের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল এবং যাহা অপ্রতিহত গতিতে স্বীয় মর্য্যাদা

রক্ষা করিয়াছিল তাহা আজ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আজ আর ব্রিটিশ জাতির নিজের নৌ-বহরকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ঘোষণা করিবার দম্ভ নাই, জ্ঞাতি ভাই মার্কিনরা নৌ-বহরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক হইতে যে সব ঘাঁটি এতদিন রণকুশলীদের কাছে বহু মূল্যবান ছিল আজ তাহার আপেক্ষিক মূল্য হ্রাস পাইতে শুরু করিয়াছে। এই পরিবর্তনের কারণগুলি ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—নব্য বিজ্ঞানের মারফৎ। আনুবিক বোমার আবিষ্কর্তা যিনিই হোন তাতে বিশ্বের বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু সেই আবিষ্কারের ফল কে হাতে পাইয়া শক্তিশালী হইয়াছে সেইটাই বড় কথা। সেখানে ব্রিটিশ জাতি মার্কিনদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই, কেন না আনুবিক বোমার ভয়াবহ সিদ্ধান্তটি তাহাদের হাতের মধ্যে ছিল না। এইখানেই নব্য বিজ্ঞান ব্রিটিশ জাতিকে একেবারে নির্মমভাবে কোণ-ঠাসা করিয়াছে। আনুবিক বোমা যে শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা নহে। রণ-বিশারদগণের রণ-কৌশলের মধ্যে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। ইতিপূর্বে শুনা গিয়াছিল আকাশে ধূমকেতু উঠিলে বিশ্ববাসীর ভয় পাইবার সম্ভাবনা প্রচুর; কিন্তু সেই ভয়টা বিশ্ববাসী সময়ের মারফৎ খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছিল, অর্থাৎ ঘড়ি ঘড়ি যখন ধূমকেতু আকাশে ওঠে না, তখন "তিষ্ঠ ক্ষণকাল" বলিয়া মনকে বুঝানো যাইতে পারে, কিন্তু নব্য বিজ্ঞান যে গুরুগম্ভীর কারসাজী দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে আকাশে ঘড়ি ঘড়ি ধূমকেতু দেখিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই কখন এবং কোথা হইতে সুবিধামত সেই ধূমকেতুকে ঠেকানো যাইতে পারে তাহাই হইতেছে বর্তমান রণকুশলীদের চিন্তা।

মোট কথা, স্থল ও জল-এর দিন পার হইয়া গিয়াছে—আজ দিন হইতেছে ব্যোমের। সম্ভবত মনুষ্যসমাজের সমষ্টিগত আকাঙ্ক্ষা মহা ব্যোমকে জয় করিবার জন্য দুর্নিবার হইয়াছিল তাই আনুবিক শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। কেউ কেউ মনে করেন যে এই শক্তি দ্বারা বিশ্বের অশেষ কল্যাণ হইবে। কিন্তু ইহা প্রথম বিকাশেই যে বিভীষিকা ছড়াইল তাহার তুলনা বর্তমান ইতিহাসে নাই, হয়ত ভবিষ্যতে অনেকই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। শোনা যাইতেছে রণ-বিশারদগণ ষ্ট্রাটস্ফিয়ার-এর মধ্য হইতে বোমা ফেলা যায় কিনা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন। এই প্রচেষ্টা যদি বাস্তবে পরিণত হয় তবে বর্তমান বিশ্ববাসীর ভবিষ্যত যে কি তাহা গুটিকয়েক শক্তিশালী রাষ্ট্রের কর্ণধারেরাই বলিতে পারিবেন।

মার্কিনদের হাতে আনুবিক বোমা যতক্ষণ পর্য্যন্ত আছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বের কোন রাষ্ট্রেরই ঘুম নাই। কাজেই আনুবিক শক্তি ও তাহার অনুগামী বিমান শক্তি এই দুটি যার হাতে থাকিবে সে-ই সবাইকে ধমকাইবে, এবং মার্কিনরা যে ধমকাইতেছে না এমন প্রমাণ নাই। এখন কথা উঠিতে পারে যে আনুবিক বোমার সঙ্গে বর্তমানের বিশ্ব-রাজনীতির সম্পর্ক কি? একদিন যেমন ব্রিটিশ জাতি বৈদ্যুতিক শক্তি ও জাহাজে কয়লার ব্যবহার দ্বারা সবার আগে টেক্কা মারিয়াছিল, আজ ইতিহাসে তেমনি একটি টেক্কা মারিবার দিন মার্কিন জাতির আসিয়াছে। কালে ব্রিটিশ জাতির নৌ-বাণিজ্য ও বহর সবার আগে দ্রুতগতিতে তখনকার সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিল, যেখানেই সুবিধা মত ভৌগলিক সংস্থান মিলিয়াছে সেইখানেই এক একটি করিয়া নৌ-ঘাঁটি তৈরী হইয়াছে। তাহাতে কাহার সুবিধা হইয়াছে তাহা বিশ্ববাসীই দেখিয়াছে। পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ জল পথে ব্রিটিশ জাতির কোন না-কোন রকম প্রহরী রহিয়াছে। ভয়-এ ব্রিটিশ নৌ-বহরকে কেউ ঘাঁটায় না তার কারণ বাণিজ্য পথ বন্ধ হইবার সম্ভাবনা। এই নৌ-বহরের গর্ব্বও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে খর্ব্ব হইয়াছে। এ কথা সেদিন পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ কোল্ড বলিয়াছেন, "We have not the reserve of power in the modern world. We have lost the command of the sea and America now has the biggest fleet the world has ever seen." (The Sunday Statesman, December 15, 1946)

একদিন যেমন নৌ-বহরের ঘাঁটি রক্ষা, বাণিজ্য রক্ষা এবং সর্ব্বোপরি প্রভুত্ব রক্ষার জন্য এক-একটি রাজনৈতিক সমস্যা গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজও তেমনি ঘটিতেছে। একদিন ব্রিটিশ জাতির নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্য সুয়েজ, মাল্টা, সাইপ্রাস, জিব্রাল্টার, দার্দানেলিস, সিঙ্গাপুর, হংকং ইত্যাদির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভুত্বের প্রয়োজন ছিল আজও তেমনি বিমান শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ভৌগলিক সংস্থানের প্রয়োজন হইয়াছে এবং সেই শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার কাজে আফ্রিকাকেই প্রধান অংশ দিতে হইতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ রশ্মি আফ্রিকার উপর পড়িয়াছে; অতএব আমরা আশা করিতে পারি যে, আগামী ত্রিশ বছর কিংবা তাহারও বেশী কিছুদিন আফ্রিকাকে দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। এবং একথা আমাদের ধরিয়া লওয়ায় বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না যে, আফ্রিকাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক জটিলতা ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করিতেছে। এই আফ্রিকায় মিশর একটা ব্রিটিশের বড় ঘাঁটি এবং তাহার সঙ্গে সুদানকে লেজের মত আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুদান লেজের মত অস্তিত্ব আর মানিতে রাজি নয় বা মিশরের সঙ্গে একতাবদ্ধ হইয়া থাকিতেও রাজি নয়। মিশর হইতে সুদানকে ছিন্ন করিবার ষড়যন্ত্র যে ব্রিটিশ কূটনীতির একটি কৌশল তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ঘোষণা করিয়াছে তাহারা মিশর পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু বিশ্ববাসী কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে, তাহারা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার যন্ত্রপাতিগুলিও কি সঙ্গে সঙ্গে ওখান হইতে গুটাইয়া লইয়া আসিবেন? একথার জবাব নাই। তবে অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই বুঝিবেন যে—জবাব দেওয়া সুরু হইয়াছে। অর্থাৎ সুদান বলিতেছে যে, সে মিশরের সঙ্গে থাকিবে না। এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই সুদানের উপর ইঙ্গ-মিশরীয় যৌথ প্রভুত্ব একদিন চাপাইয়াছিল—তার কারণ সুদানের তুলা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তা ছাড়া আরও অনেক খনিজ পদার্থ সেখানে পাওয়া যায়। শোষণের সুবিধায় যে আসর পাতা গিয়াছিল তাহা বিভিন্ন অবস্থার চাপে পড়িয়া

প্রতিযোগিতার কারণ হইয়াছে। তাই নীল উপত্যকাকে কেন্দ্র করিয়া নূতন একটি রাজনৈতিক সমস্যা গড়িয়া উঠুক তাহারই চেষ্টা চলিতেছে।

আফ্রিকার বিশেষ বিশেষ স্থানে বিমান ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ব্রিটিশ জাতিকে তার মিশর পরিত্যাগের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। তাই ভূমধ্যসাগরের কূলে সাইরেনিকা, এদিকে ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান, উগাণ্ডা ও কেনিয়া এই অংশ জুড়িয়া যদি বিমান ঘাঁটির একটি প্রশস্ত শৃঙ্খল গঠন করা সম্ভব হয় তবে নীল উপত্যকানামে আর একটি রাজনৈতিক উপসমস্যা জুটিয়া মিশরের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ও নিরাপত্তার ব্যাঘাত ঘটাইবে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করিতে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বদ্ধপরিকর। তাহার প্রমাণ হইল সুদানের মিশরের সঙ্গে থাকিবার অনিচ্ছা। এই অনিচ্ছাশক্তিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শুধু ইন্ধন যোগাইতেছে। ব্রিটিশরা নিজেরাও জানে যে ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান যদি মিশর হইতে ভিন্ন হইয়া যায়, তবে মিশরের দানা-পানি একরকম বন্ধ হইবার উপক্রম, তার কারণ নীল নদের কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখাস্রোত ইঙ্গ-মিশরীয় সুদানের হাতে থাকিবে। প্রয়োজনবোধে এই সব শাখা স্রোতের ব্যাঘাত জন্মাইয়া মিশরের কৃষি-সম্পদকে ধ্বংস করা যাইবে। মিশরের পক্ষে ইঙ্গ-মিশরীয় সুদান অপরিহার্য্য, কিন্তু ব্রিটিশ কূটনীতি সেখানে সর্ব্ব রকম বাধার সৃষ্টি করিয়াছে এবং মিশরকে হাতে না মারিয়া ভাতে মারিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আমরা এমন কথা বলিতেছিনা যে সুদানের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার বিরোধিতা করিয়া মিশর তাহাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিক। কিন্তু একমাত্র ভৌগলিক সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইহা বিনাদ্বিধায় বলা যাইতে পারে যে যৌথভাবে মিশর ও সুদান রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াই বাঁচিতে পারে। সুদানের রাজনৈতিক সত্তা মিশরের প্রখর প্রতিরোধকারীর শক্তির সঙ্গে মিশিয়া এক নূতন সমন্বয় সৃষ্টি করিবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভবিষ্যতে গোটা আফ্রিকা মহাদেশ হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করিবে। আমরা এই রাজনৈতিক সম্ভাবনার প্রতি আগ্রহশীল।

বার্লিন ফেরৎ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বার্লিন থেকে ট্রেণখানা আসছে।

শিশু আর স্ত্রীলোকে গিস্ গিস্ কচ্ছে কামরাগুলো। এত ভীড় যে মনে হচ্চে—ইঞ্জিন বুঝি আর টান্তে পারছে না গাড়ীখানাকে।···

শিশু আর স্ত্রীলোকেই গাড়ী ভর্ত্তী।···

স্বাস্থ্যবান সক্ষম পুরুষ বল্‌তে গাড়ীতে খুব কম-ই ছিল, বলা চলে। একখানা বগীর মধ্যে জার্মান ফীস্থইজ সৈন্য বসে আছে একজন। মাথার চুলে তার পাক ধরেছে। পাশে একটা বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক। দেখে খুব দুর্বল এবং অসুস্থই বোধ হচ্ছিল।

গাড়ী চলেছে। চাকার শব্দ হচ্চে। এক সঙ্গে অনেকগুলি চাকার।

ঝিক্···ঝিক্···ঝিক্···ঝক্···ঝক্···ঝক্ গাড়ী চলছে।

বর্ষিয়সী রমণীটী যেন চাকার সুরে সুর মিলিয়ে বল্‌ছিল —এক···দুই···তিন···এক···দুই···তিন···

গাড়ীর যাত্রীরা শুন্‌ছিল অবাক হয়ে।

নিজের চিন্তায় বিভোর সেই স্ত্রীলোকের কিন্তু কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সে তেমনই বলে' চলেছিল—এক··দুই···তিন···

মাঝে মাঝে আবার চুপ করেও থাক্‌ছিল।

তার ভাব-গতিক দেখে দু'টী মেয়ে হেসে উঠছিল খিল খিল্ করে'। এমন অস্বাভাবিক আচরণ বোধ হয় তারা কখনো দেখে নি। নিজেদের মধ্যে তাই ফাঁকা কতকগুলো মন্তব্যও তারা সুরু করলো।

দেখেশুনে এবার একটী বয়স্ক লোক হঠাৎ তাদের ভর্ৎসনা করে' দাবড়ী দিল।

চুপ্ করলো মেয়ে দু'টী।

এক···দুই···তিন···

পুনরায় সেই কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি কর্‌তে সুরু করলো সেই বেভুল স্ত্রীলোকটী।

আবার মেয়ে দু'টী ফেটে পড়লো হাসিতে।···

পার্শ্বে উপবিষ্ট সেই সৈন্যটী এবার মাথা এগিয়ে আন্‌লো সামনে।

গম্ভীরভাবে বল্‌তে লাগ্‌লো—

কন্যাগণ! তোমরা কী এর পরেও হাসবে, যদি শোনো এই হতভাগ্য স্ত্রীলোক-ই আমার স্ত্রী? যুদ্ধে আমরা এই মাত্র হারিয়েছি তিনটী বুকের মাণিককে। তিনটী পঞ্জরের অস্থিকে। সেই তিনটীই ছিল আমাদের ছেলে। যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ কর্‌বার আগে তাই তাদের মাকে তুলে দিতে যাচ্চি একটা অনাথ-উন্মাদ-আশ্রমে।

গাড়ীর মধ্যে একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা দেখা দিল।

মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি পরিদর্শন

শ্রীগোরা

মহাত্মা গান্ধী একদিকে যেমনি নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া শান্তির বাণী প্রচার করিতেছেন, ঠিক তেমনি সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ গ্রামবাসীদের অবস্থার উন্নতির কাজেও মন দিয়াছেন। তিনি স্থানীয় লোকদের বাড়ীতে বাড়ীতে গমন করিয়া তাহাদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। তাহারাও নিজেদের দুঃখের কাহিনী মহাত্মাজীর নিকটে বর্ণনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না। মুসলমানেরা তাঁহাকে তাহাদের বিশেষ বন্ধু বলিয়া ভাবিতেছে। শ্রীরামপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি হইতে রোগীর দল প্রায়ই তাঁহার নিকটে ঔষধ চাহিতে আসে। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত

একটি বিধ্বস্ত গৃহ দর্শনে স্তম্ভিত মহাত্মা গান্ধী ফটো—তারক দাস

চিকিৎসক ডাঃ সুশীলা নায়ারকে তাহাদের চিকিৎসার ভার দিয়াছেন। মহাত্মাজী নিজেও তাঁহার রোগীদিগকে প্রায়ই দেখিতে যান। তিনি অন্তরঙ্গের ন্যায় তাহাদের সহিত মিশিয়া কথাবার্ত্তা বলেন। তাঁহার উপস্থিতি ও পরিহাসরসিকতায় পীড়িত ব্যক্তিরা মনে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করে। ডাঃ নায়ার বর্ত্তমানে চাঙ্গিরগাঁও গ্রামে মহাত্মার কর্ম্মপন্থা অনুযায়ী শান্তি স্থাপনের কাজে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহাকে দশ বার মাইল পথ,ও হাঁটিয়া রোগী দেখিতে যাইতে হয়। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে এই সকল চিকিৎসা অবৈতনিক ভাবেই হইতেছে। ডাঃ নায়ার স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট "ডাক্তার মা" নামে অভিহিত হইয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী পূর্ব্বে বাঙলা জানিতেন না, স্থানীয় সাধারণ লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি তাঁহার সঙ্গী ও দোভাষী অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসুর নিকট হইতে বর্ত্তমানে বাঙলা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। তিনি প্রতিদিনই কিছু কিছু করিয়া বাঙলা লেখা ও পড়া

মহাত্মাজীর একটি গ্রাম্য-সাঁকো অতিক্রম ফটো—তারক দাস

অভ্যাস করেন। তাঁহার নামে বাঙলায় যে সকল চিঠি আসে তিনি তাহা পড়িতে পারেন। গ্রামবাসীরা আসিয়া তাঁহার সহিত বাঙলায় কথা কহিলে তাহাও তিনি কিছু কিছু বুঝিতে পারেন। তিনি বাঙলা কথ্যভাষা শিখিতেও চেষ্টা করিতেছেন। মহাত্মাজী বলেন—আমি এখন বাঙালী, নোয়াখালীবাসী।

একজন অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ অসীম ধৈর্য্যের সহিত অল্প সময়ের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাষা শিক্ষা করিতেছেন এবং নগণ্য গ্রামসমূহের দুর্গম পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রামবাসীদের সহিত সেই ভাষায় কথা বলিয়া তাহাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতেছেন। তারপর নিজের সকল কাজ ভুলিয়া শত প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য জীবনপণ করিয়াছেন। কথাটা শুনিয়া রূপকথা বলিয়া মনে হয়; একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর মত মহামানবের পক্ষেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বসতি সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা করিতে যাইলে তিনি তাঁহাদের বলেন—হয় আমার উদ্দেশ্য সফল করিব, নতুবা নোয়াখালীতেই আমার দেহরক্ষা করিব। যদি নোয়াখালী হইতে সমস্ত হিন্দুও চলিয়া যায়, তাহা হইলে একমাত্র হিন্দু আমিই এখানে অবস্থান করিব।

নোয়াখালীর পথে মহাত্মাজী ফটো—তারক দাস

ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলে তিনি তাঁহাকে বলেন—নোয়াখালীতে আজ আমাদের যে পরীক্ষা চলিতেছে, তাহার ফলাফল দেখিবার জন্য সকলেই আগ্রহ সহকারে এদিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। লণ্ডন হইতেও আমি এ বিষয়ে সংবাদ পাইয়াছি।

গোপেরবাগ গ্রামে গান্ধীজী ফটো—তারক দাস

মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় প্রতিদিনই হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বহু লোক উপস্থিত থাকে। তিনি প্রায় প্রতিদিনই পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে উপদেশ দেন এবং ভগবান ভিন্ন অপর কাহাকেও ভয় করিতে নিষেধ করেন। তিনি দুর্গতদিগকে ঐকান্তিক-ভাবে ভগবানের নাম করিতে বলেন। মুসলমান শ্রোতাদের বিশেষ করিয়া মাঝে মাঝে তিনি হজরৎ মহম্মদের কথা ও কোরাণের উপদেশ শোনান। ১১ই ডিসেম্বরের প্রার্থনা সভায় তিনি বলেন—হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের মত। একই জমির উৎপন্ন খাদ্যে উহাদের দেহ পুষ্ট হয়। একই নদীর জল পান করিয়া উভয়েই তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং একই মাটিতে উভয়ে শেষ শয্যা গ্রহণ করে। তিনি আরও বলেন যে, পৃথিবীতে বহু ধর্ম্মমত থাকিলেও প্রত্যেক ধর্ম্মেই আধ্যাত্মিক অনেক কথা রহিয়াছে। এই সকল আধ্যাত্মিক কথাগুলি প্রায় সকল ধর্ম্মেই অভিন্ন। এই দিক দিয়া এক ধর্ম্মের সহিত অপর ধর্ম্মের যে সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে বর্ত্তমানে প্রত্যেক ধর্ম্মেই অনেক দোষ জুটিয়াছে, এগুলি ঐ সকল ধর্ম্মের মূল শিক্ষার বিরোধী।

ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির উদ্যোগে শ্রীরামপুর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে মধুপুরে যে হাসপাতাল খোলা হইল, মহাত্মা গান্ধী ১৪ই ডিসেম্বর তাহার উদ্বোধন করেন। তথায় তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে চিকিৎসকদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের বিষয় বলেন। শ্রীরামপুর হইতে তিনি পদব্রজেই মধুপুর গিয়াছিলেন এবং পদব্রজেই ফিরিয়া আসেন।

যে সকল আশ্রয়প্রার্থী এখনও স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে না, তাহাদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ব্যাপকভাবে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই ভ্রমণকালে তিনি অল্পমাত্র সামগ্রীই সঙ্গে লইবেন এবং যেখানে রাত্রি হইবে সেইখানেই অবস্থান করিবেন। তিনি ভাত, রুটি প্রভৃতি খান নাই। সামান্য ফলমূল ও দুধ যেখানে যাহা পাইবেন তাহাই আহার করিবেন। কয়েক দিন অন্তর অন্তর বিশ্রাম গ্রহণ করিবার জন্য তিনি শ্রীরামপুরে ফিরিয়া আসিবেন মাত্র। আবশ্যক হইলে তিনি প্রত্যেক গ্রামে প্রতি বাড়ীতে বাড়ীতেও যাইতে পারেন। সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য তাঁহাকে সিধা পথে অনেক সময় মাঠের উপর দিয়া যাইতে হইবে। মাঠের ধান সবেমাত্র কাটা হইতেছে। মাঠ এখনও কর্দ্দমাক্ত। ইহার উপর দিয়াও তাঁহাকে অনেক সময় পার হইতে হইবে। ভ্রমণকালে তাঁহাকে বহু সঙ্কীর্ণ সাঁকোও অতিক্রম করিতে হইবে। সেই জন্য তিনি প্রতিদিনই ধানক্ষেতে ছোট ছোট সাঁকো পার হওয়া অভ্যাস করিতেছেন। পূর্ব্বে তিনি কাহারও সাহায্য ছাড়া সাঁকো অতিক্রম করিতে পারিতেন না। ৩০শে নভেম্বর একটি বড় সাঁকো পার হইবার সময় মহাত্মাজীর পা কাঁপিয়াছিল এবং তিনি নীচে পড়িয়া যাইবার মত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে তিনি একা সাঁকো পার হওয়ার জন্য পণ করেন। ছোট ছোট সাঁকো একা পার হইবার জন্য চেষ্টা করিলেও তিনি প্রথম কয়দিন ব্যর্থ হন এবং অপরের সাহায্য তাঁহাকে লইতেই হয়। কিন্তু সপ্তম দিনে দেখা গেল তিনি কাহারও সাহায্য না লইয়াই একা একটি সুপারী গাছের সাঁকো পার হইয়া আসিলেন। এখন তিনি বহু সাঁকোই অনেকটা সহজে অতিক্রম করিতে পারেন। মহাত্মা গান্ধীর এই যে অদম্য উৎসাহে কষ্ট স্বীকার, ইহার কারণ তিনি জানেন যে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণকালে তাঁহাকে এই সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। পূর্ব্ব হইতেই তাই তিনি ইহাকে কিছুটা সহজ করিয়া রাখিতেছেন।

সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আজ পূর্ব্ববাঙলার একপ্রান্তে নিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতের নানাস্থান হইতে এবং বহির্ভারতেরও বহু স্থান হইতে নিয়তই বহু লোক মহাত্মার কুটীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। নোয়াখালীর শ্মশান আজ তীর্থে পরিণত হইয়াছে। শ্মশানের মাঝে বসিয়া মহাত্মা গান্ধী আপন সাধনায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তিনি আজ বাঙালী, নোয়াখালীবাসী। জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে দুর্গত নরনারীর হিতসাধনের মধ্যেই তিনি তাঁহার জীবনধারণের সার্থকতা দেখিতে পাইয়াছেন। তাই দুর্গতদের দুঃখ দূর করিবার জন্যই তিনি জীবন পণ করিয়াছেন। বিহার হাঙ্গামার সময় তিনি দাঙ্গা বন্ধ করিবার জন্য অনশন করিবারও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তবে অবিলম্বে দাঙ্গা কতক পরিমাণে প্রশমিত হওয়ায় তিনি সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেন এবং ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতে সঠিক সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি কয়েকদিন মাত্র নেবুর রস ও ডাবের জল গ্রহণ করিয়াই দিনযাপন করিতেন। তারপর ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতে দাঙ্গা কমিয়া যাওয়ার তার পাইয়া ১৯শে নভেম্বর হইতে তিনি পুনরায় ক্রমে স্বাভাবিক আহার গ্রহণ করিতে থাকেন। এই সময় মহাত্মাজী কাজীর খিলে অবস্থান করিতেছিলেন।

মহাত্মাজীর অহিংসার আজ কঠিনতম পরীক্ষা চলিতেছে। এখনও তিনি এখানে অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া আলোর সন্ধান করিতেছেন। হয় তিনি ইহাতে সাফল্য অর্জ্জন করিবেন নতুবা মৃত্যুবরণ করিবেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প। অমৃতের বাণী লইয়া এ যুগের শ্রেষ্ঠ মহামানব বাঙলার বুকে কঠোর সাধনায় মগ্ন, এইদিক হইতে বাঙলা তাহার শত দুঃখ থাকা সত্ত্বেও সে আজ ধন্য—একথা বলা যাইতে পারে।

২২।১২।৪৬

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং

প্রায় দেড় বৎসর হইল যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, অথচ এখনও ভারতবাসী একইভাবে যুদ্ধকালীন দুঃখকষ্ট সহিয়া চলিয়াছে। সমরসংক্রান্ত বিভাগাদি হইতে কর্ম্মচ্যুত হইয়া কয়েক লক্ষ লোক বেকার হইয়া পড়ায় দেশের সাধারণ অর্থনীতি আরও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভারত সরকার মোটামুটি সুষ্ঠু কোন যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিলে অবস্থার অবশ্যই কিছুটা উন্নতি হইত, কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে সমস্ত সম্ভাবনা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। সমর পণ্য উৎপাদনের শিল্পসমূহকে ক্ষিপ্রতার সহিত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের শিল্পে রূপান্তরিত করিয়া এবং দেশে অসংখ্য প্রকার অত্যাবশ্যক ভোগ্যপণ্য ও মূল শিল্পের প্রতিষ্ঠা বা প্রসার করিয়া ভারত সরকার সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের তথা জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। যে কারণেই হউক, কর্ত্তৃপক্ষের দিক হইতে কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখতার জন্য এখনও ভারতে চরম পণ্যাভাব বা ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতির দুঃসহ চাপ এতটুকু কমিতেছে না।

অথচ যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ খরচ হওয়া সত্ত্বেও ভারতের আর্থিক অবস্থা এতখানি শোচনীয় হইয়া পড়িবার কথা ছিল না। ভারতে স্বাভাবিক ভাবে মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন দেখা দেয় নাই, যাহা ঘটিয়াছে ভারতবর্ষের পরাধীনতাই তাহার একমাত্র কারণ। যুদ্ধের সময় বিপ

ব্রিটিশ সরকারের মুখ চাহিয়া ভারত সরকার ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন এবং বুভুক্ষু ভারতবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া ব্রিটিশ সরকারকে ভারত হইতে অবিরাম পণ্য জোগাইয়া গিয়াছেন। এই পণ্যের বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকার নগদ এক পয়সা দেন নাই, দিয়াছেন কাগজী ষ্টার্লিং প্রতিশ্রুতি পত্র। ভারতীয় রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় এক দুই করিয়া ষ্টার্লিংয়ের পরিমাণ বাড়িয়া এখন প্রায় ১৮ শত কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটি জমিয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও ভারত হইতে ব্রিটিশ সরকার এইভাবে ধারে পণ্য গ্রহণ বন্ধ করেন নাই। এই ষ্টার্লিং পাওনাকে জামিন করিয়া ভারত সরকার একরূপ বাধ্য হইয়াই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফৎ কোটি কোটি টাকার নোট ভারতবর্ষে বিলি করিয়াছেন। বিনিময়ে স্বর্ণ পাইবার স্বাভাবিক প্রতিশ্রুতিহীন এই গোছা গোছা নোট হাতে পাইয়া ভারতের এক শ্রেণীর লোক বাজারের সামান্য পরিমাণ পণ্য যে কোন উপায়ে গ্রাস করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, ফলে অসংখ্য নিরুপায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নরনারী পণ্যাভাবে চরম কষ্ট পাইতেছে। ভারতে বর্ত্তমানে ১২ শত কোটি টাকার বেশী নোট চালু আছে, কিন্তু ইহার বিপরীত দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে স্বর্ণসম্পদ মজুত আছে মাত্র ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার। এই সোনাটুকু ছাড়া প্রচলিত নোটের পূর্ণ জামিন ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং সিকিউরিটি। কাজেই ভারতের সাধারণ অর্থনীতির বিবেচনায় ষ্টার্লিং পাওনার গুরুত্ব এখন কতখানি, তাহা লইয়া আলোচনা না করিলেও চলিবে।

সকলেই জানেন, যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। ভারতের ন্যায় পশ্চাৎপদ দেশে এই প্রয়োজন আরও বেশী। এদিকে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। ভারতের আর্থিক পুনর্গঠন সম্ভব করিতে হইলে ভারত সরকারের আর্থিক স্বাচ্ছল্য একান্ত আবশ্যক। ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংগুলি আদায় হইলে ভারত সরকারের স্বচ্ছলতা অবশ্যই কতকটা ফিরিয়া আসিবে। গরীব ও অপ্রস্তুত ভারতবর্ষ প্রচণ্ড আত্মবঞ্চনা করিয়াও ব্রিটেনকে যুদ্ধের সময় সর্ব্বস্ব দিয়া সাহায্য করিয়াছে, এখন যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতের পুনর্গঠনের পক্ষে একমাত্র ভরসা ষ্টার্লিং পাওনাটুকু ব্রিটেন স্বেচ্ছায় পরিশোধ করিবে, ইহাই আশা করা স্বাভাবিক। ভারতে এখন জনসাধারণের প্রতিনিধিবৃন্দ দ্বারা গঠিত অন্তর্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের দুর্গত জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির জন্য এই সরকার স্বতঃই ব্যগ্র। এ অবস্থায় ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাওয়ার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ যে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষের পরাধীনতার সুবিধা পাইয়া ব্রিটিশ সরকার ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে চরম স্বার্থপরতা দেখাইতেছেন। ষ্টার্লিং পাওনা জমিয়া উঠার পিছনে ভারতের বিপুল ত্যাগ স্বীকার এবং ব্রিটেনের দারুণ লাভের কথা স্মরণ রাখিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে একটা ব্যবস্থা করিয়া ফেলা উচিত ছিল। যুদ্ধোত্তর-পুনর্গঠনের জন্য ষ্টার্লিং পাওনাটুকুর মূল্য ভারতের নিকট কতখানি, তাহাও অবশ্যই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অজানা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই পাওনা পরিশোধ সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না। ভারতবর্ষ উত্তমর্ণ, ব্রিটেন অধমর্ণ ; কিন্তু এই ষ্টার্লিং পাওনার ব্যাপারে পাওনাদার ভারতবর্ষ যেভাবে দেনদার ব্রিটেনের কৃপাপ্রত্যাশী হইয়া আছে, ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হইলে তাহা কল্পনাও করা যাইত না।

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ থামিবার পূর্ব্ব হইতেই ভারতের ন্যায্য পাওনা ফাঁকী দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনে এক শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন চলিতেছে। টোরী দলপতি গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী মিঃ চার্চ্চিল এই আন্দোলনের প্রকাশ্য সমর্থক। হাউস অফ কমন্সের এক অধিবেশনে তিনি বলেন, ভারতের নিকট আমরা ১২০ কোটি পাউণ্ড ধারি বলিয়া শুনিতে পাই, কিন্তু আমরা না থাকিলে তো আক্রমণকারীর সঙ্গীনের আঘাতে ভারতবর্ষ ধ্বংস হইয়া যাইত। তিনি এমন মতও প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধে সর্ব্বস্ব ক্ষয় স্বাভাবিক বলিয়া যুদ্ধজয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত ভারতবর্ষের—যুদ্ধের খরচের অংশ হিসাবে ব্রিটেনের নিকট হইতে কিছু দাবী করা উচিত নয়। ব্রিটেন ভারতে যুদ্ধব্যয়ের একাংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে বলিয়াও ষ্টার্লিং পাওনার একাংশ জমিয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল ও তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গদের অভিমত কার্য্যকরী হইলে ভারতের পাওনা এমনিই কতকাংশে কমিয়া যাইত। ভারতবর্ষ যুদ্ধ করিয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশ হিসাবে, অন্যথায় তাহার যুদ্ধ করিবার কারণ ছিল কি না সন্দেহ। তা ছাড়া ভারত-সীমান্তে জাপানকে আটকানোর অর্থ যে জার্ম্মান অভিযান হইতে ব্রিটেনকে এক দিক হইতে রক্ষা করা—ইহাও অস্বীকার করিবার কথা নয়। সুতরাং এ হিসাবে ভারতের সমর-ব্যয়ের একাংশ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্রিটেন আত্মরক্ষারই ব্যবস্থা করিয়াছে, দাতব্য করে নাই। কাজে কাজেই যাহারা এভাবে ভারতের পাওনা কমাইবার জন্য সচেষ্ট, তাহাদের সংকীর্ণতা ও জমিদারী মনোভাব একান্ত সুস্পষ্ট।

ব্রিটেনের এক শ্রেণীর লোক এবং কয়েকখানি সংবাদপত্র আর একভাবে ভারতের পাওনা কমাইবার ষড়যন্ত্র করে। তাহারা প্রচার করিতে থাকে যে, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের অসহায়তার সুযোগ লইয়া ভারত সরকার অত্যধিক দরে ব্রিটেনকে পণ্য জোগাইয়াছে বলিয়াই ষ্টার্লিং পাওনার পরিমাণ এত বেশী হইতে পারিয়াছে। এই অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি অবশ্য রিপোর্টে উপরিউক্ত অভিযোগকে সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বরং ভারতবর্ষ নিজের প্রচণ্ড অভাব সত্ত্বেও ব্রিটেনকে ভারতের বাজারের তুলনায় অল্প দরেই মালপত্র সরবরাহ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভারতে যখন কাপড়ের দর যুদ্ধের আগের তুলনায় শতকরা ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখনও ভারত সরকার ব্রিটিশ সরকারকে সরবরাহকৃত কাপড়ের জন্য শতকরা ১০০ ভাগের বেশী দাবী করেন নাই।

তবে এ পর্য্যন্ত ব্রিটেনে ভারতের পাওনা কমাইবার বা বাতিল করিবার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলনই চলুক, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সরকারী ভাবে ও প্রকাশ্যে তাহাতে যোগ দেন নাই। ১৯৪৪ সালের ২২শে জুন কমন্স

সভায় অর্থসচিব স্যার জন এণ্ডারসনকে যখন ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা ফাঁকি দেওয়া হইবে না, এই মর্ম্মে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে বলা হয়, তখন তিনি স্থান কালের দোহাই দিয়া কোনক্রমে প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়াছিলেন। তারপর চার্চ্চিল মন্ত্রিসভার পতনের পরে মিঃ এটলী পরিচালিত মন্ত্রিসভা যখন গদি পাইলেন, তখন শ্রমিক দলের উদারনীতি সম্পর্কে আশান্বিত সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, এইবার ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এটলী মন্ত্রিসভা নিঃস্ব ও ঋণগ্রস্ত ভারতের শেষ সম্বল ন্যায্য পাওনা ষ্টার্লিংগুলি ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিবেন। দুঃখের কথা, সে আশাও পূর্ণ হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যিক নীতি লইয়া এটলী মন্ত্রিসভা এখনও যেভাবে খেলা করিতেছেন তাহাতে শ্রমিক দলের কার্য্যকরী ঔদার্য্য সম্পর্কে অনেকের মনে সত্যই সন্দেহ জাগিয়াছে। কথার মারপ্যাঁচে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যাবলী বিলম্বিত করার জঘন্য মনোবৃত্তি দেখাইয়া শ্রমিক মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই ঐতিহাসিক দুর্নাম অর্জ্জন করিয়াছেন।

ভারতে এখন অন্তর্ব্বর্ত্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সরকারের পক্ষে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবিক নেহেরু সরকারের গত তিন মাসের কার্য্যধারায় আন্তরিকতার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিন্তু তাঁহাদের চূড়ান্ত সাফল্যের পথে এখনও স্বার্থবাদী ব্রিটিশ চক্রান্ত বিপুল বাধার সৃষ্টি করিতেছে। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের ব্যাখ্যা লইয়া দারুণ গণ্ডগোলের উদ্ভব হইয়াছে। ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধ সম্পর্কেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত হতাশাজনক মনোভাব দেখাইতেছেন। সম্প্রতি ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার সহিত খোলাখুলি আলোচনার জন্য কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দ লণ্ডনে গিয়াছিলেন। পণ্ডিত নেহেরু যে বিষণ্ণ চিত্তে লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, একথা সকলেই অবগত আছেন। লীগ দলের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ জিন্নার সহিত অন্তর্বর্ত্তী সরকারের অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলিও লণ্ডনে গিয়াছিলেন। শুনা গিয়াছিল, লণ্ডনে মিঃ লিয়াকৎ আলি ষ্টার্লিং পাওনা আদায় ত্বরান্বিত করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহিত স্পষ্ট বুঝাপড়া করিবেন। প্রকাশ, মিঃ লিয়াকৎ আলি এ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকার ডাঃ হিউ ডাল্টনের ঔদাসীন্যের জন্য এ বিষয়ে তিনি ব্যর্থকাম হইয়াছেন। ডাঃ ডাল্টন নাকি জানাইয়াছেন যে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে গণ্ডগোল মিটিয়া ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক নহেন।

বলা বাহুল্য, ডাঃ ডাল্টনের এই অজুহাত একান্ত স্বার্থপ্রসূত ও যুক্তিহীন। ব্রিটেন আমেরিকার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ কর্জ্জ করিয়া হু হু করিয়া বহির্বাণিজ্য বাড়াইয়া চলিয়াছে, অথচ ভারতবর্ষ অর্থাভাবে অত্যাবশ্যক কৃষি-শিল্প সংস্কারের ব্যবস্থাটুকুও করিতে পারিতেছে না। ভারতে যে গভর্ণমেণ্টই প্রতিষ্ঠিত থাকুক, ভারতবাসীর চরম আত্ম-বিসর্জনের ফলে সঞ্চিত পাওনা আজ মুমূর্ষু ভারতকে বাঁচাইবার পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়া এই পাওনা পরিশোধে বিলম্ব করিয়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ লজ্জাকর অমানুষিকতার পরিচয় দিতেছেন। তাছাড়া দলগত মতবৈধতা থাকিলেও অন্তর্বর্ত্তী সরকার জাতীয় সরকার, এই জাতীয় সরকারের অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলির হাতে ভারতের পাওনা টাকাগুলি তুলিয়া দিলে ভূতপূর্ব্ব শ্বেতাঙ্গ অর্থসদস্য স্যার জেরেমী রেইসম্যান বা স্যার আর্চ্চিবল্ড রোল্যাণ্ডসের আমলের তুলনায় যে ভারতের অধিকতর কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহাতে তো সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। ভারতবর্ষ যেরূপ দ্রুতগতিতে আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা লাভ করিতেছে, তাহাতে ব্রিটিশ সরকার এখন সহস্র চেষ্টা করিলেও আর ভারতবর্ষকে দাবে রাখিতে পারিবে না। এক্ষেত্রে ভারতের সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের নজীর তুলিয়া দেনদার ব্রিটেনের পাওনাদার ভারতবর্ষের উপর মাতব্বরী করিবার অধিকার কোথায়? ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদের তল্পীবাহক ভারত সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঋণ গ্রহণের ফলে ভারতবর্ষে ভোগ্য পণ্যের চরম অভাব এমন কি বহুলক্ষ লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ হইয়াছে এবং ষ্টার্লিং পাওনার পর্ব্বত জমিয়া উঠিয়াছে। দেশবাসীর অসমর্থিত এই সরকারের নিকট পাওনা পরিশোধে তো ব্রিটিশ সরকার বাধ্য ছিলেন। সেই আমলাতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্ত্তে ভারতে বর্ত্তমানে জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত। এই সরকারের হাতে টাকা পড়িলে সত্যই কি ভারতের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা আছে?

নিজের ঘরে মতবৈষম্য যাহাই থাকুক, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজশক্তি কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ কাহারোই প্রকৃত মিত্র নয়। সে হিসাবে পাওনাদার ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনকারী ব্রিটিশ অর্থসদস্যের ধৃষ্টতামূলক মনোভাবের প্রতিবাদ জানাইয়া মিঃ লিয়াকৎ আলির পাওনা আদায়ের দাবী সম্পর্কে দৃঢ়তা দেখানোই উচিত। ভারতবর্ষের একান্ত দুর্ভাগ্য যে তুচ্ছ স্বার্থের মোহে আজ মুসলিম লীগ স্বার্থবাদী ব্রিটিশ চক্রান্তের জালে আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়েছে। এই লীগেরই অন্যতম নেতা মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ ভারত সরকারের অর্থসদস্য। সেই হিসাবেই শেষ পর্য্যন্ত দলগত স্বার্থ যদি জাতীয় স্বার্থের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠা পায় এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এতবড় অন্যায় জিদ করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত ষ্টার্লিং পাওনা সম্পর্কে আলোচনার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকিবার সুযোগ পান, তাহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই।

ভারতবাসীর পুষ্টিকর খাদ্যাভাব ও স্বাস্থ্যহীনতা

অর্থস্বাচ্ছল্য ও শিক্ষা মানুষকে শরীর এবং মনের দিক হইতে সুস্থ করিয়া তোলে। ব্রিটিশ শাসনের মহিমায় ভারতবর্ষের অধিবাসীদের এই দুইটি বস্তুরই একান্ত অভাব। কাজেই সকল দিক হইতে নিঃস্ব ভারতবাসী আজ অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়াই যৎসামান্য আত্মতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে।

মোটরগাড়ী চড়িবার বা নিজের বাড়ীতে সোফায় বসিয়া রেডিও শুনিবার সুযোগ লাভ লোভনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু জনসাধারণকে এই বিলাসোপকরণ যোগাইতে কোন রাষ্ট্রেরই বাধ্যবাধকতা নাই। অন্ন-

যন্ত্রের বেলা কিন্তু একথা খাটে না। দেশ যাঁহারা শাসন করেন, দেশবাসীকে পালন করিতেও তাঁহারা ন্যায়তঃ বাধ্য এবং এদিক হইতে বিবেচনা করিলে জনসাধারণের বাঁচিয়া থাকিবার মত অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া রাষ্ট্রের একটি গুরুতর কর্তব্য।

দুঃখের বিষয়, ভারতের আমলাতান্ত্রিক বিদেশী সরকার এই কর্তব্য স্বেচ্ছায় অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের শোষণ প্রবৃত্তি শাসকের সম্ভ্রমকে অবিরাম প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়া ইংরেজ রাজত্বে ভারতবাসী পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ক্রমেই হৃতস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গড়ে ৫০ লক্ষ হিসাবে লোক বাড়িতেছে, কিন্তু লোক যতই বাড়ুক, অসীম প্রাকৃতিক সম্পদশালিনী এই দেশে সুষ্ঠু কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী আর্থিক পুনর্গঠনের ব্যবস্থা হইলে বর্দ্ধিত জনসংখ্যা সমেত সমস্ত ভারতবাসীর স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন এমন কিছু কঠিন ব্যাপার হইত না।

সম্প্রতি প্যারিসে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংসদে ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ এইচ-জে-ভাবা ভারতবাসীর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং তজ্জন্য ব্রিটিশ শাসনের দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মিঃ ভাবা একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, কাজেই তাঁহার বিবৃতিতে সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব হৃদয়াবেগের তুলনায় অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। অধিবেশনে উপস্থিত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে বিদেশী শাসনের আমলে ভারতের লাঞ্ছনার এই বাস্তব চিত্র উদ্ঘাটনের প্রয়োজন ছিল সন্দেহ নাই।

মিঃ ভাবার বিবৃতিতে দেখা যায়, ভারতবর্ষের লোক গড়ে প্রত্যহ ১৭৫০ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্য খাইতে পায় এবং তাহাদের প্রত্যেকের ভাগ্যে গড়পড়তা জোটে মাত্র ৫০০ ইউনিট 'ক' ভিটামিন যুক্ত খাদ্য। গবেষকদের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, এই খাদ্যে কোন পূর্ণবয়স্ক লোক স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া বাঁচিতে পারে না। গবেষকদের মতে প্রতি লোকের গড়ে ৫০০০ ইউনিট 'ক' ভিটামিন যুক্ত খাদ্য এবং প্রত্যহ ৩০০০ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্য খাওয়া দরকার। বলা বাহুল্য, খাদ্যে খাদ্যপ্রাণের এই শোচনীয় অভাবের জন্যই ভারতবাসী ক্রমশঃ পাইকারী হারে দুর্ব্বল ও মৃত্যুমুখী হইতেছে।

সকলেই অবগত আছেন যে, গড়পড়তা কোন হিসাব ধরিলে জনসাধারণের অবস্থা সেই হিসাবের তুলনায় আরও খারাপ হইয়া থাকে, সমৃদ্ধ লোকেদের স্বাচ্ছন্দ্য সেই হিসাবে পৃথক করিয়া ধরা হয় না। এদিক হইতে মিঃ ভাবা যে গড়পড়তা ১৭৫০ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্য বা ৫০০ ইউনিট 'ক' ভিটামিনের কথা বলিয়াছেন, তাহাও লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভারতবাসীর ভাগ্যে জুটে না। সুতরাং উপরি-উক্ত হিসাব দেখিয়া ভারতবাসীর স্বাস্থ্যহানি যতটা অনুমান করা যায়, এই বিচিত্র অসম-ধনবণ্টন-সমন্বিত দেশের কয়েক কোটি দরিদ্র অধিবাসীর স্বাস্থ্য তদপেক্ষা অনেক দ্রুত নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

১৯৪৪ সালে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস প্রমুখ আটজন ভারতীয় শিল্পপতি ভারতের আর্থিক উন্নয়নের যে পরিকল্পনা (বোম্বাই পরিকল্পনা) রচনা করেন, তাহাতেও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভারতবাসীর স্বাস্থ্যহীনতার কথা তাঁহারা বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। এদেশের আবহাওয়া ও সর্ব্বনিম্ন প্রয়োজন হিসাব করিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ ভারতবাসীর দৈনিক গড়ে ২৬০০ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্য পাওয়া উচিত। নিম্নোক্ত খাদ্যাদিতে এইরূপ খাদ্যগুণ আছে :—

চাউল, গম প্রভৃতি ১৬ আউন্স; তৈল ইত্যাদি ১.৫ আউন্স; ডাল ৩ আউন্স; চিনি ২ আউন্স; শাকসব্জি ৬ আউন্স; ফল ২ আউন্স; দুধ ৮ আউন্স অথবা মাছ, মাংস ও ডিম ২.৩ আউন্স।

এই ২৬০০ ক্যালোরী ছাড়া তরকারীর খোসা ইত্যাদি অথবা রান্না ঘরে যে খাদ্যাংশ নষ্ট হইবে তাহা ২০০ ক্যালোরী ধরিয়া বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতারা জনপ্রতি দৈনিক ২৮০০ ক্যালোরীযুক্ত খাদ্যের অত্যাবশ্যকতার কথা বলিয়াছেন। যুদ্ধের আগের খাদ্য মূল্যের হিসাবে এক বৎসরের জন্য প্রত্যেক লোকের এই শ্রেণীর খাদ্যের মূল্য ৬৫ টাকা। এই সময়কার হিসাবে ভারতবাসীর মাথা পিছু বাৎসরিক আয় ছিল ৬৫ টাকা, কাজেই সাধারণের পক্ষে এইরূপ খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। বোম্বাই পরিকল্পনার রচয়িতাগণ অবশ্য জনসাধারণের মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ করিবার আশা প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা ছাড়া যে দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। রাষ্ট্র যদি বাস্তবিকই এমন ব্যবস্থা করিতে পারে যাহাতে ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় দ্বিগুণ হইয়া বৎসরে অন্ততঃ ১৩০ টাকা হয় (অবশ্য এই সঙ্গে পণ্যমূল্য যুদ্ধের আগের তুলনায় ঊর্দ্ধগামী হইলে চলিবে না), তাহা হইলেই বাদসাদ দিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণের শরীর রক্ষার মত খাদ্য সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি হইতে পারে।

মোটের উপর যুদ্ধোত্তর ব্যাপক কৃষি শিল্প-বাণিজ্য পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী না হইলে এবং দেশে যথেষ্ট পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত সার্ব্বজনীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হইলে ভারতবাসীর সুস্থ সবল হইয়া বাঁচিয়া থাকা কিছুতেই সম্ভব নহে। অথচ এই নিম্নতম প্রয়োজন মিটাইবার বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব একান্ত ভাবে ভারত সরকারের। এতদিন আমলাতান্ত্রিক বিদেশী সরকার ভারত শাসন করিয়াছেন, তাঁহাদের দিক হইতে ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার উদাসীনতা দুঃখের হইলেও স্বাভাবিক ছিল। এখন দ্রুতগতিতে ভারতের শাসনভার ভারতবাসীর হাতে আসিতেছে, জাতীয় সরকার একটু কায়েম হইলে এই গুরুতর সমস্যার সমাধানে তাঁহাদের আন্তরিকতার অভাব হইবে না বলিয়াই আমরা আশা করি। (২০-১২-৪৬)

(যাত্রা শুরু)

রাজস্থান ছিল আমাদের কৈশোরের স্বপ্ন, যৌবনের বিস্ময়। অল্পবয়সে যখন টডের 'রাজস্থান' পড়ি তখন কল্পনাও করিনি যে জীবনে কোনও দিন ঐ আরাবল্লী উপত্যকার পার্ব্বত্য মরুবক্ষে পদার্পণ করতে পারবো। মনে হ'ত—না জানি সে কতদূর কোন দুর্গম পথে, কত মরুকান্তার গিরিসঙ্কট পার হয়ে যেতে হয় ঐ দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত বীরেদের অজেয় জন্মভূমিতে।

যে দেশে আজও সূর্য্যবংশের মানুষেরা আছে, চন্দ্রবংশী লোকেরা বাস করে। কত ঝল্ল মল্লর মল্লভূমি, কত সিংহ রাও রাণা রাঠোরের বীরত্ব গৌরবে মণ্ডিত তীর্থক্ষেত্র।

স্কুলপাঠ্য ইতিহাস পড়ে তৃপ্তি হ'তনা। বীরবাদল, জয়মল্ল, হাম্মীর, পদ্মিনী, ভীমসিংহ, রাণা প্রতাপ আর ধাত্রী-পান্নার কাহিনী রাণা কুম্ভ ও মীরাবাঈ আমাদের অপরিণত মনকে উত্তেজিত করে তুলতো, জহরব্রতর কথা পড়ে দুই চোখ অশ্রুতে ভরে যেত। সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ, দুর্গেশ-নন্দিনী, রমেশচন্দ্রের রাজপুত জীবনসন্ধ্যা কল্পনায় আমাদের মনকে রাজপুতানার দুর্ভেদ্য দুর্গের রহস্যময় অভ্যন্তরে টেনে নিয়ে যেতো।

মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী', রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' রাজপুতানার প্রতি আমাদের মনটিকে শ্রদ্ধায় ভরে দিয়েছিল। গিরীশচন্দ্রের রাণা চণ্ড, দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, ক্ষীরোদপ্রসাদের পদ্মিনী প্রভৃতি নাট্য-কাব্য আমাদের চিত্তে চিতোর গড়ের সঙ্গে অম্বর জয়পুর যোধপুর আজমীর ও উদয়পুরের যে অভাবনীয় দেশাত্মবোধক নাটকীয় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল রাজপুতানার আকর্ষণ তাতে মনের মধ্যে অধিকতর দুর্দ্দার হয়ে উঠেছিল।

যদি কখনও সুযোগ পাই একবার রাজপুতানায় ঘুরে আসবোই—এ ছিল আমাদের বহুদিনের সংকল্প। বার বার বেরিয়েছি। হিমাচল থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতের দিক দিগন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমনিই দুর্ভাগ্য যে আশে পাশে কাছে পিঠে গিয়েও রাজপুতানার মধ্যে যাওয়া আর কিছুতেই ঘটে ওঠেনি।

৺পূজার কিছুদিন আগে থেকেই এবার রাজপুতানায় যাবার জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছিল। শহরের দাঙ্গা-হাঙ্গাম একটু ঠাণ্ডা হ'তেই আমরা বেরিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি দেখে হিতাকাঙ্খী ও শুভার্থী বন্ধুরা বার বার নিষেধ করতে লাগলেন। এ সময় বাইরে যেয়ো না। দেশের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। ভারতব্যাপী একটা সাম্প্রদায়িক বিরোধের আগুন জ্বলে ওঠা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এ সংশ

যে আমাদের মনেও ছিল না তা নয়, তবে আমরা এই ভেবে নিঃশঙ্কচিত্তে যাত্রা করছিলুম যে, রাজস্থানে আর যাই হোক, লীগ ও আমলাতন্ত্রের সর্ব্বনাশা ষড়যন্ত্রের সুযোগ নেই। ব্রিটীশ ভারতে যে কূট চক্রান্ত কালকূটের চেয়েও বিষাক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে দেশীয় নৃপতিগণের সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে তা প্রবেশ করতে পারেনি এখনও!

রাজস্থানের আকর্ষণ তখন আমাদের কাছে দুর্নিবার হয়ে উঠেছে। কোনও বাধাই আমরা আর মানতে রাজী নই। আমাদের সমস্ত মনটি আচ্ছন্ন ক'রে তখন ভারতের অতীত গৌরবগাথার গুঞ্জনধ্বনি ঝঙ্কৃত হ'তে শুরু হয়েছে—

"তব সঞ্চার শুনেছি আমার
মর্ম্মের মাঝখানে;
কত দিবসের কত সঞ্চয়
রেখে যাও মোর প্রাণে।
* * *
তুমি জীবনের পাতায় পাতায়
অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ
মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হ'য়ে রও।
ভাষা দাও তারে, হে মুনি অতীত
কথা কও, কথা কও॥"

কোজাগরী পূর্ণিমার পরই শ্রীদুর্গা স্মরণ করে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। রিজার্ভ কম্পার্টমেণ্ট পেতে দু'চার দিন দেরী হ'ল। যেদিন পেলুম সেদিন আবার বৃহস্পতিবার বারবেলা সংক্রান্তি! কোনও নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারই এ হেন দিনে সুদূর প্রবাসে যাত্রা করতে সাহসী হ'ত না। এত আর নৈহাটী বা শ্রীরামপুর যাওয়া নয়। চলেছি একেবারে ১২১৬ মাইল দূরে। যাত্রী ছিলুম—আমরা দু'জন, আমাদের মেয়েটি, প্রতিবেশী একটি বান্ধবী এবং আমাদের অন্তরঙ্গ এক বন্ধু পুত্র। সঙ্গে এসেছিল একাধারে পরিচারক ও সুপকার শ্রীমান ভোলানাথ। আমরা এই ছ'জনে দিল্লী-এক্সপ্রেসে রওনা হলুম। দিল্লী-এক্সপ্রেস ছাড়বে রাত্রি ৯-২০ মিনিট—কিন্তু বাড়ী থেকে বেরুতে হয়েছিল আমাদের ৭॥টার মধ্যেই। কারণ কলকাতা শহরে তখনও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জের টেনে 'কারফিউ অর্ডার' চলেছে। হাওড়ায় যে গাড়ী যাবে তাকে আবার বালীগঞ্জে ফিরতে হ'লে ৭টার মধ্যে যাওয়া চাই, নইলে 'কারফিউ' শুরু হবার আগে সে ফিরতে পারবে না। অনেক চেষ্টা করেও দিল্লী-মেলে রিজার্ভেশান পাওয়া যায়নি। দিল্লী-মেল নাকি একসপ্তাহ পর্য্যন্ত অগ্রিম 'বুকড্' হয়ে আছে।

'মা আমায় ঘু'রাবি কত'—না, 'মা আমায় ছ'জনায় পথ দেখায় ছ'দিকে—! কবি রামপ্রসাদের এ দুরবস্থায় যে আমাদের পড়তে হয়নি এজন্য

আমরা ক'জনা যাত্রী
ডাইনে থেকে :—শ্রীমতী, বান্ধবী, নিজে, মেয়েটি। (বন্ধুপুত্রটিকে দেখা যাচ্ছে না, কারণ, প্লাটফর্মে নেমে ছবি তুলেছেন তিনিই)

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কারণ, পাঁজি মেনে চলবার মতো পাজি লোক আমরা নই। বান্ধবী বললেন, আপনারা যদি বৃহস্পতিবার বারবেলা সংক্রান্তি মাথায় নিয়ে বেরুতে পারেন, আমি ঝাড়া হাত-পা মানুষ—আমি পারবো না কেন?

বন্ধুপুত্রটি ব্রাহ্মণ কুমার। একটু পাঁজি পুথির পক্ষপাতি এবং দিনক্ষণ মেনে চলার ব্রাহ্মণ-সুলভ দুর্ব্বলতাটুকু ষোল-আনাই তাঁর মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে, তাই আমরা প্রায় একরকম স্থির করেই ফেলেছিলুম যে তার পক্ষে এহেন কুদিনে আমাদের সঙ্গে যাওয়া অসম্ভব! ওর টিকিটখানা বোধ হয়, রিফাণ্ড নিতে হবে।

কিন্তু যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় বাবাজী অত্যন্ত উৎফুল্ল মুখে একখানি পাঁজি হাতে করে এসে হাজির।

মহাউৎসাহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন এই দেখুন কাকাবাবু বৃহস্পতি-বার বারবেলা সংক্রান্তি হওয়া সত্ত্বেও রাত্রি ৭টার পর পূর্ব্ব দিক থেকে পশ্চিমে যাত্রা শুভ! আমাদের গাড়ীতো রাত্রি ৯টার পর ছাড়বে?—সুতরাং যেতে কোনও বাধা নেই! সাতটার পর বেরুলেই হবে।

অতএব যাত্রায় আর পৃথক ফল হল না! অবিচ্ছিন্ন ষড়রিপুর মতো আমরা ছ' রকমের ছ'জনমানুষ এক-গাড়ীতেই উঠে পড়লুম।

সারারাত আমরা গাড়ীতে নির্ব্বিঘ্নে ঘুমিয়ে পরের দিনটিও খবরের কাগজ পড়ে বইয়ের পাতা উল্টে হাসি খেলায় ও গাল গল্পে এবং মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়ে—কাটিয়ে দেওয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। ট্রেণের কামরার জানালা দিয়ে বাহিরে ঘন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু চখে পড়ে না। কামরার আলোর ছটায় যেটুকু মাত্র দৃশ্যমান হচ্ছে তা আলো-আঁধারের আবছায়ার মধ্যে ক্ষণিক চমক দিয়ে গাড়ীর দ্রুতগতির সঙ্গে মিলিয়ে যাচ্ছে। রাত্রির স্তব্ধতা যেন সকলেরই মনের মধ্যে নেমে এসেছে। ট্রেণের কামরার মধ্যে আমরা তার অস্তিত্ব যেন বেশী করেই অনুভব করছিলুম।

টুণ্ডলা আর কতদূর? 'ব্রড্‌সা' খানা খুলে দেখা গেল গাড়ী সেখানে পৌছবে রাত্রি প্রায় ১ টায়! এইখানে নেমে আমাদের আগ্রার জন্য গাড়ী বদল করতে হবে। আমরা সবাই তখন নামবার জন্য উন্মুখ। চব্বিশ ঘণ্টা ত' গাড়াতেই কাটলো। আর ভাল লাগছে না।

কানপুরে নৈশ ভোজন সেরে গাড়ীতে পাতা আমাদের বিছানা ও ছড়ানো জিনিসপত্র শ্রীমান ভোলার সাহায্যে গুছিয়ে বেঁধে ফেলা হল। রাত্রি তখন দশটা বাজে, নবনীতা এবার ঘুমোবার জন্য ব্যস্ত হল। বিছানা বাঁধা হয়ে গেছে। তারই ব্যবহারের জন্য বাইরে রাখা একখানা শয্যা আচ্ছা-দনীর (সুজ্‌নি!) উপর তাকে শুতে বলা হ'ল। সেটা তার পছন্দ হল না। লেপ চায় সে? তার মা গেলেন রেগে। দিলেন বসিয়ে দু'ঘা। মেয়েছেলের পক্ষে না কি অত আয়েসী হওয়া ভাল নয়!

অগত্যা আমি গেলুম মেয়েকে ভুলিয়ে ঘুম পাড়াবার জন্য। কিন্তু মেয়ে ঘুমোবার সঙ্গে সঙ্গেই অথবা হয়ত একটু আগেই আমি নিজেই পড়লুম ঘুমিয়ে।

আমি কখনো সঙ্গোপনে নিদ্রা যেতে পারি নি। যখনই ঘুমোই সকলকে জাগিয়ে সশব্দে সুপ্তিমগ্ন হই! অর্থাৎ—আমার নাক ডাকে!

'টুণ্ডলা! টুণ্ডলা!'

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। ওঁরা দেখি ততক্ষণে কুলি ডেকে জিনিসপত্র নামাতে সুরু করে দিয়েছেন। নিদ্রিতা কন্যাকে ভোলানাথ সেই বেডকভার জড়িয়েই নামিয়ে নিয়ে এলো। কলকাতা থেকে গুণে সঙ্গে নিয়ে আসা—২২টী লগেজ ঠিক নেমেছে কিনা কুলিদের সংযোগিতায় আমি যখন সেগুলো গুণে দেখছি, টিকিট কালেক্টার এসে বললেন—Ticket please!

বোধ হয় সঙ্গে অত মালপত্র দেখে তার একটু বাণিজ্য করবার লোভ হয়েছিল। কারণ, তারপরই বিশুদ্ধ মাতৃ-ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন—"ইয়ে সবকিছু সামান কেয়া আপ্‌কোহি হায়? মাল ওজন হুয়া?"

'জরুর!' বলে আমি তার নাকের উপর টিকিটগুলো বার করে দেখাবার জন্য পকেট হাত্‌ড়ে দেখি—সর্ব্বনাশ! ব্যাগ ত' নেই! আমার মণিব্যাগের মধ্যে সকলেরই টিকিট ছিল, পথ খরচের টাকাও ছিল অনেকগুলো, কিছু ভাঙানো রেজকী বা খুচরা টাকা পয়সাও ছিল। আমার কোনও পকেটেই ব্যাগটা খুঁজে না পেয়ে আমার তো মুখ উঠলো শুকিয়ে। রাজপুতানা ভ্রমণ বুঝি এইখানেই শেষ করতে হয়!

'আমি' আমার বন্ধু পুত্রটি এবং ভোলা, আমরা তিনজনে তিনটে টর্চ্চ নিয়ে গাড়ীর ভিতর ঢুকে তন্ন তন্ন করে চারি-পাশ খুঁজলাম, ভোলা চেঁচিয়ে উঠলো 'পেয়েছি বাবু?'—তাড়াতাড়ি ছুটে তার কাছে গিয়ে দেখি সেটা মণিব্যাগ নয়, আমার চশমার চামড়ার খাপটা!—হতাশ হলুম না। একটা হারানিধি যখন পাওয়া গেল তখন আর একটাও পাওয়া যেতে পারে। গাড়ীর গদী টদি পর্য্যন্ত তুলে ফেলে গাড়ীখানা তচনচ্‌ করে খোঁজা হল। ব্যাগ কোথাও পাওয়া গেল না! বাথরুমের ভিতরটাও বারকতক দেখা হল। মণিব্যাগের চিহ্ন নেই কোথাও?

এবার আমার কণ্ঠ তালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠলো। হতাশ হয়ে গাড়ী থেকে নামতেই দেখি শ্বেতাঙ্গ ষ্টেশান মাষ্টার গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। টিকিট-কলেক্টার তাঁর কাছে

অভিযোগ করছে—'এই ভদ্রলোকটি খুব সম্ভব বিনা টিকিটেই হাওড়া থেকে এসেছেন—সেকেণ্ড ক্লাশে ফ্যামিলি নিয়ে।

ষ্টেশান মাষ্টারটি ভদ্র, তিনি সবিনয়ে আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করলেন; আমি তাঁকে ব্যাপারটা সব বুঝিয়ে বলায় তিনি তখন আমার টর্চ্চটা নিয়ে গাড়ীতে উঠে নিজে একবার খুঁজে দেখতে গেলেন। নেমে এলেন আমাদের পাঁচখানা বার্থ রিজার্ভের লেবেল খুলে নিয়ে। বললেন সম্ভবতঃ আপনার—মণিব্যাগ পকেট থেকে কোথাও পড়ে গেছে—টর্চ্চ জেলে প্ল্যাটফর্মের ধারে ও গাড়ীর তলায় খুঁজে দেখলেন তিনি। বললেন—রেলওয়ে পুলিশকে খবর দিন, টিকিট সমেত মণিব্যাগ চুরি গেছে বলে। আমাদের মালপত্র সব মাথায় নিয়ে ও হাতে ঝুলিয়ে ৭টা কুলি তখন তাড়া দিচ্ছে—চলিয়ে হুজুর! আগ্রা যানেওয়ালা গাড়ীকা টাইম হো গিয়া, উয়োত' আভি ছুট্ যায়গা!—

দুত্তোর! আগ্রা যানেওয়ালা গাড়ী! আমার তখন প্রাণ ছুট্ যাতা হায়!—

স্টেশন-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করলুম—আমরা কি এ অবস্থায় আর অগ্রসর হ'তে পারবো না?

তিনি দুঃখিত হয়ে বললেন—না। পুনরায় টিকিট না কিনলে আর যেতে পারবেন না। তবে আজ রাত্রিটুকু যদি ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে কাটান, কাল আমি ফেয়ার্লি প্লেসে বা হাওড়ায় ফোন করে আপনাদের টিকিটের নম্বর গুলো আনিয়ে 'দোকর' টিকিট দিতে পারবো। টিকিটের নম্বরগুলো আপনারা নিশ্চয়ই দিতে পারবেন না, কারণ আমি জানি, ভারতীয়রা কিছুতেই টিকিটের নম্বরটা পকেটবইয়ে টুকে রাখতে চান না, অথচ টিকিট হারান তাঁরাই সবচেয়ে বেশী। টিকিটের নম্বরগুলো পেলে আমি এখনি যাবার ব্যবস্থা করতে পারতুম।

শ্রীমতী বললেন—আমার পকেটবইয়ে সমস্ত টিকিটের নম্বর টোকা আছে, আমি আপনাকে এখনি দিচ্ছি।

কুলিরা হাঁকলে—"বাবু! থার্ড বেল হো চুকা!" এমন সময় বান্ধবী ও ভোলানাথ উল্লাসে চীৎকার করে উঠলেন—'ব্যাগ পাওয়া গেছে!'

কুলিদের কর্কশ হাঁকডাকে কন্যারত্নর সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় তিনি ইতিমধ্যে উঠে পড়েছিলেন। যে সুজনী খানা সমেত তাকে জড়িয়ে ট্রেণ থেকে নামিয়ে আনা হ'য়েছিল মণিব্যাগ আবিষ্কৃত হল তারই মধ্যে! মেয়ে বল'লে, বাবার পকেট থেকে ব্যাগটা বেরিয়ে পড়ছে দেখে আমি নিয়ে রেখেছিলুম্—পাছে হারিয়ে যায় বলে! বাবা তখন ঘুমিয়ে পড়েছেন যে! বুঝলুম—মেয়েকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে আগে ঘুমিয়ে ছিলুম আমিই!

ব্যাগটা ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে খুলে দেখি টিকিট ও টাকা ঠিকই আছে—"কুলি!...উঠাও ভোলা!...চালাও! চালাও!"—

উর্দ্ধশ্বাসে আগ্রার গাড়ী ধরবার জন্য অগ্রসর হওয়া গেল।

ক্রমশঃ

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট

যে বাড়ীর এবং যে পরিবারের ছেলেই হোক্ না প্রদ্যুম্ন, সে তরুণ। আধুনিক আবহাওয়া ও বাহির বিশ্বের স্বাধীনতা তারও মনকে দোলা দিয়ে যায়। চারিদিকে অবাধ মেলামেশা, আলো হাসি ও মুক্ত জীবনের বিকাশ, কিন্তু বাড়ীর বহিরঙ্গনে পর্য্যন্ত সে রঙ্গের কোন অন্তরঙ্গ প্রকাশ অসম্ভব। নববিবাহিত দম্পতির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ গভীর ও গোপন খাদে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতই বয়ে যাক্, কিন্তু কখনো যেন পরে উপচিয়ে চারদিকে না ছিটকিয়ে পড়ে; সহজ হাসিতে উচ্চ উচ্ছ্বাসে যেন প্রকাশ না পায়। মোক্ষদাসুন্দরীর রাজত্বে আদিরস একঘরে হয়ে আছে—শব্দগত ও অর্থগত উভয়ভাবেই। শেষের কবিতার অমিত কেতকীর মত নৈনিতালে ত'

শুধু দুজনে মধুচন্দ্র যাপনে যাওয়া চলবে না। যদি পূজার ছুটীতে বাইরে যেতে হয় ত বড় জোর ঝাঁঝার রোদে ঝাঁঝাঁ করা রসহীন প্রান্তর পর্য্যন্তই দৌড়। পুরী বা দেওঘর হলেই আরো ভাল হয়, কারণ তীর্থধর্ম্মটাও ওই একই সঙ্গে সেরে নেওয়া যায়।

তাও যে যুগল-বিহারের কোন সম্ভাবনা থাকবে কোন-দিন তেমন আশা নেই। বউ হচ্ছে বাড়ীর আসবাব, কর্ত্রীর সম্পত্তি; অবশ্য ছেলের সঙ্গেই বিয়েটা হয়েছে; কিন্তু আগে সে শাশুড়ীর বউ, পরে ছেলের স্ত্রী। কাজেই কলকাতার বাইরে এলেও ভাগ্য ঠন্ ঠন্। কারণ লণ্ঠন প্রশেসন আরম্ভ হয় সন্ধ্যাবেলা। সারা দুপুরের গা

লণ্ঠন প্রশেসন

গড়ানর জেরের চোটে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যায় এসে যখন ঠেকবে, তখন গুটিকতক সচল শাড়ী সমভিব্যাহারে বের হবেন মোক্ষদাসুন্দরী তাঁর অভিযানে। একপাশে পুত্রবধূ ও পিসির কন্যা প্রভৃতি, অপর পাশে পান দোক্তার কৌটা-বাহিনী দাঁতে মিসিমাখা ঝির দল, আর সামনে পিছনে লাঠি লণ্ঠন হাতে মিশির দারোয়ানের কুচকাওয়াজ। হায় কোথায় সে কাদম্বরী কাব্যের মেঘডম্বুর শাড়ীপরা তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পত্রলেখা, কোথায় বা রোম্যান্সের পুলক রোমাঞ্চ। হায় বসন্ত! কোথায় তোমার রঙীণ বসন প্রান্ত?

মোট কথা তরুণ ধর্ম্মে নর্ম্মসহচরীর স্থান এ বাড়ীতে নেই।

রবি ঠাকুর বাঙ্গালীর মাথা একেবারে খেয়েছেন। তাঁর গান শুনেছে প্রদ্যুম—

'সবুজ সায়রে সাগর কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে'

আর মনে এঁকে গেছে ড্যাফোডিল ফুলে ছাওয়া ইংলণ্ডের স্নিগ্ধ সবুজ প্রান্তরের রঙে ছাপান শাড়ী। তার পাড় বিরল সুষমতা সুরধুনীর গৌর বরতনু ঘিরে তাকে বনলক্ষ্মীর রূপ দেবে। সেই বিশেষ সন্ধ্যায় তাকে নাম দিবে শকুন্তলা। আনত কুন্তল তার আনিতম্ব এলিয়ে মুখ ও দেহটীর প্রচ্ছদপট রচনা করচে। বাহুলতায় থাকবে না কোন আভরণ, শুধু এক মণিবন্ধে একটী সরু সোনার রুলী—ব্যগ্র বাহুর আবাহনকে রূপ দেবার জন্য; অপর মণিবন্ধে থাকতে পারে মাণিক্যখচিত একটী ঘড়ি। না থাকাই অবশ্য শ্রেয়, কারণ আজ সন্ধ্যার সময় যেন গতিহীন হয়ে আটকিয়ে যায় সায়াহ্নের অস্তরাগের মধ্যে। মুখমণ্ডলে থাকবে না কোন অলঙ্কার, কেবল দুটী কানে দুলবে দুটী দুল—লাল চুনী বসানো, মনে মনে বা কানে কানে বলে যাওয়া অনুরাগের দুটী রূপায়িত ছবি। পায়ে সাজবে না চরণপদ্ম, নূপুর বাজবে না রিণি ঝিণি রিণি ঝিণি করে আগমন ধ্বনি চারিদিকে জানিয়ে। গোপন চরণে স্বপন চারিণী উষার মত নীরব মোহে সুরধুনী আসবে; সে আসার সুর ধ্বনি তুলবে মনে, প্রবাহ জাগাবে যৌবনে। ফুলশয্যায় ত ফুলসজ্জার বা প্রসাধনের কোন প্রয়োজন নেই। মনসিজের মানস সাজেই ত আজ সম্পূর্ণ সব।

কিন্তু ফুলশয্যার রাতে তার তারুণ্যের স্বপ্ন কি রকম রূপ পেয়েছিল তা সে ভুলবে না। সুসজ্জিত কক্ষের চারদিকে নেপথ্যে অন্তরালে প্রতীক্ষা করছে প্রতিবেশিনী ও আত্মীয়ার দল। নবজীবন নৃত্যের প্রথম নূপুর ধ্বনি শুনবার জন্য উৎসুক সবাই। অন্য দম্পতির উৎসবের কয়েকটী ঢেউ হয় ত মনে স্মৃতি প্রবাহ, বক্ষে যৌবন-চঞ্চলতা জাগাবে। তাদের প্রথম প্রণয়লীলার ভেসে আসা আভাসের জন্য এরা তাই এত লালায়িত।

লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে উঠছি এ কথা ভেবে, কিন্তু কথাটা মানতেই হবে যে এ সংসারে সকলেই কবি। যে নয় বলে মনে করে, সেও একরাত্রির জন্য স্পর্শমণির স্পর্শ অনুভব না করে পারে না। আর প্রদ্যুম্নের সামনে বিশ্বের প্রেমসাহিত্যের ভাণ্ডার ত উন্মুক্তই ছিল। সে ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হয়ে সৃষ্টির প্রথম যুগ পর্য্যন্ত ফিরে যাচ্ছে—যে পরম

বিস্ময়ে নর প্রথম নারীকে দেখেছিল, যে বিশ্বনারী কাল-প্রবাহে ভাসতে ভাসতে আজ বিশেষ করে তারই জন্ম নববধূর রূপ ধারণ করে এসেছে, যে অনন্তকালের কিশোরী তাকে পাবার জন্ম নদীপ্রান্তে নিরালা প্রান্তরে একান্তে এসে শিবপূজা করত, সে সব কিছুরই কথা তার মনের ভাবনাকে এলোমেলো করে দিচ্ছে। সন্ধ্যা কখন রাত্রিতে এসে মিশে গেছে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে-পড়া তার আবাল্য অভ্যাস কিন্তু আজ এ কী আনন্দ! এ কী জাগরণ! অনবকাশের উজান ঠেলে আসা দুর্লভ এ রাত্রিটার জন্মই যেন সে এতদিন অপেক্ষা করে এসেছে। এই রাত্রিটী তার সকল সামান্যতা-পূর্ণ বন্ধুরতাময় পুস্তকবেষ্টিত দিনগুলিকে ভবিষ্যতে নব বর্ণ-সুষমায় ভরে তুলবে। শুভ রাত্রির অনিমেষ প্রহরী বিনিদ্র প্রেমকে সে মনে মনে সাক্ষী মানছে। নিশীথ রাত্রির কানে কানে সে শুনিয়ে দিচ্ছে—যুগে যুগে যে নববধূর গলায় মালা দুলছে তাতে আজ আমি আরো একটী কুসুম যোগ করে দিয়ে যাব।

সমস্ত দিন মনে মনে যাকে সে পুষ্পমাল্যে সাজিয়েছে, অন্ধকারের বিপুল আশায় উন্মুখ তারাগুলি দেখে সে তারই কথা ভাবছে। দিবসের যে আলোকরেখা নিশীথের আঁধার স্রোতে মিলিয়ে গিয়েছিল, এখন সহস্র সূর্য্যের দীপ্তি নিয়ে তা একজনকে আলোকিত করে তুলবে। প্রদ্যুম্ন ভাবছে যে এ প্রতীক্ষার ভার অসহ হয়ে উঠেছে। তার চেয়ে পরিপূর্ণ প্রেমে যে এখনি প্রকাশ হবে, সে কমলকলিকার মত তাকে আপন কুসুমকোরকে আবৃত করে মুদে যাক্।

অপেক্ষা করে করে রাত্রি গভীর হয়ে এল। যখনি নিজের মনের ভাষার স্রোত বন্ধ হয়ে আসে, অন্যের ভাষা অন্যের ভাব কেমন করে নিজের হয়ে এসে সে স্রোতকে বহিয়ে নিয়ে চলে। টেরও পাওয়া যায় না কোথায় আমি সারা হলাম, আর কোথায় কবি সুরু হল। প্রদ্যুম্নেরও ধীরে ধীরে তাই হল। নীহারিকার লেখা কবিতা তার মনের ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে লাগল অসহ অপেক্ষার পটভূমিকায়।

তোমারে প্রতীক্ষা করি দিনান্ত বেলায়
পশ্চিমের আভা স্বর্ণচ্ছায়
যবে গড়ে রক্তরাগে আপনারে মেলি'
পূরবের সেতু, দীর্ঘচ্ছায়া ফেলি'
সন্ধ্যা যবে আসে ধীরে
আঁখি সিক্ত নীরে
পবশি' সাগর বারি অসীম রোদনে।
অন্তরের নিভৃত বোধনে
সমাহিত শান্তি ধীর মৌন ব্যাকুলতা
এতটুকু কহে না ত কথা,
ভাঙ্গে না রাত্রির
গভীর নীরব বাধা, মিলন যাত্রীর
গোপন কাহিনীটুকু ; উদ্বেলিয়া তম
রাত্রি শেষে যেথা স্বপ্ন সম
মিশে যায় পূবব দুয়ারে
সেথা মৌনতারে
লইযাছি বরি'
চিরসন্ধ্যা হ'তে উষা প্রতীক্ষায় ভরি'

কিন্তু বহু প্রতীক্ষার রাত্রিতে ফুলশয্যায় যে অবশেষে এসেছিল তাকে বনানী বলা চলে, বনলক্ষ্মী নয়। কুঞ্চিত কেশদামের শোভা দেখাই গেল না সিঁথিমৌর চন্দ্রহাস প্রভৃতি শোভিত অর্দ্ধোদ্ধত অবগুণ্ঠনের অন্তরালে। কোথায় গেল নববধূর সুচারু সুডৌল মুখখানি। এত শুধু বেনারসীর গর্ব্বোজ্জ্বল সুবর্ণপ্রান্তসজ্জিত চন্দনচর্চ্চিত কুণ্ডল কর্ণফুল-খচিত একটী মুদিত পদ্ম। কোথায় তার প্রিয় সম্ভাষণ ব্যাকুল বাসনাউজ্জ্বল তরঙ্গময় আবির্ভাব ; এ যে শুধু আলম্বিত স্বর্ণহার মুক্তালহরীশোভিত রত্নাচ্ছন্ন একটী অভি-জাত উপস্থিতি। বস্ত্র বাহুল্যে আভরণের আবরণে ব্রীড়াবনতা একটী বনানী, এ যেন শাখা প্রশাখা পত্রাচ্ছন্ন রসাল তরু, কালিদাসের 'আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাম্
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্'

সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা নয়। এ মূর্ত্তি বধূ হতে পারে, বঁধু নয় ; মানসী নয়, মানবীও সবটা যেন নয়।

ক্রমশঃ

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১১

পরদিন যখন আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন তরুণ সূর্য্যালোক গবাক্ষ পথে আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার কতকটা আমার শয্যায়, আর কতকটা আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া গবাক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং বাহিরের উদ্যানের দিকে চাহিয়া দেখিলাম যদি গত-রাত্রের দুর্বৃত্তদিগের কীর্ত্তির কোনও নিদর্শন দেখিতে পাই।—কিন্তু কোনও চিহ্নই দৃষ্টি গোচর হইল না। কেবল দেখিলাম সেই মাধবী প্রভাতের তরুণ উজ্জ্বল সৌর-করে সকল ধরণী প্রোদ্ভাসিত। গত রাত্রের ঘটনা একটা দুঃস্বপ্নের মত প্রতিভাত হইতে লাগিল।

কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলাম। পিতার মুখে শুনিলাম দস্যুরা তৃতীয়বার আর আসে নাই। পিতা একথা বলিবার পূর্ব্বেই আমি তাহা বুঝিয়াছিলাম—কারণ তাহারা ফিরিলে তাহাদের কোলাহলে এমন সুনিদ্রা সম্ভোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। উহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে চায়। হয়ত পাপিষ্ঠরা আমাকে লইয়া গিয়া অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিবে। এরূপ ত ইহারা অনেককেই করিয়াছে। আমাকেও কি সেইরূপে হত্যা করিবার মানস করিয়াছে? কিন্তু যদি মরিতে হয়, বীরের মত মরিব। দেহে যতক্ষণ এক বিন্দু রক্ত থাকিবে ততক্ষণ অত্যাচার ও নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইব। ধরিতে আমাকে পারিবে না—যবন! বৃথা প্রয়াস।

প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আমরা সকলে অর্থাৎ পিতা, পালক, প্রজ্ঞা ও আমি একত্রিত হইয়া গত রাত্রের কথা পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আপাততঃ আমাদিগের কি কর্ত্তব্য এবং ভবিষ্যতে এরূপ ব্যাপারের প্রতিরোধ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তাহার বিচার-বিবেচনায় ও তাহার সমাধানে ব্যাপৃত হইলাম। ঘটনা স্রোত কোন প্রণালী দিয়া যে কোন দিকে প্রবাহিত হইতেছে তাহা আততায়ীদিগের কথায় আমরা অনেকটা সুনিশ্চিয় রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। ক্ষত্রপ-শ্যালক নগরপালের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া যে এই দস্যুতা ও নির্য্যাতনের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা তাহাদের প্রেরিত দস্যুগণের পরস্পরের কথা-বার্ত্তায় প্রমাণিত হইয়াছে। হয়ত এই ব্যাপার এইখানে শেষ না হইতেও পারে। হয়ত ইহারা আমাদিগকে এইরূপে উত্যক্ত করিয়া অবশেষে বাধ্য করিবে—উহাদিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে অস্ত্র ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে এবং বিদ্রোহী প্রমাণ করিয়া পরে উহারা আমাদিগকে উৎখাত ও বিনাশ করিবার চেষ্টা করিবে। আপাততঃ সেই দণ্ডনীতির সাহায্য না লইয়া—ক্ষত্রপের দৃষ্টির অন্তরালে—আমাদিগকে গোপনে নষ্ট করিয়া ক্ষত্রপশ্যালক আপনার প্রতিশোধ-পিপাসা যদি পরিতৃপ্ত করিতে পারেন—তাহারই চেষ্টা হইতেছে। এখন ক্ষত্রপের নিকট আবেদনে কি কিছু ফল হইবে? তিনি শ্যালকের বিরুদ্ধে কি আমাদের আবেদন গ্রহণ করিবেন? না আমাদের প্রতি তিনি সুবিচার করিবেন। এরূপ আশা করা কি যুক্তিসিদ্ধ হইবে? আমাদের মধ্যে এই সকল কথা আলোচনা হইতেছে এমন সময়ে পূজ্যপাদ মহাস্থবির আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা সকলে তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলাম। তিনি আসন গ্রহণ করিলে তাঁহার অনুমতিক্রমে আমরাও উপবেশন করিলাম।

আর্য্য মহাস্থবির রাত্রের ঘটনাসমূহের কথা শুনিলেন—শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি

বলিলেন, "আর্য্য শ্বমভদত্ত, আমি গতকল্যই শোভাযাত্রার পর শুনিয়াছিলাম যে তোমাকে ও দেবদত্তকে একটা বিষম বিপদে ফেলিবার চক্রান্ত হইতেছে। আমি এই সংবাদ পাইয়াই তোমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। এই ষড়যন্ত্র এখন আরও একটু ব্যাপক হইয়া আর্য্যপালক ও প্রজ্ঞাবর্দ্ধনের বিরুদ্ধেও চালিত হইয়াছে। গতরাত্রের ঘটনার অনেকটা ইতিপূর্ব্বেই আমার কর্ণে আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। অদ্য প্রাতে এই কতক্ষণ পূর্ব্বে সংবাদ পাইলাম যে অদ্যই তোমাদিগকে ক্ষত্রপের শাসনসভায় রাজদ্রোহী বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। হয়ত অদ্য রাত্রেই তোমাদিগকে ধৃত করিয়া ক্ষত্রপ-সভায় উপস্থাপিত করিবার আদেশ হইবে। তাহারা আপনাদিগের দস্যু-বৃত্তির কথা গোপন করিয়া চারি জন যবন নগররক্ষীর হত্যাপরাধ তোমাদিগের উপর আরোপ করিতেছে।"

—কিরূপে আর্য্য ?

—মিথ্যার কি আবার কিরূপ আছে ? নগরপাল বিবৃতি দিতেছে যে ক্ষত্রপশ্যালক দেবদত্ত কর্ত্তৃক অকারণে লাঞ্ছিত হইবার পর ঘটনার স্বরূপ জানিবার জন্য নগরপাল জনকয়েক নগররক্ষী প্রহরীকে পাঠাইয়াছিল এবং তাহাদের নির্দ্দেশ দিয়াছিল যে তাহারা যেন দেবদত্তকে নগরের শান্তিভঙ্গের অপরাধে তাহার নিকট উপস্থাপিত করে। দেবদত্ত তাহাদের মধ্যে চারি জন রক্ষীকে হত্যা করিয়াছে।

—কিন্তু ইহা সে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাহা কি প্রমাণ করা যায় না ?

—কে করিবে ? নগরপাল যবন, যবনের কথা, যবনের বিচার-সভায়, যবন বিচারকগণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে।—কে তাহা মিথ্যা প্রমাণ করিবে ?

সকলে কিছুক্ষণ মৌন রহিলেন।

আমি বলিলাম, "আর্য্য, আপনি নিশ্চিন্ত হউন—যবন আমাকে জীবিত ধরিতে পারিবে না।"

—কিন্তু দেবদত্ত, তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, তোমার জীবনের উপর এখন তোমার আর কোনও অধিকার নাই। বৃথা তুমি তোমার জীবনকে নষ্ট করিতে পারিবে না। তুমি আজ আমাদের মহাব্রতের প্রতীক। তাই আমি আজ প্রাতে, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তোমাকে এই সকল সংবাদ দিতে আসিয়াছি। এখন বোধ হয় এখান হইতে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তোমার প্রচ্ছন্নভাবে স্থানান্তরে গমন করাই শ্রেয়ঃ।

—না আর্য্য, ক্ষমা করিবেন। এরূপ ভাবে আমাকে পলাইতে আদেশ করিবেন না। গোপনে আমি পলাইতে পারিব না।

—তবে কি করিবে ? ধরা দিবে ? কিন্তু মুক্তির আশা অতি বিরল। তুমি যে নির্য্যাতিত ও তোমার যে কোনও অপরাধ নাই তাহা তুমি সপ্রমাণ করিতে পারিবে না। রাজদ্রোহীর শাস্তি কি তাহা জান ?—আর—আর—তোমার সহিত আমাদের সকল আশা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

—আমি ধরা দিব না, আর্য্য !—কিন্তু আমি ওরূপ ভাবে পলাইব না।—আমি উহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া উহাদের সম্মুখ হইতেই পলায়ন করিব—আমাকে ধরিবার সাধ্য উহাদের নাই।—আর আমি যদি ওরূপ গোপনে পলায়ন করি, তাহা হইলে যবনেরা আমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিবে। আমি যদি উহাদের সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাই—সে আমি নিশ্চয়ই পারিব—তাহা হইলে সে অত্যাচার আর কাহারও উপর না হইতেও পারে। তাহারা জানিবে যে আমি তাহাদের নিকট হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া পলাইয়াছি—আমাকে কেহ লুকাইয়া রাখে নাই।

—কিন্তু পলাইতে তুমি পারিবে কি ?

—নিশ্চয়ই পারিব—আপনারা নিশ্চিন্ত হউন।

—বেশ—তাহাই করিও বৎস। যেরূপ তোমার বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত হয় সেইরূপই করিও—আমরা ত এখন তোমারই আজ্ঞাবহ।

আর্য্য মহাস্থবির উঠিলেন, আমরা তাঁহার সহিত দ্বার অবধি গমন করিলাম। তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আমরা ফিরিয়া আসিয়া অনাগত বিষাদের নিরাকরণ বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলাম।

যতক্ষণ মহাস্থবিরের সহিত আমার কথোপকথন হইতেছিল, ততক্ষণ পিতা নীরব ছিলেন। তাহার পর যখন মহাস্থবির বিদায় গ্রহণ করিলেন তখনও তিনি কোনও

কথা বলেন নাই। আমরা যখন সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলাম তখন পিতা চিন্তিতভাবে আমাদিগকে বলিলেন, "আর অপব্যয়ের সময় নাই। এখন আমাদের গৃহরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পালক, ভাই, তোমার সাহায্য পাইব কি?"

—নিশ্চয়ই—সে কথা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়?

—ইহার ফল কি হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ?

—হাঁ, দেখিয়াছি—আমি শিশু নহি।

আর্য্যপালক বড় কম কথা কহিয়া থাকেন। শস্ত্র বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। প্রজ্ঞাও তাঁহার পিতার নিকট এ বিষয়ে সম্যক্ শিক্ষালাভ করিয়াছিল। আর্য্যপালক পিতার সতীর্থ ছিলেন এবং উভয়ে একই গুরুর নিকটে অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। আমরা সকলে গৃহরক্ষার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আর্য্যপালকের গৃহ সংরক্ষণের উপায়ও অবলম্বিত হইল। উভয় গৃহের ভৃত্যদিগকে সশস্ত্র করিয়া রাখিলাম এবং আমরাও সশস্ত্র হইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত অবস্থান করিতে লাগিলাম।

দিনান্তে বিহার হইতে শ্রমণ বুদ্ধপালিত মাঙ্গলিক লইয়া আসিলেন এবং পিতাকে বলিয়া গেলেন যে, নগরপাল ক্ষত্রপের বিচার সভা হইতে আমাকে সদ্য ধৃত করিবার আদেশ অপরাহ্নে পাইয়াছে। অদ্য রাত্রেই সেই আদেশ পালনে সে সচেষ্ট হইবে। প্রধান চৌরদ্ধরণিক সসৈন্যে আসিবে, এইরূপ জল্পনা হইতেছে। অর্হতপাদ আর্য্য মহাস্থবির আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইয়া থাকিতে বলিয়া দিয়াছেন।

পিতা অর্হতপাদকে প্রণাম জানাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার আদেশ আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।

শ্রমণ বুদ্ধপালিত বিদায় গ্রহণ করিলে পিতা আমাদিগের পুরাতন ভৃত্য আনন্দকে ডাকিলেন। সে আসিলে তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

সে বলিল, "আর্য্য, আমি সন্তানহীন, স্বগৃহে আমার কেহই নাই, দেবদত্ত ও চিত্রলেখাকে আমি মানুষ করিয়াছি—বৃদ্ধের শরীরে এখনও যথেষ্ট বল আছে—আমি জীবিত থাকিতে কেহ তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

—বুঝিলাম, কিন্তু তাহারা সসৈন্যে আসিবে—ক্ষত্রপের আদেশে তাহারা আসিতেছে—গোপনে চৌর্য্যবৃত্তি বা দস্যু-বৃত্তি করিবার জন্য নহে। এটা প্রকাশ্য দস্যুবৃত্তি, ক্ষত্রপের আদেশানুযায়ী ও তথাকথিত বিচার সভার বিধিনিয়ন্ত্রিত। এখন এই আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে অনেক বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপাততঃ একটী কাজ কর দেখি—একখানা নৌকা আমাদের ঘাটে প্রচ্ছন্নভাবে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দাও। আবশ্যক হইলে উহা ব্যবহার করা যাইবে।

—যে আজ্ঞা, আর্য্য!

—তবে, যাও!—যত শীঘ্র পার কর!—আর সময় নাই।

আনন্দ পিতার নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতে চলিয়া গেল। আমরাও গৃহরক্ষা ও আত্মরক্ষা বিষয়ে প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। গৃহাভ্যন্তরে মা ও চিত্রলেখার কর্ণে আমাদের আসন্ন বিপদের কথা পঁহুছিয়াছিল। মা একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে চাঞ্চল্যে কাতরতা বা ভয়ের কোনও লক্ষণ ছিল না। মা বলিলেন—তাঁহাদের জন্য কোনও চিন্তা নাই—তাঁহারা আপনাদিগের সম্মান আপনারাই রক্ষা করিতে জানেন ও পারিবেন।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিত উদ্যোগ
নামক একাদশ বিবৃতি

(ক্রমশঃ)

জয়যাত্রা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পূজার মন্ত্র শেষ হ'ল নাকি মহাকাল-মন্দিরে ?
ওঙ্কারধ্বনি ঐ শোনা যায় ভারতের তীরে তীরে !
বন্দীর গান হ'ল না-কি শেষ—
তুষ্ট হ'ল কি রুষ্ট মহেশ,
প্রসন্ন আঁখি ভক্তের পানে উন্মেষ করি' ধীরে ?

পাপের পসরা প্রায়শ্চিত্তে পুড়িয়া হ'ল কি ছাই ?
চেয়ে দেখ্‌, দেখি ভালো করে' তার চিহ্ন তো আর নাই !
ধর্ম্ম-শপথ ভাঙি' বারবার
মুখে যত কালী দিলি আপনার,
নিজহাতে তার প্রতীকার, সে যে শেষ হওয়া আগে চাই।

কাণ দিয়ে শোন্‌, দিকে দিকে ঐ বাজিছে কালের ভেরী,
বাতাসের মুখে তাহারি বার্ত্তা ধ্বনিছে ধরণী ঘেরি' ;
এসে যদি থাকে সে শুভ লগ্ন,
থাকিস্‌নে আর তন্দ্রামগ্ন,
ওরে উদাসীন, ওরে কৃতঘ্ন, আরও কি করিবি দেরী ?

পূর্ব্ব আকাশে ভোর হয়ে আসে, প্রস্তুত তরী তীরে,
অগ্রণী যারা, একে-একে তারা, জমিছে কিনারা ঘিরে' ;
পার হতে হবে দুঃখ-পাথার,
ওরে, বিলম্ব করিস্‌নে আর,
যাত্রার বাঁশী ডাকে বারবার অনাগত যাত্রীরে।

ফুলে' উঠে পাল, ঘুরে' যায় হাল, তরণী দিল যে ছাড়ি',—
সবল হস্তে ক্ষেপণী ধরিয়া দাঁড়া দেখি সারি-সারি ;
পশ্চিমা বায়ে আসুক্‌ না ঝড়,
উঠুক্‌ তুফান, দুলুক সাগর,
নাহি কোনো ভয়, নাহি কোনো ডর—কাল নিজে কাণ্ডারী !

জয় জয় কালী নৃমুণ্ডমালী, জয় জয় মহাকাল,
এক হাতে যার অভয়মন্ত্র আর হাতে করবাল !
তৃতীয় নেত্রে অগ্নি ঠিকরে, নির্ভয় মনে সেই নির্ভরে
বিজয়-যাত্রা দেরে সুরু করে' কাটায়ে বিঘ্নজাল।
জয় জয় কালী নৃমুণ্ডমালী, জয় জয় মহাকাল॥

গণ-পরিষদ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

মুসলিম লীগ বড়লাটের মারফৎ কংগ্রেসকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়া অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে যোগদান করিলেও গণ-পরিষদের অধিবেশন লইয়া কংগ্রেসের সহিত শীঘ্রই মতভেদ দেখা দিল। কংগ্রেস বলিলেন, পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী এই ডিসেম্বর গণ-পরিষদের অধিবেশন বসিবেই। মিঃ জিন্না দেশের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অজুহাতে অধিবেশনের দিন পিছাইয়া দিবার দাবী তুলিলেন। মিঃ জিন্নার এই অযৌক্তিক দাবীতে কংগ্রেস-মহল স্থির করিলেন যে, মিঃ জিন্না এই ভাবে ইহাকে পিছাইয়া শেষ পর্যন্ত স্থগিত করিবারই চেষ্টায় রহিয়াছেন। বড়লাটও নির্দিষ্ট দিবসে গণ-পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। সদস্যগণের নিকটে যথারীতি নিমন্ত্রণপত্র প্রেরিত হইল।

ঠিক এই সময়েই মিঃ জিন্না এক বিবৃতিতে লীগ সদস্যদের গণ-পরিষদ বর্জন করিবার উপদেশ দিলেন। ইহাতে কংগ্রেস-মহল বড়লাটের প্রদত্ত আশ্বাস অনুসারে তাঁহাকে চাপ দিলেন যে, হয় লীগকে গণ-পরিষদে যোগদান করিতে হইবে নতুবা তাহাকে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে হইবে। বড়লাট উভয়সঙ্কটে পড়িয়া সমস্ত বিষয় লণ্ডনে জানাইলেন। গণ-পরিষদের অধিবেশন লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইল তাহা সমাধানের জন্য বৃটিশ মন্ত্রিসভা, নভেম্বর মাসের শেষদিকে বড়লাট লর্ড

াবেল, কংগ্রেস দলের পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দার বল্লভভাই ্যাটেল, লীগের মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ এবং শিখ প্রতিনিধি ্দার বলদেব সিংকে লণ্ডনে যাইবার জন্ত আমন্ত্রণ করিলেন।

লীগ এই আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলেও কংগ্রেস ইহা প্রত্যাখ্যান ্রিলেন। সর্দার বলদেব সিংও কংগ্রেসের পন্থা অনুসরণ করেন। ্গ্রেস প্রত্যাখ্যানের পক্ষে যুক্তি দেখাইলেন (১) আমন্ত্রণ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার ্য অতি অল্প সময় দেওয়া হইয়াছে।) ৯ই ডিসেম্বর তারিখে গণ পরিষদের ্ধিবেশনের দিন স্থির হইয়াছে, বর্তমানে ্া স্থগিত রাখা কোনরূপেই উচিৎ নহে।) লণ্ডন আলোচনা ৫।৬ দিনের মধ্যে ্ষ হইবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ ্ত্রিমিশনের সহিত আলোচনায় প্রায় ৩০ ্স সময় গিয়াছিল। (৪) লণ্ডন ্লোচনার উল্লেখ করিয়া মিঃ জিন্না গণ-্রিষদের অধিবেশন বর্তমানে বন্ধ করিবার ্বী করিবেন।

কংগ্রেস ও শিখ প্রতিনিধিদের এই ্যামন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানের পর বৃটিশ প্রধান ্ত্রী মিঃ এটলী ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত নেহরুকে লণ্ডন যাইবার জন্ত অনুরোধ ্করিলেন। তিনি পণ্ডিত নেহরুকে এই আশ্বাসও দিলেন যে, মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের কোনরূপ পরিবর্তন করা হইবে না, নির্দিষ্ট তারিখেই গণ-পরিষদের অধিবেশন বসিবে এবং ৯ই ডিসেম্বরের পূর্বেই তাঁহাদের ভারত প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হইবে।

পণ্ডিত নেহরু বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর তার পাইয়া অবশেষে সর্দার বলদেব সিংকে লইয়া লণ্ডন যাওয়া স্থির করিলেন। সর্দার প্যাটেল আর তাঁহাদের সঙ্গে যাইলেন না। পণ্ডিত নেহরুর অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ীভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইলেন।

১লা ডিসেম্বর তারিখে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার বলদেব সিং, মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ এক বিশেষ বিমানযোগে লণ্ডন রওনা হইলেন। লণ্ডনে ইঁহারা উপস্থিত হইবার দুই ঘণ্টা মধ্যেই আলোচনা শুরু হইয়া গেল। এই আলোচনা কয়েকদিন চলিল। প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী, ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স ও অন্তান্ত মন্ত্রীরা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত পৃথক পৃথক ভাবে ঘরোয়া আলোচনা করিয়া তাঁহাদের মনোভাব জানিয়া লইলেন। ইহার পর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী তাঁহার বাসভবন ১০নং ডাউনিং ষ্ট্রিটে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের লইয়া এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান

গণপরিষদে যোগদানের পথে অন্তান্ত সদস্তদের সহিত কৃপালনী-দম্পতি

গণ-পরিষদ অভিমুখে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, জগজীবন রাম প্রভৃতি

করিলেন। গোল টেবিল বৈঠকেও কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে কোনও মীমাংসা হইল না। প্রাদেশিক মণ্ডল গঠন (গ্রুপিং) ও খণ্ড-পরিষদ (সেক্শান) লইয়া উভয়ের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিল। এদিকে গণ-পরিষদের দিন আসন্ন হইয়া আসায় পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার বলদেব

সিং আর লণ্ডনে অবস্থান করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ৬ই ডিসেম্বর প্রাতে বিশেষ বিমানযোগে ভারত অভিমুখে রওনা হইলেন। লীগ গণ-পরিষদ বর্জন করায় মিঃ জিন্না ও মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ ভারতে প্রত্যাবর্তনের গা করিলেন না। তাঁহারা কিছুদিন লণ্ডনে রহিয়া গেলেন।

গোল টেবিল বৈঠক ফাঁসিয়া যাওয়ায় ৬ই ডিসেম্বর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, খণ্ড-পরিষদ সমূহের (সেকসান) সভা কি ভাবে বসিবে সেই সম্বন্ধে ১৬ই মে তারিখে মন্ত্রিমিশন যে প্রস্তাব ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার ১৯ অনুচ্ছেদের ৫ ও ৮ নং উপধারার ব্যাখ্যা লইয়া অসুবিধার সৃষ্টি হয়। মন্ত্রিমিশনের ঘোষণার ১৯ অনুচ্ছেদের ৫নং উপধারায় বলা হইয়াছে—প্রত্যেক খণ্ডে (সেকসান) যে সব প্রদেশ অন্তর্ভুক্ত হইবে খণ্ড পরিষদ তাহাদের শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। সেই সব প্রদেশ লইয়া কোন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না এবং হইলে কোন্ কোন্ প্রাদেশিক বিষয়সমূহের ভার গ্রহণ করিবে তাহাও স্থির করিবে। ১৯ (৮) উপধারার ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন প্রদেশ মণ্ডলীর বাহিরেও থাকিতে পারে।

১৯ অনুচ্ছেদের ৮নং উপধারায় বলা হইয়াছে নূতন শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর যে কোনও প্রদেশ পূর্বে তাহাকে যে মণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে। নূতন শাসনতন্ত্রের বিধান অনুসারে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর সংশ্লিষ্টপ্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদ তাহা স্থির করিবেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও সীমান্ত মন্ত্রী শ্রীযুত মেহেরচাঁদ খান্না

মন্ত্রিমিশন সর্বদাই এই মত পোষণ করিয়া আসিয়াছেন যে, যদি খণ্ড-পরিষদের সকল সদস্য মিলিয়া কোন ব্যবস্থা না করে তবে অধিকাংশের ভোটে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা হইবে। লীগ এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস বলেন, মন্ত্রিমিশনের বিবৃতিকে সমগ্রভাবে দেখিলে ইহার প্রকৃত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বিভিন্ন প্রদেশের মণ্ডলীবদ্ধ হওয়া সম্পর্কে এবং নিজ নিজ শাসনতন্ত্র রচনা সম্পর্কে স্বাধীনতা থাকিবে।

বিবৃতিতে তাঁহারা আরও বলেন যে, ভারতবাসীদের একটা বড় অংশ বাদ দিয়া গণপরিষদ যদি কোন শাসনতন্ত্র রচনা করেন, তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনিচ্ছুক লোকদের উপর উক্ত শাসন ব্যবস্থা চাপাইয়া দিবেন না, এমন কি দিবার কথা ভাবিতেও পারেন না। ১৬ই মে তারিখের ব্যাখ্যা মানিয়া লইয়া ভারতীয়রা যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবে তাহা মঞ্জুর করাইবার জন্য পার্লামেণ্টে দাখিল করা হইবে।

কংগ্রেস মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের এই অংশের ব্যাখ্যার ভার ভারতীয় ফেডারেল কোর্টে দিতে চাহিলে, ইহা শীঘ্রই দেওয়া উচিত বলিয়া বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই বিবৃতিতে সেকসান ও গ্রুপ সম্পর্কে তাঁহারা পুনরায় ব্যাখ্যা করিলেও কংগ্রেসের ব্যাখ্যাকে ভুল বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। তাঁহারা গণ-পরিষদে লীগের যোগদানের পথ সহজ করিয়া দিবার জন্য তাঁহাদের কৃত ব্যাখ্যা মানিয়া লইবার জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন। বৃটিশ সরকারের এই বিবৃতিতে কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাদের পূর্বের কথা রক্ষিত হয় নাই। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতবাসীর একটা বড় অংশকে বাদ দিয়া গণ-পরিষদ কোন শাসনতন্ত্র রচনা করিলে তাহা অনিচ্ছুক লোকদের উপর চাপাইয়া দিবার কথা চিন্তাও করিতে পারেন না; অথচ ১৫ই মার্চ প্রধান মন্ত্রী এটলী বলিয়াছিলেন, মাইনরিটিকে মেজরিটির অগ্রগতির পথ রোধ করিতে দেওয়া হইবে না। আরও একটি কথা বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে ভারতীয়রা রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলে তাহা মঞ্জুর করাইয়া লইবার জন্য পার্লামেণ্টে দাখিল করা হইবে। কিন্তু মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে এরূপ মঞ্জুর করাইবার কোনও কথাই ছিল না। তাহা ছাড়া আসল কথা হইল, মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মে তারিখের বিবৃতির ১৫ ধারা—যাহাকে সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি বলা হইয়াছে, তাহাতে "Provinces should be free to form groups" বলা সত্ত্বেও ১৯ ধারার উপর জোর দিয়া প্রদেশ বিশেষকে মণ্ডলীবদ্ধ করিতে বাধ্য করার চেষ্টা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে।

যাহা হউক এদিকে লীগ যোগদান না করিলেও গণ-পরিষদের অধিবেশন বন্ধ রহিল না। যথা সময়ে ৯ই ডিসেম্বর গণ-পরিষদের অধিবেশন বসিল। ভারতের ইতিহাসে এই দিনটি বিশেষভাবে স্মরণীয়

হইয়া থাকিবার মত। এই প্রথম কংগ্রেস স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার ভার গ্রহণ করিলেন। যদিও তাঁহাদের বাধা বিপত্তি এখনও প্রচুর রহিয়াছে, তবুও তাঁহারা সর্বপ্রথম এই পথে পা দিলেন এবং পথ মুক্ত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা রাখেন।

বৃটিশ ভারতের মোট ২৯৬ জন সদস্যের (সাধারণ ২১০, মুসলমান ৭৮, শিখ ৪, চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ দিল্লী, আজমীর মাড়োয়ার, কুর্গ ও বৃটিশ বেলুচিস্থান হইতে ১ জন করিয়া ৪ জন) মধ্যে ২০৫ জন প্রথম দিনের অধিবেশনে যোগদান করেন। লীগের কোন সদস্যই যোগদান করেন নাই। দেশীয় রাজ্যের ৯৩ জন প্রতিনিধির কেহও উপস্থিত ছিলেন না, তবে লীগের ন্যায় গণপরিষদ বর্জন করিবার কোন সিদ্ধান্ত তাঁহারা করেন নাই। প্রথম দিনের অধিবেশনে বিহারের প্রবীণ আইন ব্যবসায়ী ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ গণপরিষদে সভাপতিত্ব করেন। গণপরিষদের সাফল্য কামনা করিয়া আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও চীন হইতে শুভেচ্ছার বাণী প্রেরিত হইয়াছিল। প্রথম দিনে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ পরিচয় পত্র দাখিল করিয়া নাম স্বাক্ষর করেন। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। ৯ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদের প্রথম বারের অধিবেশন চলিল। প্রথম অধিবেশনেই অনেকগুলি বিষয়ের আলোচনা হয় এবং কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। গণ-পরিষদের ১৫ জন সদস্য লইয়া একটি কার্যবিধি প্রণয়নকারী কমিটি গঠিত হয়। সেই ১৫ জন হইতেছেন—শ্রীজগজীবন রাম, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, মিঃ ফ্রাঙ্ক এণ্টনী, স্যার আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, বক্সী স্যার টেকচাদ, ডাঃ আলবান ডি সুজা, স্যার এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডেন, শ্রীগোপীনাথ বরদলুই, ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া, সর্দার হরনাম সিংহ, শ্রীমেহের চাঁদ খান্না, মিঃ কে, এম মুন্সী, শ্রীমতী দুর্গা বাঈ ও মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই।

গণপরিষদের অধিবেশনে সদস্যবৃন্দ

গণপরিষদ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে ডাঃ মুখার্জী ও ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন

গণপরিষদের কংগ্রেসী সদস্যদের উপদেশ দিবার জন্য নিম্নোক্ত ৩০ জন সদস্য লইয়া অপর একটি পরামর্শ-দাতা কমিটি গঠিত হয়:—আচার্য্য কৃপালনী, মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, খান্ আব্দুল গফুর খান্, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মিঃ রাজাগোপালাচারী শ্রীশঙ্কর রাও দেও, শ্রীশরৎ-চন্দ্র বসু, মিঃ রফি আমেদ কিদোয়াই সর্দার প্রতাপ সিং আচার্য্য যুগোল কিশোর শ্রীজয়রামদাস দৌলৎরাম ডাঃ পট্টভি

সীতারামিয়া, ডাঃ এম, আর জয়াকর, স্যার এন, গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, মিঃ জগজীবন রাম, মিঃ ভি, আই, মুনিস্বামী পিল্লাই, শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ, ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গব, শ্রীরোহিণীকুমার চৌধুরী, ডাঃ এইচ, এম, কুশ্রুক শ্রীযুক্তা হংস মেহতা, মিঃ এম, আর, মাসানী, মিঃ নিকলস রায়, মিঃ ফ্রাঙ্ক এন্টনী এবং সর্দার উজ্জ্বল সিং।

১৩ই ডিসেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতের অখণ্ড ও সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ এই ঘোষণা সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁহার এই প্রস্তাব লইয়া কয়েকদিন আলোচনা চলে। পণ্ডিতজীর প্রস্তাবে অনেকগুলি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তন্মধ্যে ডাঃ জয়াকরের সংশোধনী প্রস্তাব ব্যতীত অপরগুলি বিধিবহির্ভূত বলিয়া সভাপতি নাকচ করিয়া দেন। ডাঃ জয়াকর তাঁহার সংশোধনী প্রস্তাবে বলেন যে, মুসলীম লীগ ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যাহাতে পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব বিবেচনা করিতে পারেন তজ্জন্য আপাততঃ ইহা মুলতুবী রাখা হউক। বর্তমানে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলে অন্যায়, বেআইনী, ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হইবে। ডাঃ জয়াকরের এই প্রস্তাবে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সর্দার প্যাটেল, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রভৃতি ডাঃ জয়াকরের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের যুক্তি—বর্তমানে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলেও লীগ বা দেশীয়রাজ্যের প্রতিনিধিদের কোনরূপ অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

অনেক বিতর্কের পর শেষে পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্তই পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব গ্রহণ মুলতুবী থাকে।

মিঃ কে, এম, মুন্সী কর্তৃক উত্থাপিত দেশীয় রাজ্য সম্পর্কিত আলোচনা কমিটি গঠনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতি এবং কোন্ রাজ্য হইতে কত জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন তাহা স্থির করিবার জন্য গণপরিষদের পক্ষ হইতে একটি এবং দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষ হইতে অপর একটি আলোচনা কমিটি গঠিত হইবে। গণপরিষদের পক্ষ হইতে যে কমিটি গঠিত হইবে তাঁহারা গণপরিষদের সমক্ষে বিষয়টি উপস্থাপিত করিবেন এবং গণ-পরিষদও ইহাতে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবে।

ইহা ছাড়া (১) পরিচয় কমিটি (২) ষ্টাফ এণ্ড ফাইন্যান্স কমিটি ও (৩) হাউস কমিটি নামে আরও তিনটি কমিটি গঠিত হয়। নিম্নোক্ত সদস্যগণ উক্ত কমিটিগুলিতে রহিয়াছেন—

(১) পরিচয় কমিটি—স্যার আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আয়ার, বক্সী স্যার টেকচাঁদ, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, ডাঃ পি, কে, সেন, এবং মিঃ ফ্রাঙ্ক এন্টনি।

ষ্টাফ এণ্ড ফাইন্যান্স কমিটি—শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ, শ্রীজয়পাল সিং, ভি, আই, মুনিস্বামী পিল্লাই, মিঃ সি, ই, গিবন, মিঃ এস, ভি, গ্যাডগিল, শেঠ গোবিন্দ দাস, রাজকুমারী অমৃতকুমারী, শ্রীশ্রীপ্রকাশ এবং সর্দার হরনাম সিং।

হাউস কমিটি—শ্রীরাধানাথ দাস, শ্রীএ, কে, দাস, শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ, খান আবদুর গফুর খান, শ্রীজয়রাম দাস দৌলতরাম, শ্রীনন্দকিশোর দাস, শ্রীমোহনলাল সাকসেনা, শ্রীএইচ, ভি, কামাথ, শ্রী আর, দিবাকর, শ্রীযুক্তা অমুখামীনাথম্ এবং পণ্ডিত শ্রীরাম শর্মা।

গণপরিষদে বক্তৃতারত পণ্ডিত নেহরু

যে সময়ে গণপরিষদের অধিবেশন চলিতেছিল ঠিক সেই সময়েই পার্লামেণ্টে ভারত সম্পর্কে বিতর্ক চলিতে থাকে। ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স ঘোষণা করেন যে, তাঁহাদের ১৬ই মে তারিখের ঘোষণায় গ্রুপ ও সেকসান সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহারা যে অর্থ করেন তাহাই তাঁহারা মানিয়া চলিবেন, এবং ৬ই ডিসেম্বরের সরকারী বিবৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন ফেডারেল কোর্ট যদি কংগ্রেসের স্বপক্ষে রায় দেন তাহা হইলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা মানিয়া লইবেন না।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা এবং তৎপরবর্তীকালে পার্লামেণ্টে বক্তৃতায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের নিকট প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেন তাহাতে কংগ্রেসী মহলে বিশেষ উদ্বেগের উদ্ভব হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কয়েকদিন অধিবেশনের পর বৃটিশ সরকারের উক্ত ঘোষণা ও বক্তৃতার সমালোচনা করিয়া ২২শে ডিসেম্বর কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বলা হয় ;—

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ৬ই ডিসেম্বর সেকসান সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের সহিত কোন সঙ্গতি নাই। ১৬ মের ঘোষণায় প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যই ছিল প্রস্তাবের মূলভিত্তিসমূহের অন্যতম। কারণ ১৬ই মে তারিখের ঘোষণায় শাসনতন্ত্রের মূলনীতি হিসাবে ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। এই যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত কয়েকটি বিষয় ছাড়া অপর সমুদয় বিষয় ও অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে এবং প্রাদেশিক মণ্ডল গঠনের ব্যাপারে প্রদেশগুলির উপর কোন বাধ্যবাধকতা থাকিবে না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালনাধীন বিষয়গুলি ছাড়া অন্য সকল দিক দিয়াই প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসনমূলক হইবে ইহাই ছিল ঘোষণার উদ্দেশ্য।

ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ১৬ই মের ঘোষণায় নূতন কিছু যোগ করা হইবে না এবং উহা ব্যাখ্যা করা হইবে না এরূপ আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মূল পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয়ে সুস্পষ্টরূপে অতিক্রম করিয়াছে। গণপরিষদের সদস্যনির্বাচনের বহু পরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ হস্তক্ষেপে যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা বিপজ্জনক বলিয়া কমিটি ঘোষণা করেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও লীগ ফেডারেল কোর্টের রায় স্বীকার করিতে রাজী না হওয়ায় কংগ্রেস এই বিষয় ফেডারেল কোর্টে দেওয়া অবান্তর বলিয়া স্থির করেন।

এই জটিল অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য জানুয়ারীর প্রথম দিকে ওয়ার্কিং কমিটি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করেন। ইতিমধ্যে নেতৃবৃন্দ নোয়াখালিতে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া লইবেন। আসাম, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের শিখসম্প্রদায় গ্রুপ ও সেকসানের তীব্র বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন। মহাত্মা গান্ধীও আসামকে মণ্ডলী ত্যাগ করিবার জন্য কঠোর হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

এদিকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আজ দৃঢ়সংকল্প যে গণপরিষদে তাঁহারা স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। বৃটিশের অনুমোদনের অপেক্ষায় ইহা থাকিবে না। বিশ্বের দরবারে এবং ভারতের জনগণের সমক্ষে তাঁহারা শাসনতন্ত্র উপস্থিত করিবেন। পণ্ডিত নেহরু তাই বলিয়াছেন—গণপরিষদে আমরা যে শাসনতন্ত্র রচনা করিব, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহা গ্রহণ করুক আর নাই করুক, উহাই হইবে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র।

এখন এক দিকে লীগ ও তাহার সমর্থক বৃটিশ মন্ত্রীসভা—অপর দিকে কংগ্রেস। একপক্ষ নীতি পরিবর্ত্তন না করিলে দুই পক্ষের এই পরস্পর-বিরোধী নীতির সমন্বয় অসম্ভব। কংগ্রেস দেশের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার বিপক্ষদলের সহিত যে কোনরূপে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। তবে তাঁহারা মহান আদর্শচ্যুত হইবেন না, বরং প্রয়োজন হইলে দুর্গম পথে যাত্রা করিবেন। ২৫।১২।৪৬

লোহজং নদী

শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী

প্রায় চার বৎসর আগেকার কথা। কার্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল সহরে যাইতেছি। আশ্বিনের মাঝামাঝি হইবে। স্রোতহীন সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা খালের মধ্য দিয়া পানসীখানা ধীরে চলিয়াছে। দুই পারে বন ঝাউ ও কাশের বনে অজস্র ফুলের সমারোহ। কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করিলাম 'মাঝি, এ কোন খাল ? উত্তর আসিল 'খাল না, কর্ত্তা ; লোজংয়ের গাঙ্.।' লোজং (লৌহজং) নামটি অদ্ভুত। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মৌলভী হেদায়েৎ হোসেন ইহার অর্থ করিয়াছিলেন 'যুদ্ধক্ষেত্র'। ঢাকা জিলায় পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে বিখ্যাত লৌহজং বন্দর ছিল। এখন তাহা পদ্মাগর্ভে বিলীন। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এখানে যে যুদ্ধ সত্যই হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। সাধারণতঃ পার্শ্ববর্তী কোন বড় গ্রামের নাম অনুযায়ী খালের নাম হয়। কিন্তু কোথায় ঢাকা ফরিদপুর সীমান্তে লৌহজং, আর কোথায় টাঙ্গাইল ?

বাংলা দেশের প্রাচীন কাঠামো গঠিত হয় ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তর বঙ্গের নদী সমূহের স্রোতবাহিত মৃত্তিকায়।(১) খৃষ্টের জন্মের বহুশত বৎসর পূর্বে বিপুল প্লাবন ও ধ্বংসের বন্যায় ভাগীরথীর স্রোত সেই স্বর্ণ মৃত্তিকায়

(১) S. C Mazumdar ; Rivers of the Bengal Delta pp. 53-54

বুকে আসিয়া পৌঁছিল।(২) আরম্ভ হইল বঙ্গভূমির পুনর্গঠন। সেই ভাঙা গড়ার ইতিহাসের শত চিহ্ন আজ আমাদের জানা বঙ্গভূমির মৃত্তিকার গভীর তলে প্রোথিত। নদীতত্ত্বের আলোচনায় সে জন্ত প্রধান সহায় ভূতত্ত্ব।

গঙ্গার পূর্বাভিমুখী ধারা পদ্মা অন্ততঃ খৃষ্টের জন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্বে চট্টগ্রামের নিকট পৌঁছিয়াছিল।(৩) তাহার বহুপূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও উত্তর-বঙ্গের নদীসমূহকে সে পরাস্ত করে। ফলে এই সব নদীর গতিপথ দক্ষিণ হইতে পূর্ব বা পূর্ব দক্ষিণ দিকে পরিবর্তিত হয়। সেকালের ব্রহ্মপুত্র এতবড় নদী ছিল না।(৪) তাহার দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখী ধারা পদ্মার স্রোত ও স্রোতবাহিত মৃত্তিকার রুদ্ধ হইলে সে প্রথম পূর্বদিকে আশ্রয় লয়। এখানেও পদ্মার আক্রমণ আরম্ভ হইল। ফলে উভয় নদীর সংযোগস্থলে গড় মধুপুর ও ভাওয়ালের উচ্চ-ভূমি গড়িয়া উঠে। তখন ব্রহ্মপুত্র গারো পাহাড় ও গড় মধুপুরের মধ্যবর্তী নিম্ন ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইল। সে ধারা এখন শুষ্কপ্রায়। প্রধান গতিপথ অবরুদ্ধ হইলে নদী প্রায়ই তাহার তীরস্থ ভূমি ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করে। এইরূপে তাহার জল রাশি নব-নব পথে প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণাভিমুখী-শাখার গতি নিজ স্রোত বাহিত মৃত্তিকার বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহার

১নং মানচিত্র
রেণেলের মানচিত্র হইতে
স্কেল ১" = ১০মাইল

পূর্বাভিমুখ গারো পাহাড়ের দক্ষিণবর্তী অংশ হইতে কয়েকটি নূতন ধারা দক্ষিণের ক্রমঃ নিম্ন ভূমির মধ্য দিয়া পথ করিয়া লয়। গড় মধুপুরের এই সব নদীর মধ্যে বানার এবং লৌহজং অন্যতম। লক্ষ্মণ সেনের ভাওয়াল তাম্রশাসনে এই বানার বা বানহার নদীর উল্লেখ আছে।(৫) আড়িয়ালখাঁ নদী বিষয়ে আলোচনা কালে (৬) আমরা দেখাইয়াছি যে পদ্মা স্রোত যখন পূর্বদিকে বিশেষ প্রবল হয় নাই তখন এই সব দক্ষিণাভিমুখী-ধারা ঢাকা এবং ফরিদপুর জিলার দক্ষিণে পদ্মার সহিত মিলিত হইত। আড়িয়লখাঁ নদীর সৃষ্টিতে ঢাকা জিলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। ক্রমে পদ্মার প্রভাবে আড়িয়লখাঁ নদীর অধিকাংশ বিলে পরিণত হয় এবং উহার দক্ষিণাংশ পদ্মার শাখা নদীতে পরিণত হয়। আড়িয়ল বিলের অনেকাংশ যে এক সময় উচ্চভূমি ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। উহার স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন কালে বৃক্ষ ও ইষ্টকনির্মিত

২নং মানচিত্র
ঢাকা জেলার বর্তমান মানচিত্র হইতে
স্কেল ১" = ৮ মাইল

গৃহাদি মৃত্তিকার বহু নিম্নে পাওয়া যায়। ভূস্তরের অবনমনে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আড়িয়ল বিল আজকাল যত বিস্তীর্ণ প্রথমতঃ তাহা ছিল না। এখনও অবনমন চলিতেছে। মুসলমান আমলেও বর্তমান লুপ্ত এই সব জল-পথের মধ্য দিয়া লৌহজং নদী পদ্মাতীরবর্তী বন্দরের সহিত ব্রহ্মপুত্রতটস্থ বাণিজ্যস্থানসমূহের সংযোগ রক্ষা করিত। ধলেশ্বরীর গতিপথ পরিবর্তনে এবং আড়িয়ল বিলের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের অবনমনে লৌহজং নদীর কতকাংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

বর্তমানে লৌহজং নদী নবাগতা যমুনা নদীর শাখা মাত্র। কিন্তু রেণেলের অঙ্কিত মানচিত্রেও লৌহজং নদীর উত্তরাংশের প্রবাহের বিশালত্ব বুঝা যায়। (১নং চিত্র) তখন উহা সন্ন্যাসীগঞ্জের কিছু উত্তর পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া গোপালগঞ্জ, কাগমারি ও সন্তোষের পূর্বপ্রান্ত বহিয়া তিল্লীর পশ্চিমে ধলেশ্বরী নদীতে মিলিত হইত। বর্তমানে এ খাত

(২) B. Chakrabarti ; Bengal : A Gangetic Delta ? in the Mod, Rev Feb' 44

(৩) Dr. N. K. Bhattasali—Antiquity of the Lower Ganges and its Courses (Science & Culture VII-5)

(৪) T. H. De La Tonche Relics of the Great Ice Age in the plains of Northern India.

(৫) I. R. A. S. B. letters Vol VIII

(৬) ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ ১৩৫০

শুষ্ক। রেণেলের বহু পূর্বেই আড়িয়ল বিলের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি ইহাকে চুরাইণ বিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মানচিত্রে লৌহজং নদীর দক্ষিণ প্রভৃতি দেখা যায় না। কিন্তু বর্তমান মানচিত্রসমূহ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। রেণেলের মানচিত্রে দেখা যাইবে যে লৌহজং নদী 'বলজুরী' গ্রামের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে পতিত হইত। বর্তমানে ধলেশ্বরী

৩নং মানচিত্র
রেনেলের মানচিত্র হইতে

বানিয়াজুরী গ্রামের উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত। ধলেশ্বরীতীরের তরা গ্রাম হইতে একটি নদী বানিয়াজুরীর পাশ দিয়া বায়রার নিকট ধলেশ্বরীতে মিশিয়াছে। ইহার চার মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে হাটীপাড়ার পাশ দিয়া একটি নদী দক্ষিণ দিকে চলিয়া কলাকোপার পাশ দিয়া গিয়াছে। ইহা সাধারণের কাছে ইছামতী বলিয়া পরিচিত। ইছামতী অতি প্রাচীন নদী, ইহা উথুলী ও ঝিটকা গ্রামের পাশ দিয়া লেছরাগঞ্জ গ্রামের কিছু পূর্বে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটি শাখা নয়াবাড়ীর নিকট পদ্মায় মিশিয়াছে। অপরটি হাটীপাড়া, কলাকোপা, রাজনগর প্রভৃতি গ্রামের পাশ দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়াছে। (২নং চিত্র দেখ) কিন্তু হাটীপাড়া ও বনথুড়া গ্রামের মাঝে একটি শুষ্কপ্রায় খাতের চিহ্ন দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে হাটীপাড়ার পার্শ্ববর্তী নদীটি লৌহজং নদীর দক্ষিণ প্রসৃতি। হরিরামপুরের নিকট হইতে ইছামতীর একটি খাল ইহার সহিত মিলিত হইত। ধলেশ্বরী নদীর গতি পরিবর্তনে উপরের অংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় লৌহজংয়ের পথেই ইছামতী প্রবাহিত হয়। রেণেলের মানচিত্রে দেখা যায় যে বালুরা গ্রামের নিকট হইতে বরাবর দক্ষিণে লটাখোলা গ্রামের পাশ দিয়া একটি নদী চুড়াম বা আড়িয়ল বিলে প্রবেশ করিত। (৩নং চিত্র দেখ) আড়িয়ল বিলের দক্ষিণে মাজাপাড়া ও রাড়িখাল গ্রামের পাশে একটি আঁকা বাঁকা জল রেখা দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে। ইহা দোগাছি হলদিয়া, ব্রাহ্মণগাঁ প্রভৃতি গ্রামের পাশ দিয়া লৌহজং বন্দরের নিকট পদ্মায় মিশিয়াছে। ইহাই প্রাচীন লৌহজং নদীর দক্ষিণাংশ। হলদিয়া গ্রামের দক্ষিণে এই খালের গতি পথ এত আঁকা বাঁকা যে স্থানীয় লোকগণ ইহাকে আঠার বেকী বলে। দোগাছির দক্ষিণে এই খালের তীরস্থ ভূমি ক্রমশঃ নীচু হইয়া পার্শ্ববর্তী বিলে মিশিয়াছে। মনুষ্যখনিত খালের তীর কখনও এরূপ হয় না।

এই খালটি যে এক সময় ব্রহ্মপুত্রের জল বহন করিত তাহার অন্য প্রমাণও আছে। অশোকাষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান পবিত্র। ব্রহ্মপুত্রের সহিত অপর নদীর সঙ্গম স্থানেই এই স্নান অনুষ্ঠিত হয়। খরিয়া গ্রামের নিকট এই খালের সহিত কালীগঙ্গার সঙ্গম হইত। (৭) এখনও অশোকাষ্টমীতে এই খরিয়ার খালে ব্রহ্মপুত্রস্নানার্থীর সমাগম হয়। এই খালটির অন্য কোথাও বা কালীগঙ্গার লুপ্তপ্রায় খাতের অপর কোন অংশে স্নান হয় না শুধু এই সঙ্গমস্থলেই স্নানে ব্রহ্মপুত্রস্নানসম পুণ্য হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

হাজার বৎসর পূর্বে এই পথে ব্রহ্মপুত্রের জলধারা প্রবাহিত হইত। এখন সে কথা আর কাহারও মনে নাই। বৎসরান্তে শুধু একবার পুণ্যলোভাতুর স্নানার্থীদের কণ্ঠে তাহার জয়ধ্বনি ঘোষিত হয়। অন্য খালের শান্ত জলরাশি সেই বিলুপ্ত স্মৃতি বহন করিয়া নীরব মন্থর গতিতে পদ্মায় আত্ম-সমর্পণ করে।

---

(৭) যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিক্রমপুরের ইতিহাস ২য় সংস্করণ ১ম খণ্ড।

পথহারা

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ, কাব্যভারতী

কুয়াসায় ভ'রে গেছে ধরণী
তাহে কণ্টকময় সরণি
একাকী পথে যেতে
পারি না পিছলেতে
হাতখানি ধর মোর কে গো পুরঃগামিনী
জীবনে যে নেমে আসে ঘনতম যামিনী।

বুক মোর কেঁপে ওঠে তরাসে
রণ-ভেরী বেজে চলে আকাশে,
বিদ্যুৎ-চমকায়
বারিধারা পড়ে গায়
বায়ুকুল বেগে ধায় পূর্বদিক অচলে
সাথে করি লও মোরে ওগো লীলা চপলে।

মোর কানে কে গো বাণী শোনালে
"ভয় নাই" 'ভয় নাই' শুধালে,
বাজিল যে কিংকিনী
শুনিলাম রিণি-ঝিণি,
আলোক-উজ্জল পথে কে গো মোরে আনিলে,
নয়নে নয়ন রাখি শুধু তুমি হাসিলে।
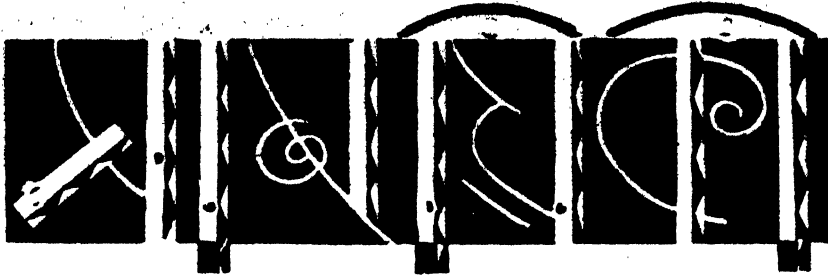
কংগ্রেসে গৃহীত নূতন প্রস্তাব—

গত ৫ই ও ৬ই জানুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু কর্ত্তৃক উপস্থাপিত কংগ্রেস কর্ত্তৃক বৃটীশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। বহু সদস্য প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিলেও দুই তারিখে ৯৯—৫২ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস টাণ্ডন কর্ত্তৃক উপস্থাপিত ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা বর্জ্জনের সংশোধন প্রস্তাব ১০২—৫৪ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। মূল প্রস্তাবটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। পণ্ডিত জহরলাল ও আচার্য্য কৃপালনী নোয়াখালিতে গান্ধীজির সহিত আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাব প্রস্তুত করেন ও পরে উহা ৪ঠা জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এইরূপ :—

"গত নভেম্বর মাসে মীরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, ১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বরে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বিবৃতি এবং গত ২২শে ডিসেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে যে বিবৃতি দান করা হইয়াছে ঐ সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস-কর্ম্মীদের নিম্নরূপ উপদেশ দান করিতেছে :—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ২২শে ডিসেম্বরের বিবৃতিকে সমর্থন করিতেছে এবং উহাতে যে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে সে বিষয়েও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একমত। কোন বিতর্কমূলক সমস্যার মীমাংসার জন্য ফেডারেল কোর্টে উহা উপস্থাপিত করার ব্যাপারে কংগ্রেস সর্ব্বদাই রাজী রহিয়াছে। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সাম্প্রতিক ঘোষণার ফলে ফেডারেল কোর্টে কোন সমস্যা উপস্থাপিত করা অর্থহীন। কেন না, কেবলমাত্র ঐক্যমতের ভিত্তিতেই উহা করা চলিতে পারে। ফেডারেল কোর্টের সিদ্ধান্ত সকল দলকেই মানিবার জন্য রাজী থাকিতে হইবে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অভিমত এই যে, স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র ভারতীয় জনগণের দ্বারাই গঠিত হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ইহাও মনে করেন যে, এই শাসনতন্ত্র যথা-সম্ভব অধিক-সংখ্যক লোকের সমর্থন ও সম্মতির ভিত্তির উপরই

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ফটো—পান্না সেন

প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বাহিরের কোন শক্তি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না এবং এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ বা প্রদেশের কোন অংশের উপর কোনরূপ জবরদস্তিমূলক নীতি প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। বৃটিশ মন্ত্রি-সভার ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে তারিখের পরিকল্পনা এবং বিশেষতঃ

এই পরিকল্পনা সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ১৯৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বরের ভাষ্যের ফলে কতকগুলি প্রদেশ, বিশেষতঃ আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবের শিখগণ যে সকল বাধার সম্মুখীন হইয়াছে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি তাহা গভীরভাবে উপলব্ধি করিতেছে। সংশ্লিষ্ট জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের উপর কোনরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা বা জবরদস্তিমূলক নীতি প্রয়োগ করায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির লেশমাত্র সম্মতি থাকিতে পারে না। অধিকন্তু বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এই নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

সংশ্লিষ্ট সমস্ত দলগুলির সদিচ্ছার সাহায্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি স্বাধীন ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র রচনার কার্য্যে অগ্রসর হইতে আগ্রহান্বিত এবং বিভিন্ন ভাষ্যের ফলে যে সমস্ত জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীকরণার্থ সেক্‌সনসমূহের কার্য্যবিধি সম্পর্কিত বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ভাষ্য অনুযায়ী কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু পরিষ্কার বুঝিতে হইবে যে, ইহা দ্বারা কোন প্রদেশের উপরই বাধ্যবাধকতার সর্ত্ত আরোপ করা যাইতেছে না এবং পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবে না। বাধ্যবাধকতার সর্ত্ত আরোপ করা হইলে কোন প্রদেশে বা কোন প্রদেশের অংশ-সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের মতামত কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা চলিবে। কিরূপ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা হইবে তাহা ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিতেছে এবং অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পরামর্শ দিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ওয়ার্কিং কমিটিকে নির্দ্দেশ দিতেছে।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর পদত্যাগ—

গত ৬ই জানুয়ারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন—'আমি মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব গ্রহণের বিপক্ষে ছিলাম। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মধ্যে কেবলমাত্র আমিই এ বিষয়ে বিরোধিতা করি।' নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বৃটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা গ্রহণ করায় শরৎবাবু পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"মুসলেম লীগ যে উহার পরও গণপরিষদে যোগদান করিবে তাহা আমার মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে গণ-পরিষদ লীগ ছাড়াই সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করিয়া তাহাদের মতানুযায়ী তাহা চালু করিতে অগ্রসর হইবে। মিঃ জিন্না চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া পাকিস্থান পাইতে চাহেন। বৃটিশ সরকারের ঘোষণা মিঃ জিন্নাকে গণপরিষদ হইতে বাহিরে থাকিতে আরও উৎসাহিত করিবে।" তিনি আরও বলেন—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে এসিয়ার উন্নতি হইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে স্বাধীন না হইলেও ভারতবর্ষ সেই সময় স্বাধীন হইবে।

লণ্ডনে হাস্যনিরত পণ্ডিত জহরলাল ও লর্ড প্যাথিক লরেন্স

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য—

মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটীর কর্ম্মী শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ

শর্ম্মা নোয়াখালিতে দুর্দ্দশাগ্রস্তদিগকে সাহায্যদান কার্য্যে ব্রতী আছেন। তিনি জানাইয়াছেন—কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ববঙ্গের দুর্গতদের সাহায্যের জন্য ৩ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। যদি ঐ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার নিজ লোক দ্বারা বিতরণ না করেন, তাহা হইলে টাকা যে যথাস্থানে পৌছিবে না, সকলেই সেরূপ আশঙ্কা করিতেছেন। এ বিষয়ে দেশে আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন।

গান্ধীজী সন্তুষ্ট হইয়া সে বিষয়ে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রীকে সুদীর্ঘ পত্র দিয়াছেন।

সন্দীপের অবস্থা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ অমিয় চক্রবর্ত্তী নোয়াখালির সন্দীপে সাহায্যদান করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন মনে করিতেছে ও সংস্কৃতির বিলোপ আশঙ্কায় কালযাপন করিতেছে। ঐ দ্বীপটি অবহেলিত—তথায় আশ্রয়-কেন্দ্র স্থাপন ও সাহায্য-দান কার্য্যের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজন।

বিশ্ববিধানভবন (উনো) যাত্রার প্রাক্কালে দিল্লীর বিমান বন্দরে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, জর্জ মেয়েল ও পণ্ডিত জহরলাল

ফটো—বসন্ত মজুমদারের সৌজন্যে

বিহারে সাহায্য দান—

বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দুর্গতদিগকে ঠিকভাবে সাহায্যদান করা হইতেছে না, এই মর্ম্মে লীগের নেতারা অভিযোগ করায় পণ্ডিত জহরলাল নেহরু নিজে ঐ বিষয়ে তদন্ত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশমত বিহারের একদল সরকারী সাহায্য দানকারী নোয়াখালিতে যাইয়া গান্ধীজিকে ঐ বিষয়ে বিস্তৃত সংবাদ জানাইয়াছেন।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষক প্রভৃতির ব্যবস্থা—

গত ২৬শে ডিসেম্বর বোলপুর শান্তিনিকেতনে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের শিক্ষা সদস্য শ্রীযুক্ত সি-রাজাগোপালাচারী

নূতন শিক্ষকপ্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিস্থাপন উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। ভারত সরকার ঐ প্রতিষ্ঠানে এককালীন ৪ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ও বার্ষিক ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তাহা ছাড়াও বিশ্বভারতীর গত ২৫ বৎসরের কাজের প্রশংসা স্বরূপ ভারত সরকার অতিরিক্ত ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইলে তদ্বারা দেশবাসী উপকৃত হইবে।

রাওলপিণ্ডিতে দুর্গোৎসব—

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও সুদূর পশ্চিম সীমান্তের রাওলপিণ্ডিনিবাসী বাঙ্গালীরা শ্রীযুক্ত মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৫ দিন ধরিয়া শারদীয় উৎসব করিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে শরৎচন্দ্রের ষোড়শী ও রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর অভিনীত হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীঅরুণ বসু, সহ সম্পাদক শ্রীঅমূল্য গুহ প্রভৃতির এ বিষয়ে চেষ্টা প্রশংসনীয়।

কলিকাতায় মিঃ ইউ-স—

ব্রহ্ম দেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও বর্ত্তমান অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের শিক্ষাসচিব মিঃ ইউ-স চক্ষু চিকিৎসার জন্য বড়দিনের সময় কয়েকদিন কলিকাতায় ছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। তিনি যাইবার পূর্ব্বে বলিয়াছেন—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় ব্রহ্মের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। ব্রহ্মবাসীরা ও ভারতবাসীরা গত মহাযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার জন্য একত্র যুদ্ধ করায় ভারতবাসীদের ও ব্রহ্মবাসীদের স্বাধীনতা লাভের আগ্রহ বাড়িয়াছে।

বাঙ্গালায় তেভাগা আন্দোলন—

বাঙ্গালার ভাগ-চাষীরা তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য জমীদারদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিতেছে। জমির' মালিকদের শোষণ নীতিই যে এই আন্দোলনের কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। একদিকে জমীদারদের এই শোষণ ও অন্যদিকে খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা—কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও ডায়মণ্ডহারবারের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী সুন্দরবন অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ভাগচাষী ও জমির মালিকদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যে আপোষের সর্ত্ত প্রস্তুত করিয়াছেন, উভয় পক্ষ তাহাতে সম্মত না হইলে দেশে ভীষণ বিপ্লব সৃষ্ট হইবে।

পাঞ্জাবে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন—

শিখগণ পাঞ্জাবকে দুইটি বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করিবার জন্য গণপরিষদের আগামী অধিবেশনে এক প্রস্তাব

রাওলপিণ্ডী প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কর্ত্তৃক দুর্গোৎসব

উপস্থিত করিবেন। নিম্নলিখিত জেলাগুলি লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করা হইবে—হিসার, রোটাক, গুরগাঁও, কর্ণাল, আম্বালা, সিমলা, কাংড়া, হোসিয়ারপুর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, অমৃতসর, লাহোর ও গুরুদাসপুর। নূতন প্রদেশের লোকসংখ্যা হইবে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ। তন্মধ্যে শতকরা ৬২ জন হইবে অমুসলমান। শিখ শতকরা ১৯ জন, হিন্দু ৪৩ জন ও মুসলমান ৩৮ জন। শিখগণ হিন্দু বা মুসলমান যে দলে যোগদান করিবে, সেই দলেরই সংখ্যাধিক্য হইবে। গণপরিষদের সদস্য জ্ঞানী কর্ত্তার সিং ঐ প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। ১৯১১ সালে আয়ার্লণ্ডে যে ভাবে আলষ্টার করা হইয়াছিল, এই প্রস্তাব তাহারই অনুরূপ।

বাঙ্গলা কংগ্রেসের নূতন কর্ম্মকর্ত্তা—

গত ৩১শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভায় নূতন কর্ম্মকর্ত্তার দল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। পুরাতন সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও পুরাতন সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত, শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীবিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন ও মৌলবী হবিবর রহমন চৌধুরী সহ-সভাপতি, শ্রীঅমরকৃষ্ণ ঘোষ কোষাধ্যক্ষ এবং শ্রীরসিকলাল দে, শ্রীপ্রমথনাথ গুহ, শ্রীদেবেন সেন, শ্রীরবি বসু ও মৌলবী আবদাস সত্তার সহ-সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভায় নির্ব্বাচন প্রথা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে মৌলবী আসরাফুদ্দীন আমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ফরোয়ার্ড ব্লক দলের সদস্যগণ সভা ত্যাগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে বাঙ্গালাকে সুপথে পরিচালিত করার ভার কংগ্রেসের নূতন কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

এসিয়াবাসী সম্মিলন—

আগামী ২৪শে মার্চ্চ হইতে ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত কয়েকদিন দিল্লীতে এসিয়াবাসী সম্মিলন হইবে স্থির হইয়াছে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ঐ সম্মিলনের উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। তিনি সে কথা গত ২৬শে ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে চীনাভবনের চীন-ভারত-সমিতির বার্ষিক সভায় প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল সে সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। সমগ্র এসিয়ার সকল দেশের প্রতিনিধি ছাড়াও মিশরের প্রতিনিধিদের তথায় আহ্বান করা হইয়াছে। এসিয়ার পরাধীন জাতিগুলিকে একত্র করিয়া সমগ্র পৃথিবী হইতে সাম্রাজ্যবাদ দূরীকরণের চেষ্টা এই প্রথম।

বিহার হইতে মুসলমান আমদানী—

বাঙ্গালার বর্ত্তমান লীগ-সচিবসংঘ বিহার হইতে মুসলমান আমদানী করিয়া বাঙ্গালার মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন; সে কাজ অবশ্য সরকারী ব্যয়েই করা হইতেছে। গত ২৬শে ডিসেম্বর এক সরকারী ইস্তাহার

দিল্লীর বিমান ঘাঁটিতে পুষ্পমাল্যভূষিতা শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী তাহা প্রকাশও করিয়াছেন। গত ১৬ই নভেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহই লোক আনা হইয়াছে। তাহাদের আসানসোলে ৭টি কেন্দ্রে, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে, মেদিনীপুরের শালবনীতে, হুগলী, হাওড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদের জন্য বর্দ্ধমানে ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা, হাওড়ায় ১ লক্ষ টাকা, বাঁকুড়ায় ২৫ হাজার, দিনাজপুরে ১২ হাজার, মেদিনীপুরে ১০ হাজার, হুগলীতে ৫ হাজার ও রাজসাহীতে ৫ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে। অথচ ইহার তুলনায় ত্রিপুরার ও নোয়াখালি জেলার দুর্গত হিন্দুদের জন্য

যাহা করা হইয়াছে, তাহা অকিঞ্চিৎকর। বাঙ্গালার রাজস্বের অধিকাংশ দেয় হিন্দুরা, তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইবে মুসলমানদের জন্য—এই ব্যবস্থা সহ্য করিতে হইবে।

প্রতি গ্রামে কংগ্রেস কমিটী গঠন—

গত ২রা জানুয়ারী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক দ্বয় শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও ও আচার্য্য যুগোলকিশোর সকল প্রাদেশিক কংগ্রেসের নিকট এক আবেদন প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে সংগঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া কংগ্রেস কমিটী গঠন করিতে হইবে। প্রতি গ্রামে এমন একজন করিয়া কংগ্রেসকর্ম্মী থাকা প্রয়োজন, যাঁহাকে গ্রামবাসীরা বন্ধু ও পথপ্রদর্শক বলিয়া মনে করেন।

প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ এত অল্প যে ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য সাধনের কোন উপায় নাই। গৃহহীন অসংখ্য পরিবার পূর্ব্ববঙ্গের দারুণ শীতে ভীষণ কষ্ট পাইতেছে।

মৌলানা আবুলকালাম আজাদ—

অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অন্যতম সদস্য মিঃ আসফ আলি আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শীঘ্রই আমেরিকা যাত্রা করিবেন। তাঁহার স্থানে মৌলানা আবুলকালাম আজাদ অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি বড় দিনের সময় হইতে প্রায় এক পক্ষ কাল জ্বরে শয্যাগত থাকায় এখনও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন নাই।
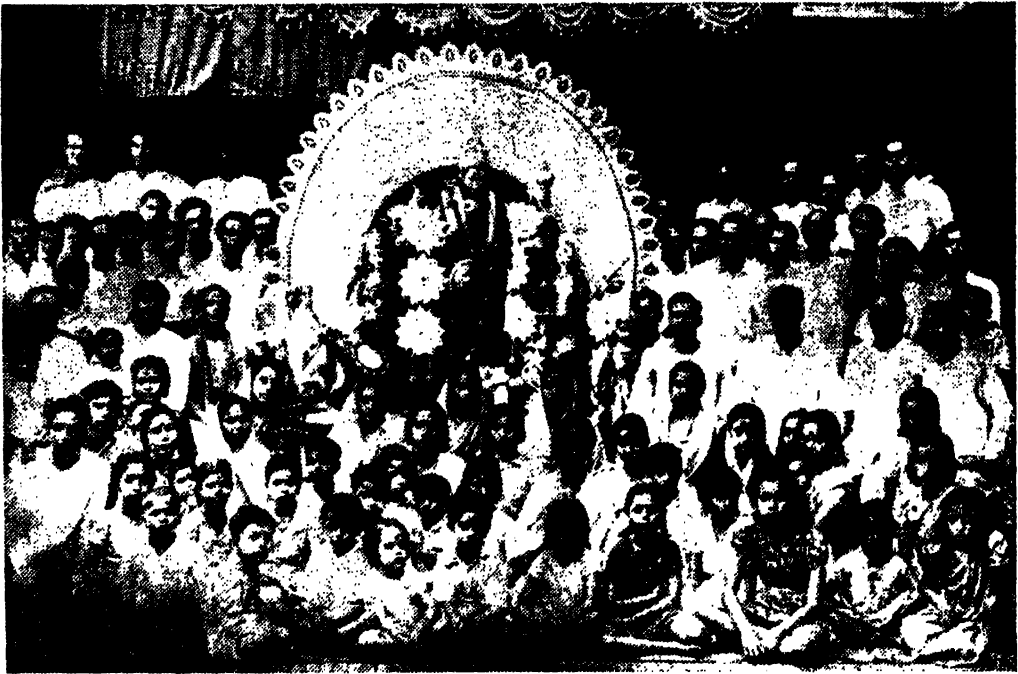
বোম্বায়ে শারদোৎসবে সমবেত বাঙ্গালীরা

বাঙ্গালা সরকারের ঔদাসীন্য—

নিখিলভারত হরিজন সেবক সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এ-ভি ঠক্কর বহুদিন যাবৎ নোয়াখালিতে বাস করিয়া দুর্গত হরিজনদিগের উন্নতি বিধান করিতেছিলেন। তিনি গত ২রা জানুয়ারী বিশেষ কাজে দিল্লী যাত্রার সময় বলিয়াছেন—পুনর্ব্বসতি ও গঠনের জন্য বাঙ্গালা সরকারের

ইন্দোচীনের মুক্তি সংগ্রাম ও ভারতের কর্ত্তব্য—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, ২রা জানুয়ারী এক বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন—ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ইন্দোচীনের প্রজাতন্ত্রকে পদদলিত ও ধ্বংস করিয়া ইন্দোচীনের অধিবাসীদিগের উপর

তাহাদের ঔপনিবেশিক প্রভুত্বকে পুন প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভিয়েটনামের যুদ্ধক্ষেত্রে এসিয়ার তথা ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ণীত হইতেছে। ভিয়েটনামের প্রজাতন্ত্রকে সাহায্য করিবার ও তাহার বিরোধীশক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য আজ সহস্র সহস্র ভারতীয় যুবককে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘ—

ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মীরা নোয়াখালিতে যাইয়া প্রায় ১১ হাজার লোককে তাঁহাদের পুরাতন ধর্ম্মে পুন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও তাহাদের নিজ নিজ বাসস্থানে বসাইয়াছেন। বলপূর্ব্বক বিবাহিতা ২ শত নারীকে উদ্ধার করিয়াছেন ও তিন হাজার নারীকে শাঁখা ও সিন্দুর দান করিয়াছেন। প্রত্যহ খাদ্য দান ব্যাপারে সংঘের ১৫ মণ চাউল ও ২৫ মণ ডাউল ব্যয় হইয়াছে।

নোয়াখালীর বিভিন্ন গ্রাম হইতে ভারত সেবাশ্রম সংঘের দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত নরনারী

কর্পোরেশন ও প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা—

কলিকাতা কর্পোরেশন আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মেজর জেনারেল শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা পদে নিয়োগের যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সরকার তাহা অনুমোদন না করায় গত ৬ই জানুয়ারী সোমবার কর্পোরেশনের সভায় 'বাঙ্গালা সরকারের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক' বলিয়া ঘোষণা করা হয় ও অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিয়োগ পুনঃসমর্থন করা হয়। ১০ই মার্চ্চের মধ্যে সরকার ঐ নিয়োগ সমর্থন না করিলে উক্ত পদে ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুক্ত ভাস্কর মুখোপাধ্যায়কে নিয়োগ করা হইবে স্থির হইয়াছে। এই সময়ে মিঃ-এস-এম-ইয়াকুব প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার পদে অস্থায়ী ভাবে কাজ করিবেন।

ভারতীয় সাংবাদিক সংঘ—

গত ৫ই জানুয়ারী ভারতীয় সাংবাদিক সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সভাপতি, সহসভাপতি ৬ জন—বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, ডাঃ শশধর সিংহ, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি বসু ও মৌলানা আহম্মদ আলি। সম্পাদক—শচীন্দ্রলাল ঘোষ, যুগ্মসম্পাদক—গোপাল ভৌমিক। কোষাধ্যক্ষ—যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। সহ-সম্পাদক ৪ জন—ভূষণ দাস, রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও সুধীন্দ্রনাথ সরকার।

কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন স্থগিত—

আগামী মার্চ্চ মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে স্থির ছিল। গত ৭ই জানুয়ারী বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট নূতন আদেশ জারি করিয়া ১ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচন স্থগিত রাখিয়াছেন। আবার নূতন করিয়া ভোটার তালিকা স্থির করা হইবে।

শ্রীমতী অণিমা চট্টোপাধ্যায়—

শ্রীমতী অণিমা চট্টোপাধ্যায় পি-আর-এস, ডি-এস্‌সি সম্প্রতি সরকারী বৃত্তি পাইয়া মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইবেন। তিনি ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের

কন্যা ও মার্কিণে গবেষণায় নিযুক্ত ডাঃ বরদানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডি-এস্‌সি।

অধ্যাপকের সম্মান—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও জয়পুরিয়া কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এচ্‌-ডি উপাধি লাভ
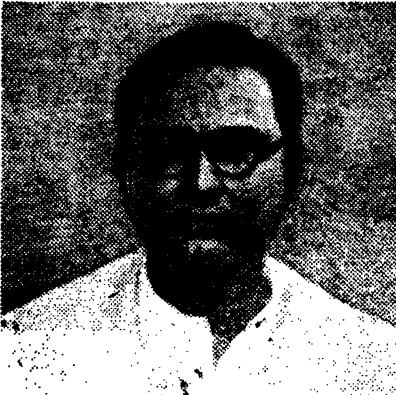
ডাঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

করিয়াছেন। তিনি ইংরাজ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম ও আসাম বিজয় সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ তিন জন পরীক্ষক কর্ত্তৃকই প্রশংসিত হইয়াছে।

অন্তর্বর্ত্তী সরকারের রদবদল—

মিঃ আসফ আলির স্থলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ অন্তর্বর্তী সরকারের নূতন সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় সরকারের দপ্তরগুলি নিম্নলিখিত ভাবে বদল করা হইয়াছে—ডাঃ মাথাই—যানবাহন ও রেল বিভাগ। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী—শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ। মৌলানা আজাদ—শিক্ষা বিভাগ।

আলোর আভাস—

মহাত্মা গান্ধী গত ৭ই নভেম্বর সোদপুর হইতে নোয়াখালী গমন করেন। ৫০ দিন নোয়াখালির সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তার পর গত ২৭শে ডিসেম্বর গান্ধীজি শ্রীরামপুর প্রার্থনা সভায় বলেন—"আলোর আভাস পাইতেছি বলিয়া আমার মনে হইতেছে। যে অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল, সেইরূপ অন্ধকার আমার জীবনে আর কখনও আসে নাই।" বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মহাত্মাজীকে জানাইয়াছেন—তিনি আশা করেন মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং তাহাতে কেবল মাত্র বাঙ্গালার নহে, সমগ্র ভারতেরই কল্যাণ সাধিত হইবে।

অন্তর্বর্ত্তী সরকারের শ্রমিক নীতি—

গত ৩১শে ডিসেম্বর মাদুরায় এক জন-সভায় অন্তর্বর্ত্তী সরকারের শ্রমিক সদস্য শ্রীযুক্ত জগজীবন রাম শ্রমিকদিগকে ট্রেড ইউনিয়নের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ইউনিয়ন গঠন করিতে উপদেশ দেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি শ্রম দপ্তরের ভার গ্রহণ করার পর হইতেই কি ভাবে ভারতীয় শ্রমিকদের উন্নতি বিধান করা যায় সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। সে জন্য এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা হইয়াছে এবং সেই পরিকল্পনা সাধারণ ভাবে শ্রমিক ও মালিকদের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

গত ৩রা জানুয়ারী দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৪ তম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। উহার সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর দুর্দ্দশা নিবারণকল্পে বিজ্ঞানকে নিয়োগ করিতে হইবে। ভারত ইতিপূর্ব্বেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে, কিন্তু দেশের প্রতিভাবান জনগণের মধ্যে শতকরা পাঁচ জনও যদি কোটি কোটি দেশবাসীর উন্নতি কামনা লইয়া বিজ্ঞান চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে আরও অনেক সুফল ফলিত।

খেতাব প্রদান বন্ধ—

এতদিন পর্য্যন্ত বৃটীশ সরকার তাঁহাদের অনুগৃহীত লোকদিগকে বৎসরে দুইবার করিয়া নববর্ষে ও সম্রাটের জন্মদিনে খেতাব প্রদান করিতেন। এবার অন্তর্বর্ত্তী সরকারের নির্দ্দেশ মত সে ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছে। কাজেই কাহারও ভাগ্যে এবৎসর খেতাব লাভ হয় নাই।

সরিষার তৈলের বরাদ্দ হ্রাস—

বাঙ্গালার সরকার গত ৩০শে ডিসেম্বর হইতে সরিষার তৈলের বরাদ্দ হ্রাস করিয়াছেন। মাসে জন প্রতি এখন মাত্র এক পোয়া সরিষার তৈল পাওয়া

যাইবে। বাঙ্গালার লোক খুব বেশী পরিমাণেই সরিষার তৈল ব্যবহার করে। এই ব্যবস্থার ফলে লোকের অসুবিধার অন্ত নাই।

ভারতে দারুণ বস্ত্রাভাব—

দিল্লীর খ্যাতনামা ব্যবসায়ী সার শ্রীরাম এক সতর্ক-বাণী প্রচার করিয়া সকলকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, শীঘ্রই ভারতে খাদ্যের দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা প্রচণ্ডতর বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তাহার কারণ, ভারতে মোটা কাপড়ের চাহিদা অধিক পরিমাণ কিন্তু কাপড়ের কলগুলি মোটা কাপড়ের বদলে সূক্ষ্ম কাপড় উৎপাদনের অধিক চেষ্টা করে। গান্ধীজি গত ২৭ বৎসর ধরিয়া দিনের পর দিন লোককে চরকা চালাইতে বলিয়াছেন; কেহ সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। কাজেই তাহাদের দুর্দ্দশা হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীরামপুরে নেতৃবৃন্দ—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীশঙ্কররাও দেও ও কুমারী মৃদুলা সারাভাই গত ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রি ১১টার সময় নোয়াখালী শ্রীরামপুরে গান্ধীজির শিবিরে উপস্থিত হন এবং শনিবার ও রবিবার তথায় বাস করিয়া গান্ধীজির সহিত বর্ত্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার পর সোমবার শ্রীরামপুর ত্যাগ করেন এবং ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়াছেন। সোমবার বিকালে কলিকাতায় ও মঙ্গলবার সকালে পাটনায় তাঁহারা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সহিতও আলোচনা করিয়াছিলেন।

নির্ব্বাসিতের সংবাদ—

সর্দ্দার অজিৎ সিং খ্যাতনামা দেশকর্মী গত ৪০ বৎসর কাল তিনি ভারতে প্রত্যাগমনের অনুমতি পান নাই। এতদিন তিনি ইরাণ, রুশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, জার্ম্মাণ, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর। এখন অনুমতি পাইয়া তিনি ভারতে ফিরিতেছেন। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের ৩ জন নেতা—হবিবর রহমান, বি-মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার কারোকী যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীতে আটক ছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহারাও ভারতে আসিতেছেন।

লণ্ডন বিমান ঘাঁটিতে মিঃ জিন্না, সর্দার বলদেও সিং প্রভৃতি

বিদেশী বৈজ্ঞানিক দলের আগমন—

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য এক দলে ১৮ জন খ্যাতনামা বিদেশী বৈজ্ঞানিক গত ২রা জানুয়ারী ভারতে আসিয়াছেন। দলে ৯ জন বৃটীশ, ৪ জন আমেরিকান, ৩ জন ক্যানাডিয়ান ও ২ জন ফরাসী আছেন। সার চার্লস ডারউইন দলের নেতা, দলে জ্যোতির্বিদ সার হেরল্ড জোন্স, ভৌগোলিক ডাঃ ডাডলে প্রভৃতিও আছেন।

পরলোকে নলিনীকান্ত দাশ—

চট্টগ্রামের তরুণ জননায়ক ও ব্যবসায়ী নলিনীকান্ত দাস মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি

নলিনীকান্ত দাস

স্বর্গত রায় বাহাদুর ডাক্তার বেণীমোহন দাসের পুত্র। এম-এ পাশ করিয়া তিনি একদিকে যেমন ব্যবসা পরিচালন করিতেন, অন্যদিকে তেমনই রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিতেন। চট্টগ্রাম সহর ও জেলার সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার সংযোগ ছিল।

পরলোকে অখিলবন্ধু গুহ—

ঢাকেশ্বরী কটন মিলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অখিলবন্ধু গুহ গত ২৫শে নভেম্বর ৬৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিখ্যাত আইন ব্যবসায়ী অনাথবন্ধু গুহের পুত্র। প্রথমে তিনি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন—পরে ব্যবসা ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।

পরলোকে যোগেশচন্দ্র সেন—

কলিকাতা নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার নিবাসী যোগেশচন্দ্র সেন এ-আই-এ (লণ্ডন) গত ৯ই নভেম্বর ৭২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি হুগলী গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত শ্যামাচরণ সেন মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র ও ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথম

৺যোগেশচন্দ্র সেন

'একচুয়ারী' পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা ছোট আদালতের উকীল ছিলেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসে বাঙ্গালী—

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মোট ১৩টি শাখার অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে (১) সংখ্যা শাস্ত্র বিভাগে অধ্যাপক আর-সি-বসু (২) পদার্থ বিজ্ঞানে ডাঃ কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) রসায়নশাস্ত্রে ডাঃ পি-কে-বসু (৪) চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডাঃ গণপতি পাণ্ডা (৫) কৃষি বিজ্ঞানে মিঃ এন-এল-দত্ত এবং (৬) পূর্ত্ত বিদ্যায় মিঃ এচ-পি-ভৌমিক সভাপতিত্ব করিয়াছেন। ইহারা ৬ জনই বাঙ্গালী।

পরলোকে কবিরাজ জ্যোতির্ম্ময় সেন

গত ২৩শে পৌষ বুধবার কলিকাতায় খ্যাতনামা কবিরাজ জ্যোতির্ম্ময় সেন ৭১ বৎসর বয়সে ৫৮নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটস্থ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ

সংস্কৃত টীকাকার ভরত মল্লিকের বংশধর ও মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারিকানাথ সেনের ছাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে ও দর্শনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। কলিকাতার মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালীসমাজে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য চিকিৎসকরূপে গণ্য হইতেন। তিনি প্রাচ্য চিকিৎসা বিষয়ক বহু

জ্যোতির্ম্ময় সেন

প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। চন্দননগরে প্রবর্ত্তক সংঘ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলনের মূল সভাপতিরূপে তিনি বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আশ্রিত বৎসল, সদালাপী ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিছিলেন।

শ্যামে প্রথম ভারতীয় কন্‌সাল—

শ্রীযুত ভগবৎ দয়াল বি-এস্‌-সি, বার-এ্যাট্‌-ল, ব্যাঙ্ককে কন্‌সাল নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পদে তিনিই প্রথম ভারতীয় নিযুক্ত হইলেন। সম্প্রতি তিনি ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের স্পেশাল অফিসার হিসাবে কার্য্য করিতেছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। শ্রীযুত দয়াল বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত নানাভাবে জড়িত। তিনি একজন ভাষাতাত্ত্বিক। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর।

পরলোকে হরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী—

প্রবীণ শিক্ষাব্রতী হরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তী গত ১৩ই নভেম্বর ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৮২ সালে বি-এ পাশ করিয়া তিনি বাঙ্গালা ও বিহারের বহু জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ রায় বাহাদুর নরেন্দ্র নারায়ণ ইনকাম ট্যাক্স এপেলেট ট্রাইবিউনালের সদস্য এবং কনিষ্ঠপুত্র বীরেন্দ্র নারায়ণ আই-সি-এস, ও-বি-ই বাঙ্গালা সরকারের সেক্রেটারী। বগুড়া

হরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

জেলার উজ্জলতা গ্রাম তাঁহার বাসভূমি, তিনি তথায় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাবান ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন।

সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী স্পীকার সৈয়দ জালালুদ্দীন হাসেমী গত ৯ই জানুয়ারী রাত্রিতে ৫৩ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহু দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন। তিনি বহুকাল কংগ্রেসের সেবা করেন। খুলনা জেলার সাতক্ষীরা—তেতুনিয়া গ্রামের তিনি অধিবাসী ছিলেন।

পরলোকে কর্ণেল ইন্দুবরণ মল্লিক—

হাজারীবাগ নিবাসী শ্রীযুত গোপীনাথ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্ণেল ইন্দুবরণ মল্লিক গত ১লা জানুয়ারী মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে মোটর দুর্ঘটনায় রাঁচীর নিকট নামকুমে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৯৩৭ সালে আই-এম-

এসে যোগদান করিয়া অল্পকালের মধ্যে কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে কিছুকাল তিনি দিল্লীতে চিকিৎসা

চন্দ্রবরণ মল্লিক

ব্যবসায় করিয়াছিলেন। তিনি বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন।

বাঙ্গালা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ববিহারের ৪৬ হাজার বর্গ মাইল ব্যাপী একটি অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে বাঙ্গালী হিন্দু সংখ্যা-গরিষ্ঠ সম্প্রদায়। তাহা লইয়া এখন একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রস্তাবিত প্রদেশের জন সংখ্যা ১৯৪১ এর আদমসুমারি অনুসারে নিম্নলিখিতরূপ হইবে—

দার্জ্জিলিং জেলা—	৩৭৬০০০
জলপাইগুড়ী জেলা—	১০৮৯০০০
দিনাজপুরের পশ্চিমাংশ—	১৫০০০০০
মালদহের পশ্চিমাংশ—	৮০০০০০
মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ—	৬৫০০০০
যশোহরের সদর	৪৪১৫০০০
ও বনগ্রাম মহকুমা—	৮১২০০০
খুলনা জেলা—	১৯৪৩০০০
কলিকাতা—	৩০০০০০০
২৪ পরগণা—	৩৫৫৩০০০
বর্দ্ধমান বিভাগ—	১০২৮৭০০০
বিহারের পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা	
ও মানভূমের পূর্ব্বাংশ—	৩২০০০০০
মোট	২৭২১০০০০

উড়িষ্যার ৮০ লক্ষ, সিন্ধুর ৪৫ লক্ষ ও সীমান্ত প্রদেশের ৩০ লক্ষ লোক লইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়াছে। বাঙ্গালাকে এই ভাগে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করা সম্ভব কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

বিমানে খাদ্য দান

শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার

ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ—বিমানে আসাম যাইতে হইবে। আমাদের মত বাঙ্গালীর আনন্দ হওয়ারই কথা—আনন্দও হইল আবার তাহার সহিত ভয় যে ছিল না এমন কথা বলিতে পারি না। তথাপি ইহা 'Troubled pleasure' ও welcome fear'!

রবিবার সকাল সাড়ে সাত ঘটিকায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গভর্ণমেণ্টের অতিথি হইলাম, বণ্ড লিখিলাম "আমি আমার নিজ ইচ্ছা অনুসারে বিমানে ঐ স্থানে যাইতেছি—পথে যদি আমি আহত হই তবে আমি কোন ক্ষতি পূরণ দাবী করিতে পারিব না অথবা কোন দুর্ঘটনায় যদি আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে তথাপি আমার পরিবারবর্গ কোন ক্ষতি পূরণ দাবী করিতে পারিবেন না।" তাহার পর—"আমার জিনিস পত্রও আমি আমার নিজ ইচ্ছা অনুসারে 'বেওয়ারিশ' করিয়া দিলাম—অর্থাৎ আমার জিনিস পত্র যদি খোয়া যায় তবু আমি খেসারত চাহিতে পারিব না"।

আমার মৃত্যুর জন্য কেহ ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে আসিবে কিনা জানি না। মনে হয়, আসিবে না। কেন না, কে আসিবে? পিতা, মাতা? হায়রে বরাত! কোন্ পিতা মাতা সন্তানের ক্ষতি অর্থে পূরণ করিবার বাসনা রাখেন তাহা ত জানি না; ভ্রাতারাও যে আসিবে'না

তাহাও ঠিক ! তবে "আর কেহ" থাকিলে কি হইত জানি না কিন্তু আপাততঃ "অন্য কেহ" নাই। সুতরাং সেদিক দিয়া গভর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিতে পারি ! যার প্রাণ ভিক্ষা মেগে খাব—ভাবিয়া নির্ভয়ে নাম ঠিকানা লিখিয়া দিলাম—আমার সঙ্গীরাও তাহাই করিলেন। কিন্তু আমি বাঁচিয়া রহিলাম, গন্তব্যস্থলেও পৌছিলাম অথচ আমার সহযাত্রী, অর্থাৎ জিনিস-পত্র খোয়া যাইবার আশঙ্কা ঘটিতেও পারে এই কথাগুলা কেমন যেন আর ভাল লাগিল না ! তবে সান্ত্বনা এই যে নেহাৎ ছিঁচকে ভিন্ন আমাদের সম্পত্তি নির্খোজ করিবার চেষ্টা কেহ করিবে না।

ব্যাস্ আমরা বেওয়ারিশ্ হইলাম। আমাদের দাম কাণা কড়িও নয়। ফিরি ভাল—না ফিরি আরও ভাল। দেবী চৌধুরাণীর দিন বহুপূর্বে গত হইয়াছে। নহিলে কাণা কড়িতেও ক্রয় করিবার ভাল লোকের অভাব হইত না।

উইলবারফোর্স সাহেব স্কোয়াড্রণ লীডার— আমাদের পরিচালনা করিবেন। যথারীতি আলাপ পরিচয় হইল। এই আলাপ পরিচয়ে আমার একটি কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমরা ইংরাজী শিখি প্রাণপণে মরি বাঁচি করিয়া, কিন্তু সাহেব-গুলার জন্য বেঙ্গলী শিক্ষার ব্যবস্থা নাই কেন ! তাহা হইলে আমাদের ত' এত কসরৎ করিতে হইত না। ইণ্টারিম্ গভর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া একটা আইন করুন, আমরা বাঁচি !

মধ্যভাগে লেখক হাস্যমুখে দণ্ডায়মান

এই স্থানে আমাদের অভিযানের হেতুটি বলিয়া রাখি— ভারত গভর্ণমেণ্ট আসাম গভর্ণমেণ্টের সহযোগীতায়, আসাম-তিব্বত ও আসাম-চীন সীমান্তদ্বয়ে খাদ্যশস্য চালান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা প্যারাসুট সহকারে নিম্নে ফেলা হয়; কারণ এই সীমান্তদ্বয়ের পথ অতি দুর্গম এবং পূর্বে মনুষ্যমস্তকে অথবা অশ্ব পৃষ্ঠে চালান দেওয়া হইত। তাহাতে সময় লাগিত বেশী—খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইত। আর বায়ু রথে, বায়ু পথে নাকি ব্যয় কম, অপব্যয় আরও কম এবং সময় ততোধিক কম। তবে যাহারা বিমান হইতে বস্তা ফেলে তাহাদের জীবনাশঙ্কা সর্ব-সময়। আমাদের দ্রষ্টব্য কেমন করিয়া খাদ্যদ্রব্য ফেলা হয় এবং ইহাতে যে কি অমানুষিক দুঃসাহসের প্রয়োজন হয় তাহার তারিফ করিব। কিন্তু ঘনঘটা আয়োজনের কারণ কি এখনো বলা হয় নাই। সম্প্রতি পণ্ডিত জওহরলাল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পরিদর্শনে গিয়াছিলেন আপনাদের জানা আছে। ঐ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত যে কারণে 'প্রয়োজনীয়', ঠিক সেই কারণে এই উত্তর পূর্ব সীমান্তও 'অত্যাবশ্যকীয়'। সীমান্ত গুলি ভারতের চৌকিদার। আসাম রাইফেল্, বার্মা রাইফেল্ নামধারী সৈন্যবাহিনী অহোরাত্র দুর্গম গিরিপথ রক্ষা করে এবং পার্বত্য উপজাতীয় লোকেরাও এখানে বসবাস করে। তাহারা বায়ু, বরফ অথবা পাহাড়ের ঢেলা ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না ! তাই রসদের এই ব্যবস্থা।

প্লেনে উঠিয়া বসিলাম—গরীবের ছেলে—পূর্বে গ্রামে থাকিতে ন্যাসানাল ট্রান্সপোর্ট (গরুর গাড়ী) চড়িতাম, এখন সভ্য হইয়াছি—সহরে আসিয়াছি—বাসে, ট্রামে চড়ি এবং আত্মীয় স্বজনের গৃহে বিবাহাদি হইলে গাড়ী পাঠায়

কালে ভদ্রে তাহা চড়িয়া আরাম পাইয়াছি। কিন্তু এ *গরুর গাড়ীও নয় আর মোটর গাড়ীও নয় একেবারে* বিমানপোত। কেমন যেন রোমখাড়া হইয়া উঠে। আঃ, এই সময় আত্মীয় স্বজন কেহ আসিয়া পড়ে না। অথবা বন্ধুবান্ধব কেহ আসিয়া পড়িলে কি ভালই হইত! বুঝিত যে তাহাদের মত রামা, শ্যামা নিধে শঙ্করা নই, একটা কেও কেটা হইয়াছি, পরে যখন এই গল্প বলিব তখন হয়ত কেহ বিশ্বাস করিবে না।

যাহা হউক প্লেনে উঠিয়া বসিলাম। প্লেন ছাড়িবে—৯-৩০ মিনিটে। আমার সঙ্গীরা এবং আমাদের পরিচালক—Conducter সাহেবও উঠিলেন। পাইলট্‌ ও ক্রু উঠিল তাহার পর আমাদের কোমরে বেল্ট পরানো হইল—ভাগ্য ভাল দড়ি দেয় নাই। (বেওয়ারিশ্‌ মাল ত বটি!)

পাইলট অভয় বাণী দিয়া প্লেন ছাড়িল—বাবাঃ—সেই আওয়াজেই কানে তালা লাগিয়া গেল। হঠাৎ এক ঝাঁকানি খাইয়া বাহিরে তাকাইলাম। চতুষ্পার্শ্বের সুদীর্ঘ সুন্দর নারিকেল গাছ গুলি কোন্‌ যাদু স্পর্শে এমন গাঁদা মল্লিকা গাছ হইয়া গেল। লাল নীল রঙের তাসের ঘর বাড়ী গুলি দেখিতে মন্দ লাগে না। একটু পরে তাহাও গেল। এমন যে প্রশস্ত বক্ষ ভাগীরথী তাহাও, প্রথমে খালির নালা, তারপর সূত্রাকারে পরিণত হইলেন। পরে আর কিছুই নাই, মেঘ ছাড়া। উপরে মেঘ, নীচে মেঘ, আশে পাশে মেঘ। মেঘের মাঝে ধরণী বিলীন। মাটির মায়া কি সহজে ভোলা যায়? তাই জানালার কাচে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া আছি, কখন তাঁহাকে—আমাদের সেই মা-টিকে দেখিব! মাঝে মাঝে দেখা যায় বটে, কিন্তু তখনই বিচিত্র বর্ণের মেঘ নারীরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বেলা বারোটার সময় মোহনবাড়ী আসিলাম। মরি নাই—আহতও হই নাই আর মালও হারায় নাই। 'লাল বরণ' কুলিরা মাল নামাইল তাহাও দেখিলাম—আনন্দ হইল—কারণ বরাবর ইহাদের সেলাম বাজাইয়াছি—গালমন্দ খাইয়াছি কিন্তু ইহাদের মোট নামাইতে দেখি নাই। নেতাজী যখন বিলাতে ছিলেন তখন তাঁহার সকল কাজ ইংরাজ চাকরে করিত—তাঁহার বড় আনন্দ হইত। আমি বিলাত না যাইয়া ইংরাজকে মোট বহাইয়া লইলাম—মন্দ কি? বরাবর ত আমরাই তাহাদের তল্পী বহন করিয়াছি।

আমরা রাজ অতিথি—থাকিব চাবুয়া মোহনবাড়ী হইতে সাত মাইল দূরে। ট্রাক হাজির ছিল—হুস করিয়া পৌঁছাইয়া গেলাম। আমেরিকান হোটেল—খালি সাহেব সুবার ভীড়। অবশ্য বাঙ্গালীও আছেন। আমাদের জন্য একটি প্রকাণ্ড ঘর সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। ঘরে ঢুকিয়া অবাক হইলাম এ যে ইন্দ্রপুরী—এত আলো—এত পাখা! কথায় বলে, ইয়াঙ্কি কাণ্ডকারখানা।

লাঞ্চের সময় হইয়াছিল—কাঁটা চামচের আওয়াজ—ভাগ্যে বাজনা বাজিতেছিল নহিলে সর্বনাশ ঘটিত। প্লেটগুলা যে ভাঙ্গে নাই সে তাহাদের পরমায়ুর জোর। সঙ্গীরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই—কেহ কেহ প্রায় সফলও হইয়াছিলেন। সঙ্গীদের মন্তব্য আমার মন্দ লাগে নাই—আরে মশাই বাঙ্গালীর ছেলে চিরকাল খোদার দেওয়া কাঁটা চামচে খেয়ে অভ্যাস! এ সকলে পেট ভরবে কেন?

দ্বিপ্রহরে ডিব্রুগড়ে বেড়াইয়া আসিলাম। দেখিবার কিছুই নাই—অতএব লিখিবার বিষয় নহে। নভেম্বর মাস, বর্ষার রাজরাজেশ্বরী ব্রহ্মপুত্র এখন হিন্দু বিধবার বেশ ধারণ করিয়াছেন। সে পুলক নাই. সে হিল্লোল নাই, নাই সে কল্লোল। বিস্তীর্ণ বালুবক্ষ একেবারে মরুভূমি করিয়া দিয়াছে।

রাত্রি বেলা উইলবারফোর্স আসিলেন, বলিলেন—কল্য আমাদের R. A. F. বায়ু বন্দর মোহনবাড়ী যাইতে হইবে—উইঙ্গ কমাণ্ডার কুক একটি কন্‌ফারেন্স ডাকিয়াছিল। ভাল কথা, কিন্তু ইংরাজী ভাষা ভাল নয়—লেখা থাকিলে পড়া যায়, শুনিলে বোঝা যায় না। কিন্তু বরাৎ বলিহারী! জ্বরের ভয়ে দেশ ছাড়িলাম, তেঁতুল তলায় বাসা। এখানেও প্রেস কনফারেন্স! ঢেঁকির স্বর্গ গমন আর কি!

পরদিন হাজিরা দিলাম। স্কোয়াডরণ্‌ লীডার, লেফটেনান্ট কর্ণাল, ইত্যাদির ছড়াছড়ি। আলাপ পরিচয় হইল। কুক সাহেবকে আমার ভাল লাগিল—অমায়িক ভদ্রলোক। কেমন করিয়া খাদ্যশস্য প্যাক্‌ করা হয়, কেমন করিয়া তাহাতে প্যারাসুট বাঁধিয়া দেওয়া হয় তাহাও দেখিলাম, এই সব কাজগুলা অবশ্য করে আমাদের দেশী লোকেরা। প্লেন হইতে কেমন করিয়া খাদ্যশস্য ফেলা হয়

তাহারও প্রদর্শন হইল। এখন প্লেন চালাইলেন স্বয়ং উইঙ কমাণ্ডার কুক। কুক সাহেব বড় যে সে লোক নহেন—ইনি হিটলারের জার্মানীতে বোমা বর্ষণ করিতেন। দুইটি টীন প্যাক প্যারাসুটে করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইল—হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে লৌহখণ্ডদ্বয় ধরণীতে আসিয়া নামিল, আমরা নীচে দাঁড়াইয়া দেখিলাম।

তাহার পর কুক সাহেবের ঘরে গিয়া বসিলাম। তিনি বুঝাইতে লাগিলেন—সর্বসমেত এগারোটি আউট-পোষ্ট আছে। যে সকল স্থানে খাদ্যশস্য ফেলা হইবে, অতি দুর্গম সে পথ। কোনখানে পাহাড়ের উচ্চতা ১২ হাজার ফিট, তাহা পার হইয়া যাইতে হয়। কোন জায়গায় বিমানপথ এত সঙ্কীর্ণ যে ধাক্কা খাওয়া বিচিত্র নয়। অন্য জায়গায়—যেখানে পথ সঙ্কীর্ণ নয় সেখানে প্রচণ্ড হাওয়ায় বিমানের প্রপেলার ভাঙ্গিয়া যায় অথবা দিগভ্রষ্ট হইয়া পাহাড়ে ধাক্কা খায়। তবে এ ভরসাও দিলেন কুক সাহেব যে, পাইলট্‌গণ অতি নিপুণ, দক্ষ এবং সুশিক্ষিত। ইহারা অতি যত্ন সহকারে প্লেন চালনা করে—যদি বিধি নিতান্ত বাম না হন্ তাহা হইলে কদাচিৎ দুর্ঘটনা ঘটে। তিনি বলিলেন যে, বিমান ছাড়ার বহুপূর্বে তাহার পরীক্ষা করা হয়। চৌদ্দখানি নূতন বিমান আনা হইয়াছে। সম্পূর্ণ নিখুঁত না হইলে সে প্লেন এই দুরারোহ আকাশ পথে চালান হয় না। স্থির হইল আমাদের আগামী কল্য প্রত্যূষে যাত্রা করিতে হইবে। নিশীথ-রাতে আমাদের বৈঠক বসিল ; আপনারা শিয়াল সংসদ বলিতে চাহেন বলুন, আমরা শুনিতে আসিব না। এক প্রবীণ ব্যক্তি কহিলেন, এত দিনে বোঝা গেল—যে প্রাণ যাবার তাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না। আর একজন সাধন সঙ্গীত সুরু করিলেন—মেঘোরে আসামে চড়িনু বিমান। নিঃশেষে বাহিরায় তাজা এ পরাণ। প্রস্তাব হইল, Sudden indisposition: অথবা Strange illness হইতে দোষ কি! আর হেতু পড়িয়াই আছে, এরূপ ভূরিভোজ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বঙ্গবাসীর উদরে জীববিশেষের মৃতবৎ প্রতিক্রিয়া না হইলেই বিস্ময়ের বিষয় হইত।

সত্যকথা বলিতে কি, প্রস্তাব সঙ্গত মনে হইল না। আমি ঘোর প্রতিবাদ করিলাম এবং দেখিলাম দু'একজন আমার সঙ্গে সায় দিতে উদ্যত হইয়াছেন (যদিও সভয়ে)। দেখিয়া জোর করিয়া বলিলাম, মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান। ধীরে রজনী, ধীরে। ভোর বেলা দেখিলাম, সকলেই টাই আঁটিতেছেন।
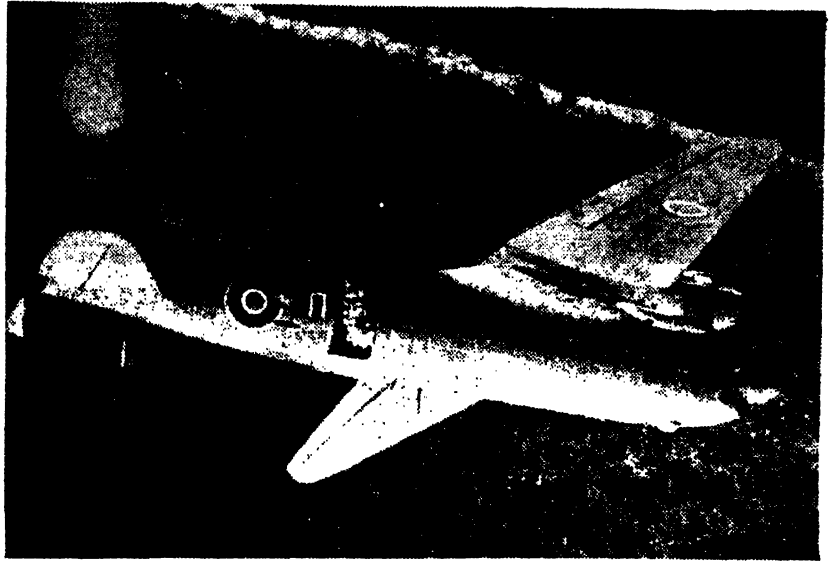
খাদ্য-সরবরাহকারী উড্ডীয়মান বিমান

ভোর পাঁচটার সময় হোটেল হইতে রওনা হইলাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সর্বশরীর কাঁপিতেছে। ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে এরোড্রোমে উপস্থিত হইলাম। আমরা উপস্থিত হইতেই দেখি, পাইলট, ক্রু, স্কোয়াডরণ লীডার আমাদের ঘিরিয়া ধরিয়াছে। একজন বলিলেন, আমাদের কি চিড়িয়াখানার জন্তু ভেবেছে যে গো-গ্রাসে দেখছে। ভরসা দিলাম না। জীবজন্তু দেখিবার বাসনা হ'লে আসিতে নিজেদের দেখলেই পারতো। আবার বলিলাম—ইহারা হয়ত ভাবিতেছে—এই যে ইহাদের পাঠাইয়া দিতেছি, ইহারা ত আর ফিরিয়া আসিবে না—একবার শেষ দেখা দেখিয়া লই।

আমাদের প্যারাসুট ক্রমে লইয়া যাওয়া হইল। শরীরে Harness (জিন ?) পরিলাম—বুকে প্যারাসুট বাঁধিয়া দেওয়া হইল। হাঁটিতে গিয়া দেখি পা আর চলে না—শরীরের যে পরিমাণ ওজন বৃদ্ধি হইয়াছে—তাহা আমার মত বকের ঠ্যাঙের পক্ষে অবহনীয় ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবু কি নিষ্কৃতি আছে। কাঁধে চড়িল কিট্‌স ব্যাগ। ইহার ভিতর নাই এমন জিনিস আমি জানি না। যখন প্যারাসুট করিয়া নামিতেই হইবে তখন খাদ্যদ্রব্য সাথে থাকাই ভাল—ঔষধ না থাকিলে নয় সুতরাং তাহাও আছে। দিগ্‌-ভ্রষ্ট না হইতে হয়—একটি পয়সার আকারের কম্পাস আছে—তাহার সহিত একটি মানচিত্র। শরীরে অত্যধিক কষ্ট হইলে ভিটামিন কমিয়া যাইতে পারে—সুতরাং ভিটা-মিন ট্যাবলেট থাকা ভাল। বিস্কুট, লজেন্স, চকোলেট, চুইং গ্যাম, সিগারেট দিয়াশলাই এবং ষোলটি বঁড়শী। বুঝিতে পারিলেন না বুঝি। বুঝাইয়া দিতেছি, ধরুণ, বিমান খারাপ হইয়া গেল, আপনি প্যারাসুটে ঝুলিয়া ভাসিয়া নামিয়া পড়িলেন; কাকস্য পরিবেদনা, উদ্ধার পাইতে বিলম্ব হইতেছে, খাইবেন কি? ভিটামিন ট্যাবলেট খান, দু'একদিন অন্য ভক্ষদ্রব্যের প্রয়োজনাভাব বুঝিবেন। তবু যদি অগ্নি জ্বলে তাহা হইলে—এই সব দেশে যথেষ্ট ছোট ছোট পার্বত্য নদী আছে—তাহাতে অজস্র মাছ—বঁড়শী সঙ্গে মা ভৈঃ বলিয়া আপনি মাছ ধরিতে বসিয়া গেলেন। মাছ ধরিয়া, দেয়াশলাই আছে, ভয় কি পুড়াইয়া আপনার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—বঁড়শীর সহিত সুতাও আছে।

প্লেনে উঠিলাম—হরি হরি—বসিবার জায়গা কোথায়—চালের বস্তাতেই জায়গা ভর্তি ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! পাইলটকে জিজ্ঞাসা করিলাম—স্মিত হাসিয়া সে বলিল—ওই ত বস্তার উপর বসবেন, কিছু অসুবিধা হবে না। মনে ভাবিলাম—তোমার অসুবিধা না হইতে পারে, তোমরা জন্মজন্মান্তর বৃক্ষশাখায় বসা অভ্যাস করিয়াছ—আমার বিলক্ষণ অসুবিধা হইবে। পাইলট লোকটি ভাল। নিজ হস্তে বস্তা সাজাইয়া খানিকটা বসিবার জায়গা করিয়া দিল; তাহার পর বলিল—আমাদের জার্নি করতে হবে সাড়ে তিন ঘণ্টা, আপনাদের একটু বসবার অসুবিধা হল—কিন্তু আমি নিরুপায়। আজিকার ওয়েদার বুলেটিন জেনেছি—কিছু ঝড়ঝাপ্টা পাওয়া যাবে—কিঞ্চিৎ বৃষ্টিও পাব আমরা কিন্তু তাতে চিন্তিত হবার কোন কারণ নাই—আপনারা যেন ভয় পাবেন না। পথের মনোরম দৃশ্যাবলী আপনাদের আনন্দ দান করবে। এখন আপনাদের আমরা ট্রেণ্ড ক্রু (শিক্ষিত ও দক্ষ নাবিক) বলে ধরে নিচ্ছি—সেইজন্য আপনাদের এবার আর বেল্ট বাঁধা হবে না। আচ্ছা, আমি এখন বিদায় নিচ্ছি।

সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখি প্রায় সকলেরই মুখ রক্তশূন্য। আমারও যে ভয় হয় নাই তাহা নহে। ভেতো বাঙ্গালী একে ব্যোম পথে ভ্রমণ, তাহার উপর ঝড় ঝাপ্টা বৃষ্টি! তাহা হইলেও মুখে সাহস আনিয়া বলিলাম—কি মশায়—ভয় কি, মরলে ত' আর আমরা একা মরব না। সহমরণের লোক আছে! ওরাও ত' মরবে—আর তা ছাড়া ওরা খুব দক্ষ পাইলট। আমার কথায় তাঁহারা নিম্নস্বরে কি একটা বলিলেন—ঠিক না বুঝিতে পারিলেও এইটুকু বুঝিতে পারিলাম যে, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতায় তাঁহারা যথেষ্ট সন্দিহান।

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ
ইংলণ্ড : ২৫৫ ও ৩৭১
অষ্ট্রেলিয়া : ৬৫৯ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৩৩ রাণে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে। ১৮৯৮ সালের পর থেকে ইংলণ্ড পর পর দুটো খেলায় এ রকম ভাবে দু'বার ইনিংসে কখনও হারে নি। ১৯২৫ সালের পর সিডনিতে ইংলণ্ডের সঙ্গে যতগুলি খেলা হয়েছে তার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া দলের এই প্রথম জয়লাভ।

সিডনিতে ১৩ই ডিসেম্বর ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা আরম্ভ হ'ল। ইংলণ্ড প্রথম টসে দিতে ব্যাট ক'রে প্রথম দিনের খেলার শেষে ৮ উইকেটে ২১৯ রাণ তুলে।

দ্বিতীয় দিনের খেলা ঝড়-বৃষ্টির জন্য বেশীক্ষণ হয় নি। সর্ব্বসমেত মাত্র ৯৩ মিনিট খেলা হয়েছিল। ইংলণ্ডের বাকি দুটো উইকেটে আর ৩৬ রাণ যোগ হ'লে পর তাদের প্রথম ইনিংস ২৫৫ রাণে শেষ হয়ে যায়। দলের সর্ব্বোচ্চ ৭১ রাণ করলেন এডরিচ ; তার পর উল্লেখযোগ্য এ্যাকিনের ৬০ রাণ। জনসন ৩০ ওভার বলে ১২টা মেডেন নিয়ে এবং ৪২ রাণ দিয়ে ৬টা উইকেট পেলেন। ম্যাককুল পেলেন ৩টে উইকেট—২৩ ওভার বলে ৭৩ রাণ দিয়ে।

অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস আরম্ভ হ'ল এবং লাঞ্চের সময় প্রবল বারিপাত দেখা দিল। সে সময় কোন উইকেট না হারিয়ে ৭ রাণ উঠেছে। ৪টের সময় বারিপাতের দরুণ খেলা বন্ধ হয়ে গেল। ১ উইকেট হারিয়ে ২৭ রাণ অষ্ট্রেলিয়ার হয়েছে। সূচনা ভাল হোল না।

তৃতীয় দিনের খেলায় লাঞ্চের সময় অষ্ট্রেলিয়া দলের ২ উইকেটে ৮৮ রাণ উঠলো। তৃতীয় উইকেট ৯৬ রাণে এবং ৪র্থ ১৫৯ রাণে পড়ে যায়। ব্র্যাডম্যান বার্ণেসের সঙ্গে জুটী হ'ন। তৃতীয় দিনের শেষে অষ্ট্রেলিয়া দলের ৪ উইকেটে ২৫২ রাণ উঠে। ওপনিং ব্যাটসম্যান বার্ণেস ১০৯ এবং ব্র্যাডম্যান ৫২ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। টেষ্ট খেলায় বার্ণেসের এই প্রথম 'সেঞ্চুরী'। এডরিচ ৫৯ রাণে ৩টে উইকেট পেলেন।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে অষ্ট্রেলিয়া দলের ৬ উইকেটে ৫৬৪ রাণ উঠলো। ব্র্যাডম্যান ও বার্ণেস উভয়েই ২৩৪ রাণ করলেন।

পঞ্চম দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দল এক ঘণ্টা খেলে ২টো উইকেট হারিয়ে ৮৮ রাণ তুলে এবং ৮ উইকেটে মোট ৬৫৯ রাণ ক'রে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলো। অষ্ট্রেলিয়াতে এর পূর্ব্বে যতগুলি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে কোন দলই এত অধিক রাণ তুলতে পারে নি। সুতরাং ৮ উইকেটে উভয় দলের পক্ষে ৬৫৯ রাণ সর্ব্বোচ্চ রাণ হিসাবে গণ্য হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের পক্ষে রেকর্ড রাণ উঠেছিল ৬৩৬, ১৯২৮ সালের সিডনিতে।

ইংলণ্ড তার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে দিনের শেষে ৩ উইকেটে ২৪৭ রাণ তুললো। এডরিচ এবং হ্যামণ্ড যথাক্রমে ৮৬ এবং ১৫ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

ষষ্ঠ দিনের খেলায় লাঞ্চ সময়ে ৫ উইকেটে ইংলণ্ডের

৩১৬ রাণ উঠে। লাঞ্চের পর ইংলণ্ডের দারুণ ভাঙ্গণ দেখা দিল। ৫০ মিনিট খেলায় আর মাত্র ৫৫ রাণ যোগ হবার পর বেলা ৩টে ৬ মিনিটে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৭১ রাণে শেষ হয়ে গেল। এডরিচ দ্বিতীয় ইনিংসে দলের সর্ব্বোচ্চ ১১৯ রাণ করলেন। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এডরিচের এই প্রথম সেঞ্চুরী। ম্যাককুল সব থেকে বেশী ৫টা উইকেট পেলেন ৩২৪ ওভার বলে ১০৫ রাণ দিয়ে।

আর তিনটি টেষ্ট ম্যাচ বাকি আছে। ইংলণ্ডকে 'Ashes' পেতে হলে উপর্যুপরি তিনটি টেষ্ট খেলাতেই জয়লাভ করতে হবে। ঠিক অনুরূপ অবস্থায় অষ্ট্রেলিয়াকে পড়তে হয়েছিল ১৯৩৬ সালে। সেবার প্রথম দুটো টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ড জয়ী হয়। বাকি তিনটেতে জয়ী হ'য়ে অষ্ট্রেলিয়া 'Ashes' পায়।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বিহার : ১৪৯ ও ২৪২ (এস ব্যানার্জ্জি ৮৫ রাণ)

হোলকার : ৩৯৭ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ; মুস্তাক আলী ১২৫, সারভাতে ৯৫ ; এস ব্যানার্জি ১০২ রাণে ৫ উইকেট পান)

হোলকার এক ইনিংস ও ৬ রাণে বিহার প্রদেশকে পরাজিত করেছে।

সি পি ও বেরার : ১০৯ ও ২৬২

হায়দ্রাবাদ : ৩৬৩ ও ১১ (২ উইঃ)

রঞ্জি ট্রফির দাক্ষিণাঞ্চলের খেলায় হায়দ্রাবাদ ৮ উইকেটে সি-পি ও বেরারকে হারিয়েছে।

টেনিস ঃ

সাউথ ক্লাবের উদ্যোগে ন্যাশানাল লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানশীপের খেলা শেষ হয়েছে।

সিঙ্গলসের ফাইনালে সুমন্ত মিশ্র ৪—৬, ৬—৩, ৬—২ ও ৬—৪ গেমে ভারতীয় ২নং টেনিস খেলোয়াড় ম্যানমোহনকে পরাজিত ক'রে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছেন। ম্যানমোহন প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে চেকের ১নং টেনিস খেলোয়াড় জে ড্রোবনিকে ৬—৩, ৫—৭, ৪—৬, ৬—৪, ৭—৫ গেমে পরাজিত ক'রে অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেন। উক্ত চেক টেনিস খেলোয়াড় পৃথিবীর ১নং টেনিস খেলোয়াড় জ্যাক ক্র্যামারকে হারিয়ে ছিলেন। সেই কারণে সকলেরই ধ্রুব বিশ্বাস হয়েছিল যে, ম্যানমোহন ফাইনালে সুমন্ত মিশ্রকে নিশ্চয়ই পরাজিত করতে পারবেন।

মিক্সড ডবলসে জে-এম-মেটা ও মিসেস ক্যার্গিন ৬—২, ৬—১ গেমে এস-এল আর সোহনী ও মিসেস সিংহকে পরাজিত করেন।

প্রবীণদের সিঙ্গলে আর ম্যাকৃলয়েড ৩—৬, ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে জে এল টেলরকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসে এস-এল-আর সোহনী ও ইফতিকার আমেদ ৬—৩ ও ৬—২ গেমে জে ড্রোবনি ও জে কাসকাকে পরাজিত করেন। (দ্বিতীয় সেট খেলার পর জে ড্রোবনি ও তাঁর সঙ্গী অবসর গ্রহণ করেন)

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিসেস কে সিংহ মিস উডব্রিজকে পরাজিত করেন।

সন্তোষ ট্রফি ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালের দ্বিতীয় দিনে মহীশুর ২—১ গোলে বাঙ্গলা প্রদেশকে পরাজিত ক'রে সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী হয়েছে।

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়া : ৩৬৫ ও ৫৩৬

ইংলণ্ড : ৩৫১ ও ৩১০ (৭ উইকেট)

মেলবোর্ণে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেষ্ট খেলা ড্র গেছে।

১লা জানুয়ারী মেলবোর্ণ মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার ক্যাপটেন ব্র্যাডম্যান টসে জয়লাভ ক'রে ব্যাট করার প্রথম সুযোগ গ্রহণ করেন এবং সারাদিন অষ্ট্রেলিয়া দল ব্যাট ক'রে ২৬৫ রাণ করে। দলের মোট ১৯২ রাণের মধ্যে মরিস, বার্ণেস, হ্যাসেট, ব্র্যাডম্যান এবং জনসন এই ছ'জনের উইকেট পড়ে যায়। ইংলণ্ডের বোলিং খুবই ভাল হয়েছিল। ব্র্যাডম্যান ৭৯ রাণ ক'রে ইয়ার্ডলির বলে বোল্ড হয়ে যান।

দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস ৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট খেলার পর ৩৬৫ রাণে শেষ হ'ল। দলের সর্ব্বোচ্চ ১০৪ নট আউট রাণ করলেন ম্যাককুল। টেষ্ট খেলায় এই তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। ম্যাককুল তিন ঘণ্টা উইকেটে ছিলেন এবং মোট ৮টা বাউণ্ডারী করেন। স্থানীয় জনৈক কোটিপতি ম্যাককুলের খেলায় খুসী হয়ে পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে প্রতি রাণে একপাউণ্ড প্রদান করেন। বেডসর

ও এডরিচ ৩টি ক'রে উইকেট পান। রাইট ও ইয়ার্ডলি পান ২ টো ক'রে।

ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের সূচনা ভাল হ'ল না। দলের ৮ রাণে হাটনকে ম্যাক্‌কুল প্রথম স্লিপে ধরে ফেলেন। চায়ের পর ইংলণ্ডের ১ উইকেটে ৪৮ রাণ উঠে। দিনের শেষে আর কোন উইকেট না গিয়ে ১৪৭ রাণ দাঁড়ায়। এডরিচ ৮০ এবং ওয়াসব্রুক ৫৪ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিনের খেলায় ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ৩৫১ রাণে শেষ হ'ল। ওয়াসব্রুক ৬২, এডরিচ ৮৯ এবং ইয়ার্ডলি ৬১ রাণ করেন। স্পিন বোলার ডোনাল্ড ৬৯ রাণে ৪টে উইকেট পান। ম্যাক্‌কুল ও লিণ্ডেন ২টো ক'রে পান।

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৪ রাণে অগ্রগামী থেকে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। দিনের শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে ৩৩ রাণ উঠে।

৪র্থ দিনের খেলার শেষে অষ্ট্রেলিয়া দলের ৪ উইকেটে ২৯৩ রাণ উঠে। ২৩ বছরের লেফ্‌ট হ্যাণ্ড ব্যাটসম্যান মরিস সেঞ্চুরী ক'রেন। তাঁর নট আউট ১৩২ রাণই সর্ব্বোচ্চ ছিল। ১৯২৬ সালে অষ্ট্রেলিয়ার লেফট হ্যাণ্ড ব্যাটসম্যান ওয়ারেণ বার্ডসলে ১৫২ নট আউট রাণ করেন। মরিস ৫½ ঘণ্টা ব্যাট করেন। বাউণ্ডারী করেন ৬টা এবং ৪১ রাণের মাথায় একবার 'chance' দিয়ে ছিলেন। সেই সময় থেকে আর কোন লেফট হ্যাণ্ড ব্যাটসম্যান টেষ্টে সেঞ্চুরী করতে পারেনি। ইয়ার্ডলে ৫৫ রাণে ৩টে উইকেট পেলেন। ব্র্যাডম্যানের উইকেট এবারও তিনি পান।

চতুর্থ দিনে সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, দর্শক সংখ্যা ৭২,০২২ হয়েছিল। অর্থ উঠেছিল ৯,৪৩৪ পাউণ্ড পৃথিবীর ক্রিকেট খেলায় পুনরায় ইহা রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে।

পঞ্চম দিনে অষ্ট্রেলিয়া দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩৬ রাণ উঠে। দলের সর্ব্বোচ্চ ১৫৫ রাণ করলেন মরিস। লিণ্ডেন করলেন ১০০ এবং ট্যালন ৯২ রাণ। বেডসার, ইভার্ডলে এবং রাইট প্রত্যেকে ৩টে ক'রে উইকেট পেলেন।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে দিনের শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে ৯১ রাণ তুলে। হাটন ও ওয়াসব্রুক যথাক্রমে ২৫ ও ৬০ রাণ ক'রে নট আউট থাকে।

টেষ্ট খেলার ৬ষ্ঠ দিনের শেষে ইংলণ্ড দলের ৭ উইকেটে ৩১০ রাণ উঠলে পর তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ ড্র হয়ে গেল। ওয়াসব্রুকের ১১২ দলের সর্ব্বোচ্চ রাণ হ'ল। ইয়ার্ডলির নট আউট ৫৩ উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনী ক্রিকেট ঃ

ইডেন গার্ডেনে ইংলণ্ড-প্রত্যাগত ভারতীয় একাদশ দল বনাম ভারতীয় অবশিষ্ট দলের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় অবশিষ্ট দল এক ইনিংস ও ১৪৭ রাণে পরাজিত হয়েছিল।

ইংলণ্ড-প্রত্যাগত ভারতীয় দল—৬১২ (৬ উইকেটে ডিক্লে)

ভারতীয় অবশিষ্ট দল ঃ ৩২১ ও ১৪৪

ইংলণ্ড-প্রত্যাগত ভারতীয় একাদশ দলের পক্ষে লালা অমরনাথ 'ডবল সেঞ্চুরী' এবং আর এস মোদী সেঞ্চুরী করেন। অমরনাথ ২৬২ রাণ করেন আর মোদী করেন ১৫৩ রাণ। এছাড়া গুলমহম্মদের ৫২ ও সোহনীর ৫৮ রাণ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংসে কে এস রঙ্গনেকারের ১৭১ দলের সর্ব্বোচ্চ রাণ হয়েছিল।

কলকাতার লালা অমরনাথ এই প্রথম 'ডবল সেঞ্চুরী' করলেন। তাঁর ২৬২ রাণ তুলতে মোট ২৮০ মিনিট সময় লাগে। বাউণ্ডারী করেন ৩২টা। আর মাত্র ৭টা রাণ করতে পারলে ক'লকাতার ওয়াজীর আলির সর্ব্বোচ্চ ২৬৮ রাণের রেকর্ড ভাঙতে পারতেন। আর এস মোদীর কলকাতায় এই প্রথম সেঞ্চুরী। তাঁর নিজস্ব ১১৪ রাণের সময় তিনি পায়ে আহত হয়ে মাঠের বাইরে যান এবং পরে 'রাণারের' সহযোগিতায় খেলতে থাকেন। প্রথম দিন ১৫৩ ক'রে নট আউট থাকেন। দ্বিতীয় দিন আর খেলতে নামেন নি, অবসর গ্রহণ করেন। ইংলণ্ড প্রত্যাগত ভারতীয় একাদশ দলের ৬ উইকেটে ৬১২ রাণ কলকাতায় সর্ব্বোচ্চ রেকর্ড স্থাপন করেছে। অবশিষ্ট ভারতীয় দলের একমাত্র কে এস রঙ্গনেকারের খেলাই উল্লেখযোগ্য ছিল।

ইংলণ্ড প্রত্যাগত ভারতীয় একাদশ—মার্চেন্ট (ক্যাপটেন) হিণ্ডেলকার, অমরনাথ, মানকাদ, সোহনী, মুস্তাকআলী, এস ব্যানার্জী, সিন্ধে, সারভাতে ও গুলমহম্মদ। অবশিষ্ট ভারতীয় দল :—মহারাজা কুচবিহার (ক্যাপটেন),

বালেন্দু সাহা, রনবীর সিংজি, কিষেন চাঁদ, এন চ্যাটার্জী, কে রজনেকার, কাদকার, কজল মহম্মদ, গিরিধারী ও এন চৌধুরী।

অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় দল ঃ

বর্ত্তমান বছরের অক্টোবর মাসের ১৭ই থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দল অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যে ক্রিকেট খেলবে তার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। জানা গেছে, ভারতীয় ক্রিকেট দল বনাম অষ্ট্রেলিয়া দলের ৫টি ৬ দিন ব্যাপী টেষ্ট ম্যাচ হবে। খেলার যে তালিকা প্রস্তুত হয়েছে তা ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের অনুমোদন লাভের জন্য পাঠানো হবে।

ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ম্যাচ ঃ

টেষ্ট খেলা প্রথম আরম্ভ হয়েছে ১৮৭৬-৭৭ সালে। এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড—অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে ১৪৪টি টেষ্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ৫৮টি খেলায় জয়লাভ করেছে। ইংলণ্ড জয়ী হয়েছে ৫৫টি টেষ্ট ম্যাচ। বাকি ৩১টি ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

টেষ্টম্যাচে ইংলণ্ডের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণে জয়—১ ইনিংস ৫৭৯ রাণ ৫ম টেষ্ট, লর্ডস মাঠে ১৯৩৮ সালে।

টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রাণে জয়—১ ইনিংস ৩৩২ রাণ ১ম টেষ্ট ব্রিসবন ১৯৪৬।

ব্যক্তিগত রাণ—হাটন—৩৬৪। ১৯৩৮ সালের ৫ম টেষ্ট ম্যাচে হাটন এই রাণ ক'রেন এবং ব্র্যাডম্যানের ১৯৩০ সালে স্থাপিত ব্যক্তিগত ৩৩৪ রাণের রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল ঃ

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার দরুণ এবছর আই-এফ-এ শীল্ডের এবং অন্যান্য ফুটবল খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলাও স্থগিত ছিল। বাঙ্গালোরে আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল খেলা হবে বলে জানা গেছে। বাঙলা দেশ থেকেও একটি ফুটবল টীম প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে এবং এই দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচনের প্রাথমিক ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

ভ্রমণে পৃথিবীর রেকর্ড ঃ

ইংলণ্ডের ৪৭ বছরের বার্ট কাউজেনস ৪৮ দিনের অবিরাম ভ্রমণে ৩০০০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে পৃথিবীর অবিরাম ভ্রমণের নতুন রেকর্ড ক'রেছেন। তিনি মাত্র ২৬ ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়েছিলেন ৬ জোড়া জুতো বদলাতে এবং ১০০ গ্যালন চা খেতে। ১৩৭ বছর পূর্ব্বে ব্রিটেনের ক্যাপটেন জে-বার্কলেস অবিরাম ভ্রমণের যে রেকর্ড করেছিলেন তা এতদিন কেউ ভাঙতে পারেনি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "বন-জ্যোৎস্না"—২৸০

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র"—৬৲

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী প্রণীত "কিশোরদের বিশ্বকবি"—২৲

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "তৃষিত মরু"—৩৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত উপন্যাস "দ্বীপপুঞ্জ"—৩৷০

শ্রীসতীকুমার নাগ সংকলিত "Netaji Speaks"—২৷০

জিতেন্দ্রকুমার পুরকায়স্থ প্রণীত উপন্যাস "জীবনের ভুল"—২৲

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত "ঊষার আলো" (১ম ময়ূখ)—৸০

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "উপনিষদ" (১ম খণ্ড)—২৷০

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত "ভাগবতী কথা"—৫৲

যাযাবর প্রণীত প্রবন্ধগ্রন্থ "দৃষ্টিপাত"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

ফটো—ইউনাইটেড্ আর্টিষ্ট্‌স, বালীগঞ্জ

ফাল্গুন—১৩৫৩

দ্বিতীয় খণ্ড	চতুস্ত্রিংশ বর্ষ	তৃতীয় সংখ্যা

ইন্দো-চীনে রামায়ণ ও মহাভারত

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পিএচ্-ডি

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় সভ্যতার উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি। ভারতবাসীগণ যখন সুদূর প্রাচ্যে উপনিবেশ স্থাপন এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করেন তখন যে এই দুইখানি মহাকাব্যও ঐ সমুদয় দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিবে এই অনুমান অত্যন্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক। যবদ্বীপে ও বালিদ্বীপে যে রামায়ণ ও মহাভারতের বিশেষ আদর ছিল তাহার বহু প্রমাণ আছে। এই দুইখানি মহাকাব্যই ঐ দেশীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—এবং ইহাদের বিশেষ বিশেষ আখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু গ্রন্থ ঐ ভাষায় রচিত হইয়াছিল। মন্দিরে মন্দিরে এই দুই গ্রন্থের ঘটনাবলী খোদিত হইত এবং যাত্রা নাটক প্রভৃতির আখ্যানভাগও প্রধানত এই দুই গ্রন্থ অবলম্বনেই রচিত হইত।

যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ ব্যতীত অন্যান্য আরও অনেক স্থানে রামায়ণ ও মহাভারতের যথেষ্ট পঠন পাঠন ছিল। প্রাচীন কম্বুজদেশ (কাম্বোডিয়া) ও চম্পা দেশে (বর্ত্তমান আনাম) এবিষয়ে যে কয়েকটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে এই প্রবন্ধে তাহাই আলোচনা করিব।

প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ চম্পা দেশের রাজধানী চম্পা নগরীর ধ্বংস মধ্যে কিছু দিন পূর্ব্বে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে চম্পার রাজা শ্রীপ্রকাশ ধর্ম্ম (৬৫৩-৬৮৭ খৃঃ অঃ) একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাল্মীকির একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বাল্মীকি সম্বন্ধে এই লিপিতে নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি আছে।

যস্য শোকাৎ সমুৎপন্নং শ্লোকং ব্রহ্মাপি পূজতি।
বিষ্ণোঃ পুংসঃ পুরাণস্য মানুষস্যাত্মরূপিনঃ ॥১

* * * রিতং কৃত্যং কৃতং যেনাভিষেচনং।
কবেরাস্তস্ত মহর্ষের্বাল্মীকেশ শ্র * * রিহ ॥২
পূজাস্থানং পুনস্তস্ত কৃত * * *।
প্রকাশধর্ম্মনৃপতিঃ সর্ব্বারিগণসূদনঃ ॥৩

ইহার প্রথম শ্লোকের সহিত মহাকবি কালিদাসের নিম্নলিখিত শ্লোকের তুলনা করা যাইতে পারে।

নিষাদবিদ্ধাণ্ডজ দর্শনোত্থঃ।
শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্ত শোকঃ। (রঘুবংশ ১৪—৭০)

শিলালিপির রচয়িতা যে রামায়ণের আদিকাণ্ডের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ইহার প্রথম শ্লোকার্দ্ধের সহিত রামায়ণের নিম্নলিখিত শ্লোকের শেষার্দ্ধের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে—

"পাদবদ্ধোক্ষর সমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্ত প্রবৃত্তোমে শ্লোকোভবতু নান্যথা॥
(আদিকাণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় ১৮শ শ্লোক)

এই অধ্যায়েই ব্রহ্মা যে বাল্মীকির শ্লোকের গুণগান করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। প্রথম শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতে অনুমিত হয় যে বাল্মীকি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অবশ্য শ্লোকটি খণ্ডিত হওয়ায় এবিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। কিন্তু বাল্মীকির মূর্ত্তিপূজার স্পষ্ট উল্লেখ থাকায় এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এদেশে বাল্মীকি অবতার বা দেবতারূপে পূজিত হন নাই—কিন্তু চম্পাদেশে হইয়াছিলেন এবং ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে ঐদেশে রামায়ণের কিরূপ আদর হইয়াছিল।

কম্বুজ দেশের শিলালিপিতেও ভারতীয় এই দুই মহাকাব্য যে সেখানে কিরূপ আদৃত হইত তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের সমগ্র পুঁথি একটি শিবমন্দিরে রক্ষিত ছিল এবং দৈনিক এই সমুদয় গ্রন্থ তথায় পঠিত হইত। ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীর মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ আর একখানি শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে উক্ত মন্দিরে রক্ষিত মহাভারতের আদিপর্ব্বের অন্তর্গত শান্তব অধ্যায়ের একখানি পুঁথি যদি কেহ নষ্ট করে তবে তাহার মহাপাতক হইবে।

কম্বুজদেশে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহুসংখ্যক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার বহুস্থানে রামায়ণ মহাভারতের অথবা উহাদের বর্ণিত আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। এই দেশের প্রসিদ্ধ মন্দির অংকোর ভাট ও অন্যান্য মন্দিরে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলীর বহু চিত্র খোদিত আছে।

আনাম দেশে (প্রাচীন চম্পা) এখনও রামের কাহিনী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত। এই কাহিনা অনুসারে রামায়ণের ঘটনাগুলি আনামদেশেই ঘটিয়াছিল। মলয় দেশে প্রচলিত হিকায়ৎ শ্রীরাম অথবা রামায়ণের মলয় সংস্করণে মলয় দেশেই রামায়ণের ঘটনাবলীর স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আধুনিক মলয় সাহিত্যের অনেক গ্রন্থও মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এই সমুদয় আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে সুদূর প্রাচীন কালে ইন্দো-চীনের হিন্দু উপনিবেশগুলিতে রামায়ণ ও মহাভারত কিরূপ শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিল।

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

২৩

অমল বাসায় ফিরিয়া একটু অনুশোচনা করিল—পরশু না বলিয়া কাল বলিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। নন্দিতাকে আর একবার দেখিবার জন্য যেন হঠাৎ সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যে অপর্ণাকে সে পায় নাই সেই যেন পুনরায় তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—নন্দিতার যেন কোন অস্তিত্ব নাই।

একটা দিন অত্যন্ত অস্বস্তির মাঝে কাটাইয়া যথাবিহিত 'পরশু' দিনে সে এ্যাটর্ণী রবিবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। রবিবাবু তাহার বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন—অমলের জুতা ও লাঠির সমবেত শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন—এস, এস ভাই অমল। কন্যার মারফতে তোমার আগমন বার্তা শুনেছি।

অমল একখানা সোফায় জড়সড় হইয়া বসিয়া,

রেপারটাকে ঝুলাইয়া দিয়া কম্ফোটারটাকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া কহিল—হ্যাঁ, তোমার মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত নাটকীয়-ভাবে পরিচয়। তা কেমন আছ, বল দেখি ভাই, আর একটু গরম চা'র বন্দোবস্ত কর।

—রবীন্দ্রবাবু গ্রীক্ ফাইলকে দেরাজে পুরিয়া কহিলেন—আরে তুমি যে একেবারে জবুথবু বুড়ো হ'য়েছ দেখছি—চুল পাকতে বাকি নেই—

—হ্যাঁ, নইলে ত বিয়ের বয়স ছিল, গিন্নী অকালে চলে গেলেন একা ফেলে, এটা কি ভদ্রতা হ'ল!

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—সখ যায় নি দেখছি। তুমি কি সব বই-টই লিখ্ছ শুনছি—ছেলেমেয়েরা ত মাঝে মাঝে ওই নিয়ে ভয়ঙ্কর তর্ক করে, তা এমন কিছু লিখ্তে পারো না যে, যা নিয়ে তর্ক চলে না—ওরা কি শেষে খুনোখুনি ক'রে ম'রবে—

—বড়ই অন্যায় ক'রে ফেলেছি ভাই—বাড়াবাড়ী যেয়ে ব্যাখ্যা করার মত শক্তি নেই, নইলে—যাক্ এখন খবর সব বল দেখি। পারিবারিক, আর্থিক, মানসিক।

রবীন্দ্রবাবু একটা সিগারেট দিয়া কহিলেন—আর বল কেন ভাই বিড়ম্বনা—মেয়ের বিয়ে নিয়েই পড়েছি ফ্যাসাদে। বলে, বিয়ে ক'রবে না। আর কত পড়বি বাবা, এম-এ ত হ'ল প্রায়—

অমল সমর্থন করিল—ওই ত রোগ আজকাল। ছেলেটারও অমনি মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে। বলে, বিয়ে ক'রবে না। ওই এক ফ্যাসান উঠেছে। আমাদের সময় ত বিয়ে ক'রতে তর সয়নি।

—কি যে ওদের পছন্দ।

—পছন্দের কথাটা একটা সমস্যা। মেয়েরা বড় হ'য়েছে, একটা প্রিন্সিপল্ গড়ে উঠেছে, এখন তোমার পছন্দে ত চলবে না। তাদের পছন্দটা বিচার ক'রতে হবে—যাকে বিয়ে করবে তার পরিচয় চাই, মনের খবর চাই—

—তোমার ছেলে ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হ'য়েছে শুনেছি। কোথায় এখন?

—মুন্সীগঞ্জে আছে এখন—তারও ওই বাতিক—

—বটে! এরা সব ক্ষেপে গেল নাকি?

—তাই বই কি? তবে তোমার এখানে আসার একটা পরোক্ষ কারণও র'য়ে গেছে। তোমার নন্দিতাকে আমার দরকার হ'য়ে পড়েছে—জবুথবু বুড়ো মাংসপিণ্ডটাকে ওর হাতে দেওয়ার আশায় ছুটেছি—

—বটে বটে! চমৎকার হয় কিন্তু—

—কিন্তুর কি আছে ভাই? বিয়ের মত নেই? ওটা হ'য়ে যাবে ভরসা করি—আসল কথা কি জানো, ওরা বিয়ে ক'রতে ভয় পায়।

রবীন্দ্রবাবু উৎসাহিত হইয়া কহিলেন—বটে! বটে! ছাখো ভাই তোমরা কবি লোক, তোমাদের কথা ওরা বিশ্বাস করে। যদি পারো তবে তোমাকে বখসিশ্ দেব—পাকা চুল কাঁচা ক'রে দেব—

—হ্যাঁ, ওদের মনের কথা আমরা বুঝি। তোমরা বুঝবে না, এটা ত আর ফাঁকি দিয়ে মক্কেলের পকেট মারা নয়, যে লোকে প্রত্যয় ক'রবে না। এ অন্তরের ভাষা—

—রক্ষে করো ভাই, আমাকে কাব্য শুনাতে আরম্ভ করো না—পাগল হ'য়ে যাবো। তোমাদের যত অর্থহীন সব বাক্য—হাস্য পরিহাসের মাঝে নন্দিতা চা-ও কিছু খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। অমল সোৎসাহে কহিল—এস, এস মা লক্ষ্মী, একটু চা'য়ের জন্যে প্রাণটা ছট্ফট্ কচ্ছিল। আর তোমার বাবার অভিযোগ ত অত্যন্ত গুরুতর—

নন্দিতা হাসিয়া কহিল—কি? আমার নামে—

—হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে জড়িয়ে। আমার কোন লেখা পড়ে নাকি তোমরা খুনোখুনি করার জোগাড় ক'রেছ। তোমার বাবা বল্ছেন—ওটা নাকি লেখকের দোষ—

নন্দিতা চা'র কাপটা তুলিয়া দিয়া কহিল—একটু তর্ক-বিতর্ক ও সর্ব্বত্রই হয়। আর কি?

—আরও আছে, বসো বলছি। এখানে বসো—অমল পা-দুটিকে একদিকে রাখিয়া বসিবার স্থান করিয়াছিল। নন্দিতার হাতখানি স্পর্শ করিবার একটা দুরন্ত আগ্রহ তাহার মাঝে দেখা দিল, যেমন করিয়া অপর্ণার হাতখানি সে চাহিয়াছিল। নন্দিতা ইতস্ততঃ করিতেছিল, অমল হাত ধরিয়া তাহাকে তাহার পাশে বসাইয়া দিয়া চা'র বাটিতে চুমুক দিল। নন্দিতা প্রশ্ন করিল—আর কি?

—গুরুতর অভিযোগ মা লক্ষ্মী, ধীরে-সুস্থে বলি। তুমি নাকি বিয়ে ক'রবে না এমনি একটা বাতিকগ্রস্ত হ'য়েছ।

মদীয় পুত্রের ঐ রকম একটা খেয়ালের কথা শুন্‌ছি।" আমরা দু'টি বুড়ো বাবা তাই বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি—

নন্দিতা হাসিয়া কহিল—এটা আর দুশ্চিন্তা কি?

নন্দিতার এই মৃদু হাসিটি বড় মধুর। অমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—দুশ্চিন্তা নয়, বল কি মা? এই বুড়ো বয়েস, খোকা তার চাকুরীস্থলে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছে, কিন্তু যাই নি। কে আমাকে দেখবে? ঠাকুর চাকর? তাদের কাজে মন ওঠে না—আর তোমার বাবার ভাবনা, হয় ত তুমি তাঁর অন্তে কি ক'রবে? চাকুরী ক'রবে? তা আমাদের পছন্দ না। আমরা ভাবি, বিয়ে ক'রে গেরস্থালী না ক'রলে জীবনটাই বৃথা হ'য়ে গেল—

নন্দিতা আবার হাসিল। অমল মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়াছিল—আর একটু চা খাইয়া কহিল—হাস্‌ছো মা, কিন্তু এটা ঠেকে শেখা।

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—ওই ত ভাই আজকালকার দোষ। আমাদের অভিজ্ঞতার যেন কোন মূল্য নেই—

নন্দিতা কহিল—আপনিই ত লিখেছেন যে মানুষের বিবাহিত জীবনে সত্যিকার ভালবাসা নেই—তারা অতৃপ্ত—

—হ্যাঁ, তাই। যা পাওয়া যায় না, তা বিয়ে ক'রলেও পাবে না। এসব কথা তুলো না, তোমার কথার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌তে পারে—তবে জ্ঞাত জগতের পিছনেও একটা অজ্ঞাত জগত আছে সেটা তোমরা জানো না। নইলে এত ছেলেমেয়ে থাকতে সেদিন তোমার সঙ্গেই আলাপ ক'রতে গেলাম কেন? আর আজ তোমার হাতে আমার স্থবির জীর্ণ দেহটাকে তুলে দেওয়ায় তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই বা তোমার বাবার কটূক্তি শুনতে আসবো কেন?

রবীন্দ্রবাবু প্রতিবাদ করিলেন—কটূক্তি আবার করলুম কই অমল—

—বেশ। আমার লেখাকে যে বিশেষণ দিয়েছ সেটার মাঝে কটূত্ব নেই—একথা তোমাদের মত উকিল এ্যাটর্ণীরাই ব'লতে পারে। নন্দিতা কথাটার ইঙ্গিত বুঝিয়াছিল, তাই মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল। অমল তাহার মাথায় হাতটি ধরিয়া কহিল—মা লক্ষ্মী, তোমরা আমাদের এ ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের অনুশোচনা, দুঃখ, পরিতাপ এ সমস্ত বুঝবে না; কিন্তু এই ধর আর চার পাঁচ বছর হয় ত বাঁচবো, কিন্তু সারাজীবনের কর্ম্মক্লান্তি ফেলে তোমাদের মত কারো কোলে মাথা রেখে পরম শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ফেল্‌বো আশা নিয়ে ঘুরছি। জানি, আমাদের এ চার বছরের জন্য তোমাদের জীবন নষ্ট করা অন্যায়, তবুও মনে হয় একটা বৎসর বড় মহার্ঘ, বড় মূল্যবান। পৃথিবীর অতিক্রান্ত বিশুষ্ক পথের দিকে আর চাইতে ইচ্ছা হয় না—

নন্দিতা মাথা নীচু করিয়াই জবাব দিল—কেন? আমরা কি বাপ-মায়ের সুখের জন্যে আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারি না!

—না, পারো কই মা? এই আমার খোকা—সে যখন সবে উপুড় হতে শিখেছে তখন আমি আর তার মা দু'জন কত গল্প ক'রতুম—খোকা ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, আমরা দুই বুড়োবুড়ী তার বাংলোয় পরম নিশ্চিন্তে শেষ জীবন কাটাবো, বৌমাটি হবে সেবাপরায়ণ, ইত্যাদি, কিন্তু কই—খোকা বিয়ে ক'রতেই নারাজ, আর খোকার মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন। খোকা ভাবে—তার জীবনের কথা আমাদের নয়, যেমন তুমি ভাবো তোমার কথা তোমার বাবার নয়—

নন্দিতা হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—যা বলেছ ভাই, তোমার মত গুছিয়ে কথা ব'লতে কোনদিনই পারি না, নইলে হয় ত ওদের বুঝোতে পারতাম—

অমল উৎসাহিত হইয়া কহিল—নন্দিতা মা, আমার কি কি বই পড়েছ?

—সবই।

—বেশ! কিন্তু জীবনের চরম সত্য যেটা বুঝেছি সেটা তোমাকে বলি, দেহাতীত যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনের, তার পরিতৃপ্তি নেই। তুমি যা পাবার আশায় আজ বিয়ে ক'রতে নারাজ, কিন্তু সারা জীবন প্রতীক্ষা ক'রলেও তা'ত পাবে না। আমরা জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বেশ বুঝ্‌ছি ও পাওয়ায় নয়—যার মন পাবে তার মন জীবন্ত বলে বিশ্বাস ক'রবো না—আমি চাই তোমাকে আমার গৃহে পুত্রবধূরূপে, কিন্তু তুমি চাও স্বাধীন জীবন—এই বৈষম্যপূর্ণ জগতে পরিতৃপ্তি কই?

নন্দিতা আনন্দিত বিস্মিত চোখে চাহিয়া কহিল—আমাকে?

—হ্যাঁ, তাই ছুটে এসেছি। তুমি ফিরিয়ে দেবে, আবার খুঁজবো, আবার আর কেউ ফিরিয়ে দেবে, আবার খুঁজবো—রবীন্দ্রনাথের পরশপাথরের সন্ন্যাসীর মত কেবল খুঁজবো—যদি পাই তাও বুঝবো না, কোন ফাঁকে সে হারিয়ে যাবে।

নন্দিতা কহিল—ফিরিয়ে দেবেই এমন অনুমান করেন কেন?

—মানুষের ধর্ম্মই ওই, যেমন তোমার সঙ্গে আজ আমাদের মত মিল্‌ছে না?

নন্দিতা কহিল—চলুন একটু ভিতরে, আমরা সকলে আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রবো।

—আমরা মানে—

—ভাই বোন সব, আর বৌদি।

অমল একটু আশান্বিত হইয়া কহিল—চল মা। কিন্তু বড় শীত, নড়তে ইচ্ছে করে না। রক্ত যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে—

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, ভিতরেই যাও, তোমাদের কাব্য আমার সইবে না। অর্থহীন সব—

—মোকর্দ্দমার নথিপত্রে অন্তরটা ঘুণে খেয়েছে, নইলে বুঝতে—

—রক্ষে করো ভাই। বুড়ো বয়সে কাব্যচর্চ্চা ক'রলে লোকে রাঁচি পাঠাবে।

—বেশী বাকি নেই বলে মনে হয়। নরকে যেয়েও আইনের ধারা ঝাড়বে বোধ হয়—যাক্ চল মা।

ভিতরে যাইয়া কাব্য সাহিত্য প্রসঙ্গে নানা আলোচনা চলিল—অমল বসিয়া বসিয়া নানা কথা কহিল। আসিবার সময় অমল নন্দিতার মাথায় হাত রাখিয়া কহিল—তোমায় বড় ভাল লাগে মা, তাই ছুটে আসি। যেন মনে হয় বহু পুরাতন পরিচিত তুমি—কর্ম্মক্লান্ত জীর্ণ মনটা, তার সঙ্গে অশক্ত দেহটা একমাত্র তোমারই আশ্রয়ে যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। বার্দ্ধক্যের স্বজনহীন অত্যন্ত একক জীবনের দুঃখ কি, তা তোমাদের যৌবনের মন নিয়ে বোঝা সম্ভব নয়—

নন্দিতা অমলের বুকের অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া কহিল—আবার কবে আসবেন?

—আবার আস্‌বো?

—নিশ্চয়ই আস্‌বেন। কেন আস্‌তে ইচ্ছে ক'রবে না, আমরা কি এতই দুর্জ্জন?

—না, নৈকট্যই বড় বেদনাদায়ক। যখন তুমি বিদায় ক'রে দেবে, তখন যাওয়াটা বড়ই দুঃখের হবে, সেই ভয়ে—

নন্দিতা অমলের হাতখানা অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে ধরিয়া কহিল—বিদায় যে দেবেই, এমন অনুমান ক'রছেন কেন?

—তোমার বাবার কাছে যা শুন্‌লাম, তাতে ত সাহস পাই না।

নন্দিতা নত দৃষ্টিতে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া রহিল। প্রশান্ত চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—কবে আস্‌বেন?

—যেদিন তুমি ডাক্‌বে—

—রোজই আস্‌বেন।

—নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রলাম, তবে বেতো শরীর নিয়ে কলকাতা বালিগঞ্জ ছুটাছুটি ক'রতে পারবো কি? অমল বন্ধুবরকে ডাক দিয়া কহিল—ভাই রবি, তোমার মেয়ে ত রোজ আসবার নেমন্তন্ন ক'রলে, তারপর তুমি আবার চা বিস্কুটের অপব্যয়ের জন্য অনুশোচনা ক'রো না।

—না, চা বিস্কুট ত ভাল—কত টাকাই অপব্যয় ক'রলুম ওদের খেয়ালে—

অমল চলিয়া আসিল—

পরের দিন অমল ভাবিয়া দেখিল—এক নন্দিতার কাছে যাওয়া ছাড়া যেন দ্বিতীয় কোন কাজ আর তাহার জীবনে অবশিষ্ট নাই। একদিন অপর্ণা যেমন দুর্ব্বার আকর্ষণে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, আজ নব-অপর্ণা এই নন্দিতাও যেন তেমনি করিয়া তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া বসিয়া গেছে। তাহাকে আপনার করিয়া পাইবার একটা দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরকে সহসা বেগবান করিয়া তুলিয়াছে—

সন্ধ্যায় রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হইতেই রবীন্দ্রবাবু সহাস্যে অমলকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন—হ্যাঁ অমল, তোমার কাব্য সাহিত্যের কিছু জোর আছে দেখ্‌ছি। তুমি কি মন্তর টন্তর কিছু জানো?

—কেন বল ত ভাই? কি অপরাধটা করলুম—মামলার রায় রাতারাতি উল্টে গেল দেখ্‌ছি—

—হ্যাঁ। যে মেয়ে বিয়ে ক'রবে না, সে মেয়ে দেখি কালই নিমরাজি। পাঠ্যাবস্থায় যে অপর্ণার কাছে

আমরা ঘেঁসতে সাহস পাই নি, তুমি তাকে একেবারে হাতের মুঠোয় ক'রলে। ব্যাপার কি?

অমল সগর্ব্বে কহিল—ও বুঝবে না। কাব্য সাহিত্য পড়লে তবে বুঝতে পারবে।

—হ্যাঁ, বুড়োকালে একটু পড়তেই হ'চ্ছে দেখছি—গিন্নীর মত হ'লেই হয়—

—সে মত হ'য়েই আছে।

নন্দিতা আসিয়া কহিল—কতক্ষণ এসেছেন? আমাকে ত ডাকেন নি—

—তোমার পিতৃদেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রছিলাম—

—বেশ, বাবা ত নেমন্তন্ন করেন নি, আমি ক'রেছি; আর আমাকে ডাকলেন না। আজ কিন্তু খেয়ে যেতে হবে—

অমল সহাস্যে কহিল—কি যে বল মা। চালচুলোহীন ব্যক্তিকে এসব প্রশ্রয় দেওয়া উদারতা হ'লেও যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় নয়—এ ভূত যে ঘাড় থেকে সহসা নাম্‌বে না।

—তা হোক্, খেয়ে যেতে হবে।

—রাত্রে আমি ত বিশেষ কিছু খাই না মা।

—কি খান বলুন। তাই ঠিক ক'রে রাখ্‌ছি—

অমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ওঃ, দীর্ঘদিন পরে খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি ক'রবে এমন লোকের সন্ধান পেলুম। আনন্দের কথা। আজ থাক্ মা নন্দিতা, দিন আসলে নিত্য খাওয়াতে পারবে—

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—ভাগ্য একে বলে, আমার মেয়ে আমাকে খাওয়াবার জন্যে পাগল হয় না, আর তুমি কোত্থেকে কে এলে, তার যত্নের সীমা নেই।

নন্দিতা কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—আহা হা, বাবাকে যেন কোনদিন সেবাযত্ন কিছু করিনি।

রবীন্দ্রবাবু পুনরায় কহিলেন—ভাল, তাই বলে অমলকে হিংসে ক'রবো না। তোমার ছেলেকে আস্‌তে লিখেছ? মেয়ের বিয়েটা না দিতে পারলে মরেও নিশ্চিন্ত হতে পারবো না।

অমল মৃদু হাসিয়া কহিল—কি বল মা, খোকাকে আস্‌তে লিখবো? তোমাদের একটু জানাশুনো হওয়া ত দরকার—

নন্দিতা নতদৃষ্টিতে জবাব দিল—আপনার খোকাকে আপনি আস্‌তে লিখবেন, তাতে আমার আবার মতামত কি? এতদিন ত নিতে হয় নি—

অমল টিপ্পনি করিল—সবে আরম্ভ হ'ল। তা একটু জল গরম করো—উষ্ণ হোক্, কবোষ্ণ হোক্—

নন্দিতা তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিয়া কহিল—এক্ষুণি আন্‌ছি।

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—বিয়েটা যদি ভালোয় ভালোয় হ'য়ে যায়, তবে তোমাকে একটা বখশিস দেব—একটা ঘটক বিদায়—কি চাও বল?

—যা চাইব তাত আর দেবে না। আমি ত বেয়ান ঠাকরুণকেও চেয়ে বস্‌তে পারি—

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—পরম আনন্দে দেব ভাই, একটা লোক যে এত ভায়া, তা'ত আগে জানি নি।

—ভারমুক্ত হ'য়ে যে পেট গুলোবে ভাই—আমার মত।

রবীন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন—যা বলেছ। ছেলের মোটর চাই নাকি? আর কি?

—ছেলেই জানে। আমার দরকার বৌমাটি—আর যদি সম্ভব হয়—

নন্দিতা আসিয়া পড়িল, কাজেই পরিহাসটার আর পুনরুক্তি হইল না।

খোকা ছুটি লইয়া আসিল। নন্দিতার সহিত দেখাও হইল। অমল বাসায় ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—বিবাহ সম্বন্ধে তোর কি মত সেটা খোলাখুলিভাবে বলে যা। বেশী দিন আমার আর নেই—তবে শেষ ইচ্ছা তোর একটা বিয়ে দিয়ে যাই। তোর মা আজ বেঁচে থাকলে—

অমল চুপ করিল—অনেকগুলি কথা যেন একসঙ্গে কণ্ঠের মাঝে কোলাহল করিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

খোকা প্রত্যক্ষ কোন জবাব না দিয়া কহিল—তুমি আমার সঙ্গে চলো।

—কোথায় যাবো বাবা? তুমি থাকবে কাজ নিয়ে—আমি এই একাকী জীবন নিয়ে কি ক'রে কাটাবো। ঠাকুর, আর চাকরের দয়ায় বেঁচে থাকতে? সে ত এখানেই

আছি—এখানে তবুও দু'একজন পরিচিত লোক অবশিষ্ট আছে—

খোকা কিছু কহিল না।

—তুমি অভিমান ক'রেছ জানি, তোমার বাসায় গেলাম না, কিন্তু বুড়ো বয়সে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটানো কি তাত জানো না, তোমার মা বেঁচে থাকলে একথা আজ উঠ্‌তো না।

—তোমার কি এই মেয়েই পছন্দ।

অমল ভাবিয়া উত্তর দিল—সহসা উত্তর দেব না। তোমরা বড় হ'য়েছ, নিজস্ব মত এক একটা আর সকলের মতই আছে। আমার জীবনের শেষ কয়েক বছরের একটু তৃপ্তি কি সুখ, এর জন্যে তোমার জীবনকে ভারাক্রান্ত ক'রতে আমি চাই না। আমাকে সুখী ক'রবার জন্যেই তোমাকে বিয়ে ক'রতে বলা যায় না। তাও জানি। শুধু তাই নয়, মেয়ে পছন্দের কথাটা হাস্যকর—সেটা মনোহারী দোকানের সামগ্রী নয় যে বেছে আনা যায়, অথচ সমাজ নিয়মে তাকে জানবার সুযোগ নেই। তবে আমার একটি মাত্র কথা হ'চ্ছে এই যে, নন্দিতা মা'র সঙ্গে আমিই পরিচয় ক'রে তার বাড়ীতে গেছি—অজ্ঞাত আকর্ষণ আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গেছে—তাই মনে হয় ওকে ঘরে আন্‌তে পারলে আমি যেন বড় তৃপ্তি পেতাম এবং বিশ্বাস তুমিও সুখী হ'তে পারতে। ওর মাঝে সত্যিকার হৃদয় আছে। তোমার নিজস্ব বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে উত্তর দিও।

খোকা তবুও কোন জবাব দিল না।

—তোমার জবাবের উপরেই আমার এখানে থাকা নির্ভর ক'রছে, নইলে দেওঘরের বাড়ীতেই বাকী ক'টা দিন কাটিয়ে দেব স্থির ক'রেছি।

খোকা অনেক সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—বিয়ে করার দরকার ত কিছু হয় নি—

—তোমার বয়সে সাধারণতই দরকার থাকে না, আমার বয়সে এসে দরকার হয়।

কয়েক দিন ধরিয়া নানা আলোচনার পর খোকা পত্রে তাহার মতামত জানাইবে বলিয়া চলিয়া গেল। ক্রমশঃ

শিশির ঋতু

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

(ঋতু-সংহার)

শুন প্রিয়ে, বলি এবার শিশির ঋতুর কথা।
হেমন্ত কালে যে কামনা জাগে শিশিরেই তাহা সুপরিণতা।
দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত এবে ক্রৌঞ্চরবে,
এবে প্রমত্ত গ্রাম-গ্রামান্ত শালিশস্যের মহোৎসবে।

শিশির ঋতুর প্রকোপের সাথে মকরকেতুরো বাড়ে প্রভাব,
হিমশিহরণ সঙ্গে সঙ্গে
প্রেমশিহরণ অঙ্গে অঙ্গে
দিন দিন করে প্রসার লাভ।
মকরকেতুরই বাড়ে প্রভাব।

গৃহে গৃহে আজ বাতায়ন আর মুক্ত নয়।
রবির কিরণ মদিরার মত, হুতাশনও উপভুক্ত হয়।
উরু উরসিজ গুরু বাসে নিজ ঢাকে ললনা,
আজিকে পরম ভোগ্যা রমণী সযৌবনা,
শীত-বিধু-রুচি পীত চন্দনে লিপ্ত করে না আজি সে দেহ,
চন্দ্রধবল হর্ম্ম্যশিখর চাহে না কেহ,
তুষারশীতল সমীরণে নাই কাহারো রুচি,
তাহাদের দিন গিয়াছে ঘুচি।
হিমসংঘাত নিপাত-শীতলা ইন্দুকিরণে ধবলায়িতা
পাণ্ডুতারকা মণ্ডিতা-নিশা শুচিস্মিতা,
সুধার চূর্ণ করে বিকীর্ণ দিগ্‌বিদিকে,
হরিতে পারে না তবুও কাহারো মানসটিকে।
মুখে তাম্বূল, অঙ্গে বিলেপ শৈত্যহারী,
কণ্ঠে মালিকা, আসবে মোদিতবদনা নারী,

কালাগুরু-ধূপ-বাসিত নিশীথ-শয়ন-গৃহে,
পশিছে ত্বরায় দেখলো প্রিয়ে।
অপরাধী পতি তর্জ্জিত অতি কাঁপিছে ভয়ে,
ঠাঁই চাহিবারে নাহিক সাহস ভুজাশ্রয়ে,
শীতের প্রভাব এমনি, সখি,
সমদা প্রমদা ভুলে পরমাদ ক্ষমার নয়নে তারে নিরখি।

দীর্ঘ রজনী ধরিয়া পতির পীড়ন সহি'
পরিপীত-রস দলিত অবশ তনুটি বহি',
বিলাসিনীগণ প্রভাতে আপন উরোজভারে
ক্ষিপ্র চরণে চলিতে নারে।
পুরবধূগণ গুরু কঞ্চুক ধরেছে বুকে,
রাগ রঞ্জিত কৌষেয় বাস পরেছে সুখে,
ফুলমালা সনে বেণীবন্ধনে বেঁধেছে কেশ,
শীতেরে স্বাগত জানাতে ইহাই বরণ-বেশ।

কামিগণ আজি কামিনীগণেরে নির্দ্দয় ভুজে বক্ষে চাপে,
কঙ্কুম-রাগ-চর্চ্চিত-কুচপীড়ন-তাপে,
শীতের প্রতাপে করি পরাভব ঘুমায়ে পড়ে,
আজিকার সুখশয্যা 'পরে।
প্রমদা আজিকে হ'তে চায় আরো মদনাতুরা
দয়িতের সাথে পিইতেছে তাই মাদন সুরা
সুরাকুম্ভের উপরে শোভিছে সিতোৎপল
তাহার সুরভি নিশ্বাস বায়ে কাঁপিছে দল।

ভোগাতিশয্যে অপগত কারো মদনরাগ,
এখনো স্ফুরিছে প্রিয়ের পীড়নে কুঞ্চিত কুচ অগ্রভাগ।
প্রিয়জন-পরিভুক্ত শিথিল তনুর পানে
হাসি হাসি চায় আনঘরে যায় নিশাবসানে।
ক্ষীণ-কটি-তটা গুরু-নিতম্বা আরেক রমণী আজিকে প্রাতে,
শয়নকক্ষ হ'তে বাহিরিছে কেশপাশ তার ধরিয়া হাতে।

সৌরভহারা এবে কালাগুরু-ধূপে আমোদিত চিকুরপাশ,
ঝরে গেছে ফুল, আলুথালু চুল মালার সূত্রে ধরেছে ফাঁস,
বিতথ কেশের গ্রন্থি মোচন না করি আজ
সবার সমুখে আসিতে সে নারী পায় যে লাজ।
পৃথুল-জঘনা কোন অঙ্গনা নিজ দেহ ভারে চলিতে নারে,
গৃহসংসার ডাকিছে তারে,
নিশীথের বেশ করি বর্জ্জন দিবসযোগ্য সজ্জা ধরে,
ধীর পদে চলে লজ্জা ভরে।
রজনীর পালা হয়েছে সারা,
গৃহলক্ষ্মীর রূপ ধরিয়াছে প্রভাতে আবার অঙ্গনারা।
সব মালিন্য ধৌত হয়েছে প্রাতঃস্নানে,
কনক-কমল-কান্তি ফুটিছে পুন বয়ানে,
লভিয়াছে নারী দেবী-মহিমা,
নয়নের কোণে আরক্তিমা
শ্রুতিপুট ঢাকি থরে বিথরে,
আলুলিত কেশ লম্বিত শোভে অংস 'পরে।
দেখ প্রিয়ে হোথা কোন রূপসী
দেহে সম্ভোগ-চিহ্নগুলিরে হেরিছে বসি'
যত দেখে তত জুড়ায় আঁখি,
ওষ্ঠের চাপে অধরে ঢাকি'
ভাগ্যেরে অভিনন্দিত করি সে সুন্দরী
বদনকমল ভূষিত করিছে নূতন করি'।
এই শীত ঋতু গৌড়ী মদিরা এনেছে প্রচুর সঙ্গে করি'
নীহারের হার অঙ্গে ধরি',
ক্ষেত্র হইতে গৃহপ্রাঙ্গণ ইক্ষু-শালিতে দিয়াছে ভরি,
উৎসব করে হের দিবারাতি
কন্দর্পেরে করি নিজ সাথী—
হর্ষ এনেছে সবার ঘরে।
প্রিয়জন যার কাছে নাই আজ
হায়রে কেবল তাহার তরে
এনেছে বেদনা, তৃণে তৃণে তাই
তাহারো নয়নে অশ্রু ঝরে।
এই শীত ঋতু তোমারে কান্তে করুক দান
সব শুভ সুখ, অশুভ হইতে করুক ত্রাণ।

নেতাজী জীবিত কি না?

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট জাপান-সংবাদ-সরবরাহ-বিভাগ (Japanese News Agency) বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত নিম্নলিখিত সংবাদ সরবরাহ করেন—

"Mr. Bose, head of the Provisional Government of Azad Hind left Singapore on August 16 by air for Tokyo for talks with the Japanese Government. He was seriously injured when his plane crashed at Taihoku airfield at 2 P. M. on August 18 He was given treatment in hospital in Japan, where he died at midnight."

ইহার তাৎপর্য—সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু টোকিও যাইবার উদ্দেশ্যে বিমানে ১৬ই আগষ্ট সিঙ্গাপুর ত্যাগ করেন। জাপান সরকারের সহিত কথাবার্ত্তা চালানই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ১৮ই আগষ্ট তাইহোকু বিমানঘাঁটিতে তাঁহার বিমানখানি বিধ্বস্ত হওয়ায় তিনি সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হন। জাপানের এক হাসপাতালে তাঁহার চিকিৎসা করা হয়; কিন্তু মধ্যরাত্রে তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫, বেলা দুইটায় তিনি আহত হন, ও ঐ তারিখেই মধ্যরাত্রিতে তাঁহার জীবনান্ত হয়—ইহাই সংবাদটির মূল তাৎপর্য্য।

ইহার পর হবিবুর রহমন্ তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন। গান্ধীজী কখনও তাঁহার মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস্য, কখনও বা অবিশ্বাস্য বলিয়াছেন। বর্ত্তমান অস্থায়ী ভারত সরকারের কর্ণধার পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহাকে মৃত বলিয়া বিবৃতি দিয়াছেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতি অবলম্বনে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ গ্রহণ বা বর্জ্জন কিছুই করেন নাই। ফরোয়ার্ড ব্লকের কতিপয় বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এ যাবৎকাল তাঁহার জীবিত থাকার স্বপক্ষে জোর গলায় বিবৃতি দিতেছিলেন—কিন্তু সম্প্রতি সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং কবিশের চীন সীমান্তে গুলির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিবার পর আবার সব চুপ্‌চাপ্ হইয়া গিয়াছে।* কেবল কয়েকদিন পূর্ব্বে আনন্দবাজারের লণ্ডন-স্থিত নিজস্ব সংবাদদাতা নেতাজীর রাসিয়ায় অবস্থান সম্ভাবনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছেন। কিন্তু ভারতের—বিশেষতঃ বাঙ্গালার জনগণ নেতাজীকে লোকান্তরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে রাজি নহেন। হয়ত তাঁহারা অপূরণীয় দুরাশার মোহে মুগ্ধ হইয়া বৃথাই এইরূপ অবিশ্বাস করিতেছেন। অথবা এত লোকের অবিশ্বাস কখনও নির্ম্মূল হইতে পারে না।—এই দুইটি পক্ষের কোন্‌টি ঠিক? এ সম্বন্ধে আমার উপরও বহু প্রশ্নবাণ বর্ষিত হইয়াছে।

নেতাজী কি সত্যই লোকান্তরিত? কিংবা দেশান্তরে আত্মগোপন-পূর্ব্বক জীবিত—সুযোগ-প্রতীক্ষারত?—এ সম্বন্ধে বহু জল্পনা-কল্পনা নানাদিকে নানাভাবে চলিয়াছে ও চলিতেছে। দৈবজ্ঞগণ বহুবার বহু আশাতীত শুভ সংবাদ ভবিষ্যদ্‌বাণীর মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—আর প্রতিবারই সেগুলি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। জ্যোতিষে বিশেষ কোনরূপ অভিজ্ঞতার দাবী আমার নাই। তথাপি কোষ্ঠী নাড়াচাড়ার অভ্যাস থাকার ফলে নেতাজী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে বহু নির্দ্দেশ পাইয়াছি। তাই এ প্রসঙ্গে যেটুকু ব্যক্তিগত মন্তব্য থাকিতে পারে—তাহাই নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

গত বৎসর ২৩শে জানুয়ারী তারিখে নেতাজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রচারিত হইয়াছিল যে—নেতাজীর জন্ম-সময়—দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট (ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)। এই ঘটনার ফলে জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, নেতাজী নিশ্চিত ১২।১৫ মিঃ (ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার মাতৃদেবী অধুনা পরলোকগতা প্রভাবতী বসু মহোদয়ার নিকট অনুসন্ধানে জানিয়াছিলাম যে তাঁহার জন্মসময় ঠিক নির্দ্ধারিত করা হয় নাই। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন আঁতুড়ঘরে নেতাজীর জননী ও একজন পরিচারিকা ব্যতীত আর কেহই ছিলেন না। নেতাজীর পিতৃদেব জানকীনাথ বসু মহাশয় তখন আদালতে গিয়াছিলেন। স্থানীয় দাতব্য চিকিৎসালয়ের একজন ইউরোপীয় মহিলা-চিকিৎসক নেতাজীর ভ্রাতা ও ভগিনীর জন্মকালে ধাত্রীরূপে সাহায্য করিতেন। তিনিও তৎকালে উপস্থিত ছিলেন না—অল্প কিছুক্ষণ পরে আসিয়া তিনি নাড়ী-কাটার ব্যবস্থা করেন। জানকীবাবুও সংবাদ পাইয়া যখন বাড়ী আসেন তখন প্রায় একটা বাজে বাজে। আর নেতাজীর জননী আঁতুড়ে যখন প্রবেশ করেন, তখন ঠিক দুপুর বারটা। অতএব, দুপুর ১২টা হইতে একটার মধ্যে নেতাজীর জন্ম হয়। ঠিক সময় কত—তাহা কেহই জানেন না। নেতাজীর জননী আমাকে জানকীবাবুর নোটবুকের যে লেখা দেখাইয়াছিলেন, তাহার নকল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

Subhas Chandra Bose at Cuttack, 23rd Jan. 1897, at a few minutes after 12 A. M., bet. 12 and 1 P. M,

---

* এই প্রবন্ধ রচিত হইবার পর সম্প্রতি শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার মহাশয় জানাইয়াছেন যে, নেতাজী নিশ্চিত জীবিত আছেন। কবিশের মহাশয়ও নিজ উক্তির খণ্ডন করিয়া এই সংবাদের সমর্থন করিয়াছেন।

জন্মার্থ—সুভাষচন্দ্র বসু, কটকে (জন্ম), ২৩শে জানুয়ারী, ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, দুপুর বারটার কয়েক মিনিট পরে, দুপুর বারটা হইতে একটার মধ্যে।

২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ—বাঙ্গালা সন ১৩০৩ সাল, ১১ই মাঘ, শনিবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে কি সুনিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, ১২।১৫ মিনিটই নেতাজীর জন্ম সময়? অথচ এই সময় ধরিয়াই অনেক দৈবজ্ঞ স্থির করিয়াছেন যে, নেতাজীর জন্মলগ্ন 'মেষ'। অবশ্য কেহ কেহ 'বৃষ' লগ্নও ধরিয়াছেন।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকানুযায়ী সময়-গণনায় পাইয়াছি যে, ১৩০৩ সালের ১১ই মাঘ কলিকাতার স্থানীয় সময়ের প্রায় ১২।৩৮।৩২ সেকেণ্ড সময়ে মেষ লগ্ন শেষ হইয়া বৃষ লগ্ন পড়িতেছে। কটকের স্থানীয় সময় কলিকাতার স্থানীয় সময় হইতে পুরাপুরি দশটি মিনিট পিছাইয়া থাকে। কটকে ৺জানকীবাবুর গৃহে যে ঘড়ি দেখিয়া নেতাজীর জন্ম সময় লেখা হইয়াছিল, সে ঘড়িতে তৎকালীন ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় রক্ষিত হইত, কিংবা কটকের স্থানীয় সময় রাখা ছিল—বহু চেষ্টাতেও তাহার কোন সন্ধান পাই নাই। নেতাজীর পিতৃদেবকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার অবসর আমার ঘটে নাই। নেতাজীর জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারেন নাই। নেতাজীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতীশ বাবু বা মধ্যমাগ্রজ শরৎবাবু তখন নিতান্ত বালক (বয়স আন্দাজ ১০ বৎসর ও ৮ বৎসর)—তাঁহারাও নিশ্চিত এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিতেন না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায় যে, নেতাজীর জন্মসময়—কটকের ১২।১৫ মিঃ, তাহা হইলে উহা কলিকাতার স্থানীয় সময় ১২।২৫ মিনিটের সমান হয়। আর লগ্ন পরিবর্ত্তন যদি কলিকাতা-সময় ১২।৩৮।৩২ সেকেণ্ডে হয়, তাহা হইলে নেতাজীর জন্ম লগ্ন 'মেষ'—ইহা বলা চলে; কারণ সেরূপ অবস্থায় লগ্ন পরিবর্ত্তন হইতে প্রায় ১৪ মিনিট (১৩ মিনিট ৩২ সেকেণ্ড) বাকী থাকে। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রেও লগ্ন-সন্ধি ধরাই সুবিবেচনার কার্য্য হইবে কি না—তাহা অপক্ষপাতদর্শী নিপুণ দৈবজ্ঞগণই স্থির করিবেন।

আর কোন কোন দৈবজ্ঞের গণনানুযায়ী যদি নেতাজীর জন্মসময় ধরা হয়—১২।১৫ মিঃ ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়, তাহা হইলে ত তাহাকে লগ্ন-পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণ বলাই সঙ্গত।

অবশ্য এ সকল গণনাই গুপ্তপ্রেসমতে করা হইয়াছে। পঞ্জিকান্তরে ভিন্ন মত হইতেও পারে। কিন্তু যে সকল জ্যোতিষী ১২।১৫ মিঃ ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময়ে নেতাজীর জন্ম ধরিয়া তাঁহার জন্ম-লগ্ন মেষ ঠিক করিয়াছেন, তাঁহাদিগের জানাইয়া দেওয়া উচিত—কোন্ পঞ্জিকানুযায়ী গণনা করিয়া তাঁহারা উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন; নতুবা জ্যোতিষীর বাক্যকে সকলে বেদবাক্য বলিয়া না মানিতেও পারে—বিশেষতঃ যখন তাঁহাদের বহু-বিজ্ঞাপিত গণনা বার বার ব্যর্থ হইতে থাকে।

এখানে নেতাজীর দুইটি জন্মপত্রিকা পর পর পর দেওয়া যাইতেছে। *যে সকল নিরপেক্ষ-বুদ্ধিসম্পন্ন জ্যোতিষী সুভাষচন্দ্রের শরীর-সংস্থান চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা উপরিলিখিত তথ্যগুলির সহিত তাঁহার* শরীর-গঠন ও কার্য্যাবলীর একবাক্যতা করিয়া স্থিরমতিতে চিন্তাপূর্ব্বক বিচার করিবেন—বস্তুতঃ নেতাজীর জন্ম-লগ্ন কি?—মেষ?—কিংবা বৃষ?—কিংবা মেষ-বৃষ সন্ধি? লগ্ন-নিরূপণ যথাযথভাবে না হইলে নেতাজীর জীবন-মরণ সম্বন্ধে কোনরূপ ভবিষ্যদ্‌বাণী করা সম্ভবপর হইবে না।

মঙ্গল ৫ / •	লগ্ন	• / শুক্র ২৫
কেতু ৯		রবি ২২ বুধ (বক্রী) ২১ রাহু ২৩
বৃহস্পতি ১১ / চন্দ্র ১২	•	• / শনি ১৭

অথবা

কোন কোন দৈবজ্ঞ শুক্রকে মীনে বসাইয়াছেন—কোন্ পঞ্জিকানুসারে তাহা বলেন নাই। গুপ্তপ্রেসে পাওয়া যায় যে, শুক্র মীনে গিয়াছিলেন ১৪ই মাঘ মঙ্গলবার ১১ দণ্ড ৪৩ বিপলে। অতএব, ১১ই মাঘ শুক্র কুম্ভেই ছিলেন।

আর একটি কথা। গুপ্তপ্রেস-মতে ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের গ্রহসংস্থানও নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

১৯৪৫ খ্রীঃ, ১৮ই আগষ্ট—বাঙ্গালা ১লা ভাদ্র ১৩৫২, শনিবার শুক্লা দশমী—একাদশী।

দৈবজ্ঞগণ বিচার করুন—মেষ লগ্ন ধরিলে দৈবদুর্ঘটনা সম্ভবপর হয়, অথবা বৃষলগ্নে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ? কিংবা, মেষ বা বৃষ—কোন লগ্নেই যদি দুর্ঘটনার যোগ না থাকে—তাহাও বলুন।

২৬ দণ্ড ১৮ পল ৫৯ বিপলে চন্দ্র ধনুর্লগ্নে সরিয়া গিয়াছেন—ইণ্ডিয়ান্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—৩।৫৭।৫ সেঃ (বৈকাল)।

দৈবজ্ঞগণ আবার বিচার করিয়া বলুন—মেষ অথবা বৃষ—কোন্ লগ্নের পক্ষে মধ্যরাত্রিতে অপঘাত মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিক ? কোন লগ্নেই যদি অপঘাত-সম্ভাবনা না থাকে তাহাও বলুন। নেতাজীর কোষ্ঠীর সহিত মিলাইয়া দেখুন।

জ্যোতিষ-গণনার ভার দৈবজ্ঞগণের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া নেতাজীর জীবন-মরণ-সমস্যা-সম্বন্ধে আনুমানিক সিদ্ধান্ত কিছু করা যায় কিনা—সেই আলোচনাই এখন করা যাইতেছে। এই আলোচনার উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্নের উত্থাপন করার একান্ত প্রয়োজন আছে। এই প্রশ্নগুলির সুমীমাংসা ব্যতীত কোনরূপ অনুমান করাও সম্ভবপর নহে।

প্রথমতঃ নেতাজীর জীবন-সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও জনসাধারণ যথার্থ-ই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে—ইহা ভাবিয়া শোকার্ত্ত হইয়াছেন কি ? তাঁহাদিগের অন্তর কি বলে ?

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ সত্য হইলে ভারতের জাতীয়-বাহিনীর সৈন্য ও সেনানায়কগণ এ পর্য্যন্ত কোনরূপ শোকসভার আয়োজন করেন নাই কেন ?

তৃতীয়তঃ, জাতীয়-বাহিনীর সেনানায়কগণ এ সম্বন্ধে একমত নহেন কেন ? নিশ্চিতই হবিবুর রহমনের উক্তি তাঁহারা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না ?

চতুর্থতঃ হবিবুর রহমনের পূর্ব্বাপর দুইটি বিবৃতির মধ্যে একবাক্যতা নাই কেন ? ইঁহার উক্তিদ্বয় যে স্ববিরোধী—তাহা একাধিক সাময়িক পত্রিকায় যথাকালে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, হবিবুর রহমন ও সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং কবিশেরের উক্তির মধ্যে পার্থক্যের সঙ্গত কারণ কি ? কি কারণেই বা কবিশের দীর্ঘকাল ধরিয়া হবিবুর রহমনের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া আসিবার পর সম্প্রতি চীন-সীমান্তে গুলির আঘাতে নেতাজীর দেহনাশের সংবাদ প্রচার করিলেন ? (সম্প্রতি আবার তাহার খণ্ডনও করিয়াছেন।) রহমনের উক্তিতে আস্থা স্থাপন করিলে কবিশেরকে বাহবা-প্রিয় মিথ্যাবাদী বলা উচিত। অন্যথায় বলিতে হয়—হবিবুর রহমনই স্বেচ্ছায় সত্যের অপলাপ করিয়াছেন (আর তাহা স্বয়ং নেতাজীর কথানুসারে কি না ?—কে জানে !)—এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে গিয়া কাঁচা সাক্ষী যেমন স্ব-বিরোধী উক্তি করিয়া আপনা হইতেই নাজেহাল হয়—রহমন সাহেবেরও কতকটা সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে !

ষষ্ঠতঃ, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের জগদ্বিখ্যাত গুপ্তচর-বিভাগ—স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দামণ্ডলী কি নেতাজীর জীবন-মরণ-সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধানই চালান নাই ? তাঁহাদিগের গোপন অনুসন্ধানের ফলাফল তাঁহাদিগের প্রীতিকর হইলে এদেশবাসীদিগকে উহা ঢক্কা-নিনাদ-সহকারেই তাঁহারা জানাইয়া দিতেন না কি ? তাঁহাদিগের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মৌন একটা বিষম সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় না কি ?

সপ্তমতঃ, নেতাজীর বহু-বিজ্ঞাপিত মরণের পর তথাকথিত মৃতদেহটি নেতাজীর অনুচরবৃন্দের হস্তে—অভাবে বিজয়-উল্লাসে উন্মত্ত স্থানীয় কোন ব্রিটিশ সেনানায়কের নিকটে সমর্পণ-পূর্ব্বক উহা ভারতে প্রেরণের দ্বারা নেতাজীর মৃত্যুর চূড়ান্ত নিদর্শন জগতের নয়নসমক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ উপেক্ষা করিয়া অতি সত্বর তাঁহার দেহ বিনা সাক্ষীতে ভস্মীভূত করার ব্যবস্থা করা হইল কেন ?

অষ্টম প্রশ্ন—নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদ কলিকাতা-পুলিশের নিকট বিশ্বাসযোগ্য হইলে নেতাজীর বিরুদ্ধে আনীত একটি মামলা অতি সম্প্রতি পুলিশ-আদালতে ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইল কেন ? কলিকাতার পুলিশ-আদালত নেতাজীর মৃত্যু অবধারিত জানিলে এ মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এতদিনে নিশ্চিত করিয়া ফেলিতেন। তবে কি কলিকাতা-পুলিশ এখনও নেতাজীর মৃত্যু-সম্বন্ধে সন্দিহান ?

নবম প্রশ্ন—কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতিদ্বয় তাঁহাদিগের অভিভাষণে এই প্রসঙ্গটিকে ধোঁয়ার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন কেন?

শেষ প্রশ্ন—শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকারের নেতাজীর জীবিত থাকা সম্বন্ধে সাম্প্রতিক বিবৃতির প্রমাণ কতদূর বিশ্বাসযোগ্য?

এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর ব্যতীত বর্ত্তমানে এ মহাসমস্যার সমাধানের কোন উপায়ই দেখা যায় না—"অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে"—এ সন্দেহ এখন চলিতেই থাকিবে।

অতএব, আরও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত মৃত্যু-সংবাদের সত্যতায় বিশ্বাস না করিলে কোন অপরাধ ঘটে কি?

ব্যক্তিগত-ভাবে—প্রতীক্ষা ও আশা ত্যাগ করার পক্ষপাতী আমি নহি। বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ্!

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮)

রাণীকে তাঁর বাপের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে, boyকেও তাঁর কাছে রেখে, বিনোদ পিসিমাকে নিয়ে আজ কাশী রওনা হচ্ছেন। ট্রেণ এসে গেল। বিনোদ পিসিকে মেয়ে কামরায় তুলে দিয়ে, পাশের বগীখানাতেই ঢুকলেন। ভীড়ে স্থানাভাব বললেই হয়।

নিয়ম মত বা অভ্যাস মত একজন হাসি মুখেই বললেন—"এই খানাই পছন্দ হ'ল?"

"মাপ করবেন—অকারণ হয় নি। অনেকগুলি বাঙালী দেখলুম, দুটো বাংলা কথাও তো শুনতে পাব। দেখলুম—জমায়েৎ মিইয়ে নেই, আসর উত্তেজনামুখো। কিছু শুনতেই পাব। তাই লোভ সামলাতে পারি নি—পছন্দই করেছি। একলা এক বেঞ্চে শুয়ে যাবার লোকও নেই—তাতে সঙ্গী থাকেন কেবল দুশ্চিন্তা।

একজন বললেন—"আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন—বসুন—আসুন"—বলে জায়গা করে দিলেন।

দ্বিতীয়—"বিদেশী জঞ্জাল আর যাবে কোথা—হিন্দুস্থানেই তাদের স্থান। strike (ষ্ট্রাইক) কথাটা তাদের কেতাবেই ছিল, তাতে আর কুলোলো না, তিনিও ভারতে এসে গেছেন। রেলে নাকি ষ্ট্রাইক হবে, তাড়াতাড়ি সব কাশী চলেছেন, পাছে ফস্কে যায়—তাই এত ভীড়।"

কথাবার্ত্তা ও গল্পে পথটা ভালই কাটল।

কাশী পৌঁছে আত্মীয়ার বাসায়—মানে—রৌদ্র ও আলোকহীন, একখানি কুটুরিকে দেড়খানি করে নিয়ে তিনি থাকেন। দাওয়ায় রান্না আর বসা দাঁড়ানো চলে। পিসি গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাসা খুঁজে বার করতে বিলম্ব বা কষ্ট হয় নি—সম ভাগ্যবতী বা ভাগ্যহীনা কয়েকটি বিধবা, সঙ্গ নিয়ে সাগ্রহে সাহায্য করলেন। বোধ করি ভাবলেনও—আর একটি পোড়াকপালীকে পেলুম। পিসি হাসতে হাসতে "নির্ম্মলা কোথায় গো" বলে ডাকলেন।

"এই যে মা, এসেছিস—বাঁচলুম। চিঠি পেয়ে পর্য্যন্ত পথ চেয়ে রয়েছি। সঙ্গে কে?"

"আমার ভাইপো বিনোদ—ডাক্তার।" নির্ম্মলার মুখে একটু চিন্তার ছায়া না পড়তে পড়তেই পিসি বললেন—"ওর তরে তোমাকে ব্যস্ত হতে বা ভাবতে হবে না। বিনোদ ওর বন্ধুর বাড়ীতে থাকবে।"

"পাগল, তাকি হয়, আমি এখনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, একটু না হয় কষ্ট হবে।"

বিনোদ অদূরেই দাঁড়িয়ে শুনছিল, এসে প্রণাম করে বললে—"আপনি দুঃখিত হবেন না, আমি দিনের বেলা আপনার রান্নাই খাব, কেবল থাকাটা সেখানে। তাতে আমার যা কাজ আছে তা সারার সুবিধেও হবে, তাঁদের মন রাখাও হবে।"

"আচ্ছা যা ভাল হয় এর পর কোরো, এখন মুখ হাত ধোও, চা খেয়ে স্নান করে এসো। আহারাদি করে একটু ঘুমিয়ে, বেলা ৩।৪ টের পর যা করবার কোরো।"

বিনোদ চা খেয়ে স্নান করতে গেল। ফিরে এসে দেখে আহারের ঠাঁই—ছোটঘরে শোবার শয্যা প্রস্তুত।

নির্ম্মলা কাছে বসে মায়ের মত খাওয়ালেন। "এইবার একটু ঘুমবার চেষ্টা কর বাবা।"

বিনোদ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো—"আশ্চর্য্য জাত, এঁরা না থাকলে আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকত না। এই সব বঞ্চিতারা সকল সাধ সকল ইচ্ছা বুকে চেপে জীবন্তে মৃতের মত দিনযাপন করাকেই স্বীকার করে পড়ে আছেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিনোদ পাশ ফিরলে, নিদ্রাও এসে গেল।

বেলা প্রায় চারটে, ঘুম ভাঙাতে নির্ম্মলার মন চাইছিল না। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাবে! একটু কাসতেই বিনোদ উঠে পড়লো।

"ইস্ বড্ড ঘুমিয়েছি।"

"ভালই করেছ বাবা, গাড়িতে তো ঘুমুতে পার নি। মুখটা ধুয়ে ফেলো—আমি চা আনি।"

"নির্ম্মলার হাতে চা, আর পিসির হাতে কাশীর দু'টি সন্দেশ এসে গেল, খেতেও হ'ল।

"এইবার আমি একবার বন্ধুর বাড়ী দেখাটা করে আসি।"

"রাত্রে থাওয়াটা ভাল দেখাবে না বটে। কিন্তু আজ কোথাও থাকা কি খাওয়া হবে না। কথাবার্ত্তার পর চলে আসবে। বন্ধুর ওখানে থাকলে তোমার কাজের সুবিধার কথা বলেছ, তাই আমার কিছু বলবার মুখ নেই—"

"না না, আপনি দুঃখিত হবেন না, আমার যখন বা যেদিন ইচ্ছা হবে আপনার এখানেই চলে আসব। এটা হ'ল আমার নিজের বাড়ী।"

"সেইটি মনে রেখ বাবা। নতুন জায়গায় এসেছ, রাত কর না, সকাল সকাল চলে এসো।"

বৈকালে মায়েরা দশাশ্বমেধ ঘাটে শীতলা মন্দিরের চাতালে গিয়ে বসেন—সংকীর্ত্তন ও কথকতাদি শোনেন, সুখ দুঃখের কথাও চলে। সন্ধ্যা হলে অবস্থামত কেউ মুড়ি, কেউ বা দুয়েকটি সন্দেশ নিয়ে ফেরেন—তাই খেয়ে শুয়ে পড়েন। শেষ রাতে কারো বা জপতপ থাকে।

নির্ম্মলাকে পিসি বললেন—"আজ তো তোমার নিয়ম ভঙ্গ হল, কীর্ত্তনে—"

"ছেলে এসেছে, আজ আবার নিয়ম কি বল্? কিছু নেই তাই ও সব।—দুটো ভালো কথা শুনে সময় কাটানো। চল্ আজ কেবল মা কালী, মা গঙ্গা, আর শীতলা মাকে প্রণাম করে আসি চল।" বেরিয়ে পড়লেন। "ফেরবার সময় বিনোদের জন্যে কিছু মিষ্টি নেব, বাসায় দুখানা লুচি আর বেগুণ ভেজে দিলেই চলবে। পো দেড়েক দুধ এনেও রেখেছি। কি খেতে ভালবাসে আমাকে বলিস।"

"তুমিও যেমন, ওরা কি কিছু বলে? তোমার ওই দুধ খেলেই বাঁচি।"

"খাবে, খাবে, কাছে বসে খাওয়ালেই খাবে।"

ইত্যাদি কথার পর ঠাকুর-প্রণাম সেরে, আর কেনবার যা কিনে, সন্ধ্যার পরই ফিরলেন। একটু আমের আচারও নিলেন। "তোরা আসায় আমার যে কেমন লাগছে তা বুঝতে পারবিনি, বুঝে কাজও নেই। মায়া কি যায় রে?" ছোট একটি নিশ্বাস পড়লো—জয় বাবা বিশ্বনাথ! বাসায় পৌঁছে গেলেন। পিসির প্রাণটা বোধহয় কেঁদে উঠেছিল, তিনি মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছলেন।

নির্ম্মলা গিয়ে উনুনে আগুন দিলেন, পিসিকে ময়দা মাখতে দিলেন। কথাবার্ত্তা উভয়েরি কম। "বেগুন চাকা চাকা করিসনি, চিরে দুখানা করে' দিস।—বিনু রাস্তা ঠিক জানে তো, বাসা চিনতে পারবে তো?" এইরূপ দুয়েকটা কথা। এতক্ষণে পিসির মুখে হাসি এলো, বললেন—"বিনোদ এর আগেও একবার কাশী এসেছিল, পুরুষদের জন্যে অতো ভাববো কেন—খুব পারবে।"

"আমাদের কাছে তো সে ছেলে—ভাবব না।"

বাইরে থেকে বিনোদের আওয়াজ এলো—"পিসিমা।"

"ওই নাও, বিনোদ এসে গেছে।"

"এই যে বাবা" বলে নির্ম্মলা দোর খুলে দিলেন। "আমি যে তোমার বড় পিসিমা।"

বিনোদ একটু জিরিয়ে আধঘণ্টাটাক পরে খেতে বসলো। পিসিরা বসে খাওয়ালেন। বন্ধুর বাড়ীর কথা শুনতে চাইলেন। বিনোদ বললে—"সে আর কি শুনবেন—প্রকাণ্ড বাড়ীতে দুটি বিধবা মাত্র থাকেন। বাড়ীতে কর্ত্তাদের প্রতিষ্ঠিত দু'তিনটি মাতৃমূর্ত্তি আছেন—তাঁদের সেবা নিয়েই তাঁরা কাটান।—" কাশী-নরেশের দরবারে কালীবাবু, পরে তাঁর পুত্র জ্ঞানবাবু সম্মানের সহিত কাজ করতেন। নামী ও বিখ্যাত ছিলেন—প্রকৃত হিন্দু পরিবার

যাকে বলে। অন্যান্য প্রদেশের রাজা-মহারাজাদের কাছে কাজ পড়লে জ্ঞানবাবুকেই যেতে হোতো। বাপেরসময় থেকেই সকল রাজবাড়ীতে তাঁর যাওয়া আসা থাকায়. অন্দর মহলে রাণীরাও ডাকতেন। রূপেগুণে স্বভাব-চরিত্রে সকলেরি প্রিয় ছিলেন। বাইরে বেরুলে স্বপাক খেতেন, গঙ্গাজল ভিন্ন অন্য জল খেতেন না। রাজাও তাঁকে সমীহ করে' চলতেন। রাজার খাওয়ার সময় জরুরী কাজ পড়লে ও আহার্য্যের সঙ্গে আমিশ পাত্র থাকলে, রাজা তৎক্ষণাৎ সরিয়ে ফেলতেন, জ্ঞানবাবুর সামনে তা ব্যবহার করতেন না; এতই শ্রদ্ধা করতেন। উচ্চ কর্ম্মচারিদের সেটা ভাল লাগত না। তাঁর ইচ্ছা ছিল রাজ সাহায্যে গৃহ প্রতিষ্ঠিতা দেবীদের জন্য স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণ করাবার—রাজা সম্মতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্তানহীন জ্ঞানবাবুর অকালমৃত্যুতে তা আর ঘটতে পারেনি—এমন কি শেষ বাড়ীখানিতেও তাঁর স্ত্রীর জীবন সত্ব মাত্র ধার্য্য হওয়াটাও অসম্ভব নয়। জ্ঞানবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল, আমি তাঁদের বার বাড়ীর উপর তলায় কয়দিন কাটাব, নচেৎ তাঁর বিধবা স্ত্রী দুঃখ করতে পারেন, তাই এই ব্যবস্থা।"

নির্ম্মলা—"যা শুনলুম, এখন আমি নিজেই তোমাকে সেইখানেই থাকতে বলবো। আহা, তিনি দুঃখ করতেই পারেন—তুমি এসেছ শুনলে করবেনও। বাবা বিশ্বনাথ কি বিধবাদের জন্যেই কাশী বানিয়ে রেখেছেন? 'বিধবা-পুরী নাম' দেননি কেন'? দেবতাদের দয়াকেও নমস্কার। যাক্ ও কথা আর শুনতে চাই না। ওকি—দুধটুকু খেয়ে ফেল' বাবা—"

"মাপ করো মা—দুধ আমি খাই না—পিসিমা জানেন।—তাছাড়া দুধ তো দেশে নাই, কোলের শিশুরাও দুধের আদর জানে না। আপনি পেলেন কোথা?"

"সে তোমার শুনে কাজ নেই। নাঃ সত্যি কথা বলাই ভাল। যাদের বাড়ী গরু আছে তাদের কিছু কাজ করে দিয়ে চেয়ে এনেছি।"

"খেটে এনেছেন?" বলেই বিনোদ চোখ বুজে দুধটা গলায় ফেলে দিয়ে উঠে পড়লো—"আর আনবেন না।"

পিসি নির্ম্মলার দিকে চাইলেন। "বলেছিলুম তো?"

নির্ম্মলা বুদ্ধিমতী, বললেন—"তাই হবে বাবা, আর আনবো না।"

নির্ম্মলা যদি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকেন ভেবে বিনোদ তাঁদের ডেকে গল্প করতে বসলো।

নির্ম্মলা বললেন—"দিনের বেলা নাওয়া খাওয়ার পর শোয়া অভ্যাস আছে কি?"

"কাজ না থাকলেই আলিস্যি ধরে, কাজ থাকলে শোবো কেন'? এখানে আর আমার কাজ কি।—পিসিমা বা দেখতে শুনতে চান তার ভার কিন্তু আপনার উপর রইলো, আমি জানিই বা কি?""

"না না, সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না। সে সুবিধা মত আমরা পাঁচ সাত জন দল বেঁধে তোমার পিসিমাকে নিয়ে বেরুবো। বেলা একটা নাগাদ সব এসে জোটেন, এ-কথা ও-কথা কয়ে দিন কাটাই বইতো নয়। তোমাকেও তাঁদের দেখাবো, অনেক কিছু শুনতে পাবে। তোমার সময় বাজে কথা শুনে কাটাবে না। নিত্যি নয়, তোমার অনিচ্ছাতেও নয়। তাতে তোমার অনেক কিছু জানাও হবে।"

বিনোদ—"সেই ভালো কথা।"

নির্ম্মলা—"যাও, রাত্তির হয়েছে এইবার শুয়ে পড়।"

বিনোদ তৃতীয় দিন হতে রাত্রে বন্ধুর বার বাড়ীতেই থাকতে লাগলেন—অন্দর মহলের সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই। ভোরে উঠে বেরিয়ে যান। গঙ্গার এ-ঘাট ও-ঘাট দেখে বেড়ান। কোনো কোনো ঘাট যেন পাতালে পৌঁছবার সিঁড়ি—৬০।৭০ পইটে! একটির পর আর একটি উঁচুতেও অস্বাভাবিক, খুব বলিষ্ঠ জোয়ান ভিন্ন ওঠা নামা করা কসরতের কাজ। সে কালে বোধ হয়—সহজ ছিল। ধনী মহাত্মারা অর্থ সার্থক করে গেছেন। কিন্তু একালে সে সিঁড়ি ভাঙা বিশেষ একটা সাজার মত। দেখে আশ্চর্য্য হতে হয়, সেই সিঁড়ি ভেঙে ৬০।৭০ বছরের বৃদ্ধারা স্নানান্তে কক্ষে জলপূর্ণ কলস নিয়ে উঠছেন, কেহ বা মধ্যে মধ্যে বসতে বাধ্য হচ্ছেন। উপায় কি? পেট আর ধর্ম্মই বোধ হয় বল্ জোগায়।

দেখে বিনোদ থাকতে পারে নি। জুতো জামা ঘাটোয়ালের কাছে রেখে, বৃদ্ধাদের বলে—"কলসিটা

আমাকে দিন মা—আপনি উপরে দাঁড়ান আমি জলটা তুলে এনে দি।" বৃদ্ধা ইতস্তত করেন "তুমি কেন কষ্ট পাবে বাবা, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।" তা হোক, রোজ তো দেখতে আসবো না—আজ দেখেছি, ছেলের অকল্যাণ করবেন না মা—দিন্।" এই রকম দশ বারোটি বৃদ্ধার জল তুলে দিয়ে কিছু বাজার নিয়ে পিসির বাসায় ফেরেন।

প্রথম দিনই নির্ম্মলা দেখে বলেন—"তুমি আবার ওসব আনতে গেলে কেন বাবা? দু'দিনের তরে এসেছ, তোমার পিসির কোনো সাধ কি নেই? এখানেও আমাকে দু'কথা শোনাবার লোকের অভাব নেই, সে সব ঠিক আছে বাবা। আনলে যদি তো মাছ আনলেই হোতো।"

"আমার ভুল হয়েছে পিসিমা, আপনি কিছু মনে করবেন না—বাজারের শোভা দেখে থাকতে পারি নি। আর আনব না। মাছ ত নয়ই—শেষ আপনি বাসন পর্য্যন্ত বদলাবেন!" বলে' বিনোদ হাসে। "না বিনু, আমি সে রকমের গোঁড়া নই—" বলে তিনিও হাসেন।

বিনোদ ভোরে উঠে মুখ হাত ধুয়ে বিশ্বনাথ দর্শনে যায়। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গিয়ে—সেবকদের কার্য্যাদি, রোগীদের সেবা, ঔষধ বিতরণ দেখে। আলাপ পরিচয় হবার পর নিজেও সাহায্য করে। শেষে অদ্বৈতাশ্রমে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম সেরে দশাশ্বমেধ ঘাটে যায়। কোনো দিন বা কেদারঘাট ও অন্যান্য ঘাটেও যায় ও জল তুলতে বৃদ্ধাদের সাহায্য করে। ঘাটের দৌড় ও সিঁড়ির সংখ্যা দেখে ভাবে—কি হলে এই কষ্টকর জল তোলাটা সহজ হতে পারে। ঘাটোয়ালদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছে—'পাইপের' সাহায্য নেবার কথা মুখে আনবার জো নেই। তাতে সে জল অপবিত্র হয়ে যায়—ব্যবহার চলে না! বহু কালের প্রাচান সংস্কার যাবার নয়। ভাবে—সময়ে সহজেই যাবে।

বেলা হলে স্নানান্তে বিনোদ বাসায় ফেরে। নির্ম্মলা বলেন—"বাবা চা খাবে কখন, দশটা যে বাজে!"

"এই যে দিন না মা। ডাক্তারেরা অন্যকে ব্যবস্থা দেয়, নিজেরা নিয়ম রক্ষা করে না" বলে' হাসে। দু' কাপের মত ছিল, সবটা শেষ করে' বলে—"চাটা খেয়ে বাঁচলুম। তখন পিসিরাও হাসেন, বলেন—'খাবার কিন্তু বিলম্ব আছে বাবা।'

বিনোদ বলে—"এখন একটা বাজলেও ক্ষতি নেই। চায়ের ওই গুণটি আছে, তাই গরীব দুঃখীরাও খায়। দেরি হোক, আমি শুয়ে শুয়ে "বসুমতী" পড়িগে।"

নির্ম্মলা বললেন—"আহারের পর তুমিও একটু শুয়ে নিও। দেড়টার পর মেয়েরা কেউ কেউ আসতে পারেন।"

"বেশ তো, তাঁদের কথাই শোনা যাবে। আমাদেরি আপনজনের সুখ দুঃখের কথা জানাও তো উচিতই।"

"বসুমতী"খানা নিয়ে বিনোদ উঠলো। শুয়ে দেখা আর হল না—বুকেই পড়ে রইল। মা গঙ্গার কথাই তাকে পেয়ে বসল'।—যাঁর স্পর্শ পেলে মহাপাপ হতে মানুষ মুক্তি পায়, বিশ্বনাথ যাকে মাথায় রাখেন, তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা ও দুর্দ্দশার দৃশ্য মনে পড়ে তাকে কষ্ট দিতে থাকে। "এটা হিঁদুর দেশ, সিদ্ধ সাধকের বেদ-বেদান্ত পূজনাদি আধ্যাত্মিক বিষয়াদির চূড়ান্ত এইখানে বসেই করে গিয়েছেন। কপিলের 'দর্শন', শঙ্করের ব্যাখ্যা, ভাষ্য ও মীমাংসা আজিও চিন্তাশীলদের শ্রেষ্ঠ পাঠ্য। রামায়ণ, মহাভারত আজিও জগতে তুলনাহীন মহাকাব্য; বেদ-ব্যাসাদি কবিশ্রেষ্ঠদের জন্মস্থান। মা গঙ্গার মহিমার কথা প্রকাশে সকলেই শতমুখ। এটা কি আর্য্যাবর্ত্তের মাতৃ-স্থানীয়া সেই গঙ্গা?—কেহ আধ্যাত্মিকভাবে না দেখে—শিবের জটা বাদ দিয়ে, ব্যবহারিকভাবে দেখলেও, তাঁর আবশ্যকতা ও উপকারিতা অস্বীকার করবার স্পর্দ্ধা কে রাখেন জানি না।"

"এখনো রাজপুতানা বর্ত্তমান, হিন্দু রাজা মহারাজরাও বর্ত্তমান, কাশীতে তাঁদের কেহ কেহ বাড়িও রাখেন—যোগেযাগে কখনো আসেনও। মা গঙ্গার বুকে চড়াগুলো ফাঁড়ার মতো নিত্যই বাড়ছে। ভাগ্যবানদের মোটরে পারাপারের পথ—আপনিই প্রশস্ত হয়ে আসছে। বোধ হয় সেটা তাঁদের খুশির খবর। আর বছর দশেকের মধ্যে দুঃখ থাকবে না—এই কথাই কেহ কেহ অনুমান করেন। রসিকেরা বলেন—চড়ার ঠেলার জলটা আর যাবে কোথায়, —গয়লার ঘরে গিয়েই ঢুকেছে—দুধ হয়ে বাবুদের তৃপ্তি দিচ্ছে। এ সব রহস্যের কথা হলেও—অবস্থা ঘটে তাই"

সর্ব্বাপেক্ষা আক্ষেপের ও লজ্জার বিষয়—এ সবই ঘটছে মহামান্য কাশী-নরেশের চক্ষের ওপর! লোকের বিশ্বাস—তিনি একটু চেষ্টা পেলে, রাজা মহারাজাদের সহযোগে মায়ের বুকের এই ভার মুক্তির উপায় যে হয় না তাও নয়। 'পেনামা' তার রূপ বদলেছে, চীনেরা খাল-গুলোকে 'ন্যাভিগেবল্' করেছে, ইত্যাদি নিদর্শনের অভাব নাই। এখানে যে হয় না কেনো—তা সক্ষম হিন্দুরাই জানেন।

প্রতি বৎসরই জগতের বহু লোক ভারত ভ্রমণে আসেন, কাশী না দেখে কেউ ফেরেন না—কারণ সেটা হিঁদুদের সেরা তীর্থ। হিন্দুদের হিন্দুত্ব গর্ব্বের—প্রমাণের বহরটাও ভাল করে দেখে যান। দেশে ফিরে বই লিখেও থাকেন। তাতে আমাদের ইতিহাসটা পাকা ও উজ্জ্বল হয়ে থাকে! এটা তো আর ব্রিটিসের স্কন্ধে চাপানো চলে না। কলঙ্কটা ধোবার জলও আর গঙ্গায় মিলবে না।

যাক্, বিনোদ রেহাই পেলে—নির্ম্মলা পিসি খেতে ডাকলেন—"ভাত বাড়া হয়েছে বিনু।" বিনোদকে উঠতেই হ'ল'।

গান্ধীজীর দৃষ্টিতে নারী

শ্রীধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(২)

নারীকে পুরুষ যখনই অসম্মান করে, তখন নারীই সে সুযোগ পুরুষকে দান করে। নারীর পবিত্রতাকে পুরুষ শুধু শ্রদ্ধাই করে না, তাকে ভয়ও করে। পুরুষের মনের এই ভয়ই নারীকে রক্ষা করে। যদি পৃথিবীতে পুরুষের মনের এই ভয়টা না থাকত, তবে সমাজটা কদর্য্যতায় ডুবে থাকত। বিবাহিতা নারীর দিকে পুরুষ সম্ভ্রমের দৃষ্টি দিয়ে তাকায়। কারণ পুরুষ জানে ঐ বিবাহিতা নারীর মধ্যে রয়েছে সতীত্বের পবিত্রতা। যা মনে লালসার ভাব জাগায় না, শ্রদ্ধার ভাব জাগায়।

কিন্তু যেখানে নারী বসন ও ভূষণের দ্বারা আপনাকে অপরূপ, মোহনীয় করে তোলে, সেখানে তারা পুরুষের লালসার দৃষ্টিকে আমন্ত্রণ করে। নারী যেখানে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের চাইতে নিজেকে অস্বাভাবিক করে তোলে, সেখানে সে পুরুষের কামনার ইন্ধন হয়। গান্ধীজী তাই নারীকে এমনি ভাবে সজ্জিত হতে বলেছেন যাতে পুরুষের দৃষ্টিকে ভোগেচ্ছার বাসনায় আচ্ছন্ন না করে দেয়। কারণ সেইখানেই তাদের আত্মসম্মান আহত হয়।

গান্ধীজী নারীদের এমনি সজ্জার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "আধুনিক মেয়েরা রোমিও জুলিয়েট্ হবার বাসনা রাখে। আধুনিক মেয়ে রোমাঞ্চকর কার্য্য পছন্দ করে। আধুনিক মেয়ে বায়ু, বৃষ্টি এবং সূর্য্য হতে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য সাজ সজ্জা করে না, পরন্তু অন্যের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবার জন্যই করে। স্বাভাবিকতার উপর রং মেখে সে নিজেকে অপরূপ দর্শনীয় করে।"

নারীর কৃত্রিম দৈহিক রূপ সজ্জায় পুরুষের মনে লালসার বহ্নি জ্বালিয়ে তোলে। রমণীর ভিতরে যে রমণীয় রূপ থাকে, তা লালসার পবিত্রতার স্পর্শ পায়, তখন তা নারীত্ব ও মাতৃত্বের রূপে রূপায়িত হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই রূপই যখন আবার কৃত্রিমতায় বেড়ে ওঠে তখন তা কামের ইন্ধন হয়। তাই গান্ধীজী নারীদের এমনি ভাবে সজ্জিত হতে বলেছেন, যাতে পুরুষের কামনার দৃষ্টি পিপাসিত হয়ে না ওঠে।

কিন্তু গান্ধীজী একথাও মনে করেন যে, নারীকে অবরোধের মধ্যে রেখেও তাকে অপহরণের হাত থেকে রক্ষা করা যায় না। পর্দ্দা ও অবরোধে নারী জাতিকে কখনও পুরুষের দৃষ্টি ও অধঃপতনের কলঙ্ক হতে রক্ষা করতে পারে না। তিনি মনে করেন যে সতীত্বটা বাইরের জিনিষ নয়, সতীত্বটা হচ্ছে নারীর অন্তরের জিনিষ। নারীর বাইরের অবরোধ ও শাসন সতীকে কখনও রক্ষা করতে পারে না। নারীর সতীত্ব রক্ষা হয়, নারীর অন্তরের পবিত্রতায়।

গান্ধীজী নারীর এই অন্তরের পবিত্রতাকেই নারী-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ বলে মনে করেছেন। নারীর এই পবিত্রতাই তার সতীত্বের জয়-তিলক। তা পুরুষের দৃষ্টিতে আহত হয় না। নারীর সে সতীত্ব সহস্র পুরুষের মাঝেও অকলঙ্কিত থাকে।

গান্ধীজী নারীর এই সতীত্বকেই তার অলঙ্কার বলেছেন। বাইরের অলঙ্কার দেহকে সুন্দর করলেও, মনকে সুন্দর করে না। মনের পবিত্রতা যে সৌন্দর্য্য দেয় তা কখনও বাইরের অলঙ্কার দিতে পারে না।

গান্ধীজী বলেন, "নারীর সত্যিকারের অলঙ্কার হচ্ছে, তার চরিত্র, তার পবিত্রতা। ধাতু অথবা প্রস্তর কখনও সত্যিকারের অলঙ্কার হতে পারে না। সীতা এবং দময়ন্তীর নাম আমাদের কাছে পবিত্র হয়েছে শুধু তাদের অকলঙ্কিত পুণ্যের জন্য, যদি তারা কোন হীরা জহরত পরে থাকে তার জন্য নয়।"

গান্ধীজীর বিশ্বাস চরিত্র এবং পবিত্রতাই নারীজীবনের এক দ্যুতিমান দীপ্তি। সে দীপ্তি ম্লান হয় না। তা অবজ্ঞাত হয় না। তা নারীর

নারীত্বকে দেবীত্বে পরিণত করে। দেবীত্বের এই শিখাকেই নারী সত্যিকারের অলঙ্কার বলে মনে করেন। তাই তিনি নারীর সৌন্দর্য্য দেখেছেন তার পবিত্রতায়, নারীর সত্যিকারের অলঙ্কার দেখেছেন নারীর চরিত্রের মাধুর্য্যে।

গান্ধীজী সিংহলে মহিলা-সভায় বক্তৃতা দানকালে বলেছিলেন, "কি এমন কারণ থাকতে পারে যার জন্য মেয়েরা পুরুষের চাইতে বেশী করে সেজে থাকবে। আমার স্ত্রী-বন্ধুরা বলেন, পুরুষকে সুখী করবার জন্যই তাঁরা সেজে থাকেন। কিন্তু আমি তোমাদের বলতে চাই যে, যদি বিশ্বে তোমরা তোমাদের ন্যায্য অংশ পেতে চাও, তবে পুরুষের সন্তোষের জন্য সেজে থাকা হীনতা বলেই তোমাদের মনে করা উচিত। আমি যদি মেয়ে হতাম তবে মেয়েরা যে পুরুষের খেলনা হয়ে থাকবে বলে পুরুষেরা যে দাবী জানিয়েছে, সেই সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতাম।...তোমরা নিজেদের খেয়ালের দাসত্ব করো না, স্বামীদের খেয়ালের দাসত্ব করতে অস্বীকার করবে। নিজেদের সাজসজ্জায় সজ্জিত করো না, গন্ধদ্রব্য বা ল্যাভেণ্ডার ওয়াটারের পিছনে ছুটো না—যদি তোমরা খাঁটি সুগন্ধ বিতরণ করতে চাও, তবে তা তোমাদের হৃদয় থেকেই বের হবে। যে গন্ধ দিয়ে তোমরা কেবল পুরুষেরই হৃদয় জয় করবে না—সারা মনুষ্যসমাজ জয় করবে। এটাই তোমাদের জন্মগত অধিকার।"

এই অন্তরের পবিত্রতাই হিন্দু বিধবাদের গান্ধীজীর কাছে দেবী করে তুলেছে। গান্ধীজী হিন্দুঘরের আদর্শ বিধবাদের চিরদিনই অন্তর থেকে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছেন। আভরণহীন সে নারীদেহ, শুধু অন্তরের পবিত্রতাতেই সৌন্দর্য্যের শিখায় দীপ্তিময়ী হয়ে থাকে। অন্তরের এই প্রদীপ্ত দীপ্তিই বিধবাদের দেবীত্বে পরিণত করেছে।

গান্ধীজী এই সব দুঃখের প্রতিমাদের মধ্যে দেখেছেন মহত্তর জীবনের আদর্শ। নারীর বৈধব্য-জীবন যেখানে, দেহ ও মনে প্রকৃতপক্ষে বৈধব্য বেশ পরিধান করে, সেখানে নারীকে মানবত্বের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করে। সংসারের মধ্যে থেকে, সমস্ত আবিলতা থেকে স্পর্শ মুক্ত হয়ে, যে ভর্তৃহীনা নারী জীবনে দুশ্চর ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা করে, সে সমস্ত সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র হয়। তাই প্রকৃতই যে বিধবা, সে হিন্দুধর্ম্মের একটা গৌরব।

কিন্তু বালবিধবার বৈধব্য বেশ গান্ধীজীর অন্তরে যেন একটা জ্বালা ধরিয়ে দেয়। অপরিণত এই সব বিধবাদের মধ্যে গান্ধীজী দেখেন সমাজের অবিচার, ধর্ম্মের অধোগতি, মানুষের আদর্শের ব্যভিচার। সমাজের এই পাপ, এই সব অল্পবয়স্কা বিধবা নারীর জীবনকে দুঃসহ বেদনার ভারে নমিত করে, তার বিকাশের পথকে বন্ধ করে দেয়।

এই সব বালবিধবারা, যাদের মনে স্বামী সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হয় নি, যাদের বিবাহধর্ম্মের সম্বন্ধে কোন উপলব্ধিই নেই, তারা কি করে সমস্ত জীবনব্যাপী স্বামীর স্মৃতিকে অন্তরে জাগরূক রেখে পবিত্র জীবনযাপন করবে? বৈধব্য-জীবনের অবলম্বন হচ্ছে স্বামীর পুণ্যময় স্মৃতি। স্বামীর এই পবিত্র স্মৃতিই নারীর জীবনকে অপবিত্রতার উর্দ্ধে রাখে। কিন্তু যে শিশু নারীর অন্তরে স্বামীর স্মৃতি কোনই রেখাপাত করতে পারে নি, সে কী করে সংসারের সমস্ত প্রলোভনের মধ্যে থেকেও পবিত্র জীবনযাপন করবে?

গান্ধীজী মনে করেন যে, জোর করে যেখানে বৈধব্য বেশ পরাণ হয়, তার মধ্যে শুধু বৈধব্য থাকে, কিন্তু বৈধব্যের প্রাণ থাকে না। তাঁর কাছে নারীর বৈধব্য জীবন একটা অতি পবিত্রতম জীবন। কিন্তু সে বৈধব্য জোর করে চাপান যায় না, তা হৃদয়ের অন্তস্তল হতে স্বতস্ফূর্ত্ত হয়ে ফুটে ওঠে।

গান্ধীজী বাল্য বিধবাদের সম্বন্ধে বলেন, "এই সব হতভাগ্য বিধবারা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের কিছুই জানে না। তারা প্রেমের কিছুই জানে না—এই কথা বললে সত্য কথাই বলা হবে যে, এই সব মেয়েদের কোন কালেই বিবাহ হয়নি। যদি বিবাহটা যেমনি হওয়া উচিত তেমনি পবিত্র হয়; একটা নূতন জীবনে প্রবেশ হয়, তবে যে সব মেয়েদের বিয়ে হবে, তারা সম্পূর্ণরূপে বয়স্কা হবে, তাদের জীবন সঙ্গী বেছে নেবার জন্য তাদের কিছু হাত থাকবে, এবং তারা তাদের কর্ম্মের পরিণাম বুঝবে। অল্পবয়স্কা বালকবালিকার মিলনকে বিবাহ বলা এবং তথাকথিত স্বামীর মৃত্যুর পর মেয়ের উপর বৈধব্য জারী করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।"

বিবাহটাকে গান্ধীজী সর্ব্বসময় একটা পবিত্র জিনিষ বলে মনে করেছেন। তিনি বলেন যে বিবাহ হয় আত্মার সহিত আত্মার মিলনে। কিন্তু যেখানে অপরিণত বয়সে দুইটি শিশু জীবন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যাদের বিবাহ সম্বন্ধে কোনই ধারণা অন্তরে জাগরূক হয়নি, সেখানে স্বামীর মৃত্যুর পর এই সব বালবিধবাদের কেন দ্বিতীয়বার বিবাহ হবে না? গান্ধীজী বলেন যে, যদি স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে তবে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কেন পারবে না? "আমি বার বার বলেছি যে প্রত্যেকটি বিধবার প্রত্যেকটি বিপত্নীকের মত পুনর্বিবাহের অধিকার রয়েছে। হিন্দুধর্ম্মে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বৈধব্য একটা অভিশাপ।"

গান্ধীজী হিন্দুঘরের আদর্শ বিধবাদের চিরদিনই অন্তর থেকে অভিনন্দন জানিয়ে এসেছেন। তিনি এই সব বিধবাদের মধ্যে দেখেছেন দেবীমূর্ত্তি। কিন্তু যেখানে বিধবা আপন বিবাহ এবং আপন বৈধব্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, সেখানে মহত্তর আদর্শের স্থান কোথায়?

নারী যেখানে দেহে বিধবা হয় কিন্তু মনে বিধবা হয় না, সেখানে নারীর বৈধব্য একটা অভিশাপ। মনের মধ্যে কামনার সহস্র দাবানল জ্বেলে রেখে বাইরের বৈধব্য বেশ একটা পরিহাস। তাই যে নারী জীবনে স্বামীকে বুঝতে পারেনি, অথবা যে নারীর স্বামী বিবাহের অল্পদিনের মধ্যেই মারা গেছে সে নারীর জীবনে বৈধব্যের মূল কোথায়? বৈধব্যের মহান রূপ সে হৃদয়ে কি করে উপলব্ধি করবে? চতুঃস্পার্শ্বের চলমান জীবনের ঢেউ এসে যখন তার মনের ভিতরে দোলা জাগায়, তখনই তার মহত্তর জীবনের আদর্শ ধুলিসাৎ হয়। বিবাহের মন্ত্র এবং স্বামীর স্মৃতি তার জীবনের পটে প্রতিফলিত হয় নি বলেই পারপার্শ্বিক জীবন তার মনকে অতি সহজেই চঞ্চল কোরে তোলে।

গান্ধীজী বলেন, আমি "অল্পবয়সের বিবাহকে ঘৃণা করি। বালবিধবা দেখলে আমি কেঁপে উঠি এবং যখন একজন স্বামী সদ্যবিপত্নীক হয়ে

নিষ্ঠুর ঔদাসিন্যে অন্ধ আর একটি বিবাহে চুক্তিবদ্ধ হয় তখন তা দেখে আমি রাগে কাঁপি।

কিন্তু গান্ধীজী কখনও সমস্ত বিধবাদেরই পুনর্বিবাহের কথা বলেননি। শুধু যে নারী বালবিধবা, যে নারীর মনে বিবাহ এবং স্বামীর স্মৃতির কোনই রেখাপাত হয় নি, সেই নারীকেই তিনি পুনর্বিবাহ করতে বলেছেন। তিনি বিধবার বৈধব্যকে জাতির অমূল্য সম্পত্তি বলে মনে করেন। কিন্তু যে বৈধব্য জোর করে চাপান হয় তাকে তিনি অমূল্য সম্পত্তি বলেন নি।

গান্ধীজী মনে করেন না যে বিধবাদের এই ব্রহ্মচর্য্য তাদের কোনও মোক্ষ লাভের পথের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শুধু ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই মোক্ষ লাভ করা যায় একথা তিনি বিশ্বাস করেন না। এই ব্রহ্মচর্য্য হবে বিধবা নারীর উন্নততর জীবনের পাথেয়। এই দুর্গমপথের যাত্রী হয়ে সে বিবাহ ধর্ম্মের আদর্শকে অম্লান রাখবে। বিধবা নারী তার পূত জীবনের পথে এই প্রমাণই করবে যে বিবাহটা শুধু দৈহিক মিলনই নয়, তা হচ্ছে আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ, যা একজনের মৃত্যুর পরও অক্ষুণ্ণ থাকে।

গান্ধীজী বলেন, "বিধবারা যদি ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তবে তারা মোক্ষলাভ করতে পারবে, এমন যদি কারো অভিজ্ঞতাও থাকে, তবুও এর কোন ভিত্তি নেই। মোক্ষ লাভ করবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া আরও অনেক জিনিষের প্রয়োজন এবং যে ব্রহ্মচর্য্য জোর করে আরোপ করা হয়, তার মধ্যে বৈধব্যের কোন গুণ থাকে না।

গান্ধীজী সর্ব্বসময় বৈধব্যের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন। সমাজের কঠোর অনুশাসন নারীর সে বৈধব্যকে রক্ষা করবে না। পারিবারিক বিধিনিষেধের গণ্ডী সে বৈধব্যের জীবনকে পরিচালনা করবে না। নারীর বিধবা-মূর্ত্তি জাগবে নারীর অন্তর থেকে। নারী বিধবা হবে স্বেচ্ছায়। সামাজিক বিধান নারীকে বিধবা করবে না। যেখানে সামাজিক বিধান জোর করে নারীকে বিধবা করে, তিনি দেখেছেন যে সেইখানেই সমাজের নৈতিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

যে কোন জাতির পক্ষে স্বেচ্ছাকৃত আদর্শ বৈধব্য একটা মস্তবড় সম্পত্তি, কিন্তু জোর করে আরোপিত বৈধব্য একটা কলঙ্ক। গান্ধীজী এই কথাই বলেছেন।

গান্ধীজী দেখেছেন যে এই আদর্শ বৈধব্যের রূপ তখনই নারীর মনে জেগে ওঠে যখন নারীর মনে বিবাহ এবং স্বামী সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট জ্ঞান হয়। এজন্যই তিনি মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ দিতে বলেছেন। কারণ তখন তারা বিবাহটা যে একটা ধর্ম্ম, তা সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে। কিন্তু পিতামাতা যেখানে নাবালিকা কন্যার জীবনকে অল্প বয়সে বিবাহ দিয়ে অঙ্কুরেই নষ্ট করে দেয়, সেখানে সে নারীর জীবনে বিবাহের আদর্শ প্রতিফলিত হবে কি করে?

"ছোট ছোট বালিকাদের ব্যাপারে কন্যাদানটা কী? পিতার কি সন্তানের উপর সম্পত্তির মত অধিকার আছে? পিতা শুধু তাদের রক্ষক, মালিক নয় এবং যখন সে তার নাবালকের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিয়ে তা নষ্ট করে, তখন সে রক্ষকের অধিকার থেকে চ্যুত হয়।"

গান্ধীজী দেখেছেন নির্যাতিত নারী জীবনের বেদনা। তিনি দেখেছেন সমস্ত নারী জাতির অন্তর বেদনার ইতিহাস। তিনি দেখেছেন পিতার খেয়ালী আদর্শের শোচনীয় পরিণাম, তিনি দেখেছেন যে অপরিণামদর্শী পিতার ভ্রান্ত ধর্ম্মের বিশ্বাস বালিকা কন্যার জীবনে কী অপরিমেয় দুঃখ ডেকে নিয়ে আসে। তাই তিনি বলেছেন যে পিতা কখনও সন্তানের মালিক হতে পারে না। পিতা হবে শুধু সন্তানের রক্ষক। পিতার অন্ধ সংস্কার বা মোহাচ্ছন্ন ধর্ম্মবুদ্ধির জন্য কন্যা কখনও তার জীবনে পিতার কর্ম্মের অভিশাপ বহন করে নিয়ে চলতে পারে না। যে পিতা কন্যার ভবিষ্য জীবন, নাবালক অবস্থায় বিবাহ দিয়ে অথবা বৃদ্ধের সাথে বিবাহ দিয়ে এমনিভাবে নষ্ট করে, সেই পিতা কন্যার বৈধব্যের পরে তার পুনঃ বিবাহ দিয়ে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

গান্ধীজী দেখেছেন যে, পুরুষের এই পাপের ফল, নারী তার জীবনে কতরকম ভাবে বহন করে নিয়ে চলে। পুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নারী। সমাজে বালবিধবা ঐ পুরুষেরই অন্ধ সংস্কারের ফল। এই আর্ত্ত নারী জীবনের বেদনার যেন শেষ নেই। নারী যেন এক দুঃখের কবিতা।

আদিম সৃষ্টির ধারা যে পথে নেমে এসেছে, সেই প্রবাহের গতিপথের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আদিম বর্ব্বর যুগ হতে আজ পর্য্যন্ত পুরুষ নারীর উপর যত অবিচার করে এসেছে, তত অবিচার তারা আর কোন কিছুর উপরই করেনি।

পুরুষ নারীর নারীত্বকে অবহেলা করেছে, তার ব্যক্তিত্বকে অবহেলা করেছে, পুরুষ নারীর দেহকে পণ্যশালা-তৈরী করে, তাকে স্বেচ্ছামত ভোগ করেছে। গান্ধীজী এইখানেই দেখেছেন পুরুষের জীবনের চরম অধঃপতন।

পতিতা পুরুষেরই সৃষ্টি। পুরুষ তার দেহের ক্ষুধাকে মেটাবার জন্য নারী-দেহকে নিয়ে পণ্যশালা তৈরী করেছে। গান্ধীজী যেখানেই এই সব পতিতাদের দেখেছেন, সেইখানেই তাদের মধ্যে তিনি দেখেছেন পুরুষের নির্ম্মমতা, পুরুষের অবনতি। পতিতাদের দুঃখময় জীবনের জন্য গান্ধীজী পুরুষকেই সর্ব্বাংশে দায়ী করেছেন। পতিতার মধ্যে তিনি দেখেছেন মানবতার নির্ম্মমতা। এই পতিতারা যেন পুরুষের স্খলিত জীবনের মূর্ত্তিমান ইতিহাস।

পুরুষের জীবনে এই অপরাধের সীমা নেই। পুরুষ নারীকে দেব-মন্দিরের সেবাদাসী করে দেবমন্দিরের পবিত্রতাকে নষ্ট করেছে। পুরুষ নারীর দেহকে ব্যবসায়ের কদর্য্য বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছে। পুরুষ নারীর যৌন-জীবনকে সাহিত্যের উৎপাদন রূপে ব্যবহার করে নারী জীবনের লজ্জাকে সহস্র মনের কাছে খুলে দিয়েছে। গান্ধীজী পুরুষের ভ্রষ্ট জীবনের এই আদর্শের মধ্যে দেখেছেন নারীর দেবীত্বের মৃত্যু।

তিনি লেখকদের উদ্দেশ করে বলেছেন "আমি এই প্রস্তাব করি, আপনারা লেখবার পূর্ব্বে নারীকে আপন মায়ের মত করে একবার চিন্তা করবেন। আমি আপনাদের বলছি যে, যেমন আকাশের সুন্দর বারিধারা

নীচের তৃষ্ণার্ত পৃথিবীকে প্লাবিত করে, তেমনি পবিত্র সাহিত্য আপনাদের কলম থেকে বেরিয়ে আসবে।"

নারী শুধু প্রিয়াই নয়, নারী মাতাও। তাই গান্ধীজী বলেছেন যে, লেখকেরা যখন মেয়েদের নিয়ে লেখে, তখন যেন একবার তাদের মায়ের কথা চিন্তা করে। কারণ মাও সেই নারী। মাতৃত্বের সেই দেবী মূর্ত্তির কাছে লেখকের কল্পনা মনের সমস্ত কদর্য্যতা নষ্ট হয়ে যাবে।

তাই গান্ধীজী বলেছেন যে, নারী আপনাদের প্রিয়া হবার পূর্ব্বে, নারী আপনাদের মা হয়েছিলেন।

মৃতজনে দেহ প্রাণ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

হিংস্র নখর সহর, ক্রূর অবিশ্বাস ও দস্তুর হিংসার উগ্রমদে উদগ্র আগ্নেয়তায় বুঁদ। দুপেয়ে মাতাল শ্বাপদরা শুধু বোঝে জঙ্গলের আইন্ ও জঙ্গী কানুন, চক্‌চকে শানানো সওয়াল বাঁধানো তেলালো জবাব। যেন হারিয়ে গেছে চিরকালের মানুষের নিঃসীম আশা, আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, অন্তঃহীন প্রেম, ভালবাসা, বিশ্বাস। তবু প্রত্যেকটি সকাল আসে আলোর স্বচ্ছ আশীষ নিয়ে প্রত্যেকটি সন্ধ্যা মিলিয়ে যায় দিনান্তের শান্ত নিবিড়তায়, বাগানে ফুল ফোটে, রঙে রঙীণ—আপনি গন্ধ বিলিয়ে ঝরে, তরুণ চায় লুব্ধ অপাঙ্গে তরুণীর যৌবনোচ্ছল দেহের পানে, মায়ের কোলে শিশু হাসে, আধো আধো কথা বলে, জীবনমৃত্যুর, হাসিকান্নার ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে চলে চিরন্তনীর কলচ্ছন্দ।

সহর গিয়ে মিশেছে সহরতলীতে, মিল, বস্তি, চিমনী ধোঁওয়া, কুলি-কামিনের ধাওড়া, গাঁজা তাড়ির আড্ডা, সস্তা মেয়েমানুষের আখড়া। আরও পেরিয়ে দূরে গাঁয়ের একটু আবছা লীন লেখা, বিদ্যুৎ রেখার মত ধানের সোনার শীষের আভাষ, ঝাঁপিভরে লক্ষ্মীর বরাভয়। তারই কাছে খালের ধারে, না সহর না গাঁয়ের মাঝে বস্তির কোল ঘেঁষে কয়েক ঘর মানুষের বাস। সামনের কলেরই ফিটার, ছুতোর কামার—ঠিক বস্তির বাসিন্দা নয়—বউ ছেলে নিয়ে ঘর করে। অন্যদের চেয়ে একটু শ্রী ও সুর আছে তাদের ঘরকন্নায়।

পচা ভাদ্দরের পোড়া তপ্তদিনের শেষে সন্ধ্যা-স্নান সেরে রাত্রি তখন সবে নামছে, এমন সময় ডাইনে বামে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে তক্‌তকে দাওয়া থেকে একটি ছোট্ট পিদ্দিম হাতে নিকোনো উঠোনে থমকে দাঁড়াল, উঠতি বয়সের এক দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে। চাবি-ঝোলানো আধময়লা শাড়ীর আঁচলের আখোটা গলায় সযত্নে ঘুরিয়ে দেওয়া, উজ্জ্বল কপালে সিঁদুরের টিপে জ্বল জ্বল করছে পূর্ণ এয়োতীর চিহ্ন। শ্যামাঙ্গিনী নাম হলে কি হয়, দস্তুর মত নিকষ কালো, কিন্তু তবু তাকে কেউ বলবে না কুৎসিৎ, সারা অঙ্গ ঘিরে অনঙ্গের এমন একটা অদ্ভুত ছন্দ লুকিয়ে, যা দেখা যায়, ধরা যায় না। তুলসীতলায় গিয়ে পিদিমটি উস্কে দিয়ে নতজানু করজোড়ে সে নমস্কার করলে অনেকক্ষণ ধরে, কল্যাণ কামনায় প্রিয়জনেদের, আকাশ পানে চেয়েও প্রণাম জানালে বহু—লঘু মেঘের মাঝ থেকে উঁকি মেরে হাসছে দুএকটি অগ্রে-উদিত সাঁঝের তারা, কালোর ছায়া এগিয়ে আসছে আকাশ প্রান্তে। কি জানি, অজান্তে মনটা ভার হয়ে উঠল শ্যামার, আকুল হয়ে সে মনে মনে বল্লে—ঠাকুর, সবাইকে ভালো রাখো—ভালো রাখো ঠাকুর। দেবলালের এখনো আসবার সময় হয়নি, ওভার-টাইম কাজ—আসবে রাত নটায়, মেয়ে অমলা রয়েছে, সইএর কাছে পাশের বাড়ীতে। ভারী মনে সে এগিয়ে গেল ছেঁচা বেড়ার ধারে, আস্তে আস্তে ডাকলে—সই মিতিন…জল আনতে যাসনি যে বড় আজ…। খেটেখুটে মহীউদ্দিন সবে তখন ফিরেছে, এখুনি বেরুবে কি একটা জরুরী কাজে, রাত হবে আসতে, তারই জন্য একটু চা তৈয়ারী করছিল রাবেয়া—সকালের হাতে গড়া রুটী-গুড়ের সঙ্গে নাস্তা চলবে। চুপি চুপি সে জবাব দেয়, মহী যাতে না শুনতে পায়—যাব কি জল আনতে, পোড়ারমুখো বেহায়া লোকগুলো কিরকম বিশ্রী ভঙ্গীতে চেয়ে চেয়ে দেখে, নোংরা গান গায়, ভারী লজ্জা করে, ইচ্ছে হয় ধরে চড়িয়ে দিই।

শ্যামা ফিক্ করে হেসে বলে—তোকে দেখে আমারই মাথা ঘুরে যায়, পুরুষগুলোর আর দোষ কি? মহীঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস কর না?

সত্যই রাবেয়া সুশ্রী তন্বী, তার উপর আসন্ন মাতৃত্বের সম্ভাবনায় তার দেহরেখাগুলি তীক্ষ্ণ নিবিড়, কৃশমধুর হয়ে উঠেছে। যাঃ, তুই বড় কাজিল সই—বলে স্বাস্থ্যসবল ছাব্বিশ বছরের ভর জোয়ান্ স্বামীর দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে চেয়ে দেখে। মহীও ফিরে ফিরে চায়। বিয়ের চার বছর পরে ছেলেপুলে আসচে, সবাই খুশী। যেদিন থেকে রাবেয়ার সকালের দিকে শরীর ম্যাজম্যাজ করতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকেই শ্যামা ঠাট্টা সুরু করে দিয়েছে। ঘটা করে সাধ্ খাইয়েছে শ্যামা। অনেক কষ্টে টাকা জমিয়ে তাঁতীবৌএর কাছ থেকে চার মাসের কিস্তিতে নিয়েছে বুটিদারী ডুরে শাড়ী চড়া দামে। কোল খালি থাকলে কি হয়, সুদশুদ্ধ আদায় করে নিয়েছে অমলা। চোদ্দ মাস বয়েস, চোদ্দ হপ্তাও মায়ের জিম্মায় ছিল কিনা সন্দেহ। সারাদিনই আছে রাবেয়ার কোলে কোলে, মহীর মাথায় চেপে, শুধু রাতে মায়ের কাছে শোয়। রাবেয়া তাকে ছিটের জামা কিনে দিয়েছে রথের মেলায়, ঝুমঝুমি, আহ্লাদী পুতুল। শ্যামা মহীউদ্দিনকে খাইয়েছে ভাইফোঁটার দিন, দিয়েছে ফোঁটা, রোববারে, ছুটীছাটার দিনে গরীবের ঘরে দুএকদিন ভালো মন্দ রান্না হলে, এঘর ওঘর নেওয়া দেওয়া ত আছেই। স্বল্প বেতনের কলের মজুর তারা, তবুও তাদের

ঘর থেকে দুমুঠো না নিয়ে ফিরে যায় না ফকির বৈরিগী। চাল বাড়ন্ত হলে শ্যামা ছোটে রাবেয়ার দোরে, রাবেয়া আসে শ্যামার কাছে—দায় দফায় পরামর্শ নিতে হলে মহী বসে দেবুদার পাশে—চমৎকার তীক্ষ্ণধী মাথা তার, যদি সাদা চোখে তাকায়। দেবলাল পুজোর একই পাড়ের একজোড়া শাড়ী অতি কষ্টে জোগাড় করেছিল কণ্ট্রোলে— দুই সখী তাই পরে ঠাকুর ভাসান দেখতে গিয়েছিল। ঈদের ছুটীতে তাদের রিক্শায় চড়িয়ে বাংলা সিনেমা দেখিয়ে নিয়ে এসেছে মহী—কিনে দিয়েছে গোলাপী রেউড়ী, সস্তা এসেন্স, কাঁচের চুড়ি। দেবলাল কোনদিন বেশী মদ বা তাড়ি খেয়ে এলে মহীউদ্দিন ধমকায়—দেবুদা, তোমার এ কী কাণ্ড। মহী কারুর সঙ্গে ঝগড়া বাঁধালে দেবু যায় ছুটে তাকে মারতে। এরই মধ্যে নারদের কল্যাণে শরতের মেঘের মত দুএক পশলা মান-অভিমানের পালাও হয়ে যায় দুই সখীর—দেবু মহী দুজনে হাসে—কঘণ্টা যায় দেখি। তার পরেই—সই, মিতিন—ওৎপেতে বসে থাকে দুদিকে দুজন, কার ডাক আগে আসে।

রাবেয়া দুটো কলাইকরা বাটিতে চা ঢেলে নিয়ে এল—আজ আবার গুড় নেই, চায়ে মিষ্টি কম—মহীর রুচবে কিনা কে জানে—যা মিষ্টির ভক্ত!

সে কথা বলতেই শ্যামা রেগে লাফিয়ে ওঠে—আমাকে বলতেও লজ্জা, তুই কিরে, মহীঠাকুরপোকে এই চা দিয়েছিস? বলে ছুটে গেল চিনি আনতে। যেতে যেতে ঠাট্টা করে—লাল ঠোঁটে যে মিষ্টি লাগানো আছে, ঠেকিয়ে দিলেই হোল, কেমন না? রাবেয়া কিল্ দেখায়।

মহী চা খেয়ে চলে গেলে তারা গল্প করতে বসে গেল। রান্নাবাড়ার হাঙ্গামা নেই, গরীবের ঘরে দুবেলা উনুন ধরে না পারতপক্ষে। ওবেলার রান্না চাপা আছে উনুনের পাশে—একটু গরম করে দেওয়া। অমলা এ সময়টা এর ওর কোলেই কাটায়। রাবেয়া তাকে দুধবালি খাওয়ালে, পা নেড়ে নেড়ে ঘুমপাড়ায়, সুর করে 'বর্গী এলো দেশে···সোনা পাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে'। শ্যামা টিপ্পুনি কাটে—হবে লো হবে, তোরও আসছে, স-পাঁচ আনার সিন্নি মেনেছি সত্যপীরের কাছে, ভালোয় ভালোয় কোল ভরে উঠুক—তবে আমার মত বছরবিয়ুনী হস্‌নি যেন। তারও পেটে আবার একটির সুচনা হয়েছে। আরক্তা রাবেয়ার চোখ মুখ সলজ্জ হাসিতে ভরে যায়, অমলাকে জড়িয়ে চুমু খায়, তাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে আসে ঘরে।

দেবলাল ফিরলো, রাত সাড়ে নটায়। কিছুটা ঘোরালো মত অবস্থা, খোস্ মেজাজ, দুটাকার তরল আগুন তার জঠরে হাবুডুবু খাচ্চে। ওভার টাইমটা নগদে পেয়ে ঢুকেছিল খাঁটি দিশীর দোকানে। ফেরবার পথে গিয়েছিল বাজারে ইলিশের সন্ধানে। সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে শ্যামা—এই রকম দিনগুলোকেই সে ভয় করে বেশী, হয় তাকে নিয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করবে দেবু, আদরে জড়িয়ে ধরবে, হেঁড়ে গলায় বেতালা গান ধরবে—ও আমার শ্যামামোহিনী, ও আমার বকুল ফুল—বাধা দিলে বকবে চেঁচাবে মারতে উঠবে—না হয় গুম হয়ে বসে কি সব বড় বড় কথা বলবে যার কাণাকড়িও সে বোঝে না। মহী ঘরে থাকলে ওসব করতে পারে না, শান্ত, সংযত, স্বল্পবাক্ মহীকে সে শুধু ভালোবাসে না ছোট ভায়ের মত, দস্তুরমত ভয়ও করে। এসে এক ধমক দিলেই অত বড় দেবু মিস্ত্রী একেবারে চুপ, ছোট ছেলের মত বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়বে। এক একদিন বমিটমি করে বিছানা কাপড় ঘর নোংরা করে শ্যামাকে বিব্রত করে ফেলে। অথচ সাদা চোখে মানুষটাই আলাদা, সরল, বন্ধুনিষ্ঠ, দিলদরিয়া উদার, হাতে পয়সা থাকলে তার কাছে হাত পেতে কেউ ফেরে না, কারখানায় সবাই তাকে ভালবাসে, কাজের পাকা ঘুণ, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারকে বাতলে দিতে পারে হুড়ুক-সন্ধান। সাহেব ত তাকে 'বেঙিন্ বয়' করতে চেয়েছিল—কিন্তু শ্যামাকে ছেড়ে সে স্বর্গে যেতেও রাজী নয়। রোগা লিক্‌লিকে কিন্তু খাটে অসুরের মত, সকলের কাজ করে দেয় হাসিমুখে, কোথায় বল্টু আটকাচ্চে না, কোথায় ওয়েল্ডিং দরকার, কোথায় লেদ্ চালাতে হবে, দেবুকে ধরলেই কাজ হাসিল।

ঘরের দাওয়ায় উঠেই বল্লে—শুনছো শ্যামমোহিনী, রাধা নামের সাধা বাঁশী আর বাজবে না—কাল থেকে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, সহরে জোর দাঙ্গাহাঙ্গামা বেঁধেছে, বঁটিটে শানিয়ে রাখো, ঐ ত সম্বল—বলে হো হো করে হেসে গড়িয়ে গেল। কিন্তু সুরাচপল কথার ভেতরে কোথায় যেন রূঢ় সত্যের কিছুটা আমেজ বাজে।

ছি, ছি, কি যে মাতলামী করো—বলে শ্যামা।

আমি মাতাল, বলি প্রিয়ে কোন শালা বলেছে, না হয় একটু খেয়েছি—মাতাল কখনো না—ঠিক বুঝবে, যখন পেটের ভেতর ছুরি ঢুকবে।

শ্যামা আঁতকে ওঠে, মনে মনে বলে—ঠাকুর একী সত্যি! সামনে বলে—থামো, আর বীরত্ব ফলিয়ে কাজ নেই, তাও ঘরের বউএর উপর, চলো হাত মুখ ধুয়ে নাও, গরম গরম মাছ ভেজে ভাত দিই।

দিয়ে নাও, সতীসাধ্বী, কাল কোথায় থাকি কে জানে—

ষাট্ ষাট্ কি যে বলো তুমি অলুক্ষণে কথা—কান্না চেপে শ্যামা বলে। জল এগিয়ে দেয়, হুঁকো তামাক, টিকে, দেশালাই।

মহীদের জন্য দুখানা রাখিস্, সকালে পান্তার সঙ্গে চলবে—চেঁচিয়ে বলে দেবু।

তা আর তোমায় শেখাতে হবে না—রেগে জবাব দেয় শ্যামা রান্নাঘর থেকে।

রাবেয়া পাংশুমুখে তার দাওয়ার পাশে এসে দাঁড়ায়—সে দেবুর সব কথা শুনেছে—মাথাফাটাফাটি, মারামারি নিজেদের ভেতরে—কি পাগলের মত বকছে দেবুদা, বলে কি ছিঃ ছিঃ, সে তার সই, অমলা, দেবুদা, মহী, আমিজান্, শিউলী, বাবুসিং—এরা কি আলাদা—এক দেশে একই রক্তের ধারায় জন্ম, এতকাল একসঙ্গে বাস, ভালবাসা, সুখে দুঃখে থাকা, এক ভাষায় মনের কথা বলা—সব মিথ্যে—না, দেবুদা নিশ্চয়ই আজ টেনেছে বেশী। না হয় দুষ্টু লোকে ভুল বুঝিয়েছে—যা সাদাসিদে মানুষ। চুপ করে বসে থাকে সে কাঁদো কাঁদো হয়ে, মহীর আসার অপেক্ষায়। দূরে বস্তির ভেতরে অনেকক্ষণ থেকেই হৈ হৈ, চেঁচামেচি লেগে গেছে। আরো দূরে গাঁয়ের মাঝে শাঁখ বাজচে—স্বাভাবিক শান্ত ভাদ্দরের রাত্তির। একটা পেঁচা ডেকে গেল—কি রকম একটা ছমছমে ভাব—

ভয় করছে তার—যাবে নাকি সইএর কাছে—নাঃ—দেবুদাকে নিয়েই ব্যস্ত সে এখন।

ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল দূরে গির্জ্জের ঘড়িতে, ক্রুশে বিদ্ধ যীশুর মূর্ত্তি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। নিস্তরঙ্গ রাত, কিন্তু বস্তির কোলাহল ঝিমিয়ে আসছে না ত! যাক্ বাঁচা গেল—ঐ যে মহী আসছে, তার সবল দৃপ্ত পায়ের প্রতিটি ষ্টেপ সে নিখুঁত ভাবে চেনে—দাঁড়িয়ে উঠল সে—মহীর মুখ গম্ভীর—হোল কি—তারও কি দেবুদার মত মাথা খারাপ হোল নাকি। তাড়াতাড়ি বদনা এগিয়ে দেয় রাবেয়া, খাবার গুছিয়ে নিয়ে আসে। মহী কথা কয় না, চুপ করে খেয়ে যায়—রাবেয়ার মুখ ও বুক শুকিয়ে আসে ভয়ে, অজানা আশঙ্কায়—নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে।

সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস্ করে—কি হয়েছে গা—

বলছি—বলে মহী উঠে দাঁড়ায়—দাওয়া থেকে নেমে পাশের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চুপি চুপি ডাকে—দেবুদা।

দেবুদার তখন বিদঘন তুরীয় অবস্থা, সোমরসের জারকে উর্ব্বশী-রম্ভা-ঘৃতাচীর সঙ্গে নন্দন কাননে ফিটনে বেড়াচ্চে—ছোট কথা কানে গেল না। দরজা খুলে বাইরে এলো শ্যামা—

কে, মহীঠাকুরপো নাকি? এত রাত্তিরে—রাবেয়া ভালো ত!

দেবুদা কোথায়—

ঘুমিয়ে পড়েছে—

একটু ডেকে দিতে হবে, বড্ড জরুরী—

ভয় পেয়ে শ্যামা জিজ্ঞাসা করে—কি হোল ভাই, ওঁকে ওঠানো যে এখন মুস্কিল, বুঝছো ত।

তাতো বুঝ্‌চি, কিন্তু প্রাণের দায়।

ওদিকের দাওয়ায় রাবেয়া কাঁপতে থাকে।

কোন রকমে তেঁতুলগোলা খাইয়ে, মাথায় জল ঢেলে, দেবুকে আধ ঘণ্টা পরে শ্যামা ও মহী খানিকটা ধাতস্থ করে চাঙ্গা করে তুলতে দেবু বলে—ব্যাপার কি, মহীভাই, এত রাত্তিরে এমন সখের মৌজ্‌টা মাটি করলে যখন, তখন নিশ্চয়ই কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার?

শুনেছো, কাল থেকে নাকি দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধবে, সহরে গোলমাল লেগেছে—এ বস্তিও বাদ যাবে না।

এই কথা, তারই জন্যে নেশাটা নষ্ট, বলছিল বটে দু বেটা বেঁটে বিটকেল তাড়ির দোকানে, মা ধান্যেশ্বরী তালেশ্বরী, বেঁচে থাকুন, ছোট কথা কি আর কানে ঢোকে।

কি করবে, ঠিক করেছ—

করাকরির আবার আছে কি, আমাদের আবার ঝগড়া কিসের, খাই দাই কাঁসি বাজাই, তুমিও আমার ভাই, বাবুসিংও আমার ভাই, আমরা মাথাফাটাফাটি করব কিসের দুঃখে, বস্তির সবাইকে জোড়হাতে বুঝিয়ে বলব কাল সকালে, সবাই এক সঙ্গে এক জোট্ হয়ে দাঁড়াব।

না ভাই দেবুদা, অত সহজ নয়—এর ভেতরে অনেক কথা আছে—বস্তির বাইরের লোক এলে কি করবে—তার চেয়ে তুমি না হয় এদের নিয়ে রাত থাকতে বেরিয়ে পড়ো, আমাদের জন্ম ভেবো না—

সবাইকে না জানিয়ে, বিপদের মুখে ফেলে রেখে চলে যাব, বলিস্ কিরে মহী, আর তোরা ছাড়া আমাদের আছেই বা কে, যাব কোথায়।

না, না দেবুদা, ভালো করে বুঝে দেখো।

হয় না মহী—হুঙ্কার দিয়ে ওঠে দেবু।

ফিস্ ফিস্ করে শ্যামা বলে—রাবেয়াকে ছেড়ে যাব কি রকম, তার যে এখন-তখন—ভর পোয়াতী।

রাবেয়া এসে দাঁড়িয়েছে শ্যামার পাশে, ফুঁপিয়ে কাঁদচে।

চুপ চুপ,—বলে মহী—আজকের সহরের খবর শোননি—

দরকার নেই শুনে।

কিন্তু—

আবার কিন্তু, ওরে মহী, এই কবছরে কত ঝড় ঝাপ্টা গেল বল দিকিন্? পঞ্চাশের মন্বন্তরে না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় লোক মলো, বন্যার জলের কলরোলে মানুষ গরু বাড়ী ডুবল, বস্ত্রের অভাবে গলায় দড়ি দিয়ে লজ্জা ঘোচাল মেয়েরা, কালোবাজার, মজুতদারী, কণ্ট্রাক্টরী, দালালী কিছুরই কমতি নেই, ভোজবাজির মত কত এল, কত গেল—কে বাঁচে, কে মরে, কে তার হিসাব রেখেছে···কালো অভিশাপ লেগেছে ভিত ধ্বসে যাচ্চে—চরমে নেমে যাচ্চি আমরা—কে কাকে বাঁচাবে ভাই।

কিন্তু এমন কেন হয় দেবুদা—

কি জানি ভাই, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—মনে হয় ভাই যখন ভাইকে, মানুষ যখন মানুষকে ঠেকিয়ে রাখে দূরে স্বার্থপরতায়, ঘৃণায়, নীচতায়, সে অপরাধ বোঝা হয়ে ওঠে, ভগবান তা সন্ না—তাঁকে যে দূরে রেখেছি। দিনে দিনে জমা হয় পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ, দুঃখ দুর্দ্দশা। একদিন একটা ছোট দেশলাইয়ের কাটিতে জ্বলে ওঠে বারুদের স্তূপ, শত শিখায়—ভারকেন্দ্র নড়িয়ে দিয়ে বাসুকি টলেন—মন্থনে যে বিষ ওঠে তাকে কণ্ঠে ধরবার শক্তি নীলকণ্ঠেরও নেই, বিষের মাশুল দিতে হবে না মহীভাই।

গম্ভীর হয়ে যায় দেবু—তার ধ্যান মানস, উদাস দৃষ্টি চলে গেছে গভীরে অনেক—অনেক দূরে।

রাবেয়া চোখ মোছে, থর থর করে কাঁপে, শ্যামাও কাঁদে।

মহী অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, রাবেয়া শ্যামার দিকে চেয়ে দেখলে,—তারায় ভর্ত্তি নির্মেঘ নিরুদ্বেগ আকাশ, অন্ধকারে ভরা—তারপর শান্ত কণ্ঠে বলে—যাই হোক্ আমাদের কেউ ছাড়াতে পারবে না।

শেষ পর্য্যন্ত তাই হোল—দিকে দিকে তাজা রক্তরাঙা নরকোৎসব—মত্ত হুঙ্কারে ভেসে গেল সব কিছু—দয়া মায়া, স্নেহ মমতা, এতদিনের এক সঙ্গেকার কত স্মৃতি, কত দেওয়া, কত পাওয়া—ডুবে গেল ভায়ের প্রতি ভায়ের দরদ, পশু মানুষের তাণ্ডবে। অতর্কিতে মৃত্যুর দূত এসে জোর-জবর দস্তি করে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, মহী দেবু শ্যামা আরো অনেককে। দাউ দাউ করে লক্‌লকে জিভ দিয়ে শুষে খেতে লাগল ছিন্নমস্তা—মম ভুঁখাহু। জোড় হাতে অনেক বোঝালে মহী, দেবু, আরো সবাই—কে শোনে—পিশাচ জনতাবেগ এগিয়ে যায় ঘোড়ো টাইফুনের বেগে। ভেতরে কাঁপতে থাকে অবোধ শিশুরা, মায়েরা কাঁদে, রাবেয়া ভয়ে অকাল প্রসব বেদনায় কাতরায়, রক্তস্রাবে নীল হ'য়ে আসে—ক্ষীণ জীবনীধারা

স্তিমিত—আকুপাকু করে শ্যামা। উদ্যত লাঠির ঘা থেকে দেবুকে বাঁচাতে গিয়ে মহী পড়ল শুয়ে মাটির শেষ আশ্রয়ে, দেবুও শুল মহীভায়ের পাশে। দুর্ব্বার জলতরঙ্গে শ্যামা মলো কি বাঁচলো, কোথায় তলিয়ে গেল কেউ জানলো না। ঠেকাতে পারলে না দেবু মহী,হয়ত পারবে রাবেয়া-শ্যামার পেটে তাদের যে ছেলেরা আছে তারা—অনাগত দিনের লেবেলহীন্ অনামীরা। * * *

কদিন পরে পোড়াঘর, গলিত দুর্গন্ধ, ঝোড়ো আবহাওয়া থেকে পাগলের মত রাবেয়া নামল পথে—উন্মাদ সহরের পচা ঘেয়ো ছোঁওয়া থেকে। এলোচুল শুকনো উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা, রক্তের দাগ কাপড়ে। বাজ-পড়া গাছ হাঁটতে পারে না, তবু চলছে, সর্ব্বহারা দিশাহারা। এক কোলে অমলা, আর কোলে সদ্যজাত শিশু। টক্‌টকে লাল জবাফুলের মত চোখ—জল ফুরিয়ে গেছে, না বলা কত কথার ভিড়ে।

ভয়ার্ত্ত ক্ষীণকণ্ঠে অমলা ডাকে—মাছি…

রাবেয়া আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরে। রিলিফ ট্রাক এগিয়ে আসে। দূরে তিন্ গাঁয়ে সর্পিল পথরেখা যেখানে লীন্ সেখানে বৈরিগীতে গাচ্ছে—'অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ'। পরের দিন উন্মাদ সহরের পচা ঘেয়ো গলিত শবশীতল ছোঁওয়া থেকে আধো জীবন্তদের নিয়ে যাবার জন্যে রিলিফট্রাক্ এসে দাঁড়াল বাজপড়া গলির সামনে। এগিয়ে এলোনা দেবুশ্যামা, ছুটে গেল না মহীরাবেয়া আরো সবাই। মরে অমর হবার পাগলামি তাদের ছিল না বটে, কিন্তু দোষ গুণে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার বালাই নিশ্চয়ই ছিল অ্যাপোক্যালিপ্‌সের ঘোঁড়-সোয়াররা, সফেন হ্রেষা-ধ্বনিতুলে, ধুলো উড়িয়ে দলে দলে চলে গেছে। আছে শুধু ঝড় শেষের বিধ্বস্ত বিপর্য্যয়, গায়ে কাঁটা দেয় এমন অসহ স্তব্ধতা। ঘরের ভেতর শব্দ শুনে ষ্ট্রেচার নিয়ে এগিয়ে গেল সেবাদল। কুতকুতে চোখ মেলে বুড়োআঙুল মুখে নিশ্চিন্তে পা নাড়াচ্ছে রাবেয়ার সদ্যজাত। মৃত্যুনীল মায়ের চোখে তখনও লেগে রয়েছে না বলা কথা, আর ভয়ের ভিড়,প্রসবকাতর আক্ষেপ। পাশে বসে আস্তে আস্তে আদর ও শাসন করছে অমলা—চুপ—তার আহ্লাদী পুতুলটা ছাড়েনি, নতুন খেলার সঙ্গী পেয়ে ভুলে গেছে ক্ষিধে, ভয়। অবসাদে নেতিয়ে পড়েছিল এতক্ষণ—মা, মাস্তি, বলে কেঁদেচে—কোন সাড়া পায়নি—ট্যাঁ ট্যাঁ কান্না শুনে উঠেছে। নিঝুম মরুশ্মশানের দুদিকে দুটি আধফোটা রক্তকরবী, কালের কলকে মহাকালের ইঙ্গিত।

দূরে তিন গাঁয়ে, সর্পিল পথ রেখা যেখানে লীন সেখানে বৈরিগীতে গান ধরেছে—"অন্ধজনে দেহ আলো, মৃতজনে দেহ প্রাণ।"

জৈন কর্মবাদ

শ্রীদেবপ্রসাদ গুহ এম-এ

শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে প্রকাশিত "জৈন কর্মবাদ" সম্বন্ধে ডক্টর বিমলাচরণ লাহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি। অগ্রহায়ণ মাসের উক্ত মাসিক পত্রিকায় শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা লিখিত সুমালোচনা পাঠ করিলাম। সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন যে ডক্টর লাহার নিকট হইতে এই বিষয় সম্বন্ধে একটী বিস্তারিত আলোচনা আশা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ন্যায় মাসিক পত্রিকায় এইরূপ জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সুবিস্তৃত বিবরণ সাধারণ পাঠক পাঠিকার কতদূর মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, ইহা বিবেচনা করিয়া ডাঃ লাহা একটী সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশ করেন। এই বিষয় সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বিশদভাবে জানিতে ইচ্ছুক হইলে, ডাঃ লাহার লিখিত নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী পাঠ করিতে পারেন :—

Mahavira : His Life and Teachings, 1937; Jain View of Karma (Bharatiya Vidya, July-August, 1945); Jaina Canonical Sutras (Indian Culture, Vol. XII, No. 4, and Vol. XIII, No. I).

ডাঃ লাহা যে সকল পুস্তকের নাম প্রবন্ধের শেষে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে তিনি জৈন অঙ্গ ও উপাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বেশী ভাগ গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। জৈন বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করিতে হইলে অঙ্গ এবং উপাঙ্গের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা উচিত। সমালোচক মহাশয় যেছয়টী পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহা Winternitz সাহেবের "A History of Indian Literature, Vol. II (Cal. Univ. Pub.) শীর্ষক পুস্তকে ৫৯১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। এই পুস্তকগুলি জৈন শ্বেতাম্বর আগমভুক্ত নহে সেইজন্য ইহাদের মূল্য ও প্রাধান্য অল্প।

সমালোচক মহাশয়ের নিম্নলিখিত উক্তিতে আমরা

বিস্মিত হইয়াছি: "হয়ত বৌদ্ধদর্শনের এই শব্দগুলি কোন প্রকার ভ্রমক্রমে জৈন বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে।" সমালোচক মহাশয়ের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সমালোচক মহাশয় বৌদ্ধ শীলব্রত পরামর্শ ও জৈন অজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য ডাঃ লাহার Mahavira : His Life and Teachings পুস্তকের ৭৪ পৃঃ দেখিতে পারেন। জৈন ধর্ম আলোচনা করিতে হইলে বৌদ্ধশাস্ত্র ভাল করিয়া পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় একই সময়ে প্রচারিত হইয়াছে এবং বুদ্ধ ও মহাবীর সমসাময়িক।

সমালোচক মহাশয় ডাঃ লাহার প্রবন্ধ হইতে যে সকল উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রমাণ আমরা নিম্নে দিতেছি:

ডাঃ লাহা লিখিয়াছেন "মানবের দেহ, মন এবং বাক্য পার্থিব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কর্মের সৃষ্টি হয়। রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ ওমানকে প্রশ্রয় দিলে কর্ম বিপন্ন হয়।" Sinclair Stevenson তাঁহার Heart of Jainism পুস্তকে ১৭৪ পৃষ্ঠায় ডাঃ লাহার এই মত সমর্থন করিয়াছেন। সমালোচকের ইহা বুঝা উচিত ছিল যে ক্রোধ, লোভ, মায়া ও মানজাতীয় কষায় দ্বারা প্রভাবিত হইলে মানবের কর্মের গতি আত্মার উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয়। তিনি ডাঃ লাহার আরও দু একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা:—"জাতি, মানবের জীবন, পেশা, বাসস্থান, বিবাহ, খাদ্য এবং ধর্মপালন প্রভৃতি বিষয়গুলি নির্দ্ধারণ করে"—এই উক্তির সমর্থনের জন্য Stevensonএর উল্লিখিত পুস্তকের ১৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ডাঃ লাহা লিখিয়াছেন "জৈনদিগের মতে আত্মা সর্ব প্রথমে কর্মের সম্পূর্ণ প্রভাব অনুভব করে এবং সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না"—এই উক্তিও Heart of Jainism পুস্তকে (১৮৫ পৃঃ) সমর্থিত হইয়াছে। "সর্ব প্রথমের" অর্থ সর্বপ্রথম স্তরে বা সোপানে। সমালোচক মহাশয় "পক্বতালাভের" অর্থ বিশেষভাবে বুঝিতে পারেন নাই। আত্মা "পক্বতালাভ" করিলে (maturity) মোক্ষলাভের উপযোগী হইতে পারে। ডাঃ লাহার Mahavira, pp. 94H দ্রষ্টব্য।

সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন যে নবতত্ত্বের কোন একটী তত্ত্বের কথা বা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না। যে সূত্রে ডাঃ লাহা নবতত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সেখানে নবতত্ত্বের কোন নামোল্লেখের প্রয়োজন দেখা যায় না। যদি কেহ নবতত্ত্বগুলির নাম জানিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে পারেন:—উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, XXVIII, 14; জৈনসূত্র, II, p. 154; এবং ডাঃ লাহা প্রণীত Mahavira: His Life and Teachings, p. 69। সমালোচক মহাশয় নবতত্ত্বের নামগুলি প্রকাশ করিয়া বিশেষ নূতন সংবাদ দেন নাই। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত ডাঃ লাহার মহাবীর গ্রন্থে (৬৯ পৃঃ) এই সংবাদ পাওয়া যায়। তিনি কল্পসূত্রের তিনটী ভাগ দিয়াছেন। এই বিভাগ দেখাইবার অর্থ কি বুঝিলাম না।

ডাঃ লাহা Jaina Antiquaryতে (১) প্রকাশিত তাঁহার "কল্পসূত্র" প্রবন্ধে বহুবর্ষ পূর্বে এই সকল ভাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ কতকগুলি কথা উত্থাপন না করিলেই সমালোচক মহাশয় ভাল করিতেন। যে কোন বিষয় আলোচনা করিতে গেলে অপ্রাসঙ্গিকভাবে আরও বহু বিষয়ের অবতারণা করা চলে, কিন্তু রচনার অপ্রাসঙ্গিকতা দোষটী বর্জন করা উচিত।

ডাঃ লাহা সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় বিষয় বস্তুটী যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা জৈন কর্মবাদের ন্যায় সূক্ষ্ম ও জটিল তত্ত্ব সহজে বুঝিতে পারেন, এবং এইরূপ সরলতা ও সুস্পষ্টতাতেই তাঁহার প্রবন্ধের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

---

(১) Vol. II, No. 4, March, 1937, p. 82; H. R. Kapadia, 'A History of the Canonical Literature of the Jainas,' 1941, p. 145 ও দেখিতে পারেন।

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্রদেব

(আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন)

রাজপুতানার পথে আগ্রায় আমরা বিশ্রাম করলুম একদিন। শ্রীমতীর খেয়াল হল উষার আলোয় তাজ দেখবেন।

একাধিকবার আগ্রায় এসেছেন। দিনের উজ্জ্বল প্রভায় তাজের প্রদীপ্ত রূপ দেখেছেন। গোধূলির অস্তরাগে তাজের মেদুর শোভা দর্শন করেছেন। পূর্ণিমারাত্রে সুষুপ্ত তাজের জ্যোৎস্নাবিধৌত স্বপ্নালুসৌন্দর্য্য দীর্ঘ প্রহর মুগ্ধদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন। এবার উষার প্রথম অরুণচ্ছটায় সদ্যঘুম-ভাঙা তাজের প্রভাতী লাবণ্য সন্দর্শনে যাওয়া হল।

তাজের দিকে চেয়ে চেয়ে কোনদিনই একথা মনে হয় না যে এ এক বিরহী সম্রাটের প্রেমে গড়া তাঁর পরলোকবাসিনী প্রিয়তমার বাদশাহী সমাধি মন্দির। মনে হয়, আমরা যেন—মুঘল হারেমের অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী বেগম মমতাজকেই দেখতে পাচ্ছি—দেখতে পাচ্ছি তাকে তার এই মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে! দেখতে পাচ্ছি তার অনুপম সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জ এই প্রশান্ত পাষাণে!

সেদিন ভোরে গিয়েও দেখলেম তাকে—

'প্রভাতের অরুণ আভাসে—

যেমন দেখেছিলাম তাকে—

ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের অরুণ নিশ্বাসে—

অথবা,—পূর্ণিমায়—দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে—

ভাষার অতীত তীরে?'

কতক্ষণ যে সে আমাদের সৌন্দর্য্যে ভুলায়ে সময়ের হৃদয় হরণ করেছিল বুঝতে পারিনি। চমক্ ভাঙলো টংগাওয়ালার তাড়ায়—'হুজুর কিল্লা যানেকা টাইম হুয়া।'

ঘড়ি খুলে দেখি ১১টা বাজে!

মুঘল সাম্রাজ্যের মহিমময় যুগের অবিস্মরণীয় ইতিকথা বুকে নিয়ে আগ্রার বিশাল দুর্গ আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে শত্রুর আক্রমণের একাধিক চিহ্ন অঙ্গে নিয়ে। আমরা ইতিপূর্ব্বে এ দুর্গের মধ্যে অনেকবার সসম্ভ্রমে ঘুরে গেছি। কিন্তু আমাদের সঙ্গিনী বান্ধবীটি আগ্রায় কখনো আসেননি বলে আর একবার আমরা ঘুরে এলুম সেই বিশ্ববিশ্রুত দেওয়ানিখাস, দেওয়ানিআম, শিসমহল, রঙমহল যোধপুরী বেগমের হিন্দুমহল, সম্রাট সাজাহানের সোমনাথবুরুজ। যমুনাতীরের যে ঝরোকায় বসে পুত্রহস্তে বন্দী বৃদ্ধ বাদশাহ সাজাহান স্তব্ধ হ'য়ে ওপারের তাজমহলের দিকে নির্নিমেষ করুণ নয়নে চেয়ে থাকতেন—

হয়ত তাঁর মনে তখন এই ভাবনাই উদয় হ'ত—

'—রাজ শক্তি বজ্র সুকঠিন

সন্ধ্যারক্তরাগ সম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,

কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস—
নিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ।'

পথপ্রদর্শকরূপে আমরা পেয়েছিলুম অশীতিপর বৃদ্ধ এক মুসলমানকে। এঁর মস্ত বড় গৌরব ইনি লর্ড কর্জ্জনের গাইড হয়ে তাঁকে সর্ব্বপ্রথম এই কেল্লা দেখিয়েছিলেন। বৃদ্ধ আমাদের আগ্রাদুর্গের প্রত্যেক পাথরখানার পর্য্যন্ত ইতিহাস বোঝাতে শুরু করলেন। বৃদ্ধের মুখে শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত শুনলুম এককথা—আগ্রাদুর্গের যা কিছু ক্ষতি তা' ভরতপুরের মহারাজা করেছেন। কিল্লার সমস্ত মণিরত্ন আভরণ ভরতপুরের মহারাজাই লুট ক'রে নিয়ে গেছেন। আমরা ইতিহাসের নজীর তুলে প্রতিবাদ করাতে বৃদ্ধ নিম্নস্বরে বললে—ফিরিঙ্গী দুষমন্ সব লুঠ লিয়া! মগর উয়ো কহ্‌নেসে মেরা লাইসেন্স খতম হো যাগা!

সারা দুর্গ ঘুরে শ্রান্ত হয়ে আমরা এসে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে ক্ষণকাল সেইখানেই অপেক্ষা করলুম। তার পর ধীরে ধীরে আমাদের অস্থায়ী আস্তানা 'আগ্রা হোটেলে' ফিরে এলুম। সঙ্গে এলেন তাজমহলের চত্বরে কুড়িয়ে পাওয়া আমাদের নবপরিচিত তরুণ বন্ধু মিঃ সালাম। ইনি দিল্লীর অধিবাসী এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সুযোগ্য সন্তান। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দিল্লীর ছেলে হ'য়েও তিনি এপর্য্যন্ত 'তাজমহল' দেখেননি। জীবনে এই প্রথম তাজমহল দেখতে এসেছেন। ছেলেটি কবি। বিরহী সম্রাটের জমাট অশ্রুরাশি—সেই প্রস্তরীভূত প্রেমের অপূর্ব্ব নিদর্শন 'তাজমহল' সন্দর্শনে তিনি তখন মুগ্ধ ও মোহাভিভূত। আমরা তাজমহলের অপূর্ব্ব স্থাপত্য কলা নিয়ে নিজেদের মধ্যে সপ্রশংস আলোচনা করছি শুনে তিনি এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে চোস্ত ইংরাজীতে আলাপ শুরু করলেন—'আপনাদের বাঙালী বলে মনে হচ্ছে যেন?'

'হ্যাঁ, আমরা বাঙালী পরিব্রাজকের দল, দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি—'

শুনে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে সপ্রেম করমর্দ্দন করে নিজের পরিচয় দিলেন এবং জিজ্ঞাসা
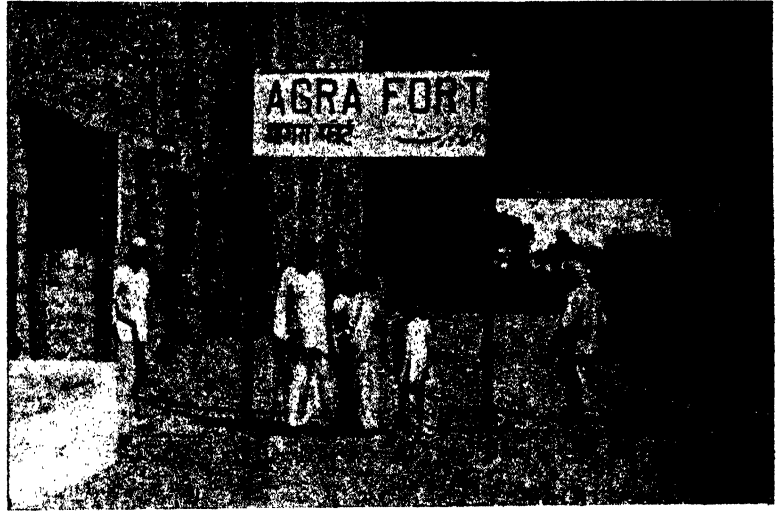
'আগ্রা ফোর্ট' ষ্টেশনে

করলেন—আপনারা তাহ'লে নিশ্চয় বাংলার বিখ্যাত কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামকে চেনেন! নজরুল আমাদের বিশেষ
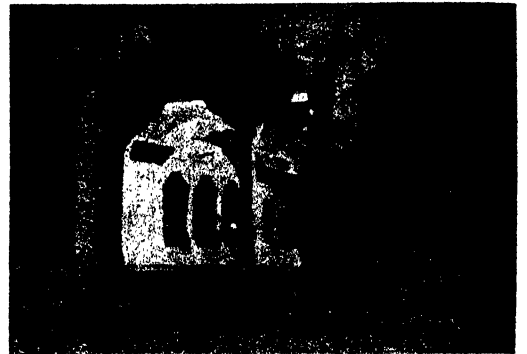
আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে

বন্ধু শুনে এবং আমাদের পরিচয় জেনে তিনি 'খুবই আনন্দিত হলেন।' বললেন—তাজমহলের উপর লেখা

নজ্‌রুলের কবিতা পড়েই তিনি ছুটে এসেছেন আলিগড় থেকে আগ্রায়। আমরা বললুম—আপনি ত' তাহ'লে

তাজমহলের মর্ম্মর চত্বরে
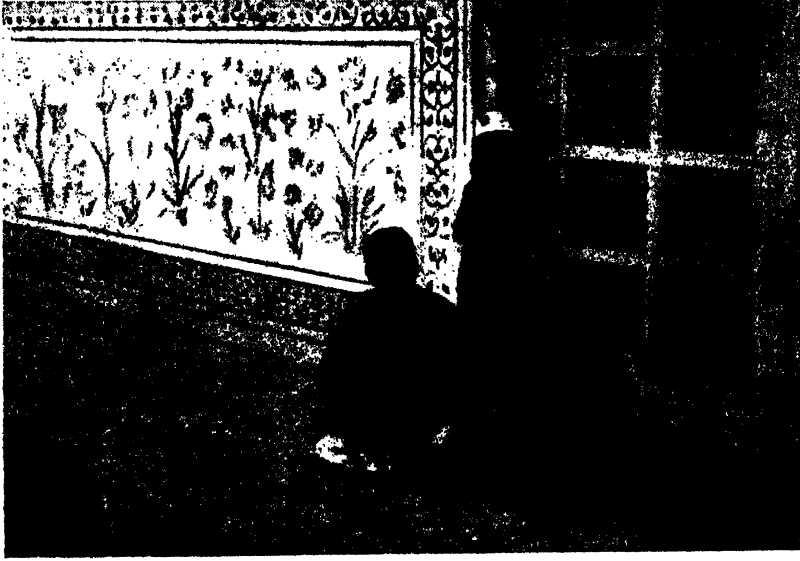
বাংলা জানেন্‌ দেখছি!—তাজমহলের উপরে লেখা রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়েছেন নিশ্চয়?

তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন—না, তিনি বাংলা জানেন না। বাংলা শেখবার তাঁর খুব ঝোঁক আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার উর্দ্দু অনুবাদ এপর্য্যন্ত কোথাও পড়বার তাঁর সৌভাগ্য হয়নি।

যমুনা তীরে (অবগাহন স্নান)

তাজমহলের ছায়াস্নিগ্ধ শান্তক্রোড়ে বসে অনেকক্ষণ আমরা তাঁর সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করলুম। কোন কবি তাজমহলকে কি চোখে দেখেছেন। কি ভাষায় কোন উপমা দিয়ে এর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সেই অনুভূতির বিচিত্র ব্যঞ্জনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হ'ল। বিশ্ব-বিখ্যাত ইংরাজ লেখক আলডুস্‌ হাকস্‌লে যখন ভারতবর্ষে এসে ছিলেন তিনি তাজমহল দেখে একে কুৎসিত বলে বর্ণনা করেছেন তাঁর 'জেষ্টার' বইখানিতে। হাক্‌সলের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েও গবেষণা করা হল।

আগ্রা হোটেলে ফিরে এসে মধ্যাহ্নভোজনের সময় ঠিক হল আমরা কাল সকালের গাড়ীতে গিয়ে—মথুরা বৃন্দাবন ঘুরে আসবো। সালামকে আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজে আমন্ত্রণ করে এনেছিলুম। মথুরা বৃন্দাবনে যাবার কথা শুনে সে আমাদের সঙ্গী হ'তে চাইলে। বললে—মথুরা বৃন্দাবনে যাবার আমার অনেক দিনের সাধ। শুনেছি রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের কাহিনা জড়ানো মথুরা বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি স্থাপত্যকলার অপূর্ব্ব নিদর্শন! রাধাকৃষ্ণ প্রেমের কাহিনী সম্বন্ধে তার অভিমত হল—লয়লা-মজনুর ও শিরীন-ফরহাদের প্রেমের কাহিনী নাকি এর কাছে কিছুই নয়। শেকস্‌পীয়ারের 'রোমিয়ো জুলিয়েটের' প্রেমও ম্লান হয়ে যায়। সালাম বলে, এরা কেউ স্থূল ইন্দ্রিয় জগতের উর্দ্ধে উঠতে পারেনি সুফী সাধকদের মতো, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ প্রেম অতীন্দ্রিয় লোকে পৌঁছতে পেরেছে। সুফী ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব দর্শন নিয়ে—সে যে আলোচনা করলে, শুনে আমি বিস্মিত হ'য়ে বললুম—বাংলা না জেনে বৈষ্ণব সাহিত্যের এত খবর তুমি রাখলে কি করে? সালাম বললে—আমি বাংলাকে ও বাঙালীকে ভালবাসি যে। তারা শিল্পী—তারা কবি! তারা 'বেনিয়া' নয়। আমি ইংরাজীতে লেখা আপনাদের ধর্ম্ম, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বই পড়েছি। আপনাদের

বৈষ্ণবিজ্‌ম্ কিন্তু পারস্যের সুফিজ্‌মের কাছে অনেকাংশে ঋণী!

এ তর্কের কোন উত্তর না দিয়ে বললুম, তুমি বাংলা শেখো। রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়তে না পারা তোমার একান্ত দুর্ভাগ্য বলে মনে করি।

সালাম বল্লে—আপনিও উর্দ্দু শিখুন দাদা। ওমর-খৈয়াম অনুবাদ করেছেন, এইবার ইকবালের কবিতা অনুবাদ করুন। ইকবাল পড়তে না পারাটাও আমার কাছে আপনাদের চরম দুর্ভাগ্য বলেই মনে হয়।

ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে ইকবালের রচনার সঙ্গে আমাদের কিছু কিছু পরিচয় আছে জানালাম। ইকবালের কবিতা নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা হ'ল। সালাম আমাদের ইকবাল-প্রীতির পরিচয় পেয়ে খুশী হয়ে উঠল। পাকিস্থানের পরিকল্পনা ও প্যান-ইসলামিজম সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলুম—তুমি কি পাকিস্থান সমর্থন করো? সালাম জোরের সঙ্গে বললে—নিশ্চয়! নইলে আমাদের ইস্‌লাম সংস্কৃতি যে হিন্দুর প্রভাবে ডুবে যেতে বসেছে! আত্মরক্ষা করতে কে না চায় বলুন?

জানতে চাইলুম—তুমি কি মোসলেম লীগের সভ্য?

সালাম বললে—শুধু সভ্য নই দাদা, আমি—একজন প্রচণ্ড পাণ্ডা! প্রোপাগাণ্ডা করে বেড়াই! হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার আমি সমর্থন করিনে বটে, কিন্তু মোসলেম সংহতির আমি পক্ষপাতী। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমরা আগে স্বাধীনতা চাও, না আগে পাকিস্থান চাও? সালাম বললে—পাকিস্থান পেলেই তবে আমরা সত্যকার স্বাধীনতা পাবো, নইলে, হিন্দুরাজের অধীনে আমাদের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হবে।

সাহিত্য চর্চ্চা কোথায় তলিয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল রাষ্ট্রীয় আলোচনা! ভারতের ভবিষ্যৎ, হিন্দুমুসলমানের অবস্থা, বিদেশীয় ও দেশীয় রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা, ভারতের অর্থ-নৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি ইত্যাদি নানা আলোচনায় সারাদিন আমাদের সঙ্গে কাটিয়ে সন্ধ্যায় চা-জলখাবার

দেওয়ানীখাসের সম্মুখে (দক্ষিণে :—লেখক, মিঃ সালাম, বান্ধবী ও শ্রীমতী) উপরে—নবনীতা, সম্মুখে বৃন্দসাইড

খেয়ে সালাম বিদায় নিলে। সে আগ্রা ক্যান্টনমেন্টে থাকে। বললে, কাল সকালের মথুরাগামী ট্রেণে আমি ওখান থেকেই আপনাদের ধরবো। একবার মথুরায় গিয়ে দাদা আমি বড় হতাশ হয়ে ফিরেছি। মুসলমান বলে আমাকে সেখানকার কোনো মন্দিরেই ঢুকতে

গোপীনাথের মন্দির

দেয়নি। আপনাদের সঙ্গে গেলে আশা করি সে বাধা থাকবে না। বললুম—সম্ভবত নয়, যদি না তুমি নিজে ধরা

পড়ো। মনে মনে বললুম, তুমি ইতিহাসের ছাত্র, একথা তোমার নিশ্চয় জানা আছে যে গজনীর সুলতান মামুদ থেকে

মথুরা ষ্টেশনে

আরম্ভ করে সম্রাট ঔরঙ্গজেব পর্য্যন্ত এই মথুরা বৃন্দাবনের বুকে কী তাণ্ডবলীলাই না করে গেছে। পঞ্চদেবতার
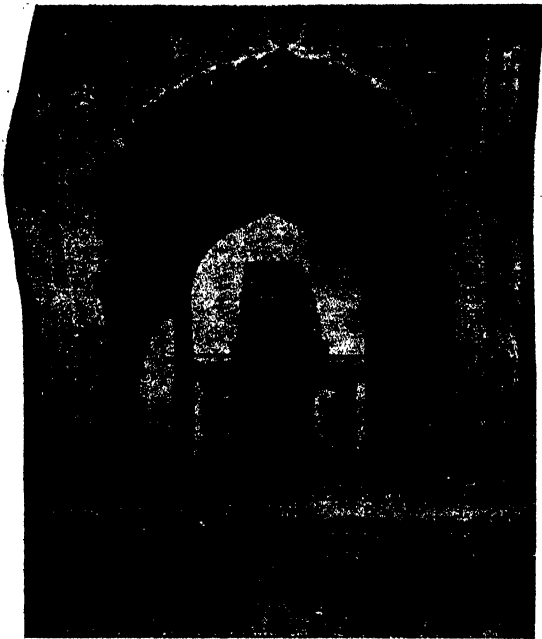
গোবিন্দ মন্দিরের তোরণ দ্বার

বিরাট স্বর্ণ দেউল, বীরসিংহের স্থাপিত কেশবদেবের অপূর্ব্ব মন্দিরের চিহ্নমাত্র রাখেননি তাঁরা। মথুরার নাম দিয়েছিলেন ইসলামাবাদ। এসব ঘটনার বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী নবব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় মথুরার বিংশতি বৌদ্ধ বিহার হিন্দুরা ধ্বংস করেছিলেন। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের বর্ণনায় দেখা যায় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই বৌদ্ধ বিহার-গুলির অস্তিত্ব ছিল এবং প্রায় বিশ হাজার বৌদ্ধশ্রমণ এখানে বাস করতেন। বুন্দেলার হিন্দুরাজা বীরসিংহ জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলে এখানে যে কেশবদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন সে এক বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপের উপর। সেই কেশবদেবের মন্দির ধ্বংস করে আবার ঔরঙ্গজেব গড়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত লাল মশ্‌জেদ! এমনি করে মথুরার উত্থান পতন চলে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী কত সংঘাত ও সঙ্ঘর্ষের বিচিত্র ইতিহাস রচনা করে। হিন্দুর কলঙ্ক ও গৌরব মুসলিম্ তাণ্ডবের পাশাপাশি নৃত্য করেছে এই প্রাচীন পুরী মথুরায়।

সালাম চলে যাবার পর আমার সহযাত্রীরা সকলেই গম্ভীর হয়ে বললেন—এ রকম অধর্ম্মাচরণ করা কিন্তু আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। মক্কা তীর্থের কাবায় কোনো বিধর্ম্মীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না জানো কি? বললুম—জানি। কিন্তু সেটা 'আরব দেশ'। আমরা সর্ব্বধর্ম্মের মিলনভূমি ভারতবর্ষে থাকি।

মথুরা যাবার পথে আগ্রা ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে নেমে সালামকে অনেক খুঁজলুম। কোথাও নেই সে।

বান্ধবী রহস্য করে বললেন—যাক্, অধর্ম্মাচরণের পাপ থেকে আপনি খুব জোর বেঁচে গেলেন কিন্তু।

আমি সখেদে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বললুম—সালামকে মথুরা বৃন্দাবন দেখিয়ে আনলে—'এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে' কখনই অধর্ম্মাচরণ হ'ত না সেটা।

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক হুনদল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"

দ্রাবিড় বলতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমরা একদল শিল্পী ও সাহিত্যিক দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাই। শুনলুম সেখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কারুর মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই। আমরা ব্রাহ্মণ নই। কাজেই এ সংবাদ শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। তখন সকলে মিলে বুদ্ধি ক'রে বাজার থেকে একগোছা পৈতে কিনে এনে সবাই মোটা মোটা উপবীত ধারণ করলুম এবং কপালে ফোঁটা তিলক কেটে প্রত্যেকেই বুক ফুলিয়ে আদুড়গায়ে ও খালি পায়ে একেবারে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করে বিগ্রহের মাথায় হাত বুলিয়ে বীরদর্পে বেরিয়ে এসেছিলুম!

শ্রীমতী তখন নিবিষ্টমনে টাইমটেব্‌ল দেখছিলেন—গাড়ীখানা মথুরা নগরীতে পৌঁছবে কখন? তিনি টাইমটেব্‌লের পাতা থেকে মুখ না তুলেই বললেন—পুণ্যলাভের সুযোগ তোমার এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। এ গাড়ীখানার আগেই আর একখানা গাড়ী মথুরার তোরণ দ্বার ছুঁয়ে গেছে। তোমার পাকিস্থানের ভাইটি হয়ত দেখবে ষ্টেশনেই সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন!

কিন্তু দেবীর ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হল। মথুরা ষ্টেশনে নেমেও আমরা সালামকে কোথাও খুঁজে পেলুম না। আর একটা দুর্ভোগ থেকেও দৈবক্রমে রক্ষা পাওয়া গেল—সেটা হচ্ছে পাণ্ডাদের উপদ্রব! মাঝ পথেই তাঁরা এসে গাড়ীতে চড়াও হয়েছিলেন, কিন্তু আমার টুপিপরা চেহারার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে বললেন—'সেলাম শেঠজী! আপ্ তো মথুরাকি রহনেওয়ালা হায়! আপ্ কো মুঝে সবকই পছানতা। আপ্ তো গিরিধারি গলিমে ঠারতানা?

গম্ভীরভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললুম—জী হাঁ! নির্বিবাদে তাঁরা আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেল।

গাড়ীতে তখন সে কী হাসির হুল্লোড়!

মথুরায় এসে যমুনাতীরে 'বাঙালী ঘাট' আর যমুনা-ব্রীজের সামনে আগ্রা হোটেলেরই শাখানিবাসে গিয়ে উঠলুম। বেলা তখন ১১টা। আগ্রায় এঁরা ঘর ভাড়া দৈনিক ১২৲ টাকা, আর খাই খরচ দৈনিক মাথা পিছু ৬৲ টাকা নিচ্ছিলেন, মথুরায় দেখলুম ঘর ভাড়া দৈনিক ৭৲ টাকায় নেমেছে কিন্তু খাইখরচের চার্জ্জ অপরিবর্ত্তিতই আছে।

বৃন্দাবন—শাহজীর মন্দির

আমার কন্যা এখানে এসেই আবৃত্তি শুরু করেছে—
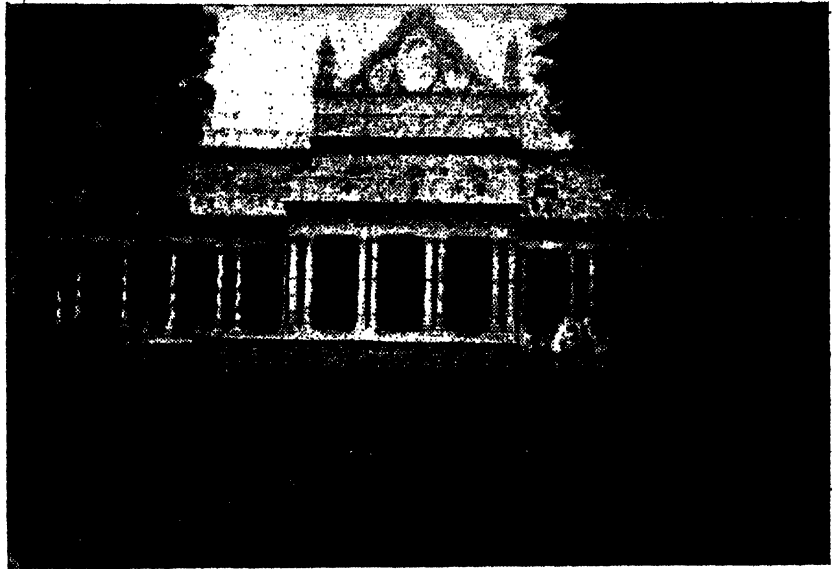
"—সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচারের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত!"

এই মথুরা নগরী আর যমুনা প্রবাহিনীর সঙ্গে বাঙালীর অন্তরের একটা সাংস্কৃতিক যোগ কত যুগ যুগান্তকাল ধরে নিবিড়ভাবে চলে আসছে। পুণ্যতীর্থ বারাণসীর পর ভারতের সবচেয়ে পুরাতন শহরগুলির মধ্যে মথুরা অন্যতম। নৃশংসনৃপতি মহারাজ কংসের রাজধানী মথুরা, মহামানব শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি—মথুরা শ্রীরাধিকার প্রেমের সকরুণ স্মৃতি বিজড়িত এই যমুনা প্রবাহিনী।

যমুনার জলে ছোটবড় অসংখ্য কচ্ছপের ভীড় সত্ত্বেও নদীতে নেমে স্নান করবার লোভ আমরা সম্বরণ করতে পারলুম না। যৎসামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন লোককে কচ্ছপ তাড়াবার ভার দিয়ে আমরা নির্ভয়ে যমুনায় নেমে আমাদের অবগাহন স্নান সমাপন করে নিলুম। মথুরায় সারা যমুনার তীর ছেয়ে ফেলেছে নানা ছোট বড় 'সতী-বরুজ' বা সতী-স্মৃতি-মঠ। এ থেকে বোঝা যায় একদা
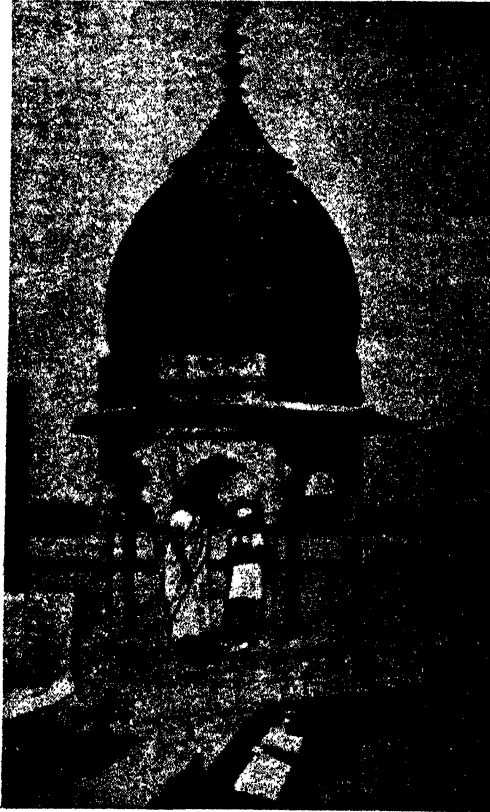
বাঙালীঘাট

এদেশে মৃত স্বামীর চিতায় বহু সতীই সহমরণে যেতেন। তবে তাঁদের মধ্যে ক'জন স্বেচ্ছায়, আর ক'জন বাধ্য হয়ে এসেছিলেন তার কোনও রেকর্ড পাবার উপায় নেই আজ। 'মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী শ্যামবিলাসিনীরা কিন্তু আজও এখানে আছেন, তাদের রূপমাধুরী দেখতে দেখতে স্নান সেরে আমরা দ্বারকানাথ ও অন্যান্য মন্দির দর্শন করে এসে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে একখানি ট্যাক্সী নিয়ে বৃন্দাবন রওনা হলুম। তার সঙ্গে রফা হল ২৫৲ টাকায় সে আমাদের সারা বৃন্দাবন ঘুরিয়ে ঠিক যমুনার সন্ধ্যারতির সময় মথুরার 'বিশ্রান্তি ঘাটে' ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

বৃন্দাবনে মীরাবাঈয়ের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীর পরিত্যক্ত মন্দির ও বাঙালী বৈষ্ণবদের চেষ্টায় নব প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ মন্দির দর্শন করে লালাবাবুদের কুঞ্জ, শেঠেদের মন্দির, গোপীনাথের মন্দির, শাহজীর মন্দির, বঙ্কবিহারীর মন্দির প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান প্রধান মন্দির এবং সোণার তাল গাছ ইত্যাদি দেখে, আমরা এলুম বাংলা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা বৃন্দাবনবাসিনী শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি অষ্টসখীর গলিতে নিজে বাটী খরিদ করে বৃন্দাবনেই বসবাস করছেন। অপ্রত্যাশিত-ভাবে আমাদের পেয়ে খুশী হয়ে তিনি পরম সমাদরে সকলকে গ্রহণ করলেন। নিরুপমা দিদির বাড়ীর নাম "শ্রীগোবিন্দ কুঞ্জ।" বৃন্দাবনে এসে মনে হল না যে আমরা বাংলা দেশ ছেড়ে ৮১৫ মাইল দূরে চলে এসেছি। এখানে পথে ঘাটে মন্দিরে সর্বত্র অসংখ্য বাঙালী মেয়ে পুরুষের ভীড়। বৃন্দাবনের প্রত্যেকটি ভিখারিণী বাঙালীর ঘরের পরিত্যক্তা নারী। তারা যখন সর্ব্বত্র 'রাধারাণীর জয় হোক' বলে আমাদের গাড়ী খানি ঘিরে দাঁড়াতে লাগলো, আমাদের মেয়ে নবনীতা বিস্মিত কৌতূহলে অধীর হয়ে বারবার তার মাকে প্রশ্ন জালে অস্থির করে তুলতে লাগলো—ওমা, এরা তোমার নাম জানলে কি করে মা! বলো না? তুমি কি আগে এখানে ছিলে?

তার মা' আত্মরক্ষার জন্য আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—'তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো।'

অগত্যা মেয়েকে বুঝিয়ে দিতে হ'ল, যে, যাঁর নামে তোমার মায়ের নাম, এই বৃন্দাবন ধাম একদিন সেই বৃকভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকার লীলাক্ষেত্র ছিল। তোমরা আজ যেমন নেতাজীর স্মরণে ও সম্মানে কারুর সঙ্গে দেখা হ'লেই 'জয়হিন্দ্' বলে অভিবাদন জানাও এরা তেমনি এখানে শ্রীরাধিকার স্মরণে ও সম্মানে 'জয়রাধে!' বলে পরস্পরকে অভিবাদন করে। তোমাদের দেশের ভিক্ষুকেরা এখনও 'জয়হিন্দ্' বলে হাত পাততে শেখেনি, কিন্তু এখানে তারা 'রাধারাণীর জয় হোক' বলেই ভিক্ষা চায়।

বৃন্দাবন থেকে মথুরায় ফিরে আসতে রাত হয়ে গেল। একরাত্রি মথুরায় বাস করে পরদিন সকালে আমরা আগ্রায় ফিরে এলুম। হোটেলে স্নানাহার সেরে বিকেলের গাড়ীতে রওনা হলুম একেবারে রাজপুতানার শেষপ্রান্তে 'অর্বুদপর্ব্বত' বা 'মাউণ্ট আবুর' উদ্দেশে। ক্রমশঃ

বিমানে খাদ্য দান

শ্রীবসন্ত কুমার মজুমদার

(২)

যাহা হউক প্লেন ছাড়িল—উপরে উঠিবার সময় দু' একজন টাল খাইয়া পড়িলেন—ধরিয়া উঠানো হইল। ট্রেণ্ড্ ক্রু কিনা!

চার হাজার ফিট উচ্চে উঠিয়াছি। আরও কিছুদূর যাইয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইলাম। এইবার আওয়াজ আসিতে লাগিল সেঁা সেঁা আর গোঁ গোঁ। কাল মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। জমাট বাঁধা মেঘ যখন বিমানের গায়ে ধাক্কা দিতেছে—বিমান তখন টলমল করিতেছে। কোথাও কিছু দেখিতে পাই না। নীচে মেঘ, উপরে মেঘ—চারি পাশে মেঘের রাজত্ব, প্রবল পরাক্রমে মত্ত হস্তীর মত একদিকে ধাইয়া চলিয়াছে। —আর হুঙ্কারে পৃথিবী প্রকম্পিত হইয়া উঠিতেছে। সঙ্গীদের অবস্থা সঙ্গীন। কেহ কেহ অজ্ঞান হইবার মত। অন্য দুইজন বমন আরম্ভ করিলেন। ক্রু আসিয়া অসুখ বলিয়া দিয়া গেল। কমলালেবু খাইতে দিল। নাক্ মুখ বন্ধ করিয়া কান দিয়া হাওয়া বার করিতে উপদেশ দিল। আমি বন্ধুদের দিকে চাহিয়াছিলাম। আহা বেচারীরা। ক্রু বারণ করিল—এই সব দেখিয়া আমিও অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারি।

কিন্তু একি—ক্রমশঃ যে প্লেনের দোলা বাড়িয়া যাইতেছে। এই প্লেনের আবার দরজা নাই। মাল ফেলিতে হয় বলিয়া দরজার জায়গা কাটা—তাহার ভিতর দিয়া প্রচণ্ড বাতাস আসিতে লাগিল। এক প্রচণ্ড ঝাপ্টায় আমাদের প্লেন-খানি একদিকে একেবারে কাত হইয়া গেল—কয়েক মুহূর্ত—আবার সোজা হইয়া গেল। সুদক্ষ পাইলট! তাহার পর আরম্ভ হইল প্রবল ঝাপ্টা। কোনবার বামদিকে কাত হইয়া যায়, আবার ডানদিকে কাত হইয়া যায়। আমরা একবার বাম ও অন্যবার ডানদিকে মুখ থুবড়াইয়া পড়ি। সমুদ্রে জাহাজের অবস্থা এমন হয় জানি। "সমুদ্রে ঝড়" শীর্ষক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধও পড়িয়াছি। কিন্তু বায়ু সমুদ্রে এমন হয় তা ত' জানিতাম না। হঠাৎ বিমান-খানিকে কে যেন ঠেলিয়া নীচে নামাইয়া দিল—প্রায় হাজার ফিট নীচে গিয়া পড়িলাম। আর তাহার সহিত মনে হইতে লাগিল যে বুক পেট ও মাথা একদম খালি হইয়া গিয়াছে। কিছু ভাবিতে পারিতেছি না। সেই সঙ্গে আরো মনে হইতে লাগিল—সমস্ত ঘুরিয়া যাইতেছে। ক্রু হাত দিয়া নাক ঢাকিতে বলিল। ইঙ্গিত বুঝিলাম—কান দিয়া হাওয়া বাহির করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর সুস্থ হইলাম। ঝড়ের সহিত তখনও অবিরাম যুদ্ধ চলিতেছে। প্রকৃতি বিমানকে অগ্রসর হইতে দিবে না—ফিরাইয়া দিবে এবং

ডাকোটায় বিমানে খাদ্যশস্য বোঝাই হইতেছে

বিমানও ফিরিবেনা—প্রকৃতিকে তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হইবেই। পাইলট ধীরে ধীরে প্লেন উপরে উঠাইতে লাগিল। কিন্তু উপরে উঠা সহজসাধ্য নয়—উপরে জমাট-বাঁধা কাল মেঘ ভেদ করিতে যাইয়া বারবার বাধা পাইতে লাগিল। সমান ভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়া বিমান জয়ী হইল। বাতাসের তেজ কমিয়া গেল, সাথে সাথে বৃষ্টিও বন্ধ হইল। আমরা তখন সাড়ে দশ হাজার ফিট উচ্চে উঠিয়াছি। নীচে তাকাইয়া দেখিলাম নীচে হু হু করিয়া মেঘ ছুটিয়া যাইতেছে তাহার গতি নির্ণয় করা সাধ্যাতীত! কাগজে দেখি, ঘণ্টায় ১৬০ মাইল বেগে প্রভঞ্জন (gale) বহিয়া গিয়াছে। আমরা তাহাকে পরাস্ত করিয়াছি।

ভয়ানক শীত করিতে লাগিল। ক্রুকে বলিলাম। সে উঠিয়া উত্তাপক চাবি (Heater switch) টিপিয়া দিল। যদিও ওই শীত হীটারে যাইবে না তথাপি কিছু শীত কমিল। —আমরা হাত পা ঘসিতে লাগিলাম। আরও পঁচিশ মিনিট চলিলাম। এক নূতন রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। এখানে বৃষ্টি নাই ঝড় নাই—খালি পাহাড়—পাহাড়ের উপর পাহাড়—আশে পাশে ছোট বড় নানা আকারের পাহাড়। তাহার উপর জমিয়া আছে মেঘ। ভাল মানুষ, যেন কিছু জানে না—যেন কিছু হয় নাই—শান্ত ভাবে পাহাড়ের সহিত মিতালী করিতেছে। কে বলিবে—কিছু আগে আমাদের ধ্বংস করিবার জন্য কি বিরাট আয়োজনই না এই মেঘ করিয়াছিল।
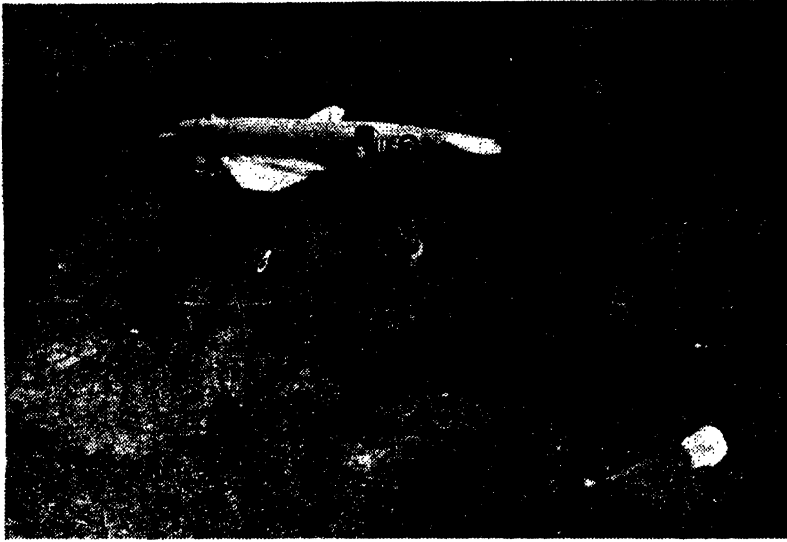
ধীরে ধীরে বরফের চূড়া দেখা যাইতে লাগিল। কেমন সারি সারি চূণের স্তূপ দাঁড়াইয়া আছে। রৌদ্র পড়িয়া চিক্‌মিক্ করিতেছে। বহুদূর—যতদূর দৃষ্টি চলে—এক সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছে বরফের পাহাড়—তাহার পর দিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। উপরে নীল আকাশ স্বচ্ছ সুমহান, নীচে ধ্যানগম্ভীর হিমাচল যেন একভাবে বহু যুগ ধরিয়া কাহার ধ্যান করিতেছে—প্রাণ স্পন্দনও বুঝি বন্ধ। উপরে নীলাকাশ প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

সঙ্গীরা সঙ্গীন অবস্থা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে জানালায় মুখও বাড়াইতে লাগিলেন। কাহারও মুখে তৃপ্তির বাণীও শুনিলাম। সত্যই কি দেখিলাম, এমনটি আর দেখি নাই—এমনটি আর দেখিব না! শুধু কল্পনায় থাকিয়া যাইবে ইহার ছবি।

খাদ্যবস্তুর অবতরণ—ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত বস্তাগুলি পরিদৃশ্যমান

বরফের পাহাড় পার হইয়া গেলাম। পাশ কাটাইয়া গেলাম বলিলে ঠিক বলা হইবে। তাহার পর আবার মেঘরাশি আসিয়া জমিতে লাগিল। তুষার ধবল মেঘের মালা, নীচে কিছু দেখা যায় না। পুঞ্জীভূত মেঘরাশি—যেন সমস্ত আকাশকে পেঁজা তুলা দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। ইচ্ছা করে ধুমুরীর হাতের ছড়ি লইয়া এই মেঘমালা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেই—দুই অঞ্জলি ভরিয়া বাতাসে উড়াইয়া দেই।

ক্রু জানাইল আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। সম্মুখের পর্বত-শ্রেণী পার হইলেই আমাদের গন্তব্যস্থল 'রূপায়' আসিয়া পড়িব। আসাম ও তিব্বতের সন্ধিস্থল রূপা, প্রহরায়া এই সীমানা রক্ষা করিতেছে। তাহাদের সহিত বাহিরের জগতের সম্বন্ধ নাই—নীরবে নিজ কাজ করিয়া যাইতেছে,

ভালমন্দ বিচার করিতেছে না। পাহাড় পার হইয়া গেলাম। চারিপাশে পাহাড়, মধ্যে সমতল জমি। এই রূপা! এইখানে আমাদের খাদ্যদ্রব্য ফেলিতে হইবে। প্লেন নীচে নামিতে লাগিল। কিছু কিছু দেখিতে পাইলাম। ছোট একটা নদী, বাড়ীঘর কিছু আছে—লাল নীল টিনের ছাদ দেখা যায়। কতকগুলি T আকারে কি লেখা। ক্রু বলিল—এই সকল জায়গায় মাল ফেলিতে হইবে। পাইলট যাহাতে স্থান চিনিতে পারে, তাহারই জন্য এই চিহ্ন। প্লেন বর্ত্তুলাকারে ঘুরিতে লাগিল। চালের বস্তা আগাইয়া আনা হইল। প্লেন ঘুরিতে ঘুরিতে নামিতে লাগিল। ক্রু আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি Actual operation দেখিব কিনা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দর্শনের বাসনা আছে কিনা! সানন্দে স্বীকার করিলাম। ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিলাম। যত আগাইয়া আসি ততই মনে হয় কে যেন সম্মুখে টানিতেছে। বুঝিলাম বাতাসের টান। প্লেনের দেওয়ালে চামড়ার বেল্ট ঝুলিতেছিল, তাহা আমার কোমরে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। জেলের কয়েদীর পূর্ব্বাবস্থা আর কি, শুধু লগুড়ধারী পুলিশ নাই। ক্রু বলিল—ভয় পাইবার কারণ নাই—আগাইয়া আসুন—আপনি ত' বাঁধা আছেন, পড়িয়া যাইবেন না। পড়িয়া যাইব না তাহা ঠিক। ঝুলিতে থাকিব তাহাও ঠিক—তবে দোদুল্যমান অবস্থায় পরাণ পাখী দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিবে এমন ভরসা নাই। যাহা হউক, আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলাম। চার বস্তা চাল সাজান হইল। বস্তার উপর প্যারাসুট ভাঁজ করিয়া রাখা আছে—তাহার দড়ি একটি ইণ্ডিয়ান ক্রুর হাতে। বস্তা ফেলিয়া দিবে—দড়ি হাতে থাকিবে এবং টান পড়িলেই প্যারাসুট খুলিয়া যাইবে। মাথার উপর হঠাৎ একটি লাল আলো জ্বলিয়া উঠিল। ক্রু বলিল, এইবার ফেলিতে হইবে—পরমুহূর্ত্তে ক্রীং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল আর বস্তা ফেলিয়া দেওয়া হইল। আবার বস্তা সাজান হইল—প্লেন গোল হইয়া ঘুরিয়া আবার সেইস্থানে আসিল—আবার আলো জ্বলিল—ঘণ্টা বাজিল—মাল ফেলা হইল।

প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় করিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইলাম। বাহিরে তাকাইয়া দেখিলাম—সাদা প্যারাসুটগুলি সমতল ভূমিতে পড়িয়া আছে। উপর হইতে সবই সবুজ দেখায়। তাহার ভিতর প্যারাসুটগুলিকে সাজানো বাগানে সদ্যঃ ফোটা মল্লিকা ফুলের মত দেখাইতেছিল।

এবার যখন বস্তা ফেলা হইল দেখিলাম ধীরে ধীরে প্যারাসুট খুলিয়া গেল—তারপর হেলিতে দুলিতে ভাসিতে ভাসিতে কেমন মাটিতে গিয়া ঠেকিল। দেখিতে বেশ লাগে। পরের বার একটি বস্তা ফেলিতে দেরী হইয়া গিয়াছিল—তাকাইয়া দেখিলাম প্যারাসুট জলে গিয়া পড়িল—কিছু দূরে। শুনিলাম মাত্র তিনটি সেকেণ্ডের দেরী হইয়াছিল। বুঝিলাম এক চুল এদিক ওদিক হইলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়।

কোমরের বেল্ট খুলিয়া পাইলটের কাছে চলিলাম। দুইজন পাইলট। দেখিলাম, লক্ষ্যস্থলে আসিবামাত্র একজন ঘণ্টা বাজায় এবং ঠিক সেই সময় মাল ফেলিতে পারিলে যথাস্থান যাইয়া পড়ে। একবার করিয়া মাল ফেলে, আবার প্লেন চক্রাকারে ঘুরিতে থাকে। একবার দেখিলাম চক্রাকারে ঘুরিয়া আসিয়াও ঘণ্টা বাজিল না—জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হইল। একজন পাইলট বলিল—প্লেন ঘুরান হয় নাই, একটু সরিয়া গিয়াছে। আমার কিন্তু মনে হইল প্লেন ঠিকই আছে। কারণ আমরা সেই T মার্কার উপর দিয়া গিয়াছে।

সুন্দর ইহাদের চালনা করিবার কৌশল। কেমন মাপ করিয়া ঘুরাইতে হইবে—একটু সরিবে না—তাহার পর জায়গা এমনই ছোট—প্রত্যেক সময় মনে হয় এই বুঝি প্লেনের ডানা পাহাড়ে লাগিয়া গেল। ভগবান সহায়, কিছুই হইল না। আমরা আবার উপরে উঠিয়া আসিলাম। এইবার আমাদের ফিরিবার পালা, আর ঝড় বৃষ্টি নাই। আকাশ নীল, স্বচ্ছ, শান্ত। প্লেন ঘণ্টায় একশো সত্তর মাইল বেগে ধাইয়া চলিল। মোটরে করিয়া খুব জোরে গেলে যেমন বুঝা যায় খুব জোরে যাইতেছে প্লেনে তাহা বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত পার হইতেছে। প্লেন বেশ নীচু দিয়া যাইতেছে। সমস্তই পরিষ্কার দেখা যায়। আমরা খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া চলিলাম। স্তব্ধ হিমাচল। স্থির গম্ভীর—তাহারই উপর ঘন উপবন অপরূপ সাজে সজ্জিত।

আমরা মোহনবাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। কমাণ্ডার কুক জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন লাগিল। বলিলাম—আমি

উপভোগ (Enjoy) করিয়াছি, কিন্তু সঙ্গীরা একটু শীক হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাহেব হাসিলেন। আমরা একটা শস্ত্রবাহী রথে আরোহণ করিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

লাঞ্চের সময় হইয়াছিল। সঙ্গীদের তিনজন যাইবেন না। আমরা খাইতে গেলাম। ওয়েলস্ সাহেব আসিলেন। তাঁহার সহিত পূর্বেই আলাপ হইয়াছিল। ওখানকার ডিস্পোজালসের কর্ত্তা। ওয়েলস্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—জার্নি আমরা উপভোগ করিয়াছি কিনা। ঘাড় নাড়িলাম এমনভাবে—যাহাতে হ্যাঁ এবং না দুইই বোঝা যায়। ওয়েলস্ সাহেব লোক ভাল! দেশের রাজনীতি ছ্যাচড়নীতি সকলই বোঝেন কিছু কিছু। তাঁহার ভাষায় গান্ধী ওয়াণ্ডারফুল। কিন্তু নন্ ভায়োলেন্স আর চলবে না এদেশে। ওটা পুরানো দিনে কোন রকমে চলে গেছে। নেহরু একটা জিনিয়াস—একটা ভল্কানো—সত্যিকার পলিটিসিয়ান একজন—কিন্তু বড় সেন্টিমেণ্টাল। তিনি আরও বলিলেন—জিন্না সাহেবকে তাঁহার ভাল লাগে। out of nothing কেমন নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কেমন একটা ধুয়া তুলেছে পাকিস্থান—যার জন্ত মাত্র দশ কোটি মুসলমান হোয়েও গভর্ণমেণ্টে পাঁচটা আসন আদায় করে নিয়েছে। তাঁহার অন্ত কথা—চার্চিল একটা ধূর্ত্ত। যত evilএর মূল হচ্ছে সেই। এখনও কমন্সে কেমন বলে—ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে না। স্বাধীনতা পাবার মুখেই তারা নিজেদের ভেতর মারামারি আরম্ভ করেছে। স্বাধীনতা পেলে আর রক্ষা আছে—সাদা চামড়া দেখবে, আর কচু কাটা করে ছাড়বে। ওয়েলস্ সাহেবের শেষ কথা—আমরা আমেরিকানরা সর্বদাই চেষ্টা করব আমাদের সাথে সদ্ভাব রাখবার এবং আশা করি আমাদের গভর্ণমেণ্টেও তাই করবে। India is a vast country with great possibility. আমার সহযাত্রীরা বিছানায় শুইয়া মিটির মিটির চাহিতেছিলেন। সাহেবের শুভেচ্ছার জন্ত সকলের হইয়া আমিই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিলাম—থ্যাঙ্কস্!

রাধা-ধারা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সুন্দর কিশোরের কৈশোর রসাবেগে উদ্বেলি' ওঠে ধরা-যৌবন,
যৌবন ফুলফোটা পূর্ণিমা জোছনায় মনভোলা হোল ব্রজযৌগণ।
অধর লীলায়িত পুলকিত চেতনায় রূপধারা বহে' যায় বিশ্বে,
মিলনের স্বপ্নের জেগে ওঠে প্রেমলোক টলমল করে রস দৃশ্যে।
অলিকুল চুম্বন চঞ্চল ফুলদল যমুনার ছন্দের কুল কুল,
নিদভোলা নিশিথের অন্তরবধূটীর ভেঙ্গে যায় নয়নের ঢুলুঢুল।
কান্তার তোলপাড় কুঞ্জেতে গোলকার চঞ্চল বনফুলমল্লী,
আনন্দ কিশোরের আজি রসজাগরণ উৎসব মুখরিত পল্লী।
চঞ্চল প্রেমরসে মাধবের মধুমন বংশীতে দিল ঘনঝঙ্কার,
অন্তরতণিমায় কামহারা কামদেব ফুলবাণে দেয় ঘন টঙ্কার।
কুলহারা গোকুলের কুলবধূ ছুটে যায় বন্ধন করি' বেণী মাল্যে
চঞ্চল পদতলে চন্দন গলে' যায় পথ ভরে' যায় নির্মাল্যে।
বিশ্বের রসবঁধু-অন্তর-রসরাধা রূপ ধরি' জাগে চিদানন্দে,
মিলনের মহারস উৎসব কেন্দ্রে গো মহারাস দুলে' ওঠে ছন্দে।
ঝঙ্কৃত মুহু মুহু বাঁশরীর নিঃস্বন সুন্দরী রচে রাসচক্র,
সুন্দর শ্রীকিশোর দাঁড়ালেন কেন্দ্রে গো নেচে নেচে তনু করি' বক্র।
নর্ত্তন তালে তালে বাজে ঘন মঞ্জীর বিশ্বের বীণা ওঠে ছন্দি,
সত্যম্ শিব আর সুন্দর এ লীলায় তিন রূপ এক সাথে বন্দী।
ঘোরে রাস ঘর্ঘর দোলে রস কেন্দ্র গো চারিদিকে রূপ ধরে কৃষ্ণ,
রস ঘন যৌবনা মোহিনী ব্রজাঙ্গনা রসরাজে বাঁধিল সতৃষ্ণ।
ছন্দের গোপীদল নাচে রসচঞ্চল বন্ধুর কটি ঘিরে গায় গান,
কেন্দ্রের নটরাজ বংশীর রন্ধ্রে গো দেয় চিদানন্দের সন্ধান।
রস রাণী শ্রীরাধার মিশে যায় রস তনু বারবার রসরাজ-গাত্রে,
মোহন আলিঙ্গন চুম্বন শিহরণ উদ্বেল হোল রসপাত্রে।
বক্ষেরি কচি-কুচ-চঞ্চল নিপীড়ন আনন্দ মুক্তির ছন্দে,
নিতম্ব ঘন গুরু দোলে উরু হিন্দোল দেহ কাম অর্পণানন্দে।
ধারা হয়ে কভু নীচে নামে ছুটী রাধাশ্যাম রাধা হয়ে ওঠে কভু মূর্দ্ধা,
ইন্দ্রিয় তনুহারা কামনার কামধারা থর থর কেঁপে হ'ল ঊর্দ্ধা।
ঝঙ্কারি ওঠে ওম্ অস্থির রবি সোম চঞ্চল গ্রহদল খায় দম্,
নৃত্যে আলিঙ্গনে নাচে ভূর্ভুবলোক পশু পাখী নাচে জড়জঙ্গম্।
নাচে পূজা নাচে ধ্যান নাচে নিত্তর জ্ঞান নাচে ঘন শ্রীপদারবিন্দ,
নাচে ইহ-পরকাল পড়ে সোম উঠে তাল উঠে লয় নাচে শ্রীগোবিন্দ।
শুধু বাঁশী শুধু গান দেহ প্রেম হিয়া দান শুধু রসভরা আজি নৃত্যে,
নিখিলের সবধারা মিশে আজি হোল রাধা,রাধা গলে' ধারা হল বিশ্বে।

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—দুই—

একটা আশ্চর্য জগৎ আছে মনের ভেতরে। সেখানকার নিয়মকানুনগুলোর সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর কোনো মিল নেই। তার আলাদা খাতা, আলাদা নিয়মে তার জমা-খরচ। অনেক বড় বড় দুঃখ মিলিয়ে যায়, অনেক উচ্ছ্বসিত আনন্দের স্মৃতি হারিয়ে যায় তার নির্বিচার অপচয়ের নেপথ্যলোকে। হয়তো মনে রাখে কোনো একটা অসংলগ্ন মুহূর্তের একটুখানি সোনালি রেখাকে, ছোট্ট একটু অভিমানের এক ফোঁটা চোখের জলকে। আকাশ দিয়ে উড়ে যাওয়া নানা রঙের পাখির খসে পড়া এক এক টুকরো হালকা পালকের মতো অযত্নে কেউ সেগুলোকে জড়ো করে রাখে; তাদের ভার নেই—শুধু সেই সব উড়ন্ত পাখির মতো আবছা অস্পষ্ট স্মৃতি তাদের ঘিরে থাকে।

আরো আশ্চর্য শৈশবের মন—। তার হিসেবের খাতা আরো অসংলগ্ন, আরো বিশৃঙ্খল। সেখানে যোগ অঙ্কে প্রতি পদে পদে ভুল, সেখানকার বিয়োগে ঠিক মেলেনা। নিজের দিকে তাকিয়ে এই এলোমেলো হিসেবটা আরো বিচিত্র লাগে রঞ্জুর। রঞ্জুর বললে ঠিক হয়না, পরিণত—হিসেবী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের।

সেদিনের সেই শিকার অভিযানের পরে কী ঘটেছিল একেবারেই মনে পড়ে না। হয়তো বাড়িতে খানিকটা বকুনি জুটেছিল, হয়তো বাবা কাণ ধরে দুটো থাপ্পড় দিয়ে-ছিলেন, অথবা হয়তো কিছুই হয়নি। শুধু সেদিনের সেই ভয়টা, সেই নিষেধ ভাঙবার একটা অপূর্ব উত্তেজনা—শিশুমনের কাছে এর চাইতে বড় সত্য সেদিন আর কিছুই ছিল না। আর তার চাইতেও বড় সত্য ছিলেন অবিনাশ-বাবু। তাঁর সেই টিনের চালা দেওয়া ছোট্ট ঘরখানা, দেওয়ালে একটি বিচিত্র মানুষের ছবি—যাঁর নাম মহাত্মা গান্ধী, বাইরে সেই আত্রাইয়ের জলে ঝিলিমিলি আলোর দোলা, আর সেই পানের টুকরোটা: "স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়—"

দেশ কী, কোথায় দেশ? কী তার মূর্তি? 'নিহিলিস্ট'রা এই দেশকে স্বাধীন করতে চায়—পিস্তল দিয়ে, কামান দিয়ে, বোমা দিয়ে। পিস্তল রঞ্জু চেনে, বাবার একটা আছে। কামানের ছবি দেখেছে তার পড়ার বইতে। আর বোমা? বোমা কথাটা শুনলেই কেমন হাসি পায়—বোমা কি কারো বৌমার মতো? কিন্তু বৌমারা তো কখনোই ভয়ঙ্কর নয়। তারা সব সময় ঘোমটা টেনে চলে, ফিস্ ফিস করে কথা বলে চাপা গলায়, মস্ত লাল-পাড় শাড়ীর নীচে দেখা যায় তাদের আল্তা-রাঙানো টুকটুকে পা দুখানা। আর বৌমার কথা ভাবলেই রঞ্জুর মনে পড়ে মা-কে—ঠাকুরমা যাকে বৌমা বলে ডাকতেন। সেই মা—কাঁচা সোনার মতো ছিল যাঁর গায়ের রঙ, কপালের ওপরে মস্ত বড় করে যিনি একটা সিঁদুরের ফোঁটা পরতেন, তারপর দুদিনের জ্বরে যিনি রঞ্জুর পৃথিবীর থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেলেন!

কিন্তু অবিনাশবাবু। অবিনাশবাবুকে আরো একবার দেখেছিল সে—সেই শেষ দেখা।

কত সাল? রঞ্জু তখন জানত না, এখন জেনেছে। বড় হয়ে বই পড়ে জেনেছে। সেই সেবার—যেবার উত্তর বাংলার বুকের ওপর দিয়ে সর্বনাশা বন্যায় মৃত্যুর স্রোত বয়ে গিয়েছিল, সেই বার। এই এতটুকু নদী আত্রাই—এই ঘুমের মতো শান্ত নীল জল, ওপারে বাঁশ আর আমের ছায়া, এপারে রঙে রঙে আলো-করা ন্যাড়া শিমুলের সারি, এই নদীর বুকেও জেগেছিল মাতলামির নেশা। নীল জলে ঘূর্ণি ঘুরিয়েছিল পাহাড় ভাঙা গৌরী মাটির ঢল, উপড়ে পড়েছিল বড় বড় শিমুল, ডুবিয়ে দিয়ে-ছিল ওপারের ছায়াশ্যামল আমের বন। সেই সেবার।

তিরিশ সালের বন্যা। তেরশো তিরিশ সাল। অত বড় বান এদিকে আর কেউ কখনো দেখেনি। সমস্ত উত্তর-বঙ্গের ওপর নেমেছিল মৃত্যুর তাণ্ডব।

হয়তো সে বন্যার কথাও মনে থাকত না রঞ্জুর। ছোট বড় আরো অনেক স্মৃতির সঞ্চয়ের সঙ্গে সেটাও হারিয়ে যেত—তলিয়ে যেত কালো পর্দাটার আড়ালে। কিন্তু সেই অবিনাশবাবু।

মনে পড়ছে তিন চার দিন থেকে বিশ্রী ঘোলাটে হয়ে ছিল আকাশটা। টিপ্ টিপ্, ঝিম্ ঝিম্, ঝম্ ঝম্। এলো মেলো বাতাসে শোঁ শোঁ করেছিল কৃষ্ণচূড়া গাছটা, ফুল আর পাতা ঝরে ঝরে তার তলাটা একাকার হয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে পড়েছিল জলে-ভেজা দুটো মরা কাকের ছানা। আর কাকের কান্নার উতরোল হয়ে উঠে ছাপিয়ে গিয়েছিল বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ।

বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ। ইস্কুল ছুটি। কাচের জানালা দিয়ে দেখা যায় ওপারের মাঠটা একটা ধূসর ছায়ায় হারিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে নতুন ধানের শীষ-ওঠা মস্ত মাঠের ভেতর দিয়ে ইস্কুলে যাওয়ার পথটাও। একটু দূরে বকুল বনের নীচে শাদা জল থই থই করছে। বাইরে ঘাসের মধ্যেও জল চিক চিক করছে, সারা দিন-রাত ধরে চলছে ব্যাঙের ডাক। জানা অজানা কত পোকা, কত প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ে উড়ে এসে ঘরের ভেতরে আশ্রয় নিচ্ছে। অনবরত গুম্ গুম্ করে মেঘের ধমকানি।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে রঞ্জু। ভারী ভালো লাগে। চুপ করে একা একা বসে বৃষ্টি পড়া দেখতে আশ্চর্য ভালো লাগে তার। কেমন ঘুম পায়, কেমন ঝিম ধরে। সত্যিই কি ঘুম পায়? না—ঠিক তা নয়। রূপ-কথাগুলো মনে পড়ে—ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর গল্প মনে পড়ে—মনে পড়ে; কোথায় ক্ষীর-সমুদ্রে ফুটেছে সোনার পদ্ম, তার ঝকঝকে পাঁপড়িগুলোর ওপর দিয়ে নিটোল মুক্তোর মতো গড়িয়ে পড়ছে বৃষ্টির বিন্দু। অন্ধকার—নীলাভ হালকা অন্ধকার—মস্ত বড় বন বৃষ্টির ছায়ায় আরো অন্ধকার হয়ে গেছে, ঘন পাতার ফাঁকে ফাঁকে চুঁইয়ে পড়ছে জল, ফুটেছে অজস্র ভুঁইচাঁপা; পথ নেই, হাত বাড়িয়ে লতারা আঁকড়ে আঁকড়ে ধরছে। আর তারই ভেতর পথ ভুলেছে রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়া—সেই ঘোড়া, যার মন পবনের গতি, পূর্ণিমার রূপালি জ্যোৎস্নায় ডুব দিয়ে আসা যার গায়ের রঙ। ওদিকে একটা কালো পাহাড়—মস্ত একটা জানোয়ারের মতো থাবা গেড়ে রয়েছে। বৃষ্টিতে ঠিক বোঝা যায়না ওটা কড়ির পাহাড়, না হাড়ের পাহাড়? ওটা পাশাবতীর দেশ, না শঙ্খমালার পুরী?

বৃষ্টিতে এই সব মনে পড়ে—মনে পড়ে এই সব এলো-মেলো গল্প। আকাশের কোনে ধোঁয়ায় তৈরী নানা আকারের অতিকায় ফানুষের মতো মেঘ উড়ে যায়। ওই সব মেঘের যেমন কোনো বাধা-বন্ধন নেই—সাত সমুদ্র তেরো নদী আর অনেক পাহাড় যাদের কাছে সব সমান, ওদের মতোই সমস্ত ভাবনাটা সব কিছুর ওপর দিয়ে পাখনা মেলে দেয়। খালি ইচ্ছে করে—এই বৃষ্টিটা যেন কখনো না থামে—ইস্কুল, ধনঞ্জয় পণ্ডিতের জোড়া বেত, হেড্-মাষ্টারের গম্ভীর গমগমে গলা, অঙ্কের ক্লাসে ভয়ে গলা আর বুকের ভেতরটা অবধি শুকিয়ে ওঠা—পাশাবতীর পাশার একটি দানে তারা যেন মিলিয়ে যায় ভোজবাজীর মতো।...

তবু মনটা ফিরে আসে পৃথিবীতে। বেশ লাগে কৈবর্তপাড়ার কালো কালো লেংটি-পরা ছেলেগুলোকে দেখতে। মেঘের ডাকে নাকি কান খাড়া করে পুকুর ডোবার জল থেকে বেপরোয়া হয়ে উঠে পড়েছে কই-মাছের ঝাঁক। চলেছে আধডোবা ঘাসের ভেতর দিয়ে, চলেছে বৃষ্টি-ভেজা এঁটেল পায়ে চলার পথটা দিয়ে কিল্ বিল্ করে। মচ্ছব লেগেছে কৈবর্তপাড়ার ছেলে-দের। লেংটি পরে পরে বেরিয়ে এসেছে সব। কারো মাথায় ভাঙা ছাতা, কারো মাথায় টোকা—আর বেশির ভাগই বৃষ্টি সম্পর্কে একেবারে নিরঙ্কুশ। লাফালাফি, ঝাঁপাঝাঁপি, আর কাড়াকাড়ি করে কই মাছ ধরছে তারা। একজন বেশ চীৎকার করে গান ধরেছে:

পরাণ পুড়ে গেলরে সই, শ্যামের বিহনে—

বেশ আছে ওরা। ইস্কুলে কখনো যেতে হয়না, বৃষ্টিতে বাইরে বেরুতে ওদের নিষেধ নেই। ওদের জ্বর হবে না কোনোদিন—সর্দি হবে না কখনো। রঞ্জু ওদের থেকে আলাদা। সে ভদ্রলোকের ছেলে, থানার বড়-বাবুর ছেলে! ওদের সঙ্গে ঝাঁপাঝাঁপি সব—তাকে

কেউ কই মাছ ধরতে দেবেনা। তার মান সম্মান আছে, তার সুকুমার শরীরে জলে ভেজার অত্যাচার সইবে না। রঞ্জু সত্যিই ওদের থেকে আলাদা।

লোভ হয়, ইচ্ছে করে সও ওদের সঙ্গে মিশে দুটো একটা কই মাছ ধরে। সেদিন যেমন ইস্কুল পালিয়ে বাদলের সঙ্গে খরগোস শিকার করতে গিয়েছিল, রক্তের মধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে নিষেধ ভাঙবার তেমনি একটা উন্মাদনা। কিন্তু বাবা—

বারান্দায় বাবার খড়মের শব্দ। কার সঙ্গে যেন কথা কইছেন তিনি।

—নদীতে বান ডাকবে বলে মনে হয়।

কে যেন জবাব দিচ্ছে : হুঁ, খুব জল বাড়ছে।

আর একজন বলছে : লক্ষণ ভারী খারাপ। ধানের ক্ষেতে জল ঢুকেছে। যদি আরো বাড়ে, ফসলের সর্বনাশ করে দেবে একেবারে।

—হাজীগঞ্জের বাঁধটা নাকি টলমল করছে।—বাবার গলা : আমার কনেস্টবল গিয়েছিল, খবর নিয়ে এসেছে।

—কী হবে বড়বাবু?—বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যেও রঞ্জু শুনতে পাচ্ছে আশঙ্কায় তার স্বর কাঁপছে : যদি বান ডাকে কী হবে? তিরিশ বছরের ভেতরেও নদীর এমন চেহারা আমি দেখিনি।

বাবা সান্ত্বনা দিচ্ছেন : ভেবে আর কী করবে। ভগবানের ওপরে তো মানুষের কোনো হাত নেই। বরং খবর নাও—হাজীগঞ্জের বাঁধটার অবস্থা কেমন। দরকার হলে ওখানে পাহারা বসাতে হবে।

কথাগুলো রঞ্জুর কানে আসে, কিন্তু মনে ছোঁওয়া দেয়না। সমস্ত মনটাই যেন এই পৃথিবীর যা কিছু ধরা-ছোঁয়ার একেবারে বাইরে চলে গেছে। বান ডাকবে—ডাকুক। 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর—নদী এল বান'—

ওই কৈবর্ত ছেলেগুলো কিন্তু বেশ আছে। বাইরের পৃথিবীতে ওইটুকুই রঞ্জুর কাছে সব চেয়ে বড় সত্য।

তবু সত্যিই বান ডাকবে নাকি? যদি ডাকে—কেমন হবে দেখতে? ওইটুকু ছোট নদীটার কূল থাকবে না, কিনারা থাকবে না, শাদা জল ছুটে চলবে প্রবল স্রোতে, মাঠ ডুববে, পথ ডুববে, ডুবে যাবে বকুল বন, একাকার হয়ে যাবে আলেয়া দীঘি আর কবিরাজের বাগানের নীচে বিশ্‌লার মাঠ। বেশ লাগবে—সত্যি চমৎকার লাগবে দেখতে।

আর তাই তো—এতক্ষণ যে খেয়ালই হয় নি রঞ্জুর!

গোঁ—গোঁ—গোঁ—গোঁ। একটানা একটা তীব্র ধ্বনি। বাতাসের শব্দ? না—তা তো নয়। বৃষ্টি? তাও নয়। ঠিক কথা—নদী গর্জাচ্ছে। গোঁ—গোঁ—গোঁ। অনেক দূর থেকে গুম্‌রে গুম্‌রে কেঁদে ওঠবার মতো একটা অদ্ভুত বিশ্রী আওয়াজ।

নদী গর্জাচ্ছে—রঞ্জুদের ছোট্ট নদী আত্রাই। যার জল ঝিলমিলে নীল, যার স্রোতে ভেসে যায় পলাশের রাঙা টুকটুকে ফুল, সেই নদী এমন করে গজরাতে পারে একি কল্পনা করতে পারে কেউ? রঞ্জুর যেন বিশ্বাসই হতে চায় না।

'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর—নদী এল বান'—

নদীতে বান আসুক—বাঁধ-ভাঙা, মাঠ-ভাসানো বান। এই খোলা জানালাটার বাইরে বানের জলের সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলুক রঞ্জুর মন।

শেষ পর্যন্ত সেই বান এল।

সারা দিনরাত সমানে বৃষ্টি চলেছিল। সন্ধ্যার একটু পরেই খিচুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছিল সবাই। বৃষ্টির শব্দে স্বপ্ন দেখছিল রঞ্জু—হয়তো চম্পাবতীর, নয়তো পাশাবতীর। কিন্তু সকলে জেগে উঠল ঠাকুরমার ভয়ার্ত চেঁচামেচিতে।

তখন মাঝরাত্তির। কালির মতো কালো অন্ধকারে জল আর ঝোড়ো বাতাসের মাতামাতি। এমন সময় জেগে উঠল ঠাকুরমার আকাশ-ফাটানো আর্তনাদ : ওরে খোকা, সব যে গেল!

খোকা অর্থাৎ বাবা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন, পেছনে পেছনে আর সকলে। আর চার পাঁচটা লণ্ঠনের আলোয় যে দৃশ্য রঞ্জু দেখল জীবনে তা ভুলবার নয়।

জল—জল। জল ছাড়া আর কিছু নেই। রঞ্জুদের দালানের আধ হাত নীচেই থই থই করছে ঘোলা জল—এত বড় উঠোনটা কার মন্ত্রবলে যেন পুকুর হয়ে গেছে। উঠোনের ওদিকে ঠাকুরমার ঘরখানা, তার ভিতটা মাটির—মাটি লেপা বাঁশের বেড়া। সেই ঘরের দাওয়া গলে গেছে—ধ্বসে পড়েছে একদিকের বেড়া—আর উঠোনের

সেই পুকুরে পরমানন্দে ভাসছে ঠাকুরমার আচারের হাঁড়ি, ঠাকুরের কাঠের সিংহাসন, থালা, ঘটি, বোক্‌নো, দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে ঠাকুরমার খাটখানা। জলের দোলায় দোলায় সেগুলো নেচে উঠছে, যেন এতদিনের বন্দিত্বের পরেও তারাও শুনেছে মুক্তির ডাক—বেরিয়ে পড়েছে বন্যার আহ্বানে, ঠিক রঞ্জুর চঞ্চল ব্যাকুল মনটার মতোই।

আর সব চাইতে চমৎকার ঠাকুরমার অবস্থাটা। এক গলা জলের ভেতরে দাঁড়িয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করছেন তিনি। বুড়ী মানুষ—একটা কিছু টের পেয়ে উঠে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেই উঠোনে সমুদ্র দর্শন করে ফেলেছেন।

—খোকা রে, আমি গেলাম, সব গেল, হায় হায়—

কারো মুখে আর কোনো কথাই নেই।

হতভম্ব ভাবটা ভাঙল মায়ের চীৎকারে।

—ওগো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী! মা-যে গেলেন!

ঝপ্‌ ঝপ্‌ করে জলে পড়ল সবাই। নামলেন বাবা, বড়দা, বাড়ির চাকর মহেশ, জ্যাঠতুত ভাই নীতুদা।

ধরাধরি করে ঠাকুরমাকে তুলে আনা হল।

বুড়ির তখন কাঁপুনি উঠেছে। দাঁতে দাঁতে একটা অদ্ভুত শব্দ উঠছে ঠাকুরমার—প্রবল জ্বরে ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি উঠলে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম। কিন্তু সে কাঁপুনির ভেতরেই চীৎকারের বিরাম নেই তাঁর। একটা বিশ্রী অস্বাভাবিক সুর, যেন ঠাকুরমার নয়, আর কারুর।

—ওরে আমার আতপ-চালের হাঁড়ি গেল, ওটাকে ধর। ওরে, ওই যে আমার বড়ির হাঁড়ি ভাসছে। ওরে, আমার ঠাকুরের সিংহাসন যাচ্ছে—ধর্‌ ধর্‌—

অল্প অল্প স্রোতে সেগুলো সব তখন খিড়কির দিকে চলেছে—আর একটু এগিয়ে গেলেই পাবে আত্রাইয়ের প্রবল টান। সুতরাং অবিলম্বে উদ্ধার করা দরকার।

আবার ঝপ্‌ ঝপ্‌ ঝপ্‌—

ঠাকুর-মা সমান ভাবে চেঁচিয়ে চলেছেন: ওরে, আগে ঠাকুরের আসনটা ধর্‌, ওরে বোক্‌নোটা ওখানে ডুবেছে, ডুব দিয়ে তোল ওটাকে, ওরে, খাট্‌খানাকে যেতে দিসনি! ওরে সব গেল, বাসন গেল, চাল গেল, গুড় গেল, কাপড় চোপড় গেল, তোষক গেল, জাজিম গেল—

চীৎকারটা একটানা চলছিল, হঠাৎ দশগুণ জোরে আর একটা আর্তনাদ উঠল: আরে, আরে, ওটা কী চিক্‌চিক্‌ করছে রে? আমার মিশির গুঁড়োর কৌটোটা না? ওরে সর্বনাশ, ওটাকে আন—ধর ওটাকে—

উঠোনের জল তোলপাড় হচ্ছে—আট দশটা লণ্ঠনের আলো সেই জলের ওপর পড়ে একটা অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে এটা ওটা ধরা হচ্ছে, আর এনে তোলা হচ্ছে বড় দালানের দাওয়ায়। ওদিকে ঠাকুরমার ঘরের একখানা বেড়া খসে পড়েই জলের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। খাটটা দুলতে দুলতে সেই পথে বেরুবার চেষ্টা করছে—আর সব চাইতে মজার, জলের ওপরে ভাসছে শূন্য একখানা টাঙানো মশারি। নীচে খাট নেই, মশারিটা সেটা টেরই পায় নি।

চীৎকার, কোলাহল, আর্তনাদ। কা বুঝেছে কে জানে, ছোট বোনটা গলা ছেড়ে কাঁদছে প্রাণপণে। সব মিলিয়ে ভারী মজা লাগছে রঞ্জুর। হঠাৎ খিল্‌ খিল্‌ করে সজোরে হেসে উঠল সে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই কুড়ি জোড়া চোখ ফিরে গেল রঞ্জুর দিকে।

বাবা, থানার বড়বাবু, তখন ডুব দিয়ে দিয়ে ঠাকুরমার মালিসের কৌটোটা খোঁজ করছিলেন বোধহয়। হাঁপানির রোগী, জলে ভিজে আর উত্তেজনায় এর মধ্যেই হাঁপানির টান ধরেছে ঠাকুরমার। কী অদ্ভুত লাগছে বাবাকে দেখতে! জলে কাদায় মানুষটিকে আর চেনাই যায় না।

বাবা বোধ করি মালিসের কৌটোটা তখনো খুঁজে পান নি। তা ছাড়া তখন মেজাজটা কোনো দিক থেকেই খুশি না থাকবার কথা। রঞ্জুর হাসির শব্দে বাঘের মতন গর্জে উঠলেন বাবা।

—অ্যাই—হাসে কে—হাসে কে রে?

রঞ্জু চুপ।

কিন্তু জবাবটা গৃহশত্রু দাদার মুখে তৈরীই ছিল: রঞ্জু হাসছে বাবা।

রঞ্জু কাঠ।

বাবা হুঙ্কার করে বললেন, এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল,

আর মজা পেয়েছে ছেলে। ধরে ধরে সব আত্রাইয়ের জলে ফেলে দেব, হাসি টের পাবে তখন।

হাঁপানির শ্বাস টানতে টানতেই ঠাকুরমা বললেন, আহা, ছেলেমানুষ, বুঝতে পারে নি—

—নাঃ, বুঝতে পারে নি! আচ্ছা, এসে বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। খড়ম পিটিয়ে বের করে দিচ্ছি হাসি।

কিন্তু ফাঁড়া কেটে গেল। উঠে খড়ম পেটা করবার মতো সময় এখন বাবার নেই। ঠাকুরমার নাশিসের কৌটোটা এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি!

চুপ করে ভাবতে লাগল রঞ্জু। তার মনটা কিন্তু এই দৃশ্যের মধ্যে নেই—ছাড়িয়ে চলে গেছে এই সব, এই জল, এই কোলাহল, এই আর্তনাদ।

বাবা বলছেন, আত্রাইয়ের জলে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন ওকে। আত্রাই! রঞ্জু স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে আত্রাইয়ের গর্জন—সন্ধ্যাবেলায় শোনা সেই গুমরে কান্নার মতো গোঁ গোঁ শব্দ। কিন্তু কত স্পষ্ট এখন, কত প্রবল! রঞ্জু সাঁতার জানে না, কিন্তু কেমন যেন মনে হচ্ছে আত্রাইয়ের জলে ওকে ফেলে দিলে সেটা নেহাৎ মন্দ হয় না একেবারে। কেমন হয়েছে এখন নদীর চেহারা, কেমন ভয়ঙ্কর তীব্র তার গতি? তার স্রোতের টানে ও চমৎকার ভেসে যেতে পারবে, সাঁতার জানবার দরকারই হবে না। কোথা থেকে কোথায় চলে যাবে রঞ্জু, দেশের পর দেশ ছাড়িয়ে, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে, জানা থেকে কতদূর কোন অজানা অচেনার আশ্চর্য জগতে। গল্প শুনেছে, ভেলায় চড়ে লোকে সাত সমুদ্রের নোনা জল পেরিয়ে যায়, আচ্ছা, ঠাকুরমার খাটটায় চড়ে ও কি তেম্নি অনেক নদী, অনেক সাগর পাড়ি দিয়ে চলে যেতে পারে না কোনো শঙ্খমালার দেশে?

কিন্তু শঙ্খমালার দেশ নয়, সকালের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে যে দেশ ওর চোখে পড়ল তা রূপকথার গল্পের চেয়েও আশ্চর্য।

বাড়ির বাইরে কি মাঠ ছিল কখনো? ওদের বৈঠকখানা ঘরটা—রোজ সকালে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে নবদ্বীপ মাষ্টার মশাই এসে যে ঘরে বসে ওদের হস্তলিপি লেখাতেন, তারই সামনে রঞ্জুর নিজের হাতে পোঁতা দো-পাটি ফুল গাছগুলোর অস্তিত্ব ছিল কি কোনো দিন? না, কেউ বলতে পারে তারই কাছাকাছি একটু ছোট খুঁটি ছিল, যাতে নবদ্বীপ মাষ্টার তাঁর বুড়ো ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখতেন? আরো একটু দূরে ছিল বন্দরে যাবার রাস্তাটা, তার দুপাশে নুয়ে নুয়ে ছিল বুনো দ্রোণ ফুলের ঝাড়—কিন্তু কোথায় গেল সে সব?

কোথায় গেল সে সব? পরিচিত পৃথিবীটাই বা গেল কোথায়? রঞ্জু কাল বসে বসে যে বানের কথা ভাবছিল, এ মূর্তি তার সে কল্পনাকেও ছাড়িয়ে চলে গেছে। ওই বকুল বনের নীচে যেখানে শাদা জল চিকচিক করছিল ঘাসের মধ্যে, কানে হেঁটে হেঁটে চলেছিল উজান-কেওয়া কই মাছের ঝাঁক, আর কৈবর্ত ছেলেরা পরমোল্লাসে যেখানে হুটোপুটি করছিল—সেটা যেন চেনাই যায় না। জলের ওপর বকুল গাছগুলোর আধখানা করে জেগে আছে, তাদের মাথার ওপরে অশ্রান্তভাবে চেঁচামেচি করছে পাখীর দল। বোধনতলার দিকটায় শুধু খানিক উঁচু জমিতে সবুজ ঘাস মাথা তুলে রয়েছে, তা ছাড়া জল, সব জল। থানাটা জলের ওপরে ভাসছে মস্ত একটা লাল রঙের নৌকোর মতো, ইস্কুলে যাওয়ার মস্ত মাঠটার ওপর সমুদ্রের ঢেউ খেলছে। কাল পর্যন্ত পৃথিবীর মাটি ছিল সবুজ, আজ সব শাদা, সব ঘোলাটে, যেন একটা রাতের মধ্যে ওরা একটা নতুন কোনো একটা দেশে এসে পৌচেছে।

জল আর জল। তিন দিন ধরে মেঘলা ছিল আকাশ, বাতাস বইছিল দমকা, বৃষ্টি পড়ছিল কখনো তীরের মতো, আবার কখনো বা ফুলঝুরির মতো ঝুর ঝুর করে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সে মেঘ, সে বৃষ্টি আজ যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। মাথার ওপরে ধরা দিয়েছে নীলাঞ্জন আকাশ, তার কোণায় কোণায় শাদা শাদা হালকা মেঘের ছেঁড়া টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। আর উঠেছে রোদ, গলানো সোণার মতো তাজা মিষ্টি রোদ, অপর্যাপ্তভাবে ঝরে পড়েছে নীচে শাদা জলের ওপরে, যেন ছোট্ট খোকার কান্নাভরা চোখের ওপর মায়ের হাসিভরা চুমু পড়েছে এসে। (ক্রমশঃ)

গ্রামের তরুলতা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমাদের গ্রামের তিনদিকে নদী থাকায় মাটি খুব সরস ও উর্ব্বর, সেই জন্য তরুলতা খুব সতেজ ও শ্যামল। অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ ছায়াতরু ছিল, যেন এক একটী পরিবার, উহাদের সঙ্গে গ্রামের ইতিহাস ও সুখ দুঃখ জড়িত। কোনটী দেবতার গৃহ, কোনটী প্রতিষ্ঠা করা, কোনটী গ্রামবাসীর বিশ্রামস্থল। একটী প্রাচীন বকুল বনস্পতি গ্রামের মধ্যস্থলে ছিল, ছেলে বুড়ার মজলিস, দাবা পাশার ছক পাতাই থাকিত, শাখায় অসংখ্য পাখীর বাসা, ফুলের সময় ভ্রমরের গুঞ্জনে মুখরিত। গাছটী অজয়ের ভাঙনে পড়িয়া যাওয়ায় লিখিয়াছিলাম—

পাঁচশো বছর হেথায় ছিলে প্রাচীন বকুল গাছ
অজয় নদীর ভাঙনেতে পড়লে ভেঙে আজ।
আজকে তোমার স্বর্গারোহণ ওগো বনস্পতি
আজকে গোটা গ্রামের অশৌচ, গোটা গ্রামের ক্ষতি।
তুমি মোদের অক্ষয়-বট, তুমি বোধি দ্রুম,
মাতামহের পিতামহ তোমায় নমো নমঃ।
সিদ্ধ তুমি না হও, মোদের বৃদ্ধ বকুল গাছ,
বক্ষ উঠে টনটনিয়ে চললে তুমি আজ।

'বাজার ঘাটের অপর পারে একটী বহু কালের বটগাছ ছিল, সেখানে কথিত আছে বর্গীদলে গ্রাম আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে ছাউনি করিয়াছিল। আমি সটীকে খুব জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় দেখিয়াছি—তখন শুনিতাম ভূত বাস করিত। রাত্রে সে দিকে যাইতে অনেকে ভয় পাইত। তারপর গাছটী ভাঙিয়া যাওয়ায় বোধ হয় ভূত কোনো তেপান্তরের গাছে আশ্রয় লইয়াছে, অথবা কোনো অখ্যাত বৃক্ষে বাস করিতেছে যাহার ঠিকানা গ্রামবাসী জানে না? অনেকগুলি ভূত পেত্নী অধ্যুষিত বৃক্ষ এইরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে অজয়ের ভাঙনে, তাহাদের অবস্থাও বোধ হয় আমাদের মতই হইয়াছে। গ্রামের বৃহৎ একটা কল্পনা রাজ্য প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। একটী বেল গাছে এক ব্রহ্ম দৈত্য বাস করিতেন—তাঁহার বেশ, আকৃতি ও কোশা কুশি সম্বন্ধে কত কথা গ্রামে প্রচলিত ছিল, গাছটীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। সে বিল্ববৃক্ষ দুর্ভিক্ষের সময় বহু গ্রামবাসীকে রক্ষা করিয়াছেন এইরূপ প্রবাদ। আর একটী তরু দেবতা 'বনের বুড়া'তলায় ছিল, সেখানে প্রার্থনা করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইত কিন্তু সে বৃক্ষটী ও নাই। 'বনের বুড়া' অন্য একটী বৃক্ষতলে অবস্থান করিতেছেন। একটী প্রকাণ্ড 'কদম' বৃক্ষ ছিল, কি সুন্দর ফুল প্রকাণ্ড গাছটী ভরিয়া ফুটিত—যেন জঙ্গলের জমাট বাঁধা পুলক। সে গাছটী অনেক দিন হইল শুকাইয়া গিয়াছে।

অজয়ের অপর পারে "সাধ সিনানের" ঘাটের উপর একটী বহুকালের অশত্থ গাছ ছিল সেইটী বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গাছটী শেষে ঝড়ে ভাঙিয়া পড়ে—তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছি—

অদূর মেদুর "কেঁদুলীর" হাওয়া বুকে লেগেছিল ঠিক
শ্রীচৈতন্য বাবা নানকের তুমি সম-সাময়িক।
গ্রামের বৃদ্ধ প্রপিতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ—
তোমার তলেতে পাল্‌কী নামালো বরণের বধূসহ।
যাও তরু তুমি তোমার লাগিয়া ঝরে পড়ে আঁখি নীর।
যাও মঙ্গল চামর ছত্র কানন রাজশ্রীর।

নদীর তীরে নির্জ্জন প্রান্তরে একটী নাগেশ্বর ফুলের গাছ ছিল—ফুলের সময় তাহার পরাগের সৌরভে দিক আমোদিত হইত। লোকালয় হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া বৃক্ষটী যথোচিত সম্মান পাইত না। কচিৎ কেহ ফুল পাড়িবার জন্য আসিত। যে ফুল "নৃপতির ভালে রাজে সুকবির কণ্ঠে সাজে" তাহা রাখাল বালকের ভূষণ হইত।

তাই লিখিয়াছিলাম—

এ নহে রাজার—এ যে বিধাতার দান,
ভরেছে নাগেশ্বরে এ ভাঙ্গা বাগান।
সমীরে সুদূরে ভাসি' যেতেছে পরাগ,
লভে ভাগ জনহীন বিপিন তড়াগ,
নয় জয় মুখরিত তার সম্মান।

২

রাজ-ছাপ পড়েনিকো তার প্রতিভায়,
মনীষী সে-নয় মহামহোপাধ্যায়।
খাঁটি সোনা জহুরীরা জানে তার দর,
ছাপ-মারা আক্‌বরী নহে সে মোহর,
তার সুখাসন করে রাজাসন ম্লান।

গ্রামে গাঙ্গুলীদের বাঁধানো অঙ্গনে তিনটী সুবৃহৎ চম্পক তরু ছিল—ফুলের সময় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দুই তিন ক্রোশ দূর হইতে পূজার জন্য পুষ্প লইতে সারি সারি লোক আসিত। ফুলের গন্ধে সমস্ত গ্রাম আমোদিত হইত। দুটী গাছের ফুল রক্তিমাভ এবং শেষটীর ফুল হরিদ্রাভ। লোকে লোম বস্ত্র পরিধান করিয়া কত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত পুষ্প চয়ন করিত। আমাদের বিল্বপত্র, তুলসীপত্র প্রভৃতি চয়নের মন্ত্রগুলি তরু দেবতার প্রতি কত ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করে। দেবতার পূজার জন্য তোলা হইতেছে তাহা জানাইয়া, বর প্রার্থনা করিয়া যেন অনুমতি লওয়া হইতেছে। তখন সে মন্ত্রের অর্থ বুঝিতাম না, কিন্তু তাঁহাদের একান্ত সঙ্কোচ ও সশ্রদ্ধ ভাব ও চয়নের বিনয়নম্র ধরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম।

পথের ধারে একটী 'আউচ ফুলের গাছ ছিল, ও ফুল খ্যাতিসম্পন্ন না হইলেও উহার তীব্র সুবাস বহুদূর পর্য্যন্ত যায়—রাস্তায় যাইতে যাইতে এ ফুলের বাস পথিককে উদ্‌ভ্রান্ত করিত। সে গাছটী জ্বালানি কাঠের জন্য কে কাটিয়া ফেলে, এমনি নিষ্ঠুর। আমি মনে বড় কষ্ট পাইয়াছিলাম—

বাতাস হয় না সুরভিত আর
পথিক পায় না বাস,
উঠই রয় বনদেবতার
বেদনার নিশ্বাস।
কি ব্যথা আমার বুঝে নাক লোক।
শৈশবের এই বন্ধু বিয়োগ,
অজ্ঞাতে হায় দস্যু করিল
কত বড় রাহাজানি।

গ্রামের পশ্চিম দিকে একটা পুকুরের পারে 'ময়না' কাঁটার এক নিবিড় বন ছিল। কাঁটার ভয়ে কেহ সে বনে প্রবেশ করিতে পারিত না—সেই কাঁটাবনকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

রসিক পথিক বলছে দেখে
থাক্ বাঁধিয়া থাক গ্রহ,
শজারুর ও উপনিবেশ
দেখ্‌তে নাহি আগ্রহ।
এখানেতে কাঁটার ভিড়ে
যায় ভ্রমরের পাখ্‌না ছিঁড়ে
বনবরাহ দূরেই থাকে
ঘেঁসে নাক ব্যাঘ্রও।
পাখী ও গায়, ফুল ও ফোটে
জীবন মোদের মন্দ না,
ভীমরুল এবং ফড়িং থাকে
টুনটুনি ও চন্দনা।
তীরন্দাজের এই যে মাটী ;
ভয় করে লোক ফেলতে পাটী
মোদের কেবল শরই আছে
করতে গুরুর বন্দনা।

একটী পড়ো বাড়িতে একটী তমাল গাছ ছিল। প্রতি রাত্রিতে সেখানে অসংখ্য জোনাকি পোকা আসিয়া গাছটী আলোকিত করিয়া রাখিত। একবার নিভিত, একবার জ্বলিত—সেই গাছটী তাহাদের কেন এত প্রিয় ছিল জানি না—তাই লিখিয়াছিলাম—

উড়ে বসে গাছটীতে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি
আকাশে তারার মত—এত বায় গোপা কি ?
জ্বেলে শত মণি দীপ কে আরতি করিছে ?
প্রিয় আঁখি আলোকের মৌচাক গড়িছে ?
হয় তো ওখানে ছিল পুরবাসী যাহারা,
নিশিতে আবার এসে জমে বসে তাহারা।

ভুলিতে কি পারে তারা ? যারা ভালবাসে রে
গত জনমের সব সুহৃদেরা আসে রে।
টিপ্ দেয় কবিতারা বুঝি কবি ভালেতে,
ঘুম পাড়ানিয়া মাসী চুমা দেয় গালেতে।

এক 'বাগ্‌দিনী'র অতি সুমিষ্ট আমের একটী গাছ ছিল, গাছ ও বড় নয়। ঋণের দায়ে মহাজন গাছটী কাটিয়া লয়। ছেলেরা বলে 'মা উহার আম লইয়া যাক, আমরা খাব না, উহারা গাছ যেন না কাটে।' দুখিনী ছেলেদিগে বুঝায়—"বাছা

ঋণের দায়েতে কত রাজার রাজত্ব যায়
মহাজন শুনে না বারণ"

যখন গাছের উপর কুঠারের ঘা পড়িতে লাগিল ছেলেরা এ উহার মুখপানে চায়, তাহাদের চোখ ফাটিয়া যেন জল পড়িতে লাগিল। গাছটী কাটা হইলেও তাহারা উহার মূলে প্রতিদিন জল দিত, ভাবিত গাছ আবার হইবে।

একি মায়া, একি ভ্রম, আশার ছলনা একি !
আজও দুটী ছোট ছোট ছেলে,
প্রভাতে উঠিয়া ওগো ঘটী ভরে জল দেয়
কাটা সেই প্রিয় তরুমূলে।

এ দৃশ্যটী যখন দেখিয়াছিলাম তখন আমি বালক, এখন হইলে মহাজনকে টাকা দিয়া গাছটী রক্ষা করিতাম। মনে বড় ব্যথা হয়।

গ্রামে আর একটী অশ্বত্থ নারায়ণ ছিলেন, তাঁর তলে ষষ্ঠীদেবীর অধিষ্ঠান। বৎসরে সেখানে দুএকবার উৎসব হইত।

নারিকেল গাছ অনেকগুলি ছিল, কিন্তু নারিকেল গাছ এ গ্রামে ভাল হয় না। নারিকেল গাছ ও গ্রামবাসীর ভক্তির পাত্র, এ গাছ কাটিতে নাই—নারিকেল কলাবৃ ভারতের বৈশিষ্ট্য। ইহাঁরা যেন ব্রাহ্মণ ও সাধুর ন্যায় সংসারে থাকিয়া সংসার হইতে ভিন্ন। সর্ব্বদা তপস্যারত বহু উর্দ্ধে তৃষিতের জন্য পানীয় ধারণ করিয়া আছেন। আমি লিখিয়াছিলাম ইহাঁদেরই কথা—

দীনবন্ধুর দেওয়া দিনগুলি
আমি কি হেলায় হারাতে পারি,
ক্ষুধিতের লাগি খাদ্য আনিব
তৃষিতের লাগি আনিব বারি।

কাঁটাল গাছ কম, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ আম গাছ ছিল। ঘোষালদের "সিন্দুরে" 'গোথুপী' ও বক্সীদের 'জোয়ানে' গাছ খুব বড় ছিল, এক একটী গাছে একটা গোটা বাগানের আম আসিত।

তাল গাছ অসংখ্য ছিল, এমন উন্নত এমন সারবান এত প্রয়োজনীয় গাছ কিন্তু সে অনুপাতে সম্মান নিতান্ত কম ; তাই লিখিয়াছিলাম—

লোকে কেন দেয় নাকো অধিক সম্মান ?
রৌদ্রপীড়িতারে কর না যে তুমি ছায়া দান।

নানাবিধ তরুলতায় গ্রাম সুশোভিত ছিল। লোচনের পাটে একটী বিশাল মাধবী মণ্ডপ ছিল, তাহার তলে একশত বৈষ্ণবের বসিবার স্থান হইত।

মালতীলতাও অনেকগুলি ছিল। ফুলের সময় বেশ একটা উৎসব বসিত। আমাদের বাড়ীতে একটা সুন্দর মাধবীবিতান ছিল, বসন্তকালে তাহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। শীতকাল হইতেই কুসুমোদগম হইত। এই লতাটী সম্বন্ধে লিখিয়াছি—

লহগো আরতি আজিকে আমার
মোর আঙিনার মাধবীলতা,
গভীর তোমার শ্যামল মমতা
খর নিদাঘের জুড়ানো ব্যথা।
শাখায় মধুপ চক্র রচেছে,
মধু গুঞ্জনে ভুলায় মোরে,
বনস্থলীর সুষমা বেঁধেছ
গৃহস্থালীর প্রণয় ডোরে।
তাপস কুমারী, গৃহ আশ্রমে
তুমি অপরূপা শকুন্তলা,
শান্তনু গৃহে শান্ত গঙ্গা
রম্যা তন্বী শ্যামোজ্জলা।
'অচ্ছোদ' ত্যজি অয়ি প্রীতিময়ী
অঙ্গনে মোর এসেছ হেথা
লতিকা হইয়া লতাইয়া গেছ
গীতিময়ী শ্যামা মহাশ্বেতা।
বল্লরীরূপা তুমি কালিন্দী
কৃষ্ণপ্রিয়ার তুমিই প্রিয়,
বনশ্রী মোর মলিন করেছে
রাজার হৈম রাজশ্রীও।
হে মাধবী তব কুসুম স্তবক
স্মরায় মাধবে ক্ষণে ক্ষণে,
হে শ্যামলে মোরে কর শ্যামময়
নিবিড় তোমার আলিঙ্গনে।

শ্যামলতা নামে একপ্রকার বন্যলতা বনে অনেক হইত। ফুল খুব ছোট, কিন্তু গন্ধ সুমিষ্ট। এ লতা বাগানে কেহ রাখে না—আমি রাখিতাম এবং লিখিয়াছিলাম—

দীন পল্লীর মেঠো গান তোর
কে শুনিবে রাজসভাতে?
কি করিবি আর বসিয়া একাকী তফাতে।
এ হাটে ও তোর শ্যামলতা ফুল
বল কে রে ভালবাসিবে?
দীনতার ছবি দেখে লোকে শুধু হাসিবে।

গ্রামে বকফুল, কাঞ্চন, ঝাঁটি, অপরাজিতা, যূঁই, রঙ্গন বেল, রজনীগন্ধা, সেফালি, টগর, বনমল্লিকা, করবী জবা, গুলঞ্চ প্রভৃতি অজস্র ফুটিত।

তরুলতাগুলিকে গ্রামবাসী দেবতাত্মা মনে করিতেন। উঁহারা মানুষের সুখে সুখী দুখে দুখী। বিপদ বিঘ্ন, অভাব হরণ করিতে সমর্থ এই ধারণা তাঁহাদের ছিল। গাছ কাটিতে বহু বাধা নিষেধ ছিল, প্রতিষ্ঠা করা বৃক্ষের একটা পাতাও কেহ ছিন্ন করিত না।

একজন সাধু বলিতেন বনস্পতির পূর্ব্বজন্মে মহৎ বৃহৎ মনীষী ও বাগ্মী ছিলেন, এজন্মে মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবৎ প্রেম আস্বাদ করিতেছেন। তাঁহাদের নীরব বাণী হইতেছে এই—

আমরা জেনেছি দিবানিশি করি ধরণীর রস পান
ভগবান এই ভুবন এবং এ ভুবন ভগবান।
শ্যামল হয়েছি আমরা তাঁহার সরস আলিঙ্গনে,
তাঁহারি রসের খেলা ফুল, ফল, জাগুক জগজ্জনে।
সকল রসই অমৃত রস উর্দ্ধে ওঠায় ওঠে,
যাহা হতে আসে আলো ও জীবন তাতেই কুসুম ফোটে।
একটা সত্য জেনেছি, তাহাই আমাদের ধ্যান জ্ঞান,
ভগবান এই ভুবন এবং এ ভুবন ভগবান।

অতি-সাধারণ

শ্রীহৃষিকেশ দেব

দিলীপের বাবা সেদিন পয়লা জুলাই আপিস ফেরৎ বাড়ী আসিবার পথে ভালো দেখিয়া কয়েকটি ল্যাংড়া আম কিনিয়া আনিলেন। মফঃস্বল সহর, ভালো আম সর্বদা পাওয়া সম্ভব নয়; সুতরাং দিলীপের আনন্দটা সেদিন একটু বেশীই হইয়াছিল। পিসিমার নিকট হইতে নিজের আমটি পরিষ্কার ভাবে খোসা ছাড়াইয়া লইয়া, হাতে করিয়া সারা বাড়ী নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল!...কিন্তু একটা মিষ্টি পাকা আম...কতক্ষণই বা হাতে রাখা যায়? একটু একটু করিয়া আরামের সহিত দিলীপ আমটি নিঃশেষ করিল! অনেকদিন পরে এত ভালো আম... আঁটিটিও ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। সেটি হাতে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া পিসিমা হাসিয়া বলিলেন, "তা বেশ তো, আঁটিটা পুঁতে দে' না, কয়েক বছর বাদে ও-ই তোকে আম খাওয়াবে বিনি পয়সায়।"...শুনিয়া দিলীপের স্ফূর্ত্তি বাড়িয়া গেল, বাবাকে গিয়া বলিল, "বাবা, আঁটিটা পুঁতে দেব?" বাবা বৈকালিক পত্রিকা পাঠে ব্যস্ত ছিলেন, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইতেই দিলীপের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। অনেক বাছিয়া, অনেক চিন্তা করিয়া, বৈঠকখানা ঘরের জানালার পাশেই স্থান মনোনীত হইল। পৈত্রিক বাড়ী, স্থান বদলের আশংকা নাই; এ ছাড়া আরো

নানা কারণে স্থানটির লোভনীয়তা অনস্বীকার্য্য। বেশ হাতের কাছে রহিল…বাহিরে যাইতে আসিতে সর্বদা চোখে পড়িবে!…ব্যস্, বৃক্ষরোপণ পর্বের প্রথম অধ্যায় হইয়া গেল।…

গাছের অংকুর দেখা দেওয়ার সাথে রোজ সকালে ও বিকালে পড়া কামাই করিয়া স্বহস্তে ঘটি ঘটি জল ঢালা দিলীপের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে পরিণত হইল। চাকরকে ক্রমাগত তাড়া দিয়া, ভাবী আম গাছটির চারিদিকে কঞ্চির বেড়া দিয়া গরু-ছাগলের আক্রমণ হইতে তাহাকে নিরাপদ করিবার ব্যবস্থাও করিয়া লইল।…

এই সময় দিলীপের দিদির বিবাহ বাঁধিল।…সহরের স্থায়ী বাসিন্দা হইলেও এই উপলক্ষে দিলীপের বাবা দেশের বাড়ীতে যাওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন। কিন্তু বিপদ বাধিল দিলীপকে লইয়া; সে তাহার আমগাছের চারাটিকে ছাড়িয়া যাইতে কিছুতেই রাজী হইল না।… "মোটে একটু দেখা দিয়েছে, এখনই তো যত্নের সময়, নইলে নষ্ট হয়ে যাবে," ইত্যাদি কথা যে সে কাহার নিকট হইতে শিখিয়াছিল, জানি না। অবশেষে তাহার বাবা চারাগাছটির রক্ষার জন্য একজন অস্থায়ী মালী রাখিয়া তবে দিলীপকে যাইতে রাজী করাইলেন। কিন্তু বিবাহ উৎসবের মাঝেও সে তাহার চারাগাছটির জন্ম সর্বদা চিন্তিত রহিল।…

তার পর অনেক বছর কাটিয়া গিয়াছে, প্রায় আট-দশ বছর। সেদিনের বালক দিলীপ আজ যুবক; কলেজ এবং আনুষঙ্গিক লইয়াই সে এখন ব্যস্ত। আম চারাটিও দিনের পর দিন আপন মনে বাড়িয়াছে। তাহার প্রতি দিলীপের আদর-যত্ন বহুদিন পূর্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে, ছেলে-খেলা করিবার বয়স বা সময় তাহার নাই।…কিন্তু তবুও আমগাছটি বড় হইয়াছে, যদিও ফলবান্ হইতে এখনো বিলম্বের প্রয়োজন; তবে তাহার পাতার গন্ধে তাহার আভিজাত্য ইতিমধ্যেই প্রকাশমান।…

অনেকদিন বাদে, সেদিন দিলীপের দিদি বাপের বাড়ীও আসিয়াছেন, কোলে চার পাঁচ বছরের ছেলে। ছেলেটি হইয়াছে দুষ্টুর চরম, প্রথম দিন আসিয়াই সারা বাড়ীর লোকজনের সহিত পরিচয় করিয়া ফেলিল; বিশেষতঃ মামামণি দিলীপের সহিত তাহার ভাব হইল সর্বাধিক; মামামণির দোয়াত উল্টাইয়া, পেন্ হস্তগত করিয়া এবং "জুলিয়াস সিজারের" পাতা ছিঁড়িয়া, সেই ভাবকে সে আরো বাড়াইয়া লইল।… পরদিন সকালে দিদি বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া দিলীপের সহিত আজে-বাজে গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় চোখে পড়িল জানালার পাশের উদ্ভিন্ন-যৌবনা আমগাছটি। "ওমা, এত বড় আমগাছ এলো কোত্থেকে?" বলিয়া দিদি উঠিয়া গেলেন জানালার পাশে, কিন্তু পরক্ষণেই "মাগো" বলিয়া সরিয়া আসিলেন ঘরের মাঝখানে।

দিলীপ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি হোল দিদি?" দিদি ভীতি-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "মাগো, ঐ কচি আমগাছটা একবার চোখেও দেখিস্ না নাকি? কি ভীষণ সব আগুনে বিছা ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর ডালে ডালে।" দিলীপ লক্ষ্য করিল, সত্যই কয়েকটি বিছা আছে বটে। বলিল, "ও, হ্যাঁ, তা' ও'সব লক্ষ্য করবার সময় কোথা বল?" "বলিস্ কি রে?" দিদি বলিলেন, "ভাগ্যিস্ আমি দেখেছিলুম, নইলে ছেলে-পুলের ঘর, কি হোত কে জানে? তোদেরও যেমন, ঘরের পাশে আমগাছ, কেটে ফেল্, কেটে ফেল্।" হাসিয়া দিলীপ বলিল, "তা' বটে, তবে কিনা, ওদিকে নজর দেবার সময়ই পাই না, কে ওসব দেখে বলো?" …হাঁকিল, "মধু, মধু"। ভৃত্য মধু আসিতেই হুকুম করিল, "ঐ ছোট আমগাছটা কেটে ফেলে দে তো।"

কচি আমগাছ, কুড়ালের কয়েক আঘাতেই হেলিয়া পড়িল; তার পর মধু তাহাকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল, হয়তো উনানে ব্যবহার করিবার জন্য।…শির্ শির্ করিয়া একটা মৃদু বাতাস ভূপতিত গাছটির ডালপালায় একটা লঘু স্পন্দন তুলিয়া গেল।…চুলের বিনুনী খুলিতে খুলিতে দিদি প্রশ্ন করিলেন, "আজ কত তারিখ রে? উনি কবে আস্‌বেন কে জানে।" মৃদু হাসিয়া দিলীপ বলিল, "আজ হোল তোমার পয়লা জুলাই।"…"ওমা, তোদের ক্যালেণ্ডারের পাতাই যে ছেঁড়া হয় নি এখনো," বলিয়া দিদি উঠিয়া পাতাটা ছিঁড়িয়া দিলেন।…

দিলীপের হঠাৎ ধ্বক্ করিয়া একটা কথা মনে হইল…অনেক দিনের পুরাণো একটা কথা…কোন এক পয়লা জুলাই এমনি দিনে এই আম-গাছটির বীজ সে নিজহস্তে রোপণ করিয়াছিল।

অভিযান

শ্রীরবিদাস সাহারায়

চঞ্চল দিনমান, মন্থর রাত্রি,
দুর্গম পথে চলে নির্ভীক যাত্রী।
সর্পিল পথে সেথা বহু বাধা বিঘ্ন,
মনুষ্য, শ্বাপদের নখ ছুরি তীক্ষ্ন।
শঙ্কিত পদে নামে রক্তিম সন্ধ্যা,
ফোটে তবু পথ পাশে ফুল মধুগন্ধা।
তাপসের অভিযান অহিংস-বর্ত্তে,
স্বর্গের বাণী আনে সহিংস-মর্ত্তে।
পরিধানে কটিবাস, দু'টি পদ নগ্ন,
ধ্যানী চোখে—দৃষ্টি, জ্ঞানলোকে মগ্ন।
জরা মৃত্যুর নীতি নাহি মানে বৃদ্ধ,
নাহি মানে বাধাভয় নর-মহাসিদ্ধ।
হিংসার-পথে—প্রীতি, সত্যের অভিযান,
জীবনের পথে শুনি মানবের জয়গান।

মেজরের শাশুড়ী

শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস

গল্প মাত্রেই যে মিথ্যে হয়, এমন কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। দোষ-গুণে যেমন মানুষ, সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে তেমনি গল্প। আর এর একটা কারণও আছে। বিধাতা পুরুষ যদি গল্প সৃষ্টি করতেন আর লেখকরা সেটা লিখে রাখতেন, তাহলে আর কোনো গোলই ছিল না। কিন্তু বিধাতা পুরুষের তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তার ওপর তাঁর না আছে পাঠক-পাঠিকা, না আছে সমালোচক। সুতরাং দু-একটা ভুলচুক হবেই। লেখকরা বুদ্ধি ক'রে সেটা শুধরে নেন; সত্যি-মিথ্যের তর্ক তুললে এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

উত্তরবঙ্গের কোনো একটা জায়গা। আমাদের পাশের বাড়ীতেই থাকেন এক ইংরেজ মিলিটারি ভদ্রলোক, ধরে নেওয়া যাক তাঁর নাম ব্রাউন্। এঁরা স্বামী স্ত্রী দুজনেই যে খুব ভদ্রবংশের সেটার পরিচয় ছিল তাঁদের আলাপে আপ্যায়নে, আচারে ব্যবহারে। মনে হ'ত যেন মার্জিত-রুচি বাঙালী দম্পতীর সঙ্গেই কথা কইছি। আমার ব্যবহারে যতই দুর্বলতা প্রকাশ পাক না কেন, এঁরা যে পর—সেটা একবারও অনুভব করতে দেন নি।

সম্প্রতি এঁদের একটি মেয়ে হয়েছে, প্রথমজাত সন্তান—তাই অত্যন্ত আদরের। মেয়ের কি নাম দেওয়া হবে, তা নিয়ে আমার সঙ্গে অনেক পরামর্শ করেছেন। মেজর জানেন আমি লিখিয়ে মানুষ, আমার লেখা নানা কাগজে বার হয়। তাই আমার 'আর্টিষ্টিক' রুচির ওপর মেজরের মস্ত ভক্তি। ভাগ্যিস আমার লেখা সব বাংলায় এবং মেজর সেগুলো পড়তে পারেন না। নইলে তাঁর ভক্তি উড়ে যেত।

আমি ভেবে-চিন্তে মেয়ের নাম দিয়েছি রমা। রমা লক্ষ্মীর নাম এবং অতি সুমিষ্ট নাম। মেজর-দম্পতীও বলেন সুন্দর নাম, "রোমা" বলে উচ্চারণ করলেই বিলিতি নাম হয়ে গেল।

বলতে ভুলেছি, যুদ্ধ তখনো শুরু হয় নি, আস্ফালন শুরু হয়েছে। মেজর ব্রাউন্ মিলিটারি থেকে বদলি হয়ে অতিরিক্ত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদে এসেছেন।

সেদিন সকাল বেলায় চায়ের টেবিলে সবেমাত্র এক পেয়ালা চা খাওয়া শেষ করেছি, এমন সময় মেজর রুদ্ধশ্বাসে ছুটে এলেন। তাঁর মুখে ছিল জ্বলন্ত সিগার, ভদ্রলোক ভীষণ চুরুট খেতেন, গন্ধ শুঁকে তাঁর গতিবিধি নির্ণয় করা খুবই সহজ ছিল।

ধাঁ ক'রে আমাদের খাবার ঘরে ঢুকে পড়ে মুখের জ্বলন্ত সিগারটা আমার বেয়ারার হাতে দিয়ে বললেন, "সর্বনাশ করেছে! আমার শাশুড়ী আসছেন বিলেত থেকে!"

আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় বেয়ারা তখন মেজরের দেওয়া সিগারটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ছিল।

আমি বললুম, "এক পেয়ালা চা খান আগে।"

মেজর বললেন, "চা খাব কি? শুনুন মশাই, আমার শাশুড়ী আসছেন, এ অবস্থায়—"

আমি বললুম, "হাঁ, হাঁ, এ অবস্থাতে এবং সকল অবস্থাতেই চা খাওয়া যায়।"

সেখানে চায়ের মালিক কেউ থাকলে আমার কথাটা লুফে নিত এবং বিজ্ঞাপন হিসেবে ব্যবহার করত। মেজর কিন্তু সে-কথায় কান দিলেন না। শাশুড়ী-সমস্যাতেই মগ্ন।

জানা গেল ওঁদের কোনো খবর না দিয়েই বৃদ্ধা শাশুড়ী একলাই বিলেত থেকে বোম্বাই এসে পৌঁছে গেছেন। সেখান থেকে তার করেছেন, "কোথাও না থেমে সটান তোমাদের ওখানে যাচ্ছি।" দৌহিত্রীর আকর্ষণে তিনি সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে আসছেন।

মেজর-দম্পতী তো আকাশ থেকে পড়েছেন বুড়ীর কাণ্ড দেখে। বুড়ী কোনোদিন জীবনে লণ্ডনের বাইরে পা দেন নি। মেজরের কাছে শোনা গেল তাঁর শাশুড়ী বিধবা এবং তাঁর বিস্তর টাকা। টাকা থাকলে খেয়ালের আর অন্ত থাকে না। মেজর বললেন, এও একটা খেয়াল।

কলকাতা থেকে মেল ট্রেণখানা আমাদের ওখানে এসে পৌঁছায় সন্ধ্যার কিছু আগে। মেজর বললেন, "আপনার গাড়ীখানা ধার দিতে হবে। শাশুড়ীকে তাইতে ক'রে ষ্টেশন থেকে নিয়ে আসব।"

মেজরের গাড়ী ছোট্ট টুসীটার, তাতে বোধ হয় শাশুড়ীঠাকরুণকে ধরবে না, তাই আমার চাউস্ গাড়ীখানার দরকার।

বললুম, "তথাস্তু এবং তোমার যদি আপত্তি না থাকে আমিও যাবো ষ্টেশনে।"

মেজর বললেন, "আপত্তি! এ তোমার দয়া।"

ট্রেণ ঠিক সময়েই এল। মেজরের শাশুড়ী নামলেন অসংখ্য মোট-প্যাঁটরা নিয়ে। তাঁর মাথার চুল সব সাদা, প্রকাণ্ড কালো হ্যাটের পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মুখখানি টোমাটোর মতো লাল এবং বাঁধা-কপির মতো গোল। অত যে বিষয়-সম্পত্তি, তবু সাজ-পোষাক খুবই সাদাসিধে, একটু যেন ভীতু-ভীতু ভাব, নতুন বিদেশে এসেছেন তাই বোধ হয়। রমার জন্যে নানা আকারের বাক্সে নানা রকমের খেলনা এনেছেন, লণ্ডনের সুবিখ্যাত খেলনাওয়ালা গ্যামাজের নাম ছাপা রয়েছে সে সব বাক্সে। আর এনেছেন মেয়ে-জামাই-নাতনীর জন্যে নানা রকম পোষাক-আসাক। নেমেই বললেন, "সব জিনিষ কি আনতে দেয় সঙ্গে! বাধ্য হয়ে তাই মালগাড়ীতে পাঠাতে হল। সে প্রায় এক ওয়াগন্ মাল, আসছে পেছনে।" শুনে মেজরের চোখ কপালে উঠল।

অনেক দিন পরে মা-মেয়েতে দেখা, আদর-আলিঙ্গনের পালা শেষ

হ'তে অনেকক্ষণ সময় লাগল। তারপর মাতামহী-দৌহিত্রী সাক্ষাৎ—সেও খুব ঘটা করেই হল।

মিসেস ব্রাউন বললেন, "মা, তুমি একটি আস্ত পাগল, এত দূর থেকে এত জিনিষ নিয়ে কেউ আসে!"

স্নেহের এ অনুযোগ ডুবে গেল বৃদ্ধার নাত্‌নীর প্রতি উচ্চারিত কল-কাকলির ভাষায়। সকল দেশে, সকল কালে আর সব ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু স্নেহ এক।

আমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে এ-দৃশ্য দেখছিলুম। বৃদ্ধা তাঁর জামায়ের মাথার চুলের গোছা ধ'রে টান দিলেন, গোঁফ-জোড়া ধ'রে টান দিলেন, জামায়ের হাতে গুঁজে দিলেন—চক্‌চকে সোনালি সিল দেওয়া হাভানা চুরটের বাক্স।

তারপর মেজর আমার সঙ্গে তাঁর শাশুড়ীঠাকরুণের পরিচয় করে দিলেন।

বৃদ্ধা দু'পা পেছিয়ে গিয়ে বললেন, "ইওর লর্ডশিপ্! গুড্‌নেস্! আপনি কলকাতা থেকে এতদূর এসেছেন! কোন অ্যাসাইজ আছে বুঝি?"

বৃদ্ধা ভেবেছেন হাইকোর্টের জজ। তাঁদের দেশে জজ বলতে বোঝায় হাইকোর্টের জজ। সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলাম, এ তা নয়, অতি সামান্য মফস্বলীয় হাকিম। কিন্তু বৃদ্ধা তবুও আমাকে সমীহ ক'রে ক'রে চলতে লাগলেন।

দেখা গেল মেজর হাসি আর চাপতে না পেরে সবার পেছনে দাঁড়িয়ে নিজের মনে হো হো ক'রে হাসছেন। আমার বেজায় রাগ হল সে হাসি দেখে।

রাতারাতি ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্যে বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা প্রকাণ্ড এক বোঝা খবরের কাগজ ও পত্রিকা কিনে পড়তে পড়তে এসেছেন এবং সে সব থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই সময় আমেদাবাদ না ফরাক্কাবাদ কোথায় শ্রমিক ধর্মঘট চলছিল। আমরা খবরের কাগজের পাতায় সেটা দেখে চোখবুজে পাতা উল্টে গেছি। কিন্তু এই নবাগতা এই ধর্মঘটের উল্লেখ ক'রে বললেন যে, এই শ্রমিক-আন্দোলনকে তিনি মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না, যে কোনো মুহূর্তে ওরা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে পারে। উনিশশো ছাব্বিশ সালে জেনারেল ষ্ট্রাইকের আগে বিলেতেও অমনিধারা আবেষ্টনের উদ্ভব হয়েছিল। কম্যুনিষ্টরা এর পিছনে আছে সেটা আর বলে দিতে হবে না, বললেন বৃদ্ধা।

আমরা, যারা খেটে খাই, তারা বুর্জোয়াও নই, কম্যুনিষ্টও নই—বড়জোর বলা যেতে পারে আমরা একটু উঁচুদরের শ্রমিক। কাজেই আমাদের সহানুভূতি শ্রমিকদের দিকে। বৃদ্ধাকে বললাম, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বিপ্লবের কোনো সম্ভাবনাই দেখছিনে।"

সন্ধ্যা হয় হয়, মোটর এসে মেজরের বাংলোয় পৌঁছাল। বোম্বাই হতে সটান এসেছেন, সুতরাং বৃদ্ধা পথশ্রমে খুবই কাতর। তাঁর মেয়ে তাঁকে তাড়া দিয়ে স্নানের ঘরে পাঠালেন।

আমি বললাম, "এখন চলি, কাল এসে গল্প করা যাবে।"

মেজর বললেন, "একটু অপেক্ষা করে যান। চা তৈরি। আইরীণ, চা ঢালো।"

আইরীণ মিসেস্ ব্রাউনের নাম।

আমার দিকে চোখটিপে চেয়ে মেজর বললেন, "ইওর লর্ডশিপ! হো হো হো হো—হি হি।"

ভুল করে যদি কেউ হাইকোর্টের জজই ভেবে থাকে, তাতে তখন থেকে এত হাসবার কি আছে! খুব বিরক্ত হলুম মেজরের ওপর।

বেশ মোলায়েম অথচ বেশ "মক্কম" গোছের একটা জবাব দিতে যাচ্ছি, এমন সময় বাড়ীর পেছনের জঙ্গল থেকে শেয়ালগুলো একসঙ্গে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই স্নানের ঘর থেকে সে কী আর্তনাদ!

অবিন্যস্ত বেশবাস, ভয়চকিত দৃষ্টি, মেজরের শাশুড়ী চীৎকার করতে করতে বেরিয়ে এলেন, "আইরীণ! They are coming! ঐ তারা এসে পড়ল!"

আইরীণ চা পরিবেশন বন্ধ রেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিগেস করলেন, "মাদার! মাদার! Who are coming? কারা এল? স্নানের ঘর থেকে এমন ক'রে পালিয়ে এলে কেন? কারা আবার এল?"

শেয়ালগুলো তখনো ডাকছে।

বৃদ্ধা বাইরে সেই শেয়াল ডাকার দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, "তোমরা শুনতে পাচ্ছ না? ঐ যে তারা সব চেঁচাতে চেঁচাতে এই দিকেই আসছে গো! সেই সব ফরাক্কাবাদের বিপ্লবী শ্রমিকরা, যাদের কথা পড়েছি কাগজে, ঐ তারাই আসছে দল বেঁধে। এখুনি দাঙ্গা শুরু করবে। রোমা কোথায়—রোমা, রোমা!"

আইরীণ বললেন, "শ্রমিক না ছাই, ও তো শেয়াল, জ্যা—কল্, যাও তুমি স্নান সেরে এসো। ভয় পেও না, জ্যা-কল্ মানুষের কোনো ক্ষতি করে না।"

একমুখ চা নিয়ে মেজরের তখন হাসতে হাসতে দম আটকেছে। খানিকক্ষণ লাগল বৃদ্ধার সামলাতে। দুচারবার বললেন, "গুড্‌নেস্"—তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে বললেন, "এই বুঝি তোমাদের জ্যাকল! তা আমি কি ক'রে জানব বাছা? আমি কি জ্যাকল দেখেছি, না তার ডাক শুনেছি কোনো জন্মে?"

এমন মজার কথাটা বাড়ীতে গল্প করবার জন্যে আমার আর তর সইছিল না। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে চলে এলুম।...

কয়েকদিন পরের কথা। মেজরের শাশুড়ীঠাকুরাণী এখন বাংলাদেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে খানিকটা অভ্যস্ত হয়েছেন, শেয়াল ডাক শুনে আর তেমন ভয় পান না। তবু ভয় একেবারে ভাঙে নি। শেয়ালদের আকৃতি-প্রকৃতি বিষয়ে মনে মনে অনেক তোলাপাড়া করেছেন, মেয়ের ধমক এবং জামায়ের হাসির ভয়ে তাঁদের বেশি কিছু জিগেস করতে সাহস করেন নি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাকে জনান্তিকে বললেন, "আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিগেস করতে চাই।"

ভণিতা শুনেই বুঝলাম—কথা আর কিছুর নয়, শেয়ালের কথা।

বৃদ্ধা বলে চললেন, "আচ্ছা বলুন তো, শেয়ালে মানুষের, বিশেষতঃ মানবশিশুর যে কোনো অনিষ্ট করতে পারে না, এটা কি ঠিক?"

আমি উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করছি দেখে বললেন, "দোহাই আপনার, আমাকে স্তোকবাক্যে ভোলাবেন না।"

বললুম, "শেয়ালে যে মানবশিশুর অনিষ্ট করতে পারে না, তা নয়। সুযোগ পেলে অনিষ্ট করে।"

বৃদ্ধা বললেন, "আমারো ঠিক তাই মনে হয়েছে। আমার মেয়ে-জামাই কেবল আমাকে স্তোকবাক্যে ভোলাচ্ছে।"

বললুম, "ভয় পাবেন না। শেয়ালেরা ভারি ভীতু হয়, ঘরের মধ্যে ঢোকে না। এখানে এত চাকর বাকর, তাছাড়া আপনি নিজে রয়েছেন, একটু সাবধানে থাকলে কোনো ভয় নেই।"

বৃদ্ধা বললেন, "বুঝেচি, অসাবধান হলেই ভয়। কোন্ ফাঁকে ঘরে ঢুকে আমার রোমাকে টেনে না নিয়ে যায়! মেজর আর আইরীণ আবার হিমালয়ের কোন্ পাহাড় চড়তে যাবে, পনেরো দিন রোমাকে আমার কাছেই রেখে যাবে। তখন কি করব তাই ভাবছি।"

হাসি পেলেও হাসলাম না, নিজের স্নেহমুগ্ধা মাতামহীর স্মৃতি মনে পড়ল, মনে পড়ল আমার কাল্পনিক বিপদের সম্ভাবনায় তাঁর অস্থিরতা। মেজরের সঙ্গে দেখা হলে বললাম, "বাঃ, বেশ লোক তো! বুড়ীর ঘাড়ে মেয়ে ফেলে দিয়ে নিজেরা হাওয়া খেতে যাওয়া!"

মেজর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "পৃথিবীতে সকল জিনিষেরই উপকারিতা আছে—শাশুড়ীরও। বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই সে উপকারিতা গ্রহণ করে।"

আসলে কিন্তু তা নয়। ওঁদের যাওয়ার প্ল্যান অনেক আগে থেকেই ঠিক ছিল। প্রথমে যাবেন দার্জিলিং, সেখান থেকে পায়ে হেঁটে সান্দকৃপু, আর কোন্ কোন্ চূড়া, তার নাম মনে নেই। কুলি-টুলি সব ঠিক করা হয়ে গেছে, অনেক টাকা খরচ হয়েছে, এখন না গেলে নয়।

আমি দেখলুম বৃদ্ধা শাশুড়ীঠাকুরাণী ইতিমধ্যেই যথাকর্তব্য ঠিক ক'রে ফেলেছেন। মেয়ে-জামাই চলে যাবামাত্রই তিনি চল্লিশ টাকার কাঁটা তার, আর চল্লিশ টাকার তারের জাল কিনে আনালেন। সেই সব তার দিয়ে বাড়ীটার অন্ধি-সন্ধি সব বন্ধ করা হল, দিনচারেক মিস্ত্রীদের পেরেক ঠক্‌ঠকানির আওয়াজে আর কানপাতা যায় না।

রমাকে প্রতি সন্ধ্যায় দেখতে যেতুম, আর ভাবতুম মেজর-দম্পতী ফিরে এলে কী কাণ্ডটাই না হবে!

হলও তাই। দিন পনেরো পরে একটা হৈ হৈ ব্যাপার। তাঁরা বাড়ী ঢুকতে পথ পান না, সর্বত্র কাঁটা তার। হো হো ক'রে হাসতে হাসতে মেজর বললেন, "নর্দামা দিয়ে যে ঢুকে পড়ব তারো জো নেই, হাতের কাছে যা পাওয়া গেছে তাই দিয়ে নর্দামাও বন্ধ—কোনোটাতে এক পাটি জুতা ঠেসে দেওয়া হয়েছে, আর কোনোটাতে বা স্নানের তোয়ালে গোঁজা।

হিন্দুস্থানী আয়া খিল্ খিল্ ক'রে হেসে বলল, "বুড্‌ঢী মেম্ সিধধড়, সে বহুৎ ডরতী হৈ। রাতমে শোতা ভি নেহি।"

বুড়ী বেচারি একপাশে চুপটি ক'রে আসামীর মতো দাঁড়িয়ে। হো হো ক'রে হাসছেন মেজর। তাঁর মুখে এক মুখ গোঁফ দাড়ি। পাহাড় চড়তে ব্যস্ত থাকায় দাড়ি কামাতে সময় পান নি। রমাকে কোলে ক'রে আছেন। রমার ছোট্ট হাতের মুঠিতে দেখলুম লাল রঙের এক গোছা দাড়ি গোঁফ। বাপের বুকে বসে সে ইতিমধ্যেই দাড়ি উপড়েছে।

কিন্তু মেজর-পত্নীর চোখমুখের ভাব দেখে তত সুবিধের মনে হল না। তিনি খুবই রেগেছেন।

বৃদ্ধা বললেন, "আইরীন্, তুমি একবার জজ্‌কে জিগেস করো, সাবধান হ'য়ে আমি কি অন্যায়টা করেছি? আমাকে সাবধানে থাকতে উনিই তো বলেছিলেন।"

কৃত্রিম কোপে আইরীন্ আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "বুঝেচি, এ সব আইডিয়া মাকে কে দিয়েছে বুঝেচি। খবরদার মা, খবরদার তুমি আর জজের কথায় চলবে না, ভাল হবে না বলছি।"

বৃদ্ধা মর্মাহত হয়ে বললেন, "গুড্‌নেস্! আইরীন্! কাঁটা তার আমাকে কেউ কিনতে বলে নি, আমি নিজেই কিনেছি। তুমি কেন মিছিমিছি ওঁকে দোষী করছ! তা ছাড়া, তুমি একজন জজের সম্বন্ধে সম্ভ্রম ক'রে কথা বলতে জান না! আমি দুঃখিত, ভয়ানক দুঃখিত।"

মেজর সাহেব ফোড়ন দিলেন, "সত্যিই তো আইরীন্, contempt of court,—হো হো হো হো, হি হি।"

মেজরের অট্টহাসিতে সহসা বাধা পড়ল। তিনি যন্ত্রণায় কাতরোক্তি ক'রে উঠলেন। রমা তার আর একটি ছোট্ট মুঠি দিয়ে বাপের আর এক গোছা দাড়ি গোঁফ উপড়েছে। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে রমা, দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক, মনে মনে আশীর্বাদ করলুম। বললুম, "আইনের মর্য্যাদা কেমন ক'রে রাখতে হয়, এই ছোট্ট মেয়েটি তার বুড়ো বাপকে তা শেখালো।"...

তারপর আর বিশেষ কোনো উপদ্রব হয় নি, বেশ নিশ্চিন্ত শান্তিতেই দিন কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মেজরের শাশুড়ী বলে বসলেন, কাছেই কোথায় নাকি একটা মস্ত মেলা বসেছে, তিনি ইণ্ডিয়ান মেলা কখনো দেখেন নি, দেখতে ভারি উৎসুক।

মেজর বললেন, "ওঃ সেই মেলা? সেখানে দেখবার কিই বা আছে, কেবল ধুলা আর ভিড়।"

তাঁর শাশুড়ী বললেন, "কত ভাগ্যের ফলে এই বুড়ো বয়সে আমি ইণ্ডিয়া আসতে পেরেছি, প্রাচ্যের 'হোলি ল্যাণ্ড' এই ইণ্ডিয়া। আর আমি ইণ্ডিয়ার একটা মেলা না দেখে বাড়ী ফিরব! সে কিছুতেই হতে পারে না!"

সুতরাং ঠিক হল সবাই মিলে মেলা দেখতে যাওয়া হবে। আইরীণ, আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "খবরদার, মা'কে যেন আবার কোনো 'আইডিয়া' না দেওয়া হয়।"

কাঁচা রাস্তায় প্রচুর ধুলা উড়িয়ে আমাদের মোটর মেলায় এসে

পৌঁছাল। মেজর ঠিকই বলেছিলেন, কেবল ধুলা আর ভিড়। হাঁড়ী কলসী থেকে আরম্ভ ক'রে কুলো ধুচুনি কাস্তে বঁটি খ্যাংরা, শিল নোড়া, মায় ঢেঁকি শুদ্ধ বিক্রী করতে এনেছে।

কিন্তু আমাদের অতি-অভ্যস্ত চোখে এসব জিনিষ অকিঞ্চিৎকর হলেও বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার মনে এক অভূতপূর্ব ভাবোদয় লক্ষ্য করলাম। তিনি যা দেখেন তাইতেই একেবারে ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। কুলো হাতে নিয়ে হাওয়া করতে করতে বলেন, "গুড্‌নেস্! হাউ লাভ্‌লি!" খেলো হুঁকার সাদরে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, "হুকা? আহা, একেই বুঝি হুকা বলে? হাউ কোয়েণ্ট্!" ঢেঁকি দেখে তো বিস্ময়ে মিনিট পাঁচেক তাঁর কথাই সরে না, শেষে বলেন, "A beauty! What you call it?—চেন্-কি!"

তাঁর মনোগত ইচ্ছে ঐগুলো সবই কিনে ফেলেন, মায় হুঁকা শুদ্ধ, কিন্তু মেয়ে আইরীনের উদ্ধত শাসনের সাম্‌নে মুখ ফুটে আর সে ইচ্ছে প্রকাশ করতে পারলেন না। নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরে এলেন। আর বললেন, আজ তিনি একটি যথার্থ ইণ্ডিয়ান মেলা দেখলেন। দেশে ফিরে যেয়ে যখন এর বর্ণনা করবেন তাঁর পাড়াপড়শীর কাছে, সবাই কম আশ্চর্য্য হবে না। আহা, জিনিষগুলি সব কি "লাভ্‌লি," কি "কোয়েণ্ট্"!—একটাও কেনা হল না ব'লে ফোঁস্ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন দুঃখে।

আইরীন্ বললেন, "মা, তুমি দেশে ফিরে গিয়ে একটি walking menace—চলন্ত আতঙ্ক হ'য়ে দাঁড়াবে, সেটা বেশ বুঝতে পারছি। যাকেই পাকড়াও করবে তাকেই তোমার ইণ্ডিয়া-ভ্রমণের কাহিনী শোনাবে, ফলে তোমার পঞ্চাশ হাত তফাত্ দিয়েও লোক হাঁটবে না!"

মা বললেন, "হ্যাঃ, walking menace! তাই নাকি! কী যে বলো তুমি আইরীন্!"

আমি লক্ষ্য করেছি, এঁদের মা-মেয়েতে এমন একটা সংস্কারমুক্ত সুন্দর সহজ সম্পর্ক—মেয়ে যেন মা হয়েছেন, আর মা হয়েছেন মেয়ে। ছোট্ট শিশুটির মতো মা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছেন যা দেখছেন তাইতে, আর মেয়ে মাকে কেবলি সাবধান করে দিচ্ছেন, "ছিঃ, অমন করতে নেই, ছিঃ!"

আমি সম্পূর্ণ বাইরের লোক, এঁদের পরিবারের এই আনন্দের মাঝে আমারও একটা ভাগ আছে, পর বলে এঁরা আমাকে বাইরে বসিয়ে রাখেন নি।

দিন দুয়েক বাদে বৃদ্ধা আমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনি যদি দয়া ক'রে আমার একটি উপকার ক'রে দেন—"

আমি মনে মনে প্রমাদ গণলাম। সেই শেয়ালের কথা তখনো ভুলি নি। তবু মনের ভাব গোপন রেখে জিগেস করলুম—"কি করতে হবে বলুন।"

বৃদ্ধা বললেন, "আমার এমন খারাপ স্মৃতিশক্তি, সেই সব 'লাভ্‌লি' আর 'কোয়েণ্ট্' জিনিষগুলির একটি ফর্দ ক'রে দেন।"

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিগেস করলুম, "ফর্দ নিয়ে কি করবেন? কিনবেন না নিশ্চয়ই?"

বৃদ্ধা ছোট্ট মেয়েটির মতো লজ্জিত অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন, "হ্যাঁ, কিনবোই তো। কেন কিনবো না? নিশ্চয়ই কিনবো।"

আমি বললুম, "ম্যাডাম, তবেই সেরেছেন। মাফ করবেন, আমি আর ওসবের মধ্যে নেই। আপনার মাথায় অনিষ্টকর আইডিয়া দিয়েছি ব'লে এর আগেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছে।"

বৃদ্ধা বললেন, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত। ভারি অন্যায় আইরীনের।" তারপর ঘাড় হেলিয়ে দৃঢ় ভঙ্গীতে বললেন, "কিন্তু জিনিষগুলি আমি কিনবোই কিনবো। ইণ্ডিয়াতে কি আমি রোজ আসছি? যে এবার না হয় আসচে বার কিনবো? এইবারই কিনবো, আজই কিনবো। আহা কী চমৎকার সব জিনিষ, বিশেষতঃ সেই যে সুন্দর ধানকোটা কল, কি যে তার নাম, চেন-কো না কি—"

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললুম, "আরে সর্বনাশ, আপনি ঢেঁকিও কিনবেন?"

"কিনবো না তো কি! যা যা দেখেছি সব জিনিষ এক এক সেট্ কিনে নিয়ে যাবো। টমাস্ কুকের সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত করাই আছে, তারা প্যাক করে বিলেতে পাঠিয়ে দেবে। তারপর,...একবার ভাবুন দেখি, যখন আমার ড্রয়িংরুমে ঐ সব জিনিষ সাজিয়ে রাখব, ওই যে ভালো কি নাম, পেটে আসছে মুখে আসচে না,—কিউলো—"

"কুলো।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ কুলো, ড্যাল্—আহ্"

"ডালা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ডালা, ওই হুকা, ওই চেন্-কো—"

"ঢেঁকি।"

বৃদ্ধা বললেন, "দোহাই আপনার, একটা ফর্দ ক'রে দিন না আমাকে।"

আমি বললুম, "ম্যাডাম, আপনি আমাকে মহা ফ্যাঁসাদে ফেললেন। আপনার মেয়ে আইরীন্—"

ঝঙ্কার দিয়ে বৃদ্ধা বললেন, "কেন! আমি কি নাবালিকা নাকি! আইরীন আমার গার্জেন নাকি! আপনি জজ। আইরীনকে আবার আপনার কিসের ভয়?"

অগত্যা দিলাম একটা ফর্দ লিখে। ফর্দটা খুব দীর্ঘই হল, কোনো জিনিষটি আর বাদ গেল না।

জিগেস করলাম, "ফর্দ তো হল। কিন্তু কিনবেন কি ক'রে?"

বৃদ্ধা বললেন, "সে সব ঠিক আছে। একজন আর্দালি বলেছে টাকা পেলে সে সব জিনিষ কিনে আনতে পারবে।"

"কিন্তু আনবে কি ক'রে? বিশেষতঃ ঢেঁকি?"

বৃদ্ধা বললেন, "কেন? একটা বাস ভাড়া ক'রে তাইতে আনবে।"

মনে মনে ভাবলুম, সাবাস। এই মহীয়সী নারী না হয়ে যদি পুরুষ মানুষ হতেন তাহলে একটা লর্ড রবার্টস্ কি কিচ্‌নার না হ'য়ে ছাড়তেন

না। কিন্তু জন্মেছেন মেয়েমানুষ হয়ে, তারি ফলে দাঁড়িয়েছে স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।...

সেদিনকার বিকেল বেলার ঘটনার আর বিস্তারিত বিবরণ দেবার প্রয়োজন হবে না। টেনিস্-র‍্যাকেটখানা হাতে ক'রে মেজর সাহেবকে ডাকতে গেছি, এমন সময় ঘড়ঘড় করতে করতে একখানা বাস এসে থামল। কুলো, ডালা, হাতা, বেড়ি, খন্তি, ঝাঁটা, হুঁকা, বঁটি কাস্তে, কলকে, সরা, গোরুকে জাব্ দেবার গামলা—কিছু আর বাদ যায় নি। বাসের ছাদের চড়ে ঢেঁকিও এসেছে। সব বিলেত যাবে।

মেজরের শাশুড়ি জিনিষগুলি দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে বলে উঠলেন, "আহা, কি ভালই হল! চমৎকার হল! মিসেস্ ট্রিগেল, মিসেস্ হোম্‌স্, লেডী ডায়েনা, অনারেবল মিস্ জনসন্—এঁরা সবাই এ জিনিষগুলি দেখে কী আশ্চর্য্যই না হবেন!"

আমি আর অপেক্ষা না ক'রে বুদ্ধিমানের মতো সরে পড়লুম। জেরার চোটে যখন বেরিয়ে পড়বে যে ফর্দটি আমিই দিয়েছি, তখন নাস্তানাবুদ হবার অপেক্ষা না রেখে স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।...

মা-মেয়েতে ভীষণ তর্কাতর্কি হল, কিন্তু অবশেষে মায়েরই হল জিত্। আমার বারান্দা থেকে দেখলুম কুকের লোক এল ঢেঁকি ইত্যাদি প্যাক্ করতে। অবশেষে ঢেঁকি এবার সত্যি সত্যিই সশরীরে বিলেত চলল।...

ছোট খুঁটি-নাটি ঘটনা অনেকগুলা এইখানে বাদ দেওয়া যাক, নতুবা পুঁথি বড় হবে।

অবশেষে এল বৃদ্ধা ম্যাডামের ফিরে যাবার দিন।

রমা তাঁর হৃদয়ের প্রায় সবটাই দখল ক'রে বসেছিল, তাকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবে দিদিমার কদিন ধরে চোখের জলের আর বিরাম ছিল না। মেজর-দম্পতী তাঁকে বোঝাচ্ছিলেন, ভাবনা কি, বছরখানেক পরেই তাঁরা ছুটি নিয়ে বিলেত যাবেন, তখন আবার দেখা হবে। আমি তামাসা করে বলেছিলুম, আমিও গিয়ে তাঁর ড্রয়িংরুমের ঢেঁকি কুলো ডালাগুলি পরিদর্শন ক'রে আসব।

মেজর অবিশ্যি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তবে ছুটি নিয়ে তাঁকে যেতে হয় নি, যেতে হয়েছিল কর্ত্তব্যের আহ্বানে।...হাসপাতাল থেকে খবর দিয়েছিলেন কামানের গোলায় তাঁর একখানি পা উড়ে গেছে, তবে প্রাণে বেঁচে আছেন। তারপর অনেক লিখেও তাঁর খবর পাই নি। হয় তো আর প্রাণে বেঁচে নেই। ড্রয়িংরুমেরও সদ্গতি হয়েছে, ঢেঁকি কুলো ডালা সব বোমায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।...কিন্তু এ সব খবর নাই বা দিলাম। যা বলছিলাম তাই বলি।

কলকাতার মেল ভোরবেলা আসে। আমি স্বেচ্ছায় ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার ভার নিয়েছি।

বৃদ্ধা মাতামহী রমার ললাটে শেষ চুম্বন রেখে চোখ মুছতে মুছতে মোটরে এসে উঠলেন। আমরা আগেই উঠেছিলাম। গাড়ী নিদ্রিত রাজপথ দিয়ে ষ্টেশনে এসে পৌঁছাল।

ট্রেণের একটু দেরি ছিল। মেজর টিকিট করতে গেলেন, আমরাও সবাই নেমে পড়ে প্ল্যাটফর্মে ইতস্ততঃ পায়চারি করতে লাগলাম।

আমরা গৃহবাসী জাতি, সুদীর্ঘ দিন আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে থাকবার দুর্ভাগ্য হতে আমরা বেঁচেছি। তাই ভেবেই পাই না, কেমন ক'রে এই ইংরেজরা এ দুর্ভাগ্য সহ্য করেন, আর কিই বা পান তার বিনিময়ে। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পঁচিশ ত্রিশটা বছর—মাত্র পাঁচ ছয়বারের ছুটি ছাড়া—গৃহ হতে সহস্র যোজন দূরে অনাত্মীয় অপরিচিত বিদেশীদের মাঝে অনভ্যস্ত এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় কেমন ক'রেই কাটান! নিজের দিয়েই বুঝতে পারি দুঃখ কষ্ট খুবই হয়—তবে সে দুঃখ কষ্টকে এঁরা সহ্য করেন, সে কি সাম্রাজ্যের মোহে? ইংরেজ জাতির সমবেত দুঃখ কষ্ট বিরহ-বেদনার বলিদানের ওপরই হয়ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। সুদীর্ঘ বিরহের দ্বারা এ জাতির হৃদয় ক্ষয় হয়ে গেছে, দেউলে হয়ে গেছে, এবং ক্ষমতাও সেই পরিমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হৃদয়ের বালাই না গেলে প্রভুত্ব করা যায় না যে! তাই, যে মুহূর্তে যান্ত্রিক উন্নতির ফলে লণ্ডন-দিল্লী মাত্র দুই রাত্রের ব্যবধানে এসে দাঁড়াল, সেই মুহূর্তেই কি সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে এল? কে জানে!

কিন্তু যাক্ গে এসব ভাবনা। বিদায় ক্ষণটি চিরদিনই বিষণ্ণ, করুণ।...

হঠাৎ প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্ত হ'তে মেজরের শাশুড়ী সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন। এম্নি চীৎকার শুনেছিলাম তাঁর আসার দিন, যেদিন তিনি শেয়ালের ডাক শুনে ভেবেছিলেন বিপ্লববাদীরা বিপ্লব বাঁধিয়েছে।

চীৎকারের পর চীৎকার, সে আর থামতে চায় না। আইরীন উদ্বিগ্ন হয়ে জিগেস করতে লাগলেন, "মাদার! মাদার! শান্ত হও! কী হয়েছে? অমন করছ কেন?"

অনেকখানি চীৎকার ক'রে হাঁফাতে হাঁফাতে বৃদ্ধা বললেন, "অমন করছি কি আর সাধে! তোমরা আমার কাছে কথাটা লুকিয়েছ! জানতে দাও নি। এত বড় সাঙ্ঘাতিক একটা মড়ক চলছে সহরে, হাজারে হাজারে লোক মরছে, আর সে কথাটা আমায় একবার জানালে না! এখন উপায়! আমার ডার্লিং রোমাকে আমি এই মহামারীর মধ্যে রেখে কেমন ক'রে যাই বল তো!"

বুড়ী বলে কি! মড়ক! মহামারী! আমরা তো নিজের কান-দুটাকে কেউ বিশ্বাস করতে পারলুম না। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে বুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আমাদের সে ভাব দেখে বৃদ্ধা বললেন, "তোমরা বলতে চাও কি মড়ক নেই? মহামারী নেই? মড়কই যদি না থাকবে সহরে, তাহলে এতগুলো মৃতদেহ আসে কোথা থেকে?"—এই বলে হাত নেড়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর শায়িত আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত কুলিদের দেখিয়ে দিলেন।

আমাদের উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ ডুবিয়ে দিয়ে ট্রেণ এসে পড়ল। বস্ত্রাবৃত কুলিরা—যাঁদের তিনি মৃতদেহ ভেবেছিলেন তারা ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।...

একটু তফাতেই দাঁড়িয়েছিলাম। চলন্ত ট্রেণের কামরা থেকে শোনা গেল বৃদ্ধার বিদায় বাণী—"গুড্ বাই অল।"

আমি এঁদের কেই বা? সংসারের চলন্ত রঙ্গমঞ্চে এমনি কত লোকই তো আসে আর চলে যায়, স্বদেশী, বিদেশী, পরিচিত, অপরিচিত। তবু এঁদের এই দুটি মাসের জীবনযাত্রার অনেকখানি আমার অজ্ঞাতে আমারি নিজস্ব হয়ে আছে, আমার অবিস্মরণীয় সম্পদ হয়ে আছে—এই কথার প্রমাণ দিল আমার চোখের দুই ফোঁটা অশ্রুজল।

বনফুল

১

প্রথমেই জেনে রাখা ভাল যে কাহিনীটি বিবৃত করতে উদ্যত হয়েছি তার স্থানকাল পাত্রপাত্রী সমস্তই কাল্পনিক। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক কোন রকম ফাঁদে পা দেবার ইচ্ছে নেই। স্থান অবশ্য আমাদেরই দেশ, কালও বর্ত্তমান—হোটেল, মোটর, ফোন, রেডিও, রেলগাড়ি, সবই আছে—পাত্র-পাত্রীও বাঙালী। তরুণ-তরুণী, সেকেলে, দুই-কালের-সীমা-রেখায়-দণ্ডায়মান সব রকম ব্যক্তিই আছেন।

সুশোভন গল্পের নায়ক। সার্থক-নামা ব্যক্তি। কোথাও কখনও অশোভন হয় নি। কান্তি অনিন্দ্য, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সও অনিন্দ্য। ভবিষ্যতও নিন্দনীয় নয়। কারণ বাপ মা ভাই বোন প্রভৃতি কোনও রকম ঝামেলা নেই। মাত্র কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় স-সম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে; একটি সুনির্ব্বাচিত সুহৃদ-গোষ্ঠী আছে। চাকরি কিম্বা ব্যবসা করে' অর্থোপার্জ্জন করবার প্রয়োজন হয় না। এ অবস্থায় সুতরাং যা অনিবার্য্য তাই তিনি হয়েছিলেন—'কমরেড্'। সুদের টাকা উপভোগ করতে করতে ক্যাপিটালিজ্‌মের নিন্দে করে' তিনি অবসর এবং চিত্ত-বিনোদন করতেন। কমরেড বান্ধবীও জুটেছিল কয়েকটি। বিয়ের সামাজিক বাজার মন্দা আজকাল। বুদ্ধিমতী বাঙালী মেয়েরা রাজনৈতিক বাজারে ভীড় করেছেন সুতরাং। তর্ক, গান, গল্প, গুজব, থিয়েটার, সিনেমা, সাহিত্য, দেশোদ্ধার প্রভৃতি নিয়ে সুশোভনের দিন ভালই কাটছিল। এমন সময় হঠাৎ—ঠিক হঠাৎ না—কমরেড অনীতার সঙ্গে আলাপ অনেক দিন আগেই হয়েছিল—তবে অভিনব অনুভূতিটা হঠাৎই উথলে উঠল একদিন এবং শেষ পর্য্যন্ত সামলানো গেল না। বিয়েই করতে হল। অনীতার মা শ্রীযুক্তা স্বয়ম্প্রভা সরকারের ঘোর আপত্তি ছিল বিয়েতে। কিন্তু উভয়েই যখন কমরেড, তখন আটকাল না কিছু।

শ্রীযুক্তা স্বয়ম্প্রভা সরকারকে বরবর্ণিনী বললে ব্যাকরণ ভুল তো হবেই না, অত্যুক্তিও হবে না। কিন্তু একটু বিস্তৃততর পরিচয় না দিলে সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা তাঁর স্বরূপটি ঠিক ধরতে পারবেন না হয়তো। আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান না হলেও স্বয়ম্প্রভা সরকার সত্যিই অসাধারণ মহিলা। ঘাড়ে-গর্দ্দানে বেঁটে মোটা বলিষ্ঠ-চোয়াল, ছোট-চুল, ঘন-ভুরু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি যে রমণীটি বর্ত্তমানে পাড়ার সকলের অন্তরে অবিমিশ্র ভীতি ছাড়া অন্য কোন ভাব উৎপাদন করতে ইচ্ছুক নন তিনিই যে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কুমারী স্বয়ম্প্রভা মিত্র ছিলেন এবং বেণী দুলিয়ে জিতু সরকারের হৃদয়-হরণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন তা অকুণ্ঠিত-চিত্তে না পারলেও জিতু সরকারকে স্বীকার করতে হবে বই কি। স্বয়ম্প্রভা মিত্রের বাবা যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন—তখন তা নিয়ে খুবই হৈ চৈ হয়েছিল, কিন্তু তার কিছুদিন পরেই যখন তাঁর মাইনার-পাশ আলোক-প্রাপ্ত দুহিতাটি গোঁড়া হিন্দু পরিবারের নিরীহ যুবক জিতেন্দ্রনাথকে কবলস্থ করলেন তখন যে আন্দোলন, হট্টগোল, দলাদলি চীৎকার প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছিল সংযুক্তা-পৃথ্বীরাজ সম্পর্কেও ঠিক ততটা হয়েছিল

কিনা সন্দেহ। বলা বাহুল্য জিতেন্দ্রনাথের বাবা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। পিতৃবিত্ত বঞ্চিত জিতেন্দ্রনাথ স্বকীয় পুরুষকার বলে কি করে' অকুল সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পেরে-ছিলেন তা' এ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রসঙ্গত একটি কথা শুধু বলা যেতে পারে। যে আলোক-প্রাপ্ত সমাজে স্থান পাবেন আশা করে' স্বয়ম্প্রভা বেণী ডুলিয়েছিলেন এবং জিতু সরকার সমাজ ত্যাগ করেছিলেন সে আলোক-প্রাপ্ত সমাজে তাঁরা ঢুকতেই পারেন নি। কারণ প্রথম জীবনে সে সমাজে ঢোকবার চাবিই সংগ্রহ করতে পারেন নি তাঁরা। জিতু সরকার টাকা রোজগার করেছিলেন শেষ বয়সে। সুতরাং প্রায় সারাজীবন স্বয়ম্প্রভাকে রূপকথা-বর্ণিত আঙুর-লুব্ধ শৃগালের ভূমিকায় অভিনয় করে' যেতে হয়েছে। এবং তার ফলে যা হয়েছে তা মনস্তাত্বিকদের মর্ম্মরোচক হলেও জিতু সরকারের পক্ষে মর্ম্মান্তিক। অনীতা এবং সুশোভনের পক্ষেও তা সুখকর হয় নি।

আর একটি ব্রাহ্ম দম্পতীও এই কাহিনাটিকে অলঙ্কৃত করেছেন। তাঁদেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় আগে থাকতে জেনে রাখা ভাল। শ্রীযুক্ত দিগ্বিজয় সিংহরায় অভিজাতবংশীয় জমিদার। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমবয়সী না হলেও সমসাময়িক ছিলেন। এখনকার শিক্ষিত সমাজে আধুনিক হতে হলে যেমন "কমরেড" হতে হয় তখনকার শিক্ষিত সমাজে তেমনি ব্রাহ্ম হতে হত। মদ খাওয়াটাও আধুনিকতার আর একটা লক্ষণ ছিল। দিগ্বিজয়ের পিতা জগদ্বিজয় নিজের ইয়ার-বক্শি মহলে ছিলেন অত্যাধুনিক। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মও হয়েছিলেন, মদও খেতেন। তাঁর কীর্ত্তিকলাপ তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই এখন গতাসু হয়েছেন, সে কীর্ত্তিকাহিনীও এখন অবলুপ্ত-প্রায়। তবু এখনও কিছু কিছু শোনা যায় মাঝে মাঝে। তিনি যেদিন বাগান বাড়ি করতেন সেদিন না কি—থাক্, সে সব কথা অবান্তর এ গল্পের পক্ষে। বাধ্য পুত্রের মতো দিগ্বিজয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন কিছুদিন। কিন্তু পারলেন না। তিনি ছিলেন অন্য চরিত্রের লোক। হাল্লা হুল্লোড় বরদাস্তই করতে পারতেন না। কোলকাতা সহরের কোলাহলই অতিষ্ট করে' তুলল তাঁকে শেষ পর্য্যন্ত। বিশেষতঃ যখন অলি গলিতে ট্যাক্সির দৌরাত্ম্য সুরু হল তখন তিনি পত্নী সুরেশ্বরীকে নিয়ে সরে' পড়লেন দেহাতে নিজেদের জমিদারিতে। কোলকাতায় কচিৎ আসতেন। খবরের কাগজের মারফত কোলকাতার যে সব খবর পেতেন তাতে আসবার প্রবৃত্তিও আর হত না। সুরেশ্বরী দেবীও অভিজাত-বংশীয় আলোক-প্রাপ্ত মহিলা। তবে আলোকটা সেকেলে আলোক। হাব-ভাব-পোষাকে তখনকার দিনের ঠাকুর বাড়ির মেয়েরাই তাঁর আদর্শ ছিল। হঠাৎ দেখলে স্বর্ণলতা দেবী বলে' ভুল হত। এই নিঃসন্তান দম্পতী পরস্পরকে নিয়ে দেহাতে নিজেদের জমিদারীতে সুখেই থাকতেন। এক-ঘেয়ে সুখও বেশী দিন ভাল লাগে না। সুরেশ্বরীর আগ্রহাতিশয্যে দিগ্বিজয়কে তাই বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ-স্থাপন করতে হত মাঝে মাঝে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করতেন সুযোগ পেলেই। দিগ্বিজয় মোটরকার পছন্দ করতেন না, কিন্তু সুরে-শ্বরীর জন্যে কিনতে হয়েছিল একটা। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে সেটা চড়ে শাল গায়ে দিয়ে বেরুতেনও তিনি মাঝে মাঝে। কিন্তু তা কদাচিৎ।

আর একটি অসাধারণ ব্যক্তির পরিচয়ও আগে থাকতে করা উচিত। স্বয়ম্প্রভা দেবীর দূর সম্পর্কের আত্মীয় সদারঙ্গ বিহারীলালের নামটি শুধু নয় প্রকৃতিও অসাধারণ। বিবাহ করেন নি ভদ্রলোক। তিন কুলে কেউ নেইও। সামান্য কিছু জমি জমা আছে, তার থেকেই গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায়। গ্রাসাচ্ছাদনের বেশী ইনি কামনাও করেন না কিছু। অত্যুৎসাহী আদর্শবাদী এই লোকটি পরোপকারকেই জীবনের ব্রত বলে' গ্রহণ করেছেন। বাড়িতে স্থবিরা পাঁচির মা এবং রাস্তায় ভাঙা একটি মোটর বাইক এঁর ভার বহন করে। আহোরাত্র ইনি পরোপকার করে' বেড়ান। কারণ অকারণ সুযোগ দুর্য্যোগ ভালমন্দ উচ্চ-নীচ কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেন না ইনি। সকলেই এঁর পরিচিত, সকলের সঙ্গেই আত্মীয়তা, সকলের উপকার করবার জন্যে ইনি সর্ব্বদা প্রস্তুত। কোন বাছ বিচার নেই। মাঝে মাঝে জটিলতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সদারঙ্গ-বিহারীলাল অকুতোভয় অদম্য ব্যক্তি, তাঁর গতি-রোধ করবার সাধ্য তাঁর নিজেরই নেই বোধ হয়, অন্যে পরে কা কথা।

২

সুশোভনের যা স্বভাব, চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল সেদিকে খেয়াল নেই, সদ্য-আগত ডাক নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। অনীতারও চিঠি এসেছিল একখানা। মায়ের চিঠি। স্বয়ম্প্রভা দেবীর মেজাজে আর যা-ই থাক, রসোচ্ছলতা নেই। চিঠিতে তিনি যে ধরণের কাটা কাটা ভাষা ব্যবহার করেন তাতে কারও চিত্ত প্রফুল্লিত হয় না। অনীতার হচ্ছিল না। সুশোভন একখানা খামের চিঠি খুলে পড়ছিল, আর হাসছিল মুচকি মুচকি।

"কার চিঠি ওটা"

"দিগ্বিজয় সিংহরায়ের"

"সে আবার কে"

"রায় বাহাদুর দিগ্বিজয় সিংহরায়"

"সিংহ রায়? বিয়ের সময় একজন সিংহ রায় আমাকে ঝকমকে বেনারসী সাড়ি দিয়েছিল একখানা। তাঁরাই না কি?" সুশোভন পড়তে পড়তে জবাব দিলে—"হ্যাঁ, তাঁরাই"

"খুব বড় লোক, নয়?"

"হ্যাঁ, কিন্তু কি মুসকিল, ছি ছি—। ঠিক এই সময় মোটরটা বিগড়ে বসে' আছে"

"কেন, কি লিখেছেন"

"নিমন্ত্রণ করেছেন"

"হঠাৎ?"

"কি জানি। এই শোন না"

সুশোভন পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়েষু,—

তোমার পিতার সহিত আমাদের এত আত্মীয়তা ছিল অথচ তোমার সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তোমাকে সেই একবার ছেলে বেলায় দেখিয়াছিলাম। তোমার বিবাহে আমরা সস্ত্রীক যাইব মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার কাকীমাতার গ্রন্থি-বাত প্রবল হওয়াতে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। আমাদের মতো মফঃস্বলবাসী ব্যক্তিদের পক্ষে কলিকাতা যাওয়াই বিপদ। পথে অজস্র ভীড়, তাহার উপর গাড়ি ঘোড়া ট্রাম ট্যাক্সি চীৎকার গোলমালে খেহি হারাইয়া যায়। খেহি—Sic—"

"খেহি সিক্ মানে?"

"মানে খেহিই লিখেছেন। ভদ্রলোকের ধারণা বোধ হয় খেই শব্দের শুদ্ধ হচ্ছে 'খেহি'। বেচারা! শোন তারপর—।

'তোমার বিবাহের পর তোমাকে নিমন্ত্রণ করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এমন বর্ষা নামিল যে ফাঁক পাইলাম না। এখন শীত পড়িয়াছে, পথ ঘাট শুকাইয়াছে। শিকার করিবার জন্য দুই একজনকে আসিতে বলিয়াছি। তুমিও যদি বধূমাতাকে লইয়া আসিতে পার সুখী হইব। শুনিয়াছি বধূমাতা একজন আধুনিকা। যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহারাও হাল-ফ্যাশানের, কোনও অসুবিধা হইবে না। আগামী বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৮ই মাঘ শিকার পার্টির আয়োজন করিয়াছি। শুনিয়াছি তুমি একজন ভাল শিকারী। তোমার বাবাও খুব ভাল শিকার করিতেন। যদি আসিতে পার আমরা খুবই আনন্দিত হইব। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ লও। ইতি আশীর্ব্বাদক শ্রীদিগ্বিজয় সিংহরায়।"

অনীতা 'কমরেড' হলেও মনে মনে রায়বাহাদুর জাতীয় লোকদের সম্বন্ধে তার কিঞ্চিৎ সম্ভ্রমই ছিল। মুখে সে যতই শ্রমিকদের দুঃখে বিগলিত হোক, বেনারসী শাড়িখানার ঝলকে সেদিন তার চোখ ঝলসে গিয়েছিল। যে রায়বাহাদুর সেই শাড়ি তাকে দিতে পারেন তাঁকে ক্যাপিটালিস্ট বলে' তাচ্ছিল্য করবার মতো মনের জোর তার নেই—মুখে যতই সে সাম্যবাদ নিয়ে আস্ফালন করুক।

"বেশ তো, চল না যাওয়া যাক, কতদূর এখান থেকে"

"প্রায় দেড়শ' মাইল"

"হাসছ যে'

"খেহিটা ভুলতে পারছি না"

সুশোভন হো হো করে' হেসে উঠল।

"একে গ্রন্থি-বাত—তার উপর খেহি! যেতেই হবে সেখানে। কিন্তু গাড়ি যে গারাজে, ব্যাটারা বলেছে একমাসের আগে হবে না। কি মুশকিল বল তো"

"মোটর নিয়ে যাবে! ট্রেণে যাওয়া যায় না?"

"যায়। কিন্তু তার চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভাল। একে প্যাসেঞ্জার গাড়ি, তার উপর চেঞ্জ আছে। অবশ্য ট্যাক্সি একটা নেওয়া যেতে পারে অনায়াসে"

"দেড়শ' মাইল ট্যাক্সি করে' যাবে।"

অনীতা বিস্ফারিত চক্ষে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সুশোভনের দিকে। বলে কি লোকটা! সে ট্রামে বাসে ঝুলে ঝুলে শিক্ষয়িত্রীগিরি করে' কাটিয়েছে কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত। এ ধরণের অমিতব্যয়িতা তার কল্পনাতীত।

"ট্রেণে টিকিস্ টিকিস্ করে যাওয়ার চাইতে—"

"বেশ তাই যেও। চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে খেয়ে নাও আগে"

চেয়ার ঠেলে অনীতা উঠে দাঁড়াল। ট্যাক্সিতে ধাবমান সুশোভনের কিছুদিন আগেকার একটা চিত্র চকিতে ফুটে উঠল মানসপটে। লিলুয়ায় একটা শ্রমিক সভায় যাচ্ছিল সবাই। সুশোভনের একপাশে ছিল কমরেড মণিকা, আর এক পাশে সে নিজে। সেদিন সুশোভনের সঙ্গে মণিকার প্রগলভ আলাপ—কমিউনিজম নিয়েই আলাপ—সর্ব্বাঙ্গে তার জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল যেন। রাত্রে বাড়ি ফিরে এসে কেঁদেছিল সে।

ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে অনীতার দিকে আড়চোখে চেয়ে সুশোভন বললে—"তুমি যাবে না? দিগ্বিজয় নাম শুনে ভয় পেও না, শুনেছি লিক-লিকে রোগা লোকটা—"

অনীতা কোন উত্তর না দিয়ে আর এক পেয়ালা চা ঢালতে লাগল টি-পট থেকে। ভয় যে তার হয় নি তা নয়, কিন্তু তার কারণ দিগ্বিজয় নামটা নয়। অন্য আর এক কারণে এই রায়বাহাদুর জমিদারের নিমন্ত্রণ তাকে যুগপৎ প্রলুব্ধ ও ভীত করে' তুলেছিল। যাঁর কোলকাতা শহরে পদে পদে 'খেই' হারিয়ে যায় তাঁর চোখের সামনে সর্ব্বদা নিজেকে প্রকট রেখে সম্ভাব্য সমালোচনার খোরাক জোগানো একটু ভীতিকর তো বটেই। আধুনিক যুগের আপটুডেট্ 'কমরেড' হলেও সমালোচনা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অর্জ্জন করতে পারেনি সে এখনও। অথচ যেতে লোভও হচ্ছিল বেশ। হঠাৎ তার মনে হল কিসের এত ভয়। যত বড় লোকই হোক, অসঙ্কোচে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে সে। শাড়ি সেমিজ সায়া ব্লাউস কি তার নেই। রূপও আছে যৎকিঞ্চিৎ। বুদ্ধিও। মা যদি শোনেন যে অত বড় একটা রায়বাহাদুর জমিদার নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে গেছেন খুশিই হবেন।

"দু'জনেই যাই চল, বুঝলে—"

"বেশ চল, ছাড়বে না যখন। ট্রেণে যাব কিন্তু।"

"ওই অতগুলো চেঞ্জ করে'! খানিকটা বাসেও যেতে হয় শুনেছি—"

অনীতা কোন উত্তর না দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। সুশোভন বুঝলে ট্রেণেই যেতে হবে।

মাত্র তিনমাস বিয়ে হয়েছে তার। এর মধ্যেই "প্রেমের নিগড়" "প্রেমের ফাঁস" "প্রেমের ফাঁদ" প্রভৃতি প্রচলিত বাক্যগুলির রূপক-বর্জ্জিত প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হচ্ছে তাকে বার বার। প্রেমে পড়ে' অনীতাকে বিয়ে করে' সে যে ভুল করেছে, একথা কারও কাছে স্বীকার করে নি সে—এমন কি নিজের কাছেও না। কিন্তু কেমন যেন প্রতিপদেই খটকা লাগছে। তার যা ভাল লাগে অনীতার ঠিক তাতেই যেন আপত্তি। বাধা-হীন স্বাধীনতা-চর্চ্চার সুযোগ আছে বলেই সে কমিউনিষ্ট, অনীতাও সেই জাতের লোক এই তার ধারণা ছিল। কিন্তু বিয়ের পর দেখা যাচ্ছে অনীতার ভাবগতিক ঘোরতর ইম্পিরিয়ালিষ্টিক গোছের! একাধিপত্য চায়! সুশোভনকে সর্ব্বপ্রকারে নিজের শাসনাধীন রাখাই তার একমাত্র লক্ষ্য। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে তার শাসনাধীন থাকতে মন্দ লাগে না! বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু তা পুনরায় শাসিত হয়ে আনন্দলাভের জন্য। ভারী আশ্চর্য কাণ্ড! একদিন কিন্তু সত্যিই দুঃখ হয়েছিল তার। যে অনীতার আর্টের প্রতি এত অনুরাগ তার কাছে, এ ব্যবহার মোটেই প্রত্যাশা করে নি সে।

সেদিন ধীরেনের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ। বিয়ের পর বন্ধুরা তাকে একরকম ত্যাগ করেছে বললেই হয়। নাগালই পায় না। তবু আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় এখনও কেউ কেউ। নাগাল পেলেই ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যায়।

ধীরেন বললে—"তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। বিশু আজ নগেনকে চা খাওয়াচ্ছে প্লাজাতে"

"সত্যি?"

"তোকে নিয়ে যেতে বলেছে। চল"

সিনেমা-গগনের উদীয়মান জ্যোতিষ্কটিকে সামান্য একটু সজদান করে' অভিনন্দিত করা এমন কিছু নিন্দনীয় কাজ নয়। কিন্তু বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেল। ফিরেও জমল না।

"কোথা ছিলে এতক্ষণ ?"

সুশোভন সোচ্ছ্বাসে বর্ণনা করে গেল।

"নগেন আবার কে! যত সব বাজে লোকের সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালও লাগে তোমার—"

"নগেন মানে নগেন্দ্রমোহিনী। শ্রমিক থিয়েটারে 'ঝি'য়ের পার্টে প্রথম নাম করলে যে, মনে নেই ?"

অনীতার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

বাঁকা হাসি হেসে বললে, "তোমার যে নগেন্দ্রমোহিনীর সঙ্গে এত ভাব ছিল তাতো জানতুম না"

"কোন কালে ভাব ছিল না। আজই প্রথম আলাপ"

অনীতা স্মেলিং সল্টের শিশিটা বার দুই শুঁকে একটা অ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়ে ফেললে।

"সন্ধ্যে থেকে মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি—"

সুশোভন এটা প্রত্যাশা করে নি। এই অনীতাই বিয়ের আগে এই নগেন্দ্রমোহিনার সম্বন্ধে কি উচ্ছ্বাসই না প্রকাশ করেছিল! সেইদিন রাত্রেই প্রতিজ্ঞা করতে হল যে ওই জাতীয় স্ত্রীলোকের আর ছায়া মাড়াবে না সে। প্রতিজ্ঞা করবার পর কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের আনন্দও অনুভব করতে লাগল। আশ্চর্য্য! অনীতার মোহিনী-শক্তি প্রভুত্বশক্তিসহযোগে খাদসংযুক্ত সুবর্ণের মতো আরও বেশী যেন মুগ্ধ করে।

সত্যিই পরস্পরকে ভালবেসেছিল তারা। অনেকেই অনীতাকে বিয়ে করবার জন্যে সাধ্যসাধনা করেছিল। কিন্তু অনীতা এক সুশোভন ছাড়া আর কাউকে আমোল দেয় নি। সুশোভনকে সাধ্যসাধনাও করতে হয় নি বেশী। সুশোভনের প্রাগবিবাহ প্রণয়লীলাকে সংক্ষিপ্ত বললে কিছুই বলা হয় না। 'সংক্ষিপ্র' বললে তবু খানিকটা বোঝান যায়। স্বয়ম্প্রভা দেবীর অনিচ্ছা-ব্যূহ ভেদ করে' ঝড়ের বেগে অনীতাকে উড়িয়ে এনেছিল সুশোভন।

স্বয়ম্প্রভা সরকার তাঁর একমাত্র সন্তানটির জন্যে ঠিক কি জাতীয় রাজপুত্র যে কামনা করেছিলেন তা খুলে বলেন নি কাউকে কোনদিন। সুশোভন সোমও পাত্র হিসেবে নিন্দনীয় নয়। প্রথম প্রথম তার দামী মোটরখানা দেখে বিচলিতও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কিছুদিন মেলা-মেশার পর তিনি বুঝলেন সুশোভন 'আজকালকার' ছেলে। চটে গেলেন। কিন্তু অনীতাও আজকালকার মেয়ে এবং ওই মায়েরই মেয়ে। সে-ও জিদ ধরে' বসল সুশোভন ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। অনীতার বাবার যদিও বিশেষ কিছু কর্ত্তৃত্ব ছিল না মেয়ের উপর, কিন্তু যতটুকু ছিল তাও তিনি ব্যবহার করলেন না। অনীতারই জয় হল শেষ পর্য্যন্ত। জিতুবাবু মনে মনে খুশিই হলেন। যদিও বাইরে আনন্দ প্রকাশ করবার মতো বুকের পাটা ছিল না ভদ্র-লোকের। তাছাড়া জীবনে নানারকম ঘা খেয়ে এইটুকু তিনি সার বুঝেছিলেন যে অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। যা হবার তা হবেই। পাঁচজনের কাছে খামখা আনন্দ বা উত্তেজনা প্রকাশ করলে অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করা হয় মাত্র। কোন লাভ হয় না।

বাপ যখন ত্যাজ্যপুত্র করলেন তখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁকে বাল্যবন্ধু ইয়াসিন মিঞার শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। বড় বাজারের এক গলির মধ্যে ইয়াসিন মিঞার লোহা-লক্কড়ের ছোট একখানা দোকান ছিল। তাতেই ক্রমশঃ নিজেকে সংশ্লিষ্ট করলেন জিতুবাবু। ইয়াসিন বললে একদিন, তিনি আর আপত্তি করলেন না। কি হবে পাঁচ-জায়গায় ঘোরাঘুরি করে'। বিনা আয়াসে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই ভাল এ বাজারে। কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না, নীরবে লেগে রইলেন কেবল। স্বয়ম্প্রভা দেবী অবশ্য তাঁকে আলোক-প্রাপ্ত সমাজের উপযোগী ভদ্রতর একটা চাকরি নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতে কসুর করেন নি। সে সম্বন্ধে যে সব বাক্যাবলী তিনি ব্যবহার করেছিলেন তা সাধারণ-ধৈর্য্য-বিশিষ্ট যে কোন লোককে পাগল করে' দিত। কিন্তু জিতুবাবুর কিছু হয় নি। তিনি অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে লোহা-লক্কড়ের দোকানে লেগে রইলেন। আত্মরক্ষার দুটি উপায় তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সাধ্যপক্ষে বাড়ি আসতেন না এবং যখন আসতেন পারতপক্ষে স্বয়ম্প্রভার কোনও কথার প্রত্যুত্তর দিতেন না। শেষ বয়সে অদৃষ্ট হঠাৎ সুপ্রসন্ন হল তাঁর উপর। যুদ্ধ বাধল। লোহার দাম হু হু করে' বাড়তে লাগল। স্বয়ম্প্রভা তো ওৎ পেতে ছিলেনই অনীতাও দেখতে দেখতে নৃত্য-গীত-পটিয়সী 'কমরেড' হয়ে পড়ল। আলোক-প্রাপ্ত সমাজের যে দ্বার এতদিন রুদ্ধ ছিল তা হঠাৎ যেন খুলে গেল খানিকটা। তারপর এল সুশোভন। জিতুবাবু ইয়াসিন মিঞাকে যেমন মেনে নিয়েছিলেন

সুশোভনকেও তেমনি মেনে নিলেন। সুশোভনের ডিগ্রি চেহারা মোটর কোলকাতার বাড়ি প্রভৃতি দেখে স্বয়ম্প্রভাও পুলকিত হয়েছিলেন প্রথমটা। যে সভ্য সমাজে তিনি মিশতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেশবার সুযোগ পান নি, সুশোভনের হাতে সেই কাম্যলোকে ঢোকবার চাবিকাঠিটি দেখে বড় আশায় আশান্বিত হয়েছিলেন তিনি! সুশোভনের মোটর আছে, পয়সা আছে, অনেক বড় বড় পরিবারের সঙ্গে হৃদ্যতাও আছে। ইচ্ছে করলে অনায়াসে পারত সে। কিন্তু কিছুতেই নিয়ে গেল না তাঁকে। সাজিয়ে গুছিয়ে অনীতাকে নিয়ে গেল বারবার, তাঁকে একবার ডাকলেও না। আর না ডাকলে নিজে সেধে তার মোটরে যাবেনই বা কেন তিনি। সুশোভনের না নিয়ে যাবার সঙ্গত কারণ ছিল একটা অবশ্য। সুশোভনের পরিচিত মহলের কেউ প্রত্যাশাই করতে পারে নি যে সুশোভনের মতো ছেলে জিতু সরকারের মেয়েকে বিয়ে করে বসবে। অনীতা যে স্ত্রী-রত্ন তাতে কারও সন্দেহ ছিল না কিন্তু একালে দুষ্কুলাদপি তা আহরণ করাটা সভ্য-সমাজে সুরুচিসঙ্গত নয়—অন্তত সুশোভন যে সমাজে ঘোরা-ফেরা করে সে সমাজে নয়—সকলেরই মানসিক নাসা ঈষৎ কুঞ্চিত হয়েছিল। সুশোভন তাই নানা কৌশলে স্বয়ম্প্রভা দেবীকে এড়িয়ে চলত। স্বয়ম্প্রভাও বেশ বুঝতে পারলেন সুশোভন তাকে এড়িয়ে চলছে। ক্রমশঃ তাঁর সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে' উঠল। এতদিন যা তিনি সন্দেহ করতেন ক্রমশঃ তা বিশ্বাস করতে লাগলেন। স্বার্থপর ছোটলোক চরিত্রহীন সব! ওদের পার্টি সিনেমা, সভা সমিতি সম্মিলন সব যথেচ্ছাচারের নামান্তর মাত্র। কোন ভদ্র মহিলাকে তাই নিয়ে যেতে সাহস করে না ওরা। কোনও ভদ্রমহিলার যাওয়াও উচিত নয় ওদের সঙ্গে। জিতুবাবুকে এসব কথা বললেনও একদিন তিনি সালঙ্কারে। জিতুবাবু টুঁ শব্দটি করলেন না। চুপ করে' রইলেন। জিতুবাবুকে কিন্তু সুশোভন নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে গিয়েছিল একদিন। নিমন্ত্রণ সেরে রাত্রে ফিরে এসে জিতুবাবু এমন অস্বাভাবিক রকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে লাগলেন যে স্বয়ম্প্রভার কেমন যেন সন্দেহ হল। খানিকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করে' চেয়ে রইলেন। লোহার দালাল এই নিরীহ ভদ্রলোকটিকে এত উচ্ছ্বসিত হতে তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখেছেন বলে মনে পড়ল না। মদটদ খাইয়ে দেয় নি তো! সব পারে ওরা। সুশোভনের উপর রাগ আরও বেড়ে গেল। কিন্তু কন্যারও অনুরাগ বাড়ছিল এবং সে 'কমরেড', সুতরাং বিয়ে আটকাল না।

৩

গার্ড হুইস্‌ল্ দিয়ে সবুজ নিশান নাড়তে লাগলেন।

"উঠে এসে বস না। কি যে তোমাদের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা ফ্যাসান। ট্রেণ ছাড়ছে যে—"

প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে গলা বাড়িয়ে অনীতা বললে।

"এই যে যাচ্ছি"

বেশ কায়দা করে' সিগারেটটি ধরিয়ে দেশলাই কাঠিটি নেড়ে নেড়ে নিবিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে হাসিমুখে চেয়ে রইল সুশোভন। কমরেড অনীতার এই ভীতু-ভাবটা বেশ উপভোগ করছিল সে। আর একবার হুইস্‌ল্ পড়ল। গার্ডের দিকে চাইতে গিয়েই কিন্তু অঘটন ঘটে গেল।

"আরে—আরে—আহা—এ কি—"

ছুটল সুশোভন সেদিকে।

নিঃশব্দ গতিতে ট্রেণটি ছেড়ে দিলে। প্রথমটা মনে হল ছাড়েই নি। অনীতা বুঝতেই পারে নি প্রথম। কিন্তু বুঝতে পারামাত্রই দাঁড়িয়ে উঠল এবং জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে যা করতে লাগল তাতে একটি ফল হল শুধু, প্ল্যাটফর্মে দণ্ডায়মান স্থূলকায় একটি মাড়োয়ারি বণিকের প্রাণে রস-সঞ্চার হল। গদগদ হয়ে হলদে রঙের একখুড়ি দাঁত বার করে' হেসেই ফেললে সে। অনীতা ভীড়ের মধ্যে আবছাভাবে সুশোভনকে দেখতে পেলে একবার। একটি মেয়ের দু'হাত ধরে' দাঁড়িয়ে আছে সে। মনে হল মেয়েটির রং ধপধপে ফরসা।...

ট্রেণের গতি-বেগ বাড়ল।* ক্রমশঃ

---

* বিদেশী গল্প অবলম্বনে রচিত

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১২

পরদিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ। প্রথম যামের মধ্যভাগ। চন্দ্রমা তখনও চক্রবাল হইতে অধিক উপরে উঠে নাই। কুহেলিকা অপেক্ষাকৃত তরল এবং জ্যোৎস্নালোক অনেকটা অনাবিল। সেই স্নিগ্ধ শুভ্র আলোকে জগতের একটা অস্ফুট স্বপ্নময় বিমল সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অদ্য নিশার এই স্বচ্ছ নির্ম্মল উৎসব আমার প্রাণের একটা অন্ধতম প্রদেশ স্পর্শ করিতে পারে নাই। একটা অজ্ঞাত উৎকণ্ঠা আমাদের সকলের হৃদয়কে নিপীড়িত করিতেছে। আমি নিজের জন্য ভীত নহি। আমি আমার পিতামাতা ও ভগ্নীকে এবং আর্য্য পালকের পরিবারবর্গের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

ধরা দিব কি ?—তাহা হইলে বোধ হয় কাহারও উপর আর কোন প্রকার পীড়ন বা অত্যাচার হয় না। কিন্তু আমি যদি চৌরদ্ধরণিক ও তাহার অনুচরগণের সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাই—যদি তাহাদের জাল ছিঁড়িয়া—তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া—যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া—মানুষের মত তাহাদিগের হস্ত হইতে আপনাকে উদ্ধারপূর্ব্বক তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাইতে পারি—তাহা হইলে বোধ হয় তাহারা আমার আত্মীয়-স্বজনকে নির্য্যাতন করিবে না। কিন্তু তাহাও আমার অনুমান মাত্র। উহাদের অত্যাচার যে কোনও আকারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং তাহার জন্য ষড়যন্ত্রেরও অভাব হইবে না।—না, ধরা দিব না—যদি পারি ত তাহাদিগের কবল হইতে আমি আপনাকে উদ্ধার করিব—আমি যে দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করি না তাহা একবার যবনকে ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আমি পিতাকে বলিলাম, "আমি গোপনে চোরের মত পলাইয়া আপনাকে এবং আর্য্য পালককে বিপদে ফেলিতে পারিব না। যবন আমাকে বন্দী করিতে পারিবে না।—আমাকে জীবিত বন্দী করিবার মত বল যবনের বাহুতে নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। হীনভাবে গোপনে পলায়ন করিতে আমাকে আদেশ করিবেন না। ক্ষমা করিবেন! আমার জন্য আপনারা সকলে বিপদে পড়িবেন না!"

পিতা আমার দিকে কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে চাহিয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন "বেশ, কিন্তু অধীর হইয়া কোনও কার্য্য করা যুক্তিযুক্ত হইবে না। অনাগত বিপদের জন্য এখন হইতে কোনও কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া রাখা বোধ হয় ন্যায়সঙ্গত নহে; বিপদ আসিলে সকল বিষয় বিচারপূর্ব্বক কার্য্য নির্দ্ধারণ করা হইবে। কিরূপ ভাবে উহারা আসে দেখা যাউক।"

আমি বুঝিলাম যে আমার বিপদে তিনি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন তাঁহাকে আমার মতে আনয়ন করা সহজসাধ্য নহে। আমি আর কোনও কথা বলিলাম না—বলিলেও বোধ হয় কোনও ফল হইত না, আমার কোনও কথাই হয়ত তিনি শুনিতেন না। তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীর বা তাঁহার চিন্তাধারার কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পিতা নৌকা সম্বন্ধে যে আদেশ করিয়াছিলেন আনন্দ সে সম্বন্ধে কি করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য আমি একবার নদীতীরে গেলাম। সেখানে দেখি আনন্দ একাকী বসিয়া আছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি আনন্দ, এখানে একাকী বসিয়া আছ কেন ?"

—সবই ঠিক হইয়া রহিল—তীরে ঐ গাছটার যে শাখাটা নদীর উপরে হেলিয়া পড়িয়া জলস্পর্শ করিয়া আছে, উহারই ঐ নিবিড় পত্র-পল্লবের অন্তরালে নৌকাখানা বাঁধা

আছে। চৌরঙ্গরণিকের পিতৃপুরুষগণও উহার সন্ধান করিতে সক্ষম হইবে না।

আনন্দ উঠিয়া আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহার সহিত কথা কহিতে কহিতে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলাম। আমাদের কথোপকথনের বিষয় গত রাত্রের ঘটনাই প্রধানতঃ ছিল। আর্য্য পালকের পরিবারবর্গের আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করিয়া আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

জ্যোৎস্নালোকে কপিষা তীরে কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া ও আনন্দের সহিত গল্প করিয়া আমার মানসিক উদ্বেলন অনেকটা প্রশমিত হইল। নদীতীরে আমাদের উদ্যানের একটি মর্ম্মরবেদিকায় আনন্দের সহিত উপবেশন করিলাম। সুদূর মধ্যদেশের নর্ম্মদা তীর হইতে মর্ম্মর প্রস্তর আনাইয়া পিতা আমাদিগের উদ্যানবেদিকাগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পারিবারিক ব্যবহারের জন্য ঐ দূরদেশ হইতে আনীত বহুমূল্য শিলাপট্ট দ্বারা উদ্যান হইতে নদীতে অবতরণের জন্য সোপান নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা সেই বেদিকায় বসিয়া নীরবে নদীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। জানি না, আনন্দ কি ভাবিতেছিল! আমার মনে কত দিনের পুরাতন স্মৃতি—কতদিনের অতীত ঘটনার কথা—শৈশবের কত নির্ম্মাণ কাহিনী অস্পষ্ট স্বপ্নের মত জাগিয়া উঠিতেছিল—সদ্য সুপ্তোত্থিতের নয়নে উষার স্পর্শ যেমন স্বপ্নের অবাস্তব অস্তিত্বের অচঞ্চল আবিলতা ও বাস্তবের জীবনময়ীর চঞ্চলতার সহিত ক্ষণিক সমন্বয় করিয়া দেয়, আমার এই অতীত স্মৃতির আভাস অনেকটা সেইরূপ।—এই কপিষার সঙ্গে—এই মর্ম্মরমণ্ডিত তটভূমির সহিত—আমার শৈশবের অনেক কাহিনা বিজড়িত আছে। জীবনের প্রথম প্রভাতের স্বর্ণালোক এখনও ইহাদের উপর ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। জানি না পিতার কি আজ্ঞা হইবে,—জানি না ঘটনা স্রোত আমাকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইবে! এই সকল কি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে কোন অজ্ঞাত দূরান্তরে যাইতে হইবে? আর কখনও কি এখানে ফিরিতে পারিব? পিতার স্নেহ, মাতার ভালবাসা, ভগিনীর প্রীতি, সব কি পরিত্যাগ করিয়া আমাকে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতে হইবে? মনটা বড় চঞ্চল হইতেছে।

আমরা—অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলাম। সহসা দেখিলাম আমাদের কিয়দ্দূরে বৃক্ষান্তরাল হইতে যেন কে একজন আমাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যেদিকে ইহার আবির্ভাব হইল সেদিকে তখনও চন্দ্রালোক বৃক্ষছায়ায় আশ্রিত পুঞ্জীভূত অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারে নাই। আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ঐ মূর্ত্তি ধীরে ধীরে আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম এক দেবী মূর্ত্তি। কিছুক্ষণ তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া চিনিলাম—ইনি সেই বনদেবী! যাঁহাকে আমার দীক্ষা গ্রহণের রাত্রে কপিষাতীরে দেখিয়াছিলাম। পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নাময়ী কপিষাতটে সেই অপূর্ব্ব পুণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া সেদিন মুগ্ধ হইয়াছিলাম ও ভক্তিআনত হৃদয়ে ইঁহার ওজস্বিনী কথা শুনিয়াছিলাম। আজ রাত্রেও সেইরূপ দেখিলাম—আলুলায়িত কেশরাশি সেদিনও এমনই স্কন্ধ, বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ আবৃত করিয়া পড়িয়াছিল—পরিধানে সেই গৈরিক বসন,—নয়নে সেই শান্ত স্থির দৃষ্টি। আপনা হইতেই আমার মস্তক নত হইয়া পড়িল। আমি প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলাম। আনন্দ তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এই দুর্দ্দিনে আমাদের মনে পড়িয়াছে, মা!"

—"কিসের দুর্দ্দিন, আনন্দ?—সব দিনই সমান।—জগতে সুদিন দুর্দ্দিন নাই।—জগন্নাথের রথ সমভাবেই চলিতেছে।—সেই অবিরাম গতি এক পূর্ণতার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছে। চল দেবদত্ত, আনন্দ, তুমিও চল—আমি আজ ঋষভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। তোমরা সঙ্গে চল!

—আসুন, মা! তিনি আজ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। আমরা তিনজনে বাটীর মধ্যে পিতার নিকট চলিলাম। আমি একটু বিস্মিত হইলাম।—বনদেবী সন্ন্যাসিনী—পিতাকে জানেন!—তাঁহার সহিত এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে যে বনদেবী তাঁহাকে ঋষভ বলিয়া ডাকিলেন!—কই?—আর কখনও তাঁহাকে আমাদের বাটীতে ত আসিতে দেখি নাই!

আমরা পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পিতা একটু ব্যস্ত হইয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি বনদেবীর পাদস্পর্শ করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? দিদি?

এতদিন পরে ঋষভের কথা কি মনে পড়িয়াছে? সৌমিত্রের সঙ্গে কি দেখা হইয়াছে?"

—ঋষভ, চিরকালই তোমাদের মনে আছে—সৌমিত্রের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে।—কি জান ঋষভ, সংসার হইতে একটু দূরে থাকিতে চাই।—কিন্তু তা' পারি কি?—এই দেখ না—কি এক আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আবার তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলাম।—তোমাদের বিপদ শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। গৃহরক্ষার কি উপায় স্থির করিয়াছ?—বুঝিতেছ ত বিপদ বড় সাধারণ নহে?

—কিন্তু, আমরা কি করিব?—আর কি-ই বা করিতে পারি?—তবে, দেবদত্তকে কি করিয়া বাঁচাইব তাহাই আমাকে বড় চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে।—হয়ত আজই আমাদের সকলের শেষ দিন।—শত্রুকে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না।—গৃহরক্ষায় অসমর্থ হইলে নিজ হস্তে সব শেষ করিয়া দিব। ঋষভের গৃহের ও পরিবারের কোনও চিহ্ন থাকিবে না।

—এত হতাশ হইতেছ কেন, ঋষভ?

—আশা ত কিছুই নাই—ক্ষত্রপের সহিত কলহে একজন সামান্য প্রজার কি সসম্মানে আত্মরক্ষা করা সম্ভব?

—কেন?—তোমরা যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ তাহাতে হতাশ হইবার বোধ হয় তত কারণ নাই। আমি আজ প্রাতঃকাল হইতে নগরের বাটীতে-বাটীতে গিয়া সকলকে তোমার বিপদের কথা বলিয়াছি, এবং যাহাতে ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ ও জনসাধারণ তোমার সহায়তা করে তাহার ব্যবস্থাও হইয়া আছে—যবন ব্যতীত সকলেই উত্তেজিত হইয়া আছে—সকলেই প্রস্তুত থাকিবে।

পিতা বনদেবীর দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে দিদি, তুমি সকল সংবাদই জান?"

—হাঁ, জানি; সকল কথাই আমি শেখরের নিকট শুনিয়াছি।

—চল, দিদি, বাটীর ভিতরে চল—দেবদত্ত, ইনি সৌমিত্রের দিদি এবং আমারও দিদি—শেখরের পিসিমা, অতএব তোমারও পিসিমা। তুমি ইঁহাকে পূর্ব্বে আর কখনও দেখ নাই? ইনি ইঁহার বৈধব্যের পর সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতেছেন। পুরুষপুরের উপকণ্ঠে বাসুদেব ও শর্ব্বর্ণের মন্দিরে ইঁহার স্বামী পূজারী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর এখন ইনিই সেই মন্দিরের পূজারিণী। দিদি, এখন এখানে থাকিবে ত?

—এখন ত এখানে থাকিয়া দেবতা, আর্ত্ত ও দরিদ্রের সেবা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়টা দিন কাটাইয়া দিব বলিয়া মনে করিয়াছি—তবে, কি হয় তা জানি না।

—দেবদত্ত, পিসিমাকে প্রণাম কর!

—দেবদত্ত আমাকে প্রণাম করিয়াছে—তুমি ব্যস্ত হইও না।—চল, বাটীর ভিতরে যাই!

—চল, দিদি! তুমি যে আসিয়াছ এ আমার কত ভাগ্য! কখনও ভাবি নাই যে আবার তুমি আমাদের স্মরণ করিবে।

—তুমি যে আমাকে টানিয়া আনিয়াছ, ভাই!—তুমি যে কাতর!—আমার আর্ত্তের দেবতার কাছে যে তোমার ব্যথার নিবেদন পঁহুছিয়াছে!—তাঁহার ডাকে যে আমাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে!—চল, ভাই, ভিতরে যাই!

পিতা ও বনদেবী—আমার নব পরিচিতা পিসিমা—বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমি বাহিরে একটি প্রস্তর বেদীর উপর বসিয়া রহিলাম এবং বর্ত্তমান ঘটনা প্রবাহের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। বনদেবী যে কখন আমাদিগের গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন তাহা আমি জানি না। বোধ হয়, তিনি আমাদের বাটীর ভিতর দিয়া তীর্থপালকের গৃহে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কপিষার তটভূমি হইতে যেন বনদেবীর কণ্ঠে সঙ্গীত শ্রুত হইল—

আমার মরম মাঝারে,
বাঁশরীর সুরে,
কে যেন ডাকিছে ঐ!—
আমি যাই!—আমি যাই!

পরাণ অবশ
মোহন সে তানে,
আমি আপন-হারা হই !—
আমি যাই !—আমি যাই !

আমি উঠিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে শেখরের পিতা—আমাদের মণ্ডলের একজন প্রধান গৃহপতি এবং পিতার বাল্যবন্ধু পূজ্যপাদ ভট্টসৌমিত্র—বনদেবীর কনিষ্ঠ সহোদর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এই প্রবীণ ব্রাহ্মণ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব এবং ক্ষত্রপের একজন অন্তরঙ্গ মিত্র। ক্ষত্রপ অনেক বিষয় বিচার-বিবেচনার জন্ত তাঁহার মত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ক্ষত্রপসভায় তাঁহার যাতায়াত এবং প্রভূত প্রতিপত্তি আছে, এইরূপ শুনিয়াছি।

আমি পিতৃবন্ধুকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঋষভ কোথায়, দেবদত্ত ?" পরে তিনি উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন, "ঋষভ !—ও ঋষভ !"

পিতা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ? সৌমিত্র ?"

—হাঁ, বাহিরে এস !

পিতা বাহিরে আসিলেন।

ভট্ট সৌমিত্র বহু শাস্ত্রবিৎ, সুপণ্ডিত, বহু ভাষাভিজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন। ক্ষত্রপ এই তত্ত্বজ্ঞ ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকে গত বৎসর পুরুষপুরের প্রধান ধর্ম্মাধিকারের আসন প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহার ধর্ম্মাচরণে ব্যাঘাত হইবে বলিয়া সে সম্মান ও বিত্ত গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি যে, ক্ষত্রপ ইহাতে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং তাঁহাকে আরও অধিকতর ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকেন। এই ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের সহিত কাহারও শত্রুতা ছিল না এবং কাহাকেও তিনি ঘৃণা করিতেন না।

তিনি পিতাকে বলিলেন, "ঋষভ, তোমার, দেবদত্তের, পালক এবং প্রজ্ঞার নামে আজ ক্ষত্রপের বিচার সভায় বিদ্রোহের অভিযোগ উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে তাহা সপ্রমাণ না হওয়ায় তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদিগের উদ্দেশ্য সফল হইল না।"

—সৌমিত্র, ভাই, তুমিই এই চক্রীদিগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছ—আমি বুঝিয়াছি।

—শেখরের নিকট শুনিলাম যে তুমি বড় বিপদে পড়িয়াছ, আর তোমার বিরুদ্ধে ক্ষত্রপ সভায় একটা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। আমি সেইজন্তই আজ অপরাহ্ণে ক্ষত্রপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম—এতক্ষণ আমি সভাতেই ছিলাম—এখনও আমার সায়ংকৃত্য সমাপন হয় নাই।

—আমি কতকটা শুনিয়াছিলাম। অভিযোক্তা কি স্বয়ং নগরপাল ?

—হাঁ। নগরপাল অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, দেবদত্ত মদনোৎসবের দিন আসবপানে উন্মত্ত হইয়া নগরের রাজপথের শান্তিভঙ্গ করিয়াছে, পথচারীদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং নগরপালের সৈন্তগণ তাহাকে ধৃত করিতে আসিলে তাহাদিগকে তোমরা পিতা-পুত্রে, পালক ও প্রজ্ঞার সাহায্যে, মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছ। তাহাদের মধ্যে দুইজন মৃত ও চারিজন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। তোমরা আরও যবনদিগকে, যাবনিক শাসনকর্ত্তা ও রাজকর্ম্মচারীদিগকে গালি দিয়াছ এবং তাহাদের অসম্মান করিয়াছ বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলে।

—তাহাতে ক্ষত্রপ আমাদিগকে ধৃত করিয়া তাঁহার বিচার-সভায় লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন—কেমন ?

—হাঁ, প্রথমে তাহাই হইয়াছিল—পরে সভাভঙ্গ হইলে—আমি নির্জ্জনে ক্ষত্রপকে সকল ঘটনা বিস্তারিত ভাবে অবগত করিলাম। তিনি নগরপাল ও চৌরদ্ধরণিককে ডাকাইয়া আনিলেন, পরে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া তাহাদিগের অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাহারাই যে সম্পূর্ণরূপে দোষী তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপ্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার করিয়া, তাঁহার শ্যালক নগরপাল ও চৌরদ্ধরণিককে ধৃত ও বন্দী করিবার আদেশ দিয়াছেন। তাহাদের কৃত—নগরের শান্তিভঙ্গ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকের উপর অত্যাচারের কারণ জানিতে চাহিয়াছেন।

—সকল কথা কি ক্ষত্রপকে বলিয়াছ ?

—হাঁ, বলিয়াছি—গত রাত্রের সকল কথাও তাঁহাকে শুনাইয়াছি।

—সব কথা তুমি জানিতে ?—কেমন করিয়া জানিলে ?

—শেখর আমাকে সব বলিয়াছিল—আর আজ দিদি আসিয়াছিলেন—তাঁহার নিকটও সকল ঘটনার বিবরণ শুনিয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। এখন বুঝিলাম যে, আপাততঃ অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে এবং অদ্য এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার মূলে আমার পিতৃবন্ধু পূজ্যপাদ সৌমিত্র ভট্ট।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে ভট্ট
সংবাদ নামক দ্বাদশ বিবৃতি।

(ক্রমশঃ)

দৃষ্টি

শ্রীউমানাথ ঘোষ

ইন্‌টার ক্লাসের কামরায় রূপসী তরুণীটির সটান দৃষ্টির সামনে বসে অস্বস্তি বোধ করছিলাম। তাঁর পাশের ভদ্রলোক চোখ নামিয়ে হাতের ম্যাগাজিনখানা সেই যে কখন থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন, তারপর পাতার পর পাতা উলটেই যাচ্ছেন, চোখ তোলবার কথা যেন তাঁর মনেই নেই।

যদিও আজকাল অনেক মেয়েই ইন্‌টার ক্লাসের পুরুষ কামরায় চড়ে, তবুও মনে প্রশ্ন জাগল, ভদ্রমহিলা পুরুষ কামারায় যাচ্ছেন কেন? কি এমন কারণ থাকতে পারে যার জন্য এই মহিলাটিকে অসংখ্য পুরুষের লোভী কুৎসিত দৃষ্টির মাঝখানে থেকে যেতে হচ্ছে।

সে যাই হোক্! কিন্তু আমার দিকে উনি অমন সহজভাবে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন কেন? অনেক ভাবলাম, কিন্তু কোনদিন ওঁকে দেখেছি বলে তো মনে হোল না।—দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়া?—পিসিমার, বড়মার, সেজমাসীর, বুলাদের, শান্তি, অনিলা, সৌরেন—না কারও বাড়ীতে আমি এঁকে দেখিনি। আমার যতদূর মনে আছে, কোথাও এঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়নি।

ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে দেখলাম। সাধাসিধে পোষাক হোলেও তাঁর চোখে মুখে ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। হাতে তাঁর 'মডার্ণ রিভিউ'। মুখখানা একেবারে অচেনা।

ভদ্রমহিলার বোধ হয় ভুল হোয়েছে। এমন কাকেও তিনি চেনেন যার মুখের সঙ্গে আমার মুখের মিল আছে; তাই আমাকে তাঁর সেই পরিচিত ব্যক্তি মনে করে আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। সেই পরিচিত ব্যক্তি হয়তো খুব নিকট আত্মীয় নন, তার উপর আমার দিক থেকেও সাড়া পাচ্ছেন না, তাই সাহস করে কিছু বলতেও পারছেন না।

আমি যেন তাঁর আমার দিকে চেয়ে থাকা মোটেই বুঝতে পারিনি এই রকম ভাবে বসে রইলাম খবরের কাগজটার দিকে চেয়ে। কিন্তু মুখ খবরের কাগজের দিকে নামানো থাকলেও চশমার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর দিকে চাইছিলাম।—তিনি সেই একই ভাবে চেয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। সারা দেহ দিয়ে আমি অনুভব করছিলাম সেই দৃষ্টি—তীক্ষ্ণ তীরের মতো সোজা, মর্মভেদী।

নির্লিপ্তের মতো খবরের কাগজটা ধরে বসেছিলাম। যে কারণেই হোক, অভিভূত হোয়ে ভদ্রমহিলা যখন আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, তাঁকে অপ্রতিভ করবার কোন দরকার নেই। তবুও মাঝে মাঝে অস্বস্তিজ্ঞাপক নড়াচড়া না কোরে থাকতে পারিনি।

কিন্তু তরুণীটি আমার দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছেন।—স্থির, সংযত, অপলক সেই সরল দৃষ্টি।

তাঁর পাশের ভদ্রলোকটি বোধ হয় আমার অস্বস্তি বুঝতে পেরেছিলেন। হাতের পত্রিকা থেকে মুখ তুলে তিনি আমার দিকে চাইলেন, পার্শ্ববর্তিনীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন; তারপর দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

তরুণীটি আমার দিকে এখনও সেইভাবে তাকিয়ে আছেন অচঞ্চল দৃষ্টিতে।

কিছুক্ষণ পরে হাতের খবরের কাগজখানাতে মৃদু টান পড়ায় চোখ তুলে দেখি যে ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তিনি আমায় তাঁর অনুসরণ করতে বললেন। আমি তাঁর পিছু পিছু চললাম।

একটু দূরে গিয়ে তিনি বললেন, "কিছু মনে করবেন না, আমার স্ত্রীর অপটিক্যাল নার্ভে প্যারালিসিস্ হোয়েছে। কিছু দেখতে পান না—চোখ ওঁর এমনিই খোলা থাকে। আপনার দিকে উনি চান নি। কলকাতায় ওঁর চোখ অপারেশন করতে নিয়ে যাচ্ছি।"

তাঁর সঙ্গেই ফিরে এসে বসলাম আমার জায়গায়। আর একবার তরুণীটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, চোখ দুটি খোলা, অসহায় দৃষ্টি সামনে কি যেন খুঁজছে—বোধ হয় আলো—কিন্তু পাচ্ছে না কিছুই।

আগষ্ট সংগ্রামের সেনানী

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়প্রকাশ

দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের জন্ম মাঝে মাঝে বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। জয়প্রকাশনারায়ণ সেই শ্রেণীর মানুষ। পুরুষসিংহ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন ভারতের বাইরে থেকে আক্রমণ হেনে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের আয়োজন করেছিলেন সেই সময় জয়প্রকাশ দেশের ভিতরে থেকে নেতাজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আজাদ দুস্তা গঠনের দুঃসাহসিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। বৃটীশের লৌহকারা এই লোকটিকে আটকে রাখতে পারেনি। সহস্র সতর্ক দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ভারতের এই বীর সন্তান জেল থেকে পালিয়ে গিয়ে আগষ্ট আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কাজে তিনি নেপাল, যুক্তপ্রদেশ, বাংলা ও আসামের নানাস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। দীর্ঘ দাড়ি রেখে কখনও ধুতি পাঞ্জাবীতে বাঙ্গালীর বেশে, কভু বা কোট প্যাণ্ট হ্যাটে পাঞ্জাবী মুসলমানের সজ্জায় গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে চলতে হয়েছে তাঁকে।

উত্তর বিহারের ছাপরা জেলার পল্লীবাসী জয়প্রকাশের ছেলেবেলা কাটে দুরন্তপনায়। কিশোর বয়স পর্য্যন্ত সহরের সঙ্গে কোন পরিচয়ই ঘটেনি তাঁর। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি কলকাতায় এসে প্রথম ট্রাম গাড়ী দেখেন। ম্যাট্রিক পাশ করে তখন তিনি আই-এস-সি পড়ছেন। এমন সময় এল দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন ১৯২১ সালে। জয়প্রকাশ পড়া ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিলেন। আন্দোলনের গতি হ্রাস পেলে জয়প্রকাশ আবার কলেজে ঢুকলেন। বিজ্ঞানের যাদু তাঁকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। বায়োলজিতে উচ্চ শিক্ষা নেবার জন্ম তিনি গেলেন আমেরিকায় একপ্রকার নিঃসম্বল অবস্থায়। কালিফোর্ণিয়াতে এসে তিনি কখনও খেতমজুর, কখনও কারখানার শ্রমিক, কভু বা অফিসের বেয়ারা; আবার কোন কোন সময় সেলস্‌ম্যানগিরি করে পড়ার খরচ জোগান। এ বিশ্ববিত্তালয়, ও বিশ্ববিত্তালয় করতে করতে তিনি বিভিন্ন বিত্তায় ডিগ্রী নিতে লাগলেন। শরীরতত্ত্বের শিক্ষা সমাপন করে, ধরলেন নৃতত্ত্ব এবং এম-এ ডিগ্রী নিলেন সমাজ-বিজ্ঞানে। এর পর তিনি মার্কসীয় মতবাদ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন এবং মার্কস্ নির্দ্দিষ্ট পথে জাতির মুক্তির সন্ধান পান। তাই আমরা জয়প্রকাশকে পাই সমাজতান্ত্রিক নেতা রূপে।

১৯৩০ সালে ভারতে ফিরে জয়প্রকাশ দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯৩২-৩৪ পর্য্যন্ত তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এই সময়েই কংগ্রেসের নেতৃমহলে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৩২ সালের আন্দোলনে তিনি কারাবরণ করেন। কারামুক্তির পর তাঁর মতবাদের পরিবর্ত্তন ঘটে। নাসিক কারাগারের রুদ্ধকক্ষে ভারতের কয়েকটি তরুণ কংগ্রেসকর্ম্মী দিনের পর দিন নানা বিতর্ক ও আলোচনার পর কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী দল গঠনের সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে জয়প্রকাশ ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দল গঠন করলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তিনি যুদ্ধে ভারতের যোগদানের বিরুদ্ধে ও যুদ্ধের সুযোগে স্বাধীনতা আদায়ের জন্ম আন্দোলন চালাতে লাগলেন। যুদ্ধবিরোধী প্রচারের অপরাধে ১৯৪০ সালের মে মাসে তিনি কারারুদ্ধ হন। দেউলী বন্দিনিবাসে তাঁকে বন্দী রাখা হয়। দেউলী থেকে তিনি তাঁর সহকর্ম্মীদের কার্য্যপদ্ধতির নির্দ্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠাবার চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হন। তারপর অনশন ধর্ম্মঘট অবলম্বন করে দেউলীর বন্দিগণকে স্ব স্ব প্রদেশে প্রেরণে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করেন। জয়প্রকাশকে হাজারিবাগ জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

এদিকে তখন ভারতব্যাপী আগষ্ট বিপ্লব সুরু হয়েছে। যে গণ-অভ্যুত্থানের জন্ম প্রচার কার্য্য চালাতে চেয়েছিলেন তিনি দেশের দিকে দিকে, এ তারই বহ্নিশিখা। কারাগারের প্রাচীর ভেদ করে সব সংবাদ পৌঁছে না তাঁর কাছে। যেটুকু পৌঁছায় তাতেই তাঁর অন্তরে সৃষ্টি করে এক গভীর উন্মাদনা। কারাপ্রাচীর ভাঙতেই হবে তাঁকে। এখানে আটকে থাকলে তাঁর সারাজীবনের স্বপ্ন বিফল হবে যে।

তারপর ১৯৪২ সালের ৮ই নভেম্বর দেওয়ালি অমাবস্যার তমসাবৃত রজনীতে পাঁচজন সহকর্ম্মীসহ তিনি হাজারিবাগ জেল থেকে পলায়ন করেন। জেল থেকে বেরিয়ে জয়প্রকাশ ও তাঁর সঙ্গীগণ ছোটনাগপুরের শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিন দিন ধরে দীর্ঘ ৫৫ মাইল অরণ্যপথ অতিক্রমের পর বনপ্রান্তের কোন গ্রামে চিঁড়া ও গুড় সহযোগে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন। ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে তাঁরা গরুর গাড়ীতে করে প্রথমে গয়াতে গেলেন এবং সেখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে উপস্থিত হলেন কাশীতে।

পুলিস সমস্ত দেশ তোলপাড় করে তাঁর খোঁজে প্রবৃত্ত হল আর জয়প্রকাশ মাতলেন আগষ্ট বিপ্লবের পরিচালনার কাজে। জয়প্রকাশের উপস্থিতিতে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের আন্দোলনে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার হল। উন্মত্ত জনগণ কিছুকালের জন্ম বৃটীশ কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ করলে।

তারপর জয়প্রকাশ গেলেন মেদিনীপুরে। ঝঞ্ঝা ও জলোচ্ছ্বাস প্লাবিত মেদিনীপুরের দুর্দ্দশা দেখে তাঁর প্রাণ বিগলিত হল, আরম্ভ করলেন সেবাকার্য্য। এখানে তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ-বাহিনীর কথা জানতে পারেন এবং সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ভারতের মধ্যে

আজাদ হিন্দ-বাহিনী গঠনের সঙ্কল্প করেন। কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে তিনি নেপালের অরণ্যে যান। বহু তরুণ এইখানে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে। নেপাল পুলিস জানতে পেরে তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু আজাদ দস্তার অধিনায়ককে তাঁরা কারাগারে রাখতে পারলেন না। আজাদ দস্তা কারাগার আক্রমণ করে তাঁর মুক্তি দিলে। নেপাল থেকে ছাড়া পেয়ে জয়প্রকাশ আসামে যান এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হন।

এইভাবে প্রায় এক বৎসরকাল আত্মগোপন করে থাকবার পর ১৯৪৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পাঞ্জাব পুলিসের হাতে বন্দী হন। তাঁকে লাহোর দুর্গে আটক রাখা হয়। এই সময় থেকে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত আড়াই বৎসরাধিককাল তাঁকে বিনা বিচারে লাহোর ও আগ্রা দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়। ভারত সরকারের আদেশে তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার চলে। একাদিক্রমে ৫০ দিন তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানারূপ অবান্তর প্রশ্ন ও গালিগালাজ করা হয়। এমন কি কিছুকাল তাঁকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক মুহূর্ত্তও নিদ্রা বা বিশ্রাম করতে দেওয়া হয় নি।

অবশেষে ১৯৪৬ সালে ভারতে বৃটীশ মন্ত্রিমিশনের আগমনের পর এবং মিশনের হস্তক্ষেপের ফলে ভারত সরকার গত এপ্রিল মাসে তাঁকে মুক্তি দেন। রাজনীতি সম্পর্কে জয়প্রকাশ এখনও বামপন্থী। তিনি কংগ্রেস কর্ত্তৃক মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ সমর্থন করেন না এবং গণপরিষদে যোগ দিতে অস্বীকৃত হন। ১৯৪৬ সালে নবগঠিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও তিনি সদস্যপদ গ্রহণে অনিচ্ছা জানান। পরে তিনি এই পদ গ্রহণে রাজী হন। বর্ত্তমানে তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদে অধিষ্ঠিত। তিনি চির বিপ্লববাদী।

ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া

আগষ্ট বিপ্লবের নায়করূপে অরুণা ও জয়প্রকাশের মত ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াও খ্যাতিলাভ করেছেন। অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ সংগঠন শক্তি ও অফুরন্ত উৎসাহের আধার ডাঃ লোহিয়া দেশের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। লোহিয়া পরিবারের সকলেই দেশসেবাব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। পিতা হীরালাল লোহিয়া ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় সমস্ত সম্পত্তি কংগ্রেসের কাজে দান করেন এবং আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যুর পর মহাত্মা গান্ধী সকলকে হীরালাল বাবুর আদর্শ অনুসরণ করবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

রামমনোহর পিতার মতই দেশের কল্যাণে আত্মনিবেদিত চিত্ত। তরুণ বয়স থেকেই তিনি কংগ্রেসের কাজে লাগেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেবার গয়া কংগ্রেসের সভাপতি হন ডাঃ লোহিয়ার বয়স তখন ১৪ বৎসর। এই বয়সেই তিনি ডেলিগেটরূপে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন। রামমনোহরের পড়াশুনা কাটে বোম্বাই ও কলকাতায়। তারপর দর্শন-শাস্ত্র পড়বার জন্য যান জার্ম্মানীতে এবং দর্শনে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন।

১৯৩৩ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করে ডাঃ লোহিয়া কলকাতায় এলেন। জয়প্রকাশনারায়ণ তখন সমাজতন্ত্রী দল গঠন করছেন। ডাঃ লোহিয়া কলকাতায় এই দল গঠনের ভার নিলেন এবং 'কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। পররাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানে আকৃষ্ট হয়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৩৫ সালে তাঁকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পররাষ্ট্র বিভাগের ভার নিতে অনুরোধ করলেন। অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি এই বিভাগের কাজ চালাতে থাকেন। ১৯৩৮ সালে স্বাধীনভাবে কাজ করবার জন্য তিনি এই ভার ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভের পর তিনি যুদ্ধবিরোধী প্রচার আরম্ভ করেন এবং ১৯৪০ সালে দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৪২ সালের প্রথম ভাগে মুক্তিলাভ করে তিনি আগষ্ট বিপ্লবের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। এই বিপ্লবের মহাপ্লাবনের মধ্যে আমরা বিপ্লবী রামমনোহরের প্রকৃত শক্তির সন্ধান পাই। নেতৃহারা জনগণ যখন ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ক্ষিপ্ত হয়ে বিদেশী শাসকের নাগপাশ ছিন্ন করবার জন্য এগিয়ে এসেছে তখন এই নিঃশঙ্কচিত্ত বীর তাদের পথ-নির্দ্দেশ করেছেন। কোনদিন বোম্বাই, কোনদিন কলকাতা, কোনদিন কাশী আবার কোনদিন বা যুক্তপ্রদেশের ক্ষুদ্র গ্রামে অকস্মাৎ তাঁর আবির্ভাব হয়েছে।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাস থেকে নভেম্বর পর্য্যন্ত চার মাসকাল কংগ্রেস রেডিও যোগে যে প্রচার কার্য্য চালান হয় ডাঃ লোহিয়া ছিলেন সেই গোপন আন্দোলনের প্রাণ। সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশের লোকে প্রকৃত সংবাদ পেত না। তাদের প্রকৃত সংবাদ পরিবেশন ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ছিল এই বেতারের উদ্দেশ্য। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নেতারা বন্দী থাকায় জনগণকে পরিচালনা করবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপনকারী নেতারা এক পরিচালক সমিতি গঠন করেন। ডাঃ লোহিয়া এই সমিতির বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্য্যটন ও আন্দোলন সংগঠনে সহায়তা করে ১৯৪৪ সালের প্রথম ভাগে ডাঃ লোহিয়া বোম্বাইতে যান এবং মে মাসে পুলিশের হস্তে বন্দী হন। জয়প্রকাশনারায়ণের মত তাঁকেও লাহোর দুর্গে আটক রেখে তাঁর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হয়। লাহোর দুর্গ থেকে তিনি আগ্রা জেলে নীত হন এবং বৃটীশ মন্ত্রিমিশনের হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তিলাভ করেন।

অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন

শ্রীযুক্ত অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন শ্রীমতী অরুণার ন্যায় তিনিও দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর কাল পুলিশের সতর্ক প্রহরার মাঝখানে পলাতক থেকে আগষ্ট বিপ্লবে নেতৃত্ব করেন। বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর পুণ্যভূমি মহারাষ্ট্রের অন্যতম বিপ্লবী বর্ষিত বালগঙ্গাধর তিলকের ন্যায় তেজস্বিতা পট্টবর্দ্ধনকে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমেদনগরের এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েও অচ্যুত দেশের বিত্তহীন সমাজকেই আপন করে নিয়েছেন। পট্টবর্দ্ধন পরিবারের সকলেই দেশহিতব্রতী। অচ্যুতের মাতা বাট বৎসর বয়সে দেশ-সেবার আকুল আহ্বানে কারাবরণে কুণ্ঠিত হন নাই। রাওসাহেব পট্টবর্দ্ধন মহারাষ্ট্রের সর্ব্বজনমান্য কংগ্রেস নেতা। ছয় ভ্রাতার একমাত্র ভগিনী বিজয়া ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যোগ দেন এবং আত্মগোপনকারী দলে থেকে অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন ও জয়প্রকাশ-নারায়ণের সেক্রেটারীর কাজ করেন।

আমেদনগর এডুকেশান সোসাইটির হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অচ্যুত রাও কাশীতে গিয়ে মিসেস এনি বেশান্ত প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হলেন। এই কলেজ মালব্যজীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হয়। সেখান থেকে এম-এ পাশ করে অচ্যুত উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপে যান। প্রত্যাবর্ত্তন করে তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন।

১৯৩২ সালে দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলনের আহ্বানে অচ্যুত নীরবে থাকতে পারলেন না। আইন-অমান্যের জন্য তাঁর কারাদণ্ড হল। এই সময় কয়েকজন প্রগতিপন্থী তরুণ নাসিক জেলে একত্র হবার সুযোগ পান। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর দেশের তরুণ প্রাণগুলি আর বিলম্ব সইতে পারে না। ১৯৩০-৩২ সালের আন্দোলনের ব্যাপকতায় মুগ্ধ হলেও তাঁরা ফলাফল খুব আশাপ্রদ মনে করতে পারলেন না।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠনের কাজে অচ্যুত বিশেষ পরিশ্রম করেন। এই বৎসর অক্টোবর মাসে বোম্বাইতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন যে বক্তৃতা করেন তাতে তাঁর যুক্তিজাল রচনার নৈপুণ্য, ভাষার মাধুর্য্য ও কথন ভঙ্গি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাঁর সেদিনকার বক্তৃতার কথা বিস্মৃত হবার নয়। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়ার্কিং কমিটিতে অচ্যুতকে মনোনীত করেন।

১৯৪২ সালে আগষ্ট বিপ্লবের ভিতর দিয়েই অচ্যুতের দেশাত্মবোধ ও আত্মত্যাগের চরম বিকাশ ঘটেছে। পশ্চিম ভারতে জনগণের নেতা রূপে আবির্ভূত হয়ে তিনি এই সময় তাদের মধ্যে যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিলেন তা অভূতপূর্ব্ব। সাতারাই ছিল অচ্যুতের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। এখানের প্রায় সাতশত গ্রামের অধিবাসীর তেজস্বিতা সেদিন মহাবল বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সাতারা থেকে বৃটীশ কর্তৃত্ব লোপ পায়।

বিপ্লব শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অচ্যুত আত্মগোপন করলেন। তাঁর বৈপ্লবিক কার্য্যকলাপে সরকার অধীর হয়ে পড়লেন তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য। চতুর্দ্দিকে গোয়েন্দা ছুটল, মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষিত হল। কিন্তু তাদের সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করে সর্ব্বত্র বেড়াতে থাকেন তিনি। ১৯৪২ সালের আগষ্ট থেকে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ৪৪ মাসকাল তিনি বিভিন্ন প্রদেশের গোয়েন্দাদের নাজেহাল করে ফেরেছেন। ১৯৪৬ সালে বোম্বাইতে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হলে তাঁরা আগষ্ট বিপ্লবের এই বীর নায়কের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার করেন। তখন এই বিপ্লবী নায়ক আত্মপ্রকাশ করেন। রাজনীতিতে এখনও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় চরমপন্থী।

আগষ্ট সংগ্রামে আমরা আরও বহু বীর যোদ্ধার প্রকৃত পরিচয় পেয়েছি। পরাধীন জাতির জীবনে এমনি একটা অভ্যুত্থান আশীর্ব্বাদ স্বরূপ। শোষণ ও পীড়নজর্জ্জর জনগণের দৈনন্দিন গ্লানি, ক্ষোভ ও অপমান সঞ্চিত হয়ে তলে তলে সৃষ্টি করে এক বিরাট আগ্নেয়গিরি। তারপর হঠাৎ একদিন তা থেকে যে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাতে সমস্ত অত্যাচার ও শোষণের অবসান ঘটে। ভারতবাসীর জীবনেও ১৯৪২ সাল এই আশীর্ব্বাদ বহন করে এনেছিল।

প্রিয় বন্ধু ও সখা

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের জন্মদিনে

প্রেম পারাবারে ভাসায়ে তরণী অজানা আলোর অন্বেষণে,
হে তাপস-কবি, তোমার বীণায়, বাজে কোন্ সুর সঙ্গোপনে!
সৌম্য শান্ত, হেম-উজ্জ্বল, নবারুণ—আভা আনন-ঘিরে—
জ্ঞান-গরিমায়, প্রেম-মহিমায়, উচ্ছল গীতি স্বপ্ন-তীরে!

শরণ ল'য়েছ শ্রীঅরবিন্দ শ্রীমার চরণে অটল-স্থির—
পদতলে যাঁর বহিছে তোমার হৃদয় গঙ্গা ভক্তি-নীর।
তাই সুরে সুরে সাজালে অরূপে চির উজ্জ্বল আলোক-ধাম—
ভুলিতে পারি না, কী যে ক'য়েছিলে, "বৃন্দাবনের লীলাভিরাম!"

তোমারে ঘেরিয়া ছন্দি-মণিপুরে, রূপ তুলিকায় এঁকেছি ছবি—
তুমি সখা মোর—আরো আরো কিছু—হয় ত' আমারি মরম-কবি!
তুমি থাকো দূর সিন্ধু-নিলয়ে, কল্পনা-জালে নিজেরে ঘেরি'—
দিকে দিকে তব বিজয়-নিশান, বাজে মঙ্গল শঙ্খ ভেরী!

তোমার জনম-লগ্ন-বাসরে, আমার রচিত স্বপ্ন-মাঝে
আলো-চঞ্চল প্রথম উষার প্রথম হাসিটি জড়ায়ে আছে!
তুমি বৈরাগী, চির-উদাসীন—ভাবের খেয়ালী, রহিবে দূরে—
তবু আমি প্রিয় আলিব তোমার প্রেমের আরতি গোপন পুরে!

ঐকত্রিক ভোজন ও জাতীয়তা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর

ভারতবর্ষে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাহা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে রক্ষা করিয়া বিনা অপচয়ে সেবার ভার লইলে এবং আপামর সকলের মধ্যে বিতরণ করিতে পারিলে অনাহারজনিত প্রাণহানী বন্ধ হইবে। নেতৃবৃন্দকেও বিদেশে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ঘুরিতে হইবে না, মনে প্রাণে দেশের সেবায় ক্ষেপণ করিতে সমর্থ হইবেন।

আহার্য যেখানে স্বল্প, সামান্য অপচয়ও সেখানে দোষার্হ। ব্যক্তিগত রন্ধনশালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপচয় সারা দেশের হিসাবে ক্ষতির পাল্লা ভারী করিয়া দাঁড়ায়। এই জন্য যতদিন আহার্যের প্রাচুর্য না বৃদ্ধি হয় ততদিন, যুদ্ধের সময় স্বাধীন দেশে যেমন হয় তেমনি, আইন জারী করিয়া ব্যক্তিগত রন্ধনশালা শিকায় তুলিয়া রাখিয়া সমবায় প্রথানুযায়ী পাড়ায় পাড়ায় ঐকত্রিক বৃহৎ ভোজনালয় সৃষ্টি করা যাইতে পারে। ইহাতে যেমন ব্যক্তিগত লোভ ও মাৎসর্য হইতে জাতি রক্ষা পাইবে, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপচয় নষ্ট হইয়া দেশের খাদ্যেই অভাব নির্বাহ হইবে; কিন্তু এই কাজ করিবার জন্য প্রয়োজন পুনরায় জবরদস্ত অশোকের মতন; রাজর্ষিকে। দেবতাদিগের প্রিয় অশোককে জবরদস্ত বলিতেছি এই জন্য যে, দুই হাজার বৎসর পূর্বে একমাত্র অশোকই অহিংসা ধর্মকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য সাধারণ প্রজা হইতে রাজবংশীয় আপামর সকলকেই প্রাণীহত্যায় বিরত হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

ঐকত্রিক ভোজনের কল্পনা কার্য্যকরী হইলে কেবল যে খাদ্যদ্রব্যের অপচয় বন্ধ হইবে তাহা নহে, যে বৃহৎ লোকবল ব্যক্তিগত ভৃত্য হিসাবে আমাদের দেশে আটকাইয়া আছে তাহা উদ্ধার করিয়া জাতীয় অন্য গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হইবে। ব্যক্তিগত পরিবারের গৃহিণীরাও দৈনন্দিন অভাবপূর্ণ সংসারের নিরানন্দ একঘেয়ে রান্নাঘর হইতে মুক্তি পাইয়া অন্য কোনও রোজগারী শ্রমমূলক কাজে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ঐকত্রিক ভোজনালয় রাজসরকারের পরিচালনাধীনে থাকায় খাদ্যপ্রাণ নূতন নূতন খাদ্য, তালিকায় শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিবে। জাতীয় স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য সরকারী গবেষণাগার (Dietetic Laboratory) ইহার পিছনে নিযুক্ত হইতে পারিবে। প্রাচীন ভারতের অশোক যাহা করিয়াছিলেন বিংশ শতাব্দীর লেনিন, কামাল ও স্তালিন তাহাই বিভিন্ন প্রণালীতে করিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন।

আমাদের মতন পুরাতন দেশে, যেখানে অধিকাংশ নরনারীই অত্যন্ত গোঁড়া ও সনাতন নিয়মের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধাশীল সেখানে আমার এই আলোচনা সাধারণ লোকের নিকট উদ্ভট মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। এই ভয়াবহ খাদ্যসমস্যা লোক-বৃদ্ধির সহিত উত্তরোত্তর হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনাই অধিক। মৌখিক ও সংবাদপত্র মারফৎ বর্তমানের ন্যায় 'অধিক খাদ্য ফলাও' নীতিতে দেশে খাদ্য বাড়ে নাই—বাড়িতেও পারে না। খাদ্যসম্পদ শীঘ্র অথচ স্থায়ীভাবে বাড়াইতে হইলে রাশিয়ার মতন আমাদের দেশে নদীশাসন হইতে যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যৌথ কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতীত জোড়াতালি দেওয়া আশু মীমাংসা কখনও স্থায়ী সমাধান হইতে পারে না। এই বিরাট পরিকল্পনা যেদিন কার্য্যে পরিণত হইবে, তখন প্রাকৃতিক নিয়মেই বহু সনাতন আচার বিচার নূতনের প্রবল বন্যার প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া যাইবে। সময়োপযোগী নূতন বিধান সনাতন সমাজের সিংহদরজা দিয়া প্রবেশ করিতে অপারগ হইলে তখন চোরা-বালির পিচ্ছিল পথে পড়িয়া বিষাক্ত হইবার পরে খিড়কীদরজার অন্ধকারে আমাদের সামনে হাজির হইয়া থাকে। সমাজদেহ ইতিমধ্যে শনৈঃ শনৈঃ ঘুণে ঝাঁঝরা হইয়া পড়ে আর হঠাৎ ঝড়ে পড়া তাসের ঘরের দিকে নজর পড়ায় আমরা নিরুপায়ের চীৎকারে হাট বসাইয়া থাকি। সময়ে সাবধান না হইলে বহুদিনের সঞ্চিত পাপের অচলায়তনে তুফান একদিন লাগিবেই।

তাই বলিতেছিলাম গ্রামের নিভৃত শান্ত নির্ঝরিণীর মিষ্ট সুশীতল বারির ন্যায় অনেক যুগের অভিজ্ঞতায় গড়া একান্নবর্তী পরিবার সহরমুখো সভ্যতা গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লইয়াছে। প্রাচ্যের ধীর সলাজ শান্ত সভ্যতার স্থানে পাশ্চাত্যের দুর্বার গতি আসন গাড়িয়াছে এখন পিছনে ফিরিয়া আনমনে বিচার করিবার সময় নাই। পথের সামনে দুই আদর্শ ভাসিয়া উঠিতেছে, কোনটী আসল বা কোনটী নকল তাহা বুঝিবার উপায় নাই। একটীকে কিম্বা অপরকে গ্রহণ করিতেই হইবে। হয়তো কালে ফটোগ্রাফীর মতন একের ছায়া অপরের কায়ায় সহিত মিলিত হইবে। জাতির জীবন-মরণের সমস্যা লইয়া দুই জনেই জীবন বেদ রচনা করিয়া চলিয়াছে। পাশ্চাত্যের সকল আদর্শের গোড়ায় ধাপই-জীবনের মানদণ্ড উন্নীত করা। কাজেই সভ্যতার মানদণ্ডে সমতা রাখিয়া চলিতে হইলে পরিশ্রমের অঙ্ক বাড়াইয়া চলিতে হইবে। তাই মনে হয় প্রাচ্যের শান্ত গ্রামের আয়ও প্রশান্ত রন্ধনশালার "ইতি" হয়তো এই পর্য্যন্ত। রোজগারের তাগিদে বেলা বাড়িতে না বাড়িতে যে যাহার কাজে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে, তারপরে দিনান্তে গৃহে ফিরিয়া যদি হারানো শান্ত গৃহের সন্ধান লোকে পায় তবেই সেই কর্মক্লান্ত

শ্রমিক ক্লাব হাউসের সস্তা ঐহিক সুখে না চলিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবে। আমাদের রন্ধনশালাকেও নূতন সভ্যতার আলোয় সংস্কৃত করিয়া মনীষী পার্ব্বাক লিখিত রন্ধনশালায় রূপান্তরিত করিয়া লইতে হইবে। আমেরিকার রন্ধনশালায় গ্যাস কিম্বা বিদ্যুৎশক্তি অতি সুলভে পাওয়া যায়। বাসন ধোওয়া ও ঘর পরিষ্কার করিবার কাজ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে স্বল্প সময়ে নিখুঁতরূপে সম্পন্ন হয়। কাজেই ভৃত্যতন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত গৃহিণী সুশৃঙ্খলায় সকল কাজ নিষ্পন্ন করিতে পারেন। এইভাবে সাধারণ আমেরিকাণ পরিবারে রান্নাঘর নিজ বৈশিষ্ট্য ও ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণ ব্যতীত দরিদ্র জাতির নিরপেক্ষ হইয়া দেশের গঠনমূলক কাজ করিবার জন্যও খাদ্যদ্রব্যের অপচয় বন্ধ করা দরকার। একমাত্র সমবায় প্রথায় স্বল্প সময়ে ন্যূনতম মূলধনে গ্রামে গ্রামে সর্ব্বসাধারণের জন্য রন্ধনশালা তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইলে অপচয়ের অঙ্ক নিম্নতম হইবার সম্ভাবনা। বিপ্লবের পরে লাল রাশিয়া তাহার প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এরা কঠিন পণ করেছে পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত দেশকে যন্ত্রশক্তিতে সুদক্ষ করে তুলবে, বিদ্যুৎশক্তি, বাষ্পশক্তিকে দেশের একধার থেকে আর একধার পর্য্যন্ত কাজে লাগিয়ে দেবে"। "এই কাজের জন্য এদের প্রভূত টাকার দরকার—য়ুরোপীয় বড়বাজারে এদের হুণ্ডি চলে না—নগদ দামে কেনা ছাড়া উপায় নাই, তাই পেটের অন্ন দিয়ে এরা জিনিষ কিনছে, উৎপন্ন শস্য, পশুমাংস ডিম মাখন সমস্ত চালান হচ্ছে বিদেশের হাটে, সমস্ত দেশের লোক উপবাসের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, এখনও দেড় বছর বাকি, অন্য দেশের মহাজনরা খুসী নয়, ব্যাপারটা বৃহৎ ও জটিল, সময় অত্যন্ত অল্প, সময় বাড়াতে সাহস হয় না বলে এরা সকল কষ্ট মুখ বুজে সহ্য কচ্চে"।

দেশের ভৌগলিক অবস্থা, কৃষকের দারিদ্র্য, কৃষিযন্ত্র এবং গৃহপালিত পশু এক সঙ্গে চতুর্ব্বর্গ দারিদ্র্যের সামনে আমরা উপস্থিত। কাজেই উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং টাকায় নূতন যন্ত্রপাতি না আনিয়া আমরা যদি কৃষিজাত দ্রব্যাদি এনে দুর্ভিক্ষের সাময়িক নিবৃত্তি করি তবে কি আমাদের "ইতোনষ্ট ওতঃভ্রষ্ট" হইবে না? দেশের অবস্থা নানাদিক দিয়ে প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যের অপচয় বন্ধ করিতেই হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে দেশের খাদ্যেই যাহাতে দেশের চলে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জায়গায় "ইহঃ সনাতনঃ" বলিয়া যিনি বা যাঁহারা ইহার প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইবেন তাঁহারাই ভাবী ভাববন্যার মহাপ্রলয়ে ডুবিয়া যাইবেন।

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে কলকারখানায়, অফিস কিম্বা সৈন্যদিগের ছাউনীতে ঐকত্রিক ভোজন ব্যবস্থার যে নানা ছন্দ দেখিতে পাওয়া গেল ইহার সহিত জাতীয়জীবনের কি সম্পর্ক এবং সামাজিক মানুষের গোড়াপত্তন হইতে ধাপে ধাপে ইহার কি দারুণ প্রভাব তাহার পরিচয় লওয়া যাউক।

ছাত্র ও বিদ্যালয়ঃ

জাতির ভাবী মেরুদণ্ড, আমাদের কাঁচা ও সবুজ, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা সকাল ১০টা হইতে না হইতেই নাকেমুখে গুঁজিয়া বিদ্যামন্দিরে হাজিরা দেয় তারপরে ৪টা ৫টা পর্য্যন্ত সেখানে বিদ্যা অধিকার মধ্যে তালগোল পাকাইয়া ক্লান্ত অবসন্ন ও ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসে। বিদ্যালয়ের মাঝখানে টিফিন বলিয়া একটা "জিনিষ" আছে, তাহা প্রায় সকলেরই পকেট "সরকারী মাঠ" বলিয়া, ডাণ্ডাগুলি ও গল্পগুজবে অতিবাহিত হয়। কতিপয় ভাগ্যবান হয় মায়ের দেওয়া খাবার কিম্বা ফিরিওয়ালার নিকট হইতে ২।১ পয়সার চীনাবাদাম বা তেলেভাজা চিবাইয়া অকালে লিভার পাকাইয়া ফেলে। স্বাস্থ্যতত্ত্বের সাধারণ নিয়মে ২টার পর হইতে অধিকাংশ ছাত্রই ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্তদেহে পাঠ দেওয়া নেওয়ার কাজ সাঙ্গ করে, কোন কোনও আদর্শ বিদ্যালয়ে ইহারও পরে থাকে জিম্‌নাসিয়াম ক্লাস, অভুক্ত ক্লান্ত শরীরে আদর্শ বিদ্যালয়ের আদর্শ স্বাস্থ্যতত্ত্বের অত্যধিক পরিশ্রমে শিশুদের স্বাস্থ্য আরও ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৯৪১ সালের ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব পরিদর্শক সমিতির কেন্দ্রীয় সভায় রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে ভারতের অনেক স্কুলেই ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার পূর্ব্বে খাওয়া দাওয়া সারিয়া ফেলাই নিয়ম এবং বৈকালে ঘরে ফিরিবার পূর্ব্বে তাহাদের খাওয়ার আর কোনও রেওয়াজ নাই। বিদ্যালয়ের খাটুনী সহিবার মতন যে শক্তি প্রয়োজন তাহা ইহাদের অনেকেরই নাই। ছেলেদের স্বাস্থ্য ও পড়াশোনার উন্নতির জন্য দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।" এখন এই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করে কে? অভিভাবকদের অধিকাংশই কায়ক্লেশে ছাত্রবেতন ও পুস্তকের খরচ বহন করিয়া থাকেন। সেখানে আরও বেশী আশা করা দুরাশা। রাশিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে উজবেকিস্থান কিম্বা তুর্কোমেনিস্থানএর জনসাধারণের শিক্ষার জন্য মাথা প্রতি ৫ রুবল অর্থাৎ ১২৷৹ খরচ করিতেন—যেখানে আমাদের গভর্ণমেন্ট ১৲ টাকা খরচ করাই যথেষ্ট মনে করেন। ইহার পরে আর কিছু করিতে বলিলে ট্যাক্স বাড়াইবার অজুহাত দেখান হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আর্থিক সঙ্গতির উপরে না তাকাইয়া সকল জাতীয় ছাত্রদিগের জন্য একরকম পুষ্টিকর জলযোগের ব্যবস্থা করা দরকার। জাতীয় সরকার হইলে আয়ের ব্যবস্থা আপনা হইতেই হইবে। খাওয়ার পরেই শিশুমনের একত্ববোধের দ্বিতীয় পাঠ একই রকম পোষাক—বর্ত্তমানের "ধুতি পাঞ্জাবী," "চোপা চাপকান" ও "ছেঁড়া জাঙাল"এর সম্মিলিত শোভাযাত্রা বিভেদই স্থায়ী করিয়া থাকে। সরকার যদি এই খরচের দায়িত্ব বহন করিতে সত্যিই অপারগ হয়, জনসাধারণকে জয়যাত্রার প্রথম পায়ের কড়ি গুণিতেই হইবে। শিক্ষা সম্পর্কে রাশিয়াই বা কি করিতেছে তাহাও আমাদের জানা ভাল। সেখানে শিক্ষাকে জীবনযাত্রার সাথে মিলাইয়া লওয়া হইয়াছে, প্রণালী খুব সজীব এবং প্রাণবান। সংসারের সীমা হইতে বিদ্যালয়ের সীমাকে সরাইয়া লওয়া হয় নাই। আমাদের দেশের মতন এখানের বিদ্যালয় কেবল পাশ করাইবার জন্য কিম্বা পণ্ডিত বানাইবার জন্য শিক্ষাযন্ত্রে পরিণত হয় নাই। সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা পাড়ার প্রাইমারী স্কুলে লেখাপড়া শিখে। যে শিশুর পিতামাতা বিদেশে কোনও কল কারখানায় কিম্বা কৃষিক্ষেত্রে কাজ করে তাহারা ছেলেমেয়েদিগকে নূতন একরকম স্কুলে রাখিয়া যায়। এইগুলি অনেকটা নার্শারী স্কুল। আবার যদি দেখা যায়—পিতামাতা ছেলেমেয়েদের শিক্ষার তেমন সুব্যবস্থা করিতেছেন না তবে গভর্ণমেন্ট সেই

সকল ছেলেমেয়েদিগকে নার্শারী স্কুলের বোর্ডিং হাউসে রেখে দেন। ইহাতে কিন্তু সকল সময় পিতামাতার ভরণপোষণের দায়ীত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। সেখানে ভাবটা এইরকম যে, ছেলেমেয়েদের গড়্‌বার দায়ীত্ব ষ্টেট ও পিতামাতা উভয়েরই।

ছেলেমেয়েরা ষ্টেটের আদর্শ অনুযায়ী লেখাপড়া ঠিক মতন করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত আছেন। নার্শারী স্কুলে ৭।৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পড়িতে পাওয়া যায় তাহার পরে তাহারা ষ্টালিনের "ক্যমুন" বা একরকম আশ্রমে আশ্রয় পায়। রবীন্দ্রনাথের মতে এই আশ্রমগুলি শান্তিনিকেতনের ব্রতীবালকদের মতন। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় থাকিবার সময় এইরূপ একটী আশ্রম দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হন। আমাদের দেশে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা যে সময়ের মধ্যে দুবারের বেশী খাইতে পায় না, সেই সময়ের মধ্যে এই সকল নার্শারী স্কুল বা আশ্রমে তিনবার ভাল পেটভরা খাবার দেওয়া হয়। রাশিয়ার ব্রতীবালকদের শিক্ষাপদ্ধতি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন "শিক্ষা কেবল পুঁথিপড়ার শিক্ষা নয়, নিজের ব্যবহারকে, চরিত্রকে একটা বৃহৎ লোকযাত্রার অনুগত করে এরা তৈরী করে তুলেছে। তিন নয়ে সাতাশ হয় এইটে মুখস্ত করাকে তারা শিক্ষা বলে মনে করে না। এরা প্রথমে শিক্ষকদের নিকটে পাঠান তারপরে নিজেরা পাঠ থেকে ছবি আঁকে, এই রকম করে বছরে ৯ মাস পড়াশুনা করার পরে অন্যান্য স্কুলে এরা উক্ত পাঠ শিক্ষকতা করবার জন্য প্রেরিত হয়। এই শিক্ষকতা কার্য্যে সাফল্যলাভ করলে তবে তারা নিজ নিজ শেষ পরীক্ষায় পাশ বলে স্বীকৃত হয়।" ব্রতী বালক-বালিকাদের দৈনন্দিন কাজের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন ; সকাল ৭টার সময়ে ওরা বিছানা থেকে উঠে, তারপরে পনরো মিনিট ব্যায়াম, প্রাতঃকৃত্য, প্রাতরাশ সেরে আটটার সময় ক্লাসে বসে। একটার সময় কিছুক্ষণের জন্য আহার ও বিশ্রাম, বেলা ৩টা পর্য্যন্ত ক্লাস চলে। তিনটার পরে বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী কারখানা, হাসপাতাল, গ্রাম প্রভৃতি দেখতে যায়। এই সকল আশ্রমে ১৬ বছর বয়স পর্য্যন্ত পড়াশোনা করে অধিকাংশই নানাদিকে ঢুকে পড়ে, কেবলমাত্র যারা বিশেষজ্ঞ হতে চায় তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হয়। এদের শিক্ষনীয় বিষয়-তালিকা অনেকটা আমাদের ইণ্টার মিডিয়েটের মতনই বরং হাতের কাজ, ছুতোরের কাজ, হাল আমলের চাষযন্ত্রের ব্যবহার ইত্যাদি বেশী শিখতে হয়। আধপেটা খেয়ে গলা পর্য্যন্ত শুখিয়ে কাঠ হয়ে ফিরে একমাত্র আমাদের ছেলেমেয়েরা ; তাই জীবনযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই জরা এসে ধরা দেয়।

কল কারখানা ও যৌথ কৃষিপ্রতিষ্ঠান :

মানুষের জীবনে ছাত্রাবস্থার পরেই আসে রুজী রোজগারের সময়। য়ুরোপে সরকারী কাজে যত লোক নিযুক্ত তার চেয়ে বেশী লোক কল-কারখানায় জীবিকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ঠিক ইহার বিপরীত, প্রায় শতকরা ৮০ জন লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও য়ুরোপে এক রাশিয়া ব্যতীত সর্ব্বত্র কলকারখানা ও কৃষিপ্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। ব্যক্তিগত বলিলেও বেশী বলা হয় না, য়ুরোপের প্রত্যেক দেশে অর্দ্ধাংশের যাবতীয় সম্পত্তির ন্যাসরক্ষক কয়েকটী পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজ্যের যাবতীয় সম্পত্তি কয়েকটী পরিবারের কুক্ষিগত হওয়ার ফলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কতিপয় বিত্তশালী পরিবার ব্যতীত দারিদ্র্যে দেশ ভরিয়া যায়, গুটীকয়েক বিত্তশালীর অত্যাচার জাতির মর্ম্মবেদনার কারণে পরিণত হয় এবং ইহারই ফলস্বরূপ রাশিয়ায় "সবার উপরে মানুষ সত্য" এই চিরন্তনী সত্য গৃহীত হয়। এই চরম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই রুশরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয় ক্ষতি অগ্রাহ্য করিয়া অসাধ্যসাধনে সমর্থ হইয়াছে, জাতির এই একতার গোড়ায় ঐকত্রিক ভোজন ব্যবস্থার কৃতিত্ব কম নহে। রাশিয়ার হোটেল রেস্তোরায় খাওয়া দাওয়ায় ধনী দরিদ্রের কোন তফাৎ নাই, ইতর ভদ্র সকলেই একই সঙ্গে একই সময়ে একই তালিকার ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। যে সকল প্রাসাদোপম অট্টালিকা বিপ্লবপূর্ব্ব রাশিয়ার ধনীদের বিলাসকুঞ্জ ছিল এখন সেখানে হয় কোনও মিউজিয়াম, সাধারণের শিক্ষনীয় বিদ্যালয়, অপেরা অথবা ভোজনালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জাতির একত্ব বোধের গোড়ায় এই সমসমাজ ব্যবস্থা বিপ্লবী ভাবধারার সৃষ্টি করিয়াছে। যুদ্ধপরিস্থিতিতে বাধ্য হইয়া খাস ইংলণ্ডেও এই জাতীয় সুস্থ আবহাওয়া তৈয়ারীর চেষ্টা হইয়াছে। বিস্তর ব্যবসাবাণিজ্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ লোকে বুঝিতে পারিয়াছে যে খাদ্য বাণিজ্য ও অর্থ যাঁহাদের হাতে, যুদ্ধও বাধাইয়া থাকেন তাঁহারাই, সাধারণে কেবল সস্তা বুলির চটকে মুগ্ধ হইয়া পতঙ্গের ন্যায় অনলে ঝাঁপাইয়া পড়ে ও মরে।

ইংলণ্ড সমসমাজ ব্যবস্থায় অনেক দূর অগ্রসর হইলেও রাশিয়ার মতন বিপ্লব এখানে আসে নাই, যুদ্ধের বিভীষিকায় কতকটা বাধ্য হইয়া ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে কোলাকুলি ও আপোষ হইয়াছে।

ব্রিটিশ প্রজাতন্ত্রের সহিত সাধারণের অবোধ্য রাজতন্ত্রের সংমিশ্রণের আপোষমূলক নীতি এখানে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় দো-তরফা নীতি ব্রিটীশচরিত্রের এক অজেয় ঐতিহ্য। তাই ঘরোয়া ব্যাপারে শ্রমিকরাষ্ট্র সমাজতন্ত্রবাদী হইলেও বৈদেশিক ব্যাপারে পুরা বুর্জোয়া। ঐকত্রিক ভোজন ব্যবস্থা যুদ্ধের চাপে গৃহীত হইলেও অভিজাত বংশীয়দের জন্য কিছু আপোষ করা হইয়াছে। ছোট বড় সকল হোটেলের খাদ্য তালিকা এক হওয়া সত্ত্বেও অভিজাতবংশীয় কেহ সাধারণ শ্রমিকের সহিত একই টেবিলে খাদ্যগ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলে আলাদা সাজান ঘরে ভাল চাকনীওয়ালা চেয়ার টেবিলে বিলাসী আবহাওয়ায় খাবার খাইতে পারেন। এই বিলাসী মনের তৃপ্তির জন্য ধনী ও অভিজাতদের খাদ্যের মূল্য ব্যতীত "কভার চার্জ্জ" বলিয়া পৃথক মূল্য দিতে হয়। যুদ্ধের মধ্যে খাদ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত বলিয়া যাহাতে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ না হয় তৎপ্রতি রাষ্ট্রের লক্ষ্য খুব বেশী। এই জন্য নানা গবেষণাগার স্থাপিত হয়, এবং রসনা তৃপ্তির উপরে সব সময় বেশী নজর দিতে সমর্থ না হইলেও স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে খরদৃষ্টি রাখা হয় এবং নিত্য নূতন পরীক্ষিত খাদ্যদ্রব্য তালিকায় যুক্ত হয়। এই কারণেই দীর্ঘ ছয় বৎসরের বাধ্যতামূলক স্বল্পাহারেও জাতির শক্তি কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই বরং জয়ের হার

যুদ্ধপূর্ব ইংলণ্ডের সংখ্যাকে আশাতিরিক্ত ভাবে পিছনে ফেলিয়া গিয়াছে। যুদ্ধপরিস্থিতির ডামাডোলের মধ্যে ও খাদ্যতত্ত্ব সম্পর্কে নানাবিধ গবেষণা করিতে গিয়া য়ুরোপীয় খাদ্য বিজ্ঞান বিপুল উন্নতি লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের এক বৎসর পরেও আমাদের দেশে মন্বন্তর চলিতেছে অথচ প্রবল যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত রাশিয়া তাহার দেশের খাদ্য রেশনিং তুলিয়া দিতেছে। এই সংবাদের কৈফিয়তে বলা হইয়াছে য়ুক্রেন ও ভলগা উপত্যকা জার্ম্মাণ সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ার পরে লক্ষ লক্ষ রাশিয়ান গৃহহারা হইয়া য়ুরাল পর্ব্বতের পূর্ব্বদেশের জঙ্গল কাটিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে; আজ ইহাদের ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রের শস্যসম্পদ সোভিয়েট রাশিয়ার হৃতসর্ব্বস্ব নরনারীর ক্ষুধার অন্ন পরিবেশন করিতে সমর্থ হইয়াছে, অথচ আমাদের দেশে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে কিম্বা আরাকানের যুদ্ধে যাহারা গৃহহারা হইল তাহাদের কেহ কেহ কলিকাতার ফুটপাতে কেহ বা আশ্রয় ছাউনীর নিভৃতে, দলে দলে মৃত্যুবরণ করিল।

দেশ বিদেশের কলকারখানা যৌথ কৃষিক্ষেত্র কিম্বা সৈন্যদের ছাউনীর সাথে সাথে চলমান ঐকত্রিক ভোজনালয় যুদ্ধপ্রচেষ্টার সকল বিভাগকে সক্ষম, উত্তমশীল ও কার্য্যক্ষম রাখিয়াছিল। এই মহাযুদ্ধে বিজয়ী সৈন্যদের প্রয়োজনাতিরিক্ত রসদ সরবরাহ জয়লাভের অন্যতম হেতু। সরবরাহ প্রস্তুতকারী শিল্পী, চাষী এবং কারিগরদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার পশ্চাতে স্বাস্থ্যপূর্ণ খাদ্যসরবরাহ, সকল গোপনীয় আয়ুধের অন্যতম।

বিগত যুদ্ধে আমাদের দেশেও নানা কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছিল, নানা দেশের নানাভাষী লোক এই সকল কারখানায় সমবেত হয়। সকল শ্রেণীর শ্রমিকের সারাদিন খাটুনীর পরে মিলনের স্থান ছিল কলকারখানার সংশ্লিষ্ট ক্যান্টিনে। ঐকত্রিক ভোজনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন জাতীয়, বিভিন্ন দেশীয়, নরনারীর মধ্যে যুদ্ধের বীভৎসতায় মধ্যেও যে ঐক্য ও হৃদ্যতা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, আশাতিরিক্ত উৎপাদন এবং নিখুঁত সরবরাহের গোপন ইতিহাসে এইখানে। একত্র বাস, একত্র ভোজন এবং এক উদ্দেশ্য যে বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে গভীর ঐক্যের সৃষ্টি করে তাহা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন কাহিনীর মধ্যে জানিতে পারা যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাধারণ সৈনিক হইতে সেনানী পর্য্যন্ত "নেতাজী সাধারণ সৈনিকের সহিত একই খাবার খাইতেন" এই কথা বলিবার সময় আবেগকম্পিত হইয়া উঠেন। বস্তুতঃ নেতাজীর সৈন্যদল সৃষ্টির মূলে ঐকত্রিক আহার স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে কম সাহায্য করে নাই। এইরূপে প্রাচীন ক্ষুদ্র পারিবারিক রান্নাঘর আজ ব্যষ্টিজাগরণের দিনে বিরাট জাতীয়তা ও একত্রীকরণের কাজে নিয়োজিত হইতে চলিয়াছে।*

* কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ Collective, Community অর্থে "ঐকত্রিক" এই পদ ব্যবহার করিয়াছেন। লেখক সেই একই অর্থে প্রবন্ধের এই নামকরণ করিয়াছেন।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

মহেন্দ্রবাবুর বাটীর এক কক্ষ। বিক্রম রাধা ও অনুরাধা বসিয়া কথা কহিতেছে। ইহাদের পিছনে ঘরের ধারে বারান্দা দেখা যায়।

রাধা। কি হয়েছে, কিছু জানিস না তুই? এত আসতো যেতো, হঠাৎ কী হল যে একেবারে আসে না? বাবার অসুখের খবর জানতেও আসে না। কেন?

অনু। তা আমি কী করে জানব?

রাধা। তুই কিছু জানিস না? নিশ্চয় জানিস।

অনু। বলছি জানি না, তবু খালি ঐ কথা। জানি না, জানতে চাইও না।

রাগ করিয়া প্রস্থান

রাধা। কনক মেয়েটিও অনেক দিন আসে নি যে ভেতরের খবর দেব। নিশ্চয় কিছু ঝগড়া করেছে।

বিক্রম। ওদের রাগের কথা ছেড়ে দিন। আপনি ওদের মুরুব্বিকে ছোট ছেলে মেয়ের বেশি কিছু ভাবেন নাকি? আমার ত হাসি পায় এই সব যাকে বলে তরুণ তরুণীদের ব্যাপার দেখে।

রাধা। আপনার কিসে যে হাসি পায় আর কিসে পায় না, তা তো বুঝি না। রুগী দেখতে গিয়েই যার হাসি পায়। কিন্তু হাসির কথা নয়, বীরুবাবু, অনুর বিয়ে দিয়ে বাবাকে নিয়ে কাশী চলে যাব, এরই জন্যই দিন গুণছি আমি।

বিক্রম। বেশ তো, তাই যাবেন। আমার আপত্তি নেই।

রাধা। জয়ন্ত ছেলেটি বড় ভালো, আর মনে হয় অনুকে কালো বলে অপছন্দ করে না—

বিক্রম। তা যে করে না তা আমি লিখে দিতে পারি।

রাধা। বেশ তো, আপনি লিখেই দেবেন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হবে না। দেশে মেয়ের অভাব নেই, জয়ন্ত যে আমাদের অনুকেই বিয়ে করবে এমন কোনও কথাও হয় নি। আমার কালো বোন, তাল যদি ওকে না বাসে, তা হলে বিয়ে দেবও না আমি। তার আত্মীয় পরিজনও যদি ওকে আদর করে না নিয়ে যায়, তবে সে যাবে না কারও বাড়ীতে।

বিক্রম। এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত আপনার সঙ্গে। মেয়েরা হলেন লক্ষ্মী, তা সে কালোই হন আর ফরসাই হন। লক্ষ্মীকে পূজো করে আবাহন করে আনতে হয়।

রাধা। জয়ন্ত অনেকদিন আসে নি। রাগ করেছে না-কি—

বিক্রম। না, রাগ করে নি সে। আমাকে নিজে বলেছে। পরশু দিন কলেজ ষ্ট্রীটে একটা রেস্তোঁরাতে জয়ন্তবাবুকে দেখলুম। বল্লুম, কী খবর? আর আসেন না কেন, রাগ করেছেন?

রাধা। আপনার যেমন জিজ্ঞেস করা। তাই বুঝি কেউ বলে যে হ্যাঁ, আমি রাগ করেছি। তারপর, কী বল্লে?

বিক্রম। কী বল্লে তা বলা শক্ত। কারণ সেটা অত্যন্ত বেশি কথা। অত্যন্ত বেশি জোরে হেসে উঠ্‌ল, অত্যন্ত বেশি অভ্যর্থনা করে আমাকে ডেকে বসালে, অত্যন্ত বেশি আতিথেয়তার সঙ্গে চা-যোগ করালে। হাসতে হাসতে বল্লে—রাগ করতে যাব কেন? কী আশ্চর্য্যি, ইত্যাদি। এবং রাগ যে করেনি, বোধহয় তাই প্রমাণ করতে অজস্র গল্প করলে, সকলের সব খবর, আপনার বাবার কথা, আপনার কথা, মধুর কথা, এমন কি আমার কথাও জিজ্ঞাসা করলে, করল না কেবল শ্রীমতী অনুরাধার কথা। অনুরাধা বলে কোনও মেয়ে যে ওরই সঙ্গে এক পৃথিবীতে বাস করছে, সে বিষয়ে ও একেবারেই অবহিত নয়। তবু বলে রাগ করেনি—হাঃ হাঃ হাঃ—

হাসির ছোঁয়াচ্‌ লাগিয়া রাধাও হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু হাসি সত্ত্বেও দুশ্চিন্তা কাতর স্বরে বলিল—

রাধা। না, বীরুবাবু, হাসির কথা নয়।

বিক্রম। নিশ্চয় হাসির কথা নয়। তবে এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের মুরলীর কথা আপনাকে বলা দরকার। বেশ ভালো ছেলে, লেখাপড়া করে, বি-এসসি দেবে। হঠাৎ একবার মুরলীর মাথা খারাপ হ'ল। ক্রমে বেড়ে গেল মাথার রোগ। দেওয়া হল একটা প্রাইভেট এসাইলাম-এ। মাস কতক পরে সুস্থ হয়ে মুরলী বাড়ী এসেছে। আসার দিন-দুই পরে কী একটা তুচ্ছ কারণে বাড়ীর পুরোনো চাকরকে মুরলী ভীষণ বকা-বকি গাল মন্দ করেছে। চাকর কাপড় গামছা নিয়ে মুরলীর মাকে এসে বল্লে—চল্লুম। বুড়ী মা বেচারী তাকে বোঝাচ্ছেন—কিছু মনে করো না বাবা, কাজ ছেড়ে যেও না, ওর কী মাথার ঠিক আছে, ওর কথা ধরো না, ইত্যাদি। মুরলী যে কখন দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ী দেখেন নি—এই আর যায় কোথা। তেড়ে এসে চীৎকার করে মুরলী বল্লে—হাই-ড্রোজেন প্যারক্সাইডের ফরমুলা কী বল তো? হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড? বলেই কড়্‌কড়্‌ করে ফরমুলা আউড়ে গেল, হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড, এথিল্‌ ক্লোরাইড, সোডিয়াম্‌ হাইপো সলিফাইব ইত্যাদি। মা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ফরমুলা আবৃত্তি শেষ করে মুরলী বল্লে—পাগল! বলে চলে গেল। অর্থাৎ মাথা যে তার ঠিক আছে তারই প্রমাণ দিয়ে গেল সে।

বিক্রম হাসিতে লাগিল, রাধাও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। এই সময় পিছনের বারান্দায় মহেন্দ্রবাবু আসিয়া দাঁড়াইলেন, ইহারা জানিল না।

বিক্রম। ও সব কিছু নয়, সব ঠিক হয়ে যাবে। শুনেছি ভালবাসার ধর্ম্মই নাকি ওই। বিয়েটা হয়ে গেলেই দেখা যাবে সব ঠিক হয়ে গেছে। কোথাও কিছু বাধবে না তখন।

রাধা। হলে তো বাধবে না, কিন্তু হওয়ার আগে যে অনেক বাধা।

বিক্রম। বাধা তো আছেই সেই বাধাকে জয় করাই আমাদের কাজ। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। অথচ শুভস্য শীঘ্রম্‌ সুতরাং শ্রেয়কার্য্যটি আমার ছুটি ফুরোবার আগে যদি সেরে যেতে পারি তা হলেই ভালো হয়।

রাধা। এত শীগ্‌গির কী করে হবে? ওর বাবার যদি মত না থাকে, কেই বা বলবে তাঁকে, কে দেখা করবে—

বিক্রম। দেখি না, মত হয় কি না। আমি নিজে কথা কইব, কর্ত্তাকে বলে তাঁকে রাজী করিয়ে, অনুমতি আদায় করে, (মহেন্দ্রবাবু অন্তর্ধান হইলেন) পারি তো দিন স্থির অবধি করে আসব।

রাধা। তা যদি পারেন বীরুবাবু, তা হ'লে—

বিক্রম। বুঝতে পেরেছি। তাহলে ভূতলে একটা অতুল কীর্ত্তি রেখে যাব, এই তো? কিন্তু মধ্যে মধ্যে হেসে ফেললে কিছু মনে করতে পারবেন না, তা বলে দিচ্ছি। এবং আপনার প্রেমিক প্রেমিকাদেরও বলে দেবেন যেন রাগ করে না বসেন। কী ভাগ্য, আমার কখনও ও পাগলামি হয় নি। হলে কী বিপদ যে হত।

রাধা। বিপদ কোন খানটায় হত?

বিক্রম। বিপদ বই কি। 'অন্যে হেসে যাবে, তুমি রবে নিরুত্তর।' পাঁচজনে এই রকম হাস্য উপভোগ করতো তো আমার খরচায়?

রাধা। সত্যি বীরুবাবু, আপনি বিয়ে করেন নি কেন?

বিক্রম। আপনি ভদ্রতা বশতঃ, বা আমার মনে আঘাত দেবার ভয়ে, প্রশ্নটা ঘুরিয়ে করলেন। আসল প্রশ্নটা হচ্ছে—বাংলা দেশে এত মেয়ে থাকতে আমাকে কেউ বিয়ে করলে না কেন? এই তো?

রাধা। তা হলে বলুন মেয়ে দেখি?

বিক্রম। এঃ, আপনি নেহাৎ বাঙ্গালী মেয়ে। বিয়ের ঘটকালি করতে পেলে আর কিছু চান না।

রাধা। আপনিও তো ঘটকালি করতে যাচ্ছেন।

বিক্রম। তা যাচ্ছি। ঘটকালি আমার প্রিয়কার্য্য নয়, মানে যাকে বলে হবি (hobby) নয়, তবে উচিত বুঝলে করব না, এমন প্রেজুডিস্‌ও নেই। কিন্তু আপনারা যে, অনুচিত উচিত বাছেন না।

রাধা। বেশ, তাই। তা'হলে কথা রইল—সম্বন্ধ দেখছি।

(পিছনে পুনরায় মহেন্দ্রের আবির্ভাব)

তাহলে ছুটি ফুরোবার আগেই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন করার ব্যবস্থা হোক, কেমন?

(কৌতুকোজ্জ্বল মুখে রাধা বিক্রমের মুখের দিকে চাহিল, বিক্রমের মুখেও প্রসন্ন হাস্যের রেখা ফুটিল। মহেন্দ্রের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।)

বিক্রম। হুঁ, তারপর?

রাধা। তারপর আবার কী? তারপরের ভাবনা আমার নয়। সে ভাবনা যে বিয়ে করবে তার।

মহেন্দ্র অদৃশ্য হইলেন

কেমন, আমি মেয়ে ঠিক করি?

বিক্রম। ক্ষেপেছেন আপনি! আমার চাল নেই, চুলো নেই, নেহাৎ চা বাগানের কুলীগুলো দয়া করে আছে, তাই তাদের মেরে খাচ্ছি। আমার মতো হৃদয়হীন লক্ষ্মীছাড়াকে বিয়ে করবে, কার বয়ে গেছে?

মহেন্দ্রের আবির্ভাব

রাধা। সে আমি বুঝবো। আপনাকে স্বামীরূপে পেলে যে কোনও মেয়ে ধন্য হয়ে যাবে। টাকা পয়সা কম কি বেশি, সে হিসেব মেয়েদের কাছে নিরর্থক। তার পরিমাণ আমি জানতে চাই নে। কিন্তু আসল বস্তু মন, তার পরিচয় তো আমার কাছে অজানা নয়।

মহেন্দ্র সরিয়া গেলেন

বিক্রম। কী আশ্চর্য্য! আপনি যেন সিরিয়াস্ বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, লোকের বিয়ে দিতে আপনি এত ব্যস্ত কেন বলুন তো?

রাধা। বিয়ে দিতে ব্যস্ত নই। ব্যস্ত লোককে সুখী দেখতে।

অল্পক্ষণ চক্ষু মুদিয়া বিক্রম নীরবে বসিয়া রহিল। তারপর গম্ভীর স্বরে কহিল—

বিক্রম। আপনি বলছিলেন আমাকে স্বামীরূপে লাভ করে যে-কোনও মেয়ে নাকি ধন্য হয়ে যাবে। অতটা স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু তাই যদি হতো, সেইটেই যথেষ্ট হতো কি না, নিজের মধ্যে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলুম। দেখলুম, যে-কোনও মেয়েকে ধন্য করতে আমি চাই না। ধন্য করে, কৃতার্থ করে, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা আদায় করে আমি সুখী হতুম না। বিয়ে যদি করতেও চাইতুম, তা হলে চাইতুম এমন মেয়েকে যাকে পেলে ধন্য হয়ে যেতুম আমি। ধন্য করে সুখ, না ধন্য হয়ে সুখ, তাই ভাবছি।

রাধা। সে রকম মেয়েও তো জগতে অপ্রাপ্য না হতে পারে।

বিক্রম। প্রাপ্য কি না, সে পরীক্ষা করবার সাধও নেই, প্রয়োজনও নেই। ও পাঠ পড়ি নি, ভালবাসা, প্রেম, ওসব বইয়ে পড়ে মজা লাগতো, বন্ধু-বান্ধবের মুখে শুনে ঠাট্টা করতুম। কিন্তু সত্যি ভালবাসার রূপ সম্প্রতি দেখেছি মিসেস সেন, তাই ও বস্তু নিয়ে ছেলে খেলা করবার ধৃষ্টতা আমার হবে না। (কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিল) আপনি বল্লেন, সে রকম মেয়ে পাওয়া সংসারে অসম্ভব নয়। ও রাজ্যের খবর অবশ্য আমার অতি সামান্যই জানা আছে। কিন্তু তবু মনে হয়, যে মেয়ের প্রেম লাভ করলে ধন্য হওয়া যায়, সে মেয়ের দেখা সংসারে ঘরে ঘরে পাওয়া যায় না।

রাধা চুপ করিয়া রহিল

অনুরাধার প্রবেশ

অনুরাধা। (উভয়ের মুখের পানে চাহিয়া) বাঃ, দুটীতে চুপ চাপ যে? মুখোমুখী, গম্ভীর দুখে দুখী, তারপর কী দিদি?

রাধা। (হঠাৎ উঠিয়া) বাবা উঠেছেন বোধ হয়, দেখি কোনও দরকার আছে কি না।

অনুরাধা। না, না, দরকার নেই। আমি এই তো দেখে আসছি, ঘরের মধ্যে বেড়াচ্ছেন। তুমি বসো।

রাধা শুনিল না, চলিয়া গেল

অনুরাধা। আমারই দোষ।

বিক্রম। নিশ্চয়। কিন্তু কী দোষ বল তো?

অনুরাধা। ঐ ছুটো লাইন আমি দিদিকে আর জামাইবাবুকে প্রায়ই বলতুম। আপনাকে দেখলে আমার জামাইবাবুর কথা মনে পড়ে যায়। আপনার সঙ্গে বোধ হয় তাঁর কোথায় মিল আছে।

বিক্রম। হুঁ, তা আছে। আমরা পরস্পরের জামা, প্যাণ্ট, এমন কি জুতো পর্য্যন্ত বদলাবদলি করে পরতুম। পেছন থেকে দেখে লোকে একজনকে অপরজন মনে করে ভুল করেছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে।

অনুরাধা। কবে যে জামাইবাবু ফিরবেন! যত দিন যাচ্ছে, দিদির মুখের দিকে আর চাইতে পারি না। তবু ভাগ্যে আপনি এসে পড়েছিলেন। তা আপনিও নাকি চলে যাচ্ছেন? সত্যি বীরুদা?

বিক্রম। সত্যি বই কি। আর ছুটি দেবে না। অবশ্য আর দরকারও নেই থাকবার। আমার বোর্ডিংএর রুম ছেড়ে দেবার কথা দিয়েছি।

অনুরাধা। বাবা ভাল হয়েছেন বলে আর কোনও দরকার বুঝি থাকতে নেই?

বিক্রম। হুঁ, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছে, একটা কাজ আছে বটে। একটা ঘটকালি কেস হাতে পেয়েছি পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে। তা' সেটা এরই মধ্যে হয়ে যাবে, তুমি ভেবো না। (উঠিল)

অনুরাধা। আমি ভাবছি না। আপনাকেও ভাবতে হবে না। কিজিসিয়ান হিল দাইসেল্ফ্। মনে রাখবেন আগে নিজের ঘটকালী করতে শিখুন।

বিক্রম বাহিরে গেল। অনুরাধা চলিয়া যাইতেছিল, অপরদিক হইতে রাধা প্রবেশ করিয়া ডাকিল—

রাধা। অনু, শোন। অনুরাধা ফিরিল।

অনুরাধা। কী বলছ?

রাধা। তোর সঙ্গে কথা আছে। বোস।

রাধার গম্ভীর মুখ ও কথা শুনিয়া অনুরাধা বিস্মিত হইয়া।

অনুরাধা। কী হয়েছে দিদি? বাবা কি—

রাধা। বাবা ভাল আছেন। কথা তোরই সম্বন্ধে। দেখ, তুই বড় হয়েছিস, তোর সঙ্গে পরামর্শ করাই উচিত আমার। আর কে আছে আমাদের পরামর্শ দেবার। বীরুবাবু চলে যাবেন, যতই বন্ধু হন, তিনি পর। আমাদের জন্তে কলকাতার বোর্ডিং ভাড়া দিয়ে রইলেন—

অনুরাধা। সে তো আমি সব জানি। তুমি কী বলবে বল না। কিসের পরামর্শ?

রাধা। (অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া) তোর বিয়ের পরামর্শ। তোর ব্যবস্থা না করে—

অনুরাধা। কোন পরামর্শ, কোনও ব্যবস্থা দরকার নেই। আমি বিয়ে করব না।

রাধা। ছেলেমানুষি কথা কস্ নি অনু। আমি জয়ন্তর বাবার কাছে বীরুবাবুকে যেতে বলেছি।

অনুরাধা। সে কী? কেন বললে? কেন তুমি তাদের কাছে ভিক্ষে চাইতে যাবে?

রাধা। বীরুবাবু নিজেই যাবেন বললেন। আমি মত দিয়েছি। ভিক্ষে চাওয়া তো নয় ভাই, এক দিক থেকে তো প্রস্তাব করতে হবে, নইলে কোনও বিয়ের সম্বন্ধই হয় না। কিন্তু তোর কী মত, আমাকে খুলে বল দিকি। জানি না জয়ন্তর বাবা মা কী ধারণা পোষণ করেন আমাদের সম্বন্ধে। কিন্তু যদি তাঁরা রাজী হন, তোর মত আছে তো।

অনুরাধা। (মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল) কী দরকার দিদি? তাঁরা বড়লোক, তাঁদের ছেলের বিদ্যা বুদ্ধি রূপ গুণ কত, আমরা নগণ্য গরীব, আমি—আমি কালো—অতি সাধারণ—(বলিতে বলিতে ভাবাবেগে তাহার কণ্ঠ থামিয়া আসিল।)

রাধা। কালো বলেই বলছি ভাই। কালোকে আদর করে না নিয়ে গেলে সে যাবে না। আর তোর অমতেও আমি তোকে কোথাও পাঠাব না। তাই জিজ্ঞেস করছি, বীরুবাবু যাবেন ওদের বাড়ী তো? তুই বল।

অনুরাধা। না, দরকার নেই। ওখানে কথা তোলবার দরকার নেই।

রাধা। তা হলে অন্য সম্বন্ধ দেখতে বলি। বাবা ভাল হয়েছেন। জেঠামশাইয়ের কাছে কাশীতে যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছেন। তোর বিয়ে না হলে তো যেতে পারি না। দেখ, আমাদের আর এভাবে থাকাও ভাল দেখায় না। সংসারে কত রকমের লোক আছে। তা হলে অন্য সম্বন্ধ—

অনুরাধা। না দিদি, কোথাও আমার সম্বন্ধ করতে হবে না। কিছু ভাবতে হবে না আমার জন্যে। আমার জন্যে যদি তোমাদের এত ভাবনা, এত অসুবিধে, আমি চলে যাব কোথাও—তোমরা না আশ্রয় দাও—আমি যেখানে হোক চলে যাব, কিন্তু কারও পায়ে ধরে সেধে আমাকে বিয়ের করার ব্যবস্থা কর না। দোহাই তোমাদের।

বলিতে বলিতে অনুরাধা কাঁদিয়া ফেলিল। এবং কান্না লুকাইতে মুখ ফিরাইয়া বসিল

রাধা। (ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া) ছিঃ অনু, অত সামান্যতে কাতর হলে চলবে না তো বোন। অনেক কষ্ট সহ্য করবার জন্যে আমাদের সৃষ্টি করেছে বিধাতা। এরই মধ্যে অধীর হলে চলবে না। যদি জানতিস আমার কী অবস্থা। যদি তোকে সব কথা—

হঠাৎ থামিয়া গেল রাধা। তাহা লক্ষ্য করিয়া অনুরাধা ফিরিয়া তাহার পানে তাকাইল ও প্রশ্ন করিল—

অনুরাধা। কী বলতে যাচ্ছিলে দিদি? কী তোমার অবস্থা জানি না, বল—

রাধা। আজ থাক, আর একদিন বলব।

রাধা উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইবার জন্য অগ্রসর হইল।

অনুরাধাও উঠিয়া বলিল—

অনুরাধা। কেন, আর একদিন কেন? এমন কী কথা তোমার আছে যা আমাকে বল নি? যা এখনও বলা যায় না?

রাধা। বলা যায়। তোকে বলতেই হবে, নইলে কাকে বলব বল্। আর কে আছে আমার—

এই সময় আবার বারান্দার দরজার উপর মহেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল। ইহারা দেখিল না। রাধা আপন মনেই বলিল—

আর বাবাকেও বলব। আর ঠকাব না, অনেক ঠকিয়েছি—

বলিতে বলিতে রাধা বাহির হইয়া গেল। অনুরাধা নীরবে অনুসরণ করিল। মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া পায়চারি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন (ক্রমশঃ)

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চবার্ষিকী কৃষি পরিকল্পনা

ভারতবর্ষের জমি অনুর্বরা নয়, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষি ব্যবস্থার জন্য এদেশে ফসল উৎপাদনের হার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, জাপান প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশের তুলনায় একান্ত কম। বিখ্যাত বোম্বাই পরিকল্পনায় উল্লিখিত নিম্নলিখিত হিসাবে ভারতের শোচনীয় অবস্থার একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যাইবে:—

(প্রতি একর জমিতে টন হিসাবে উৎপাদন, ১৯৩৯-৪০ সালের হিসাব)

দেশ	ধান	গম	আখ	তুলা
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	১°০১	০°৩৭	২০°০৬	০°১১
ক্যানাডা	—	০°৫২	—	—
অষ্ট্রেলিয়া	—	০°৪২	—	—
জাপান	১°৩১	—	—	—
মিশর	—	—	—	০°২৩
জাভা	—	—	৫৪°৯১	—
ভারতবর্ষ	০°৩৫	০°৩২	১২°৩৬	০°০৪

শস্য উৎপাদনের দিক হইতে ভারতবর্ষের এই দুর্গতির জন্য এদেশের দেড়শতাধিক বৎসরের ব্রিটিশ শাসনই প্রধানতঃ দায়ী। বিদেশী শাসক সম্প্রদায় বরাবরই এদেশকে শাসন ও শোষণ করিতে চাহিয়াছেন। শাসক কর্তৃপক্ষের এই দায়িত্বহীনতার ফলে ভারতবর্ষে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ক্রম-অবনতিই ঘটিয়াছে এবং ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। শাসন কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীর এই দারিদ্র্য বৃদ্ধিতে খুসীই হইয়াছে, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, দারিদ্র্য আর অশিক্ষা ভারতবাসীকে একই সঙ্গে দীন ও হীন করিয়া রাখিবে। শিক্ষায় ও স্বাচ্ছল্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলে ভারতবাসী অবশ্যই সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামশীল হইয়া উঠিবে এবং সে ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ইংরেজ সেনার পক্ষে ভারতবর্ষকে তাঁবে রাখা কিছুতেই সম্ভব হইবে না—ইহাই ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা।

যাহা হউক, ব্রিটিশ চক্রান্তে এতকাল ভারতের অপরিসীম কাঁচামাল শিল্পজীবি ব্রিটেনাদি দেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং এদেশের শিল্প সম্প্রসারণের প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারতবর্ষ কৃষিজীবি দেশ; এখানকার শতকরা অন্ততঃ ৮০ জন অধিবাসী কৃষির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবিকার জন্য নির্ভর করে। কিন্তু বিদেশী সরকারের অবহেলায় ভারতের-প্রাণস্বরূপ কৃষিনীতিরও এপর্য্যন্ত কোনরূপ উন্নতি সাধিত হয় নাই। জমিতে জলসেচের ব্যবস্থার দিক হইতে ভারতের দীনতার কথা উল্লেখ করিলেই কৃষি সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত মিলিবে। জলসেচ জমির উৎপাদিকা শক্তি রক্ষার বা বৃদ্ধির দিক হইতে অপরিহার্য্য; পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য দেশেই গভর্ণমেণ্ট দেশবাসীর অন্নসংস্থান নিশ্চিত করিবার জন্য কৃষি-বিভাগ মারফৎ সেচনীতি ব্যাপকভাবে কার্য্যকরী করিয়া থাকেন, কৃষিজীবি ভারতবর্ষে এই সেচনীতির উন্নতির আবশ্যকতা অধিকতর হইলেও ভারতসরকার এই জরুরী ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিস্ময়কর উদাসীনতা বজায় রাখিয়াছেন। ১৯৩৮-৩৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে মোট ২০ কোটি ৯০ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়, ইহার মধ্যে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল মাত্র ৫ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমিতে। এই জলসেচ ব্যবস্থার শতকরা ৪০ ভাগের বেশী আবার বেসরকারী চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল।

কৃষিই জনসাধারণের প্রধানতম বৃত্তি হইলেও ভারতবর্ষ খাদ্যের দিক হইতে কিরূপ পরমুখাপেক্ষী তাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম হইতেই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। জাপান ব্রহ্মদেশ জয় করিবার পর ব্রহ্ম হইতে বাৎসরিক কম বেশী ১০ লক্ষ টন চাউল আমদানী বন্ধ হইয়া যায়; তা ছাড়া সমুদ্রপথ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠায় ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উদ্বৃত্ত দেশ হইতে গমও আর আমদানী হইতে পারে না। ইহার ফলে ভারতের বাজারে খাদ্য শস্যের জোগান ও চাহিদার দারুণ অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। ১৯৪৩ সালের ২৫।৩০ লক্ষ লোকক্ষয়কারী মহামন্বন্তরের ইহাই সবচেয়ে বড় কারণ। যুদ্ধ শেষ হইবার পর প্রায় দেড় বৎসরকাল অতীত হইয়াছে, কিন্তু বাহির হইতে নানা কারণে এখনো প্রচুর খাদ্য শস্য আমদানী হইতেছে না বলিয়া ভারতে প্রচণ্ড খাদ্যাভাব কিছুতেই দূর হইতেছে না।

ভারতে এখন লোকায়ত্ত অন্তর্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদেশী আমলাতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষ ভারতের আর্থিক দৈন্য দূরীকরণের ব্যাপারে এতকাল যে অমানুষিক উদাসীনতা দেখাইয়া আসিয়াছেন, জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত এই জাতীয় সরকারের সদস্য-বৃন্দের নিকট হইতে সে তুলনায় উন্নততর দৃষ্টি-ভঙ্গিই সকলে আশা করে। যুদ্ধোত্তর কালের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক নানা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পণ্ডিত নেহেরু পরিচালিত অন্তর্বর্ত্তী সরকার এ পর্য্যন্ত ভারতবাসীর আর্থিক স্বাতন্ত্র্য সম্পাদনের উপযোগী কাজ বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে এদিক হইতে তাঁহারা যে আগ্রহশীল রহিয়াছেন,তাহা তাঁহাদের ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। জনসাধারণের দুঃখ মোচনে ভারত সরকারের এই আগ্রহও ভারতবাসীর অভিজ্ঞতার দিক হইতে একেবারে অভিনব ব্যাপার এবং আশা করা যায় যে, এই আগ্রহ যথাসময়ে মোটামুটি কার্য্যকরী হইলেও বিপুল সম্ভাবনাময় ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল নবযুগের সূচনা হইবে।

ভারতের বর্ত্তমান খাদ্য পরিস্থিতি সত্যই অত্যন্ত হতাশাজনক। এই পরিস্থিতির উদ্ভব একান্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার এবং ইহা বহুদিনের দুর্নীতি ও অব্যবস্থার ফল। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের খাদ্যসচিব ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গত ১০ই জানুয়ারী বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া এক খাদ্য উৎপাদন সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন এবং এই সম্মেলনে তিনি এ দেশের শোচনীয় অবস্থা ও বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে অত্যন্ত মনোজ্ঞ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ভারতের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী কৃষি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন এবং বিশেষ জোরের সহিত আশা প্রকাশ করেন যে, প্রাদেশিক সরকারসমূহের সহিত কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ণ সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করিতে পারিলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতের জটিল ও ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্যসমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভব হইবে।

বাহির হইতে আমদানী এবং আশপাশের নির্ভরশীল দেশসমূহে রপ্তানীর হিসাব ধরিলে ভারতে সর্ব্বসমেত বৎসরে অন্ততঃ ১৫ লক্ষ টন খাদ্য শস্য ঘাটতি পড়ে। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত আদমসুমারীর হিসাবেই দেখা যায় যে, এই কুড়ি বৎসরে ভারতে প্রায় ৯ কোটি লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে প্রতি বৎসরে গড়ে প্রায় ৪৫ লক্ষ হিসাবে লোক বাড়িতেছে। এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার হিসাব ধরিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অনুমান করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির কোনরূপ উন্নতিরই আশা নাই, বরং অবস্থা আরও খারাপ হইয়া ১৯৫১ সালে মোট ঘাটতির পরিমাণ ৭০ লক্ষ টনে দাঁড়াইবে। ঘাটতির এই অঙ্ক অভ্রান্ত সন্দেহ নাই এবং ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এইরূপ চরম সঙ্কট সম্পর্কে সময় থাকিতে সাবধান করিয়া দিয়া বিভিন্ন

প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গকে আপন আপন এলাকার কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে আহ্বান করিয়াছেন।*

ভারতের কৃষক এত দরিদ্র ও অজ্ঞ যে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হওয়া বা সেই ব্যবস্থানুসারে কৃষিকার্য্য পরিচালনা করা তাহার পক্ষে একান্ত কঠিন। এদিক হইতে গভর্ণমেণ্ট এতকাল বড়-জোর মৌখিক সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু রাসায়নিক সার, ভাল বীজ ধান অথবা চাষের আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়া কৃষককে তাঁহারা কখনোই সাহায্য করেন নাই। আশার কথা ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনার সময় কৃষকদের এই অসহায়তার কথা স্মরণ রাখিয়াছেন। তাঁহার পরিকল্পনানুসারে এদেশে কৃষির পুনর্গঠনের জন্য যে ব্যয় হইবে তাহার শতকরা ২৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার ও ২৫ ভাগ প্রাদেশিক সরকার দিবেন এবং বাকী শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দিবে কৃষক। বলা বাহুল্য, সরকার এইভাবে টাকার থলি লইয়া কৃষির উন্নতির জন্য আগাইয়া আসিলে কৃষিজীবির পক্ষে সেই সুযোগ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। এই হিসাবে পাঁচ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ হইতে ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আশা করিয়াছেন যে, পাঁচ বৎসর এই পরিকল্পনানুসারে কাজ হইলে ভারতের খাদ্যসঙ্কট একেবারে দূরীভূত হইবে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার কথা ধরিলে দেখা যায় ৫ বৎসর পরে বর্ত্তমানের তুলনায় শতকরা সাড়ে এগারো ভাগ উৎপাদন না বাড়াইলে এদেশের খাদ্যাভাব দূর করা যাইবে না এবং ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতে তাঁহার পরিকল্পনা এই উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই রচনা করা হইয়াছে।

জলসেচ ও সার প্রয়োগ ভালভাবে হইলে ভারতের জমির ফলনও যে বাড়িয়া যায়, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। ভারতে দামোদর পরিকল্পনাদি যে সব সেচ পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, সেগুলি সম্ভবতঃ অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে এবং ইহার ফলে বহুপরিমাণ জমির জলসেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত ভাবে উন্নত হইবে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আশা করিয়াছেন যে, এক বৎসরের মধ্যেই সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা সমূহের প্রাথমিক ফল লাভ করা যাইবে। রাসায়নিক সার সম্বন্ধেও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আশার কথা শুনাইয়াছেন। কৃষকদের সুশিক্ষিত করিয়া ঘরোয়া সারসমূহ কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা ছাড়া তিনি আগামী ২।৩ বৎসরের মধ্যে বিহারের সিন্দ্রি কারখানা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাসায়নিক সার উৎপাদনের পরিমাণ এখনকার তুলনায় তিনগুণ হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন। এই আশা ফলপ্রসূ হইলে ভারতের কৃষিনীতিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর দোষ ত্রুটি সংশোধনের সময় ধরিয়া এবং সরকারী অর্থানুকূল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে ভাবে পঞ্চবার্ষিকী কৃষি-পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, ভারতের পশ্চাৎপদ কৃষি ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক দৃষ্টিকোন হইতে রচিত সেই কৃষি পরিকল্পনার মূল্য সকলেই স্বীকার করিবেন।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সকল প্রাদেশিক প্রতিনিধির প্রতি পরিকল্পনাটির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই অনুরোধ একটুও অসঙ্গত নয় এবং আমরা আশা করি ভারতের অধিকাংশ প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষই এই আবেদনে আন্তরিক ও সক্রিয় সাড়া দিবেন। বাঙ্গলা, প্রভৃতি দু একটি দুর্ভাগ্যপ্রদেশে রাজনৈতিক মতভেদ প্রাদেশিক অর্থ ব্যবস্থাকে একেবারে দেউলিয়া করিয়া দিতেছে, অথচ ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার গুরুত্ব এই সব প্রদেশেই বেশী। আমরা মনে করি, প্রজা সাধারণের অন্ন সমস্যা সমাধানের সহিত সংশ্লিষ্ট এই পঞ্চবার্ষিকী কৃষি পরিকল্পনা অহেতুক জিদ বসে উপেক্ষা করিলে তাহা বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রদেশের অকংগ্রেসী কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে আত্মহত্যারই সমান হইবে।

অবশ্য কৃষককে কর্ম্মচঞ্চল করিয়া তুলিয়া সরকারী সহযোগিতায় কৃষির উন্নতির কথা পরিকল্পনায় যেভাবে বলা হইয়াছে, জমির উপর চাষীর সত্যকার অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সে হিসাবে কিছুই বলা হয় নাই। বলা বাহুল্য, চাষের জমির উপর চাষীর দাবী যদি প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহা হইলে সরকারী-সহযোগিতা সত্বেও জমির স্থায়ী উন্নতি বিধানে বিশেষ কোন দায়িত্ব সে গ্রহণ করিবে কিনা সন্দেহ। যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী সরকার জমিদারী প্রথা রহিত করিবার জন্য এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিবার জন্য লক্ষনীয় উদ্যম দেখাইতেছেন। আমরা আশা করি, এইভাবে জমির উপর হইতে জমিদারের প্রভাব কমাইয়া ভূমি ব্যবস্থায় আমূল বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনাই কংগ্রেসের লক্ষ্য। সেদিক হইতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের পরিকল্পনায় কৃষকদের আশান্বিত হইবার সঙ্গত কারণ আছে।

দামোদর পরিকল্পনা

দামোদর নদে প্রায় প্রতি বৎসর বন্যা হয় এবং ইহার ফলে পশ্চিম বঙ্গের অসংখ্য গ্রাম বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই নদ একান্ত, অগভীর এবং রেলপথ ও রাজপথ রক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট অবিবেচকের মত স্বাভাবিক জলপ্রবাহ প্রতিরুদ্ধ করিয়া বাঁধ দেওয়ায় ইহার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। বারবার পশ্চিমবঙ্গবাসী দামোদরের বন্যায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া এসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারের নিকট বহু আবেদন নিবেদন করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে কোনরূপ কার্য্যকরী সাড়া দেন নাই। ১৯১৩ সালের দামোদর বন্যায় বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার প্রভূত ক্ষতি হয়, সেই সময় বাঙ্গলার ৭০ লক্ষ নরনারীর স্বাক্ষরযুক্ত একখানি আবেদনপত্র তৎকালীন শাসনকর্তা লর্ড রোণাল্ডসের নিকট প্রেরিত হয়, কিন্তু সে সময় সরকার এত উদাসীন ছিলেন যে এই উপলক্ষে গঠিত তদন্ত কমিটি ৭ বৎসরের আগে রিপোর্টই দাখিল করিলেন না। পরে তাঁহারা যখন রিপোর্ট দাখিল করিলেন, সেই রিপোর্টও অফেজোভাবে দপ্তরে চাপা পড়িয়া গেল। তারপর আরও কয়েকটি

* "To you, gentlemen, who are in charge of provincial affairs, my appeal is to realise betimes the risk and to work with determination to avert it."

ভয়াবহ বন্যার পর ১৯৪৩ সালে আবার দামোদরে ভীষণ প্লাবন দেখা যায় এবং এই বন্যার পর হইতে বঙ্গবাসী অধিকতর প্রবলভাবে দামোদরের বন্যা প্রতিরোধ সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের উপর চাপ দিবার উদ্দেশ্যে আন্দোলন শুরু করিয়াছে।

এই আন্দোলনে অবশ্য একটা ফল ফলিয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত টেনেসী ভ্যালী পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডব্লিউ এল ভুরডুইনের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় টেকনিকাল বোর্ড অবশেষে দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অত্যন্ত ব্যাপক ইহা কার্য্যকরী করিতে ২৫ হাজার অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ শ্রমিক লাগিবে এবং মোট ব্যয় হইবে ৫৫ কোটি টাকা। কয়েকটি বাঁধ বাঁধিয়া নদীর বিপজ্জনক এলাকাগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। এই পরিকল্পনানুসারে কাজ শেষ হইলে দামোদর নদীর গভীরতাও বাড়িয়া যাইবে এবং দামোদর পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। জলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হউক বা না হউক, এই পরিকল্পনার ফলে দামোদর হইতে ৮ লক্ষ একর জমিতে ভাল ভাবে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ যে অনুমান করিয়াছেন, তাহার গুরুত্বও খাদ্যের দিক হইতে ঘাটতি এই কৃষিজীবি দেশের পক্ষে কম নয়। তা ছাড়া ইহার ফলে যে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কিলওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে, তদ্দ্বারা পশ্চিম বাঙ্গলায় কিছু কিছু কলকারখানা স্থাপন এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি সহজেই আশা করা যায়। মোটের উপর দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর মার্কিণ কৃষিবিভাগের সহযোগিতায় ভারত সরকারের কৃষিবিভাগ শেষ অবধি যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইলে বন্যাক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী উপকৃত ও উল্লসিত হইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী নদীর সহিত ভারতবর্ষের দামোদর নদের অনেক দিক হইতে মিল আছে। উভয় নদীই জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে। টেনেসী নদী সাতটি রাষ্ট্রের উপর দিয়া বাহিয়া গিয়াছে, দামোদরও বিহারের পালামৌ জেলা হইতে বাহির হইয়া বিহার ও বাঙ্গলার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। প্রথম প্রথম এই একাধিক রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া বহিয়া যাওয়া টেনেসী নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার একটি সমস্যা ছিল। পরে অবশ্য মার্কিন কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ টেনেসী নদীর এলাকাভুক্ত সব কয়টি রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া এবং সমবেতভাবে আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া টেনেসী উপত্যকা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করেন এবং ইহার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বিরাট অঞ্চলে অর্থনৈতিক নবযুগের প্রবর্ত্তন হয়। ভারতে প্রথম প্রথম বিহার ও বাঙ্গলা সরকারের দ্বৈত দায়িত্ব সম্পর্কিত প্রশ্নে সমতাবিধান দুরূহ বলিয়া মনে হওয়ায় দামোদর পরিকল্পনার কার্য্যকারিতা সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ ছিল। আশার কথা, ভারতের বর্ত্তমান অন্তর্বর্ত্তী সরকারের চেষ্টায় বাঙ্গলা সরকার ও বিহার সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সহযোগিতা করিয়া সঙ্কল্প ঘোষণা করায় পরিস্থিতি অনেকটা সহজ হইয়াছে।

গত ৩ই জানুয়ারী অন্তর্বর্ত্তী সরকারের পূর্ত্ত সদস্য মিঃ সি-এইচ-ভাবার সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় সরকার, বাঙ্গলা সরকার ও বিহার সরকারের প্রতিনিধিবর্গের যে সম্মেলন হয়, তাহাতে সমবেত প্রতিনিধিবর্গ দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে মোটামুটি একমত হইয়া পরিকল্পনাটিকে কার্য্যকরী করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতশাসন আইনের ১০৩ ধারা অনুসারে পরিকল্পিত 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন' নামে একটি সম্মিলিত কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান গঠনের খসড়াও অনুমোদন করিয়াছেন। মোট আর্থিক দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার সরকার ও বাঙ্গলা সরকারের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া বহন করিবার প্রস্তাবও প্রতিনিধিবৃন্দ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে বাঙ্গলার লাভই যে অধিক হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এক কথায় সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের সাধারণ অর্থনীতি এই ব্যবস্থার দ্বারা সমুন্নত হইবে। সে হিসাবে মোট প্রস্তাবিত ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে বাঙ্গলাকে ২৮ কোটি টাকা বহন করিতে হইবে বলিয়া দুঃখিত হইবার কিছু নাই। তবে মুস্কিল হইতেছে এই যে, যে অপদার্থ শাসনযন্ত্রের অধীনে বাঙ্গলাদেশ বর্ত্তমানে রহিয়াছে তাহার আমলে এই বিপুল পরিমান অর্থ শেষ পর্য্যন্ত হয়তো দরিদ্রদের শোষণ করিয়াই সংগৃহীত হইবার ব্যবস্থা হইবে। বাঙ্গলাদেশের বাজেটে প্রতি বৎসরই ঘাটতি হইতেছে, বাঙ্গলা সরকার মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের অবিরাম মুণ্ডপাত করিলেও বাজেটঘাটতির জন্য ভিক্ষার ঝুলি লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের দুয়ারে ধর্ণা দিতে বাধ্য হইতেছেন, এ সময় এই ২৮ কোটি টাকা তাঁহারা সংগ্রহ করিবেন কি উপায়ে, তাহাও অবশ্যই ভাবিবার বিষয়। বাঙ্গলার কৃষক যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, পন্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি, ও নানাপ্রকার আধি ব্যাধিতে জীবন্মৃত, তাহাদের কল্যান হইবে বলিয়াই তাহাদের উপর নূতন কোন কর সংস্থাপন করিয়া এই টাকা তুলিবার ব্যবস্থা হইলে তাহা অমানুষিক হৃদয়হীনতার পরিচায়ক হইবে। কেহ কেহ প্রস্তাব করিতেছেন যে বাঙ্গলার কয়লা খনি এলাকা এই পরিকল্পনার দ্বারা যখন সমুন্নত হইবে, তখন টাকাটা কয়লাখনির মালিকদের নিকট হইতে আদায় করিলেই ভাল হয়। খনিমালিকেরা ধনী, তাহাদের নিকট হইতে এই উপলক্ষে মোটামুটি কিছু আদায় করার প্রস্তাব অবশ্য অসঙ্গত বা অসম্ভব নয়। যাহা হউক, মোটের উপর দামোদর পরিকল্পনার প্রস্তাবিত ব্যয় ভার বহন হইতে বাঙ্গলার চিরদরিদ্র চাষীদের মুক্তি দেওয়ার যে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থাতেই বাঙ্গলা সরকার দেশের অধিকাংশ লোকের সমর্থন পাইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

ভারতের খাদ্য পরিস্থিতি ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে; বাঙ্গলার অবস্থাও অত্যন্ত হতাশাজনক। আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিষদে ভারতের প্রতিনিধি মিঃ রাও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৪৭ সালেও ভারতে খাদ্যাভাব অত্যন্ত তীব্র হইবে। এই অবস্থায় ভারতের আমদানী ঘাটতি কমাইবার চেষ্টা করা সত্যই অত্যাবশ্যক। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ৭।৮ লক্ষ একর জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। এ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইতে অকারণে একদিন বিলম্ব হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয়। তাছাড়া এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ হইলে অবিলম্বে বহুলোকের কর্ম্ম সংস্থান হইয়া যুদ্ধোত্তর-বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান হইবে। বাঙ্গলার যুদ্ধোত্তর শিল্প পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার পক্ষে অপরিহার্য্য বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থার উপায় হিসাবেও দামোদর পরিকল্পনা মূল্যবান। সুতরাং সকলেই আশা করিতেছে যে, বিধিব্যবস্থার জন্য অনিবার্য্য বিলম্ব ছাড়া পরিকল্পনা কাজে লাগাইতে কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার সরকার ও বাঙ্গলা সরকার অতঃপর তৎপর হইবেন। ৮।২।৪৭

মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি পরিদর্শন

শ্রীগোরা

মহাত্মা গান্ধী শ্রীরামপুরের শান্ত পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করিয়া স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদিগের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হন। উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাকে তাঁহাদের বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেন। এখানে থাকিয়া তিনি তাঁহাদের বন্ধু, উপদেষ্টা ও চিকিৎসক হইয়া পড়েন।

মহাত্মাজীকে দেশের প্রতিদিনের সংবাদ জানাইবার জন্ত কাজিরখিল শিবিরে একটি বেতার-যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এই শিবিরটি খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের পরিচালনাধীনে রহিয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে বেতার যন্ত্র হইতে সংগৃহীত সংবাদ সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া বিশেষ প্রতিনিধি দ্বারা মহাত্মাজীর নিকটে প্রেরণ করা হয়। খাদি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নোয়াখালি শান্তি মিশন ও রিলিফ নামে একটি বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগ একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা করিতেছে। গঠনমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী এই কেন্দ্রে বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থাও চলিতেছে।

শ্রীরামপুরে দিনের পর দিন গান্ধীজীর সাক্ষাৎকারীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং তাঁহার চিঠির সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার বেশীর ভাগ সময় সাক্ষাৎকার ও চিঠিপত্র লেখাতেই কাটিয়া যাইত। ২০শে ডিসেম্বর বিকালে একজন ফরাসী সাংবাদিক মঃ রেমণ্ড কার্টিয়ার যখন মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান তখন তিনি কাদা মাখিয়া প্রাকৃতিক চিকিৎসায় রত ছিলেন। তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া মহাত্মাজীর সহিত ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে বলেন—ইউরোপ আজ মুখে শান্তির কথা বলিতেছে বটে, কিন্তু অন্তরে যুদ্ধেরই কামনা করিতেছে। তাহারা অন্তর হইতে হিংস্রভাব দূর না করিলে শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বর্ত্তমানে ইউরোপ যেভাবে চলিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তন না হইলে ধ্বংস অনিবার্য্য। ইউরোপে হিটলারবাদ অধিকতর ক্ষমতাশালী হিটলারবাদ দ্বারা পরাজিত হইয়াছে। আবার আরও এক শক্তিশালী হিটলারবাদ ইহাকেও পরাজিত করিবে; এইভাবেই চলিতে থাকিবে।

অহিংসার দ্বারা কিভাবে হিটলারবাদ ধ্বংস করা যাইতে পারে এই প্রশ্ন করা হইলে মহাত্মাজী বলেন—হিংস কার্য্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্ত যদি অধিকতর হিংস পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে ছোট ছোট রাজ্যগুলির বাঁচিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কোন জাতি যদি অপরের পশুশক্তির কাছে পর্য্যুদস্ত হইতে না চায়, তাহা হইলে তাহাকে জীবনের বিনিময়ে সঙ্কল্পে অটুট থাকিতে হইবে। তবেই সে বাঁচিতে পারিবে। এইভাবে অহিংসাই তাহার আত্মরক্ষার উপায় হইবে। এইরূপ সাহস ও প্রতিরোধের ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে না পারিলে গণতন্ত্র টিকিতে পারে না।

২১শে ডিসেম্বর মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভার কিছু পূর্ব্বে কয়েকজন দুর্গতদের সাহায্য ও পুনর্বসতির বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে আসেন। তিনি তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অপরের পক্ষেও শুনিবার মত বলিয়া প্রার্থনা সভায় তাহার পুনরুত্থাপন করেন। তিনি বলেন—অপরের দান গ্রহণ করা যেমন অন্যায়, কাহাকে কিছু দান করাও ঠিক তেমনি অন্যায়। আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে অনেকেই অধর্ম্ম করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় ভারতে ৫৬ লক্ষ সন্ন্যাসী ভিক্ষাজীবী হইয়া বাস করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশকেই মোটেই যোগ্যতাসম্পন্ন বলা চলে না। এই হতভাগ্য দেশে এমন কি অস্পৃশ্যতাকেও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া চালান হইয়া থাকে।

আজ নোয়াখালিতে যে অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সারা ভারতবর্ষ হইতে অনেকেই দান করিতে উৎসাহী হইয়াছেন। ইহাতে দুইটি

নোয়াখালির রৌদ্রতপ্ত পথে সদলে মহাত্মাজী ফটো—তারক দাস

বিপদের সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রথমতঃ দুর্গতদের অনেকেই হয়ত ইচ্ছা-পূর্ব্বক ইহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে, অপর দিকে দাতারা দান করিয়া পুণ্য অর্জ্জনের আত্মপ্রসাদের চেষ্টায় থাকিবে, এই উভয় পথই বন্ধ করা দরকার।

লোকে নিঃস্ব হইয়া আশ্রয় কেন্দ্রে আসিয়া যে জড়ো হইয়াছে, ইহাতে তাহাদের কোনও দোষ নাই। তাহারা যাহাতে ফিরিয়া গিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে তজ্জন্য সাধারণ দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া কর্ত্তব্য এবং তাঁহাদের সেবাকার্য্য চালাইয়া যাওয়া উচিত।

এখানে যে সকল সেবা প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে তাহাদের

প্রার্থনা সভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে গান্ধীজী ফটো—তারক দাস

জানাইয়া দেওয়া উচিত যে শ্রম না করিয়া কাহারও একবেলাও আহার গ্রহণ করা অসম্মানজনক। ইহাদের শ্রমবিমুখতা দূর করিয়া আত্ম-নির্ভরতা শিখাইতে হইবে, তাহা হইলে আমাদের জাতীয় চরিত্রও উন্নত হইবে। আর আশ্রয়প্রার্থীদিগকে এমন কি গবর্ণমেণ্টের নিকটেও সাহায্য গ্রহণের সময় বলিতে হইবে যে, আজ তাহারা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে নিঃস্ব। জীবনধারণের জন্য আজ তাহাদের খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও ঔষধের প্রয়োজন। তবে তাহারা নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী কাজের বিনিময়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবে নচেৎ উহা জাতীয় সম্পদ চুরি বলিয়া গণ্য হইবে।

২২শে ডিসেম্বর শ্রীরামপুরের প্রায় ৮ মাইল দূরে পানিয়ালা গ্রামে একটি সার্ব্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। এখানের এক জরুরী সভায় মহাত্মা গান্ধীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পথ অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় তিনি যাইতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার এক প্রেরিত বাণীতে এই আশা প্রকাশ করেন যে, পানিয়ালা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিবে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাইদের শান্তিতে বসবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এই সময়ে ছুঁৎমার্গ দূর করিবার জন্য চণ্ডীপুরেও একটি সার্ব্বজনীন ভোজ হয়। এই দেখাদেখি ক্রমে বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই ঐক্যত্রিক ভোজনের এক হিড়িক পড়িয়া যায়।

২৩শে ডিসেম্বর প্রার্থনা সভায় অনেকেই মহাত্মাজীকে জিজ্ঞাসা করেন

পল্লীর দুর্গম পথে মহামানব ফটো—তারক দাস

যে, তিনি বাঙলা সরকারের বিরুদ্ধে অনশন করিতেছেন না কেন। ইহার উত্তরে মহাত্মাজী বলেন—এরূপ করিলে বাঙলায় মন্ত্রিসভাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হইবে। লীগ মন্ত্রিসভাকে হেয় করিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই। অধিকাংশ মন্ত্রীই আমার বন্ধুস্থানীয়। গত অক্টোবর মাসে এখানে যে শান্তি নষ্ট হইয়াছে, সেই শান্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনাই আমার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই সন্তুষ্টচিত্তে নোয়াখালি ত্যাগ করিব।

নোয়াখালি হইতে তিনি একটি সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইবেন এইরূপ এক গুজবের প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলেন—সত্যাগ্রহী সর্ব্বদাই তাহার বিরুদ্ধ দলের নিকটে নিজের পরিকল্পনা প্রকাশ করিবেন।

গোপনীয়তা অবলম্বন করিলে তাহা সত্যাগ্রহ হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, অন্যত্র তাঁহার যথেষ্ট কাজ রহিয়াছে। বর্ত্তমানে যে রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে দিল্লীতে উপস্থিতি তাঁহার একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। তবে এখানেও তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহারও গুরুত্ব কম নহে। এখানে সকলকাম হইতে পারিলে সর্ব্বত্রই ইহার প্রভাব বিস্তার করিবে।

২৪শে তারিখে প্রার্থনা সভার পূর্ব্বে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে একটি বৃহৎ কীর্ত্তনিয়ার দল আসে। এইদিন প্রার্থনা সভায় বহু মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মাজী প্রার্থনা সভায় প্রবেশ করিলে তাঁহারা উলুধ্বনি দিয়া তাঁহাকে বরণ করেন। মহাত্মা প্রার্থনার পর আশ্রয় প্রার্থীদের উপদেশ দিয়া বলেন, যাহারা নিজেদের গৃহে ফিরিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ভগবানের উপরে এবং আত্মশক্তির উপরে বিশ্বাস করিতে হইবে, সর্ব্বদাই সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিৎ নহে। দুঃখ কষ্ট হইলেও এবার আশ্রয় প্রার্থীদের নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া উচিত।

২৫শে ডিসেম্বর ভগবান যীশুর জন্মদিবস বলিয়া ঐদিন মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় বাইবেল পাঠ একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। গান্ধীজী শ্রোতাদের বলেন যে, তিনি পূর্ব্বে বিভিন্ন ধর্ম্ম মত সহিষ্ণুতা বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু এখন তিনি সকল ধর্ম্মের সমতা ও অভিন্নতায় বিশ্বাস করেন। তিনি আরও বলেন যে, অনেকেই যীশুকে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা ও বাণী হইতে দেখা যায়, তিনি প্রকৃতপক্ষে কোন সম্প্রদায় বিশেষের ছিলেন না।

এই দিন শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। শ্রীযুক্তা কৃপালনী ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মী দত্ত পাড়ায় একটি সান্ধ্য-বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। গ্রামের মেয়েদের এখানে লেখাপড়া শেখান হয়। শীঘ্রই সুতা কাটা, সেলাই ও অন্যান্য কুটীরশিল্পেরও প্রবর্ত্তন করা হইবে। শ্রীযুক্তা কৃপালনী মহাত্মার আদর্শ অনুযায়ী এখানে গ্রাম পুনর্গঠনের কাজে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

২৭শে ডিসেম্বর ঢাকা শক্তি মঠের স্বামী জ্ঞানানন্দ ঢাকার গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি লইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলোচনা করেন। গান্ধীজী তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, হিংসানীতি একান্তভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। কর্ম্মীদের মধ্যে হিংসার লেশমাত্র থাকা উচিত নহে। যে অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে দূর করিবার জন্যও আন্দোলন চালাইতে হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি ও তৎপরবর্ত্তীকালে পার্লামেণ্টে ভারতসচিবের বক্তৃতায় যে সমস্যার উদ্ভব হয় গান্ধীজীর সহিত তাহা আলোচনার জন্য এই দিন মধ্যরাত্রিতে পণ্ডিত নেহরু, আচার্য্য কৃপালনী, শঙ্কররাও দেও ও মিস্ মৃদুলা সরাভাই, শ্রীরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। ২৮শে ২৯শে এই দুই দিন ধরিয়া পণ্ডিত নেহরু, আচার্য্য কৃপালনী ও শঙ্কররাও দেও গান্ধীজীর সহিত আলোচনা করেন। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার লণ্ডন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও গণপরিষদের প্রথমবারের অধিবেশনের কার্য্যাবলী মহাত্মাজীকে জানান।

২৯শে ডিসেম্বর গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় নেতৃবৃন্দের শ্রীরামপুর আগমনের জন্য অসম্ভব রকম লোকসমাগম হইয়াছিল। বহুদূর হইতে অনেক মুসলমান আসিয়াও প্রার্থনা সভায় যোগদান করে। মহাত্মাজী প্রার্থনান্তে নেতৃবৃন্দের প্রথমে পরিচয় দেন, তারপর বলেন যে যদি কেহ এরূপ ভাবিয়া থাকেন যে, মুসলমানদের ক্ষতি করিবার জন্য নেতারা তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে এখানে আসিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা ভুল করিবেন। কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাধিক্য থাকিলেও ইহা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই প্রতিষ্ঠান। তাঁহারা সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি লইয়া দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছেন। তারপর তিনি নিজের কাজের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কেহ কেহ তাঁহাকে মুসলমানদের শত্রু বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি কাজের দ্বারা প্রমাণ করিবেন যে তিনি তাঁহাদের বন্ধু।

৩০শে ডিসেম্বর পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ শ্রীরামপুর ত্যাগ

প্রার্থনা সভা অভিমুখে মহাত্মাজী ফটো—তারক দাস

করেন। পরদিন মহাত্মাগান্ধী তাঁহার প্রার্থনান্ত অভিভাষণে নেতৃবৃন্দের কথা পুনরায় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে উপদেশ গ্রহণের জন্যই তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতে যাহাতে শীঘ্রই শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান হয়, সেইরূপ তাঁহার লিখিত অভিমত লইয়া নেতারা গমন করিয়াছেন। ঐ অভিমত আলোচনা করিয়া ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা নোয়াখালির অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্যও এখানে আসিয়াছিলেন এবং ভারতের অন্যত্র আর যাহাতে কখন ইহার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তাহাই তাঁহারা ইচ্ছা করেন। গণপরিষদে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবার জন্য তাঁহারা তাঁহার সাহায্য ও উপদেশপ্রার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। কংগ্রেস কখনও কোন সম্প্রদায়েরই বিরোধী নহে।

মহাত্মা গান্ধী ব্যাপকভাবে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভ্রমণের যে

পল্লী সেবাসংঘের কর্ম্মীবৃন্দের প্রতি গান্ধীজীর উপদেশ দান

ফটো—তারক দাস

পরিকল্পনা করেন পণ্ডিত নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহা কয়েকদিনের জন্য পিছাইয়া দেন। ইতিমধ্যে তাঁহার যাত্রাপথের মানচিত্রও প্রস্তুত হইয়া যায়। এই মানচিত্রে উপক্রান্ত গ্রামগুলির তালিকা ও দূরত্ব নিরূপণ করা হয়। মহাত্মাজীও তাঁহার ঐতিহাসিক ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় ক্রমশঃ তাঁহার ভ্রমণ পথের দূরত্ব বাড়াইতে থাকেন। দৈনিক তিনি ছয় মাইল হাঁটা অভ্যাস করেন। মহাত্মাজীর এই ব্যাপক পল্লী পরিক্রমা নানা কারণে তাঁহার ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান অপেক্ষাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মহাত্মাজী নিজে তাঁহার এই ভ্রমণ সম্বন্ধে মনে করেন—ছোটনাগপুরের নিবিড় অরণ্যপথ দিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্য বারাণসী তীর্থযাত্রায় যেরূপ বাহির হইয়াছিলেন, ইহাও সেইরূপ হইবে। গান্ধীজী এই ভ্রমণের তাঁহার জীবনের কঠিনতম পরীক্ষা বলিয়া মনে করেন এবং ইহার সাফল্যেই তাঁহার অহিংসা আদর্শের সার্থকতা।

হিন্দু-মুসলমান মিলনের ব্রত লইয়া মহাত্মাগান্ধী ২রা জানুয়ারী ভোর সাড়ে সাত ঘটিকার সময় শ্রীরামপুর কুটীর হইতে চণ্ডীপুর গ্রাম অভিমুখে তাঁহার ঐতিহাসিক অভিযান সুরু করিলেন। একটি দীর্ঘ বংশদণ্ডের উপর ভর দিয়া পৌষের প্রখর শীতে মহাত্মাজী মানবতার আবেদন লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে বাহির হইলেন। শ্রীরামপুর কুটীরে তিনি প্রায় দেড়মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। এই কুটীর ত্যাগ করিবার প্রাক্কালে তিনি বাড়ীর সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

মহাত্মা গান্ধী এই গ্রাম পরিক্রমাকালে মাত্র চারিজনকে তাঁহার সঙ্গী হিসাবে লইলেন—তাঁহার বাঙলা-দোভাষী অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মল বসু, শর্টহ্যাণ্ড লেখক শ্রীপরশুরাম, মহাত্মার নানা কাজে সাহায্য করিবার জন্য দক্ষিণভারতের শ্রীরামচন্দ্রন্ ও গান্ধীজীর ব্যক্তিগত কাজের ব্যবস্থা করিবার জন্য কুমারী মানু গান্ধী।

মহাত্মাজী চণ্ডীপুর অভিমুখে যাইবার সময় যখন তিনি পল্লীগৃহগুলি অতিক্রম করিতেছিলেন তখন পল্লীর হিন্দু মুসলমানেরা মহাত্মার দর্শন-লাভের আশায় পথিপার্শ্বে সমবেত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। অনেকে তাঁহার অনুগমনও করে।

মহাত্মাজী শ্রীরামপুর গ্রামের প্রান্তস্থিত গত হাঙ্গামায় জনৈক ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দীর ভস্মীভূত গৃহ পরিদর্শন করেন। পথে শিবপুরে এক মুসলমান মৌলবীর বাড়ীতে গমন করেন। উক্ত মৌলবী শ্রীরামপুরে পূর্ব্বদিন গিয়া মহাত্মাকে আমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

বেলা ৯টার সময় মহাত্মাগান্ধী চণ্ডীপুর গ্রামে পদার্পণ করিবামাত্রই গ্রাম সেবা সঙ্ঘের সভ্যরা "রামধুন" গান করিতে থাকেন। তিনি বিশ্রাম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত গান চলিতে থাকে। এই গ্রামে তিনি শ্রীঅবনী মজুমদারের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিলে বাড়ীর মেয়েরা উলুধ্বনি করিয়া মহাত্মাজীকে বরণ করিয়া লন।

শ্রীসৌরেন বসুর পরিচালনায় পূর্ব্ব হইতেই এই গ্রামে একটি শিবির স্থাপন করিয়া সেবা ও পুনপ্রতিষ্ঠার কাজ চলিতেছিল।

চণ্ডীপুর গ্রামের বিবিধ তথ্য মহাত্মার নিকটে পেশ করা হয়। এই গ্রামের আয়তন ১২ বর্গ মাইল। হাঙ্গামার পূর্ব্বে এখানে ৩৫৩৫ জন হিন্দু ও ৩২৪১ জন মুসলমান বাস করিত। হাঙ্গামার সময় গ্রামের সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের ৫০৫টি পরিবারের মধ্যে ২০০ পরিবারের বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করা হইয়াছিল।

মহাত্মাজীর সহিত তাঁহার চারজন ভ্রমণ সঙ্গী ব্যতীত—ডাঃ সুশীলা নায়ার, শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, সর্দ্দার জীবন সিং, শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী, প্রভৃতিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীপুরে আগমন করেন।

ভ্রমণকালে মহাত্মার নিরাপত্তার জন্য বাঙলা সরকার ৮ জন সশস্ত্ররক্ষী দলের ব্যবস্থা করেন। মহাত্মাজী এই রক্ষীদল আদৌ পছন্দ না করিলেও তাহারা তাঁহার অনুগমন করে।

মহাত্মার ভ্রমণকালে কোথাও সুবিধামত আশ্রয় না মিলিলে তাঁহার থাকার জন্য একটি ভ্রাম্যমান পর্ণ কুটির প্রস্তুত হয়। এই পর্ণকুটিরটিও চণ্ডীপুর লইয়া যাওয়া হয়।

এই দিন মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে—তাঁহার পল্লী অতিক্রম প্রকৃতপক্ষে এখনও আরম্ভ হয় নাই। শ্রীরামপুর হইতে চণ্ডীপুরে তাঁহার সফর দপ্তর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র। এখানে তিনি ৩।৪ দিন অবস্থান করিবেন। তাহার পর তাঁহার প্রকৃত সফর আরম্ভ হইবে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় সম্প্রীতি আনয়ন করাই তাঁহার বর্ত্তমান সফরের উদ্দেশ্য। এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অপর সম্প্রদায়কে সুগঠিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। এতদিন ভীরু ও দুর্ব্বলের অহিংসার অনুশীলন হইতেছিল এইবার সাহসী ও শক্তিমানের অহিংসার কার্য্য চলিবে।

পূর্ব্ব বাঙলা সোনার দেশ হইলেও এখানের অধিবাসীরা গরীব। গ্রামগুলি মোটেই পরিচ্ছন্ন নয়। পুকুরের জল এত দূষিত যে হাত ধুইতেও সাহস হয় না। আমাদের দেশে ধনীরা ক্রমশঃ ধনশালী এবং গরীবরা ক্রমে আরও গরীব হইয়া পড়িতেছে। এই সমাজ ব্যবস্থার মূলে যে শয়তানী চক্র রহিয়াছে তাহাকে ভাঙিয়া সাম্য ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

প্রার্থনা সভার পূর্ব্বে ত্রিপুরা হইতে একদল দুঃস্থ নারী মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। তিনি তাহাদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাহাদিগকে সূতা কাটিয়া আয় বাড়াইতে তিনি উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান গরীব পল্লীবাসীরা যদি সূতা কাটিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ইহাতে শুধু তাহাদেরই মঙ্গল হইবে না—সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে।

ইহার পর তিনি শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত প্রেরিত স্বেচ্ছাসেবকদলের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন—তাঁহাদিগকে বহু বিপদের সম্মুখীন হইতে হইতেছে, এজন্য হয়ত তাঁহাদের প্রাণও বিসর্জ্জন দিতে হইতে পারে, তবে সাহসে ভর করিয়া প্রেমের বাণী লইয়া অগ্রসর হইলে অতিবড় অত্যাচারী ও হৃদয়হীন ব্যক্তিরও হৃদয়ে জয় করা সম্ভব হইবে।

চণ্ডীপুরে যে গৃহে মহাত্মাজী অবস্থান করেন তাহার সম্মুখে ৩রা জানুয়ারী মহিলাদের এক সভা হয়। তাহাতে মহাত্মাজী বলেন, নারীদের অন্য কাহারও উপর বিশ্বাস না করিয়া ভগবানের উপর এবং নিজেদের আত্মশক্তির উপর নির্ভর করা উচিত। এই বিশ্বাস লইয়া তাহাদিগ[কে] অধিকতর সাহস অর্জ্জন করিতে হইবে। ভীত হইয়া পড়িলে তাঁহাদিগ[কে] আক্রমণ করা দুর্ব্বৃত্তদের পক্ষে সহজ হইবে। তারপর মহাত্মা[জী] অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের অনুরোধ জানাইয়া বলেন, এখনও অস্পৃশ্যদিগকে দূ[রে] সরাইয়া রাখিলে তাঁহাদিগকে আরও দুঃখভোগ করিতে হইবে।

নোয়াখালির পল্লীপথে গান্ধীজীর সহগামী ভ্রাম্যমাণ কুটীর ও মহাত্মাজী

মহাত্মার বাসস্থান হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত তমালতলা রাম[...] আশ্রমে এই দিন প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা সভায় বক্তৃতা প্রস[ঙ্গে] তিনি জনসাধারণকে—আলস্য ত্যাগ করিয়া পল্লী সংস্কার কা[র্য্যে] আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন। তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ কি[রিলে] তাহাদিগের নিকটে কিছুই অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে না। তিনি ব[লেন] জনসাধারণ পল্লী উন্নয়নে মনোযোগী হইয়াছে দেখিলে, তিনি তাঁ[হার] সফর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন।

বিহার দাঙ্গায় দুর্গতদের সম্পর্কে কিছুদিন যাবৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে মহাত্মাজীর নিকটে অসংখ্য পত্র ও নানারূপ বিবরণ আসিতে থাকে। বিহারের আশ্রয়প্রার্থীদের প্রতি ব্যবহার লইয়া বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীও গান্ধীজীর নিকটে লিখিত এক পত্রে কতকগুলি বিষয়ের অভিযোগ করেন। এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী বিহার গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক পত্র দেন। মহাত্মা যাহাতে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন সেই কারণে বিহারের রাজস্ব সচিব শ্রীযুত কৃষ্ণবল্লভ সহায়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল এ সম্পর্কে সমস্ত কাগজপত্র লইয়া ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্নে চণ্ডীপুরে আগমন করেন। প্রতিনিধিদল মহাত্মাজীর নিকটে এক স্মারকলিপি পেশ করেন। তাহাতে বিহার গবর্ণমেণ্টের বক্তব্য লিপিবদ্ধ থাকে। এই স্মারকলিপিতে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির জবাব দেওয়া হয়। দুর্গতদের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতির জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সকল ব্যবস্থা করেন নথিপত্রে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেখান হয়।

৪ঠা তারিখে প্রাতঃকালে মহাত্মাজী চণ্ডীপুরের এক মাইল দূরবর্ত্তী চাঙ্গিরগাঁও গ্রামে একটি স্কুল পরিদর্শন করেন। স্কুলটিতে শিল্প সম্বন্ধে কোনও শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা মহাত্মাজী তাহা জিজ্ঞাসা করেন এবং স্কুলটিতে যাহাতে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাহার পরামর্শ দেন। তিনি এখানে 'নয়াতালিম' শিক্ষা পদ্ধতির কথাও উল্লেখ করেন।

এইদিন চণ্ডীপুর-চাঙ্গিরগাঁও গ্রাম সেবাসঙ্ঘের সদস্যবৃন্দ মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনর্ব্বসতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মহাত্মাজী একজন সদস্যের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, রক্তের বদলে রক্ত গ্রহণ নীতি বর্ত্তমানে অচল। শক্তিমানের অহিংসাই বর্ত্তমানে প্রতিকারের প্রকৃষ্ট পন্থা।

চণ্ডীপুর হইতে এক মাইল দূরে কাজিবাজার গ্রামে এই দিনের প্রার্থনা সভা হয়। মৌলবী ফজলল হকের বিশেষ অনুরোধে এখানে প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করা হয়। প্রার্থনান্তিক ভাষণে মহাত্মাজী বলেন—অনেকেই আমাকে বাঙলা ত্যাগ করিয়া বিহার যাইবার কথা বলিতেছেন, সেখানে নাকি আমার প্রয়োজন এখানের অপেক্ষা বেশী। আমি নোয়াখালি ত্যাগ করিতে চাহি না কারণ এখানের কাজ আমার জন্য ধরণের। আমি এখানে থাকিয়া কাজের দ্বারা প্রমাণ করিব যে হিন্দুদের ন্যায় মুসলমানদেরও আমি বন্ধু। মুসলমান সম্প্রদায়ের কেহ কেহ আমাকে তাহাদের প্রধান শত্রু বলিয়া মনে করেন। আমি আমার জীবনে কখনও মুসলমানদের শত্রু বলিয়া ভাবি নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমান বন্ধুদের সহিত আমার জীবনের অনেক মূল্যবান সময় কাটিয়াছে। আপনারা জানেন আমি এখানে থাকিয়াই সর্ব্বদা বিহার সরকারের সহিত পত্রালাপ করিতেছি এবং বিহার গবর্ণমেণ্টের উপর আমার প্রভাব প্রয়োগ করিতেছি। গতকাল যে বিহার প্রতিনিধিদল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন তাঁহারাও কিছু গোপন না করিয়াই হাঙ্গামার সকল বিবরণ, সেবাকার্য্যের সকল ব্যবস্থাই আমাকে জানাইয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, শুনা যাইতেছে নোয়াখালির অধিকাংশ আশ্রয়প্রার্থীই এবার গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের গৃহ পুনর্নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাজে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করা উচিত। বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য করিতে চান, কিন্তু যাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য তাহা তাঁহারা করিবেন কেন। গবর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, তাঁহারাই জনসাধারণের সাহায্য চাহিবেন।

এই প্রার্থনা সভায় মৌলবী ফজলল হকও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য আবেদন জানাইয়া বক্তৃতা করেন। তিনি কোরাণের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ভাইয়ে ভাইয়ে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বা প্রতিবেশীর সঙ্গে বিরোধ কোরাণ সমর্থন করে না। তিনি বলেন, হিন্দু মুসলমান স্মরণাতীতকাল হইতে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও বাস করিবে। মিঃ জিন্নার লোকবিনিময় এক অসম্ভব পরিকল্পনা ও খেয়াল মাত্র। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মীদিগকে হিন্দু প্রতিবেশীদের পুনর্ব্বসতির কাজে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ জানান।

৫ই ডিসেম্বর চণ্ডীপুরের এক মাইল দূরে হরিশচর স্কুলে মহাত্মাজী তাঁহার প্রার্থনা সভা করেন। তিনি বলেন, এখানে তিনি রাজনীতি করিতে আসেন নাই। লীগের প্রভাব নষ্ট করিতে বা কংগ্রেসের প্রভাব বৃদ্ধি করাও তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। তিনি বলেন, জনসাধারণ তাঁহার উপদেশ মত কাজ করিলে, তাহাদের দুরবস্থা দূরীভূত হইবে। বাঙলা সুজলা সুফলা হইলেও এখানের লোকে দারিদ্র্য ও রোগে নিপীড়িত। জমির উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিলে পল্লীর সম্পদও বহু গুণ বৃদ্ধি পাইবে।

আশ্রয়প্রার্থীদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, সকল বিপদের মধ্যেও তাহাদের গ্রামে ফিরিয়া আসা উচিত। তিনি দুষ্কৃতকারীদের ভগবানের উপর নির্ভর করিতে এবং সৎ জীবনযাপনকরিতে উপদেশ দেন এবং বলেন অন্যায়কারীদেরও ভগবানের নিকটে অন্যায় স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিক ব্যক্তি ভগবানের নিকট অন্যায় স্বীকার করিলে পুনরায় অন্যায় করিতে পারেন না।

৬ই ডিসেম্বর চণ্ডীপুরের একটি মুসলমান পাড়ায় অবস্থিত এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভা হয়। সৈয়দ আলি সারেঙ্গ এই প্রার্থনা সভার ব্যবস্থা করেন। চণ্ডীপুরে মহাত্মার আশ্রয়দাতা শ্রীরমণীমোহন মজুমদার ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীঅবনীমোহন মজুমদারকে মিঃ সারেঙ্গ গত হাঙ্গামার সময় দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে রক্ষা করেন। তিনি অবনী মজুমদারকে তাঁহার বাড়ীতে আনিয়া রাখেন এবং রমণীবাবুকে দুর্ব্বৃত্তরা কাটিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া দুর্ব্বৃত্তদের তরবারির নিকটে নিজের গলা বাড়াইয়া দিয়া আগে তাঁহাকে কাটিতে বলেন। এইভাবে মজুমদার ভ্রাতৃদ্বয় রক্ষা পান।

গান্ধীজী এই দিন প্রার্থনা সভায় তাঁহার অনুগামী শিখদের কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, শিখরা বাঙলা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া কৃপাণ রাখিয়া নিরস্ত্রভাবে এখানে আসিয়াছেন। অহিংস আদর্শে তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান সেবায় ব্রতী হইয়াছেন। তারপর তিনি গ্রামবাসীদিগকে পল্লী পুনর্গঠন, পুকুরের জল পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কথা

বলেন। ইহার পর মিলাদ সরীফ হয়। বহু শিশু ও প্রায় ৫০জন বয়স্ক মুসলমান ইহাতে যোগ দেন। মিলাদ সরীফের পর মৌলবী মহম্মদ রহিম বক্স হিন্দু মুসলমান মিলনের উপর জোর দিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই হিসাবে বহু যুগ ধরিয়া পাশাপাশি বাস করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। একজন অপরকে ছাড়া চলিতে পারে না।

৭ই জানুয়ারী প্রাতে মহাত্মাজী চণ্ডীপুর ত্যাগ করিয়া মাসিমপুরের দিকে রওনা হন। এইবারই তাঁহার প্রকৃত পল্লীপরিক্রমা আরম্ভ হয়। হিন্দু মুসলমান দুইটি সম্প্রদায় বহুশত বৎসর ধরিয়া যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছিল, কিছুদিন পূর্ব্বে এক অন্ধ রাজনৈতিক ধূয়া দমকা হাওয়ার মত আসিয়া সেই বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল এবং পরস্পরকে পরম শত্রুতে পরিণত করিল। হিন্দু মুসলমানের সেই সম্প্রীতির বন্ধন পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্যই মহাত্মা গান্ধীর এই গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ভ্রমণের আয়োজন; মনুষ্যত্বের পুন প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁহার এই জীবন পণ। ৮।১।৪৭

গণ-পরিষদ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

৫ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে নিখিলভারত রাষ্ট্রীয়-সমিতির যে অধিবেশন আহূত হয়, তাহা এই কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, এই অধিবেশনের মতামতের উপরেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি গ্রহণ অথবা বর্জনের কথা নির্ভর করিতেছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ব হইতেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিবৃতি সম্পর্কে এক খসড়া প্রস্তাব রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, অপরাহ্নে কনষ্টিটিউশন ক্লাবে আচার্য কৃপালনীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বৈঠক বসিলে ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাদের প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিবৃতি গ্রহণের সুপারিশ করিয়া বলা হয়—গণ-পরিষদ সকল দলের শুভেচ্ছা লইয়া স্বাধীন ভারতের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিবে ইহাই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ইচ্ছা। মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকার ভাষ্যের ফলে যে সকল জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূরীকরণের জন্য সেকশনের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাজ করিতে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি নির্দেশ দিতেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে রাষ্ট্রীয় সমিতির এই সম্মতির ফলে কোন প্রদেশের উপর বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া চলিবে না এবং পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা চলিবে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইরূপ কোন বাধ্যতামূলক কিছু চাপাইয়া দেওয়া হইলে প্রদেশ বা প্রদেশের অংশ বিশেষ নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে এবং সে অধিকার তাহাদের রহিয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার সুপারিশ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিলে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ২১ জন বক্তার মধ্যে ১৬ জন প্রস্তাবের বিপক্ষে বক্তৃতা করেন এবং অধিকাংশ সংশোধন প্রস্তাবেই ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি বর্জনের কথা বলা হয়। পণ্ডিত নেহরু প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন—প্রস্তাবটি অত্যন্ত সহজ ও স্পষ্ট। ইহার মধ্যে দুর্বলতার কোন চিহ্ন নাই, দুর্বলতার সংশয় থাকিলে ইহা গ্রহণ করিতে বলিতাম না। আসল কথা হইতেছে যে গণ-পরিষদকে বাঁচাইয়া রাখিয়া উহার মধ্য দিয়া কিভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করা যায় তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি গ্রহণ করিয়া আমরা গণ-পরিষদে লীগের জন্য প্রবেশের দ্বার খুলিয়া দিব এবং তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ দিব। আমরা এই বিবৃতি গ্রহণ না করিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ১৬ই মের প্রস্তাব পরিবর্তন অথবা প্রত্যাহারের সুযোগ পাইবেন। তাহা হইলে গণ-পরিষদের রূপ মূলতঃ পরিবর্তিত হইবে। গণ-পরিষদ যাহাতে বন্ধ না হয় বা ভাঙ্গিয়া না যায় আমাদের তাহাই দেখিতে হইবে। গণ-পরিষদ আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম এক নূতন পথে পরিচালিত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বলপ্রয়োগ ভিন্ন ইহাকে আর ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বলপ্রয়োগ করিতে চাহিলে, কিভাবে আমরা উহার সম্মুখীন হইব, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখিব। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আমরা জগৎকে দেখাইয়া দিব যে, আমরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া কোন কিছু করিতে চাহি না। লীগের সহিত সহযোগিতায় ব্যগ্রতা দেখাইতে গিয়া আমরা বহু অপ্রিয় কার্য করিয়াছি এবং বহু জরুরী সিদ্ধান্তও পিছাইয়া দিয়াছি বৃটিশ পরিকল্পনা আমরা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছি একথা বলিবার সুযোগ আমরা কাহাকেও দিতে চাহি না।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি মানিয়া লওয়া সম্পর্কে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হইলেও ৬ই জানুয়ারী পণ্ডিত নেহরুর উক্ত প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্ত্তৃক ৯৯-৫২ ভোটে গৃহীত হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যোগদান করিতে না পারায় এক তার যোগে রাষ্ট্রপতি কৃপালনীর মারফৎ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যে, ওয়ার্কিং কমিটি যেন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি গ্রহণের সুপারিশ না করেন। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করায় তিনি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

এদিকে গণ-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনের দিন আগাইয়া আসিল। কংগ্রেস বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বরের ভাষ্য স্বীকার করিয়া গণ-পরিষদে যোগদান করিলেন। গণ-পরিষদের প্রথমবারের অধিবেশন শেষ হইবার ২৭ দিন পরে ২০শে জানুয়ারী এই দ্বিতীয় অধিবেশন বসিল। মাঝে ২৩শে তারিখে একদিন প্রকাশ্য অধিবেশন বন্ধ থাকিয়া ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত এই অধিবেশন চলে। প্রথম অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরুর রাষ্ট্রিক আদর্শ ঘোষণা বিষয়ক প্রস্তাব লইয়া যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ডাঃ জয়াকরের সংশোধন প্রস্তাব অনুযায়ী লীগ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে গণ-পরিষদে যোগদানের সুযোগ দিবার জন্য যাহা স্থগিত রাখা হইয়াছিল, এবারের অধিবেশনে বিশেষভাবে তাহারই পুনরালোচনা হয়। গত ডিসেম্বর মাসে পার্লামেণ্টে ভারত সম্পর্কে বিতর্ককালে মিঃ চার্চিল, ভাই-কাউণ্ট সাইমন প্রভৃতি গণ-পরিষদকে পণ্ড করিবার জন্য লীগের পক্ষে ওকালতী করিতে গিয়া ইহার প্রথম অধিবেশনকে এক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সভা—"বর্ণ-হিন্দুদের সভা" বলিয়া যে মিথ্যা মন্তব্য করিয়াছিলেন এবারের অধিবেশনের প্রথমেই গণ-পরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেই ভিত্তিহীন উল্লেখের স্পষ্ট উত্তর দেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন—প্রাথমিক অধিবেশনে মোট ২৯৬ জন সদস্যের মধ্যে ২১০ জন সদস্য যোগদান করিয়াছিলেন। গণ-পরিষদের ১৬০ জন বর্ণ হিন্দু সদস্যের ১৫৫জন, ৩৩ তপশীলীর মধ্যে ৩০ জন, ৫ জন শিখের সকলেই, ৭ জন দেশীয় খৃষ্টানের মধ্যে ৬ জন, অনুন্নত জাতি সমূহের ৫ জন সদস্যের সকলেই, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও পার্শী সকল সদস্যই, ৮০ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে ৪ জন অ-লীগ মুসলমান প্রাথমিক অধিবেশনে যোগদান করেন। এইভাবে অঙ্কের হিসাব দেখাইয়া ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লীগ-দরদী মিঃ চার্চিল প্রভৃতির দুরভিসন্ধিমূলক মিথ্যা অপপ্রচারের অসারতা প্রমাণ করিয়া দেন।

লীগ গণ-পরিষদে যোগদান না করায় অপর সদস্যরা দুঃখ প্রকাশ করেন এবং লীগকে গণ পরিষদে যোগদান করিতে চিন্তা করিবার জন্য যথেষ্ট সুযোগও তাঁহারা দেন। তাঁহাদের মুখ চাহিয়া, আপোষমূলক মনোভাবেই সদস্যরা প্রথম অধিবেশনে প্রাথমিক কাজগুলি ছাড়া অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

২০শে জানুয়ারী পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব আলোচনায় প্রথমেই স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। মিঃ গ্যাড্‌গিল, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, হরিজন সদস্য মিঃ নাগাপ্পাও ইহা সমর্থন করিয়া এই দিন বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মিঃ এস, এইচ-প্রেটার, বেগম ডি পুরুষ, ডাঃ এইচ সি মুখার্জী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সামন্ত এবং শ্রীখাণ্ডেকর সহ আরও ১১ জন সদস্য বক্তৃতা করেন। দুইটি অধিবেশনে প্রায় ৫০ জন সদস্য এই প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

লীগ গণ-পরিষদে যাহাতে যোগদান করিবার সুযোগ পান, সেই জন্য পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব স্থগিত রাখা হইয়াছিল। কিন্তু লীগ ২০শে জানুয়ারীর পূর্বে তাঁহাদের কোনরূপ মতামত প্রকাশ না করিয়া ২৯শে তারিখে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করেন। এরূপ ক্ষেত্রে ডাঃ জয়াকর পরিষদের অনুমতি লইয়া তাঁহার সংশোধন প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। ডাঃ জয়াকর তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করায় এবং আর কোনরূপ বিতর্কের সৃষ্টি না হওয়ায় ২২শে জানুয়ারী উহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পণ্ডিত নেহরুর এই প্রস্তাবের মূল কথা হইল—বৃটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য ও অন্যান্য অঞ্চল যাহা ভারতের সহিত সংযুক্ত থাকিতে চাহে তাহাদের লইয়া একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং দেশের জনগণই হইবে ইহার সকল শক্তির উৎস। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসী সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সুবিচার, সমান মর্য্যাদা, সুযোগ সুবিধায় সমান অধিকার অবশ্যই পাইবে বলিয়া স্বীকৃত হইবে। চিন্তায়, বাক্যে এবং ধর্মাচরণে স্বাধীনতা থাকিবে। নীতি ও আইন সম্মতভাবে সঙ্ঘ গঠনের অধিকারে স্বীকৃতি পাইবে। আবশ্যক হইলে সংখ্যালঘু, অনগ্রসর, আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার বহির্ভূত সকল বিষয়ে ইউনিটগুলি আত্মকর্তৃত্ব সম্পন্ন থাকিবে এবং গণপরিষদ প্রয়োজন বোধ করিলে এই ইউনিটগুলির পরিবর্তন এবং অতিরিক্ত নূতন ইউনিট গঠন করিতে পারিবেন।

ভারত আজ অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া যে আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ বলি দিয়া সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে, পণ্ডিত নেহরুর এই প্রস্তাবে তাহাই সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। কোটি কোটি নরনারীর স্বপ্ন এই প্রস্তাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই ঘোষিত নীতিকেই অবলম্বন করিয়া গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের জন্য গৌরবময় শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। শাসনতন্ত্র রচনায় ইহাই পবিত্র ভিত্তি। তাই পরিষদ কক্ষে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার কালে সদস্যবৃন্দ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস এতদিন কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজের শক্তিতেই সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন, আজ অপরে আসে ভালই নতুবা কাহারও জন্য কংগ্রেস আর অপেক্ষা করিবেন না। সকলের ন্যায়সঙ্গত ও গণতন্ত্রসম্মত অধিকার রক্ষা করিয়া আজ ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই পণ্ডিত নেহরু এই দিন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—যাঁহারা গণ-পরিষদে আসেন নাই তাঁহাদিগকে প্রচুর সময় দেওয়া হইয়াছে, দুঃখের বিষয় তাঁহারা এখনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। গণ-পরিষদে তাঁহারা আসুন আর নাই আসুন একথা স্পষ্ট করিয়া জানান দরকার যে গণ-পরিষদের কাজ বন্ধ থাকিবে না। দেশের ধনী ব্যক্তিরা হয় ত আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের পক্ষে আর অপেক্ষা করা চলে না।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রিক আদর্শ বিষয়ক প্রস্তাবে জনসাধারণকে

শক্তির উৎস বলায় কয়েকজন দেশীয় নৃপতি ইহাতে আপত্তি করেন। দেশীয় নৃপতিবৃন্দ নিজেদের বৃটিশ প্রদত্ত অধিকারে অধিকারী ভাবিয়া এই প্রস্তাবে আপত্তি তোলায় আজ তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বৃটিশ অনুগ্রহপুষ্ট এই সব দেশীয় নৃপতিবৃন্দকে আজ বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং ইহাও বুঝিতে হইবে যে জনগণের প্রদত্ত অধিকারই তাঁহাদের প্রকৃত অধিকার, নচেৎ জনগণের বিরাট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের নিকটে তাঁহাদের টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

পণ্ডিতজী দেশীয় রাজ্যের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—এই প্রস্তাবে জনসাধারণকে সর্ব ক্ষমতার মূলাধার বলায়, কয়েকজন দেশীয় নৃপতির নাকি ইহা মনোমত হয় নাই। ইহা বিশেষ নিন্দনীয়, কারণ মানুষের উপর আধিপত্য করিবার অধিকার আজ লজ্জাজনক। গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরা শীঘ্রই যোগদান করুন ইহা আমাদের কাম্য, তবে তাঁহারা প্রকৃত প্রতিনিধি হওয়া চাই।

দ্বিতীয় অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরুর রাষ্ট্রিক আদর্শ ঘোষণা বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া (১) গণ-পরিষদের কার্য পরিচালনা কমিটি, (২) গণ-পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচন, (৩) সংখ্যালঘুদের অধিকার, খণ্ডজাতি এবং শাসনসংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকার রক্ষার জন্য কমিটি (৪) গণ-পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনের জন্য কার্যক্রম প্রণয়ন করিয়া পরবর্তী অধিবেশনের পূর্বেই তাহা দাখিল করিবার জন্য একটি কমিটি (৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আয়ত্তাধীন বিষয়-সমূহ নির্ধারণের জন্য অপর একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম দুইটি প্রস্তাবের উত্থাপন করেন শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ, তৃতীয়টির পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, চতুর্থটির ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া এবং শেষ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শ্রীরাজাগোপালাচারী।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার উজ্জ্বল সিংহ, শ্রীমতী দুর্গাবাঈ, মিঃ এস এইচ প্রেটার, মিঃ কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ, শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার, শ্রীএস. এন, মানে, শ্রী কে. এম. মুন্সী ও দেওয়ান চমনলালকে লইয়া গণ-পরিষদের কার্য পরিচালনা কমিটি গঠিত হইবে বলিয়া সভাপতি ঘোষণা করেন। ডাঃ এইচ. সি. মুখার্জী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণ-পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ডাঃ সীতারামিয়ার প্রস্তাব অনুযায়ী গণ-পরিষদের পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করিবার জন্য স্যার গোপালস্বামী আয়েঙ্গার, মিঃ কে. এম. মুন্সী এবং শ্রীবিশ্বনাথ দাসকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাব অনুসারে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইবে তাহাতে ৭২জন সদস্য থাকিবেন বলিয়া ঘোষিত হয়। গণ-পরিষদের সদস্য নহেন এরূপ ব্যক্তিও কমিটির সদস্য থাকিতে পারিবেন। ইতিমধ্যেই ৫০জন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। সভাপতি একই সময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে অপর সদস্যদের মনোনীত করিবেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও আসাম হইতে ৭জন মুসলমান প্রতিনিধি কমিটিতে থাকিবেন। উপদেষ্টা কমিটি উপজাতি অঞ্চল ও শাসনতন্ত্র বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন পরিকল্পনা সম্পর্কে যে সাব-কমিটি নিয়োগ করিবেন, তাহাতে প্রত্যেকটি উপজাতি অধ্যুষিত নির্দিষ্ট অঞ্চল হইতে ২জন করিয়া সদস্য গ্রহণ করা হইবে। প্রয়োজনবোধে উপদেষ্টা কমিটি অন্যান্য সাব-কমিটিও নিয়োগ করিতে পারিবেন। উপদেষ্টা কমিটি ও উহার সাব-কমিটিসমূহের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকিলেই কোরাম হইবে। উপদেষ্টা কমিটি এই প্রস্তাব গ্রহণের তিনমাস মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গণ-পরিষদের নিকট তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা বিভিন্ন সময়েও আংশিক রিপোর্ট দাখিল করিতে পারেন। এই কমিটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ৬ সপ্তাহের মধ্যে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার সম্পর্কে ১০ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

গুরুত্ব হিসাবে পণ্ডিত নেহরুর রাষ্ট্রিক আদর্শ ঘোষণা বিষয়ক প্রস্তাবের পরই পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবটি উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী গণ-পরিষদের সভাপতি নির্বাচনের পরই এই বিষয়টি বিবেচনা করার কথা, কিন্তু অনুপস্থিত সদস্যদের অপেক্ষাতেই ইহাকে এতদিন স্থগিত রাখা হইয়াছিল। গণ-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনের কাল পর্যন্তও লীগের মতিগতি বুঝিতে না পারায় এই জরুরী প্রস্তাবটিকে আর ফেলিয়া রাখা সমীচীন নয় বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হয়।

এই কমিটির সুবিবেচনার উপরেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা লইয়া ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, এই কমিটিকে তাহারও সমাধান করিতে হইবে। এই সকল কারণে এই কমিটির গুরুত্ব সমধিক।

গণ-পরিষদের দুইটি অধিবেশন শেষ হইয়া গেল, সার্বভৌম স্বাধীন রিপাবলিক ভারতের রাষ্ট্রিক আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইল এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ কমিটিও গঠিত হইয়া গেল, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি গণ-পরিষদে যোগদান সম্পর্কে তাঁহাদের কোনও মত প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে ২৯শে জানুয়ারী তারিখে নয়াদিল্লীতে নরেন্দ্র মণ্ডলের ষ্টাণ্ডিং কমিটি কয়েকটি সর্তে দেশীয় রাজ্যসমূহ গণ পরিষদে যোগদান করিবে বলিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐদিনই পরে নরেন্দ্রমণ্ডলের সাধারণ অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রস্তাবের প্রধান সর্তগুলি হইল যে—

অন্তর্বর্তীকালীন শাসন ব্যবস্থা শেষ হইয়া গেলে ভারত গবর্ণমেন্টের সার্বভৌম ক্ষমতার যখন অবসান হইবে তখন অধীশ্বরদের ক্ষমতা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে না দিয়া তাঁহাদের প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রভুশক্তির নিকটে তাঁহারা যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের হয় তো ফিরিয়া আসিবে, পক্ষান্তরে দেশীয় রাজ্যসমূহ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করিবেন, তাহাতেই শুধু যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার থাকিবে। দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রিক অখণ্ড এবং দেশীয় রাজ্যের প্রচলিত সংস্কার, আইনকানুন ও রাজবংশের উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। কোন রাজ্যের সম্মতি ছাড়া তাহার বর্তমান সীমানা পরিবর্তন বা পরিবর্জন

করা চলিবে না। গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের আসনগুলি তাঁহাদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করা হইবে তাহা রাজন্যবর্গই ঠিক করিয়া লইবেন, তবে কিভাবে সদস্য মনোনয়ন করা হইবে, সে সম্পর্কে নরেন্দ্র মণ্ডলের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত দেশীয় রাজ্যের আলোচনাকারী কমিটি ও গণ-পরিষদের আলোচনাকারী কমিটির মধ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা হইবে। ৮ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে এই আলোচনার দিন স্থির হয়।

দেশীয় রাজ্যগুলি কতক বিষয়ে সর্ত্তসাপেক্ষ হইয়া গণপরিষদে যোগদানের সিদ্ধান্ত করিলেও, লীগ কিন্তু কয়দিন পরে গণপরিষদ সম্পর্কে তাঁহাদের যে মত প্রকাশ করিলেন, তাহাতে যোগদান ত দূরের কথা, গণপরিষদকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দিবার জন্য বৃটিশ প্রভুর সাহায্য ভিক্ষা করিলেন।

২৯শে জানুয়ারী করাচীতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক আহুত হয়, তাহার তিন দিন অধিবেশনের পর তিন হাজার শব্দ সম্বলিত লীগ গণপরিষদ সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই লীগ প্রস্তাবের সার কথা এই যে—কংগ্রেস ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি মোটেই গ্রহণ করেন নাই, গ্রহণের ভাণ করিয়াছেন মাত্র। এরূপ ক্ষেত্রে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে আহ্বান করিয়াছেন যে এই গণপরিষদ একেবারে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক।

প্রকাশ যে লীগের এই প্রস্তাব গ্রহণ কালে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে নাকি বিশেষ মত বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই কারণেই লীগ নেতারা লীগ কাউন্সিলের সভা আহ্বান করিয়া ইহা অনুমোদন করাইবার আর সাহস পাইলেন না। যাহাই হউক লীগ কর্তৃক গণপরিষদ বর্জনের ফলে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্র আরও জটিলতর হইয়া পড়িল। কংগ্রেস পক্ষ লীগকে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টও ত্যাগ করিবার জন্য এবার বড়লাটকে চাপ দিবেন। কারণ মন্ত্রিমিশনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ না করিলে অন্তর্বর্তী সরকারে কাহারও থাকা সম্ভব নহে। লীগ নেতৃবৃন্দ এবার আর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিবার সাহসী হইলেন না, কারণ পূর্বেই দেখিয়াছেন যে ইহাতে বিশেষ কিছু ফলোদয় হয় নাই। তাই গণপরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য এবার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এদিকে শুধু লীগ ব্যতীত ভারতের অপর সকল দল ও সম্প্রদায়ই গণ পরিষদের কাজ চালাইয়া যাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। লীগের অনুরোধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এখন কোনপন্থা অবলম্বন করিবেন তাহাই লক্ষণীয়। ৪।২।৪৭

বা গুড়ূচী

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এসসি ও কবিরাজ শ্রীসতীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ভিষগ্রত্ন

গুলঞ্চ আর একটি অতি প্রয়োজনীয় আয়ুর্বেদীয় ঔষধ। উহা এক প্রকার লতানে গাছ। বৈজ্ঞানিক নাম Tinospora Cordifolia, Natural order Menispermaceae। আকনাদি এই জাতীয় গাছ; গুণও সদৃশ। গুলঞ্চ বর্ষাকালে সহজেই জন্মান যায়। পুরাণ গুলঞ্চের কাণ্ড—এক বিঘৎ (বিতস্তি) কাটিয়া লইয়া, বর্ষায় জল জমে না এমন জমিতে চার আঙ্গুল আন্দাজ মাটির ভিতর পুঁতিয়া বেশ করিয়া মাটি চাপিয়া দিতে হইবে। জমিটা যদি নীচু হয় তবে কয়েক ঝুড়ি মাটি ফেলিয়া দিয়া উহাকে উঁচু করা যাইতে পারে। পাঁচ ছয়টা কলম (cutting) চার আঙ্গুল দূরে দূরে লাগাইলে মাস খানেকের মধ্যে উহার মধ্যে তিন চারিটি মাটির ভিতর শিকড় ছাড়িয়া নূতন গাছে পরিণত হইবে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ঐ কলম প্রয়োজন মত স্থানে লাগাইতে হইবে। গুলঞ্চ লতানে গাছ বলিয়া উহার আশ্রয় প্রয়োজন। তবে অম্লরসযুক্ত গাছে (আম, আমড়া, তেঁতুল) গুলঞ্চ উঠিলে কবিরাজ মহাশয়রা উহার ঔষধার্থে ব্যবহার নিষেধ করেন। তিক্ত গাছে—বিশেষতঃ নিমগাছে উঠান গুলঞ্চই ঔষধার্থে সমধিক গুণসম্পন্ন। একটি বাঁশ বা অন্য শুষ্ক কাঠের উপর গুলঞ্চ গাছ উঠান যাইতে পারে। এরূপ আশ্রয়ের উপর উঠান গুলঞ্চ একটি সবুজ স্তম্ভের মত দেখায়; সৌখিন বাগানেও তখন উহা অশোভন হয় না।

গুলঞ্চ জ্বর ও অনেকবিধ পীড়ায়—বিশেষতঃ বাতরক্ত নামক রক্ত-বিকৃতির পীড়ায় মহৌষধ। চক্রদত্ত ও ভাবপ্রকাশ—উভয় গ্রন্থে লিখিত শ্লোক দুইটি সুন্দররূপে উহার গুণ ব্যাখ্যা করে।

> গুড়ূচ্যাঃ স্বরসং কল্কং চূর্ণং বা কাথমেব বা।
> প্রভূত কালমাসেব্য মুচ্যতে বাত শোণিতাৎ॥

গুলঞ্চের রস, কল্ক (উত্তমরূপে বাটা বা ছেঁচা দ্রব্য) চূর্ণ (শুষ্ক গুলঞ্চ গুঁড়া করা) বা কাথ (২ তোলা ঔষধ আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া অবস্থায় ছাঁকা দ্রব্য) বহুদিন সেবন করিয়া লোকে বাতশোণিত হইতে মুক্ত হয়।

> ঘৃতেন বাতং সগুড়া বিবন্ধং পিত্তং সিতাঢ্যা মধুনা কফঞ্চ।
> বাতস্রগুগ্রং রুবুতৈল মিশ্রা শুণ্ঠ্যামবাতং শময়েদ্ গুড়ূচী॥

ঘৃতের সহিত ভক্ষিত গুড়ূচী বায়ুরোগ নাশ করে; গুড়ের সহিত ভক্ষিত হইলে কোষ্ঠবদ্ধ নাশ করে; চিনির সহিত ভক্ষিত হইলে পিত্তজ রোগ নাশ করে; মধুর সহিত ভক্ষিত হইলে কফরোগ নাশ করে। এরণ্ড তৈলের (castor oil) ভক্ষিত হইলে উহা উগ্র বাতরক্ত রোগ নাশ করে; এবং শুঁঠের সহিত ভক্ষিত হইলে উহা আমবাত নাশ করে।

গুলঞ্চের আর কয়েকটি প্রয়োগ :—

(১) গুলঞ্চের রস দু তোলা বা শুষ্ক গুলঞ্চ চূর্ণ আধ তোলা এক পোয়া দুগ্ধ ও চিনিরসহ সেব্য—বলকারক ও রসায়ন (দীর্ঘ-জীবনপ্রদ ও শরীরের কান্তিবৃদ্ধিকর)।

(২) গুলঞ্চের রস ১ তোলা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

(৩) ঐ রস মধুসহ সেবন করিলে বা ২ তোলা শুষ্ক গুলঞ্চের কাথ করিয়া তাহা মধুসহ সেবন করিলে কামলা রোগ ভাল হয়।

(৪) পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ গুলঞ্চের কাথ সেবনে কাসযুক্ত পুরাতন জ্বর ভাল হয়।
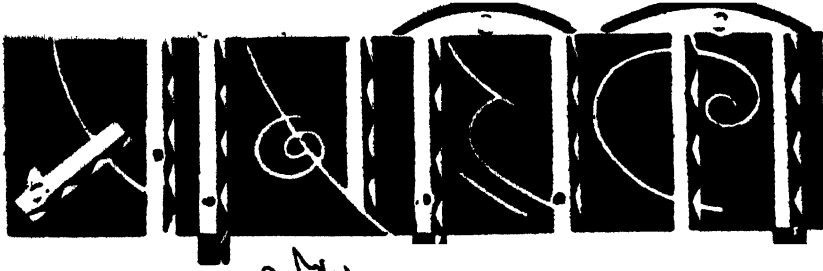
নেতাজী জন্মোৎসব সপ্তাহ

গত ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৫১ তম জন্ম দিবস উপলক্ষে ভারতের সর্ব্বত্র ঐ দিনটি নানাবিধ অনুষ্ঠানের সহিত পালিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে কলিকাতায় আজাদ-হিন্দ-ফৌজের বহু নেতা ও কর্ম্মী আসিয়া ৭ দিন 'বেলগেছিয়া ভিলা' প্রাসাদে বাস করিয়াছিলেন ও তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া সহরতলী ও বিভিন্ন জেলায় যাইয়া ৭ দিন ধরিয়া নেতাজী জন্মোৎসব সপ্তাহ পালন করিয়াছেন। কলিকাতায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় সভা বা শোভাযাত্রা হয় নাই বটে, কিন্তু আজাদ-হিন্দ-দলের কর্ম্মীদের লইয়া প্রায় গৃহে গৃহে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কর্ম্মীরা ২৩শে তারিখে সকালে প্রায় এক শত দলে সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ও সুভাষচন্দ্রের জীবনকথা সর্ব্বত্র আলোচিত হয়। ঐ দিন দ্বিপ্রহরে সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বাসভবন নেতাজী ভবন বলিয়া ঘোষিত হয় ও জনসাধারণ কয়েকদিন ধরিয়া ঐ গৃহ দর্শন করিতে গমন করেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু গণপরিষদে যোগদানের জন্য দিল্লীতে না যাইয়া কয়দিন অহোরাত্র উৎসবের নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন এবং আজাদ-হিন্দ-দলের সদস্যগণের সকল প্রকার সুখসুবিধা বিধানে তৎপর ছিলেন। ১৯৪৬ সাল অপেক্ষা ১৯৪৭ সালে সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবসে অধিকসংখ্যক অনুষ্ঠান হইয়াছে ও গত এক বৎসর কাল দেশবাসী সুভাষচন্দ্রের কার্য্যের যে পরিচয় পাইয়াছিল, তাহার সুযোগে সুভাষচন্দ্রকে অধিকতর আগ্রহের সহিত তাঁহার জন্মদিনে শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছে। সুখের বিষয়, মুসলমানগণও সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসবে দলে দলে যোগদান করিয়া ভারতবাসীর ঐক্য ঘোষণা করিয়াছেন।

নেতাজী ভবনে নেতাজীর জন্মক্ষণে শঙ্খধ্বনি
ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

নেতাজীর জন্মদিনে ক্যাপ্টেন রাঠোরী ও অন্যান্য আজাদ হিন্দ সদস্যগণ
ফটো—পান্না সেন

ভিয়েৎনাম দিবসে কলিকাতার রাজপথে ছাত্রদের শোভাযাত্রা ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-দিবস পালন—

গত ২৬শে জানুয়ারী ভারতের সর্ব্বত্র স্বাধীনতা দিবস পালিত হইয়াছে ও সর্ব্বত্র দেশবাসী জাতীয় পতাকার তলে সমবেত হইয়া কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাণী পাঠ করিয়াছে। এই উপলক্ষে দেশে যে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছিল তাহা প্রকৃতই অসাধারণ। দেশবাসী স্বাধীনতালাভের পথে যতই অগ্রসর হইতেছে, পূর্ণ স্বাধীনতালাভের আগ্রহও তাহার ততই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই সুভাষ জন্মদিবসে ও স্বাধীনতা দিবসে সারা ভারতের সর্ব্বত্র—গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে সকলের মধ্যে উত্তেজনা ও উৎসাহের ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা দিবসে বাঙ্গালায় এবার আজাদ-হিন্দ-দলের বহু নেতা উপস্থিত থাকায় সকলেই তাঁহাদের উপস্থিতির সুযোগ লইয়া তাঁহাদের নিকট স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ শ্রবণ করিয়াছে।

ভারতের খাদ্যসমস্যা—

ভারতের বর্ত্তমান সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতিতে খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের খাদ্য সচিব ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বহু প্রকার চেষ্টা করিতেছেন। দেশে অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য তিনি নূতন পরিকল্পনা স্থির করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করার ব্যবস্থা করিতেছেন। গত ৩০শে জানুয়ারী তিনি তাঁহার সেক্রেটারী সার রবার্ট হাচিংসকে বিলাতে পাঠাইয়াছেন। হাচিংস তুরস্কে ভারতের জন্য ক্রয়-করা গম সত্বর ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং ১৯৪৭ সালের প্রথমার্দ্ধে অন্যান্য দেশ হইতে বরাদ্দ খাদ্য যাহাতে যথাসময়ে ভারতে প্রেরিত হয়, সে বিষয়ে তদ্বির করিবেন। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের কংগ্রেসী সদস্যগণ ৫ মাস কাল কাজ করার পরও ভারতের খাদ্য পরিস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—

বরং তাহা আরও জটিল হইয়াছে। কবে যে তাঁহারা এ সমস্তার সমাধানে সমর্থ হইবেন, তাহা কে জানে ?

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও সহকারী ভারতসচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন

কলিকাতায় পুলিশের গুলি—

ফরাসী ইন্দোচীনের অধিবাসীরা যে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছে, তাহার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্ম গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতাবাসী ছাত্রগণ পথে এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। কলিকাতার পুলিশ নানাস্থানে শোভাযাত্রার বাধা প্রদান করে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহের সম্মুখে সকল ছাত্র-মিছিল একত্র হইলে পুলিশ ছাত্রদের সরাইবার জন্ম বার বার কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং বিফল হইয়া শেষে লাঠি ও গুলী চালাইয়াছে। গুলীর আঘাতে বেঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্ত অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনের পুত্র ধীররঞ্জন সেন নিহত হইয়াছেন এবং বহু ছাত্রছাত্রী আহত হইয়াছে। সে জন্ম ২২শে কলিকাতা সহরের সর্ব্বত্র হরতাল পালিত হইয়াছিল।

নিখিল ভারত ছাত্র-সম্মেলনে আগষ্ট আন্দোলনের শহীদ ছাত্রদের স্মারক স্তম্ভ

পাঞ্জাবে নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার—

পাঞ্জাবে দাঙ্গা বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া স্থানীয় সচিবসংঘ একটি হিন্দু ও একটি মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে গত ২৪শে জানুয়ারী বেআইনি বলিয়া ঘোষণা করেন ও মুসলেম লীগের ৮ জন বড় বড় নেতাকে গ্রেপ্তার করেন। ঐ দিনে মুসলেম লীগ সভাপতি মামদোতের নবাব, মিঃ ফিরোজ খাঁ নুন, বেগম সাহ নওয়াজ প্রভৃতি ছিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীদ্বয়কে আইন সঙ্গত বলিয়া ঘোষণা করা হয় ও ধৃত নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার পর মুক্তি প্রাপ্ত নেতারা আবার আইন অমান্ত করিতে উদ্যত হইলে ২৯শে জানুয়ারী ভোরে ১২ জন নেতা ও প্রায় ৬ শত মুসলেম লীগ কর্ম্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে; নেতাদিগকে অজ্ঞাত স্থানে লইয়া গিয়া রাখা হইয়াছে। পাঞ্জাবে এই ঘটনায় বিষম চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা উপস্থিত হইয়াছে।

দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে রুশ বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধিদল

নিখিলভারত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়—

আগ্রার ভারতীয় বিদ্যাপ্রচার সমিতি একটি নিখিল ভারত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, ধর্ম্ম, প্রত্নতত্ত্ব, রাজনীতি ও সমাজনীতি, সংস্কৃত ও প্রাচ্যবিদ্যা গবেষণা, প্রাচ্য সাংবাদিকতা, কৃষিবিদ্যা, চারুশিল্প, যন্ত্রবিদ্যা, কারুশিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ খোলা হইবে এবং সমস্ত বিভাগেই সংস্কৃতের মাধ্যমে শিক্ষা দান চলিবে। যেখানে সংস্কৃত একেবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে আপাততঃ সেখানে হিন্দী ব্যবহার করা হইবে। এই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পাশ করিয়া যাহাতে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ন্যায় সমান মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য উক্ত সমিতি কেন্দ্রীয় পরিষদে একটা আইন করাইয়া লইবার চেষ্টায় রহিয়াছেন। আলওয়ারের মহারাজা এই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সেরিস্কা প্রাসাদ, অন্য কয়েকটি বাড়ী, সংলগ্ন উদ্যান, জমি, বিজয়মন্দির প্রাসাদ, গ্রন্থাগার ও বহু আসবাব দান করিয়াছেন। এই সকলের মূল্য এককোটী টাকা হইবে। ইহা ছাড়া তিনি বৎসরে ৫০ হাজার টাকা করিয়া দান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আলওয়ার হইতে ২২ মাইল দূরে দিল্লী-জয়পুর প্রধান রাস্তার উপরে এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবে। বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলের নাম হইবে "ভর্ত্তৃহরি নগরম্।" এইস্থানে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও রাজা ভর্ত্তৃহরির সমাধি রহিয়াছে। এইখানেই পাণ্ডবগণ বিরাট রাজার আশ্রয়ে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন এবং বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন নীলকণ্ঠের মন্দিরটি ও এখানে অবস্থিত। স্থানটি পাহাড়, নদী ও উদ্যানে ঘেরা অপরূপ ও মনোরম। উক্ত ভারতীয় বিদ্যাপ্রচার সমিতি নগদ ২৫ লক্ষ টাকা হাতে পাইলেই কাজ আরম্ভ করিয়া দিবেন। সমিতির পক্ষ হইতে অর্থসংগ্রহের জন্য ব্যাপক চেষ্টা চলিতেছে। সংস্কৃত জগতের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য। ইহার রচনাশৈলী, শব্দ ভাণ্ডার, ব্যাকরণ প্রভৃতির সহিত জগতের কোন সাহিত্যেরই তুলনা হয় না। এই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই ভারতে ঋষি ও জ্ঞানীরা জগৎকে আলো

দান করিয়া গিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের পর হইতে ভারতের গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি বহুলপরিমাণে ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হয়। আজকাল বিদেশী ভাষার মোহে পড়িয়া সংস্কৃতকে আমরা যে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছি তাহা দূর করা প্রয়োজন। সংস্কৃতের মধ্য দিয়া সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দান যে একেবারে অসম্ভব তাহা বলা চলে না। কারণ ভারতের গৌরবময় অতীতের দিনে নালন্দা ও তক্ষশীলায় সংস্কৃতের মাধ্যমেই সকল বিদ্যার পঠনপাঠন চলিত। দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ও ভারতীয় কোটীপতিরা এদিকে একটু কৃপা দৃষ্টি করিলেই এই বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টা সহজেই সাফল্যলাভ করিতে পারিবে।

ভারতচন্দ্র স্মৃতি উৎসব—

গত ১২ই জানুয়ারী রবিবার ২৪ পরগণা শ্যামনগরের সন্নিহিত মূলাজোড়স্থ ভারত চন্দ্র পাঠাগারের উদ্যোগে তথায় স্থানীয় ডাক্তার পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের গৃহ প্রাঙ্গণে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সভায় খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন এবং অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি গোপাল ভৌমিক প্রভৃতি ভারতচন্দ্র বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার শেষ জীবন মূলাজোড়ের যে গৃহে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা আজিও বিদ্যমান। জাতির পক্ষ হইতে জাতীয় সম্পদরূপে তাহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মিত্র, পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীচিত্তেশ্বর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি এ বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র এখন আর স্থান বা ব্যক্তিবিশেষের কবি নহেন—বাঙ্গালী মাত্রেরই তাঁহার স্মৃতি রক্ষা ব্যবস্থায় অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য।

মূলাজোড়ে ভারতচন্দ্র স্মৃতি উৎসবে সমবেত সাহিত্যিকগণ

সংস্কৃত আবৃত্তি প্রতিযোগিতা—

শ্রীযুক্ত তারানন্দ ব্রহ্মচারী শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক; তিনি সন্ন্যাসী হইয়া হুগলী জেলার রিষড়া গ্রামে গঙ্গাতীরে প্রেম-মন্দির নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া ঐ অঞ্চলে জন-কল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার উদ্যোগে গত ১৯শে জানুয়ারী রবিবার বিকালে বৈদ্যবাটী শরৎচন্দ্র বসু স্মৃতি মন্দিরে স্থানীয় যুবক সমিতির পরিচালনায় সংস্কৃত আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও তাহার পুরস্কার বিতরণ উৎসব হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে গ্রামে গ্রামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বালক ও বালিকাগণের মধ্যে গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি হইতেও সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তির ব্যবস্থা হয়। যে যুগে দেশে সংস্কৃত শিক্ষা ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, সেই যুগে সাধুজী এই প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন করিয়া ও প্রতিযোগিতায় কয়েকটি করিয়া পুরস্কারদানের ব্যবস্থা করিয়া দেশের সংস্কৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করায় তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র এই ব্যবস্থা বিস্তৃতি লাভ করিলে, তবেই দেশ উপকৃত হইবে।

নোয়াখালী যাত্রার উদ্দেশ্যে দমদম্ বিমান ঘাঁটিতে পণ্ডিত নেহরু ও আচার্য্য কৃপালনী ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

সিঁথিতে ছাত্রসমিতি সপ্তাহ—

কলিকাতা কাশীপুর সিঁথি পল্লীর ছাত্র সমিতি গত ২৭শে জানুয়ারী হইতে ২রা ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৭ দিন ৩৪ আটাপাড়া লেনস্থ সিঁথি আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা-মণ্ডপে ছাত্র সপ্তাহ সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথম দিনে বাণী পূজা, দ্বিতীয় দিনে বাণী সম্মিলন, তৃতীয় দিনে ধর্ম্ম সভা, চতুর্থ দিনে সাহিত্য সভা, পঞ্চম দিনে শিশুসাহিত্য সভা, ষষ্ঠ দিনে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও সপ্তম দিনে বার্ষিক সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণ উৎসব হইয়াছিল। প্রতিদিনই কলিকাতা হইতে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ উৎসবে যোগদান করিয়া ছাত্রবৃন্দকে উপদেশ ও উৎসাহ দান করিয়াছিলেন। ছাত্রসমিতির ও স্থানীয় অধিবাসীদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। ইহার সহিত আমোদ ও খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকিলেই অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত।

সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনে দাঙ্গা—

গত ২৮শে জানুয়ারী মঙ্গলবার রঙ্গপুর জেলার সৈয়দপুরে সরস্বতী প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় দাঙ্গা বাধায় বহু লোক নিহত হইয়াছে, বহু গৃহে লুঠতরাজ ও বহুগৃহ অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। পরদিন পুলিশ যাইয়া পড়ায় দাঙ্গা বন্ধ হয়। তথায় সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারার আদেশ জারি হইয়াছিল।

মৈমনসিংহে ছাত্র নিহত—

কলিকাতায় ছাত্র মিছিলের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে ২২শে জানুয়ারী মৈমনসিংহে ছাত্রগণ প্রতিবাদ মিছিল বাহির করিলে পুলিশ ছাত্র মিছিলের উপর গুলী বর্ষণ করে, তাহার ফলে স্থানীয় সিটি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র অমলেন্দু ঘোষ নিহত হইয়াছে। ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে ২৩শে জানুয়ারী মৈমনসিংহে পূর্ণ হরতাল পালিত হইয়াছিল এবং ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে জনগণ উত্তেজিত হইয়া স্থানীয় সরকারী অফিসে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল।

চীনে ভারতের প্রথম কূটনৈতিক দূত মিঃ কে-পি-এস-মেনন

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বর্দ্ধনা—

কলিকাতা টালায় 'যুগের যাত্রী সংঘ' গত ২৭শে জানুয়ারী বাণী পূজার মণ্ডপে ৩৭এ খেলাৎবাবু লেনে সঙ্গীতানুষ্ঠানের সহিত যে সাহিত্য বাসরের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। সভায় সুকবি শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত এক বাণী-

বন্দনা পাঠ করেন ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। নানাবিধ যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতের দ্বারা উৎসব সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। বাণীপূজা মণ্ডপে বাণীর সেবকের সম্বর্দ্ধনা সময়োপযোগীই হইয়াছিল।

ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বিভিন্ন দেশের সহিত কুটনৈতিক দূত বিনিময়—

ভারত সরকার শ্রীযুত কে, পি, এস, মেননকে রাশিয়ার সহিত ভারতের দূত বিনিময় সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য বিশেষ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুত মেনন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশন শেষ হইলেই মস্কো যাত্রা করিবেন। আরও জানা গিয়াছে যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের বিশেষ প্রতিনিধিরূপে শ্রীযুত ভি, কৃষ্ণ মেনন ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিয়া তাহাদের সহিত ভারতের কুটনৈতিক দূত বিনিময় লইয়া আলোচনা করিবেন। এইভাবে ভারত সরকার জগতের বিভিন্ন দেশের সহিত শীঘ্রই রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিবেন।

আসাম সামরিক বিভাগে প্রথম ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ
উপবিষ্ট—বাম হইতে দক্ষিণে: ক্যাপ্টেন খেনফুণ্‌গা সাইলো, মেজর অমর সেন, ক্যাপ্টেন এস-পি-চৌধুরী আই-এ-এস-সি
দাণ্ডায়মান—বাম হইতে দক্ষিণে: লেঃ লালমিনলিয়ানা, লেঃ লালানাওয়াল কুমার দে, লেঃ লালসাওতা হোনওয়ার

শরৎচন্দ্র মৃত্যু স্মৃতি বার্ষিক—

গত ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৈতৃক গৃহে তাঁহার মৃত্যুর নবম বার্ষিক স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং খ্যাতনামা কথাশিল্পী শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ঐ উপলক্ষে বাঙ্গালার নানাস্থানে সভা হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের বালীগঞ্জস্থ বাস ভবনে, হুগলী মাহেশ সাধারণ গ্রন্থাগারে ও অন্যান্য বহু স্থানে সভা হইয়াছিল।

মালকন্দে পলিটিক্যাল এজেণ্ট সসপেণ্ড—

গত অক্টোবর মাসে পণ্ডিত নেহরু সীমান্ত সফরে বাহির হইলে পাঠান উপজাতিরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। ইহার ফলে তিনি, তাঁহার সঙ্গী খান ভ্রাতৃদ্বয় ও রয়টারের সংবাদদাতা সামান্য আহত হইয়াছিলেন। এই আক্রমণ ব্যাপারে জড়িত থাকায় মালকন্দ এজেন্সীর পলিটিক্যাল এজেণ্ট নবাব মহবুব আলীকে সসপেণ্ড করা হইয়াছে।

কলিকাতায় গুরু গোবিন্দ সিংএর জন্মদিন উৎসবে শিখ মহিলাদের শোভাযাত্রা

ফটো—তারক দাস

গুরু গোবিন্দ সিংএর জন্মদিন স্মরণোৎসবে সুদীর্ঘ এক মাইল পথ ব্যাপী কলিকাতার শিখদের বিরাট শোভাযাত্রা

ফটো—তারক দাস

সন্তোষের মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত রবীন রায় ও ডাঃ ত্রিবিক্রম

গণপরিষদে কৃপালনী দম্পতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ প্রভৃতি

প্রবাসী ভারতীয় কংগ্রেস—

আগামী মে মাসে লণ্ডনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিদেশস্থ শাখা সমূহের এক সম্মেলন হইবে। বর্ত্তমানে ভারতের বাহিরে চল্লিশ লক্ষ ভারতবাসী অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা ভারতের জনসংখ্যার একশতাংশ। তাঁহাদের মঙ্গল ভারতের জাতীয় মঙ্গল। প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে নানাবিষয়ের খোঁজ লইবার জন্য এক কমিশন প্রেরণের বিষয় লইয়া এই অধিবেশনে বিশেষভাবে আলোচনা হইবে।

নয়া দিল্লীতে নিখিল ভারত চিত্র প্রদর্শনী হলে পণ্ডিত নেহরু ও সার উষানাথ সেন

বাঙ্গালায় সরিষার তৈলের অভাব—

কিছুদিন যাবৎ বাঙ্গালাদেশে সরিষার তৈলের ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছে। কলিকাতায় মাথা পিছু মাসে আধসের করিয়া তৈল দিবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহা কমাইয়া এক পোয়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই এক পোয়া তৈল পাইতেও লোকের কষ্টের সীমা নাই। বহুদিন ফিরিয়া, একবেলা লাইনে দাঁড়াইয়া ও রীতিমত লড়াই করিবার পর যাহা ভাগ্যে জোটে তাহাও ঠিক তৈল নহে, নানারূপ মিশ্রিত এক অদ্ভুত পদার্থ। সারা ভারতে মোট উৎপন্ন তৈল বীজের পরিমাণ ১২ লক্ষ টন। ইহার শতকরা ৬০ ভাগ জন্মায় যুক্তপ্রদেশে। তাহার পর ক্রমান্বয়ে পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ইত্যাদি প্রদেশে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা দেশে তৈলবীজ ও তৈল আমদানীর শতকরা ৭৫ ভাগ আসে যুক্তপ্রদেশ হইতে। কিছুদিন পূর্ব্বে যুক্তপ্রদেশের তৈলকল মালিক সমিতির সেক্রেটারী কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালা সরকারের সহিত এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে আগামী দুই তিন মাস এই অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। শীতকালেই যখন অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা তৈলের প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী তখনই এই সঙ্কট চূড়ান্ত আকার ধারণ করিয়াছে। বাঙ্গালা সরকার পূর্ব্ব হইতে এবিষয়ে সচেতন থাকিলে পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থান হইতে তৈল আনাইয়া এই সঙ্কট এড়াইতে পারিতেন।

নেতাজী দিবসে বেলগাছিয়া ভিলায়
আজাদ হিন্দ্-ফৌজের বিশিষ্ট
অফিসারগণ

ফটো—পান্না সেন

গণপরিষদে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ,
বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ,
শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর,
ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জি প্রভৃতি

ভারতীয় যাদুকরের সম্মানলাভ—

সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকার মহাশয় সম্প্রতি বেলজিয়ামের যাদুকর সম্মিলনা (CERCLE DE PRESTIDIGITATION DE BELGIQUE)র 'সম্মানিত সদস্য' নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আমেরিকার Conjurors Magazine এর সম্পাদক মণ্ডলী (আমেরিকার বিশিষ্ট যাদুকরগণ) স্বাক্ষরিত একটি 'Certificate of merit' তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। উহাতে যাদুবিদ্যায় শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকারের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ অবদানের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। উভয় সম্মানই সমগ্র এশিয়াবাসীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকার সর্ব্বপ্রথম লাভ করিলেন।

যাদুকর পি-সি-সরকার

বাঙ্গালাসরকারের ধান্য ও চাউল সংগ্রহ—

গত ১লা জানুয়ারী হইতে শস্য সংগ্রহ এলাকার সরকারী কর্ম্মচারীরা আমন ধান্য ও চাউল সংগ্রহ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। শস্য সংগ্রহ এলাকাকে ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে :—(১) দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর ও দার্জ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা, (২) মালদহ, রাজসাহী, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া, (৩) ময়মনসিংহ জেলার সদর, জামালপুর ও নেত্রকোণা মহকুমা (৪) বরিশাল, খুলনা, যশোহর ও ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমা (৫) বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলার অবশিষ্ট অংশ। বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধ কবে মিটিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের কারণে আমদানা করা সৈন্যরাও তাহাদের দেশে ফিরিয়া গিয়াছে। ভারতের বাহির হইতেও রীতিমত খাদ্যশস্য আমদানা হইতেছে। দেশে বর্ত্তমান বৎসরের ফলনও মন্দ নহে। অথচ বাঙ্গালা সরকার দেশের ফসলের সময়েই লোকের খাদ্য ব্যবস্থা কমাইয়া এবং চাউলের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া দেশের লোককে ভাতে মারিবারই ব্যবস্থা করিতেছেন।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিত নেহেরু
ফটো—জলধিরতন বন্দ্যোপাধ্যায়

বরিশাল জেলায় সুরাপান নিষিদ্ধ—

বাঙ্গালা সরকার বরিশাল জেলায় সুরাপান নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন। ক্রমে বাঙ্গালা সরকার সমগ্র প্রদেশ ব্যাপিয়াই সুরাপান বর্জ্জন নীতি কার্য্যে পরিণত করিবেন। কংগ্রেসশাসিত প্রদেশ সমূহে বহুপূর্ব্বেই এই নীতি গৃহীত হইয়াছে এবং যথাসাধ্য চালুও করা হইয়াছে। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট অনেক দেরীতে এই নীতি গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের এই উদ্যম বিশেষ প্রশংসনীয়।

দিল্লীতে আন্তঃএশিয়া সম্মেলন—

আগামী ২৩শে মার্চ্চ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩রা এপ্রিল পর্য্যন্ত নয়াদিল্লীতে আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। আফগানিস্থান, মিশর, তুরস্ক, পারস্য, আরব, সিংহল, নেপাল, ভুটান, ব্রহ্মদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ফিলিপাইন, সিরিয়া, শ্যাম প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন। এশিয়ার সর্ব্বত্র স্বনামখ্যাত মহিলাদের নিকটে এবং আটত্রিশটি বিভিন্ন মহিলা প্রতিষ্ঠানেও আমন্ত্রণ লিপি পাঠান হইয়াছে।
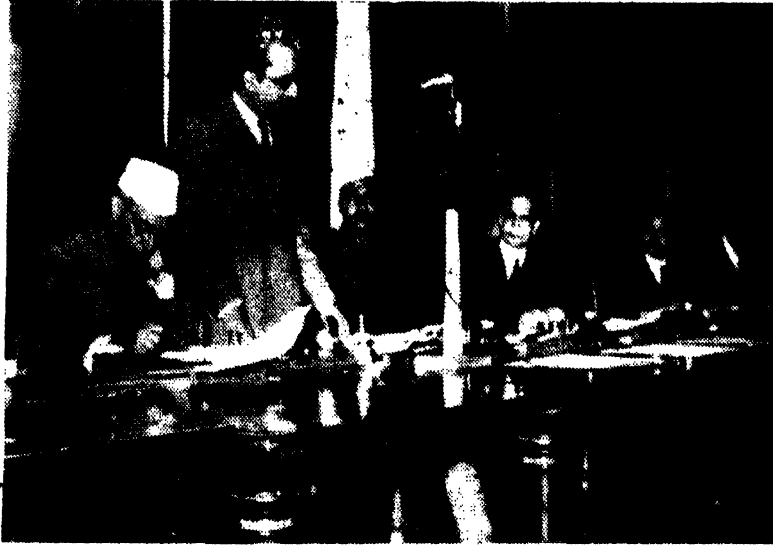
ভারতীয় খনি সম্পর্কিত উন্নয়ন পরিকল্পনায় দিল্লীতে প্রদেশ সমূহ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধি সম্মেলন : অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী মিঃ পি-এইচ-ভাবা বক্তৃতারত

ব্রহ্মদেশীয় নেতাদের সহিত কথোপকথন-রত শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু

ফটো—পান্না সেন

দক্ষিণেশ্বরে কল্পতরু উৎসব

রামকৃষ্ণ কল্পতরু উৎসব—

গত ১লা জানুয়ারী দক্ষিণেশ্বরে কালী বাড়ীতে রামকৃষ্ণদেবের কল্পতরু উৎসব বিরাটভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সারাদিন সমাগত বহু সহস্র ভক্তকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে নাটমন্দিরে রায়-বাহাদুর অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কীর্ত্তন গান করেন এবং সঙ্গে শ্রীযুত নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয় মৃদঙ্গ-সঙ্গত করেন। শ্রীযুত সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থানীয় তরুণগণের চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

নয়া দিল্লীতে খাদ্য-উৎপাদন পরিকল্পনা সভায় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষণ

পরলোকে অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়—

২৪ পরগণা পাণিহাটী নিবাসী অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু দিন রোগ ভোগের পর সম্প্রতি মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি স্থানীয় মিউনিসি-

৺অনাদিনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্যালিটির কমিশনার, পাণিহাটী ক্লাব, সমবায় ব্যাঙ্ক, ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় প্রভৃতি সম্পাদকরূপে দেশ সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত পণ্ডিত, সুধী, বিচক্ষণ ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়।

পরলোকে পাঁচুগোপাল মল্লিক—

খ্যাতনামা সাংবাদিক পাঁচুগোপাল মল্লিক মহাশয় সম্প্রতি ৬৫ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার সোমড়া গ্রামে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি 'হাওড়া হিতৈষী' পত্রে কাজ করার পর প্রায় ৩৫ বৎসর কাল 'হিতবাদী' সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু গল্প ও উপন্যাস বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পরলোকে মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

২৪পরগণা দক্ষিণেশ্বর গ্রামনিবাসী জনহিতব্রতী সাহিত্যিক মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ১৮ই পৌষ ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সুন্দর

৺মৃণালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবিতা ও গান রচনা করিতেন এবং তাঁহার রচিত বহু নাটক কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মানে-মানে, শ্যামসুন্দর, ভোজবাজি, খোসখবর, চালবেচাল প্রভৃতি নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চেষ্টায় খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দির, দোল মন্দির, কুঞ্জ-বাটী প্রভৃতির সংস্কার হইয়াছিল ও শ্যামসুন্দরের সেবার সুব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থেও দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া তিনি তাহার সদ্ব্যয় করিতেন।

প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

বিগত ৮ই মাঘ ২২শে জানুয়ারি, বুধবার বেলা ৮টা ১৫ মিনিটের সময় নিত্যানন্দবংশ্য স্বনামখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ৭৯ বৎসর বয়সে তদীয় কলিকাতা মহেন্দ্র গোস্বামী লেনস্থ বাস-ভবনে সজ্ঞানে স্বীয় সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার তিরোভাবে বৈষ্ণব জগৎ তথা বাংলার পণ্ডিত সমাজ হইতে এক উজ্জ্বল রত্ন খসিয়া পড়িল। অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ জাতি বর্ণ শিক্ষিত অশিক্ষিত ও ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সহস্র সহস্র নরনারীর ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুরূপে, বহুশাস্ত্রগ্রন্থের সম্পাদক ও ব্যাখ্যাতারূপে, প্রসিদ্ধ পুরাণপাঠক ও বক্তারূপে এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাহিত্যের সংরক্ষক ও প্রচারকরূপে বাংলার সমাজ ও ধর্ম্মজীবনে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। সৌম্যদর্শন অতুলকৃষ্ণ তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, শিশুর ন্যায় সরল ব্যবহার, বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও সরস কথোপকথনের দ্বারা সকলেরই চিত্ত জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব সদাচার ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অনেকেরই সহিত তাঁহার মতান্তর ছিল, কিন্তু কাহারও সহিত তাঁহার মনান্তর ছিল না। এ বিষয়ে বহু বৈষ্ণব পণ্ডিতের সহিত আমাদের আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু অজাতশত্রু প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের নিন্দা কাহারও মুখে কখনও শুনি নাই।

১২৭৪ সালের ১০ই কার্ত্তিক শনিবার ৺শ্যামাপূজার রাত্রে অতুলকৃষ্ণ কলিকাতা সিমুলিয়া পল্লীস্থ বাস ভবনে ভূমিষ্ঠ হন। ইনি পিতামাতার তৃতীয় সন্তান ও দ্বিতীয় পুত্র। ইঁহার পিতৃদেব ৺মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী পুরাণশাস্ত্রে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ তাঁহার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। অতুলকৃষ্ণের জননী ৺ভুবন-মোহিনী দেবী অত্যন্ত পতিব্রতা ও দয়াবতী ছিলেন। অপরকে খাওয়াইতে ইঁহার এত আনন্দ হইত যে আহারে বসিবার সময় কোন ভোজনার্থী উপস্থিত হইলে তিনি সানন্দে নিজের অন্ন তাহাকে দিয়া স্বয়ং উপবাসী থাকিতেন।

সিমুলিয়া কাঁসারিপাড়াস্থ স্বনামধন্য দানবীর তারক প্রামাণিক মহাশয়ের অন্যতমপৌত্র ৺আশুতোষ প্রামাণিকের সহিত অতি বাল্যকাল হইতেই অতুলকৃষ্ণের বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল এবং উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম প্রীতির বন্ধন চির-দিনই সমভাবে বিদ্যমান ছিল। বালক অতুলকৃষ্ণ অধিকাংশ সময়েই প্রামাণিকদের বাটীতে থাকিতেন এবং বন্ধু আশুতোষের সহিত একই গৃহ-শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ভদ্রলোক ইঁহাদের প্রথম গৃহশিক্ষক ছিলেন। ইনি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। এই ভদ্রলোক পরে হুগলীর সবজজ হইয়াছিলেন। উত্তরকালে অতুলকৃষ্ণ ইঁহার রচিত কবিতাগুলি একত্রে সংগ্রহ করিয়া "কবি-কুঞ্জ" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। ইহা তাঁহার বাল্যশিক্ষকের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার অকৃত্রিম নিদর্শন।

অতুলকৃষ্ণ প্রথমে সিমুলিয়াপল্লীস্থ পাঠশালায় ও পরে সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। প্রামাণিক মহাশয়দের বাটীতে তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবি তারাকুমার কবিরত্ন ও ভট্ট-পল্লীনিবাসী পণ্ডিত গণপতি বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট হইতেও পাঠ গ্রহণ করেন। সংস্কৃত চর্চ্চায় চিরদিনই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ঘটনাচক্রে তাঁহাকে বহু দেশে নানা অবস্থার মধ্যে কাটাইতে হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্রানুশীলন তিনি একদিনের জন্যও ত্যাগ করেন নাই। বিদ্যা চর্চ্চার মধ্যেই তিনি পরম শান্তি লাভ করিতেন।

জ্ঞান-পিপাসু অতুলকৃষ্ণ চিরদিনই অধ্যয়নশীল ছিলেন। নিত্য নব নব বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদাই উন্মুখ থাকিত। সর্ব্ব শাস্ত্রেই তাঁহার সমান অধিকার ছিল। কেবলমাত্র নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামিসন্তান বা বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়া নহে, অনন্যসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচার শক্তির জন্য সমগ্র পণ্ডিত সমাজে তাঁহার অসামান্য খ্যাতি ছিল। তিনি

মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের নিকট ন্যায়শাস্ত্র, স্বীয় পিতা প্রভুপাদ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র ও মহারাষ্ট্রীয়দেশীয় পণ্ডিত বেণীমাধব শাস্ত্রীর নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সংগীত ও কাব্যেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। যৌবনে তিনি স্বীয় পল্লীস্থ সখের থিয়েটারে সুর-সংযোজনা ও মধ্যে মধ্যে অভিনয় করিতেন। তিনি একজন নিপুণ বাদকও ছিলেন। প্রথম যৌবনে অতুলকৃষ্ণ কিছুদিন যাবত সখের পাঁচালীর দলে ছড়া বাঁধিতেন। ১৩৩৩ সালে কলিকাতা মহানগরীতে অখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তিনি তাঁহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। তাঁহার অভিভাষণ শ্রবণ ও পাঠ করিয়া সমবেত সুধীবর্গ সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞানের জন্য একবাক্যে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। সংস্কৃত ও বাংলা ছাড়া ইংরাজীতেও তাঁহার কথঞ্চিৎ জ্ঞান ছিল। হিন্দী ও ওড়িয়া ভাষা তিনি বেশ ভালই জানিতেন। তুলসীদাসকৃত কতকগুলি হিন্দী দোঁহা তিনি সুললিত বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ "তুলসী-মঞ্জরী" নামে প্রকাশিত করেন। পুরীতে বাস করিবার সময় তিনি ওড়িয়া ভাষা শিক্ষা করেন এবং উক্ত ভাষায় লিখিত "দার্ঢ্যভক্তি-রসামৃত" নামক গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "ভক্তের জয়" রচনা করেন। এই পুস্তকখানি বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ। এরূপ মনোহর সরল ও সরস বর্ণনা অতি অল্প পুস্তকেই দৃষ্ট হয়। এই পুস্তকখানি গুজরাটী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

অতুলকৃষ্ণের বয়স যখন ২০।২১ বৎসর তখন তাঁহার বিবাহ হয়। বর্দ্ধমান মশাগ্রাম নিবাসী ৺কালীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের একাদশবর্ষীয়া মধ্যমা কন্যা অম্বুজবালা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। অম্বুজবালা সর্ব্বপ্রকারে স্বামীর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী ছিলেন। অতুলকৃষ্ণের অসংখ্য শিষ্য শিষ্যাগণকে তিনি সন্তানের মত ভালবাসিতেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি স্বামীর পাদপদ্মে মস্তক রাখিয়া ইহজগৎ ত্যাগ করিয়াছেন। বিবাহের বহুকাল পরে অতুলকৃষ্ণ একটি পুত্রলাভ করেন, কিন্তু পুত্রটি মাত্র কয়েক মাস পরেই মারা যায়। বর্ত্তমানে অতুলকৃষ্ণের একটি বিধবা কন্যা, এক দৌহিত্র ও এক দৌহিত্রী বিদ্যমান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ বহু গ্রন্থের সম্পাদক ও ব্যাখ্যাতা। তৎসম্পাদিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রীরূপগোস্বামি-বিরচিত "লঘুভাগবতামৃত", শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর-কৃত "চৈতন্যভাগবত", সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত বনমালী দাসের "জয়দেব-চরিত" ও জয়গোবিন্দ দাসকৃত শ্রীসনাতন গোস্বামীর "বৃহদ্ভাগবতামৃতের" পদ্যানুবাদ ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত "প্রমেয় রত্নাবলী"র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের সম্পাদনায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার কতকগুলিতে তাঁহার নাম আছে, আবার কতকগুলিতে নাম দেওয়া নাই। উহাদের মধ্যে লীলাশুকের "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" (যদুনন্দন দাসের পদ্যানুবাদ সমেত), লোচনদাসের "চৈতন্যমঙ্গল" ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃত" সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রতি গ্রন্থের সম্পাদনার মধ্যে অতুলকৃষ্ণের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, পাঠ-শুদ্ধির জন্য সুদৃঢ় প্রয়াস ও দুর্ব্বোধ্য শব্দের যথার্থ অর্থ-নির্ণয়ের পরিচয় উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান। গ্রন্থ-সম্পাদনা সম্বন্ধে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব হইতেছে, উপযুক্ত স্থানে "ড্যাশ", "কমা" ও "উদ্ধৃতি" চিহ্নের ব্যবহার দ্বারা মূলের অর্থকে সহজবোধ্য করিয়া তোলা। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থের যে কোন পৃষ্ঠা পাঠ করিলে আমাদের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। বস্তুত, গ্রন্থ-সম্পাদনায় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণের যে কৃতিত্ব, তাহার তুলনা অতি অল্পই দেখা যায়। বিবিধ মাসিক ও সাময়িক পত্রে বিশেষতঃ বঙ্গবাসী পত্রিকায় তাঁহার লিখিত বহু সারগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ঐগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিতে পারিলে কয়েক খণ্ড পুস্তক হইতে পারে। অতুলকৃষ্ণের কতকগুলি লেখা "নানান্ নিধি" নামে ও কয়েকটি গল্প "পূজার গল্প" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎসঙ্কলিত "ভক্তিরত্নমালা" ও "সাধন-সংগ্রহ" বৈষ্ণবগণের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ।

"শ্রীমদ্ভাগবত" পাঠের দ্বারা অতুলকৃষ্ণ বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ঐ অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যয়ও করিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি কার্সিয়ংএর যক্ষ্মা হাসপাতালে এককালীন ২৫০০০৲ টাকা দান করেন। তাহা ছাড়া তাঁহার ছোটখাট দানের সংখ্যাও নিতান্তকম

নহে। খড়দহে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মন্দিরসংলগ্ন একখানি বাটী তিনি যাত্রিগণের ব্যবহারের জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। পতি-পত্নী উভয়েই অতি অনাড়ম্বরভাবে জীবন-যাপন করিয়া সর্ব্বদা পরদুঃখমোচনে তৎপর থাকিতেন। এরূপ ধর্ম্মপ্রাণ সাধু দম্পতি বর্ত্তমান যুগে একান্ত বিরল।

অতুলকৃষ্ণের অন্যতম কীর্ত্তি—গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী। কলিকাতা মহানগরীর চালতা বাগান পল্লীতে বৈষ্ণব সম্মিলনী লেনে এই প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত। ১৩১৮ সালে প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আনুকূল্যে বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হয় ও ১৩২৮ সালে চালতা বাগানে সম্মিলনীর নিজস্ব বাটী ক্রয় করা হয়। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সম্মিলনীর সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহার আজীবন-সঞ্চিত দুর্লভ গ্রন্থরাজি এই সম্মিলনীর গ্রন্থাগারে স্বীয় জীবদ্দশাতেই দান করিয়া গিয়াছেন। এই সম্মিলনীকে কেন্দ্র করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাহিত্যের যথেষ্ট অনুশীলন হইয়াছে ও হইতেছে। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ এই সম্মিলনীকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসিতেন। ইহার সহিত তাঁহার পুণ্যস্মৃতি চিরদিনই বিজড়িত থাকিবে।

যুদ্ধোত্তর ভারত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

দুই

যুদ্ধের প্রেরণা সত্যই এদেশের সাহিত্যে কমই, আর সাহিত্যও যুদ্ধকে প্রেরণা দিয়াছে অল্পই। নূতন লেখক যাহারা, তাহারা প্রচ্ছন্ন বা প্রকট কংগ্রেসী, না হয় Communist। আবার কেহবা anti-Fascist এসব মতবাদ বা ideologyর ব্যাপার। সাহিত্যে তার রূপ যা দেখা যায়, তা সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে সাধারণত। আর সবগুলোই শেষ পর্য্যন্ত প্রায় Proletariet সাহিত্য হইয়া গেছে।

দয়াল একদিন বলিয়াছিল, "এদেশে জড়ভরত ছিলেন প্রাচীন যুগের রাজা। এখন তিনি কালক্রমে ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ে হোয়েছেন প্রজা।" মনে হয় দয়ালের কথা যেন একেবারে মিথ্যা নয়। গতানুগতিকতার ভিতর নূতন চিন্তার ভাবধারা নষ্ট হইয়া যায়। একখানা বই লেখার মত উপকরণ হয় তো অনেক লেখকের আছে। কিন্তু তারপর দেখি সেই একখানার মত পাঁচশ খানা নভেল লেখা হইতেছে। নূতন একটা কিছু হইলেই তার অনুকরণ ঘটেই। সেটাই নাকি মানুষের সভ্যতা ও সামাজিকতার প্রবৃত্তি। আর অনুকরণ শুধু ইতর জনেই করে না, যে ব্যক্তি একখানাও উত্তম পুস্তক রচনা করিয়াছে, নূতন কিছু লিখিয়াছে, সেই নিজেকে অনুকরণ করিতে ছাড়ে না। * * *

রমেন্দ্র কিছুদিনের ছুটিতে আসিল। বাড়িখানিকে হাঁক ডাকে তার squadron ও messএর গল্পে মুখর করিয়া তুলিল। তা ছাড়া তার ছিল কবিতার ঝোঁক। শ্রীর সঙ্গে ও উমার সঙ্গে তাহার ভাব করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। শেষে একদিন সকলের সামনেই তাহার কবিতার কাগজ বাহির করিল। শ্রী ও উমা ধরিয়া বসিল, "শোনাও তোমার কবিতা।"

সে আমার দিকে চাহিয়া সঙ্কোচ করিতে লাগিল। আমি বলিলাম, "শোনাও না হে। কবির সব কিছুই সহ্য হয়।"

রমেন্দ্র তখন পড়িল:

সুন্দরীর চোখের উজ্জ্বলতা নিয়ে যে আকাশের রঙ তৈরি, তা'র তৈলহীন কেশের রুক্ষ বিশৃঙ্খলার মত যা'র মেঘ—তা'র বরদেহ হোতে যে আকাশ কোমল স্পর্শ আহরণ কোরেছে—সেই আকাশের রূপ রঙ রসের জন্য বুভুক্ষু আমার মন—!

এরোপ্লেনের দুর্বার গতিতে মনের বুভুক্ষা আমার দুর্বার হোয়েছে—ছন্দে আমার অনাগত যুগের আশা হিল্লোলিত; ইঞ্জিনের শব্দে ও তেজে নবজীবনের উৎসাহ—

তাই যে পৃথিবীকে একদিন ভাল লেগেছিল তা'র প্রতি মন আর ফিরে না; তা'র যৌবন যেন আমার চোখে হঠাৎ অন্তর্হিত হো'য়েছে। আর যা'রা এখনো সেই পৃথিবীর প্রেমে নিগড়িত, তা'দের মনে হয় অস্বাভাবিক নির্ব্বোধ!

তারা শত্রু নয়! তারা মাটি-লোলুপ আত্মনিগ্রহী! ওদের মুক্তি নেই—আছে মৃত্যু!

এরোপ্লেনের গর্ভ থেকে যে বহ্নিবর্ষণ হোচ্ছে—সেটা তাদের মাটি-লোলুপতারই রূপান্তর! তাদের মৃত্যুর দূত!

শ্রী মুখ চাপিয়া হাসিতেছিল। আমি কতকটা শুনিয়াছিলাম, কতকটা শুনি নাই। তবু বলিলাম, "এতো গদ্য হে? পদ্য কৈ?"

রমেন্দ্র কাগজের তাড়া গুটাইতে গুটাইতে বলিল, "কোনো পদ্যে এরোপ্লেনের ভাবকে ধরা যায় না। এরোপ্লেনের ছন্দের মত ছন্দ কোথায়?"

উমা প্রশ্ন করিল, "এ কবিতাটার নাম কি দিয়েছো, ভাই?"

রমেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, "Atom Bomb!"

শ্রী কহিল, "এইবার দয়ালবাবুও যন্ত্রের কবিতা লিখ্‌বে দেখ্‌ছি!"

রমেন কথা কহিল না, শুধু ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।

উমা ব্যঙ্গ করিল, "Air-Force এর সব ছেলেগুলিই হোচ্ছে splendid না ? সবগুলিই কি কবিতা লেখে ?"

রমেন্দ্র গর্বিত হাসির সহিত বলিল, "আমরা সবাই চেষ্টা করি splendid হোতে। আমাদের motto হোচ্ছে, we are a splendid team. তবে সবাই কি আর কবিতা লিখ্‌তে পারে ?"

শ্রী মন্তব্য করিল, "আগে কিন্তু ধুয়াটা ছিল we are jolly fellows ?"

Jolly fellows ! তা' আজকালকার সৈন্যদল তা বটেই। যখন তারা ছুটিতে শহরে আসে বা কর্ম্মোপলক্ষে শহরে থাকে, তখন তারা jolly fellows, আর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যায় তখন তারা হয় "a splendid team." রমেন্দ্র গিয়া সুমিতাকে আনিল তাহার হোষ্টেল হইতে; তাহার পর দুইজনে সারা কলিকাতার যত jolly places ছিল সব ঘুরিতে সুরু করিল। আমার মনে অবশ্য একটু উদ্বেগ যে দেখা দিল না তাহা নহে। সুমিতার পূর্ব্ব কথাটার স্মৃতিই সম্ভব—তাহার জন্য দায়ী। যদি আবার কিছু সেই রকম ঘটে, বলা কিছুই যায় না। এই বয়সে কোনো কিছুই চরম নহে। তবুও……। মন হইতে জোর করিয়া দুর্ভাবনাটাকে তাড়াইলাম। জীবনের পথে এই রকমটাই স্বাভাবিক।

সুমিতা বলিল, "বাবা, ছোড়দা'র (রমেন্দ্রের) change খুব হোয়েছে। পাকা gallant হোয়েছে। মেয়েদের দেখ্‌লেই হাঁ কোরে থাকে, gallantry দেখবার সুযোগ কিছুতেই ছাড়বে না। এই ভাব।"

দয়াল কহিল, "ছাড়া উচিত নয়। তাতে বয়সের ও services এর অপমান হয়। gallantry নানা রকমের ও Armed services এ দুটো একেবারে— turns."

রমেন্দ্রের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। আমারও এই সব আলোচনাতে উপস্থিত থাকা উচিত কি না ভাবিতেছিলাম। বয়সের ধর্ম্ম নহে শুধু, সংস্কারও আছে আমাদের যে, এ সব বিচার ও আলোচনা খুব প্রকাশ্য ভাবে সকলের মধ্যে করা যায় না। কিন্তু সেটা যে প্রাচীন ও বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে নিবৃত্ত করিবে তাহাও ঠিক নহে। শুধু এই মনে হয় যে অসঙ্গত ও বিশৃঙ্খল চিন্তা ও আলোচনা হইতে প্রথমত বাক্য সংযম হয়, তা'র পর মনের সংযম ও শেষে প্রবৃত্তির সংযম। মন নামক পদার্থটি বা অপদার্থটি যে কি তাহা এখনো ঠিক বুঝি নাই। শুনা যায়, ইহা নানাবিধ ক্রিয়ার বা ক্রিয়া শক্তির একটা সমষ্টিগত রূপ। ইহা প্রবৃত্তি, অভিজ্ঞান, চিন্তা, ইচ্ছা সব কিছুরই একটা রহস্যপূর্ণ কেন্দ্র ও আশ্রয় বা রূপ। ঠিক কি তাহা মনোবিজ্ঞান হইতে বুঝি না, তবে শুনি নাকি ইহার মূলে আছে অহংকার ও যৌন-প্রবৃত্তি। অহঙ্কার negative, যৌনজ্ঞান positive ; একটা বিকর্ষণ, অন্যটা আকর্ষণ। এই নিয়া জীবনবেদ রচিত হইয়াছে যুগে যুগে, সম্ভব এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল। অন্তত পক্ষে ইহা খুব ভুল নহে। তাহা যদি হয়, তবে এ দুইটির বিশেষরকম অধ্যয়ন ও আলোচনা না হইলে ইহাদের সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট রূপে কিছুই জানা যাইবে না। প্রকৃত শিক্ষাতে সংযম আনে ; আর অন্যথায় অসংযম। অবশ্য সংযমের অর্থ আত্মনিগ্রহ নহে। * * *

শ্রী বলিল, "তা হোলে রমেন্দ্রের একটা বিয়ে দেওয়া চাই, বাবা।"

রমেন্দ্র ব্যস্তভাবে কহিল, "ও সব কি বৌদি, শুনুন তার চেয়ে কবিতা—"

শ্রী মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "না, তোমার ও সুন্দরীর চোখ চুল দেহের বর্ণনা আর শুনতে পারি না। তার চেয়ে—বিয়ে কর একটা। সব হাতের কাছে পাবে বাবু। আমরাও কবিতা শোনা থেকে রেহাই পাবো।"

সুমিতা প্রশ্ন করিল, "তোমার কি রকম বৌ চাই, ছোড়দা ? বল না, বাবাকে। লজ্জা কি ? সব ছেলেরই তো একটা ideal থাকে—তোমারটা কি রকম শুনি ?"

রমেন্দ্র উঠিয়া গেল। তাহাকে টিকিতে দিল না। শ্রী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "যেও না ভাই, বোলে যাও।" তারপর আমাকে বলিল, "ঘটক লাগাতে হবে বাবা।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "লাগাও। কিন্তু ঘটকের মারফতে বিয়ে কি আজকাল কেউ কোরতে চায় ?"

শ্রী উত্তর দিল, "বিয়েই কোরতে চায় না সব, তা ঘটকই বা কি, আর নিজে থেকেই বা কি। এখন ছেলেদের আছে শুধু ভাব বিলাসিতা, কিন্তু দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা ও সাহস নেই। সাহসের এত অভাব আমি দেখি নি আর !"

এ কথা আমারো অনেকবার মনে হইয়াছে। যখনই জাতির সাহস কমিয়াছে—তখনই জাতির পতন সুরু হইয়াছে। যৌনজ্ঞানসংস্কার মুক্ত অবস্থাতে বিবাহের সংস্কারকে আবার কি ভাবে পুনর্গঠিত করিবে, তাহা এখনো স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না, কিন্তু কোনো জ্ঞানকে কাজে লাগাইবার মত সাহসও তো নাই। ইহাতেই হইয়াছে মুস্কিল, সংস্কারও থাকে না—আর তার জায়গায় জ্ঞানের ব্যবহারও না। সে ক্ষেত্রে একটা বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কি হইতে পারে ? কিন্তু অসংযম যে মানুষকে কোথায় লইয়া যায়, শুধু এই ব্যাপারে নহে, অন্য ব্যাপারেও বটে—তাহা কে বলিতে পারে ? তাহাই শুধু নহে। অসংযম ব্যয়সাপেক্ষ। সে ব্যয় করিবার মত শক্তি না থাকিলে অসংযত হওয়া যায় না। আবার ব্যয় শক্তির অভাবে যে সংযম, তাহাও নিরর্থক।

শ্রী বলিল, "যা হোক্, বিয়েটা দিলেই ভালো। যুদ্ধই হোক্ আর দুর্ভিক্ষই হোক্, বিয়ে আট্‌কাবে না।"

কহিলাম, "বরং বাড়ছে যুদ্ধের বাজারে। অনেকে উপার্জ্জন কোরছে ও বিয়ে করার সুযোগও পাচ্ছে। কন্যার পিতারাও এখন অনেকে অর্থ ব্যয় কোরতে পারেন। পয়সার ব্যাপারে এখন অনেক স্বচ্ছলতা এসেছে। কিন্তু তবুও লোক সংখ্যা হিসাবে বিবাহের সংখ্যা যে বেড়েছে তা নয়। তাই মেয়েদের দেখি সব চাকুরি কোরতে যেতে। কলেজ স্কুলের উঁচু ক্লাশেও অনেক মেয়ে। ট্রামে বাসে মেয়েদের ভিড় বেড়েছে। মাঝে মাঝে সংবাদ-পত্রে ছেলেরা মেয়েদের ও মেয়েরা ছেলেদের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ প্রকাশ করে। ক্রমশঃ এই রকম হাওয়া জোরই বইবে।"

উমা আসিয়াছিল কখন দেখি নাই। সে সমস্ত শুনিতেছিল। বলিল,

"যে হাওয়া বইছে তা বইবে। এখন মেয়েদের বাইরে বেরবার সুযোগ মিলেছে। তারা যে সেটা ঠিক মত ব্যবহার কোরতে পারছে না—এটাই দুঃখ। স্বাধীনতা শুধু ট্রামে বাসে রাস্তাতে দল বেঁধে বেড়ানোও নয়, আর সিনেমা হলে কি রেস্তোরাঁতে ভিড় কোরে গোলযোগ করাও নয়। সেটা এখনো বুঝতে সময় লাগবে। তা ছাড়া সভ্যতা ও শ্লীলতার সঙ্গে স্বাধীনতা মিশ খাবে ও শক্তি-অর্জ্জনের সঙ্গেও বটে; তা না হোলে স্বাধীনতাও একটা বিলাসে পরিণত হবে।

আমি কহিলাম,"মেয়েদের স্বাধীনতায় পুরুষ নিরপেক্ষ থাকবে। যেখানে তা পুরোপুরি না হয়, সেখানে তার কোনো সদর্থ থাকে না। অন্যথায় মেয়েদের প্রবৃত্তি হবে শুধু পুরুষকে বেশী রকমে আকর্ষণ করার। এই মহাযুদ্ধের ফলে মেয়েদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে একটা বিশৃঙ্খলা সর্ব্বত্রই এসেছে। বাঙ্গালীর সনাতন অচলায়তনেও তার জের দেখা দিয়েছে। মার্কিন, চীন, ইতালি, প্রভৃতি কোনো দেশেই এর ব্যত্যয় ঘটে নাই। সে দিন একটি মার্কিনী সংবাদপত্রে দেখলাম যে Red district-এ ভদ্রঘরের মেয়েরাও রাত্রে নিশাচরীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর মধ্যে আমাদের সমাজে বিপ্লবের ধাক্কাটা অত্যন্ত কম। একটু অসংযম হবেই। অবশ্য এ হাওয়া থাকবে না। কিন্তু তার আগে অনেক কিছু বদল হবে।"

শ্রী বলিল, "বলা যায় না, বাবা। এ দেশে মেয়েদের সংযমটা এত বেশী আইন কোরে বাঁধা হয়েছে যে, সেটার বিরুদ্ধে এমনিতেই একটা প্রতিক্রিয়া সুরু হোয়েছে। সম্ভব যুদ্ধে সেই প্রতিক্রিয়াটা আরো সতেজ ও সক্রিয় হবে। তা হোক্। একটা কিছু না হোলে দেশের এই নিয়মগতিটা বন্ধ হবে না। অবশ্য সব কিছু কোরতে হবে আত্মমর্য্যাদার জন্য, আপনার অসম্মানের জন্য নয়। উদ্দেশ্য ও আত্মমর্য্যাদাহীন যে ব্যবহার তাতে ক্ষতি হয়। সেইরূপ প্রবৃত্তি বা ব্যবহার কোনো সভ্য সমাজই প্রশ্রয়ের চোখে দেখে না।"

কথাটা হয় তো ঠিক। উমার বা শ্রীর মুখে কখনও একটা বাজে কথা শুনি নাই। দুইজনেই জীবনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই পুরাতন সংস্কার হইতে অনেকটা মুক্ত, অথচ শক্তিশালিনী, তাই তাহাদের চরিত্রে একটা মাধুর্য্যও আছে। অন্য দিকে মনে পড়ে সীতার কথা। তাহার স্বাধীনতা আছে, মনের একটা দৃঢ়তা আছে; যাহার জন্য সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে নাই এবং নিজের ইচ্ছামত চলে; যে শক্তির পরিচালনায় মানুষের মন অপরের প্রভাব স্বীকার করিয়াই আনন্দ পায়। সমাজে বা পরিবারে নারীর স্থান লইয়া অনেক রকম তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে নারীর পদ মর্য্যাদার অভাব হইয়াছে পুরুষের মুখাপেক্ষিতাতে। বেশীর ভাগই পুরুষ হইয়াছে এ দেশে কাপুরুষ।

একটা নূতন আইন প্রণয়ন করা হইতেছে মেয়েদের দাবী লইয়া। উমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "উমা, তোমার কি মত? পিতার সম্পত্তির ভাগ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার মেয়েদের থাকা ভালো মনে কর?" উমা বলিল, "থাকলে ক্ষতি কি? অধিকার থাকলেই যে-সব সময়ে সেটার ব্যবহার হবে, এমন কিছু নয়। কিন্তু অধিকারটা অস্বীকার করার—বা না থাকার দৈন্য কেন ছেলে বা মেয়েদের হবে।" শ্রী বলিল "আইন করে অভাব অভিযোগ জীবনের মেটে না। কিন্তু এই রকম একটা আইন আছে জানলে মেয়েরাও অসহায় হবে না, ছেলেরাও যথেচ্ছ মেয়েদের উপর প্রভুত্বও চালাবে না। যাই হোক্ যতক্ষণে না স্বাধীনতায় জোর ও অধিকার আসছে, ততক্ষণ জীবনে কোনো কার্য্য বা চিন্তাই সুশোভন ও সার্থক হবে না। স্ত্রীলোকের হয় তো সংসারে স্বাধীনতা আছে, প্রভুত্বও আছে। তবে সেটা প্রকাশ্যে মেনে নেওয়ায় আপত্তি কি?"

মনে হয়—এই কথাই সত্য; আদর্শ হিন্দু-ধর্ম্ম কি অনুশাসন দিয়েছেন—তাই নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি। কিন্তু আমার মনে হয়—সামাজিক জীবনটাকে social statistics না বানালেই জীবনযাত্রা সুবিধাই হবে। সামাজিক stability—ভালো; কিন্তু stability—ঠিক stationery society—নহে। এটা বোধহয় আমাদের দেশের আধুনিক সমাজকর্ত্তারা ভুলে যান্। তাছাড়া আমার মনে হয় যে আসলে হিন্দু ধর্ম্মের সামাজিক অনুশাসন অন্য রকমই ছিল।

শ্রী মন্তব্য করিল, "সমাজ বা হিন্দু সমাজ কি একটা বস্তু বিশেষ? একটা দল? না, বাবা, একথা মানা যায় না। হিন্দু সমাজ একটা বিশিষ্ট জীবনধারা ও উদ্দেশ্য সাধন। আমাদের যে হিন্দু সমাজ, সাধারণের কল্পনাতে কতকগুলি সামাজিক ব্যবস্থা মানা—আর সে ব্যবস্থাগুলি তৈরী হ'য়েছিল কত শতাব্দী আগে তা বলা যায় না। সে ব্যবস্থা বুঝেই বা কে? আর তা' চালায়ই বা কে? পল্লীগ্রামে যান্—দেখবেন সমাজপতির স্বরূপ। সামাজিক বন্ধন সহরে সর্ব্বাপেক্ষা শিথিল হোয়েছে। তা ছাড়া সমাজ গেছে ধনতন্ত্রের প্রভাবে। যতদিন ব্রাহ্মণের প্রভাব সমাজে ছিল ততদিন হিন্দু সমাজ ছিল—একটা জীবন্ত প্রাণবন্ত ব্যাপার। এখন তাহার কিছু নাই—কঙ্কালটা ছাড়া।"

সম্ভব তাই, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝছি। সমাজ বলে আমি কিছুই জানি না। হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার আমি মানি না। যাতে আমার জীবনযাত্রা সুগম ও স্বচ্ছন্দময় হোয়েছে তাই কোরেছি। কৈ কোন সমাজ তো আমাকে বাধা দেয় নাই। কোনো রকম অসুবিধাও তাতে হয় নাই।

লোকে হয়তো বলিবে, "কিন্তু তোমার এই অসামাজিকতায় আজ তোমার সংসার ভেঙ্গে গেছে।"

আমি তা স্বীকার করি না। সংসার ভাঙ্গার কি গড়ার ভিতর নিজের স্বকীয়তা আছে। একদিকে ভেঙ্গেছে, আবার অন্যদিকে গড়েছে। ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে সুখ দুঃখ দুই পেয়েছি ও দেখেছি। কিন্তু তা ফেলে কৃত্রিম উপায়ে জোর কোরে ভাঙ্গন বাঁচিয়ে লক্ষ্য কি হোতো?

আমার এক বন্ধু আমাকে বোলেছিলেন "সমাজ বা পরিবার ভাঙ্গে এই জন্য যে আমাদের ঐতিহ্য বা tradition আমরা যথেষ্ট ভাবে সজীব ও সক্রিয় অবস্থাতে পরবর্ত্তী পুরুষকে দিতে পারি না। আমরা তাদের বুঝাতে পারি না ঠিক মত যে, সমস্ত উত্তরকালের সৃষ্টি হবে এই সক্রিয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর তবে তার সার্থকতা হবে। নূতন কিছু গড়তে হোলে, তার ভিত্তি চাই। সে ভিত্তিটা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের অভিজ্ঞতা। আমাদের ইতিহাস। তাই ইতিহাস এত মূল্যবান্। না হোলে, কেন তা পড়া, কেন তার সম্বন্ধে এত আলোচনা গবেষণা?" (ক্রমশঃ)

উমা ব্যঙ্গ করিল, "Air-Force এর সব ছেলেগুলিই হোচ্ছে splendid না? সবগুলিই কি কবিতা লেখে?"

রমেন্দ্র গর্ব্বিত হাসির সহিত বলিল, "আমরা সবাই চেষ্টা করি splendid হোতে। আমাদের motto হোচ্ছে, we are a splendid team. তবে সবাই কি আর কবিতা লিখ্‌তে পারে?"

শ্রী মন্তব্য করিল, "আগে কিন্তু ধুয়াটা ছিল we are jolly fellows?"

Jolly fellows! তা' আজকালকার সৈন্যদল তা বটেই। যখন তারা ছুটিতে শহরে আসে বা কর্ম্মোপলক্ষে শহরে থাকে, তখন তারা jolly fellows, আর যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যায় তখন তারা হয় "a splendid team." রমেন্দ্র গিয়া সুমিতাকে আনিল তাহার হোষ্টেল হইতে; তাহার পর দুইজনে সারা কলিকাতার যত jolly places ছিল সব ঘুরিতে সুরু করিল। আমার মনে অবশ্য একটু উদ্বেগ যে দেখা দিল না তাহা নহে। সুমিতার পূর্ব্ব কথাটার স্মৃতিই সম্ভব—তাহার জন্য দায়ী। যদি আবার কিছু সেই রকম ঘটে, বলা কিছুই যায় না। এই বয়সে কোনো কিছুই চরম নহে। তবুও……। মন হইতে জোর করিয়া দুর্ভাবনাটাকে তাড়াইলাম। জীবনের পথে এই রকমটাই স্বাভাবিক।

সুমিতা বলিল, "বাবা, ছোড়দা'র (রমেন্দ্রের) change খুব হোয়েছে। পাকা gallant হোয়েছে। মেয়েদের দেখ্‌লেই হাঁ কোরে থাকে, gallantry দেখবার সুযোগ কিছুতেই ছাড়বে না। এই ভাব।"

দয়াল কহিল, "ছাড়া উচিত নয়। তাতে বয়সের ও services এর অপমান হয়। gallantry নানা রকমের ও Armed services এ ছুটো একেবারে— turns,"

রমেন্দ্রের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল। আমারও এই সব আলোচনাতে উপস্থিত থাকা উচিত কি না ভাবিতেছিলাম। বয়সের ধর্ম্ম নহে শুধু, সংস্কারও আছে আমাদের যে, এ সব বিচার ও আলোচনা খুব প্রকাশ্য ভাবে সকলের মধ্যে করা যায় না। কিন্তু সেটা যে প্রাচীন ও বৈজ্ঞানিক আলোচনাকে নিবৃত্ত করিবে তাহাও ঠিক নহে। শুধু এই মনে হয় যে অসঙ্গত ও বিশৃঙ্খল চিন্তা ও আলোচনা হইতে প্রথমত বাক্য সংযম হয়, তা'র পর মনের সংযম ও শেষে প্রবৃত্তির সংযম। মন নামক পদার্থটি বা অপদার্থটি যে কি তাহা এখনো ঠিক বুঝি নাই। শুনা যায়, ইহা নানাবিধ ক্রিয়ার বা ক্রিয়া শক্তির একটা সমষ্টিগত রূপ। ইহা প্রবৃত্তি, অভিজ্ঞান, চিন্তা, ইচ্ছা সব কিছুরই একটা রহস্যপূর্ণ কেন্দ্র ও আশ্রয় বা রূপ। ঠিক কি তাহা মনোবিজ্ঞান হইতে বুঝি না, তবে শুনি নাকি ইহার মূলে আছে অহংকার ও যৌন-প্রবৃত্তি। অহংকার negative, যৌনজ্ঞান positive; একটা বিকর্ষণ, অন্যটা আকর্ষণ। এই নিয়া জীবনবেদ রচিত হইয়াছে যুগে যুগে, সম্ভব এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল। অন্তত পক্ষে ইহা খুব ভুল নহে। তাহা যদি হয়, তবে এ দুইটির বিশেষরকম অধ্যয়ন ও আলোচনা না হইলে ইহাদের সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট রূপে কিছুই জানা যাইবে না। প্রকৃত শিক্ষাতে সংযম আনে; আর অন্যথায় অসংযম। অবশ্য সংযমের অর্থ আত্মনিগ্রহ নহে। * * *

শ্রী বলিল, "তা হোলে রমেন্দ্রের একটা বিয়ে দেওয়া চাই, বাবা।"

রমেন্দ্র ব্যস্তভাবে কহিল, "ও সব কি বৌদি, শুনুন তার চেয়ে কবিতা—"

শ্রী মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "না, তোমার ও সুন্দরীর চোখ চুল দেহের বর্ণনা আর শুনতে পারি না। তার চেয়ে—বিয়ে কর একটা। সব হাতের কাছে পাবে বাবু। আমরাও কবিতা শোনা থেকে রেহাই পাবো।"

সুমিতা প্রশ্ন করিল, "তোমার কি রকম বৌ চাই, ছোড়দা? বল না, বাবাকে। লজ্জা কি? সব ছেলেরই তো একটা ideal থাকে—তোমারটা কি রকম শুনি!"

রমেন্দ্র উঠিয়া গেল। তাহাকে টিকিতে দিল না। শ্রী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "যেও না ভাই, বোলে যাও।" তারপর আমাকে বলিল, "ঘটক লাগাতে হবে বাবা।"

আমি হাসিয়া কহিলাম, "লাগাও। কিন্তু ঘটকের মারফতে বিয়ে কি আজকাল কেউ কোরতে চায়?"

শ্রী উত্তর দিল, "বিয়েই কোরতে চায় না সব, তা ঘটকই বা কি, আর নিজে থেকেই বা কি। এখন ছেলেদের আছে শুধু ভাব বিলাসিতা, কিন্তু দায়িত্ব নেবার ইচ্ছা ও সাহস নেই। সাহসের এত অভাব আমি দেখি নি আর!"

এ কথা আমারো অনেকবার মনে হইয়াছে। যখনই জাতির সাহস কমিয়াছে—তখনই জাতির পতন সুরু হইয়াছে। যৌনজ্ঞানসংস্কার মুক্ত অবস্থাতে বিবাহের সংস্কারকে আবার কি ভাবে পুনর্গঠিত করিবে, তাহা এখনো স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না, কিন্তু কোনো জ্ঞানকে কাজে লাগাইবার মত সাহসও তো নাই। ইহাতেই হইয়াছে মুস্কিল, সংস্কারও থাকে না—আর তার জায়গায় জ্ঞানের ব্যবহারও না। সে ক্ষেত্রে একটা বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিন্তু অসংযম যে মানুষকে কোথায় লইয়া যায়, শুধু এই ব্যাপারে নহে, অন্য ব্যাপারেও বটে—তাহা কে বলিতে পারে? তাহাই শুধু নহে। অসংযম ব্যয়সাপেক্ষ। সে ব্যয় করিবার মত শক্তি না থাকিলে অসংযত হওয়া যায় না। আবার ব্যয় শক্তির অভাবে যে সংযম, তাহাও নিরর্থক।

শ্রী বলিল, "যা হোক্, বিয়েটা দিলেই ভালো। যুদ্ধই হোক্ আর দুর্ভিক্ষই হোক্, বিয়ে আট্‌কাবে না।"

কহিলাম, "বরং বাড়ছে যুদ্ধের বাজারে। অনেকে উপার্জ্জন কোরছে ও বিয়ে করার সুযোগও পাচ্ছে। কন্যার পিতারাও এখন অনেকে অর্থ ব্যয় কোরতে পারেন। পয়সার ব্যাপারে এখন অনেক স্বচ্ছলতা এসেছে। কিন্তু তবুও লোক সংখ্যা হিসাবে বিবাহের সংখ্যা যে বেড়েছে তা নয়। তাই মেয়েদের দেখি সব চাকুরি কোরতে যেতে। কলেজ স্কুলের উঁচু ক্লাশেও অনেক মেয়ে। ট্রামে বাসে মেয়েদের ভিড় বেড়েছে। মাঝে মাঝে সংবাদ-পত্রে ছেলেরা মেয়েদের ও মেয়েরা ছেলেদের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ প্রকাশ করে। ক্রমশঃ এই রকম হাওয়া জোরই বইবে।"

উমা আসিয়াছিল কখন দেখি নাই। সে সমস্ত শুনিতেছিল। বলিল,

"যে হাওয়া বইছে তা বইবে। এখন মেয়েদের বাইরে বেরবার সুযোগ মিলেছে। তারা যে সেটা ঠিক মত ব্যবহার কোরতে পারছে না—এটাই দুঃখ। স্বাধীনতা শুধু ট্রামে বাসে রাস্তাতে দল বেঁধে বেড়ানোও নয়, আর সিনেমা হলে কি রেস্তোরাঁতে ভিড় কোরে গোলযোগ করাও নয়। সেটা এখনো বুঝতে সময় লাগবে। তা ছাড়া সভ্যতা ও শ্লীলতার সঙ্গে স্বাধীনতা মিশ খাবে ও শক্তি-অর্জ্জনের সঙ্গেও বটে; তা না হোলে স্বাধীনতাও একটা বিলাসে পরিণত হবে।

আমি কহিলাম,"মেয়েদের স্বাধীনতার পুরুষ নিরপেক্ষ থাকবে। যেখানে তা পুরোপুরি না হয়, সেখানে তার কোনো সদর্থ থাকে না। অন্যথায় মেয়েদের প্রবৃত্তি হবে শুধু পুরুষকে বেশী রকমে আকর্ষণ করার। এই মহাযুদ্ধের ফলে মেয়েদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে একটা বিশৃঙ্খলা সর্ব্বত্রই এসেছে। বাঙ্গালীর সনাতন অচলায়তনেও তার জের দেখা দিয়েছে। মার্কিন, চীন, ইতালি, প্রভৃতি কোনো দেশেই এর ব্যত্যয় ঘটে নাই। সে দিন একটি মার্কিনী সংবাদপত্রে দেখলাম যে Red district-এ ভদ্রঘরের মেয়েরাও রাত্রে নিশাচরীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর মধ্যে আমাদের সমাজে বিপ্লবের ধাক্কাটা অত্যন্ত কম। একটু অসংযম হবেই। অবশ্য এ হাওয়া থাকবে না। কিন্তু তার আগে অনেক কিছু বদল হবে।"

শ্রী বলিল, "বলা যায় না, বাবা। এ দেশে মেয়েদের সংযমটা এত বেশী আইন কোরে বাঁধা হয়েছে যে, সেটার বিরুদ্ধে এমনিতেই একটা প্রতিক্রিয়া সুরু হোয়েছে। সম্ভব যুদ্ধে সেই প্রতিক্রিয়াটা আরো সতেজ ও সক্রিয় হবে। তা হোক্। একটা কিছু না হোলে দেশের এই নিয়গতিটা বন্ধ হবে না। অবশ্য সব কিছু কোরতে হবে আত্মমর্য্যাদার জন্য, আপনার অসম্মানের জন্য নয়। উদ্দেশ্য ও আত্মমর্য্যাদাহীন যে ব্যবহার তাতে ক্ষতি হয়। সেইরূপ প্রবৃত্তি বা ব্যবহার কোনো সভ্য সমাজই প্রশ্রয়ের চোখে দেখে না।"

কথাটা হয় তো ঠিক। উমার বা শ্রীর মুখে কখনও একটা বাজে কথা শুনি নাই। দুইজনেই জীবনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই পুরাতন সংস্কার হইতে অনেকটা মুক্ত, অথচ শক্তিশালিনী, তাই তাহাদের চরিত্রে একটা মাধুর্য্যও আছে। অন্য দিকে মনে পড়ে সীতার কথা। তাহার স্বাধীনতা আছে, মনের একটা দৃঢ়তা আছে; যাহার জন্য সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে নাই এবং নিজের ইচ্ছামত চলে; যে শক্তির পরিচালনায় মানুষের মন অপরের প্রভাব স্বীকার করিয়াই আনন্দ পায়। সমাজে বা পরিবারে নারীর স্থান লইয়া অনেক রকম তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে নারীর পদ মর্য্যাদার অভাব হইয়াছে পুরুষের মুখাপেক্ষিতাতে। বেশীর ভাগই পুরুষ হইয়াছে এ দেশে কাপুরুষ।

একটা নূতন আইন প্রণয়ন করা হইতেছে মেয়েদের দাবী লইয়া। উমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "উমা, তোমার কি মত? পিতার সম্পত্তির ভাগ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার মেয়েদের থাকা ভালো মনে কর?" উমা বলিল, "থাকলে ক্ষতি কি? অধিকার থাকলেই যে-সব সময়ে সেটার ব্যবহার হবে, এমন কিছু নয়। কিন্তু অধিকারটা অস্বীকার করায়—বা না থাকার দৈন্য কেন ছেলে বা মেয়েদের হবে।" শ্রী বলিল "আইন করে অভাব অভিযোগ জীবনের মেটে না। কিন্তু এই রকম একটা আইন আছে জানলে মেয়েরাও অসহায় হবে না, ছেলেরাও যথেচ্ছ মেয়েদের উপর প্রভুত্বও চালাবে না। যাই হোক্ যতক্ষণে না স্বাধীনতার জোর ও অধিকার আসছে, ততক্ষণ জীবনে কোনো কার্য্য বা চিন্তাই সুশোভন ও সার্থক হবে না। স্ত্রীলোকের হয় তো সংসারে স্বাধীনতা আছে, প্রভুত্বও আছে। তবে সেটা প্রকাশ্যে মেনে নেওয়ায় আপত্তি কি?"

মনে হয়—এই কথাই সত্য; আদর্শ হিন্দু-ধর্ম্ম কি অনুশাসন দিয়েছেন —তাই নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি। কিন্তু আমার মনে হয়—সামাজিক জীবনটাকে social statistics না বানালেই জীবনযাত্রা সুবিধাই হবে। সামাজিক stability—ভালো; কিন্তু stability—ঠিক stationery society—নহে। এটা বোধহয় আমাদের দেশের আধুনিক সমাজকর্ত্তারা ভুলে যান। তাছাড়া আমার মনে হয় যে আসলে হিন্দু ধর্ম্মের সামাজিক অনুশাসন অন্য রকমই ছিল।

শ্রী মন্তব্য করিল, "সমাজ বা হিন্দু সমাজ কি একটা বস্তু বিশেষ? একটা দল? না, বাবা, একথা মানা যায় না। হিন্দু সমাজ একটা বিশিষ্ট জীবনধারা ও উদ্দেশ্য সাধন। আমাদের যে হিন্দু সমাজ, সাধারণের কল্পনাতে কতকগুলি সামাজিক ব্যবস্থা মানা—আর সে ব্যবস্থাগুলি তৈরী হ'য়েছিল কত শতাব্দী আগে তা বলা যায় না। সে ব্যবস্থা বুঝেই বা কে? আর তা' চালায়ই বা কে? পল্লীগ্রামে যান—দেখবেন সমাজপতির স্বরূপ। সামাজিক বন্ধন সহরে সর্ব্বাপেক্ষা শিথিল হোয়েছে। তা ছাড়া সমাজ গেছে ধনতন্ত্রের প্রভাবে। যতদিন ব্রাহ্মণের প্রভাব সমাজে ছিল ততদিন হিন্দু সমাজ ছিল—একটা জীবন্ত প্রাণবন্ত ব্যাপার। এখন তাহার কিছু নাই—কঙ্কালটা ছাড়া।"

সম্ভব তাই, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝছি। সমাজ বলে আমি কিছুই জানি না। হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার আমি মানি না। যাতে আমার জীবনযাত্রা সুগম ও স্বচ্ছন্দময় হোয়েছে তাই কোরেছি। কৈ কোন সমাজ তো আমাকে বাধা দেয় নাই। কোনো রকম অসুবিধাও তাতে হয় নাই।

লোকে হয়তো বলিবে, "কিন্তু তোমার এই অসামাজিকতায় আজ তোমার সংসার ভেঙ্গে গেছে।"

আমি তা স্বীকার করি না। সংসার ভাঙ্গার কি গড়ার ভিতর নিজের স্বকীয়তা আছে। একদিকে ভেঙ্গেছে, আবার অন্যদিকে গড়েছে। ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে সুখ দুঃখ দুই পেয়েছি ও দেখেছি। কিন্তু তা ফেলে কৃত্রিম উপায়ে জোর কোরে ভাঙ্গন বাঁচিয়ে লাভ কি হোতো?

আমার এক বন্ধু আমাকে বোলেছিলেন "সমাজ বা পরিবার ভাঙ্গে এই জন্য যে আমাদের ঐতিহ্য বা tradition আমরা যথেষ্ট ভাবে সজীব ও সক্রিয় অবস্থাতে পরবর্ত্তী পুরুষকে দিতে পারি না। আমরা তাদের বুঝাতে পারি না ঠিক মত যে, সমস্ত উত্তরকালের সৃষ্টি হবে এই সক্রিয় ঐতিহ্যের ভিত্তির উপর তবে তার সার্থকতা হবে। নূতন কিছু গড়তে হোলে, তার ভিত্তি চাই। সে ভিত্তিটা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের অভিজ্ঞতা। আমাদের ইতিহাস। তাই ইতিহাস এত মূল্যবান্। না হোলে, কেন তা পড়া, কেন তার সম্বন্ধে এত আলোচনা গবেষণা?"　　(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া

চতুর্থ টেষ্ট

ইংলণ্ড: ৪৬০ ও ৩৪০ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)

অষ্ট্রেলিয়া: ৪৮৭ ও ২১৫ (১ উইঃ)

ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ড্র গেছে।

ইংলণ্ড প্রথম টসে জিতে ব্যাট করতে নামে। সূচনা খুবই ভাল হ'ল। প্রথম উইকেট পড়ল ১৩৭ রাণে; প্রথম দিনের খেলার শেষে চার উইকেটে ২৩৯ রাণ উঠল। হাটন ৯৪ এবং ওয়াসব্রুক ৬৫ রাণ করে আউট হ'ন; ডেনিস কম্পটন এবং হার্ডষ্টাফ যথাক্রমে ১৫ রাণ ও ২২ রাণ করে নট আউট রইলেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় লাঞ্চের সময় ইংলণ্ডের চার উইকেটে ৩০৮ রাণ উঠল। কম্পটন ও হার্ডষ্টাফ ১৩৫ মিনিট একত্র খেলে মোট ১০৬ রাণ করলেন। দ্বিতীয় দিনের টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড তার পূর্ব্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য যেন ফিরে পেল। বিগত চার মাসের খেলায় ইংলণ্ড তার নৈরাশ্যজনক খেলারই পরিচয় দিয়ে এসেছিল। কম্পটন তাঁর অপূর্ব্ব ক্রীড়াচাতুর্য্যে অষ্ট্রেলিয়ার স্পিন বোলারদের আক্রমণ ব্যর্থ করতে লাগলেন। লাঞ্চের সময় খেলার ফলাফল থেকে ইংলণ্ডের জয়লাভ সম্বন্ধে বেশীর ভাগ দর্শকই আশান্বিত হলেন। লাঞ্চের পর ইংলণ্ডের ৩২০ রাণের মাথায় হার্ডষ্টাফ ও কম্পটনের জুটী ভেঙ্গে গেল। হার্ডষ্টাফ এবং কম্পটন তাঁদের পঞ্চম উইকেটের পার্টনারসিপে ১৭৫ মিনিট খেলে ১১৮ রাণ করেন। কম্পটন করেন ৫১ রাণ। হার্ডষ্টাফ ৬৭ রাণ ক'রে মিলারের বলে বোল্ড হ'লেন। তিনি ৫টা বাউণ্ডারী করেন। এ্যাকিন কম্পটনের জুটী হলেন। সাত ঘণ্টার কিছু বেশী সময় খেলার পর ইংলণ্ডের ৩৫০ রাণ উঠল। কম্পটন নির্ভুলভাবে ক্রিকেট খেলছিলেন, একবার ৯১ রাণের মাথায় তিনি অল্পের জন্য ষ্টাম্পিং থেকে রক্ষা পান। দলের ৩৮১ রাণে এ্যাকিন ২২ রাণ ক'রে আউট হলেন। ইয়ার্ডলি কম্পটনের জুটী হলেন। ২৩০ মিঃ খেলার পর কম্পটন তাঁর নিজস্ব ১০০ রাণ পূর্ণ করলেন। তিনি ৯টা বাউণ্ডারী করেন। দ্বিতীয় ৫০ রাণ তুলতে তাঁর ৭০ মিনিট সময় লাগে। অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কম্পটনের এই দ্বিতীয় 'সেঞ্চুরী'। প্রথম সেঞ্চুরী করেন ১৯৩৮ সালে নটিংহামে, মোট ১০২ রাণ করেছিলেন। চা পানের সময় ৬ উইকেটে ইংলণ্ডের ৪০৯ রাণ উঠল। কম্পটনের ১২০ রাণ উঠলে পর এবারের টেষ্ট খেলায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'স্কোরার হিসাবে সম্মানিত হলেন। ইংলণ্ডের ৪৫৫ রাণের মাথায় ফিগুওয়ালের বলে কম্পটনের উইকেট পড়ে গেল। কম্পটন ২৮৬ মিনিট উইকেটে খেলে ১৪৭ রাণ করেন, তার মধ্যে ১৫টী বাউণ্ডারী করেন।

মোট রাণে আর ৫টা রাণ যোগ হবার পর ৪৬০ রাণের মাথায় ইংলণ্ডের ৮ম ৯ম ও ১০ম উইকেট পড়ে গেল। ফিগুওয়াল ইংলণ্ডের শেষের চারটা উইকেট ২ ওভার বলে মাত্র ২ রাণ দিয়ে পেলেন; প্রকৃতপক্ষে শেষ তিনটে উইকেট পেলেন ৪টা বলে। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ৯ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। ইয়ার্ডলি ৯৮ মিনিট খেলে ১৮ রাণ ক'রে নট আউট রইলেন। ফিগুওয়ালের বল যে সময় ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল সে সময় সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে তার সম্মুখীন হ'তে হয়নি। ফিগুওয়াল ২৬ ওভার বলে ৫টা মেডেন পান এবং ৫২ রাণ দিয়ে ৪টা উইকেট পেয়েছিলেন। ডোনাও পেয়েছিলেন ৩টে উইকেট ৩৩ ওভার বলে, ১৩৩ রাণ

দিয়ে এবং মাত্র ১টী মেডেন নিয়ে। আধঘণ্টার কিছু বেশী সময় হাতে পেয়ে অষ্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। সূচনা মোটেই ভাল হ'ল না। প্রথম উইকেট ১৮ রাণে পড়ে গেল। তারপর ক্যাপটেন ব্র্যাডম্যান কোন রাণ না করেই বেডসারের বলে বোল্ড হয়ে গেলেন। দর্শকরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ব্র্যাডম্যান সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন। টেষ্ট খেলায় ব্যাডম্যানের এই নিয়ে পাঁচবার শূন্য রাণ করলেন। তার মধ্যে চারবার ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলায় এবং একবার ইণ্টইণ্ডিজের বিপক্ষে। দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে অষ্ট্রেলিয়ার ২ উইকেটে মাত্র ২৪ রাণ উঠল। মরিস ১১ এবং হ্যাসেট শূন্য রাণ ক'রে নট আউট রইলেন সরকারীভাবে ৩০, ১৬০ হাজার দর্শকের উপস্থিতি ঘোষণা করা হয়েছিল। অষ্ট্রেলিয়ার এ শোচনীয় সূচনায় তারা হতাশ হয়েই বাড়ী ফিরলো।

তৃতীয় দিনের খেলায় মরিস ও হ্যাসেট একত্রে তিন উইকেটের জুটীতে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁরা একত্রে ১৮৯ রাণ তুলেছিলেন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে অষ্ট্রেলিয়া দলের ৪ উইকেটে ২৯৩ রাণ উঠলো। মরিস ১২২ এবং হ্যাসেট ৭৮ রাণ করে আউট হলেন। মিলার ও জনসন যথাক্রমে ৩৩ ও ৩৫ রাণ ক'রে নট আউট রইলেন। বেডসার ২৩ ওভার বলে ৬৩ রাণে ৩টে উইকেট পেলেন। চতুর্থ দিনের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসে ৪৮৭ রাণ উঠলো। কে মিলার ১৪১ রাণ করে নটআউট রইলেন। জনসন করলেন ৫২ রাণ।

ইংলণ্ড তার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। কোন উইকেট না হারিয়ে ৯৬ রাণ উঠল। হাটন ও ওয়াসব্রুক যথাক্রমে ৫৮ ও ৩৮ রাণ করে নট আউট রইলেন। টেষ্টের পঞ্চম দিনের খেলার শেষে ইংলণ্ডের ২৭৪ রাণ উঠল ৮ উইকেটে। হাটন ৭৬, এডরিচ ৪৬, ওয়াসব্রুক ৩৯ রাণ করলেন। কম্পটন ৫২ রাণ করে নট আউট রইলেন। টোসাক ৬৯ রাণে ৪, লিণ্ডওয়াল ৪৭ রাণে ২ এবং মিলার ও জনসন উভয়েই ১টা ক'রে উইকেট পেলেন।

৬ষ্ঠ দিনে লাঞ্চের পরই ইংলণ্ড ৮ উইকেটে ৩৪০ রাণ তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলো। কম্পটন ১০৩ রাণ ও ইভান্স ১০ রাণ করে নট আউট রইলেন।

কম্পটন ইংলণ্ডের তৃতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় যিনি অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একই টেষ্ট ম্যাচের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। ইতিপূর্ব্বে হার্বার্ট সাটক্লিফ (মেলবোর্ণ ১৯২৪-২৫, ১৭৬ ও ১২৭ রাণ) এবং ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (১১৯ নট আউট ও ১৭৭ রাণ; এডলেড, ১৯২৮-২৯) এইরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন ক'রে ছিলেন। ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্টম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে প্রথম ওয়ারেন ব্র্যাডস্লে অনুরূপ সম্মানলাভ ক'রেছিলেন ১৯০৯ সালে ওভাল মাঠে যথাক্রমে ১৩৬ও ১৩০ রাণ ক'রে। তারপর করেছেন মরিস এইবার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে। এই টেষ্ট ম্যাচে ইভান্স ৯৫ মিনিট কাল উইকেটে খেলে ১০ রাণ তুলে টেষ্ট খেলায় আর এক ধরণের রেকর্ড করেছেন। এত অধিক সময় উইকেট রক্ষা করে এত কম রাণ তুলতে ইতিপূর্ব্বে আর কোন খেলোয়াড়কে দেখা যায়নি।

খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার ১ উইকেটে ২১৫ রাণ উঠলে পরে খেলা বন্ধ হয়ে গেল। মরিস ১২৪ এবং ব্র্যাডম্যান ৫৬ রাণ ক'রে নট আউট রইলেন। অষ্ট্রেলিয়ার লেফট্‌হ্যাণ্ড ব্যাট্‌স্‌ম্যান মরিস উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী করলেন।

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ড্র হয়ে গেল।

এবার অষ্ট্রেলিয়া 'রবার' পেল।

রঞ্জি ট্রফি ঃ

বাঙ্গলা ঃ ২৯৫ (পি রায় নট আউট ১১২ ডি দাস ৬৭, গার্বিস ৪১; এন সিংহ ২৫৪ রাণে ৪ উইকেট) ও ১৫৮ (পি সেন ৪৫)

যুক্তপ্রদেশ ঃ ৯৫ (পি চ্যাটার্জ্জি ৩১ রাণে ৭ উইঃ) ও ২১৩ (এস খাজা ১১; চৌধুরী ৭৭ রাণে ৪ উইঃ)

বাঙ্গলা প্রদেশ ১৪৫ রাণে যুক্তপ্রদেশকে পরাজিত করে।

পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনাল

হোলকার ঃ ৩৫০ (সি এস নাইডু ৭৮, জে এন ভায়া ৫৪, এম জগদ্দল ৪৭, সি সারভাতে ৪২; সি চ্যাটার্জ্জি ৮০ রাণে ৫ এবং এস চৌধুরী ৮৬ রাণে ৩ উইকেট পান।

বাঙ্গলা ঃ ১৬৫ (কে বসু ৬১, মুস্তাফা ৩৯; গিকোর্ড ৪২ রাণে ৬ উইকেট, সি এস নাইডু ৬৫ রাণে ৩ উইকেট) ও ১৫৩ (পি সেন ৫০, এন চ্যাটার্জ্জি ৪২; গিকোর্ড ৩২ রাণে ৫, সারভাতে ২৩ রাণে ৩ উইকেট পান)

রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে হোলকার এক ইনিংস ও ৩২ রাণে বাঙ্গলা প্রদেশকে পরাজিত করেছে। হোলকারদল নর্থ ইণ্ডিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন দলের সঙ্গে সেমি-ফাইনালে খেলবে।

পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনাল ঃ

বরোদা : ৩৪৭ ও ২৪৯

বোম্বাই : ২৬৯ ও ১১৯ (১ উই:)

রঞ্জিট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের ফাইনালে বরোদা প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ৭৮ রাণে অগ্রগামী থেকে বোম্বাইকে পরাজিত করেছে।

উত্তরাঞ্চলের ফাইনাল ঃ

নর্থইণ্ডিয়া ক্রিকেট এসো: দল ১৯৫ রাণে দক্ষিণ পাঞ্জাবদলকে পরাজিত করেছে।

এন আই সি এ—৪২৬ ও ২৬২

দক্ষিণ পাঞ্জাব—২৮৩ ও ২৪৬

দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল ঃ

হায়দ্রাবাদ : ২৯৬ ও ৪৮৬ (৮ উই: ডিক্লে:)

মহীশূর : ১৪৫ ও ২২০

হায়দ্রাবাদ ৪১৭ রাণে মহীশূর দলকে দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনালে পরাজিত করেছে।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট ঃ

এবার আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাই এক ইনিংস ২২২ রাণে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে উপর্য্যুপরি তিন বছর রোহিনটন বেরিয়া ট্রফিবিজয়ী হয়েছে।

ফলাফল ঃ

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় :

১১৯ ও ২২৪ (এস জাভেরী ৯৪ রাণে ৭ উইকেট ও সি আবদুল্লা ৫৪ রাণে তিন উইকেট পান)

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় :

৫৬৫ (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের আর এস মোটী ১৭৫, উমরীগড ১১৪ এবং খাজাঞ্চী নট আউট ৭৪ রাণ করেন।

লন্ টেনিস ঃ

সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া লন্ টেনিস্ চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার সিঙ্গলসের ফাইনালে সুমন্ত মিশ্র ৩—৬, ৬—৩, ৬—৪, ৬—৩ গেমে ভারতবর্ষের এক নম্বর টেনিস খেলোয়াড় ঘস্ মহম্মদকে পরাজিত করেছেন। এই বৎসর এই নিয়ে সুমন্ত মিশ্র ঘস্ মহম্মদকে চারবার পরাজিত করলেন। ক্যালকাটা লক্ষ্ণৌ মাদ্রাজ এবং সকেট চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ঘস মহম্মদ সুমন্ত মিশ্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন।

টেষ্ট ব্যাডমিণ্টন ঃ

ভারতবর্ষ বনাম সিলোনের তিনটি ব্যাডমিণ্টন টেষ্ট খেলাতেই ভারতবর্ষ জয়লাভ করেছে।

আন্তঃকলেজ স্পোর্টস ঃ

কলিকাতা আন্তঃকলেজ স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ৭১ পয়েণ্ট পেয়ে কলেজ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছে। ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় টি আও (কারমাইকেল কলেজ)। তিনি মোট ১৯ পয়েণ্ট করেছিলেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীঅপরাজিতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মার জীবনচিত্র"—৫৲
প্রাণতোষ ঘটক প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পঙ্গপাল"—১॥৹
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "তরুণের স্বপ্ন" (২য় পর্ব্ব)—২৸৹
শ্রীঅতুলা ঘোষ প্রণীত "স্বাধীনতার স্বরূপ"—।৹
শ্রীদিলীপকুমার মালাকার প্রণীত "জাতীয়তার বাণীমূর্ত্তি হার্ডার"—১৲
মৌলবী মোহাম্মদ মোহসেন প্রণীত "মিলন-গীতি"—৷৹
শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "প্রেম নহে মোহ"—৩৲
পরিমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "দিল ডাক"—৩৲
শীতল বর্দ্ধন প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "ধূলোট"—৫৲
মোহিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সব্যসাচী"—২॥৹
শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত "ছোটদের চিলড্রেন অফ্ দি নিউ ফরেষ্ট"—১।৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চৈত্র—১৩৫৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

শিশুর হাতে-খড়ি

শ্রীহিমাংশু মজুমদার এম-এস্‌সি, বি-টি

শিশু পাঁচ বছরে পা দিল। মা-বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তার হাতে-খড়ি দেওয়ার জন্য। শিশুর হাতে এলো একটি বর্ণবোধ, একখানা শ্লেট আর পেন্সিল এবং বড় জোর দু'একখানা ছবির বই। শিশু খেলা গেল ভুলে—নূতন জিনিষ পেয়ে তার শিশুমন আনন্দে নেচে উঠেছে, সে বই-শ্লেট বগলে নিয়ে আজ পাঠশালায় যাবে, একটা নূতন রাজ্য তার সমস্ত মাধুর্য নিয়ে শিশুর চোখের সামনে জেগে উঠল—শিশুমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল।

পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় পড়াতে লাগলেন, অ—অজগর, আ—আনারস। শিশু ভাবতে লাগল, এ আবার কি! মুহূর্তেই সে বুঝে নিল, এ তার রাজ্যের কথা নয়। নিমেষে পড়বার আগ্রহ সে হারিয়ে ফেলে, স্থির করে ফেলে বই-পড়া বড়দের কাজ, বড় হ'লে সে পড়বে। সে তার খেলার রাজ্যে ফিরে আসতে চায়। জোর করে মাষ্টার ম'শায় তাকে বই-শ্লেট নিয়ে বসান। সে পড়তে চায় না। ঐ ছোট্ট বই কয়টির প্রতি তার শিশুমন বিষিয়ে ওঠে। মা-বাবা শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাকুল হয়ে উঠেন, ভাবেন তাঁদের ছেলের বুঝি 'কিছু' হোল না।

যদি 'কিছু' না হয়, এর জন্য দায়ী কে? শিশুর লেখাপড়া শিখবার অনিচ্ছা? তার মেধার অভাব? এর জন্য দায়ী তার শৈশবের শিক্ষাগুরু, আর অর্থহীন ঐ অ, আ, ক, খ কথাগুলো, যারা গোড়াতেই তার শিখবার ইচ্ছাকে, পড়বার আগ্রহকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল।

কেমন করে ছাপার অক্ষরের সাথে, বইএর সাথে শিশুদের পরিচয় করাতে হবে, কী প্রণালীতে তাদের বর্ণের সাথে পরিচয় করালে সময়ের অপব্যয় হবে না অথচ আগামী ছাত্রজীবনের একটি সুদৃঢ়, সুষ্ঠু কাঠামো তৈরী হ'বে তারই আলোচনা করা হবে এ প্রবন্ধে।

কোন দু'টি শিশুর মনোবৃত্তি সমান নয়। বাড়ীতে যদি পাঁচটি ভাইবোন থাকে, তারা একই রকম মেধাসম্পন্ন হবে, একই জিনিষ তাদের প্রত্যেকের ভাল লাগবে এ আশা করা সমীচীন নয়। প্রত্যেকেরই একটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, এই স্বাতন্ত্র্য এবং মনোবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের পড়াশুনা আরম্ভ করার বয়স নির্দ্ধারণ করতে হবে।

চার বছরের খোকন দেখলো তার ছয় বছরের দিদি বেশ সুন্দর

সুন্দর বই পড়ছে, দিদির কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়ে, কোলের উপর তাকে ছড়িয়ে রেখে সুর করে ঝুঁকে ঝুঁকে আপন মনে সে ছড়া বলে যায়। দিদিটির অক্ষর শিখবার সাথে সাথে সেও দু'চারটি শব্দ, অক্ষর শিখে ফেলে, এরকম অবস্থায় বুঝতে হবে খোকন চার বছরের হলেও তার পড়বার আগ্রহ জন্মেছে, বই-এর সাথে পরিচিত হবার মত বুদ্ধির উন্মেষ তার হয়েছে। এ' অবস্থায় তাকে চার বছর বয়সে হাতেখড়ি না দেওয়া মানে—তার শিখবার তীব্র ইচ্ছাকে বলিদান দেওয়া।

পরন্তু আর একটি ছেলে নয় দশ বছর বয়স অবধিও যদি পড়বার কোন আগ্রহ না দেখায়, বা ভাল করে বই পড়তে না পারে, তা' হলে এ' সিদ্ধান্ত করা উচিত হবে না যে এ ছেলে চিরকাল মূর্খ-ই থেকে যাবে। মাতাপিতার ও শিক্ষকের অসীম ধৈর্য চাই। শিক্ষা ব্যাপারে তাড়াহুড়ো চলে না। অনেক সময় দেখা যায় মা-বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়েন অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের ছেলে-মেয়েকে মহাপণ্ডিত করে তুলতে, তাদের মনটাকে বিশ্বকোষ করে তুলতে। মেয়ে সাত বছরে পা দিতেই যদি "নীতি-সুধা"র ৩য় ভাগ পড়তে পারে, দশের নামতা মুখস্থ বলতে পারে, বড় বড় গুণ ভাগ অঙ্ক কষতে পারে, ইংরাজীর প্রথম ওয়ার্ড-বুকটির প্রত্যেকটি শব্দ যদি তার জানা হয়ে যায়, মা-বাবার গর্ব আর ধরে না। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন, শিশুর অপরিপক্ক মনকে খানিকটা পুঁথিগত বিদ্যার বোঝায় ভারাক্রান্ত করে তোলার পরিণাম সহসাই দেখা দেয়। যে জিনিষের কোন অর্থ নেই শিশুর বাস্তব জীবনে, তা তাকে শিখতে হয়েছিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে। কেমন করে অজানিতে তার মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা। গুরুভারে প্রপীড়িত মেধা আর মাথা তুলতে পারে না। তার মনের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে তার শিক্ষক বা মাতাপিতা তার শিক্ষার ব্যবস্থা যদি করতেন, তা' হলে সে হয়ত একদিন বড় হতে পারত।

তা' হলে দেখা যাচ্ছে ঠিক কোন্ বয়সে শিশুরা বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করবে তার কোন একটা মাপ কাঠি নাই। তবে শিশুশিক্ষায় যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা দেখেছেন যে ৬১/২—৭ বছর বয়সের মধ্যে সাধারণ মেধা-সম্পন্ন শিশুর বর্ণের সাথে পরিচিত হওয়া উচিত। বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে এর অনেক আগেই হয়ত পড়তে পারবে। বোকা ছেলেমেয়েদের আরও অনেক বেশী সময় লাগবে। মেধাবী শিশুদের দেখতে পাওয়া যাবে তারা অতি সহজেই বর্ণের তারতম্য বুঝতে পারছে, যে সব শব্দের সাথে তাদের পরিচয় নেই উচ্চারণের সাথে মিল রেখে তা' বানান করতে পারছে। বাড়ীর বড়দের আলোচনা থেকে অজ্ঞাতে সাধারণ-জ্ঞান অর্জন করতে পারছে, তার শব্দসম্ভার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের চাইতে অনেক বেশী, সর্বোপরি তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে নিজে নিজে শিখবার আপ্রাণ চেষ্টা, প্রয়োজনে নিজেকে নিজে সাহায্য করবার প্রয়াস এবং সহিষ্ণুতা। শিশু সে, কিন্তু তার নিজের কাজের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস দেখে অবাক হয়ে যেতে হবে। এ গুণাবলী সাধারণ মেধা-সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না।

শিশুর বর্ণ-পরিচয় হবার আগে তার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করা, ছাপার বইএর রহস্য জানবার জন্য আগ্রহ জন্মান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান কাজ। পাঁচ বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশু কোন স্কুলে না গেলেও চলবে, কিন্তু পাঁচ বছরের পর তার স্কুলে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন, শৈশবের প্রথম পাঁচটি বছরে তাকে অনেক ছেলেমেয়েদের সাথে খেলবার সুযোগ দিতে হ'বে। অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে খেলতে গিয়ে অনেক নূতন শব্দের সাথে শিশু পরিচিত তো হয়ই, তদুপরি সে বুঝতে পারে মানুষের সমাজে বাস করতে গেলে মানুষকে অপরের সুবিধা অসুবিধা দেখতে হয়, সময়ে এবং প্রয়োজনে নিজের আবেগকে সংযত করার শিক্ষা ঐ খেলার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে হতে পারে। শিশুর মনের খবর নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, শিশুকে খেলা থেকে বঞ্চিত করা মানে তার মনকে চিরকালের জন্য পঙ্গু করে দেওয়া। বহু গবেষণার ফলে এও দেখা গিয়েছে যে, যে সব ছেলেমেয়েরা অন্য ছেলেমেয়েদের সাথে কোন না কোন কারণের জন্য খেলতে পারে না তারা পরবর্তী জীবনে স্কুলের শিক্ষা দ্বারা খুব কমই উপকৃত হয়।

বর্ণের সাথে শিশুদের পরিচিত করবার আগে তাদের কথা বলবার ক্ষমতা তথা শব্দসম্ভার যাতে বৃদ্ধি পায়, তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। খেলনা নিয়ে খেলতে গিয়ে, বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে নানা রকমের গল্প শুনে, ছবির বইএর পাতা উল্টিয়ে শিশুরা অনেক নূতন শব্দের সাথে পরিচিত হয়, শিশুরা গল্প শুনতে ভালবাসে, গল্প শুনবার পর তাদের মনে কত রকমের জিজ্ঞাসাই যে আসে, তাদের রূপ-জগতের সাথে বাস্তব জগতের কোন্খানে প্রভেদ, তা' জানবার জন্য তাদের কত প্রশ্ন—অসীম ধৈর্য-সহকারে এ সবের উত্তর দিতে হবে।

লেখাপড়ার প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টি করার, তার স্বাতন্ত্র্যকে জাগরিত করার অঙ্কন একটি প্রকৃষ্ট উপায়, ভাষার দীনতা হেতু শিশুরা তাদের নিত্য নূতন অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে পারে না অনেক সময় মনের ঐ অভিব্যক্তি রূপলাভ করতে পারে শিশুর অঙ্কনে তুলি দিয়ে পেন্সিল দিয়ে, রঙিণ খড়িমাটি দিয়ে বা কাঠকয়লা দিয়ে ঘরের মেজেতে দেয়ালে, খবরের কাগজে, বইএর পাতায়, যেখানে সেখানে শিশু কত দাগ কেটে যায় আপন মনে, ঐ তাদের ছবি, আমাদের কাছে এ' অতি তুচ্ছ, কিন্তু শিশুর কল্পনারাজ্যে তার দাম অনেক, আপন পরিবেষ্টনীর মধ্যে যে সব জিনিষ শিশু দেখতে পায়, যে সব অভিজ্ঞতা সে দিনের পর দিন অর্জন করে তাকে সে প্রকাশ করতে চায় তুলির আঁচড়ে নিজের অঙ্কন সম্বন্ধে, কথা বলতে গিয়ে সে তার শব্দ সমষ্টি বাড়িয়ে ফেলে, তার আঁকবার খাতাটি তার "প্রথম পাঠ" হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। শিশুর নির্দেশ অনুযায়ী মা কি বাবা অথবা শিক্ষক তারই আঁকা ঐ ছবির তলায় কয়েকটি লাইন লিখে দেবেন। যিনি লিখলেন তিনি শিশুকে তা' বারবার পড়িয়ে শোনালেন। শিশু নিজে তা' পড়তে চেষ্টা করবে এবং দেখা যাবে বার দুই চেষ্টা করার পর সে সব কথা কথা সুন্দরভাবে পড়ে যাচ্ছে, যদিও সে অক্ষর চেনে না।

শিশুর মনোবৃত্তির দিকে লক্ষ্য রেখে যদি বর্ণ-পরিচয়ের অনুকূ

তথা বিদ্যাশিক্ষার গোড়াপত্তন করতে হয় তবে একটি শিশুর বা একদল শিশুর একটা আগ্রহ বা ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে শিশুর "প্রথম পাঠের" গোড়াপত্তন করতে হবে। ছেলেমেয়েরা হাতের কাজ করতে ভালবাসে, এ' করতে না পারলে তাদের মনের উন্মেষ বাধা পায়। কাদা, বালি, জল দিয়ে সে মনের আনন্দে তার কল্পনার সৌধ গড়ে তুলুক; অনেক সময় দেখা যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঠের বাক্স দিয়ে, ইট দিয়ে, কার্ডবোর্ড দিয়ে, কাদা দিয়ে বাড়ী তৈরী করতে চায়। বাড়ী তৈরী করতে গিয়ে বাড়ীতে যারা বাস করে তাদের কথা এসে প'ড়ে, এসে প'ড়ে তার আসবাবের কথা। এ কথাগুলি নিয়ে এবং বাড়ী সম্বন্ধে অন্য কথা নিয়ে শিক্ষকমহাশয় শিশুর 'বর্ণবোধ' তৈরী করতে পারেন। একটি ছেলে বল্‌লো 'আমার মা এখন বাড়ীতে'। ছেলেটির এ কথাগুলো শিক্ষকমহাশয় একটি কাগজে সুন্দর করে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন, অন্য একটি মেয়ে যদি বলে 'আমার বাড়ীর পেছনে একটি আম গাছ আছে'—শিক্ষক মহাশয় এ' কথাগুলোও লিখে দিলেন। এ' লেখাগুলো শিশুরা শিক্ষকমহাশয়ের সাথে সাথে বার কয়েক পড়বে, দেখা যাবে 'আ' অক্ষরটির পুনরাবৃত্তির ফলে অজ্ঞাতে তার সাথে শিশুরা পরিচিত হয়ে গেল, 'বাড়ীর' আসবাবপত্র শিশুরা তৈরী করবে মাটি, কাগজ, খালি দিয়াশলাইএর বাক্স, ন্যাকড়া ইত্যাদি দিয়ে। শিক্ষক মহাশয় তাদের উপর বড় বড় অক্ষরে লেবেল্ লাগিয়ে দিলেন, এই লেবেলগুলোও অক্ষর চিনবার সাহায্য করবে।

বই পড়াটাকে খেলার মত আনন্দজনক করে তুলতে পারলে শিশুদের, বর্ণের সাথে পরিচিত করান অনেকখানি সহজ হয়ে পড়বে, খেলার মধ্যে দিয়েই শিশু বর্ণ শিখবে, এমন খেলার ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি, তবে অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের শ্রম সার্থক করতে পারি। যেমন, একটি ছোট্ট কাগজে রঙিন পেন্সিল দিয়ে বড় বড় করে লেখা হোল 'বিড়াল' কুকুরটি আর একটি কাগজে আঁকা হোল বিড়ালের একটি ছবি। ঐ রকম অনেক কয়টি লেখা এবং ছবির কার্ড তৈরী করা হোল। বিড়ালের ছবির পাশে 'বিড়াল' কথাটি রাখা হোল। 'বিড়ালটির পিছনে কুকুর দৌড়াচ্ছে'—ঐ লেখাটির পাশে রাখা হোল তার সমীচীন ছবিটি। শিক্ষক মহাশয় বা মা লেখা কয়টি শিশুকে প'ড়ে শোনালেন। তারপর ছবি এবং লেখাগুলো মিশিয়ে ফেলে শিশুকে বলা হোল বিড়ালের ছবির পাশে 'বিড়াল' কথাটির কার্ড রাখতে। বার দুয়েক ভুল করে শিশু তৃতীয় বারে আর ভুল করবে না। ঐ রকম খেলা খেলতে ৫-৬ বছরের ছেলে মেয়ে খুব আনন্দ পাবে। তবে ঐ রকম কার্ড তৈরী করতে গিয়ে দেখতে হবে এমন কোন শব্দ বা ছবি ব্যবহার করা হবে না যার সাথে শিশু পরিচিত নয়। ঐ রকম খেলায় শিশুরা বেশ খানিকটা অভ্যস্থ হবার পর আর একটি শব্দের খেলা তাদের খেলতে দেওয়া যায়। কয়েকটি কাগজের টুক্‌রো (রঙিণ হলে ভাল হয়) কাটা হোল। প্রত্যেকটিতে একটি করে আলাদা শব্দ বড় করে লেখা হোল যাতে সব কয়টা শব্দ নিয়ে একটা বাক্য হয়, যথা 'মাছ জলে থাকে', এই টুক্‌রোগুলো এলোমেলো করে রাখা হোল। শিশুকে এবারে বলতে হবে কাগজের লেখাগুলোকে এমন ভাবে সাজাতে যাতে একটা বাক্য রচিত হয়। এমনিতর অনেক শব্দের খেলা শিশুদের জন্য রচিত হতে পারে।

ছয় বছর বয়সে শিশুর হাতে আসবে একটি 'প্রথম পাঠ'। তাতে যদি সে দেখতে পায় শৈশবের প্রথম পাঁচটি বছরে যে খেলনাগুলির সাথে খেলতে গিয়ে সে ভুলে যেতো খাবার কথা, মায়ের কথা, যে জিনিষগুলি নিজের অনিপুণ হাতে তৈরী করে সে পেতো অপরিসীম আনন্দ, নানা রকমের কল্পনা পরিপূর্ণ খেলা খেলতে গিয়ে যে শব্দ সে ব্যবহার করত, তাদের কথাই বইটিতে সুন্দর ছাপার অক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তখন ভাষা শিখা, অক্ষর শিখা তার কাছে আর কঠিন অবাস্তব বলে প্রতীত হবে না। তার ছাত্র জীবন আনন্দজনক অভিজ্ঞতায় ভরে উঠবে। মায়াময় ছাপার অক্ষরে রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মনের দুয়ার, জ্ঞানের দুয়ার চির উন্মুক্ত হয়ে থাকবে।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯

আহারের পর বিনোদ ঘুমুচ্ছিল, নির্ম্মলা এক একবার এসে দেখে যাচ্ছিলেন। "আহা—একটু ঘুমুক, এখুনি উঠবে।" মেয়েদের গলা কানে যেতেই বিনোদের ঘুম ভেঙে যায়—"বড় পিসিমা" বলে ডাকতেই নির্ম্মলা মুখ ধোবার জল দিলেন।

"ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। দেরি হয়ে গেল—"

"না ছুটো এখনো বাজেনি।"

"ওঁরা বড় ঘরেই বসুন না, কথা শোনবার সুবিধে হবে।"

"আমাদের কথা আর কি শুনবে বাবা, সবই দুঃখের কথা"—বলতে' বলতে' তাঁরা ঘরে ঢুকলেন।

"না পিসিমা, আমি ওকথা বলি না। যারা দুঃখ পেলে না—ভাল খেলে পরলে, আমোদ করলে, হেসে খেলে চলে গেল, তারা যে কেন এসেছিল বুঝতে পারি না। কোনো অভাব নেই—করবারও কিছু নেই। হাবাতে বন্ধুই তাদের জোটে, ভালো লোক পায় না। "খোসামুদে" বলে মিছে

বদনাম নিতে কে ভাল লোক তাদের বাড়ী যাবে? জড়-পদার্থের অন্ত এক পিঠের মর্ত। জগতে তারা করলে কি, জানলে কি, শিখলে কি, পেলে কি?"—

—"ওতে কারো কারো সুখ থাকতে পারে, আর তা আমাদের মত অলস জাতের মধ্যেই বেশী। তার সঙ্গে আমরা নিজেদের অবস্থা তুলনা করতে গিয়েই বোধ হয় বেশী কষ্ট ভোগ করি। আবার যখন সাঁওতালদের দিকে তাকাই—যারা খেটে খায়, তাদের হাসি খুশি, নাচগান ও স্বাস্থ্য দেখে হিংসে হয়। ও নিয়ে বেশী ভেবে আর হতাশ হয়ে কোনো ফল নেই, কেবল মনকে কষ্ট দিয়ে—অসুখী হওয়া। তবে এ বলছি না যে দুঃখকে ডেকে এনে ইচ্ছে করে কেউ কষ্ট পাক বা পাই।"

একজন বললেন—"কি সুন্দর কথাই শুনছি—সব ঠিক্ ঠিক—শুনলে মনে সাহস আর বল আসে!"

নির্ম্মলা বললেন—তোমাকেও দুটো কথা শোনাই। এই উষা বসে রয়েছে। বড় ঘরের মেয়ে, পড়েছিলও বড় ঘরে। নিঃসন্তান অবস্থাতেই কপাল পোড়ে, বয়স তখন তিরিশ হবে। মাস কয়েক পরে বড়বউ স্বামীকে বললেন "ছোট বউ একবার বাপ মাকে দেখতে যেতে চায়।" ভাসুর বললেন—"তা একবার যাবেন বইকি, আমাদের আপত্তি নেই।" বড় বউ বলেন—"আমি তোমাকে আগেই বলতুম, কিন্তু ছোট বউ ও-সম্বন্ধে কিছু বলে না দেখে বুঝেছিলুম, কোনো গোপন কারণ থাকতে পারে, সেস্থলে জেদ করা আমার উচিত নয়। ছেলেমানুষ, এইটাই তো হল ওর নিজ বাড়ী—তুমি রয়েছ, ওর নিজের যা আছে—গয়না টাকাকড়ি বাক্সে বন্ধ করে তোমার কাছে রেখে গেলেই হবে, তার তরে ভাবনার কি আছে? বাপ-মার কাছে গিয়ে কিছুদিন থেকে মনটা শান্ত করে আসাই তো উচিত। কিন্তু মেয়েদের যে কতরকম জ্বালা তোমরা কি বুঝবে? এখন বাইরে থেকে মেয়েদের কানে আসছে—"এ অবস্থায় ছোট-বউকে একবার তার বাপ-মার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া কি ওঁদের উচিত ছিল না? বেচারী যে কি অবস্থায় আছে, অপরে কি বুঝবে! অর্থাৎ আমরা—"অপর"। তুমি কালই ব্যবস্থা করে পাঠিয়ে দাও, কিছুদিন বাপমার কাছে থেকে আসুক।" বড় বউয়ের কথাগুলো সব নিজের কথাই ছিল, উষা একটি কথাও কয়নি। তার নিজের হাজার দুই টাকা আর হাজার দেড়েকের গহনা ভাসুরের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বাপের বাড়ী চলে যায়। কেউ খোঁজ নেন না দেখে বছর দেড়েক পরে নিজেই চলে' আসে। তখন শ্বশুরবাড়ীর আর পূর্ব্বভাব নেই। বড় বউ একদিন বলেন—"বসে বসে কেবল মন খারাপ করা বই তো নয়, মেয়েদের যা কাজ—রান্নাবাড়া নিয়ে থাকাই ভাল, মিছে একটা রাঁধুনী রাখা আর কেন?" রাঁধুনীকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়। তার দিন কতক পরে ছোট বউয়ের সামনেই স্বামীকে বলেন—"ওর টাকাকড়ি যা আছে সেগুলো সুদে খাটানোই ভালো নয় কি? ওর তো এখন ওই সম্বল—বাড়ুক না!" ও আর কি বলবে—"ভাসুর যা ভাল ভাবেন করুন" ছাড়া একটি কথাও কইতে পারে নি। বছর সাতেক টাকার কথা কারুর মুখে আসে নি—সে সুদেই বাড়ে! বাপ-মাও ইতিমধ্যে মারা যান। উষার জগৎ অন্ধকার। আরো বছর কয়েক রান্নাবাড়া চলে। ক্রমশঃ চাপ বাড়তেই থাকে। ম্যালেরিয়া ধরে, কাজও করতে হয়, কারণ ম্যালেরিয়া আবার অসুখ নাকি! কার না আছে। পরে শয্যাশায়ী। তখন একজন ডাক্তার ডাকা হয়। তিনি বলেন—"রোগ যে এখন কঠিন দাঁড়িয়েছে, কোথাও পাঠাতে হবে, অনেক আগেই উচিত ছিল। দেখছিলেন কে?" ইত্যাদি।

বড় বউ মুখ বেঁকিয়ে বলেন—"ম্যালেরিয়ায় আবার দেখবে কে, খুব ডাক্তার এনেছ তো! এখন আমি যা বলি কর, দুবেলা ওঁর সাবু রাঁধতে আর পারি না, রাঁধুনীকে ডাকো। নগেনদের বাড়ীর সব কাশী যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে ওকে কাশী পাঠিয়ে দাও। জায়গা বদলালে উপকারও হতে পারে। ওর তো টাকা রয়েছে ভাবনা কি; যতদিন না সারে—মাসে মাসে ৭।৮ টাকা করে পাঠিয়ে দিলেই হবে। সারলে আসবে। বিদেশে থাকা—গয়নাগাটি সঙ্গে নেবার দরকার নেই; যেমন আছে থাক। আর টাকার সুদ থেকে সেখানকার খরচ চলবে, কম পড়ে তুমি দেবে। ইত্যাদি।

করাও হ'ল তাই; সেটা বছর চারেকের কথা। তাঁদের হিসেব মত মাস সাতেক ছটাকা করে এসেও ছিল, তাতে চলে না। আজকাল ৮।১০ টাকাতেও কষ্টে চলে। কাকে জানাবে, আর জানিয়েই বা ফল কি? আগে

আগে অনেক লিখেছে, এখন জবাবও দেয় না। সর্ব্বস্ব খুইয়ে উষা এখন—আর কি বলবো? বুঝতেই পারছো—

বিনোদ সদ্য আগতের মত বলে উঠলো—"না পিসিমা—আর বলবেন না। নিজেদের জাতের, নিজেদের ঘরের কথা আর শুনতে চাই না। কি পাপে ভগবান আমাদের প্রতি এমন বিরূপ হলেন! কোন্ অপরাধে আমরা এমন অধঃপতিত হলুম—নীচ ও হীন বুদ্ধির আশ্রয় নিলুম। যে ভারতের এত মাহাত্ম্য শুনি বোধ করি এটা সে ভারত নয়। মহাপাপ হয়ে থাকবে, না হলে ভগবান দেখেন না! থাক্ আর শোনাবেন না মা।"

"না, আমিও আর শোনাচ্ছি না বাবা। কেবল বলে রাখি, যাঁরা আজ উপস্থিত, সকলেরি সমান দশা, সকলেই ভদ্রঘরের মেয়ে নানা অছিলায়, কাশীবাসের লোভ দেখিয়ে, আত্মীয়েরা বা পাষণ্ডেরা এই পাপ করেছে, যা কিছু সামান্য ছিল নিয়েওছে। বেশ জানে তাদের সঙ্গে মেয়েরা কি আর মামলা মকর্দ্দমা করতে আসবে। কিছুদিন কিছু কিছু পাঠিয়ে সব চুপ। কেউ কেউ দয়া করে বলে থাকেন—সব চুরি হয়ে গেছে, আমরাই খেতে পাচ্ছি না, ইত্যাদি অনেক কথা। কি আর শুনবে, তফাৎ কেবল—অনাথাদের তাড়াবার রকম রকম ফিকিরফন্দিতে।"

বিনোদ বলে—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ওঁদের বলছি না। এখানে মহাপ্রাণ লোকদের অনেকগুলি ছত্রের কথা শুনেছিলুম, সে বুঝি মেয়েদের জন্যে নয়?"

"আমি ঠিক জানি না, মেয়েদের জন্যে নয় বোধ হয়। আর সে কথাই বা কেন, এখন অক্ষম পুরুষেও খেতে পায় না। দেশ থেকে যত সব নিষ্কর্ম্মা আত্মীয়েরা ও বন্ধুবান্ধবেরা এসে পড়েছে—তারাই খায়, আর আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। যাদের জন্যে দাতারা করে গিয়েছিলেন, শুনতে পাই তারা কেউ ঢুকতে পায় না।"

বিনোদ একটি নিশ্বাস ফেলে বললে—থাক মা, আর নয়। শুনেছিলুম কাশীতে মলেই মুক্তি। কথাটায় বড় বিশ্বাস হ'ত না, আজ আমার সে সন্দেহ গেল। বুঝলুম ওর চেয়ে সত্যি কথা আর নেই। ওটা কেবল অনাথা, উপায়হীনা বিধবারের জন্যে। যাঁরা এই সত্যটা প্রকাশ করেছেন তাঁরা ও-কথার সঙ্গে ধর্ম্মের নেকামী একটুও রাখেন নি। পেটেই জানিয়ে দিয়েছেন—"তারা মুক্তি পায়, মানে—মরে বাঁচে। অর্থাৎ জোচ্চোরদের দ্বারা বঞ্চিতা উপায়হীনা বিপন্না বিধবারা মলেই বেঁচে যান। সেই তাঁদের মুক্তি।"

সকলে একস্বরে বলে উঠলেন—"খুব সত্যি, খুব সত্যি, ওর চেয়ে আর সত্যি নেই বাবা।"

নির্ম্মলা বললেন—"তুমি ওই যে কাজকর্ম্মের কথা কইলে, ওদের সেদিনও আর নেই যে বাবা, এখন আর কি করবে। চরকা কাটাতেও পয়সার দরকার—কোথা পাবে? কে এনে দেবে—কে সাহায্য করবে—উদ্‌যোগী লোকও তো চাই। ওই যে মুক্তির কথা বললে, তাছাড়া সবদিকই যে তাদের অন্ধকার।"

"আমি ওঁদের কথা বলছিলুম না। আচ্ছা এখন সব কীর্ত্তন শুনতে যান, সময় হয়েছে। বাবা বিশ্বনাথ ঘুমুচ্ছেন না, একটা কিছু করে দেবেনই—এ বিশ্বাস আমার আছে। আমিও উঠি; শঙ্কটমোচনকে একবার দেখে আসি।"

"সেই ভাল কথা। চা হয়ে গেছে, খেয়ে যাও।" বলে' নির্ম্মলা হাসলেন। সকলে বিনোদকে আশীর্ব্বাদ করতে করতে উঠলেন; বিনোদও বেরুলো। মাথায় চিন্তার পাহাড়।

সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথের গলির হালোয়াইদের দোকানের গরম গরম কচুরি, তরকারি আর জিলিপি খায়; বেশ লাগে। পরে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়ে। সকালে সেবাশ্রমে আর গঙ্গার ঘাটে জলতোলার কাজ চলে। চিন্তা তো সর্ব্বক্ষণের সঙ্গী আছেই।

দিন দিন ফেরবার দিনও সন্নিকট হয়ে আসে। পিসির দেখাশোনাও একপ্রকার শেষ হয়েছে। নির্ম্মলার হাসি-খুশিও কমে আসছে। এত স্নেহ-যত্নের পর বিনোদ চোখোচোখি আর করতে পারে না।

মেয়েরা নিত্যই আসেন, তাঁরা যেন আপনজন পেয়েছেন। বিনোদ সযত্নে তাঁদের সকল কথাই শোনেন; সান্ত্বনার কথা কন। তাঁদের মনের মত গল্লাদিও করেন। যাবার কথা শুনে নির্ম্মলার মত তাঁরাও বেদনা-বিধুরা।

বিনোদ পিসিকে নিয়ে আজ ফিরবে। সকালে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনান্তে, সেবাশ্রমে দেখাশোনা করে। ঘাটে বৃদ্ধাদের জল তুলে দিয়ে বন্ধুবাড়ী বিদায় নিয়ে নির্ম্মলার

বাসায় ফিরে দেখে বিধবাদের ভীড়। সকলেই শোক-বিমর্ষ, চক্ষু জলভারাক্রান্ত। কারো মুখে কথা নেই। বিনোদই কেবল কথা কইলে—"বাবা বিশ্বনাথের পাদপদ্মে থাকুন; যা জানাবার তাঁকেই জানাবেন—কারো মন্দটা মনে রাখবেন না। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।" একটু হাসি টেনে বললে—আমার কথাটাও জানাতে ভুলবেন না, মনে রাখবেন আমি আপনাদের একজন। একটু সুবিধা করতে পারলেই আসবো। ছেলের কথা শুনুন—এখানে দাঁড়িয়ে আর কষ্ট পাবেন না। তাতে আমাকেও কষ্ট দেওয়া হবে, মন চঞ্চল হবে—কোনো কাজ করতে পারব না। আমার বড় পিসিমাকেও দেখবেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদই আমার সম্বল, এখন বিদায় দিন—বলে মাটিতে মাথা ঠ্যাকালে।

যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে চোখ মুছতে মুছতে বাসায় ফিরলেন। পা আর ওঠে না—

জিনিসপত্তর গুছিয়ে, আগারাদি শেষ করে, বিনোদ নির্ম্মলার কাছে গিয়ে বসলেন—"পিসিমা—এই যাতায়াতই চিরদিন, আমারই কি যেতে ইচ্ছে করছে, কি করব চাকরি করি, যেতেই হবে। সেখানে আমিও একটু বিপন্ন, নইলে আরো দিন কতক থাকতুম। বোধ করি শীঘ্রই ফিরবো। কথাবার্ত্তায় ওঁদের সান্ত্বনা দেবেন। আর এই সামান্য কিছু আপনার কাছে রাখুন, যেমন বুঝবেন—নিতান্ত আবশ্যকে ও থেকে ওদের কিছু কিছু দেবেন।"

এই বলে কয়েকখানি নোট তাঁর হাতে দিলেন। "আবার দেখা হবে—এখন আশীর্ব্বাদ করুন" ব'লে প্রণাম করলেন। নির্ম্মলা মঙ্গলঘট পেতেই রেখেছিলেন। প্রণাম করে পিসিমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কারো মুখে কথা নেই, ট্রেণ ছেড়ে দিলে পিসি কেবল বললেন—"যেতে ইচ্ছে করছে না বাবা, নির্ম্মলার তরে প্রাণ কেমন করছে।"

তা করবে বই কি—কি স্নেহ, কি আদর যত্ন, কি কথাবার্ত্তা, তেমনি বুদ্ধিমতী। কেবল বললেন—

"আবার এসো।"

"সে কি আর আমার ভাগ্যে আছে বাবা!"

"আছে আছে। পোলের ওপর গাড়ী চলেছে, এইবার কাশীর শোভাটা ভাল করে দেখে নাও।" তার পর উভয়েই নিশ্বাস ফেলে নীরব হলেন।

মোগল-সরায়ে পিসিমাকে মেয়েদের গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে নিজে অন্য কামরায় গিয়ে বসলেন। "কোনো ভয় নেই—আমি কাছেই আছি, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ কর'—বাঙালী মেয়েরাও আছেন।"

বিনোদের এইবার নিজের চিন্তার পালা। ফিরে গিয়েই বোধ হয় মামলা মুখিয়ে আছে—শুনতে হবে। কাশীতে সে চিন্তা মাথায় ঘেঁশবার অবকাশ পায় নি। বাসায় দু'জন বিধবা পিসি, তাঁরাই সেটা থামিয়ে রাখতেন। তাঁদের দুস্থ পরিচিতারা reminderএর মত নিত্য উপস্থিত হতেন। তাঁদের অন্য কথাইবা কি ছিল। লোক প্রকৃতির বশ, বিনোদ স্বভাবতই দুর্ব্বল প্রকৃতির, একলা থাকলেও তাদের দুরবস্থার কথাই তাকে পেয়ে থাকতো। কি উপায়ে তারা সহজে একবেলা খেতে পায়। আজ তাদের ফেলে চলেছে। সে চিন্তার কামড় কমলেও, কিছুটা আছে বইকি। সেই হতভাগা হারই আজ আবার তার সংহারের অস্ত্র হয়ে দাঁড়ালো। "যা হয় মা করবেন, আর সাহেব আছেন।" আবার চিন্তা আসে।

দুর করো—একটা সিগারেটই খাই। পকেটে হাত দিলেন। পরক্ষণেই হেসে—সিগারেট কোথায়? মাণিকও নেই। কেমন আছে কে জানে। এসে গিয়ে থাকবে না এসে থাকে তো—ওরে বাবা! পাগল হ'তে হবে সে না থাকলে আমার…

গাড়ী একটা ছোট ষ্টেসনে থামতেই—দূরে "পান বিড়ি সিগারেট" কানে এল। গাড়ী থেকে মুখ বার করে ডাকতে না ডাকতেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল। একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক প্ল্যাটফর্ম্মে নেবেছিলেন—নমস্কার করে বললেন—"কেনবার সময় পাবেন না—মোশন দিচ্ছে আগেই দিলদারনগর সেইখানেই পাবেন" বলেই ছুটে নিজের কামরায় উঠে পড়লেন।

বিনোদ অবাক। কি ভদ্র ব্যবহার, নমস্কার না করে কথা কইলেন না। এটা প্রায় সব জাতেরই আছে, কেবল আমাদের মধ্যে বড় দেখতে পাই না। লোকটি বাংলা কি কি সুন্দর বললেন, উচ্চারণ দোষও নেই। ষ্টেসনের কি মিষ্টি নামটি বললেন—হ্যাঁ—"দিলদারনগর", কি মধু

শুনতে। আমরা সাহিত্য সাহিত্য করে মরি, আর গর্ব্ব করি, ষ্টেসনের নাম দিয়েছি ভূতছাড়া, ঘুশকরা।

পাঞ্জাবীদের পোষাক দেখলে নিজেদের উলঙ্গ বলে বোধ হয়। ওরা নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে—কোমরে কৃপাণ রয়েছে, হাতে লোহার কড়াটা পর্য্যন্ত রেখেছে। আজো গুরুগোবিন্দের হুকুম মেনে চলে। আমরা ইংরিজি-পড়োরা ওটা অভদ্রতা বলে আগেই দূর করতুম। ব্যবহার কিন্তু সুন্দর। গাড়ীর মোসন কমেছে, এইবার বোধ হয় সেই সুশ্রাব্য ষ্টেসনটি। কি নগর বললেন—হ্যাঁ, দিলদার নগর, খাসা নাম।

"মাণিক মুখ খারাপ করে দিয়েছে, Gold Flake নিশ্চয়ই ভেঙে ব্যাচে না।"

গাড়ী না থামতেই পাঞ্জাবী এসে হাজির। "নিন, নাবুন—সঙ্গে কি আছে দিন। ওই স্যুটকেসটা আর বিছানা বুঝি? সরুন আমি নিচ্ছি—আমি একটা 'কুপে' একলা যাচ্ছি—দু'জনে কথা কইতে কইতে বেশ যাওয়া যাবে।"

বিনোদের ভ্যাবাচাকা লেগে গেল। "করছেন কি, আমার সঙ্গে—" হ্যাঁ আমি জানি "যান মেয়েদের গাড়ীতে দেখা করে আসুন।" বলে' বিনোদের জিনিসপত্তর নিয়ে 'কুপে' গিয়ে রাখলেন। বিনোদ অগত্যা পিসির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ফিরে এসে—"আমার তো ও টিকিট নয়"।

"ওটা পুরো আমার, আসুন। কিছু খাবেন কি?" —"না এই তো খেয়ে আসছি।"

"পিসির অত কাঁদাকাটির মধ্যে সে কি আর খাওয়া হ'য়েছে!"

বিনোদ চমকে গেল—ভয়ও পেলে—"কার হাতে পড়লুম?" ভদ্রলোক বুঝতে পেরে, একটু হাসি টেনে বললেন—"ভয় নেই, চিনতে পারলেন না!—আমি আপনাদের যুধিষ্ঠির।"

"সে কি, না—আমি এখনও চিনতে পারছি না—"

"তবে ঠিক হয়েছে, তা নাতো ওরা আমাকে রাখবে কেন?"

"আমি কিছু বুঝতেও পারছি না, চিনতেও পারছি না।" 'বলছি' বলে হঠাৎ উঠে ল্যাভেটারির দোরটা খুলে—ভেতরটা ভাল করে দেখে, আবার বন্ধ করে দিয়ে পাগড়ী, দাড়ি, গোঁফ, চুল খুলতে খুলতে বললে—"এইবার তো চিনতে পারবেন?"

বিনোদ দেখে স্তম্ভিত। "একি, কোথায় গিয়েছিলে, মাথা মুড়ুলে কেন?"

"প্রয়াগে মাথা মুড়ুতে গিয়েছিলুম"—বলে যুধিষ্ঠির হাসলে।

"এখন চিনতে পেরেছি বটে, কিন্তু বুঝতে পারছি না। খুলে বলতে আপত্তি নিশ্চয়ই থাকতে পারে। আমি বিস্তারিত শুনতেও চাই না, মোটামুটি বলতে চাও—বলো। পিসিদের কথা পর্য্যন্ত যখন জান, ব্যাপারটা আমার উদ্দেশ্যেই হবে—কাজ নেই শুনব না, থাক।"

আপনাকে ধরাটা যে আমার নিজের উদ্দেশ্য। কাশীতে আজ তিনদিন আপনার পেছনেই বেড়াচ্ছি! কথা কবার সুযোগ পাইনি।

"আমি তো পথে পথেই একা ঘুরি, আমার সঙ্গে তো কেউ থাকে না।"

যুধিষ্ঠির হাসতে হাসতে বললে—"আমার পেছনে যে থাকে।"

বিনোদ শিউরে উঠলো—"কেন, সে আবার কে?"

"এই আপনার পশ্চাতে যেমন আমি।"

"না যুধিষ্ঠির, আর শুনিও না, তুমি বিশ্বাসঘাতক হয়ো না। থাক। মাণিকলাল ফিরেছে কি?"

"এক সপ্তাহের বেশী হবে আমি বেরিয়েছি, দেখে আসিনি। কই আপনি সিগারেট খেলেন না?"

বিনোদ হেসে বললে—"আমার দিয়েশলাই নেই।"

"অভাব কি" বলে যুধিষ্ঠির পকেট থেকে দিয়েশলাই বার করে দিলে। আগে দুটো খান, পরে কথা হবে।

"না যুধিষ্ঠির—যা আমাকে নিয়ে—তা আর নয়।"

"বেশ, আপনি সিগারেট তো খান। পরে আমি নিজের কথা আর অন্য কথাই কইব। গল্পের মতই শুনবেন। জগতে দিনরাত কত কাণ্ডই চলছে, সম্প্রতি এ দেশেও, তা জানতে আর ক্ষতি কি, পথের দৌড়টাও কমবে, সময়ও কাটবে। মনটাকে মিছে চিন্তায় ফেলে রেখে কোনো লাভ নেই। পনের আনার বেশী মিথ্যা নিয়েই তো জগতটা চলে!"

বিনোদ বাইরের দিকে মুখ করেই সিগারেট টানছিল। একটা শেষ হতেই বললে—"খুব খাওয়া হয়েছে, এখন আর নয় যুধিষ্ঠির।

"বেশ পরেই খাবেন। আগে আমার কথাটাই বলি। বিশ্বাস করবেন—আমি এখন আপনাকে পিতা, গুরু বা দেবতার মতই পেয়েছি ও জেনেছি। 'এখন' কথাটা বললুম,তার কারণ—আগে অনেক প্রকারে পরীক্ষা করেছি, রোগীদেরও ঘরে ঘরে বেড়িয়ে অনুসন্ধান করেছি, বিপক্ষে কিছুই পাইনি। না পেলে বানাতে হয়, সেটা বড়দের কাজ। আমি পারলে এতদিনে আমিও বড় হতুম—তা পারিনি। কঠিন কাজ নয়। জানি না কে করতে দিত না—আপনাকে সামনে দেখতুম।"

"বড় কাদের বলচো?—না থাক, শুনতে চাই না।"

আমি নিজের কথাই গল্প করছি। আমাকে যে আমার সব কথা বলতেই হবে—গল্প শুনবেন বইতো নয়—বলে হাসলে।

বয়স আমার তখন ১৫।১৬, ছিলুম ডানপিটে, শক্তি অসীম। জাতে আমরা সত্যিকার স্বর্ণকার। বাবার দোকানে কাজ করি। কাজের হাত আমার বরাবর ভাল। বাবার কাছে কারা সব রাতে আসতো। সোনা, রূপো, জহরৎ, সোনার গহনা, বাসন—এই সব বেচতে আসতো। বাবা আমায় ছুটি দিতেন, আমি লুকিয়ে দেখতুম—শুনতুম। তারা বেরুলে সঙ্গ নিতুম। তাদের হাতে মুঠো মুঠো টাকা। বলতো—দেখছিস, দুদিন পরে মোটরে বেড়াবি। মজুরি করে আর এই ঠুক্ ঠাক্ করে, দুঃখার মত দুটি ডাল ভাত মেরে সারাজীবন কাটাতে হবে না। তারা আমার শরীর আর স্বভাব দেখে লোভে পড়েছিল, আমিও তাদের টাকা দেখে লোভে পড়েছিলুম! বয়স যখন ১৯।২০ তখন বড় কারিগর হয়েছি। বাবা মারা গেলেন। আমারও সেকরার কাজ আর ভাল লাগছিল না,—নতুন কিছু খোলবার নেই। দেখবার মত দোকানখানা রইল কেবল। তারাও আসে যায়, সে কাজও চলে। শেষ তারাই টানলে, তাদের সঙ্গে মিশে পড়লুম।

"থাক্—আর নাইবা শুনলুম যুধিষ্ঠির!"

"দয়া করে শুনুন, আপনাকে বলা আমার বিশেষ দরকার, তাতে আমার উপকার আছে, আমি শান্তি পাব। আপনি একবার পিসিমার খবর নিয়ে আসুন।"

"ঠিক বলেছ, ভুলে গিয়েছিলাম।" গাড়ী একটা ষ্টেশনে থামতেই বিনোদ নেবে গেল। ফিরে এলে যুধিষ্ঠির আরম্ভ করলে।

জাতীয়তার ক্ষেত্রে স্বামী প্রণবানন্দের ভবিষ্যদ্দৃষ্টি

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পিএইচ-ডি

বর্ষ-চক্রের আবর্ত্তনে শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর জন্মতিথি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। এই উপলক্ষে আবার আমরা এই মহাপুরুষের জীবনী ও কার্য্যকলাপের পুনরালোচনার সুবিধা পাইলাম। বাঙ্গালার আকাশ-বাতাসে আজ যে প্রলয়দুর্যোগপূর্ণ ঝঞ্ঝাবাত ঘনাইয়া আসিয়াছে, সেই সঙ্কটময় প্রতিবেশে স্বামীজির অদ্ভুত দূরদৃষ্টি ও সংগঠনপ্রতিভা, কালো নিকষে স্বর্ণাভার ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে বিপদ আজ আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত, তিনি প্রায় শতাব্দীর একপাদ পূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বাভাস পাইয়া আমাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ দিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আশ্চর্য্য সংগঠনী-প্রতিভার বলে তাহার আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী একদল সর্ব্বত্যাগী সজ্ঘ-কর্ম্মী গঠন করিয়া গিয়াছেন। আজ আমাদের মধ্যে যাহারা অবিশ্বাসী ও আত্মকেন্দ্রিক, তাহারাও এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। জীবন মরণ সংগ্রামের আগতপ্রায় সর্ব্বনাশের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুর আজ বিলম্বিত উপলব্ধি জাগিয়াছে যে, ঐক্য ও ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন ব্যতীত তাহার আর বাঁচিবার উপায় নাই। মৃদু সস্নেহ অনুযোগে উদ্দীপনাময় প্রচার-কার্য্যে ও আত্মোপলব্ধির মন্থর প্রক্রিয়ায় যে সত্য আমাদের মনে পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে নাই, আকস্মিক বজ্রপাতের তীব্র অগ্নিরেখায় তাহা স্বতঃসিদ্ধের মত প্রতিভাত হইয়াছে। ভবিষ্যতের অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া যাঁহার দিব্যদৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছিল ও যিনি তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে মোহাচ্ছন্ন দেশবাসীর মনে পৌঁছাইয়া দিবার গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ দুর্দ্দিনে তাঁহার নিকট শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে মস্তক অবলুণ্ঠিত হয়।

তত্ত্ব হিসাবে স্বামীজির বাণীর মধ্যে যে বিশেষ চমকপ্রদ বেশী কিছু আছে তাহা দাবী করা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের যে বিশুদ্ধ, অবিকৃত সারাংশ তাহাই তিনি যুগ প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া আমাদের নিকট ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রধান সমস্যা কোন নূতন আবিষ্কার নহে, সনাতনের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্যটিকে নূতন করিয়া অনুভব করা, তাহা হইতে জীবনযাপনের নূতন প্রেরণা আহরণ করা। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র প্রণেতারা—বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদের পর আর নূতন তত্ত্ব প্রচারের কোন অবসর নাই। আধুনিক ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রধান কর্ত্তব্য ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠানের পুঞ্জীভূত প্রাচুর্য্যের চাপ হইতে ইহার আদিম প্রাণস্পন্দনটীর উদ্ধারসাধন ও ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনের বিচ্ছিন্নতার পুনঃসংযোগ স্থাপন। ধর্ম্মবোধের উন্নতি-অবনতি, স্ফূর্ত্তি জড়তা যেন একই মূলীভূত কারণের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একদিকে বহিরনুষ্ঠান ও পূজা-বিধির মধ্য দিয়াই ইহা প্রচারিত ও সাধারণের বোধগম্য হয়, অন্যদিকে এই পূজোপকরণের প্রাচুর্য্যই ইহার প্রাণশক্তিকে ক্ষীণ করিয়া আনে। ধূপ দীপ নৈবেদ্য, পুষ্প-বিল্বপত্র ও মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা দেবতাকে আবাহন করা হয়, তাহাদেরই অন্তরালে তিনি পূজকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে আত্মগোপন করেন। তাঁহাকে পাইবার যে পথ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট, সেই পথে চলার নেশাতেই আমরা গন্তব্য স্থানের চরম লক্ষ্যের কথা ভুলিয়া যাই। ভগবানের জন্য যে অভ্রভেদী মন্দির রচিত হইয়াছে, তাহারই বিপুল, নিবিড় ছায়ায় তাঁহার সত্বা নিদ্রা জড়িমায় অভিভূত হইয়া পড়ে। অরূপ হইতে রূপ, ধ্যান হইতে মূর্ত্তি, সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে যাতায়াতের মধ্যে ধর্ম্মের আদিম, বলিষ্ঠ প্রেরণা ধীরে ধীরে নিস্তরঙ্গ নদীর ন্যায় প্রাণবেগ ও স্রোতো চাঞ্চল্য হারায়। ধর্ম্মের এই উভয়বিধ প্রকাশের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষাই ধর্ম্মজীবনের প্রধান সমস্যা।

সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি সূর্য্যমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া আমরা দুই চক্ষু ভরিয়া গ্রহণ করিতে পারি না—সামাজিক বায়ুস্তরে উহার বিচ্ছুরিত আলোক বা কাচাধারের মধ্য দিয়া উহার মৃদুতর প্রতিবিম্বই আমাদের গ্রহণ শক্তির উপযোগী। আধুনিক সমাজে ধর্ম্মের আধিপত্য নানা বিরোধী ভাবের প্রতিকূলতায় মণ্ডিত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বতন যুগে যে ত্যাগের

স্বামী প্রণবানন্দ

ব্যক্তি-জীবনে ধর্ম্মের কার্য্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে সমাজ প্রতিবেশের প্রভাবের উপর। সমাজে যদি ধর্ম্মবোধের বায়ুপ্রবাহ সচল থাকে, তবে তাহার জীবনীশক্তি ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামিত হয়। প্রত্যক্ষ ধর্ম্মবোধ স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিরূপে খুব কম লোকেরই অধিগত হয়। সমাজ ও গুরুর প্রভাব মুখ্যতঃ সাধারণ মানুষকে তাহার ধর্ম্মপ্রেরণা যোগায়। আদর্শ, ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবনের যে পবিত্র উদাহরণ, নানা পূজাপার্ব্বণ ও উৎসব সমারোহের ভিতর দিয়া ধর্ম্মের অবশ্য-পালনীয়তা সম্বন্ধে যে প্রচার ও অনুশাসন ধর্ম্মজীবনে অনগ্রসর জনসাধারণের মনে ধর্ম্মবিশ্বাসকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিত এখন সমাজের সেই সর্ব্বাঙ্গীণ ধর্ম্মাভিমুখিতা আর নাই। যে সমস্ত যুগে রাজারা রাজ্যপদ পরিত্যাগ

করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন, ধনীসম্প্রদায় উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ ধর্ম্মের জন্য ব্যয় করিতেন, কথকতা-পাঁচালী-কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ঘোষণার সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা ছিল, সেই সমস্ত যুগের জনসাধারণ ধর্ম্মের উচ্চতর আদর্শ আয়ত্ত ও জীবনে প্রতিফলিত করিতে পর্য্যাপ্ত সুযোগ পাইত। বুদ্ধের সংসার ত্যাগ হইতে লালাবাবুর সন্ন্যাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত ধর্ম্মসাধনার একটি অক্ষুণ্ণ ধারা সুদূর ও সদ্য-অতিক্রান্ত অতীতের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করিয়া দেশের নিকট ত্যাগ ও বৈরাগ্যের চিরন্তন মহিমা ঘোষণা করিয়াছে। অশোকের শিলালিপি হইতে দাশু রায়ের পাঁচালী পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রচারের একই প্রচেষ্টা সহস্র বর্ষের ব্যবধানের উপর আদর্শের স্বর্ণ সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে। ঐতিহ্য গৌরবের এই স্রোতস্বতীতে কত অজ্ঞাত ইতিহাসের অপরিচিত যোগীভক্ত-সাধক নিজ নিজ ক্ষুদ্র জীবনের ধর্ম্মসাধনার নির্ঝর ধারা মিশাইয়াছে। ভাগীরথী তীরের অধিবাসীরা যেমন গঙ্গার সান্নিধ্য হেতুই একপ্রকার সহজ সংস্কার-জাত ধর্ম্মবোধের অধিকারী হয়, সেইরূপ এই যুগ যুগান্তর ধরিয়া প্রবাহিত পুণ্য সংস্কৃতি ধারাও চারিদিকের চিত্ত ক্ষেত্রকে সরস ও অধ্যাত্মবোধের অঙ্কুরোদ্গমের জন্য প্রস্তুত করিয়া অসীমের সাগরসঙ্গমাভিমুখে ছুটিয়াছে।

আধুনিক যুগে ধর্ম্মবোধের আপেক্ষিক ক্ষীণতার আর একটি কারণ ইতিহাসের অনিবার্য্য বিবর্ত্তন ধারার সহিত সংশ্লিষ্ট। শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজ চেতনার ক্রমপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবোধের তীক্ষ্ণতা হ্রাস পাইয়া বৈশিষ্ট্যবিহীন নৈতিকতায় রূপান্তরিত হয়। Religion হইতে moralityর উদ্ভব ধর্ম্মনীতিশাস্ত্রের আলোচনার একটি সুপরিচিত বিষয়। আকাশের চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎশিখা যেমন যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে কাচাধারে সুরক্ষিত স্নিগ্ধ দীপের আকার ধারণ করে, তেমনি ধর্ম্মের উগ্র সর্ব্বব্যাপী উপলব্ধি ক্রমশঃ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও জনহিতৈষণার মৃদু, নিরুত্তাপ ধারণায় পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সূর্য্য মেঘাচ্ছন্ন হইলে যেমন চাপা, ধূসর আলো পৃথিবীর উপর বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ প্রত্যক্ষ ঐশী অনুভূতি অন্তরায়িত হইলে বিবেকের মধ্য দিয়া প্রতিফলিত নীতিজ্ঞানের নাতিপ্রখর রশ্মি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথপ্রদর্শক হয়। এই নীতিজ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বরবিশ্বাস নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী হয়; নাস্তিকের মনেও ইহা ক্রিয়াশীল। কিন্তু এই আস্তিক্যবুদ্ধিবিচ্ছিন্ন নীতি-বোধের, সমতল প্রবাহিনী নদীর মত যে পরিমাণ ব্যাপ্তি ও বিস্তার আছে সে পরিমাণ গভীরতা নাই। ইহা আমাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে প্রণোদিত করিয়া আমাদিগকে ছোটখাট দয়াদাক্ষিণ্যের প্রেরণা যোগায়; কিন্তু গিরিনির্ঝরের প্রচণ্ড গতিবেগ ইহার মধ্যে নাই বলিয়া ইহা কোন দুরূহ অধ্যাত্মসাধনা বা আত্মবিসর্জ্জনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে না। প্রতিবিম্ব গৃহীত আলোকের মত ইহার মধ্যে স্বচ্ছতা আছে, কিন্তু উত্তাপ নাই। কাজেই জীবনের যে সমস্ত ক্ষেত্রে অসাধারণ মানসিক বল বা দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন হয়, সে সব ক্ষেত্রে ইহার প্রেরণাশক্তির অপ্রাচুর্য্য শোচনীয়ভাবে প্রমাণিত হয়। আজ আমাদের অধিকাংশের মনেই ভগবদ্বিশ্বাসের স্থান এই দুর্ব্বল নীতিবোধ অধিকার করিয়াছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্মজীবন এত রিক্ত ও কার্য্যকরীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

এই অবস্থায় আমূল প্রতিকারের কি কোন সম্ভাবনা আছে?—এই প্রশ্ন প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে আবর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে। অতীত যুগের বলিষ্ঠ, দ্বিধাহীন, কর্ম্মতৎপর, ধর্ম্মবিশ্বাসকে কি কোনদিন পুনর্জ্জীবিত করা যাইবে? আজ সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে ধর্ম্মের সে পূর্ব্বতন একচ্ছত্র প্রভাব লুপ্ত হইয়াছে। মধ্যযুগের কাব্য-সাহিত্যে মানুষের ব্যাপারে ঐশী শক্তির পৌনঃপুনিক আবির্ভাবের, ভক্তের আহ্বানে ভগবানের অলৌকিক শক্তি প্রয়োগের, প্রচুর বর্ণনা দ্বারা মুমূর্ষু ধর্ম্মবিশ্বাসকে অক্সিজেন সাহায্যে জীয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। ভগবানের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির কাহিনী শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহার মহিমা ঘোষণার পরিপূরকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই দো-ফলা ছুরির আঘাতে ক্রমবর্দ্ধমান সংশয়-জটিলতার জালকে ছিন্ন করার ব্যবস্থা ছিল। আধুনিক যুগে এইরূপ প্রতিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; জড়বাদ ও বিজ্ঞানের ক্রমপ্রসারশীল অভিভবের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের একান্ত আত্মসংহরণযুক্ত হইয়া মানুষের সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের আভাস-ইঙ্গিতগুলিকে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া দিয়াছে। আজ হয়ত কোন কবি বা ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ইতিহাসের রোমাঞ্চকর সংঘটনের অন্তরালে যুগ পরিবর্ত্তনের বিরাট আয়োজনের মধ্যে ঐশী শক্তির নিগূঢ় রহস্যাচ্ছন্ন ক্রিয়াশীলতার অনুমানমূলক পরিচয় আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই পরোক্ষ অনুভূতি সাধারণের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করে না। যাহারা রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব প্রভৃতি অবতারবৃন্দের পূর্ণাঙ্গ মানবিক পরিচয় পাইতে অভ্যস্ত, তাহারা সুদর্শনার ন্যায় এই আঁধার ঘরের রাজার লুকোচুরি খেলায় বিশেষ সান্ত্বনা ও চিত্তপ্রসাদ লাভ করে না।

এই দুরূহ সমস্যার যদি কোন সমাধান সম্ভব হয়, তবে তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কের পুনঃ স্থাপনা। অবশ্য গত শতাব্দীর মধ্যে এই যোগসাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও তাহাতে সাফল্য লাভের দৃষ্টান্ত মিলে। সাধক রামপ্রসাদ বিশ্বশক্তির মধ্যে যে মাতৃরূপের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়া মাতৃ স্নেহাস্বাদনে উৎসুক শিশুর ন্যায় আদর-আব্দার মান-অভিমানের বিচিত্র খেলায় বিভোর হইয়াছিলেন, অল্পদিন পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মধ্যে সেই মনোভাব আবার নবজীবন লাভ করিয়াছে। রামপ্রসাদে কাব্যসুলভ অতিরঞ্জনের কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে; কিন্তু রামকৃষ্ণদেব তাঁহার ভক্তিবিহ্বল অনুভবকে কাব্যরূপ দিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। তাঁহার এই অলৌকিক অভিজ্ঞতা স্খলিত, অসংলগ্ন উক্তি পরম্পরায় গ্রথিত হইয়া নিজ কার্য্য-নিরপেক্ষ অকৃত্রিমতার অবিসংবাদিত প্রমাণ দিয়াছে। রামকৃষ্ণের এই অন্তরঙ্গ ঐশী উপলব্ধি বিবেকানন্দের মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যবর্গের শাখাপ্রশাখাপথে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার প্রেরণা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ছাড়াইয়া অনেক স্বাধীনভাবে সাধনারত মহাপুরুষকেও প্রভাবিত করিয়া থাকিতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীর নির্জ্জন আশ্রম হইতে তপশ্চর্য্যা ও অধ্যাত্মশক্তি অনুশীলনের ধারাটী জড়বাদের বালুকা-গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টার প্রভাব যে ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। হোমাগ্নির শিখাটী প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহ

হইতে কোনমতে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে ; কিন্তু ইহার ধূম্র সুরভিটা যে আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রাকৃতজনের মধ্যে অলৌকিক জগতের আভাস বিতরণ করিতেছে এরূপ দাবী করা যায় না।

আমাদের অধ্যাত্ম উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের এই যুগব্যাপী প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামী প্রণবানন্দের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইবে। দীর্ঘদিন ধ্যান ধারণা ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া তিনি যে অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহা তিনি আত্মোন্নতির সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ করেন নাই। তিনি নিজ আদর্শে অনুপ্রাণিত ও তাঁহার অধ্যাত্ম শক্তির অংশভাক্ একদল সন্ন্যাসীমণ্ডলীর সৃষ্টি করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের কষ্টি পাথরে তাঁহাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অধ্যাত্মশক্তির জনসেবাকার্য্যে নিয়োগের পরিকল্পনা স্বামী বিবেকানন্দের উদ্ভাবন ; স্বামী প্রণবানন্দ তাঁহার হস্ত হইতে আলোকবর্ত্তিকা গ্রহণ করিয়া আমাদের আধিব্যাধি-পীড়িত জীবনের অন্ধকার বিদূরিত করিতে আরও ব্যাপক ও সার্থক প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিয়াছেন। নরনারায়ণের সেবা মহৎ কার্য্য সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও মহত্তর কার্য্য সেবার প্রয়োজনীয়তার নিরাকরণ। আত্মশক্তির উদ্বোধন হইলে মানুষ পরমুখাপেক্ষিতার গ্লানি হইতে চিরন্তন মুক্তিলাভ করে। বন্যা, মহামারী প্রভৃতি দৈব উৎপাতের উপর মানুষের কোন হাত নাই ; তাহাদের আক্রমণ এত আকস্মিক ও তীব্র হয় যে সহায়তাহীন আত্মনির্ভরশীলতা সব সময় প্রতিকারে সমর্থ হয় না। কিন্তু মানুষের অনুষ্ঠিত অবমাননা দৈবদুর্বিপাকের মত অপ্রত্যাশিত নহে এবং আত্মশক্তিতে ইহার প্রতিরোধ অবশ্য কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত। স্বামীজি হিন্দু সমাজের যে মৌলিক, মজ্জাগত ব্যাধি—ঐক্যের অভাব ও আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস—তাহা বিচক্ষণ চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের ন্যায় অভ্রান্তভাবে ধরিয়াছেন ও সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া এই ব্যাধি প্রশমনের উদ্যোগ করিয়াছেন। তাঁহার হিন্দু মিলন মন্দিরগুলি হিন্দু সমাজের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারের জন্য প্রথম বীজ রোপণ ; এই আদর্শ যদি প্রকৃতভাবে গৃহীত হয়, তবে ইহার মধ্যে মহামহীরুহের সম্ভাবনা নিহিত আছে। আজ চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হাঁপাইতে হাঁপাইতে উদ্‌ভ্রান্ত ব্যস্ততার সহিত যে সংঘবদ্ধতার আয়োজনে ব্রতী হইয়াছেন, স্বামীজি এক যুগ পূর্ব্বেই সেই অবশ্য প্রয়োজনীয় সংগঠন কার্য্যের সূচনা করিয়াছেন। আজ যদি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের এই প্রচেষ্টায় জনসাধারণের সোৎসাহ সমর্থন পান, তবে তাহার কৃতিত্ব অনেকাংশে স্বামীজির প্রাপ্য—তিনিই বিচ্ছিন্ন পরমাণুসমূহের ঐক্যবন্ধনের পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। আজ যদি হিন্দুর ধনমান প্রাণরক্ষায় আমরা লজ্জাকর, শোচনীয় অপ্রস্তুতির পরিচয় দিয়া থাকি তবে সে দোষ আমাদেরই আন্তরিকতার অভাব ও অকর্ম্মণ্যতা হইতে উদ্ভূত। জানি না নোয়াখালির অত্যাচার-প্লাবনে এই মিলন মন্দিরগুলি ভাসিয়া গিয়াছে কি না ; যদি গিয়া থাকে তবে অন্যান্য জেলার অধিবাসীদের এই বিপৎপাতের পুনরাবৃত্তির বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন আশু বিধেয়। হিন্দুর আশ্রয় ও আত্মরক্ষার এই খণ্ড দ্বীপগুলিকে অবিলম্বে প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করিতে হইবে। জানি না ভবিষ্যতে আরও কি অধিকতর ভয়াবহ বিভীষিকা আমাদের ঐতিহ্য গৌরব ও প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর নারীর পবিত্রতাকে বাঁচাইতে হয়, তবে স্বামীজির অভয়মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তিনি আমাদের জন্য যে দুর্গম, কণ্টকাকীর্ণ পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন জাতিবর্ণ- নির্ব্বিশেষে সমস্ত হিন্দুকে সেই পথেই অগ্রসর হইতে হইবে। আজ সমস্ত হিন্দুকে মৃত্যুর ভিতর দিয়া মুক্তির অমৃতত্বে পৌঁছিতে হইবে।

যৌবনের ইন্দ্রজাল

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী

শারদীয়া উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে চারিদিকে। পূজা আগত প্রায়।

হাওড়া ষ্টেশনে বহির্যাত্রীর ভীড় সাধারণত এ সময়টা বাড়ে, এবারেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। ৪নং প্লাটফর্মে বেনারস এক্সপ্রেস খানি গার্ডের ইঙ্গিত অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সশব্দে ধূম-উদ্গার করছে।

এমন সময় একখানি ইণ্টার-ক্লাশের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো বৃদ্ধাস্ত্রী-সহ এক বৃদ্ধ, পিছনে কুলীর মাথায় মোট-ঘাট। কিন্তু বাধা স্বরূপ ঠিক গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক যুবক। বৃদ্ধ বিনীতকণ্ঠে বলিলেন—"বাবা, দরজাটা একটু খুলে দাও।"

যুবক ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—"এখানে যায়গা হবে না—অন্য গাড়ী দেখো।"

বৃদ্ধ কাতরকণ্ঠে বললেন—"ওদিকের সব গাড়ী ভর্ত্তি দেখে এসেছি বাবা।"

কুলী এগিয়ে গিয়ে জোর করে দরজার হাতল খুলতে গেলে যুবক রুখে দাঁড়ালো, বললো—"দেড়া-মাশুলের গাড়ী দেখতা নেই? যাও—ভাগো?"

বৃদ্ধ উত্তর করলেন—"হ্যাঁ বাবা তা জানি, আমাদেরও ইণ্টার ক্লাশের টিকেট।"

যুবক বৃদ্ধের মলিন পোষাক পরিচ্ছদের দিকে চেয়ে অবিশ্বাসের হাসি হাসলো। কিছুক্ষণ পরে এক পশ্চিম দেশীয় ভদ্রলোক ত্রস্তভাবে গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন—তখনও সেই উদ্ধত যুবকটি কুলীর সঙ্গে ঝগড়া করছিলো। নবাগত ভদ্রলোকটি অবস্থা বুঝতে পেরে দরজার হাতল ঘুরিয়ে জোরে ধাক্কা মারলেন। ভদ্রলোকটির স্বাস্থ্যপুষ্ট দেহখানি দেখে যুবক আর বাধা দিতে সাহসী হল না—স্বস্থানে ফিরে গেল। ভদ্রলোক প্রথমে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে গাড়ীতে তুলে দিলেন, পরে নিজে উঠে পড়লেন। গাড়ী বেশ ফাঁকা ছিলো—কয়েকটী যাত্রী বেশ আরাম করেই শুয়েছিলো—যুবক ও তার সঙ্গী একখানি বেঞ্চ দখল করে ব'সে ছিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা গাড়ীতে উঠে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভদ্রলোক মালপত্র গোছগাছ করে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন—আরে বাবুজী, আপনি দাঁড়ায়ে আছেন কেনো—বেঞ্চিতে বসিয়ে পড়ুন। একটা বেঞ্চিতে দুইটী বাবু বসিয়ে আছেন। আরও দুই আদমীর যায়গা হবে।

এবার কিন্তু যুবকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো—বিকৃতমুখে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—বাঃ, আপনি ত দেখছি নবাবের মত হুকুম করছেন মশাই, দেখছেন না আমরা এখানে ব'সে রয়েছি।

ভদ্রলোক যুবকের কথায় কর্ণপাত না ক'রে তাদের বিছানার একটা পাশ সরিয়ে দিয়ে বৃদ্ধাকে বসিয়ে দিলেন। যুবক লাফিয়ে উঠলো, উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এলো ভদ্রলোকের দিকে। তার দিকে চেয়ে ভদ্রলোক হেসে বললেন—"আরে বাবুজী, রাগছেন কেনো? মারামারি করতে চান, এদিকে এগিয়ে আসুন। একটা বেঞ্চিতে ৪ জন বসিবেক। আপনি নবাবী করতে চান, গাড়ী রিজার্ভ করে আরাম করুন। মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে আছেন আর আপনি দিব্যি আরাম করে শুয়ে থাকবেন? কি রকম ভদ্রলোক আপনি।"

ভদ্রলোকের পাণ্টা যুদ্ধং দেহি ভাব দেখে যুবক শেষে সরেই বসলো। বেশী বাড়াবাড়ি করতে সাহস করলো না। বসবার স্থান পেয়ে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। গাড়ীর অন্যান্য যাত্রীরা মুচকী হাসি হাসলো যুবকের দিকে তাকিয়ে।

শ্রীরামপুর ষ্টেশনে ট্রেণ এসে থামল। ভ্যানিটী ব্যাগ হাতে এক যুবতী সেই গাড়ীতে উঠে, সব সিট ভর্তি দেখে নেমে যাচ্ছিলো। পূর্ব পরিচিত যুবকটি তাড়াতাড়ি নিজের সিটের এক অংশে একটু স্থান করে দিয়ে সবিনয়ে যুবতীকে বসতে অনুরোধ জানালো। যুবতী প্রথমটা একটু ইতঃস্তত করে শেষে বসে পড়লো।

যুবক জিজ্ঞাসা করলো—"আপনি কোথায় নামবেন?"

যুবতী সহজকণ্ঠে বললো—"পাটনা জংশন।"

আলাপ ক্রমশঃ বেশ জমাট হয়ে উঠলো। কথাবার্তায় জানা গেল, যুবতী বি-এ, বি-টি। পাটনার এক স্কুলের মিষ্ট্রেস। শ্রীরামপুরে বাবা মা থাকেন।

ক্রমেই যুবক-যুবতী আলাপে তন্ময় হয়ে গেল—হাসি ঠাট্টাও চললো।

পাশে বসে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে দু'টী যাত্রী নেমে গেল। যুবক যুবতী উঠে গিয়ে সেইখানে একসঙ্গে বসলো। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো—যুবক আর যুবতী স্থান ত্যাগ করাতে। গাড়ীতে বসে সীতাভোগ ও মিহিদানা কিনে যুবক যুবতীকে আপ্যায়িত করে খাওয়ালো।

আসানসোলে গাড়ী থামলো। যাত্রীর ভয়ানক ভীড় জমলো। গাড়ীতে উঠলো অনেক লোক—মালপত্রে গাড়ী ভর্তি হয়ে গেল। স্থানাভাবে বহু লোক দাঁড়িয়ে রইলো। একটী ভদ্রলোক ভীড় ঠেলে হঠাৎ বৃদ্ধের কাছে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন—"পণ্ডিতজী, কোত্থেকে আসছেন?"

আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ সোল্লাসে বলে উঠলেন—"আরে এ যে আমাদের হরিধন! এস বাবা এদিকে এসো, কোথা থেকে আসা হলো?" স্বামী-স্ত্রী একটু সরে বসে হরিধনকে বসতে যায়গা করে দিলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক জানালেন—তিনি আসছেন কলকাতা থেকে—পুত্র হেমন্তকুমারের বাসায় গিয়েছিলেন বেড়াতে, কাশীতে ফিরে যাচ্ছেন। হরিধন মুখোপাধ্যায়—পাটনা হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট, তিনি বললেন যে, তিনি

কটকে গিয়েছিলেন মোকদ্দমা করতে, সেখানে মাঝে মাঝে পাটনা হাইকোর্টের জজ বিচার করতে যান সাধারণের সুবিধার জন্য। এখন জেসিডি নেমে দুমকা জজ-কোর্টে মোকদ্দম করতে যাবেন। হেমন্তকুমার হরিধনের সহপাঠী ও বন্ধু, সেই সূত্রে হেমন্তকুমারের পিতা কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিত রামদেব শিরোমণি মহাশয়কে হরিধন বিশেষভাবে জানেন ও শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। উভয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চললো—বিষয় রাজনৈতিক, বৈদেশিক, হিন্দু-মহাসভা, কংগ্রেস মিনিষ্ট্রী, মোসলেম লীগ—কত কি ?

হঠাৎ এক সময়ে হরিধনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো গাড়ীর অন্য বেঞ্চে উপবিষ্ট যুবক যুবতীর দিকে। যুবতী হরিধনের তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করছিলো কিন্তু সুদক্ষ আইনজীবী হরিধন নাছোড়বান্দা ; যুবতীকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপ করে বললেন, "মিস্ বিশ্বাস যে—কি খবর ? আপনার ও সঙ্গীটি কে ?"

যুবক বিরক্তভাবে হরিধনের দিকে তাকালো। মিস্ বিশ্বাস বললো, "শ্রীরামপুর থেকে আসছি।" একটু থেমে আমতা আমতা করে বললো—"সঙ্গী আমার কেউ নয়। এই ট্রেণেই আলাপ।"

হরিধন শঙ্কিতকণ্ঠে বলে উঠলেন—"সাধু সাবধান।" যুবক উত্তেজিতভাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, মিস্ বিশ্বাস ইঙ্গিতে মানা করলো।

হরিধন চুপি চুপি পণ্ডিতজীকে কি বললেন—পণ্ডিতজী একবার যুবতীর দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকালেন। গাড়ী লেট্ রাণ্ করছিলো, রাত্রি প্রায় একটার সময় হরিধন নেমে গেল জেসিডি জংশনে। শিরোমণি মশাই এবার মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলেন—তাঁর নাম জানলেন কিষণলাল ঝুনঝুনওয়ালা। কাশীতে বেড়াতে যাচ্ছেন। শিরোমণি মশাইএর পরিচয় পেয়ে কাশীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন বললেন। শিরোমণি মশাই যুবতীর দিকে তাকিয়ে ঝুনঝুনওয়ালাকে কানে কানে কি বললেন—চোখ দু'টো ট্যাঁটার মত করে ঝুনঝুন্ওয়ালা বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে বললো, "পণ্ডিতজী, এ তো বহুৎ তাজ্জবকা বাৎ"—বলে তার জিনিষপত্রগুলির দিকে একবার নজর বুলিয়ে নিলো, নীচের মালগুলো নিজের কাছে টেনে নিলো।

কিউল জংশন থেকে গাড়ীতে উঠলো এক ছোকরা—চেহারা নেশাখোরের মত, পরিধানে ময়লা প্যাণ্ট ও ছিন্ন হাফ সার্ট। গাড়ীতে উঠে একবার চারদিকে তাকিয়ে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করলো—গাড়ীর লোকেরা চমকে ছোকরার দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। মিস্ বিশ্বাস মুচকী হেসে আগন্তুকের দিকে একবার তাকালো—দু'জনার চোখে চোখে ভাবাহীণ বার্তা বিনিময় হলো। গাড়ী চলতে লাগলো বেশ জোরে। তন্দ্রালু যাত্রীরা রাত্রি শেষের শীতল বাতাসে নিদ্রায় ঢলে পড়লো—মোকামা জংশনে গাড়ী থামলে মিস্ বিশ্বাস একবার চারদিকে নজর করে দেখলো—যাত্রীরা নিদ্রিত। ইঙ্গিতে নবাগত আগন্তুককে কাছে ডেকে মিস্ বিশ্বাস তার হাতে কি একটা জিনিষ দিলো রুমালে জড়িয়ে আর আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো একটা সুটকেস। ছোকরা নেমে পড়লো সেই জিনিষ নিয়ে! মিস্ বিশ্বাস ঘুমের ভাণ করে চোখ মুদলো। কিছুক্ষণ পরে দরজার পাশে বেঞ্চির সামনে রক্ষিত মোটগুলিতে টান পড়াতে ঝুন্ঝুন্-ওয়ালা উঠলো চীৎকার করে—গাড়ীর যাত্রীরা চমকে জেগে উঠলো। ঝুন্ঝুন্ওয়ালা মিস্ বিশ্বাসের দিকে তাকালো, দেখলো সে ঘুমে বিভোর। নবাগত ছোকরাটি আর গাড়ীতে নাই। ঝুন্ঝুন্ওয়ালা আবার মালগুলি টেনে এনে রাখলো তার অতি নিকটে। জিজ্ঞেস করে জানলো জায়গাটা মোকামা জংশন।

ভোর রাত্রি অনুমান ৫ টার সময় ট্রেণ থামলো পাটনা ষ্টেশনে। মিস্ বিশ্বাস স্বচ্ছন্দভাবে উঠে দাঁড়ালো, যুবককে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ডাকলো, "মিঃ মুখার্জি, এবারে আমি নামছি, উঠুন—গুড্ মর্ণিং!" মিঃ মুখার্জি ঘুমের চোখে একবার মিস্ বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে জড়িতকণ্ঠে "গুড্ মর্ণিং" বলে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ঝুনঝুনওয়ালা ত্রস্তে উঠে বসলো। মিস্ বিশ্বাস ভ্যানিটীব্যাগ হাতে নিয়ে গট্ গট্ করে ট্রেণ থেকে নেমে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সেই কামরায় এসে উঠলেন একজন বেহারী ভদ্রলোক। চারিদিকে চাইতে চাইতে বললেন—"এই কামরা থেকেই তো নামলো বোম্বেটে মাগীটা। গাড়ীর সামনে আবার দাঁড়িয়ে ছিল সেই বোম্বেটের চেলা মোহনলাল। মাণিক-জোড় কার সর্বনাশ করে গেল কে জানে ?"—বলতে বলতে ভদ্রলোক তার জিনিষ পত্র গুছিয়ে রাখছিলো কামরার ভিতরে। ঝুনঝুনওয়ালা কৌতুহলী

কণ্ঠে বললো—"আপনি কি বলছেন, শেঠজী।" ভদ্রলোক ঝুনঝুনওয়ালার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—"যা হোক আপনি জেগে আছেন দেখছি। বলছিলাম ঐ বোম্বেটে মাগীর কথা, আপনাদের গাড়ী থেকে যে নেমে গেল। দেখুন, কা'র কি নিয়ে গেল? দু'জনকে যখন এক সঙ্গে দেখেছি, নিশ্চয়ই কিছু সরিয়েছে।" ঝুনঝুনওয়ালা আশ্চর্যান্বিতকণ্ঠে বললো—"আর একজনা কে? মেয়ে তো একজন ছিলো!" ভদ্রলোক ধীর কণ্ঠে বললো—"মেয়ে একজন বটে, আর একটী মর্দানা। সেই নেশাখোরের মত চেহারা, প্যাণ্ট ও ছেড়া হাফসার্ট-পরা ছোকরা।" ঝুনঝুনওয়ালা বললো—"হাঁ,হাঁ, ঐ চেহারার একটা ছোড়া উঠেছিল বটে এই কামরায়, সে তো নেমে গেল মোকামায়।" ভদ্রলোক মুরুব্বিয়ানা ভাবে বললো—"যা অনুমান করেছি ঠিক। তা' হলে যা সরাবার সরিয়েছে আগুতে। বাবা, কি ঝানু চোর। একটা গ্যাং মশাই—একটা গ্যাং—ভদ্র ঘরের মেয়ে চোর হলে বড্ড ভয়। দেখুন কার কি গেল?"

ঝুনঝুনওয়ালা বললো—"আমার এই মাল ধরে টেনেছিলো শেঠজী, মোকামায়?"

ভদ্রলোক বললো—"জেগেছিলেন তাই রেহাই পেয়ে গেলেন, নইলে ঠিক টেনে নামাতো আপনার মাল। ধরবার উপায় নাই।"

শিরোমণি মশাই বসে শুনছিলেন দু'জনার কথাবার্তা। ভদ্রলোককে বললেন—"তিনি শুনেছিলেন মেয়েটার কাহিনী হরিধনবাবু উকীলের কাছ থেকে—হরিধনবাবু তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে জেসিডি জংসনে নেমে যান।" ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললো—"আরে বাবুজী, ঐ হরিধনবাবু মেয়েটাকে বাঁচিয়েছেন তিন তিন বার জেল থেকে। তবু ও শোধরালো না। গাড়ীতে চেপে একজনার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাকে যেন যাদু করে, তারপর সব লুটে নেয়।"

গাড়ী এসে থামলো মোগলসরাই জংসনে বেলা ১০টায়। গাড়ীর কামরায় পড়ে গেল সাড়া। চা-ওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, ফলওয়ালার ডাক হাঁক পড়লো দরজায় দরজায়। লোক-জনের কলরবে মিঃ মুখার্জির নিদ্রাভঙ্গ হলো। চা-ওয়ালাকে ডেকে সে চা পান করলো, খাবার-ওয়ালার কাছ থেকে পুরী ও মিঠাই নিয়ে দাম দিতে গিয়ে দেখে মণি-ব্যাগ নাই! স্যুটকেস থেকে টাকা বের করতে গিয়ে তার কোন পাত্তাই পেলে না। বেঞ্চির উপর-নীচ, আশপাশ তন্নতন্ন করে খুঁজলো, কিন্তু বৃথা। তখন তার মুখে উৎকণ্ঠা—চোখে জল। কামরার যাত্রীরা তাকিয়ে আছে বিস্মিতনেত্রে মিঃ মুখার্জির দিকে। ঝুনঝুনওয়ালার চোখে মুখে হাসির ঝলক। শিরোমণি মশাই ব্যথিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—"কি খুঁজছো, বাবা?" মলিনমুখে মিঃ মুখার্জি বললো—"আমার মণি-ব্যাগ আর স্যুটকেসটা পাচ্ছি না।" ঝুনঝুনওয়ালা বিদ্রূপ করে বললো—"বাবুজি, আপুনি যে মেয়ের সঙ্গে ভাব কোরছিলেন সে মেয়ে বোম্বেটে আছে—আপনার সঙ্গে মহব্বৎ করে আপনার সব চুরি করে পালিয়েছে।" মিঃ মুখার্জি অবিশ্বাসের হাসি হাসলো। সঙ্গীর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে চায়ের ও খাবারের দাম দিলো।

পরের দিন। পাড়ে হাবেলীর বিনোদ চাটুয্যের মেয়ে সুনন্দাকে দেখতে পাত্র শিশির মুখার্জি নিজে এসেছে কলকাতা থেকে। বাড়ীতে হৈ চৈ পড়েছে। হরেকরকম খাবার আয়োজন চলছে, রাত্রে হবু বরকে ভোজ দিতে হবে। বৈকাল ৫টার সময় শুভলগ্নে পাত্রী দেখান হ'বে। পাত্রর পাত্রী দেখে পছন্দ হলে বিবাহের পাকা কথা হবে।

বিকেল ৪টার সময় পাত্র তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো চাটুয্যে মশায়ের বাড়ী। তাদের অভ্যর্থনা করে বসানো হলো—পাত্রীকে সাজাবার তাগিদ দেওয়া হলো।

চাটুয্যেমশাই'এর উপরের হলঘরে পাত্রী দেখাবার স্থান ঠিক হ'ল। যথাসময়ে পাত্র ও তার বন্ধুদের হলঘরে বসান হলো—পাত্রীরও সাজসজ্জা সম্পূর্ণ, দেখালেই হয়; কিন্তু দেরী হচ্ছে শুধু পাত্রীর মাতামহের আগমন প্রতীক্ষায়। কিছুক্ষণ পরে তিনি এসে দাঁড়ালেন হলঘরের দরজায়। পাত্রের সঙ্গে তাঁর চোখোচোখী হওয়াতে দু'জনাই দু'জনার দিকে তাকিয়ে রইল বিস্মিতনেত্রে। উপস্থিত সকলেই কেমন যেন উদ্বিগ্ন হলেন। মেয়ের মাতামহ শিরোমণি মশাই পাশের ঘরে চলে গেলেন। জামাতা ও কন্যার নিকট বললেন পাত্রের গত রাত্রের চরিত্রকাহিনী, একটা অপরিচিত যুবতী মেয়ের সঙ্গে লজ্জাকর মেলামেশা। হাওড়া

ষ্টেশন থেকে মোগলসরাই পর্য্যন্ত সব কিছু ঘটনা। জামাতা বিনোদ ও কন্যা ক্ষীরোদা সব শুনে তাদের একমাত্র কন্যা সুনন্দাকে এমন পাত্রের হাতে তুলে দিতে অমত করলো। বিনোদ উত্তেজিতভাবেই হলঘরের দিকে যাচ্ছিলো, শিরোমণি মশাই তাকে বাধা দিয়ে বললেন—"তুমি শান্ত হও বাবা, বিয়ে তো আমরা দিচ্ছি না। মেয়েকে একবার দেখিয়ে দাও—ভদ্রসন্তানদের অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়ে দিলে কাজটা অশোভনীয় হবে।"

সুনন্দাকে দেখানো হলেও বাড়ীর হৈ চৈ উৎসাহ হঠাৎ কেমন নীরব হয়ে গেল। বিতৃষ্ণায় বিনোদ আর সে ঘরে ঢোকে নি। বন্ধুরা পাত্রী দেখে বললে—সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী, খাসা মেয়ে। শিশির তুই খুব ভাগ্যবান!

শিরোমণি মশাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পরিতোষ করে ভদ্রসন্তানদের ভোজন করালেন। বন্ধুরা গৃহকর্তার আতিথেয়তায় হৃষ্ট হলো।

শিশির কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটি কথাও বলে নি, বন্ধুদের সঙ্গে ভোজনে বসলেও বিশেষ কিছু মুখে তুলতেও পারে নি, শিরোমণি মশাই খাবার জন্যে অনুরোধ করতে ছাড়েন নি, কিন্তু সে মুখ তুলে তাঁর মুখের পানেও তাকাতে সাহস করেনি। খাওয়া দাওয়ার পর শিরোমণি মশাইকে একান্তে পেয়ে শিশির তাঁর পা দুখানি জড়িয়ে ধরে গাঢ়-স্বরে বললো—"আপনি মহাপুরুষ, তাই এমনি করে সবার সামনে আমার ইজ্জৎ রেখেছেন। কিন্তু আমি এ কন্যার অযোগ্য—এর বিহিত আমি নিজেই করবো।"

শিরোমণি মশাই সস্নেহে শিশিরকে ধরে তুললেন, পরে বললেন—"আশীর্বাদ করি তোমার সুমতি হোক।"

কয়েকদিন পরে কলকাতা থেকে শিশিরের বাবা ভোলানাথবাবু বিনোদ চাটুয্যেকে চিঠি লিখে জানালেন, শিশিরের পাত্রী পছন্দ হয় নি। বিনোদ রুক্ষ মেজাজে চিঠিখানি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেললো।

মূলধন ও যান্ত্রিক উৎপাদন

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

মূলধনপ্রথা বা capitalism এর প্রসারের মূলে কল-কারখানার প্রভাব এত বেশী যে—বর্তমানে মূলধনপ্রথা (capitalism) ও ইণ্ডাষ্ট্রিপ্রথা (industrialism) সমার্থক হয়েছে। বাস্তবিক বিরাট কালের প্রবর্তন না হ'লে—এই মূলধনপ্রথা এমনি বিস্তার লাভ করতে পারত না। প্রথম অবস্থায় মূলধনের সমাবেশ হ'ত সওদাগরদের (merchants) হাতে—যারা সমাজের বিক্ষিপ্ত উৎপন্নদ্রব্য কুড়িয়ে নিয়ে হাটে বাজারে মেলায় (fair) ও বড় বড় শহরে এবং কখনও বা বিদেশে বিক্রির ব্যবস্থা করত। এমন কি ১৮শ শতাব্দীতেও সওদাগরদের ও বণিকদের প্রভাব এত বেশী ছিল যে Dr. Johnson তখন বলেছিলেন—"an English merchant is a new species of gentleman"—ইংরাজ বণিক এক নূতন রকমের ভদ্রলোক। তখন উৎপাদন ছিল ধীর মন্থর গতিতে—হস্ত-উৎপাদনের টুকুর-টাকুর গতিতে। কাজেই তা দিয়ে খুব বেশী মুনাফা সম্ভব হ'ত না। তাই যাদের ধন পিপাসা ছিল প্রবল, তারা গ্রামে গ্রামে বা ছোট ছোট উৎপাদন-কেন্দ্রে ঘুরে উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করত এবং অন্যত্র নিয়ে চড়াদামে বিক্রি করত। এর পর কল-কারখানা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন হ'তে লাগল দ্রুতগতিতে; মুনাফা পাবার নূতন রাস্তা ধনপতিদের (capitalist) সামনে উন্মুক্ত হ'ল। এর বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় তুলাবস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির হিসাবে। ১৭৩০ সাল হতে তুলার সুতা তৈরির (spinning) যন্ত্র প্রবর্তিত হ'তে থাকে এবং পরে পরে এর উন্নতি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বয়নের যন্ত্রও উদ্ভাবিত হয়। ইংলণ্ডে ১৭৩০ সালে বস্ত্র-উৎপাদনের জন্য মাত্র ১৫২ লক্ষ পাউণ্ড তুলা দরকার হয় এবং একশ' বছর পর ১৮৩২ সালে ২৮১/২ কোটি পাউণ্ডের তুলার প্রয়োজন হয়েছিল।

কল বা যন্ত্র ফস্ করে একদিনে উদ্ভাবিত হয় নি। কুটীর-ইণ্ডাষ্ট্রির (cottage industry) খুট-খাট উৎপাদন থেকে একদিনে হঠাৎ যন্ত্র ও কারখানার বিরাট উৎপাদন স্রোতের মধ্যে সমাজ এক লাফে গিয়ে পড়ে নি। যে সুতো তৈরির যন্ত্র (spinning machine) আজকাল চলছে তার মধ্যে প্রায় হাজার খানেক উদ্ভাবন ক্রমে ক্রমে এসে জুড়ো হয়েছে। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত তার সংখ্যা ৮০০শ'র মতো ছিল—লর্ড সভার দপ্তরে এমন উল্লেখ আছে। এই প্রায় একশ বছরে আরও ২০০ নূতন উদ্ভাবন এর মধ্যে এসে মিশেছে—এমন অনুমান করা অন্যায় নয়। অল্প-স্বল্প উৎপাদন থেকে যান্ত্রিক বিরাট উৎপাদনে যাবার রাস্তা তৈরি করেছে—বণিকগণ। দ্রব্য বেচাকেনা-বাজারের বিস্তার না হ'লে অনর্থক উৎপাদনের বিস্তার হ'তে পারে না। বাজারের বিস্তার করেছে বণিকগণ এবং তারাই উৎপাদন বিস্তারের তাগিদ সৃষ্টি করেছে। প্রথম এরা গ্রাম ও শহরের উৎপাদন কেন্দ্রে গিয়ে উৎপন্ন দ্রব্য কিনে আনত এবং তা শহরে ও হাট বাজারে বা মেলায় বিক্রি করত। পরে এরা উৎপাদনের ফরমাস দিত এবং কখন-ও কখন-ও দাদন দিত। দ্রব্য বেচবার সময়

যেমন চাহিদা এরা অনুভব করত, তেমন ফরমাস দিত এবং সুবিধা দরে পাবার জন্য বা অন্য বণিকের গ্রাস ও লুব্ধ দৃষ্টি এড়াবার জন্য দাদনও দিত। এর পর এল কাচা মালের সরবরাহ। যেমন স্বাধীন কারিগরগণ (artisaus) অতিরিক্ত ও নূতন নূতন উৎপাদনের ফরমাস পেতে লাগল, কাঁচা মাল তাদের সাধ্য ও আয়ত্তের বাইরে পড়তে লাগল। কাঁচা মাল কিনবার হাঙ্গামা এড়াবার সহজ মনোভাবও এদের ছিল। তখন পর্যন্ত এরা নিজের গৃহে বসে ও নিজের যন্ত্রপাতি দিয়েই উৎপাদন করত। কিন্তু যখন একদল শ্রম-সর্বস্ব বেকার লোক সমাজে দেখা দিল—বণিকগণ তাদের নিয়ে নিজেদের উৎপাদন কেন্দ্রে জড়ো করতে লাগল এবং উৎপাদনের যন্ত্রপাতি এবং কাচামালও বণিকগণ যোগাতে লাগল। এতদিন কারিগরগণই উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের মালিক হ'ত—কিন্তু এখন হতে মালিক হ'ল—ঐ বণিক ধনপতিগণ। উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের বিস্তার এরা পূর্বেই সৃষ্টি করেছে এবং বাজার তাদেরই হাতে। এখন এরা উৎপাদনও নিজেদের হাতে নিয়ে এল। দ্রুত উৎপাদন এবং কম শ্রমে বেশী উৎপাদনের সুযোগ ও প্রয়োজন তখন সমাজে দেখা দিয়েছে। যেমন কৃষিজীবী, বুদ্ধিজীবী, পণ্যজীবী সমাজে আছে, তেমনি এই শ্রমজীবীদের একমাত্র জীবিকা হল নিজেদের শ্রম। এই শ্রমজীবীরা (Proletariat) হ'ল নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের প্রধান অবলম্বন; এদের শ্রমকে মুনাফায় খাটানোই হল ধনপতিদের প্রধান প্রেরণা, যা থেকে যন্ত্র উদ্ভাবনের বিশেষ তাগিদ এল। যতদিন শ্রমিকরা উৎপাদনের মাল মসলা, যন্ত্রপাতি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক ছিল, ততদিন এই প্রেরণা তেমনভাবে দেখা দিতে পারে নি; কারণ শ্রমিকদের তেমন বুদ্ধি, অর্থ ও অবসর ছিল না এবং ধনপতি বণিকদের কোন স্বার্থের তাগিদ ছিল না।

এই নূতন ব্যবস্থায় শ্রম ও মূলধনের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ বদলে গেল। পূর্বে দ্রব্য উৎপাদনে শ্রমই ছিল প্রধান। কৃষক নিজের ফালতু সময়ে এবং কৃষির অতিরিক্ত জমিতে তুলার, শনের ও তিসির গাছ লাগাত, নিজ সংসারের মেয়েরা তুলার সূতা কাটত এবং শন ও তিসির সূতা বের করত এবং নিজের অবসরে বা মেয়েরাই তা দিয়ে কাপড় বুনত। এর মধ্যে অর্থের প্রয়োজন হ'ত প্রধানতঃ কেবলমাত্র এককালীন একটি তাঁত তৈরি করার জন্য। কুটীর-উৎপাদনে প্রায় সর্বত্র ও সব বিষয়েই এই ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রথমই ব্যয়সাধ্য যন্ত্রের এবং তারপর বাহির হ'তে ক্রীত কাচামালের, শ্রমিকদের কাজ করার কারখানা গৃহের এবং শ্রমিকদের বেতন প্রভৃতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হ'ত। বহু মাল উৎপাদন ক'রে সুবিধা মতো বাজারে বিক্রির জন্য অনেক সময় তা দীর্ঘকাল মজুত রাখতে হ'ত, দূর দেশে পাঠাতে হ'ত এবং স্থানের উপযোগিতা অনুসারে উৎপাদন কেন্দ্র ও উৎপন্ন দ্রব্যের অদল-বদল করতে-ও হ'ত। এই সব কারণে-ও বহু অর্থের প্রয়োজন হ'ত। অর্থাৎ ক্রমেই ইণ্ডাষ্ট্রির মধ্যে শ্রমের চেয়ে অর্থের প্রভাব প্রবল হ'য়ে উঠল।

ধনপতি সওদাগর হ'য়ে উঠল উৎপাদন মালিক industrialist—ইণ্ডাষ্ট্রির ধনী। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—৯৯র ধাক্কায় পড়া; যার কিছু নেই অর্থের নেশাও তার হয় না, কিন্তু কিছু অর্থের স্বাদ পেলেই অর্থ-লিপ্সা বেড়ে যায়। এই ইণ্ডাষ্ট্রীয় ধনপতিদের অবস্থাও হ'ল তাই। পূর্বেই বলেছি—এই নূতন অর্থ-ব্যবস্থার প্রধান উৎপত্তি কেন্দ্র হ'ল ইংল্যাণ্ড। প্রধানতঃ ভারতের ও আমেরিকার শোষণ-লব্ধ অর্থ তখন তাদের রক্তে নেশার সৃষ্টি করেছে। সাম্রাজ্যের অর্থের বলেই ইংল্যাণ্ডের নূতন ইণ্ডাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা স্থাপিত হয়। অপর দেশের লোকের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে যাদের ন্যায়বুদ্ধিতে বাধে না, দুদিন পরে স্বদেশের লোকদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতেও তাদের বাধবে না। ইংল্যাণ্ডের নূতন ধনপতিগণ তাই সুরু করল স্বদেশের শ্রমজীবীদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের স্ফীত উদর স্ফীততর করতে। এই সময়ই মার্কস ইংল্যাণ্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। যন্ত্রের সহযোগে মানুষের শোষণ দেখে মার্কস স্তম্ভিত হলেন। আমাদের ধারণা আছে গান্ধীজী যন্ত্রের ঘোরতর বিরোধী এবং মার্কস এর ঘোরতর পক্ষপাতী। কিন্তু এই উভয় ধারণাই ভুল। মার্কস্ হিসাব করেছেন—একটা বাষ্প লাঙ্গল (steam plough) এক ঘণ্টায় ৩ পেনি খরচে যে কাজ বা চাষ করতে পারে, তা করতে মানুষের শ্রমে ১৫ শিলিং ব্যয় ক'রে ৬৬ জন লোকের শ্রমের দরকার হয়! এই যে এত লোক বেকার হ'ল এদের গতি কি! গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হ'য়ে চাষীরা জীবিকাহীন হয়ে ধনপতিদের ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছে—মার্কস্ ইহা দেখে যন্ত্রের সম্বন্ধে মোটেই তুষ্ট হন নি। এই যান্ত্রিক উৎপাদনে শোষণপ্রথা দেখে তিনি লিখেছেন—"ধনপতিদের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রম কেবল যে শিশুদের খেলার সময়টুকু অপহরণ করল তা নয়, ঘরে বসে স্বাধীনভাবে শ্রম করার সুযোগও হরণ করল।"(১)

আবার লিখেছেন—"আমরা দেখছি যে যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে মূলধনের শোষণের প্রধান উপকরণ মানুষের শ্রম-শক্তি বেড়ে গেল এবং সাথে সাথে তার শোষণ-ক্ষমতাও বেড়ে গেল।"(২)

যন্ত্রের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী ও ধনজীবীর সম্পর্ক যে বদলে গেল, তা উল্লেখ ক'রে—মার্কস বলেছেন—পূর্বে বেচা-কেনায় লেন-দেনে শ্রমিক ও ধনিক ছিল সমকক্ষ; একজনের শ্রম-শক্তি ও একজনের অর্থশক্তির বিনিময় হত। কিন্তু যন্ত্রের প্রবর্তনের ফলে কি হ'ল?—এখন (অর্থাৎ যন্ত্রযুগে) ধনপতি শিশু ও নাবালকদের ও ক্রয় করতে লাগল। পূর্বে শ্রমিক তবু-ও কতকটা স্বাধীনভাবে কেবল নিজের শ্রম-শক্তিকে বিক্রয় করত; এখন সে তার স্ত্রী ও সন্তানকেও বিক্রয়

১ "Compulsory work for the capitalist usurped the place, not only of children's play, but also of free labour at home ..."।

২ "Thus we see that machinery, while augmenting the human material that forms the principal object of capital's exploiting power at the sometime raises the degree of exploitation.

করতে সুরু করল। ফলে সে এখন ক্রীত-দাস ক্রয়-বিক্রয়ের দালাল হয়ে দাঁড়াল—নিজের স্ত্রী ও সন্তানের বিক্রির সহায়ক হ'ল।(৩)

Capital গ্রন্থের ১৫শ অধ্যায়ে এমনি বহু উক্তি আছে। মার্কসের আরও ২।১ টা উক্তি নিয়ে উদ্ধৃত হ'ল। "হস্ত ও কারু উৎপাদনে, শ্রমিক হাতিয়ারকে (tool) চালায়; কিন্তু কারখানায় সে কলের দাস হ'য়ে পড়ে। প্রথমোক্ত অবস্থায় উৎপাদন-যন্ত্রের নড়া-চড়া শ্রমিকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু শেষোক্ত অবস্থায় শ্রমিকের নড়া-চড়াই কলের নির্দেশ অনুগামী হয়।"(৪) machine বা যন্ত্রের বিরাটত্ব ও জটিলত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকের উপর machine বা যন্ত্রের প্রাধান্য—আরও বেড়ে গেছে;—সাম্যবাদী সমাজেও যন্ত্রের নিকট শ্রমিকের এই দাসত্বের কোন প্রতিবিধান হয় নি। সেখানেও যন্ত্র দানবের নিকট ক্ষুদ্র মানুষ অসহায় হতভম্ব হয়ে থাকে। তাইত গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় এই সমস্যার উল্লেখ ক'রে বলেছেন—

"মানুষ হবে যন্ত্রের অধিপতি—যন্ত্র যেন মানুষের অধিপতি না হয়।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন—

"যন্ত্রের একটা বিশেষ স্থান আছে; যন্ত্র সমাজে এসেছে টিকে থাকবার জন্যেই। কিন্তু মানুষের শ্রমকে অনাবশ্যক ক'রে তাকে বেকার করতে যেন যন্ত্র না পারে।"(৫)

তিনি আবার বলেছেন—

"কলকারখানা যদি বহুর খরচায় মুষ্টিমেয়কে ধনী বানায় বা যদি বহুর শ্রমকে অনাবশ্যক ক'রে দেয়, তবে সেই কলকারখানার জন্য আমার বিন্দুমাত্র ও দরদ নেই।"(৬)

৩। Part I. Chap XV P. 291.

But now the capitalist buys, children & young person under age. Previously, the workmen sold his own labour-power which he disposed of nominally, as a free agent. Now he sells his wife & child. He has become a slave-dealer."

৪। In manufacture & in handicraft, the worker uses a tool; in factory he serves a machine. In the former case, the movement of the instruments of labour proceed from the worker; but in the latter, the movements of the worker are subordinate to those of the machine"—

মার্কস manufacture শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহার করেন নি,—তিনি এর মৌলিক অর্থে—অর্থাৎ হাতের তৈরি কারখানা উৎপাদন অর্থে ব্যবহার করেছেন। Handicraft হ'ল শ্রমিকদের নিজ গৃহে বসে কাজের উৎপাদন—অন্যের কারখানায় কাজের নয়।

৫। "Man should be the master of machines & not machines that of man". Machineryhas its place; it has come to stay. But it must not be allowed to displace necessary human labour"—

৬। "I can have no consideration for machinery—which is meant either to enrich the few at the expense of the many—or without cause—displace the useful labour of many."

যান্ত্রিক উৎপাদনে এই তিনটি ত্রুটি,—মানুষ যন্ত্রের দাস হয়, বহুলোক বেকার হয় এবং বহুর শ্রম খাটিয়ে অল্প কয়েকজন ধনী হয়। মার্কস ও গান্ধী উভয়েই এই জন্য কল-কারখানার নিন্দা করেছেন।

যান্ত্রিক মূলধন প্রথার এই যে অত্যাচার—মানুষকে মানুষের অধিকার থেকে বিচ্যুত ক'রে যন্ত্রের অঙ্গে পরিণত করার যে অপরিহার্য গতি—এর বিরুদ্ধে মার্কস ও গান্ধী নিজ নিজ পন্থায় অভিযান করেছেন। মার্কসের আমলে সমস্যা ছিল দৈন্য—প্রয়োজন-দ্রব্যের দৈন্য। মার্কস দেখেছেন—মানুষের অভাব সর্ব-ব্যাপী—খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, গৃহের অভাব, শিক্ষার অভাব। সমাজের এক মেরুতে জমছে—প্রচুর অর্থ—আর অন্য মেরুতে জমছে দ্রব্যের অভাব। মার্কসের সময়কার উৎপন্ন দ্রব্যের (ধনের নয়) সমান বণ্টন হলেও এই দৈন্য দূর হত না; সেই অভাব দূর করতে হলে আরও উৎপাদনের প্রয়োজন ছিল। তাই মার্কস যান্ত্রিক উৎপাদনকে বাতিল করেন নি। মানুষকে স্বাধীন শ্রমিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার সহজ উপায় না পেয়ে, তিনি সাম্যবাদের ভিতর দিয়ে সেই উপায়ের সন্ধান দিলেন। আর আজ যান্ত্রিক উৎপাদন এত বেড়ে গেছে যে এখন দ্রব্যের অভাব নেই—এবং সহজেই আরও দ্রব্য উৎপন্ন করা যায়। বরং আছে প্রাচুর্য্য। প্রচুর খাদ্য অনেক সময় পুড়িয়ে বা অন্য উপায়ে নষ্ট ক'রে ফেলা হয়, কিন্তু বহুলোক হয়েছে বেকার। যান্ত্রিক উৎপাদন যে দেশে যে পরিমাণে বাড়ছে, সেই দেশে সেই পরিমাণে বেকার সমস্যা ও বাড়ছে। অবশ্য সাম্যবাদী রুশিয়ার বা ফ্যাসীপন্থী জার্মেনীর কথা স্বতন্ত্র। সাম্যবাদ দিয়ে মানুষের স্বাধীন শ্রমের মর্য্যাদা ও মূল্য দেওয়া যাবে কি না, প্রত্যেক মানুষকে শ্রমের ও শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের অধিকার দেওয়া যাবে কি না—তা এখন ও পরীক্ষা সাপেক্ষ। একদিক থেকে দেখা যচ্ছে—যন্ত্র যত বাড়ছে, তত-ই তা জটিল হচ্ছে এবং তত-ই মানুষ-নিরপেক্ষ হচ্ছে।

তার ফলে সাধারণ মানুষ যন্ত্রের সামনে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ব'লে মনে করতে বাধ্য। আদিম মানব যেমন বুদ্ধির অগম্য প্রকৃতির খেলা-দেখে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হ'ত—আজকালকার শ্রমিকও দানবপ্রায় যন্ত্রের সামনে স্তম্ভিত হ'য়ে যায়। জমসেদপুরের বিরাট কারবারে গেলে, শিক্ষিত লোকই যেন বিস্ময়ে হত-বাক হ'য়ে যায়;—সাধারণ অশিক্ষিত শ্রমিক ত হবেই। নিজ গৃহে কারিকর তার হাতের যন্ত্রপাতিকে চালাত; কিন্তু কারখানার বিরাট যন্ত্র শ্রমিককে চালায়;—সে তার স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলে। এই দুই কারণে, প্রত্যেক লোককে শ্রমের অধিকার দেওয়া ও স্বাধীন শ্রমিকের মর্য্যাদা দেওয়ায় এবং তাকে যন্ত্রের হাতের পুতুল না ক'রে যন্ত্রের চালক করার জন্য—মহাত্মাজী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে কুটীর ও স্বাবলম্বী উৎপাদনের পক্ষে ঘোষণা করলেন। মার্কস যে হিসাবের ও আশার উপর নির্ভর ক'রে সিদ্ধান্ত করেছিলেন—যে মূলধন প্রথার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলেই—তার নিজস্ব dialectic process এর ফলে-ই—সাম্যবাদ আসতে বাধ্য, গত এক শতাব্দীতে তাঁর সেই হিসাব ও আশা অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। বরং তার পরিবর্তে এসেছে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ।

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—তিন—

জল দুলছে, জল নাচছে, জল খেলা করছে। মাঠ নেই, পথ নেই, আলেয়া দীঘিটার চিহ্নই নেই। কৃষ্ণচূড়া গাছটার গুঁড়িটাকে ঘিরে ঘিরে জল পাক খাচ্ছে, সেই মরা কাকের ছানাদুটো যে এতক্ষণে কোথায় ভেসে গেছে কে বলবে! শুধু নতুন-রোদ-ওঠা আকাশে পাখা মেলে দিয়ে ঘুরে ঘুরে একদল কাক কান্নাকাটি করছে এখনো।

রোদ উঠেছে আকাশে, চারদিন পরে নতুন রোদ। একটা নতুন অপরূপ আর অচেনা পৃথিবীর ওপরে। বেশ খুশি হয়ে দেখছিল রঞ্জু, হঠাৎ তার খেয়াল হল সে যতটা খুশি হয়েছে, আর কারো ততটা খুশি হবার মতো কারণ ঘটেনি।

সকালের আলোয় এ জলের খেলা সুন্দর নয়—এ একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশের রূপ। আস্তে আস্তে রঞ্জু এও শুনতে পেলে যে শুধু তার ঠাকুরমার ঘরই নয়, আরো অনেকের ঘর গেছে, গেছে ঘরের সঙ্গে সঙ্গে যথাসর্বস্ব। বন্দরের যে দিকটায় মালোপাড়া ছিল, সেখানে দাঁড়িয়েছে দু বাঁশ জল। নদীর ধারে মশানীর পুরোণো মন্দিরটা ধ্বসে নেমে গেছে নদীর গর্ভে। ওপারে চণ্ডীপুরের দিকে যে কী হয়েছে, সে কথা কেউ বলতে পারেনা। বন্দরের ঘাটে ঘাটে যে সব নৌকো বাঁধা ছিল, বন্যার টানে কাছি নোঙর উপড়ে তারা অদৃশ্য হয়েছে, কোথায় কোন্ পথে দরিয়ায় ভেসে চলে গেছে একমাত্র ভগবান সে সন্ধান দিতে পারেন।

আর সেই সঙ্গে মানুষের আর্তনাদ—মানুষের হাহাকার।

—হায় ভগবান! তোমার মনে এই ছিল!

—ওগো, তোমরা কেউ আমার ছোট ভাইটাকে দেখেছ, জহিরদ্দিকে? কাল বানের টানে সে ভেসে গেছে, কোথাও উঠেছে বলতে পারো?

—হায় হায়, আমার তিনটে গোরু গেল, ছটা ছাগল—

—বাবু গো, ঘরের ধান গেল, চাল গেল, জিনিসপত্তর সব গেল, আমাদের উপায় কী হবে?

কে কাকে উপায় বলে দেবে? নিজের উপায়ই কেউ জানেনা। থানায় গিজ গিজ করছে লোক, দলে দলে লোক হাঁড়ি-কুঁড়ি বাক্সো-প্যাটরা যা পেয়েছে নিয়ে এসে উঠেছে রঞ্জুদের দালানে। তাদের অবস্থা দেখে ঠাকুরমাও আচারের বোয়ামের কথা ভুলে গেছেন।

বারান্দায় পাতা হয়েছে মস্ত বড় একটা উনুন। তাতে হাঁড়ি-বোঝাই করে খিচুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সারাদিন সমানে চলেছে সেই খিচুড়ি রান্না, লোকগুলোকে খাওয়ানো হচ্ছে। তাদের বিলাপে-আলাপে রঞ্জুর যা কিছু ভাবনা কল্পনা—সব ছায়াবাজীর মতো মিলিয়ে গেছে মন থেকে। ভয়—একটা অস্বাভাবিক ভয়ে বুকের ভেতরটা অবধি শুকিয়ে উঠেছে তার। বাইরের শাদা থলথলে জলে যেন একটা নিষ্ঠুর হাসি; দূর থেকে নদীর গোঙরানি যেন একটা বন্যজন্তুর আর্তনাদ—শীতের রাত্রে ফেউয়ের ডাক শুনে বাঘের কল্পনায় যেমন ভয় পেত ছিল, ঠিক সেইরকম।

—হে আল্লা, জল নামাও, জল নামাও—

—মুন্সীগটের ওদিকটার আর কোনো চিহ্নই নেই, সব সাফ হয়ে গেছে।

—ঢের ঢের মানুষ মরেছে, আমার সামনেই তো হোসেন হাজীর বউ ব্যাটা বানের টানে ভেসে চলে গেল দেখলাম—

—হায় ভগবান, আমাদের উপায় কী হবে?

উপায় কী হবে? তার জবাব দিলেন অবিনাশবাবু।

আখের চাষ আর গুড়ের জন্যে গঞ্জটা বিখ্যাত। বন্দরের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে কতদিন রঞ্জু দেখেছে

উঠোন-জোড়া এক একটা মস্ত কড়াইতে জ্বাল দেওয়া হচ্ছে আখের রস। পাতা পুড়ছে, লাকড়ি পুড়ছে, আর মস্ত মস্ত কাঠের হাতা দিয়ে নাড়া দেওয়া চলছে প্রথম-দানা-ধরে-আসা তরল গুড়কে। বাতাসে ভাসছে গুড়ের উগ্র মধুর একটা গন্ধ। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে যারা ভিড় করেছে সেখানে, শাল পাতায় তাদের একটু একটু গরম গুড় দেওয়া হচ্ছে, পরমানন্দে চেটে চেটে খাচ্ছে তারা।

রঞ্জুর ওই গুড় খাওয়ার জন্যে যে খুব লোভ জেগেছে তা নয়। তবু ওই বিচিত্র উগ্র গন্ধটা, লালচে হয়ে আসা ফুটন্ত ওই ঘন রসের রঙটা ভারী ভালো লেগেছে তার। ইচ্ছে করেছে তাকেও যদি পাতায় করে ওই রকম একটুখানি গুড় দেয়, সে খেয়ে দেখতে পারে কেমন লাগে। কিন্তু উপায় নেই। সে বড়বাবুর ছেলে, ওসব ছোট লোকের খেয়াল মনের কোনে তার স্থান দেওয়াও চলবেনা।

—আর আশ্চর্য, কত বড় ওই কড়াইগুলো। অত বড় কড়াই যে কী করে তৈরী করল, সেটা যেন ভেবেই পাওয়া যায়না। ওই রকম একটা কড়াইতে চুপচাপ শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে রঞ্জু, ঘুমুতে পারে স্বচ্ছন্দ আরামে।

আজ বান ডেকেছে। বাঁধ-ভাঙা, উপছে-পড়া ভয়ঙ্কর বান। ক্ষেপে উঠেছে, নাগিনীর মতো গর্জে উঠছে ঘুমন্ত নদী আত্রাই। এই সময় রঞ্জু দেখতে পেলে, গুড় জ্বাল দেওয়ার চাইতেও আরো ঢের ঢের বেশি কাজ করতে পারে ওই কড়াইগুলো!

চোখকে বিশ্বাস কি করা যায়? না—যায়না। তবু এ সত্যি—বাইরের ঝকঝকে শাদা জলের ওপর সকালের মিষ্টি নরম রোদটার মতোই সত্যি।

বন্দরের ওদিক থেকে জলের ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে আসছে মস্ত একটা কড়াই। সেই কড়াইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবিনাশবাবু। তাঁর হাতে একটা লম্বা বাঁশ। লোকে যেমন করে লগি দিয়ে নৌকো ঠেলে নিয়ে যায়, তেমনি করে বাঁশের খোঁচায় কড়াই বাইতে বাইতে অবিনাশ-বাবু ওদেরই বাড়ির দিকে আসছেন।

এই অপূর্ব নৌকোয় আরোহণ করে অবিনাশবাবু এসে হাজির হলেন একেবারে কৃষ্ণচূড়া গাছটার সামনে। তার পর কড়াইয়ের আংটার ভেতর দিয়ে লগিটা মাটিতে পুঁতে দিয়ে এক লাফে রঞ্জুদের সিঁড়িটার ওপরে পড়লেন।

শশব্যস্তে বেরিয়ে এলেন বাবা: অবিনাশবাবু যে! ব্যাপার কী!

অবিনাশবাবুর সারা গা বেয়ে টপটপ করে ঘাম গড়িয়ে পড়ছিল। অতখানি রাস্তা কড়াইয়ের নৌকোটা ঠেলে আনতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। একটু দম নিয়ে তিনি বললেন, চাটুয্যে মশাই, সর্বনাশ হল যে।

—আপনার আশ্রমের খবর কী? ঠিক আছে তো?

—তা আছে। ওদিকটাতে জল ওঠেনি। কিন্তু মালোপাড়ার খবর শুনেছেন বোধ হয়।

বাবা বিষণ্ণস্বরে বললেন, শুনেছি।

—কী করা যায় বলুন দেখি?

বাবা হতাশার ভঙ্গি করলেন: কোনো উপায়ই তো দেখছি না! একেবারে নদার গায়ে, শুনেছি বারো হাত জল দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে।

—আর মানুষগুলো?

বাবা তেম্‌নি ব্যথিত গলায় বললেন, ভগবান জানেন।

—না, না, ভগবান নয়।—অত্যন্ত চঞ্চল শোনালো অবিনাশবাবুর কণ্ঠ: আমাদেরও কিছু করবার আছে। শুনেছি বড় বটগাছটায় এখনো কিছু কিছু লোক ঝুলে ঝাপ্‌টে রয়েছে কোনো রকমে। ওদের উদ্ধার করা দরকার। একটুও দেরী নয়—স্রোতের টানে গাছ উপড়ে যেতে পারে।

বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু ওখানে যাওয়া যায় কী করে? নৌকো তো একখানাও পাওয়া যাবে না, স্রোতের টানে সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

অবিনাশবাবুর চোখ দপদপ করে উঠল। শান্ত নম্র চোখদুটিতে এমন জোরালো আগুন থাকতে পারে—এমন করে যে কোনো মানুষের চোখ জ্বলে উঠতে পারে রঞ্জুর জীবনে এ অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

অবিনাশবাবু তীব্রভাবে বললেন, তাই বলে এতগুলো মানুষ এমনভাবে মরতে পারে না। এ কখনোই হতে দেওয়া যাবে না, কোনোমতেই নয়।

বাবা যেন এবারে একটুখানি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, আপনি কী করতে চান?

সতেজ গলায় জবাব এল: ওদের উদ্ধার করব।

—কেমন করে?

অবিনাশবাবু আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন কড়াইটা : ওই ওটায় করে।

—পাগল আপনি!—বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। ওই কড়াইতে করে! ওটায় আপনি ক'জন মানুষকে তুলে নিয়ে আসতে পারবেন?

—যে কজন পারি। একজন-দুজন। বারে বারে গিয়ে নিয়ে আসব।

বাবার মুখের চেহারা ক্রমে গম্ভীর হ'য়ে উঠতে লাগল : অবিনাশবাবু, পাগলামি করবেন না। ওখানে নদীর ভয়ঙ্কর টান, ও কড়াই আপনি কিছুতেই সামাল দিতে পারবেন না। শেষকালে আপনি শুদ্ধ—

এক মুহূর্তের জন্যে মাথা নীচু করে রইলেন অবিনাশবাবু। পরক্ষণেই যখন তিনি মাথা তুললেন, তখন তাঁর চোখে সেই আশ্চর্য আগুনটা আবার ঝক ঝক করে উঠেছে। কাচের জানালার পেছনে দুটো আলো জ্বেলে দিলে সামনে থেকে যেমন দেখায়, তেমনি দেখাতে লাগল অবিনাশবাবুর চোখ দুটোও—যেন তারার আড়ালে সেখানে কেউ দুটো প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছে।

শান্তগলায় অবিনাশ বাবু বললেন, জানি।

বাবা বোঝাবার ভঙ্গি করে বললেন, তবে? জেনে শুনে ও বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছেন কেন?

এবারে অবিনাশ হাসলেন, অত্যন্ত মিষ্টি করে হাসলেন। রঞ্জুর মনে পড়ল তাঁর আর একদিনের এমনি সুন্দর হাসির কথা, যেদিন সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি 'নিহিলিষ্ট' কিনা।

বললেন, আমি সত্যাগ্রহী চাটুয্যে মশাই। মরাটা আমার কাছে বড় কথা নয়, তার চাইতে ঢের বড় সত্য-পালন। সেই চেষ্টাই আমি করব। একজন মানুষকেও যদি বাঁচিয়ে যেতে পারি, তা হলে মরতে আমার এতটুকু দুঃখ নেই।

বাবা হাল ছাড়েননি তখনো। বললেন, থামুন, পাগলামি করবেন না। যা সম্ভব, তারই চেষ্টা করা ভালো, অসম্ভবের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপদ ডেকে আনবার কোনো সার্থকতা নেই। তা ছাড়া দেশ আপনাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে, এত সহজে আপনারা মরলে চলবে কী করে?

দেশ। কথাটায় বাবা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও একটুখানি খোঁচা দিয়েছিলেন হয়তো—অথবা হয়তো বলেছিলেন নিতান্ত সহজ আর নিরীহভাবেই। কিন্তু অবিনাশবাবু আর বসলেন না, সঙ্গে সঙ্গে পিঠের মেরুদণ্ডটাকে একেবারে সোজা করে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠলেন।

অবিনাশবাবু বললেন, চাটুয্যে মশাই, দেশ বলতে আমি ঝাপসা বা আবছায়া কিছু বুঝি না, একটা মানচিত্রও আমার দেশ নয়। দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে যদি কোনো একটা আলাদা দেশের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তার সম্বন্ধেও আমার কোনো কৌতূহল নেই। আপাতত এই মানুষ-গুলোকে বাঁচানো ছাড়া দেশের প্রতি কোনো বড় কর্তব্য আমি দেখতে পাচ্ছি না।

বাবা বললেন, কিন্তু আপনি পারবেন না।

—অন্তত চেষ্টা করতে পারি, সেইটেই আমার সান্ত্বনা।

বাবা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সময় দিলেন না অবিনাশবাবু। বাইরে এসে তিনি একলাফে আবার তাঁর কড়াইয়ের নৌকোতে উঠে বসলেন। তারপরেই বাঁশের খোঁচায় আবার কড়াই দুলতে দুলতে বন্দরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, লোকটার সত্যিই মাথা খারাপ, বেঘোরে প্রাণটা দেবে বলে মনে হচ্ছে।

অবিনাশবাবুর সত্যিই মাথা খারাপ ছিল কিনা এ প্রশ্নের উত্তর আজো রঞ্জু পায়নি। কিন্তু বাবার শেষ অনু-মানটা কিন্তু ভুল হয়নি। সেই যে কড়াইতে বাঁশের খোঁচা দিয়ে বানের জলের ওপর দিয়ে তিনি ভাসতে ভাসতে চলে গিয়েছিলেন, তারপরে রঞ্জু আর কোনোদিন তাঁকে দেখতে পায়নি—। শুধু রঞ্জু কেন, পৃথিবীর কেউই দেখতে পায়নি।

হ্যাঁ—জলে ডুবে মারা গিয়েছিলেন অবিনাশবাবু। সত্যাগ্রহী রক্ষা করেছিলেন তাঁর কঠিন শপথ। যে দেশের আহ্বানে নামগোত্রহীন মানুষটি সকলের অগোচরে নিঃশব্দে এখানে এসে বাসা বেঁধেছিলেন, সেই দেশের তাগিদেই তিনি আবার তেমনি নিঃশব্দে হারিয়ে গেলেন পৃথিবীর সম্মুখ থেকে। কোথা থেকে তিনি এসেছিলেন কেউ জানে নি, কোথায় তিনি চলে গেলেন সেটাও কেউ জানতে পারল না।

তিরিশ সালের বন্যা। উত্তর বাংলার বুকের ওপরে সর্বনাশা বন্যার ভৈরবী মূর্তি। তার স্মৃতি এখনো সুদূর নয়। রেল লাইন ডুবেছিল, বহু গ্রাম ভেসে গিয়েছিল, মানুষ, গোরু, ছাগল প্রাণ দিয়েছিল অজস্র। তারপর এই বন্যার সেবার কাজে সমস্ত বাংলা দেশ সাড়া দিয়েছিল। ছুটে এসেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁদের সেবা, তাঁদের ত্যাগের কথা রয়েছে ইতিহাসে, লেখা রয়েছে সোনালি অক্ষরে। কিন্তু অবিনাশবাবুর কথা কারো মনে নেই, কারো মনে থাকবার কথা নয়। বেঁচে থেকে যে সত্যাগ্রহী নিজেকে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছিলেন, মৃত্যুর পরেও কারো কাছে তিনি ধরা দিলেন না।

কী করে মারা গেলেন অবিনাশবাবু? দু একজনে জানে সে ঘটনাটা।

নদীর স্রোতে টলমল করছিল অবিনাশবাবুর কড়াই। তবু বহু পরিশ্রমে তিনি বটগাছটার কাছে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু পৌঁছোনো মাত্রেই বিপত্তি দেখা দিলে, এক সঙ্গে আট দশ জন কড়াইয়ের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের ধৈর্য্য নেই, সকলেই সবার আগে প্রাণ বাঁচাতে চায়।

এক মিনিটও সময় লাগল না। জলে মন্থন উঠল কিছুক্ষণ, কয়েকটা মাথা হাত পা ছুঁড়ে এদিক ওদিক সাঁতার দেবার চেষ্টা করল, তারপর প্রবল টানে তাদের আর চোখে পড়ল না। শুধু যেখানে কড়াইটা ডুবেছিল, ক্রমাগত সেখান থেকে কয়েকটা বুদ্বুদ ওপরের দিকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল। যাদের বাঁচাতে গিয়েছিলেন অবিনাশবাবু, শেষ পর্যন্ত তারাই হত্যা করলে তাঁকে।

বাবা শুনে খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, আহা, অমন চমৎকার ভালো লোকটা! বুদ্ধির দোষেই প্রাণটা এমন ভাবে খোয়ালে!

হয়তো বুদ্ধিভ্রষ্টই হয়েছিল অবিনাশবাবুর। কিন্তু সত্যাগ্রহীর সত্যভ্রষ্ট হয় নি।

* * * *

এই সময়ে আরো একটি ছোট ঘটনা ঘটেছিল।

যে মন রূপকথার জগতে ভেসে যেতে ভালোবাসে, কড়ির পাহাড়, হাড়ের পাহাড়, আর ক্ষীরসমুদ্র যার কাছে কিছুমাত্র অবাস্তব নয়, এ ঘটনাও সে অবিশ্বাস করতে পারে নি। বড় হয়ে রঞ্জু বুঝতে পেরেছে চোখের ভুল ওসব, মনের ভুল। কিন্তু সেদিন—সেই মুহূর্তে কা ভয়ঙ্কর সত্য হয়ে উঠেছিল সেটা!

বিকেল শেষ হয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নামছে তখন। পশ্চিমের আকাশ কালো হয়ে আসছে, কালো হয়ে আসছে আত্রাইয়ের জল, অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে দূরে বোধনতলার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বেলগাছগুলোর নীচে। খিড়কির পেছন দিয়ে, বড় পেয়ারা গাছটার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা আত্রাইয়ের ঘাটে গিয়ে নেমেছে, সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল রঞ্জু। আকাশে তাকিয়ে শুনছিল, বাদুড়ের ডানার শব্দে কেমন করে হাল্‌কা অন্ধকারটা মুখর হয়ে উঠছে।

ঠিক এমন সময়। ঠাকুরমার ভাষায়, ঠিক কালী সন্ধ্যেবেলায়। যে সময় দক্ষিণের বাঁকটায় শ্যাঁওড়া বনে পেত্নীরা একে একে ঘুম থেকে জেগে উঠে পলুই নিয়ে বেরোয়—নদীতে আর জলায় মাছ ধরতে, যে সময় আলেয়াদীঘির উঁচু মাদার-কাঁটাভরা ডাঙাটার ওপরে কন্ধ-কাটারা একে একে আলেয়ার আগ্নেয় হাই তুলতে থাকে, ঠিক সেই সময়। যখন মশানীর বানে-ধ্বসা ভাঙা মন্দিরটার ইটের স্তূপের ওপরে বসে মা কালীর ডাকিনী-যোগিনারা হাজার হাজার ফণা তোলা কাল্‌কেউটের মতো কোঁকড়ানো এলোচুল নদীর উদ্দাম বাতাসে শুকিয়ে নেয়, সেই কালী সন্ধ্যেবেলায়।

খানিক দূরে বাসক বনের ভেতরে ডাহুক ডেকে উঠল। ওই ডাহুকের ডাকটা ভালো লাগে না রঞ্জুর—মনে হয় ওদের অদ্ভুত কান্নার সুরের মধ্যে অস্বস্তিকর কী একটা আছে, আছে কোনো একটা অশরীরী ব্যাপার। কয়েক পা পেছনেই রঞ্জুদের গোয়াল, বাবার ঘোড়াটার আস্তাবল, তারপরেই খিড়কির দরজা। সেই দরজার দিকে সে দ্রুত পা চালিয়ে দিলে।

এমন সময় সেই ডাক তার কানে এল।

—রঞ্জু, রঞ্জু!

বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরল রঞ্জু। আশ্চর্য সেই ডাক। বাতাস বইলে নড়েওঠা পাতায় যে খস্‌ খস্‌ করে অস্পষ্ট

একটা শব্দ বাজে, ডাকটা তার চাইতে জোরালো নয়। অথচ, রঞ্জু স্পষ্ট শুনতে পেল, যেন কানের কাছে তীব্র স্বরে কে তাকে ডেকে উঠেছে, রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জন!

সে ডাক, সে গলা ভোলবার উপায় নেই। অবিনাশবাবু।

সত্যিই অবিনাশবাবু। একটু দূরেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। রঞ্জু তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ স্পষ্ট বুঝতে পারছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। কোনো রূপ নেই, কোনো আকার নেই তাঁর। কালো হয়ে আসা আবছা-দিনের আলোর পটভূমিকায় ধূপছায়া রং দিয়ে কে যেন এঁকে রেখেছে তাঁকে—পৃথিবীর অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা পরিবেশের সঙ্গে একাকার হয়ে তিনি মিশে আছেন। তাঁকে দেখা যাচ্ছে না, অথচ তিনি আছেন; তাঁর গলার কোনো স্বর নেই—অথচ স্বরের একটা মূর্ছনা কাঁপছে বাতাসে বাতাসে, রঞ্জুর কানের কাছে দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শব্দ করে কে বলছে, রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জন—

পাথরের মূর্তির মতো থেমে দাঁড়িয়েছে রঞ্জু। বুকের ভেতরে পাথর হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডটা। তার চোখ দুটোয় কোনো পলক পড়ছে না, যেন সে দুটোও পাথরের চোখ।

তারপরেই আকারহীন সে দেহটা চলতে সুরু করলে অবিনাশবাবুর। শব্দহীন কণ্ঠস্বরটা অশ্রান্ত বেজে উঠতে লাগল: রঞ্জু, রঞ্জন, রঞ্জু—

রঞ্জু চলতে সুরু করলে। খিড়কি দরজার দিকে নয়, বাড়ির দিকেও নয়। চলে গেল সে বাদুড়ের পাখা-ঝাপটানো পেয়ারাগাছটার তলা দিয়ে, চলে গেল ডাহুকের কান্না-ওঠা ঘন অন্ধকার বাসক বনটার পাশ দিয়ে। কোনো কিছু তার মনে পড়ল না, কোনো কিছু সে ভাবতে পারল না। মনে পড়ল না, বাইরের বৈঠকখানা ঘরে লণ্ঠনের আলো জ্বলে উঠেছে এতক্ষণে, ভাইবোনেরা সবাই সুর তুলে পড়তে সুরু করেছে বিকট গলায় এবং সে এখনো বই নিয়ে এসে বসে নি বলে তার কাণ দুটো মলে দেবার জন্যে জ্যাঠ্‌তুতো ভাই নীতুদার হাত নিস্‌পিস্‌ করে উঠেছে।

রঞ্জু চলতে লাগল। পায়ে-চলা পথ দিয়ে ক্রমশ এল আত্রাইয়ের নির্জন ঘাটে, তারপর ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে চলতে লাগল। আরো, আরো, আরো, আরো—

সম্মুখে আকারহীন মূর্তিটা চলে যাচ্ছে। তার পায়ে পায়ে কোনো শব্দ উঠছে না, অথচ শুনতে পাচ্ছে রঞ্জু; তাঁর গলায় কোনো স্বর নেই অথচ সে স্বর স্পষ্ট কানে আসছে। এই কালীসন্ধ্যায় অশরীরীরা জেগেছে, অবিনাশবাবুও জেগে উঠেছেন তাঁর মরণ-ঘুম থেকে, আত্রাইয়ের লাল জলের নীচে ঝুরঝুরে মিহি বালির ওপরের ঠাণ্ডা বিশ্রাম থেকে। আর সেই সঙ্গে এই সন্ধ্যাটাও অপরূপ হয়ে উঠেছে। যা দেখা যায় না, তাই দৃষ্টির সামনে প্রত্যক্ষ রূপ ধরেছে, যা নেই তাই নিয়েছে নির্ভুল সত্যের মূর্তি।

কানের কাছে হুহু করে আত্রাইয়ের বাতাস: রঞ্জু, রঞ্জু, রঞ্জু—

রঞ্জু চলেছে—কতক্ষণ ধরে চলেছে খেয়াল নেই। ধূপছায়া রঙের সন্ধ্যাটা ক্রমে নিবিড় কালো হয়ে গেল, আলেয়া দীঘির ধারে নাচানাচি করে উঠল অসংখ্য—অগণিত আলেয়া। অবিনাশবাবুর নিরবয়ব মূর্তিটা তেম্‌নি কালো হয়ে উঠতে লাগল জমাট অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে।

চ্যাঁ—চ্যাঁ—চ্যাঁ—

মাথার ওপরে প্যাঁচার বীভৎস একটা তীব্র চীৎকার।

এতক্ষণে রঞ্জুর চমক ভাঙল। এতক্ষণে যেন ঘুম ভেঙে গেল তার।

এ সে কোথায় এসে পড়েছে! করছেই বা কী! চারদিকে থম্‌থমে অন্ধকার—জনপ্রাণীর চিহ্ন মাত্র নেই। একটু দূরে কবিরাজের বড় আমবাগানটার মাথাগুলো আত্রাইয়ের বাতাসে শোঁ শোঁ করে দুলছে, যেন অতিকায় কতগুলো ভূত-প্রেত মাথা নেড়ে নেড়ে ডাকছে রঞ্জুকে।

আর রঞ্জু একমনে ঘুরে ঘুরে প্রদক্ষিণ করছে একটা টিনের চালার ধ্বংসস্তূপ—অবিনাশবাবুর আশ্রমটা! কতকগুলো ভাঙা খুঁটি মড়ার হাড়ের মতো অন্ধকারে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে, তাদের ওপরে চাপা দেওয়া নানা আকারের কতগুলো টিনের টুকরো। রঞ্জু তারই চারদিকে বার বার ঘুরছে, ঘুরছে বিছুটির জঙ্গল মাড়িয়ে, ভাঁট্‌ ফুলের ঝোপ ভেঙে, জানা-অজানা ছোট ছোট গাছ-গাছালি পায়ের তলায় দলে দলে। চারদিকের বনে জঙ্গলে কালি-ঢালা রাত্রি, জন-মানুষের চিহ্নহীন ঘন অন্ধকারে আম বাগানটার ভৌতিক আহ্বান।

—চ্যাঁ—চ্যাঁ—চ্যাঁ—

মাথার ওপরে আবার প্যাঁচার চীৎকার। যে মুহূর্তে রঞ্জু থেমে দাঁড়ালো, সেই মুহূর্তেই অসীম ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। দ্রোণ ফুলের কষায় গন্ধভরা ঝোপটার ওপরে যখন সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল, তখন শেষবারের মতো তার চোখে পড়ল আকাশের কালো শ্লেটটার গায়ে কতগুলো আলোর অক্ষর দিয়ে কে যেন একটা দুর্বোধ্য লিপি লিখে চলেছে !

ক্রমশঃ

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী

বিনয়াধিকারিক—প্রথম অধিকরণ

দ্বাদশ অধ্যায়

গূঢ়পুরুষপ্রণিধি

মূল :—সূদ, আরালিক, স্নাপক, সংবাহক, আস্তরক, কল্পক, প্রসাধক, উদক-পরিচারক (ইত্যাদিরূপে অবস্থিত) রসদ-গণ, কুব্জ, বামন, কিরাত, মূক, বধির, জড়, অন্ধ (ইত্যাদি) ছদ্মবেশধারিগণ, নট, নর্ত্তক, গায়ন, বাদক, বাগ্‌জীবন, কুশীলবগণ ও স্ত্রীগণ—(ইহাদিগকে) আভ্যন্তর-চার বলিয়া জানা উচিত।

উহাকে ভিক্ষুকীগণ সংস্থাসমূহে অর্পণ করিবে।

সঙ্কেত :—সূদ—রাঁধুনী, সূপকার ; অন্নকার (গঃ শাঃ)। sauce-maker (SH)। আরালিক—এই পদটির অর্থ লইয়া খুব গোলমাল। গণপতি শাস্ত্রীর মতে ইহার অর্থ—ভক্ষ্যকার ; শ্যাম শাস্ত্রীর অনুবাদ—cook. আপ্তে মহোদয়ের অভিধানে ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে—অরালং কুটিলং চরতি ঠক্—one who deals crookedly, a cook—"ধন-লোভেন পরপ্রোৎসাহিতঃ পাচকো বিষাদিসংসৃষ্টং পচতীতি তস্য তথাত্বম্" —ঘুষ খাইয়া কোন কোন পাচক অন্নে বিষ দেয়—তাই তাহার নাম আরালিক (কুটিল-পাচক)। মহাভারতের বিরাট পর্ব্বে (দ্বিতীয় অধ্যায়ে) ভীম বলিতেছেন যে তিনি বিরাটকে ছদ্ম-পরিচয় দিবেন—'আমি যুধিষ্ঠিরের আরালিক গোবিকর্ত্তা, সূপকর্ত্তা, নিযোধক ছিলাম'। নীলকণ্ঠ উহার টীকায় দিয়াছেন—'অরাল' অর্থে মত্ত গজ—তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া যে জয় করে সে আরালিক—'অরালঃ কুটিলে সর্জ্জরসে মত্তদন্তিনি' ইতি বিশ্বঃ। গোবিকর্ত্তা—বড় বড় বলীবর্দ্দের দমনকর্ত্তা। সূপকর্ত্তা—মুদ্‌গাদির রন্ধনকর্ত্তা বা অত্যন্ত উপকারী। নিযোধক—না মারিয়া মল্লযুদ্ধকারক। মতান্তরে,—আরালিক—প্রকৃতিগণের গুণদোষ-সূচক অথবা হস্তিদমক—"আরালিকঃ সূচনকো হস্তিনাং দমকস্তথা" ইতি বিক্রমাদিত্যঃ। গোবিকর্ত্তা—গো অর্থে বাক্। বাগ্‌বিকারী—গদ্যপদ্যাদি বাগ্‌ভেদের প্রযোক্তা। অন্য মতে—আরালিক অন্নকার, সূপকর্ত্তা শাককার, তৈলান্ন-পাককার গোবিকর্ত্তা—"আরালিকোঽন্নপাকী স্যাৎ সূপকর্ত্তা তু শাককৃৎ। তৈলান্নং পচতে যস্তু গোবিকর্ত্তা স উচ্যতে"॥ এই মতই এস্থলে সমীচীন মনে হয়। সূদ—শাকপাকী, সূপকার। আরালিক—অন্নপাচক। স্নাপক—স্নান করাইয়া দেয় যে। সংবাহক—অঙ্গমর্দ্দক, shampooer SH)। আস্তরক—শয্যাস্তরণ-কারক—যে বিছানা পাতিয়া দেয়। কল্পক—নাপিত। প্রসাধক—যে প্রসাধন করিতে সাহায্য করে—toilet-maker (SH) ; make-up man বলা উচিত। উদক-পরিচারক—যে জল বহিয়া আনে—ভারী। এই সকল ব্যক্তির ছদ্মবেশে রসদাতা চরগণ অন্তঃপুরে অবস্থান করিতে পারে। কুব্জ—কুঁজো। বামন—বেঁটে। কিরাত—এস্থলে ব্যাধজাতিকে বুঝাইতেছে না—ইহার অর্থ ক্ষুদ্রকায়। বামন ও কিরাতে প্রভেদ এই যে, বামনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিকৃত—যথা—হাত-পা ক্ষুদ্র, মাথাটি বড় হওয়ায় বিকৃতাকার ; পক্ষান্তরে, কিরাতের তাহা নহে—উহার সর্ব্বাঙ্গাবয়ব মানানসই ভাবে ছোট—কোন অঙ্গ ছোট কোন অঙ্গ বড়—এরূপ বিকৃতাকার নহে—pigmy (SH)। মূক—বোবা। বধির—কালা। জড়—নির্ব্বোধ, idiot (SH)।—এই সকলের ছদ্মবেশেও অন্তঃপুরে চারগণের বাস সম্ভব। নট—নবরসাভিনয়কর্ত্তা (গঃ শাঃ) ; actor (SH) ; পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ইহার অর্থ করেন মূকাভিনেতা। নর্ত্তক—নাচিয়ে ; চারণ—অঙ্গবিক্ষেপমাত্র-কর্ত্তা (গঃ শাঃ)—এ অর্থ ঠিক নহে। নর্ত্তক বলিতে ভাবহীন 'নৃত্ত' ও ভাবযুক্ত 'নৃত্য'—এ উভয় প্রকার নটনে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারে। বাগ্‌জীবন—পুরাবৃত্ত-কথনোপজীবী, পুস্তকবাচক, (গঃ শাঃ) ; buffoon (SH) ; কথা বলাই যাহাদিগের পেশা—কথক, ভাঁড়—দুইই হইতে পারে। কুশীলব—বেণ, লঙ্ঘন-প্লবনাদি যে করে—দৌড়-ঝাঁপের খেলা দেখায় (গঃ শাঃ) ; আমাদিগের মনে হয়—কুশীলব বলিতে—রামায়ণাদি কথা-গায়ক বলা সঙ্গত—পরবর্ত্তী যুগে উহা নটের (অভিনেতার) পর্য্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Bard (SH)। স্ত্রী—প্রতারিকা ; নপুংসকগণও ইহার অন্তর্গত।—এই সকল আভ্যন্তরীণ চর বা চার। 'ভিক্ষুকী'-শ্রেণীর 'সঞ্চার'গণ ইহাদিগের নিকট হইতে গুপ্ত বার্ত্তা সংগ্রহ করিয়া 'সংস্থা'-

গণের নিকট জানাইয়া আসিবে। উহাকে—ঐ শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ চরকে। উহাকে সংস্থাসমূহে সমর্পণ করিবে—ঐ শ্রেণীর চরকে সংস্থাগণের নিকট লইয়া যাইয়া তাহাদিগের হস্তে সঁপিয়া দিবে। অথবা—ঐ শ্রেণীর চরের নিকট হইতে সংগৃহীত সংবাদ সংস্থাগণের নিকট জানাইবে। চার শব্দের অর্থ চর; গৌণভাবে চর-কর্তৃক জ্ঞাত রহস্যের নামও 'চার' (secret information); ঐ চার (গুপ্ত রহস্য) ভিক্ষুকীগণ সংস্থাগণের নিকট সমর্পণ করিবে অর্থাৎ গোপনে জানাইয়া আসিবে—shall deposit this secret information with the institutes of espionage.

মূল :—সংস্থাসমূহের অন্তেবাসিগণ সংজ্ঞা ও লিপি দ্বারা চার সঞ্চার করিবেন।

সঙ্কেত :—অন্তেবাসিগণ—একাদশ অধ্যায়ে যে পঞ্চ সংস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর যাহারা প্রধান পুরুষ, তাহাদিগের বহু শিষ্য বা অনুচর থাকিবে—ইহাও ঐ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ঐ সকল শিষ্যকে বলা হইয়াছে উহাদিগের 'নিজ নিজ বর্গ'। ঐ বর্গ বা শিষ্যই 'অন্তেবাসী'। অন্তেবাসী অর্থে সেবক, ছাত্র। শ্যাম শাস্ত্রী অনুবাদ করিয়াছেন—immediate officers of the institutes of espionage—কোথা হইতে এ অর্থ তিনি পাইলেন—বুঝা গেল না। সংজ্ঞা—সঙ্কেত; লিপি—লিখিত পত্র। গণপতি শাস্ত্রী 'সংজ্ঞা-লিপি' একপদ ধরিয়াছেন—'অর্থ-সূচনের উদ্দেশ্যে নিজ সঙ্কেত-কল্পিত পত্র-লিখিত লিপি' (code-letter ?)। শ্যাম শাস্ত্রী—by making use of signs or writing চার-সঞ্চার—চার দ্বিবিধ—বাহ্য ও আভ্যন্তর—উহাদিগের ব্যাপার অর্থাৎ উহাদিগের দ্বারা সংগৃহীত গোপনীয় তথ্যও চার; তাহার সঞ্চার—রাজার নিকট সমর্পণ বা নিবেদন—গণপতি শাস্ত্রীর ব্যাখ্যা। শ্যামশাস্ত্রী অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—shall set their own spies in motion (to ascertain the validity of the information)…অর্থাৎ চার সঞ্চার করিবে—ইহার অর্থ এমন নহে যে, রাজাকে জানাইবার নিমিত্ত চার সঞ্চার (চার ব্যাপার-নিবেদন) করিবে; পক্ষান্তরে—চার-কর্তৃক সংগৃহীত সংবাদ সত্য কি না, তাহা পরীক্ষার নিমিত্ত চার-সঞ্চার (নিজ চর-প্রয়োগ) করিবে। এই অর্থটিই পরবর্তী মূলাংশের অনুকূল মনে হয়।

মূল :—সংস্থাগণ অথবা তাহারা পরস্পরকে জানিবে না।

সঙ্কেত :—শ্যাম শাস্ত্রীর অর্থ—সংস্থাসমূহ ও সঞ্চারসমূহ পরস্পরকে চিনিতে পাইবে না। পক্ষান্তরে অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন গণপতি শাস্ত্রী—সংস্থান্তবর্তী চরগণের মধ্যে পরস্পর চেনা থাকিবে না—ঐরূপ সঞ্চারান্তর্গত চরগণের মধ্যে পরস্পর চেনা বা জানাশোনা থাকিতে পাইবে না; কারণ তাহা হইলে সংবাদছলন বা একের রহস্যজ্ঞানে সকলেরই ক্রমশঃ উহা পরিজ্ঞান ও ফলে গুপ্ত রহস্য প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে। সংস্থাগণের বা সঞ্চারগণের মধ্যে পরস্পর চেনা থাকিলে—এক এক শ্রেণীর চর অন্য শ্রেণীর চরের সহিত পরামর্শপূর্বক মিথ্যা সংবাদ রচনা করিয়া প্রভুকে বঞ্চিত করিতে পারে; অথবা একজন চর প্রথমে একটা গুপ্তকথা জানিল, পরে তাহার নিকট হইতে তাহার পরিচিত আর একজন চর জানিল—এইরূপে ক্রমশঃ সকল চর একই গুপ্ত সংবাদ জানায়—উহা গোপনে না থাকিয়া প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক হয়।

মূল :—ভিক্ষুকীর প্রতিষেধে—দ্বাঃস্থ-পরম্পরা, মাতা-পিতার বেশধারী (স্ত্রীপুরুষগণ), শিল্পকারিকাবৃন্দ, কুশীলবগণ অথবা দাসীগণ-গীত—পাঠ্য-বাদ্যভাণ্ড-গূঢ়লেখ্য-সংজ্ঞাদি-দ্বারা চার নির্হারিত করিবে। অথবা দীর্ঘরোগ-উন্মাদ-অগ্নি-রসবিসর্গ-ব্যপদেশে গূঢ়নির্গমন (সম্ভব)।

সঙ্কেত :—ভিক্ষুকীর প্রতিষেধে—যদি ভিক্ষুকীর অন্তঃপুরে প্রবেশ প্রতিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত জনগণ চার-নির্হরণ করিবে অর্থাৎ গুপ্ত কথা যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবে। (১) দ্বাঃস্থপরম্পরা—'দ্বাঃস্থ' অর্থে দ্বারে অবস্থিত—দৌবারিক, দ্বাররক্ষী, বা অন্য কেহ। একজন অন্তর্দ্বারস্থিত অপর বহির্দ্বারস্থিতকে—সে আর একজন আরও বহির্দ্বারস্থিতকে—এইভাবে রহস্য ক্রমশঃ বাহিরে সঞ্চারিত করিবে। এই সকল দ্বারস্থিত জনগণও চার-শ্রেণীভুক্ত—ইহা অবশ্য বুঝাই যাইতেছে। মাতা-পিতার বেশধারী—'অন্তঃপুরস্থ সেবকাদির আমি পিতা আমি মাতা আমি ভ্রাতা' এইভাবে আত্মীয়তা সম্বন্ধ পাতাইয়া বাহিরের স্ত্রী-পুরুষগণ অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক চার নির্হরণ করিতে পারে। শিল্পকারিকা—কেশ-সংস্কার, পত্ররচনা (অলকা-তিলকা-কাটা) ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পে অভিজ্ঞা নারী অনায়াসে অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া চার নির্হরণ করিতে পারে। কি কি উপায়ে চার নির্হরণ করিবে ?—(১) গীত-দ্বারা—সূচনীয় অর্থ সুকৌশলে পদবিন্যাস দ্বারা গীতাকারে সংগ্রহ করিয়া চার-নির্হরণ করিতে পারা যায়; যে ব্যক্তি গীতের তাৎপর্য্য তলাইয়া বুঝিবে না, সে উহা সাধারণ গীত বলিয়াই মনে করিবে—কোন সন্দেহ করিবে না। পাঠ্য—ইহা গীত নহে—সাধারণ পাঠ্যাংশ—গদ্য বা কবিতা আবৃত্তির উপযোগী। বাদ্য—বাঁশী, বীণা ইত্যাদি। ভাণ্ড—ঢাকজাতীয় বাদ্য। বাদ্য চারি শ্রেণীর—(১) তত—তন্ত্রীবাদ্য, (২) সুষির—বায়ুদ্বারা ছিদ্রপূরণে যাহা বাজান হয়—বংশীজাতীয়, (৩) ঘন—ধাতুবাদ্য (করতালাদি) ও (৪) অবনদ্ধ—ঢক্কাজাতীয়। শেষোক্ত শ্রেণীকে 'ভাণ্ড' বলে—আর প্রথম তিন শ্রেণীর সাধারণ নাম 'বাদ্য'। গণপতি শাস্ত্রী ইহা না বুঝিয়া অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন—তাঁহার মতে 'ভাণ্ড-গূঢ়লেখ্য-সংজ্ঞা' একপদ—ভাণ্ডে জলকুম্ভাদিতে নিক্ষিপ্ত গূঢ়লেখ্য-দ্বারা যে সংজ্ঞা (অর্থ-সূচনা) প্রদত্ত হয়—তাহার দ্বারা। শ্যাম শাস্ত্রী অনুবাদে ভুলও করিয়াছেন—বাদও দিয়াছেন—under the pretext of taking in musical instruments—বলিয়া ছাড়িয়াছেন। বাদ্যাদি অন্তঃপুরে লইয়া যাইবার ছলে—এ অর্থের কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কারণ, বাদ্যাদি ব্যতীত অন্য বহু প্রয়োজনীয় বস্তু ভিতরে লইয়া যাইবার ছলে চার-নির্হরণ করা যায়। এস্থলে ঐরূপ অর্থ নহে। গানের পদাবলীর সাহায্যে অথবা বাজনার বোলের সঙ্কেতের সাহায্যে রহস্য বাহিরে জানাইয়া দেওয়া যায়—ইহাই

তাৎপর্য্য। গূঢ়লেখ্য—code writing, cipher-writing (SH); সাঙ্কেতিক লেখা। সংজ্ঞা—লেখন ব্যতীত অঙ্গ-সঞ্চালনাদি অন্য প্রকার সঙ্কেত (signs), চার-নির্হরণ—চর-সংগৃহীত গুপ্ত তথ্য অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আনয়ন করা—convey the information (SH); cause to leak out the secret—বলা সঙ্গত। দীর্ঘকালব্যাপী রোগ—chronic diseases. অগ্নি রস-বিসর্গ—অগ্নিদান অথবা বিষদান। দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ, উন্মাদ ইত্যাদি ব্যপদেশে অন্তঃপুর হইতে বহির্নিগমন সম্ভব। অগ্নিদান বা বিষদান—অন্তঃপুরে অগ্নি দিলে বা কাহাকেও বিষ দিলে যে হৈ-চৈ উঠিবে—তাহার ফাঁকে গোপনে বাহির হওয়া অনায়াস সাধ্য।

মূল :—তিনজনের একবাক্যতায় সম্প্রত্যয়। তাহাদিগের পুনঃ পুনঃ (পরস্পর) বিরোধে গোপনে দণ্ড (দান) অথবা নিষেধ (কর্ত্তব্য)।

সঙ্কেত :—তিনজন চরের কথা যদি মিলিয়া যায়, তবে তাহারা সত্য বলিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে। মূল—অভীক্ষ বিনিপাতে—তাহাদিগের কথার যদি বার বার পরস্পর গরমিল হয়, তাহা হইলে গোপনে তাহাদিগের শাস্তি বিধান কর্ত্তব্য, অথবা চরের কার্য্য হইতে প্রতিষেধ বা অপসারণ কর্ত্তব্য। প্রতিষেধ—কর্ম্ম হইতে দূর করিয়া দেওয়া, dismissal.

মূল :—'কণ্টকশোধন'-(নামক অধিকরণে) কথিত চরগণ পর (নৃপাদির) নিকটে বেতন স্থির করিয়া বাস করিবে। চোর (ধরিবার) নিমিত্ত একমত্য (হইতে পারে)। তাহারা উভয় (রাষ্ট্রের) বেতনভুক্ (হইবে)।

সঙ্কেত :—কণ্টকশোধন অধিকরণ—উহার চতুর্থ অধ্যায়ে স্ব-পররাষ্ট্রগত সিদ্ধ-তাপস প্রব্রজিত ইত্যাদি বহু শ্রেণীর চরগণের কথা উল্লিখিত আছে। মূল—অপসর্প-চর। পরেষু—শত্রুর নিকটে। পর—শত্রু। পরেষু বহুবচন—পর রাজা ও উহার মন্ত্রি পুরোহিতাদি অষ্টাদশ তীর্থ। ইঁহাদিগের নিকট বেতন স্থির করিয়া বাস করিবে—পররাষ্ট্রগত চরগণ; তাহারা স্বরাষ্ট্র হইতে কোন বেতন পাইবে না—পররাষ্ট্রেই তাহারা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া লইবে। পরবর্ত্তী অংশের পাঠ লইয়া মতভেদ আছে। শ্যাম শাস্ত্রীর পাঠ—সম্পাতশ্চোরার্থং—when they aid both the states in the work of catchig hold of robbers—ইহা ব্যাখ্যা-মাত্র—অনুবাদ নহে। সম্পাত—মতের ঐক্য-সম্পাদন; unanimity, concord agreement, pact, যখন চোর ধরিবার উদ্দেশ্যে শত্রু ও বিজিগীষু—উভয় রাষ্ট্র একমত হইয়া (প্যাক্ট করিয়া) সাধারণ চর নিযুক্ত করিবে, তখন সে চর উভয় রাষ্ট্রেরই বেতনভুক্ হইবে। An agreeme t between both states as to catching thieves through the same spies Jolly. গণপতি শাস্ত্রীর পাঠ—সম্পাতনিশ্চারার্থং—তিনি অর্থ করিয়াছেন—সম্পাতগণের (অর্থাৎ চারগণের) নিশ্চারার্থ (অর্থাৎ পররাষ্ট্রে অনায়াসে অনুষ্ঠানার্থ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে শত্রুচারগণের স্বরাজ্য অপসর্পণে প্রবৃত্তি দূর করিবার নিমিত্ত); তাৎপর্য্য—এই সকল চর পররাষ্ট্রে যাইয়া তথাকার চররূপেই বাস আরম্ভ করিবে—ফলে তাহারা বিনা বাধায় পররাষ্ট্রের রহস্য সংগ্রহ করিতে পারিবে, আবার পররাষ্ট্রের চর সাজিয়া থাকায় পররাষ্ট্রের অন্য খাঁটি চরগণকে স্বরাষ্ট্রে আসিতে দিবে না—তাহাদিগকে এই বলিয়া অন্য মুখে ফিরাইবে—'আরে ও রাজ্যের খবর আন্‌তে ত আমিই যাচ্ছি, তুমি আর কেন যাবে—তুমি অন্য রাজ্যে যাও'। এই সকল চর দুই রাষ্ট্রেরই বেতন খাইবে। Jolly—in order to make collusion manifest—কি অর্থ ইহার তিনি নিজেই ভাল বুঝেন নাই—প্রশ্ন-চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছেন।

মূল :—উভয়-বেতন-(ভুক্) চরগণের পুত্র-দারসমূহ স্ববশে রক্ষা করিবেন (রাজা); আর তাহাদিগকে অরিপ্রহিত বলিয়া জানিবেন; ও তাহাদিগের শুচিতা তদ্বিধ (চরগণ) কর্ত্তৃক জানিবেন।

সঙ্কেত :—যাহাদিগকে উভয়বেতন চর করা হইবে, পূর্ব্বেই তাহাদিগের স্ত্রী-পুত্রগণকে রাজা নিজবশে (জামিনরূপে) রাখিবেন—নতুবা ঐ সকল চর পররাষ্ট্রের অনুগত হইয়া স্বরাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে। গণপতি শাস্ত্রী বলিয়াছেন—'পূজাপূর্ব্বক নিজবশে রাখিবেন'—পূজাপূর্ব্বক বলা অসঙ্গত; শ্যামশাস্ত্রীর অনুবাদ বরং ভাল—kept (as hostages)—জামিন রাখিবেন—পূজাপূর্ব্বক কেন? তাহাদিগকে অরিপ্রহিত বলিয়া জানিবেন—ইহা সত্ত্বেও তাহাদিগের উপর পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন—তাহারা শত্রু-প্রেরিত চর বলিয়া ধরিয়া লইয়াই তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবেন। আর এই সকল উভয়-বেতন চরের শুচিতা তাদৃশ উভয়-বেতন চরের সাহায্যেই নিরূপিত হইবে।

মূল :—এইরূপে শত্রু, মিত্র, মধ্যম ও উদাসীন রাজগণের প্রতি ও তাহাদিগের (প্রত্যেকের) অষ্টাদশ তীর্থসমূহেও চর প্রেরণ করিবেন।

সঙ্কেত :—মধ্যম—তুল্যবল, intermediate; উদাসীন—মধ্যস্থ, neutral—ইহাদিগের পারিভাষিক অর্থ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। অষ্টাদশ তীর্থ—মন্ত্রি পুরোহিত-সেনাপতি ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ কার্য্যস্থান eighteen government departments (S H); high officials—Jolly কালিদাস রঘুবংশে (১৭.৬৮) বলিয়াছেন—"অতীর্থাদপ্রচারিতাং"—মল্লিনাথ উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"মন্ত্র্যাদ্যষ্টাদশাস্থকতীর্থপথাত্তম্।" Jolly বলিয়াছেন—মহাভারতে—সভাপর্ব্বে (৫.৩৮)—এই অষ্টাদশ তীর্থের উল্লেখ আছে—"কচ্চিদষ্টাদশান্যেষু স্বপক্ষে দশ পঞ্চ চ। ত্রিভিস্ত্রিভিরবিজ্ঞাতৈর্বেৎসি তীর্থানি চারকৈঃ"॥—ইহার টীকায় নীলকণ্ঠ পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ তীর্থেরই নাম করিয়াছেন। তাঁহার মতে পররাষ্ট্রে অষ্টাদশতীর্থে ও স্বরাষ্ট্রে মন্ত্রি-পুরোহিত-যুবরাজ ব্যতীত পঞ্চদশতীর্থে পরস্পর অজানা তিনটি করিয়া চর-নিয়োগ কর্ত্তব্য। তাহাদিগের মতৈক্যে আনীত রহস্যকথা সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। —ইহা অর্থশাস্ত্রেরই মতানুকূল। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড (১০০।৩৬),

পঞ্চতন্ত্র (৩.৬৯)—ইত্যাদি স্থলেও অষ্টাদশ তীর্থের বিবরণ আছে। রাজতরঙ্গিণীতে (১।১২০) কথিত অষ্টাদশ কর্ম্মস্থানও (government offices) তুলনীয়।

মূলঃ—তাঁহাদিগের অন্তর্গৃহচর কুব্জ-বামন-ষণ্ড-শিল্পবতী নারীগণ ও নানাপ্রকার ম্লেচ্ছজাতিগণ।

সঙ্কেত :—শত্রু ও তাঁহার অষ্টাদশ তীর্থের অন্তর্গৃহচর। ষণ্ড—নপুংসক।

মূল :—দুর্গসমূহে বণিগ্‌গণ সংস্থা-(রূপে রক্ষণীয়); দুর্গান্তে সিদ্ধতাপসগণ (সংস্থা); রাষ্ট্রে কর্ষক ও উদাস্থিত-গণ (সংস্থা); রাষ্ট্রান্তে ব্রজবাসিগণ।

সঙ্কেত :—দুর্গ—দুর্গবিশিষ্ট রাজধানী প্রভৃতি মহানগরে। দুর্গান্তে—দুর্গসীমায়। কর্ষক—কৃষক (বাঙ্গালায়)। রাষ্ট্রান্তে—রাষ্ট্রসীমায়। ব্রজবাসী—গোপাল।—ইহারা সংস্থারূপে চরকার্য্য করিবার নিমিত্ত স্থাপনীয়।

মূল :—বনে বনচর, শ্রমণ, অটবীপাল প্রভৃতি শত্রুসংবাদ-জ্ঞানার্থ শীঘ্রকারী চারপরম্পরা কর্ত্তব্য।

সঙ্কেত :—গণপতিশাস্ত্রীর অন্বয়—শ্রমণ-আটবিক প্রভৃতিকে বনে বনচর করণীয়। শত্রু-সংবাদজ্ঞানার্থ ক্ষিপ্রকারী চারপরম্পরা করণীয়। শ্যামশাস্ত্রীর অন্বয়ানুযায়ী অনুবাদ উপরে দেওয়া হইয়াছে—ইহাই স্বাভাবিক মনে হয়। শ্রমণ—বৌদ্ধভিক্ষু বা জৈন ভিক্ষু (ক্ষপণক) আটবিক—অটবীপালক। মূল—পরপ্রবৃত্তি—শত্রুর বার্ত্তা।

মূল :—(স্বরাষ্ট্রের) তাদৃশ (চরগণ)-কর্ত্তৃক শত্রুর এই সকল তাদৃশ চরগণ জ্ঞাতব্য। গূঢ় ও অগূঢ় সংজ্ঞিত সংস্থা-সমূহ চার-সঞ্চার করিয়া থাকে।

সঙ্কেত :—শ্যামশাস্ত্রী টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া অন্বয় করিয়াছেন—শত্রুর এই (চরগণ) জ্ঞাতব্য ; তাদৃশ-কর্ত্তৃক তাদৃশ চরগণ (জ্ঞাতব্য)। অবশিষ্ট অংশ অনুবাদে দ্রষ্টব্য। তাদৃশ—যে যে শ্রেণীর চর, সে সেই শ্রেণীর শত্রুপক্ষীয় চরকে সহজেই ধরিয়া ফেলিতে পারে। স্বরাষ্ট্রের সমশ্রেণীর চরকর্ত্তৃক পররাষ্ট্রের স্বজাতীয় চরকে ধরিয়া ফেলা উচিত। পক্ষান্তরে, গণপতি শাস্ত্রী একটানা অন্বয় করিয়াছেন—এই সকল তাদৃশ (উক্তজাতীয়) গূঢ় হইয়াও অগূঢ় চিহ্নধারী শত্রুর চারসঞ্চারিগণ (অর্থাৎ সত্রিতীক্ষ্ণাদি) ও সংস্থাসমূহ (কাপটিকাদি) তজ্জাতীয় (চরগণ)-কর্ত্তৃক বিজ্ঞেয়। গূঢ় হইয়াও অগূঢ় চিহ্নধারী—বোধ হয় ইহার তাৎপর্য্য—প্রকাশ্য চিহ্ন (তাপস প্রভৃতি) যাহাই হউক না কেন, গূঢ়চিহ্নানুযায়ী তাহার চর।

মূল :—অকৃত্য (রাষ্ট্র) মুখ্যগণকে কৃত্যপক্ষীয় কার্য্য-হেতুসমূহ-দ্বারা বোধিত করিয়া পর (রাষ্ট্রগত) চরজ্ঞানার্থ রাষ্ট্রান্তে বাস করাইবেন॥

সঙ্কেত। এই শ্লোকটির অর্থ কিছু দুরূহ। গণপতি শাস্ত্রীর অর্থ :—'কৃত্য' অর্থে সাধ্য—যাহাকে বশে আনা যায়—অনুকূল—দলভুক্ত। অকৃত্য—অসাধ্য, প্রতিকূল, বিরোধী। অকৃত্য (অর্থাৎ অসাধ্য, বিরোধী) মুখ্য (অর্থাৎ রাষ্ট্রমুখ্য) গণকে কৃত্যপক্ষীয় (অর্থাৎ সাধ্যপক্ষোচিত) কার্য্য-কারণ-ভাব-সমূহের সাহায্যে সাধ্যতা যাহাতে হয় এরূপভাবে দর্শিত (অর্থাৎ বোধিত) করিয়া পররাষ্ট্রীয় চরজ্ঞানার্থ রাষ্ট্রসীমায় বাস করাইতে হইবে। যে সকল রাষ্ট্রমুখ্য পুরুষ বিরোধী,—অনুকূল পক্ষের যত কিছু কার্য্য-কারণাদি যুক্তি তর্ক আছে, সে সকলের দ্বার যাহাতে তাঁহাদিগের অনুকূলতা সাধিত হইতে পারে, এই ভাবে তাঁহাদিগের নিকট যুক্তি প্রদর্শন করিয়া পরে তাঁহারা কিছু অনুকূল হইলে শত্রু রাষ্ট্রের চর খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সীমায় তাঁহাদিগকে বাস করান উচিত। পক্ষান্তরে, শ্যামশাস্ত্রী অন্যরূপ অর্থ করেন—যে সকল রাষ্ট্রমুখ্যের শত্রুভাব রাজপক্ষীয়গণ-কর্ত্তৃক দর্শিত হইয়াছে। শত্রুপক্ষীয় চর ধরিবার সুবিধা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রের সীমায় বাস করাইতে হইবে। আসলে গোলমাল হইতেছে—'কার্য্যহেতুভিঃ দর্শিতান্' এই দুইটি পদ লইয়া। কার্য্যহেতুভিঃ—তাঁহাদিগের কার্য্যরূপ হেতু দ্বারা ; দর্শিতান্—প্রদর্শিত হইয়াছে স্বরূপ যাঁহাদিগের। অর্থাৎ—নিজ নিজ কার্য্যরূপ হেতুদ্বারা যাঁহারা দর্শিত হইয়াছেন (যাঁহাদিগের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে), এমন অকৃত্য (রাজবিরোধী) রাষ্ট্রমুখ্যগণকে শত্রুচর ধরিবার নিমিত্ত রাষ্ট্রসীমায় বাস করাইতে হইবে। ইহাদিগের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন কাহারা ? কৃত্যপক্ষীয় চরগণ—রাজার অনুকূল চরগণ-কর্ত্তৃক ইহাদিগের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে।—এইরূপ অর্থই বোধ হয় শ্যামশাস্ত্রীর অভিপ্রেত। কিন্তু তাহার অনুবাদ মূলানুগ হয় নাই।

"ইতি বিনয়াধিকারিক-নামক প্রথম অধিকরণে গূঢ়পুরুষোৎপত্তি প্রকরণে সঞ্চারোৎপত্তি নামক দ্বাদশ অধ্যায়॥

বেহালা

শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল

নগদ দু-আনা দাম হলেও তার উপকরণগুলি কম নয়। বিগৎ দেড়েক চীনে বাঁশ। ঐ বাঁশেরই দুটো টুকরো দিয়ে তৈরী দুটো কান, এস্রাজের তার খানিকটা, আর পোড়া মাটির তৈরী ডিবে একটা, পাৎলা চামড়া দিয়ে ঢাকা। বলে নাকি ব্যাঙের চামড়া। তার ওপর আবার ছোট একরত্তি একটু মোটা চাঁচাড়ি টেলিগ্রাফের তারের মত শক্ত করে তারটাকে ধরে রেখেছে। সরু বাঁখারীর তৈরী ধনুকাকার ছড়ি, ঘোড়ার বালাঞ্চি

দেওয়া। উপরন্তু একটু রজন, একেবারে ফাউ। চাইলেই পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ধরে বাজানো যায়। তারপর হয় কান মোচড়াতে গিয়ে তারটা যায় ছিঁড়ে, না হয় ভিজে হাওয়া লেগে চামড়াটা ঢব্ ঢব্ করে। তখন আর সেই চাঁচাড়ির টুকরোটাকে কিছুতেই খাড়া করে দাঁড় করানো যায় না। হাত থেকে একবার ফসকে পড়ে গেলে তো কথাই নেই। মাটির ডিবেটা নির্ঘাৎ ভেঙে যাবে। হাত থেকে না পড়ে গিয়ে বরং তারটা ছিঁড়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ তাহলে ডিবেটাকে ঢাকের মত করে বাজানো যেতে পারে। ঝাঁটার কাঠির তীর তৈরী করে ছড়িটাকে সত্যিকার ধনুকের মতও ব্যবহার করা চলে। কাটির তীরগুলো তাগ করে ছুঁড়লে বাজারের ঝুড়ীতে রাখা থোড়, মোচা, কিংবা বেগুনগুলোয় বেশ বিঁধে যায়। বাঁশের টুকরো, কানদুটো আর ছেঁড়া তারটা দিয়ে ভাঙা কাঠের ইঞ্জিনটার পাশে খানকতক বই দিয়ে খাড়া করে রেখে করা যায় একটা প্রায় সত্যিকার টেলিগ্রাফের পোস্ট্। বইয়ের সেই ছোট্ট রঙিণ পাখাটা কেটে তুলে নিয়ে তারের ওপর কোনো রকমে আটকে দিলেই তো মনে মনে রাণাঘাট থেকে দিব্যি ট্রেণে করে হুস্ হুস্ করে আসা যায় ক'লকাতায়। ...সন্তোষ অসহিষ্ণুভাবে দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করে তারের ওপর টানা-টানা দুটো আওয়াজ শোনবার জন্যে। কেন যে আজকাল আসে না এদিকে সেই বেহালাওয়ালাটা!

অথচ তার সেই বেহালাটা যখন আস্ত ছিল তখন তো লোকটা প্রায়ই দুপুরের দিকে যেতো এদিক দিয়ে, বেহালা বাজাতে বাজাতে। মুখে কিছু বলে না, "বেহালা চাই" কিংবা কিছু, শুধু বেহালা বাজাতে বাজাতে চলে যাবে। দুটো তারে দু-রকম সুর। যার বেহালা কেনবার দরকার, সে নিজেই ডাকে জানলা দিয়ে "এই বেহালাওয়ালা!" সন্তোষ এক-একবার ভাবে, হাত থেকে তার নিজের বেহালাটা যদি কতকটা ইচ্ছে করে এবং কতকটা অনিচ্ছায় শানের মেঝের ওপর ফেলে দেওয়া যায়, তাহলে এক্ষুণি ডাকা যায় জানলা দিয়ে: "এই বেহালাওয়ালা!" কিন্তু কী করে সে বলবে ঐ নির্জলা মিথ্যে কথাটা যে, বেহালাটা আপনা থেকেই পড়ে ভেঙে গেছে, সেও একটা সমস্যা। তার চেয়ে তার পুরোণোটাই থাক, যতদিন থাকে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ওটা একদিন না একদিন খারাপ হয়ে যাবেই, আগেকারগুলোর মত। সুতরাং দুদিন সবুর করা ছাড়া উপায় কী?

তারপর একদিন সত্যিই সেটা নষ্ট হয়ে গেলো। তারটাকে গেরো বেঁধে জোড়াতাড়া দিয়েও বেশীক্ষণ টনকো করে রাখা গেলো না, তার ধরে রাখা চাঁচাড়িটাও গেলো দুমড়ে। সুতরাং ওটাকে আর বাজানোই চলে না। কিন্তু সেই থেকে বেহালাওয়ালাটাও যে কোথায় উধাও হয়েছে তার আর পাত্তাই পাওয়া যায় না।

সন্তোষ ঠিক করেছিল, রথের মেলায় গিয়ে একটা নিশ্চয়ই কিনবে সে। কিন্তু তার বরাত দেখো! ঠিক আগের দিন হলো তার জ্বর। উল্টো রথের দিন সন্তোষের বাবা প্রদ্যোৎকে কারা এসে মোটরে করে তুলে নিয়ে গেলো, ক'লকাতার বাইরে কোথায় সেই শ্রীরামপুরে, সাহিত্য না কিসের একটা বাসরে। যাবার সময়ে প্রদ্যোৎকে মনে করিয়ে দিলে সন্তোষ: "বাবা, আমার সেই বেহালাটার কথা ভুললে চলবে না কিন্তু।" প্রদ্যোৎ বলে গেলো "আচ্ছা চেষ্টা করে দেখবো'খন।" সন্তোষ না ঘুমিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর ঐখানেই ক্রমে বসে তারপর ঘুমিয়ে পড়লো চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে। সকালে উঠে দেখে সে রোজকার মতই শুয়ে আছে বিছানায়। তার বাবা তখনো ঘুমোচ্ছে। মা ডেকে নিয়ে যায় ও-ঘরে: "আয় আয় সন্তু দেখবি আয়, কী এনেছে তোর জন্যে!" তার-বাঁধা, নেতিয়ে পড়া ফুলের মালা একটা···আর একটা···ছোট কাঁঠাল! যাও, ওসব সে চায় না কিছু! কৈ তার বেহালা? এত করে মনে করিয়ে দিলে, তবু বাবার মনে থাকে না। নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে ভুলে যায়।

তারপর অনেকদিন চলে গেছে, দিনের গায়ে গায়ে মিশে। সন্তোষের খাওয়া হয়ে যাবার একটু পরেই আসে দুপুর, পা টিপে টিপে। পথ দিয়ে গরুগুলো আস্তে আস্তে চলে যায়—পড়ে থাকা শালপাতা, কলাপাতা, আমের আঁটি কিংবা ঐরকম যা কিছু জিভ দিয়ে সাপটে মুখে তুলতে তুলতে। এইবার সে শুনতে পাবে নাকি?···

সেদিন সন্তোষের খাওয়া হয়ে গেছে। প্রদ্যোতের ভাত বাড়া। ঠিক এই সময়টিতে আসে পিওন। সব দিন

আসে না। তবু প্রদ্যোৎকে তার জন্যে দোর খুলে বসে থাকতে হয়। সেই গল্পটার টাকা আসবার কথা অনেক দিন। দু দিন কলকাতার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে হেঁটে গিয়ে পত্রিকাটার আফিসে খোঁজ করে এসেছে, টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেকদিন। দশটা টাকা। পিওনটাকে বক্শিস্ দিতে হবে দু-আনা। থাকবে ন'টাকা চোদ্দ আনা। মোড়ের আলুর দোকানটায় দেনা পড়েছে তিন টাকার ওপর, ডাক্তারখানাতেও প্রায় দু-টাকা। সব দিয়ে থুয়ে তার হাতে গোটা তিনেক টাকাও থাকবে কিনা বলা যায় না। পরের গল্পটার টাকাটা কবে পাওয়া যাবে তার স্থিরতা নেই। তবুও বাড়ীতে বাক্সে এ টাকাও যে কদিন থাকবে সে কদিন সে সুস্থ মনে অন্তত: আরো গোটা দুই তিন গল্প লিখে ফেলতে পারবে। ঐ তিনটে টাকার মনের জোর কম নয়। আজ তার হাতে প্রচুর সময়। সকাল থেকে খরচ করে উঠতে পারছে না। তবু সে লেখবার মত সুস্থ মন খুঁজে পায় না। পাঞ্জাবীর ঘড়ির পকেটে তার মাত্র পাঁচটি ডবল পয়সা আছে। কোনো গুরুতর প্রয়োজনের জন্যে কিছুদিন আগে লুকিয়ে রেখেছে নিজের কাছ থেকে। প্রদ্যোৎ ভাবছে ঐ দশটা পয়সা কালই হয়তো খরচ করতে হবে চাকরীর সেই ইন্টারভিউটার জন্যে। পায়ে হেঁটে জল বৃষ্টি মাথায় করে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া যায় না। সময় মত পৌছতে পারলেও ক্লান্তদেহে ক্লান্ত মনে চাকরীদাতাদের সামনে দাঁড়ালে যে চাকরী যে হওয়া সম্ভব নয়, তা সে কয়েকবারের অভিজ্ঞতাতেই উপলব্ধি করেছে। তাই কাল তাকে যেতে হবে ট্রামে, অন্ততঃ খানিকটা পথ। তাছাড়া দুটো সিগারেট তাকে কিনতেই হবে কাল। একটা ইন্টারভিউতে যাবার ঠিক কিছুক্ষণ আগেই ধরাতে হবে। স্নায়ুবন্ধনীগুলিকে সংযত করবার জন্যে। আর একটা দরকার ইন্টারভিউ থেকে বেরিয়ে বাড়ী ফেরার সুদীর্ঘ পথে নামবার আগেই, মনে ভরসা এনে শরীরের অবশিষ্ট বলটুকুকে একত্র করবার জন্যে। প্রদ্যোৎ ভাবছে। এমন সময়ে শুনতে পেলে বহুদূর থেকে আসা দুটো শব্দ—একটা সা আর একটা মা। সা সা সা সা সা—মা মা মা মা মা—মা-টা কখনো কখনো কোমল হয়ে যাচ্ছে।

সন্তোষ তার শুঁড়-ভাঙা চাকাওয়ালা কাঠের চ্যাপ্টা হাতীটাকে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চৌকিটার চারিধারে। চাকার ঘর ঘর আওয়াজে দূর থেকে আসা বেগলার সুর তার কানেই পৌছয় নি। প্রদ্যোৎ দোরের কাছে বসে দেখতে পায় সেই গাছে গাছে ছায়া-করা পথটা দিয়ে লোকটা বহুদূর থেকে আসছে তাদের পাড়া লক্ষ্য করে। মাথায় তার প্রকাণ্ড ঝুড়ীতে খাড়া খাড়া হয়ে বেরিয়ে আছে সারি সারি বেগলার কানওয়ালা আগাগুলো। শহরের কাছেই কোনো গ্রাম থেকে আসে বোধ হয়। শহরে ঢুকেই একবার হাতের বেগলাটা বাজিয়ে দেয়—সা সা সা সা সা—মা মা মা মা মা! দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে নয়। শহরে ঢুকে কী ভাবে বাজাবে তারই মহড়া ওঠা। একবার বাজিয়ে নিয়ে পথ চলে অনেকক্ষণ। নিঃশব্দে, খোয়া-বাঁধা পথের ওপর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলা ছায়া ফেলতে ফেলতে।

প্রদ্যোৎ তাড়াতাড়ি ভাবতে চেষ্টা করে কী করলে সন্তোষের ঐ ছোট্ট মনটিকে একেবারে অধিকার করে অন্তত: কয়েক মিনিটের জন্যেও ঐ বেগলার আওয়াজ থেকে দূরে রাখা যায়। একটা গল্প আরম্ভ করে দেওয়া ছাড়া উপায় কী, তক্তাপোষের ওদিকটায় বসে, রাস্তা থেকে যতটা দূরে পারা যায়। বলে: "আয় সন্তু, সেই গল্পটা বলি। গোডার্সনের সেই ভাল্লুকের গল্পটা।" দিন দুয়ে খোকার আজ গল্প শোনবার একটুও উৎসাহ নেই। প্রদ্যোৎ বলে চলে: "হ্যাঁ, তারপর, কী বলছিলাম। ভাল্লুকওলাটা ভাল্লুকটাকে নিয়ে ঘুরছে শহরের রাস্তায় রাস্তায়। এমন সময়ে তার পেয়েছে ভীষণ ক্ষিদে। তাই সে করলে কি না। ভাল্লুকটাকে বললে 'এই ব্রুণ্, তুই বোস্ এই দোরগোড়াটায়, লক্ষ্মী হয়ে। আমি একটু খেয়ে আসি।' তারপর সেই যে ঢুকলো খেতে, আর বেরবার নাম নেই। এটা খায়, ওটা খায়, তার আর ক্ষিদেই ভাঙে না। এদিকে ব্রুণ্ বেচারীর একলা একলা ভালো লাগে না। আড়া মোড়া ভাঙে, হাই তোলে…" প্রদ্যোৎ নানা ভঙ্গি করে ভাল্লুকের আড়া মোড়া ভাঙা আর হাই তোলার অভিনয় করে। অন্য দিন হলে সন্তোষ এতক্ষণ হেসে গড়িয়ে পড়ে বলতো: "বাবা আর একবার দেখাও না, কী রকম হাই তোলে।" আজ কিন্তু সন্তোষ

ওর দিকে তাকিয়েও দেখে না। সে ঐ হাতীটাকে নিয়েই মেতে গেছে। প্রদ্যোৎ আবার সুরু করে: "এক যে ছিল হাতী, তার নাম তুমাই।" সন্তোষ বলে: "না আমি চাই না গল্প শুনতে। পথ ছাড়ো শীগ্‌গির, হাতী আসচে। এক্ষুণি তোমার পা'টা মাড়িয়ে দিয়ে যাবে। টেরটি পাবে তখন।" আবার চলে তক্তাপোসের চারিদিকে প্রদক্ষিণ।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে প্রদ্যোৎ দেখে বেহালাওয়ালাটা তাদের পাড়ার কাছাকাছি এসে পড়েছে। বড় রাস্তা থেকে তিন দিকে তিনটে পথ বেরিয়ে গেছে, তিনটে পাড়া লক্ষ্য করে। লোকটা চৌমাথার কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়ালো। তারপর বেছে নিলে ঠিক তাদেরই পাড়ার পথটা। এ পথে ঢুকেই সে আর একবার বেহালা বাজানো মহড়া দিয়ে নিলে। এতক্ষণ সে হয়তো ভাবছিল নানান্ অন্য পাঁচ রকম কথা। এইবার সে খাঁটি ফেরিওয়ালা। তার চলনটাও আর আগের মত আঁকা বাঁকা, ঢেলাগোছা নেই। বেহালাটা এখনো সে বাজাতে আরম্ভ করে নি। এখনো সময় আছে···

প্রদ্যোৎ তাড়াতাড়ি তাশজোড়াটা পেড়ে বলে: "আয় সন্তু, আমরা পেটাপিটি খেলি। তুই নিবি লাল না কালো?" সন্তোষ সংক্ষেপে জানায়, তাশ খেলাতে তার আজ আদৌ অভিরুচি নেই। বেহালাওয়ালাটা তার চলার গতি দ্রুততর করেছে। পাড়াতে এসে ঢুকলো বলে। প্রদ্যোৎ সন্তোষকে দেখায় প্রলোভন: "লুডো খেলবি? স্নেক্‌স্ এ্যাণ্ড ল্যাডার? আয় তোকে দাবা খেলা শিখিয়ে দিই। কিছু খেলবি না? আমার ভারী বিচ্ছিরি লাগছে আজ দুপুরটা। আয় না একটু খেলি। আচ্ছা তা হলে শোন্ বলি সেই গল্পটা···" না, না, না, সন্তোষ কিচ্ছু চায় না, সে তার ঐ হাতীটাকে চরানো শেষ না করে কিচ্ছু করবে না। তার সময়ই নেই ওসব খেলবার! প্রদ্যোৎ বলে: "তবে চ' একটু ঘুরে আসি মাঠের দিকটা। বেশ মেঘলা করেছে। বল্ জামা-কাপড় পরিয়ে দিক্। যা, যা, মা'র কাছে, দেরী করিস নি। চল্ চল্ ভেতরে চল্, চল্ রান্নাঘরে সে কী করচে দেখে আসি। চ', চ', চ', শিগ্‌গির চ'!"···

ঠিক জানলার কাছে আর্ত্তনাদ করে ওঠে সেই মাটির আর বাঁশের তৈরী বেহালাটা—সা সা সা সা সা—মা মা মা মা মা!

"বাবা, ঐ যে বেহালা!"

সন্তোষের চোখ দুটিতে আনন্দ টল্‌টল্ করে। ছুটে যায় জানলার কাছে। "এই বেহালাওয়ালা!"

"ওমা, সত্যিই তো সেই বেহালাওলাটা এসেচে এতদিন পরে!" প্রদ্যোতের কৃত্রিম উল্লাস। বলে: যাতো রে খোকা, নিয়ে আয় তো ঐ চেয়ারের গায়ে ঝোলানো পাঞ্জাবীটা। ঘড়ির পকেটে রাখা দশটি পয়সা থেকে গুণে দেয় চারটে ডবল পয়সা সন্তোষের হাতে। তারপর জানলা দিয়ে বেহালাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করে পরম আত্মীয়ের মত: "হ্যারে তুই কি আমাদের একেবারে ভুলেই গেচিস্! এদিকে আসিস্ নি কতদিন বল্ দিকি?"

অস্পৃশ্যতা নাই

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এসসি

অধ্যাপক নিখিল সেন বলিলেন, আমার কাছে জনকয়েক মাতব্বর নমশূদ্র আবেদন করিয়াছে, আপনারা আমাদের জলাচরণীয় করিয়া লউন। আমরা আপনাদের সর্ব্বতোভাবে সমকক্ষতা করিতে চাহি না। সেন বলিলেন, ব্রাহ্মণদের—বিশেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে। কারণ তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিরা তাহাদিগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে। অধ্যাপক সেনকে এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব বলিয়া যে কথা দিয়াছিলাম তাহার অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অস্পৃশ্যতা নিরাকরণের পাতি দিয়াছেন। 'ভারতবর্ষের' কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে আমি যে প্রচারের সুবিধা পাইয়াছি তাহাতে এ বিষয়টিকে আমি আর একদিক হইতে আলোচনা করিতেছি।

পণ্ডিত যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত এ সম্পর্কে কথা হইতেছিল।

তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। আমাদের বাটিতে যাজন ক্রিয়া করেন। আমি বলিলাম, আমার পিতামহের গোঁড়ামিকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারি না। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, সগোত্র ছাড়া কখনও অন্য ব্রাহ্মণের হাতে পর্য্যন্ত খাইতেন না। তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের আদর্শমতে যে ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছের চাকরী করে বা বৃত্তি গ্রহণ করে তাহারা পতিত। অর্থাৎ আমরা যাহারা গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিয়াছি বা যে সকল মহামহোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী তাহারা পতিত। তিনি বিদেশে যাইলে নিজে হাত পুড়াইয়া, ধূমে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া স্বপাক করিয়া নিজের নিষ্ঠা বজায় রাখিতেন। আর আমরা যাহারা পাচক ব্রাহ্মণের হাতে খাই—তাহারা কি কেহ নিজের বুকে হাত দিয়া বলিতে পারে যে, আমরা এই সকল পাচকের জাতি কুলের বিশেষ হিসাব লইয়া তবে তাহাদিগকে নিযুক্ত করি?

আমার এক পরিচিত ব্রাহ্মণ গৃহে এক পাচক কিছুদিন কাজ করিতেছিল। কিছুদিন পরে দুটি লোক বলিল—সে বামুন নহে কাহার। গৃহকর্ত্তা তাড়াতাড়ি তাহার মাহিনা দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। বেশী অনুসন্ধান করিতে ভরসা হইল না। পাছে কথাটা সত্যই হইয়া পড়ে।

বর্দ্ধমানের চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই রকমের একটি কৌতুকপ্রদ গল্প বলেন। এক মাংস বিক্রেতাকে গোমাংস বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া উত্তম-মধ্যম দিয়া লোকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করে। মাংস বিক্রেতার বন্ধুবর্গ পরামর্শ দিল—ইন্দ্র বাঁড়ুয্যে ছাড়া আর কেহই তাহাকে জেল হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। সে ইন্দ্রবাবুর পা জড়াইয়া তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইল। তিনি লোকটির অপরাধের কথা শুনিয়া তাহাকে এক চোট চটি জুতা পেটা করিলেন। তাহাতেও যখন সে পা ছাড়িল না তখন তাঁহার দয়া হইল। আর কখনও এরূপ করিব না বলিয়া তাহার কেস গ্রহণ করিলেন। মোকদ্দমার দিন ইন্দ্রবাবু হাকিমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাংস-বিক্রেতা বহুদিন হইতে এই ব্যবসা করিতেছে। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাহার দোকান হইতে মাংস যায়। হজুরের বাটিতেও যায়। এপর্য্যন্ত কি তাহারা কেহ তাহার কোন ত্রুটি পাইয়াছে?" যথা সময়ে আসামী খালাস পাইয়াছিল।

যৌবনে এক বন্ধুর বিবাহে খাইতে বসিয়াছি। পাশে এক কায়স্থ যুবক খাইতেছে। খানিক পরে সে বলিল, তাইত হে উড়ে ময়রার বাটী খাইতেছি লোকে বলিবে কি? এ যুবকটির মুসলমান ও সাহেবের হোটেলে যাওয়া অভ্যাস ছিল। কাজেই তাহার অস্পৃশ্যতা নিজের ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য নহে—নিজের আভিজাত্য জ্ঞাপন করিয়া আনন্দ অনুভব করার জন্য—বা আরও হীন, অন্যকে আঘাত করিবার জন্য মাত্র।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আমি ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হই। প্রায় ২৫০ ছেলে থাকিত। উহার মধ্যে এম-এ পরীক্ষার্থীও অনেক। বাঙ্গালার মফঃস্বলের সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেরা এখানে থাকিত। আমিও নবদ্বীপের ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশের লোক এবং আমাতেও যে গোঁড়ামির ভগ্নাবশেষ কিছু না ছিল তাহা নহে। হোষ্টেলের ছেলেরা উচ্চ জাতীয় এবং সুশিক্ষিত। বাঙ্গালার গোঁড়া হিন্দু পরিবারগণ এই সকল যুবককে জামাতৃরূপে পাইবার জন্য লালায়িত থাকিত। এখানে যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম—ছুৎমার্গ এখন ভণ্ডামিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ছেলেদের একটু শরীর খারাপ হইলেই তাহারা চাকরকে দিয়া ভাত আনাইয়া টুলের উপর রাখিয়া বিছানাতেই শুইয়া খাইত। এঁটো গেলাসের জলে হাত ধুইয়া গামছায় মুছিয়া হাত পরিষ্কার করিত। বিকালে বনমালীর দোকানের লুচি, মাংস ও ডিমের তরকারী বিছানায় বসিয়া খাইত। ঠাকুরদাদার আমলের হিঁদুয়ানীতে এ সকলই ম্লেচ্ছাচার। এরা সকলেই পতিত—অস্পৃশ্য।

হোষ্টেলের খাবার ঘরগুলিতে—ব্রাহ্মণের খাবার ঘর—বৈদ্যের এবং কায়স্থের খাবার ঘর এইরূপ লেখা ছিল। কয়েকটি ছেলে আসিয়া আমাকে বলিল, সার ব্রাহ্মণের গৃহে অনেক অব্রাহ্মণ খায় আমাদের ইহাতে বড় অসুবিধা হইতেছে। আমার এখানে কুল শাস্ত্রের চর্চ্চা করিবার ইচ্ছা ছিল না। বলিলাম, তোমাদের যদি ধর্ম্ম রক্ষা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তোমাদের আর একটি স্বতন্ত্র গৃহ করিয়া দিতেছি। ইহাতে তাহারা সম্মত হইয়া গেল। কিন্তু চ'মাস না যাইতে যাইতে 'ঝাঁকের কই' ঝাঁকে গিয়া জুটিল। স্বতন্ত্র গৃহে আর কেহ আসিত না।

ক্রমশঃ বিলাত ফেরৎ বন্ধুরা সংগোপনে নিজের কাহিনী বলিতে লাগিলেন। এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-বংশীয় বন্ধু বলিলেন, জাহাজে প্রথম প্রথম বড় খাবার কষ্ট ছিল। সর্ব্বত্র গোমাংসের সম্পর্ক। খাইতে গেলে যেন বমি আসিত। কোন রকমে ফল ও রুটি খাইয়া জাহাজের দিবসগুলি কাটাইয়া দিলাম। বিলাতে গিয়া একটু সুবিধা হইল। মাংসের সময়ে মেষ মাংসই দিত। কখন কখন ভুল হইত। প্রথম প্রথম বমি হইত। পরে ক্রমশঃ অভ্যাস হইয়া যায়।

পিতামহের যুগের অস্পৃশ্যতায় ভণ্ডামি ছিল না। তাঁহাদের ব্যবহার নমশূদ্র মুচি হাড়ি প্রভৃতির সহিত কর্কশ ছিল না। তাহাদের সহিত সহজভাবে মিশিতেন, গল্প করিতেন, বিপদে পরামর্শ দিতেন, অর্থ বা অন্য সাহায্য করিতেন। তাহাদের শুচিবাই কতকটা নব্য-যুগের অস্ত্র চিকিৎসকের (surgeon) মত। সার্জ্জন শস্ত্র ক্রিয়ার পূর্ব্বে অতিমাত্র শুচি ভাব ধারণ করে। এ সময়ে যদি কেহ তাহাকে ছুইতে যায়, তাহার ব্যবহারের বস্ত্র, অস্ত্র, বা দেহ স্পর্শ করিতে যায়, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত খাপ্পাভাব ধারণ করেন। স্পর্শ করিলে তবে আবার তাহাকে নূতন করিয়া শুচি হইতে হয়। পিতামহের অধিকাংশ সময় পূজা বা শাস্ত্র পাঠে অতিবাহিত হইত। এই সকল কার্য্য তিনি শুচি না হইয়া করিতেন না। এ সময়ে তাঁহাকে নমশূদ্র মুসলমান, বা আমরাও অশুচি হইয়া স্পর্শ করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন, স্নান করিয়া শুচি হইতেন।

তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতীয় ব্যক্তিগণ নিষ্ঠাবান সেকেলে লোকের অস্পৃশ্যতাকে শ্রদ্ধা করিত কিন্তু একেলে তথাকথিত শিক্ষিতের অস্পৃশ্যতার ভণ্ডামিতে কষ্ট হয়—যেই দেখে ইহারা মুসলমান বা সাহেবের হোটেলে যায় ও অন্যান্য অহিন্দু আচার করে। আমরা প্রথম প্রথম ইংরাজী শিখিয়া দেখিলাম, নীচ শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিবার শক্তি হারাইয়াছি।

আমাদের সহিত কথা কহিবার সময় তাহারাও অশান্তি অনুভব করে এবং আমরাও অবস্থানটা অতিষ্ঠ ভাবি। ইতর ও ভদ্রের উভয়ের ঐহিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিক হইতে তখন খুব বেশী পার্থক্য ছিল না। কাজেই কমিউনিজিমের বিশেষ প্রয়োজন হয় নাই। কাপড় একজন ৯হাত, অপরে ৮ হাত পরিত। উভয়েই কুটীরে বাস করিত। শীতের দিনে মোটা চাদরে উভয়েরই শীত নিবারণ হইত। ভদ্রের চটি জুতা জুতার ভান (apology) মাত্র ছিল। ঠাকুর মশায় সমস্ত পথ জুতা বহন করিয়া আসিয়া গ্রামের বাহিরের পুষ্করিণীতে পদধৌত করিয়া জুতা পায়ে দিয়া কুটুম্ব বা শিষ্য গৃহে পৌঁছিতেন। যদি ও তাঁহার নিমন্ত্রণ উপলক্ষে মাঝে মাঝে ভাল ভোজন মিলিত—কিন্তু ইতরদের প্রাপ্য পিঁয়াজ, রসুন, শামুক, গুগলি, কাকড়া ডিম প্রভৃতি মুখরোচক খাদ্যে তাঁহার অধিকার ছিল না।

ইতরদের বর্ত্তমান যুগে ৮ হাত কাপড় ১০ হাত হইয়াছে। গায়ে গেঞ্জি ও হাফ সার্ট উঠিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বর্ত্তমান বংশধরের কি পরিবর্ত্তন! ধুতি ১১ হাত ৪৮ ইঞ্চ বহরের। ইহার এক চতুর্থাংশ বর্জ্জিত হইলে বস্ত্র-দুর্ভিক্ষের দিনে কত নারীর লজ্জা নিবারণের সাহায্য হইত। কত দরিদ্র শিশু শীতের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত। এখন যুবকদের দু'তিন রকমের চটি জুতা, পাম্পসু, সু, স্পোর্টিং সু ইত্যাদি ৫৬ জোড়া জুতা প্রয়োজন। গেঞ্জি সোয়েটার তিন চারিটি। হাফ সার্ট, পাঞ্জাবী, গরমকালীন কোট, শীতকালীন কোট, আণ্ডারওয়ার, প্যান্ট, হাফপ্যান্ট, পায় জামা, আটপৌরে শীতের র‍্যাপার, পোষাকী শীতের র‍্যাপার, বিবিধ রুমাল মাফলার, মোজা, অ্যাটাচিকেস, রিষ্টওয়াচ, ফাউন. টেন পেন! এ সকল পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বর্ত্তমান বংশধরের ব্যক্তিগত পোষাকের অঙ্গ। দরিদ্রের ইহাতে ঈর্ষার উদ্রেক না হইবে কেন?

আগামীবারে সমাপ্য

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

২৪

যথাসময়ে উত্তর আসিল—নিজের জন্যে না হইলেও পিতার জন্যে এ বিবাহে সে প্রস্তুত আছে। অমল হাসিয়া রবীন্দ্রবাবুর নিকটে কহিল—বাঙালী ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃই নিজের জন্যে বিয়ে করে না। আমিও একদিন মায়ের আগ্রহে বিয়ে করেছিলাম।

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—আমিও তাই—বাবার অনুরোধে একান্ত অনিচ্ছায় কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইচ্ছেটা প্রবলই ছিল। দুইজনই হাসিলেন—অতিক্রান্ত-যৌবনের ভাবপ্রবণতা যেন ঠিক এমনই হাস্যকর।

যাহা হউক এক শুভদিনে নন্দিতার সহিত খোকার বিবাহ হইয়া গেল। নন্দিতা অমলকে একাকী কলিকাতায় রাখিয়া যাইতে স্বীকার করিল না, অতএব অমলও খোকার কর্ম্মস্থলে গিয়া বাসা বাঁধিল।

বৎসরাধিক পরের কথা—

অমলের বাতটা বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাই ডাক্তার তাহাকে দেওঘরে যাইয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন। নন্দিতা ও অসুস্থ অমল দেওঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। খোকা ছুটি পাইলে সেখানে আসিয়া সমবেত হইবে।

রোহিনা রোডের ধারে ছোট্ট বাড়ীখানি—পিছনে একটা পাহাড় দেখা যায়। সামনে একটু ফুলবাগান—অমলের আদেশে এবং পরিকল্পনায় রচিত। শীতের প্রারম্ভে নানা ফুল ফুটিয়াছে।

সকালে বারান্দায় রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। নন্দিতা চা খাইবার জন্যে সেখানেই চেয়ার টেবিল ঠিক করিয়া দিয়াছে। অমল রোদে বসিয়া চা'র অপেক্ষা করিতেছিল, নন্দিতা সমস্ত গুছাইয়া লইয়া উপস্থিত হইল। কহিল—দেরী হ'য়ে গেছে বাবা?

—না, রোদে বসে বসে একটু চাঙ্গা হ'য়ে নেওয়া গেল।

চা খাইতে খাইতে অমল কহিল—বৌমা, তুমি আমার বৌমা না হ'য়ে অন্য কেউ হ'লেও কি এমনি যত্ন ক'রতো?

নন্দিতা হাসিয়া কহিল—ক'রতো বই কি? আমি আর কি ক'রছি—

—তোমার শাশুড়ী আজ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আমার মানুষ চিনবার ক্ষমতাকে তারিফ ক'রতো—

—তিনি কেমন ছিলেন?

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—কেমন? বড় শক্ত প্রশ্ন—

গেটের কাছে কয়েকটি মহিলাকে দেখা গেল—তাঁহারা এদিকেই আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা আসিয়াও পড়িলেন। নন্দিতা চাকরকে চেয়ার আনিতে বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল।

অমল চশমাটা আঁটিয়া তারস্বরে কহিল—অপর্ণা যে, এসো এসো। কি সৌভাগ্য, কি ক'রে এলে?

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—তোমার মত বিখ্যাত লোকের ঠিকানা অবস্থিতি জানাটা ত বিস্ময়কর নয়। সেদিন কাগজে পড়লুম তাই আজ এসে উপস্থিত—

—বেশ করেছ। এঁরা?

—এটি আমার বৌমা অর্থাৎ দেবর-পুত্রবধূ, আর এটি—পরিচয় দিতে হইল না বেশেই বোঝা গেল কি? তাহারা চেয়ার গ্রহণ করিলে নন্দিতা কহিল—একটু চা'র বন্দোবস্ত করি?

অপর্ণা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—হুঁ। এটি তোমার—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে অমলের পানে চাহিল। অমল কহিল—আমার খোকাকে মনে আছে?—এতদিনে রাজকন্যা খুঁজে পাওয়া গেছে—

—যাক্, তোমার বৌমাটি সত্যিই রাজকন্যার মত।

অমল রহস্যাবৃত ভাষায় কহিল—রাজকন্যা সে খোঁজে নি, আমি খুঁজে পেয়েছি। পেয়েছি কিনা জানি না, তবে খুঁজে খুঁজে মনে হল এই বুঝি সেই ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা।

—খোকা যেমন রিক্তহস্তে আমার কাছ থেকে ফিরেছিল তেমনি ভাবে ফিরে আস্‌তে হবে না ত?

অমল ঈষৎ হাসিয়া কহিল—ফিরে আস্‌তে হবেই! ঘুমন্তরাজপুরীর রাজকন্যা ত বাস্তব সামগ্রী নয় যে পাওয়া যায়। যাক্, তোমাদের বাড়ী কোনটা—

অপর্ণা আঙুল দিয়া পাশের বাড়ীটা দেখাইয়া দিল ওইটা। ভাগ্যচক্রে আবার পাশের বাড়ী।

অমল সহাস্যে কহিল—ভালই, নইলে এই একাকী কাটাতুম কি ক'রে। সামনের একটা বৎসর যেন বুকে বেধে গেছে, আর কাটে না। তোমার সাথে দেখা হ'য়ে যেন স্বস্তিবোধ ক'রছি—তবুও কাটবে।

অপর্ণা তাহার রেখাকুঞ্চিত মুখখানিকে যথাসাধ্য প্রসন্ন করিয়া কহিল—হ্যাঁ, বসে বসে দীর্ঘদিনের হিসাব নিকাশ করা যাবে।

অমল কহিল—কৃপণের কাজ টাকা বার বার গোনা, আমাদের জীবনের নিষ্ফল সঞ্চয় হয়েছে কৃপণের ধন।

নন্দিতা চা লইয়া আসিল। অমল ঈষৎ হাসিয়া কহিল—বৌমারা বোধহয় আশ্চর্য্য হচ্ছ, আমাদের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখে, না? আমরা একসঙ্গে এম-এ পড়েছি, তাই শুধু পরিচয় নয়, খোকার অর্দ্ধেক মা ইনি; কারণ ছোট-কালের আব্দার আদরের ঝামেলা অনেকখানি পোহাতে হ'য়েছে—তুমি প্রণাম করো বৌমা।

নন্দিতা প্রণাম করিল। অপর্ণা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল—তোমাকে আর খোকাকে একসঙ্গে একবারটি দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হয়।

অমল, খোকা আস্‌বে না?

—আস্‌বে ছুটির অপেক্ষায় আছে। ছুটি পেলেই আস্‌বে—

নন্দিতা অপর্ণাকে কহিল—আমি ওঁকে নিয়ে গেলাম, আপনারা কথাবার্ত্তা বলুন। যখনই দরকার হয় ডাকবেন বাবা—

—অবশ্যই, আর কা'কে ডাকবো?

—রৌদ্রতপ্ত বারান্দায় অপর্ণা ও অমল পরস্পরের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া আপন মনেই হাসিয়া উঠিল। অমল কহিল—তোমারও চুল পেকেছে অপর্ণা।

—আমি অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী এমন ধারণা হ'ল কেন? দাঁতও দু'চারটে পড়েছে—

—হ'লে ভাল হ'ত।

—ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্নও ক'রলে না? আমিও ত কোলে পিঠে ক'রে খোকাকে খানিক মানুষ ক'রেছি—

অমল ব্যঙ্গ করিল—নতুন অপর্ণাকে খুঁজতে খুঁজতে পুরাতন অপর্ণাকে ভুলে গেছি।

—অর্থাৎ?

—আশুতোষ বিল্ডিংএ বেড়াতে গেলাম—ঠিক তেমনটি রয়েছে যেমন আমাদের সময় ছিল। অপর্ণাও অমলের দল বার্দ্ধক্যকে ভুলে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি যেখানটিতে বসে প'ড়তে লাইব্রেরীতে ঠিক সেইখানে বসে একটি মেয়ে তোমারই মত—লোভ হল। নিজে পাইনি, তাই পুত্রকে দিয়ে নিজে পেতে চাইলাম—বৌমা ক'রে ঘরে এনেছি।

অপর্ণা কহিল—হুঁ। কিন্তু এ বুড়োকালেও তুমি ভুলতে পারো নি সে সব কথা—

—না, হাস্যকর মনে হয় তবুও ভুলতে পারি না। আর একটু সাহস থাক্‌লেও হয়ত পরিতাপ ক'রতে হ'ত না!

অপর্ণা স্মিতহাস্যে বিগত যৌবনকে স্মরণ করাইয়া দিয়া

কহিল—আমার পক্ষেও তাই—যাকে জোর করে কথাটা ব'লতে পারলুম না কোনদিন—তোমার বৌমাটি কিন্তু বেশ হয়েছে, না?

—মনে হয়। কিন্তু ও খোকার রাজকন্যা খোঁজার মতই অর্থহীন, তবুও খোঁজার বিরাম নেই আমাদের—ভাল কথা, অজিতবাবু কোথায়? কেমন আছেন।

—ক'লকাতা, ভালই আছেন। অকস্মাৎ এ প্রশ্ন ক'রলে কেন?

—কেন? আনুসঙ্গিক বলেই অবান্তর নয়—তাই। আসবেন না এখানে?

—আস্‌তে পারেন বড়দিনে। তোমার রোগটা কি?

অমল কহিল—বার্দ্ধক্য—তথা বাত। সকাল-বিকেল লাঠি ভর দিয়ে একটু বেড়াই। তুমি বেড়াও না?

—হ্যাঁ, এক সঙ্গে বেড়ানো যাবে, আর কেউ ত নেই পরিচিত।

—বেশ, বেশ প্রস্তাব। কথায় কথায় সময়টা চলে যাবে। আজ একটা প্রশ্ন মনে পড়ে—তুমি ইউনিভার-সিটিতে আমার সঙ্গে অমন আলাপ ক'রলে কেন?

অপর্ণা কহিল—আজ স্বীকার ক'রতে ত বাধা নেই —নিজের সম্মান আভিজাত্য রক্ষার জন্যে অকারণ সাবধানতা আজ আর নেই, তাই ব'ল্‌তে পারি। তোমাকে প্রথম থেকেই আমার বড় ভাল লাগ্‌তো। ব'ললে হয়ত আশ্চর্য্য হবে, পড়বার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য ক'রতুম—

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—এ কথাটা যদি সেদিন জান্‌তুম! তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে কি দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাই ছিল, কিন্তু তোমার কাছে যেতেই সাহস হ'ত না।

—তুমিও কম ভীতু ছিলে না, আমি আলাপ না ক'রলে হয়ত তুমিও ক'রতে না—

অমল প্রতিবাদ করিল—ক'রতুম বই কি, তবে তোমাকে লক্ষ্য করছিলুম, কিছুদিন পরে হয়ত সাহস হত—

অপর্ণা কপালের উপর হইতে একগোছা কাঁচাপাকা চুল সরাইয়া দিয়া কহিল—ছাই হ'ত—প্রথম দিনে বিড়িটা নিয়ে যে বিভ্রাটে পড়েছিলে!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ত ঠিক মনে আছে। মিথ্যা কথাও বলেছিলাম কতকগুলো—সিগার খাই বলেছিলাম না?

—হ্যাঁ তুমি যে রকম ভাবে স্পষ্ট কথা ব'লতে, তাতে কথা ব'লতেই ভয় হ'ত—

—ভয় হ'ত—বল কি! তোমাকেও ত আমার বড্ড ভয় হ'ত।

দুইজনেই অত্যন্ত প্রগলভের মত হাসিয়া উঠিল—যেন সেদিনের সেই ক্ষুদ্র দুঃখ আনন্দ আজ একেবারেই হাস্যকর।

অমল কিছুক্ষণ অপর্ণার মুখের পানে চাহিয়া কহিল —উঃ আজ তোমার দিকে তাকানো যায় না। কলেজের যে ছবিখানা মনের কোণে অঙ্কিত হ'য়ে রয়েছে তার এতটুকুও নেই আজ তোমার মাঝে—

অপর্ণা কহিল—তোমার মাঝেই আছে বুঝি? তুমিও ত বুড়ো—একেবারেই বুড়ো। তোমার লেখাগুলো না থাকলে বিশ্বাসই করা যেত না যে তুমি সেই অমল।

—বটে!

—হ্যাঁ—ঠিক তাই।

নন্দিতা ও অপর্ণার বৌমা আসিয়া উপস্থিত হইল। অপর্ণা কহিল—বেলা হ'য়েছে, আজ উঠি, কেমন?

—বেলা হ'ল? তা হ'ল বই কি! এখন আর বেলা অবেলা কি?

—সত্যিই, তবুও একটা অভ্যাস আছে ত।

—সকাল বিকেল এসো, বুড়োর কাছে বসে কেউ ত তৃপ্তি পায় না। তুমি এলে সময় কাট্‌বে—সময় বুঝে নিদ্রাও আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছে।

অপর্ণা সান্ত্বনার সুরে কহিল—আস্‌বো নিশ্চয়ই। বেড়াতে যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাবো, কেমন?

—হ্যাঁ। আমি অপেক্ষা ক'রবো তোমার জন্যে।

অপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—হ্যাঁ, অপেক্ষা ক'রো।

দ্বিপ্রহরে লেপটায় আপাদমস্তক ঢাকিয়া অমল একখানা দার্শনিক পুস্তক পড়িতেছিল কিন্তু ভাবনাটা নানা দিক দিয়া তাহকে অপর্ণার প্রসঙ্গে লইয়া আসিল। জীবনের সন্ধ্যায় অপর্ণা আর একবার আসিয়াছে তাহার হৃদয়ের করুণা ও সহানুভূতি লইয়া। নিরবচ্ছিন্ন একাকীর

মাঝেও যেন নূতন আলোক—হয়ত সন্ধ্যার আঁধারকে তারার আলোয় আলোকিত করিয়া দিবে—

নন্দিতা আসিয়া কহিল—বাবা, আপনার সেই "মরণাতীত" বইখানার এমাসের কিস্তি পাঠাবেন না। তাঁরা ত আবার তাগিদ দিয়েছেন—

—বড় শীত মা, লিখ্‌তে ইচ্ছে করে না। পরে হবে—

—না বাবা, আপনি বলুন, আমি লিখছি।

অমল আর একটু জড়সড় হইয়া কহিল—কাগজ কলম নিয়ে এসো, দেখি পারি নাকি। ওসব আর ইচ্ছে করে না যেন—কি হ'বে, দুদিন বাদে সবই ত থাক্‌বে পিছনে পড়ে—

নন্দিতা কাগজ কলম আনিয়া লিখিতে বসিল। অমল বলিয়া যাইতেছিল—

চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কে একজন দেখা করিতে আসিয়াছেন। জেরায় জানা গেল, জনৈক মহিলা ও তৎসঙ্গে একটি পরিচারিকা আসিয়াছে। অমল তাহাকে লইয়া আসিতে বলিল।

মহিলাগণ আসিলেন। অমল সহাস্যে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—রমলা দেবী। আশ্চর্য্য, আরও কয়েক বছর বাঁচতে ইচ্ছে করে যেন।

রমলা নমস্কার জানাইয়া কহিল—কাপালিক-কবি-দর্শনে এলাম। ভাগ্যচক্রে আমিও এখানে এসেছি।

—তাইত বলি—সকালে অপর্ণা এসে গেছে, আপনিও এসেছেন। হারানো যৌবনের দিনগুলি যেন ফিরে পেয়েছি। কাপালিকের কথা ভুল্‌তে পারেন নি তা হ'লে!

রমলা বার্দ্ধক্যজীর্ণ মুখখানিতে অক্ষম হাসি ফুটাইয়া কহিল—ভুল্‌তে দিলেন না যে! আপনার লেখা পড়তে পড়তে আর ভুল্‌তে পারলাম না। কিন্তু এত বুড়ো হয়েছেন ভাবি নি—সে দিনের লোকটিকে চেনাই যায় না যেন!

অমল নন্দিতার মাথায় হাত তুলিয়া দিয়া কহিল—এই মা লক্ষীটি আমার একমাত্র পুত্রবধূ। বুড়ো জীর্ণ স্থবির দেহটাকে ওর হাতেই ছেড়ে দিয়েছি—উপযুক্ত পাত্রী।

রমলা ব্যঙ্গের সুরে কহিল—সন্দেহ নেই। বেছে বেছে বেশ সুন্দরী বৌমা এনেছেন—অপর্ণার দ্বিতীয় সংস্করণ—

অমল উঠিয়া কহিল—ঠিক, ঠিক বলেছেন—অপর্ণাকে খুঁজতে খুজতে যেন হটাৎ ওকে পেয়ে গেলাম। কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল, তাই কহিল—মানে, অপর্ণার মত পোষ্টগ্রাজুয়েটের ছাত্রী—অকস্মাৎ আলাপ নাটকীয়ভাবে—আপনার?

—দু'টি মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেছে—একজন শীগ্‌গিরই এখানে আসবে হয়ত'।

—বেশ শীগ্‌গিরই আস্‌তে লিখে দিন। বৌমা বোধ হয় কাপালিক-কবি শুনে হাস্‌ছো—

নন্দিতা হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ। অমন কথা শুনে কার না হাসি পায়।

—ওর ভাইকে পড়াতুম এম-এ পড়বার সময়। একদিন কাব্য প্রসঙ্গে ওঁর কাছে বলেছিলুম, আমি অঙ্কশাস্ত্রে এম-এ পড়ি। উনি মন্তব্য ক'রেছিলেন—আপনি একেবারেই কাপালিক। অমল উচ্চকণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমলাও হাসিতে হাসিতে কহিল—এখনও এ একটা মিষ্টি হ'য়ে রয়েছে, আপনি মিথ্যা কথা ব'ললেন কেন?

অমল কহিল—মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলে কিন্তু বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। যাক্ সে সব কথা দীর্ঘদিন পরে আলোচনা ক'রে কি হবে? দীর্ঘ জীবনের ইতিহাসটা সংক্ষেপে বলুন—

রমলা একটু হাসিয়া ব্যঙ্গের সুরে কহিল—মেয়েদের আবার জীবনেতিহাস আছে নাকি? সংক্ষেপে ব'লতে গেলে বলা যায়—আপনার বিদায়ের কিছুকাল পরে অকস্মাৎ পিতৃদেব এক সৎপাত্রের হস্তে আমায় সমর্পণ ক'রলেন, তার পরে গৃহস্থালি করা, সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্ত্তব্য, যার একদিনের ইতিহাস অন্য সবদিনের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক। কিন্তু আপনার বৌমার শাশুড়ী—

অমল কহিল—বুড়োকালে একলা ফেলে গত হ'য়েছেন আজ ক' বৎসর। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'লাম সঙ্গে সঙ্গে। তবে অপর্ণার সঙ্গে কিছুকালের পরিচয় হ'য়েছিল—

নানা প্রসঙ্গে আলাপ করিতে করিতে বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। অমল নন্দিতার দিকে চাহিয়া কহিল—একটু চা'য় বন্দোবস্ত কর এঁদের, আবার বেরুতে হবে ত?

নন্দিতা চলিয়া গেল। রমলা একাকী অমলের কক্ষের মাঝে নীরবেই বসিয়াছিল, যেন আজ বলিবার, অভিযোগ

করিবার মত কিছুই নাই। অমল হাসিয়া কহিল—আমার বিদায়ের দিনের কথা মনে ক'রে আজও আপনার হাসি পায়, না? কি ছেলেমানুষী ক'রেছি আমরা—

রমলা ম্লান একটু হাসিয়া কহিল—সত্যি হাসি পায়, কিন্তু সেদিন কত দুঃখে কত অভিমানে কত চোখের জলই না ফেলেছি—মনে মনে আপনাকে কত তিরস্কার ক'রেছি। কিন্তু আজ তা স্মরণ ক'রলে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়!

অমল সগর্ব্বে কহিল—কিন্তু দেখুন, কি সুবুদ্ধির পরিচয় সেদিন দিয়েছি, নইলে জীবনে আপনার দুঃখের পরিসীমা থাকতো না। আপনার হঠকারিতাকে এবং আমার নির্ব্বুদ্ধিতাকে বারবার ধিক্কার দিতেন।

অমলা সহজ কণ্ঠেই কহিল—কি ক'রতাম ভেবে লাভ নেই, তবে যা ঘটেছে তার জন্যেও অনুশোচনা করিনি, যা ঘটেনি তার জন্যেও করিনি। আর ও প্রসঙ্গটাই যেন আজ অত্যন্ত অবান্তর—ছেলেবেলায় খেলনা হারালে কেঁদেছি, তার পরে—

—তার পরে যৌবনেও খেলনা ভেঙেছে ব'লে আর একবার কেঁদেছেন, কিন্তু কে জানে এই বার্দ্ধক্যেও আর একবার কাঁদতে হবে কিনা?

রমলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—সে দুর্ব্বলতা আর নেই যে তা নিয়ে এখন যা খুশী তাই করা চলে—

—যাক্, একদিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত। জীবনে আমার কথা পুনরায় মনে পড়েনি জেনে সুখী হ'লাম।

—মনে না পড়েছে তা নয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ তেমন শক্তিশালী আর নেই—শুনে দুঃখ পাবেন হয়ত'—রমলা ইচ্ছা করিয়াই যৌবনের লীলাচঞ্চল দৃষ্টিভঙ্গির একটু অক্ষম অনুকরণ করিল।

অমল আবার হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—শক্তিশালী থাকলে আজ একটা বিড়ম্বনাই হ'য়ে দাঁড়াতো। বৌমাকে ফাঁকি দিয়ে পুনরায় আপনার সঙ্গ চাইতুম।

রমলা হাসিতে হাসিতে অভিযোগ করিল—সঙ্গটা অমনই যখন চাননি, এখন সেটার কথা উল্লেখ করা পরিহাস মাত্র।

—পরিহাস! না, ভুল বুঝবেন না। আমার অক্ষমতাকে আমি মার্জ্জনা করিনি তাই—

নন্দিতা চা লইয়া আসিল। অমল প্রসঙ্গোত্তরে প্রশ্ন করিল—চলুন না, আমাদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসবেন।

রমলা হাসিয়া কহিল—বেশ! ঘর গেরস্থালী নেই, সেই দুপুরে বেরিয়েছি, একবার দেখ্‌তে ত হবে!

অমল হাসিয়া উঠিল। রমলার জীর্ণ শ্রীহীন বৃদ্ধ মুখখানির দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া অমল কহিল—আপনারা সুখী, আমার কিছু দেখবার নেই ব'লেই বোধ হয় এত একা বলে মনে হয়—

—একা? এখনও একা?

—হ্যাঁ। সেই কলেজে পড়বার সময় যেমনটি ছিল—সে সমস্যা আজও পূরণ হয় নি। এই বিচিত্র আমার জীবন।

অপর্ণা তাহার বৌমাকে লইয়া দ্রুতপদে ঘরের মাঝে ঢুকিয়া পড়িয়া কহিল—বেশ! এখনও তৈরী হও নি, বেড়াতে যাবে কখন?

অমল কহিল—আরে! অতিথিটিকে চিন্‌তে পারো?

—ও রমলা! তুমিও এসে জুটেছ—বেশ বেশ—বুড়ো বয়সে আবার ক্লাব ক'রবো নাকি?

—হ্যাঁ নামটা গঙ্গাযাত্রা ক্লাব হ'লে বেশ মুখরোচক হবে।

সকলে হাসিয়া উঠিল। অমল কহিল—দাঁড়াও, তৈরী হ'য়ে নি।

ক্রমশঃ

দেবাসুর যুদ্ধ

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম-এ, পিএচ-ডি

মেঘনাদ রামকে নাগপাশে বাঁধিল। গরুড় গিয়া সে বাঁধন কাটিয়া দিয়া আসিল। ইহাতে গরুড়ের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল, রাম বিষ্ণু-অবতার! সে কেমন অবতার যাহাকে বাঁধা যায়, আর তজ্জন্য গরুড়ের সাহায্য লইতে হয়? গরুড় দেখিল রামের কোনো প্রভাব নাই। যাঁহার নাম লইয়া লোকে ভব-বন্ধন-মুক্ত হয়, ক্ষুদ্র রাক্ষস কিনা তাঁকে নাগপাশে বাঁধে! গরুড়ের মনে অশান্তি উপস্থিত হইল। সে নারদকে জিজ্ঞাসা করিল। নারদ বলিলেন—ঐরূপ মোহ আমাকেও অধিকার করিয়াছে, কিন্তু আমি কিছু ঠিক করিতে পারি নাই। তুমি গিয়া ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা কর। ব্রহ্মা বলিলেন—আমিও ঐরূপ সংশয়-গ্রস্ত হইয়াছি। তুমি গিয়া শংকরকে জিজ্ঞাসা কর। শংকর বলিলেন, অনেক দিন সাধু-সঙ্গ করিলে তবে সন্দেহ যায়। সাধু-সঙ্গে হরিকথার আলোচনা হয়। আলোচনায় প্রমাণ হয় যে রামই ভগবান্। রাম-কথা ভিন্ন মোহ যায় না। মোহ দূর না হইলে রামপদে যথার্থ অনুরাগ হয় না। ভক্তি না হইলে রামই যে ভগবান, সে বিশ্বাস আসে না।"

ভক্তের হিতের জন্য রাম মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের মত, অথচ পরম পবিত্র চরিত্র তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যরূপ তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের রূপ নয়। নট যেমন নানা প্রকার বেশ ধরিয়া নানা ভূমিকায় অভিনয় করে এবং প্রত্যেক ভূমিকার উপযোগী ভাব দেখায়, কিন্তু কোনোটাই তাহার নিজের নয়, সেইরূপ নানা যুগে ভগবান নানা রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া নাটক অভিনয় করিয়াছেন। ত্রেতা যুগে তিনি রামরূপে মনুষ্যাকার ধারণ করিয়া খেলা খেলিয়া গিয়াছেন।

রাম নামক এক ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন, বিবাহ করিয়াছিলেন, যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সকল কার্যে তিনি আদর্শ চরিত্র দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়া তাঁহার উপর সহসা পূর্ণ ঈশ্বরত্ব আরোপ করা যায় না। তাহা করিতে গেলে কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। অপূর্ণের উপর পূর্ণত্ব চাপাইয়া মানুষ নিজের প্রয়োজন মিটাইয়া লয়। পদে পদেই মানুষ রূপধারী অপূর্ণ অবতারের ত্রুটি ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্ত তাহার কল্পনা-বলে তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব দেখিতে পায়। এই কাল্পনিক অবতার তাহার কাছে ইতিহাসের লোক অপেক্ষাও সত্য।

রামচন্দ্র মানব-চরিত্র অভিনয় করিয়া আমাদিগকে মুক্তির পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। একখণ্ড শিলার তো কোনো কার্যাবলী নাই—তথাপি শালগ্রাম-শিলাকে ভক্তি দিয়া, তাহাতে পূর্ণত্ব আরোপ করিয়া মানুষ যাহা পাইতে চাহে তাহা পাইয়া থাকে। মুক্তি-পথের পথিকের নিকট রামের চরিত্রে আস্থা স্থাপন করায় আশ্বাসের মন্ত্র-শক্তি রহিয়াছে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে রূপকের আশ্রয় লওয়া একটী সুন্দর প্রণালী। উহা দ্বারা কঠিন বিষয়ও সহজে বুঝান যায়। আমরা যখন পুতুল নাচ দেখি, তখন পুতুলগুলা যে পুতুল মাত্র, মানুষ বা অন্য কোনো জীব নয়, তাহা ভুলিয়া আমরা পুতুলের কাতর ক্রন্দনে ক্লেশ অনুভব করি, আনন্দে আনন্দবোধ করি, যুদ্ধের সময় আমাদের মনে উত্তেজনার উদ্ভব হয়। সত্য ঘটনা দেখিলে আমরা যে যে রসের আস্বাদ পাইতাম, পুতুল নাচ দেখিয়াও প্রায় তাহাই পাই। এই কারণেই যাত্রা, থিয়েটার, বায়োস্কোপ এত আকর্ষক।

রামায়ণের ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকিলেও উহা রূপক। রাবণের সহিত রামের যুদ্ধ হইয়াছিল। রাবণ রাক্ষসদের রাজা। রাক্ষস কাহারা? যাহারা শুদ্ধ আচরণ করিতে দেয় না, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু মানে না, যজ্ঞ পণ্ড করে, তাহারাই রাক্ষস। রাক্ষস খুঁজিতে অধিক দূর যাইতে হয় না। মানুষের হৃদয়েই রাক্ষসের দল বাস করে। তাহাদের রাজাও হৃদয়েই বাস করে। এই রাক্ষসদের অত্যাচারে পৃথিবী ব্যাকুল। হরি ভিন্ন কে তাহাদিগকে দমন করিবে? হরি বা রাম হৃদয়ের মধ্যেই আছেন! চাই কেবল তাঁহাতে ভক্তি। তাহা হইলেই তাঁহার প্রকাশ হয়।

হৃদয়ে যখন রাক্ষসদের উৎপাত হয়, অর্থাৎ কু-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, তখনই তাহাদের দমনের জন্য ভগবান জাগ্রত হন। ভগবান্ নানা উপায়—উৎপন্ন করিয়াই হউক, অথবা শরীরিক বা মানসিক ক্লেশ দিয়াই হউক সুপথে চালিত করেন।

প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকরা হৃদয়ের এই বিপ্লব অনুভব করিতে এবং উহাকে বাস্তব আকার দান করিতে সমর্থ। কতকগুলি অবিচ্ছিন্ন ভাবকে (abstract ideas) বাস্তব, অর্থাৎ মনুষ্যাকার দান করিয়া, সেই মনুষ্যগুলিকে লইয়া একটী গল্প রচনা করাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে রূপক (allegory) বলে।

বাল্মীকি মুনি রামায়ণ নামে একটী দীর্ঘ রূপক রচনা করিয়া তাহাতে মন্দ প্রবৃত্তি সমূহকে (যথা রাবণ, মেঘনাদ, কুম্ভকর্ণ ইত্যাদিকে) রাক্ষস নাম দিয়া তাহাদের দুর্বৃত্ততা পরিস্ফুট করিয়াছেন এবং অপর দিকে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা, হনুমান, বিভীষণ ইত্যাদি নাম দিয়া, উভয় দলের সংগ্রাম বর্ণিত করিয়াছেন। অবশেষে সাধু প্রকৃতিদের জয়, (রাম ইত্যাদির) এবং অসাধু প্রকৃতিদের (রাবণ ইত্যাদির) পরাজয় ও সংহার দেখাইয়াছেন।

রাবণের উৎপাতে হৃদয়ের প্রভু জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে সদলবলে নষ্ট করিলেন। রাবণ দুরাচার ও পার্থিব সম্পদে সমৃদ্ধ। সেই দুষ্প্রবৃত্তির বিরাট স্তম্ভের সহিত রাম চালিত সুপ্রবৃত্তিনিচয়ের ভীষণ যুদ্ধ হইল। রাবণ মরিয়াও মরে না—বারবার তাহার বিচ্ছিন্ন মস্তক স্থানে স্কন্ধ হইতে নূতন মাথা গজাইয়া উঠে। দুষ্প্রবৃত্তি ও হিংসা নির্মূল করা বড়ই কঠিন। অবশেষে রাবণ মরিলে হৃদয়ে ধর্মরাজ্য বা রাম-রাজ্য স্থাপিত হইল।

ইহাই রাম রাবণের সংগ্রামের অন্তরের দিক্। ইহার বাহিরের দিক অবতার রূপে রামের কার্যকলাপ। সে কাহিনীও পবিত্র মঙ্গলদায়ক ও ভক্তিপ্রদ। দুইটী ধারাই মনোহর ও ভক্তিমূলক। বাহিরের ধারার ঘটনাবলী, স্থানসমূহ ও চরিত্রনিচয় অসত্য বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাসে উহা সম্পূর্ণ সত্য না হইতে পারে, কিন্তু কল্পলোকে ইতিহাসের মর্যাদা অপেক্ষা উহার মর্যাদা কম নয়। উহা ইতিহাস অপেক্ষাও সত্য।

মহাভারত বর্ণিত কুরু পাণ্ডবের বৈরিতাকেও এই প্রকারের নৈতিক সংঘর্ষের রূপক বলা যাইতে পারে। দ্বাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া সময়োপযোগী খেলা খেলিয়াছিলেন।

অনুকম্পা

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

অফিস থেকে ফিরেই শিবনাথ বিস্মিত হ'য়ে গেল মাধবীর পানে চেয়ে। ব্যাপারটা কিছুই সে অনুমান করতে পারলে না। হঠাৎ এমন কি ঘটতে পারে যার জন্য কেঁদে কেটে চোখ-মুখ ফুলিয়ে ফেল্‌তে হ'ল মাধবীকে! তবে কি পিত্রালয়ের কোন মন্দ সংবাদ…কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে সম্ভব হয়? এই তো মাত্র গতকাল সন্ধ্যায় তার বড় শ্যালক এখানে এসেছিল। কই কিছু তো সে জানায় নি তাদের?

রীতিমত চিন্তান্বিত হ'য়ে পড়লো শিবনাথ। মাধবীর এই মনস্তাপের কারণ সে ভেবে পেলো না। অথচ সকালে অফিস যাবার সময়ও মাধবীকে এমন দেখে যায় নি সে। প্রতিদিনের মতই হেসেছে, কথা কয়েছে, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফেরার জন্য অনুরোধ করেছে মাধবী। তাদের এই এক বৎসরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে এমন ব্যাপার কোনদিন ঘটেনি…এই প্রথম।

একটা মধুর স্বপ্নাবেশের ভেতর দিয়ে তাদের জীবনের দিনগুলি একে একে কেটে যায়। মান অভিমানের পালাও যে মাঝে মাঝে অভিনীত না হয় এমন নয়; তবে সেও যেন একটা মাধুর্যমণ্ডিত দৃশ্য বিশেষ। কিন্তু আজিকার মত অকস্মাৎ এমন অভাবনীয় দুর্জয় অভিমান কোনদিন প্রকাশ করে নি মাধবী।

শিবনাথকে দেখে অন্যান্য দিনের মত মাধবী কাছে এসে আজ দাঁড়ালে না, তার আহ্বানেও সাড়া দিলে না। অগত্যা শিবনাথই মাধবীর মানভঞ্জন করতে এগিয়ে গেল।

আস্তে আস্তে অতি সাবধানে একখানি হাত মাধবীর স্কন্ধে অর্পণ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে শিবনাথ—'কি হ'য়েছে মাধু? অমন…'

সবলে একটা ঝট্‌কা দিয়ে স্বামীর হাতটা সরিয়ে দিলে মাধবী। সংগে সংগে শিবনাথ তার একটি হাত চেপে ধ'রে ফেল্‌লে। ক্ষিপ্তার মত ব'লে উঠলে মাধবী—'ছেড়ে দাও বলচি, ভালো হবে না।' ব'লেই জোর ক'রে সে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত স্থানান্তরে চলে গেল।

স্তম্ভিত শিবনাথ কিছুক্ষণ চুপচাপ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি ভাবলে,তারপর আবার চললো মাধবীর সন্ধানে।

…একখানি শয়নকক্ষ, একটি ছোট্ট রান্নার ঘর, একটি বসবার—অর্থাৎ বহিরাগতদের জন্য বিশেষ কক্ষ এবং তার পাশে একফালি বারাণ্ডা নিয়ে শিবনাথের বাসা। সুতরাং মাধবীর সন্ধান পেতে বেশী দেরী হ'ল না তার। রান্না-ঘরের মেঝের 'পরে লুটিয়ে পড়ে মাধবী তখন ফুলে ফুলে কান্না জুড়ে দিয়েছে।

শিবনাথ ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে গেল এবং উবু হয়ে পাশে বসে সযত্নে তার ক্রন্দন-কম্পিত পৃষ্ঠদেশে একটি হাত রেখে স্বল্প হাস্যের সংগে বললে—'আজকের রাগটা অবিশ্যি খুবই হ'য়েচে সন্দেহ নেই; কিন্তু হেতুহীন।'

দলিতা ফণিনীর মত সবেগে গ্রীবা উত্তোলন ক'রে তার পানে চাইলে মাধবী। বাষ্পজড়িত অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো—'হেতুহীন, হেতুহীন! মিথ্যেবাদী ভণ্ড কোথাকার! তোমার সব চালাকী…' আর বলতে পারলে না সে—কান্নায় ভেঙে পড়লো।

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তার পানে তাকিয়ে শিবনাথ বললে—'ও কি সব বলচো তুমি মাধবা?'

—'ন্যাকা, কি বলছি বুঝতে পারছ না? তোমার শয়তানী ধ'রে ফেলেচি—তোমার প্রথম পক্ষের অনু আর মেয়ে কল্পনার খবর প্রকাশ হ'য়ে পড়েচে। শয়তান কোথাকার! তোমার ভালো-মানুষীর মুখোস আজ খসে গেছে।'

—'কি যা তা বকচ?'

—'যা তা বকচি—যা তা বকচি?' মাধবী ধড়মড় ক'রে উঠে তীরের মত ছিট্‌কে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং মুহূর্ত মধ্যে ফিরে এসে বিস্ময়বিমূঢ় শিবনাথের মুখের 'পরে একটা সবুজ লেফাপা সজোরে ছুঁড়ে দিলে।

চমকে উঠলো শিবনাথ। বিস্ময়বিহ্বল চক্ষু দুটি একবার মাধবীর পানে বুলিয়ে নিয়ে সে খামখানির প্রতি দৃষ্টি ফেরালে।…একি! বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। শিবনাথের

নেত্রযুগল ঠেলে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হ'ল। আশ্চর্য তো…এ চিঠি মাধবী পেলে কোথায়!

কম্পিত হাতে খামটি তুলে নিয়ে তার ওপর লিখিত ঠিকানাটার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে শিবনাথ।…কি আশ্চর্য—এ যে তারই নাম ঠিকানা! দিব্যি মেয়েলি ধাঁজের আঁকা-বাঁকা হরপে তারই নাম ঠিকানাই তো লেখা রয়েছে। আবার বিপরীত দিকে সাড়ে চুয়াত্তর দিব্যি সমেত 'মালিক ভিন্ন অন্যে খুলিবেন না'—লেখা রয়েছে। আর একবার সে ভালো ক'রে খামের নাম ঠিকানাটা পড়ে দেখলে।… না, ভুল তো হয়নি…স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে…শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ দত্ত। ৫-৫৫ নং…ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূর্বেই মাধবী লেপাফা ছিঁড়ে পত্রখানি বার ক'রে পড়েছিল; তাই নূতন ক'রে আর খাম ছেঁড়ার প্রয়োজন হ'ল না। খামের ভেতর থেকে পত্র বার ক'রে শিবনাথ পড়তে লাগলো:

'দেবতা, না জানি তোমার কাছে অজ্ঞাতে কি অপরাধ ক'রেছি, যার জন্যে আজ আমি পরিত্যক্তা। এই এক বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি চিঠিই তোমায় দিয়েছি। দুর্ভাগ্যবশে একটারও উত্তর পাইনি।…আমার দিক থেকে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোন কারণ নেই। তুমি স্বামী, আমার দেবতা। তুমি যাতে সুখী হও সেই তো আমার কাম্য। আমি হয়তো তোমাকে সুখী করতে পারিনি—তোমার উপযুক্ত হ'তে পারি নি, তাই আবার তুমি বিয়ে করেছ। কিন্তু সেজন্য আমি এতটুকুও দুঃখিত নই। দুঃখ শুধু এই যে, আমার নোতুন ছোট বোনটীর সংগে একবারও দেখা হ'ল না এবং আমরা দুজনে মিলে আমাদের দেবতার সেবা করতে পেলাম না। আমার অভিশপ্ত জীবনের এই বড় দুঃখ সব চেয়ে।

যাই হোক, তুমি যা ভালো বুঝেছ করেছ, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। ভেবেছিলাম, আর পত্র দিয়ে তোমায় বিরক্ত করবো না, কিন্তু থাকতে পারলাম না। অনেক কষ্টে তোমার নোতুন বাসার ঠিকানা যোগাড় করে এই পত্র লিখছি। আজ প্রায় পনেরো দিন তোমার আদরের মেয়ে কল্পনার অসুখ—সে শয্যাশায়ী। জানি না, তোমার সম্পদটুকুঁ রক্ষা করতে পারবো কি না! দিন রাত সে শুধু তোমারই নাম করে—তোমায় দেখতে চায়। চিকিৎসা করাতে পারি না—অবস্থার জন্য। ওগো! তুমি যদি দয়া ক'রে একবারটি আস বড় ভালো হয়। তোমার কল্পনার ভার তুমি নিলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। কল্পনা তো কোন দোষ করে নি? আর তোমার সময় নষ্ট করতে চাই না। যা ভালো মনে হয় ক'রো। অভাগীর অসংখ্য প্রণাম নিও। বোনটিকে ভালবাসা জানিও। ইতি—

জন্মদুখিনী…'অনু।'

পত্রপাঠ শেষে শিবনাথ মুখ তুলে চাইলে মাধবীর পানে। তখনো ক্রন্দনরতা মাধবী পূর্ববৎ দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল শিবনাথের পানে চেয়ে। শিবনাথের মুখে কেন জানি না—অকারণে একটু হাসির রেখা দেখা গেল। সে প্রশ্ন করলে—'কিন্তু এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে? আর এ পরের গোপন চিঠি তুমি পড়তেই বা কেন গেলে?'

ঝংকার দিয়ে উঠলো মাধবী—'বেশ করেচি পড়েচি। না পড়লে তোমার স্বরূপ কি জানতে পারতুম—নির্লজ্জ বেহায়া ধাপ্পাবাজ লোক কোথাকার! উঃ, কি শয়তান! একটা বিয়ে করা বউ থাকতে…' আর সে বলতে পারলে না—আপন অদৃষ্টের কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

একটু খোঁচা দেবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলে না শিবনাথ; বললে—'দোষ তো আর আমার একার নয়। বিয়ে করার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তোমার বাবাই তো জোর ক'রে…'

—'চুপ করো মিথ্যেবাদী।' মাধবা ফোঁস্ ক'রে ওঠে।…'লজ্জা করে না—মাষ্টারী করতে ঢুকে ভদ্রলোকের মেয়ের সংগে প্রেম ক'রে বিয়ে করতে?'

—'সেটা তো আর একপক্ষের দোষ নয়।'

—'না নয়। তখন তুমি জানাও নি কেন যে, তোমার বিয়ে হ'য়েছে—মেয়ে আছে। চুপ্ শয়তান কোথাকার।'

—'কিন্তু যা হবার তাতো হ'য়েচেই মাধবী—আর তো উপায় নেই। জেনেই যখন ফেলেচ—'

—'ওগো, এ সব জোচ্চুরি চাপা থাকে না…ধর্মের কল বাতাসে নড়ে! তুমি এখন দয়া ক'রে আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমি আর একদিনও এখানে থাকতে পারবো না…কিছুতেই নয়!' কাঁদতে কাঁদতে দ্রুত কক্ষান্তরে চলে গেল মাধবী।

তারপর বহু কাকুতি মিনতি, কিন্তু মানিনী মাধবীর মান কিছুতেই ভাংলো না। সে কোন কথা শুনতেও চায় না, বুঝতেও চায় না। তার এক কথা—'আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও…আমি সতীনের ঘর করতে পারবো না। নইলে আমি আত্মহত্যা করে মরবো। তোমার অম্বু আর কল্পনাকে নিয়ে তুমি সংসার করো।'

সে রাত্রে শিবনাথের সংসারে আর হাঁড়ী পর্য্যন্ত চড়লো না—সারারাত উপবাসেই কাটলো। সেই সঙ্গে কান্নাকাটি, মাথা খোঁড়াখুঁড়ি প্রভৃতি অনেক কিছুই ঘটে গেছে। মাধবীর সেই ভয়ংকর মানভঞ্জন করতে শ্রীকৃষ্ণের অভিনয় পর্য্যন্ত ক'রতে হ'য়েছে শিবনাথকে; কিন্তু সমস্তই বৃথা! ভবী ভোলবার নয়…মাধবীর সেই এককথা—বিশ্বাস-ঘাতকের কোন কথা আমি বিশ্বাস করি না…আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। শেষ পর্য্যন্ত শিবনাথও ধৈর্য্য রাখতে পারেনি। দু'কথা সেও শুনিয়ে দিয়েছে…'বেশ করেচি, খুব করেচি', ইত্যাদি…

পরদিন রবিবার…শিবনাথ সকালে উঠে ষ্টোভ্ জ্বেলে নিজেই একটু চায়ের জল চড়িয়ে দিলে।

মাধবী তখন পিত্রালয়ে যাবার উদ্যোগ করতে ব্যস্ত। তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, এ সংসারে আর জলস্পর্শ করবে না। সমস্ত রাত্রি ধ'রে সে এত কেঁদেছে যে, চক্ষু দুটির রেখা ব্যতীত আর বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না—এমন ফুলেছে। মুখের অবস্থাও অবর্ণনীয়।

চা হ'য়ে গেলে শিবনাথ এক পেয়ালা চা নিয়ে অপরাধীর মত গিয়ে মাধবীর সামনে দাঁড়ালো। বললে—'মাধু, লক্ষীটি, এই চা-টুকু খেয়ে নাও। মিথ্যে মিথ্যে…'

মাধু সবেগে মুখখানা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলে। অত্যধিক ক্রন্দনের জন্য কণ্ঠস্বর তার রুদ্ধপ্রায়; সুতরাং কি বললে বোঝা গেল না।

শিবনাথ বললে—'শুধু শুধু একটা অশান্তি টেনে এনে লাভ কি মাধবী। কোথাকার এক বাজে…'

—'বাজে?' ধরা গলায় যতটা সম্ভব জোর দিয়ে মাধবী ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো—'ওসব কথা অন্যলোককে বোঝাবে—আমাকে নয়। হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়ে এখনও ঢাকবার চেষ্টা! নির্লজ্জ পুরুষ…আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও না—তোমার অশান্তি ভোগ করার দরকার কি!'

শিবনাথ কি যেন বলতে গেল, কিন্তু ঠিক সেই সময় দোতলার ফ্ল্যাটের গিন্নীর আহ্বানে আর বলা হল না, তাড়াতাড়ি সে দরজা খুলে দিতে গেল।

আনন্দময়ী দেবীকে এ বাড়ীর সকল ভাড়াটিয়ারাই দিদিমা বলে ডাকে। শিবনাথ এবং মাধবীও দিদিমা বলে। বহুদিন হ'তে তিনি এই বাড়ীর দোতলার ফ্ল্যাটটি অধিকার ক'রে বাস করছেন। প্রত্যেক ভাড়াটিয়াদের ঘরেই তাঁর অবাধ গতি বিধি। সকলের সুখ দুঃখে, আপদে বিপদে তিনি না হ'লে যেন চলে না। তাঁর আন্তরিক স্নেহ সকলেই কামনা করে। এ বাড়ীর প্রত্যেকেই তাঁকে প্রাণের সংগে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।

শিবনাথ দরজা খুলে দিতে তিনি ভিতরে প্রবেশ ক'রে বললেন—'কি গো নাতী, কি ব্যাপার তোমাদের? কাল শনিবার গেল, ভেবেছিলুম—কোথায় মাংস-টাংস সব হবে, তা না হাঁড়ীই চড়েনি দেখচি! ব্যাপার কি বলো দিকি?'

—'আর বলবেন না দিদিমা—প্রাণ ওষ্ঠাগত।' বলে শিবনাথ তাঁর পানে চেয়ে একটু ম্লান হাসলে।

দিদিমা তার পানে তাকিয়ে বললেন—'কি রকম? এও কি মান অভিমানের ব্যাপার নাকি? চল, চল দেখি। নাতবৌ কোথায়—গোসাঘরে?'

বলতে বলতে শিবনাথসহ তিনি ঘরে এসে ঢুকলেন। মাধবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ঘরের একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার পানে তাকিয়েই দিদিমা বলে উঠলেন—'ও বাব্বা। এ যে ভয়ংকর মান। কিন্তু হেতুটা কি?'

—'অহেতুক।' মাধবীর দিকে চেয়ে শিবনাথ বললে। মাধবী দাঁতে দাঁতে চেপে দাঁড়িয়ে রইলো—কোন কথা বললে না। দিদিমা বললেন—'কদিন ধ'রে দেখচি বাড়ীতে মানের ছড়াছড়ি যাচ্চে। তিনতলার ঐ যে নোতুন ভাড়াটেরা এসেছে—আজ প্রায় মাসখানেক মাসদেড়েক হ'ল…তাদের ঘরেও এই মানের পালা চলেচে। পরশু থেকে হাঁড়ী চড়েনি। এখন গিয়ে অনেক ক'রে ব'লে ক'য়ে তবে মানিনীর কিছুটা মান কমিয়ে এসেচি।'

—'তাই নাকি ?' শিবনাথ বললে—'তা এ দিকেও একটু হাত লাগান দিদিমা।'

মাধবী আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হ'য়ে যেতে গেল, দিদিমা খপ করে তার একখানা হাত ধরে ফেলে বললেন— 'কি লো ছুঁড়ি, যাচ্চিস কোথা ? ব্যাপার কি বল্ দিকি, অতো রাগ কিসের লা ?'

শিবনাথ তাড়াতাড়ি সেই চিঠিখানি তাঁর হাতে দিয়ে বললে—'এই ব্যাপার !'

সবিস্ময়ে দিদিমা বললেন—'ওমা, এ চিঠি তোমাদের কাছে কোত্থেকে এলো ? এ তো তিনতলার শিবুদের চিঠি ! এই নিয়েই তো ওদের রাগা-রাগি, কান্নাকাটি সব ঘটলো।'

—'আরে আমাদের ব্যাপারও তো এই নিয়েই দিদিমা। কিন্তু···ঠিকই তো ! একেবারে আমার মনেই ছিল না যে, তিনতলার ঐ ভদ্রলোকের নাম আর আমার নাম এক। উনিও দত্ত, আমিও দত্ত। তাইতো বলি—কোথা থেকে এটা এলো !···তা ওঁদের ব্যাপারটা কি রকম গড়ালো দিদিমা ?'

—'তা মন্দ নয়। বেশ শোনবার মতই গল্প। তোমার মিতে ঐ তিনতলার শিবু কি কারণে প্রথম পক্ষের সংগে ঝগড়াঝাটি ক'রে তাকে ত্যাগ করে। তারপর আবার এই মেয়েটাকে বিয়ে করে। কিন্তু এর কাছে প্রথম পক্ষের বউ বা তার মেয়ের কথা এতদিন গোপন রেখেছিল। সেদিন হঠাৎ এই চিঠিটা সব ফাঁস ক'রে দিলে। কি করে ভগবান জানেন—চিঠিটা বোয়ের হাতেই এসে পড়ে, আর সেই থেকে বউ গোঁ ধ'রে বসে আছে যে, যতদিন পর্যন্ত না তার এই সতীন আর মেয়েকে এখানে আনা হ'চ্চে, ততদিন সে এ বাড়ীতে জলস্পর্শ করবে না। একজনকে কাঁদিয়ে সে তার স্বামী নিয়ে আমোদ করতে পারবে না। এত-বড় অবিচার নাকি তার অসহ্য। তাই শুনে আমি আবার জিগ্যেস করলুম—সতীন নিয়ে মানিয়ে ঘর করতে পারবি নাত্‌বউ ? উত্তরে সে বললে—কেন পারবো না দিদিমা ? আমার বড় বোন নেই, তিনিই আমার সে স্থান পূর্ণ করবেন। আমরা দু'বোনে মিলে স্বামীর সেবা করবো। এর চেয়ে সুখ আর কি আছে দিদিমা। আমি তো ভাই মেয়ের কথা শুনে অবাক্! এমন মেয়েও হয় ?' হঠাৎ মাধবীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই দিদিমা উচ্চহাস্য ক'রে উঠলেন। বললেন—'কিন্তু আমার এ নাতবোয়ের ব্যাপার বোধ হয় ঠিক উল্‌টো ?'

শিবনাথ সংগে সংগে বলে উঠলো—'সে কথা আবার বলতে দিদিমা ? বলে, 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' পড়ে আমার প্রাণান্ত।'

লজ্জায় মাধবীর মাথা নত হয়ে পড়লো···বিস্ময়-স্তম্ভিত মাধবী এতক্ষণ দিদিমার পানে বড় বড় চক্ষু মেলে তাকিয়েছিল। দিদিমা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—'তা এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে নাতবউ ?'

সলজ্জে অস্ফুটকণ্ঠে মাধবী বললে—'ঐ বারাণ্ডার কোণে।'

দিদিমা বললেন—'ঠিক হয়েছে—বাতাসে উড়ে এসে পড়েছে আর কি। কিম্বা হয়ত ঝিয়ের ঝাঁটার সংগে···একবার উর্দ্ধদিকে তাকিয়ে বললেন—'হুঁ তাই সম্ভব, ঠিক রুজু রুজু ফ্ল্যাট···তাই ওরা চিঠিটা খুঁজে পাচ্ছিল না।'

—'কি ক'রে পাবে ? তাহ'লে আমাদের মাধুর নাটক যে অভিনয়ই হয় না।' বলেই শিবনাথ সজোরে হেসে উঠলো।

মাধবী লজ্জায় যেন এতটুকু হয়ে গেল।

গান

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল

কত গান আমি গেয়েছিনু সারানিশি তব আঙিনায় ;
বাতাস বিভোল ছিল বসন্তের জোছনা বেলায়।
মন্ত্রমুগ্ধ স্তাবকের দল সুবিলোল কটাক্ষ হানিয়া,—
ভুলায়েছে মোরে যবে আমি চলেছিনু আপন ভুলিয়া।

ক্ষীণ জ্যোতিঃ, বিদায়ের বেলা, কিন্তু আজি একি হেরি হায় !
একাকী ফেলিয়া মোরে একে একে সবে লয়েছে বিদায় !
কোথা মোর কুসুমের তোড়া—কি নিয়ে বা ফিরি আজ ঘরে ?
প্রতিধ্বনি শুধু ওঠে ব্যঙ্গ করি—শুনি মোর অন্তর শিহরে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম-এস্‌সি

মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থান্বেষী। সেই স্বার্থ ধন বা নাম সংযুক্ত অথবা উভয় সংযুক্তই হইতে পারে। বিজ্ঞানীও মানুষ, সুতরাং তাহার কার্য্যকলাপও যে ঐ নিয়মের অধীন তাহা সহজেই অনুমেয়। বিজ্ঞান কংগ্রেসে যখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উত্তম, মধ্যম, অধম সর্বশ্রেণীর অসংখ্য বিজ্ঞানসেবী উপস্থিত হন তখন তাঁহারাও যে স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিবেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গোড়ার দিকে সাধারণতঃ সরকারী কর্মে নিযুক্ত বৈজ্ঞানিকগণই বৎসরান্তে মিলিত হইয়া ভাবের আদান-প্রদান করিতেন এবং অধম হইতে উত্তম পর্য্যন্ত সকলেই নিজ নিজ ঊর্দ্ধতন মনিবের কৃপা-কটাক্ষ লাভের চেষ্টা করিতেন। কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা বাধ্যতামূলক হওয়াতে প্রত্যেক বৎসরই বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আজকাল ভারতে মৌলিক গবেষকদের সংখ্যা কয়েক সহস্র হইবে। বলা বাহুল্য বাংলাদেশই বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এবং এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞান কংগ্রেসে বাঙালী সভ্যের সংখ্যা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক বেশী। বর্ত্তমান বৎসরের কংগ্রেসেও ১৩ জন বিভাগীয় প্রেসিডেণ্টের মধ্যে ৬ জনই ছিলেন বাঙালী বিজ্ঞানী। তবে অন্যান্য প্রদেশ আত্মপ্রতিষ্ঠায় যেরূপ দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে এবং বাঙলার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ দিন দিন যেরূপ দিল্লীমুখো হইয়া উঠিতেছেন তাহাতে বাংলাদেশ তাহার সেই গৌরব যে আর বেশী দিন রক্ষা করিতে পারিবে তাহা মনে হয় না।

যাহা হউক এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেস ও তৎসঙ্গে অনুষ্ঠিত কয়েকটি ব্যাপার সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিমত জ্ঞাপন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। দৈনিক কাগজে বিজ্ঞান কংগ্রেসের দৈনন্দিন অধিবেশনের বিষয়াবলীর যথেষ্ট আলোচনাই প্রকাশিত হইয়াছে এবং সুধী বাঙালী পাঠকসমাজ তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন, সুতরাং সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

অন্যান্য বারের মত এবারও ২রা জানুয়ারী কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়াই ঘোষণা করা হইয়াছিল তবে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণ যথাসময়ে আসিয়া না পৌছানতে কংগ্রেসের উদ্বোধন ৩রা জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। এ যাবৎ প্রত্যেকবার বড়লাটের পৌরোহিত্যে কংগ্রেসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, কিন্তু এ বৎসর তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। এবারের কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টের ভাইস প্রেসিডেণ্ট জওহরলাল নেহরু পৌরহিত্য করেন এবং মূল সভাপতির পদও তিনিই অলঙ্কৃত করিয়াছেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত বেদীর উপরে সভাপতির, বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণের, দেশীয় নেতৃবৃন্দের ও দেশীয় খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণের বসিবার জন্য শতাধিক স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। বেদীর সম্মুখে বৃত্তাকারে বহুদূরবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভ্য ও বিশিষ্ট দর্শকদিগের জন্য প্রায় ৫ সহস্র আসনের ব্যবস্থা ছিল। তিনটার সময় সভা আরম্ভ হইবার কথা, কিন্তু তাহার বহুপূর্ব হইতেই দলে দলে লোক তাহাদের স্ব স্ব স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। পণ্ডিতজীর অভিভাষণ শ্রবণের জন্য সবাই উন্মুখ আগ্রহে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে নির্দিষ্ট সময় আসিয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে বৃষ্টিও থামিয়া গেল। লাউডস্পীকারের সাহায্যে স্থানাভাবে দণ্ডায়মান জনতাকে বেদীতে যাইবার পথ হইতে সরিয়া গিয়া সুবিধামত স্থান গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান হইতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণের সঙ্গে পণ্ডিতজী, অন্যান্য ভারতীয় নেতা ও বিশিষ্ট ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ ধীর পদক্ষেপে বেদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমাগত সভ্যবৃন্দ ইঁহাদের দর্শনলাভের জন্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহারা বেদীর উপরে গিয়া নিজেদের নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলে সকলে আবার শান্তভাবে আসন গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণকে একে একে ডাকিতে লাগিলেন ও সেই সঙ্গে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে লাগিলেন। ইঁহারা আসিয়া পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে করমর্দন করিয়া আবার যথাস্থানে গিয়া বসিতে লাগিলেন। বলাবাহুল্য, সেদিন পর্য্যন্ত রুশীয় বৈজ্ঞানিকগণ আসিয়া পৌছেন নাই। বিলাত, আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও চীনদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর ঐভাবে বিভাগীয় প্রেসিডেণ্টগণকে পণ্ডিতজীর সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত নেহরু কিয়ৎক্ষণ উর্দুপ্রধান হিন্দীতে বক্তৃতা দিবার পর ইংরাজীতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি লিখিত অভিভাষণের পরিবর্ত্তে মুখে মুখে স্পষ্ট, গম্ভীর ও হৃদয়গ্রাহক স্বরে, সহাস্যমুখে একঘণ্টা ধরিয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক—বিজ্ঞানের সহিত শিল্পের সম্বন্ধ, শিল্পবিজ্ঞানের সাহায্যে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, আণবিক শক্তিকে গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োগ, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণের গুরুদায়িত্ব এবং রুশিয়া প্রভৃতি সর্বদেশের বৈজ্ঞানিকগণের সহিত ভারতীয় মনীষীদিগের যোগাযোগ স্থাপন এবং জাতীয় উন্নতিতে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ বিষয় অনর্গল বলিয়া গেলেন। সমাগত সভ্যবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পণ্ডিতজীর প্রত্যেকটি কথা অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সভাপতির অভিভাষণ সমাপ্ত হইলে সমাগত বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের আগমনের কারণ প্রভৃতি সংক্ষেপে বলিলেন এবং অতঃপর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার

সার মরিস গয়ার এবং অপর ২।১ জন বক্তৃতা দিবার পর সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হইল।

তৎপরদিবস হইতে মামুলি প্রথায় বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিভাগীয় প্রেসিডেণ্টগণ তাঁহাদের অভিভাষণ পাঠ করিলেন। অতঃপর প্রত্যেক বিভাগের গবেষণামূলক প্রবন্ধের মধ্যে কয়েকটি পঠিত ও আলোচিত হইল। ৪ঠা জানুয়ারী হইতে ৮।৯ জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণ সাধারণের বোধগম্য বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা সূর্য্যের কলঙ্ক বিষয়ে এবং অধ্যাপক ভাবাও কস্‌মিক রশ্মি সম্বন্ধে এইরূপ পপুলার বক্তৃতা দেন।

এবারের কংগ্রেসের প্রধান বিশেষত্ব বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণের বৈজ্ঞানিকগণের সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা স্থাপন এবং বিজ্ঞানের সহায়তায় দেশের দুরবস্থা অপনোদনের আপ্রাণ প্রয়াস। একদিন অনেক ঘণ্টা ধরিয়া বিভিন্ন প্ল্যানিং সম্বন্ধে আলোচনা চলে। (অনেকেই অবগত আছেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্রই সর্বপ্রথম এদেশে প্ল্যানিংএর প্রবর্ত্তন করেন)। পণ্ডিত নেহরু এই সভার উদ্বোধন করেন এবং অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, সার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, ডক্টর ওয়াডিয়া, ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তি কৃষি, শিল্প, খনিজ, নদীপ্রবাহ হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের প্ল্যানিংএর অবতারণাও পাণ্ডিত্যপূর্ণভাবে আলোচনা করেন। ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানিকগণ মৌলিক গবেষণা লইয়াই বেশী আলোচনা করিতেন, শিল্প বিষয়ে তাঁহাদের তেমন ঔৎসুক্য ছিল না। কিন্তু গত যুদ্ধের সংঘাতে ভারত শিল্প বিষয়ে যে একেবারেই শিশু এবং অসহায় তৎসম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা হওয়াতে দেশের বৈজ্ঞানিকগণ মৌলিক গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বিষয়েও মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবার রাসায়ণশাস্ত্রের সভাপতি হইয়াছিলেন ডক্টর প্রফুল্লকুমার বসু, রাঁচি ল্যাক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ। এঁর অভিভাষণও ছিল 'প্লাসটিক' সম্বন্ধে। এই একটি মাত্র উদাহরণেই আমার উল্লিখিত মন্তব্যের যাথার্থ্য বুঝা যাইবে।

দিল্লীর ঐতিহাসিক স্থানসমূহ কুতুবমিনার, লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ এবং নূতন দিল্লীর দর্শনীয় বস্তু, বিরলা মন্দির, কাউন্সিল হাউস, যনতর মনতর প্রভৃতি বিজ্ঞান কংগ্রেসের তরফ হইতেই 'বাসের' ব্যবস্থায় ভলাণ্টিয়ারগণের সাহায্যে দেখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সব বিষয় এত সুপরিচিত যে এ সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবে এইমাত্র বলা যায় যে দিল্লীতে কেল্লা প্রভৃতির ভিতরে এত জায়গা থাকিতে ব্রিটীশ রাজত্বের চিহ্ন বজায় রাখায় অহঙ্কারদৃপ্ত খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য দরিদ্র ভারতবাসীর এত রক্ত না চুষিলেই ভাল হইত। কারণ এত চেষ্টাতেও বৃটীশের কীর্ত্তি মোগল কীর্ত্তিকে ম্লান করিতে পারে নাই। কংগ্রেসের তরফ হইতে বিমানযোগে আগ্রা ভ্রমণের ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু এইভাবে গেলে অর্থব্যয়ের অনুপাতে দেখার সুযোগ ঘটিবে না ভাবিয়া আমরা সাধারণ যানেই আগ্রা পরিভ্রমণ ও ঐতিহাসিক স্মৃতিমণ্ডিত স্থানগুলির সহিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলাম।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের আনুসঙ্গিক আর দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতে চাই। প্রথমতঃ পণ্ডিত নেহরু কর্ত্তৃক ন্যাশানাল ফিজিক্যাল লেবরটরির ভিত্তি স্থাপন এবং দ্বিতীয় অন্তর্বর্ত্তী সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডক্টর জন মাথাই কর্ত্তৃক শ্রীরাম ইনষ্টিটিউট ফর ইনডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন।

গত ৪ঠা জানুয়ারী বেলা ৪টার সময় নূতন দিল্লীর অনতিদূরে রাজকীয় কৃষি প্রতিষ্ঠানের সম্মুখস্থ বিস্তীর্ণ মাঠে ন্যাশানাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরির ভিত্তি স্থাপিত হয়। সুদৃশ্য চাঁদোয়ার নীচে বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণ এবং ভারতীয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও নেতৃবৃন্দ স্থান গ্রহণ করেন; তাহারই সম্মুখে বিরাট মণ্ডপের নীচে ৩।৪ হাজার দর্শকের বসিবার আসন নির্দিষ্ট ছিল। লাউডস্পীকারের সাহায্যে শ্রোতৃমণ্ডলীর বক্তৃতা শুনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আমরা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিযুক্ত বাসে যথাসময়ে উক্ত স্থানে পৌঁছিলাম। প্রথমে ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ঐ ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে মুদ্রিত পুস্তিকা পাঠ করিলেন। ইহার পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হিন্দি ও ইংরাজীতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিবার পর উক্ত ল্যাবরেটরির ভিত্তি স্থাপন করেন এবং চা পানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

এইরূপ জাতীয় গবেষণাগার স্থাপনে ভারতবাসী সকলেই মনে মনে গর্ব অনুভব করিবেন। তবে শিল্প বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ অন্যান্য দেশে এইরূপ ল্যাবরেটরি সাধারণতঃ শিল্প-প্রধান অঞ্চলেই স্থাপিত হয়—শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের ও নূতন নূতন শিল্প সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত। সুতরাং সেই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই ল্যাবরেটরি ভারতের শিল্পপ্রধান কলিকাতা বা বোম্বাই নগরীতে স্থাপিত হওয়াই অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল। জাতীয় কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিও পুনায় পরিবর্ত্তে কেমিক্যাল শিল্পে অগ্রণী কলিকাতায় স্থাপিত হওয়া দেশের সত্যিকারের কল্যাণের দিক হইতে অধিকতর সমীচীন ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজকীয় কৃষি গবেষণাগার পুণার উর্বর অঞ্চল ও কৃষক সাধারণের সান্নিধ্য হইতে কৃষক বিরল দিল্লীর মরু প্রান্তরে পুনঃ স্থাপনের প্রয়াসের মূলে যে মনোবৃত্তি বিদ্যমান—দেশের উপকারের চেয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের আত্মতুষ্টি ও সরকারের নিকট বাহবা লাভের সুযোগ গ্রহণ—এক্ষেত্রেও সেই মনোবৃত্তিই সক্রিয় কিনা তাহা মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞরাই স্থির করিবেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভ্য হিসাবে 'শ্রীরাম ইনষ্টিটিউট ফর ইনডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ' এর উদ্বোধন ও ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যও আমরা আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ৬ই জানুয়ারী বিকাল সাড়ে তিনটায় সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, ডক্টর জন মাথাই, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, সার মরিস গয়ার, কয়েকজন বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক ও কয়েক সহস্র ভারতীয় সভ্য উপস্থিত ছিলেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বিরাট চাঁদোয়ার নীচে অতিথিগণের বসিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ভূমিখণ্ডের উপরেই সার শ্রীরামের নামে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আমেরিকার মেসাচুসেসটস

ইনষ্টিটিউটের অনুরূপ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইবে। প্রথমে সার শ্রীরাম সমাগত সভ্যবৃন্দকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং ধীর গম্ভীর ভাষায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। অতঃপর ডক্টর জন মাথাই ও সার মরিস গয়ার নীতিদীর্ঘ বক্তৃতায় সার শ্রীরামের অতুলনীয় দান ও অপূর্ব দূরদৃষ্টির প্রশংসা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানে দেশের রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্প কতদূর উপকৃত হইবে তদ্বিষয়ে সারগর্ভ অভিমত প্রদান করেন। ইহার পর ডক্টর মাথাই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু উর্দুপ্রধান হিন্দিতে এই প্রতিষ্ঠানের শুভ সূচনায় আশীর্বচন উচ্চারণ করেন। ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভাটনগর তাঁহার স্বভাবসুলভ মনোরম ভাষায় মাননীয় অতিথিবৃন্দ ও সমাগত সভ্যবৃন্দকে যথারীতি ধন্যবাদ দিবার পর সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

যথা সময়ে বিজ্ঞান কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। শুধু একটি কথাই মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছে—শিল্প বিজ্ঞানে বাঙালীর নেতৃত্বের দিন যেন ক্রমশই ঘনাইয়া আসিতেছে—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামও বুঝি আমরা জাগাইয়া রাখিতে পারিলাম না।

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট

পরকীয়া চিরকালই মুখরোচক। শুধু যে বৈষ্ণবধর্ম্ম কথিত প্রেম, তা নয়। পরচর্চ্চা, পরনিন্দা পরছিদ্রান্বেষণ প্রভৃতি সব কিছুই আত্মচর্চ্চাদি অসুবিধাজনক কাজের চেয়ে ভাল। করালী কেবিনের ডবল ডিমের মামলেট পরস্মৈপদী আস্বাদ করবার সময়ই বেশী ভাল লাগে। ঝগড়া হলে পরভাষাতেই আমরা বিক্রমটা ভাল প্রকাশ করতে পারি। এমন কি আমাদের চম্পটী চট্টো ত পিতৃদত্ত প্রাণটাকে পরকীয় জ্ঞান করাতেই সেদিন চৌরঙ্গীর কাছাকাছি বদমায়েসদের হাত থেকে এক নিরীহ ভদ্রলোককে উদ্ধার করতে যাওয়ার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে

চম্পটী চট্টো

গেল। মাত্র একটী লোকের উদ্ধারে গিয়ে তা বিপন্ন করলে শুধু নিজেরই যা একটু পুণ্য হত, কিন্তু পৃথিবীময় পরের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ পরার্থে সযত্নে রক্ষা করে যাওয়া প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য কর্ত্তব্য। আত্ম-সম্মানটা নেহাৎই নিজের ; ওটা রক্ষা করতে যাওয়াতে বিশ্ব-প্রেমের মর্য্যাদা কিছু রক্ষা করা হয় না। কাজেই ওটাকে পকেটে রক্ষা করে পরের দান অপমান মাথা পেতে নিলে সেই পরকীয়া তত্ত্বেরই সম্মান রক্ষা করা হয়।

স্ত্রীকে স্ত্রী বললে নেহাৎ নিজস্ব সর্ব্বসত্ত্বসংরক্ষিত ঘোমটা পরা মুখখানটা মারা নখনোলকশোভিত—খুড়ি, নখদন্তশোভিতও বলা যেতে পারে—কারো কথা বোধ হয় মনে হয়। কাজেই সে বেচারীকে একটু পর একটু দূর করে না দেখলে জীবনে আধুনিকতার দক্ষিণে বাতাসটুকু পাওয়া যায় না। সেজন্য স্ত্রীকে ওয়াইফ বানিয়ে হাঁফ্ ছেড়ে বেঁচেছে ইয়ং বেঙ্গল।

এ হচ্ছে স্ত্রী

স্ত্রী বললেই মনে হবে একটী অচল প্রায় সচল বোঝা, পরণে তার ময়লা মিলের শাড়ী, চরণে মল ও আলতা। গলায় মঠরমালা, ঠোঁট দুটী পানের পিচে রাঙা। শাড়ীটী হয় মাথায় বেড় দিয়ে আছে, না হয় কোমরে পেঁচান, অন্তত শাড়ীর খুঁটে চাবির গোছা বাঁধা, কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে নেমে গেছে। সারাদিন সংসারের কাজ তবুও তন্বুলতা কেবলই বৃক্ষের দিকে এগোচ্ছে। তার রাজত্ব হচ্ছে পল্লীগ্রামের সহর

থেকে সহরের উত্তর পল্লী পর্য্যন্ত। তাকে বিয়ে করা যায়, কিন্তু ঠিক ভালো ভাকে না বাসলেও চলে। আর তার সঙ্গে প্রেম? ছোঃ—সে ত একেবারেই অসম্ভব।

অন্যদিকে দেখুন একবার ওয়াইফকে। রাজত্ব তার দক্ষিণ পল্লীতে এবং ক্রমশই তার দাক্ষিণ্য কামনা করতে আরম্ভ করছে অন্যান্য জায়গার লোকও। অন্তত গল্প উপন্যাসে সবাই শুধু দক্ষিণ পল্লীতেই বৌ দেখতে বা প্রেমে পড়তে যায়। তার গতি বহুমুখী—সকালের শপিং থেকে সন্ধ্যার সিনেমা পর্য্যন্ত; আজকাল আবার মোহন-বাগান ইষ্ট বেঙ্গলের খেলাও যোগ হয়েছে। পরণে তার জর্জেট, চরণে স্যাণ্ডেল। হাতে হাতঘড়ি ও বনিতা বটুয়া। খাঁটী স্বদেশী যদি পছন্দ না হয় ভ্যানিটী ব্যাগ বলতে পারেন; গলায় নেকলেশ—তাও না থাকলেই ভাল। ঠোঁট দুটী রস রসায়নের সাহায্যে রাঙা। শাড়ী আঁচল মাথায় উঠলে এলো খোঁপা বা 'বব' করা ঝোপের শোভা কমে যাবে তাই সে বেচারা অভিমানে কাঁধের উপর দিয়ে নেমে পিঠের উপর ঝুলে পড়েছে। তন্বুলতা তন্বু এবং লতা দুই-ই বটে—যদিও সংসারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সে নেই। তাকে ভালবাসব কি না, সেটা বড় কথা নয়; সে ভালবাসবে কি না সেটাই সমস্যা। আর প্রেম? তুমি নিজেই প্রেমের যোগ্য কি না সেটা ভেবে দেখো আগে। কারণ সে ত স্ত্রী নয়, তিনি হচ্ছেন ওয়াইফ।

আর ইনি হলেন ওয়াইফ

কলেজের মাঠের আড্ডাটিতে বিবাহিত কেহ হাজির নেই। কিন্তু অভিজ্ঞ তারা সব কিছু সম্বন্ধেই, কারণ মুখের উপর ট্যাক্স নেই। তাদের মতে ওয়াইফের চেয়েও একটু পর, কিন্তু বড় যিনি তিনি হচ্ছেন শ্যালিকা। কিন্তু শ্যালিকার চেয়ে সিষ্টার-ইন-ল শুধু যে আইনসঙ্গত সেটা তা নয়, রুচিসঙ্গতও বটে। প্রথমার মধ্যে যেটুকু তিক্ত রস আছে সেটা শোধন করবার জন্য রাজ বুলিতে অনুবাদ করে ব্রজবুলির মিষ্টরস আমদানী করতে হয়েছে। তবে শ্যালিকা যতদিন কেবল মধুহৃদয়ার ভগ্নী থাকেন তাকে কোন নামে অভিহিত করবার দরকার থাকে না। বিবাহ নামক স্বার্থপর কার্য্যটীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সব নারীই মাধুরীময়ী এবং তাদের ভগ্নীরাও বিশ্বভগিনীর সমভাগিনী অর্থাৎ পঞ্চশরের সম্ভাবিত লক্ষ্যস্থল।

সহপাঠীর দল আজ একটু পরকীয়া চর্চ্চা করতে ব্যস্ত। প্রদ্যুম্ন হচ্ছে তাদের আলোচনার বস্তু। মহা মুখরোচক বিষয় সন্দেহ নেই। একে পরচর্চ্চা, তায় নববিবাহিত আর সব চেয়ে বড় কথা এই যে একটা লুকিয়ে তোলা ফটোগ্রাফ তারা ওর বইয়ের ভিতর থেকে গোপনে হস্তগত করতে পেরেছে। রাত্রের আলোয় ফটো তোলা ওর ক্ষমতার বাইরে, আর দিনের আলো লজ্জায় রাত্রির অন্ধকারের মত সুরধুনীকে ঘিরে রাখে। কিন্তু প্রদ্যুম্নর সাহসের তুলনা নেই; নইলে পানসাজা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময় তার ছবি তুলে নিল হঠাৎ। ভাগ্যিস কাছাকাছি কেহ ছিল না। ও ত পালিয়ে চলে যেত, কিন্তু সুরধুনী লজ্জায় সারা হয়ে যেত। হঠাৎ ঘোমটা টেনে নামিয়ে আনতে যাচ্ছে, অপ্রত্যাশিত স্বামী সমাগমের আনন্দটুকু মুখে এখনো মিলিয়ে যায় নি, অথচ লজ্জা ও বিব্রত ভাব ছড়িয়ে পড়ছে। আলো আঁধারি একটা বিচিত্র ভাব ফুটে উঠেছে মুখে।

এ ছবিখানার সঙ্গে কেন যে ওরা নবাগতা সহপাঠিনীদের তুলনা আরম্ভ করল তা ওরাই জানে। কিন্তু একথা ঠিক যে কেমন বৌ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ওদের বহু মতবাদ থাকলেও সঠিক ধারণা কারো নেই। কেবল এটুকু বাদে যে ওই রকম সপ্রতিভ কুণ্ঠাহীন বাক্‌বিদগ্ধ হতে হবে; অলঙ্কারবিরল বস্ত্রবাহুল্যবর্জ্জিত ও বালিগঞ্জ-ফ্যাসানে শাড়ী পরিহিতা হতে হবে। দূর থেকে মন্দিরাভ্যন্তরে দেবতা দেখার মত ওরা সহপাঠিনীদের দেখেছে; নৈকট্যের নিবিড় পরিচয় ওদের বেশীর ভাগেরই ভাগ্যে জোটে নি। যাদের জুটেছে তারা একটু রং ফলিয়ে সাড়ম্বরে অর্দ্ধেক ঢেকে অর্দ্ধেক রেখে নানা রকম কথা বলে। সব মিলিয়ে কলেজে প্রথম সহশিক্ষা প্রচলনের যুগের একটী বিচিত্র পরিস্থিতি।

যাদের জোটে নি, তারা রংএর মাত্রা আরো একটু বাড়াতেই প্রস্তুত আছে কিন্তু কোন সুযোগ পাচ্ছে না। দোষটা অবশ্য সহপাঠিনীদেরই। তাদের মেলামেশা সম্বন্ধে আপাত নিস্পৃহতা দেখে ছাত্ররা মনে মনে ভবিষ্যৎকে শাসাচ্ছে, তার সান্ত্বনা দিচ্ছে বর্ত্তমানকে এই বলে যে,—বেশ ভাল কথা; না মিশতে চান, মিশবেন না, কিন্তু জেনে রাখবেন যে কোন পুরুষই তার উপযুক্ত নয়—এ কথা যে মেয়ে মনে করে সে হয়ত ঠিকই বলছে; তবে এ সত্য বেশীদিন চালালে এমন দিন আসবে যখন সব পুরুষই তার সঙ্গে সত্যাগ্রহ করবে।

অবশ্য নারীকেও দোষ দেওয়া যায় না। তার পূর্ব্ববর্ত্তিনীদের অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে যে, বিয়ের আগে যে পুরুষ যত ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেম নিবেদন করবে সে তার উপযুক্ত নয়, বিয়ে হয়ে গেলে সে ততই নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লাগবে।

এ সব আলোচনা ঠেকানর সাধ্য কারো নেই। তবু যারা পরিচয়ের প্রসাদ প্রাপ্ত হয়েছে সেই সৌভাগ্যবানরা অন্যান্যদের বারণ করে এ সব আলোচনা করতে। বলে—ভায়া, মুখের বল্‌গা এত আল্‌গা করো না। অভ্যাস দোষে ভবিষ্যতে যখন গৃহিণীর কাছে এরকম রাজদ্রোহের কথা উচ্চারণ করে ফেলবে তখন কি হবে আগে থেকেই ভেবে রেখো। বন্ধুরা উত্তর দেয়—আদিকাল থেকে আমাদের যা একমাত্র অস্ত্র আছে তাই চালাব—অর্থাৎ ভাতের উপর অভিমান। তার প্রত্যুত্তর আসে—সে অস্ত্রে সমস্যার সাময়িক সমাধান হতে পারে; কিন্তু ভুলে যেয়ো না যে ভগবান্ ক্ষমা করেন, পুরুষ ভুলে যায়, কিন্তু নারী চিরকাল মনে রাখে।

(ক্রমশঃ)

ভীমপলশ্রী
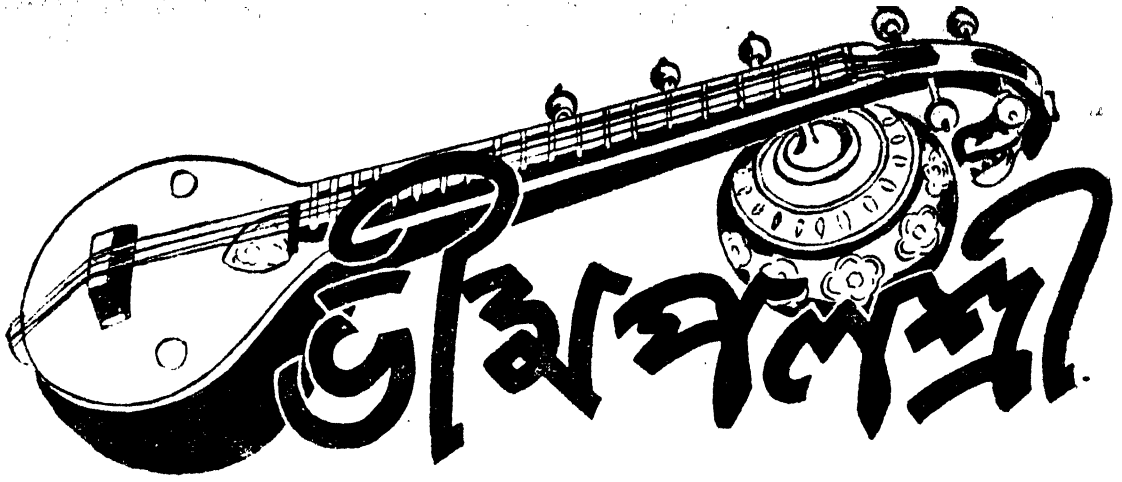
বনফুল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মেয়েটিকে তুলেই সুশোভন পুলকিত হয়ে উঠল। কমরেড সান্ত্বনা! খুব মাখামাখি ছিল কিছুদিন আগে।

"আরে, সান্ত্বনা যে! হঠাৎ পড়ে' গেলে কি করে—"

"কলার খোলা বোধহয়। অনেক ধন্যবাদ"

সান্ত্বনা ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে লাগল পিছন দিকের শাড়িটা নষ্ট হয়েছে কি না।

"না, শাড়ির কিছু হয় নি, ঠিক আছে। আরে, মাথায় সিঁদুর দেখছি যে—বিয়ে হল কবে"

"মাস তিনেক"—মুচকি হেসে জবাব দিলে সান্ত্বনা।

"কোথায়"

"বরিশালে। তবে উনি এখন কোলকাতাতেই আছেন"

"কি করেন"

"প্রফেসারি। আপনারও বিয়ে হয়েছে শুনেছি। আপনার স্ত্রী কোথায় এখন"

"এস না, আলাপ করিয়ে দিই—ওই যে বসে আছে—"

ঘাড় ফিরিয়েই সুশোভন থেমে গেল এবং অপসৃয়মান গার্ড গাড়িটার দিকে চেয়ে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে রইল।

"যাচ্চলে"

"কি হল।"

"আমার স্ত্রী ওই গাড়িতে চলে গেল"

"আপনারা এই গাড়িতেই যাচ্ছিলেন না কি"

"হ্যাঁ"

"কোথায়"

"দিগ্বিজয়বাবুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে"

"ওমা আমিও যে সেইখানেই যাচ্ছি—আমাদেরও নিমন্ত্রণ আছে—"

"একমাত্র ট্রেণটিতো চলে গেল। এখন উপায়"

পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল।

"মাসীমা ভাববেন খুব"—ক্ষুণ্নকণ্ঠে সান্ত্বনা বললে।

"তোমার মাসীমা সেখানে আছেন না কি"

"দিগ্বিজয়বাবুর স্ত্রীকে আমি মাসীমা বলি। মায়ের খুব বন্ধু উনি। আমার ছেলেবেলাটা তো ওঁর কাছেই কেটেছে"

বাক্স বিছানা সুটকেস ট্রাঙ্ক কুঁজো পুঁটুলি এবং একটি কুকুর বাচ্চা বহন করে' কুলীর সারি এসে দাঁড়াল।

"সব তোমার জিনিস না কি"

"হ্যাঁ, কি করি বলুন তো এখন। কালকের আগে তো আর ট্রেণ নেই"

"না। সত্যিই কি করা যায়। অনীতা আবার তাদের কাউকে চেনে না। আজ রাত্রেই আমার যেমন করে হোক পৌছতে পারলে ভাল হত"

"কিন্তু তা আর কি করে সম্ভব বলুন"

"একেবারে যে অসম্ভব তা নয়, থাম—একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে। এখন কটা বেজেছে? একটা—একটা ট্যাক্সি নিলে হয়। ভাল একটা ট্যাক্সিতে যেতে কত সময় লাগবে। শার্দ্দুল সিংয়ের সঙ্গে আমার খুব জানা-

শোনা আছে। ফোন করলে ভাল গাড়ি দেবে, অনেক গাড়ি তার। কতক্ষণ লাগবে দেড়শো মাইল যেতে—দেড়শো ডিভাইডেড্ বাই টয়েনটি—সাত ঘণ্টা, আট ঘণ্টাই ধর—নটার মধ্যে নির্ঘাত পৌঁছে যেতে পারি। তুমি কি এখন বাসায় ফিরবে? অধ্যাপক মশায় কোথায় এখন"

"তিনি এখানে নেই। তিনি থাকলে তো ভাবনাই ছিল না, একসঙ্গে যেতাম। তিনি এক কংগ্রেস সভায় গেছেন রংপুরে। আজ রাত্রে ফেরার কথা। ফিরে তিনি যাবেন সেখানে। তাই অন্তত কথা আছে। আমরা একসঙ্গেই যেতাম, কিন্তু তিনি আসবেন কিনা ঠিক নেই, কেউ না গেলে মাসীমা দুঃখিত হবেন খুব, তাই আমি একাই যাচ্ছিলাম, উনি যদি আসেন পরে আসবেন"

"আমি ট্যাক্সি করেই যাচ্ছি। তুমি যদি যেতে চাও আসতে পার আমার সঙ্গে। আপত্তি আছে?"

"না, আপত্তি আর কি"

সুশোভন সহসা উৎসাহিত হয়ে উঠল খুব। কুলীদের দিকে ফিরে বললে—"এই—মাইজিকো চীজ একঠো ট্যাক্সিমে চঢ়াও—জলদি—"

তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললে—"আগে আমার বাসায় ফেরা যাক চল। ষ্টেশন থেকেই শার্দ্দুল সিংকে ফোন করে দিচ্ছি আমার বাড়িতে একখানা ভাল ট্যাক্সি পাঠাতে। বাসায় গিয়ে চা খেতে খেতেই গাড়ি এসে পড়বে, তারপরই—বাস্।"

মুচকি হেসে সান্ত্বনা বললে, "আপনার স্ত্রী কি—"

"আমার স্ত্রীর সম্ভাব্য মানসিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবার সময় নয় এখন সান্ত্বনা। যদি কিছু হয় দেখা যাবে পরে তখন—"

"না আমি জিগ্যেস করছিলাম, আপনার স্ত্রী কি সোজা দিগ্বিজয়বাবুর ওখানেই যাবেন"

"সোজা দিগ্বজয়বাবুর ওখানে যাওয়া যায় না কি। তবে শেষ পর্য্যন্ত সেইখানেই যাব বলে বেরিয়েছিলাম তো। টাইম টেবেলখানাও তার কাছে। আমার বাক্স বিছানা সবই তার সঙ্গে। চটছে খুব নিশ্চয়"

"আজ রাত্রেই পৌঁছাচ্ছেন তো! রাগ আর কতক্ষণ থাকবে"

"তা বটে। অনীতা লোক ভাল—আলাপ হলে দেখবে—ওয়াণ্ডারফুল"

সান্ত্বনা কিছু না বলে' মুচকি হাসলে একটু।

সুশোভনের বাসায় যে চাকরাণিটি ছিল সে শত্রুপক্ষীয় লোক। স্বয়ম্প্রভা দেবীরও চাকরাণি ছিল সে কিছুদিন আগে। জামাইবাবু লোকটি যে ডুবে ডুবে জল খান এ সন্দেহ স্বয়ম্প্রভাই তার মনে সঞ্চারিত করেছিলেন তখন। নিজের মুখে তাকে বলেন নি কিছু যদিও, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে যে আলাপ করতেন তিনি, তা নিম্নকণ্ঠে করতেন না। সুতরাং চাকরাণিটি সুশোভনের সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিল তা স্বায়ম্প্রভিক। সেই সুশোভন যখন হঠাৎ একটি রূপসী যুবতীকে নিয়ে ট্যাক্সি চড়ে' এসে হাজির হল তখন সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। সান্ত্বনার দিকে দু'চারবার যে দৃষ্টি সে নিক্ষেপ করলে তার অর্থ পরিষ্কার। সান্ত্বনা অবশ্য বেশী বিচলিত হল না! এ জাতীয় দৃষ্টির সম্মুখীন সে বহুবার হয়েছে জীবনে। ফিটফাট রূপসী মেয়েদের ভাগ্যই এই—বিশেষত তার যদি দামী গয়না শাড়ি থাকে এবং সে যদি একটু পুরুষ-ঘেঁসা হয়। বিপদেও পড়তে হয় বেচারাদের। সমালোচনা তারা অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু বিপদকে এড়াতে পারে না সব সময়ে। সান্ত্বনাকে বিপদেই পড়তে হয়েছিল একবার। জনৈক লেখকের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিছক সাহিত্য-প্রীতি-বশতই সে উক্ত বিবাহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা করেছিল। সমাজহিতৈষীদের টনক নড়ে উঠল অমনি। ওঠাটাই স্বাভাবিক। প্রথমত সে সুন্দরী, দ্বিতীয়ত শিক্ষিতা, তৃতীয়ত কমরেড, চতুর্থতঃ কাউকে কেয়ার করে না, পঞ্চমত এক নাইট স্কুলে পড়াবার ছুতোয় রোজ সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে অনেক রাত্রে, ষষ্ঠত ওই লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে মাখামাখি করে' তার পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করেছে। তুমুল তুফান উঠল। সান্ত্বনা কিন্তু গ্রাহ্য করলে না কিছু। সমস্ত সমালোচনা তুচ্ছ করে' নিবিষ্ট চিত্তে লেগে রইল সে তার নাইট স্কুলে। যুবকদের মধ্যে জনকয়েক ভক্তও জুটে গেল তার এজন্যে। সে কিন্তু কাউকে আমোল দিলে না। দুর্ভেদ্য গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে আত্মগোপন করে' সে তার নাইট স্কুলেই লেগে

রইল। দু' একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কারও সঙ্গে মিশত না। কথা পর্য্যন্ত বলত না কারও সঙ্গে। লেখকটির সংস্রব আগেই ত্যাগ করেছিল। এই সময়েই সুশোভনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় তার। বিরাট কোলকাতা শহর। সে-ও সুশোভনের খবর রাখেনি, সুশোভনও তার খবর পায় নি। সান্ত্বনার আপন বলতে ছিলেন এক বিধবা মা। কিন্তু তিনি থেকেও ছিলেন না। বুড়ো বয়সে টি. বি. হয়ে ধরমপুর স্যানাটোরিয়ম্ আশ্রয় করেছিলেন তিনি। সান্ত্বনা থাকত মামার বাড়িতে। কিন্তু মামা যখন দেখলেন ভাগ্নী 'কমরেড' হয়ে উঠেছে, তখন স্পষ্ট ভাষায় নিজের সেকেলে অভিমত ব্যক্ত করলেন তিনি একদিন। ফলে, সান্ত্বনা গিয়ে এক হোটেলে উঠল। হোটেলেই হয়তো থাকতে হত তাকে, যদি না সুরেশ্বরী দেবী সে সময় কোলকাতায় এসে পড়তেন। সুরেশ্বরী দেবী এসেই সান্ত্বনার কলঙ্ককাহিনীর সালঙ্কার বর্ণনা শুনলেন। শুনেই চটে গেলেন তিনি। সান্ত্বনার মা তাঁর বাল্যসখা, সান্ত্বনাকে এতটুকু বয়স থেকে দেখেছেন তিনি, সান্ত্বনার সম্বন্ধে এসব কথা বিশ্বাসযোগ্যই মনে হল না তাঁর! সান্ত্বনা ওরকম কিছু করতেই পারে না। বাজে কথা সব। সান্ত্বনাকে নিয়ে চলে গেলেন তিনি দেশগাঁতে নিজেদের জমিদারিতে। সান্ত্বনা ফিরে এল অবশ্য কিছুদিন পরে। তখন ঝড়টা থেমে গেছে। তার কিছুদিন পরেই অধ্যাপক ব্রজেশ্বরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীতে আর যায় নি সে। মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরীই দিগ্বিজয়বাবুর জমিদারি। সুরেশ্বরী ব্রজেশ্বরকে দেখেন নি, তাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন যাবার জন্যে।

শার্দ্দুল সিংহ প্রেরিত বিরাট ট্যাক্সিখানা সুশোভনের বাড়ির সামনে এসে হর্ন দিয়ে দাঁড়াল। ড্রাইভারটি বাঙালী কিন্তু বলিষ্ঠ। কাইজারি ছাঁদের গোঁফ। হর্ন শুনে চাকরাণিটি কপাট খুলে মুখ বাড়াল।

"সুশোভনবাবুর কি এই বাড়ি"

"হ্যাঁ"

"খবর দাও যে শার্দ্দুল সিং গাড়ি পাঠিয়েছেন"

"ট্যাক্সি করে' কোথা যাবে আবার এখন। এই তো এল"

"অনেক দূর যেতে হবে, তুমি খবর দাও না"

"তোমাকে ডাকলে কে"

"ফোনে খবর দিয়েছিলেন বাবু"

"ফোনে? কোথা থেকে?"

"আরে খবর দাও না তুমি"

মুক্ত দ্বারপথে সান্ত্বনার জিনিসপত্র ড্রাইভারের নয়নগোচর হল।

"ওই সব মাল যাবে না কি"

"ওঁরা যদি যান, মালও যাবে বই কি"

ড্রাইভার নেমে এসে মালগুলি পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল।

"শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন না কি"

"কোথা যাবেন তা কেমন করে' বলব"

চাকরাণি খবর দিতে উপরে চলে গেল। ড্রাইভার জিনিসপত্র তুলতে লাগল ট্যাক্সিতে। একটু পরেই সুশোভন নেবে এল সান্ত্বনাকে নিয়ে। ড্রাইভারের দিকে চেয়ে সুশোভন বললে, "তোমাকে চিনি বলে' তো মনে হচ্ছে না। শার্দ্দুল সিংয়ের প্রায় সব ড্রাইভারের সঙ্গেই আলাপ আছে আমার"

"আমি নতুন বাহাল হয়েছি সার"

"তোমার নাম কি"

"গণেশ সরকার"

"জোর হাঁকাতে পারবে তো"

"পারব না কেন সার। কিন্তু ধরুন যদি কোন অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে যায় তার খেসারত দেবে কে"

"সে ঝুঁকি আমার"

গণেশ গোঁফজোড়া একবার চুমরে নিয়ে বললে "বেশ! পৌঁছবার পর গরীবকে ভুলে যাবেন না যেন সার"

"শার্দ্দুল সিংয়ের পুরোণো কোন ড্রাইভার এলে একথা জিগ্যেসই করত না। তারা চেনে আমাকে"

"বেশ"

সুশোভন সান্ত্বনা উঠে বসল।

গণেশ আর একবার গোঁফ চুমরে গাড়িতে স্টার্ট দিলে।

৩

বিবেকানুমোদিত সৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করবার পর যে জাতীয় সুনিদ্রা হওয়া উচিত সদারঙ্গবিহারীলালের নিদ্রা তার চেয়েও গাঢ়তর এবং দীর্ঘতরই হয়েছিল, কারণ বেচারাকে পরিশ্রমও করতে হয়েছিল যথেষ্ট। সমস্ত দিন মোটর

বাইকে টো টো করে' ঘুরে বেড়ানো কম ক্লান্তিজনক নয়। কিন্তু কোন কাজ ক্লান্তিজনক বলেই তার থেকে নিবৃত্ত হবেন এমন লোক সদারঙ্গবিহারীলাল নন। উমেশ চৌবে যেই তাঁকে এসে ধরলেন যে তাঁর হয়ে ভোট ক্যানভাস করতে হবে—অমনি রাজি হয়ে গেলেন তিনি।

…পাচির মায়ের ঠেলাঠেলিতে নিদ্রাভঙ্গ হল।

"জনার্দ্দনবাবু ডাকছেন যে তোমাকে। কতক্ষণ আর ঘুমুবে, রোদে কাঠ ফাটছে যে চারদিকে—"

"ও! রোদ উঠে গেছে না কি! অ্যা—ছি—ছি—"

অপ্রস্তুতমুখে সদারঙ্গবিহারীলাল বিছানায় উঠে বসলেন এবং বালিশের তলা থেকে চশমাটি বার করে' পরিধান করলেন।

"বড্ড বেলা হয়ে গেছে—অ্যাঁ—ছি—ছি—"

হাসিমুখে পাচির মায়ের দিকে চাইলেন একবার। চশমার পুরু লেন্স থেকে আলো ঠিকরে পড়ল।

"জনার্দ্দনবাবু বাইরে অনেকক্ষণ থেকে ডাকাডাকি করছেন"

"জনার্দ্দনবাবু? অনেকক্ষণ থেকে? ও—"

তাড়াতাড়ি চটিটা পরে' সদারঙ্গবিহারীলাল বাইরে যেতে উদ্যত হলেন চোখে মুখে জল না দিয়েই।

"কালকের মতো না খেয়ে বেরিও নি যেন। চায়ের জল চড়িয়েছি, বেশী দেরি কোরো নি যেন বাইরে"

"চায়ের জল? ও—হ্যাঁ—না—আসছি এখুনি"

বেরিয়ে গেলেন সদারঙ্গবিহারীলাল।

"জনার্দ্দনবাবু যে! বাঃ—চা খাবেন তো নিশ্চয়ই—সিঙাড়া—"

হঠাৎ থেমে যেতে হল তাঁকে। জনার্দ্দনের মুখ ভ্রূকুটি-কুটীল, চক্ষু অগ্নিবর্ষী। অদম্য সদারঙ্গবিহারীলালও দমে' গেলেন ক্ষণকালের জন্য। এ কি হল!

"উমেশলালের জন্যে ক্যানভাস্ করে' বেড়িয়েছেন শুনলাম"

প্রত্যেকটি কথা ছররার মতো নির্গত হল জনার্দ্দনের মুখ থেকে।

"হ্যাঁ—"

"লজ্জা করে না আপনার"

"লজ্জা? লজ্জা করবার কিছু আছে না কি, জানি না তো, ভদ্রলোক ধরলেন এসে"

"উমেশলাল ভদ্রলোক? ভদ্রলোক কি পরের খাসি চুরি করে' খায়?"

"খাসি? না—না—কি যে বলেন আপনি—বি.এ. বি.এল—গড্!"

"গ্রামের প্রত্যেকটি খাসি ওর পেটে গেছে। তাছাড়া মিউনিসিপাল কাউন্সিলার হবার কি যোগ্যতা দেখলেন ওর। যার নিজের বিষয় দেনার দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে সে মিউনিসিপালিটি সামলাবে!"

জনার্দ্দন চক্ষু দু'টি অত্যন্ত ছোট করে' নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তাঁর চোখের দিকে। সদারঙ্গবিহারীলাল অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। চোখের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন, কানে কড়ে' আঙুল ঢুকিয়ে সজোরে কানটা চুলকুলেন, কাসলেন একবার। কিন্তু নাঃ—কোনও লাভ হল না। জনার্দ্দন নির্নিমেষ।

"ভদ্রলোক ধরলেন এসে সকালবেলা—"

"ওই হনুমানটা যদি ধরে এসে আপনাকে, ক্যানভাস করবেন তার হয়ে?"

নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে উপবিষ্ট হনুমানটিকে দেখিয়ে জনার্দ্দন পুনরায় প্রশ্ন করলেন।

সদারঙ্গবিহারীলাল আড়চোখে হনুমানটির দিকে চাইলেন একবার।

"বলুন—"

"হনুমানের কথা বলছেন? আরে নাঃ—কি যে বলেন—ছি ছি—"

নিজের ক্ষুদ্রায়িত চক্ষুকে স্বাভাবিক আকৃতি দান করে' জনার্দ্দন বললেন—"শুনুন, যা করবার তা তো করেইছেন। এখন ভুল সংশোধন করতে হবে।"

"তার মানে? ভুল—মানে—"

"মানে প্রত্যেক লোককে গিয়ে বাবার বলে' আসতে হবে যে আমি আসল খবর জানতাম না—তাই উমেশ চৌবের হয়ে ক্যানভাস করেছি। এখন তাঁর কীর্ত্তিকলাপ শোনবার পর তোমাদের আবার মানা করতে এসেছি তাকে একটি ভোট দিও না কেউ। সমস্ত ভোট বৈদ্যু-প্রসাদকে দেবে"

"বৈজুপ্রসাদ? ঘিয়ে সাপের চর্ব্বি অনর্গল মেশায় শুনেছি লোকটা"

"তা মেশাক। কিন্তু ওকে যদি তোমরা কমিশনার করে' দিতে পার ও একটা গার্লস্কুল করে' দেবে বলেছে নিজের খরচে। উমেশ চৌবে পারবে?"

"দেবে বলেছে না কি"

সদারঙ্গবিহারীলালের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"না বললে অমনি তোমার কাছে এসেছি"

"এত বড় ভাল কাজ যদি একটা হয় তাহলে আমি—"

"করতেই হবে"

"বেশ"

সদারঙ্গবিহারীলাল চিরকালই স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী।

আলো ঠিকরে পড়ল তাঁর চশমার লেন্স থেকে।

৫

ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের নাম বাইরের লোকের কাছে অজ্ঞাত হলেও স্থানটি নগণ্য নয়। অন্য কোন কারণে না হোক, গোঁসাইজির হরিমটর নিরামিষ হিন্দু পান্থনিবাসের জন্যই ও অঞ্চলে ফাৎনাফিরিঙ্গিপুর বিখ্যাত। হোটেলের নামের সঙ্গে হরিমটর শব্দটি যে অশোভন সে জ্ঞান যে গোঁসাইজির নেই তা নয়। কিন্তু হরিহর গোস্বামী ধর্ম্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক। প্রিয়বন্ধু মটর বৈরাগীর টাকা নিয়ে তিনি হোটেলটি সুরু করেছিলেন। তখন হোটেলটির নাম ছিল 'নিরামিষ হিন্দু পান্থনিবাস'। এখন মটর বৈরাগী গত হয়েছেন। বিশেষ করে' সেইজন্যেই বন্ধুর স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে হোটেলটির নূতন নামকরণ করেছেন তিনি। নিজের নামটিও অবশ্য সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। টাকা মটর বৈরাগীর, কিন্তু পান্থনিবাসের আসল স্রষ্টা তো তিনিই। হরিমটর শব্দটির এই ইতিহাস। নামটি লিখে প্রকাণ্ড একটি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছেন সামনেই। কারও দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

অর্থ উপার্জ্জন করবার জন্য গোঁসাইজি হোটেল খুলে অন্ন-বিক্রয় করছেন এ কথা যাঁরা মনে করেন তাঁরা শ্রীযুক্ত হরিহর গোস্বামীকে ঠিক চেনেন না। অতিশয় নিষ্ঠাবান আস্তিক্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন শ্রীলমনা নিষ্কাম ব্যক্তি ইনি। গীতার উপদেশ অনুসারেই কর্ম্মযোগ অবলম্বন করেছেন কেবল। পয়সার চেয়ে নীতির দিকেই এঁর লক্ষ্য বেশী। মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ হোটেলের ত্রিসীমানায় ঢুকতে পায় না। হোটেলে রাত্রিবাস করবার জন্যে যদি কেউ আসে, তাহলে কেবল পয়সা ফেললেই রাত্রিবাস করবার অধিকার লাভ করে না সে। তার চালচলন কথাবার্ত্তায় গোস্বামী মশায় ঘুণাক্ষরে যদি সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করেন, তাহলে আর স্থান হয় না তার হোটেলে। রাত্রিবাস করবার জন্যে দ্বিতলে দু'খানি ঘর আছে। ত্রিতলের ঘরটিতে গোঁসাইজি নিজে শয়ন করেন। বর্ত্তমানে দ্বিতলের দু'খানি ঘরই অধিকৃত। একটিতে শয্যাশায়ী বৈষ্ণবী রোগিণী আছেন একজন। ইনি গোস্বামী মহাশয়ের গুরু-ভগ্নী। গুরুভ্রাতার সঙ্গে দেখা করতে এসে গুরুতর অসুখে পড়ে গেছেন। দ্বিতীয় ঘরখানিতে আছেন এক শিক্ষক-দম্পতি। ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের মাইনার স্কুলের হেডমাষ্টার যোগজীবন বণিকও সজ্জন ব্যক্তি। উপর্য্যুপরি দুটি ঘটনা যুগপৎ ঘটায় ভদ্রলোক বিপন্ন হয়েছেন সম্প্রতি। তাঁর বাসাটি ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের। তার বার্ষিক জীর্ণ সংস্কার সুরু হয়েছে। একটি ঘরের খাপরা নামানো হয়েছে, দ্বিতীয় ঘরটি তিনি ব্যবহার করছিলেন। দিন দুই আগে তাঁর মা হঠাৎ এসে পড়েছেন কোনও খবর না দিয়ে। যোগজীবনবাবু সজ্জন লোক। মায়ের সঙ্গে এক ঘরে স-স্ত্রীক শুতে পারেন না তিনি। এই শীতে বারান্দায় শোওয়াও অসম্ভব। মুস্কিলে পড়েছিলেন। গোস্বামী মশায় আশ্রয় দিয়েছেন তাঁকে দ্বিতীয় ঘরটিতে।

রাস্তার ধারে হোটেলটির একটি আপিসও ছিল। গোঁসাইজি খুঁত রাখেন নি কিছু। আপিসে আপিসোচিত সমস্ত কিছুই ছিল। পাঁজি, ক্যালেণ্ডার, হিসাবের খাতা, লেখবার সরঞ্জাম, লাল-কালো দুরকম কালি এবং কলম, হাতবাক্স একটি, টেবিল, চেয়ার কোনও জিনিসের ত্রুটি ছিল না। কিছুদিন থেকে গোঁসাইজি নূতন একটি খাতা খুলেছেন। অ্যাডমিশন রেজিষ্টার। ইংরেজি নাম দেবার ইচ্ছা ছিল না। কেবল 'অ্যাডমিশন' শব্দটির লোভে ম্লেচ্ছ ভাষার শরণাপন্ন হতে হল তাঁকে। 'অ্যাড-মিশন' শব্দটি দ্ব্যর্থক। 'স্বীকৃতি' এবং 'প্রবেশ' দুই অর্থই করা যায় এর। এক-ঢিলে-দু-পাখী-মারা-যায় এ রকম বাংলা বা সংস্কৃত শব্দ গোঁসাইজির জানা ছিল না।

তাঁর হোটেলের উক্ত ঘর দুটিতে প্রবেশকারীকে স্বহস্তে নিজের পূর্ণ পরিচয় এই খাতায় লিখতে হত। কিছুদিন পূর্ব্বে গোঁসাইজি এক নিরীহ-আকৃতির ছোকরাকে আশ্রয় দিয়ে বিপদে পড়েছিলেন। ছোকরা চলে' যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ এসে হাজির। ছোকরা না কি এক ফেরারি অ্যানার্কিষ্ট! ভাগ্যে দারোগার সঙ্গে জানা-শোনা ছিল তাই রক্ষা পেয়ে গেলেন। তারপর থেকেই গোঁসাইজি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

গোঁসাইজির আপিসের জানলা কাচ-দেওয়া। কিন্তু ধুলোয় ধোঁয়ায় কাচের স্বচ্ছতা নষ্ট হয়ে গেছে। রাস্তার দিকের ঘর বলে' সেটিকে মনোহর করবার চেষ্টা করে-ছিলেন গোঁসাইজি যথাসাধ্য। কাচ দিয়েছিলেন, চৌকাটের ফ্রেমে সবুজ রংও লাগিয়েছিলেন। কিন্তু দেশের জলহাওয়া এমন বদ যে সবুজ ক্রমশ ধূসর হয়ে অবশেষে এমন একটা রংয়ে পরিণত হয়েছে যা বর্ণনা করা কঠিন। শুধু তাই নয়, জানলার কপাটগুলো এমন 'যাম্' হয়ে গেছে যে খোলেই না সহজে। খোলবার বিশেষ চেষ্টাও করেন না গোঁসাইজি। যা ধুলো, বন্ধ থাকাই ভাল।

...সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শীতের কনকনে বাতাস উঠেছে একটা। নিজের আপিস ঘরে মঙ্কিক্যাপ পরে' হ্যারিকেন লণ্ঠন জেলে গোঁসাইজি তন্ময় চিত্তে দৈনিক হিসাব লিখছিলেন। জানলাটি বন্ধ। সুতরাং সুশোভন-সান্ত্বনার আগমন বা কথোপকথন টের পেলেন না তিনি।

"যাক্—"

সুশোভন বলে উঠল। আর পারছিল না বেচারা। দুহাতে সান্ত্বনার দুটো ভারী স্যুটকেস। অপেক্ষাকৃত ছোটটি রাস্তায় নামিয়ে রেখে সে উর্দ্ধ-মুখে সাইনবোর্ডটা পড়তে লাগল।

"বলি নি তোমাকে, কাছে-পিঠে ঠিক একটা হোটেল আছে? এই দেখ—হরিমটর নিরামিষ হিন্দু পান্থনিবাস। স্বত্বাধিকারী বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীহরিহর গোস্বামী—"

"এর নামে কাছে-পিঠে? অন্তত চার মাইল হেঁটেছি"

"যাক এসে তো পড়া গেছে! নিরামিষ হিন্দু-হোটেল—তা হোক"

"হরিমটর কথাটার তাৎপর্য্য কি"

"কি জানি"

"যাই হোক চলুন, ঢোকা তো যাক"

সান্ত্বনা এগিয়ে গিয়ে কপাটটা ঠেলতেই খুলে গেল সেটা। সুশোভন রাস্তা থেকে স্যুটকেস দুটো তুলে-নিলে আবার। বেশ ভারী! কি এনেছে এত সান্ত্বনা! আপিসের জানলার অস্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে যৎসামান্য আলো প্রবেশ করছিল বাইরের ঘরটিতে।

"যাক্ শেষ পর্য্যন্ত—" কথা অসমাপ্ত রেখে সুশোভন স্যুটকেস দু'টি মেজেতে নামিয়ে ফেললে।

"উফ্—সর্ব্বাঙ্গ ধুলোয় ভরে' গেছে একেবারে। কথা বলছ না যে"

"বড় ক্লান্ত লাগছে"

"ক্ষিদে পায় নি?"

"খুব পেয়েছে। আপনার?"

"আমার! ফাৎনাফিরিঙ্গিপুরের এই হোটেলের খবর না জানলে তোমার ঝুনুকেই গিলে ফেলতাম রাস্তায় আমি। থাক আর কোন চিন্তা নেই। এসে যখন পড়া গেছে, তখন রাত্রের মতন আহার বাসস্থান জুটে যাবেই যা হোক করে'। সকাল নাগাদ গণেশ এসে পড়বে কি বল—অ্যাঁ—"

চেষ্টা সত্ত্বেও সুশোভনের কণ্ঠস্বরে আশার সুর ঠিক বাজল না যেন। চার মাইল দু' দুটো ভারী স্যুটকেস বয়ে কেমন যেন দমে' গিয়েছিল বেচারা। উঁচু-নীচু মেঠো রাস্তা, সূচীভেদ্য অন্ধকার, তার উপর কনকনে পুবে হাওয়া। সান্ত্বনা বেচারাও বেশ কাবু হয়ে পড়েছিল। যে সপ্রতিভতা তার চোখে মুখে সর্ব্বদা দেদীপ্যমান থাকে তা নিবে গিয়েছিল যেন। যাবারই কথা। শখ করে' মেঠো রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো—এক আর হঠাৎ পথের মাঝখানে মোটর বিগড়ে হাঁটতে বাধ্য হওয়া—আকাশ-পাতাল তফাত যে। আর এ কি যে সে মাঠ। তেপান্তর ছেলেমানুষ এর কাছে। সুশোভন প্রথমটা দমে নি। "এতে আর কি হয়েছে, মোটরে অমন হয়েই থাকে, এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে সব" গোছের একটা ভাব দেখিয়ে হালকা হাসি হেসে হাঁটতে সুরু করেছিল সে। কিন্তু ক্রমেই গম্ভীর হয়ে পড়তে লাগল। বেশ ভারী স্যুটকেস দুটো। সান্ত্বনা ঝুনুকে বুকে করে' নিয়েছিল। খানিকক্ষণ হেঁটে সে বললে—"চলুন, ওই মোটরেই ফেরা যাক। অন্ধকারে কোথা যাচ্ছেন"। সুশোভন বললে, "শুনলে না, ফাৎনা-ফিরিঙ্গিপুরে গোঁসাইজির ভাল হোটেল আছে। রাত্রে মাঠের মাঝখানে থাকা ঠিক নয়"

হোটেল যে আছে হরিমটর নিরামিষ পান্থনিবাসে প্রবেশ করবার পর তা আর অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সেজন্যে সুশোভনকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রবৃত্তি হল না সান্ত্বনার। (ক্রমশঃ)

আজাদ হিন্দ সরকার *

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

সংস্কৃতি পরিষদ

বিশ্ববিধ্বংসী দুর্য্যোগের মধ্যেই নেতাজীর অধিনায়কত্বে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাষ্ট্র-ভবঘুরে বেদের ছাউনী নহে, সভ্য সমাজে যে সমস্ত প্রকরণ ও উপকরণ রাষ্ট্রের পরিচায়ক, আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রে তাহার কোনটির অভাব ছিল না। পৃথিবীর যে কোন উন্নত ও সুসংস্কৃত রাষ্ট্রের সহিত তুলিত হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াই আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, অথবা সংস্কৃতি বিভাগ যুদ্ধকালীন বিভাগ নহে! দুর্য্যোগের মধ্যে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি, তাহাতে ঐগুলি না থাকিলেও পারিত; কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিপূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতেই চাহিয়াছিলেন এবং সেই ঘোর দুর্য্যোগের ভিতরেও তাহাই করিয়াছিলেন।

দুর্য্যোগই কি যেমন তেমন? সারা বিশ্ব একদিকে, একাত্মা হইয়া হারাধন পুনঃ প্রাপ্তি—স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে। শুধু কি নিজেদের সর্ব্বস্বই পণ করিয়াছে? না। যুদ্ধে জড়িত হইবার কোনও কারণ যাহাদের ছিল না, যুদ্ধে হারিলে অথবা জিতিলে যাহাদের অদৃষ্টের কণামাত্র ইতর বিশেষ হইত না, ময়াল সাপের লাঙ্গুলে বদ্ধ হইয়া পিষ্ট ক্লিষ্ট হইয়া তাহারাও ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িতেছিল। আমাদের ভারতবর্ষ দৃঢ়কণ্ঠে তাহার অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিল। ক্রীতদাসের অনিচ্ছা পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া ভারতের বড়লাট এই বিশাল মহাদেশকে বৃটিশের যুদ্ধ জাহাজের পশ্চাতে গাধা-বোটের মত জুড়িয়া দিয়াছিলেন। ভারতের অগণিত জন, অপরিমিত ধন, অতুল অফুরন্ত খনিজ সম্পদ নিঃশেষে নিঃশেষিত হইতে লাগিল। পশ্চিমদেশীয় দুগ্ধব্যবসায়ী যেমন পন্থা-নির্ব্বিচারে দুগ্ধ দোহন করে, গো-বৎসের মুখ চাহিবার অবসরমাত্র থাকে না, সাম্রাজ্য-অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে সেই ভাবেই নিঃশেষিত করা হইতেছিল।

বুঝি তাহাতেও কুলায় না। তাই রুজভেল্ট-চার্চ্চিল-সম্মিলনে অতলান্ত মহাসাগরের উত্তাল উত্তুঙ্গ তরঙ্গ-ভঙ্গে জাহাজ ভাসাইয়া বিশ্ববিধানের নামে চতুর্ব্বর্গ স্বাধীনতার সাম গানের ড্রেস রিহার্স্যাল সুরু হইয়া গিয়াছিল। পৃথিবী হইতে শোষণ লোপ, অভাব বিলোপ, ভয় লোপ, দারিদ্র্য বিলোপ, অতএব স্বতঃসিদ্ধভাবে যুদ্ধ সম্ভাবনা বিলোপ! কলিকালের এই পৃথিবীকে পুরাণোক্ত শচীপতি ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার পক্ষে একমাত্র অন্তরায়, শত্রুকুল তখনও সশরীরে বিদ্যমান। এই বিশ্ববিধানের ধাপ্পায় (United Nations Charter) বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য বৃটিশ ও মার্কিন রণনায়কগণ সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। বল, ছল ও কৌশল—লাগে তাগ্—না লাগে তুক্। আসল কথা, তখন মরণ কামড়। ক্রাইসিস্ ক্লাইম্যাক্সে উঠিয়াছে। তখন এমনই মারাত্মক ও সসেমিরে অবস্থা যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও রণনৈপুণ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আর থাকিতে পারা যাইতেছে না। একটা কল্পিত নূতন স্বর্গও অভিনব মর্ত্ত্যের সুরঞ্জিত সুরভিত সুখচিত্র অঙ্কনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। বৃটিশের দ্বীপপুঞ্জের বাহিরে স্বাধীনতা শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র যে বৃটিশ কালাপাহাড় শাবল কুড়ুল কোদাল কাটারি লইয়া ধাবিত হয়; সম্ভব হইল, সাধ্যে কুলাইলে অভিধানের পৃষ্ঠা হইতে ঐ শব্দটির বিলোপ ঘটাইতে যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, স-ভারত সসাগরা পৃথিবীকে চতুর্ব্বর্গ স্বাধীনতা দানের জন্য যে চার্টার, সেই চার্টারে চার্চ্চিল সাহেবের সাগ্রহ স্বাক্ষর-দান, ইহা হইতেই বুঝা গিয়াছিল, সে কত বড় বিরাট ধাপ্পা! বিশ্বের কাল, পীত, তাম্র বর্ণ স্বাধীন হইবে, চার্চ্চিল নিজের মৃত্যু পরোয়ানা সহি করিবেন! অহো, কি পরিবর্ত্তন!

যুদ্ধ পরিচালনা ও যোদ্ধৃপক্ষের আত্মরক্ষাই তখনকার করণীয় কর্ত্তব্য। যুদ্ধবহির্ভূত কার্য্য তখন অকার্য্য; যুদ্ধ সম্পর্কিত নহে এমন মানুষের কথা তখন ধর্ত্তব্য নহে। আমরা তখনও বাঁচিয়া ছিলাম (ছিলাম ত?), তাই আমরাও দেখিয়াছি গভর্ণমেণ্ট তখন দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগ—সামরিক বা মিলিটারি আমাদের ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট, সজীব, সক্রিয় ও সাবলীল এবং সর্ব্বক্ষম। দ্বিতীয় ভাগ—বেসামরিক অর্থাৎ সিভিল গভর্ণমেণ্ট। জগন্নাথের রথ তবু নড়ে, কূর্ম্মগতিতেও চলে, বে-সামরিক গভর্ণমেণ্ট অচল ও অনড়। এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশের অভিজ্ঞতা অতীব করুণ ও মর্ম্মন্তুদ। পঞ্চাশ লক্ষাধিক নরনারী গভর্ণমেণ্টকে দুই বাহু তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছিল। ভারত নৈবেদ্যের চূড়ায় গাছমোণ্ডাস্বরূপ যে নির্ব্বিকল্প মহাপুরুষটি নয়া দিল্লীর ময়ূর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার শ্রীমুখে ক্ষুদ্র একটি "আহা" পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয় নাই! বৃটিশের তখন 'যে যায় যাক্, যত যায় যাক্, রণজয় চাই। আত্মানাং সততং রক্ষেৎ!

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের আত্মরক্ষার প্রয়োজন কি কম ছিল? তাহার সামরিক প্রয়োজনের গুরুত্ব কি অন্যান্য রাষ্ট্রের অপেক্ষা অল্প ছিল? সহজ বুদ্ধিতেই বুঝিতে পারা যায় যে, উভয়বিধ প্রয়োজনের গুরুত্ব এই বিদেশে, বিভুঁয়ে, নবগঠিত রাষ্ট্রেরই ছিল সর্ব্বাধিক। ভারতবর্ষের মত রত্নখনি তাহার নাই; মার্কিণের কুবেরের সম্পদ সে কোথায় পাইবে? লোকের দেশ-প্রেম ও স্বাধীনতার বাসনাই তাহার জমিদারী, কারেন্সী, ফ্যাক্টরী, আর্সিন্যাল। ভেলা ভাসাইয়া সাগর পর্য্যটন। পৃথিবীর দুই

---

* কার্ত্তিক "ভারতবর্ষ"-এর অনুবৃত্তি—লেখক।

শ্রেষ্ঠ মহাশক্তি দুই বিরাট দৈত্য-দানবের মত, দুই দিক হইতে বিপুল বিক্রমে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে দলিত, নিষ্পেশিত করিতে ধাবিত হইতেছে, ক্ষুদ্র দরিদ্র রাষ্ট্রটিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে, রাষ্ট্রধরগণকে অণুতে পরমাণুতে পরিণত করিতে এবং রাষ্ট্রভূমিখণ্ডটিকে ধূলিকণায় রূপান্তরিত করিতে উদ্যত, তাহারই মধ্যেবে-সামরিক লোকশিক্ষার 'সোপকরণ সহিত ষোড়শোপচার' আয়োজন যেখানে ও যাহাদের দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল, তাহাদের রাষ্ট্রীক চেতনার উৎকর্ষ অনুধাবন করিতে অমানুষিক বিদ্যা বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় মর্ম্মজ্ঞান হয় নাই, রাষ্ট্রপরিচালন ক্ষমতা আয়ত্ত হয় নাই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিবোধ নাই, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি নাই, উদারতা নাই, অনুন্নত মমত্ব নাই—এক কথায় কিছুই নাই! শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইয়াছে; তথাপি আজও তাহার বিরাম নাই। ভারতবর্ষের বর্ম্মে বর্ম্মে লিখিতআছে—নাই। মোড়ে মোড়ে ফলক বিলম্বিত রহিয়াছে—নাই। নাই। নাই। এমন কি গণ-পরিষদের প্রাচীর গাত্রেও সেই দু'টি আখর—'নাই!'

এই গণ-পরিষদ সম্পর্কেই একটা হাসির কথা মনে পড়িয়া গেল, পাঠিকাঠাকুরাণী ক্ষমা করিবেন, ঈষৎ অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িতেও পারে। বিলাতের পার্লিয়ামেন্টে ভারত বিতর্কের গদাধারী ভীমসেন বুলডগানন্ চার্চ্চিল সাহেব প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বিবাহ-সভায় (অর্থাৎ কি-না গণ-পরিষদ!) বর উপস্থিত, বরযাত্র সমুপস্থিত, পুরোহিত হাজির, কেবলমাত্র ক'নেটি পলাতকা। এমতাবস্থায় কি কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য আমরা বাৎলাইতে পারি। কুলধর্ম্মত্যাগিনী পলাতকার পশ্চাদ্ধাবনানন্তর গলদঘর্ম্ম না হইয়া অপর একটি কন্যা সংগ্রহ করিয়া শুভলগ্নে সুতহিবুকযোগে শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন করা এবং রেসনের শাসন না থাকিলে, 'মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ'।

কবে যুদ্ধের অবসান হইবে, কবে ইঙ্গ-মার্কিণ কামানগর্জ্জন স্তব্ধ হইবে, কবে সামরিক প্রয়োজনের গুরুত্ব লাঘব হইবে, কবে জীবনযাত্রা নিরাপদ ও সহজ হইবে, তবে ও তখন বে-সামরিকদিগের খাদ্য, স্বাস্থ্য, ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার ফুরসৎ পাওয়া যাইবে এই বিবেচনায় সমর পরিচালনায় সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিলেও আধুনিক রাষ্ট্রবিধানে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে নিন্দাভাজন অথবা পাপের ভাগী হইতে হইত না; বরং সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য, সর্ব্বাধিক উন্নত ও যীশু জানিত বলিয়া প্রচারিত, বৃটিশের সহিত পংক্তি ভোজনে বসিতেও পারিত; মার্কিণের সহিত কুটুম্বিতা করিতেও পারিত; কিন্তু 'অশিক্ষিত', 'অনুদার' ও 'অদূরদর্শী' ভারতবর্ষীয় সর্ব্বাধিনায়ক তাহা না করিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ রাষ্ট্র সংগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালন কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের স্রষ্টা সুভাষচন্দ্রকে সংগঠকের শক্তি, দৃষ্টি ও আকুল আবেগ দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যায়, জীবনের ধ্যান ও সাধনাই ছিল, সংগঠন।

'গঠন ভাঙ্গিতে পারে,
আছে নানা খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে,
সে বড় বিরল।'

সুভাষ সেই বিরলেরই অন্যতম।

সেই অনিশ্চিত জীবন ও সুনিশ্চিত মৃত্যুর সন্ধিস্থলে অবস্থিত হইয়াও সংগঠক গঠন-বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন মরিতে চলিয়াছে, আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট তখনও শিক্ষা বিভাগ সংগঠনে, লোকশিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই শিক্ষা বিভাগের বিস্তারিত বিবরণ যেদিন প্রকাশিত হইবে সেদিন এই ভারতবর্ষ সোল্লাসে ও সানন্দে ঐতিহ্য অলঙ্কৃত বহুদূর অতীতের মহান ভারতবর্ষের পরিপূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি দর্শন করিয়া ধন্য মানিবে। নেতাজী স্বরচিত রাষ্ট্রের শিক্ষাবিভাগের নামকরণ করিয়াছিলেন, এন্লাইটেনমেণ্ট ও কালচার বিভাগ (Enlightenment & Culture)। এডুকেসন বলিতে আমরা যাহা বুঝি এবং যাহা পাই, নেতাজীর স্পৃহা ও আস্থা যে আদৌ তাহাতে ছিল না, ঐ নামকরণ দেখিয়া তাহাই অনুমিত হয় না কি?

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ হইতে দৈনিক সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা, পাঠ্যপুস্তক, নাটক প্রকাশ, বিদ্যালয় পরিচালন, লোকশিক্ষামূলক বক্তৃতা সংগঠন প্রভৃতি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। সর্ব্বাধিনায়ক সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রের সমস্ত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকেই সংস্কৃতি-পরিষদে কতকটা বাধ্যতামূলক ভাবেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। প্রতি মাসে সেন্সাস গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছিল; শিক্ষিতের সংখ্যা সংগ্রহের উপর নেতাজীর অসামান্য আগ্রহ। সংস্কৃতি পরিষদ গঠনকালে দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল, শতকে পাঁচ। দশ মাস পরে বে-সামরিক বিভাগে শিক্ষিতের সংখ্যা, শতকরা পঁচাত্তরে দাঁড়াইয়াছিল।

হিন্দুস্থানী ভাষাকে মাধ্যম ও রাষ্ট্র ভাষা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানী হরপের পরিবর্ত্তে রোম্যান হরপই রাষ্ট্র ভাষার বাহন হইয়াছিল। কর্ণেল আলাগাপ্পন ছিলেন সংস্কৃতি পরিষদের প্রাতকোত্তম (অফিসার কম্যাণ্ডিং); লেফটেনাণ্ট রিজভী তাঁহার সহকারী (অ্যাডজুটাণ্ট)। যে

কদম্ কদম্ বাঢ়য়ে যা
খুশীকে গীত গায়ে যা

আজ সারা ভারতবর্ষের চিত্তজয় করিয়াছে; যে কদম কদম গাহিতে গাহিতে ভারতের তরুণ-তরুণীর মানসে যুদ্ধাশ্বের গতি ও তেজ অনুভূত হয়, মনে হয় ঐ কদম কদম বাড়িতে বাড়িতেই তাহারাও 'ঐ পাহাড়ের ওপারে, ঐ বনানীর ওধারে, ঐ প্রান্তরের পর পারে মায়াময় মোহময় জন্মভূমি—মাতৃভূমির' সেবায় আত্মদান—আত্মোৎসর্গ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, সেই কদম কদম বাঢ়ায়ে যা মহাসঙ্গীত ঐ সংস্কৃতি পরিষদেরই অমর অবদান। একদিন ছিল, যখন ভারতের বনউপবন পাহাড়প্রান্তর গ্রাম ও নগর চারণ চারণীর সঙ্গীতে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইত। চারণ চারণী দেশের লুপ্ত গরিমা, সুপ্ত সমৃদ্ধির গীতি গাহিয়া—সঞ্জীবনী মন্ত্রে জাতিকে দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া বেড়াইত। নেতাজীর সংস্কৃতি পরিষদের

নাটক সঙ্গীতও দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডের আকাশে বাতাসে মানুষের চিত্তাকাশে সেই সঞ্জীবনী-অমৃতের প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিল। পৃথিবীতে যেমন এক ঈশ্বর, বহু তাঁহার অভিধান, আকাশে যেমন এক সূর্য্য, শতধা বিস্তারিত দিনমণির রশ্মিজাল, নেতাজীর সংস্কৃতি পরিষদের শিক্ষণীয় বিষয়ও তেমনই মাত্র, একটী! ভারতবর্ষ!! ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক, ভারতের ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রচিত নাটক, ভারতের উজ্জ্বল অতীত ও সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতে গ্রথিত গাথা, তাহারই গীতি। একদা মধুময় ব্রজভূমে কানু ছাড়া গীত ছিল না, সে ত আমরা জানি; এবং কল্পনা করিতেও মধুস্বাদ আস্বাদ করি। আজাদ হিন্দ রাষ্ট্রে ভারত ছাড়া কথা ছিল না। একটি মেরুদণ্ডকে বেষ্টন ও কেন্দ্র করিয়া জীবের অবয়ব। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র ভারতবর্ষকে কেন্দ্র ও বেষ্টন করিয়া গঠিত হইয়াছিল।

আমি অনেক সময়ে এই কথাই ভাবি যে নেতাজী কি স্বকীয় জীবনাদর্শেই স্বপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংস্কৃতি পরিষদের 'সিলেবাস্' শিক্ষা-সার রচনা করিয়াছিলেন? আমার বুদ্ধিমতী পাঠিকা ও সুধী পাঠককেও আমি ইহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। দেখুন কি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য! ভারতকে যে ভালবাসিবে, ভারতের ধ্যানে যাহার চিত্ত ভরিবে, ভারতের সমৃদ্ধির অঞ্জন যাহার নয়নে লাগিবে, শৃঙ্খলিত ও পরপদানত ভারতের দীন মূর্ত্তি যাহার মনে দোলা দিবে, সে যে সেই মুহূর্ত্তে, সেই দণ্ডে, সেইক্ষণে আত্মচিন্তা, গৃহ-সংসারের কথা, জাতির পাঁতি, ধর্ম্মের কলহ, সাম্প্রদায়িক বিভেদ সব ভুলিয়া, সব জলাঞ্জলি দিয়া ভুবনমনোমোহিনী জগজ্জননী ভারতবর্ষের দুঃখ বিমোচনে প্রধাবিত হইবে, আত্মদানও তুচ্ছ জ্ঞান করিবে, নেতাজীসৃষ্ট রাষ্ট্রের সংস্কৃতি পরিষদের 'পাঠ্যবস্তু' একমাত্র ভারতবর্ষ হওয়াতে কি এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয় না যে নেতাজীর নিজের জীবন-সত্যের ভিত্তির উপরেই সংস্কৃতি পরিষদ গঠিত হইয়াছিল? নেতাজী মা-কে ভালবাসিয়াছিলেন, জননী জন্মভূমিকে ভক্তি করিয়াছিলেন, তাই না বেদনায় আত্মহারা হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়াছিলেন মাতৃভূমির শৃঙ্খল বিমোচনে। সংস্কৃতি পরিষদে সেই বীজ মন্ত্রই দান করিয়াছিলেন—মা! প্রথমে মা, শেষেও মা। শিক্ষাতেও মা, সাধনাতেও মা। সংগ্রামেও মা। নেতাজীর যে জীবন আজ বিজিত বিশ্বে উচ্চাদর্শ হইয়াছে, স্বাধীনতা-কামী মানুষমাত্রেই যে অত্যুচ্চ আদর্শের পাদমূলে শ্রদ্ধার্ঘ্য অঞ্জলি দিতেছে, সে জীবনের আরম্ভ হইতে আমরা—পৃথিবীর নরনারী কি ঐ একাক্ষরের 'মা' শব্দটিই মূর্ত্ত, প্রত্যক্ষ প্রতিমা-মূর্ত্তিতেই প্রোজ্জ্বল দেখি না? সিদ্ধ সাধক, সার্থক মানব, সকল নেতাজী রাষ্ট্রের নরনারীর সম্মুখে সেই সিদ্ধ মন্ত্র, সেই সকল সার্থক জননী মূর্ত্তিই স্থাপিত করিয়াছিলেন।

নেতাজী পরিকল্পিত এই ভারত-শ্রী আমরা দেখি নাই। একদা নৈশ অন্ধকারবিমুক্ত আকাশে উষার সোনালী বর্ণে বিকশিত হইয়া, ঘনঘোর দুর্য্যোগের মধ্যেই সে স্বাধীন স্বর্গরাজ্য অবলুপ্ত হইয়াছে! দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। দুঃখ হয় সত্য; কিন্তু কল্পনায় সে মহিমময়ী সৃষ্টি আমরা অবলোকন করিতে পারি। নেতাজীপরিকল্পিত ভারত, রাণা প্রতাপের ভারত, মারাঠা শিবাজীর ভারত, মহাত্মা আকবরের বিশাল ভারত। নেতাজী সেই ভারতের সাধনা করিয়াছিলেন যে-ভারতের সাধনায় গান্ধীজী আজীবন অর্দ্ধনগ্ন ফকির। নেতাজী সেই ভারতের ধ্যান করিয়াছিলেন, যে-ভারতের ধ্যানে ধ্যানী-বৃক্ষসম প্রাজ্ঞ আবুল কালাম আজাদ আবাল্য সন্ন্যাসী। নেতাজী সেই ভারতের ধারণা করিয়াছিলেন যে-ভারতের ধারণায় রাজর্ষি জওহর সর্ব্বত্যাগী উদাসী। নেতাজী সেই ভারতকেই ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা-ধারণা করিয়াছিলেন, যে-ভারতের ভুবনমোহিনী প্রতিমার উদ্ধারকল্পে নেতাজীই ধনজন গৃহ দেশ ধর্ম্ম পরিহরি মৃত্যু আহবে প্রমত্ত হইয়া উল্কা-সম বেগে, নক্ষত্রের গতিতে অশান্ত হৃদয়ে অতৃপ্ত চিত্তে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া এই সুদূর দেশে সেই সর্ব্বরত্নালঙ্কারবিভূষিতা মাতৃ-মূর্ত্তির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। নিজে উদাত্তকণ্ঠে ডাকিয়াছিলেন, মা। সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, ডাক, মা!

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

দ্বিতীয় অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

মহেন্দ্রবাবুর শয়নকক্ষ।

খাটের উপর মহেন্দ্র শুইয়া আছে, চক্ষু মুদ্রিত। মাথার কাছে দাঁড়াইয়া মধু ভৃত্য বাতাস করিতেছে। একপাশে একটি ছোট টেবিলের উপর একটি টেবিল্-ল্যাম্প জ্বলিতেছে, আলোর উপর সিল্কের সেড। হঠাৎ যেন চমকিয়া মহেন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিল। চোখ খুলিয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র। কে? কে হাওয়া করছে?

মধু। আজ্ঞে, আমি।

মহেন্দ্র। আমি? কে তুমি?

মধু। আমি মধু।

মহেন্দ্র। ও। আর কে আছে?

মধু। আর কেউ নেই বাবু। বড়দিদিমণিকে ডাকব?

মহেন্দ্র। (ব্যস্ত হইয়া) না না, ডাকতে হবে না। ডাকতে হবে না। (একটু নীরব থাকিয়া) সে বুঝি বীরুবাবুর সঙ্গে গল্প করছে, না? থাক্। ডাকতে হবে না।

মধু। আজ্ঞে না, তিনি ওপরে আছেন। বীরুবাবু বাইরে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা কইছেন।

মহেন্দ্র। তা হোক, ডাকতে হবে না। (হঠাৎ অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে) ডাকতে হবে না বলছি।

মধু। আচ্ছা, আচ্ছা বাবু, ডাকব না।

মহেন্দ্র। (ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর নিদ্রাচ্ছন্নের কথা কহার মত) তুই একবার অভিলাষকে ডাক দেখি—

মধু। (বুঝিতে না পারিয়া) কাকে ডাকব বাবু?

মহেন্দ্র। অভিলাষকে। আমার—না, না, ডাকিস নি। তার কাছে মুখ তুলে কথা কইব কী করে? থাক্, কারুকে ডাকতে হবে না।

মধু। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আছি। আপনি ঘুমোন বাবু। কোন ভয় নেই।

মধু জোরে জোরে হাওয়া করিতে লাগিল। মহেন্দ্র নিদ্রিত হইল বলিয়া মনে হইল। প্রবেশ করিল নীলমণি ডাক্তার ও বিক্রম।

নীলমণি। চীৎকারটা বড় খারাপ ঠেকল কানে। (বলিতে বলিতে কাছে আসিয়া নিঃশব্দে রোগীকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অতি সন্তর্পণে রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিল। তাহার মুখ গম্ভীর হইল। সে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া দূরে ঘরের অন্যপাশে সরিয়া গিয়া কথা কহিল।) আচ্ছা, হঠাৎ আবার এ রকম বাড়লই বা কেন বলতে পারেন?

বিক্রম। কী জানি। কদিন তো বেশ ভাল ছিলেন। কোন রকম ট্রাব্‌ল্ ছিল না। পরশু বিকেলে হঠাৎ বিছানা নিলেন, একেবারে যেন ভেঙে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে এতটা বেড়ে উঠল।

নীলমণি। ভরসা দিতে পারি না আর ডক্‌টর ঘোষ। একটা কিছু কারণ ঘটেছে নিশ্চয়। কিন্তু এ রকম কেসে কেবল চাকর বাকরের হাতে নার্সিং ছেড়ে দিলে তো চলবে না।

বিক্রম। ঐ হয়েছে সবার বড় বিপদ, নতুন এক কম্‌প্লিকেশন। মেয়েদের একেবারে সহ্য করতে পারছেন না। তাদের এ ঘরে ঢোকাটা পর্য্যন্ত ওঁর কাছে বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা নার্স রাখব, না কী করব তাই ভাবছি।

নীলমণি। এক্‌স্‌কিউজ মি ডক্টর ঘোষ। আপনি এ সময় এঁদের প্রায় একমাত্র বন্ধু, তা দেখছি। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়ও অল্পদিনের নয়। তাই বলছি—

বিক্রম। বলুন না, নিশ্চয় বলবেন।

নীলমণি। আমার মনে হয় ওঁর মনের মধ্যে একটা ডিপ্‌ রূটেড্ ওরি আছে। কী সে দুশ্চিন্তা, কোথায় তার গভীর মূল, তা আমি জানি না। হয়তো আমার অনুমান ভুল। এণ্ড্ আই শ্যাল বি গ্ল্যাড্ ইফ্ আই অ্যাম্ মিস্‌টেকেন্।

বিক্রম। না, আপনার ভুল হয়নি ডক্‌টর সরকার। হি হ্যাজ্ এ কার্টলোড্ অফ্ ওরিজ্,—মোর দ্যান হি ক্যান্ বেয়ার। কী সে গুরুভার দুশ্চিন্তা, কী জটিল তার সমস্যা, তা আপনাকে এখন বলতে পারছি না—

নীলমণি। ইউ নিড্ নট্। আমার শোনারও প্রয়োজন নেই। আমার কেবল এইটুকুই বক্তব্য, প্রোগনোসিস্ ইজ্ ভেরী ব্যাড্। যা আপনিও বুঝতে পারছেন।

বিক্রম। তা পারছি বইকি।

নীলমণি। সেইজন্যেই একটা কথা বলছি। যদি মেয়েদের ওপর কোনও কারণে বা অকারণেও রাগ করে থাকেন,—বুড়ো মানুষ, ও রকম হয়,—তাহলে মেয়েদের উচিত যাহোক করে ওঁকে ঠাণ্ডা করা। অন্ততঃ ফর্ দি সেক্ অফ হিজ্ লাইফ, দুটো মিছে কথা বলেও যদি ওঁকে খুশী করে প্রাণটা রক্ষা করা যেতো,—কী বলেন?

বিক্রম। তা তো বটেই।

নীলমণি। নিজের মেয়ে যেমন সেবা করবে, পেড্ নার্স কি কখনও তা পারে? এই আর কী। আচ্ছা, চলি। ঘুম ভাঙলে আর এক ডোজ দিয়ে দেবেন। আর দেখবেন কোন রকমে রোগী যেন ডিস্‌টার্বড্ না হন। রাত্রে একটু সজাগ থাকবেন।

বিক্রম। এক মিনিট—ডক্‌টর সরকার।

নীলমণি। থাক, ওর জন্যে ব্যস্ত হবেন না। এ বেলা আমি নিজে এসেছি। গুড্ নাইট্। বড়ই দুঃখিত যে এমন একটা টার্ন্ নিল। প্রস্থান

বিক্রম ধীরে ধীরে রোগীর কাছে গেল ও মৃদুকণ্ঠে মধুকে জিজ্ঞাসা করিল

বিক্রম। ঘুমিয়েছেন, না মধু?

মধু। মনে তো হচ্ছে বাবু। কিন্তু থেকে থেকে চমকে উঠছেন—

বিক্রম। ঘুম ভাঙলে আমাকে বোলো, আর এক দাগ ওষুধ দিতে হবে।

মধু ঘাড় নাড়িল। বিক্রম ফিরিয়া আসিতেছিল, সেইক্ষণে মহেন্দ্র চোখ চাহিল

মহেন্দ্র। (প্রস্থানপর বিক্রমের দিকে দেখিয়া) কে?

বিক্রম। (ফিরিয়া দাঁড়াইল) আজ্ঞে আমি।

মহেন্দ্র। ও তুমি? তুমি এসেছ? দেখতে এসেছ? না বাবা, আমি দিইনি, আমি তা দিইনি। তোমার জিনিস যে। একবার তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি। আবার তা অপরকে কী করে দেব? তা কি পারি?

বিক্রম। আপনি ভুল কর—

মহেন্দ্র। ভুল, মহা ভুল আমি করেছিলুম, আমার বোঝবার ভুল হয়েছিল। আমি তো বলেছি ভুল করেছি। আমি মাফ চাইছি। কার জিনিস কাকে দেব?

বিক্রম প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু মহেন্দ্রর কথা শুনিয়া চমকিয়া স্তব্ধ হইল

বিক্রম। আমি বীরু—

মহেন্দ্র। না, না, বীরুর দোষ নেই, রাধুরও দোষ নেই। বয়সের

ধর্ম্ম। সব দোষ আমার, সব দোষ এই মিথ্যেবাদী জোচ্চোর বুড়োর। তুমি আমাকে ক্ষমা কর বাবা—

বলিতে বলিতে উত্তেজনায় উঁচু হইয়া উঠিয়া বিক্রমের হাত ধরিতে গেলেন। পর মুহূর্ত্তেই, মানুষের স্পর্শ পাইয়া তাঁহার চৈতন্য আসিল। ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—

মহেন্দ্র। তু—তুমি?

বিক্রম। আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকাবাবু, আমি বীরু।

মহেন্দ্র। (অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন) তুমি কেন? তোমাকে তো আমি ডাকি নি।

বিক্রম। এই ওষুধটা দিতে এসেছি।

টেবিলের উপর হইতে ঔষধ লইল

মহেন্দ্র। ওষুধ? কী হবে? আচ্ছা দাও। (ঔষধ খাইয়া) যাও, এবার তোমার কাজ হয়েছে তো? এইবার যাও। কী? দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আর কী? এইবার যাও।

ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন

মধু। বাবু, দিদিমণিকে ডেকে দেব?

মহেন্দ্র। না, না, না, কারুকে ডাকতে হবে না। আর তুমিও যাও, যাও বীরুবাবু—

বিক্রম সরিয়া আসিল। মহেন্দ্র দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইলেন। ঘরের অপর দিক হইতে রাধার প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া বিক্রম দ্রুতপদে নিকটে গেল।

রাধা। বীরুবাবু—

বিক্রম। চুপ্। আপনি এ ঘরে কেন এলেন? আপনার গলা শুনলেই ক্ষেপে যাবেন।

রাধা। তা হোক, আমি বাবার কাছে যাই। আজ তিন দিন—

বিক্রম। না, শুনুন। মিথ্যে ওঁকে উত্তেজিত করে কোনও লাভ নেই, বরং ক্ষতিরই সম্ভাবনা,—

রাধা। কিন্তু আমি যে—

বিক্রম। এখানে আর কোনও কথা নয়। এখুনি যদি ফেরেন,—আসুন ও ঘরে—

চলিতে লাগিল। মঞ্চ ঘুরিল

পাশের ঘর। একটি সোফার কোণে অনুরাধা হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ক্রন্দনরতা। বিক্রম ও রাধা প্রবেশ করিল। বিক্রম অনুরাধাকে দেখিল না।

বিক্রম। আপনি সর্বনাশ করবেন না। অধীর হবার সময় নয়। এক মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় কী যে হতে পারে, জীবন মরণ—

রাধা। আপনি আমাকে বোঝাবেন না বীরুবাবু। আমি সব দেখেছি, সব শুনেছি এই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবু ঠিকই বলেছেন, বাবার মনের কাঁটা অসহ্য হয়েছে। আমি সব বুঝতে পেরেছি। সে কাঁটা আমাকে তুলতেই হবে। তাতে যা হবার হোক।

বিক্রম। কিন্তু কী করে তুলবেন, মিসেস্ সেন? উনি যে আপনার নাম পর্য্যন্ত সইতে পারছেন না। তাছাড়া এখন যা অবস্থা ওঁর—

রাধা। জানি। তবু আপনি আমাকে বাধা দেবেন না। বাবার জীবন থাকবার হয় থাকবে, যাবার হয় যাবে। কিন্তু যাবার আগে তাঁকে শুনে যেতে দিন যে আমাকে যাঁর হাতে সঁপে দিয়েছেন তিনি—আমি তাঁরই। তারপরও যদি বাবা আমাকে তাড়িয়ে দেন আমি চলে আসব, কিন্তু শান্তিতে নিঃশ্বেস ফেলুন।

রাধা কাঁদিতে লাগিল

বিক্রম। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কী কর্ত্তব্য। আপনি যা বলছেন তা আমার মনে লাগছে, কিন্তু এ অবস্থায় কী করে,—না, আমার ডাক্তারি বুদ্ধি ভয় দেখাচ্ছে।

অনুরাধা। (মাথা তুলিয়া অশ্রুজড়িত কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে) ডাক্তারি বুদ্ধি ভুলে যান বীরুদা, দিদিকে যেতে দিন বাবার কাছে, বলতে দিন সব কথা, ফল তার যাই হোক।

বিক্রম। অনুরাধা, তুমি? তুমি কি—

রাধা। হ্যাঁ, ও সব জানে। ওকে আজ আমি সব খুলে বলেছি। আপনাকে তো আমি সেইদিনই বলেছিলুম যেদিন সেই ঘটকীর মুখে নিজের কানে নিজের অপবাদের খবর শুনলুম, সেই দিন থেকেই ঠিক করেছিলুম অনুকে সব কথা খুলে বলব। ও বড় হয়েছে। ওর কাছে লুকোনো আমার উচিত হয় নি। তবু বলব বলব মনে করেও কদিন বলতে পারিনি।

অনুরাধা। কেন এতদিন আমাকে বলনি দিদি? কেন আমাকে তোমার এত বড় দুঃখের ভাগ নিতে দাওনি? কেন আমি এতদিন হেসে খেলে আনন্দ করে কাটিয়েছি?

রাধা। অনুকে বলা হয়েছে। আজ বাবাকেও বলব। আমাকে তিনি কী মনে করেছেন, কতখানি ঘৃণায় আজ তিন দিন তিনি রাধু নাম মুখে উচ্চারণ করেন নি, একবার কাছে আসতে দেন নি, সে আমি আজ বুঝেছি। আর নয়, তাঁর ভয় ভেঙ্গে যাক। বাবা চিরদিন থাকে না কারও। তারপর আমার কী হবে, সে আমার ভাবনা, আমিই ভাবব। বাবাকে আর ভাবতে দেব না।

বিক্রম নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল

অনুরাধা। বীরুদা, আমি ছেলেমানুষ, বুঝি কম। তবু আমার এই কথাটা আপনি শুনুন, বাবাকে যেন আমরা শান্তিতে যেতে দিতে পারি। অল্প বয়সে মা গেছেন, বাবা যে আমাদের কতখানি ছিলেন, আমরাও তাঁর কতখানি, তা কারুকে বলে বোঝাতে পারবো না। আমাদের ভাবনা ভেবেই তিনি জীবন যাপন করেছেন, আমাদের ভাবনা ভেবেই তিনি জীবনপাত করছেন।

বিক্রম। সব বুঝতে পারছি অনুরাধা। এতদিন এই কাজই আমাদের করা উচিত ছিল। কিন্তু ঠিক আজকের রাতে ওঁর যে অবস্থা চলেছে—

অনুরাধা। আজকের রাতের পর আর ওঁকে নিশ্চিন্ত করবার সময়

আমরা পাবই, এ ভরসা কি দিতে পারেন বীরু-দা? (বিক্রম নীরব) পারেন না। তাহলে ওঁর বুকের কাঁটা সরাতে দিন, যাতে উনি সহজে নিঃশ্বেস ফেলতে পারেন। সে নিঃশ্বেষ যদি শেষ নিঃশ্বেসও হয় তা হোক। কিন্তু সহজ নিঃশ্বেস হোক।

বিক্রম। তাই হোক। কিন্তু আমাকে আপনি দুমিনিট সময় দিন মিসেস সেন। আমি আসছি। প্রস্থান

মঞ্চ ঘুরিল। মহেন্দ্রের কক্ষ। বিক্রম প্রবেশ করিল। দেখিল মহেন্দ্র জাগিয়াছেন।

বিক্রম। কেমন আছেন কাকাবাবু?

মহেন্দ্র। (বিরক্তিতে ভ্রু কুঞ্চিত হইল) আবার কেন? আবার কী চাই?

বিক্রম। আপনার কাছে একটা অনুমতি ভিক্ষে করছি।

মহেন্দ্র। অনুমতি? আমার কাছে? ও,—না, না, না বীরুবাবু। অনুমতি আমি দিতে পারব না, দেব না।

বিক্রম। মধু, তুমি বাইরে যাও, একটু শুয়ে নাও। আমি বসছি।

মধুর প্রস্থান

মহেন্দ্র। না, তোমাকে বসতে হবে না, কারুকে বসতে হবে না।

বিক্রম। আচ্ছা, আমি বসব না। কিন্তু আপনি উত্তেজিত হবেন না। আমার কথাটা দয়া করে শুনুন।

মহেন্দ্র। না, আমি উত্তেজিত হইনি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর বীরুবাবু। আর রাধাকে বল সে-ও যেন আমাকে ক্ষমা করে। সব দোষ আমারই, কিন্তু অনুমতি দিতে আমি পারছি না। আমি আর বেশি দিন নেই, তারপর, তারপর তোমাদের যা খুশী—কিন্তু বেঁচে থাকতে আমি অনুমতি দিতে পারব না।

বিক্রম। (দৃঢ় স্বরে) সে অনুমতি নয়। আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন। আপনি কেবল মিসেস সেনকে আপনার কাছে আসবার অনুমতি দিন, আপনার সেবা করবার অনুমতি দিন।

মহেন্দ্র। কী বললে? কার নাম করলে?

বিক্রম। মিসেস সেন।

মহেন্দ্র। মিসেস সেন, মিসেস সেন। হ্যাঁ, মিসেস সেন। মনে রেখো বীরু, মিসেস সেন সে।

বিক্রম। (পূর্ব্বের মত দৃঢ় কণ্ঠে) আমি চিরকালই মনে রেখেছি। কোনওদিন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিনি যে তিনি মিসেস সেন। আর শুধু আমি নয়, তিনি নিজেও জানেন যে ইহলোকে পরলোকে তিনি মিসেস সেন ছাড়া আর কিছুই নন।

মহেন্দ্র। কিন্তু তাহলে তোমার সঙ্গে তার এই যে—এই অন্তরঙ্গতা, তোমার প্রতি তার মনোভাব কী?

বিক্রম। তা বন্ধুত্ব।

মহেন্দ্র। শুধুই বন্ধুত্ব? বন্ধুত্বের বেশি নয়? না, আমার বিশ্বাস বন্ধুত্বের বেশি কিছু আছে।

বিক্রম। কাকাবাবু, আমি জানি আপনার মনের বল অসাধারণ। আর এই কঠিন রোগেও তা একেবারে নষ্ট হয়নি, এই আমার বিশ্বাস—

মহেন্দ্র। তুমি জানতে চাইছ, আমি অপ্রিয় সত্য কথা সহ্য করতে পারব কি না? খুব পারব। সব সহ্য করতে পারব, তুমি বল তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রীতি, হ্যাঁ যে অনুরাগ আমি চোখে দেখেছি, কানে শুনেছি, তা কী, সঠিক বল?

বিক্রম। তা ছলনা, তা অভিনয়। তা সর্ব্বৈব মিথ্যা। আপনি মার্জনা করবেন, আপনাকে প্রবঞ্চনা করে শাস্তি দেবার জন্যেই আমরা—যাক। কিন্তু সেই ছলনার ফলে আপনার যে অশান্তি—

মহেন্দ্র। (ধীরে হাত তুলিয়া) থামো, বীরু, আমাকে বুঝতে দাও। বুঝতে দাও সেইটে ছলনা, কি আজকের এইটে ছলনা। আমাকে বুঝতে দাও। আমার রোগ শান্তির জন্যে তোমরা—না, না, ছলনা করে, মিথ্যে দিয়ে আর আমাকে ভালো করতে যেও না।

বিক্রম। এতদিন ছলনা করেছি হয়তো, কিন্তু আজ—

মহেন্দ্র। না, রাধা কী করে আমাকে ছলনা করবে। সে তো জানে না নিজের অবস্থা—

বিক্রম। জানেন। তিনি জানেন অনেকদিন থেকে।

মহেন্দ্র। (উত্তেজিত হইয়া) না, সে জানে না। তুমি আমায় এখনও ছলনা করছ, প্রবঞ্চনা করছ। না বীরুবাবু, তুমি যাও, যাও তুমি। অনেক মিথ্যে বলেছি, অনেক মিথ্যে শুনিয়েছ, আর মিথ্যে আমি সইতে পারছি না। তুমি যাও, যাও আমার সামনে থেকে।

বিক্রম চুপ করিয়া রহিল। মহেন্দ্র পাশ ফিরিয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইলেন। ধীরে ধীরে শুভ্রথান-পরিহিতা সর্ব-অলঙ্কার-বিহীনা রাধা আসিয়া মহেন্দ্রের পায়ের কাছে দাঁড়াইল। বিক্রম অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। রাধা মহেন্দ্রের পায়ের উপর মাথা রাখিল।

মহেন্দ্র। (চমকিত হইয়া) কে? কে? (সাড়া না পাইয়া মাথা তুলিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন) কে? কে আমার পায়ের ওপর? কে ও বীরু?

বিক্রম জবাব দিল না

রাধা। (ক্রন্দনার্ত্ত স্বরে) বাবা!

মহেন্দ্র। কে ডাকলে? কে? কে আমায় ডাকলে?

মহেন্দ্র হাতের উপর ভর দিয়া অর্দ্ধউত্থিত হইলেন। রাধা মাথা তুলিল, কিন্তু স্তিমিত আলোয় তাহার এই নূতন অপরিচিত বেশে মহেন্দ্র তাহাকে চিনিতে পারিলেন না।

মহেন্দ্র। তুমি—তুমি! কি—কে তুমি? উঠে এসো। বীরু; আলোটা তুলে ধর তো।

বিক্রম আলোর ঢাকা উঠাইয়া দিল। উজ্জ্বল আলো রাধার মুখের উপর পড়িল। মহেন্দ্র ভূতাবিষ্টের মত নির্নিমেষ নয়নে তাহার নিরাভরণ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। বিক্রম ভয় পাইয়া মহেন্দ্রের নাড়ী পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইল।

মহেন্দ্র। ভয় নেই বাবা, ভয় নেই। আমি ঠিক আছি। আমার মনের জোর আছে।

ধীরে হাতের ইসারায় রাধাকে কাছে ডাকিলেন। রাধা কাছে আসিল। তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া তিনি অকস্মাৎ বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন ও আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিলেন—

মহেন্দ্র। মাগো, মা আমার! আমার রাধু মা—

রাধা খাটের পাশে জানু পাতিয়া বসিয়া বিছানার উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কান্নার আবেগে তাহার দেহ কাঁপিতে লাগিল। ধীরে তাহার মাথার উপর হাত বুলাইয়া মহেন্দ্র বলিতে লাগিলেন—

মহেন্দ্র। আমি বাঁচলুম, মা আমি বাঁচলুম। আমি বাঁচলুম বীরু।

বিক্রম তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিল

কোনও ভয় নেই, বীরু আমি মরব না। তুমি একটা চিঠি লিখে দাও শেখরকে। সে এসে আমাদের নিয়ে যাক। আর কোনও সমস্যা রাখবো না, কোনও চিন্তা করব না। তিনি যা করেন। মা, মাগো—

রাধার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সেই সময় দরজার উপর অনুরাধা আসিয়া দাঁড়াইল, সে মুখের ভিতর আঁচল পুরিয়া ক্রন্দন রোধ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। বিক্রম নিশ্চল, নীরব।

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা নামিল (ক্রমশঃ)

হিন্দুমহাসভার গোরক্ষপুর অধিবেশন

শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন

বর্ত্তমান যুগের ও রাষ্ট্রব্যবস্থার যে সকল ভালমন্দ সুযোগ সুবিধা লইয়া আমাদের সুখ-সৌভাগ্য, শিক্ষা-সভ্যতার গৌরব করিয়াছি তাহা যে কত ক্ষণভঙ্গুর—কলিকাতায় অনুষ্ঠিত গত সাম্প্রদায়িক বিপর্য্যয়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হিন্দু সমাজ, পরিবার, পারিবারিক মান-মর্য্যাদা—একটা বিপর্য্যয়ের ধাক্কায় এলাইয়া পড়িল। সংঘবদ্ধ হইবার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুসম্প্রদায় তাহাদের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থবোধে বাঁচিবার যে প্রয়াস করিয়া আসিতেছিল তাহা যে কতখানি মিথ্যা কলিকাতার অসহায় নরনারীর মৃত্যুতে তাহাই প্রমাণ করিয়াছিল। এই মর্ম্মান্তিক আঘাতের পর তাহাদের চৈতন্যোদয় হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সাম্প্রতিক নোয়াখালীতে ও ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত অত্যাচারে তাহারা আত্মরক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। এইরূপ সময়ে যখন বাংলার তথা সমগ্র ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আরও বিপুল-ভাবে হিন্দু সংগঠনের জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইতেছিল সেই সময়ে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে ২৬শে ডিসেম্বর গোরক্ষপুরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সপ্তবিংশতিতম অধিবেশন হইবে। অনতিবিলম্বে উদ্বিগ্ন ও কৌতুহলী নরনারী অধিবেশনের পরবর্ত্তী সংবাদ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ সংবাদ পাওয়া গেল হিন্দু আন্দোলনে উৎসর্গকৃত প্রাণ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়এর স্থলে লোকমান্য তিলকের শিষ্য শ্রীযুত এল, বি, ভোপৎকার সভাপতিত্ব করিবেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এবৎসরেও মহাসভার সভাপতিপদে মনোনীত হইলেও অসুস্থতা নিবন্ধন স্বেচ্ছায় ঐ পদ শ্রীযুত ভোপৎকারকে প্রদান করেন।

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ডাঃ বি, এস, মুঞ্জের সম ভিব্যাহারে গোরক্ষপুরে উপস্থিত হন। ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ষ্টেশনে সমবেত জনতা ডক্টর মুখার্জ্জীকে 'গার্ড অব অনার' দেয়। নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি শ্রীযুত ভোপৎকার ও অন্যান্য মহাসভা নেতৃবৃন্দকে লইয়া ৪টি শ্বেত অশ্ববাহিত একটি রাজকীয় শকটকে কেন্দ্রে রাখিয়া ১৬টি হস্তীশোভিত এই শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই শকটে শ্রীযুত ভোপৎকার, ডঃ মুঞ্জে,, ডঃ মুখার্জ্জী প্রভৃতি সমাসীন ছিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে সভাপতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণরাও বলবন্ত ভোপৎকার মণ্ডপের বহির্ভাগে হিন্দুপতাকা অভিবাদন-উৎসব সম্পন্ন করেন। তৎপর বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অধিবেশন আরম্ভ হয়। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে অধিবেশনের উদ্বোধন করেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ, তাঁহার সারগর্ভ উদ্বোধনীবক্তৃতা প্রসঙ্গে গণপরিষদের সদস্যদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলেন "গণপরিষদের সকল সদস্য (কতিপয় মুসলমান সদস্যসহ) যদি সঙ্ঘবদ্ধ হন, লীগকে তোষণ করিতে উদ্বিগ্ন না হইয়া যদি কেবলমাত্র ভারতীয় স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার মূলনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অগ্রসর হন তবে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অভীষ্ট সাধনে বাধা দিতে পারিবে না। ভারতের শাসনতন্ত্র লীগের খেয়ালমত রচিত হইলে ভারতবর্ষ কখনও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না। গণপরিষদ ব্রিটিশ শক্তির সৃষ্ট হইলেও উহার পশ্চাতে ভারতীয়দেরই সমর্থন চাই। ভবিষ্যতে যদি কোন দুর্ব্বিপাক ঘটে, তবে গণপরিষদকে তাহার নিজের ক্ষমতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে হইবে। ক্ষমতা জাহির করিয়া সংখ্যালঘুদের স্বার্থের প্রতি সম্যক অবহিত থাকিয়া গণতন্ত্রসম্মত পন্থায় স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। এইভাবে রচিত শাসনতন্ত্র লীগ গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে সমগ্র ভারতকে সেই শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামীদের, হিন্দুমহাসভার ন্যায় ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে যে, আমরা

সকলদলের সহযোগিতাকামী হইলেও ভারতের স্বাধীনতার পথে কোন দল বা সম্প্রদায় বিশেষের বাধা স্বীকার করিয়া লইব না। আমাদিগের ইহা স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে যে আজ গণ-পরিষদে লীগ সদস্যগণ ছাড়াও বিভিন্ন স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আছেন। তিনি বলেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস ভারতকে তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে আর একটি তীব্র সংগ্রামে রত হইতে হইবে। ভারতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার আবির্ভাব হউক ইহা কেহ না চাহিলেও ব্রিটিশ শক্তি ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকৃত হইবে এবং মুসলিম লীগকে চিরন্তন শিখণ্ডীরূপে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিলে আমরা এই বিসদৃশ অবস্থা মানিয়া লইব না। সেক্ষেত্রে সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে এবং সে সংগ্রামে, ভারতের স্বাধীনতার সত্যকার দরদী যাঁহারা,—যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার ও অখণ্ডতার উপাসক, তাঁহারা যোগদান করিবেন। আর এই ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য দায়ী ব্রিটিশ।

পাকিস্থান দাবীর এবং আসামকে পাকিস্থানের কবলভুক্ত করিবার প্রচেষ্টার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়া ডক্টর মুখার্জ্জী বলেন "ভারতে যদি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই বাস করিতে হয় তবে পাকিস্থান ও লোক-বিনিময় পরিকল্পনার পরিবর্ত্তে অন্য পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। প্রধান প্রধান দলগুলি যাহাতে নিজস্ব স্বাধীন সত্তা বজায় রাখিয়া নিজ বিচার-বুদ্ধি-সম্মত পন্থা অবলম্বনে উন্নতশীল হইতে পারে তজ্জন্য অখণ্ড ভারতের মধ্যেই প্রাদেশিক সীমাগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আস্থা ও নিরাপত্তার মনোভাব প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের সাহায্যে তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঞ্চলসমূহ হইতে সরাইয়া আনিয়া একটি অঞ্চলে সমাবেশ করিয়া শক্তিশালী অংশে পরিণত করাও আমার কাছে সমাধান সূত্র বলিয়া মনে হয়। ভারতের ঘরোয়া ব্যাপারে বৃটেন মাথা ঘামায় কেন? আমি মনে করি, ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশের অপসারণেই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সম্ভব। ভারতের স্বাধীনতা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। তাই বর্ত্তমানে আমরা কোনরূপ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িব না এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমাদিগকে হইতে হইবে। আমাদের এখন এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিতে হইবে যে আমরা যেন প্রাদেশিক ও অন্যান্য সকলপ্রকার বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারি।

বাংলার কথা উল্লেখ করিয়া ডক্টর মুখার্জ্জী বলেন "বাংলার সমস্যা প্রকৃতপক্ষে একটা সর্ব্বভারতীয় সমস্যা। বাংলায় যে সংঘর্ষ হইয়াছে উহাকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বলা যায় না—উহার পশ্চাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। আমাদিগকে এখন আত্মরক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং দলগত বৈষম্য ত্যাগ করিয়া হিন্দুহিসাবেই সেই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সময়ে সময়ে মিঃ জিন্না যে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়া থাকেন তাহাতে আমাদিগের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই। স্থানবিশেষে তাঁহার সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অত্যাচার সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু একথা তাঁহার মনে রাখা উচিত যে তাঁহার সম্প্রদায়ের হার ভারতে শতকরা ২৫ জন মাত্র। তৎকর্ত্তৃক ভারতে গৃহযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইলে শতকরা ৭৫ জনের বিরুদ্ধে মাত্র শতকরা ২৫ জনের বিরোধ হইবে এবং তাহার পরিণাম মুসলমানদের পক্ষে অতীব ভীষণ হইয়া পড়িবে।"

তিনি আরও বলেন "কংগ্রেসের কার্য্যে আমাদিগের নিরর্থক বাধা সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায় নাই। বরং সকল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আমরা সহযোগিতা করিব। তবে হিন্দু বা সমগ্র ভারতের মৌলিক অধিকার ও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে দেখিলে আমরা সঙ্গত অথচ নির্ভীকভাবে উহার বিরোধিতা করিব।" ভারতের স্বাধীনতার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকিতে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন—"বিভিন্ন মত ও সংস্কৃতির পীঠভূমি এই ভারতবর্ষ অতীত গৌরবময় ঐতিহ্য বহন করিয়া স্বাধীন হিন্দুস্থানরূপে পৃথিবীর মহান্ প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে অগ্রণী হইয়া চলুক তাহাই আমরা দেখিতে চাই।"

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর বক্তৃতার পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলরামপুরের মহারাজা স্যর পটেশ্বরীপ্রসাদ সভাপতি, সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকমণ্ডলীকে স্বাগত অভিবাদন জানাইয়া তাঁহার ভাষণ দেন।

অতঃপর শ্রীযুত ভোপৎকার তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি ভাষণে প্রসঙ্গক্রমে বলেন" ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরগণ যেন ভারতের অতীত ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই কথা মনে রাখেন যে মুসলমানদের তোষণ করিয়াও তাহাদের চিত্ত জয় করিতে পারিবেন না। মুসলমানদের ক্রমবর্দ্ধমান দাবী পূর্ণকরা অসম্ভব। মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেও অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের জনৈক সদস্যের উক্তি পর্য্যালোচনা করিলে এই কথার সত্যতা বুঝা যায়। সেদিনও কি তিনি বলেন নাই যে অমুসলমান ভারত ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত প্রকৃত পাকিস্থান অর্জ্জিত হইয়াছে বলা যায় না?

দেশের বর্ত্তমান অন্যান্য সমস্যার আলোচনান্তে তিনি বলেন "হিন্দু মহাসভাকে অসঙ্কোচে নিম্নলিখিত প্রণালীতে স্বীয় কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে, যথা—

(১) সর্ব্বত্র হিন্দু-সাধারণের মধ্যে হিন্দুমহাসভার বাণী প্রচার করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে; কেন না ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দুই ন্যূনতম হিন্দুমনোবৃত্তি-সম্পন্ন।

(২) ভারতের যে কোন স্থানেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আক্রমণ সংঘটিত হউক না কেন, সর্ব্বপ্রকার আক্রমণের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য বর্ণহিন্দু, অনুন্নত সমাজ, শিখসম্প্রদায় ও অন্যান্যকে লইয়া একটি হিন্দুবাহিনী সংগঠিত করিতে হইবে এবং এই কার্য করিবার জন্য নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সমস্ত বিভেদ অপসারণ করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক হিন্দুর মনকে নূতনভাবে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিতে হইবে এবং প্রয়োজন বোধ করিলে সামরিকভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে।

(৪) এই বিরাট কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য হিন্দুমহাসভাকে একটি অর্থভাণ্ডার খুলিতে হইবে।

শ্রীযুত ভোপৎকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "ভারতের সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা বলিতে গিয়া জনৈক বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা বলিয়াছেন 'তরবারির দ্বারাই তরবারির সম্মুখীন হইতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে অতি অল্প কথায় ইহাই হিন্দু মহাসভার আদর্শ।

মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনায় মণ্ডলীগঠন প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুত ভোপৎকার বলেন যে, মুসলীম লীগ ভান করে যে সংখ্যা গরিষ্ঠের চাপে সংখ্যা লঘিষ্ঠের কৃষ্টি বিধ্বস্ত হইবে এবং এই কারণে তাহারা পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। তাহাই যদি হয় তবে পাকিস্থান অঞ্চলে মুসলমানদের চাপে কি অমুসলমানদের কৃষ্টি ধ্বংস হইবার আশঙ্কা নাই ?

তিনি হিন্দুমহাসভা কর্ম্মীদের দুইটি প্রকৃত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়া বলেন "সকল হিন্দুমহাসভা কর্ম্মীকে মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দু মহাসভা নামে সাম্প্রদায়িক হইলেও ইহার উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা বিচার করিলে এই কথা প্রতীয়মান হইবে যে ইহা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী। মহাসভা এমন একটি রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো প্রস্তুত করিতে অভিলাষী যে তাহাতে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সুবিচার করা হইবে—কাহারও প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট অন্যায় করা হইবে না।"

হিন্দুমহাসভার গোরক্ষপুর অধিবেশনের সমাপ্তি দিবসে গৃহীত বিহার সম্পর্কিত প্রস্তাব, হিন্দু সংগঠনের পরিকল্পনা, বাংলার আদম-সুমারী সংশোধন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রস্তাবের মধ্যে সমগ্র হিন্দু জাতির প্রতিনিধিস্থানীয় একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান গঠন এবং নেপাল, ব্রহ্ম, চীন, জাপান, ইন্দোচীন ও মালয়ের হিন্দু, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া নিখিল এশিয়া সর্ব্ব-হিন্দু সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত প্রধান। শুদ্ধি আন্দোলন সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া এবং আগ্রা ও অযোধ্যা হিন্দু মহাসভাকে সংযুক্তক্রমে একটি সভায় পরিণত করিয়া দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে সিন্ধুতে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী 'পাকিস্থান প্রদেশ' সুসংবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য স্থানের মুসলমানদিগকে আহ্বান করায় তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করা হয়। প্রস্তাবে সিন্ধু গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করিয়া বলা হইয়াছে যে তাহারা যদি ঐ নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকেন তাহা হইলে সমগ্র হিন্দু-ভারত সিন্ধুবাসী হিন্দুদিগকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে। নোয়াখালি দাঙ্গা সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভাপতি শ্রীযুক্ত এন. সি. চাটার্জ্জীর উত্থাপিত প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবে বড়লাট ও বাংলার লাট তাহাদের বিশেষ দায়িত্ব অনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করেন নাই বলিয়া এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারও নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জিলার লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, যে সকল জেলায় হিন্দুগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ সেখানে হিন্দুদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাইতে হইলে সরকারের ব্যয়ে সুবিধাজনক অঞ্চলে বসবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং উপদ্রুত অঞ্চলের হিন্দুদিগের ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে এবং উৎপীড়ক সম্প্রদায়ের উপর পিটুনী কর ধার্য্য করিতে হইবে। শ্রীযুত চাটার্জ্জীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের রক্ষার নিমিত্ত হিন্দু সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। জগমনপুরের রাজা সাহেব এই সেনাবাহিনী গঠনে ১ লক্ষ রাজপুত সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য প্রত্যেক হিন্দুকেই এক্ষণে সচেতন হইতে হইবে। হিন্দু সংগঠন কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে হিন্দুর জাতীয় শক্তি যে বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগঠনে সফলতা আমাদিগকে অহিন্দুর চক্ষেও শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র করিয়া তুলিবে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার একাধিক অভিভাষণে গণসংযোগের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়াছেন। মহাসভার দাবীর মধ্যে এবারও তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা, এক ও অখণ্ড ভারত, যৌথ নির্ব্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের উপর জোর দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভোপৎকারও তাঁহার অভিভাষণে অনুরূপ দাবীই পেশ করিয়াছেন।

রাসলীলা

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, বার্-এট্-ল

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ—২৯ অধ্যায়, ২৯-৪১ শ্লোক

২৯

শোকে আঁখি নত করি' চরণে মৃত্তিকা 'পরি,
আনমনে লিখিছে লিখন,
অধর শুকাল শ্বাসে, নেত্রজলে বক্ষ ভাসে,
সিক্ত হ'ল নয়ন অঞ্জন।
মুছাইল মসীজলে উচ্চকুচে বক্ষতলে—
কুঙ্কুমের চিহ্ন ছিল যত,
গুরুভারে মুখভার বক্ষে শেল উপেক্ষার
নীরবে দাঁড়াল মুখ নত।

৩০

যাঁর লাগি' সর্ব্ব ত্যাজি' এল অভিসারে সাজি'
তাঁর একি অপ্রিয় বচন!
তথাপি প্রণয়-ভরে অশ্রু গদ গদ স্বরে
প্রিয়তমে করে নিবেদন :

৩১

গোপী :

হে বিভো স্বচ্ছন্দগতি, গোপীগণ প্রাণপতি,
কেন তুমি হেন রূঢ়ভাষী ?
স্বামী পুত্র সর্ব্ব ত্যাগি' হনু তব অনুরাগী
পদ প্রান্তে করো তব দাসী।
না করিও অবহেলা, প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
না ত্যাজিও তব দাসীগণে,
আদি দেব নারায়ণ, তোষেন মুমুক্ষু জন,
তুমিও তুষিও গোপী জনে।

৩২

হে কৃষ্ণ, তোমারই সাজে তুমি ধর্ম্মবিদ্,
যা কহিলে, "পতি পুত্র আত্মীয় সুহৃদ্,
সেবা করা, স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ভবে,"
বন্ধু তুমি, তুমি ছাড়া এ কথা কে কবে ?

৩৩

যারা শাস্ত্র সুকৌশলী, তারা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
কৃষ্ণপ্রীতি করিছে কামনা।
ওগো আত্ম আত্মা, প্রিয়, পাদপদ্মে স্থান দিও,
পতি পুত্রে নাহিকো বাসনা।
করিও না আশা ছিন্ন, জানি না তো তোমা ভিন্ন,
দাসী হ'তে মনে চির-সাধ
কমললোচন হরি, বর দেহ কৃপা করি,'
যাচি তব চরণ-প্রসাদ।

৩৪

গৃহেতে নিবিষ্ট মন, কর্ম্মরত করদ্বয়,
এ সকলই লইয়াছ হরি'
তোমার চরণ ছাড়ি' এ চরণ নাহি চলে,
ব্রজে যাবো কেন, বা কি করি ?

৩৫

অনল জ্বেলেছ চিতে সে অনল নিভাইতে,
অধর অমৃত কর দান,
হেরিয়া ও মুখশশী বাঁশরী শ্রবণে পশি'
অনল জ্বলিছে অনির্ব্বাণ !
যদি নাহি কথা রাখো, অধরে না চিহ্ন আঁকো,
কহি সখা, তোমার সাক্ষাতে,
এ তনু ত্যজিব ধ্যানে, এ প্রাণ আহুতি দানে—
অন্তিমে মিলিব তব সাথে।

৩৬

হে অরণ্যজনপ্রিয়, যেদিন নির্জ্জনে,
বিহার করেছ সুখে আমাদের সনে।
সেই দিন হ'তে প্রিয় তোমার চরণ,—
রমার আনন্দ-প্রদ, জেনেছি শরণ।

৩৭

সদা কৃপা দৃষ্টি যাঁর দেবতার ও কামনার,
নারায়ণ বক্ষে সে কমলা,
তুলসীর সঙ্গে মাগে, পদরেণু অনুরাগে ;
মাগি তাই ব্রজের অবলা।

৩৮

ত্যজি' বাস, মনে আশ,
তোমার ভজন,
দয়া করো, দুঃখ হরো—
দুঃখ-নিবারণ।
মনোহর, কী সুন্দর,
তোমার ঈক্ষণ !
সঙ্গ চাই, মোরা তাই
পুরুষ-ভূষণ !
স্মর-জ্বর জর-জর
তপ্ত তনু মন।

৩৯

অলকে আবৃত মুখ গণ্ডেতে কুণ্ডল,
অধরে ঝরিছে সুধারাশি,
নয়নে হাসির ছটা, দ্বিভুজে অভয়—
রমা রতিপ্রদ বক্ষস্থল।
হেরিয়া মধুর-মুখ ভুলি' ত্রি-সংসার
চিরতরে হনু পায়ে দাসী।

৪০

কে আছে রমণী ভবে রূপে মুগ্ধ নাহি হবে ?
—তব মৃদু কলালাপধ্বনি।
বাঁশীর মোহন তান, টানিছে নিখিল প্রাণ,
সতী ধর্ম্ম অতি তুচ্ছ গণি।
হেরি' নব ঘন শ্যাম —রূপ নয়নাভিরাম,
পশুপক্ষী—মুগ্ধ এ ধরণী।

৪১

আদিদেব নারায়ণ ভুবন পালক,
তুমিও ব্রজের ভয়-ভঞ্জন, রক্ষক !
আর্ত্ত বন্ধু, দাসীদের তপ্ত স্তনে, শিরে,
অর্পণ করহ তব করপদ্ম ধীরে।

কয়েকটি ভিটামিনযুক্ত লিভারতৈল ও খাদ্যের পুষ্টি বৃদ্ধি

শ্রীমোহিনীমোহন বিশ্বাস এম-এস্‌সি

অনেকেই জানেন যে কডমৎস্যের লিভার হতে প্রস্তুত তৈল প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' যুক্ত এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করবার পর ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ ভিটামিনযুক্ত ও পুষ্টিসম্পন্ন তৈলে পরিণত হয়। বিগত মহাসমরের সময় নরওয়েজাত কডলিভার তৈলের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায় সমগ্র পৃথিবী উহার অভাব বোধ করে এবং কডলিভার তৈলের অনুরূপ পুষ্টিসম্পন্ন আরও কয়েকটি মৎস্যের লিভার তৈল আবিষ্কৃত হয়। ১৯৪০ সালে মাদ্রাজ ফিশারি বিভাগ হাঙ্গরের লিভার হতে তৈল প্রস্তুত করে উহার ভিটামিনমূল্য বাহির করেন। হাঙ্গর একটি অতিকায় মৎস্যজাতীয় প্রাণী এবং উহার লিভারের ওজনও খুব বেশী। এই প্রাণীর লিভার থেকে প্রচুর পরিমাণ তৈল পাওয়া যায় এবং উহা সংশোধন করবার পর প্রায় কডলিভার তৈলের সমগুণ-সম্পন্ন একটি মূল্যবান তৈলে পরিণত হয়। এইপ্রকার তৈল ও তাহা হতে প্রস্তুত ঔষধ ও খাদ্য সম্বন্ধে নানা রকমের গবেষণা করা হয়েছে। এতে যে পরিমাণ ভিটামিন 'এ' আছে তার মূল্য বৈজ্ঞানিকগণ ভালরূপ উপলব্ধি করেছেন এবং জীবদেহের পুষ্টিসাধনে এর বিশেষ চাহিদা হবে আশা করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদী ও উপসাগরসমূহে বহুসংখ্যক হাঙ্গর পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পশ্চিম উপকূলভাগে ও বঙ্গদেশের হুগলী নদীর মোহানাতেও হাঙ্গরের সংখ্যা খুব বেশী। হাঙ্গরের লিভার তৈলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বোম্বাই ও মাদ্রাজের ফিশারি বিভাগ হাঙ্গর শিকারে মনোযোগ দিয়েছে। এইরূপ শিকারের সরঞ্জাম অতি সাধারণ শ্রেণীর বলা যেতে পারে। জেলে ডিঙ্গি হতে বিশেষ ধরণের বঁড়শী ও লৌহশৃঙ্খল সহযোগে এই অতিকায় মাছগুলো ধরা হয়। এই সকল প্রাণীর আয়তন প্রকাণ্ড এবং মাদ্রাজ উপকূল হতে যে শ্রেণীর হাঙ্গর শিকার করা হয়েছে তার মধ্যে কোন কোনটি ৩০ ফুট দীর্ঘ এবং উহার লিভারের ওজন প্রায় তিন মনের উপর। এই সমস্ত লিভার হতে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ তৈল উৎপন্ন হয়।

হাঙ্গরের লিভার হতে তৈল প্রস্তুতের প্রণালী বেশী কঠিন নয়। কাঁচা লিভার হইতে উত্তাপ-সংযোগে তৈল বের করা হয় এবং এই তৈল ওপরে ভেসে ওঠে। এইরূপ যে তেল ভেসে ওঠে হাতার সাহায্যে তা পৃথক পাত্রে রাখা হয়। এই তৈলকে ফিল্টার করে পরে বিশুদ্ধ সোডিয়াম সালফেট সহযোগে জলশূন্য করা হয়। এই সংশোধন প্রক্রিয়ার সময় তৈলকে বাইরের আলোবাতাসের সংস্পর্শ থেকে পৃথক রাখা হয়, কারণ তাতে ভিটামিনের পরিমাণ কমে যায়। ভারতীয় তৈল-সংশোধনাগারে এইরূপ সরল পদ্ধতি সাধারণতঃ অনুসরণ করা হয়। অধুনা তৈল সংশোধন ব্যাপারে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মলিকুলার ডিষ্টিলেশন নামক নূতন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হচ্ছে এবং এই পদ্ধতিতে বহুল পরিমাণ খাঁটি ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' প্রস্তুত করা আরম্ভ হয়েছে। এই বিশেষ ধরণের ডিষ্টিলেশন বা উর্দ্ধপাতন প্রক্রিয়ার দ্বারা অপেক্ষাকৃত কমতাপেই বিশুদ্ধ ভিটামিন 'এ', 'ডি' বাষ্পীয় অবস্থায় নীত হয় এবং পরে ঠাণ্ডা করে তৈলাকারের ভিটামিন 'এ', 'ডি'তে পরিণত করা হয়। এই পদ্ধতিতে যেরূপ খাঁটি ভিটামিন 'এ', 'ডি' যুক্ত হাঙ্গরের তৈল পাওয়া যায় তার মূল্য কডলিভার তৈল হতে কম নয়। উপরন্তু এই প্রকার হাঙ্গর তৈলের সরবরাহের পরিমাণ কডলিভার তৈলের মত সীমাবদ্ধ হবে না। ভারতের উপকূলভাগে যে পরিমাণ মৎস্য শিকার করা সম্ভব, তার সুব্যবস্থা করতে পারলে ভিটামিন সমস্যার বহুলাংশে সমাধান করা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সহিত ভিটামিন 'এ', 'ডি' উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করা আধুনিক খাদ্য-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ আবিষ্কার বলা যেতে পারে। অনেক খাদ্যোপাদান বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে, অথচ উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন 'এ'র অভাবে ঐ খাদ্য জীবদেহে উপযুক্ত পুষ্টিসাধন করতে পারে না। আবার বিশুদ্ধ ভিটামিন সংগ্রহ করাও অনেক সময় কঠিন হয়ে ওঠে। প্রকৃতিজাত কাঁচা শাকশব্জী, ডিম ইত্যাদিতে ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্বেও ঐ ভিটামিন সংরক্ষণ করা বা সংগ্রহ করা কঠিন কাজ এবং ঐ সমস্ত পদার্থ হতে হয়ত একটা বিশেষ ধরণের খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব—কিন্তু কোন ভিটামিনযুক্ত ষ্টাণ্ডার্ড-খাদ্য প্রস্তুত করা বেশ কঠিন। কডলিভার এবং হাঙ্গর লিভার হতে প্রস্তুত তৈলকে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাপের ভিটামিন শ্রেণীর খাদ্য বলে ধরা যেতে পারে এবং এই তৈল সহযোগে অনেক ষ্টাণ্ডার্ড ভিটামিনযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করা সম্ভব। অধুনা অনেক সভ্যদেশে, বিশেষ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে এই তৈলের সাহায্যে কেবল যে মানুষের খাদ্যে ভিটামিন যোগকরা হচ্ছে তা নয়, জীবজন্তুদের খাদ্যও এইভাবে অধিকতর পুষ্টিসম্পন্ন করা হয়েছে। ভারতবর্ষের পক্ষেও এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন নিউট্রিশন ল্যাবরেটরীতে হাঙ্গর লিভার তৈলের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন। মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র অলিওমার্গারাইন নামক কৃত্রিম মাখনের সহিত হাঙ্গর লিভার তৈল সংযোগ করে উচ্চশ্রেণীর ভিটামিনযুক্ত মাখন প্রস্তুত করেছে। এইভাবে সাধারণ লোকের মধ্যে ভিটামিন 'এ'র ব্যবহার অনেক পরিমাণে বেড়ে চলেছে। অতীতে যাহা কেবলমাত্র ঔষধমধ্যে পরিগণিত

হত এখন তাহা ঔষধ ও খাদ্য উভয়েরই স্থান গ্রহণ করেছে। আজ যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান তাহারও খাদ্যতালিকায় এই শ্রেণীর ভিটামিনযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ভালরূপ স্থান পেয়েছে, কারণ ঐ ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভিটামিনের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছে। ভারতবর্ষের সাধারণ-শ্রেণীর অধিবাসীদের পক্ষে এমন কি বর্ত্তমানে মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষেও এই অর্থসঙ্কটের দিনে খাঁটি ঘি, তৈল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু হাঙ্গর লিভার তৈল প্রভৃতি সংযোগ করে উদ্ভিজ্জ তৈল, ঘি প্রভৃতির ভিটামিন মূল্য বর্দ্ধিত করা হলে এই সমস্যার অনেকটা সমাধান সম্ভব হবে। দরিদ্র জনসাধারণের সমক্ষে কেবল ভিটামিনের গুণকীর্ত্তন করলেই চলবে না। দেখতে হবে কি করে এবং কত স্বল্প ব্যয়ে তাঁহারা এই ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করতে পারেন।

বিলাতে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জীবজন্তুর খাদ্যমূল্যও এইভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেখানে গো, মহিষাদি গৃহপালিত পশুসমূহের এবং হাঁস, মুরগী ও অন্যান্য পক্ষীদের খাদ্যে এই ভিটামিনযুক্ত হাঙ্গর-তৈল সংযুক্ত করে সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে সমস্ত জীবজন্তুর স্বাস্থ্যের কেবল যে ক্রমোন্নতি দেখা যাচ্ছে তা নয়, অধিকন্তু উৎপন্ন দুগ্ধ, ডিম প্রভৃতির পরিমাণও বেশ বেড়ে চলেছে। গো, মহিষাদি প্রাণীরা আরও বেশী কৃষিকর্ম্মের উপযোগী হয়েছে। ভারতবর্ষে এই সমস্ত আদর্শ অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন।

কডমৎস্যের এবং হাঙ্গরের যকৃত হতে উৎপন্ন তৈলে ভিটামিন 'এ'র পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। হ্যালিবাট নামক আর এক-প্রকার মৎস্য আছে তাহাতেও ভিটামিন 'এ' ও 'ডি'র পরিমাণ প্রচুর আছে। বাংলাদেশের অনেক মৎস্য আছে যাহাদের লিভারে এই ভিটামিন বেশ পাওয়া যায়। চাঁই, ভেটকী, চিতল, মৃগেল, রোহিত, ইলিশ প্রভৃতি মৎস্যের লিভারতৈলে ভিটামিন 'এ'র পরিমাণ কডলিভার তৈলের চেয়ে বহুগুণে বেশী। ভিটামিন 'এ' একটি বর্ণহীন তরলপদার্থ এবং ইহা তৈল ও চর্ব্বিতে দ্রবীভূত থাকে।

উত্তাপ সংযোগে যখন যকৃত হতে তৈল বের করা হয়, তখন তৈল-জাতীয় ভিটামিন 'এ' ঐ সঙ্গে দ্রবীভূত অবস্থায় আসে। পরে যখন সমস্ত উৎপন্ন লিভার তৈল সংশোধন করা যায় ভিটামিন এ'র পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যায় যে বাঙ্গালীর খাদ্যে যদি ঐ সব মৎস্যের লিভার তৈল সংযোগ করবার ব্যবস্থা করা যায় তবে সাধারণ খাদ্যের উপযোগিতাও বেড়ে যাবে। আমিষভোজীরা যখন মাছ মাংস খান, তখন লিভার হতে তৈল সংরক্ষণ করে যদি খাদ্যে সংযোগ করতে প্রয়াস পান ত তাঁহাদের খাদ্যের ভিটামিন-মূল্য স্বভাবতঃই বহুল পরিমাণে বেড়ে যাবে।

এক্ষণে কড প্রভৃতি মৎস্যের যকৃত হতে উৎপন্ন তৈলে যে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' আছে তাহাদের রাসায়নিক স্বরূপ ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। উদ্ভিদ জগতে এক প্রকার কমলারঙের কঠিন পদার্থ দৃষ্ট হয় তাহাকে ক্যারোটিন বলা হয়। এই ক্যারোটিন স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয় এবং জীবদেহে প্রবেশ করবার পর ইহাই জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভিটামিন 'এ' তে রূপান্তরিত হয়। ভিটামিন 'এ' সাধারণতঃ একটি বর্ণহীন তৈল এবং ইহা স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয়। উদ্ভিদ জগতের ক্যারোটিন জীব দেহের মধ্যে প্রবেশ করে অধিকাংশই ভিটামিন 'এ'তে রূপান্তরিত হয় এবং কিয়দংশ ক্যারোটিনও অপরিবর্ত্তিত থাকে। এ কারণ প্রাণীর লিভারে ভিটামিন 'এ'র সঙ্গে ক্যারোটিনও পাওয়া যায়। দুগ্ধ হতে প্রস্তুত মাখনের মধ্যেও ক্যারোটিন পাওয়া যায় এবং মাখনের পীতাভ বর্ণ এই ক্যারোটিনের জন্য ইহাও প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষণে ভিটামিন 'ডি' সম্বন্ধেও দু একটি কথা বলা যেতে পারে। আরগস্টেরল নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থকে আলট্রা ভায়োলেট রশ্মিতে রাখলে ইহা ভিটামিন 'ডি' তে রূপান্তরিত হয়। কডলিভার প্রভৃতি তৈলে যে ভিটামিন 'ডি' আছে তাহা অনেক সময় আরগস্টেরল হতে প্রস্তুত ভিটামিন 'ডি' অপেক্ষা বেশী সক্রিয় প্রমাণ হয়েছে। ভিটামিন 'ডি' সুরাসার ও স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয় এবং ভিটামিন 'ডি', 'এ' অপেক্ষা অধিক তাপ সহ্য করতে পারে। ভিটামিন 'এ' ও 'ডি'র রাসায়নিক ধর্ম্ম বিষয়ে খাদ্য বিজ্ঞানে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে।

ভিটামিনযুক্ত লিভার তৈলের প্রচলন হলে খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে যে সব সমস্যা ক্রমাগত দেখা যাচ্ছে তার আংশিক সমাধান সম্ভব হতে পারে। খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর ও সুরুচি সম্পন্ন উপাদান সমূহের স্থান দেওয়া বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে সম্ভব নয়। সুতরাং খাদ্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ রেখে যাতে ভিটামিন প্রভৃতি সংযোগ করে খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি করা যায় তার প্রতি সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভিটামিনের নির্দ্দিষ্ট পরিমাপ বা ইউনিট বর্ত্তমানে ঠিক হয়েছে এবং ঐ ইউনিট হিসাব করে ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সাধারণ খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

যুদ্ধোত্তর ভারত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

কথাটা অস্বীকার করিতে পারি না, যদিও আজ পর্য্যন্ত কোনো ইতিহাসের গ্রন্থই এই মূল সূত্রে লইয়া লেখা হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে যে লেখা পড়ানো হয় তাহার মত নিরর্থক আর কিছু নাই। সেটা পুরাকালের একটা প্রাণহীন Record মাত্র। তাহাও সমস্ত পুরাকালটার নহে। কতকগুলি বিশিষ্ট ঘটনার। অবশ্য ইতিহাসে অনেক কথা থাকে—রাষ্ট্র, সমাজ, চিন্তাধারা ইত্যাদির কথা। কিন্তু সে সব কথা দিয়া দেশের প্রকৃত Tradition যে কি ছিল বা আছে তাহা বুঝা অসম্ভব। মনে মনে আমিও ভাবিয়াছি অনেকদিন, কি আমাদের ইতিহাস? হিন্দুদের ঐতিহ্য কি? খুঁজিয়া পাই নাই। কোন গ্রন্থেই তাহার বিশদ ও প্রণিধানযোগ্য বিবৃতি নাই। আমি কোন্ সংহতির কোন্ উদ্দেশ্যের অংশ ও রূপ? কে বলিয়া দিবে? সম্ভব ইতিহাস নাই বলিয়া, ঐতিহ্য tradition-এর রূপ আমরা জীবনে জানি না বলিয়াই, পাই নাই বলিয়াই, আমাদের নিজেদের জীবনে কোনো একটা বৃহত্তর উদ্দেশ্য নাই। আমরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়াই যতটা পারি চেষ্টা করি। নূতন tradition কিন্তু বিনা ভিত্তিতে হয় না। আমরা ভিত্তি কি তৈয়ার করিতেছি?

উমাকে প্রশ্ন করিলাম, "মেয়েদের কি ছেলেদের মত সমান অধিকার দিলে অবস্থা ভালো হবে?"

উমা হাসিয়া উত্তর দিল, "জ্যাঠামশা'য়, সাম্যবাদের যুগ এটা। সমান অধিকার দিলে, তবে আপন আপন বিশেষ অধিকারটা বুঝা পড়া করে নেওয়া যাবে। তার আগে কোন functionকে ঠিকমত কেউ নিরূপণ কোর্ত্তে পারে না।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "কেন? প্রকৃতি?"

উমা কহিল, "প্রকৃতির জৈব function হয় তো কতকটা নিরূপিত করেছে। কিন্তু সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় অন্য কোনো function নিরূপণ করে নি। জৈব function দিয়ে এইগুলি নিরূপণ করার মত বুদ্ধি বা বিচারশক্তি বা জ্ঞান আমাদের নেই। মেয়েরা এই কাজ পারে, অন্য কাজ পারে না—এ রকম একটা বিচার করা যায় না। অবশ্য কাজে লাগালে তারা হয় তো নির্দ্দিষ্ট কাজটা সুচারুভাবে কোরতে পারে; কিন্তু কাজটার সঙ্গে তাদের পরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতির যে যোগ আছে ও চিরকাল থাকবে তা'র মানে কি? পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সবারই প্রকৃতিকে দুরস্ত কোরতে হয়। সেই পরিস্থিতি যখন বদলায়, কার্য্য ও প্রকৃতির যোগও বদলায়। নয় কি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "অর্থাৎ তোমার মতে, ঘরে যে স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র 'ও একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র এ কথা চিরকাল সত্য হোতে পারে না, নারীর প্রকৃতির দিক দিয়েও।"

উমা উত্তর দিল, "সত্য হোতে পারে না। আর হোলেও, সেটা সব সত্য নয়। যদি কোন মেয়ে ঘরের কাজ না শেখে, এই সব খুঁটিনাটি গৃহস্থালীর ও বাইরের কাজে ঘুরে বেড়ায় ও ব্যস্ত থাকে, তবে ঘরের কাজে তার প্রকৃতি আর সায় দেবে না, এই আমার মনে হয়।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "উমা, তুমি তো স্কুলে কাজ কোরেছো—ভাল মনেই কোরেছো। তোমার কি সত্যি সে কাজ ভালো লাগ্‌তো!' তা'তে তোমার মন সমগ্রভাবে পূর্ণ হোয়ে ছিল?"

উমা কহিল, "একটা কোনো বিশেষ কাজে মন পূর্ণ হয় না জ্যাঠামশা'য়। সংশয়ে ব্যর্থ কোরেও না, বাইরের কাজেও বা চাক্‌রিতেও না। আমাদের জোর কোরে মনের প্রসারকে ছোট কোরে, সঙ্কীর্ণ কোরে, এ কাজ কোরতে হয়। তাতে হয় তো কখনো কখনো সুখ পাওয়া যায়; আবার দুঃখও হয়। এমন কোনো বিশিষ্ট কাজ নেই যাতে মনোনিবেশ কোরে, মন কখনো না কখনো বিদ্রোহ করে না। যদি বিদ্রোহ না করে, তবে মন হোয়ে যায় স্থিতিপ্রবণ, আশাহীন, দ্বিধাহীন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই যে মেয়েরা চাক্‌রি কোরছে সব—এটা ভালো মনে কর?"

উমা সংক্ষেপে উত্তর দিল, "চাক্‌রি কারো ভালো করে না, তা ছেলেরই হোক্ আর মেয়েরই হোক্। চাই—কাজ, কাজে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ। সেটার কথাই আমি বোল্‌ছি। চাক্‌রি আমি কোরেছি—কিন্তু দুদিনেই তা' রসহীন হোয়ে গিছ্‌লো। নিতান্ত routineএর ব্যাপার। আর যখন কাজ এই রকম routineএ হয়, তখন মন তাতে আনন্দ পায় না। সে অবস্থাতে হয় মনের বার্দ্ধক্য ও নিরুৎসাহ অবস্থা আসে, না হয় অন্য কোনো কাজে রসের ও আনন্দের সন্ধান কোরতে হয়। কোনটাই স্বাভাবিক নয়।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু, শোনো উমা। ছেলেবয়সে আমরা দেখেছি প্রকাণ্ড একান্নবর্ত্তী পরিবার। সে পরিবারে মা, খুড়ি, জ্যেঠী প্রভৃতিকে দেখেছি; বৌদি, ভগ্নী, ভাগ্নী, পিসি, মাসী সবাইকে দেখেছি। তাদের ছিল না কাজের অভাব সারা দিনে। আর ছিল না কষ্টের সংসারে কর্ম্মের নিরুৎসাহ। সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত একটা অসম্ভব রকমের কাজের ভিড় থাক্‌তো। তাদের জীবনের একটা অতি সহজ রূপ দেখেছি। আজকাল সে একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারও কম। সে রকম সহজ ও সুন্দর জীবনের রূপও নেই। শহরের মধ্যে তো দেখেছি। মেয়েদের এখন ছোট ছোট সংসারে বিশেষত স্বচ্ছল ঘরে

প্রচুর অবসর। সে অবসর যাপনের ব্যবস্থা নেই। তাই তাদের হয় অস্বস্তি। নানা মেয়ে নানারকমে নিজের অবসরটা নিয়োজিত কোরতে চায়। কিন্তু তাতেও তো ঠিকমত তা কোরতে পারে না। চাক্‌রি কোর্লেও কোরতে পারবে না। শুধু চিত্তবিক্ষেপ বাড়বে। সেটা কি ভালো?"

উমা কহিল, "ভালো মন্দ জানি না, জ্যাঠামশা'য়। তবে আপনার ছেলেবেলাকার ঐ একান্নবর্তী পরিবার কি আর ফিরবে? জীবনযাত্রা সহজ আর হবে না; সুন্দর হবে কি না হবে, তা নির্ভর করে শক্তির উপর, মনের শক্তির উপর। সে শক্তি দিয়ে অসহজ ও অত্যন্ত জটিল জীবনযাত্রাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ কোরতে হবে। যতদিন সে শক্তি না হয়, ততদিন বিশৃঙ্খলা থাক্‌বে বৈ কি। যখন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ঘটে, তখন তা'কে শান্তি শৃঙ্খলার নামে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করাটা ক্ষতিকর বোলে মনে হয়।"

তিন

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ শেষ হইতে চলিল। মহাযুদ্ধের শেষ এখনো দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তবে মনে হইতেছে যে শীঘ্রই শেষ হইবে। য়ুরোপের পশ্চিমাংশে মিত্র শক্তির একটু দেরী হইলেও, পূর্ব্বাঞ্চলে রুষ সৈন্যের গতি রুদ্ধ হইবার নহে মনে হইতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ সেরকম সুরু হয় নাই। কিন্তু জাপান যে পিছু হঠিতেছে তাহা বুঝা যাইতেছে।

Axis-বিপক্ষ যাহা কিছু গ্রাস করিয়াছিল,সবই একে একে তাহাদের হস্তচ্যুত হইতেছে, হইবেও। মনে হয়—এ কি রকম বুদ্ধি-বিপর্য্যয়? যাহা কিছু গ্রহণ করিয়া রক্ষা করা যাইবে না—তাহা গ্রহণের জন্য এতো উদ্বেগ ও অশান্তি কেন? Axis বিপক্ষ কি নিজেদের শক্তির পরিমাণ বুঝে নাই? সম্ভব না। আর সেই না বুঝার জন্য যে কঠিন মূল্য দিতে হইবে—তাহা দিতে এখন প্রস্তুত হইতে হইবে।

এমন বিড়ম্বনা বার বার হইয়াছে। হয় তো হইবেও। এই উত্তেজনা ও পরাজয় হইতে যুদ্ধের উদ্যম ও আয়োজন ক্রমশঃই বাড়িবে। অমোঘ অপরাজেয় শক্তি তৈরি করিতে সমস্ত বৃহত্তর রাষ্ট্র-শক্তিগুলি উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে হয় তো। কিন্তু কে বলিতে পারে সেই অমোঘ অপরাজেয় শক্তির পরিমাণ কি। তাহার অবয়ব ও রূপ কি? শক্তি সঞ্চয়ের একটা সীমা আছে। আবার শক্তির সঞ্চয় হইলেও, সে শক্তি যে সর্ব্ব সময়েই, সব যুগেই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কালের প্রবাহে কি ঘটিতে পারে তাহা বলা যায় না। তা ছাড়া আরো অনেক কিছু আছে। বৃহত্তর শক্তিগুলির দুর্ব্বার হইবার চেষ্টাতে ছোট ছোট রাষ্ট্র ও সমাজগুলির কি অবস্থা হইবে? ইহারা কি বৃহত্তর বা বৃহত্তম শক্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে? আপন আপন ক্ষুদ্র স্বাধীনতা হারাইয়া বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের সহিত সমন্বিত হইতে বাধ্য হইবে?

সম্ভব তাহাই হইবে। ছোট ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির দিন গিয়াছে। তাহারা মানব জীবনকে অযথা খণ্ডিত করিয়া শুধু রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি করিয়াছে। সব মানুষ যে একটা সমুক্ত পরিবার, সে কথা এই ক্ষুদ্র জাতি ও রাষ্ট্রগুলি থাকাতে সহজ ও সফল হয় নাই এত দিন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দিন গেলেও, মানুষের মনের ও দেহের স্বাধীনতার দিন যায় নাই। তাহার দিন আসিয়াছে বা আসিতেছে। তাহার প্রত্যয় ঘটিলে কোনো বৃহত্তর বা বৃহত্তম শক্তিই অটুট থাকিবে না। মানুষের প্রকৃতিগত স্বাধীনতার প্রবৃত্তিকে অযথা নিরোধ করিলে কোন প্রতিষ্ঠানই, ছোট হোউক্ বা বড় হোউক্, বাঁচিবে না।

এই কথাই মনে হইতেছিল, যতই মহাযুদ্ধের শেষ অনুমান করিতেছিলাম।

নরেন্দ্রনাথ বলিল, "ভারতের কি হবে? এবার কি স্বরাজ?" চমকিত হইলাম। তাই তো, য়ুরোপের কথাই ভাবিতেছি। ভারতের কথা তো ভাবি নাই। নরেন্দ্র বলিল, "আমি ইদানীং এ সব ভাবনা ছেড়েছি, বাবা। তবু মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে মনে, আবার কি সেই গোলযোগ? সেই কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুসভা, পরিষৎ, দলাদলির পলিটিক্স, সাম্প্রদায়িক বিবাদ, এই সব? বৃটিশ বল্‌বেন, তোমরা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার যোগ্য হও নি; আর এ দেশের লোক বোল্‌বে, না হোক্—দাও তুমি, দিয়ে সরে পড়। Quit India. যদি আবার সেই পূর্ব্বাবস্থাতে ফিরতে হয় তবে সবটাই যেন পণ্ডশ্রম মনে হয়। আমাদেরও বটে, আর বৃটিশেরও বটে।"

আমি বলিলাম, "যুদ্ধের মধ্যে দেশের লোক তো তার বেশী কিছু ভেবেছে বা অনুভব কোরেছে বোলে মনে হয় না।

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "তা হোলে যুদ্ধটা বাজেই হোলো দেখ্‌ছি শেষ পর্য্যন্ত! সেই পুরাণো কথা, not successful enough."

আমাকে মানিতেই হইল, "তাই বটে! অন্ততঃ তাই এখনো মনে হয়।"

নরেন্দ্র কহিল, "মনে হয় মানুষের ইতিহাসটা একটা ব্যর্থতার ইতিহাস। বিশেষতঃ ভারতের। তাই ভাবি সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র মনুর বংশধর আজ কোথায় ও কি ভাবে আছে? আর কিই বা শেষ পর্য্যন্ত কোরতে চায়?"

আমি উত্তর দিলাম, "সে কথা ভাব্‌বার সময় সম্ভবত হোয়েছে। কিন্তু চিরকাল যা হোয়েছে তাই হবে, গণ্ডগোলে শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হোয়ে যাবে। আসলে আমাদের বুদ্ধির প্রকৃতিস্থতা নাই। যথেষ্ট জ্ঞান নাই। উদ্দেশ্য প্রণিধান নাই। শুধু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সাময়িক একটি উত্তেজনাকে অবলম্বন কোরে চলেছি। মহাযুদ্ধ তারই একটা বড় রকমের রূপ।"

নরেন্দ্র একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমার আর কিছুতেই কোনো বিশ্বাস নেই বাবা, আশাও নেই। এককালে ভেবেছিলুম যে এ দেশের স্বাধীনতা চাই-ই চাই; আর কংগ্রেসে থেকে তাই পাবো। তাই যথাশক্তি কংগ্রেসের সাধন-মন্ত্রটা প্রচার করেছি লোকের কাছে। এখন কেবলই মনে হয়, কিছুই হবে না। স্বাধীনতা কি? রাষ্ট্র, সংসার, সমাজ বেঁধে থাক্‌তে গেলেই, আমার স্বাধীনতা আমি

হারাবোই। যতই self government হোক, আমি কোনো দিনই বন্ধন মুক্ত হবো না। পাঁচজনে যা' কোরবে, আমাকে তাই মেনে নিতে হবে। তাই নাকি discipline, কিন্তু আমি চাই জীবনে স্বার্থকতা, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক discipline তো চাই না। আর সে সার্থকতা কি আমার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দিতে পারবে? দেবার পথ তৈরি হয় নি।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

নরেন্দ্র বলিল, "তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কতক্ষণ থাকবে যদি জগতের—পৃথিবীর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা না আসে স্থায়ীভাবে! আজ আমাদের দেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেলে—মনে করা যাক্; কিন্তু কাল সে স্বাধীনতা হারাতে পারে একদিনে। পৃথিবীর মহাশক্তিগুলির মধ্যে স্বাধীনতা রক্ষার বুঝা পড়ার চরম না হোলে, কোনো ক্ষুদ্র জাতির বা দেশের স্বাধীনতা বজায় থাকা অনিশ্চিত ব্যাপার। তা ছাড়া জোর জবরদস্তিতে স্বাধীনতা আর পাবার উপায় নেই। আন্দোলন, হৈ চৈ, বক্তৃতা, এসবে বিশেষ কি হয়? এসব সেকালের ব্যাপার। কালক্রমে যে সব কিছু পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটে, তা এদেশের politics থেকে বুঝা যায় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করা উচিত তাও তো ভেবে পাই না।" নরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ভেবে না পেয়েই তো বক্তৃতা কোরতে হয়। কিন্তু মনে হয় যত কিছু সব নির্ভর কোরছে মহাশক্তিদের উপর। প্রথমে তাদের একটা আপোষে বুঝাপড়া হওয়া চাই; তারপর তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছোট ছোট জাতি ও রাষ্ট্রগুলির কি সম্পর্ক হবে সেটা ঠিক হবে; যতটা সম্ভব একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোরতে হবে। তা হোলে স্বাধীনতা ইত্যাদির মীমাংসা হবে একটা। নচেৎ আমাদের চেষ্টাতে কিছু হবে না! Sun Francisco থেকে তা বুঝা যাচ্ছে।"

আমি বলিলাম, "শুধু এই নয়। স্বাধীনতা নিয়ে কি কোরবো তা যদি আগে থেকে জানি কিছু, তা হোলে স্বাধীনতা পেলে তা ঠিক কোরতে পারবো। নচেৎ তখন তাই নিয়ে আর নানারকম উদ্ধত ও উদ্ভত স্বার্থ নিয়ে এত বেশী ব্যস্ত হোতে হবে যে স্বাধীনতার মানেই বুঝা যাবে না। তাই প্রথম দরকার আমাদের values নির্ণয় করা। জীবনযাত্রাতে value-এর confusion হোয়ে গেছে খুব বেশী রকম। কোনটা খুব প্রয়োজনীয়, কোনটা কম প্রয়োজনীয়— তা বিচার কোরতে না পেরে উপস্থিত স্বার্থ ও প্রয়োজনের কাছে আত্মদান করি। আমাদের বোলে নয়—সারা জগতেরই এই অবস্থা। সবাই চায় প্রভুত্ব ও ধন; কিন্তু সে দুটো আসলে যে উপকরণ, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নহে, এ কথা ভুলে যেতে বেশী দেরী হয় না।"

নরেন্দ্র মন্তব্য করিল, "আমাদের দেশকালীনতা আমাদের কর্ম্মপদ্ধতিকে বিপর্য্যস্ত কোরেছে। তাই কোনো কাজ আমরা সুশৃঙ্খলাতে কোরতে পারি না। কাজ যে কোথাও কিছু হবে না বা হোচ্ছে না সেটা ঠিক। সুতরাং কি যে এ সবের পরিণতি হবে তা কল্পনাও করা কঠিন।"

বলিলাম, "মনে হয়—বড় বড় লক্ষ্যটা ছেড়ে ছোট খাট কর্ম্মক্ষেত্রে ছোটখাটো উদ্দেশ্য নিয়ে সুরু কোরলে ভালো হোতো। একজন মাদ্রাজী ব্যবসায়ীর কাছেও আমি একথা শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, কবে জাতীয় গভর্ণমেন্ট হবে তার জন্য বোসে থাকলে চলবে না। গভর্ণমেন্ট বলেন নি যে তোমরা ব্যবসা কোরতে পারবে না, কারখানা তৈয়ার কোরতে পারবে না। অবশ্য আজকাল মুস্কিলের কথা। যুদ্ধকালীন কন্ট্রোলের টাকা এখনও চলেছে, কিন্তু সেটার জন্য দুশ্চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। আমি শুধু ভাবি যে আমাদের বাঙ্গালাদেশে কই সে কথা তো কেউ ভাবে না। এত বড় যুদ্ধের সুযোগটাও বাঙ্গালার দিক থেকে বাজে হোয়ে গেল। অথচ ধনীর অভাব তো বাঙ্গালাতে নেই।"

নরেন্দ্র কহিল, "তাই তো হোয়েছে। যা কিছু ব্যবসা বাণিজ্য তা মধ্যবিত্ত ঘরের লোকের উৎসাহ ও উদ্যম থেকেই হোয়েছে। কিন্তু তাদের অর্থসামর্থ্য বিশেষ নাই। দুর্দ্দিন এলে তাদের হাত পাততে হবে মাড়োয়ারির কাছে কিম্বা ভাটিয়ার কাছে। আমাদের ব্যবসা প্রচেষ্টা যে একালে নষ্ট হোয়ে যায়, তার জন্য দায়ী এই ধনীরা।"

শ্রী কহিল, "এই functionless property-holdingই যত উপদ্রবের সৃষ্টি করে এই পৃথিবীতে, এ দেশের সঞ্চিত অর্থ Hoard capital নয়। এতে দেশের অমঙ্গল করে।

আমি কহিলাম, "অনেক কিছু এই বাঙ্গালা দেশের দরকার। শুধু ব্যবসা বাণিজ্য নয়। উপকরণ আছে, কিন্তু তার সদ্ব্যবহার নাই। নিজেদের কোনো রকম ভালমন্দ বিচারে প্রবৃত্তি নাই, উৎসাহ নাই। আত্মরক্ষার জন্য, জীবিকার জন্য, বিদ্যাশিক্ষা সংস্কৃতির জন্য আমরা যাই পরের কাছে রিক্ত হস্তে ভিক্ষায়। চাঁদা তুলে মন্দির গড়বো, মঠ দেবো, কিন্তু মানুষের কাজ করার সুযোগ তৈরি কোরে দেবো না। এখন বাঙ্গালায় দরকার প্রথম ও প্রধানত একটা নীতি স্থির করা। প্রথমত কি আমাদের অভাব, দ্বিতীয়ত, কি আমরা চাই, তৃতীয়ত; যা' চাই তা পাবার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা কি ও সে ব্যবস্থার কল্পনা হোলে, তার কাজ কি কোরে হবে। এই সমস্ত সমস্যার পূরণ চাই। আর চাই, সাহস, আন্তরিকতা, বিচার বুদ্ধি—দায়িত্ব নেবার মত, লোকসান সহ্য করার উপযুক্ত শক্তি। এর জন্যে দেশের মাথা যারা তাদের একত্রিত হোয়ে বিচার কোরতে হবে দেশের সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান নিয়ে ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে। এই রকমে না ব্যবস্থা কোরলে কিছু হবে না। শুধু ভাবোচ্ছ্বাসেই দেশটা ভেসে যাবে।" (ক্রমশঃ)

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৩

পরদিন প্রাতে নগরে প্রচারিত হইল যে পুরুষনগরের নগরপাল অস্তিত্তক কোনও সম্ভ্রান্ত ও নিরপরাধ এবং নিরীহ নাগরিকের উপর অযথা অত্যাচারের জন্য ধৃত হইয়া আপাততঃ আবদ্ধ আছেন। তৎকৃত অপরাধের বিষয় অনুসন্ধান চলিতেছে। আরও বিঘোষিত হইল যে চৌরদ্ধরণিক বসুমিত্র এখন অস্থায়ীভাবে নগরপালের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং নায়ক থিওক্রীত বর্ত্তমানে অস্থায়ীভাবে চৌরদ্ধরণিকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

অদ্য বাহ্লিক হইতে সংবাদ আসিল যে ইউয়েচি জাতি তাহাদের রাষ্ট্রপতি কজুলো-কদফিসের অধিনায়কত্বে বাহ্লিক-গন্ধারের সীমান্তে প্রবেশের জন্য প্রয়াস করিতেছে। সীমান্তের একটা গিরিদুর্গের রক্ষীদিগকে আক্রমণও করিয়াছিল বটে, কিন্তু বিফল ও বিতাড়িত হইয়াছে। কিন্তু এই দুর্দ্ধর্ষ জাতি একবার বিফলমনোরথ হইয়া, তাহাদের সংকল্প যে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া যবনদিগের ন্যায় বিলাসে জীবন কাটাইবে তাহা বিশ্বাস হয় না। প্রায় চারিবৎসর পূর্ব্বে এইরূপই আর একবার আক্রমণ হইয়াছিল এবং বার বার পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়াও নিরস্ত হয় নাই, শেষ বার সাম্রাজ্য সীমান্ত ভেদ করিয়া, সীমান্তের একটা তথাকথিত দুর্জ্জেয় দুর্গ অধিকার করিয়া, সেই গিরিদুর্গ শিখরে তাহাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন্ করিয়াছিল। বাহ্লিক-গন্ধারের সম্রাট্ অবশেষে একটা অপমানজনক সন্ধি করিয়া এই বর্ব্বর জাতিকে সাময়িকভাবে অপসারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার সেই আক্রমণ—এবারও কি এই বর্ব্বর জাতি পরাজয়ের পর আর ফিরিবে না? বিশ্বাস ত হয় না। এ জাতি যতদিন বিধ্বস্ত না হয় ততদিন নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। আর যদি তাহারা পরাজিত ও বিদূরিতই হইয়া থাকে—সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার সম্বন্ধে যদি আর কোনও সন্দেহ না থাকে—তাহা হইলে নগরের সর্ব্বত্র এত জল্পনা-কল্পনা—নূতন সৈন্য সংগ্রহের এত আয়োজন—এত প্রচেষ্টা—পুরুষপুর দুর্গরক্ষী সৈন্যাধিনায়কের এত সাগ্রহ ও প্রলোভনময়ী ঘোষণা কেন? এই সকল যে নিরর্থক নহে, তাহা সুনিশ্চিত। হয় ত আমাদের ব্রত উদ্‌যাপনের সময় নিকটবর্ত্তী—যবন শাসনের এই দুর্ব্বল ক্ষণে হয়ত আমাদের শুভযোগের উদ্বোধন হইবে। এখন আর এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। সকল বিষয় বিচার ও সম্যকরূপে আলোচনা পূর্ব্বক একটা সুচিন্তিত কর্ত্তব্য পন্থা অদ্যই নির্দ্ধারণের আবশ্যক বলিয়া আমার মনে হইতেছে। সঙ্ঘের সম্মেলন আহ্বানের জন্য আমি নির্দ্দেশ দিলাম এবং সঙ্ঘের একজন নায়কের দ্বারা আর্য্য মহাস্থবিরের নিকট সংবাদ দিলাম যে অদ্য সন্ধ্যায় আমি সঙ্ঘারামে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয়ে একত্রে সম্মেলনে গমন করিব এবং যদি সম্ভব হয়, সম্মেলনের পূর্ব্বে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য তাঁহাকে নিবেদন করিব।

বোধ হয় আমাদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইবার সময় আসিয়াছে। এখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের আবশ্যক। কিন্তু সাম্রাজ্যের এই সুদূর প্রত্যন্ত দেশে সকল সংবাদ সর্ব্বসময়ে এবং যথাসময়ে লাভ করা সম্ভবপর হয় না। সাম্রাজ্য শাসন কেন্দ্রে কি উপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইতেছে তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া এবং তদনুসারে আমাদের কর্ত্তব্য অবিলম্বে নির্দ্ধারিত ও অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, তাহা না হইলে আমাদের এই অস্ফুট স্বপ্ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া একটা অনাগত কাল্পনিক শুভযোগের জন্য এরূপ নিশ্চেষ্ট

ভাবে বসিয়া থাকিলে অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইব—সে ভ্রম হয় ত সংশোধনের অবকাশ আর কখনও হইবে না।

এই সময়ে একবার বাহ্লিক-গন্ধারের রাজধানীতে বাহ্লিক নগরে কিংবা সাম্রাজ্যের সীমান্ত অথবা শকস্থানে গমনপূর্ব্বক সকল বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইলে আমাদের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে।—আমার প্রাণের মধ্যে একটা উদ্দাম চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছি। রাজধানীতে—যবনের সাম্রাজ্য শাসনকেন্দ্রে আমাদের উপস্থিতি নিতান্তই প্রয়োজন। প্রজ্ঞাকে ডাকিলাম। প্রজ্ঞাকে আমার প্রাণের সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। সে বলিল, "আমাকে একটু ভাবিতে সময় দাও! এ সম্বন্ধে সম্মেলনে আলোচনা হইবে—তুমিও আর একটু ভাবিবার সময় পাইবে—শেখরকেও এসকল কথা পূর্ব্ব হইতে জানাইয়া রাখা প্রয়োজন—তাহার সুচিন্তিত মতামত গ্রহণের আবশ্যক—তাহাকেও এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার কিঞ্চিৎ সময় দিলে ভাল হয়।—তুমি কি বল?"

—হাঁ, নিশ্চয়ই।

—আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিতেছি।

—বেশ, আমি তোমাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

প্রজ্ঞা শেখরকে ডাকিতে গেল।

দ্বিপ্রহরে শেখরের সহিত প্রজ্ঞা আসিল। আমরা তিনজনে একত্রে বসিয়া বাহ্লিক হইতে প্রাপ্ত সংবাদসমূহ আলোচনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলাম। শেখর আমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। গন্ধারে ইতিমধ্যেই সৈন্য সংগ্রহ ও তাহাদিগের শিক্ষা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমাদের সংঘের জন্যও অনেকগুলি নূতন সদস্য ইতিপূর্ব্বেই জুটিয়াছে এবং তাহাদের শিক্ষা অনেক দূর অগ্রসরও হইয়াছে। অদ্য সম্মেলনে আলোচনা সভার পর কপিশার বনভূমির মধ্যে সেই পূর্ব্বের ভগ্ন গিরিদুর্গপ্রাঙ্গণে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। আর্যমহাস্থবির এইরূপ স্থির করিয়াছেন এবং শেখর ও প্রজ্ঞাকে এই সংবাদ আমাকে জানাইতে বলিয়া দিয়াছেন।

আমরা তিন জনে এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম এবং অনেক বিতর্কের পরে আমরা স্থির করিলাম যে আমাদের কর্ম্মপন্থা আপাততঃ হইতেছে বাহ্লিক-গন্ধারের সৈন্যবিভাগে কিংবা শাসনকার্য্যবিভাগে প্রবেশ করিয়া ঘটনাস্রোত বিশেষ মনোযোগ সহকারে এবং সংযতচিত্তে অনুধাবন করা। তবে, যুদ্ধ করিতে হইলে, আমাদিগকে যবনের পক্ষ লইয়া দেশরক্ষার জন্য মরুপ্রদেশের বর্ব্বরদিগকে বিতাড়িত করিতে হইবে। পরে, বিদেশী আততায়ী দূরীভূত হইলে, দুর্ব্বল যবনকে বাহ্লিক-গন্ধারের সিংহাসন হইতে নামাইয়া আমাদের দেশবাসীদিগের অনুমোদিত এক অভিনব শাসন প্রবর্ত্তন কঠিন হইবে না। বহিঃশত্রুকে অগ্রে দূরীভূত করা আবশ্যক। আরও আমরা স্থির করিলাম, আমাদের মধ্যে জনকয়েককে বাহ্লিকে গমন করিয়া সেখানে আমাদের ত্রাণসংঘের সংপ্রসারণে সচেষ্ট হইতে হইবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর মধ্যে আমাদের এই সংঘের প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে।

অপরাহ্ণে, শেখর ও প্রজ্ঞা সংঘবাহিনীকে অদ্য রাত্রে সম্মেলনের পর পরীক্ষণের জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বিদায় গ্রহণ করিল। তাহারাও সম্মেলনের পরামর্শ সভায় যোগ দিবে।

প্রদোষে প্রজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। আমরা উভয়ে পিতার সহিত অন্তঃপুর প্রাঙ্গণে সাক্ষাৎ করিলাম। সেখানে আর্য্যপালকও ছিলেন। তাঁহারা সেখানে বসিয়া অনুচ্চস্বরে কি লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন তাহা ভাল করিয়া শুনিতে বা বুঝিতে পারিলাম না! যতটা অনুমান করিতে পারিলাম, তাহাতে বোধ হইল যে বর্ত্তমান পরিস্থিতি লইয়াই আলোচনা হইতেছে।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি? তোমাদের কি আমাদের নিকট বিশেষ কিছু বলিবার আছে।"

—আজ্ঞা, হাঁ।

—আচ্ছা বস; এখন তোমাদের যাহা বলিবার আছে তাহা বল!

পিতার অনুজ্ঞামত আমরা তাঁহাদের সম্মুখে বসিলাম এবং আমি তাঁহাদিগকে দীক্ষার রাত্রের সকল ব্যাপার খুলিয়া বলিলাম। আমার ব্রত গ্রহণের কথা—মহাস্থবির কর্ত্তৃক আমার অভিষেকের কথা—আমাদের ত্রাণ-সংঘ সংগঠনের বিষয়—আমার জীবনের লক্ষ্যর কথা—আমার শপথের কথা—সকল কথা আমি তাঁহাদের বুঝাইয়া বলিলাম। তাঁহাদের নিকট আমার কোনও বিষয় লুকাইবার নাই

এবং আমি কিছু গোপনও করিলাম না। সাম্রাজ্যের এখনকার অবস্থা তাঁহাদের শুনাইলাম। অন্য সীমান্ত হইতে যে বর্ব্বরদিগের আক্রমণের সংবাদ আসিয়াছে তাহা তাঁহাদিগকে অবগত করিলাম। আমাদিগের পরামর্শ সভায় আজ রাত্রে স্থির হইবে যে এখনকার এই পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য—আরও জানাইলাম যে হয়ত প্রজ্ঞাকে কিংবা আমাকে, অথবা আমাদের দুই জনকেই, বাহ্লিকের অভিমুখে অচিরে যাত্রা করিতে হইবে। যেন তাঁহারা অন্ধ স্নেহ-মমতার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের যাইবার অনুমতি দানে ইতস্ততঃ না করেন।

পিতা ও আর্য্যপালক ক্ষণকাল মৌন রহিলেন। পরে পিতা ধীরে ধীরে বলিলেন—

"যদি এইরূপই হইয়া থাকে—তুমি যদি তোমার জীবনকে এইরূপ একটা মহাব্রত সাধনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া থাক—আমার প্রাণে যতই কেন কষ্ট হউক না, আমি তোমার গৃহীত ব্রতের উদ্যাপনের পথে অন্তরায় হইব না। আমার অনুমতি আছে। আমার শুভ কামনা—আমার আশীষ—তোমার সকল কার্য্যে—সর্ব্ব অনুষ্ঠানে—সর্ব্বত্রে সকল অবস্থায়, তোমার অনুসরণ করুক! ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধের উদাত্ত করুণা তোমার সাধনার পথে সূর্য্যালোক প্রদান করুক!"

তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল—কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়াছিল।

আর্য্যপালককে বাহিরে অবিচলিত বলিয়া মনে হইল। অন্ততঃ তাঁহার অন্তরের আলোড়ন আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

তিনি শুধু বলিলেন, "প্রজ্ঞা, তুমি শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ—তোমাকে বিদেশে যাইতে দিতে আমার কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। আর একটা কথা আমার মনে হইতেছে—কিঞ্চিৎপণ্য সম্ভার লইয়া এবং দুই-চারিজন লোক সঙ্গে লইয়া যদি বাণিজ্য ব্যপদেশে যাত্রা কর, তাহা হইলে পথে আর কেহ তোমাদিগকে সন্দেহ করিয়া কোনওরূপ গণ্ডগোলে ফেলিতে পারিবে না।"

পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য মহাস্থবিরের উপদেশ লইয়াছ কি?"

—অদ্য সন্ধ্যার পর তিনি পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়াছেন, এই সম্মেলনে সংঘের কর্ম্মপন্থা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

—সন্ধ্যায় সারথিকে রথ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে বলিয়াছ ত?

—না, পদব্রজে সংঘারামে যাইব।

পিতা আর কোনও কথা বলিলেন না।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে লগ্ন সমাবেশ
নামে ত্রয়োদশ বিবৃতি। (ক্রমশঃ)

পুষ্প ও প্রেম

শ্রীনিত্যানন্দ সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ

তোমার বাগানে ফুটেছে গোলাপ
এখানে চন্দ্রমল্লিকা
মোর বেদনায় জড়ায় আদরে
তব মাধবীর বল্লিকা।
তোমার প্রেমের ফুল্ল মহিমা
মম সাধনার মাঝে লভে সীমা,
নিরালা আমার দেহলীতে জ্বলে
তোমার দীপ্ত দীপশিখা—
তোমার বাগানে ফুটেছে গোলাপ
এখানে চন্দ্রমল্লিকা।

তোমার কাননে করবী গরবী
মোর ভীরু নিশিগন্ধা
তোমার গগনে উষার গরিমা
মোর নভে মৃদু সন্ধ্যা।
তব লাবণ্য-বন্যার ধারা
মোর পারাবারে হ'তে চায় হারা—
অরুণিত প্রেমে শুভ্র সাধনা
হবে না কখনো বন্ধ্যা;
তব উপবনে রক্ত করবী
মোর বনে নিশিগন্ধা।

সিন্ধু-চরণে (দীঘা)

শ্রীঅপরাজিতা দেবী

অসমান বন্ধুর পথে হেলিয়া দুলিয়া পড়িতে পড়িতে অনেক কষ্টে কিছু দূর গিয়া গাড়ী আসিয়া থামিয়া গেল। আর যাইবে না—পথ নাই।

বিস্তৃত সৈকত ভূমি। ঢালু জমিতে জোয়ারের জলবেগে বালু ধুইয়া গিয়া মধ্যে মধ্যে প্রকাণ্ড গর্ত। জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত রৌদ্রে দিক দগ্ধ করিতেছে। বালুকারাশি অগ্নিতপ্ত —ধান ছড়াইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ফুটিয়া খৈ হইবে নিশ্চয়। দুই দিকে ছোট ছোট ঘন সবুজবর্ণ ঝোপ্—বড় গাছ নাই যে তলায় দাঁড়াইবে। কিন্তু এত প্রখর সূর্য্যকিরণে এবং অসহনীয় উত্তাপে তীরবর্ত্তী ঝোপ ঝাড় এমন সতেজ—এমন উজ্জ্বল কোমল সবুজ—আশ্চর্য্য! ইহা কি সমুদ্র তীরের লবণাক্ত ভূমির ফল? অন্যত্র দেখা যায়—দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে লতা পাতা ফুল ক্লিষ্ট ও কুঞ্চিত হইয়া পড়ে—অপরাহ্নে ধীরে ধীরে উন্নত হয়—পূর্ণ সজীবতা আসে রাত্রিতে।

শ্রেষ্ঠ ফল—যাহা একসঙ্গে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করে সেই নারিকেল এবং বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন সুমিষ্ট হিজলী বাদাম এখানকার নিজস্ব সম্পত্তি। নারিকেল অত্যন্ত পুরু এবং মিষ্ট, জলও অতি মিষ্ট।

কিছুক্ষণ চলিবার পরে সমুদ্রের গুরু গম্ভীর গর্জ্জন ধ্বনি শোনা গেল। সম্মুখে ঝাউ শ্রেণী—শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছে। তীর দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ বালিয়াড়ীর মধ্য দিয়া খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে সমুদ্র দর্শন মিলিল।

দৃষ্টি সীমা রেখায়—যেখানে আকাশ মিশিয়াছে সমুদ্রে—সেই সমুদ্রের বর্ণ ঘোর নীল। তারপরে পদ্মানদী তুল্য গৈরিক—গৈরিকের ধারে ময়ূরকণ্ঠী, শেষে ঘোর সবুজ বারি রাশি শ্বেতমুকুটমণ্ডিত হইয়া তীরাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে।

মুহূর্ত্ত পরে সবুজ পরিণত হইল গৈরিকে—আবার বেগুনী—আবার সবুজ!—সাগর বক্ষে সে চিরন্তন বর্ণ লীলা-বিভ্রমের বৈচিত্র্য অতুলনীয়—যেন বহুবর্ণা বিজলী ইচ্ছা-সুখে খেলিয়া বেড়াইতেছে।

দূর হইতে নিকটে আসিয়া ভ্রম ভাঙ্গিল। সমুদ্র নিকটে নয়—এতক্ষণ শুধুই সৈকত অতিক্রম করিতেছি।

বহুবিস্তৃত নিম্ন ভূমি—সেইটি পার হইয়া একটি গভীর ক্ষুদ্র ঝরণা—জোয়ারের জল আসিয়া খালে আটকাইয়া যায়। ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শামুক ঝিনুক প্রভৃতি পড়িয়া আছে—কেহ কেহ সেগুলি কুড়াইতে ব্যস্ত, রত্নাকরের কাছে আসিয়া ঝিনুকে সন্তুষ্ট।

উচ্চ ভূমি আরম্ভ হইল—সেও কম নয়। পরে আবার নিম্নভূমি—অগম্য বালিয়াড়ী তীরে তীরে। সম্মুখে বিস্তৃত বালুকাময় বেলা ভূমি—স্রোত আসিতেছে—আবার ফিরিয়া চলিয়াছে।

এই সমুদ্র।—নতজানু ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম কর।

কি ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য্য!—ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ সংসারী প্রাণীর ততোধিক ক্ষুদ্র দৃষ্টির সম্মুখে কি অসীমতা!—এই পৃথিবীতে জন্মিয়া আমরা কিসের সংবাদ রাখি? কিসের অহঙ্কার করি? সৈকতের একটি বালুকণা মাত্র, তার চেয়ে বেশী নয়।

সমুদ্র দূরে নিস্তরঙ্গ শান্ত—গভীর নীল। নিকটে গৈরিক বর্ণ অশান্ত—তরঙ্গসঙ্কুল। গম্ভীর ভৈরব গর্জ্জন সমুদ্র মহিমা উদ্দাম বাতাসে দিকে দিকে ব্যক্ত করিতেছে। শুভ্র ফেন কিরীটশীর্ষ উচ্চতরঙ্গমালা সবেগে তীরাভিমুখে ছুটিয়া আসিয়া সগর্জ্জনে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ফিরিয়া যাইবার সময় বালুকারাশি শির শির করিয়া সেই সঙ্গে চলিয়া যায়। তখন ঠিকভাবে না দাঁড়াও যদি—পতন অনিবার্য্য।

ক্ষণকাল পরেই একটী অতি বৃহৎ তরঙ্গ প্রবলবেগে আসিয়া সৈকতের বহুদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া দিল। তীর ভূমিতে দর্শকদলের রুমাল, পানের কৌটা এবং অন্যান্য জিনিস স্রোতে ভাসিয়া যাইতে বস্তুর অধিকারীগণ ছুটিয়া গিয়া সেগুলি আনিতে আনিতে উলট পালট আছাড় খাইয়া ভিজিয়া গেল। বিরাট রূপের পদতলে দাঁড়াইয়া বস্তুর উপর আকর্ষণকে ইহা একটু ব্যঙ্গ মাত্র। তথাপি কেহ

কেহ বিচিত্র ঝিনুক কুড়াইতে কুড়াইতে তীরে তীরে বহুদূর চলিয়া গিয়াছে—সমুদ্রের চেয়ে শুক্তির উপর আগ্রহ বেশী।

অল্প জলে জানু পাতিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছি স্নানের আশায়।—ভীমকায় অজগরের মত উদ্যত ফণা তুলিয়া ফেনশীর্ষ উচ্চ তরঙ্গ ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে ছুটিয়া আসিয়া মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল—সৈকতে ছড়াইয়া পড়িয়া শান্ত ভাবে আবার ফিরিয়া গেল। তরঙ্গ বেগে পড়িয়া গিয়া উঠিতে না উঠিতে প্রতিহত বেগে আবার পতন!—জলের নীচে দ্রুতবেগে একটা বিপরীত স্রোত বহিতেছে।

এই যে অগণ্য অসংখ্য তরঙ্গের অবিরাম উদ্দামলীলা—কোনদিন কোন কারণে লেশমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না—কারণ কি ইহার? কি উদ্দেশ্য? চিরন্তন যে প্রশ্ন—উত্তর কোথায়?—সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে এমন শোভা কেন? চন্দ্রকিরণ কেন এত মনোহারী? ঝড়-বৃষ্টি মেঘ-বিদ্যুৎ জ্যোৎস্না কেন এমন অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত?

সৃষ্টি রহস্য বুঝিতে চাও—এত বড় স্পর্দ্ধা?

সূর্য্য জগতের প্রাণ।—চন্দ্র জগতের আনন্দ। সূর্য্য-বিহীন হইলে পৃথিবী নিমেষে জীবশূন্য হইবে। চন্দ্রের প্রয়োজন আনন্দের জন্য। কয়দিন নিরবচ্ছিন্ন চন্দ্রালোক মিলে? সেইজন্য এত আকর্ষণ।

আর সমুদ্র?—বিজ্ঞান বলিবে সুসঙ্গত কারণ। কিন্তু অপর দিক? ইহা বরুণ রাজ্য। সমুদ্র স্বতন্ত্র জগৎ—সাগরবাসী স্থলবাসীর ধার ধারে না। যা কিছু প্রয়োজন সমুদ্রেই আছে—স্থলবাসীর সঙ্গে সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। —কিন্তু স্থলবাসীর সমুদ্র-সাহায্য চাই-ই।

এই সমুদ্র—এমন সুন্দর, এমন গম্ভীর, এমন বিরাট, এহেন ভীষণ রূপৈশ্বর্য্যশালী। এই সমুদ্র একদিন মন্থন হইয়াছিল—বিশ্বমাতা লক্ষ্মী দুর্ব্বাশার অভিশাপে এই সমুদ্রে লুকাইয়া ছিলেন।

লক্ষ্মী জলধি-নন্দিনী। জলধি আমাদের পিতামহ—সম্বন্ধ বড় প্রিয়—সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও মধুর—কিন্তু—

'হেরি ওই রুদ্ররূপ ভয়ে প্রাণ কাঁপিছে আমার—'

পিতামহের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করিতে চাও কি?

বহু তরঙ্গ লইয়া স্নান করিয়াছি। অপর কেহ স্নান করিল না। যেহেতু দ্বিতীয় বস্ত্র নাই সঙ্গে। কিন্তু এবার কাপড় ভিজাইয়া জলের ঝিনুক কুড়াইতেছে। ক্ষতি নাই—উদ্দাম বাতাসে একদণ্ডে সিক্ত বসন অঙ্গেই শুকাইবে।

তীরে অনেক রকম মাছ পড়িয়া আছে—ঢেউয়ের সঙ্গে আসিয়াছিল আর যাইতে পারে নাই। একটি জেলে রাশীকৃত মাছ লইয়া চলিতেছিল—মাছগুলি ঝকঝকে সাদা। সমুদ্র তীরে লোকালয় নাই। দিবসে দুই চারি জন মৎস্যজীবী এবং কদাচিৎ দর্শনার্থী ভিন্ন কেহ আসে না এই ঘোর নির্জ্জন প্রদেশে।

হে অনন্ত রূপধারী, অসীম তোমার মহিমা। কে তোমার চরণতলে আসিয়া প্রণাম করিল—কে বা তোমার দিকে দেখিল না—কি প্রয়োজন তাহাতে তোমার? তুমি চির উদাসীন—চির একাকী—তুমি একচ্ছত্র সম্রাট।

ঐ দীপ্তিময় হীরকপুষ্পতুল্য অগণ্য নক্ষত্রশালী আসন্ন সন্ধ্যান্ধকারযুক্ত আকাশ অচিরে মিশিবে তোমার অতুলনীয় নীলরূপ সমুদ্রে, এই অসংখ্য নক্ষত্রতুল্য কুসুমরাশিভূষণা চিরনবীনা শ্যামশ্রী মণ্ডিতা বসুন্ধরাও মিশিতেছে তোমার নীলরূপ তরঙ্গে—

ভুবনে ভুবনে
গগনে পবনে
ছুটিছে সঘনে
এ কি তড়িৎ!
ওগো—মিশে গেল সীমা—
গগন কালিমা—
সিন্ধু নীলিমা
পৃথ্বী হরিৎ। (যমুনা)

এবং কে অনির্ব্বচনীয় মিলন রূপ দর্শন করিবে অনিমেষে—পৃথিবীতে দিকে দিকে নীল গিরিমালা, আকাশে দিকে দিকে নীল মেঘ পর্ব্বতশ্রেণী।

বিদায় হে স্থির ধীর অচঞ্চল সিন্ধু—তোমার অশান্ত তরঙ্গের অশ্রান্ত গর্জ্জনবাহী উদ্দাম শীতল বায়ুপ্রবাহের মধ্য দিয়া এবার বিদায়।

মহাত্মা গান্ধীর নোয়াখালি পরিদর্শন

শ্রীগোরা

৭ই জানুয়ারী। রাত্রির অন্ধকার তখন সবে মাত্র বিদরিত হইতেছে। পূর্ব্ব গগন তখনও রক্তবর্ণ ধারণ করে নাই। ধরণী পরিপূর্ণভাবে শিশির-স্নাত। একে পৌষের প্রথম শীত; তাহাতে উত্তর বায়ুর প্রবল চাপ। পল্লীর পথও দুর্গম। স্থানে স্থানে বন্ধুর, কোথাও কর্দ্দমাক্ত, কোথাও কণ্টকাকীর্ণ, প্রায় সর্ব্বত্রই অপরিচ্ছন্ন। পথের মাঝে মাঝে দুরতিক্রম্য সঙ্কীর্ণ সুপারী গাছের সাঁকো। যাহার পারাপারের সহিত কোথাও কোথাও জড়িত, জীবনমরণের প্রশ্ন। সেই দুর্গম পথের যাত্রী এক অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ। নগ্ন তাঁহার পদ। তদুপরি উপ্পত যন্ত্রণাদায়ক দুইটি স্ফোটক। পরণে কটিবাস। ঊর্দ্ধাঙ্গে শ্বেত খদ্দরের উত্তরীয়। অকম্পিত হস্তে একটি দীর্ঘ বংশদণ্ড। ইহাই তাঁহার পথের অবলম্বন। মুখে স্বভাবসুলভ মৃদু হাসি। অন্তরে কিন্তু এক বজ্র-কঠিন পণ---অত্যাচারিত সংখ্যালঘু হিন্দুর সহিত উৎপীড়ক সংখ্যাগুরু মুসলমানের মিলন সাধন, নতুবা মৃত্যুবরণ।

যাত্রী তাঁহার শুভ যাত্রার পথে পদার্পণ করিলেন. ঠিক এমনি সময়ে, তিনি যে গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার গৃহকর্ত্রী জ্বলন্ত প্রদীপ থালে সাজাইয়া তাঁহাকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বরণ করিয়া লইলেন। অতঃপর সেই বৃদ্ধের ললাটে আঁকিয়া দিলেন উজ্জ্বল সিন্দুরের বিন্দু।

বৃদ্ধ চলিলেন, কঠোর ব্রত সাধনে। সঙ্গীরা গাহিলেন, তাঁহার অতি প্রিয় সঙ্গীত "রামধুন।" পথে বাহির হইয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার যাত্রা পথের উভয় পার্শ্বেই অপেক্ষমান নরনারীর সে কি সমাবেশ! তাঁহারা আসিয়াছেন মহামানব দর্শনে। বর্ত্তমান পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মহাত্মা গান্ধী প্রেমের বাণী লইয়া আজ বাহির হইয়াছেন পথে পথে। এই বার্ত্তা লোকের মুখে মুখে দূরে দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই এই সুবর্ণ সুযোগে দূরবাসীরাও আসিয়াছেন তাঁহার দর্শন লাভে। তাঁহাদের অন্তরের কামনা একবার দেখিয়া ধন্য হইবেন। তিনি চলিতে লাগিলেন। পথের নারীরা তাঁহাকে দেখিয়া সমস্বরে উলু ধ্বনি দিতে থাকিল। দর্শনার্থী জনতা অনুগমন করিল মহামানবের। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহার অনুগামীদলও ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পথের জনতা তাঁহাকে থামাইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া দেখিবার জন্য কি আকুল আবেদন। তাঁহার মুখের বাণী শুনিবার জন্য কি একান্ত অনুরোধ। মহাত্মা পথের মাঝে মাঝে থামিয়া, হিন্দু মুসলমান মিলনের বাণী, তাঁহাদের অজ্ঞতার কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। কাহারও বা এই মহাত্মাকে আপনাদের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য কি ব্যগ্রতা। একজন এমনও জানাইলেন যদি তিনি তাঁহার গৃহে একবার পদার্পণ না করেন, তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। মহাত্মা নিরুপায়। কর্ত্তব্যের পথে চলিলেও ক্ষণিকের জন্য তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। গৃহী ধন্য হইলেন।

এই ভাবে আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মহাত্মা গান্ধী চণ্ডীপুর হইতে মাসিমপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীরা তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত "রামধুন" গাহিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন। মহাত্মা এখানে আসিয়া তাঁহার ভ্রাম্যমান কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গ্রাম সেবা সঙ্ঘের কর্ম্মীরা তাঁহার নিকটে গত হাঙ্গামার বিবরণ পেশ করিলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে ধন, প্রাণ, মান ও মর্য্যাদা সকল দিক হইতে কি নির্ম্মম ভাবে অত্যাচারিত হইয়াছে, ইহা তাহারই নিদারুণ কাহিনী।

সন্ধ্যায় মহাত্মার প্রার্থনা-সভা বসিল। হিন্দু-মুসলমান — উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাহাতে যোগদান করিলেন। মহাত্মা প্রার্থনান্তিক ভাষণে পরধর্ম্মমত সহিষ্ণুতার কথা শুনাইলেন। তিনি বলিলেন— বিভিন্ন ধর্ম্ম একই বৃক্ষের পত্র বিশেষ। যে, যে নামেই ডাকুক সেই এক ভগবানকেই ডাকিবে। ধর্ম্ম মতের মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই। ধর্ম্মও এক, ভগবানও এক।

রাত্রি কাটিল, মহাত্মা আবার চলিলেন গ্রামান্তরে। পরদিন অন্য গ্রামে, তাহার পরদিন আবার একগ্রামে, এই ভাবে মহাত্মাজী ২।৩ মাইল অন্তর অন্তর দিনে একটির পর একটি করিয়া গ্রামে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পথে অন্যান্য গ্রামের ধ্বংসাবশেষও দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। মহাত্মার এই ভ্রমণ পথে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য গ্রামবাসীদের কত রকমেরই না আয়োজন। পথের পাশে পাশে গৃহের দ্বারে দ্বারে কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার নিকটে মঙ্গল কলস স্থাপন করা হইয়াছে। পথের উপরে নানা ধরণের ও নানা বরণের তোরণ, তাহাতে লেখা "বাপুজী স্বাগতম্।" কোথাও বা গ্রামের সারা পথ জুড়িয়া জাতীয় পতাকা সুসজ্জিত। পথের উভয় পার্শ্বেই হিন্দু-মুসলমান অসংখ্য নরনারীর সমাবেশ। তাঁহারা কোথাও নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতেছেন, কোথাও তাঁহাকে ফল উপহার দিতেছেন, কোথাও বা নানা প্রশ্ন করিতেছেন। মহাত্মা সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া উপহারের বদলে তাঁহাদের নিকট হইতে শুধু ভালবাসা চাহিয়া গ্রামে গ্রামে ফিরিতে লাগিলেন। যে গ্রামে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন সেখানেও তাঁহাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য কি আকুল আগ্রহ। গ্রামে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোথাও রামধুন গাহিয়া, কোথাও কীর্ত্তন গাহিয়া, কোথাও উলু ধ্বনি দিয়া শঙ্খ বাজাইয়া, তাঁহাকে বরণ করিয়া লওয়া হইল। গ্রাম ত্যাগের সময়েও ঐ একই রকমের বিদায় সম্ভাষণ—গ্রামে আসিয়া এবার তিনি আর তাঁহার ভ্রাম্যমান কুটীরে অবস্থান করিতে চাহিলেন না। যাঁহার গৃহে আশ্রয় পাইলেন সেখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং মুসলমানের গৃহে আশ্রয় পাইলে সর্ব্বাগ্রে সাদরে তাহা গ্রহণ করিলেন।

এই ভাবে পল্লী পরিক্রমার পথে মহাত্মা গান্ধী একদিন সিরণ্ডী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার মুসলমান শিষ্যা কুমারী আমতুস সালাম তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী হিন্দু-মুসলমান মিলনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বধর্মীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া না পাইয়া একটি অপহৃত খড়্গকে ফিরাইয়া না দেওয়ায়—এই লইয়া অনশন আরম্ভ করেন। মহাত্মা যখন এই গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার অনশনের ২৫শ দিন। মহাত্মাজী গ্রামে পৌঁছিয়াই প্রথমে শিষ্যা আমতুসের শয্যা পার্শ্বে গমন করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সে দিন ছিল মৌনব্রতের দিন। মৌনী মহাত্মা নীরবে আমতুসের কপালে হাত বুলাইয়া ব্যাকুল নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কুমারী আমতুস ও দীর্ঘ অনশনে বাক্‌শক্তিহীনা; নীরবে মনের ভাব মুখে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সে এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য। অপরাহ্নে মহাত্মার মৌনব্রত ভঙ্গ হইল। স্থানীয় মুসলমানেরা হিন্দু-মুসলমান মিলনে সচেষ্ট হইবেন, এরূপ একটি লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র মহাত্মাজীর নিকটে দাখিল করিলে, মহাত্মা স্বহস্তে কমলা লেবুর রস খাওয়াইয়া কুমারী আমতুসের অনশন ভঙ্গ করাইলেন।

আর একদিন মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ভ্রমণ পথে সাহাপুরের উপর দিয়া সদলে অতিক্রম [illegible] হলেন.

[illegible]

মধ্যে কে মহাত্মা গান্ধী—এই লইয়া। একজন মহাত্মা গান্ধীর শিখ সঙ্গী সর্দার দেওয়ান সিংকে দেখাইয়া বলিল, উনিই মহাত্মা গান্ধী। অপর একজন নির্দেশ করিল আর একজনকে। শেষে একজন বৃদ্ধ মুসলমান গান্ধীজী দেখাইয়া সঙ্গীদের বলিলেন, যিনি দেশের সেবায় এত বৎসর কাটাইয়াছেন তিনিই এই মহাত্মা গান্ধী।

মহাত্মা গান্ধী এখনও লোকের গৃহে গৃহে গমন করিয়া এবং হাটে, মাঠে, পথে সর্বত্র ঘুরিয়া উপদ্রবের স্বরূপ দেখিয়া বেড়াইতেছেন। গৃহাদি কিভাবে ভস্মীভূত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে, নারী কিরূপে নির্যাতিতা হইয়াছে, পুরুষকে কিভাবে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে ও হত্যা করা হইয়াছে তাহা তিনি দেখিতেছেন। নির্যাতিত নরনারী মহাত্মাজীর নিকটে নিজেদের দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া অন্তরের বোঝা হাল্কা করিতেছে। মহাত্মাও তাহাদের কাছে সান্ত্বনার প্রলেপবাণী বুলাইয়া দিতেছেন।

গান্ধীজী প্রতি দিনই সভায় প্রার্থনান্তিক ভাষণে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা প্রচার করিতেছেন। নোয়াখালির সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকটে কোরাণের বাণী উদ্ধৃত করিয়া পরধর্মসহিষ্ণুতার কথা বলিতেছেন। নোয়াখালির ধ্বংসস্তূপের উপরে উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই নূতন করিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার উপদেশ দিতেছেন। পল্লীর পথ ও পুষ্করিণী সংস্কারের কথা বলিতেছেন। কৃষকদের উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। সুতা কাটিয়া দরিদ্র গ্রামবাসীর অন্নের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। একদিকে তিনি অত্যাচারিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে যেমন শিখাইতেছেন অপরকে ক্ষমা করিতে, ঠিক অপর দিকে উৎপীড়ক সংখ্যাগুরু মুসলমানদেরও বলিতেছেন, অত্যাচারিতকে ভালবাসিতে এবং পুনরায় তাহাকে বন্ধু

পল্লী পরিক্রমার পথে অনেক মুসলমান কর্তৃক মহাত্মাজীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন

বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়া লইতে। অত্যাচারীদিগকে তিনি নিজ নিজ ভুলের জন্য অনুতাপ করিতে এবং ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিতেছেন।

মহাত্মা গান্ধী আজ তাঁহার সকল কর্ম ভুলিয়া কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সকল চিন্তা ও শক্তিকে তিনি মনুষ্যত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নিয়োগ করিয়াছেন। পরিণত বার্দ্ধক্যে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া মানুষের সেবায় নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছেন। সর্বশক্তিমান ভগবান মহাত্মাজীর এই সাধনাকে জয়যুক্ত করুন, ইহাই আজ আমাদের অন্তরের একান্ত কামনা। ১৬।২।৪৭

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্র দেব

(মাউন্ট আবু)

আগ্রা ষ্টেশনে সতেরো বছর পরে দেখা হ'ল, বম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে জয়পুরের রাজকীয় শিল্প ও কারুকলা বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ—আমাদের বহুদিনের শিল্পী বন্ধু—শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মুখার্জ্জির সঙ্গে। তিনি আগ্রায় এসেছিলেন শিক্ষাবিভাগের একটা কি মিটিংয়ে যোগ দিতে। কাজ সেরে জয়পুর ফিরছেন। বহুকাল পরে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় খুব আনন্দ হল। আমরাও সেই গাড়ীতেই যাচ্ছি এবং জয়পুরেও যাবো শুনে তিনি খুশী হয়ে তাঁর সঙ্গেই যেতে বললেন। সেখানে যাতে আমাদের কোনও অসুবিধা না হয় তার সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবেন বললেন। কিন্তু আমরা একেবারে মাউণ্ট আবুর টিকিট করে চলেছি। আবু পাহাড় থেকে নেমে যোধপুর, বিকানীর, উদয়পুর, চিতোরগড়, আজমীর হয়ে তবে জয়পুরে আসবো শুনে তিনি একটু হতাশ হয়ে পড়লেন। বললেন, তাহলে তোমরা জয়পুর আসবার আগে অতি অবশ্য আমাকে একখানা চিঠি দিও, আমি তোমাদের জন্য সব বন্দোবস্ত করে রাখবো।

দিল্লী-আমেদাবাদ মেলের সেকেণ্ড ক্লাশে রিজার্ভ এ্যাকোমোডেশন অর্থাৎ, সংরক্ষিত আসন না পেয়ে আমরা বাধ্য হয়ে আগ্রা থেকে আজমীর পর্য্যন্ত 'এক্‌সেস্ ফেয়ার' দিয়ে একখানি ফার্ষ্টক্লাশ্ রিজার্ভ করেছিলুম। বললুম কুশল, তুমি আমাদের গাড়ীতেই চলো। কুশল বললেন ধন্যবাদ! তার প্রয়োজন হবে না। আমার বার্থ্ রিজার্ভ আগে থেকেই করা আছে।

গভীর রাত্রে কখন যে ট্রেণ জয়পুরে থেমেছিল, কিছুই জানতে পারি নি। আমরা সকলেই তখন অগাধ নিদ্রায় অচেতন।

বেলা ৮টা নাগাদ আমাদের ট্রেণ আজমীর ষ্টেশনে এসে দাঁড়াতেই আমরা মালপত্র নিয়ে আজমীরে নেমে পড়লুম!

আজমীর থেকে মাউণ্ট-আবু পর্য্যন্ত দিল্লী-আমেদাবাদ মেলে একটি সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট এখান থেকে সুনিশ্চিত রিজার্ভ পাওয়া যাবে এই ভরসা আগ্রা ষ্টেশনের কর্ত্তৃপক্ষ দেওয়াতেই আমরা কেবলমাত্র আরামে রাত্রিবাস-টুকুর লোভে অনেকগুলো টাকা অতিরিক্ত গচ্ছা দিয়েছিলুম। আগ্রাওয়ালারা মিথ্যা আশ্বাস দেয় নি। আজমীর থেকে মাউণ্ট-আবু পর্য্যন্ত একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট এখানে রিজার্ভ পাওয়া গেল। অবশ্য সেদিন নয়, তার পরদিনের মেলে! আগ্রা থেকে এখানকার 'ষ্টেশন ষ্টাফ্' পূর্ব্বাহ্লেই সংবাদ পেয়েছিলেন বলে ব্যাপারটা সহজেই মিটে গেল।

আমরা ভ্রমণে বেরুবার আগে কলকাতা থেকেই 'আবু

মোটর সার্ভিস' কোম্পানীকে পত্র লিখে 'আবু রোড' ষ্টেশন থেকে 'মাউণ্ট আবু' পর্য্যন্ত যাবার জন্য মোটর রিজার্ভ করিয়ে রেখেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আবু মোটর সার্ভিসের বিশ্রামাগারে (রিটায়ারিং রুমে) আমাদের সকলের থাকার ব্যবস্থাও করে রাখতে বলেছিলুম। আজমীর থেকে আবার একখানি জরুরী টেলিগ্রাম করে তাঁদের এবার জানিয়ে দিলুম আমরা কখন কোন ট্রেণে আবু রোড ষ্টেশনে গিয়ে পৌছ'ব।

আবু পাহাড়ের একাংশ

আজমীরে আমরা সারাদিন ও সারারাত কি করলুম সে খবর আজ আর বলবো না। কারণ বাড়ী ফেরবার পথে আমাদের আর একবার আজমীরে নামতে হয়েছিল। সুতরাং, সে কথা যখন লিখবো, সেই সময়ে আমাদের আজমীর দর্শনের উভয় পর্ব্ব এক সঙ্গেই শোনাবো, তা'হলে আর পুনরাবৃত্তির অপরাধ হবে না।

পরের দিন সকালে ৮টার সময় আমরা যে ট্রেণে আগের দিন আজমীরে এসে নেমেছিলুম, সেই দিল্লী-আমেদাবাদ মেল ট্রেণেই আবুরোড ষ্টেশনে রওনা হলুম। আমাদের রিজার্ভ গাড়ীখানি এখানকার রেলকর্ত্তৃপক্ষ ঐ মেলের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেন। মেলে যাবার এই ঝোঁকটা আমাদের আর কিছুর জন্য নয়, দীর্ঘপথ সত্বর অতিক্রম করতে পারবো এবং বেলা চারটে নাগাদ আবু রোডে পৌছতে পারবো বলে। অজানা অচেনা জায়গায় দিনের আলো থাকতে থাকতে গিয়ে নামাই নিরাপদ। তাছাড়া, অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণাভা-রঞ্জিত স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে আবু রোড

রঘুনাথজীর মন্দির (নখী হ্রদের তীরে)

দিয়ে ঘুরে ঘুরে ৬০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় গিয়ে ওঠার পথে শৈলসরণীর চার পাশের গৈরিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার লোভটিও ছিল প্রবল। শুনেছিলেম এই 'ড্রাইভ্'টি নাকি ভারি প্রীতিপ্রদ!

রেলের বাতায়ন থেকে যতদূর দৃষ্টি যায়—দেখছি শুধু তৃণ-তরুহীন ধূসর প্রান্তর, বিস্তীর্ণ বালুরাশির অযতনে বিছানো তরঙ্গায়িত আস্তরণ। মাঝে মাঝে ছোট বড় কাঁটা

গাছ যেন সেই নির্জ্জন প্রান্তরে প্রহরীর মতো স্থির ভাবে খাড়া হয়ে রয়েছে। সেই ধূসর পটভূমিকায় শিল্পীর বিস্ময়ের মতো দেখা দিচ্ছে, শুষ্ক বালুকার পাণ্ডুর বর্ণে ছোপানো অসমতল মরু-কান্তারে অসমছন্দে চলা উটের সারি! থেকে থেকে চকিতে দৃষ্টিকে চমক দিয়ে যাচ্ছে মুখর ময়ূরের ঝাঁক। তাদের কর্ক্কশ কেকাধ্বনি দিগন্ত-ঘেরা পাহাড়ের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে।

বম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলের দ্রুতগামী ট্রেণখানি তখন কোনদিকে দৃক্‌পাত না ক'রে ছুটে চলেছে মাড়োয়ারের অভিমুখে। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন চলেছে একগুঁয়ের মতো পার হয়ে।

"নাই নাই নাই যে সময়—
হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ-
প্রান্তে ফেলে যেতে হয়!"

তুচ্ছ অবজ্ঞায় যেন ষ্টেশন-গুলোকে অবহেলা করে চলেছে আমাদের ট্রেণ। কোথাও সে দাঁড়াচ্ছে না। গোঁ-ভরে চলেছে মাড়োয়ার জংশনে।

মাড়োয়ার। বড়বাজারের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা বাংলামুলুকে আসে এই সুদূর মাড়োয়ার থেকে। এই তাদের দেশ! বিড়লা, গোয়েন্‌কা, খেম্‌কা, দালমিয়াদের জন্মভূমি। কত নাথুমল, সুরজমল, ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালা, চামেরিয়া পুরুষানুক্রমে এখানেই বাস করতো।

কিন্তু, সেদিন তারা ছিল ক্ষত্রিয় বীর, রাজপুত সৈনিক। আজ তারা বাণিয়া ব্যবসাদার মাত্র! পার্শ্বনাথ প্রমুখ ২৪ জন জৈন তীর্থঙ্কর এদের বীর্য্যবত্তার মাথা খেয়ে, একেবারে দফা সেরে ছেড়ে দিয়েছে। এরা সব অহিংস নিরামিষাশী। এদেশে কিন্তু একজনও মাড়োয়ারীর বড়বাজারী ভুঁড়ি দেখতে পেলুম না। ওটা বোধ করি বাংলাদেশেরই জলহাওয়ার গুণ!

আজমীর থেকে মাড়োয়ার পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ কোনও সামন্ত রাজার অধীন নয়। এ অংশটুকু খাস ব্রিটীশ সিংহের অধিকারে আছে। কারণ, আজমীর মাড়োয়ার হ'ল রাজপুতানার আগম ও নির্গমের প্রধান পথ। সমস্ত সামন্ত রাজারা যদি কখনো একজোট হয়ে ব্রিটীশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তবে অতি সহজেই ব্রিটীশরাজ তাদের রাজপুতানার সীমান্তের মধ্যেই অবরোধ করে রাখতে পারবেন।

আরাবল্লী গিরিশ্রেণী এই বরেণ্য বীরভূমিকে উত্তরে

আবু পাহাড়ের মধ্যপথে

প্রায় দিল্লীর নগর প্রান্ত থেকে দক্ষিণে আবু পর্ব্বত পর্য্যন্ত ঘিরে অতীতের মুঘল সাম্রাজ্য ও বর্ত্তমানের ব্রিটীশ সাম্রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

রাজপুতানার মানচিত্র দেখলে বোঝা যাবে যে এরই উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম ঘেঁষে 'থর্' মরুভূমি রাজপুতানার মাটিকে তৃষার্ত্ত ক'রে তুলেছে। শীর্ণা স্রোতস্বিনী লুনীর কৃপাপ্রসারিত তরঙ্গ বাহুর সস্নেহ স্পর্শে রাজপুতানার পশ্চিম মরুপ্রান্তে সবুজ ও সতেজ হয়ে বেঁচে আছে প্রসিদ্ধ প্রদেশ তিনটি—বিকানীর, জশলমীর ও যোধপুর। ভূতত্ত্ব বিশারদেরা বলেন, কোন এক অবিস্মরণীয় যুগে আরবসাগর নাকি এই পশ্চিম রাজপুতানা ওসিন্ধুর মরুপ্রদেশ জুড়ে বেলুচিস্থানের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাজপুতানার পূর্ব্বপ্রান্ত আলো করে আছে আলোয়ার, জয়পুর, টঙ্ক আর উদয়পুর। এই পূর্ব্ব ও পশ্চিমের রাজপুত রাজ্যগুলির কেন্দ্রস্থল ভেদ করে ধূসর বালু গর্ভে

আবু পাহাড়ের উপর 'মাউণ্ট আবু' শহর

প্রোথিত রক্তপতাকার মতো মানচিত্রের বুকে লোহিতবর্ণে রঞ্জিত আজমীর ও মাড়োয়ার—পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ ব্রিটীশ অধিকার ঘোষণা করছে।

আরাবল্লীর পার্ব্বত্যবাধা বিচূর্ণ করে ব্রিটীশের নির্মিত

জয়পুর মহারাজের আবুপ্রাসাদ

রেলপথ আজ দিল্লী থেকে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আজমীর হ'য়ে মাড়োয়ার লঙ্ঘন করে আবুপর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এবং সেখান থেকে আমেদাবাদ ও বোম্বাই পর্য্যন্ত চলে গেছে। এই কেন্দ্রীয় প্রধান রেলপথ অবলম্বন ক'রেই জয়পুর যোধপুর ষ্টেট্ রেলওয়ের মিটার গেজ শাখা স্থাপিত হয়েছে। আজমীর অথবা মাড়োয়ার ষ্টেশন থেকে গাড়ী বদল করে এ অঞ্চলের যে কোনও শাখা রেলপথে সহজেই যাওয়া যায়।

মাড়োয়ারে প্রায় ২০ মিনিট অপেক্ষা করে ট্রেণ আমাদের আবার ছুটতে সুরু করে দিলে। চারটে পনেরো মিনিটে আমরা আবুরোড ষ্টেশনে এসে নামলুম। আশা করেছিলুম আবু মোটর সার্ভিসের কোনও প্রতিনিধি সম্ভবতঃ ষ্টেশনে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করবেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষের একটা কোনও চাপরাশীকেও ষ্টেশনে খুঁজে পাওয়া গেল না!

কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় ষ্টেশনের কুলি জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় যাবেন? তাকে গন্তব্যস্থানের কথা বলায় কুলি বললে—ঠিক ষ্টেশনের বাইরেই মোটর গাড়ীর আস্তানা। চলুন, সব মাল আমরা মাথায় নিয়ে পৌঁছে দিই গে। আবুরোড ষ্টেশন থেকে মাউণ্ট আবু পর্য্যন্ত নিয়মিত বাস্ সার্ভিস্ আছে। বহু যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে বাসগুলি দু'বেলা যাতায়াত করে। আমাদের ২২টি মাল কুলিদের মাথায় চাপিয়ে তাদেরই পিছু পিছু 'আবু মোটর সার্ভিস' অফিসে গিয়ে হাজির হলুম। কুলি সত্য কথাই বলেছে। আবু রোড ষ্টেশন থেকে বেরিয়েই রেলওয়ে কম্পাউণ্ডের মধ্যেই তাদের অফিস। দুরত্ব, দশ পনেরো গজের বেশী নয়।

আজমীর থেকে পাঠানো আমার টেলিগ্রাম তাঁরা যথাসময়েই পেয়েছেন। আমাদের পাহাড়ে ওঠার সমস্ত ব্যবস্থাই করছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা মোটরে মাউণ্ট আবু অভিমুখে রওনা হলুম।

আবু রোড ষ্টেশন থেকে মাউণ্ট আবু পর্য্যন্ত ১৮

মাইল যেতে মোটর ভাড়া লাগে ২৫৲ টাকা। এটা সরকারি বাঁধা রেট্। এর উপর আরও ৫৲ টাকা দিতে হয় আবু পাহাড়ের মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স! অর্থাৎ মোট ৩০৲ টাকা। পাঁচজনের বেশী গাড়ীতে নেয় না। বাসে অল্প খরচে হয়। দশ এগারো টাকাতেই পাঁচ-জনের যাওয়া চলে।

আবু রোড ষ্টেশন থেকে মাউন্ট আবু পর্য্যন্ত ১৮ মাইল পথ যেতে কিন্তু সময় লাগে ঠিক দেড় ঘণ্টা! আমরা বেলা ৫টায় ষ্টার্ট দিয়ে পাহাড়ে উঠতে সুরু করলুম। পাহাড়ের পথ যেমন সচরাচর সর্ব্বত্রই পাহাড়-টিকে ঘিরে প্যাঁচের মতো ঘুরপাক দিতে দিতে ধীরে ধীরে উপরে ওঠে, আবু পাহাড়ের পথও ঠিক সেই রকমই। অনেকটা কাল্‌কা-সিমলা মোটর রোডের মতই আশপাশের দৃশ্য। পাথরে বাঁধা সর্পিল পথটি যেন একান্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে উপরের দিকে উঠেছে। সারা পথটি এমন ঝরঝরে

'জয়বিলাস' প্রাসাদ

পরিষ্কার যে একটি আল্‌পিন্ পড়লেও খুঁজে পাওয়া যাবে। কোথাও একটি শুকনো পাতা পড়ে নেই। রাস্তার অবস্থা দেখে মনে হয় যেন এই নূতন তৈরী হয়েছে। বোঝা গেল এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি যে ট্যাক্স নেন্ সেটা কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের মতো অপব্যয় করেন না। সদা সতর্ক ভাবে এঁরা সে
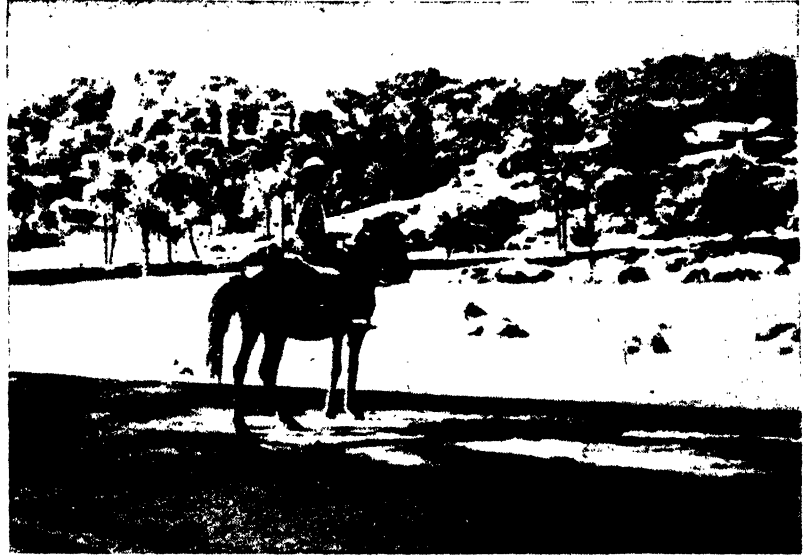
আবু পাহাড়ের উপর 'পোলো গ্রাউণ্ড'

অর্থের সদ্ব্যয় করেন। এখানে গ্রীষ্মের সময় প্রায়ই আশে পাশের সামন্ত রাজ্যের রাজা মহারাজাগণ এবং বড় বড় ব্রিটীশ অফিসাররা কিছুদিন অবসর যাপন করতে আসেন। পোলো গ্রাউণ্ড, গল্‌ফ্ খেলার মাঠ, ক্রিকেট, টেনিস, ইয়ট্ ক্লাব, সিনেমা হল প্রভৃতি য়ুরোপীয় আমোদ প্রমোদের সর্ব্ববিধ ব্যবস্থাই আছে। এখানকার 'রাজপুতানা ক্লাব' ও হোটেল বিখ্যাত। রাজপুতানার শাসন বিভাগের হেড কোয়ার্টার এখানে। ব্রিটীশ রেসিডেন্সী, চীফ কমিশনার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্থায়ী ডেরা আছে। আর আছে ব্রিটীশ সৈনিকদের স্বাস্থ্য-নিবাস। খৃষ্টান মিশনারীদের ইস্কুল কলেজ এবং গীর্জ্জাও একাধিক। রাজরাজড়া ও সাহেব সুবোর নিয়ত গতিবিধির জন্য আবু পাহাড়ের মিউনিসিপ্যালিটিকে তাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে সর্ব্বদা সজাগ থাকতে হয়।

অর্দ্ধ পথে বিশ্রাম নেবার জন্য আমাদের মোটরখানি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ালো। আমরা তখন প্রায় ১২ মাইল পথ অতিক্রম করে তিন হাজার ফুট উপরে উঠে এসেছি। এখানে পাহাড়ের পথটি একটি প্রশস্ত সমতলক্ষেত্রে এসে

পড়েছে। শুনলুম প্রতিদিনই সব গাড়ীই এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম নেয়। আমরা সকলে গাড়ী থেকে নেমে একটু হাত পা ছাড়িয়ে নিলুম। বৃহৎ বটের ছায়ায় ঘেরা এ স্থানটির স্থানীয় নাম 'ছিপাবেড়ী চৌকী'। এখানে আছে একটি মন্দির ও চৌকীদারের ঘর। এখান থেকে আবু পাহাড়ের চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম লাগছিল। বিদায়োন্মুখ সূর্য্যের অস্তরাগে পাহাড় ও উপত্যকা, গিরিবন ও নির্ঝরিণী সব যেন রূপকথার রাজ্যের মতো স্বপ্নময় মনে হচ্ছিল।

নক্কী-হ্রদ। ৮০০০ ফিট উপরে প্রাকৃতিক জলাশয়।

রাজপুতানা ক্লাব

আবু পাহাড়ের শিখরদেশে যখন পৌছলুম ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে ছটা বেজেছে। সূর্য্য অস্তাচলগামী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় চূড়ায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল। কিন্তু পথের মধ্যেই পাহাড়ের গায়ের সমস্ত বৈদ্যুতিক আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠে পর্ব্বত শিখরকে আলোকিত করে তুলেছিল। পূর্ব্ব ব্যবস্থামতো আমরা আবু মোটর সার্ভিসের রিটায়ারিং রুমে গিয়ে উঠলুম।

পাকা দ্বিতল বাড়ী! দার্জ্জিলিঙ্ মুশৌরী বা সিমলা পাহাড়ের মতো কাঠের ও কাঁচের ঘর নয়। এই বাড়ীর ৩টি ভাগ। একতলার একদিকে আবু মোটর সার্ভিসের অফিস এবং অপরদিকে রিফ্রেশ-মেণ্ট রুম ও রেস্তোরাঁ। অফিস অংশের দ্বিতলে আবু মোটর সার্ভিস কোম্পানীর ম্যানেজার সপরিবারে বাস করেন। অপর অংশের দ্বিতলে সারি সারি তিনখানি রিটায়ারিং রুম।

ম্যানেজারটি ভারতীয়, মাথার বৃহৎ পাগড়ী দেখে ওই অঞ্চলেরই লোক বলে মনে হ'ল। অতি ভদ্র। বয়সে প্রবীণ। আমাদের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেন নি।

১নং ও ২নং ঘর খালি রেখেছিলেন। ৩নং ঘরে একটি য়ুরোপীয় দম্পতী ছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁদের একটি বছর সাতের ছেলে। তাঁরা স্বামী স্ত্রী উভয়েই তরুণ এবং স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের যেন মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি! তাঁরা দেখতুম দিবারাত্র ঘুরে বেড়াতেন। ঘরে আসতেন মাঝে মাঝে কেবলমাত্র কাপড় বদলাতে ও শয়ন করতে। ভোজনপর্ব্ব সমাধা করতেন খুব সম্ভব বাইরের কোনো হোটেলে। আমরাও নির্ঝঞ্ঝাটে থাকবো বলে নীচের রেস্তোরাঁয় খাবার ব্যবস্থা করতে গেলুম। কিন্তু ম্যানেজার দুঃখপ্রকাশ করে বললেন—চা, বিস্কুট, ডিম ও টোষ্ট্ ছাড়া আর কিছুই দিতে পারবেন না। 'ফুডকণ্ট্রোল' হওয়ায় তাঁরা ডিনার, লাঞ্চ, ব্রেকফাষ্ট সব তুলে দিয়েছেন। আমরা তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লুম! এই রাত্রে পাহাড়ের উপর খাই কি? রাখে কৃষ্ণ মারে কে? আমাদের বাঁচিয়ে দিলে মাউণ্ট আবুর 'ভিক্টরি হোটেল'। এ হোটেলটি দেশী হোটেল এবং নূতন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের রি টা য়া রিং রুমের ঠিক পিছনেই একটি উঁচু টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত। এঁরা আমাদের মাথা পিছু মাত্র ১৷০ সিকায় থালাবাটি সাজিয়ে পুরি, তরকারি, ডাল, ভাজা, চাটনি, পাঁপর ইত্যাদি সরবরাহ করলেন। আমরা খুশী হ'য়ে রোজ রাত্রে আমাদের ভোজ্য সরবরাহ করবার জন্য তাঁদের স্থায়ী অর্ডার দিয়ে দিলুম। তাঁরাও খুশী হ'য়ে সেলাম বাজিয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু খেতে বসে আমাদের মেজাজ গেল বিগড়ে! ডাল যেন একেবারে সিংহল-রসায়ন—অর্থাৎ লঙ্কার ঝোল! যে তরকারিটাই মুখে দিই, সবই এক রকম আস্বাদ! প্রতি গ্রাসেই বেরিয়ে পড়ে ইণ্টারজেকশন! অর্থাৎ 'উঃ!' নয় 'ওঃ!'

রাত্রের মতো পিত্তি রক্ষা ক'রে আমরা যথেষ্ট গরম পোষাক চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লুম সেই পার্ব্বত্য পুরী পরিক্রমা করে দেওয়ালী উৎসব দেখতে। পথে প্রবাসেই কদিন কেটেছে। মনেই ছিল না যে আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা! সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হ'তে না হ'তে অমানিশার ঘনতমসাকে যেন উপহাস করে প্রতি গৃহে জ্বলে উঠলো অসংখ্য প্রদীপ ও রঙীণ বিজলী বাতি। শুরু হয়ে গেল আতসবাজীর বিচিত্র লীলা!

উৎসব বেশে সুসজ্জিত নরনারী দলে দলে বেরিয়ে পড়েছে পথে দেওয়ালীর আনন্দ উপভোগ করতে। পর্ব্বত শিখরের উপর অবস্থিত এই ছোট শহরটি পত্রপুষ্প পতাকা ও আলোকমালায় মণ্ডিত হয়ে অতি অপরূপ রূপ ধারণ করেছিল। বাজারের প্রত্যেক দোকানটিকে, পথপার্শ্বের প্রত্যেক গৃহটিকে মনে হচ্ছিল যেন কোন স্বপ্ন লোকের এক একটি দীপ্ত রহস্য! দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্ত আমরা শুনেছিলুম ঘরে ঘরে গীতবাদ্য ও নৃত্যের নূপুর ঝঙ্কার!

পালনপুর প্রাসাদ

আমরা আবু মোটর সার্ভিসের সুসজ্জিত রিটায়ারিং রুমে পরম আরামে দশ দিন ছিলুম! এখানে এসে আমরা জানতে পারলুম যে শুধু 'দিলবারা মন্দির' ও 'অচল গড়' নয়, এখানে আরও বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। নখী হ্রদ, রঘুনাথজীর মন্দির, অস্তাচল শিখর, দেবাঙ্গন, অর্ব্বুদদেবীর মন্দির, গোমুখী ও বশিষ্ঠাশ্রম, ব্যাসতীর্থ, নাগতীর্থ, গৌতম আশ্রম, নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দির, বিমলশাহী মন্দির, তেজপাল ও বস্তুপালের মন্দির, ত্রিভর হ্রদ, গুরুশিখর, চন্দ্রাবতী, হৃষিকেশ এবং আরও অন্যান্য অনেক। এ ছাড়া জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, পালনপুর প্রভৃতি সামন্ত রাজাদের পার্ব্বত্য প্রাসাদগুলিও যে দেখবার মতো একথা স্বীকার করতেই হবে।

(ক্রমশঃ)

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

এবারের রেলবাজেটে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী অন্তর্বর্ত্তী সরকারের যানবাহন সদস্য ডাঃ জন মাথাই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে রেলবিভাগের ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে আয়ব্যয়ের সংশোধিত হিসাব এবং ১৯৪৫-৪৬ সালের আয়ব্যয়ের চূড়ান্ত হিসাবও পেশ করা হইয়াছে।

আলোচ্য বাজেট যুদ্ধোত্তর দ্বিতীয় বাজেট। যুদ্ধোত্তর প্রথম বৎসরে যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে বলিয়া এই বৎসরের বাজেটে কোন সুসমঞ্জস নীতির পরিচয় পাওয়া কঠিন। সে হিসাবে দ্বিতীয় বৎসরের অপেক্ষাকৃত শান্ত পরিস্থিতি ভারপ্রাপ্ত সদস্যকে ধীরে সুস্থে চিন্তাভাবনা করিয়া বাজেট রচনায় সাহায্য করিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের রেলবাজেটে রেলবিভাগের বহুবিধ সমস্যা এবং তাহাদের সম্ভাব্য সমাধান লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে এবং এই বাজেটে ভারতসরকারের রেলনীতি উন্নয়ন সম্পর্কে যেসব বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব আছে, তাহাদের ফল সুদূর-প্রসারী। তাছাড়া এবারের বাজেটের আর একটি বৈশিষ্ট্য, ইহা আমলাতান্ত্রিক বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের হাতধরা কোন শ্বেতাঙ্গ সদস্যের বাজেট নয়, পণ্ডিত নেহেরু পরিচালিত অন্তর্বর্ত্তী সরকারের একজন সদস্য ইহা রচনা করিয়াছেন। ডাঃ মাথাইয়ের ন্যায় কৃতী ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা অবান্তর, জাতীয় সরকারের সদস্য ও জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এবারের রেল বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া এই বাজেটের অন্যরূপ মূল্য আছে।

অবশ্য যুদ্ধোত্তরকালে দেশবাসী আশা করে যে, যুদ্ধকালীন অভাব অসুবিধা দূরীভূত হইয়া এইবার তাহারা অপেক্ষাকৃত সুখেস্বচ্ছন্দে দিন কাটাইবার সুযোগ পাইবে; সেদিক হইতে এবারের রেলবাজেটে তাহারা ভাড়ার ব্যাপারে কিছুটা সুবিধাই আশা করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাহাদের সেই আশা পূর্ণ হয় নাই এবং ভাড়া কমা দূরে থাকুক ডাঃ মাথাই এবার রেলভাড়া বাড়াইবারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। রেল-সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এবৎসর কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর পণ্যের উপর ভাড়া বাড়ানো হইবে এবং যাত্রীগাড়ীতে ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে টাকা পিছু এক আনা হিসাবে। ১লা মার্চ্চ হইতেই এই ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব কার্য্যকরী হইয়াছে। সরকারী রেলনীতির সর্ব্বাঙ্গীণ দুর্গতি এবং ভারতসরকারের সাধারণ রাজস্ব-তহবিলের ঘাটতিই এইভাবে ভাড়া বৃদ্ধির কারণ। ভারতসরকারের রেলপথসমূহের ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের মোট আয় হয় ১৮৩ কোটি টাকা, ইহার ভিতর হইতে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বাদ দিয়া রেল বাজেটে ৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত অনুমিত হইয়াছিল। উন্নয়ন তহবিল, ও মজুত তহবিলে প্রয়োজনের নিম্নতম পরিমাণ টাকা জমা রাখিয়া এই ৭ কোটি টাকা হইতে সাধারণ রাজস্ব তহবিলে আর কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ রেলবিভাগ হইতে কিছু টাকা না পেলে ভারতসরকারের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ভীষণভাবে বাড়িয়া যাইবে। এ অবস্থায় সবদিক বজায় রাখিতে ডাঃ মাথাই ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। জনসাধারণের অসুবিধা বিবেচনা করিয়া তিনি অবশ্য বর্ত্তমানে আট আনার নীচে যে ভাড়া তাহা আর বাড়ান হইবে না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আশা করিয়াছেন যে, যাত্রীদের ভাড়াবৃদ্ধির ফলে প্রায় পৌনে পাঁচ কোটি টাকা এবং মালগাড়ীর ভাড়া বাড়িবার জন্য প্রায় পৌনে ছয় কোটি টাকা আয় বাড়িবে এবং এইভাবে রেলবিভাগের ৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় পৌঁছাইবে। এই টাকা হইতে রেলসদস্য ভারতসরকারের সাধারণ রাজস্ব তহবিলে সাড়ে সাত কোটি টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

যুদ্ধোত্তর ভয়াবহ বেকার সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়াইয়া দেশ এখনো যুদ্ধকালীন অভাবঅসুবিধা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিতেছে, এই বিপন্ন দেশবাসীর উপর নূতন রেলভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব কিছুটা প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করিবে সন্দেহ নাই। অবস্থা যতই হীন হউক, প্রয়োজন হইলে রেলভ্রমণ না করিয়া লোকের উপায় নাই। যুদ্ধের মধ্যে বাড়তি খরচের দোহাই দিয়া ভারতসরকার যখন রেলভাড়া বাড়াইয়াছেন, তখন যুদ্ধ শেষ হইবার পর সেই বাড়তি ভাড়া কমাইয়া দেওয়াই সঙ্গত। তাহা না হইয়া এবার যে আবার রেল ভাড়া বাড়িতেছে, ইহাতে জনসাধারণের দুর্গতি সহজেই অনুমেয়। এই-বারের বৃদ্ধি লইয়া যুদ্ধের আগের তুলনায় রেলযাত্রীদের ভাড়া বাড়িল শতকরা ৯৩ ভাগ। যুদ্ধকালীন নরম বাজারেই যে দেশের লোক রেলভাড়া দিবার অসামর্থ্যের দরুণ হাঁটাপথে দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করিত, এখনকার চড়াবাজারে তাহাদের পক্ষে এই বর্দ্ধিত হারে ভাড়া যোগানো অবশ্যই আরও কঠিন হইয়া উঠিল। ভারত-সরকারের সাধারণ তহবিলে কিছু টাকা দিলেই যে নয়, একথা দেশবাসীও স্বীকার করে; দেশের লোক ইহাও বুঝে যে কাঁচড়াপাড়ায় রেল ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানার জন্য ১১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়া রেলসদস্য অন্যায় করেন নাই; রেল ইঞ্জিনের জন্য পরামুখা-পেক্ষিতা আমাদের অবিলম্বে ঘুচানো দরকার। যুদ্ধের সময় খুলিয়া লওয়া রেলপথ পুনরায় বসাইবার জন্য, পুরাতন রেলপথ সংস্কারের ও নূতন রেলপথ বসাইবার জন্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দও অবশ্যই অনুমোদনীয়। তবে দেশবাসীর বক্তব্য

হইতেছে। এইসব অত্যাবশ্যক খরচ ছাড়াও তো বাজেট আরও বহু ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং সেই সব বরাদ্দ হইতে কিছু কিছু কাটিতে পারিলে হয়তো তাহাদিগকে বিপন্ন করিবার প্রয়োজন হইত না। এই প্রসঙ্গে ক্ষয়পূরণ বা মূল্যাপকর্ষ তহবিল, মজুত তহবিল ও রেলবিভাগের সাধারণ ব্যয়বরাদ্দের কথা উঠে। ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের শেষে রেলবিভাগের ক্ষয়পূরণ তহবিল ১০১ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা এবং মজুত তহবিলে ২৬ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা জমা হইবে। আগামী সুদিনের প্রত্যাশায় সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে এবৎসর এই দুই তহবিলে কিছু জমা না দিলে তো ভাড়া বাড়াইবার প্রয়োজন হইত না। কাঁচড়াপাড়ার কারখানায় বাড়ী ঘর তৈয়ারী ইত্যাদি পত্তনী মূলধনজনিত ব্যয় চিরকাল থাকিবে না। রেলনীতি সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত ওয়েজউড কমিটি তাঁহাদের ১৯৩৭ সালের রিপোর্টে অবশ্য রেল বিভাগের মজুত তহবিলের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা রাখিতে বলিয়াছিলেন, তবে এই রিপোর্টের একস্থানে তাঁহারা মূল্যাপকর্ষ তহবিলের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকায় পর্য্যন্ত নামাইবার অনুমতিও দিয়াছিলেন; বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় রেলসদস্য মজুত তহবিলে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের সময় ওয়েজউড কমিটির রিপোর্টের উপর যেভাবে জোর দিয়াছেন, মূল্যাপকর্ষ তহবিল সম্বন্ধে তিনি ঠিক সেই অনুপাতেই নির্ব্বাক থাকিয়া গিয়াছেন। মূল্যাপকর্ষ তহবিলের অঙ্ক না বাড়াইয়া এবারের পরিবর্ত্তনশীল পরিস্থিতির বিবেচনায় রেলভাড়া অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া দিলেই বোধ হয় ভাল হইত। অবশ্য যুদ্ধজনিত রেলপথের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সংস্কার করিতে প্রচুর খরচ হইবে, কিন্তু সব সংস্কার এখনি হইতেছে না। মালের উপর ভাড়া বাড়াইয়া রেলবিভাগ পৌনে ছয় কোটি টাকা আয় বৃদ্ধির আশা করিয়াছেন, এই বৃদ্ধি এত সামান্য হারে হইয়াছে যে, ইহাতে পণ্য মূল্য অপরিবর্ত্তিত থাকিবে বলিয়া তাঁহাদের ধারণা, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একথা নিশ্চিত যে ব্যবসাদাররা গরীব পণ্যভোগীর দেশবাসীদের উপর দিয়া এই পৌনে ছয় কোটি টাকা তুলিয়া লইবেনই, অধিকন্তু মালের রেল ভাড়া বৃদ্ধির অজুহাতে পণ্যমূল্য বাড়াইয়া তাঁহারা আরও কিছু মুনাফা সংগ্রহ করিবেন। রেলবিভাগের সাধারণ ব্যয়ভার কমাইবার দিকে নজর দিলেও এবার ভাড়া বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়তো এতটা হইত না। ১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ, যুদ্ধের শেষ দিকে ভারতীয় রেলপথগুলিতে যখন প্রচণ্ড গতিতে কাজ হইয়াছে, সে বৎসর রেলবিভাগের পরিচালনাখাতে মোট ব্যয় হয় ১৪৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা; ক্ষেত্রে যুদ্ধ থামিয়া যাইবার পর ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে (এ বৎসর উন্নয়ন সংক্রান্ত বড় কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী হয় নাই) ১৫৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবার কারণ কি? এই অযৌক্তিক ব্যয়-বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা রেলভাড়া বাড়াইবার পূর্ব্বে রেলসদস্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে বলিয়া রেলবিভাগের আয় তেমন কিছু কমে নাই। গত বৎসর ১৮ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন রেলসদস্য স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল যখন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দের বাজেট পেশ করেন, তখন তিনিও আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধাবসানের ফলে রেলবিভাগের আয় কমিবে এবং এই বৎসরের জন্য আয় অনুমিত হয় ১৭৭ কোটি টাকা। ডাঃ জন মাথাইয়ের এবারের বাজেট বক্তৃতায় প্রকাশ পাইয়াছে যে, স্যার এডওয়ার্ডের অনুমান ঠিক হয় নাই এবং ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সংশোধিত বাজেটে রেলবিভাগের আয় প্রাথমিক হিসাবের তুলনায় ২৯ কোটি টাকা বাড়িয়া ২০৬ কোটি অনুমিত হইয়াছে। এই আয় বৃদ্ধি নজীর হিসাবে ধরিয়া এবারও আশা করা যায় যে, আয় হ্রাসের আশঙ্কায় চিন্তিত ডাঃ মাথাইয়ের প্রাথমিক অনুমানের তুলনায় ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রেলবিভাগের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং এই বৃদ্ধি সম্ভব হইলে দেশবাসীর উপর ভাড়াবৃদ্ধির জুলুম অবশ্যই নিরর্থক হইয়া যাইবে। ডাঃ জন মাথাই জাতীয় অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য, জনসাধারণ তাঁহাকে নিজেদের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করে; কাজেই তাঁহার বাজেটে দেশবাসীর দুর্গতিবৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা থাকিলে তাহা নিঃসন্দেহে গভীর পরিতাপের বিষয় হইবে। অবশ্য রেলবিভাগের এবারের বাজেট যেভাবে রচিত হইয়াছে তাহাতে নূতন লাইন খোলা, পুরাতন লাইনের সংস্কার প্রভৃতির ফলে ভারতবাসীর কিছু কর্ম্মসংস্থান হইবারও আশা আছে।

বাঙ্গলা সরকারের বাজেট

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙ্গলা সর্ব্বাধিক দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে। যুদ্ধের সম্মুখবর্ত্তী ভূমিভাগ হিসাবে জাপানী-বোমা হইতে শুরু করিয়া চোরাকারবারী জুলুম পর্য্যন্ত নানা দুঃখ দুর্ভোগ তাহাকে সহিতে হইয়াছে, যুদ্ধ থামিয়া যাইবার পর ভারতের অন্যান্য প্রদেশ যখন দ্রুতগতিতে শান্তিকালীন পরিস্থিতির দিকে আগাইয়া যাইতেছে, বাঙ্গলার তখনও যুদ্ধকালীন পণ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি ও চোরাকারবারের অবসান ঘটিতেছে না। যুদ্ধের মধ্যে বাঙ্গলা যখন হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে তখন অনেক ভারতীয় প্রদেশ নিঃসঙ্কোচে যুদ্ধকালীন মুনাফা লুটিয়া গিয়াছে। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বহু লক্ষ লোকক্ষয়কারী মহামন্বন্তরের ধাক্কা সামলাইয়া একটু সুস্থ হইয়া উঠিতে না উঠিতেই বাঙ্গলায় আবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলার এই শোচনীয় দৈন্য দুর্দ্দশার জন্য বাঙ্গলা সরকারের অযোগ্যতা ও দূরদৃষ্টির অভাব কম দায়ী নয়, তবু যে প্রদেশ এইরূপ উপর্য্যুপরি বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়, তাহার আয় ব্যয় বরাদ্দে সমতা রক্ষা করা যে কোন কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষেই কঠিন। প্রকৃতপক্ষে এই সব কারণেই গত ৯ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার বাজেটে অবিরাম ঘাটতি চলিতেছে।

এবারও গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব মিঃ মহম্মদ আলি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের যে বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতেও ঘাটতি অনুমান করা হইয়াছে ৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। অর্থসচিব এই বৎসরের প্রাদেশিক আয় ও ব্যয় অনুমান করিয়াছেন যথাক্রমে ৩৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ও ৪১ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা।

আয় ও ব্যয় উভয়খাতেই ভারত সরকার কর্তৃক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য হিসাবে ১২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ধরিলে এবারের অনুমিত মোট আয় ব্যয় দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা এবং ৫৩ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা। এই উপলক্ষে অর্থসচিব ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আয় ব্যয়ের যে সংশোধিত হিসাব পেশ করিয়াছেন, তাহাতে উন্নয়নখাতে ভারত সরকারের ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা সাহায্য সত্ত্বেও এই বৎসরের সম্ভাব্য ঘাটতি অনুমান করা হইয়াছে ১৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। গত প্রাথমিক বাজেট পেশ করিবার সময় মিঃ মহম্মদ আলি এই বৎসর ঘাটতি ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এই বৎসর জাতিগঠনমূলক নানা খাতে ব্যয় কমাইয়া এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলধনখাতে সাড়ে তিন কোটি টাকা বাঁচাইয়াও বাজেটে এই ঘাটতি হইতেছে। বলা বাহুল্য, যুদ্ধ শেষ হইবার পরও বাঙ্গলার ন্যায় দরিদ্র ও ঋণগ্রস্ত প্রদেশের প্রাথমিক বাজেটের তুলনায় সংশোধিত বাজেটে প্রায় ৪ কোটি টাকা ঘাটতি বৃদ্ধি নিদারুণ অপব্যয় ও চূড়ান্ত আর্থিক দৈন্যের পরিচায়ক। ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দেরও বাজেটে এখনই ৬ কোটি টাকার বেশী ঘাটতি অনুমান করা হইয়াছে, এই ঘাটতির পরিমাণও কার্য্যগতিকে বৃদ্ধি পাওয়া বিচিত্র নয়। যুদ্ধবিরতির পর যখন ব্যয়বাহুল্য হ্রাস ও বর্দ্ধিত প্রাদেশিক আয়ের হিসাবে বাজেটে উদ্বৃত্ত হইবার আশা করা যায়, তখন এইভাবে ঘাটতি বৃদ্ধি অবশ্যই আশঙ্কার কথা। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গলা সরকারের বার্ষিক আয় ছিল মাত্র ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, সে হিসাবে আয় এখন তিনগুণের বেশী হইলেও ব্যয় অসম্ভব বাড়িয়া যাওয়ায় বাজেটে ঘাটতি চলিতেছে এবং বাঙ্গলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচুর সাহায্যলাভ সত্ত্বেও দেনার দায়ে দেউলিয়া হইবার অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারের আয় বৃদ্ধি যে প্রদেশবাসীর উপর বহু নূতন এবং বিচিত্র করভার সংস্থাপন করিয়াই সম্ভব হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলিবে। শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে এই সব বাজেটে প্রকাণ্ড ঘাটতি হইয়া করভার হ্রাস পাইবার সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধের সময়কার বড় বড় খরচ অনেক কমিয়া গিয়াছে, এ সময় সাধারণ ব্যয়ভার না বাড়াইয়া বাঙ্গলা সরকারের অবশ্য উচিত বাজেটে আয় ব্যয় বরাদ্দে সমতা রক্ষার চেষ্টা করা। আমাদের ধারণা, ঠিকভাবে চেষ্টা হইলে কিছুটা সুফল না ফলিয়া পারে না।

আগেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গলা দেশে উপর্য্যুপরি যেভাবে অপ্রত্যাশিত সব ঘটনা ঘটিতেছে এবং সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বাঙ্গলা সরকার যেভাবে কারণ বিশেষে দুহাতে টাকা খরচ করিতেছেন, তাহাতে বাজেটে ঘাটতি হওয়াই স্বাভাবিক। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট হইতে লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উপলক্ষ করিয়া সারা বাঙ্গলায় দাঙ্গা শুরু হয়, এই দাঙ্গার জের এখনো চলিতেছে। দাঙ্গার সময় দোকানপাট বন্ধ থাকায় এবং ব্যবসা বাণিজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া যাওয়ায় বাঙ্গলা সরকারের বিক্রয়কর, আবগারী প্রভৃতি খাতে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। ইহার বিপরীত দিকে দুর্ভিক্ষের জের এখনো চলিতেছে বলিয়া বাঙ্গলা সরকারকে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ৫ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা দুর্ভিক্ষত্রাণ খাতে ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া মনে হইতেছে এবং দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্য হিসাবে প্রায় ২½ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। অবশ্য বিহার হইতে আশ্রয়প্রার্থী মুসলমানদের জন্য বাঙ্গলা সরকারের দাতব্যজনিত বিপুল ব্যয়ভারও এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বাঙ্গলার সমস্যার যখন অবধি নাই এবং অর্থাভাবে সেই সব সমস্যায় হাত দেওয়া যখন বাঙ্গলা সরকারের সাধ্যাতীত, তখন সমস্যাপীড়িত বিহারীদের জন্য বাঙ্গলা সরকারের এই দরদ বাহুল্য বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থসচিব অবস্থার উন্নতি আশা করিয়াছেন। এবারের বাজেটে দুর্ভিক্ষখাতে খরচ ধরা হইয়াছে ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্য খাতে ধরা হইয়াছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। বিস্ময়ের কথা, বাঙ্গলার অসংখ্য অসহায় দাঙ্গাপীড়িত হিন্দু-মুসলমানের পুনর্বসতি সমস্যা থাকিলেও এই সওয়া কোটি টাকা হইতে বিহারের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ৫৪ লক্ষ টাকা সরাইয়া রাখা হইয়াছে। দাঙ্গাপীড়িতদের সাহায্য খাতে অপেক্ষাকৃত কম টাকা ধরিলেও প্রদেশে অধিকসংখ্যক পুলিশের ব্যবস্থা করিতে মিঃ মহম্মদ আলি পুলিসখাতে গত বৎসরের তুলনায় ৭৫ লক্ষ টাকা বেশী ধরিয়াছেন। গত বৎসরও পুলিস বিভাগের উন্নতিকল্পে অর্থসচিব পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় পুলিসখাতে এক কোটি টাকা বাড়তি ব্যয় বরাদ্দ করেন; কার্য্যকালে এই সম্প্রসারিত পুলিস বিভাগ কিন্তু এই ব্যয় বৃদ্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। ব্যয় বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিস বিভাগকে শান্তি রক্ষায় অপেক্ষাকৃত যোগ্যতার পরিচয় দিতে বাধ্য করাও বাঙ্গলা সরকারের অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। দুঃখের কথা, বাঙ্গলা সরকারের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যার এই বৃহত্তর দিকটিতে কিছুতেই পৌঁছাইতেছে না।

বাঙ্গলা সরকারের এবারের বাজেটেও সত্যকার জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনাসমূহের প্রতি আশানুরূপ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির জন্য ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় বাড়তি ১৯ লক্ষ টাকা, প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার জন্য ১০ লক্ষ টাকা, জমিদারী প্রথা অবসানের প্রাথমিক ব্যবস্থার জন্য ৮২ লক্ষ টাকা, কাঁচরাপাড়ায় নূতন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য মার্কিন সামরিক বিভাগের পরিত্যক্ত ১৪ হাজার একর জমি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ৫০ লক্ষ টাকা, বস্তিবাসীদের উন্নতিকল্পে ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ লক্ষ টাকার স্থলে ৩৫ লক্ষ টাকা, বেসরকারী ছোট ছোট কলেজে অত্যাবশ্যক সরঞ্জামাদি সাহায্যের জন্য ৪ লক্ষ টাকা, বাঙ্গলায় লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য এবং লবণ উন্নয়ন বিভাগ প্রতিষ্ঠা কল্পে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, মৎস্য সংক্রান্ত একটি গবেষণাগারের জন্য ১ লক্ষ টাকা, প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছোট পরিকল্পনায় কিছু কিছু ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে; তবে মোটের উপর এই বাজেটে কৃষি-শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পূর্ত্ত প্রভৃতি বিভাগের নানাদিকের অত্যাবশ্যক উন্নতিবিধান সম্পর্কে আশানুরূপ মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দেতো এসব খাতে প্রাথমিক বাজেটের বরাদ্দ হইতে খরচই কমানো হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে,

১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রাথমিক বরাদ্দের হিসাবে বাঙ্গলা সরকার শেষ পর্য্যন্ত কৃষি গবেষণাখাতে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা, ইক্ষুগবেষণা খাতে ১ লক্ষ টাকার বেশী, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনখাতে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা, কুইনাইন উৎপাদনখাতে ৩ লক্ষ টাকা ও শ্রীরামপুর টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট, শিবপুর ইনজিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও হাঁসপাতালাদির উন্নতিখাতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ কমাইয়া দিয়াছেন। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ সংক্রান্ত মূলধনখাতে তাঁহারা এবৎসর বাঁচাইয়াছেন ৮৪ লক্ষ টাকা। বলা নিষ্প্রয়োজন এই সব জনকল্যাণমূলকখাতে ব্যয়সঙ্কোচ শাসনকর্তৃপক্ষের কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের আগ্রহ অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এবারের বাজেটে মুসলিম শিক্ষার আড়ম্বরের হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেছেন তাহা সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটেও বাঙ্গলা সরকার মোটেই সাড়া দেন নাই। মুসলিম স্বার্থরক্ষার নামে এবারের বাজেটে যে সব বাড়তি ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বরাদ্দগুলি সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য ; (১) মুসলিম শিক্ষা তহবিল—১০ লক্ষ টাকা ; (২) ইসলামিয়া কলেজের জন্য কলিকাতার প্রান্তভাগে জমি সংগ্রহার্থ ৪ লক্ষ টাকা (৩) কলিকাতায় মুসলিম ছাত্রদের হোষ্টেলের জন্য ২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ; (৪) পুরাতন মাদ্রাসাগুলিকে সাহায্যের জন্য ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ; (৫) ইসলামিয়া হাঁসপাতালের উন্নতিকল্পে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। এবারের বাজেটে ঢাকায় একটিনূতন ইনজিনিয়ারিং কলেজ খুলিবার জন্য বাড়ী ও ব্যবস্থাসমেত ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং ঢাকার আশাসুল্লা ইনজিনিয়ারিং স্কুল প্রসারের জন্য সর্ব্বসমেত ১২ লক্ষ ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে ; বলা বাহুল্য এই বাড়তি ব্যয়ের সুবিধাও প্রধানতঃ মুসলমান ছাত্ররাই লাভ করিবে। ১৯৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রাথমিক বাজেটে ধরা হয় নাই, এই বৎসর বাঙ্গলা সরকার মুসলিম শিক্ষা প্রসারের নামে এমন অনেক খরচও করিয়াছেন।

বাঙ্গলা সরকারের ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেটে একমাত্র আশ্বাসের কথা এই যে, এবার মৃতপ্রায় প্রদেশবাসীর উপর নূতন কোন করভার চাপানো হয় নাই। বাঙ্গলা সরকার যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার জন্য গত বৎসর প্রাথমিক হিসাবে যে ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ বরাদ্দ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত খরচ করিতেছেন মাত্র ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। এই বৎসরের মত ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দেও বাঙ্গলা সরকার উন্নয়ন খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত ১২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকাই খরচ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এদিক হইতে বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ লক্ষ্য করিলে মনে হয় বাঙ্গলার আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যেন বাঙ্গলা সরকারের নিজের কোন গরজ নাই। এই মনোভাব প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ হিসাবে বাঙ্গলা সরকারের দায়িত্বহীনতারই পরিচায়ক। মুখে কিন্তু এই পুনর্গঠন সমস্যার উপর অর্থসচিব তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। * ২৭।২।৪৭

* Never before in the history of the Province has there been such a unique opportunity as has now presented itself for the economic uplift of our people by the planned development of our agricultural and industrial resources."

গণ-পরিষদ

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের যোগদান সম্পর্কে, নরেন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক গঠিত দেশীয় রাজ্য আলোচনা কমিটি ও বৃটিশ ভারতের আলোচনা কমিটির মধ্যে, আলোচনার দিন স্থির হয় ৮ই ফেব্রুয়ারী ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের আলোচনা কমিটি ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে দেশীয় রাজ্য প্রজামণ্ডলের সভাপতি ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার সভাপতিত্বে মিলিত হইলেন। পণ্ডিত নেহরুও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণের এই কমিটি, গণ-পরিষদের আলোচনা কমিটির নিকটে দাখিল করিবার জন্য এক স্মারকলিপি প্রস্তুত করেন। উহাতে, গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের যে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে, রাজন্যবর্গের তাহা নির্বাচনের ক্ষমতা অস্বীকার করা হয়। তাঁহাদের মতে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণই কেবল প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন।

রাজন্যবর্গ সার্বভৌম ক্ষমতা লোপের আশঙ্কায় আজ শঙ্কিত, একদিন যে ক্ষমতা তাঁহারা প্রভুশক্তির নিকটে অর্পণ করিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতে তাহাই আবার ফিরিয়া পাইতে চাহেন। বৃটিশ প্রভুর অবর্তমানে দেশের প্রজাআন্দোলনকে নির্মমভাবে দাবাইয়া রাখার দিন তাঁহাদের ফুরাইয়া যাইবে। তখন আর পূর্ব মহিমায় থাকিয়া স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হইবে না। তখন তাঁহাদের এই মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা টিকিতে পারিবে না। দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণরের ন্যায় তাঁহাদিগকে অবস্থান করিতেই হইবে। দেশীয় রাজ্যগুলি স্বাধীন সার্বভৌম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এক একটি অংশে পরিণত হইবে।

নির্দিষ্ট দিনে নরেন্দ্রমণ্ডল কর্তৃক গঠিত দেশীয় রাজ্য আলোচনা কমিটিও বৃটিশ ভারতের আলোচনা কমিটির যুক্ত বৈঠক হয়। দুই দিন

অধিবেশনের পর দেশীয় রাজ্য আলোচনা কমিটির পক্ষ হইতে নরেন্দ্র মণ্ডলের চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব এবং বৃটিশ ভারতের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সংক্ষিপ্ত আকারে এক যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করেন। উক্ত অধিবেশনে বৃটিশ মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মের বিবৃতি, গণ-পরিষদের গৃহীত প্রস্তাবাবলী, এবং নরেন্দ্র মণ্ডলের গৃহীত প্রস্তাব—সকল বিষয়ই বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। বিবৃতিতে জানান যে, এই আলোচনা সন্তোষজনক ও বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট যে ৯৩টি আসন রহিয়াছে তাহা কিভাবে বণ্টন করা হইবে, উভয় কমিটির পরবর্তী অধিবেশনে তাহা স্থির করা হইবে।

এই বিবৃতিকে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার আয়োজনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ ভারতবর্ষে ছোটবড় প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্য শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় থাকিয়া মধ্যযুগীয় শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেশ শাসনের সুযোগ পাইয়াছে। নৃপতিবর্গের প্রতি কাজেই গতানুগতিক কূপমণ্ডুকতা চলিয়া আসিতেছে। উদার দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রগতির লক্ষণ সেখানে বিরল। কংগ্রেসের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা আলোর সন্ধান পাইতে সক্ষম হইবেন। গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের যোগদানের ফলে সার্বভৌম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পথ প্রস্তুত হইবে।

যে সময়ে নরেন্দ্র মণ্ডলের আলোচনা কমিটি গণ-পরিষদের আলোচনা কমিটির সহিত কথাবার্তা চালাইতেছিলেন, সেই সময়ে বরোদা রাজ্যের পক্ষ হইতে বরোদার দেওয়ান স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র গণ-পরিষদের আলোচনা কমিটির সহিত পৃথক ভাবে আলোচনা চালান। নরেন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক গঠিত আলোচনা কমিটিতে যোগদানের জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উক্ত আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। কারণ বরোদার মহারাজা নরেন্দ্র মণ্ডলকে দেশীয় রাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন না। ৫৮৪টি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে নরেন্দ্র মণ্ডল মাত্র ২৩৬টি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন। হায়দরাবাদ, মহীশূর, কাশ্মীর, ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর, বরোদা প্রভৃতি নরেন্দ্র মণ্ডলের সদস্য নহে। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতি ১০ লক্ষে ১ জন হিসাবে বরোদা ৩ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন। বরোদার দেওয়ান স্যার ব্রজেন্দ্র লাল মিত্র গণ-পরিষদের আলোচনা কমিটির সহিত কথাবার্তা শেষ করিলে গণ-পরিষদের সেক্রেটারী যে ইস্তাহার প্রকাশ করেন, তাহাতে বলা হয় যে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন হইবে। বরোদা রাজ্যের আইন সভায় নির্বাচিত ও বে-সরকারী মনোনীত সদস্যরাই কেবল ভোট দিবেন। সরকারী মনোনীত সদস্যগণ ভোট দিবেন না।

এই বিবৃতি হইতে দেখা যায় যে বরোদা জনসাধারণের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতেই প্রতিনিধি প্রেরণের উদ্যোগী হইয়াছেন। বরোদা গণ-পরিষদের কাজে পূর্ণ-সহযোগিতা করিবার জন্য প্রথম হইতেই কংগ্রেসকে আশ্বাস দিয়া আসিতেছেন। নরেন্দ্র মণ্ডল যখন কংগ্রেসের নিকট হইতে কতকগুলি সর্ত আদায়ে সচেষ্ট, ঠিক সেই সময়ে বরোদার মহারাজা দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথমেই এই মনোভাব প্রদর্শন করিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেন।

দেশীয় রাজ্যগুলি গণ-পরিষদে যোগদানে উদ্যোগী হইল বটে, কিন্তু লীগ করাচী প্রস্তাবে গণ-পরিষদ বর্জন করায় রাজনৈতিক আবহাওয়া আরও জটিল হইয়া পড়িল। কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বড়লাটকে এক পত্রে জানাইলেন যে, লীগ গণ-পরিষদ বর্জন করিয়াছে, অতএব অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টেও তাহার আর থাকিবার অধিকার নাই। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টও ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হউক। বড়লাট যথাসময়ে সমস্ত বিষয় বৃটিশ মন্ত্রিসভাকে জানাইলেন। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী কমন্স সভায় ভারত সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নীতি ঘোষণা করেন। ঐদিন সারা ভারতেও বেতার-যোগে প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি বিঘোষিত হয়। মিঃ এটলীর বিবৃতির আসল কথাগুলি হইল—(১) আগামী ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চূড়ান্তভাবে ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন। (২) ভারতের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি ঐ সময়ে যাহাতে পূর্ণভাবে দেশ শাসনের উপযোগী হইতে পারেন তজ্জন্য এখন হইতেই তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হইবে। অর্থাৎ এখন হইতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগ আরম্ভ হইবে। ইহার জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন হয়ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করা যাইবে না, আবশ্যক হইলে যথারীতি আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হইবে। (৩) উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি সমগ্র বৃটিশ-ভারত একমত হইয়া ক্ষমতা গ্রহণে ইচ্ছুক না হয় তাহা হইলে কাহার নিকট বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন তাহা চিন্তা করিবেন। তখন এই ক্ষমতা বৃটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে, অথবা কোন কোন অঞ্চলের প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হস্তে অথবা ভারতের স্বার্থ ও ন্যায়পরায়ণতার দিক হইতে কাহার হস্তে ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে তাহা বিবেচনা করা হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতির মধ্যে দেখা যায় যে তিনি লীগের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, অপরদিকে কংগ্রেসের দাবীকেও কৌশলে এড়াইয়া গিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী লীগকে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট হইতে অপসারণ না করিয়া, বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে সরাইয়া তাঁহার স্থলে লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনকে নিয়োগ করেন। মনে হয় অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্টে লীগের অসঙ্গত দাবীকে প্রশ্রয় দিতেছিলেন বলিয়াই লর্ড ওয়াভেলকে সারাইয়া দেওয়া হয় এবং লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের হাতে আরও অধিকতর ক্ষমতা অর্পণ করিয়া তাঁহাকে নিয়োগ করা হয়। বিবৃতিতে স্বীকার করা হইল যে গণ-পরিষদের কাজ (লীগ যোগদান না করিলেও) এবং

অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকিবে, বরং অন্তর্বর্তী সরকারকে আরও ক্ষমতাশালী করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই বিবৃতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল, ক্ষমতা হস্তান্তরের নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা। কংগ্রেস এতদিন ইহাই চাহিয়া আসিতেছিলেন। কারণ দেশে তৃতীয় পক্ষের অবস্থান যতদিন থাকিবে, ততদিন কংগ্রেস-লীগ মিলনের সম্ভাবনা খুব কমই রহিয়াছে। এই তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনা ও সহায়তাতেই লীগ কংগ্রেস হইতে এতদিন দূরে দূরেই রহিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতেছে। বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিলে কংগ্রেস ও লীগ পরস্পরকে বুঝিবার সুযোগ পাইবে এবং ইহাদের মিলনও সম্ভবপর হইবে। পণ্ডিত নেহরুও তাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই ঘোষণার প্রশংসা করিয়া ইহাকে "সদ্বিবেচনাপ্রসূত ও সাহসিকতাপূর্ণ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন,—এখন আমাদের দ্রুতগতিতে গণ-পরিষদের কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। লীগকে অহেতুক ভয় ও সংশয় দূর করিয়া গণ-পরিষদে যোগদানের জন্যও তিনি আহ্বান জানান। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন ঘোষণায় ভারতের বিভিন্ন দলের উপরে যে দায়িত্ব পড়ে তাহার উল্লেখ করিয়া মহাত্মা গান্ধীও বলেন—মিঃ এট্‌লির এই ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করা হইবে—না উহা ব্যর্থ করা হইবে, তাহাই এখন বিভিন্ন দলকে স্থির করিতে হইবে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এই ঘোষণায় সত্যই তাঁহারা ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন, না আবার কোন অছিলা করিয়া অন্যপথ অবলম্বন করিবেন, কেহ কেহ এরূপ সন্দেহও করিতেছেন। কারণ বৃটিশের প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে ভারতবাসীর এত বেশী তিক্ত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে যে উহাতে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। তবে একথাও সত্য যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ দায়ে পড়িয়াই আজ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের দয়া বা মহানুভবতার লেশ মাত্র নাই। ভারতের জাগ্রত শক্তির নিকটে দাঁড়াইতে না পারিয়া, নিজের ভবিষ্যৎ স্বার্থের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এই ক্ষমতা অর্পণ করিতে আয়োজন করিতেছেন। কারণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছেন যে বিদ্রোহ ও অশান্তির মধ্যে ভারতবর্ষকে হারান অপেক্ষা, স্বাধীন ভারতবর্ষকে বন্ধুরূপে পাইলে তাঁহাদের যথেষ্ট লাভেরই সম্ভাবনা রহিয়াছে। ২৫।২।৪৭

পরলোকে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের অকস্মাৎ পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদ বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বেদনাহত করিয়াছে। পুরাতন শিলালেখ, তাম্রশাসন, মুদ্রা ও মূর্ত্তিতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত-রূপে তিনি সারাভারতের সুধী সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। সত্যনিষ্ঠ নির্ভীক ঐতিহাসিক বলিয়া তাঁহার প্রচুর প্রসিদ্ধি ছিল। অকপট বন্ধুবৎসল সাহিত্যরসিক সদালাপী সামাজিক মানুষরূপে তিনি পরিচিত গণের নিকট অকৃত্রিম সমাদরলাভ করিয়াছিলেন। মর্য্যাদাবোধ, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও পরোপকার প্রবৃত্তি তাঁহাকে মানবতার মহনীয় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াও তিনি অবসাদগ্রস্ত হন নাই, কোন বাধাবিপত্তিই তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ভট্টশালী একশত টাকা মাহিনায় ঢাকা যাদুঘরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই কাজই করিয়া গিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত বেতন উঠিয়াছিল আড়াই শত টাকায়! বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা অন্যত্র তিনি উচ্চ বেতনের প্রলোভনে যাদুঘরের কার্য্যভার ত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিনও ভট্টশালী মহাশয় সুস্থ ছিলেন। রাত্রে সুনিদ্রা হইয়াছিল, বেশ ভালভাবেই ঘুমাইয়াছিলেন। ২৩ মাঘ (১৩৫৩) ৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) প্রভাতে উঠিয়া অপরাপর দিনের মত প্রাতঃকৃত্য সারিয়াছেন। কিন্তু শৌচাগার হইতে আসিয়াই বড় মেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"দুলি, আমার বুক কেমন করছে। আমি তো চললাম, তোর মায়ের সাথে দেখা হলো না।" পথের উপরেই বসিয়া পড়িলেন। নিমেষের মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল।

প্রাচীন অভিজাত বংশে কিন্তু দরিদ্রের গৃহে ভট্টশালীর জন্ম। পিতা রোহিনীকান্ত পনের টাকা মাহিনার পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। এই বেতন হইতে মাসে মাসে কিছু কিছু পাঠাইয়া তিনি কনিষ্ঠ সহোদর অক্ষয়-চন্দ্রকে সাহায্য করিতেন। অক্ষয়চন্দ্র ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ইং সনের ২৪ জানুয়ারী ১২৯৪ সালের ১১ই মাঘ মামার বাড়ী নয়নন্দ গ্রামে নলিনীকান্ত ভূমিষ্ঠ হন। চারিবৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। মাতা মায়াকামিনী শিশুপুত্র সহ অক্ষয়চন্দ্রের আশ্রয় লন। অক্ষয়চন্দ্রের সাহায্যে ভট্টশালী সোনারগাঁ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে এনট্রান্স পাশ করিয়া বিদ্যালয় হইতে পাঁচ টাকা বৃত্তি ও রৌপ্যপদকলাভ করেন। সে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। পিতৃব্যের ব্যয় লাঘবের জন্য ভট্টশালী ছাত্র পড়াইয়া এবং গল্প প্রবন্ধ লিখিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার পাঠে মনোযোগ ও সাহিত্যে অনুরাগ দেখিয়া ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল এক সি টাটার কিছুদিন তাঁহাকে ২০৲ কুড়ি টাকা হিসাবে সাহায্য

করিয়াছিলেন। অধ্যাপক রেমসবোথামও তাহাকে কয়েক মাস সাহায্য করেন। পরে তিনি একজন ইংরাজকে বাংলা পড়াইবার কার্য্য পাইয়াছিলেন। এইভাবে দুঃখে কষ্টে আপন অধ্যবসায়ে ভট্টশালী ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় বিভাগে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ পুরস্কার পাইয়াছিলেন। কয়েকবার প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির পরীক্ষক হইয়াছিলেন। ঢাকা কলেজ কর্তৃপক্ষ ডক্টর উপাধিদানের প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার সময় ভট্টশালীর অকৃত্রিম বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক দর্শনাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভট্টশালীর পুরানো দিনের লেখা হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্ত্তিতত্ত্ব ও বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতানগণের মুদ্রা বিষয়ক প্রবন্ধ দুইটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেন। তন্মধ্যে মূর্ত্তিতত্ত্ব (Iconography) প্রবন্ধই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। ডব্লিউ টমাস, মসিয়ে ফুমে, লুইফিনো এবং রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহানী—এই চারিজন পণ্ডিত পরীক্ষক নিযুক্ত হন। রচনা উচ্চপ্রশংসিত হয়, ভট্টশালী পি-এচডি উপাধি প্রাপ্ত হন। (১৯৩৪ খ্রীঃ)

৺নলিনীকান্ত ভট্টশালী

সতের বৎসর বয়সেই ভট্টশালী লেখকরূপে পরিচিত হন। ১৩১৫ সালের মাঘ মাসের প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত তাঁহার কবিতা "কেদার রায়" শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইংরাজী ১৯০৫ হইতে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া বাংলার বিবিধ মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রে তাঁহার বহু কবিতা, গল্প, সমালোচনা ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজা দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের পরিচয় নির্দ্ধারণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাঁহার যুগান্তকারী আবিষ্কার। ভোজবর্ম্মদেবের বেলাবলিপির পাঠোদ্ধার করিবার সময়েই ঢাকায় যাদুঘর প্রতিষ্ঠার সংকল্প তাঁহার মনে স্থান পায়। ঢাকা যাদুঘর তাঁহারই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো পুঁথি সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করেন। ঢাকা রিভিউ পত্রে প্রকাশিত ভট্টশালীর নিঃসঙ্গ ও অপর পত্রে প্রকাশিত পূর্ব্বরাগ গল্প ওয়েগনার সাহেবের জার্ম্মাণ সংকলনে স্থান পাইয়াছে। ১৯১৪ সালে তাঁহার কয়েকটা গল্প "হাসি ও অশ্রু" নামক একটা সংকলনে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। বীরবিক্রম নাম দিয়া তিনি (ডায়মণ্ড ও জুবিলী থিয়েটারে অভিনীত) একটা নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ময়নামতীর গান, মীন চেতন, কাস্তনামা প্রভৃতি পুস্তক সম্পাদনে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁহার রচিত বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা প্রায় চল্লিশখানি হইবে। তাঁহার সম্পাদিত কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ড একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ।

ভট্টশালীর সাহিত্য রসিকতার একটা উদাহরণ দিতেছি। শরৎচন্দ্রের বড়দিদি ১৩১৪ সালে ভারতীতে প্রকাশিত হয়। ১৩১৮ সালে ভারত-মহিলায় বড়দিদির সমালোচনা প্রসঙ্গে ভট্টশালী লিখিলেন—"বড়দিদির লেখক এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কে? ইনি যদি ছদ্ম নামে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ না হন, তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে বঙ্গ সাহিত্য গগনে একজন প্রথম শ্রেণীর জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ১৩১৪ সনে বড়দিদি লিখিয়া তিনি যে এই চারি বৎসর যাবৎ চুপ করিয়া আছেন, ইহাতে তাঁহার ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইবার উপযুক্ত অপরাধ হইতেছে"। বলা বাহুল্য একজন অখ্যাতনামা লেখকের গল্প পড়িয়া এই যে রসাস্বাদন, ইহাই তাঁহার রসগ্রাহিতার উজ্জ্বল উদাহরণ। সে সময় শরৎচন্দ্রকে অন্তরঙ্গ দুই একজন ভিন্ন অপরে চিনিত না।

তুমি চলে গেছ আজ—

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ

তুমি চলে গেছ আজ—বিষণ্ণ এ আঁধার রজনী,
প্রাণের প্রাচুর্য্য নাই বেদনায় হিয়া ভরপুর ;—
স্তিমিত প্রদীপ শিখা আনিয়াছে হিম শীতলতা,
এ চঞ্চল হতাশায় পৃথিবী যে ব্যথিত বিধুর।
সুদূর নক্ষত্রলোকে জাগিয়াছে করুণ ক্রন্দন—
গভীর মেঘের বুকে বিদ্যুতের—বেদনা জাগায়,
অনন্ত আকাশ আর পৃথিবীতে প্রচণ্ড প্রলয় ;
নিঃশেষিত ক্ষুব্ধ মন দিক্‌ভ্রষ্ট উন্মাদের প্রায়।
অসমাপ্ত অসহায় ছন্দহারা কবিতা আমার—
পথভ্রষ্ট পথচারী, কল্পনার নাহি কল্পলোক,
মোদের মিলন গেহে ঘনায়েছে আষাঢ়ের মেঘ ;
মহাশূন্যে হাহাকার, পৃথিবীতে জাগিয়াছে শোক।
তোমার বিদায় সন্ধ্যা, আনিয়াছে বিষণ্ণ আঁধার,
তুমি নাই, মিথ্যা সব,—নিঃশেষিত কবিতা আমার।
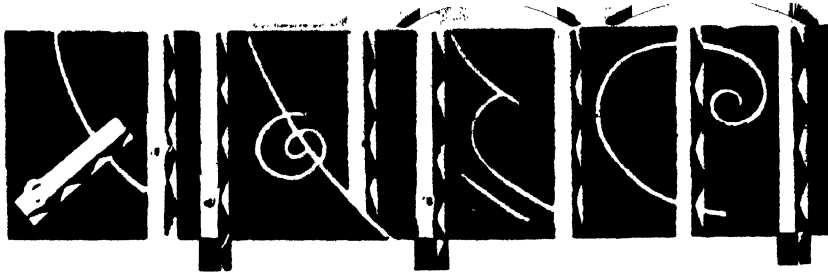
বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন—

বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিসভার আমলে লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" বাঙ্গালী হিন্দুরা ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহারই ফলে আজ তাঁহারা বাঙ্গালার হিন্দু প্রধান অঞ্চলে আলাদা একটি প্রদেশ গঠনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুর আর বাঁচিবার পথ নাই। লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে একদিন যাঁহারা প্রাণপণে বাধা দিয়াছিলেন তাঁহারা এখন বঙ্গবিভাগে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বেও এই কথা কল্পনা করা পাগলামীরই নামান্তর ছিল। কিন্তু আজ বাঙ্গালায় লীগ রাজনীতি এমনি এক কুটিল পথে গিয়া পাক খাইতেছে যে তাহার ফলে বাঙ্গালী হিন্দুর মনোভাব পরিবর্ত্তন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ভুয়ো সংখ্যাধিক্যের জোরে আইন পরিষদে হিন্দুকে আজ কোনঠাসা করিয়া রাখিয়াছে। ভোটের জোরে অপর সম্প্রদায় একের পর এক করিয়া আইন পাশ করাইয়া লইতেছে। হিন্দু সংখ্যালঘু, চেঁচাইয়া কোন ফল ফলিতেছে না। বাহির হইতে লাখে লাখে স্বসম্প্রদায়ের লোক আনাইয়া মন্ত্রিসভা বাঙ্গালাকে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের পাকা ঘাঁটিতে পরিণত করিতেছে। যে রাজস্বের অধিকাংশ হিন্দুর দেওয়া, তাহার দ্বারাই বহিরাগতদের উদর পূরণের ব্যবস্থা হইতেছে। অথচ পূর্ব্ববাঙ্গালার রাজা দুর্গতরা ইহাদের তুলনায় অতি সামান্যই সরকারী ভিক্ষা পাইতেছে। হিন্দুর দান ও সাধনায় পুষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রাসের চেষ্টা চলিতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে অহেতুক কোটি টাকা ব্যয় করিয়া মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আয়োজন চলিতেছে। শাসনতান্ত্রিক সকল ব্যাপারেই হিন্দুর বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র সুরু হইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে এই "ব্রুট" মেজরিটির হাত হইতে বাঙ্গালার হিন্দুর বাঁচিবার একমাত্র পথ হইল, স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হওয়া। বাঙ্গলার বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগ এবং হিন্দু প্রধান জলপাইগুলি ও দার্জ্জিলিং জেলা লইয়া এই হিন্দু প্রদেশ গঠিত হইতে পারে। এই প্রদেশে মুসলমানপ্রধান নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে যেমন ধরা হইয়াছে, অপরদিকে পূর্ব্ববাঙ্গালা প্রদেশেও তেমনি হিন্দু প্রধান পার্ব্বত্য চট্টগ্রামকে ধরা হইয়াছে। বাঙ্গালার জন সংখ্যার শতকরা ৪৫ জন হিন্দু; অতএব তাঁহারা বাঙ্গালা প্রদেশের মোট আয়তনের শতকরা ৪৫ ভাগ দাবী করিতে পারেন। বাঙ্গালার মোট আয়তন ৭৭,৪৪২ বর্গমাইলের মধ্যে আমাদের পরিকল্পিত পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশে ৩৪,৮৪৯ বর্গমাইল পড়ে। ইহা শতকরা ৪৫ ভাগের কিছু কম। এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আয়তন ১৪,২৬৩ বর্গমাইল, উড়িষ্যার আয়তন ৩২,১৯৮ বর্গমাইল, এবং সিন্ধুর আয়তন ৪৮,১৬৩ বর্গমাইল।

এই বিভক্ত বাঙ্গালায় জনসংখ্যার হার হইবে নিম্নরূপ—

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে	হিন্দু	১,৭১,৬৮,৬৯৯
	মুসলমান	৬৪,০১,৪৪৯
পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশ	হিন্দু	১,০১,৩২,১৯২
	মুসলমান	২,৫৬,০৩৯৭৫

দুই অংশেই সংখ্যালঘুর শতকরা হার প্রায় সমান সমান দাঁড়াইবে। ইহার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এক প্রদেশে সংখ্যালঘুর উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে সাহসী হইবে না। সুতরাং উভয় প্রদেশেই শান্তি বিরাজ করিবে। বাঙ্গালী হিন্দুকে আজ প্রাণপণে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনে অগ্রণী হইতেই হইবে। নচেৎ তাহার জাতীয় জীবনে যে কাল যবনিকা ঘনাইয়া আসিতেছে, পরে তাহা রোধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

ভারত সরকারের বাজেট—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ সচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ তাঁহার

গভর্ণমেন্টের ১৯৪৭-৪৮ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থিত করিয়াছেন—

আয়—২৭৯ কোটি ৪২ লক্ষ

ব্যয়—৩২৭ কোটি ৮৮ লক্ষ

ঘাটতি—৪৮ কোটি ৪৬ লক্ষ

ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যে অর্থ-নৈতিক চুক্তি হইয়াছিল, তাহা ১৯৪৭ সালের ৩১শে মার্চ্চ শেষ হইবে—সে জন্য ভারত রক্ষার ব্যয়ভার প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষের উপর পড়িবে। তাহাতে দেশরক্ষা খাতে আগামী বৎসরে ব্যয় হইবে ১৮৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। বেসামরিক খাতে ব্যয়ের জন্য ১৩৯ কোটি ৭ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। লবণ কর তুলিয়া দিলে ৮ কোটি টাকা আয় কমিয়া যাইবে—ফলে ঘাটতির পরিমাণ বাড়িয়া ৫৬ কোটি

বেলগেছিয়া ভিলায় কর্ণেল ধীলন আজাদ-হিন্দ বীরদের জনসাধারণের কাছে পরিচয় করাইয়া দিতেছেন···শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফটো—শ্রীপান্না সেন

৭১ লক্ষ টাকা হইবে। বেতন কমিশনের সুপারিশ অনু-সারে যে ব্যয় বাড়িবে, তাহা এ হিসাবে ধরা হয় নাই। আড়াই হাজার টাকার কম আয়ের উপর আয়কর ধরা হইবে না। পূর্ব্বে দুই হাজার টাকার অধিক বার্ষিক আয়ের উপর আয়কর ধার্য্য করা হইত। ১ লক্ষ টাকার অধিক বার্ষিক আয়ের উপর শতকরা ২৫ টাকা কর ধার্য্য করা হইবে। নূতন কর ধার্য্যের ফলে আয় ৩৯ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা বাড়িলে ঘাটতি হইবে ১৬ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা।

ভারত সরকারের ব্যয় হ্রাস ও বাজে খরচ বন্ধ করার বিষয় বিবেচনার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের লইয়া একটি কমিটী গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিণত করিয়া শেয়ার, পণ্যদ্রব্য, সোনার বাজার প্রভৃতিতে ফাট্‌কা নিয়ন্ত্রণের জন্যও প্রস্তাব করা হইয়াছে। যাহাদের ধনভাণ্ডার অসম্ভব রকমে স্ফীত হইয়াছে, তাহাদের এই ধনস্ফীতি সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব করা হইয়াছে। পুন-র্বসতি ও উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগামী বৎসরে ১৩ কোটি টাকা ও আমদানী করা খাদ্য শস্যের জন্য সাহায্য বাবদ ১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সংঘ—

বিগত ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত বেজওয়াড়া নগরে অখিল ভারতবর্ষীয় বর্ণা-শ্রম স্বরাজ্য-সংঘের ষোড়শ অধিবেশন হইয়াছিল। বারাণসীর পণ্ডিত শ্রীদেব নায়কাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। বঙ্গদেশ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র, তামিল, উড়িষ্যা ও নিজাম রাজ্য হইতে অনেক প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রতিনিধি ও দর্শকদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রাধান্য ছিল। এই সংঘের উদ্দেশ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং তাহার সহিত বর্ণাশ্রম ধনরক্ষা করা। পৃথিবীতে অপর সকল প্রাচীন সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়াছে। কেবল বর্ণাশ্রমমূলক বৈদিক সভ্যতা এখনও জীবিত। ধর্ম্মহীন ভোগমূলক পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যর্থতা চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। ভারত এখন স্বাধীনতার দ্বারদেশে। সে স্বাধীনতা কি পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণমাত্র হইবে? না ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিদের তপোলব্ধ জ্ঞান স্বাধীন ভারতে মূর্ত্তিমান হইবে। অখণ্ড ভারত, পাকিস্থান বিরোধ, সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার, ধর্মভাব বিস্তার প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আগামী অধিবেশনের জন্য মহারাষ্ট্র-দেশের অন্তর্গত শোলাপুর হইতে আহ্বান আসিয়াছে। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সংঘের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুত পূর্ণেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—

রিপন ল কলেজ ও বঙ্গবাসী কলেজের কমার্স বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুত পূর্ণেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা, লাহোর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থানে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পূর্ণেন্দুকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুত প্রমথনাথ

শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, এফ্-সি-ইউ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ও ডক্টর শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাগিনেয়। তিনি বাঙ্গালার শ্রমিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট। তাঁহার বয়স মাত্র ২৯ বৎসর—সিনেটের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ সদস্য।

মাদ্রাজে শাসনতন্ত্র অচল—

মাদ্রাজ ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত প্রকাশমের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস হারাইয়াছেন। তাহার ফলে তথায় মন্ত্রিসভার ৫ জন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। কংগ্রেস দলের এক সভায় নেতা শ্রীযুত প্রকাশমের উপর অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত শঙ্কর রাও দেও ও রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালানী ঐ অবস্থা সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানিবার জন্য মাদ্রাজে গিয়াছিলেন।

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগচী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র বাগচী গত কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্ব ভারতীর চীনা ভবনে গবেষণা ও অধ্যাপনা কার্য্যের ভার লইয়া শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি চীনদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্য ও চীনের

ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী

সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিস্তারের জন্য চীনদেশে গমন করিতেছেন। ডক্টর বাগচী ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে যেমন সুপণ্ডিত, চীনদেশের ইতিহাস বিষয়েও তেমনই অভিজ্ঞ।

'ন্যাসানালিষ্ট' সম্পাদক দণ্ডিত—

ন্যাশানালিষ্ট কলিকাতার একখানি ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র; গত ৮ই নভেম্বর ঐ পত্রে 'ত্রিপুরার গ্রামে দুর্ব্বৃত্তদের বিরুদ্ধে জনৈক মহিলার সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রাম' শীর্ষক এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সংবাদ প্রকাশের দ্বারা বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের গত ৩১শে অক্টোবরের আদেশ অমান্য করার অভিযোগে বিচারে উক্ত পত্রের সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রায়ের ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড (না দিলে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড) ও মুদ্রাকর শ্রীপরেশ চট্টোপাধ্যায়ের এক শত টাকা অর্থদণ্ড (না দিলে

১ মাস সশ্রম কারাদণ্ড) হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর বাঙ্গালাদেশে সংবাদপত্রের এই প্রথম দণ্ড হইল।

পাঞ্জাবে আপোষ মীমাংসা—

পাঞ্জাবে মুসলেম লীগ দল মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরুদ্ধে যে আইন অমান্য আন্দোলন করিতেছিল ৩৪ দিনের পর তাহার আপোষ মীমাংসা হইয়াছে। পাঞ্জাবে প্রাদেশিক মুসলেম লীগের সভাপতি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত প্রায় ১৫ শত বন্দীর মুক্তির আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মামদোতের নবাব, মালিক ফিরোজ খাঁ নুন, সর্দ্দার সৌকৎ হায়াৎ খান, মিয়া মোমতাজ দৌলতানা, মিয়া ইফতিখার উদ্দীন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ২৬শে ফেব্রুয়ারী মুক্তিলাভ করেন। প্রধান মন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ বলিয়াছেন—বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের ২০শে ফেব্রুয়ারীর বিবৃতিতে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় আপোষ সম্ভব হইয়াছে।

বেলগেছিয়া ভিলায় আজাদ-হিন্দ ফৌজদের সম্বর্দ্ধনা দৃশ্যের একাংশ ফটো—শ্রীপান্না সেন

নয়া দিল্লীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধিদের সভায় শ্রীযুত জগজীবন রাম

মতিলাল শীলের দান—

কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী স্বর্গত মতিলাল শীল এক শত বৎসর পূর্ব্বে ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দ্বারা এক ট্রাষ্ট করিয়াছিলেন। ঐ সম্পত্তির আয়ে কলিকাতাস্থ শিল্‌স্ ফ্রি কলেজ ও অন্যান্য বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। এক শত বৎসর পরে ট্রাষ্টের নূতন রূপ দান করা হইয়াছে। উদ্বৃত্ত টাকায় শীঘ্রই জমির মূল্য বাদে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া শীল মহাশয়ের নামে কলিকাতায় একটি পাবলিক হল নির্ম্মাণ করা হইবে। দাতা মৃত্যুর পরও বাঁচিয়া থাকেন

সৈয়দ নৌসের আলি—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব স্পীকার সৈয়দ নৌসের আলি বর্ত্তমানে কংগ্রেস দলে কাজ করিতেছেন। সে জন্য কলিকাতার গত দাঙ্গার সময় তাঁহাকে বিশেষভাবে নিগৃহীত হইতেও হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি স্যাণ্ড—ষ্টোইং বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার যোগ্যতার প্রতি এই সম্মানে সকলেই আনন্দিত হইবেন।

বাঙ্গালায় চাউলের অভাব—

বাঙ্গালা দেশে ফাল্গুন মাসে কখনও চাউলের অভাবের কথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। এবার ফাল্গুন মাসে মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায় ও সমগ্র বরিশাল জেলায় চাউলের দারুণ অভাব দেখা দিয়াছে। এখনই ঐ সকল স্থানে ২৫ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রীত হইতেছে। ইহার কারণ কোথায়?

শ্রীযুত বদ্রীদাস বর্ম্মণ—

কলিকাতা ৬ নং ওয়ার্ড হইতে নির্ব্বাচিত কাউন্সিলার মদনমোহন বর্ম্মণের মৃত্যুতে তাঁহার স্থানে শ্রীযুত বদরীদাস বর্ম্মণ নূতন কাউন্সিলার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি কংগ্রেস দল হইতে প্রার্থী হইয়াছিলেন।

দেওয়ান চমনলাল—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলের ডেপুটী নেতা দেওয়ান চমনলাল ফ্রান্সে প্রথম ভারতীয় দূত নিযুক্ত

আজাদ-হিন্দ-অফিসারগণ সহ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ওয়াশিংটন যাত্রার উদ্দেশে পালাম বিমান-ঘাঁটীতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মিঃ আসফ আলি

হইয়াছেন। তিনি ১৯২১ সাল হইতে কংগ্রেসের সেবায় নিযুক্ত আছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর তিনি দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

নেতাজীর জন্মদিনে নেতাজী-ভবন ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

গান্ধীজি ও মিঃ ফজলুল হক—

বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মিঃ এ-কে ফজলুল হক এখন মসলীম লীগ দলে যোগদান করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি কুমিল্লায় যাইয়া সর্ব্ব প্রথমে মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যের নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন। তাহার পর গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তিনি চাইমচরে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এক ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছেন। সেখান হইতে ফিরিয়াই তিনি এক জন-সভায় বাঙ্গালার লাগ মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যের নিন্দা করেন। তাঁহার কার্য্যের কারণ বুঝা কঠিন।

সাহিত্যিকদিগের মাসিক বৃত্তি—

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বাঙ্গালায় তিন জন খ্যাতনামা সাহিত্যিকের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। চট্টগ্রামের সুপণ্ডিত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের মাসিক ৫০ টাকা, ঢাকার খ্যাতনামা কবি কাইকোবাদ সাহেবের জন্য মাসিক ৭৫ টাকা ও বীরভূমের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয়ের জন্য মাসিক ৪০ টাকা দানের ব্যবস্থা ৬ মাসের জন্য করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই ব্যবস্থার জন্য বাঙ্গালার সাহিত্যিক মাত্রই বাঙ্গালা সরকারকে ধন্যবাদ দিবেন সন্দেহ নাই—কিন্তু এই ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে করা হইলে লোক অধিকতর সুখী হইবে। কি কারণে ৩ জনের ভাগ্যে অর্থের পরিমাণ তিন প্রকার হইয়াছে তাহা আমরা জানি না। তবে মুসলেম লীগের রাজ্যে হিন্দু বলিয়াই কি সাহিত্যরত্ন মহাশয়কে সর্ব্বাপেক্ষা কম অর্থ দানের ব্যবস্থা হইল? বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এ বিষয়ে আন্দোলন করিয়া এই তারতম্য দূর করার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আসামের নবনিযুক্ত গভর্ণর স্যার আকবর হায়দারী

পরলোকে পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র বেদান্তরত্ন—

বাঁকুড়া জেলা আউসপাড়া গ্রামনিবাসী পণ্ডিত অবিনাশ-চন্দ্র বেদান্তরত্ন সম্প্রতি ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বেদান্ত, জ্যোতিষ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ৩৪ বৎসর যাবৎ তিনি নিজগৃহে বলরাম চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া অধ্যাপনা করিতেছিলেন। তিনি আজীবন পল্লীর সর্ব্বপ্রকার হিতচেষ্টা করিতেন।

প্রেস কন্‌ফারেন্সে শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

ব্রহ্মচারী অণিমানন্দ স্মৃতিসভা—

বিগত ১২ই জানুয়ারী, কলিকাতা ২০ হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনে বয়েজ্‌ ওন্‌ হোমে, উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা

স্বামী অনিমানন্দ ব্রহ্মচারী

ব্রহ্মচারী অণিমানন্দজীর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী বলেন যে ত্যাগ ও সেবাকার্য্যে উদ্বুদ্ধ চিরকুমার অণিমানন্দজী ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষার ভিতর দিয়া চরিত্র গঠন করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। সারা জীবন ধরিয়া এই ব্রতই তিনি উদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীশিশিরকুমার গুহ—

পাটনা সায়েন্স কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, এস সি উপাধি লাভ করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় ও লণ্ডনের কেমিকেল সোসাইটীর মাসিক পত্রিকায় গত বিশ বৎসর যাবৎ নাল জাতীয় রঞ্জক দ্রব্যের বিষয় বহু

ডক্টর শিশিরকুমার গুহ ডি-এস্‌-সি

প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৭ সালে পাটনা সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি, এই লেবরেটরীতে গবেষণা করিয়া অধ্যাপক গুহই সর্ব্বপ্রথম ডি, এস সি উপাধি লাভ করিবার সম্মান পাইয়াছেন।

পরলোকে রণবীর মিত্র—

খ্যাতনামা দেশসেবক সন্তোষকুমার মিত্র মহাশয় গত ১৯৩১ সালে হিজ্‌লী জেলে কর্ত্তৃপক্ষের গুলীতে নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রণবীর মিত্র সম্প্রতি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই-এস্‌সি পাশ

করিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে গিয়াছিলেন। তথায় সাঁতার কাটিতে যাইয়া তিনি

৺রনবীর মিত্র

পুষ্করিণীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। তিনি সুগায়ক ও সুদক্ষ খেলোয়াড় ছিলেন।

দিল্লীতে নিখিল ভারত গো-প্রদর্শনীতে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

গণ-পরিষদে দেশীয় রাজ্যের আসন—

গণ-পরিষদে বিভিন্ন দেশীয়-রাজ্যের আসন নির্দ্ধারণ সম্পর্কে নরেন্দ্র মণ্ডলের দেশীয় রাজ্য আলোচনা কমিটী ও গণ-পরিষদের দেশীয় রাজ্য কমিটী সাধারণভাবে একমত হইয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, দেশীয় রাজ্যের মোট প্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা অনূ্যন ৫০ জন রাজ্যের আইন সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। কাজেই গণ-পরিষদের আগামী অধিবেশনে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণের যোগদানে আর কোন বাধা থাকিবে না।

শ্রীযুত সুধীর ঘোষ—

শ্রীযুত সুধীর ঘোষ বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধীর সোদপুর বাসের সময় বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত গান্ধীজির যোগাযোগের ব্যবস্থা করিতেন। তাহার পর হইতে তিনি বহুবার রাজনীতিক দূতের কার্য্য করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি বিলাতে ভারতীয় হাই-কমিশনারের অফিসে সাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন ও কাজে যোগদানের জন্য গত ১লা মার্চ্চ দিল্লী হইতে বিমানে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী ডাক্তার শান্তা ঘোষ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন।

পাঞ্জাবে নূতন অবস্থা—

পাঞ্জাবে মুসলীম লীগ কর্ত্তৃক আন্দোলনের ফলে শেষ পর্য্যন্ত ইউনিয়নিষ্ট দলের নেতা পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী মালিক সার খিজির হায়াৎ খাঁ পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সকল দলের মিলিত মন্ত্রিসভা যাহাতে গঠিত হয় তাহার চেষ্টা করিবেন। শেষ পর্য্যন্ত তথায় শাসন-তান্ত্রিক সমস্যা কি ভাবে সমাধান হয়, তাহা বুঝা কঠিন। সিন্ধু ও বাঙ্গালা দেশের মত পাঞ্জাবে মুসলীম লীগদল সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে। তবে ব্যবস্থা পরিষদে একক দল হিসাবে তাহারা প্রথম। সে জন্য প্রধান মন্ত্রী তাহাদের সহিত আপোষের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

গান্ধীজির বিহার পরিদর্শন—

প্রায় ৪ মাসকাল বাঙ্গালা দেশে বাস করার পর গত ২রা মার্চ্চ মহাত্মা গান্ধী সদলে ত্রিপুরা জেলা ত্যাগ করেন। ২রা মার্চ্চ বেলা ২টায় তিনি ত্রিপুরা জেলার হাইমচর হইতে

জিপ গাড়ীতে চড়িয়া বিকালে চাঁদপুরে আসেন। সেখানে স্পেশাল ষ্টীমারে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন সকালে যাত্রা করিয়া দুপুরে গোয়ালন্দ ও রাত্রি ৯টায় সোদপুরে পৌছেন। প্রকাশ, ১৪ দিন বিহারে থাকিয়া তিনি আবার বাঙ্গালায় ফিরিবেন ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ আরম্ভ করিবেন।

ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা সম্বন্ধে আলোচনা রত ভারত সরকারের অফিসারগণ ও বৃটিশ ষ্টার্লিং প্রতিনিধিদল
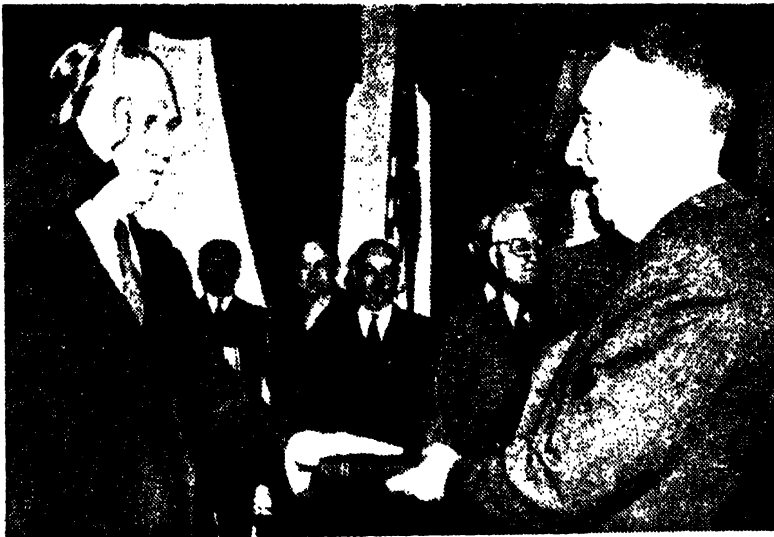
যুক্তরাষ্ট্রের নূতন স্বরাষ্ট্র সচিব কর্তৃক কার্যগ্রহণ

সর্ব্বভারতীয় মৈত্রীর উপায়—

জেমসেদপুরে চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন গত ১লা মার্চ্চ হইয়া গিয়াছে। তথায় সভাপতিরূপে যাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খ্যাতনামা মনীষী শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সর্ব্ব-ভারতীয় মৈত্রী প্রতিষ্ঠার এক নূতন উপায়ের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রদেশগুলির বিভাগ তুলিয়া দিয়া ভারতের এক একটি জেলাকে এক একটি কেন্দ্ররূপে লইয়া দিল্লীর পরিষদের অধীনে দেশ শাসনের ব্যবস্থা হইলে ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধ চলিয়া যাইবে। তাঁহার প্রস্তাব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভ করিলে অচিরে দেশে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে।

মিঃ আসফ আলির আশা—

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদূতরূপে মিঃ আসফ আলি আমেরিকার নিউইয়র্কে যাইয়া বাস করিতেছেন। গত ১লা মার্চ্চ তিনি মার্কিণ প্রবাসী ৩০জন ভারতীয় প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিকে তাঁহার কার্য্যালয়ে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের নিকট বলিয়াছেন···ভারতের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য কাহারও অতিমাত্রায় শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। তাঁহার বিশ্বাস, অচিরে কংগ্রেস ও মুসলমানদের মধ্যে একটি সুন্দর ও সম্মানজনক মীমাংসা হইবে।

আসাম সংস্কৃত এসোসিয়েসন—

সম্প্রতি আসাম গোয়ালপাড়াস্থ বিলাসিপাড়ার রাজবাটীতে বিলাসিপাড়ার রাণী শ্রীযুক্তা বেদবালা দেবী-চৌধুরাণীর হিতৈষণায় আসাম গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত এসোসিয়েসনের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসব হইয়া গিয়াছে। আসামের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বর্দ্দলৈ সভার উদ্বোধন করেন এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীচন্দ্রকান্ত বিদ্যালঙ্কার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী সমাবর্ত্তন অভিভাষণ প্রদান করেন। এ অভিভাষণে ডক্টর চৌধুরী আসাম ও বঙ্গদেশের নিকট সম্পর্ক এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ দান, সংস্কৃত
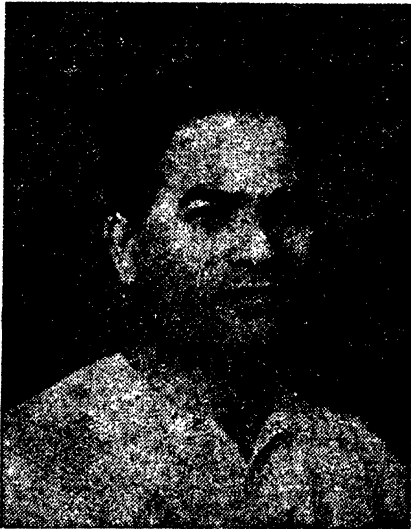
ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সাহিত্যের বিশালত্ব ও সার্বজনীনত্ব, বর্তমান ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন—তাহার কারণ নির্ণয় ও প্রতীকারোপায় উদ্ভাবন, সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা প্রভৃতি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা করেন। ডক্টর চৌধুরী সংস্কৃত সাহিত্যের সার্ব্বজনীনত্ব প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে সংস্কৃত সাহিত্য যে কেবল ব্রাহ্মণদেরই দানে সমৃদ্ধ, জনসাধারণের এ ধারণা অতিশয় ভ্রান্ত এবং মারাত্মক। সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় মাত্রেরই পূর্ব্বপুরুষদের অগণিত দান আছে এবং তজ্জন্যই সকলেরই এ সাহিত্য সংরক্ষণ এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানের সম্প্রসারণ বিষয়ে সমধিক দায়িত্ব রহিয়াছে। তিনি আরো বলেন যে পুরুষদের মত নারীদেরও সংস্কৃত সাহিত্যের বহুবিভাগে অনবদ্য দান আছে। শুধু তা' নয়, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদের দানও এ সাহিত্য সুসমৃদ্ধ। মুসলমানেরাও কাব্য, জ্যোতিষ, সঙ্গীত প্রভৃতি বহু বিষয়ে বিশিষ্ট রচনায় এ সাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়াছেন। সংস্কৃত বিষয়ক পরীক্ষাসমূহেও পাঠ্যপুস্তকের ও বিষয়ের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন বিষয়েও ডক্টর চৌধুরী মত প্রকাশ করেন। এ উৎসবে আসামের অন্যান্য মন্ত্রী, ডি-পি আই, বহু অধ্যাপক এবং আসামের অগণিত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদিবসব্যাপী এ উৎসবে আসামের সর্ব্বত্র সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং আসাম-গবর্ণমেণ্ট ও বিলাসিপাড়ার শ্রীযুক্তা দেবী চৌধুরাণী এইজন্য ভারতবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়—

মহারাজা সার ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আত্মীয় কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী জমীদার শ্রীযুত করুণাক্ষ

শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফটো—শ্রীরবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি বৈদেশিক কন্সাল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শিক্ষিত তরুণ। তাঁহার পিতা

৺বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও বহু দেশের কন্সাল পদে নিযুক্ত ছিলেন।

স্বামী প্রণবানন্দ স্মৃতি উৎসব—

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, জাতি সংগঠক ও সমাজসংস্কারক, যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দ-জী মহারাজের বার্ষিক স্মৃতি উৎসব গত ১৭ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বালীগঞ্জস্থিত সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয়ে বিরাট-ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৭ই তারিখে সঙ্ঘনেতার সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ এক সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা বালীগঞ্জ ও ভবানীপুর অঞ্চল পরিভ্রমণ করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৩ ঘটিকায় আচার্য্যের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক সার্ব্বজনীন বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ৫ ঘটিকায় সমবেত হিন্দু নরনারী দণ্ডায়মান হইয়া স্তব পাঠ পূর্ব্বক অর্ঘ্য নিবেদন করে। তৎপরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব মেয়র) মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক স্মৃতি সভা হয়। উদ্বোধন সঙ্গীতের পর মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য্য একটী সংস্কৃত প্রশস্তি মঙ্গলাচরণ করেন। সঙ্ঘনেতার অধ্যাত্ম সাধনা, এবং ধর্ম্মপ্রচার, তীর্থ সংস্কার, সমাজ সংস্কার ও সমাজ সংগঠন, শিক্ষাবিস্তার ও জনসেবা-মূলক কার্য্যাবলী এবং তৎপ্রবর্ত্তিত হিন্দু মিলন মন্দির ও 'রক্ষাদল' আন্দোলনের সার্থকতা বিশ্লেষণ করিয়া স্বামী অদ্বৈতানন্দজী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত মুরলীধর সরকার প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা করেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর ৫২তম জয়ন্তী উপলক্ষে যে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহার সম্মুখভাগের দৃশ্য

সবাদ্য শোভাযাত্রার অপর এক অংশ

বাঙ্গালী যাদুকরের সম্মানলাভ—

সুপ্রসিদ্ধ যাদুকর শ্রীযুক্ত পি-সি-সরকার মহাশয় সম্প্রতি নেপাল সরকার কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া রাজপরি-বারের সম্মুখে তাঁহার যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। তাঁহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হইয়া নেপাল গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান "রৌপ্য তরবারি" পুরস্কার দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের নামাঙ্কিত, সিলমোহরযুক্ত তরবারিটিতে সংস্কৃত

তাহার "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী" কথাটি লিখিত আছে।

শ্রীশিশিরকুমার দাশ—

ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভে মিশনের সদস্যরূপে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বড় বড় কারখানাগুলি দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাশ ইউরোপে গিয়াছেন।

শ্রীশিশিরকুমার দাশ

তিনি বাঙ্গালার খ্যাতনামা শিল্পী ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আলা-মোহন দাশের একমাত্র পুত্র। তাঁহাদের ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মুখার্জ্জির সহিত শিশির-কুমারের বিমানে আরোহণকালের চিত্র এখানে প্রদত্ত হইল।

সমষ্টি বিরোধী দিবসে গৌহাটীতে অসমিয়া নারীদের বিরাট শোভাযাত্রা ফটো—শ্রীকামাখ্যা ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার—

কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ সরকার অপরাধ বিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যে সম্প্রতি বিলাতের স্কট-

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁহার পত্নী

ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী রেণুকা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। শ্রীমতী রেণুকা কলিকাতার বহু নারীমঙ্গল ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। হীরেন্দ্রবাবু সুপণ্ডিত এবং ভারতবর্ষের লেখক।

আপোষ

অধ্যাপক শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

চায়ের আড্ডা ঝিমাইয়া আসিয়াছে। Cabinet Mission হইতে সুরু করিয়া পাকিস্থানতত্ব এবং সকলের শেষ চিনির বরাদ্দ কমানো পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার নিয়াই তুমুল এবং চূড়ান্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ 'ঠাকুরদা' হুঁকাটি এক কোণে সযত্নে রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "যাই বলো ভায়া, সংসারে সুখ চাওতো আপোষ কত্তে জানতে হবে।"

ঠাকুরদাকে ভালো করিয়া জানি। বুঝিলাম ঠাকুরদার রসনা উত্তেজিত হইয়াছে। ওই "যাই বলো ভায়া"— আমাদের অতি পরিচিত।

সোৎসাহে বলিলাম, "কি হোল ঠাকুরদা? আবার ঠান্দির সঙ্গে বুঝি"—

স্নিগ্ধ হাসিয়া ঠাকুরদা বলিলেন, "ঠিক ধরেছিস ভাই।"

সুবীর একটু বেশী ফক্কড়। ফোড়ন কাটিল, "ঠাকুরদা, এ বুড়ো বয়সেও"—

ঠাকুরদা চটিয়া গেলেন—বলিলেন,"আরে, বুড়োই না হয় হয়েচি—মরিনি তো এখনো। পারবি ছোঁড়ারা সাঁতরে গঙ্গা পেরোতে—বালীর পোলের ধারে? এ বুড়ো হাড় এখনো" ..

বুঝিলাম ঠাকুরদা বিষম চটিয়াছেন। কিন্তু ওষুধও আমার জানা আছে। নূতন কল্কে সাজাইয়া ঠাকুরদার হাতে হুঁকাটি আগাইয়া দিয়া সুবীরকে এক প্রচণ্ড ধমক দিলাম—"দেখ সুবীর, তোর ফচ্‌কেপানা সব সময় ভাল লাগে না। গুরু লঘু জ্ঞান নেই?"

ঠাকুরদার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "আপনাদের অভিজ্ঞতার একটা আলাদা মূল্য আছে। ও আমরা পাবো কোথায়?"

ঠাকুরদা ধীরে ধীরে হুঁকাতে টান দিতেছেন। চোখ দুটি বুজিয়া আসিয়াছে। বুঝিলাম ফল হইয়াছে। আর কয়েকটা টান দিয়া ঠাকুরদা হুঁকাটা আমার হাতে ফিরাইয়া দিলেন। অনুতপ্ত সুবীর আমার হাত হইতে হুঁকাটা নিয়া দরজার কোণে রাখিয়া দিল।

কিছুক্ষণ চুপ্‌ চাপ্‌।

কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া ঠাকুরদা সুরু করিলেন "ও তোমরা যাই বলো—সংসারে সুখ পেতে চাও তো আপোষ করতে শেখো। এই দ্যাখো না গান্ধিজী—

তেজেন্দ্র নতুন জেল হইতে ছাড়া পাইয়া আসিয়াছে, অসহিষ্ণুকণ্ঠে বলিল, "আবার গান্ধী মহাত্মাকে এর মধ্যে কেন? আপনার গল্পই বলুন না!"

ঠাকুরদা আবার চটিয়া বলিলেন, "ঐ:তো তোমাদের দোষ। ভাল কথা চুপ করে শুনবে না।"

আবার এক ধমক লাগাইলাম।

এবার সব শান্ত হইয়া ঠাকুরদার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি বলিলাম, "আপনি বলুন, ঠাকুরদা।"

ঠাকুরদা সুরু করিলেন, "ব্যাপারটা সামান্যই, কিন্তু ওর থেকে শেখবার অনেক আছে। তাই তোমাদের বলা— আমরা আর ক'টা দিন?"

সোৎসাহে বলিলাম, "ঠিক বলেচেন ঠাকুরদা। শুনে রাখলে আমাদেরই উপকার।"

ঠাকুরদা বলিয়া চলিলেন—"ব্যাপারটা হয়েচে কি—কাল তো ছিল পূর্ণিমা। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে—ভাবলুম জানালাটা খুলে দি। জানালা খুলে দিয়ে আয়েশ করে তামাক খাচ্ছি। তোদের ঠান্দি কাজকর্ম্ম সেরে এলেন। বল্লুম, "দেখো কি সুন্দর চাঁদের আলো ফুটেচে— হাওয়াটিও কি মিষ্টি। বলে তাকে হাত ধরে বসাতে যাবো, তিনি তো হাঁ হাঁ করে ছুটে গেলেন জানলা বন্ধ করতে। বললেন, বেতো রুগী, পূর্ণিমা রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে ব্যাথায় মরি আর কি!"

আমারও কেমন রোখ্‌ চেপে গেল, বল্লাম, "জানলা খোলাই থাকবে।" গিন্নিও নাছোড়বান্দা! চললো কতক্ষণ কথা কাটাকাটি—

কৌতুহলী অনেকগুলি কণ্ঠ একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, —"বলেন কি ঠাকুরদা! তারপর?"

ঠাকুরদা উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন "তোদের আগেই তো বলেচি—আপোষরফা হোল।"

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপোষরফা? কি আপোষ হোল?"

ঠাকুরদা হাসিয়া বলিলেন "ওরে হাঁদারাম, এটাও বুঝলিনে? জানালা বন্ধ রইলো।"

আমরা সশব্দে হাসিয়া উঠিলাম।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া

পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ

ইংলণ্ড: ২৮০ ও ১৮৬

অষ্ট্রেলিয়া: ২৫৩ ও ২১৪ (৫ উইকেট)

ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেষ্ট অর্থাৎ ফাইনাল টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ফাইনাল টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হ'ল সিডনিতে। টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভের ক'দিন আগে থেকেই খুব বৃষ্টি নেমেছিলো। টেষ্ট ম্যাচ ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়েই আরম্ভ হ'ল। ইংলণ্ডের ক্যাপটেন হ্যামণ্ডের অসুস্থতার জন্য ইয়ার্ডলি পঞ্চম টেষ্টে ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক হলেন। সম্ভবত হ্যামণ্ড টেষ্ট ম্যাচ থেকে চিরতরে অবসর গ্রহণ করলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি বিভিন্ন দেশের মোট ৮৪টি টেষ্ট ম্যাচে যোগদান করে রেকর্ড করেছেন। নরম্যান ইয়ার্ডলি ইয়র্কসায়ারবাসীদের মধ্যে টেষ্ট ম্যাচ ক্যাপটেন হিসাবে ইংলণ্ডের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়াতে প্রথম খেললেন। হাটন ও ওয়াসব্রুক ইংলণ্ডের খেলা আরম্ভ করলেন। সূচনা ভাল হ'ল না, দলের মাত্র এক রান হবার পরই ওয়াসব্রুক শূন্য রানে বোল্ড হ'লেন। এডরিচ হাটনের জুটী হয়ে খেলা ঘুরিয়ে দিলেন। হাটন ও এডরিচের দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১৫০ রান উঠে। এডরিচ ৬০ রান করে লিণ্ডওয়ালের বলে ক্যাচ তুলে আউট হ'ন। প্রথম দিনের খেলার শেষে ইংলণ্ডের ৬ উইকেটে ২৩৭ রান উঠে। এল হাটন ও ইভান্স যথাক্রমে ১২২ ও ১৬ রান ক'রে নট্ আউট থাকেন। লিণ্ডওয়াল ১৫ ওভার বলে ৪৬ রান দিয়ে ৫টা উইকেট পান।

১লা মার্চ্চ, প্রবল বারিপাতের জন্য খেলা আরম্ভ হ'ল না। উভয় দলের ক্যাপটেন দীর্ঘ সময় অপেক্ষা ক'রে ২-৩০ মিঃ (স্থানীয় সময়) সময়ে খেলা হবে না বলে ঘোষণা করলেন।

৩রা মার্চ্চ, ইংলণ্ডের প্রথম দিনের ৬ উইকেটে মোট ২৩৭ রানের সঙ্গে আর মাত্র ৪৩ রান যোগ হ'লে পরে প্রথম ইনিংস ২৮০ রানে শেষ হল। ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য যে হাটন প্রথম দিনের খেলায় নট আউট ১২২ রান ক'রে পরে খেলায় অসুস্থতার জন্য নামতে পারলেন না।

লিণ্ডওয়াল ৬৩ রানে মোট ৭টা উইকেট পেলেন ২২ ওভার বলে।

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলেন বার্ণেস ও মোরিস। সূচনা বেশ ভাল হ'ল। প্রথম উইকেটের জুটিতে ১২৬ রান উঠলো, বার্ণেস ৭১ রান এবং মোরিস ৫৭ রান। এর পর ভাঙ্গণ দেখা দিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উইকেট ১৪৬ রানের মাথায় পড়ে গেল। ৪র্থ পড়লো ১৮৭ রানে। খেলার শেষে অষ্ট্রেলিয়ার ৪ উইকেটে ১৮৯ উঠলো। ঐ দিন দলের সর্ব্বোচ্চ রান হ'ল এস বার্ণেসের ৭১। ব্র্যাডম্যান ১২ রান ক'রে রাইটের বলে বোল্ড হলেন।

৪ঠা মার্চ্চ, অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস চা পানের কিছু পূর্ব্বে ২৫৩ রানে শেষ হয়ে গেল, পূর্ব্ব দিনের ১৮৭ রানের সঙ্গে মাত্র ৬৪ রান যোগ হবার পর। ইংলণ্ডের বোলার রাইট তৃতীয় দিনে ৫টা উইকেট পেলেন ৪২ রানে। রাইট মোট ৭টা উইকেট পেলেন ১০৫ রান দিয়ে ২৯ ওভার বলে। বেডসার ২১ ওভার বলে ৪৯ রান দিয়ে ২টো

উইকেট পেলেন। রাইটের মারাত্মক বলই অষ্ট্রেলিয়া দলের এ বিপর্য্যয়ের কারণ হ'ল।

প্রথম ইনিংসের ২৭ রানে অগ্রগামী থেকে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। হাটন দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে পারলেন না। আরম্ভ ভাল হ'ল না। কোন রান হবার আগেই প্রথম উইকেট এবং ২য় উইঃ ৪২ রানে, ৩য় উইঃ ও ৪র্থ উইঃ ৬৫ রানে, ৫ম উইঃ ৮৫ রানে এবং ৬ষ্ঠ উইকেট ১২০ রানে পড়ে গেল। খেলার শেষে ইংলণ্ডের ৬ উইকেটে ১৪৪ রান উঠলো। কম্পটন ও স্মিথ যথাক্রমে ৫১ ও ১৪ রান ক'রে নট আউট রইলেন। ম্যাক্‌কুল ১৯ ওভার বলে ৫টা মেডেন নিয়ে এবং ৩২ রান দিয়ে ৪টা উইকেট পেলেন।

বেঙ্গল এ্যাথলেটিক্ স্পোর্টসের ১৫০০ মিটার সাইকেল রেসে প্রথম স্থান অধিকার করেন—মিস্ তপতী মিত্র   ফটো—জে কে সান্যাল

৫ই মার্চ্চ, এক দারুণ উত্তেজনার মধ্যে টেষ্ট খেলা শেষ হ'ল। টেষ্ট খেলার ইতিহাসে যতগুলি খেলা উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়েছে এবারের পঞ্চম টেষ্ট তার মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইংলণ্ডের পূর্ব্বদিনের রানের সঙ্গে ৪২ রান যোগ হ'ল শেষ ৩ উইকেটে। কম্পটন দলের সর্ব্বোচ্চ ৭৬ রান করলেন। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮৬ রান উঠল।

অষ্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ ক'রে ৫ উইকেটে ২১৪ রান তুলে জয়লাভ করলো। দলের সর্ব্বোচ্চ ৬৩ রান করলেন ব্র্যাডম্যান। হ্যাসেট করলেন ৪৭ রান, মিলার ৩৪ রান।

ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য যে, তারা শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করতে পারলো না। পঞ্চম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের খেলোয়াড় হাটনের অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিতি এবং ইয়ার্ডলির বীরত্বপূর্ণ অধিনায়কত্ব লোকের মনে রেখাপাত করবে।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের মিঃ দত্ত বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস্‌এর ৪৫ ফিট ৯½ ইঞ্চ হফ্-ষ্টপ্ ও জাম্প্ প্রতিযোগিতায় নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেছেন। ব্রড্ জাম্প প্রতিযোগিতায়ও তিনি প্রথম স্থান অধিকার ক'রেছেন।   ফটো—জে-কে-সান্যাল

ইংলণ্ড ঃ এল হাটন, সি ওয়াসব্রুক, ডবলউ জে এডরিচ, এল ফিসলক, ডি কম্পটন, জে ইকিন, এন ইয়ার্ডলি-ক্যাপটেন, টি ইভান্স, পি স্মিথ, এ বেডসার, ডি রাইট।

অষ্ট্রেলিয়া ঃ এস বার্ণেস, এ মোরিস, ডন ব্র্যাডম্যান, এ এল হ্যাসেট, কে মিলার, আর হ্যামেন্স, সি ম্যাক্‌কুল, ডি ট্যালোন, আর লিণ্ডওয়াল, জি ট্রাইব, ই টোসাক।

জোনাল কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

জোনাল কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট টুর্ণামেন্টের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল বিজয়ী হয়েছে।

ফাইনাল ঃ

পশ্চিমাঞ্চল ঃ ৪৯২ (ভি এস হাজারী ১৮৫, আর এস মোদী ১২৪ ; ফজল মামুদ ১১৮ রানে ৫ উইঃ, অমরনাথ ১১৭ রানে ২ উইঃ)

উত্তরাঞ্চল ঃ ২৫৩ (জি কিষণচাঁদ ৬৯ ; ডি জি ফাদকার ১৪ রানে ৫ উইঃ, আমীর ইলাহী ৭৬ রানে ২ উইঃ) ও ২০৫ (লালা অমরনাথ ৪০ ; ডি জি ফাদকার ৪৬ রানে ৩ উইঃ, কে কে তারাপুর ৪০ রানে ৩ উইঃ এবং ভি মানকাদ ১৮ রানে ২ উইঃ)

বেঙ্গল কেমিক্যাল কর্মীদের বাৎসরিক খেলাধূলা অনুষ্ঠান

'তকলী'তে সুতাকাটা প্রতিযোগিতা

পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস এবং ৩৪ রানে উত্তরাঞ্চল দলকে জোনাল কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট টুর্ণামেণ্টের দ্বিতীয় বার্ষিক ফাইনালে পরাজিত করেছে।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে জোনাল কোয়াড্রাঙ্গুলার টুর্ণামেণ্টের খেলাগুলি হয়েছিল। পশ্চিমাঞ্চল ২৭০ রানে পূর্ব্বাঞ্চলকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠে। উত্তরাঞ্চল ফাইনালে উঠে ১০ উইকেট দক্ষিণাঞ্চলে পরাজিত ক'রে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল বাৎসরিক খেলা-ধূলা

বেঙ্গল কেমিক্যাল, পাণিহাটী কারখানায়, কর্মিদের বাৎসরিক খেলাধূলা প্রতিযোগীতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সেন উপহার বিতরণ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। বালী নর্থ ক্লাবের ব্যাণ্ড পার্টি তাঁদের ব্যাণ্ড বাদ্যে উৎসবের শ্রীবর্দ্ধন ক'রে ছিলেন। অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য এই যে, দৈহিক বহুবিধ কলা-কৌশল প্রদর্শনের সঙ্গে আদর্শের প্রতিযোগিতা "তকলী"তে সুতা কাটা বিশেষ স্থান গ্রহণ ক'রেছিল।

পৃথিবীর টেবল টেনিস ঃ

শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় টেবল টেনিসদল প্যারিসে পৃথিবীর টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। বোম্বাই প্রদেশ তার 'কোটা' অনুযায়ী অর্থ পাঠায় নি বলে ভারতীয় টেবল টেনিসদল অর্থাভাবে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান

না করার সিদ্ধান্তই করেছিলো। ভারতীয় টেবল টেনিস দলে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ ছিলেন—কে ঘোষ (বাঙ্গলা), ভি শিবরামণ (অন্ধ্র)—ক্যাপটেন ; ইউ এম চন্দ্রণা (বোম্বাই), জে গড্‌রেজ (হোলকার)।

১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় মেয়েদের মধ্যে মিস্ ডি-বিক্ প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়া সাম্প্রতিক বেঙ্গল এ্যাথেলেটীক্ স্পোর্টস্‌এর ১০০-২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায়ও তিনি প্রথম হন

ফটো—জে-কে-সান্যাল

রঞ্জি ট্রফি সেমি-ফাইনাল ঃ

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতার একদিকের সেমি-ফাইনালে পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল বিজয়ী হোলকার দল বনাম উত্তরাঞ্চলের ফাইনাল বিজয়ী নর্থ ইণ্ডিয়া ক্রিকেট এসোঃ দলের মিলিত হবার কথা ছিলো। কিন্তু শেষ সময়ে নর্থ ইণ্ডিয়া এসোঃ দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অক্ষমতা জানালে ক্রিকেট বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল হোলকার ষ্টেট দলকে 'ওয়াক-ওভার' দেয়।

বরোদা ঃ ৩৩৭ ও ৪৫ (১ উইঃ)

হায়দ্রাবাদ ঃ ১১৮ ও ২৬৩

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ানসীপের অপর একদিকের সেমি-ফাইনালে বরোদা ৯ উইকেটে হায়দ্রাবাদ দলকে পরাজিত করেছে।

পৃথিবীর টেবল টেনিস

চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

প্যারিসে পৃথিবীর টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। চেক খেলোয়াড় বোহুন ভানা পুনরায় পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে বিজয়ী হয়েছেন। ডবলসের খেলাতেও তিনি বিজয়ী হয়েছেন।

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালে বোহুন ভানা ২১-১০, ২১-১৪ ও ২১-৯ গেমে ফেরেন্‌ক সিডোকে (হাঙ্গেরীয়ান) পরাজিত করেছেন।

ভেরাইটি স্পোর্টসের সাইক্ল-প্রতিযোগিতার বিজয়ী প্রতিযোগীগণ

ফটো—জে-কে-সান্যাল

পুরুষদের ডবলস ফাইনালে ভানা ও শ্লার (চেকোশ্লোভিয়া) ২১-৮, ২১-১৪ ও ২১-১৫ গেমে জ্যাক ক্যারিংটনকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে মিস ডিসেল ফারকাস (হাঙ্গেরী) ২১-১০, ২১-১২ গেমে মিস এলিজাবেথ ব্লাকবোর্ণকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে ফেরেন্‌ক সিডো ও মিস ফারকাস (হাঙ্গেরী) ১৮-২১, ২১-১৩, ২১-১৮, ২১-১৫ গেমে এডলফ্ শ্লার এবং মিস ভলাস্তা ডি পেট্রিসোভা (চেকোঃ) পরাজিত করেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া পৃথিবীর টেবল টেনিস টীম চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ফাইনালে

ইউনাইটেড ষ্টেটসকে ৫-২ গেমে পরাজিত ক'রে পুনরায় সুইথলিং টেবল টেনিস কাপ পেয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯৩৯ সালে কাইরোতে উক্ত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। তার পর যুদ্ধের দরুণ খেলা বন্ধ ছিল।

অল্-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন ঃ

অল্-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ফাইনালে ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় প্রকাশনাথ ১৫-৭ ও ১৫-১১ পয়েণ্টে সুইডেনের কোনী জিপসেনের কাছে পরাজিত হয়েছেন। ফাইনাল খেলায় প্রকাশনাথ তাঁর স্বাভাবিক ক্রীড়াচাতুর্য্য দেখাতে পারেন নি। খেলায় উভয়েরই বহু ত্রুটি দেখা গিয়েছিলো।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইনালে ডেনমার্কের মেরী ইউসিং ১১-৬, ৬-১১ ও ১২-১০ পয়েণ্টে ডেনমার্কের ক্রিষ্টেন থর্নডাহালকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডবলসের ফাইনালে টি ড্যাডসেন এবং পি হোল্ম (ডেনমার্ক) ৪-১৫, ১৫-১২ ও ১৫-৪ পয়েণ্টে জে স্কারূপ এবং পি ডাডেসষ্টিনারকে (ডেনমার্ক) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলস ফাইনালে মিস টি ওলসেন এবং থর্নডাহাল (ডেনমার্ক) ১৫-৮, ১৫-৭ পয়েণ্টে মিস এম ইউসিং ও মিস এ জ্যাকোবসেনকে পরাজিত করেন।

ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় প্রকাশনাথ পুরুষদের সিঙ্গলসের সেমি-ফাইনালে প্রতিযোগিতায় সর্ব্ব শেষ ইনিংস খেলোয়াড় নোয়েল রাডফোর্ডকে হারিয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন।

ডবলসের সেমি-ফাইনালে প্রকাশনাথ ও দেবীন্দর মোহন ১৫-১০ ও ১৮-১৬ পয়েণ্টে ডেনিস খেলোয়াড়দ্বয়ের কাছে হেরে গিয়ে দর্শকদের বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। ভারতীয় খেলোয়াড়দ্বয় প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউণ্ডে এই প্রতিযোগিতার ভূতপূর্ব্ব বিজয়ীকে পরাজিত করায় সেমি-ফাইনেলের খেলায় তাঁদের জয়লাভ সম্বন্ধে সকলেই বেশী আশা করেছিলেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীআশালতা সিংহ প্রণীত কৌতুক-চিত্র "লগন ব'য়ে যায়"—১৷৵০
বনফুল প্রণীত উপন্যাস "নঞ্‌ তৎপুরুষ"—৩৲
মনোজ বসু প্রণীত উপন্যাস "শত্রু পক্ষের মেয়ে"—৩৷০
স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আমার পৃথিবী"—১৷৷০
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "সাইকেলে পশ্চিম এশিয়ায়"—২৷০
শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর ও শ্রীপ্রবোধ সরকার প্রণীত কিশোর নাটিকা "রঙ্‌মহল"—১৲
শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত "অজানা দেশের যাত্রী"—১৷০
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ প্রণীত "অজানা দেশে মঙ্গোপার্ক"—১০
শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত "আলালের ঘরের দুলাল"—১০, "হুতোম প্যাঁচার নক্সা"—১৷০
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "যাঁরা ছিলেন মর্ত্তীয়সী"—১৷৷০
শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী প্রণীত "কবি-তীর্থের পাঁচালী"—২৷০
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "বন্দীবীর"—৷৷০
শ্রীগৌরমোহন দেববর্ম্মন বিদ্যাভূষণ প্রণীত "যজ্ঞোপবীত"—১৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মেজর জেনারেল অনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বৈশাখ—১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড	চতুস্ত্রিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

সাবান শিল্পের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন

বর্ত্তমান রাজনৈতিক জাগরণের দিনে শিল্প-বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে দেশের রাজনীতিবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকগণ একযোগে কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। সাবান শিল্প একটী মুখ্য শিল্প এবং আগামীকালের স্বাধীন ভারতে ইহার বিপুল সম্ভাবনা বিদ্যমান। সুতরাং ইহার উন্নতির পথের অন্তরায়গুলির উল্লেখ ও কি উপায়ে তাহা বিদূরিত করিয়া এই শিল্প এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। স্মরণাতীত কাল হইতেই দেহের পবিত্রতা আত্মিক পবিত্রতারই প্রতীক বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। আধুনিক যুগে শরীরের বিশুদ্ধতা বিধানে সাবান অপরিহার্য্য উপকরণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে—বলা বাহুল্য, শরীরের আনুষঙ্গিক পোষাক পরিচ্ছদের বিশুদ্ধতাও সাবানের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রুমফোর্ড (Rumford) বলিয়াছেন—"পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মানুষের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করে যে ইহাতে তাহার নৈতিক চরিত্র পর্য্যন্ত প্রভাবিত হয়। আত্মিক উৎকর্ষ কখনও বাহ্যমলিনতার মধ্যে বিকাশ লাভ করিতে পারে না; ইহাও আমি আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না যে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনও ঘৃণিত দুর্বৃত্ত হইতে পারে।" বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালে কোনও দেশের সভ্যতার মানদণ্ড সেই দেশের অধিবাসীদের ব্যবহৃত সাবানের পরিমাণের দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। এই মানদণ্ডের বিচার করিলে ভারতবর্ষ যে অনেক নিম্নতর স্থান অধিকার করিবে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যে স্থলে ভারতবাসীর জনপ্রতি বার্ষিক সাবানের খরচ একপোয়ার মতন, সেস্থলে মার্কিন রাজ্যের অধিবাসীরা জনপ্রতি বার্ষিক ১২ সের সাবান ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইংরাজ এবং ফরাসীদের সাবানের খরচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীচে হইলেও উহা তাহার তুলনায় খুব বেশী কম নয়।

ভারতবর্ষের সাবান ব্যবহারের অল্পতার কারণ নির্ণয় করা খুব দুরূহ নহে। ভারতবাসীর দারিদ্র্য সর্ব্বজনবিদিত। ভারতের অগণিত সাধারণ নর-নারীর, এমন কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনধারণের মানদণ্ডও স্বভাবত-রূপে নিম্নস্তরের। যতদিন পর্য্যন্ত সাধারণ ভারতবাসীর জীবন-যাত্রার মানদণ্ডের উন্নতি না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত এদেশে সাবানের ব্যবহার

বৃদ্ধি পাইবার আশা নাই। সুখের বিষয়, সম্প্রতি রাজনীতি এবং শিল্পক্ষেত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ভারতের জনগণের জীবন-ধারণের মানদণ্ডের উন্নতি-বিধানকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছেন।

এদেশের প্রচলিত দারিদ্র্যের উপর যুদ্ধের অপদান (aftermath), দুষ্প্রাপ্যতা ও 'কনট্রোল' এবং তদনুষঙ্গী দুর্নীতি প্রযুক্ত অধিকাংশ লোকের পক্ষে কোনওরূপে দু'টো ডাল ভাতের যোগাড় করিয়া প্রাণরক্ষা করাও যারপর নাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ইহা অস্বাভাবিক নয় যে সাবানের মত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীও দুর্ভাগ্যক্রমে আজ সৌখীন দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে চলিয়াছে।

আমাদের দেশে সাবানের মূল্যের উপরেই উহার ব্যবহারের সম্প্রসারণ নির্ভর করিতেছে। যদি আমরা জনগণের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইতে—তথা অধিকতর পরিমাণ সাবান ব্যবহার করিতে দেখিতে চাই তবে গায়ে মাখা এবং কাপড় কাচা উভয় প্রকার সাবানেরই দাম কমাইতে হইবে। সাবান শিল্প এবং তৎসংশ্লিষ্ট লোকেরা ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন বলিয়া আমি মনে করি না। কারণ, আমার বিশ্বাস যে যদি আমরা আমাদের কোনও কোনও সাবানের মূল্য এরূপভাবে হ্রাস করি যে তাহাতে উহা সাধারণ লোকেরাও কিনিতে পারে তাহা হইলে দেশের বর্ত্তমান সাবান কারখানাগুলির সম্প্রসারণ এবং দেশের বিভিন্ন অংশে নূতন নূতন সাবানের কারখানা স্থাপনও সম্ভবপর হইয়া উঠিবে।

কিন্তু সাবানের মূল্য হ্রাস করা সাবান-শিল্পীদের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। ইহা সাবানের কাঁচামালের দাম এবং সহজে সংগ্রহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ কষ্টিক সোডা, নারিকেল তৈল এবং গন্ধ তৈল প্রভৃতি সাবানের কাঁচামালের জন্য সম্পূর্ণরূপে না হইলেও বহুলাংশে আমাদিগকে অন্যদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং এই কাঁচামালের সংগ্রহ এবং সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

এক্ষণে অত্যাবশ্যক কাঁচামালগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যাইতেছে:—

কষ্টিক সোডা—কষ্টিক সোডা সাবানশিল্পের চাবি কাঠি স্বরূপ। ভারতের বার্ষিক কষ্টিক সোডার চাহিদা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টন এবং ইহার প্রায় অর্দ্ধেকই সাবান শিল্পে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এই অত্যাবশ্যক সামগ্রীর জন্য আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী আমদানী মালের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং গত বহু বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মারফৎ ইহার সংগ্রহের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে। যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও রেশন-সামগ্রীর মধ্যে গণ্য হয়। যুদ্ধ-পূর্ব্বকালে যে কারখানা যতটা পাইতেন রেশন ব্যবস্থায় তাহার শতকরা ৫০ এবং পরে ৭৫ অংশ দিবার ব্যবস্থা হয়। অবশ্য যে সব কারখানা যুদ্ধের মাল সরবরাহ করিতেন তাঁহারা পুরামাত্রাতেই কষ্টিক সোডা পাইতেন। যুদ্ধ থামিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে বলিয়া যখন আমরা আশা করিতেছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থা ঠিক সেই সময়ই আরও খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। কনট্রোল এবং রেশন ব্যবস্থা এখনও বলবৎ আছে, অথচ সরবরাহ-ব্যবস্থা অসন্তবরূপে অবনতির দিকে গিয়াছে। সহজ কথায় বলিতে গেলে সাবান প্রস্তুতের দায়িত্ব যদিও ভারতীয় সাবান-শিল্পীদের উপর ন্যস্ত—সাবান কারখানার আসল চাবিকাঠি রহিয়াছে বিদেশী কষ্টিক আমদানীকারকদের হাতে। জানা গিয়াছে যে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত 'হেভী কেমিক্যাল প্যানেল' আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কষ্টিক সোডা প্রস্তুতের পরিমাণ বার হাজার টন হইতে বাড়াইয়া ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টন করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। আমরা আশা করি যে প্যানেলের সুপারিশে সত্যিকারের সুস্পষ্ট ফল ফলিবে এবং সাবান শিল্পের সাহায্যকল্পে উদ্যোক্তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এদেশে কষ্টিক-সোডা শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

নারিকেল তৈল—কষ্টিক সোডার সঙ্গে সঙ্গেই আসে নারিকেল তেলের প্রশ্ন। কারণ, কষ্টিক সোডার মত নারিকেল তেলও সাবান-শিল্পের অন্যতম চাবিকাঠি। ইহার সরবরাহের জন্য যদিও আমাদিগকে সুদূর বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয় না, তথাপি ইহার সরবরাহ এত অল্প এবং ইহার দামও এত অধিক যে বর্ত্তমান অবস্থায় সাবান শিল্প ইহার মূল্য বহনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। এই সেদিন পর্য্যন্তও ইহার দাম ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। অধিকন্তু সম্রাটের গবর্ণমেণ্ট সিংহলজাত নারিকেল তেলের প্রায় সবটাই পাইকারীভাবে খরিদ করায় এবং ভারতীয় সাবানশিল্পীদের মধ্যে বিতরণের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের হাতে অতি সামান্য অংশই ছাড়িয়া দেওয়ায় এই অবস্থা আরও সঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট যথা সময়ে আবেদন প্রেরণ করিয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই। তবে সম্প্রতি তাঁহারা অনেক বিবেচনার পর মালাবার, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর এবং মাদ্রাজের তৈলের মূল্যের সঙ্গে আমদানী তৈলের মূল্যের সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে নারিকেল তৈলের সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয় ইহার ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করাই অর্থাৎ মাদ্রাজ, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের তৈলের মূল্য কমাইয়া উহা আমদানী তৈলের মূল্যের সমতায় আনাই অধিকতর সমীচীন ছিল। ভারতবর্ষের উপকূলভাগে নারিকেল চাষের প্রসারকল্পে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এই আন্দোলন সমর্থন করি এবং ১৯৪৫ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত কেন্দ্রীয় কোকোনাট কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য—নারিকেল চাষের সম্প্রসারণ এবং নারিকেল বৃক্ষজাত দ্রব্য সম্ভারের ক্রয় বিক্রয়ের সুব্যবস্থার উপর আমি যথেষ্ট আশা পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু ইহা একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা—তারপর ইহা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না যে, গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব-পরিকল্পনার রথ জগন্নাথের রথের মতই মৃদু গতি। সুতরাং অন্তবর্ত্তীকালের জন্য গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এমন কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য যাহাতে দেশীয় শিল্পের প্রকৃত

সাহায্য হয় এবং দেশের প্রস্তুত সাবান বিদেশী সাবানের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে আমি গবর্ণমেন্টের নিকট বিশেষ জোরের সঙ্গেই এই প্রস্তাব পেশ করিতে চাই যে, তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টায় অধিক পরিমাণে এবং অধিকতর সুলভ মূল্যে নারিকেল তৈল ভারতীয় সাবান শিল্পীদের সরবরাহ করেন। বর্ত্তমানে সিঙ্গাপুর ও প্রণালী-উপনিবেশ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আমদানী কাঁচা মালের উপর যে শুল্ক বর্ত্তমান আছে উহা তুলিয়া দেওয়া এবং ঐ সব দেশ হইতে যাহাতে অধিক পরিমাণে তৈল ভারতবর্ষে আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দেশের উৎপন্ন নারিকেল তৈলে যখন দেশের চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মিটিতে পারিবে তখন এই শুল্কের পুনঃ প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে।

অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈল—সাবান শিল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য উদ্ভিজ্জ তৈলের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধিই নারিকেল তৈলের দুষ্প্রাপ্যতা এবং দুর্ম্মূল্যতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এই 'দেখা-দেখি' বৃদ্ধি ছাড়া খাদ্য হিসাবে এবং অন্যান্য শিল্পে অধিকতর চাহিদা হওয়াও উদ্ভিজ্জতৈলের মূল্য-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এইখানে অধিক পরিমাণ জমিতে তৈল বীজ চাষের প্রশ্ন আসে। এটি একটি অত্যাবশ্যক বিষয় এবং ইহার জন্য গবর্ণমেন্ট অপেক্ষা দেশের লোকদের উপরই আমাদের বেশী আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে গবেষণার যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং যে সকল তৈল খাদ্য নয়, যেমন মাছের তেল এবং পোলং তেল—সেগুলি সাবান শিল্পে ব্যবহৃত হইবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে বলিয়া আমার ধারণা।

চর্ব্বি—রিফাইন করা চর্ব্বি (বিশুদ্ধীকৃত) সাবান শিল্পের অন্যতম বিশিষ্ট উপাদান এবং ইহার জন্যও আমদানী মালের উপরেই আমাদিগকে প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যদি আমরা সমবেতভাবে চেষ্টা করি এবং গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত সাহায্য দেন তবে ভারতবর্ষের কসাইখানাগুলি হইতে প্রভূত পরিমাণে এই সামগ্রীর সংস্থান হইতে পারে। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে, মেদ-চর্ব্বির ভীষণ অভাবের কথা গবর্ণমেন্টের গোচরে আসা সত্ত্বেও তাঁহারা এ বিষয়ে উপযুক্ত মনোযোগ দিয়া কসাইখানাগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চর্ব্বি সংগ্রহের তেমন কোনও ব্যবস্থাই করেন নাই; যদিও এই চর্ব্বির ক্রমবর্দ্ধমান এবং জরুরি চাহিদার অন্ত নাই। শুনিতেছি আমাদের দেশে অনেকগুলি হাইড্রোজিনেশন করিবার (দুর্গন্ধ বা অখাদ্য তরল তেলকে প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে শক্ত ও গন্ধহীন করা) কল আমদানী করা হইতেছে। যে সব কল আসিতেছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি যাহাতে কেবল মাত্র সাবান শিল্পের উপযোগী চর্ব্বির পরিবর্ত্তে ব্যবহারযোগ্য শক্ত তৈলপদার্থ কোনও অখাদ্য তৈল হইতে প্রস্তুত করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই পৃথক ভাবে নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহাও দেখা দরকার।

গন্ধ দ্রব্য—প্রাকৃতিক গন্ধ তৈল সুগন্ধি রাসায়নিক দ্রব্যের উপর গায়ে মাখা সাবানের দাম অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। দুর্ভাগ্য ক্রমে এক্ষেত্রেও সাবানশিল্প পশ্চাৎপদ। ভারতের প্রাকৃতিক গন্ধ-তৈলের শিল্প এখনও সবেমাত্র শৈশব অবস্থায়। সুতরাং আমাদের চাহিদার জন্য এক্ষেত্রেও বিদেশীয়দের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। চন্দন তৈল ভারতবর্ষের একচেটিয়া সামগ্রী; এতদ্ব্যতীত পামারোজা, খস, লেবু ঘাস প্রভৃতির তৈল ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এ সমস্তই বিদেশে চালান যায় এবং এগুলি হইতে মূল্যবান্ সুগন্ধি রাসায়নিক সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া সেগুলি আমাদের দেশে আমদানী হইয়া থাকে। গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ এবং বৈজ্ঞানিকগণের প্রচেষ্টাতেই এই বিসদৃশ অবস্থার অপনোদন সম্ভবপর হইতে পারে। গবর্ণমেন্টের জরুরি ব্যবস্থা অবলম্বনে এই সব কাঁচা মালের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য এবং বৈজ্ঞানিকগণের উপযুক্ত প্রণালী আবিষ্কার করিয়া দেশে একটি সুগন্ধি রাসায়নিক পদার্থের শিল্প গঠন করিয়া তোলা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা কার্য্যে পরিণত করিলে ভারতবর্ষের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইবে এবং তৎসঙ্গে পরদেশের উপর নির্ভরশীলতাও হ্রাস পাইবে।

কি উপায়ে সাবান শিল্পের উন্নতির পথের অন্তরায়গুলি যথাসম্ভব বিদূরীত করিয়া ইহাকে দাঁড় করান যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। এই শিল্প এখনও এদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ইহা প্রকৃতপক্ষে এখনও শৈশবাবস্থাতেই আছে। শিশু যখন সবেমাত্র হাঁটিতে শেখে তখন যেমন তাহাকে চতুর্দ্দিক হইতে সাহায্য করিতে হয়, সাবান শিল্পের পক্ষেও বর্ত্তমানে সেইরূপ গবর্ণমেন্টের উৎসাহ ও জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই শিল্পের আবশ্যক কাঁচামাল যতদিন না দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত আমদানী কাঁচামালের উপর হইতে শুল্ক তুলিয়া দিয়া ইহার রক্ষা করা এবং বিদেশ হইতে আগত সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত বা অর্দ্ধ প্রস্তুত সাবানের উপর অত্যধিক শুল্ক ধার্য্য করিয়া উহার আমদানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া গবর্ণমেন্টের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্ত্তব্য। দুর্ভাগ্যক্রমে এতদিন ইহার বিপরীত অবস্থাই লক্ষিত হইয়াছে। ভারতে আমদানী সাবানের অপেক্ষা উহা প্রস্তুত করিবার পূর্বোল্লিখিত কাঁচামালগুলির উপরেই বেশী শুল্ক ধরা হইয়া আসিতেছে। আমি অবগত আছি যে সাবান শিল্প সংক্রান্ত সমস্যাগুলির অনুসন্ধান কল্পে ভারত গবর্ণমেন্ট একটি প্যানেল গঠন করিয়াছেন এবং সেই প্যানেল একটি রিপোর্টও দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু ঐ রিপোর্টের মর্ম এখনও জানিতে পারি নাই। সুতরাং আমরা এইমাত্র আশা করিতে পারি যে ঐ রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং উহার দ্বারা গঠনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় সাবান শিল্প প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

প্রস্তুত মাল যাহাতে দেশের বিভিন্ন অংশে, বিভিন্ন বাজারে অবাধে এবং সমানভাবে চলাচল করিতে পারে সেদিকেও কেন্দ্রীয় সরকারের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন। অতিশয় দুঃখের বিষয় এই যে যদিও এখন সামরিক গতিবিধি বন্ধ হইয়াছে তথাপি এখনও পর্য্যন্ত

রেল ষ্টিমারে মাল আমদানী-রপ্তানির অসুবিধা সমভাবেই রহিয়াছে। আরও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, এই কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্তও কোনও নির্দ্দিষ্ট দলের স্বার্থানুকূলে আভ্যন্তরীণ বাধানিষেধ বলবৎরাখা হইয়াছিল যাহার ফলে বিদেশী সাবান আমদানী করায় সুবিধা জন্মিয়াছিল। সাবানের আমদানী প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ১৯৩১ সালে ভারতবর্ষে তিন লক্ষ হন্দর সাবান আমদানী হইয়াছিল, পক্ষান্তরে ১৯৩৯-৪০ সালে উহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৩৩ হাজার হন্দর হয়—ইহা ভারতীয় সাবান শিল্পের উন্নতিরই পরিচয় দেয়। যুদ্ধকালে বিদেশ হইতে সাবান আমদানী হয় নাই বলিলেই চলে এবং এই সময় সাবান শিল্প দেশের চাহিদা মিটাইয়া গবর্ণমেন্টের যুদ্ধের অর্ডারের অসম্ভব বেশী চাহিদা মিটাইতেও সমর্থ হইয়াছে। অথচ যুদ্ধ বিরতির পর সম্প্রতি বার্ষিক উৎপন্ন সাবানের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে এক লক্ষ ৩০ হাজার টন, যদিও যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে ভারতে উৎপন্ন সাবানের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন। উৎপাদনের এই ঘাটতি প্রধানতঃ যুদ্ধরত দেশগুলি হইতে কাঁচামাল আমদানী না হওয়ার দরুণই ঘটিয়াছে। আমি খুব জোরের সঙ্গেই বলিতে পারি যে যদি আমরা এই সব আবশ্যক উপাদান যথারীতি পাইতাম তবে এতদিন আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করিতে পারিতাম।

সকলেই জানেন যে জীবনের সর্বশেষ গবেষণার প্রকৃষ্ট স্থান বিজ্ঞান—সাবান শিল্পেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে কেন? দেশের পক্ষে ইহা খুবই শুভলক্ষণ যে কাউন্সিল অব সায়েনটিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ কর্ত্তৃক গঠিত শিল্প-গবেষণা কমিটি দেশের শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন অংশে ৭টি বড় বড় জাতীয় ল্যাবরেটরী স্থাপনও যথার্থই শুভ-সূচক। আশা করি, যখন এই সব ল্যাবরেটরি পরস্পরের সহিত অন্তরঙ্গ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া পুরদোমে কাজ করিবে তখন বিবিধ দ্রব্য-সম্ভার উৎপাদনের নূতন নূতন সুলভ পন্থা হইবে—অকেজো সামগ্রীগুলি কাজে লাগাইবার উপায় বাহির হইবে এবং আমাদের বর্ত্তমান অনেক সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা হইবে। বলাবাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশীয় উৎপন্ন সামগ্রী একটি নির্দ্দিষ্ট মানে উন্নীত হইবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা একটি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার এবং বর্ত্তমান অবস্থায় এমন অনেক ছোট খাট সাবান শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে যাহাদের পক্ষে তাহাদের স্বল্প সংস্থান হইতে গবেষণার জন্য মোটা বরাদ্দ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সাবান শিল্পী সকলে যদি আমরা সমবেত হই, তবে এ বিষয়ে বেশ ভাল রকমের কিছু করা যাইতে পারে। আমরা কি সম্পূর্ণরূপে গবর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরির উপর নির্ভর করিব? না তাহাদের প্রচেষ্টাকে আমরা সাধ্যমত সাহায্য করিব? এবিষয়ে সাবানশিল্পী সকলেরই সজাগ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

আমার মনে হয় আমার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিবে যদি আমি এ[illegible] গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথাসময়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ না করি; যদিও আ[illegible] বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ইহাতে কোনও কোনও মহলে হৈ[illegible] পড়িয়া যাইবে। সাবান শিল্প সংশ্লিষ্ট সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবে[illegible] যে—গত কয়েক বৎসর হইতে সাবান শিল্পে বিদেশী স্বার্থ বড় বে[illegible] মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। জাতীয় স্বার্থের তরফ হইতে দেখিলে এ[illegible] যদি সত্যসত্যই আমরা এই শিল্পকে জাতীয় ধারায় বিকশিত করিয়া স্থায়ী ভাবে গড়িয়া তুলিতে যাই তবে আমরা ইহাকে কখনও শুভলক্ষ[illegible] বলিয়া মনে করিতে পারি না। অসম্ভব রকমের মোটা মূলধন এব[illegible] প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান দেশের ছোট ছোট কারখানার পক্ষে মারাত্মক বলিয়াই আমি মনে করি। এই ব্যাপার ভারতীয় সাবান শিল্পের জাতীয়তাকরণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। বর্ত্তমানে এই শিল্পের মধ্যে অল্প মূলধনযুক্ত বহুসংখ্যক ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই কারণে তাহাদের উৎপাদনের ক্ষমতা অল্প, বিক্রয়ের ব্যবস্থাও সামান্য এবং প্রচার ও গবেষণা বিভাগ না থাকারই সামিল। যদি এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকে তবে দেশী মূলধনে স্থাপিত অনেক ছোট ছোট কারখানাকেই অদূর ভবিষ্যতে বিদেশী প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত হইয়া পাততাড়ি গুটাইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রতি বৎসর আমাদের দেশে হাজার হাজার টন সাবানের গাদ (soap lye) ড্রেনে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে। অনেকেই জানেন এই গাদের সহিত একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য, গ্লিসারিণও ড্রেনে চলিয়া যায়। ব্যাঙ্গালোরের অধ্যাপক ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র গুহ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে সমুদয় সাবান প্রস্তুত করিতে যত সাবানের গাদ (soap lye) নষ্ট হইতেছে তাহা কাজে লাগাইতে পারিলে বার্ষিক ৬৩৭৫০ টন গ্লিসারিন পাওয়া যাইতে পারে এবং পাউণ্ড প্রতি আট আনা দাম ধরিলেও উহা হইতে বার্ষিক প্রায় ৭১ লক্ষ টাকা আসিতে পারে। সাবান শিল্পীগণ সমবেত ভাবে চেষ্টা করিলে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে সাবান-গাদ হইতে গ্লিসারিণ বাহির করিয়া এই বিরাট জাতীয় অপচয় নিবারণ করিতে পারেন এবং উপসামগ্রী (by-product) হিসাবে গ্লিসারিন উৎপন্ন করিলে সাবানের দামও যথেষ্ট কমাইতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এতৎসত্ত্বেও সাবান এবং গন্ধদ্রব্য উৎপাদনকে আমাদের দেশে এখনও অবৈজ্ঞানিক শিল্পের মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে, ফলে যে কেহই সাবানের কারখানা খুলিয়া বসেন। সাবান শিল্পে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা সকলেই জানেন যে, যেমন ভাল সাবান শরীরের এবং বস্ত্রাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় অপরিহার্য্যরূপে উপকারী, তেমনি খারাপ সাবান আবার শরীর এবং বস্ত্রাদির পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকারক। সাবান কারখানার পরিচালকদের সর্বপ্রযত্নে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরে কাজ করিয়া সাবানের উৎকর্ষ এবং মান বৃদ্ধি করা এবং তাহা বজায় রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নানা কারণে আমাদের মধ্যে অনেকেই সাবান শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান, কিন্তু আশাবাদী আমি সম্মুখে ভারতীয় সাবান শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎই দেখিতে পাইতেছি। বিশাল দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সুপরিচালিত

প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠিত হইলে, উপযুক্ত পরিমাণ কাঁচা মাল সরবরাহের অবাধ ব্যবস্থা হইলে, দেশের আপামর সাধারণ স্বদেশী ভিন্ন বিদেশী কিনিব না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলে এবং ক্রমশঃ জনগণের আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতি হইতে থাকিলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় সাবান শিল্পিগণ বর্ত্তমান উৎপাদনের বহুগুণে বেশী সামগ্রী উৎপাদন করিয়া শুধু যে, দেশের চাহিদাই মিটাইবেন তাহা নহে, তাঁহাদের উৎপন্ন সামগ্রী নিকটবর্ত্তী দেশসমূহেও চালান দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ে আমি অণুমাত্র সন্দেহ করি না। সরকারী রিপোর্ট হইতে ইহা বেশ বুঝা যায় যে অন্যান্য অনেক দেশে, বিশেষ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় সাবানের সর্ব্বদাই চাহিদা রহিয়াছে। উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা পাইলে আমরা যে আমাদের নিজেদের দেশের চাহিদাই শুধু মিটাইতে পারিব তাহা নহে, পরন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি বিপুল অংশ আমাদের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, সিংহল এবং চীন প্রভৃতি দেশেও যে পাঠাইতে না পারিব তাহারও কোনও কারণ দেখি না।

আমি এতক্ষণ সাবান শিল্পের উন্নতির পথে যে সব বাধাবিঘ্ন আছে এবং সেগুলি অপসারণের যে সব উপায় নির্দ্দেশ করিলাম—তাহাই যে এ বিষয়ের শেষ কথা এবং আমার মতামতই যে অভ্রান্ত সে বিষয়ে আমি কোনও গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতে চাহি না। আমার আলোচনার বহির্ভূত আরও অনেক বাধাবিঘ্ন থাকিতে পারে এবং তাহা অপনোদনে অন্যবিধ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইতে পারে। সাবান শিল্পে আমার অপেক্ষা যোগ্যতর এবং অধিকতর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তির অভাব নাই। আশা করি তাঁহারা এ বিষয়ে আরও আলোকপাত করিবেন।

পরিশেষে সাবান শিল্পীদের প্রতি আমার এইমাত্র নিবেদন, তাঁহারা সকলে তাঁহাদের এই প্রিয় শিল্পের ক্রমোন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য যেন সর্বান্তঃকরণে সমবেতভাবে চেষ্টা করেন। কারণ এই একটিমাত্র শিল্প স্বাধীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষভাবে আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পথও অনেকটা প্রশস্ত ও সুগম হইবে।

ড্রাইভার

শ্রীশিবদাস বসু

…ড্রাইভার!

…এ ড্রাইভার!…বঙ্কু দু-হাতে চোখ কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে উঠে দাঁড়াল!

—ড্রাইভার?—হ্যাঁ ড্রাইভার…ওই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়…সে ড্রাইভারি করে পেটের জ্বালা মিটায়! বাড়ীর সত্তর বছরের বুড়ো সাহেব থেকে সাত বছরের ডলি পর্য্যন্ত তাকে ডাকে—এ ড্রাইভার!

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে সে। আজ সে উঃ! অসম্ভব রকম ক্লান্ত! মাথার ভেতরটা দপ্‌-দপ্‌ করছে…চোখ দুটো জুড়ে আস্‌ছে…ঘুমের আঠা মাখা! কাল রাত একটা পর্য্যন্ত সে মেজ সাহেবের শিকারের বাতিকে—না-না, তার নিজের পেটের জ্বালায়—জীপ চালিয়েছে! …এ বন…সে ঝোপ্‌…মাঠ…আল্‌…খানা…গর্ত্ত…ঝাঁকানিতে গা-হাত যেন পাকা ফোঁড়া—পিঠে পাট-আংড়ানো ব্যথা! শরীর টল্‌টলে…

একপা-দুপা করে এগিয়ে আসে বঙ্কু। রুবি হুকুমের সুরে বলে—চলো 'প্রভাত' সিনেমায়…জল্‌দি!

বঙ্কুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে, তার মুখের ওপর যেন কে চাবুক বসিয়ে দেয়!…তবু বল্‌বার কী আছে? ড্রাইভারি করে সে রুটি যোগায়।

পায়ে পায়ে ফিরে যায় বঙ্কু। রুবি হাঁক দেয়—হাঁটতে পার্‌ছিস্‌ না? জল্‌দি! সারাদিন শুধু ঘুম…

না-হ্যাঁ কিচ্ছু জবাব না দিয়ে বঙ্কু গাড়ী ঠিক করে। তার হাত নড়্‌ছে না…তার চোখ ঘুম-অলস। হঠাৎ রুবির হম্‌কী কানে বাজে…এখনো হচ্ছে না?—নো টাইম…কুইক!

—হয়ে গেছে মিস্‌-সাহেব…বঙ্কু তাড়াতাড়ি সিট্‌কটা ঝেড়ে দেয়—গাড়ী বে'র করে।

…গাড়ী ষ্টার্ট্‌ নিয়েছে। দুহাতে ষ্টিয়ারিং মুঠো করে ধরেছে বঙ্কু। কিন্তু অবশ হাত তার যেন খসে খসে আস্‌তে চাইছে। সে অসম্ভব রকম ক্লান্ত…পারছে না…উঃ! পা-র-ছে না সে…

…ষ্টার্ট্‌ গিয়ার্‌…মিড্‌ গিয়ার্‌…টপ্‌ গিয়ার্‌…প্রকাণ্ড

একটা আর্ত্তনাদ ছেড়ে গাড়ী শোঁ-শোঁ করে যায়! ···বন্ধুরও বুক-ঝাঁকান একটা দীর্ঘশ্বাস পাঁজরাগুলোকে সজোরে নাড়া দিয়ে বেরিয়ে আসে···তার মনে হয়, সামনের ওই লাখো মাইল গতিপথে এ দুটো ইঞ্জিনকে দিনরাত এমন বে-কায়দা ছুটে মর্ত্তে হবে, তবু শত accident নয় এ দুটী জীবনের ঘূর্ণাবর্ত্তন···শুধু পরের খেয়ালে এ হুকুমের দাসত্ব বুঝি কস্মিন্ কালেও ঘুচবে না···

গাড়ী সন্-সন্ করে ছুটছে···বন্ধু উদাস দৃষ্টিতে সামনে 'ট্রাফিক্'গহিন পথে চেয়ে-চেয়ে ভাবে—হ্যাঁ-হ্যাঁ,···সেও ত আর একটা ইঞ্জিন। দিনে রাতে যখনই তারে চল্‌তে বলা হয়···সে চলে! তার মুখে ওজর ফোটে না—না-না, জ্বালার ওজর নেই···

—য়্যাই জোর্‌সে!···সিটে মাথাটি এলিয়ে মিস্ সাহেব হুকুম দেয়।

ক্লান্ত···মুচড়ে পড়া শরীরটাকে 'সল্‌তে-ওস্‌কা' করে নিয়ে বন্ধু 'য়্যাক্‌সিলেটর্' চেপে ধরে! ভাব্‌তে থাকে—'প্রভাতে' চলেচে 'বাচ্ছোঁকি খেল্' আর এ···?

···না-না···সে ড্রাইভার! সে ভুল করে না।

—য়্যঁ!···

কাদের মেয়ে যে ওই ককিয়ে উঠ্‌ল! বন্ধু আঁত্‌কে উঠে চেয়ে দেখে···কে জানে, ফুটপাতে খেল্‌তে-খেল্‌তে ছুঁয়ে-দোবার ভয়ে মেয়েটা এমন দৌড় দেবে! কাৎরাণি শুনে বন্ধু জল্‌দিসে ব্রেক্ কস্‌তে যায়···সর্ব্বোনাশ! লুস্ ব্রেক্! কাল 'কোর্স্‌কার্টি ড্রাইভে' তার 'ব্রেক্ ফেল্' করেছিল··· মিস্‌সাহেবের তাড়ায় আর মনে ছিল না। আহাম্মক!··· ক্ষিপ্রহাতে সে হ্যাণ্ডব্রেক টানে···গিয়ার্-সির্কট্! ঘ্যাঁচ্ করে গাড়ী দাঁড়িয়ে যায়! কিন্তু মেয়েটা কি আর আছে?···বন্ধু মুখ বাড়িয়ে দেখে···হ্যাঁ আছে! এক ইঞ্চির জন্যে! ভগবান! ছুটে গিয়ে থর্‌থরে দুখানা হাতে সে বুকে তুলে নেয় খুকুকে: খুকু ভয় নেই! কিসের আদর পেয়ে ভয়ে আঁকুর-পাঁকুর খুকু ডুকুরে কেঁদে ওঠে!

কিন্তু একি! তার নিজের মাথা থেকে ঝর্-ঝর্ করে রক্ত ছুটছে···সাম্‌নের গ্লাসে ঠুকে তার কপালটা চিল্‌তে-চিল্‌তে হয়ে কেটে গেছে···উঃ জোর্‌সে···ফিন্‌কি দিয়ে··· অজ্ঞান হোয়ে যাবে ভেবে সে সিটের ওপর টপ্ করে বসে পড়ে! কিন্তু ততক্ষণে পথের দোকানদারেরা ছুটে এসেছে ···খদ্দের···পথিক···ছাত্র!···মারো শালাকো'···উঃ! কচি মেয়েটাকে খুন কর্লে!

পুলিশ লাল চোখ পাকায়—শালে, সোরাব পিতে-হো?···শালে···

—কিছু বোঝাবার ফুরসুৎ হোল না···কিল্-চড়্-লাথি! মার খেতে খেতে বন্ধু নেতিয়ে পড়ে। শুধু শেষ নিশ্বাসটাকে পাঁচটা মিনিট জোর্‌সে ধরে রেখে সে বলে দেয়—খুকুর বোধ হয় কিচ্ছু হয় নি···এ আমারই রক্ত···উঃ, মাগো···

জনতা তখন যে-যার মতো ছত্রভঙ্গ হোয়ে গেছে। মিস্ সাহেব রেগে গিয়ে হুকুম দেয়—আছ্‌ড়ে পড়া দেহটাকে—য়্যাই জল্‌দি চলো···

বাঙ্গালার সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের দান

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের কথা বলিতে পারি না, বঙ্গদেশে বহুদিনের একত্রবাসের ফলে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া মিশিয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে—এ সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাত শত বৎসর ধরিয়া পাশাপাশি বসবাস ও জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া, কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে সহযোগিতা করিয়াও তাহারা তেল ও জলের মত এক আধারে থাকিয়া গিয়াছে ইহা মনে করিলে তাহাদের জীবনধর্ম্ম ও মানবধর্ম্মকেই অস্বীকার করা হয়। জড় পদার্থগুলিও বহুদিন একত্র থাকিলে রাসায়নিক মিলনে রূপান্তর লাভ করে।

এ দেশে হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে মিলিয়া চিরদিন বন্যা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সাইক্লোন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ম্যালেরিয়ার সঙ্গেই কেবল সংগ্রাম করে নাই, বর্গী, মগ, আরাকানী ও হারমাদী পোর্ত্তুগীজ ইত্যাদি দস্যু ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করিয়াছে। একদিন চাঁদ-কেদার ও ঈসা খাঁ একসঙ্গে এবং প্রতাপাদিত্য ও মুসা খাঁ একসঙ্গে দিল্লীর মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী হইয়াছিল। একদিন মোহনলাল ও মীরমদন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যেমন ক্লাইবের বিরুদ্ধে যুঝিয়াছে, তেমনি রাজবল্লভ ও মীরজাফর একত্রে মিলিয়া ইংরাজকে এদেশে বরণ করিয়া আনিয়াছে।

আবার ইংরাজ অধিকারে হিন্দু-মুসলমান সিপাহিরা একদিন একযোগে বিদ্রোহী হইয়া একপ্রকারেরই দণ্ডভোগ করিয়াছে।

ইংরাজ রাজত্বের সমস্ত সুখ দুঃখ তাহারা ভাগাভাগি করিয়া লইয়া

ভোগ করিয়াছে। জমিদার, মহাজন ও রাজকর্ম্মচারীরা সমভাবেই তাহাদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। তাহারা নসিব বা অদৃষ্টকে দায়ী করিয়া ও ধিক্কৃত করিয়া সবই সহ্য করিয়াছে। গ্রামের বিপদের দিনে মাতব্বর করিম চাচা ও হরিশ দাদাঠাকুর দুইজনে এক আটচালায় বসিয়া মুস্কিলের আসানের জন্য জল্পনা-কল্পনা করিয়াছে। পূর্ব্বোত্তর বঙ্গে বন্যার সময় হিন্দু-স্বেচ্ছাসেবক ও মুসলমান গ্রামবাসী একত্র মিলিয়া দুর্গত বিপন্ন অসহায় নর-নারীকে উদ্ধার করিয়াছে। মোহরমে, চড়কে ও গাজনের উৎসবে তাহারা একসঙ্গে শৌর্য্যসূচক ক্রীড়ায় মাতিয়াছে।

বন্যার দিনে জলপ্লাবিত প্রান্তরের একটা ডাঙ্গায় জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে শত্রু-মিত্র সকলেই যেমন পরমমিত্রভাবে আশ্রয় লয়, পরাধীনতার দুর্দ্দিনে একই অদৃষ্টের তাড়নায় তাহারা তেমনি একসঙ্গে গ্রামযাত্রা নির্বাহ করিয়াছে। বাংলা মায়ের একই ভূমিখণ্ডের অন্ন উভয়েই ভাগাভাগি করিয়া খাইয়া প্রাণধারণ করিয়াছে—একের অভাব হইলে অন্যে পূরণ করিয়াছে। একই অন্নজলে তাহাদের দেহ পুষ্ট, একই নৌকায় তাহারা পারাপার করিয়াছে। একই গাছের ছায়ায় তাহারা কর্ম্মক্লান্ত বা পথশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিয়াছে।

গাছের দুটি পাতা এক আকারের নয় ইহা সত্য, কিন্তু তাহারা শতকরা ৯৫ ভাগ একাকার, ইহা আরো সত্য। বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানে বৈষম্য আছে শতকরা পাঁচ, কিন্তু সাম্য আছে শতকরা ৯৫, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

আরবি-ফারসী ও সংস্কৃত-প্রাকৃত ভাষার মিলনে বর্ত্তমান বাংলা ভাষার সৃষ্টি। আমরা মুখে এমন বাক্য খুব কমই ব্যবহার করি যাহাতে ফারসি-আরবি শব্দ নাই। কেবল ফারসী আরবি শব্দ নয়, ফারসী আরবি বিভক্তি প্রত্যয় পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়াছে। অনেকে জানেনই না যে তাহারা অজ্ঞাতসারে অজস্র ফারসী আরবি শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। নবদ্বীপ ভাটপাড়ার পণ্ডিতরাও মুসলমানী শব্দাবলী বর্জ্জন করিয়া কথা বলিতে পারেন না। আমাদের বৈষয়িক ব্যাপারের অধিকাংশ শব্দই ফারসী আরবি।—আদালতী ব্যাপারের ত কথাই নাই।

মঙ্গল কাব্যেত কথাই নাই, আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীতেও ফারসী আরবি শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তারপর ভারতচন্দ্র হইতে আমাদের সাহিত্যে অবাধ অবারিত প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ভাষার মত ভূষাতেও হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইয়াছে। আমাদের ছিল ধুতি, চাদর ও পাদুকা। বিলাতী পোষাকের কথা বাদ দিলে আমাদের বেশভূষার বাকি সবই মুসলমানী। এদিকে নারীদের অঙ্গে জওসম, বাজু, তাগা, তাবিজ, তখতি ইত্যাদি অলঙ্কার ত মুসলমানী।

বাংলা দেশে হিন্দুর উপাধি খাঁ, মল্লিক, মুন্সী, মজুমদার, বক্সী—মুসলমানদের উপাধি বিশ্বাস, চৌধুরী, মণ্ডল ইত্যাদি।

আমাদের ভোজকাজে উৎসব আমোদের দিনে হিন্দু-মুসলমানী খাদ্যবস্তুর অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে। পায়স-পিষ্টকের সঙ্গে আমরা খাই হালুয়া, পোলাও, কালিয়া, কোফ্‌তা, কোর্ম্মা, কাবাব।

কে না জানে এদেশে মুসলমান সুলতান ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক শ্রীবৃদ্ধি। বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহ ও লছিমা দেবীর সঙ্গে সুলতান গিয়াসেরও গুণগান করিয়াছেন। যশোরাজ খাঁ, গুণরাজ খাঁ ইত্যাদি বৈষ্ণব কবিরা মুসলমান সুলতানদেরই সভায় ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের যুগে হুসেন শাহের গুণগান করিয়া কাব্য রচনা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছিল। হুসেনশা, নসরৎশা, ছুটি খাঁ, পরাগল খাঁ ইত্যাদি রাজন্য ও রাজপ্রতিনিধিরাই বাংলা সাহিত্যের শৈশবের অভিভাবক। হিন্দু-মুসলমান কবিরা একত্র মিলিয়া মৈমনসিংহ গাথাগুলি রচনা করিয়া একত্রে গ্রামে-গ্রামে গান করিয়াছে। মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণব পদাবলীও রচনা করিয়াছেন।

সৈয়দ মর্ত্তুজা, আব্বাস আলী, আফজল, সামসের আলী, আব্‌দুল ওহাব, আমান, সৈয়দ জাফর, নোহের, দুলা মিঞা ইত্যাদি বহু মুসলমান কবি শাক্তবৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছেন।

আলওয়াল হইতে আরম্ভ করিয়া কবি জসিমউদ্দিন পর্য্যন্ত কত মুসলমান কবি যে বাংলা সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন অল্প পরিসরের মধ্যে সে পরিচয় দেওয়া কঠিন। সত্য কথা বলিতে কি, বাংলা সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের সমবেত প্রয়াসের সৃষ্টি।

ভারতচন্দ্রের রচনায় প্রথম ফারসী সাহিত্যের প্রভাবসম্পাত হয়। মুসলমানী বিষয়বস্তু প্রথম তাহার কাব্যে স্থান পায়। তাহার পরে নবযুগের সাহিত্যে বহু কাব্য নাট্য উপন্যাসের উপজীব্য মুসলমানী বিষয়-বস্তু। আমি কেবল পাঠান-মোগল যুগের ভারতেতিহাসের কথা বলিতেছি না, আরব ইরাণের সাহিত্য হইতে এবং ঐ সকল দেশের ইতিহাস হইতে আহৃত বিষয়বস্তুর কথাই বলিতেছি। আরবের মরুস্থান ও ইরাণের গুলবাগ আমাদের সাহিত্যিকের কল্পনাকে যেরূপ বিলসিত করে, কোশল অবন্তীর প্রমোদোদ্যান বা পুরমার্গ সেরূপ করিতে পারে না। হারুণ-উল-রসিদের দরবার বর্ত্তমান যুগে যে Romance-এর সৃষ্টি করে, —বিক্রমাদিত্যের রাজসভা তাহা পারে না।

বর্ত্তমান বাংলা কাব্য সাহিত্যে ওমর-খৈয়াম, হাফেজ, সাদী, জামী ও রুমীর প্রভাব খুবই স্পষ্ট।

সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমানের মিলন বসন্তের সহিত বাহারের, ইমনের সহিত কল্যাণের, কাফির সহিত সিন্ধুরাগিণীর মিলনের চেয়েও নিবিড়। মুসলমান ওস্তাদের কাছে গান শিখিয়াই বাংলার গুণীরা কালোয়াৎ হইয়াছে। এক কীর্ত্তন ছাড়া সর্ব্বপ্রকারের গানেই হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠস্বরের ও সুরের মিলন ঘটিয়াছে। এদেশের কালোয়াতী গান, টপ্পা, গজল, ঠুংরি, খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি সর্ব্ববিধ গানই হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দানে পুষ্ট। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর গায়ক মিলিয়া এদেশে মনসার ভাসান ও মঙ্গল কাব্য গান করিয়াছে—পূর্ব্ববঙ্গের গাথাগান করিয়াছে। সারিগান, জারিগান, ভাটিয়ালগান, গম্ভীরা গান, বাউলগান, যাত্রাগান, কবিগান ও মুর্শিদ্যাগানে উভয় সম্প্রদায়ের কণ্ঠ মিলিয়াছে।

রায়দেশের রায়বেঁশে নৃত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সৃষ্টি। হিন্দু ঢুলী ও মুসলমান শানাইদার এদেশে নহবতের সৃষ্টি করিয়াছে।

মুসলমান মাঝি দাঁড় ধরিয়া আর হিন্দু মাঝি নৌকার হাল ধরিয়া মুক্তকণ্ঠে গাজীর গান গাইতে গাইতে পাঁচপীরের নাম স্মরণ করিয়া পদ্মা-মেঘনার তরী ভাসাইয়াছে। আজিও আমার কানে বাজিতেছে—'শিরে গঙ্গা দরিয়া পাঁচপীর বদর বদর।'

ধর্ম্মজগতেও হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটিয়াছে বাংলার মাটিতে। মহাত্মা বায়েজিদ রোস্তামীর চট্টগ্রাম প্রবাস বাংলার ধর্ম্মজগতে বিপ্লব আনিয়াছে। তাঁহার প্রচারিত সুফীতত্ত্ব, রসের ধর্ম্মে অভিষিক্ত বাংলার মাটিতে অনুকূল আবহাওয়া লাভ করিয়াছে। সুফীতত্ত্বের সহিত বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বের মিলনেই এদেশে আউল, বাউল, সাহেবধনী, মুরশিদ্দা, স্পষ্টদায়ক, দরবেশী ইত্যাদি নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। এই সকল সম্প্রদায়ের সাধকদের সাধনমার্গ হিন্দু-মুসলমানের সমবেত রস-সাধনার ফল।

হিন্দুর সত্যনারায়ণ ও মুসলমান পীরের মিলনে এদেশে সত্যপীরের উদ্ভব। এই সত্যপীরের পূজা হিন্দুর ঘরে ঘরে। হিন্দুর সাধুসন্তদের মুসলমানগণ চিরদিন শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন—হিন্দুরাও পীর-দরবেশ ফকিরদের চরণে প্রণত হইতেও ইতস্ততঃ করে নাই। হিন্দুরা ধর্ম্মরাজ ও চণ্ডীদেবীর মন্দিরে যেমন মানসিক করিয়াছে—পীরের আস্তানায় তেমনি সিরণি এবং দরগায় তেমনি চিরাগ মানত করিয়াছে।

বাংলার নবযুগের ধর্ম্মগুরু রাজা রামমোহন কোরাণ পাঠ করিয়াই একেশ্বরবাদমন্ত্রে দীক্ষিত হ'ন,—পরে তিনি এই একেশ্বরবাদের পোষকতার জন্য বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ পাঠ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হাফেজের রচনা উদ্ধৃত করিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেন। ব্রাহ্ম আচার্য্য গিরিশচন্দ্র সেন কোরাণের বঙ্গানুবাদ করিয়া এবং মুসলমান তাপসগণের জীবনচরিত রচনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মমতপ্রচারের সহায়তা করিতেছেন মনে করিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে বাংলার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হিন্দুত্বের আধারে মুসলমানী আবে হায়াৎ।

বহু হিন্দুই ধর্ম্মান্তরিত হইয়াই বাংলার মুসলমানসমাজ পুষ্ট করিয়াছে। তাহাদের আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—কিন্তু তাহারা বহু হিন্দু সংস্কার ও ঐতিহ্য দেহে মনে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। মুসলমান সমাজে তাহা কি কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই?

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলিয়াছেন—"প্রবলতর মোসলেম চিন্তাবৃত্তি প্রাচীন হিন্দু সভ্যতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করেছে বটে, কিন্তু শান্তির ক্ষেত্রে তাকে আত্মসাৎ ক'রে নিজেকেও সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। ফলে সে কেবল মুসলমানদের মানস রূপ বদলেছে তা নয়, হিন্দু মানসের তাতে আরো বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন ঘটেছে।"*

উপসংহারে বক্তব্য,—বাংলায় হিন্দু মুসলমানকে পৃথক জাতি মনে করা ইতিহাসবিরুদ্ধ, সমাজতত্ত্ববিরুদ্ধ এবং নৃতত্ত্ব-বিরুদ্ধ—এক কথায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির অস্বীকৃতি অথবা অনস্তিত্বের পরিচয়।

বাংলার সংস্কৃতি হিন্দুমুসলমানের বহুদিনকার সাধনার সমবেত সৃষ্টি। উভয়ের দান বাংলার সভ্যতায় ও জাতীয় জীবনে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে ওতপ্রোত।

সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক প্রভাবের ঊর্দ্ধে অবস্থিত কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায় এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

গুল্‌গুল আর গুলাবের বাস মিশাও ধূপের ধূমে,
সত্যপীরের প্রথম প্রচার মোদেরি বঙ্গভূমে।
পূর্ণিমা রাতি পূর্ণ করিয়া দাও গো হৃদয় প্রাণ,
সত্যপীরের হুকুমে মিশুক হিন্দু মুসলমান।
পীর পুরাতন ম্বুর নারায়ণ সত্য যে সনাতন,
হিন্দু মুসলমানের মিলনে তিনি প্রসন্ন হ'ন।
মিলন ধর্ম্মী মানুষ আমরা মনে মনে আছে মিল
খুলে দাও খিল হাসুক নিখিল দাও খুলে দাও দিল।
হিন্দু মুসলমানে হয়ে গেছে উষ্ণীষ বিনিময়
পাগড়ী বদল ভাই সে আদরে সোদর অধিক হয়।
সুফী বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি আমাদের এই দেশে,
সত্যদেবের ইঙ্গিতে মেশে বাউল ও দরবেশে।
বাহারে মিশায়ে বসন্তরাগ সিন্ধুর সনে কাফি,
এক মার কোলে বসি কুতূহলে মোরা দোঁহে দিন যাপি।
গুল্‌গুল্ জ্বালি ধূপের সঙ্গে ধোঁয়ায় মিলাও আজি
বাণীমন্দিরে বীণার সঙ্গে সিতার উঠুক বাজি।

---

* অধ্যাপক কবীর সাহেব এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ফল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে মতানৈক্য আছে। তিনি আমেরিকার একটি সাময়িক পত্রে তাঁহার মতের পোষকতার জন্য "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই বাক্যটি উৎকলন করিয়া বলিয়াছিলেন—এই মানবতার গৌরব প্রতিষ্ঠার বাণী, ইহা ইস্‌লামের বাণী। ঐ অমূল্য বাক্যটি বৈষ্ণব পদাবলীর নয়, উহা সহজিয়া সাধকের বাণী এবং ঐ মানুষ মানবজাতি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, 'মনের মানুষ' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে একথা স্বীকার করি, সহজিয়া মতবাদের উপর সুফী মতবাদের প্রভাব আছে। একথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সুধা ও ক্ষুধা

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভারতের বাণী' দৈনিকের নূতন বাড়ী উঠছে। ইট-সিমেন্টের কঠোর বুকের উপর বসবে রোটারি মেসিন, অগণিত পাঠকের কাছে পৌছে দেবে আপ-টু-ডেট সংবাদ। উদগ্র আগ্রহে সারা দেশ সেই শুভ দিনটীর প্রতীক্ষায় বসে আছে। এমন সময় ঘটল এক দুর্ঘটনা। দেওয়ালের একটা অংশ ধ্বসে কতকগুলো লোককে চাপা দিয়েছে। কয়েকটা কুলি মারা গেছে—তার মধ্যে কৈলাস একজন।

কৈলাসের মৃত্যুতে কোন সমারোহও নেই, কারও মনে বিশেষ কোন বেদনা-বোধ বা দোলাও নেই। একটা শীর্ণ, নোংরা কুলির জন্ত কেই বা মাথা ঘামায়। বড়-মানুষের বাড়ীতে একটা কুকুর মারা গেলেও তার চেয়ে অনেক বেশী চাঞ্চল্য দেখা যায়। কিন্তু কৈলাস যেমন নীরবে মাথা নত করে কাজ করে যেত, তেমনি নীরবেই সে বিদায় নিল পৃথিবী থেকে। ছায়ার মত তার আসা যাওয়া শেষ হয়ে গেল। পথের ধুলা তার পদচিহ্ন বুকে ধারণ করে রাখলে না—কারও অন্তরে গাঁথা হয়ে রইল না তার স্মৃতি। একলাই এসেছিল, আবার একলাই চলে গেল সে।

কুলি-বস্তির স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার যে ঘরটার এক-কোণে তার আস্তানা ছিল, সংবাদটা প্রচার হতে না হতে আর একজন সেটা দখল করে নিলে। হাসপাতালের যে বেড থেকে তাকে মর্গে নিয়ে যাওয়া হল সেটাও মুহূর্তমাত্র খালি রইল না। মর্গের যে টেবিলে অস্ত্রাঘাতে তার দেহটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হল সেটা থেকেও তাকে বঞ্চিত করবার জন্ত দশ বারোটা শব উন্মুখ হয়েছিল। পৃথিবীর কোথাও যেন তার কোন অধিকার সইছিল না।

পৃথিবীর পরপারে কিন্তু দেখা গেল এর বিপরীত দৃশ্য। কৈলাসের আগমন সম্ভাবনায় স্বর্গরাজ্য যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। সপ্ত স্বর্গে দুন্দুভি নিনাদে তার আগমন সংবাদ ঘোষণা করা হল: "কৈলাস পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গ অভিমুখে রওনা হয়েছে।" দেব-দূতেরা দ্রুতপদক্ষেপে স্বর্গের এক-প্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে রটনা করতে লাগল: "দিব্যধামে কৈলাসের জন্ত আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।" দেব-দেবীর মুখে মুখে কৈলাসের নাম ঘোরা'ফেরা করতে লাগল। দেবশিশুরা তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্ত ঘটা করে আয়োজন করতে লাগল।

মহামুনি নারদ স্বর্গদ্বারে কৈলাসের জন্ত অপেক্ষা ক'রতে লাগলেন। তাকে নিয়ে আসবার জন্ত চতুরশ্ববাহিত দিব্য-রথ স্বর্গের পথ দিয়ে দিগন্ত সচকিত করে অগ্রসর হল। চতুর্দ্দিক আলোকিত করে দেবদূতেরা মণিমাণিক্যখচিত সুবর্ণমুকুট নিয়ে কৈলাসের সম্বর্দ্ধনা করতে চললেন।

স্বর্গের মুনিঋষিরা এতটা বাড়াবাড়ি ভাল মনে করলেন না। দেবদূতদের তাঁরা প্রশ্ন করলেন—"ত্রিদিবের বিচার-সভার রায় হবার আগেই যে তোমরা সুবর্ণমুকুট নিয়ে চলেছ হে: বিচার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে হোত না?"

উত্তর এল—"বিচারটা তো এবার একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। ত্রিদিবের সরকারী উকীলও কৈলাসের বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না। পাঁচ মিনিটেই বিচার চুকে যাবে। কারণ এ তো আর কেউ নয়—কৈলাস যে!"

তারপর দেবশিশুরা যখন আকাশপথে মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে কৈলাসকে বরণ করলে, স্বর্গদ্বারে মহামুনি নারদ যখন প্রিয়বন্ধুর মত আলিঙ্গন করলেন, তা ছাড়া যখন শোনা গেল যে দিব্যধামে তার জন্ত আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছে এবং ত্রিদিব বিচারালয়ে তার বিরুদ্ধে কেউ একটি কথাও বলবে না, তখন কৈলাস ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল। সারাটা জীবন যে সকলের উপেক্ষা পেয়েই এসেছে, তার কাছে এতটা সমারোহ পরম বিস্ময়ের ব্যাপার বলেই মনে হল। আতঙ্কে সে এতটা অভিভূত হয়ে পড়ল যে, কারও পানে চাইতেই পারলে না। স্বপ্ন দেখছে না তো সে!

পৃথিবীতে সে কতদিন স্বপ্ন দেখেছে—যেন এমন এক দেশে গেছে যেখানে চারিদিকে হীরা, মুক্তা, মোহরের স্তূপ, আর সে দুহাতে মুঠো মুঠো করে সেগুলো তুলে নিচ্ছে। কিন্তু ঘুম ভেঙে দেখেছে যে, সে সেই কুলিবস্তির অপরিচ্ছন্ন ঘরের কোণেতেই শুয়ে আছে। আবার কতদিন বাবুরা

তাকে ডেকে হেসে কথা বলেছেন, সেও কৃতকৃতার্থ হয়েছে। কিন্তু খানিকটা পরেই আবার পিঠে পড়েছে পদাঘাত।" এ সমস্তকেই সে তার প্রাপ্য বলে ধরে নিয়েছিল। এই বলে সে নিজেকে প্রবোধ দিত—'এ আমার ভাগ্য'।

তাই স্বর্গে তার সম্বর্দ্ধনার এই সমারোহকে তার স্বপ্ন মনে হতে লাগল। স্বপ্ন ছুটে যাবে বলে সে চোখ তুলে চাইলে না। দেবদূতেরা যখন তার গুণকীর্ত্তন করতে লাগল তখন সে রীতিমত কাঁপছে। যখন তাকে ত্রিদিবের বিচার সভায় হাজির করা হ'ল তখন সে একটা নমস্কার করতেও ভুলে গেল। মেঝের দিকে দৃষ্টি পড়তে তার আতঙ্ক আরও বেড়ে গেল। শ্বেত-মর্ম্মরমণ্ডিত গৃহতলের সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব কারুকার্য্য—হীরকের পুষ্পগুচ্ছ দেবশিল্পীর অনবদ্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছে। পায়ের দিকে চেয়ে কৈলাস কেঁদে ফেলবার উপক্রম করলে। হীরার ফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে? সে করছে কি? নিশ্চয়ই দেবতারা তাকে কোন মহাবিত্তশালী মহাপুরুষ, অথবা মহর্ষি ভেবে ভুল করে এই কাণ্ড করেছেন। তারপর যখন আসল লোক এসে পড়বে তখন কি হবে তার!

সে এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে, প্রধান বিচারপতি যখন "কৈলাসের বিচার" বলে ঘোষণা করে তার পক্ষ সমর্থনকারী উকীলের হাতে দলিলপত্র দিলেন তখন তার একটি বর্ণও সে শুনতে পেলে না। তার চোখের সামনে তখন বিচারালয়ের গৃহতল ও প্রাচীরগাত্রের কারুকার্য্যের ছবি এবং কাণে সমবেত দেবগণের মৃদু-গুঞ্জন ধ্বনি। এই গুঞ্জন যখন স্পষ্টতর হয়ে উঠল তখন সে শুনতে পেলে, তার উকীল বললেন:—"চতুর শিল্পীর হস্তনির্ম্মিত অঙ্গবাসের ন্যায় 'কৈলাস' নাম একে চমৎকার মানিয়েছে।"

বিমূঢ় কৈলাস ভাবে—"কি বলছেন ইনি?"

তৎক্ষণাৎ বিচারাসন থেকে এক গম্ভীর কণ্ঠের আদেশ শোনা গেল—"উপমার প্রয়োজন নেই।"

উকীল এদিকে বলে চলেছেন:—"কোনদিন কেউ তাকে মানুষ বা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শোনে নি; কোনদিন তার চোখে মুখে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেনি, কখনও সে কোন অধিকারের দাবী নিয়ে স্বর্গ পানেও তাকায় নি।"

আবার সেই গম্ভীর কণ্ঠের ঘোষণা—"অতিরঞ্জিত করে বলার প্রয়োজন নেই।"

"বার বছর বয়সে মা মারা গেলে পিতা তার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলেন। ক্রূর, নিষ্ঠুর বিমাতার হাতে তার লাঞ্ছনার অন্ত ছিল না।" বিচারপতি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন—"তৃতীয় পক্ষকে জড়িত করার দরকার কি। প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করে যান।"

কৈলাস ভাবে—"ইনি কি আমার কথাই বলছেন?" উকীল বলে চলেছেন—"কোনদিন সে পিতার কাছেও এ নিয়ে নালিশ করেনি। একা একাই কেটেছে তার শৈশব ও বাল্যকাল। কোন শিক্ষা কেউ তাকে দেয়নি কোনদিন, বিদ্যালয়ের পথ তার কাছে অজানাই রয়ে গেছে; নববস্ত্র বা পরিচ্ছদ কোনদিন তার দেহে স্থান পায় নি; স্বাধীনভাবে চলা ফেরাও তার কাছে স্বপ্ন ছিল।"

বিচারক আবার বলে উঠলেন—"নিছক ঘটনা বলে যান, অলঙ্কারের প্রয়োজন নেই।"

"তারপর এল তার চরম দুর্গতির দিন। সেদিন সন্ধ্যারাত্রে সে খেতে বসেছে। মদ্যপ পিতা তার এসেছে নেশায় চুর হয়ে। বিমাতার প্ররোচনায় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পিতা তাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে তাড়িয়ে দিলে বাড়ী থেকে। মুখের গ্রাস তার রইল পড়ে, উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল সে। বাহিরে তখন প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, প্রকৃতির তাণ্ডব চলেছে যেন। সেই দুর্য্যোগের রাত্রে এই বার বছরের বালক চলল ভাগ্যের অন্বেষণে। সারারাত ও সারাদিন চলার পর সন্ধ্যাকালে পৌঁছল সে এক বিরাট সহরে। কলকোলাহলমুখর নগরীর জনসমুদ্রের মধ্যে একটা বুদ্‌বুদের মত কোথায় হারিয়ে গেল সে। তথাপি কারও বিরুদ্ধে সে অভিযোগ করল না। ক্ষুৎপিপাসাকাতর বালক কলের জল সম্বল করে কাটাল দুদিন, খুঁজতে লাগল কাজ। কাজ পাওয়া তার পক্ষে সহজ হল না। অবশেষে এক ঝাঁকাওয়ালার পরামর্শে আরম্ভ করলে সে মুটেগিরি। ট্রাম-বাস-মোটর ও ঘোড়া-গরু-মহিষের গাড়ী কণ্টকিত রাস্তায় চলে তার ঝাঁকা বহা। যা পায় তা খেতেই ফুরিয়ে যায়, কোন কোন দিন আবার আধপেটাও জুটে না।

তখন আরম্ভ করলে সে রাজমিস্ত্রীর কুলিগিরি। ইট, বালি, সিমেণ্ট বয়ে সে যোগান দেয় রাজমিস্ত্রীর হাতের কাছে। দেরী হলে রাজমিস্ত্রীরা অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করে। অর্থহীন চোখ তুলে সে চেয়ে থাকে তাদের মুখের

দিকে। তবুও কোন প্রতিবাদ বা অভিযোগ বেরোয় না তার মুখ দিয়ে। মজুরীর একটা অ শ থেকে বঞ্চিত হয়েও সে চুপ করে থাকে—সেকি সিকি, দুয়ানিও বিনা প্রতিবাদে সে নিয়ে যায়। বলে "আমার ভাগ্য"।

দুদিনের জন্তও ভাগ্য অনুকূল বলে সে মনে করলে, যখন রামু কুলির মেয়ে মতিয়ার সাথে তার বিয়ে হল। রামু তার দুটো ঘরের একটা ছেড়ে দিলে কৈলাসকে। কটা দিনেরই বা কথা! কৈলাস কাজ সেরে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরে। মতিয়া তার দিকে চায় আর অকারণ হাসিতে ফেটে পড়ে। কৈলাস এলেই সে তার মজুরীর পয়সা কেড়ে নেয়! মতিয়া মদ খায়। এটা সে তার বাপ মায়ের কাছে শিখেছে। মাঝে মাঝে কৈলাসকেও টানাটানি করে, কিন্তু কৈলাস ও জিনিষটা সইতে পারে না। তবু সে চুপ করেই থাকে। মতিয়া তাকে পছন্দ করে না। অবশেষে দুবছর যেতে না যেতে মতিয়া একদিন ফকিরা কুলির যোয়ান ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে গেল। কৈলাসের জন্ত রেখে গেল একটা এক বছরের শিশু। এত বড় অঘটনেও কেউ কৈলাসের মুখে কোন অভিযোগ শুনলে না। রোজকার মতই সে কাজে যায়, ছেলেকে তুলে নেয় বুকে, কাছে কাছে রাখে তাকে।"

এবার কৈলাসের মনে হতে লাগল, 'স্বর্গের উকীল তো আমার কথাই বলছেন।'

"তারপর কৈলাসের সেই ছেলে বড় হল। যোয়ান বলে কুলি বস্তিতে তার সুখ্যাতি রটল। কৈলাস ছেলের এই সুনামে সুখী হল, মনে মনে আশীর্ব্বাদ করলে তাকে। তারপর একদিন সেই ছেলে বাপকে বার করে দিলে বাড়ী থেকে। বুড়ো রামু নাতিরই পক্ষ নিলে। কৈলাস নীরবে বেরিয়ে গেল।

আবার আগের মত চলে তার দিন। এদিকে দেহে ধরেছে ভাঙন। কাজের তেমন সামর্থ্য নেই। রাজমিস্ত্রীরা গালাগালির মাত্রাটা তাই বাড়িয়ে দিলে। কৈলাস কিন্তু টুঁ শব্দটি করে না, নিঃশব্দে কাজ করে যায়। অবশেষে 'ভারতের বাণী'র নূতন বাড়ীতে তার পৃথিবীর পালা শেষ হল। মৃত্যুশয্যাতেও সে মানুষ বা ভগবানের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করে নি।" এই বলে তার পক্ষের উকীল তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

এইবার সরকার পক্ষের উকীল উঠলেন। কৈলাস ভয়ে কাঁপতে লাগল—"ইনি আবার কি বলবেন কে জানে!"

সরকারী উকীল বললেন "আজকের বিচারে আমি কিছু বলব না। কৈলাস সারাজীবন নীরবেই কাটিয়েছে, আমিও আজ নীরব থাকব।"

দেবসভা নারব, নিস্তব্ধ। প্রধান বিচারপতির রায় শোনবার জন্ত সকলেই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। প্রধান বিচারপতির ঘোষণা এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে। আজ তাঁর কণ্ঠে গুরুগম্ভীর ধ্বনি নেই। মায়ের মত স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তিনি বললেন—"কৈলাস তুমি পৃথিবীতে পেয়েছ শুধু নির্য্যাতন। তবুও প্রতিবাদে একটি কথাও বল নি। পৃথিবীতে তোমার এই মহত্বের মূল্য কেউ বোঝে নি; কিন্তু এই সত্যের জগতে তুমি তোমার পুরস্কার পাবে। ত্রিদিবের বিচারালয় তোমার বিচার করবে না; তোমাকে কোন দণ্ড বা পুরস্কার দেবে না। এখানের সব কিছুই তোমার উপভোগের জন্ত। স্বর্গের সুধাভাণ্ডারের দ্বার তোমার কাছে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। যা তোমার ভাল লাগে তুমি তাই নিতে পারবে।"

এইবার কৈলাস মুখ তুললে, চারিদিকে চেয়ে দেখলে সে। আলোর ছটায় চোখ তার ধাঁধিয়ে গেল। অতি ভারুকণ্ঠে তখন সে বললে "সত্যিই আমি যা চাইব তাই পাব?"

বিচারপতি বললেন—"হ্যাঁ, সত্যই তাই পাবে। এ সমস্তই তোমার। আলোর যে অপূর্ব্ব ছটা তুমি দেখছ তা তোমার মহৎ অন্তরের প্রতিচ্ছবি। এখানে তুমি তোমার নিজস্ব জিনিষ দেখতে পাচ্ছ।"

কৈলাস আবার জিজ্ঞেস করলে—"সত্যি!"

দেবসভার চতুর্দ্দিক থেকে উত্তর এল—"সত্য, সত্য, সত্য।"

এতক্ষণে কৈলাসের মুখে হাসি দেখা গেল। আনন্দে ফেটে পড়ে বললে সে—"তাহ'লে রোজ আমি পেট ভরে খেতে চাই—রোজ দুবেলা।"

আধুনিক কৃষি ও আমাদের সমস্যা

শ্রী রবীন্দ্রনাথ রায়

সভ্যতার গোড়ার ইতিহাসে খাদ্য সংস্থানই প্রধান অধ্যায় অধিকার করিয়া রহিয়াছে; প্রকৃতির আদুরে দুলাল মানুষ, খাদ্যের স্বল্পতার সাথে সাথে পুরাতন নীড় পরিত্যাগ করিয়া অজানার পথে পাড়ি দিয়াছে বহুবার, এইভাবেই এক দেশের মানুষ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিহাসের কদর্য্য মারামারি হানাহানির তলায় সুলভে খাদ্য পাইবার চেষ্টাই সর্ব্বত্র। খাদ্যের জন্য খুনোখুনি পরস্বাপহরণ প্রকার-ভেদে আজও আসর সরগরম করিয়া রাখিয়াছে।

প্রকৃতিজাত ফলমূল কিম্বা আমমাংস-ভোজী মানুষ ধীরে ধীরে শস্যোৎপাদন সুরু করিল কবে এবং কোথায়, ইতিহাস তাহা লিখিয়া না রাখিলেও শস্যোৎপাদন ও হল চালনারত অনেক রাজন্য ও ঋষির বর্ণনা বৈদিক গ্রন্থাবলীতে প্রচুর পাওয়া যায়। রাজর্ষি জনকের হলের সীতায় যাঁহাকে পাওয়া গিয়াছিল তিনিই আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীরাম-বনিতা জানকী। পরবর্ত্তী যুগের হলযন্ত্রধারী বলরাম এই রামচন্দ্রের অপর-রূপ বলিয়া বিদিত। এই সাথেই পাই কৃষির দেবতা গোবর্দ্ধনধারী কৃষ্ণকে। গোয়ালার ঘরেই তাঁহার বিহার। মানুষের যন্ত্রবলের আদিম প্রতীক বলরামের অস্ত্রই লাঙ্গল। জননী বসুমতী সতত কম্পিতা এই যন্ত্রের ভয়ে; পরিবর্ত্তে দিতেন অকুণ্ঠচিত্তে অপরিমিত অন্ন, ফল, ফুলহার। কালের অমোঘবিধানে কৃষিক্ষেত্রের কোনও স্থানে আজ বলরামের দেখা পাওয়া দুর্ঘট, জননী বসুমতী অকর্ম্মণ্য সন্তানের পানে ফিরিয়াও চাহেন না, কোন মা'ই বা অকৃতজ্ঞ সন্তানের জন্য ব্যস্ত! বলরাম চলিয়া গিয়াছেন সাগরপারে, অস্ত্রে যেখানে তেজ প্রচুর। আমেরিকা ও রাশিয়া আজ বলরামের তুষ্টির জন্য তাল ঠোকাঠুকি সুরু করিয়াছে। অর্থ ও স্বপ্নের অসম প্রতিযোগিতার ফলে "দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠ্‌লো, তাঁর নুতন হলের স্পর্শে অহল্যা ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।" * ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ায় যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে ওদেশে শতকরা নিরানব্বইজন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চোখেও দেখে নি; "তারা সেদিন আমাদের চাষীদের মতন সম্পূর্ণ দুর্ব্বলরাম ছিল,·নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্ব্বাক। আজ (১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে) দেখতে দেখতে এদের ক্ষেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে, আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব, আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।" "কিন্তু শুধু যন্ত্রে কাজ হয় না, যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে উঠে।" "এদের ক্ষেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে এগোচ্ছে।" (১)

আমাদের দেশের মতন রাশিয়াও ছিল সকল বিদ্যার মতন কৃষি বিদ্যায়ও অনগ্রসর। নেতারা যখন দেখিলেন যে কৃষি বিদ্যাকে এগিয়ে না দিলে দেশের যাবতীয় মানুষকে বাঁচানো যাবে না, তখন তাঁরা এ দারুণ পণ করিলেন—পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের চেহারা যাহাতে ফিরি যায় তাহার বন্দোবস্ত হইল। সকল রকম শিক্ষার ব্যবস্থা হইল সমস্ত জাতি দুঃসাধ্যসাধনের তপস্যায় নিযুক্ত হইল। এই সাধনা চো না দেখিলে 'আমাদের মতন দুর্ব্বলরামের হৃদয়ঙ্গম হওয়া দুঃসাধ্য বিশেষতঃ আমরা যেখানে দেখ্‌তে অভ্যস্ত মোটা মাহিনায় সিভি সার্ভিসের আমলা দিয়ে অফিস দুরস্ত রাখা। নূতন কোন পরিকল্পনার বরাদ্দ মোট টাকা—মোটা আমলা ও তাঁর অফিসের ঠা বজায় রাখ্‌তে খরচ হয়ে যায়—পরিবর্ত্তে নূতন·কোনও সমাধান না পে পাই, ফাইলের গহনারণ্যে সমাধিলাভ করিবার জন্য নূতন আর এক সাম্বৎসরিক রিপোর্ট। তাই শত-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরে আমাদের দেশ রহিয়াছে যে তিমিরে সেই তিমিরে। আজ পাঁচ বছ ধরে চেষ্টা চলেছে দেশের শস্য চাষীদের নিকট হইতে সংগ্রহ ক গুদামজাত রেখে সারাবছর ধরে সাধারণ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া; কি আমরা কী দেখছি কত কোটী কোটী টাকার বাৎসরিক অপচয়! কি রাশিয়া দশবৎসরের মধ্যে শিক্ষায়, কৃষি বিদ্যায়, চিকিৎসা বিজ্ঞা বিজ্ঞান চর্চ্চায় এত এগিয়ে গিয়েছিল যে পৃথিবীর অগ্রগামী অন্যা দেশের তাক লাগিয়া গিয়াছিল। সে দেশে দেখা যায় যাঁরা যোগ্য লো তাঁহারা সকলেই নানান কাজে লেগে গিয়েছিলেন, যাঁরা বৈজ্ঞানিক তাঁরা বিজ্ঞানের খুঁটিনাটির বিলাসে ডুবিয়া না থাকিয়া যাতে সত্বর গো দেশটা এগিয়ে যায় তার জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর ফলে এ কৃষি চর্চ্চা বিভাগে এত উন্নতি ঘটেছিল যে তার খ্যাতি জগতে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মহলে ছড়িয়ে পড়ে ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। এক বী বাছাইএর কথাই ধরা যাউক। আমাদের দেশে সরকারী বীজে প্রায় গাছ জন্মায় না, সময় সময় যব লাগিয়ে ঝরা-ধান উৎপন্ন হয়। আজ দু তিন বছর, থেকে আলুর বীজ নিয়ে কি হৈ হৈ চলছে তা সকলেরই জা আছে, অথচ রাশিয়ায় দারুণ খাদ্য সঙ্কটের মধ্যেও দশ বছরের চেষ্টা তিন কোটী মণ বাছাই করা আলুর বীজ ওদের হাতে জমেছিল। এ ছাড়া ওদের কেবল চেষ্টা নূতন নূতন ফসল তৈয়ারী করা; পাহাড় পর্ব্বত কিম্বা জলা ভূমিতে যেখানে পূর্ব্বে কোনও শস্য পাওয়া যেত না, সেখানে যাহাতে প্রচুর দেশোপযোগী শস্য উৎপন্ন করা যা তাহার কী বিপুল চেষ্টা। এই চেষ্টা আমাদের দেশের মতন শু কৃষি কলেজের প্রাঙ্গণে সীমাবদ্ধ থাকে নাই, দ্রুতবেগে সমস্ত দে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষি সম্বন্ধে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশাল আজারবাইজান, উজবেকীস্থান, জর্জ্জিয়া, য়ুক্রেন প্রভৃতি রাশিয়ার প্রত্য প্রদেশেও স্থাপিত হইয়াছে। মধ্য রাশিয়ায় পূর্ব্বে গম জন্মিত ন

---

(১) রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি দ্রষ্টব্য।

চাষীর ভাগ্যে গমের রুটী এক অত্যন্ত বিলাসী খাদ্য ছিল, বিজ্ঞানের সহায়তায় এই আবহাওয়ার উপযুক্ত গম গাছ উৎপন্ন করায় আজ এই দেশের ইতর ভদ্র সকলেই গমের রুটী খেতে পাচ্ছে। বিজ্ঞান এখানে আরও অদ্ভুত কাজ করিয়াছে, গমের চারার সহিত বন্য ঘাসের মিলন করাইয়া এখানে দীর্ঘজীবী গমগাছ উৎপন্ন করা হইয়াছে। এই রকম গমগাছে ৭।৮ বৎসর ফসল পাওয়া যাবে। সাইবেরীয়ার যেখানে খুব ঠাণ্ডা, তাপ মাত্রা ৯ ডিঃ পর্য্যন্ত নেমে আসে, সেখানেও চাষ যোগ্য বার্লি, ওট, আলু, কপি প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে। ওর্কনিকিজের সম্মিলিত কৃষি প্রতিষ্ঠানে এক একর জমিতে ২২ টন বাঁধা কপি পাওয়া গিয়াছে। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এখানে শস্যোৎপাদন কল্পনাতীত ছিল। আমাদের জানা আছে, ভাল তুলার চাষ শীত প্রধান ও আর্দ্র স্থানে সম্ভব নহে। আজ রাশিয়ায় ইহাও অসম্ভব করিয়া য়ুক্রেনের যে জায়গায় তাপ মাত্রা ৪০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামে সেখানেও মিশরীয় কার্পাসের চাষ হইতেছে। বস্তুতঃ কোন জায়গার কি অভাব, কোন সার দিলে জমির ক্ষতি না করিয়া প্রচুর ও স্থায়ী শস্য পাওয়া সম্ভব হয় তাহার জন্য সেখানে বিজ্ঞানশালা ও কৃষিশালায় প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। নানা রকম নূতন নূতন সার, বিজ্ঞানী তৈয়ারী করার সঙ্গে সঙ্গেই জমির উপরে তার ক্রিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশের জমি ও আবহাওয়া পৃথক বলিয়া পৃথক পৃথক সার তৈয়ারী হইতেছে। বিভিন্ন হ্রদ ও জলাশয়কে জলসেচ প্রণালীতে যোগাযোগ করিয়া, দেওয়ায় শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় সমানভাবে জল বিতরণ ব্যবস্থা যেমন সুষ্ঠু হইয়াছে, তেমনি বিভিন্ন দেশের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছে। আলতাই উপত্যকার পুরাতন নাম ছিল "মৃত্যু উপত্যকা" ; আজ সেখানে নৌবহর নির্ম্মাণের কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। কৃষ্ণ সাগর, কাস্পিয়ান উপসাগর হইতে বৈকাল হ্রদের দূরত্ব আজ অভিধানের "অসম্ভব" কে অনায়াসলব্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। ১৫ বছর আগে দশ লক্ষ অধিবাসীর মরু দেশ তুর্কোমেনিস্থানএ সকল রকম বৈজ্ঞানিক কলাশালা ও বিদ্যায়তন স্থাপনের সংকল্প পাঠে ছয় কোটী অধিবাসীপূর্ণ শস্যশ্যামলা বাংলা দেশের দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত অর্দ্ধমৃত বাঙ্গালী যুবকের মাথা লজ্জায় ও বেদনায় নুইয়া পড়ে মাত্র।

আমাদের দেশে একটী কেন্দ্রীয় কৃষিগবেষণাগার আছে, কিন্তু কৃষকের ইহার সহিত কোনও যোগাযোগ নাই, যোগাযোগ থাকাও সম্ভব নহে। গবেষণাগারের গবেষণা ইংরাজীভাষায় মূল্যবান কাগজে প্রকাশিত হয়। যে দেশের শতকরা মাত্র ১১ জন লোক অতিকষ্টে মাতৃভাষায় নাম সহি করিতে সক্ষম, সেই দেশের অজ্ঞ ও দরিদ্র কৃষক উক্ত মূল্যবান পত্রিকার রসাস্বাদন করিতে পারিবে ইহা নির্ব্বোধের অমূলক কল্পনামাত্র। ১৩৫১ সালের (ইং ১৯৪০) রোটারী ক্লাবের বার্ষিক বক্তৃতায় বাংলাদেশের তৎকালীন গভর্ণর মাননীয় মিঃ কেসী জমির অদ্ভুত উর্ব্বরতাশক্তি সত্ত্বেও বাংলার অর্থনৈতিক দুরবস্থা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিঃ কেসী সম্ভবতঃ জানিতেন না যে ইংরাজের সুশাসনে আসিবার পরে এই বাংলাদেশের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস হইয়াছে এবং কৃষি হইয়াছে বাঙ্গালীর জীবিকা অর্জ্জনের একমাত্র প্রধান অবলম্বন। এই কৃষিও আবার বরুণদেবের কৃপার উপর নির্ভরশীল। অথচ চিরদিনই বাংলার ধন ঐশ্বর্য্য আগন্তুকদের মনে কল্পনার ষড়ৈশ্বর্য্যের দ্বার খুলিয়া দিত। এই দেশের প্রায় ৫ কোটী অধিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা চাষে নিযুক্ত থাকিয়াও ৬ কোটী বাঙ্গালীর একবেলার পুরাখাদ্য জোটাইতে পারে না, কিন্তু আমেরিকা কত কম লোকে, কত কম জমি চাষ করিয়া নিজের জন্য অঢেল খাদ্য রাখিয়া পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। হেষ্টিংসের আমল হইতেই আমাদের দেশের শাসনধারা আমাদের জন্য না হইয়া, আমাদিগকে নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিবার যে রীতি চালু হইয়াছে, তাহা আজও অব্যাহত, মিঃ কেসীর শাসনকালেও তাঁহারই উজীর সম্প্রদায়ের মিলিত প্রচেষ্টায় এক নৌকা নির্ম্মাণ খাতেই ৭ কোটী টাকা অপব্যয়ে হেষ্টিংসী শাসন ব্যবস্থার বনেদী ধারার অক্ষুণ্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। (২) এই নৌকা পর্ব্বের ১ বছর পূর্ব্বে নৌকা অপসরণ ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের কুকীর্ত্তি ও দেশবাসী ভুলিয়া যায় নাই, চল্লিশ লক্ষ দেশবাসীর তাজা রক্তদানে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। দুই শত বৎসরের সুশাসনে বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত মাছ ও দুধ আজ সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে অথচ বাংলার সোণার ক্ষেত্র, অবারিত মাঠ, নদনদী ও খালবিল বাঙ্গালীকে চিরকালই ভাত মাছ ও দুধ প্রাচুর্য্যের সহিত জোগাইয়া আসিয়াছে।

১৯৩১ সালের লোক গণনায় জানা যায় যে আমাদের দেশের শতকরা ৮৭ জন লোক কৃষিকাজে নিযুক্ত। সারা বৎসর সকল জায়গায় কৃষকের কোনও কাজ থাকে না, কোন কোনও স্থানে কৃষকের কাজ বৎসরে তিন মাসও থাকে না, বৎসরের বাকী নয় মাস কৃষির কোনও কাজ না থাকায় স্থানীয় লোকদিগকে নানারকম অসামাজিক কাজে লিপ্ত দেখা যায়। প্রায়ই দেখা যায় এক-ফসলী অঞ্চলের লোক দাঙ্গা, মারামারি-ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় যথেষ্ট সময় ও অর্থ নষ্ট করিয়া থাকে। অথচ প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই কৃষি ব্যতীত কিছু না কিছু কুটীর শিল্প এদেশে ছিল। চরকায় সুতাকাটা থেকে পশমী, রেশমী ও সুতী বস্ত্রবয়ন, তুলা পেঁজা, গরু ছাগল ও মুরগী পালন, মাদুর, ঝুড়ি ও দড়ি তৈয়ারী, ধানভানা, তৈলবীজ পেষণ, গুড়, চিনি ও লবণ তৈয়ারী, মাটীর বাসন হইতে কাঁসা, রূপা, সোণা ও হাড়ের তৈজসপত্র এবং নবশাখদের নানা শিল্পসম্ভার গ্রামেই তৈয়ার হইত। সাধারণতঃ বিলাতী জিনিষের অসম প্রতিযোগিতায় উল্লিখিত অনেক শিল্প লুপ্ত হইয়াছে। তার পরেও মৃতপ্রায় যেগুলি ছিল তাহাও স্বদেশী মিলের কল্যাণে পাততাড়ি গুটাইয়া ফেলিতেছে। ইহার ফলে ১৯৩১ সালের লোক গণনায়, বাংলায় প্রায় ১½ কোটী নরনারীর শতকরা ৬০ জনকে শিল্পী বংশোদ্ভব

(২) বাজেট বক্তৃতা ১৯৪৫-৪৬, শাহ সৈয়দ গোলাম সারোয়ার, আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী, এবং মৌলানা আবদুল রেজ্জাকের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

হওয়া সত্ত্বেও কৃষি কাজে নিযুক্ত থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। জমির উপর এই প্রচণ্ড চাপ পড়িলেও জমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধির কোনও ব্যবস্থা হয় নাই বরং ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া চলিয়াছে, বংশ পরম্পরায় একমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল ৬ কোটী লোকের অবস্থা অবর্ণনীয় দারিদ্র্যে পূর্ণ হইয়াছে। ১২ বিঘা জমির কমে একটী কৃষক পরিবারের সম্বৎসরের খোরাকী উৎপন্ন হয় না, অথচ বাংলায় হাজারকরা ৪১৯টী পরিবারের প্রত্যেকের সম্বল ৬ বিঘা, কিম্বা আরও কম জমি। ছয় থেকে বার বিঘা জমি আছে এইরূপ পরিবারের সংখ্যা সারা বাংলায় শতকরা মাত্র ৮টী, ফলে জমিহীন দিনমজুরের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৩১ সালে ভারতে দিনমজুরের সংখ্যা হাজারকরা ২৫৪ থেকে ৪১৭তে দাঁড়াইয়াছে। একমাত্র বাংলাদেশেই বিশ বৎসরে (১৯১১-১৯৩১) দিনমজুরের সংখ্যা ১৫৫০২০৪ হইতে ২৪৫৭৭৩৫এ দাঁড়াইয়াছে। (৩) বাংলার ন্যায় ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে জমির উর্ব্বরতা শক্তিও ভয়াবহরূপে কমিয়াছে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে শরীর দুর্ব্বল হইলে নানারকম ব্যাধিতে মানুষ যেমন আক্রান্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ উপযুক্ত সারবিহীন জমিতে কৃষি করিলে সবল ও সুস্থ গাছপালা ও উদ্ভিদ জন্মায় না। নীরস জমিতে প্রায়ই দেখা যায় একপ্রকার কীটে আক্রান্ত হওয়ায় উদ্ভিদ অকালে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে; ধান, আলু, ইক্ষু ও তামাকে এই ক্ষতিকর কীটের দৌরাত্ম্য কৃষকের খুবই জানা আছে। রোগের সহিত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অশিক্ষিত কৃষক ইহার কারণ ও নিদান ব্যবস্থা জ্ঞাত নহে। মানুষের শরীরে যেমন কতকগুলি মৌলিক পদার্থের অভাব হইলে ক্ষয়রোগ জন্মিয়া থাকে, কিম্বা আলো বাতাসহীন সেঁতসেঁতে স্থানে বাস করিলে নানারকম রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়, উদ্ভিদের বেলায়ও এই কথা চরম সত্য। আলো বাতাসহীন, খাদ্য-বিহীন শুষ্ক জমিতে সুস্থ স্বাস্থ্যসম্পন্ন শস্য আমরা কি করিয়া আশা করিতে পারি?

একই জমিতে পুনঃ পুনঃ সার না দিয়া চাষ করার ফলে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ নিম্নের তালিকা হইতে বোঝা যাইবে। ভারতের অপরাপর প্রদেশেও ঠিক এই কারণে উৎপাদিকাশক্তি ভয়াবহরূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে:—

চাউল উৎপাদন (একর প্রতি পাউণ্ডে হিসাব)

	বাংলা	বিহার	মধ্য প্রদেশ
১৯৩১-৩২	৯৬১	৯১২	৭১৮
১৯৪০-৪১	৬৫২	৫১৯	৪৯৯

এই প্রসঙ্গে ভারতের উৎপাদিকাশক্তির সহিত পৃথিবীর অপরাপর দেশের হিসাব তুলনা করা যাইতে পারে।

চাউল (একর প্রতি পাউণ্ডে)

স্পেন	...	৫৫৪২
মিশর	...	৩৭১৯
ইটালী	...	৪৭৪৩
জাপান	...	২৯৯৮
আমেরিকা	...	২১৮৫
চীন	...	২৪৩৩
ভারতবর্ষ	...	৮২৮

গমের হিসাব ধরিলেও সেই একই কথা, ভারতে গম উৎপাদনের পরিমাণ মিশরের তিনভাগের একভাগ এবং ইংলণ্ড ও ডেনমার্কের পাঁচভাগের একভাগ। এদেশে আখের উৎপাদন জাভার তিনভাগের একভাগ এবং তুলা জন্মে মিশরের পাঁচভাগের একভাগ। অথচ ফ্রান্সের জমিতে যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হয় তাহা আমাদের দেশে সম্ভব করিতে পারিলে ভারতের আয় প্রায় ৬৬ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড, ইংলণ্ডের সমান করিতে পারিলে ১০০ কোটী পাউণ্ড এবং ডেনমার্কের সমান করিতে পারিলে ১৫০ কোটী পাউণ্ড, অর্থাৎ ২২৫০ কোটী টাকা হইতে পারে। এই সংখ্যাতত্ত্ব অনেকের নিকটে অলীক বলিয়া মনে হইলেও ইহা সত্য। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারী কমিটীতে স্যার ম্যাকডুগাল এই হিসাব দিয়াছিলেন। (৪) ১৯৪০ সালে ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টেও বলা হইয়াছে যে বাংলাদেশে চাউলের উৎপাদন অপরাপর দেশের চেয়ে কম ত বটেই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষাও কম। বহুকাল হইতে সার ব্যবহার না করার জন্যই কি সারা দেশের এই অবনতি হইয়াছে? সার অব্যবহার আংশিক সত্য হইলেও বিশেষজ্ঞদের মতে নদনদীর অব্যবস্থা এবং জলপ্লাবন অন্যতম কারণ।

অতীতকালে আমাদের মত নদনদীবহুল দেশে অত্যধিক সার ব্যবহারের প্রয়োজন কোন দিনই অনুভূত হয় নাই। বরং সুদূর পৌরাণিক যুগ হইতেই গোপালন ও কৃষি-বৃত্তি হিসাবে পাশাপাশি চলিত থাকায় গোময় ও গোমূত্র পচা লতাপাতার সহিত সার হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া প্রাচীনতম প্রথা। উদ্দালক ও অরণি শীর্ষক প্রবন্ধাদি হইতে সুদূর অতীত যুগেও বুদ্ধিজীবী ও যুব সম্প্রদায়কে কৃষি ও গোপালনের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই প্রবন্ধের গোড়ায় বর্ণিত গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণকে এবং হলধারী বলরামকে গো ও কৃষিসভ্যতার অঙ্গাঙ্গী সহোদর ভ্রাতারূপে পাইয়াছি। চিরসবুজের দেশে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম-নন্দের-নন্দন—সখা, প্রেমিক ও দেবতারূপে পূজিত হইয়াছিল।

কথিত আছে, জননী আদ্যাশক্তি গোদেহে অবস্থান করেন এবং নিখিল সৌন্দর্য্য ও সুষমার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীর চিরআবাস গাভীর মল ও মূত্রে; বৈদিক যুগপূর্ব্ব আর্য্যগণ কৃষিজীবী হইবার পূর্ব্বে প্রথমে ছিলেন পশুজীবী, তাই ভারতীয়ের অর্থনীতিতে গরু ছিল প্রধান সম্পত্তি ও জীবন ধারণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ক্রমে এই ধারণা নিছক-রূপক হিসাবে ভারতীয় সভ্যতায় নিগূঢ় অর্থে গৃহীত হইলেও আধুনিক কৃষকের অর্থনীতিতে গরু আজও অতুলনীয়। পাশ্চাত্য

ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

সভ্যতা-অভিমানী ভারতীয়ের তীর্থ—মক্কা বা কাশী—য়ুরোপের, গরু, কৃষি ও কৃষকের অবস্থা আমাদের গরু, কৃষি ও কৃষকের তুলনায় কত শ্রেষ্ঠ। উপযুক্তভাবে রক্ষিত গোময়, গোমূত্র ও পচা লতাপাতাকেই বর্ত্তমান পণ্ডিতেরা compost আখ্যা দিয়া পংক্তিভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দরিদ্রদেশে গোবর অনেক ক্ষেত্রেই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলিয়া আমাদের দেশের জমি এই মূল্যবান সার হইতেও বঞ্চিত হইতেছে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির দ্বিতীয় প্রাচীন উপায়, মৃত জীবজন্তুর হাড়চূর্ণ মাটীর সহিত মিশ্রিত করা। অবস্থার বিপাকে আজ এই হাড় ও হাড়চূর্ণ নিঃশেষে জাহাজ ভরিয়া বিদেশের মাটীতে সোণা ফলাইবার জন্য প্রেরিত হইতেছে। প্রাকৃতিক অবস্থাকে অনুকূল করিয়াও জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। বর্ষার সময় ঘোলা জলরাশি খাল, বিল, নদী নালা বাহিয়া মাঠএর উপর দিয়া প্রবাহিত হইলে জমির উপরে একদফা পলি রাখিয়া যায়। এই পলিমাটী জমির অশেষ উৎকর্ষ বিধান করিয়া থাকে। যুগ যুগান্তর হইতেই গৃহপালিত পশুর গোময়, মৃত জীবজন্তুর হাড়গোড় ও এই পলিমাটী আমাদের দেশের জমির অশেষ কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধির কাজ করিত। নানা কারণে এই তিন ব্যবস্থার অপকর্ষ ঘটিবার জন্যই এই দুর্দ্দৈব আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রথমতঃ রাজশক্তি বৈদেশিক হওয়ার পর হইতেই নদী শাসন ও জলসেচন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নৈসর্গিক ও ভৌগলিক অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় পুনঃ পুনঃ জলপ্লাবনে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি দূরের কথা, অতিরিক্ত মৃত্তিকাক্ষয় জনিত (৫) পলিমাটীর স্থলে বালুকায় জমির ক্ষতি সাধিত হইতেছে। নদনদীর খাতের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনে দেশের অভ্যন্তরে বড় বড় বিল ও বদ্ধ জলাশয় সৃষ্টি হইয়াছে। পুরাতন খাতের গভীরতা হ্রাস পাওয়ায় সামান্য বর্ষার জলে দুকূল প্লাবিত হইয়া শস্যহানি ও গৃহপালিত পশুর মৃত্যু হওয়ায় গোটা দেশ দারিদ্র্যের চরমে উপস্থিত হইয়াছে। খাল বিলের বদ্ধ জলে ওলাউঠা, ম্যালেরিয়ার নিত্য বসতি। এইভাবে সকল কিছু মিলিয়া সারাদেশ দারিদ্র্য, দৈন্য, স্বাস্থ্যসম্পদ-বঞ্চিত ভবিষ্যৎ আশাসহায়হীন মৃতজাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

এই চিরদরিদ্র কৃষক ও কৃষির উপর নির্ভরশীল গোটা জাতিটাকে বাঁচাইতে হইলে প্রথমেই চাই নদী-শাসন। বরুণ দেবের উপর নির্ভরশীল কৃষিকে নিদাঘের আতপতাপ কিম্বা বর্ষার প্লাবন হইতে রক্ষা করিতে হইলে নদী-শাসনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বর্ষায় জলরক্ষার জন্য প্রয়োজন—বিশাল জলাধার নির্ম্মাণ। নদীর উৎপত্তিস্থলের নিকটবর্ত্তী স্থানে এই সকল জলাধার নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন হইবে। বছরের যে কয়মাস খালবিল বরুণ দেবের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইবে তখন এই জলাধার হইতে জল সরবরাহ করা হইবে। সারা দেশ জলসেচ প্রণালীতে সংযুক্ত হইলে জলাধারের জল নদনদী, খালবিল, ও জলসেচ প্রণালীর মধ্য দিয়া দেশের চাষোপযোগী জমিতে প্রবাহিত হইলে জলাভাব ঘটিবে না। অতিরিক্ত জলপ্লাবন বন্ধ হইলে কেবলমাত্র শস্যহানি কিম্বা পশু মৃত্যু নিবারিত হইবে না, তীব্র প্লাবন জনিত জমির উপরস্তরের ক্ষয় নিবারিত হইবে এবং নদীগর্ভ-প্লাবিত বালুকাচ্ছাদন বন্ধ হইয়া জমি চাষের অযোগ্য ও অনুর্ব্বর হইয়া পড়িবে না। এই সকল জলাধারে উৎপন্ন প্রচুর মৎস্য আমাদের মাছের দুর্ভিক্ষ চিরকালের জন্য বন্ধ করিতে সমর্থ হইবে। জনকল্যাণকামী শাসক ও জনসাধারণের সহযোগিতায় নদী শাসন, জলসেচন এবং জলাধার নির্ম্মাণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে প্রকৃতির উপরে বিজ্ঞানের অভিযানের দ্বিতীয় পর্য্যায় সুরু করা সম্ভব হইবে। জলাধার হইতে প্রস্রবণের ন্যায় জলধারা সারা বৎসর প্রবাহিত হইবার সময় যে স্রোত উৎপন্ন হইবে তাহার সাহায্যে বৈদ্যুৎ তৈয়ারী পরিকল্পনা সম্ভব হইবে। য়ুনাইটেডষ্টেট্সে T. V. A, এই উপায়ে বহু কোটী টাকা মূল্যের বৈদ্যুৎ উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছে। সস্তা বিদ্যুতের সহিতই জড়িত নানা ব্যবসাবাণিজ্যের পত্তন। টেনেসী নদীর উপত্যকায় আজ হাজার হাজার কারখানা স্থাপিত হওয়ার আসল কারণ, এখানের সস্তা বিদ্যুৎ প্রবাহ।

টেনেসী নদী আমাজন নদীর চেয়ে বিশাল না হইলেও ইহার বাৎসরিক শস্যহানি, প্রাণধ্বংসী শক্তি ও বীভৎসতা যে প্রতিষ্ঠানের বিপুল উদ্যমে ও বহু কোটী টাকা ব্যয়ে নিবারিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত নাম হইল T. V. A. এই টেনেসী নদী শাসিত হইবার অনতিকাল মধ্যেই বন্যাবিধ্বস্ত বিরলবসতিসম্পন্ন জনপদে শুধু বৃহৎ শিল্পকলাশালাই প্রতিষ্ঠিত হইল না, উপত্যকাভূমির বাকী অংশ আদর্শ কৃষি প্রতিষ্ঠানে ভরিয়া উঠিল। ১৯৪৪ সালের মধ্যেই ৩২০০০ কৃষিশালা সমস্ত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কৃষিজাত দ্রব্যের ৫০ ভাগ সরবরাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গবেষণাগার, কৃষি কলেজ ও কৃষি উদ্যানের মধ্যে অমূল্য যোগাযোগ ও উন্নতি বিধানের জন্য এক যুগ্ম-সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সমিতির আন্দোলনে নূতন নূতন সারের প্রক্রিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য কেবলমাত্র রেল ভাড়ায় কৃষি উদ্যানকে সার সরবরাহ করিয়াছিল, এবং সারের দাম সরকার বিনা দ্বিধায় বহন করিয়াছিল। ১৯৪৪ সালে টেনেসী ভ্যালীর ৩২০০০ হাজার কৃষি উদ্যান ৬২০০০ টন বিবিধ সার কেবলমাত্র রেল ভাড়ায় পাইয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই গবেষণার ফলাফলে সারের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছে। সকল জায়গার কৃষকই আমাদের দেশের মত সনাতন পদ্ধতির উপরে বিশ্বাসী। পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষা, আন্দোলন এবং প্রচারের দ্বারা কৃষকের সনাতন মনকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী গ্রহণে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

---

(৫) সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় মৃত্তিকাক্ষয় প্রতিরোধের জন্য কমিশন বসিয়াছে।

রূপান্তরিতা

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

ব্যাপারটা বেশ ঘোরালোই হয়ে উঠেছে !···

বিনয় উঠানে লাট্টুটা ঘোরাবার বৃথা চেষ্টা করছে, কিছুতেই হচ্ছেনা ···লেত্তিটা জোরে পাক দিয়ে মাটিতে ছুঁড়েছে···এবারও তাই···ঠিক তাই নয়···ছোটদি যাচ্ছিল ও ঘরে, লাগবি ত লাগ ঠিক তারই পায়ে।

আর যায় কোথা···প্রতিমাও অমনি লাট্টুটা নিয়ে কুয়োর দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। বিনয় ও ছাড়বার পাত্র নয়··কথা কাটাকাটির পর··· ছোড়দির চুলের মুঠি ধরে টানাটানি সুরু করেছে···প্রতিমাও কিল চাপড় বৃষ্টি করে চলেছে ! উভয়ের চীৎকার···যেন একটা খণ্ডপ্রলয় বেধেছে···

মা এসে ছাড়িয়ে দিলেন। বিনয় রুদ্ধনিশ্বাসে গর্জ্জন করে···"একটু লেগেছে পায়ে···তাই বলে একেবারে কুয়োর জলে ফেলে দেবে ! বেশ করেছি চুলের মুঠি ধরেছি !"

মা প্রতিমাকে বকতে থাকেন···"দিন দিন তোর জ্ঞান বাড়ছে··· ছোটছেলে সাধ করে ত আর তোর পায়ে মারেনি ! মেয়ে মানুষের অত তেজ ভাল নয় ! পরের ঘরে গিয়ে চলবে কি করে !"

প্রতিমা গজরাতে গজরাতে চলে যায়—"ভারী আমার আদরের ছেলে···।" বিনয়ের কান ধরে মা বারকয়েক নাড়া দিয়ে বলে ওঠেন— "পাজি ছেলে দিদির গায়ে হাত তুলতে বাধে না ! আর কদিন মারামারি করবি ওর সঙ্গে ! ওত শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে দুদিন পর···তোদের বাড়ীতে কি আর থাকবে চিরকাল ! দিনরাত খুনসুটি আর ঝগড়া··· পড়াশুনো কি নাই তোর ? চল কাকার কাছে !"

বিনয় ধরাগলায় বলতে থাকে···"মেরেছি নাকি ? চুলের মুঠি ধরেছি শুধু···আর ওযে আমাকে মারলে, তার বেলায় কিছুই নয়···নোতুন বিয়ে হয়ে লায়েক হ'য়ে গিয়েছে···।" মা হাসি চাপতে পারেন না··· তবু তাকে ধমক দিয়ে পাঠাতে হয় বৈঠকখানার দিকে !

অবিনাশবাবু আজ মারা গেছেন কয়েকবৎসর হ'ল। গোলগাঁয়ের মধ্যে একজন সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন তিনি ! মৃত্যুর পর সংসারের ভার পড়ল ধীরেনের উপর ! প্রকৃতপক্ষে মা-ই হলেন সর্ব্বেসর্ব্বা···কোনরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে সংসারের চাকাটা চালাচ্ছেন···। ছোট মেয়ে প্রতিমার বিয়ে দিলেন হরিপুরে ! ছোটমেয়ে···কোনরকমে খুঁজে পেতে একটু ভাল ঘরেই বিয়ে দিয়েছেন !

গোপালনগরের চাটুয্যেরা ও অঞ্চলের জমিদার···বনেদীঘর···এককালে নামডাক ছিল খুবই ! এখন যদিও অবস্থা ভাঙ্গতি, তবুও মরাহাতী সওয়া লাখ গোছের কিনা ! প্রতিপত্তিটা আছে···আর আছে পুরোনো ···সেকেলের বিরাট বিরাট পরিত্যক্ত বাড়ীগুলো···খিড়কীর ভাঙ্গা পাচীল ঘেরা পুকুর···বিরাট খিলানের ফাটলের উপর গজান বট-তেঁতুলের গাছ···

চণ্ডীমণ্ডপ···রাসমঞ্চ···দোলবাড়ী—কোনরকমে জোড়াতাড়া দিয়ে চালান হচ্ছে···কিন্তু নামটা আছে 'আর কুমীর নামক জলজন্তুটির মত 'হাঁ' খানি ও বর্ত্তমান। ছেলে কোন স্কুলে পড়ে···সেকেণ্ডক্লাসে··· তাতেই চার হাজার। তারপর বরাভরণ জোড়-অঙ্গুরী···ইত্যাদি।

ধীরেন বাধ্য হয়েই মত দিয়েছিল···মায়ের জন্যে। ছোট মেয়ে, মায়ের আদর সে একটু পায়, তার উপর আবার পিতৃহীন। প্রতিমার গোপালনগরেতেই বিয়ে হল···সবে মাস তিনেক হয়েছে··· জমিদার ঘর, দেওয়া থোওয়াও তারা করেছে বেশ।

যাক এ কথা। দুপুর বেলা···সূর্য্যের তেজে চারিদিক উত্তপ্ত। বৈশাখের প্রথম ! আকাশ ফেটে যেন রৌদ্রের তেজ বার হচ্ছে। উঠানটার উপর লম্বা হয়ে পেঁপে গাছটার ছায়া পড়ে আসছে··· গাছে দু একটা পেঁপে রং ধরেছে···থেকে থেকে এক ঝলক বাতাস··· আগুনের হলকার মত উত্তপ্ত···বয়ে আসছে মাঠের দিক থেকে··· পুকুরের তেঁতুল গাছটার উপরে কয়েকটা হনুমান বসে আছে অলসভাবে···

···প্রতিমার ঘুম আসে না···"ছোটদি···এই ছোটদি"···বিনয় বাইরে থেকে চাপাগলায় ডাকছে—"এই দেখ—"এক কোঁচড় কাঁচা আম বার করে। "বাটবি—চল রান্নাঘরের দাওয়ায় শীলটা আছে"···প্রতিমা তাড়াতাড়ি আমগুলো নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে।

—"তুই একেবারে বোকা ছোটদি। খোসা গুলো না ছাড়ালে কস্‌টা লাগবে ! বিয়ে হলে লোকের কত বুদ্ধি হয়। তোর এক কড়াও···"

"থাম্—থাম্···নে···ও গুলো দে··· হ্যারে পাঠশালা থেকে পালিয়ে এসেছিস না···। ও মা···কি ছেলেরে তুই।"

"চুপ কর না। বাগান থেকে নিয়ে এলাম পেড়ে—একেবারে মগডালে ছিল—ওই চালুনী গাছটার।"

···প্রতিমা বেটে চলেছে···বিনয় লোভ সামলাতে না পেরে দু এক টুকরো আধবাটা নুন মরিচ লাগান আম চাপতে থাকে।

"হ্যারে ছোটদি···তোর শ্বশুর নাকি খুব বড় লোক, নয়। সেদিন হরিকাকা বলছিল যে, আগেতে অনেক ঘোড়া ছিল !···উঃ ঝাল দিইছিস !···একটা মাটির তলায় নাকি ঘর আছে···অনেক নীচে অন্ধকার ঘুটঘুট্টি।"

আর কথা বলা হল না। কাকার খড়মের শব্দশুনে তাড়াতাড়ি শিলটার উপর থেকে একখামচা আধবাটা আম নিয়ে ছুটে পালাতে যাবে কুয়োতলার দিকে···এদিকে মায়ের গলার শব্দ···

ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছে···সর্ব্বনাশ ! এদিকে কাকা···ওদিকে মা··· পালাবার পথ বন্ধ। তাড়াতাড়ি কুরে বইদপ্তর প্রতিমার কাছে ফেলে

চোঁচাদৌড় দিয়ে সামনে মরাইটার নীচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল।

"হ্যাঁরে প্রতিমা, বিনে পাঠশালা যায়নি—"

"হ্যাঁ কাকা, সেই কখন খেয়ে চলে গিয়েছে ত"···যেন কিছুই জানে না।

"পণ্ডিত ডাকতে পাঠিয়েছে—দুষ্ট ছেলে ত? কোথায় গিয়ে খেলা করছে হয়ত। ওকি আম কোথায় পেলি?"

···আমতা আমতা করে জবাব দেয়—"গোবরা পাড়ছিল বাগানে—দিয়ে গেল।"

বিনয় এদিকে মরাইএর নীচে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে···নানা আবর্জ্জনা···খড়গুলো পিট পিট করে গায়ে লাগে···তার উপর আবার বিপদ পিঁপড়ে ···লাল পিঁপড়েতে সারা গা ছেয়ে গিয়েছে···কামড়ের চোটে জ্বালা করতে সুরু হয়েছে।

···বেরিয়ে এসে বাঁচে! কাকা চলে গিয়েছেন, মাও উপরে কি কাজে গিয়েছেন···বইগুলো নিয়ে আবার বেরিয়ে যায় বগলদাবা করে। একহাতে গায়ে হাত বুলোয় দাগড়া দাগড়া কামড়গুলোতে, অন্যহাতে শালপাতায় খানিকটা আম ছেঁচা পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে খেতে চলেছে।

বেলা পড়ে আসছে···ক্লান্তসূর্য্য দিবসের শেষে চলে আসচে পশ্চিম দিগন্তে···বিদায়গামী সূর্য্যের পাণ্ডুর লালিমা···সারাটা ধরণীকে রঞ্জিত করে তুলেছে—বাগানের ঘন সবুজ আম তেঁতুল গাছগুলোর মাথার উপর লুটিয়ে পড়েছে সোনালী রোদ···হালকা মেঘগুলো চলে-পড়া সূর্য্যের সামনে দিয়ে ভেসে চলেছে দিকভ্রষ্ট হয়ে। পুরুষের বাগানটার আড়ালে গরুর পালগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে···দল বেঁধে মেয়েরা জল নিয়ে ফিরছে তালপুকুর থেকে, এই সময়টুকুতে পরিচিত হয় শ্যামল ধরণীর সঙ্গে! সূর্য্য ঢলে পড়েছে, এই অবসরে ধরণী যেন ঘোমটা তুলে বৌঝিদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেয়···অল্পক্ষণের জন্ত!

"বুঝলি রাণী···মিন্তির বর বাসর ঘরে বলে কি না—মা ষষ্ঠির নিকুচি করেছি—ঐ শিলখানাকে তুলে নিয়ে কেশ সাগরের জলে ফেলে দিতে পারলে ঠিক হয়। অথচ বছর না ঘুরতেই···"

মিন্তি লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে···"আঃ থাম না, যতসব তোদের অনাচ্ছিষ্টি···"

বাক্‌মুখরা টুনি তবুও থামে না···কিলো প্রতিমা···তোদের ত হালি পিরিত···বলি চিঠি চাপটা দেয় ত? ক'পাতা? আমাকে ত বোন্ ও চিঠি দেয় রামপট। তাছাড়া মহিন ত ইস্কুলে পড়ে, ওরা ত চিঠি দেবেই।"

প্রতিমা কথা কয়না···মুখ নামিয়ে চলতে থাকে। ভট্টাচার্য্যদের পান্তি···কলসী এ কাঁকাল থেকে ও কাঁকালে নিয়ে বলে···"বুঝলি ভাই। আজকালকার ছেলেরা খুব ধূর্ত্ত।···ও সেদিন আমাকে শুধুচ্ছে কি জানিস্···ওমা···বলে কিনা···তুমি আগে আর কাউকে···"

একটা চাপা মিষ্টি হাসিতে পথটা ভরে ওঠে। "···তুই কি বললি?"

"···কি আর বলব—আমি লজ্জায় মরে যাই···ছি ছি কি লজ্জার কথা! বললাম তুমি আগে কোন মেয়েকে···"

বাধা দিয়ে বলে ওঠে টুনি···"ওকথা যদি বললি ভাই, ওরকম মেয়ে ঢের আছে···আমাদের পাড়াতে পাবি দেখতে। প্রতিমা রাগ করিস না বোন···রমা···ধীরেনদা এত ভাল ছেলে···তাও কিনা সারাদিন তার সঙ্গে হাসি গল্প আর ঠাট্টা।"

কথাটা অনেকটা সত্যি···প্রতিমাও জানে···চুপ করে যায় সে। খুব রাগ হয় দাদার উপর···লজ্জাও একটু আসে।

···পুজো এসে গিয়েছে।···শরতের সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে···লম্বা···গাছগুলোর মাথায়···বাঁশবনের অন্ধকারময় বুকে। মাঠটার বুক ভরে গিয়েছে সবুজ ধানে···তালপুকুরের উঁচু পাড়টা থেকে স্তরে স্তরে মাঠগুলো নেমে গিয়েছে নীচে ঐ দূরে···অর্জ্জুন খেঁজুর, জামগাছ ঘেরা ছোট্ট নদীটা···ওপার থেকে আবার ক্রমশঃ মাঠটা উঠে গিয়েছে···ঐ কলসি পোঁতার কাছ অবধি···যেন শ্যামল সমুদ্র···বিরাট একটা ঢেউ খেলে গিয়েছে।···

বাগানের তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমা, একটু দূরে বিনয়···তেঁতুল গাছটায় ঢিল মারছে···ছোট ছোট ডালপালা সমেত দু'এক থোকা তেঁতুল ঝরে পড়ছে মাটির উপরে।

ধীরেন আজ বাড়ী আসছে কলকাতা থেকে। ছুটি-ছাটা বড় একটা নাই···অনেকদিন পর বাড়ী আসছে। প্রতিমা চেয়ে আছে ঐ কলসি-পোতার দিকে···মাঠের রাস্তাটায় যেন একটা গাড়ী আসছে···রমা বাগানের দিকে আসছিল···আবার ফিরে গেল···প্রতিমার ডাকে ফিরতে সে পারে না।

"আয় না রমা—বাড়ী গিয়ে কি করবি?"

আমতা আমতা করে সে জবাব দেয়···"না ভাই, মা আবার খুঁজবে···রজনীদা ভিয়েনের গুড় চাপিয়েছে···রাজ্যের কাজ বাকী—"

বিনয় এক গোছা তেঁতুল নিয়ে আসে···"দেখ্—দেখ্ ছোড়দি—কেমন দানা বেঁধেছে···" পরম তৃপ্তি ভরে কামড়াতে থাকে।

রমা বলে ওঠে···"কি দস্যিছেলে তুই! এখনও মায়ের আঙ্গুল হয়নি···আর তুই তেঁতুল খাচ্ছিস?"

জিহ্বা আর তালুর সংযোগে একটা পরম তৃপ্তির শব্দ করে বিনয় বলে "ধ্যাৎ···আজ বলে চতুর্থী, কট্‌কটে ঠাকরুণ আসছে···আর দুদিন পর মায়ের পুজো···আবার আঙ্গুল হয়নি!"

গাড়ীটা নদীর এধারে এসে গিয়েছে। তাদেরই গাড়ী···ঐ কালো বাগ্দী গাড়োয়ান···রাঙ্গা বাছুরটা। প্রতিমা বলে ওঠে—"বিনয়, ঐ দেখ দাদা আসছে···"

বিনয় রাস্তাটা ধরে এগিয়ে যায়।

রমাকে কিছুতেই রাখা গেল না।···"না ভাই আমি যাই, মা আবার বকবে···কাজ ফেলে—"

যদিও সে বাড়ী গিয়ে কিছুই করবে না···তবুও চলে যায় তাড়াতাড়ি।

মা খুব ব্যস্ত।—"ওরে ধীরু, ছ'জন এসেছিল গোপালনগর থেকে··· আমাদের অন্ততঃ চারজন পাঠান চাই। কাপড়···তা···চারখানাতেই হবে। সিল্কের পাঞ্জাবী—স্নো—সেন্ট—সাবান—তেল—তোয়ালে—আর সব কি কি এনেছিস···ওগুলো বড় চামড়ার সুটকেশটায় পুরে দে। মিষ্টিগুলো বাকী লোকে নিয়ে যাবে···পুকুর থেকে মাছ···ঐ যাঃ···"

ধীরু বলে ওঠে—"ওরা জমিদারী চাল চালবে···আমরা পাল্লা দিতে পারব কোথা থেকে বল!"

—"পাল্লা দেবার কথা নয়রে—ওদের ত মান সম্মান আছে। পাড়ার···ঘরের পাঁচজন দেখবে···বুঝে সুঝে তত্ত্ব দিতে হবে ত! ও কালোর মা, তুমি বাছা গোয়ালাবাড়ী থেকে দইটা দেখে এস ত!"

পদ্মপিসী জিনিষপত্র তন্ন তন্ন করে দেখে রায় দেন···"তা ধীরু বেশ দিয়েছে বৌ···অল্পবয়সে বাপ মারা গেল···তবুও বোনকে কে এমন দেয় খোঁজ বলত বাছা! বেশ তত্ত্ব হয়েছে—খাসা তত্ত্ব হয়েছে!"

শুকনো চোখ দুটো কাপড়ের খুঁটে মুছে লক্ষীদিদি মন্তব্য করেন··· "অবিনাশকাকা এমন সোনার চাঁদ জামাই দেখে গেল না কাকিমা··· তা ধীরু আমাদের বেশ দিয়েছে···"

···"প্রতিমা, দে ত বাছা কাদাসোলের খুড়ীর ছেলেকে দুটো মিহিদানা —ঐ জলচৌকির ওপর বাটিতে আছে···কি আর দিলাম খুড়ী··· কর্ত্তা বেঁচে থাকলে তাঁর জামাইএর সাধ সম্মান করতেন···আমার যেমন পোড়া বরাত···"

খুড়ীর প্রশংসা আর ধরেনা···"চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিস না বৌ···সে দেবতুল্যি মানুষ ছিল···চলে গ্যাল···ধীরেন বেঁচে থাক, সে একাই এক'শ!"

পেট ডিগডিগে ছেলেটাকে বগলে করে খুড়ী দরজার দিকে পা বাড়ান।

বাইরেই গোবিন্দের মাকে দেখে লুপ্তপ্রায় নাকটা একটু তুলবার বৃথা চেষ্টা করে বলেন···"নেহাৎ মন্দ হয়নি তত্ত্ব···তবে কিনা···বড়-লোকের ঘর···ওলো যে চাটুয্যেদের বাড়ীতে গাড়ী গাড়ী জিনিষ তত্ত্ব যায়—তারা এ তত্ত্ব কেয়ার করে না···ওরা আমাদেরও কুটুম কিনা··· আমার পিসতুতো বোনের খুড়শ্বশুরের মেয়ের বিয়ে হয়েছে ওদেরই—ঐ চাটুয্যেদের ঘরে! ধীরেনের মায়ের বামন হয়ে চাঁদে হাত। সাধে কি আর মহাভারতে লিখেছে—

'বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদ···
মহাভারতের কথা অমৃতি সমান'···আহা—।"

খুড়ির কথাটা নেহাৎ মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না!

তত্ত্ব দেখে কেউ নাক সিটকান···কেউ বলেন একি যার তার সঙ্গে কুটুম্বিতে···দাও বড়গিন্নী, ও তত্ত্ব তোমার বেয়ান বাড়ীতে ফেরৎ পাঠিয়ে দাও!

মেজবাবু আহার পর্ব্ব সমাধা করে উঠেছেন পান মুখে···তত্ত্ব পরীক্ষা করতে করতে রায় দেন···"ওরে বিনোদ, এইগুলো বাইরের ঘরে তুলে রাখ···কাপড়গুলো তোদের পুজোয় বিদেয়ী দেওয়া হবে···এ ···হাড়িগুলো খোলত!···মিহিদানা!

এই গণশা···এইগুলো বাইরের ভাঁড়ারে নিয়ে যা···লোকজনদে দেওয়া হবে পালপরবের দিনে।

যারা তত্ত্ব নিয়ে এসেছে তারা ত অবাক! এমন ব্যবহার বিনোদ মহাখুসি! গণেশ বিনোদ আর মেজবাবু যাবামাত্র কাপ বইতে যাবে···হঠাৎ বড়গিন্নীর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে···

"এই বিনোদ···ওগুলো আমার ঘরে নিয়ে চল! বেয়ানঠাকরু বিধবা, আমারই মত পোড়া বরাত তাঁর! যা দিয়েছেন ঐ ঢের·· খুব দিয়েছেন! মহীনের আর দরকার নাই···ও খেস্তি···এদিকে জলটল খেতে দে! জল খেয়ে জিরিয়ে তোমরা চান করে এ বাবা! বেয়ান···বৌমা সব ভাল? ধীরেনকে একবার আসতে বল, কেমন?"

তারা মুগ্ধ হয়ে যায় এর ব্যবহারে···অমায়িক ব্যবহার!

"ওরে বিনোদ, কাছারী বাড়ী থেকে বিদেয়ের কাপড় আর টাক আমাকে এনে দিবি একটু পরে বুঝেছিস···হাতচিটে নিয়ে যা! তোমর লজ্জা করোনা বাবা···খাসা তত্ত্ব হয়েছে···তিনি কি একটা কাজে উপরের ঘরে চলে যান।

খবরটা ঠিক চাপা থাকে না! কোন ফাঁকে বার হয়ে পড়ে মেজবাবুর মেজাজী কথাগুলো! কাদাসোলের খুড়ি পিলেপেট ছেলেটাকে ক'সে দু' চাপড় মেরে জোর করে কাঁদিয়ে বলে ওঠেন·· "ওলো পদ্ম···আমি প্রথমেই বলেছি···ধীরেন যাবে চাটুয্যে বাড়ীতে তত্ত্ব করতে···যারা আজন্ম রাজত্তি করে এসেছে···খোঁটা খাবে না বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদ, মহাভারতের কথা অমৃত সমান···আহা মল' হতভাগা ছেলে!"···

ধীরেন বিশেষ কিছু বলে না···মনে মনে গর্জ্জাতে থাকে···"চামা ···আজন্ম লোকের রক্ত শুষে বড়লোক! হ'ত যদি রোজকার করতে!

মা বলেন···"আমার বেয়ান অতি ভাল মানুষরে···হলে কি হবে মাথায় ছাতা যার নাই তার আর কি আছে—বল! কথায় বলে পু খেয়ো তবু পুরুষ খেয়ো না···"

···এদের এ চর্চ্চায় প্রতিমা যোগ দিতে পারে না···সে থাকে দূরে দূরে। সে হয়ে উঠেছে লজ্জিত···অকারণে!

সকালের সোনালী রোদে চারিদিক ভরে গিয়েছে···শ্যামল প্রকৃতি শিশির মাখান ঝলমলে রূপ···চোখকে ধাঁধিয়ে দেয় ক্ষণিকের জন্য!

···"ওরে ধীরেন, হাট যাচ্ছিস বাবা···একটু বুঝে সুঝে হা করবি···মিষ্টি দুরকম···বড় মাছ···তরকারি···কালোকে নিয়ে যা·· মহীন আবার খয়রা মাছ খেতে পারে না···! হ্যাঁ রুজ ময়দা সে দুসের আনবে!—"

বাড়ীতে অনেকদিন পর জামাই এসেছে। নূতন জামাই···তি আদর যত্ন করে কূল পান না।

—"মহীন গেল কোথা, বিনয়কেও দেখছি না। জলখাবার বে

হয়ে গ্যাল…ও প্রতিমা…কাপড়খানা যাবে যে…আচ্ছা মেয়ে বা হোক! বামুনদিদি লুচিগুলো যেন বেশ কড়া হয়! প্রতিমা… দেখ, মেয়ের কাণ্ড দেখ!" তিনি বকে চলেছেন!

কুয়োতলার ধারে পেয়ারাগাছটার উপর উঠে একটা পেয়ারা পাড়বার বৃথা চেষ্টা করছে! মা বকে চলেন…"ওরে হতভাগী, নেমে আয়! দামী সাড়ীখানা ছিঁড়বে যে! ঘরে জামাই রয়েছে, আর এদিকে আবাগীর দস্যিপনা দেখ!"… বাইরে বিনয় এবং আরও জনকয়েকের গলার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি করে নেমে রান্নাঘরের বারান্দায় বামুনদিদির পাশে বসে অকারণে বেলনাটা নাড়তে থাকে প্রতিমা!

…রাত্রি হয়ে গিয়েছে…পাড়াগাঁ নিশুতি! মা…দাদা বাড়ীতে নেই—সেই পুজোমণ্ডপে গিয়েছে! নীচেকার ঘরে বামুনদিদি আর বিনয় ঘুমুচ্ছে! জানলাটা দিয়ে এক ঝলক আলো বাইরে খেজুর গাছটার মাথার উপর পড়েছে! প্রতিমা একদৃষ্টে চেয়ে আছে সেই দিকে! মনটা চলে গেছে অনেক দূরে, হয় ত ভাবছে নিশীথরাত্রে …তার বাবার কথা…সেই বাল্যজীবন…মিসনরী স্কুলটা কেমন আম বাগানের মধ্যে ছোট পাহাড়টার গায়ে সাজান…অনুভা…লতা…মিস্ ফ্রানসিস্…ফুলের মত সুন্দর চেহারা…আরও কতকি! মনটা খুব খারাপ হয়ে আসে…

স্বামীর ডাকে তার স্বপ্নজাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। "আঃ এদিকে ফিরে শোওনা…জোর করে তার দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করে। মহীনের কণ্ঠলগ্ন হয়ে…থাকে প্রতিমা! খুব ভাল লাগে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তার উপর ছেড়ে দিতে…"হ্যাঁগো, আমাদের তত্ত্ব নাকি তোমার মেজকাকা" আরও কাছে প্রতিমাকে টানতে টানতে মহীন বলে…'আরে দ্যুৎ-বুড়োর কথা ছেড়ে দাও! বাড়ীর মধ্যে ঐ দাড়িয়াল রামছাগলটাই ত সব মাটি করে! ঐ নিয়ে মায়ের সঙ্গে কত কথা কাটাকাটি! বলে কিনা…আমাদের অপমান করেছে তোমার বেয়ান ঠাকরুণ। চামার ছোটলোক…যা নয় তাই বললে! মা ও বলেছে খুব! আমার কুটুম যা দেবে তাই সই! বিধবা মানুষ পাবে কোথায়? আমাকে ত আসতে দেবে না এখানে। বলে কিনা, ঘড়ি আর বাইক না দিলে জামাই পাঠাবে না! মা-ই বললে…ও শ্বশুরবাড়ী যাবে না, ও যাবে ওর মামার বাড়ী বিষ্ণুপুর, তাই বলে ত আমাকে পাঠালে!"

বাইরে রাত্রির নির্জ্জনতা—একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক বেড়ে চলেছে! বাতাসের শব্দ ধরণীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভরিয়ে রেখেছে! কানে আসে থেকে থেকে রাত্রিচারী পাখীর ডানার ঝটপট শব্দ…আর্ত্ত চীৎকার নৈশ অন্ধকার ভেদ করে।

প্রতিমার গাটা কেমন ছম ছম করে ওঠে—বাইরের আলো আঁধারের দিকে তাকাতে পারে না…ভয় করে! বাত্যাহত পাখীর মত স্বামীর বুকে নিজেকে সমর্পণ করে সে ভয়াতুর হয়ে!…

মহীন তাকে সাদরে বুকে টেনে নেয়! দৃঢ় আলিঙ্গনে তাকে করে আবদ্ধ! শিহরণে প্রতিমার চোখ দুটো নিমীলিত হয়ে আসে…!

পাড়াগাঁয়ের পুকুর ঘাট! রাজনীতি—রঙ্গজগৎ থেকে সুরু করে বর্ত্তমান সংবাদ এবং সমালোচনা…সবটার আইটেমই পাওয়া যাবে।

তাল গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দু' এক ফালি কাঁচা রোদ লুকিয়ে ঢুকেছে ঘাটে…তালগাছগুলোর একটানা সাঁ সাঁ শব্দ আকাশ বাতাসে একটা সুর সৃষ্টি করেছে।

গোবিন্দর মা দূর জলে গিয়ে ঘড়াটায় পবিত্র জলপুরে উঠে আসছে—হঠাৎ পেট রোগা ছেলেটা বগল দাবা করে খুড়ি…একবগলে ছেলেটা অন্য হাতে একরাশ ময়লা ক্ষারে দেওয়া কাপড়…সঙ্গী সাথী অর্থাৎ যমুনার দিদি পদ্মপিসী আরও অনেককে নিয়ে ঘাটে আসছে!

আলোচনাটাও বেশ রসাল এবং মুখরোচক!

—ওলো পদ্ম, বললাম না…ধীরেনের মা পাল্লা দিয়ে জামাই করতে গেল—চাটুর্য্যে ঘরে—কেমন হয়েছে! জামাই এল সোনার ঘড়ি আর বাইক দেবার কথাছিল এই পুজোয়। তাত আর দিতে পারেনি…তাই রাগ করে জামাই ভোর বেলাতেই চলে গিয়েছে! ওলো, ওরা হচ্ছে জমিদারের বংশ—আর ধীরেনের মা কিনা—বামন হইয়া হাত বাড়াইলি চাঁদ মহাভারতের…"আর কথা শেষ করতে পারলে না…গোবিন্দের মা তালগাছের ফাঁকে সূর্য্যদেবকে এক নজর দেখে নিয়ে বিড় বিড় করে কি একটা বলছিল…হঠাৎ থেমে গিয়ে বাধা দিয়ে ওঠেন…"ঐ প্রতিমের অদৃষ্টে অনেক দুঃখু আছে বলে দিলাম…! আর ছুঁড়িও যেন চার পা হয়েছে মা—মেয়ে মন্দানন্দ জমিদারের বাড়ীর বৌ—গরবে আর পা পড়ে না।"

দাঁতগুলো তামাকের গুল দিয়ে ঘসতে ঘসতে পদ্মপিসী উত্তর দেন… "তবু ও ত ঘর করা হ'ল না…আমি বললাম দেখ ঐ দেনাপাওনা নিয়েই ছাড়াছাড়ি হবে। এদিকে মায়ের ত গল্পের শেষ নাই—আমার বেয়ান অমুক বল্লে, এই তোমুক বল্লে…হেন বল্লে…! ন্যাকামি দেখতে পারি না মা!"

কাদাসোলের খুড়ি…পাথরের উপর ময়লা কাপড়গুলোকে আছড়াতে আছড়াতে বলেন…"মাগ নাই ছেলে কাঁদে…ঘর নাই আগড় বাঁধে…কালে কালে আর কত দেখব।"

অধিকাংশ লোকের মেয়ের বিয়ে হয়েছে—কারও দোজ পক্ষে নয়ত দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে…সুতরাং প্রতিমার সৌভাগ্যে একটু হিংসা হবেই!

কিছুক্ষণ পর ঘাটটা আবার মুখরিত হয়ে ওঠে মেয়েদের কোলাহলে। পুজোর সময়…গ্রামে অনেকেই ফিরেছে বিদেশ থেকে…ছোট ছেলে মেয়েদের চীৎকারে ঘাট মুখরিত।

গাছকোমর বেঁধে সাঁতার দিতে দিতে পান্তির পায়ে গ্যাছে কাপড় জড়িয়ে…চুলগুলো খুলে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে…জলও এক আধ ঢোক গিয়েছে পেটে!—"বেশ হ'ত—ডুবে গেলে!"

চাঁপার কথার উত্তরে চুলগুলোকে ঠিক করতে করতে পান্তি

জবাব দেয়···"কি আর হ'ত ! ও আবার একটা বিয়ে করত ! বেটা-ছেলের আবার কথার ঠিক।"

"এই প্রতিমা···তোর নোতুন বর কি বললে কাল !···ওমা চোখ যে তোর করমচার মত লাল···কতক্ষণ জেগেছিলি ? লাজ কেন লো ···বল বল, বলতে হয়—"

সুর করে চাপা গেয়ে ওঠে···"সুখশয়নে বিধুমুখী···"

প্রতিমা এক আঁচলা জল তার মুখের দিকে ছুঁড়ে তার সজোরে··· "ধ্যুৎ !"

সকলের সম্মিলিত হাসিতে ঘাটটা ভরে ওঠে !···

(আগামী বারে সমাপ্য)

পুরুষোত্তম জগন্নাথ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার এম-এ, পি-আর-এস, পিএচ-ডি

উড়িষ্যাদেশের অন্তর্গত পুরী বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি মহাতীর্থ। ইহার সম্পূর্ণ নাম পুরুষোত্তম-পুরী বা জগন্নাথ-পুরী। যেমন গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থিত প্রাচীন গঙ্গাসাগরতীর্থকে সংক্ষেপার্থে গঙ্গা অথবা সাগর বলা হইত, সেইরূপ পুরুষোত্তম-পুরীকেও সংক্ষেপে কখনও বা পুরুষোত্তম, কখনও বা পুরী বলা হইত। সংক্ষিপ্ত পুরী নামটি অদ্যাপি জনপ্রিয় আছে। উৎকলখণ্ড প্রমুখ গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত পুরুষোত্তম নামটিরও বহুবার উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন লেখক আবার তীর্থটিকে পুরুষোত্তমকটক কিংবা পুরুষোত্তমজগন্নাথক্ষেত্র নাম দিয়াছেন। পুরুষোত্তম এবং জগন্নাথ উভয় শব্দই ভগবান্ বিষ্ণুর নামবোধক। পুরীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরের প্রধান দেববিগ্রহ পুরুষোত্তম এবং জগন্নাথ এই উভয় নামেই অভিহিত হন। কথিত আছে যে, গঙ্গবংশীয় পরাক্রান্ত সম্রাট অনন্ত বর্ম্মা চোড়গঙ্গের শাসনকালে (১০৭৮-১১৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং তদীয় প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীমের রাজত্বকালে (১২১১-৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) উহা সমাপ্ত হয়।

গঙ্গরাজ তৃতীয় অনঙ্গভীমের বৃদ্ধপ্রপৌত্র দ্বিতীয় ভানু নামক নরপতি ১৩০৭-২৭ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে উড়িষ্যা দেশের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। পুরীর একটি মঠে তাঁহার একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই লিপির তারিখ ১২৩৪ শকাব্দ (১৩১২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং রাজা দ্বিতীয় ভানুর সপ্তম অঙ্ক সংবৎসর। উড়িষ্যার উত্তরকালীন গঙ্গবংশীয় রাজগণের অনুসৃত রাজ্যবর্ষ গণনার পদ্ধতি অনুসারে সপ্তম অঙ্কবর্ষ প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় ভানুর রাজত্বের পঞ্চম বৎসর হইবে। এই নরপতির অন্যান্য লিপি হইতেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই তারিখটিকে দ্বিতীয় ভানুর স্বকীয় রাজ্যবর্ষ না বলিয়া পুরুষোত্তম নামক কাহারও রাজ্য সংবৎসররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেকালে স্বাধীন রাজগণ স্বকীয় রাজ্যবর্ষ অনুসারে শাসনের তারিখ গণনা করিতেন এবং সাধারণতঃ ঐস্থলে নিজের নামোল্লেখ করিতেন। পরাধীন রাজন্যবর্গ পরাক্রান্ত হইলে শাসনদানের অধিকার লাভ করিতেন; কিন্তু তাঁহাদের শাসনে স্ব স্ব অধিস্বামীর নাম এবং রাজ্য সংবৎসর উল্লিখিত হইত। দ্বিতীয় ভানুর পুরী শাসনে পুরুষোত্তমের নামোল্লেখ থাকায় কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, ঐ নরপতির রাজত্বের প্রথম ভাগে পাঁচ ছয় বৎসর পুরুষোত্তম নামক এক ব্যক্তি গঙ্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় ভানু বন্দীদশায় কাল-যাপন করিতেছিলেন। আবার কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় ভানুর নামান্তর ছিল পুরুষোত্তম। পুরী শাসনের ভাষা পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, এই উভয় সিদ্ধান্তই ভ্রান্ত। কিন্তু এই অনুমান দুইটির বিরুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ এই যে, দ্বিতীয় ভানুর রাজত্ব-কালীন ১২৩১ শকাব্দের (১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দ) তারিখ সম্বলিত শ্রীকূর্ম্মং লিপিতে ভানুদেবের পরিবর্ত্তে জগন্নাথ নামক কাহারও তৃতীয় রাজ্য সংবৎসরের উল্লেখ দেখা যায়। পুরী লিপির পুরুষোত্তম এবং শ্রীকূর্ম্মং লিপির জগন্নাথ অভিন্ন এবং গঙ্গরাজ দ্বিতীয় ভানু তাঁহাকে স্বীয় অধিস্বামী বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অধিস্বামী কোন নরপতি নহেন; স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি পুরী মন্দিরের দেববিগ্রহ ভগবান্ পুরুষোত্তম-জগন্নাথ। পুরী শাসনের ভাষা হইতে ইহা সম্যকরূপে প্রতীয়মান হয়।

পুরীলিপিতে পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় ভানু এবং পুরুষোত্তম কটক (অর্থাৎ পুরী) এই তিনটি নামই দুইবার করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। শাসনাংশ নিম্নরূপ—

"চতুস্ত্রিংশদধিক দ্বাদশশত পরিমিতবৎসরেষ্বতিবাহিতেষু বিশ্বম্ভরা ভারবহনমহনীয়েত্যাদি প্রশস্তিস্তোম বিরাজমান শ্রীপুরুষোত্তমদেবস্য প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে সপ্তমেঙ্কেভিলিখ্যমানে ধনুঃ কৃষ্ণ নবম্যাং সৌরিচারে শ্রীপুরুষোত্তম কটকে দক্ষিণ মহোদধিতীরে বীর শ্রীমদ্ভানুদেব রাউত্তবর্ম্মা স্বায়ুরারোগ্যৈশ্চর্য্যাভিবৃদ্ধয়ে বৎসসগোত্রায় ভার্গবচ্যবনাপ্নবদৌর্ব্বজামদগ্ন্য প্রবরায় যজুর্ব্বেদান্তর্গতকাণ্ব শাখৈকদেশাধ্যায়িনে সান্ধি বিগ্রহিক শ্রীরঙ্গদাস শর্ম্মণে কোন্টরাবঙ্গ বিষয় মধ্য মধ্যাসীন······সোমনাথ পড়া নামকং গ্রামং রাবঙ্গ বিষয় পূর্ব্ব খণ্ড মধ্য মধ্যাসীনম্ আকুর্ব্বা নামক গ্রামক্ষেত্রোতদ্ গ্রামদ্বয়ং সর্ব্বকর বহির্ভূতং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নম্ অকরীকৃত্য প্রাদাৎ। শ্রীপুরুষোত্তম কটকে অভ্যন্তর নগরে বিজয়িনা শ্রীমদ্ভানুদেব রাউত্তেন সমাজ্ঞাপিত······গ্রামদ্বয়স্য সীমানো লিখ্যন্তে।······আকুর্ব্বা গ্রামমধ্যাৎ শ্রীপুরুষোত্তমদেবায় পূর্ব্বরাজদত্ত ষড়্‌বিংশতি বাটিকা-পরিমিতং বহিঃকৃত্য গ্রামদ্বয়ং সিদ্ধমবদান জলস্থলমৎস্যকচ্ছপ পুরাতন বৃক্ষ সহিত মাচন্দ্রার্কমকরীকৃত্য সান্ধি বিগ্রহিক শ্রীরঙ্গদাস শর্ম্মণে প্রাদাৎ।" শাসনের শেষাংশে অপারিশর্ম্মা নামক সেনাধ্যক্ষকেও

কিঞ্চিৎ ভূমিদানের বিবরণ উল্লিখিত আছে। এই লিপির সমগ্র পাঠ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই। কোন কোন গ্রন্থে ইহার অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমপূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। একখানি গ্রন্থে প্রকাশিত পুরী শাসনের একটি আংশিক প্রতিলিপি হইতে আমরা পাঠ উদ্ধৃত করিলাম।

যাহা হউক, উদ্ধৃত লিপি হইতে জানা যায় যে, গঙ্গরাজ দ্বিতীয় ভানু স্বীয় রাজ্যবর্ষকে পুরুষোত্তমের রাজ্য বৎসর রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। পুরুষোত্তমকটকে অর্থাৎ পুরীতে অবস্থান কালে তিনি তদীয় মন্ত্রী রঙ্গদাস শর্ম্মাকে সোমনাথ পড়া এবং আকুর্ব্বা নামক দুইটি গ্রাম দান করেন। ইতিপূর্ব্বে ঐ আকুর্ব্বা গ্রামের কিঞ্চিৎ ভূমি দ্বিতীয় ভানুর কোন পূর্ব্বপুরুষ উক্ত পুরুষোত্তমকে দান করিয়াছিলেন; আকুর্ব্বা গ্রামের পূর্ব্বপ্রদত্ত অংশ বাদ দিয়া এবার উহার অপরাংশ দান করা হইল। এই পুরুষোত্তম দ্বিতীয় ভানুর অধিস্বামীর বা তাঁহার নিজের নাম হওয় নিতান্তই অসম্ভব। ইনি পুরী মন্দিরের দেববিগ্রহ তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। দ্বিতীয় ভানুর অধিকার অন্ততঃ পুরী ও গঞ্জাম (গঞ্জং) জেলায় স্বীকৃত হইত; তাঁহার নিজের সান্ধিবিগ্রহিক এবং সেনাধ্যক্ষ ছিল এবং পুরী ও গঞ্জাম অঞ্চলে তাঁহার ভূমিদানের ক্ষমতা ছিল। আবার তাঁহার অন্যান্য লিপি হইতে জানা যায় যে, ১২৩৬ শকাব্দে তাঁহার নিজেরই সপ্তম অঙ্ক বৎসর অর্থাৎ পঞ্চম রাজ্যবর্ষ ছিল। এ অবস্থায় এই সময় গঙ্গরাজ দ্বিতীয় ভানু এক অজ্ঞাতকুলশীল পুরুষোত্তমের বন্দী ছিলেন মনে করা হাস্যকর। উত্তর কালীন গঙ্গবংশের কোন কোন নরপতি যে আপন রাজ্যকে পুরুষোত্তমের রাজ্য বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহার আরও অকাট্য প্রমাণ আছে। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে গঙ্গরাজ তৃতীয় অনঙ্গভীমের একখানি লিপি আছে। উহার প্রথমাংশ নিম্নরূপ—

"শ্রীমদনীয়ঙ্কভীমদেবস্য প্রবর্দ্ধমানপুরুষোত্তম সাম্রাজ্যে চতুস্ত্রিংশত্তমে অঙ্কে।" এস্থলে পুরুষোত্তমকে কোন ক্রমেই তৃতীয় অনঙ্গভীমের অধিস্বামী বলা যায় না; কিন্তু তিনি স্বীয় রাজ্যকে "পুরুষোত্তমের সাম্রাজ্য" রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্যই এই পুরুষোত্তম দ্বিতীয় ভানুর পুরী লিপির পুরুষোত্তম এবং শ্রীকূর্ম্মং লিপির জগন্নাথের সহিত অভিন্ন। এই পুরুষোত্তম-জগন্নাথ পুরী মন্দিরের দেবতা ব্যতীত অপর কেহ হইতে পারেন না।

দেখা যাইতেছে, গঙ্গবংশীয় তৃতীয় অনঙ্গভীম এবং তদীয় বৃদ্ধ-প্রপৌত্র দ্বিতীয় ভানু ভগবান্ পুরুষোত্তম-জগন্নাথের সামন্ত বা প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছু নাই। আজিও ত্রিবাঙ্কুরের রাজগণ আপনাদিগকে পদ্মনাভস্বামী নামক দেববিগ্রহের প্রতিনিধিস্থানীয় শাসনকর্ত্তা জ্ঞান করেন। প্রাচীন কাল হইতে মেবারের রাণারা ভগবান্ একলিঙ্গেশ্বরের দেওয়ান-রূপে রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন। মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর শিবাজী স্বীয় গুরুদেব রামদাস স্বামীর নামে তদীয় প্রতিনিধি রূপে দেশ শাসন করিতেন বলিয়া কথিত আছে। প্রাচীন কলচুরি-বংশীয় রাজপুত রাজগণ বিখ্যাত শৈবসাধু বামশম্ভু বা বামদেবের সামন্ত-রূপে ডাহল রাজ্য অর্থাৎ আধুনিক জব্বলপুর অঞ্চল শাসন করিতেন। উক্ত বামদেবের তিরোধানের বহুকাল পরেও কলচুরি নৃপতিগণ স্ব স্ব তাম্রশাসনে তাঁহার নামোল্লেখ করিতেন। সুতরাং গঙ্গবংশীয় তৃতীয় অনঙ্গভীম এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ যদি পুরী মন্দিরের ভগবান্ পুরুষোত্তম-জগন্নাথের নামে রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন, তাহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই।

তবে পুরীর মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় হইতে সকল গঙ্গরাজাই আপনাদিগকে পুরুষোত্তম-জগন্নাথের প্রতিনিধিজ্ঞান করিতেন কিনা, তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায় না। কেবল তৃতীয় অনঙ্গভীমের একখানি লিপি এবং দ্বিতীয় ভানুর দুইখানি লিপিতে উক্ত দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এমন কি, এই দুইজন নরপতিও সাময়িকভাবে পুরুষোত্তম-জগন্নাথের নিকট কাল্পনিক হিসাবে গঙ্গরাজ্য বন্ধক রাখিয়াছিলেন কিনা, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। অনেক সময়ে সধবা স্ত্রীলোকেরা স্বামীর নিরাময় বা অন্যরূপ মঙ্গলের জন্য কোন দেবতার কাছে শাঁখা, সিন্দুর প্রভৃতি সধবাচিহ্ন বন্ধক রাখিয়া থাকে। দেবতার নামে মাথার চুল রাখিয়া দিতে অথবা দক্ষিণ হস্ত প্রভৃতি অঙ্গবিশেষের ব্যবহার বন্ধ রাখিতেও অনেককেই দেখা যায়। এইরূপে সাময়িকভাবে কোন দেবতার নামে অন্যান্য মূল্যবান্ বস্তু বা সম্পত্তি বন্ধক রাখার প্রথাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে। সুতরাং তৃতীয় অনঙ্গভীম এবং দ্বিতীয় ভানু সাময়িকভাবেও আপনাদিগকে পুরুষোত্তম-জগন্নাথের সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিতে পারেন। তবে উড়িষ্যায় এই দেবতার মাহাত্ম্যের বিষয় অনুধাবন করিলে মনে হয় যে, গঙ্গরাজ তৃতীয় অনঙ্গভীম এবং তদীয় উত্তরাধিকারিগণ সকলেই সম্ভবতঃ বাচনিকভাবে ভগবান্ পুরুষোত্তম-জগন্নাথের প্রতিনিধিরূপে রাজত্ব করিতেন।

উপরে দেবতার নিকট সম্পত্তি বন্ধক রাখা সম্পর্কিত যে ধর্ম্মবিশ্বাস-মূলক প্রথার উল্লেখ করা হইল, বর্ত্তমানযুগে বাংলা এবং উড়িষ্যায় জনসাধারণের মধ্যে উহার ব্যাপকতা এবং প্রচলতা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পাঠকেরা কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদ দিলে উপকৃত হইব।

অর্দ্ধেক মানবী তুমি

রচনা—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস

রেখা—শ্রীরঞ্জন ভট্ট

যৌবন ও ক্যামেরার ছবি তোলার কাগজ একই রকম। সব কিছুরই দাগ তাতে এঁকে যেতে পারে। কিন্তু যৌবন তার চেয়ে বড়, কারণ সে সৃষ্টি করে—আর ক্যামেরা শুধু তোলে প্রতিচ্ছবি। নবজাগ্রত যৌবনে দৃষ্টি থাকে কল্পনার রংএ রাঙা, আর কল্পনা পৌঁছে যায় আকাশে রামধনুর সীমানা পর্য্যন্ত। বাস্তবের সঙ্গে তার সংস্পর্শ না হয় নাই থাকল। কিন্তু বাস্তব জগতের সব কিছুকেই নূতন রঙে, নূতন ছন্দে সাজিয়ে নিয়ে উপভোগ করবার ক্ষমতা কল্পনার আছে।

কবিগুরুর প্রবন্ধ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' পড়ান হল ক্লাশে। ছাত্ররা যে বিশেষ বক্তৃতা শুনেছে বা হৃদয়ঙ্গম করেছে এমন সন্দেহের উপযুক্ত কারণ নেই; কিন্তু অধ্যাপক ও ছাত্রীরা চলে যাবার পরই বোর্ডের উপর ছবি আঁকা হয়ে গেল 'বাক্যের অপেক্ষিতা'। কালিদাস ত শকুন্তলা লিখেই সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেন। শকুন্তলার বিরহ ও প্রত্যাখ্যান দুঃখের অন্তরালে যে সখী প্রিয়ংবদা অনসূয়ার স্বাভাবিক মানসিক আকাঙ্ক্ষা লুকানো ছিল এবং কালিদাস তা উপেক্ষা করে গিয়েছেন সেটা বোঝাতে হল এসে রবীন্দ্র-নাথকে। কিন্তু বন্ধুরা তার আধুনিক রূপটার রহস্য উদ্ঘাটন করেছিল ক্লাশে বসেই। সংস্কৃতে বলেছে রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বন্ধুর দল বলে সে কথা ঠিক এবং গোল পৃথিবীর সবটাই রসগোল্লা। জল ভাগটা হচ্ছে রস, আর স্থল ভাগটা ছানা।

> যেখানে কঠিন ঠাঁই
> টিপিয়া দেখিয়ো ভাই,
> মিলিলে মিলিতে পারে রস নিকেতন।

অর্থাৎ কিনা রসগোল্লা। ক্লাশের পড়ার মধ্যে রস নেই? কাব্যের উপেক্ষিতা পড়াতে গিয়ে অধ্যাপক অসুবিধাজনক শক্ত শক্ত কথা ও উপমা, কুল্লুক ভট্টের টীকা (ছাত্ররা তার সঙ্গে যোগ করে দেয় উল্লুক ভট্টের টীপ্পনী)* প্রভৃতি অবতারণা করে রসভঙ্গ করেছেন? তাতে ক্ষতি কিছুই নেই। শুধু তিনি হেন সুবিবেচকের মত পড়া চাওয়াটা ছেড়ে দেন এবং পরের ঘণ্টার অধ্যাপক একটু পরেই যেন আসেন। কার্য্যে আমাদের মন না থাকতে পারে, কিন্তু অপকার্য্যে প্রতিভার বিকাশের সুযোগ চাই। সেই অবসরে কাব্যের উপেক্ষিতা অড়চর দাসের হাতে পড়ে খড়ির আঁচড়ে বাক্যের অপেক্ষিতায় পরিণত হয় এবং তার পরই আরম্ভ হল চিত্র পরিচয়।

আধুনিক প্রিয়ংবদা ইডেন গার্ডেনে (স্বর্গোদ্যান ত বটেই, কণ্বমুনির আশ্রমটার পাশে কোন্ নদী ছিল মশাই? গঙ্গাই হয়ত হবে এবং না হলেও ক্ষতি নেই) খালের ধারে প্যাগোডার ছায়ায় পরম বাক্যটীর অপেক্ষা করছেন।

বাক্যের অপেক্ষিতা

কালিদাস ছিলেন সেকালের কাঁচা দরজীদের বিজ্ঞাপন, তাই তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, যে সুন্দর তাকে কিসে না সুন্দর দেখায়? তার মান রক্ষা করবার জন্যই একালে ব্লাউস ক্রমশ বাহুমূল পেরিয়ে উপরে উঠছে, আর কণ্ঠদেশ ছাড়িয়ে নীচের দিকে বিজয় অভিযান করছে। কালিদাসের নজীর মেনেই এ যুগের পিয়সহিরা মাথার চুল থেকে শাড়ীর ঝুল পর্য্যন্ত ছেঁটে ফেলছেন। তবেএ কালের বল্কল অর্থাৎ খদ্দর বড় রুক্ষ, কাব্যযুগের চাঁদের আলো দিয়ে বোনা হয়নি

বলে মসৃণতা নেই তাতে একটুও। তাই চিকণ সিক্ত উঠেছে শ্রী অঙ্গে।

বেঞ্চিতে পাশে বসে সায়াহ্ন-সঙ্গী ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কোম্পানী অর্থাৎ মানস সঙ্গী তিনি খোঁজেন। কিন্তু হায় টাকা আনা পাইয়ের মানসাঙ্ক মনে এসে পড়ে—যখনি প্রেমকে প্রস্তাবে পরিণত দেখতে চান সঙ্গিনী। তা ছাড়া এ জনের কাছে বাঁধা পড়াটা অত্যন্ত সহজ, সামান্ত ও সঙ্কীর্ণ ব্যাপার। নব যুগের খেলোয়াড়রা কি এই অপরাধ করে যুগকে খেলো করে দেবে? গড়ের মাঠে বাঙ্গালী দলের ফুটবল খেলা কি দেখ নি তোমরা? বল নিয়ে নেচে কুঁদে বাহবা পেলেই হয়রাণ হয়ে যায়। গোল দেবার সময় বা সুবিধা আর আসেই না। না আসুক, শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, সে সময় কখনো না আসুক। কারণ গোল হলেই ত শেষ হয়ে গেল। গীতায় বলেছে, শুধু কাজ করে যাও; ফলের উপর তোমার অধিকার নেই। আমরা তার চেয়েও এক কাঠি উপরে যেতে চাই। ফল আমাদের চাই-ই-না। নব ভৃঙ্গরা—দুষ্ট লোকে বলে নন্দী ভৃঙ্গীরা—গীতা বাক্য অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেই শুধু মধু পান করে যাচ্ছে? চাক বাঁধার অর্থাৎ নীড় রচনার দিকে কোন লক্ষ্য নেই। মা ফলেষু কদাচন?

অন্য পক্ষে আধুনিক কাব্যের উপেক্ষিতারা মোটেই উপেক্ষিতা ভাব দেখান না। বহু কলকূজন ও প্রেম গুঞ্জনের অন্তরালে পরম বাক্যটীর প্রতীক্ষায় থাকেন। তিনি কি দেবেন বরণমালা বরের গলায়? সে-ই প্রার্থনা করুক—তার কাছ থেকে বরমাল্য। যদি না করে তবে বুঝতে হবে যে সে নিজেই অযোগ্য; চাইবার পর্য্যন্ত যোগ্যতা নেই তার।

কুমারী অপেক্ষিতা, কিন্তু অনন্তকাল ইডেন গার্ডেনে অপেক্ষা করতে পারেন না। তাই তিনি বাড়ী ফিরে এসেছেন। চারিদিক শূন্য মনে হচ্ছে। চিত্রকরের তুলিও সহানুভূতি দেখিয়ে সহযোগিতা করবার জন্যই ছবিতে আর কিছু দেখায় নি। তা বলে কিন্তু মনে করো না চিত্রকরের আরো কিছু আঁকা ক্ষমতায় কুলায় নি। চার পাশে আর কিছুই আঁকার দরবার নেই, বিশেষ করে যখন প্রিয়ংবদা এখন বাড়ীর গোল কামরায়—কামরাটী কোনকালেই গোল করে তৈরী করা হয় নি—একা বসে অপেক্ষা করছেন এবং পাশে কোন মানস সঙ্গী নেই। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আজ কে বা কাছে আসবে? কে মুখের কথা খসাবে? কার অপেক্ষা করছি আমি? বোর্ডে আঁকা ছবির দিকে খড়ি তুলে প্রশ্ন করল হরিহর।

"ওহে অড়হর, হাওয়া হয়ে যাও। অধ্যাপক গুপ্ত প্রকাশ হয়েছেন দিগন্তে। হিতবাচ্য বর্ষণ আর অপেক্ষা করবে না একটুও।"

তাড়াতাড়ি সবগুলি মুখ ভাবলেশহীন হয়ে গেল। সকলেই গভীর ভাবে পাঠ্যপুস্তক খুলে সুবিবেচনার কাজ করছে দেখে অধ্যাপক বিশেষ সুখী হলেন।

এই সব ছেলেদের দুর্দ্দান্ত কল্পনাকে ঠেকাবে কে? বইয়ের ললাটে যদি দাগ লেগে থাকে, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই বউএর মাথার তেলের দাগ। অমনি তাতে কি গন্ধ আছে তা পরীক্ষা করবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। যদি দাগ না থাকে তাহলে স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে বউ বইয়ের প্রতি সতীনের ব্যবহার করছে। যদি পড়া ভাল তৈরী না হয়ে থাকে, তাহলে কারণটা অত্যন্ত স্পষ্ট—আর যদি তৈরী হয়ে থাকে একমাত্র গৃহে কারো অসহযোগের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। যদি মন দিয়ে পড়া শুনতে থাকে তাহলে গত রজনীর কথা ভুলতে চেষ্টা করছে, আর যদি অসহযোগ দেখা যায় তাহলে মানভঞ্জনের উপায় ভাঁজছে মনে মনে। সময়ে অসময়ে সহপাঠীদের এসব জল্পনা কল্পনা প্রায়ই ভাল লাগে প্রদ্যুম্নর। তার নববধূর ছবিটী যে তাদের মনে পরস্ত্রীকাতরতা—থুড়ি, পরশ্রীকাতরতা নয়, ও দোষটা আমার প্রতিবেশীদের আছে, আমার নেই—জাগায় নি তা সে জানে।

কিন্তু আজকাল বন্ধুদের আলাপ আলোচনা একটু সন্দেহজনক খাতে বইতে সুরু করেছে। যেন কোন হঠাৎ পাওয়া সংবাদ, গোপনে রাখবার মত সংবাদ ওদের কাছে এসে পড়েছে। প্রকাশ্যে আলোচনার তা অযোগ্য এবং বিশেষ করে যেমনি সে উপস্থিত হয় তেমনি সহপাঠীদের নীচু স্বরে চাপা আলোচনা হঠাৎ থেমে যায়।

সম্প্রতি বন্ধুদের দলে ভিড়তে চাচ্ছে না প্রদ্যুম্নও। ক্রমশঃ আগেকার জগৎ থেকে সে একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আগেকার বন্ধুবৎসল রহস্য-প্রিয় আনন্দময় প্রদ্যুম্নের মনে একটা ছায়া এসে পড়েছে। বন্ধুরা সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে যে, সে বিয়ে করে তেমন সুখী বোধ করছে

না। যে যৌবনানন্দে তন্ময় আত্মহারা হয়ে থাকা উচিত ছিল তা দেখা যাচ্ছে না। কোথায় যেন একটা বাধা, একটা অপূর্ণতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

বৌভাতের রাতে প্রদ্যুম্নর বাড়ীতে কেহই যে বৌ দেখার সময় তাদের কুণ্ঠাহীন ও পরিহাসপ্রবণ ব্যবহার পছন্দ করে নি, বরং অত্যন্ত অপ্রীতির চোখে দেখেছিল তা বন্ধুরা ভাল করেই বুঝে এসেছিল। বিশেষত নীহাররঞ্জনের ডাকনাম নীহারিকা দিয়ে তাকে নববধূর কাছে পরিচয় দেওয়াতে যে ঝড় বয়ে গিয়েছিল তা ওরা ভুলবে না। এটাও ওরা বুঝে এসেছিল যে ওই বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে তার প্রাচীন বনিয়াদ ও পূর্ব্ব-সঞ্চিত ধনগর্ব্বিত মাথা তুলে—সব রকম আধুনিকতা ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। বহু সহপাঠীর নিজের বাড়ীতেও সেই একই রকম অবস্থা। কিন্তু ঘরে ঘরে ক্ষুদে হিটলার মুসোলিনাদের যে অত্যাচার অহরহ সহ্য করতে হয়, তা অনেকটা গা-সহা হয়ে গেছে। তাই তা নজরে পড়ে না। পড়ে শুধু বড়র পুঞ্জীভূত বা প্রতীকস্বরূপ অত্যাচার। সেই জন্য কল্পনায় ওরা দাঁড় করিয়েছে সেই বাড়ীটাকেই প্রাচীনতার প্রতীক হিসাবে, আর মোক্ষদা সুন্দরীর সেদিনকার রণমূর্ত্তি দেখে তাকেই নাৎসীর সেনাপতি বানিয়েছে। রাগের চোটে একজন বলে ফেলেছিল যে তার জীবনের লক্ষ্য হবে নাতী-সেনাপতি হওয়া। ওরা বলে যে যা কিছু আধুনিকতা [illegible] স্বেচ্ছাবিহার, সব কিছুকেই স্বৈরাচার নাম দিয়ে ফ্যাসিস্টের ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দিতে চায় প্রাচীনরা এবং তাদের চেলা-চামুণ্ডারা।

বুকে তাল ঠুকে শূন্যে ঘুষি উচিয়ে আর একজন ঘোষণা করেছিল যে—কবি বলেছেন, "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা" নবীন এখনো যৌবনে ঠিক পৌঁছায় নি, কাঁচা এখনো কাঁচামিঠে হয়ে উঠে নি। ততদিন সবুর করো। তার পরে বড়লোকের ছেলে প্রদ্যুম্ন কিন্তু আর ওই উত্তর কলকাতার ওই পাড়ায় ওই গলিতে চকবন্দী অন্দরের মধ্যে দক্ষিণে বাতাসের সন্ধান করবে না। পুচ্ছটাকে উচ্চ করে যখন নাচাবে তখন মোক্ষদাসুন্দরী সংসারের মোক্ষম কথাটা বুঝতে পারবেন। সেটা হচ্ছে যে হিটলার সব থামাতে পারত, কিন্তু আধুনিক তরুণের প্রেমকে নয়।

নাৎসী-সেনাপতি (নাতী-সেনাপতি)

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা

বিপুল করতালি ও হাস্যরোল এই ভবিষ্যৎ বাণী সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করল। (ক্রমশঃ)

১৩৫৪ সাল

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

গত ৭ই চৈত্র ১৩৫৩ ইংরাজি ২১শে মার্চ ১৯৪৭ শুক্রবার কলকাতার বিকাল ৫টা ৭ মিনিটে (বাংলা সময় ৫টা ৪৩ মিঃ—ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড ৪টা ৪৩ মিঃ) সূর্য বিষুব রেখার উপর এসেছেন। এই সময়কার গ্রহসংস্থান এক বছরের মত পৃথিবীর উপর প্রভাব স্থাপন করবে। ঐ সময়কার গ্রহসংস্থান নিচে দিলুম।

প্র ২৪।৫৫ রা ১১।২৭		র ৬।৫৪ চ২২।১ ম ২০।৬ বু ১৬।৯ বং
শ ৯।১ বং বৃ ১৮।৮ বং		শু ২৫।৪৭
ন ১৬।৩৬ বং		কে ১১।২৭ বৃ ৪।২৩ বং

এই রাশিচক্র থেকে বোঝা যাবে সারা পৃথিবীর উপর গ্রহগুলি সাধারণভাবে কী ধরণের প্রভাব স্থাপন করবে এবং গোটা পৃথিবীর মানুষ এর দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হবে।

রবির সঙ্গে বৃহস্পতি ও শনির শুভপ্রেক্ষা ও সম্বন্ধ থাকায় পৃথিবীর সব দেশে মানুষের অন্তরাত্মা শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠবে এবং প্রত্যেক দেশের কর্তৃপক্ষ বা রাজশক্তি চেষ্টা করবে যাতে একটা শান্ত ও সুশৃঙ্খল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। এই আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য নতুন নতুন সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা এবং নীতি হিসাবে তা কাজে পরিণত করার চেষ্টাও চলবে। কিন্তু বৃহস্পতি শনি দু'টি গ্রহই বক্রী থাকায় এবং বৃহস্পতি কেতুযুক্ত ও শনি প্রজাপতি দ্বারা পীড়িত হওয়ায় শান্তি-শৃঙ্খলার সুসঙ্গত প্রয়োগ সম্ভব হ'য়ে উঠবে না। সারা পৃথিবীতেই কর্তৃপক্ষ এবং প্রজা-সাধারণের মধ্যে সহযোগিতা খুঁজে যাওয়া যাবে না এবং চিন্তাশীল ব্যবস্থাপক যে নীতি প্রবর্তন করতে চাইবেন, প্রজা-সাধারণের দ্বারা এবং অপরিণামদর্শী সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা তার বিপক্ষতাচরণ হবে, যাতে ক'রে এগুলি কাজে পরিণত করা সম্ভব হ'য়ে উঠবে না। সমাজে বা রাষ্ট্রে সুশৃঙ্খল ও স্থায়ী সংগঠন চেষ্টা ক্রমাগত ব্যাহতই হ'য়ে চলবে।

রবির উপর বৃহস্পতি, শনির শুভপ্রভাব যেমন মানুষের ভিতরে একটা শুভবুদ্ধি জাগাবার চেষ্টা করবে, চন্দ্রের উপর মঙ্গল, বুধ, শনি ও প্রজাপতির অশুভপ্রভাব তেমনি মানুষের বাইরের পরিবেশে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে—যাতে ক'রে ভিতরের শুভবুদ্ধির প্রেরণা ও সংগঠনের চেষ্টা বিপর্যস্ত হ'য়ে যাবে। চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধ কুম্ভরাশিতে থাকায় এ বছর পৃথিবীর সর্বত্র দলাদলি ও দলীয় স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রকট হ'য়ে উঠবে এবং দলীয় স্বার্থের পুষ্টির জন্য সর্বদেশে উত্তেজনামূলক প্রচার চলবে, সভা-সমিতিতে, লেখায়, বক্তৃতায় সর্বব্যাপারে একটা উত্তেজনার স্রোত প্রবাহিত হবে। নানা মত ও নানা পথের পরস্পর বিরোধিতায় সংগঠন ও শৃঙ্খলা বিধানের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। দেশের সঙ্গে দেশের বা রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের একটা সন্ধি বা আপোষের চেষ্টা হবে বটে, কিন্তু দেশের বা রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ বা নেতারা যা সর্ত ঠিক করবেন, দেশের জন-সাধারণ তা মেনে নিতে চাইবে না। সকল দেশের প্রজা-সাধারণের মনোবৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় থাকবে এবং এক একটা দল বা শ্রেণীর স্বার্থ জন-সাধারণের মনকে এমনি প্রভাবিত করবে যে ভাবোন্মাদনায় তারা ব্যক্তিগত বিবেক বা হিতাহিত জ্ঞান অনায়াসে বিসর্জ্জন দেবে। মোট কথা রাষ্ট্রের শাসক ও বিধায়কদের সঙ্গে সাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতার অভাব পৃথিবীর সর্বত্রই কম বেশী প্রকট হ'য়ে উঠবে, যার ফলে প্রজা-সাধারণকে নানা রকমে দুঃখ ভোগ করতে হবে। এ বছরও জন-সাধারণকে অভাব-অনটন ও আহার-বিহারে যথেষ্ট অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হবে।

রাশিচক্র যে রকম হয়েছে, তাতে পৃথিবীর সর্বত্রই এই ফলগুলি কম বেশী দেখা যাবে।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে কম-বেশী গণ্ডগোল উপস্থিত হবে এবং অনেক দেশেই নতুন ধরণে অর্থনৈতিক সংগঠনের চেষ্টা হবে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা নিয়ে আসা কষ্টকর হবে। দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খাপ খাবে না এবং রাষ্ট্রের আয়বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন কর বা নতুন উপায় প্রজার পক্ষে পীড়াকর হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য ভার-সাম্যের এমনি একটা অভাব সৃষ্টি করবে যে বিনিময়ের ব্যাপারে কম-বেশী বিশৃঙ্খলা ও স্থিরতার অভাব সর্বত্রই দেখা যাবে। মোট কথা আর্থিক ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য নীতি কোথাও পাওয়া যাবে না।

আভ্যন্তরীণ অবস্থা কোন দেশেরই খুব ভাল হবে না; প্রজা-সাধারণের দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন সর্বত্রই প্রকট হবে। মানুষকে জীবন-যাত্রার জন্য এমনি বিব্রত হ'তে হবে যে, উচ্চধরণের মানসিকতা বা চিন্তাধারা কোথাও ঠাঁই খুঁজে পাবে না। জনসাধারণের মধ্যে কোথাও বা প্রাণের উগ্র উত্তেজনা, কোথাও বা একটা নৈরাশ্য ও অবসাদ আত্ম-

প্রকাশ করবে। নীতি, আদর্শ, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির আদর্শ যবনিকার অন্তরালে চ'লে যাবে।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে কম-বেশী চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা লক্ষিত হ'লেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপারে মোটের উপর উন্নততর অবস্থাই দেখা যাবে। কাঁচামালের আমদানি রপ্তানিতে কম-বেশী বিঘ্ন হ'লেও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং তার বাণিজ্যও প্রসার লাভ করবে। অনেক-দেশেই বাণিজ্য প্রত্যক্ষভাবে গভর্মেন্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কম-বেশী সঙ্কুচিত হবে।

বিখ্যাত চিন্তাশীল ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের পক্ষে এ বছরটি খুব শুভ নয়, তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাব এ বছর মোটেই কোন কাজ করবে না। তা ছাড়া অভিজাত ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের প্রতিপত্তিও খুব ক'মে যাবে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে দেশের সরকারের সঙ্গে পুঁজিপতিদের প্রকাশ্য বিরোধও উপস্থিত হবে।

এ বছর আভ্যন্তরিক অবস্থা সকলের চেয়ে ভাল হবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের। প্রজাদের স্বাচ্ছন্দ্যও বৃদ্ধি হবে এবং আর্থিক অবস্থাও উন্নততর হবে। তা ছাড়া বাইরেও সর্বত্র তার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে এবং পৃথিবীর সকল দেশের উপর সে কম-বেশী প্রভাব স্থাপন করবে। অবশ্য এ প্রভাব যে অপর সকল দেশ প্রীতির চক্ষে দেখবে তা নয়। তার প্রতিষ্ঠা অপরের পক্ষে পীড়াদায়ক হ'তে পারে এবং তার এ ব্যাপারে কিছু অখ্যাতির আশঙ্কাও আছে। বৈদেশিক ব্যাপারে আমেরিকা খুব সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারবে না, তার বৈদেশিক নীতিতে অনেক ক্ষেত্রে হঠকারিতার প্রকাশ পাবে এবং সে নীতি অনেক ক্ষেত্রে যুক্তির চেয়ে উত্তেজনামূলক মনোভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

সোভিয়েট রুশ কিন্তু এ বছর বাইরের দিকে দৃষ্টি দেবার মোটেই অবকাশ পাবে না। সে জগতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা আকর্ষণ করবে বটে—কিন্তু ঐ পর্যন্তই, নিজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়েই তাকে এ বছর বিব্রত থাকতে হবে। দেশের মধ্যে সংগঠন ও শৃঙ্খলা বিধান—এই হবে তার এ বছরের প্রধান কাজ। তার বৈদেশিক নীতি এ বছর বাইরে স্পষ্ট প্রকাশ পাবে না। বৈদেশিক ব্যাপারে তার কম বেশী উদাসীনতাই লক্ষিত হবে।

ইংলণ্ডকে এ বছর নানারকম ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হ'তে হবে। সারা বছরটা প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্য তার চিন্তা ও চেষ্টার অন্ত থাকবে না। এ বছর নানা রকমে তার আশাভঙ্গ হবে এবং পূর্বপ্রতিষ্ঠা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অবশ্য তার কর্ম তৎপরতা খুব বেশী প্রকাশ পাবে এবং উৎসাহের সঙ্গে নতুনভাবে সংগঠন ক'রে নিজেকে দাঁড় করাবার চেষ্টাও যথেষ্ট হবে, কিন্তু অনেক সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় বা বিভ্রাটে তার পরিকল্পনা ব্যাহত হ'য়ে যাবে। তথাপি তার আশাবাদী মনোভাব অটুট থাকবে এবং আবার নতুন পরিকল্পনা নিয়ে নতুন ভাবে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টার সে কসুর করবে না। ইংলণ্ডের অগ্রগতির কোন সম্ভাবনা এ বছর না থাকলেও তার অধোগতি রোধ করার জন্য সে যে প্রাণপাত চেষ্টা করবে এবং তাতে কতকটা সফলও হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই সব দেশের সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু আদার ব্যাপারী আমরা—জাহাজের খবরে আমাদের কোন লাভ নেই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য না থাকাই ভালো। আমাদের নিজেদের দেশের কথাই বলি। ভারতের কী হবে? বাংলাদেশের অবস্থাই বা কেমন চলবে?

১৩৫৪ সালে ভারত ও বাংলাদেশ উভয়েরই লগ্ন হয়েছে সিংহ। কিন্তু ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে শুক্র এবং বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে চন্দ্র। শুক্র ষষ্ঠে থেকে শনি রাহু দুষ্ট, প্রজাপতির শুভপ্রেক্ষায় অনুগৃহীত কিন্তু রবির শত্রুপ্রেক্ষায় পীড়িত। চন্দ্র সপ্তমে থেকে সব রকমে পীড়িত, তা মঙ্গলের কনজংশন থেকে বিচ্যুত হ'য়ে বক্রী শনির সেক্সোয়ার প্রেক্ষায় সংযুক্ত এবং দশমস্থ প্রজাপতির ঘনিষ্ঠ শত্রু প্রেক্ষায় পীড়িত।

ভারতের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই প্রথমে প্রশ্ন জাগে ভারতের স্বাধীনতার কত দেরী। নানা জ্যোতির্বিদ্ এ সম্বন্ধে নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, কেউ বা ভারতকে এই বছরেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছেন, কেউ বা অর্ধ স্বাধীনতা দিয়ে পরে পূর্ণস্বাধীনতার আশা দিচ্ছেন; আমাকেও এ সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু স্বাধীনতার কোন সম্ভাবনা এ বছরের রাশিচক্রে পাওয়া যায় না। আত্মপ্রতিষ্ঠার দুটি গ্রহ শনি ও রবি, দুটিই ভারতের রাশি-চক্রে দুঃস্থান-গত এবং দশমপতি শুক্রও ষষ্ঠস্থ। সুতরাং এ বছর বাস্তবিক স্বাধীনতার কোন ভরসাই নেই। স্বাধীনতার নাম দিয়ে একটা নতুন কিছু ব্যবস্থা অবশ্যই হবে, কেন না দশমে প্রজাপতি শুক্রের শুভপ্রেক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু সে ব্যবস্থা এমনি ধোঁয়াটে ও প্রহেলিকাপূর্ণ হবে যে শীতের দিনে শীতের দেশের কোয়াসা আর ধোঁয়ার বেষ্টনী ভেদ ক'রে সূর্যের আলো যেমন ফুটতে পারে না, এ ব্যবস্থা ভেদ ক'রে স্বাধীনতার আলোও তেমনি প্রকাশের পথ পাবে না। ভারত থাকবে সে তিমিরে সেই তিমিরে। এই প্রসঙ্গে অবান্তর হ'লেও একটা কথা ব'লে নিতে চাই—স্বাধীনতার জন্য ভারতকে এখনও বহুদিন লড়াই করতে হবে, সন ১৩৫৮ সালের আগে তার পূর্ণস্বাধীনতার কোন আশাই নেই। বর্তমানে ভারত যে নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে, সে নেতৃত্ব তাকে কোনদিনই স্বাধীনতা দিতে পারবে না। এর পরে একজন নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটবে, যিনি ভারতকে নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভারতবাসী সপ্রতিষ্ঠ হবে।

এ বছর ভারতের নেতারা যে নীতি অবলম্বন করবেন তাকে আত্মঘাতী নীতি বলা চলে। তা হয়ত দেশের বিত্তশালী বা অভিজাত সম্প্রদায়কে খানিকটা সুবিধা বা সুযোগ দিতে পারে, কিন্তু সাধারণ জনগণ কোন সুবিধাই তা থেকে পাবে না। নেতাদের এই ভুলের ফলে দেশের মধ্যে দলাদলি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেড়ে উঠবে এবং বিভিন্ন দলের নেতাদের এই দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে জনসাধারণ সব রকমে নিগৃহীত হবে। নেতারা স্বাগজে কলমে, লেখায় বা সভা সমিতিতে বক্তৃতায় সে নীতি

প্রচার করবেন প্রয়োগের ক্ষেত্রে কাজের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য থাকবে না। মোট কথা এ বছরও ভারতের জনগণের দুর্ভোগের অন্ত থাকবে না গত বছরের মতই।

এবার ভারতের রাশিচক্রে লগ্নপতি অষ্টমে, ব্যক্তিগত কুণ্ডলীতে এ যোগ থাকলে সে হয় আত্মহত্যা করে, না হয় কোন বৃহত্তর আদর্শের জন্য আত্মবিসর্জন করে। অষ্টমস্থ রবি চতুর্থস্থ বৃহস্পতির (পঞ্চমপতি) স্নেহপ্রেক্ষা থেকে দ্বাদশস্থ শনির স্নেহপ্রেক্ষায় সংযুক্ত হচ্ছে—শনি বৃহস্পতি দুইই বক্রী। এ থেকে এই বোঝা যায় যে ভারতের বর্তমান নেতারা একটা ভ্রান্ত ধারণা ও আদর্শের বশবর্তী হ'য়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। কিন্তু ঐ শনি দশমস্থ প্রজাপতি এবং সপ্তমস্থ চন্দ্র ও মঙ্গলকে পীড়িত করায় জনসাধারণ তাতে দারুণ দুর্দশা ভোগ করবে।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে একদিকে যেমন উত্তেজনা, দলাদলি ও দ্বন্দ্ব প্রকট হ'য়ে উঠবে, অন্যদিকে তেমনি অভাবে, অনটনে, অনশনে একটা নৈরাশ্য ও অবসাদে মৃতকল্প হ'য়ে, তারা কোনদিকে কোন পথ খুঁজে পাবে না।

এ বছরে কতকগুলো ব্যাপার যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হচ্ছে এই—

গভর্মেণ্টকে বিশেষ অর্থাভাব অনুভব করতে হবে—যার ফলে তাকে ঋণও করতে হবে এবং নতুন করও বসাতে হবে. যে করের প্রত্যক্ষ-প্রচারিত উদ্দেশ্য প্রজার হিত ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি হ'লেও পরোক্ষে তা সাধারণ প্রজার পক্ষে কষ্টকর ও পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠবে, যাতে ক'রে গভর্মেণ্টের উপর জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি কমবে বই বাড়বে না। গভর্মেণ্টের সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতা বা সহানুভূতি মোটেই থাকবে না।

দেশের উন্নতির ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যা কিছু পরিকল্পনা হবে, তাতে দেশের অভিজাত বা ধনশালী সম্প্রদায়ের হয়ত কিছু উপকার হবে এবং তাদের লাভের পথও কিছু সুগম হ'তে পারে—কিন্তু ভারতের অধিকাংশ গরীব জনসাধারণের খাদ্য, পরিধেয় ও আশ্রয়ের জন্য সেই হাহাকারই করতে হবে। কুলি, মিস্ত্রী, কারিগর ইত্যাদি শ্রেণীর কিছু সুবিধা বা আয়বৃদ্ধি হ'তে পারে, কিন্তু কৃষিজীবী বা ভূমিজীবীদের অবস্থা হবে শোচনীয়।

এ বছর বড় বড় ব্যবসার দিক দিয়ে অনেক উদ্যোগ আয়োজন হবে. নানা রকমের শিল্প প্রচেষ্টায় অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠবে, বিশেষ ক'রে লিমিটেড কোম্পানী করবার একটা সাড়া প'ড়ে যাবে। ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে দু' চারটি বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান মাথা খাড়া করবে, তাতে ক'রে দক্ষিণের প্রদেশগুলির শ্রীবৃদ্ধিও ঘটবে। ছোট ছোট ব্যবসায়ের পক্ষে বছরটি কিন্তু মোটেই ভাল নয়, দলাদলি, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতির ঠেলায় ব্যবসার সাধারণ বাজারে নিয়ম বা শৃঙ্খলা ব'লে কিছু থাকবে না। বাংলা দেশে বিশেষ ক'রে ব্যবসা-বাণিজ্যের অত্যন্ত দুরবস্থা ঘটবে।

এ বছর দেশে বাস্তবিক খাদ্যাভাব ঘটবে না, কিন্তু তবুও অপচয়, গোপন রপ্তানী, চোরা কারবারীদের গোপন সঞ্চয় ইত্যাদি কারণে প্রজা-সাধারণ খাদ্যাভাবে কষ্ট পাবে এবং খাদ্যাভাবে ও তার আনুষঙ্গিক আধি-ব্যাধিতে বহু প্রজাক্ষয়ও হবে। এ বছরও চোরা বাজার পুরোদমেই চলবে এবং শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাজারে নিয়ম বা শৃঙ্খলা নিয়ে আসা শক্ত হবে।

বাঙলা দেশের অবস্থা এ বছর শোচনীয়—দলাদলি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকট প্রকাশে তার সকল রকম অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হবে। মাঝে মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি হ'লেও একটা দারুণ অবসাদে সারা বাঙলা দেশ যেন ছেয়ে যাবে। বাঙলা কোন দিক দিয়ে কারো কাছে কোন সাহায্য বা সহানুভূতি পাবে না এবং তার ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু ক'রে সকল কর্ম প্রচেষ্টা ক্রমাগতঃ ভিতর ও বাইরে দু'দিক থেকে বাধাপ্রাপ্ত হবে। সরকারের সঙ্গে প্রজা সাধারণের কোন সহানুভূতি ও সহযোগিতা লক্ষিত হবে না এবং অনেক স্থলে সরকার ও সাধারণের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা ও সংঘর্ষ চলবে। এ বছর আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কোন ব্যাপারেই বাঙলা অগ্রসর হ'তে পারবে না। সব দিক দিয়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় বাঙলা আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকবে।

সংস্কারের নামে নতুন অনেক বিধিবিধান এবং শৃঙ্খলাবিধানের জন্য সহসা কোন নতুন আইন সরকার পক্ষ থেকে প্রবর্তিত হ'তে পারে, কিন্তু তাতে খুব সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে তা জনসাধারণের পীড়ারই কারণ হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে এর বিরোধিতাও করতে পারে। পর্যায়ক্রমে উত্তেজনা ও অবসাদের তরঙ্গ বাঙলার বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে। সকলের মধ্যেই বুদ্ধি-বিবেচনা-যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাবল্যই হবে বেশী এবং আবেগের প্রাবল্যে বিবাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক সময় পশুবল আশ্রয় ক'রে ব্যক্ত হবে গত বছরের মতই। কাগজে-কলমে বক্তৃতায় নানা-রকমের পরিকল্পনা প্রচারিত হবে, কিন্তু কোন কিছুই কাজে পরিণত হওয়া সম্ভব হবে না। মোটের উপর বাঙলার পক্ষে বছরটি অত্যন্ত দুর্বৎসর। এই ১৩৫৪ সালের মত সঙ্কটময় কাল বাঙলায় কোনদিন আসে নি।

এ বছর বাঙলায় একটা প্রবল দল গ'ড়ে উঠবে, যাঁরা বাঙলাকে দ্বিধা বিভক্ত করতে চাইবেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টা ভিতরের ও বাইরের বাধায় কোনমতেই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

বাঙলার আবহাওয়া এমনি হবে যে মানুষের উচ্চতর মনোবৃত্তিগুলি প্রকাশের কোন সুযোগই পাবে না, একটা পশুসুলভ উত্তেজনায় ভেদ, দ্বন্দ্ব ও দলাদলিতে অন্য সব দিকের অগ্রগতি রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। তার কৃষ্টি, তার সংস্কৃতি, তার ভাবধারা সবই এ বছর বিপন্ন হ'য়ে উঠবে।

রক্তপাত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এ বছর চলবে, কিন্তু তা গেল বছরের মত অত তীব্র হ'বে না, পুরাতন রোগের মত ধিকি ধিকি তার দেহ ক্ষয় ক'রে চলবে।

ভারতের সর্বত্রই এ বছর কমবেশী অশান্তি, উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খল

অবস্থা লক্ষিত হবে, কিন্তু বাঙলার মত দুর্দশা আর কোন প্রদেশের অদৃষ্টে নেই। এরকম সঙ্কটময় অবস্থা আর কোথাও লক্ষিত হবে না। এই দুর্দশা অতিক্রম ক'রে সে যদি বাঁচে তো নবজন্ম লাভ করবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা অবান্তর হ'লেও ব'লে নিতে চাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে অনেক জ্যোতির্বিদ্ অনেক কথা প্রচার করেছেন, তা দেখে অনেকে এ সম্বন্ধে মতামত জানতে চেয়েছেন—তিনি জীবিত আছেন কি না, তিনি ফিরবেন কি না, ফিরলে কবে ফিরবেন ইত্যাদি ইত্যাদি! এ বিষয়ে জ্যোতিষের মধ্য দিয়ে যা বুঝতে পারা যায়, অন্ততঃ আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত আমি যা বুঝেছি, তা হচ্ছে এই—

নেতাজীর ৪৯, ৫০, ৫১ বছর বয়সে অর্থাৎ ইংরিজি ১৯৪৬, ৪৬, ৪৭, সালে তাঁর বিশেষ অরিষ্ট যোগ আছে, এ সময়ে তাঁর জীবন সংশয় হবে। এ কাটবে কি না, তা বলা সম্ভব নয়, তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত কর্মের উপর। তবে এইটুকু বলা যায় যে, যদি এ সময়টি উত্তীর্ণ হয়, তা হ'লে ৭২ বছরের আগে এত গুরুতর রিষ্টি তাঁর আর নেই। কিন্তু এও ঠিক যে, ৪৯ থেকে ৫১ বছরের মধ্যে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করলে আয়ু খণ্ডিত হ'তে পারে। সকলের সমবেত প্রার্থনায় তাঁর এ রিষ্টি কেটে যাবে, এইটেই আমরা আশা করি। তিনি যদি জীবিত থাকেন, তাহলে ১৩৫৫ সালে তিনি ফিরে এসে নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন এবং ভারতকে বাঁচার পথে চালিত করতে পারবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তা যদি না হয়, তা হ'লে ভারতকে নতুন নেতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ভগবান্ নেতাজীকে দীর্ঘজীবী করুন।

পদকর্ত্তা শ্রীজগদানন্দ ঠাকুরের নূতন পদ

শ্রীগৌরীহর মিত্র বি-এল

সুবিখ্যাত পদকর্ত্তা জগদানন্দ সরকার ঠাকুরের পদাবলী বৈষ্ণব রসগ্রাহী ভক্তজনের অতি মধুর জিনিষ। জগদানন্দের বহু পদ প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার এমন অনেক পদ আছে যাহা আজিও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার রচিত ৮টি অপ্রকাশিত পদ সংগৃহীত করিয়া পদকর্ত্তার জীবনীসহ ১৩৫০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত করিয়াছিলাম। অদ্য এখানে তাঁহার রচিত আরও দুইটি নূতন পদ প্রকাশিত করিলাম। এই পদ দুইটি সতীশবাবুর 'পদকল্পতরুতে' সংগৃহীত হয় নাই।

(১)

কেন গেলাম যমুনার জলে,
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়ে রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছলে কদম্বের মূলে॥
দিয়ে হাস্য সুধাচার অঙ্গ ছটা আঠা তার
আঁখি পাখি তাহাতে পড়িল,
মনমৃগ সেইকালে পড়িল রূপের জালে
শূন্যদেহ পিঞ্জর রহিল॥
গর্ব্বশালে মত্তহাতী বাঁধাছিল দিবারাতি
ক্ষিপ্ত হইল কটাক্ষ অঙ্কুশে,
দন্তের শিকল কাটি চারিদিক গেল ছুটি
পলাইয়া গেল দূরদেশে;
লজ্জাশীলের হেমাগার গুরুগৌরব সিংহদ্বার
তাহে ছিল কনক কপাট,
বংশীধ্বনি বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল কপাট॥
কালার ত্রিভঙ্গ বানে কুলশীল সব হানে
ডুবিল উঠিল ব্রজের বাস
অবশেষে প্রাণ বাকী তাও পাছে যায় দেখি
ভনয়ে জগদানন্দ দাস।

(২)

প্রভাতি

জয় জয় গৌরকান্ত জয় মঙ্গলকারী,
প্রভাতে উঠিয়া রাম নারায়ণ জপেন ত্রিপুরারী,
সিঙ্গায় জপে রাম রাম ডম্বুর বলে হরি,
খটমটি করে হার মাল, লটপটি করে বাঘছাল
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে রসাল, শিরে ধরি সুর নরী।
ঝলমল করে জটার জটা, থৈ থৈ নাচে দানব ঘটা,
শঙ্কর নাচে এলা হয়ে জটা, সঙ্গে লইয়া গৌরি।
……তুলু তুলে করে নয়ন ভঙ্গ, কুলু কুলু শিরে বহয়ে গঙ্গ,
জগদানন্দ, পাইয়া আনন্দ দেয়ত করতালি॥

ভীমপলশ্রী

বনফুল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তরকারি রান্নার গন্ধ ভেসে আসছিল একটা। কলের তেলের দুর্গন্ধ! নিশ্চয় গোয়াল কিম্বা আস্তাবলও আছে কাছে কোথাও। তেলে গোবরের গন্ধ ছাড়বে কি ক'রে। সান্ত্বনা বসে' পড়ল একটা সুটকেশের উপর।

"দাঁড়িয়ে আছেন কেন, যাহোক একটা ঠিক করে' ফেলুন এবার। চারটি খেয়ে শুতে পারলে বাঁচি"

"যা বলেছ"

সুশোভন এগিয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে জানালার কাচের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে।

"কিছু দেখতে পাচ্ছেন"

"কালো মতন কি যেন একটা"

"ডাকুন"

বাঁ হাতটি মুখের উপর রেখে ছোট্ট একটি হাই তুললে সান্ত্বনা। সুশোভন বার দুই ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে ধাক্কা দিলে জানালায় শেষে।

"কে—"

বেরিয়ে এলেন গোসাইজি।

"আপনিই কি গোসাইজি—"

মঙ্কি ক্যাপ দেখে সুশোভনের সন্দেহ হচ্ছিল একটু।

"হ্যাঁ"

"নমস্কার। রাত্রের জন্য আমরা দু'জন—"

"ক্ষমা করবেন। আপনাদের সৎকার করতে অক্ষম আমি আপাতত"

গোসাইজি যথাসাধ্য শুদ্ধ কথা ব্যবহার করে' থাকেন।

"অক্ষম! কেন?"

"স্থানাভাব। আমার দুটি ঘরেই অতিথি রয়েছেন"

"একটু জায়গা হবে না কোথাও?"

"না"

গোসাইজি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন।

"কচু খেলে যা—" অর্দ্ধস্বগত উক্তিটা বেরিয়ে পড়ল সুশোভনের মুখ থেকে।

"খাবার কিছু পাওয়া যাবে অন্তত আশা করি"

গোসাইজি কটমট দৃষ্টিতে সুশোভনের দিকে চেয়ে ছিলেন।

"ওই ধরণের অশ্লীল কথা ফের যদি উচ্চারণ করেন, তাহলে খাবারও পাওয়া যাবে না"

"মাপ করবেন, আপনাকে শুনিয়ে কথাটা বলি নি—মানে—"

"ভগবান কিন্তু শুনেছেন"

"কি করে' জানলেন আপনি?

মেজাজ আর ঠিক রাখতে পারছিল না সুশোভন।

গোসাইজি সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললেন—"ভদ্রলোকের মুখ থেকে আমি এ রকম কুৎসিৎ ভাষা প্রত্যাশা করিনি"

"খুব অন্যায় হয়েছে ওঁর। খাবার কি পাওয়া যাবে"

গোসাইজি সুশোভনের দিকে চেয়ে বললেন, "কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। খাতায় ঠিক ঠিক টোকা থাকে সব"

"কিছু খাবার কি পাওয়া যাবে"

পুনরায় বললে সান্ত্বনা।

"দেখি। সাধারণতঃ বাড়তি খাবার থাকে না আমার। আর তাছাড়া আর একটা কথা শুনে রাখুন গোড়াতেই।

হোটেল আমার, মনোমত লোক ছাড়া ঢুকতে দিই না আমি কাউকে এখানে”

সুশোভন বলে ফেললে—“তবু এখানে স্থানাভাব! আশ্চর্য্য কাণ্ড!”

গোঁসাইজির ভ্রূ কুঞ্চিত হল। সান্ত্বনারও হল।

“বড় ক্লান্ত আমরা, ক্ষিদেও পেয়েছে, কিছু খাবার যদি থাকে·····শোবার জায়গা কোথায় যে আবার জোগাড় হবে এতরাত্রে”

একটু কাতর কণ্ঠেই বললে সান্ত্বনা।

“এখানে টেলিফোন করবার ব্যবস্থা আছে কোন”—সুশোভন জিগ্যেস করলে।

“না”

“কাছাকাছি কোথা থেকে টেলিফোন করা সম্ভব”

“কোথাও থেকে নয়। হ্যাঁ হতে পারে—পাঁচ মাইল দূরে একটা পোষ্টাফিস আছে, সেখান থেকে হতে পারে”

“পাঁচ মাইল! রামচন্দ্র!”

“রামচন্দ্র বলে আমার চেনা শোনা লোক আছে এক-জন, তাকে টেলিফোন করব ভাবছিলাম। কিন্তু তার তো কোনও উপায় নেই আপাতত। গাড়িটাড়ি পাওয়া যেতে পারে?”

“না”

“এখানে ঘোড়ারগাড়ি গরুরগাড়ি কিছু পাওয়া যায় না?”

“না”

“লে হালুয়া—ও মানে—হালুয়াগঞ্জে যাবার কোনও উপায় নেই তাহলে”

গোঁসাইজির ভ্রূর কুঞ্চন ভয়াবহ হয়ে উঠছিল ক্রমশঃ।

“হালুয়াগঞ্জ বলে’ কোন স্থানের নাম তো শুনি নি”

“আপনি শোনেন নি হয় তো, কিন্তু আছে”

সান্ত্বনা অধীর হয়ে উঠল।

“ওসব বাজে কথা থাক এখন। আমাদের খাবার ব্যবস্থাটা করে’ দিন দয়া করে”

গোঁসাইজি সান্ত্বনার দিকে ফিরে চাইলেন। ছোঁড়াটা যদিও অসভ্য, মেয়েটি কিন্তু শ্রীমতী। দ্বারের দিকে চেয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন—“ফদ্‌কা—”

তারপর সান্ত্বনার দিকে ফিরে বললেন—“আপনার মুখ চেয়েই আমি খাবারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি” তারপর সুশোভনের দিকে চেয়ে বললেন—“আপনার স্বামী যদি একা আসতেন, খেতে পেতেন না আমার হোটেলে। যেন তেন প্রকারেণ পয়সা লোটাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়”

“শুনুন এই মহিলাটি”—সংশোধন করতে গিয়ে সুশোভন থেমে গেল। সান্ত্বনা চোখের ইঙ্গিতে বারণ করলে তাকে।

“এই মহিলাটি কে—”

“এই মহিলাটি আজ রাত্রে আর হাঁটতে পারবেন না। রাত্রের মতো কোনও ব্যবস্থা কি—”

দ্বার খুলে গোঁসাইজির ভৃত্য ফদকা প্রবেশ করল। তাকে দেখবামাত্রই গোঁসাইজি তেড়ে গেলেন।

“হলে আলো জ্বালিস নি কেন এখনও? বাঁদর কোথাকার”

“আলো জ্বালছিলাম। আনছি—”

ফদকা বেরিয়ে যাচ্ছিল গোঁসাইজি বললেন—“আর শোন, ঠাকুরকে বলে দে আরও দুজন খাবে। চাল ডাল বার করে’ নিয়ে যাক—তরকারি যা আছে ওতেই হবে—”

ফদকা চলে গেল। স্ত্রীকে ‘মহিলা’ বলে উল্লেখ করাতে গোঁসাইজি আরও চটেছিলেন। সুশোভনের দিকে ফিরে বললেন “মহিলাটির কষ্ট হবে বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করি বলুন, যাঁরা রয়েছেন তাঁদের তো তাড়িয়ে দিতে পারি না”

ফদকা একটা ভাঙা হ্যারিকেন নিয়ে প্রবেশ করল।

গোঁসাইজিও আর অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে’ বেরিয়ে গেলেন।

৬

কলাইয়ের ডাল এবং চচ্চড়ি সহযোগে খানিকটা কড়-কড়ে ভাত গলাধঃকরণ করার পর সান্ত্বনার প্রসন্নতা অনেকটা ফিরে এল যেন। সুশোভনের দিকে ফিরে সে বললে—“হয়তো রূঢ় ব্যবহার করেছি ক্ষমা করবেন। সত্যিই বড্ড ক্ষিদে পেয়েছিল। কিছু মনে করেন নি তো”

“এতে মনে করাকরির কি আছে। ক্ষিদে কি আমারই কম পেয়েছিল? তুমি আবার রূঢ় ব্যবহার করলে কখন, মনে পড়ছে না তো! বরং বেফাঁস কথাবার্ত্তা বলে’ আমিই সব মাটি করেছিলাম আর একটু হ’লে”

“বিশেষ করে’ আপনি যখন বলতে যাচ্ছিলেন যে

মহিলাটি আমার স্ত্রী নয়। উনি যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারতেন যে আমরা স্বামীস্ত্রী নই, তাহলে আস্তাবলে শোয়ার অনুমতিও বোধ হয় দিতেন না"

"যাক সে কথা। এখন শোয়ার কি করা যায় বলতো। তোমার পরামর্শ অনুসারে আমরা এখন যদি চলে যাই এখান থেকে, গণেশ আমাদের খুঁজে পাবে না সকালে—"

"কিন্তু পোষ্টাফিস থেকে আমরা ফোন করতে পারতাম মাসীমাকে"

"মাসীমার ফোন আছে?"

"আছে। মাসীমার অসুখের সময় অনেক খরচ করে ফোন কানেকশন্ করা হয়েছিল"

"কিন্তু এখন পাঁচ মাইল হাঁটতে পারবে তুমি? পুঁই-শাকের চচ্চড়ির সাংঘাতিক ক্ষমতা দেখছি"

চারটি ভাত পেটে পড়ার পর সান্ত্বনার ফুর্ত্তি সত্যিই ফিরে এসেছিল যেন। সত্যিই তার মনে হচ্ছিল এত দমে' যাবার কি হেতু ঘটেছে। 'আউটিং' করতে গেলে এমন মটোর অ্যাক্সিডেণ্ট তো হয়েই থাকে। তারা জলেও পড়ে নি। না হয় দু'জন গল্প করেই কাটিয়ে দেবে রাতটা। না হয় হাঁটবে। চিন্তার কি আছে……। হঠাৎ সুশোভনের দিকে ফিরে সে বললে—"সত্যি ভারী স্বার্থপর আমি। আমার চিন্তার কোন কারণই নেই কিন্তু আপনার আছে"

"কি"

"আপনার স্ত্রী"

সুশোভন গম্ভীরভাবে বললে—"সত্যি, ভয়ানক চিন্তা হচ্ছে।" বলেই হেসে ফেললে।

"এখন হাসছেন, কিন্তু আজ রাত্রে পৌঁছবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে নিজেই তো ট্যাক্সি করলেন—তা না হলে কাল ট্রেণে এলেই চলত"

"বড় বিপজ্জনক প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছ। চুপ চুপ, ঠাকুর আসছে বোধ হয়"

মৈথিল ঠাকুরটি আরও চারটি করে' ভাত এবং আর একটু করে' তরকারি দিয়ে গেল।

সান্ত্বনা হেসে বললে, "ভয় নেই, আমি সাক্ষী দেব যে আপনি মহদুদ্দেশ্যেই ট্যাক্সি নিয়েছিলেন"

"এ আলোচনা থাক এখন। যদি শুনতে পেয়ে যায় তাহলে—"

দু'জনে নীরবে খেতে লাগল। অনীতার কথা উঠে পড়াতে সুশোভন একটু দমে গিয়েছিল। সান্ত্বনা সহাস্য-দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললে "আচ্ছা সত্যি করে' বলুন তো, বিবাহিত জীবনটা কেমন লাগছে"

গোঁফের প্রান্ত বাঁ হাত দিয়ে পাকাতে পাকাতে সুশোভন বললে "অনেকটা যেন ধৌতি গোছের"

"ধৌতি? সে আবার কি!"

"বিশুদ্ধী করণ"

"মানে?

"মানে বিশুদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ বিয়ের আগে যে সব জিনিস মস্ত বড় বলে' মনে হয়, বিয়ের পর দিব্যদৃষ্টি লাভ করে' দেখা যায় সে সমস্তই বাজে। বিবাহ করবার পর মানুষ খাঁটি হয়, খাঁটি চেনে। বিয়ের আগে যা সোনা ছিল বিয়ের পর দেখা যায় সমস্তই ভ্রম—তা তামাও নয় পাক—সেরেফ খাদ! কেমন কবিত্বপূর্ণ হল না জবাবটা?"

মৃদু হেসে সান্ত্বনা বললে—"খুব"

"অনীতার মনন শক্তি (চিৎশক্তিও বলতে পার) আমার চেয়ে বেশী। এখন আমাকে যা করতে হচ্ছে, বিয়ের আগে যদি জানতাম যে তা করতে হবে—তাহলে বিয়েই করতাম না বোধ হয়। কিন্তু ওর মধ্যে একটু মজা আছে; এখন যা করছি তা যে বাধ্য হয়ে করছি তা-ও নয়, তা করতে ইচ্ছেও হচ্ছে! ধরতে পারলে কথাটা"

"খুব পেরেছি। যে বিয়ে করেছে সেই পারবে"

"বিয়ের আগে যা ভাল লাগত তাই করতাম, এখন যা করি তাই ভাল লাগে"

"আপনার স্ত্রীরও লাগে?"

"লাগা উচিত। অনীতার ভাবগতিক ঠিক বোঝা যায় না যদিও। তোমার কিন্তু যায়। তোমাকে দেখলেই মনে হয় যে তুমি সুখী। তোমার চোখে মুখে সে কথা লেখা রয়েছে"

"বহু ধন্যবাদ—"

ঠাট্টার সুরে বললেও অকৃত্রিম আনন্দে সান্ত্বনার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"অনীতাও সুখী হয়েছে আশা করি"—একটু ইতস্তত করে' বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ল যেন সুশোভন।

সান্ত্বনা হেসে বলল—"সুখী না হবার কোন কারণ তো নেই—"

"চুপ চুপ, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মৈথিল আসছে"

"খন্টা নিবেন ?"

"নিশ্চয় নিব। চারটি ভাতও আন"

"আমার আর ভাত চাই না—" সান্ত্বনা বললে।

বড়ির টক দিয়ে সুশোভন আর এক প্রস্থ সুরু করতে যাচ্ছিল, সান্ত্বনা হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল।

"শুনতে পাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ। ঘোড়ার গাড়ি"

"যান, থামান ওটাকে"

"এখানেই থামবে হয়তো"

"আর 'হয়তো'র দরকার নেই—যান যেমন করে' পারেন থামান ওটাকে"

"বেশ"

উঠতে হল সুশোভনকে। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়ে বললে—"কিন্তু এঁটো হাতে একটা ঘোড়ার গাড়ির পিছনে পিছনে দৌড়নোটা কি একটু—"

"যান যান শিগগির যান—চলে গেল। না, থামল বোধ হয়"

"বাঁচা গেল ! ভগবান আছেন"

"ও কি, আবার বসলেন যে এসে"

"অম্বলটুকু শেষ করে নি"

"ছি, ছি, কি আপনি !"

অম্বল শেষ করে' সুশোভন বেরিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এসে বললে—"ভগবান আছেন সত্যিই"

"ঠিক করে ফেললেন গাড়িটা ?"

"তার আর দরকার হবে না। আর একটু অম্বল আনতে বলি বরং। বেড়ে হয়েছে টকটা"

"কি হল বলুন না"

"ওপরের একটা ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে এক্ষুণি"

"কি করে ?"

"ওপরে কে একজন হেডমাস্টার আছেন, তাঁর মায়ের ভয়ানক হাঁপানি উঠেছে। তাঁকে নিতেই এসেছে গাড়ি"

"হেডমাস্টার এখানে ছিলেন ?"

"হ্যাঁ, স-স্ত্রীক"

"কি রকম ?"

"কি রকম আবার ! স-স্ত্রীক ছিলেন, চলে যাচ্ছেন। এই খবরটুকুই যথেষ্ট আনন্দজনক আপাতত, আর অধিক জানবার প্রয়োজন কি ? অম্বলটা ফেলে রাখছ কেন, খাও ভাল হয়েছে"

অম্বলের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে' সান্ত্বনা বললে—"কিন্তু তাতে আমাদের কি সুবিধে হল"

"সুবিধে হল না ? তিন মিনিটের মধ্যে একটা ঘর খালি হয়ে যাচ্ছে এক্ষুণি"

"কিন্তু মাত্র একটা ঘর খালি হলে কি সুবিধে হবে তাতে"

ব্যাপারটা এতক্ষণে স্পষ্ট হল সুশোভনের কাছে।

"ও, আচ্ছা বেশ, আমার ঘর চাই না, আমি বাইরে কাটিয়ে দেব কোথাও রাতটা। এই গুরু ভোজনের পর স্যুটকেস হাতে ঝুলিয়ে যে পাঁচ মাইল হাঁটতে হল না, তাই যথেষ্ট আমার পক্ষে"

মৃদু হেসে সান্ত্বনা বললে, "আমার স্যুটকেশ দুটো বয়ে আনতে আপনার খুবই কষ্ট হয়েছে বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করি বলুন। অত গয়না কাপড় মোটরে ফেলে রেখে আসাটা কি ঠিক হত"

"কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি আমার। তোমার কষ্টের কথাই ভাবছি। তোমার একটা শোবার ব্যবস্থা হয়ে গেল, বাঁচলুম"

"বাইরে আপনার অসুবিধে হবে খুব"

"কিছুমাত্র না। এরা চলে গেলেই গোঁসাইজির সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করে ফেলছি দেখ না"

বলেই সুশোভন থেমে গেল। পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল একটা।

"গোঁসাইজির সঙ্গে কিন্তু সাবধানে কথাবার্ত্তা কইতে হবে"

"নিশ্চয়, উনি যদি কোনক্রমে টের পেয়ে যান যে আমরা স্বামী-স্ত্রী নই, তাহলে—"

"তাহলে আর এখানে স্থান হবে না রাত্রে"

"উপায় ?"

খানিকক্ষণ ভেবে সুশোভন বললে—"ভাই বোন বলে পরিচয় দিলে ক্ষতি কি—"

"গোড়ায় ওঁকে সে কথা তো বলা হয় নি, উনি ধারণা করে' নিয়েছেন যে আমরা স্বামী-স্ত্রী। এখন যদি আবার—"

"বেশ দেখা যাক, কি হয়"

"না না, ঠিক করে' ভেবে দেখুন। আমরা যদি স্বামী-স্ত্রী হই, আপনি বাইরে শোবেন কি ওজুহাতে"

"বেশ, ওজুহাত যদি না খাড়া করতে পারা যায় এক ঘরেই শোয়া যাবে। কি হয়েছে তাতে। তোমার আপত্তি না থাকলেই হল। কিম্বা তোমার যদি আপত্তি থাকে গোঁসাইজির সামনে আমরা দু'জনে ঘরটায় একসঙ্গে ঢুকব—গোঁসাইজি আমাদের সমস্ত রাত পাহারা দেবেন না নিশ্চয়ই—তার পর উনি গিয়ে শুলেই আমি বেরিয়ে আসব। তার পর তুমি শুয়ে পোড়ো—আমি বারান্দায় থাকব"

"তার পর সকালে?"

'সকালে আবার কি। ভোরে তোমাকে উঠিয়ে দুজনে একসঙ্গে নেবে আসব। তার পরই তো গণেশ এসে পড়বে"

সাম্বনা চুপ করে' রইল। বিয়ের আগে সেই লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে মিছিমিছি তার নাম জড়িয়ে সবাই যে কলঙ্ক রটিয়েছিল তার গ্লানিকর স্মৃতি আজও তার মন থেকে মোছে নি। আবার না কিছু হয়। হঠাৎ সে মন স্থির করে' ফেললে—"বেশ তাই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই যখন। কিন্তু একথা গল্পচ্ছলেও কাউকে বলবেন না যেন কখনও"

"পাগল না কি!"

শিক্ষক-দম্পতির ট্রাঙ্ক স্যুটকেস বিছানা প্রভৃতি নামতে লাগল উপর থেকে। তাঁরাও নামলেন এবং অযথা বিলম্ব না করে' চলে গেলেন। তাঁদের বিদায় দেবার জন্য গোঁসাইজিও নির্গত হলেন নিজের ঘর থেকে। তাঁরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার গিয়ে ঢুকলেন অবশ্য।

সুশোভন সাম্বনাকে বললে—"এবার যাও, বুঝলে, গোঁসাইজিকে একটু চোমরাও গিয়ে"

"আপনি যাবেন না?"

"আমার চেয়ে তুমি গেলে বেশী কাজ হবে।"

একটু মুচকি হেসে সাম্বনা বেরিয়ে গেল।

মঙ্কি-ক্যাপটি খুলে ফেলে গোঁসাইজি তাঁর আপিস ঘরের চেয়ারে বসে' ক্যালেণ্ডারে অঙ্কিত ওঁ-বিজড়িত রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিকে প্রণাম করছিলেন। প্রতিদিন শয়নের পূর্ব্বে তিনি এই পুণ্য কাজটি করে' থাকেন। প্রণামান্তে মুখ তুলে দেখতে পেলেন—সাম্বনা শ্রদ্ধা-গদগদ মুখে তাঁর দিকে চেয়ে আছে।

"কি চমৎকার যে খেলাম আপনার এখানে। এমন চমৎকার রান্না অনেক দিন খাই নি"

"গোড়াতেই তো বলেছি,পয়সা রোজকার করবার জন্যে আমি হোটেল খুলি নি"

স্নেহভরে সাম্বনার মুখের দিকে চাইলেন তিনি।

"আপনাদের ওপরের একটা ঘর খালি হয়ে গেল না কি এখুনি"

"হ্যাঁ, ইচ্ছে করেন তো নিতে পারেন ঘরখানা"

এত সহজে হয়ে যাবে সাম্বনা আশা করে নি।

গোঁসাইজি সাম্বনার মুখের দিকে চেয়েই ছিলেন। বেশ একটা লক্ষ্মী-শ্রী আছে মেয়েটির, অথচ পড়েছে একটা অসভ্যের হাতে। অদৃষ্ট!

সহসা প্রশ্ন করলেন—"বিয়ে কতদিন হয়েছে"

"তিনমাস"

"ও। আচ্ছা, বেশ ওপরের ঘরটা নিন আপনারা। আমি ফদকাকে বলে' দিচ্ছি—"

ঘর থেকে বেরিয়েই 'হল' ঘরে সুশোভনকে দেখতে পেলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে' একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তার দিকে। তারপর বললেন—"অ্যাডমিশন খাতায় আপনাদের পরিচয় লিখে দিতে হবে"

অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে সুশোভন বলল—"বেশ তো, দেব, চলুন"

"ভিতরে আসতে পারি"

বাইরে থেকে অপরিচিত কার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বেশ পরুষ কণ্ঠস্বর। দ্বার খুলতেই সদারঙ্গবিহারীলাল প্রবেশ করলেন।

"আশা করি বিরক্ত করলাম না। একটু মোবিল হবে কি আপনাদের কাছে"

সদারঙ্গবিহারীলালের আপাদমস্তক ধুলোয় পরিপূর্ণ। কিন্তু সেদিকে তাঁর মোটে ভ্রূক্ষেপ নেই। আবেগে উৎসাহে চোখের দৃষ্টি জলজল করছে।

"একটু তেল হবে—সামান্য একটু—"

"না"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে' গোঁসাইজি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন। আপিস ঘর থেকে সান্ত্বনা বেরিয়ে এল।

"আরে সান্ত্বনা দেবী যে—অ্যাঁ—একেবারে অপ্রত্যাশিত—ছি ছি—বাঃ! বিয়ের খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু যেতে পারলাম না কিছুতে। অধ্যাপক মশায়ের নামটি কি যেন—দেবী চোধুরাণীতে আছে—হ্যাঁ গট ইট—ব্রজেশ্বর—ব্রজেশ্বর দে। প্রবন্ধ পড়লাম তাঁর একটা সেদিন—খাসা লেখা। ভারী খুশি হলাম আপনাকে দেখে। চমৎকার চমৎকার—বাঃ—"

তাঁর পুরু লেন্সের চশমা থেকে অজস্র রশ্মি-রেখা বিচ্ছুরিত হতে লাগল। বিরক্তিকে বিস্ময়ে রূপান্তরিত করে' সান্ত্বনা বললে—"আপনার সঙ্গে যে এখানে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবি নি সত্যি। এখানে কোথায় এসেছেন—"

"বৈজুপ্রসাদের জন্য ভোট ক্যানভাস করছি—লোকটী ডিজার্ভিং ক্যাণ্ডিডেট—আমি প্রথমটা ধরতে পারি নি, উমেশ চৌবের জন্যে প্রথমটা—ছি ছি—যাক সে লম্বা কাহিনী—আপনি এখানে কি করে' এলেন"

"এসে পড়া গেছে এ অঞ্চলে। রাতটা কাটাচ্ছি এখানে"

"আমার কাছে মোবিল নেই"—গোঁসাইজি আবার বললেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনবে কে। সদারঙ্গ বিহারীলাল সান্ত্বনার দিকে চেয়ে বলে' চলেছেন—"এ অঞ্চলে এসে পড়েছেন যখন রাউতপুরের হিস্টরিক্যাল রিমেন্‌স্‌গুলো দেখে যাবেন, যদি না দেখে থাকেন। দু' একদিনের মধ্যে আমারও যাবার কথা আছে। একাই এসেছেন? ও—আই সি—সো সরি"

"আমার এখানে তেল নেই মশাই, শুনছেন"

সদারঙ্গ বিহারীলালের তখন শোনবার মতো অবস্থা নয়। উচ্ছ্বাস অনুতাপ আনন্দ বিস্ময় প্রভৃতি বিবিধভাবে তাঁর চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সুশোভনকে দেখে। চশমায় আলোর ফুলঝুরি কাটছিল।

"আরে রাম রাম—আমার ভাবাই উচিত ছিল—মানে—বাঃ যাক। খুব খুশি হলাম—খুব। নামই শুনেছিলাম শুধু—লেখাও পড়েছি একটা—চমৎকার—রাউতপুরে যান যদি—যাওয়া উচিত—মানে ওঁরাও-দের সম্বন্ধে নতুন ক্লু পাওয়া যেতে পারে—আপনি আমার চেয়ে ভাল বুঝবেন অবশ্য। মোবিল অয়েলের খোঁজে এসে—হঠাৎ এখানে—অ্যাঁ—ছি ছি—দেখুন দিকি—বাঃ—বাঃ—" (ক্রমশঃ)

আমাদের গ্রাম

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ক্ষুদ্র তৃণ-কুসুম তাহার অকিঞ্চিৎকর সুরভি ও রূপ লইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে ফুটিয়া উঠে। তাহার ক্ষণস্থায়ী জীবনের আরও ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখের একটা ইতিহাস আছেই, কিন্তু সে ইতিহাস কেহ জানে না, জানিতে চাহে না, শুনিবার বা শোনাইবার মত তাহা নহে—তাহা এতই ক্ষুদ্র ও নগণ্য। ঝড় বৃষ্টির আঘাত, মেঘ-রৌদ্রের খেলা, মন্দাকিনীর স্পর্শ, প্রজাপতির সঙ্গ—ফুলের বুকে যে অনুভূতি জাগাইল তাহা অকথিতই রহিয়া গেল—ফুল যদি তাহা আমাদিগকে শুনাইত—তাহা হইলে হয় ত সমধর্ম্মী কোনো না কোনো শ্রোতার তাহা ভাল লাগিত।

আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামের এবং আমার এই তুচ্ছ জীবনের সুখ দুঃখের কথাও হয়ত কাহারো ভাল লাগিতে পারে—ইহাতে আমাদের গ্রামের বন্যা-বাদলের সজল স্মৃতি, আমাদের সরোবরের পদ্মের পরাগ, মালতীর সুরভি, যুথীর পরিমল—আমাদের পূজার দিনের ধূপের গন্ধ, সানাই সুরের রেশ মিশিয়া আছে—আর আছে আমাদের বক্ষের আলিঙ্গন ও চক্ষের জলের অভিষেক।

আমাদের গ্রামটা ছোট, কিন্তু সুবিখ্যাত পুরাণ ও কাব্য কাহিনী ইহাকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। ইহা মহাপীঠ—

"উজানিতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি।"

এখানে শ্রীমন্ত সদাগরের বাড়ী—

"এড়ায় মঙ্গলকোট—উজানি নগর
খুল্লনার সুত, সাধু শ্রীমন্তের ঘর।"

কবিকঙ্কণের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' এই গ্রামেরই ইতিহাস—এইখান হইতেই শ্রীমন্ত সদাগর সিংহল যাত্রা করেন—এখান হইতে কাটোয়

পর্য্যন্ত অজয় তীরে অবস্থিত বর্ণিত গ্রামগুলির এখানো অনেক বিদ্যমান আছে—

"এড়াইল 'গাঙ্গার।' 'ঘাট কুলীন পাড়া'
ডাহিনে এড়ায় 'কোঁয়ারপুর'।"

'থানাঘাট' 'বকুলিয়া' হইতে 'বেগুনকোলা' 'শাখাইঘাট' কিছুই বাদ যায় নাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম সম্ভবতঃ এই গ্রামের দেবীর পূজারী-গণের বংশধর ছিলেন এবং বহুবার এ গ্রামে আসিয়াছেন, নতুবা বর্ণনা এত সুন্দর ও সত্য হইত না। সতী বেহুলাও এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহাকে মিথিলার ন্যায় গৌরব দান করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের ইহা জন্মভূমি। বৈষ্ণব শাক্ত উভয়েরি তীর্থস্থান।

জমিদারী সেরেস্তায় এখনো গ্রামের নাম 'সুগ্রাম'। বিশাল নগরী গ্রামে পরিণত—তাই বুঝি রাজা এই সম্মান দিয়াছিলেন। গ্রাম সমৃদ্ধ ছিল—বর্গীর হাঙ্গামার সময় সেইজন্য বোধহয় এত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল—একটী প্রাচীন অশথকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

"টোডর মলের জরিপী আমিন,
নিশান গেড়েছে তলে,
নিম্ন শাখায় ঘোড়া বাঁধিয়াছে
নিঠুর বর্গী দলে।"

এই গ্রাম সম্বন্ধে বিখ্যাত 'কণ্ঠ' মহাশয় একটী গান বাঁধিয়া ছিলেন; তাহাতে আছে।—

"বলে পরস্পর উজানি নগর
অতি প্রাচীন সহর শুনি।
নয় সামান্য স্থল পরম নির্ম্মল
পূর্ব্বে অজয়ের জল বহিত উজানই।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে যা করে পাপ,
খণ্ডিবারে করতে হয় না যজ্ঞ যাগ,
মকরেতে দিলে এই নদীতে ঝাঁপ
শত জন্মের পাপ হ'ত হয় তখনি।"

গ্রামের উত্তরে অজয় নদ, তাহার ভাঙ্গনে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে গ্রামের অর্দ্ধেকের উপর নদীগর্ভে সমাহিত হইয়াছে। বহু প্রাচীন ইষ্টকালয়, দেবমন্দির, সুসজ্জিত ভবন, উদ্যান ও তরু-দেবতার চিহ্ন নাই। প্রকাণ্ড 'খড়্গামোক্ষণের মাঠ', 'মেলাতলা', 'কুচলারি বন' ও চারি পাঁচটী ঘাট লুপ্ত হইয়াছে। লোচনদাস ঠাকুরের 'সমাজ বাড়ী' ও আখড়া স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে। শুনা যায়, প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে আর একবার অজয়ের ভাঙনে এই গ্রাম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়। যে সব মুদ্রা নদীতে পাওয়া গিয়াছে তাহা ইলিয়াস সাহী আমলের। একটী অতি সুন্দর শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে স্বর্ণাক্ষরে 'ওঁ' লেখা আছে—উহা এখনো সুস্পষ্ট। কেমন করিয়া ঐরূপ লেখা হইল তাহা বিশেষজ্ঞরা বলিতে পারেন।

গ্রামের সে শোভা নাই, তবুও দুইদিকে অজয় ও কুনুর নদী, নিবিড় শ্যামল বনভূমি—দিগন্তপ্রসারী মাঠ এবং প্রকাণ্ড পাণ্ডু সৈকত ইহাকে রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বর্ষায় নদী দুটীর নিত্য নব নব রূপ, শীতকালে শীর্ণ স্বচ্ছ জলস্রোত—আর শস্যশ্যামলা তটভূমি প্রকৃতই দর্শনীয়।

গ্রামের বসতি প্রায় সত্তর ঘর, অবস্থা ভাল বলা চলে না—ধনী নাই বলিলেই হয়, যদিও অনেকেই ধনীয়াদীবংশ ও এককালে ধনী ছিলেন—গ্রাম্য সঙ্গীতে আছে—

"কে আর ভবে আছে সুখী
আমাদের মতন ?
দুটী বেলা চালের অভাব
নিত্য অনটন।
খুঁজে দেখ গাঁ খানি ভাই
নাইকো হেথায় একটী 'মরাই'
কমলা পেঁচারে রেখে
চির অদর্শন।

গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব বেশী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষায় এ গ্রামের ছাত্র ছিল। শিক্ষিতেরা প্রায়ই কর্ম্মক্ষেত্রে থাকেন।

গ্রামে অসুবিধা অনেক, স্বাস্থ্যকর হইলেও সময় সময় ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু গ্রামে বহু দেবতার বাস, এত দেবতা অধ্যুষিত ক্ষুদ্র গ্রাম সারা বাঙলায় বিরল—সেই সকল গ্রাম্য দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলাম—

১

তোমরা গ্রামের আদিম অধিবাসী,
অনন্তকাল শ্রেষ্ঠ গোষ্ঠীপতি,
সেবক মোরা—আমরা তো যাই আসি,
যাতায়াতে জানায়ে যাই নতি।

২

এত কুসুম ফুটায় গ্রামের বন,—
তোমাদেরি নিত্য পূজার লাগি,
ক্ষুদ্র গ্রামের ধান্য এবং ধন
তোমাদেরি—আমরা প্রসাদ মাগি।

৩

তোমাদিগে বিহগ শুনায় গান
তাই তো মধুর প্রসাদী সঙ্গীত,
জলে করি চরণ-উদক পান
ভোগেতে পাই ত্যাগেরি ইঙ্গিত।

৪

গ্রাম ত কেবল পূজারিদের বাসা,
সকল হৃদে ভক্তি অনুরাগ,
সবার চেয়ে আমরা আছি খাসা
পল্লী কোথা ?—এই তো 'দেব-প্রয়াগ'।

৫

অন্যে ভাবে আমরা থাকি একা,
বিপদে ও রোগে নিরাশ্রয়,
নিত্য যাদের দেবের সাথে দেখা
তাদের আবার অন্য কিসের ভয় ?

৬

মাতা পিতা অভিভাবক, গুরু
সহায়, সুহৃদ, অধিক কি চাই আর ?
পৃথিবীতেই স্বর্গ মোদের সুরু
এমন জীবন কাঙ্খিত নয় কার ?

এক একবার রোগের প্রকোপের সময় কেহ কেহ গ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে ভাল চিকিৎসক প্রভৃতি মিলিবে বলিয়া যাইতেন, কিন্তু আমরা দেবতার আশ্রয়ে থাকাই নিরাপদ মনে করিতাম।

এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথাই সর্ব্বত্র প্রচলিত। প্রতি মঙ্গলবারে বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে "জয় মঙ্গলবার" পালন এখানকার গৃহলক্ষ্মীরা করিয়া থাকেন। আমার মাতৃদেবী ভক্তি-সহকারে উহা পালন করিতেন। তাঁহার শ্রীমুখে 'কমলে কামিনীর' কথা আমার জীবনে সর্ব্বসময়ে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ভয়াল তরঙ্গাকুল সমুদ্রের মধ্যে 'কালিদহের' কমল কানন, যেখানে গণেশজননীর কোলে নির্ভয়ে সন্তান বসিয়া আছেন—স্নেহময়ী মহামায়া সন্তানের মুখে আদরে চুম্বন দিতেছেন—বিপদ সাগরের গর্জ্জন ও সর্ব্বগ্রাসী উর্ম্মিমালা তাঁহার চরণপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িতেছে। ওই মূর্ত্তিই আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অভয় দিত—কোনো বিপদকে ভয় হইত না। মনে হইত আমি মায়ের কোলে আছি, বিপদ ও দুর্গতি আমাকে স্পর্শ করিবে না। সিংহলের মশানে শ্রীমন্তের এই উক্তি আমার বড় ভাল লাগিত—

"তোদের রাজা সিংহলের রাজা
আমার মা রাজরাজেশ্বরী"

গ্রামে এত ব্রত আচরিত হইত, এত ব্রতকথা প্রচলিত ছিল যে আমরা মনে করিতাম সর্ব্বদা দেব দেবীর চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছি—ঘর-বাড়ী সবাই তাঁদের, আমরা তাঁদের আশ্রিত, আমাদের ভয় করিবার কিছু নাই, তাদের প্রিয় হইতে হইবে। তাই লিখিয়াছিলাম—

এ পথেতে আবার আমায়
আস্‌তে যদি হয়,
যেখানেতে ছিলাম—দিয়ো
সেইখানে আশ্রয়।
যেথায় জেনে ছিলাম আমি,
তুমিই কর্ত্তা গৃহস্বামী।
তুমি ভিন্ন করতে হয় না
অন্য কারো ভয়।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অবনীবাবুর দ্বিতলের বৈঠকখানা। এক ধারে পাশাপাশি নিচে নামিবার ও ত্রিতলে উঠিবার সিঁড়ি দেখা যায়। সেই দিকে একটি বড় পিঠওয়ালা কৌচে মজুমদার বসিয়া একটি বিলাতী পত্রিকা পড়িতেছে ও অবিরাম সিগারেট টানিতেছে। (ইংরাজিতে যাহাকে বলে চেয়্‌ন্ স্মোকার (Chain Smoker), মজুমদার তাহাই।) মজুমদারের পরিধানে প্যাণ্ট ও একটি ওভারকোট। ঘরের অপর পাশে, অন্তঃপুরের দিকের দরজা দিয়া সুমিত্রা ও কনক প্রবেশ করিল।

কনক। কই, এখানেও তো নেই। সারদা বল্লে যে ওপরে এসেছে ছোড়দা।

সুমিত্রা। হয়তো এসেছিল, আবার চলে গেছে। ও কি এক দণ্ড ঘরে থির থাকে মা ?

কনক। একটু বোসো মাসীমা, সিঁড়ি ভেঙ্গে হাঁপাচ্ছো তুমি। আচ্ছা, কোথায় যায় বল তো ? যখনই আসি দেখি বাড়ী নেই। আমাদের ওখানে যে কতকাল যায়নি তার ঠিক নেই। আর আজকাল মেজাজ যা হয়েছে মাসীমা তোমার ছেলের। বাবা ! যেন সদাই বন্দুক নিয়ে লড়াই করতে যাচ্ছেন, কাকে মারবে, কাকে ধরবে তার ঠিক নেই।

সুমিত্রা। কী জানি মা, কী হয়েছে ওর।

কনক। সেদিন ধরেছিলুম, বল্লুম লজিকটা একটু বুঝিয়ে দেবে ছোড়দা ? তা পড়া বোঝানো চুলোয় গেল, সে কী বকাবকি, ধরে মারতে বাকি রাখলে !

সুমিত্রা। তোকে বকলে ? খোকা ?

কনক। হ্যাঁ গো মাসীমা, শুধু আমাকে বকলে ? সমস্ত মেয়ে জাতটাকেই গো টু হেল্ করে দিলে। বলে, মেয়েরা আবার লজিক বুঝবে কী ? যুক্তি বিবেচনার ধার ধারে না, কেবল এক পুঁটলি নার্ভ্‌স্, আর এক ঘড়া চোখের জল,—সে কত কী দোষ যে বার করলে আমাদের। কেউ দুখানা রুটী বেলতে পারলেই আমরা তাকে মনে

করি পুরুষসিংহ, কেউ দুটো হাসির কথা বল্লেই আমরা তাকে মাথায় করে নাচি। এমনি সব কথা। কী হয়েছে বল তো ওর? তোমার সঙ্গে কি ঝগড়া টগড়া কিছু—। নাঃ, তোমার সঙ্গে আবার কারুর ঝগড়া হবে! তবে?

সুমিত্রা। কী জান মা, আমায় কি ওরা কিছু বলে কখনও। যেমন উনি, তেমনি তো ওঁর ছেলে হবে। এই গেল সোমবার তোর মেসোমশাই সকালে চা খেয়ে বেড়াতে বেরিয়ে—ফিরলেন সেই বিকেল চারটের পর। ভেবে মরি সারাদিন। তাতে ওঁর কী বল্। কোন পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল, তাঁর কী সব বিষয় সম্পত্তির গোলমাল চলেছে সেই কাগজপত্তর নিয়ে পড়েছিলেন, সেখানেই খাওয়া-দাওয়া করেছেন। আমার যে কী করে দিন কেটেছে সে জানেন অন্তর্য্যামী।

কনক। ওমা, মেসোমশাই এখনও এইরকম করেন? বাবার কাছে শুনেছি, অল্পবয়সে অমনি বলা নেই কওয়া নেই কোথায় দেশ-বিদেশে ঘুরতে যেতেন।

সুমিত্রা। সেই লোকের ছেলে তো তোর ছোড়দা। এই পরশুদিন বিকেলে কোথায় মিটিঙ ছিল, ফিরে এল এক প্রহর রাত্তিরে।- সে যা অবস্থা যদি দেখতিস মা! জামা কাপড় ছেঁড়া, মাথায় গায়ে ধুলো-কাদা-মাখা, কপালটা ফুলে আছে,—জিজ্ঞেস করতে একটু হেসে সরে গেল। তার পর কাল কাগজে পড়লুম, কোথায় ছেলেদের সভায় পুলিশ নাকি লাঠি চালিয়েছিল, গুলি ছুঁড়েছিল, ছেলেদের চারজন হাঁসপাতালে।

কনক। তুমি যে কিছু বল না, তাইতেই তো যা খুশী করে বেড়ায়।

সুমিত্রা। তুই বলিস আমি কিছু বলিনা, আর তোর দাদা বলে আমি সব কথায় কথা কই কেন, সব কথা নিয়ে ভাবি কেন।

কনক। আমি কতদিন থেকে বলে আসছি, তা তোমরা তো শুনবে না। আচ্ছা, একবারটি দেখই না বাপু মেয়েটাকে। আমার বন্ধু বলে বলছি না, এমন চমৎকার মেয়ে, একটিবার দেখলেই তুমি ভালবাসবে। তারও ছোট্টবেলা থেকে মা নেই, তোমার মতো মা পেলে সেও ধন্য হয়ে যাবে।

সুমিত্রা। না মা, মিথ্যে মা সাজার সাজা যথেষ্ট পেয়েছি, আর নয়। ও লোভ আর নেই। পরের ছেলে মেয়ের মা হওয়ার সাধ আমার মিটেছে। আর দেখার কথা যদি বলিস, আমিই বা মেয়ে দেখে কী করব মা?

কনক। তুমি মেয়ে দেখবে না, তবে দেখবে কে? বেশ কথা তো তোমার।

সুমিত্রা। কী করতে দেখব মা? তোর মেসো তো খোকার বিয়েই দিতে চান না।

কনক। সে কী?

সুমিত্রা। বলেন, বিয়ে আমি দেব না। ওর যখন ইচ্ছে হবে, বিয়ে যদি করে সে আলাদা কথা, কিন্তু আমি দিতে চাই না।

কনক। ওমা, সে কী গো! ও যদি বিয়ে করতে না চায়—

সুমিত্রা। বলেন, না চায় সে তো ভালই। বিবেকানন্দ বিয়ে করেন নি, সুভাষচন্দ্র বিয়ে করেন নি, প্রফুল্লচন্দ্র বিয়ে করেন নি। বলেন, এদেশে শেকল-পরা ছেলে লক্ষ লক্ষ আছে, অতিরিক্ত আছে, আর চাইনে। এখন চাই শেকল-না-পরা ছেলে একদল, যারা খোলা পায়ে আকাশ পৃথিবী জয় করে বেড়াবে।

কনক। শেকল? তুমি বলতে পার না যে বিদ্যাসাগর শেকল পরেও বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন, শেকল পরেও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে জয় করে ভারতে টেনে এনেছেন, জগদীশচন্দ্র শুধু শেকল পরে নয়, শেকল সাথে করেই পৃথিবী জিতে এসেছিলেন, অত বড় দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজের শেকল যিনি ভেঙ্গে দিয়েছেন সেই গান্ধী চিরকাল গলার হার করে রেখেছিলেন কস্তুর বা'কে, শেকলের বোঝা মনে করেন নি, শেকল-পরা আশুতোষ, শেকল-পরা জহরলাল, শেকল-পরা আজাদ—কত বলব? শেকল!

সুমিত্রা। আমি কি তোদের মত অমন করে গুছিয়ে বলতে পারি, না অত কথাই জানি? তুই বলিস মা।

কনক। বলবই তো। এখনই বলব। শেকল বই কি!

সুমিত্রা। তা বলিস। এখন আয়, একটু জল খাবি আয় মা, কলেজ থেকে এখনও বাড়ী যাসনি। আয়।

কনক। না মাসীমা, রাখো তোমার জলখাবার। আমার মাথায় রক্ত ফুটছে এখন। আগে মেসোমশায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে আসি, তারপর খাওয়া। বলে আসি মেয়েরা শেকল নয়, মেয়েরা—

সুমিত্রা। তা বেশ তো আগে খেয়ে যা। তারপর ঝগড়া করিস।

কনক। না, আগে ঝগড়া তারপর খাওয়া।

(সিঁড়ির দিকে চলিল)

সুমিত্রা। তা বলে নীচে থেকেই চলে যাসনি কনক, আমি খাবার দিতে যাচ্ছি।

কনক। তা দাও, আজ ডবল খাবার দিও। ঝগড়া করে মেসোমশায়ের মত বদলে তোমার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করে আসব দেখ না।

সুমিত্রা। (সহাস্যে) এ মেয়েও তেমনি পাগল!

সুমিত্রার অন্তঃপুরের দিকে প্রস্থান

কনক। (যাইতে যাইতে) তোমাকে দেখেও মেসোমশাই বলতে পারলেন মেয়েরা শেকল? বলতে পারলেন না যে মেয়েরা—

ততক্ষণে সে সিঁড়ির কাছে গিয়াছে, পিছনে মিষ্টার মজুমদার বইয়ের আড়াল হইতে কথা কহিল—

মজুমদার। মেয়েরা চন্দন—

কনক চমকিয়া দাঁড়াইয়া এদিকে ফিরিল

কনক। ওমা, আপনি এখানে বসে আছেন?

মজুমদার। মেয়েরা চন্দন, যাকে ছোঁয়—কয়লাকেও,—শুভ্র করে, সুরভিত করে।

কনক। ঠিক বলেছেন !

মজুমদার। মেয়েরা দীপ, নিজে পুড়েও জগৎকে আলো দেয়—

কনক। (উৎসাহিত হইয়া) ঠিক, ঠিক, মিঃ মজুমদার, বলব মেসোমসাইকে, মেয়েরা দীপ, মেয়েরা চন্দন—

মজুমদার। বোলো, মেয়েরা বিদ্যুৎ, জড় পদার্থেও গতি আনে, উত্তাপ আনে, শক্তি আনে। মৃত দেহে প্রাণ আনে।

কনক। (সোচ্ছ্বাসে) বাঃ ! আপনি এমন চমৎকার কথা বলতে পারেন ? অথচ লোকে বলে আপনি—(হঠাৎ থামিয়া গেল)

মজুমদার। পাগল, না ? যারা বলে তারা ঈর্ষায় বলে, অজ্ঞানতায় বলে, সে সব মূঢ়দের তুমি মার্জ্জনা কোরো, তাদের কথা তুমি ধোরো না। যাও, এবাড়ীর ঐ মূঢ় লোকটির ভুল ভেঙ্গে দিয়ে এস।

কনক। আচ্ছা, আমি এখুনি আসছি। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

মজুমদার সিগারেটের অবশিষ্টাংশ হইতে একটি নূতন সিগারেট ধরাইয়া লইয়া পুনরায় পুস্তকে মনোনিবেশ করিল।

ক্ষণ পরে প্রবেশ করিল জয়ন্ত। তাহার রুক্ষ অবিন্যস্ত কেশ, অযত্ন-বর্দ্ধিত গোঁফ ও দাড়ি, মলিন ধুতি পাঞ্জাবি পরণে। মুখে ও চালচলনে একটা উৎকণ্ঠিত চকিত ভাব। সে ঘরে মজুমদারকে দেখিবার আশা করে নাই।

জয়ন্ত। (হঠাৎ দেখিয়া চমকিয়া) মিষ্টার মজুমদার !

মজুমদার। (বই নামাইয়া) ইয়েস ? বল।

জয়ন্ত। না, কিছু না। (চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া) আচ্ছা, বলি আপনাকে।

মজুমদার। নিশ্চয় বলবে।

জয়ন্ত। (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) শ' পাঁচেক টাকা দিতে পারেন মিষ্টার মজুমদার ?

মজুমদার। পাঁচ শো টাকা ? তাই তো।

জয়ন্ত চার শো ? আমি দিয়ে দেব আপনাকে।

মজুমদার। দিয়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। তোমারই তো আমার কাছে পাওনা হবে প্রায়—(পকেট হইতে নোটবুক বাহির করিয়া দ্রুত পাতা উলটাইতে লাগিল) প্রায় সাড়ে তিন শো'র ওপর। তা ছাড়া তোমার বাবার তো—

জয়ন্ত। সে দেনা পাওনার হিসেব চাইছি না। সে হিসেবেও চাইনি। টাকা আছে আপনার কাছে ? পারেন দিতে ?

মজুমদার। অত্যন্ত দুঃখিত জয়ন্ত। তবে তোমার বাবার কাছ থেকে আমি চেয়ে—

জয়ন্ত। না, না, বাবাকে কিছু বলবেন না। তাঁকে বলা যেতে পারে না। কিন্তু আর দুঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ পাঁচশো টাকা জোগাড় করতে না পারলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। কী যে করি !

মজুমদার। বলা বাহুল্য নিশ্চয় যে তোমার টাকা কড়ি সব খরচ হয়ে গেছে।

(জয়ন্ত নীরব, চিন্তাকুল।)

তা যাক। দুঘণ্টার মধ্যে পাঁচ শোটা টাকা পাওয়া তোমার পক্ষে তো শক্ত নয় বাবা, কিন্তু তোমার বাবাকেও বলতে পারছ না, সেইটেই বেশি গুরুতর ঠেকছে।

জয়ন্ত। সে কথা কাকেও বলা চলে না।

মজুমদার। তোমার বাবা তোমার বেষ্ট্ ফ্রেণ্ড্।

জয়ন্ত। দি ভেরি বেষ্ট। কিন্তু মন্ত্র আর মন্ত্রণা উচ্ছিষ্ট করা নিষেধ, জানেন তো ? আমি চল্লুম।

মজুমদার। দাঁড়াও, তোমার বাবা তোমার বেষ্ট ফ্রেণ্ড। কিন্তু তোমার বাবা আমার ওন্‌লি ফ্রেণ্ড। সুতরাং, থ্ আওয়ার কমন ফ্রেণ্ড, কান্‌ট উই বি ফ্রেণ্ড্‌স্ ম্যাজ্ ওয়েল্ ? (হাত বাড়াইল) আমাকে তোমার বন্ধু বলে মনে করতে পার না ?

জয়ন্ত তথাপি নীরব। মজুমদার হাত টানিয়া লইল।

মুখে আনলে যা উচ্ছিষ্ট হয় না, যা মন্ত্রও নয়, মন্ত্রণাও নয়, এমন কোনও কথাই কি নেই জয়ন্ত ? কিছু বলতে পার না আমাকে ? তোমার প্রব্‌লেম্ ?

জয়ন্ত (চিন্তিত ভাবে) প্রব্‌লেম্ ? কিন্তু—(চুপ করিয়া গেল)

মজুমদার। বুড়ো মানুষ। গুড্ ফর্ নাথিং, ভ্যাগাবণ্ড্। কিন্তু বিশ্বাস করলে ঠকবে না বাবা।

জয়ন্ত। আমার বাবা যাঁকে বন্ধু বলে জানেন, তাঁকে আমি চোখ-বুজে বিশ্বাস করতে পারি। কিন্তু এ বিশ্বাস যে আমার নিজস্ব নয়। আমি একা—(কী বলিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিল ও ক্ষণকাল পরে বলিল) নাঃ, বলবার আর কিছু নেই মিষ্টার মজুমদার। আবার বলতে চাই অনেক কথাই। আই য়্যাম্ ইন্ এ ক্রস্ রোড, তেমাথার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

মজুমদার। কাফ ইট্ আউট্ মাই বয়। মুখ ফুটে বলে ফেলাই ভাল। হয় তো সামান্য একটু কাজে লেগে যেতেও পারি। (কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া) অনেক রাস্তা হেঁটে এসেছি, অনেক তে-মাথা, অনেক ক্রস্ রোড ছিল তার মধ্যে।

জয়ন্ত। না, আমি ভুল বলেছি। তে-মাথার মোড় আমি ছাড়িয়ে এসেছি। রাস্তা আমি ধরেছি, ডাইনে বাঁয়ে বাঁকবার পথ পেছনে পড়ে আছে, পিছু ফেরবার সময় আর নেই।

মজুমদার। 'উই লুক্ বিফোর এণ্ড্ আফ্‌টার,
এণ্ড্ পাইন্ ফর্ হোয়াট ইজ্ নট্।

আমাদের কবিও বলেছেন, 'সামনে যখন যাবি ওরে, থাকনা পিছন পিছে পড়ে', আবার একথাও বলেছেন না, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না' ? হ্যাঁ, কী বলছিলে ?

জয়ন্ত। এখন আমি—কিন্তু আপনাকে বলে কোনও ফল নেই—একস্‌কিউজ মি মিষ্টার মজুমদার, আমি সে ভাবে বলিনি।

মজুমদার। (হাসিমুখে) তুমি ঠিকই বলেছ বাবা, আমাকে বলে কোনও ফল হবে না, সুফলও না, কুফলও না। অতএব যতটুকু ইচ্ছে হয় নির্ভয়ে বলতে পার।

জয়ন্ত। (একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া) মা চেয়েছিলেন ছেলে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে, স্ত্রীপুত্র দাসদাসী পুজোপার্বণ নিয়ে দশজনের একজন হয়ে সুখের বাঁধানো বড় রাস্তায় চলুক। মায়ের ইচ্ছে ছাড়াও সে পথের মোহ আমাকেও টেনেছিল একবার। কিন্তু যার মোহ তারই জন্যে সে পথে চলা হল না। যাক। বাবা চেয়েছিলেন অন্য রকম। সস্তা সুখ দুঃখের ছোট গণ্ডীর বাইরে, সাত কোটী বাঙ্গালীর সন্তানের মাথা ছাড়িয়ে তাঁর ছেলের মাথা উঁচু হতে দেখবেন। 'রেখেছ বাঙ্গালী করে, মানুষ কর নি,' এ কলঙ্ক যেন না লাগে।

মজুমদার। তোমার বাবা যখন তোমার বাবা হন নি, তখন, সে অনেক দিন আগের কথা, তিনি দুবার রামকৃষ্ণ মঠে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তার পরে তিনি ছিলেন সুরেন বাঁড়ুজ্যের গাড়ী টানবার পাণ্ডা। তোমার ঠাকুর্দ্দা মশায় তোমার মাকে এনে বেলুড়ে যাবার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বুড়ো নিজে মরে তোমার বাবাকে সুরেন্দ্রনাথের গাড়ী থেকে খুলে সংসারের গাড়ীতে জুতে দেন। সেই কৌমার্য্যের আদর্শ, সেই বিশ্ব উদ্ধারের স্বপ্ন তো মরে নি। সেগুলো তোমার মধ্যে দিয়ে—যাক, নিজেই বকে যাচ্ছি। তারপর?

জয়ন্ত। বাবার এ পথেও টিকতে পারলুম না। ঠিকই বলেছিল অনুরাধা। মিটিং করে দেখলুম, বক্তৃতা দিয়ে দেখলুম, আর্টিকেল্ লিখে দেখলুম। সব নিরর্থক, সব প্লে-অ্যাকটিং। ফায়ারী স্পীচ্ দিয়ে কিছু জ্বলে না। কাগজ জুড়ে আগুন আগুন লিখলেও কাগজে একটা ধোঁয়ার দাগও পড়ে না। মাথা পেতে লাঠী খেয়ে দেখলুম, তাতে বীরত্ব থাকতে পারে, কৃতিত্ব কিছু নেই। দেখলুম রেজোলিউশনের চেয়ে রেগুলেশন বেশি কনভিন্সিং। খাদির চেয়ে খাকি মজবুত। ফায়ারি টাংএর চেয়ে ফায়ার আরম্ অনেক বেশি শক্তিমান। ওঃ, সে কী জ্বালা, সে কী অশান্তি! আপনি চিরকাল শান্ত মানুষ, বুঝতে পারবেন না সে কী ভীষণ অবস্থা।

মজুমদার। হুঁ, বোঝা শক্ত, তা মানি বইকি। কিন্তু তাই বলে কি—

মুখের সিগারেট হাতে লইয়া মজুমদার জয়ন্তকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া চুপে চুপে কী বলিল। শুনিয়াই জয়ন্ত বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মজুমদারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—

জয়ন্ত। স্পাই!

মজুমদার। (সিগারেট মুখে তুলিয়া) ছি জয়ন্ত, ডোন্ট্ গিভ্ ইওর-সেল্ফ্ অ্যাওয়ে। এত অল্পে ধরা দেওয়া তো ভাল নয় বাবা, যে গুরুভার নিয়েছ—

জয়ন্ত। (মজুমদারের দুই কাঁধ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া) সত্যি কথা বলুন, আপনি কে? নইলে আজ—আজ…(উত্তেজনায় তাহার কথা যেন বন্ধ হইয়া আসিল)

ঝাঁকানিতে মজুমদারের মুখ হইতে সিগারেট পড়িয়া গিয়াছিল, সেইটি ধীরে উঠাইয়া মুখে দিয়া মজুমদার শান্ত কণ্ঠে বলিল—

মজুমদার। এত উত্তেজিত হওয়া তোমাদের সাজে না জয়ন্ত। ট্রাষ্ট, বিগেট্স্ ট্রাষ্ট্। বিশ্বাসই বন্ধুত্বের সিমেণ্ট। তোমার বাবার আমি ওল্ড্ ফ্রেণ্ড্, বহুদিনের পুরোণো বন্ধু। তোমারও আমি ওল্ড্ ফ্রেণ্ড্, বৃদ্ধ বন্ধু। বন্ধুকে বিশ্বাস করা উচিত—

(বলিতে বলিতে জামার বোতাম খুলিতেছিল, এখন বক্ষ অনাবৃত করাতে, তাহার হাত ও চোখ অনুসরণ করিয়া জয়ন্ত সেই অনাবৃত বক্ষের দিকে তাকাইল)

জয়ন্ত। (শিহরিয়া) ঈ—স্! হরিবল্! এ কী?

মজুমদার। (জামার বোতাম লাগাইতে লাগাইতে) পট্কা ফেটে গিয়েছিল একটা।

জয়ন্ত। পট্কা ফেটে? অসম্ভব। কত বড় পট্কা?

মজুমদার। হ্যাঁ বাবা, একটু বড় বোধ হয় ছিল! ছেলেবেলার দুর্বুদ্ধি। বাজী তৈরী করা। গ্রামে লাট সাহেব আসছেন, তাঁর গাড়ীর মধ্যে ফায়ার ওয়ার্কস্ দেখিয়ে একেবারে চক্ষুস্থির করে দেব তাঁর। লাট সাহেবের বরাতে নেই। তৈরী করতে করতে দু একটা পট্কা ফেটেও যায় তো।

জয়ন্ত। (চিন্তিত ভাবে) লাটসাহেব? কোন্ লাটসাহেব?

মজুমদার। অত কি মনে আছে বাবা? বুড়ো মানুষ।

জয়ন্ত। আপনি—আপনি কি—?

মজুমদার। (ম্লান হাসিয়া) ঠিকই ধরেছ বাবা, আমি।

বলিয়া মজুমদার ঈষৎ মাথা নাড়িল।
জয়ন্ত হাতজোড় করিয়া বলিল—

জয়ন্ত। মিষ্টার মজুমদার, আমাকে মাপ করুন।

মজুমদার। করেছি।

জয়ন্ত। কিন্তু কখনও তো এ কাহিনী বাবার কাছেও শুনি নি।

মজুমদার। কারণ তো বলেছি। অবনীর আমি ওল্ড্ ফ্রেণ্ড্। ঠিক যেমন তোমার কাছেও এই ওল্ড্ ফ্রেণ্ডের গল্প কেউ শুনবে না।

জয়ন্ত। আপনার কাছে আবার মাপ চাইছি। কিন্তু আর তো বসলে চলবে না। টাকার জোগাড় না করলে সমস্ত প্ল্যান নষ্ট হয়ে যাবে। আমি আসছি, জামাটা বদলে আসি।

(সিঁড়ি বাহিয়া উপরে প্রস্থান করিল)

মজুমদার পুনরায় একটি সিগারেট ধরাইল।
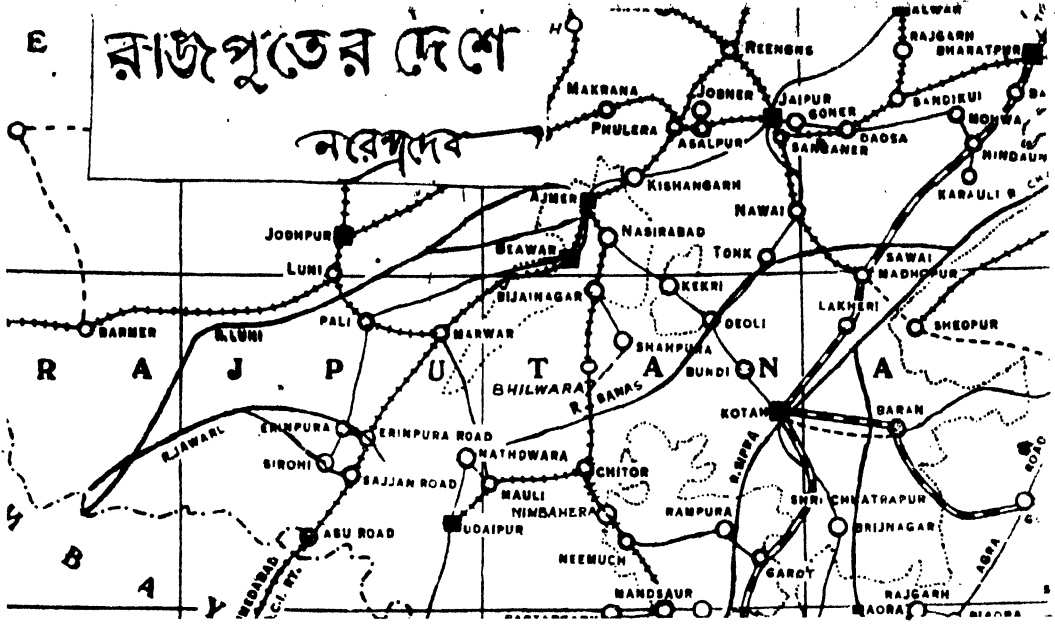
মাউণ্ট আবু—নখীহ্রদ ও 'সান্-সেট-পয়েণ্ট'

তিন রাত্রি ধরে চলেছিল এই দেওয়ালী উৎসব। দেওয়ালীর আনন্দ ও উত্তেজনা শেষ হ'তে না হ'তে লেগেছিল সেখানে মহাসমারোহে এক বিবাহ উৎসব। আমেদাবাদের কোটী পতি এক মিল-মালিকের পুত্র পিতামাতার অসম্মতি ও অনিচ্ছা উপেক্ষা করে এখানে পালিয়ে এসে বিবাহ করলেন একটি প্রসিদ্ধ চিত্র-তারকাকে। মাউণ্ট-আবুর সিনেমা হাউসের কল্যাণে সেই চিত্র-তারকা ছিলেন এখানে সর্ব্বসাধারণের জনপ্রিয়া। কাজেই এ বিবাহে আবু শহরের ইতরভদ্র সবাই মহা উৎসাহে ও আনন্দে যোগ দিয়েছিলেন। বরিয়াতের সে কি বিরাট মিছিল! রাজপুত বীরের বেশে সজ্জিত অশ্বারোহী বরকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল! প্রিয়দর্শন তরুণ যুবা। কন্যাটিও যে রূপসী একথা বলাই বাহুল্য! মোটর সার্ভিস ষ্টেশনের পাশেই ছিল বরের বাড়ী। বিবাহের পরই সেই রাত্রেই বর ফিরে এলেন কন্যাকে নিয়ে, তাই আমাদের বর কনে দেখবার খুব সুযোগ হয়েছিল। আমরা আমাদের রিটায়ারিং রুমের বারান্দা থেকেই দেখতে পাচ্ছিলুম কনেকে বরণ করে ঘরে তুলে নেওয়া! সমস্ত আবু শহর যেন ভেঙে পড়েছিল বরের বাড়ী!

রিটায়ারিং রুমের ঘরগুলি ভালো। প্রতি ঘর ৫৲ হিসাবে আমাদের প্রতিদিন ১০৲ টাকা দিতে হয়েছিল। একটি ঘর আমাদের—'ফর জেণ্টস্!' আর একটি ঘর 'ফর লেডিজ!' অর্থাৎ, একঘরে আমি ও বন্ধুপুত্র আশ্রয় নিয়েছিলাম, অন্য ঘরে শ্রীমতী, তাঁর কন্যা ও তাঁর বান্ধবী দখল করেছিলেন। ভোলানাথ ঘেরা দালানের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল।

বেশ বড় বড় এক একখানি ঘর। আন্দাজ ২০ ফিট × ৩০ ফিট হবে। ঘরের সামনে চওড়া দালান। দালানটি আবার জাফ্‌রি দিয়ে ঘেরা। এটিকেও প্রায় ঘর বলা চলে। এই দালানে বেতের চেয়ার টেবিল সাজানো। অনেকটা মফঃস্বলের বা ডাকবাংলোর ড্রয়িংরুমের মতো। প্রতি ঘরের মধ্যে তিন খানি করে গদী দেওয়া বম্বেপ্যাটার্ণ চওড়া সিংগল্ খাট, তিনটি সাইড্ টেবিল, একটি রাইটিং টেবল ও চেয়ার। মধ্যে ডাইনিং টেবিল ও চার খানি ডাইনিং চেয়ার। একটি করে পূর্ণাবয়ব আয়না লাগানো পোষাক-রাখা আলমারী, দুটি আলনা, চামড়ার গদী মোড়া বড় বড় আরাম চৌকী দু'খানি। প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন একটি করে প্রশস্ত সুসজ্জিত ড্রেসিংরুম ও বাথরুম। ঘরের বড় বড় দোর জানালায় বাহারি কার্টেন। প্রত্যেক ঘরে একাধিক ইলেকট্রিক লাইট ফিট করা

দৈনিক পাঁচ টাকা হিসাবে ঘরের ভাড়া আমাদের অল্প বলেই মনে হল।

পথ প্রদর্শক

এ পর্য্যন্ত কোথাও আমাদের গরম কাপড় ব্যবহার করতে হয়নি, কিন্তু এখানে এসে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহেই গরম কাপড়ের বাক্স খুলতে হল। কন্ কনে ঠাণ্ডা। রাত্রে কেবলমাত্র রাগে শীত ভাঙেনা। তার উপর লেপ নিতে হ'ল।

সকালে উঠে কাশ্মিরী কম্বলের ড্রেসিং গাউনটা চড়িয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে দেখি সামনেই বিস্তীর্ণ পোলো গ্রাউণ্ড ও গলফ কোর্স। তারপরেই পাহাড়। বাঁদিকে পাহাড়ের অদূরে সিরোহী রাজপ্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। দক্ষিণে জয়পুরের সুদৃশ্য শৈলাবাস। পর্ব্বত শিখরের অন্তরালে তখন সূর্য্যোদয় হ'চ্ছিল। পূবের আকাশ অরুণচ্ছটায় রক্তিম হ'য়ে উঠেছে। প্রাসাদ চূড়ায় ও তরুশীর্ষে দীপ্ত হয়ে উঠেছে সেই প্রভাত তপনের রঙীণ জ্যোতি! আবু পর্ব্বতের একটা বিশেষত্ব চোখে পড়লো এই যে, সমতল ভূমির যা কিছু অরণ্য সম্পদ তা সমস্তই এই ছ' হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ের উপর কোন খেয়ালী শিল্পী যেন তুলে এনে সাজিয়ে দিয়েছে! অগণিত শাল তমাল পিয়াল দেবদারু খর্জ্জুর অশথ বট প্রভৃতি বৃক্ষ ও ওষধিতে পরিপূর্ণ। পুষ্পিত তরুলতারও অভাব নেই। যূথি জাঁতি চম্পক কুরুবক কদলী আম্র পনস প্রভৃতি দেশী ও বিলাতী ফলফুলের অসংখ্য গাছ। মাঝে মাঝে নিবিড় ঘন বেণুকুঞ্জ! নিমেষে ভুলে গেলুম যে আমরা ছ'হাজার ফিট উপরে পর্ব্বত শিখরে উঠে এসেছি। এ যেন ভারতের কোন পঞ্চবটী বা জেতবন!

পাহাড়ের উপরের পথ সর্ব্বত্রই দেখেছি কেবল চড়াই উৎরাই, ভীষণ উঁচু নীচু। চলতে চলতে নেমে যাওয়া যায় বেশ, কিন্তু উঠে আসতে প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ। আবু পাহাড়ের পথ কিন্তু প্রায় সমতল ভূমিরই মতো। উঁচু নীচু এত সামান্য যে সে টেরই পাওয়া যায় না। শ্রীমতী তাড়া দিলেন চা' জলখাবার তৈরী। খেয়ে নিয়ে বাজারে যাও। মাছ মাংস তরি তরকারী কিনে আনো। আমরা আজ রান্না

নখী হ্রদের তীরে

রে তোমাদের খাওয়াবো। পাশের ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখি সেই সামনের দালানের একপাশে রান্না ঘর সাজিয়ে ফেলা হয়েছে। চা, চিনি, জমাট দুধ, মাখন, কাপ ডিস্ কেটলি, ষ্টোভ, ইকমিক কুকার, কেরসিন, স্পিরিট জ্যাম জেলি বিস্কুট কেক্ প্রয়োজনীয় কোনও কিছুরই অভাব ছিলনা। ছ' জন লোকের সঙ্গে ২২টি লগেজ নেওয়া হ'চ্ছে দেখে আমি বেরুবার সময় যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলুম। আমাকে বেশ কড়া করেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে এর একটিও বাদ দেওয়া চলবে না। এখন বুঝতে পারলুম আমাদের সঙ্গে সমস্ত সংসারটাই এসেছে।

সহিসকে বললুম, দাদাবাবুকোওয়াস্তে একঠো মজবুদ ঘোড়া লে আও। সহিস বিনীতভাবে যা জানালে তার সার মর্ম্ম হচ্ছে এই যে এখানে কেবল বাচ্ছাদের জন্তই ঘোড়া পাওয়া যায়। জোওয়ান আদমিদের জন্ত পাওয়া যায় না।

সেদিন যা পরিতৃপ্তির সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন হল, বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পর্য্যন্ত এ রকম আহারে আরাম পাওয়া যায় নি। শ্রীমতীর মুখে শুনেছিলুম বটে তাঁর বান্ধবীটি নাকি দ্রৌপদীর স্তায় রন্ধন-নিপুণা। এবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি শ্রীমতীকে কিছুই করতে দেননি। শ্রীমান ভোলানাথ তাঁকে যোগাড় দিয়েছে এবং তিনি একাই সব রেঁধেছেন। পালং শাকের তরকারী থেকে টোমাটোর শুস্ পর্য্যন্ত যেন অমৃতের আস্বাদ পাওয়া গেল! ইক্‌মিক কুকারে পাক করা মাংস মনে হ'ল যেন কোনও বড় হোটেলের প্রধান চেফের তৈরি স্পেশ্যাল মীট ডিশ্! ব্যস্! এরপর আর কে রেস্তোরাঁয় খায়? আবু পাহাড়ে আমরা যে দশদিন ছিলুম প্রত্যহ গৃহপক্ক আহার্য্য পরম আরামে উপভোগ করেছি। এর জন্য অবশ্য সমস্ত কৃতজ্ঞতা শ্রীমতীর বান্ধবীটিরই প্রাপ্য।

নখীহ্রদের বুকে

ভোলানাথকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধুপুত্রসহ আমি বাজারের দিকে রওনা হলুম। নবনীতাও সঙ্গ নিলে। পথে নামতেই এক ছোকরা সহিস একটি সুশ্রী পনি নিয়ে এসে হাজির। হুজুর বাবা লোককে ওয়াস্তে ঘোড়া! নবনীতা একেবারে অসংযত হ'য়ে উঠলেন—ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার জন্ত। ঘণ্টায় ১৲ টাকা হিসাবে চুক্তি করা গেল। রোজ সকালে সে নবনীতাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে ঘুরিয়ে আনবে।

বন্ধুপুত্র বললেন, বুড়িকে একলা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সইস্‌টা নেহাৎ ছেলেমানুষ। বুড়ির সঙ্গে আমিও যাই। নবনীতার সঙ্গে তার এই দাদাটির ভাব যত, ঝগড়াও তত।

আবু পাহাড় হ'ল পুরাণোক্ত অর্ব্বুদ পর্ব্বত। প্রাচীন ঋষিরা এটিকে 'জ্ঞান-গিরি' বলে উল্লেখ করতেন, কারণ এখানে পুরাকালে বহু জ্ঞানী মহাপুরুষ ও সাধকের আশ্রম ছিল। কেউ কেউ এজন্য অর্ব্বুদ পর্ব্বতের নাম দিয়েছিলেন —'তপঃশিখর!'

রাজপুত অভ্যুদয়ের শৌর্য্য বীর্য্যের যুগে এর নাম হয়েছিল 'রাজপুত স্বর্গ!' কতযুদ্ধ হয়ে গেছে এই পাহাড়ের অধিকার নিয়ে। কত রাজ্যের—কত রাজারইনা উত্থান পতন দেখেছে

এ নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে। সে সব অতীত ইতিহাস বর্ণনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। বিন্ধ্য,হিমাচল ও কৈলাসের মতো এই অর্ব্বুদ পর্ব্বতও ছিল দেবগণের লীলাভূমি।

নখীহ্রদের শেষ প্রান্ত

বহু সিদ্ধ যোগীর নিভৃত গিরিগুহা, দেব দেবীর বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন মন্দির এখনও এখানে অতীত গৌরবের অক্ষয় স্মৃতি বহন করছে।

সিরোহী রাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত এই আবু পাহাড়। আরাবল্লী গিরি শ্রেণীর সঙ্গে এর কোনও প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই বটে; কিন্তু সান্নিধ্য নিকটতম। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম 'গুরু শিখর'—উচ্চতা সাগর সমতল হ'তে ৫৬৫৩ ফিট। ইংরাজ আমলে এখানে আধুনিক সভ্যতার সব কিছু বিলাস ও আরামের ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে, প্রাচীন মর্য্যাদা ও গৌরব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আভিজাত্য ও অহঙ্কার যেন পরস্পরকে এখানে আলিঙ্গন ক'রছে।

এখানে যে শুধু রাজপুতানারই সৌখীন অধিবাসীরাই পদার্পণ করেন তাই নয়,আমেদাবাদ,গুজরাট ও বোম্বাইয়ের ধনী ব্যবসায়ীরাও প্রায়ই এই পর্ব্বতের শান্ত শীতল ক্রোড়ে তাঁদের দেহমনের শ্রান্তি দূর করতে আসেন। বহু গুজরাটী ও জৈন তীর্থযাত্রী আসেন, দিলবারা মন্দির দর্শনে। এখানকার আবহাওয়া ভারি সুন্দর। পাহাড়ী শীত বলতে যা মনে হয় তা নেই এখানে। এখানকার শীত বেশ প্রীতিপ্রদ! ইংরাজীতে যাকে বলে উপাদেয় ঠাণ্ডা—deliciously cold! বিশেষ করে এই অক্টোবর নভেম্বরে।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়,একাদশ শতাব্দীতে আবু পাহাড় ছিল প্রামারা রাজপুতদের অধিকারে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রামারাদের যুদ্ধে পরাস্ত করে সিরোহী রাজপুতেরা এই পার্ব্বত্য রাজ্য জয় করে নিয়েছিলেন। ১৮২২ খৃঃ অব্দে রাজস্থান রচয়িতা কর্ণেল টড য়ুরোপীয়ানদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আবু পাহাড়ে পদার্পণ করেছিলেন। আবুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এবং প্রাচীন জৈন-মন্দির দিলবারা ও গিরিদুর্গ অচলগড়ের অপূর্ব্ব স্থাপত্য কলার পরিচয় তিনিই প্রথম ভারতের বাইরে প্রচার করেন।

সান্‌সেট্ পয়েন্টে যাত্রা

১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট আহত ও রুগ্ন ব্রিটীশ সৈন্যদের জন্য এখানে একটি স্বাস্থ্য-নিবাস নির্ম্মাণ করে পাহাড়ের উপরের জমি খানিকটা সিরোহী রাজার নিকট চেয়ে নিয়েছিলেন। সিরোহীরাজ এই সর্ত্তে ইংরাজকে জমি

দিয়েছিলেন যে তারা কথনও এথানে গোহত্যা করবে না এবং গোমাংস থাবে না।

সুদীর্ঘ ৭২ বছর এথানে সুখ-ভোগের পর—এথানকার সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট মাত্র ১৯১৭ খৃঃ অব্দে তদানিন্তন সিরোহী মহারাজের নিকট সমস্ত আবু পাহাড়টাই স্থায়ীভাবে লীজ নিয়েছেন। সেই থেকে আবু পাহাড়ের নানাদিক দিয়ে উন্নতি হ'তে সুরু হয়েছে। মোটর যাবার উপযোগী পীচের রাস্তা, জলের কল, বিজলী বাতী, এ সবই ইংরেজের ব্যবস্থা।

আবু পাহাড়ে আমরা এসেছিলুম এথানকার দুটি জিনিসের আকর্ষণে। আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিশ্বশ্রুত জৈন মন্দির দিলবারা দেখা ও সিরোহীপতির বীরত্ব-গাথামণ্ডিত ইতিহাসবিশ্রুত 'অচল গড়' দুর্গ দেখা। পর্ব্বতবাসের বিলাস কুতূহল আমাদের মনে কিছুমাত্র ছিল না। বিশেষতঃ আসবার আগে আমাদের পরিচিত আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা দিলবারা মন্দির দেখে গেছেন তাঁদের প্রত্যেকের মুখেই শুনেছিলুম আবুপাহাড়ে কিছুদিন বসবাস করবার মতো কোনও রকম আশ্রয় পাবার উপায় নেই। একমাত্র বহু ব্যয়সাধ্য ইংরাজী অতিথিশালা রাজপুতানা হোটেল আছে, যা অধিকাংশ সময়ই যাত্রীপূর্ণ থাকায় স্থান মেলা অসম্ভব বললে অত্যুক্তি হবে না।

সূর্য্যাস্তের দৃশ্য

এথানে এসে বুঝলুম, তাঁরা ভুল সংবাদ দিয়েছেন। এথানে থাকবার জন্ম 'ডাক বাঙ্‌লা' ত' আছেই, তা ছাড়া আছে একাধিক দেশী হোটেল, যাদের সুসজ্জিত সুন্দর কক্ষে বসবাস এবং দুবেলা আহার, চা ও জলযোগের ব্যয় মাত্র দৈনিক চার টাকা। দশ আনা থেকে এক টাকা মাত্র ঘর ভাড়ায় 'বিশ্রাম ভবন', রঘুনাথজী ধর্মশালা, শান্তি-বিজয় সেবা সদন প্রভৃতি অতিথিনিবাস আছে তীর্থযাত্রীদের জন্য।

অভিজাত নিবাস রাজপুতানা হোটেলে য়ুরোপীয়ানদের সমান মর্য্যাদায় ভারতীয়েরাও স্থান পান্।

আবু পাহাড়ের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলির চিত্তাকর্ষক নাম শুনে পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি দেখে আসবার আগ্রহ আমাদের ক'জনেরই মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল। খোঁজ খবর নিয়ে শোনা গেল দু'চারটি দর্শনীয় স্থান দু'এক মাইলের মধ্যেই আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থানেরই দূরত্ব দশ বারো মাইলের কম নয়।

মোটর সার্ভিস স্টেশনের উপরেই বসে রয়েছি আমরা। অনেকগুলি ভালো ভালো মোটর রয়েছে এদের। হ'লই বা একটু দূর। পাহাড় ভেঙে যাবার কোনও ভাবনা নেই। পাহাড়ের উপর মোটর রোড ও বাস্ চলাচলের চমৎকার রাস্তা রয়েছে। আমাদের সব কিছুই দেখা হবে।

আবু মোটর সার্ভিসের ম্যানেজারকে এথানকার সকলেই "পণ্ডিতজী" বলেন। গিয়ে বললুম—পণ্ডিতজী, আমাদের একথানি গাড়ী দিন। আমরা এথানকার সব দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে আসতে চাই।

পণ্ডিতজী বললেন, আমার গাড়ী তো আপনাদের জন্যই, কিন্তু অত্যন্ত দুঃথের বিষয় যে আমার হাত পা বাঁধা। ম্যাজিষ্ট্রেটের পারমিট্ ছাড়া কোনো টুরিস্টকে মোটর গাড়ী সরবরাহ করা নিষেধ।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলুম—এর মানে কি? আমরা সেই

সুদূর কলকাতা থেকে এই ১২১৬ মাইল দূরে এত কষ্ট স্বীকার করে এত টাকা খরচ করে এসেছি আপনাদের দেশ দেখতে, আর আপনারা একখানা গাড়ী দেবেন না আমাদের? আমরা তো ভাড়া দিতে প্রস্তুত।

পণ্ডিতজী একটু হেসে বললেন—আপনি ভুলে যাচ্ছেন কোথায় এসেছেন? এটা রাজপুতানার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত। সমস্ত রাজপুত স্টেটের 'ওকালৎ' অর্থাৎ প্রতিনিধি অফিস আছে এখানে। আপনারা কী মতলবে এসেছেন, ষড়যন্ত্রকারী 'স্পাই' কিনা, শত্রুর 'গুপ্তচর' কিনা, এসব ভালো করে না জেনে আপনাকে মোটর নিয়ে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ দেওয়া হবেনা। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এসব বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক। তবে, আমি আপনাকে ভরসা দিচ্ছি যে আপনি আপনার কলকাতার ঠিকানা দিয়ে, আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় জানিয়ে এবং এখানে আসবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মোটর ব্যবহারের পারমিট চেয়ে দরখাস্ত করেন, তাহ'লে গাড়ী নিয়ে বেড়াবার হুকুম নিশ্চয় পাবেন। আপনি অনুগ্রহ ক'রে একখানা পিটিশন লিখে নিয়ে আসুন, আমি এখনি লোক দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই হল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে মোটর ব্যবহারের পারমিট চেয়ে এক মামুলী পিটিশন করলুম। পণ্ডিতজী পিটিশনখানি নিয়ে পড়ে দেখে বললেন, ঠিক হয়েছে, কিন্তু আজ পারমিট পাবেন না। একদিন দেরী হবে। পুলিশ এন্‌কোয়ারী ক'রে রিপোর্ট দিলেই অর্ডার হয়ে যাবে। হাকিমের পেস্কারের জন্য শুধু একটা টাকা এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।

তথাস্তু! মোটরের অভাবে আমরা তখন অচল হয়ে গেছি।

সারাদিন ম্যাজিষ্ট্রেটের উত্তরের প্রতীক্ষায় থেকে বিকেল নাগাদ খবর পেলুম যে-লোক পিটিশন নিয়ে গেছলো সে অক্ষত অবস্থায় সেখানি নিয়ে ফিরে এসেছে। দেওয়ালী উপলক্ষে ম্যাজিস্টেটের কোর্ট বন্ধ, সেই সোমবার খুলবে। সুতরাং, সোমবারের আগে আর মোটর পাওয়া সম্ভব নয়।

আমরা একেবারে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লুম। সর্ব্বনাশ! শুক্র, শনি, রবি—এই তিনটে দিন কি স্রেফ্ এখানে বসে বসে কাটাবো? ভীষণ রেগে উঠলুম এই বিদেশী শাসকদের উপর, কিন্তু সে নিষ্ফল আক্রোশ! একেই বলে বোধহয় পরাধীনতার গ্লানি!

পণ্ডিতজী বললেন, আপনারা এক কাজ করতে পারেন, কাছাকাছি যেগুলো দেখবার 'রিক্‌শ' নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন। আমার রিক্‌শ আছে দিতে পারবো।

আমরা যেন অকূলে কূল পেলুম! (ক্রমশঃ)

পাঞ্জাবের সমস্যা

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ভূত এক সম্প্রদায়ের লোকের ঘাড়ে এমনিভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে যে, তাহা যেন আর কিছুতেই নামিতে চাহিতেছে না। ফলে পূর্বে নোয়াখালি হইতে পশ্চিমে পেশোয়ার পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষটা ব্যাপিয়াই একটা হানাহানি লাগিয়াই রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষে ভারতের বাতাস আজ বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর দেশ যখন স্বাধীনতা লাভের সম্মুখীন হইয়া দেশের জনসাধারণের জন্য অখণ্ডভাবে তাহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তখন এক সম্প্রদায় সেই অখণ্ডতায় বাধা দিবার জন্য প্রাণপণে উদ্যোগী হইয়াছে। ইহার জন্য প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের প্রচার ও প্রস্তুতি চলিতেছে, এমন কি গোপন প্রস্তুতিরও অভাব নাই। গত ২৪শে জানুয়ারী লাহোরে এমনি এক গোপন ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়া পুলিশ, মুসলিম ন্যাসনাল গার্ড অফিসে খানাতল্লাস করিতে যায়। কিন্তু স্থানীয় লীগ নেতৃবৃন্দ—কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য মিঃ ফিরোজ খাঁ নুন, পাঞ্জাব প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সভাপতি মামদোতের খাঁ, মিঞা মমতাজ দৌলতানা, বেগম শাহ নওয়াজ, সর্দার সৌকৎ হায়াৎ খাঁ, মুসলিম ন্যাসনাল গার্ডের প্রাদেশিক নেতা সৈয়দ আমির হোসেন সাহ প্রভৃতি পুলিশের কাজে বাধা দেন। পুলিশ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া মুসলিম ন্যাসনাল গার্ড কার্যালয়ের তালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে সহস্রাধিক লৌহ শিরস্ত্রাণ ও অসংখ্য ব্যাজ পাইল। এই সকল ব্যাজে ছোরা, তরবারি ও রিভলবারের চিহ্ন ছিল।

লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের পর এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হইল যে, কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে তাঁহাদের এই অভিযান নহে, দেশে

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম। বেসরকারী সাম্প্রদায়িক বাহিনী গঠন নিবারণই উদ্দেশ্য।

কিন্তু সহরের মুসলমানেরা নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই শোভাযাত্রা বাহির করিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে এই বিক্ষোভ পাঞ্জাবের অন্যত্রও ছড়াইয়া পড়িল। পাঞ্জাব সরকারের সভা, শোভাযাত্রা ও জনসমাবেশের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াই মুসলমানেরা দলে দলে শোভাযাত্রা বাহির করিতে লাগিল। জলন্ধরে সহস্রাধিক লীগপন্থী একত্র মিলিত হইয়া স্থানীয় কারাগার লুণ্ঠনেরও চেষ্টা করিল। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া গ্রেপ্তার করিতে লাগিল।

লীগ নেতাদের গ্রেপ্তারের সময় প্রধান মন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ লাহোরে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন দিল্লীতে। ২৫শে সন্ধ্যায় দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং পরদিনই ধৃত লীগনেতাদের মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করিলেন।

লীগ নেতৃবৃন্দ কিন্তু মুক্তি পাইয়া আরও সংগ্রামশীল মনোভাব প্রকাশ করিলেন। ক্রমে অমৃতসহর, মুলতান, সারগোদা, শিয়ালকোট, লুধিয়ানা, রাওয়ালপিণ্ডি, ক্যাম্বেলপুর প্রভৃতি স্থানে আন্দোলন ছড়াইয়া পড়িল। পুলিশ বাধ্য হইয়া ২৮শে জানুয়ারী তারিখে মধ্যরাত্রে মিঃ ফিরোজ খাঁ নুন প্রভৃতি মুক্তিপ্রাপ্ত নেতাদের পুনরায় গ্রেপ্তার করিল।

প্রায় একমাস ধরিয়া লীগের বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের সহিত লীগের একটা আপোষ আলোচনা হইল। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুযায়ী গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়া বিক্ষোভকারীদের ধৃত সকলকেই মুক্তি দেওয়া হইবে, জনতার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইবে, এইরূপ কয়েকটি সর্তে উভয়ের মধ্যে মিটমাট হইয়া গেল।

কিন্তু ২রা মার্চ পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী মালিক খিজির হায়াৎ খাঁ তিওয়ানা হঠাৎ পদত্যাগ করায় পাঞ্জাবের রাজনীতি সম্পূর্ণ উল্টা পথে পরিবর্তিত হইয়া গেল। পাঞ্জাবের গবর্ণর মালিক খিজিরের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াই পরদিন পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে মুসলিম লীগ দলের নেতা মামদোতের খাঁকে সাক্ষাৎ করিবার জন্ম আহ্বান করিলেন। মামদোতের খাঁ গবর্ণরকে জানাইলেন, তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে প্রস্তুত, শীঘ্রই তাঁহার সহকর্মীদের নামের তালিকা পেশ করিবেন।

এদিকে পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় ভীষণ বিপদে পড়িয়া গেলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের চোখের সম্মুখেই পাঞ্জাবে লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে চলিয়াছে। ইহা দেখিয়া পরিষদে কংগ্রেসীদলের নেতা শ্রীযুক্ত ভীম সেন সাচারের গৃহে কংগ্রেসী সদস্যদের এক বৈঠক বসিল। বৈঠকে সকলেই দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন যে পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক গবর্ণমেন্ট গঠিত হইলে, উহা তাঁহারা কিছুতেই বরদাস্ত করিবেন না। পন্থিক আকালীদলও এক সভায় মিলিত হইলেন; তাঁহারা স্থির করিলেন, পাঞ্জাবে লীগ যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট থাকিবে ততদিন শিখরা লীগ মন্ত্রিসভা গঠনে সর্বপ্রকারে বিরোধিতা করিবে। এই সময়ে ব্যবস্থা পরিষদে মোট ১৭০ জন সদস্যর মধ্যে কোয়ালিশন দলের সংখ্যা ছিল ৯৫, আর লীগদলের সংখ্যা ছিল ৭৫। গবর্ণর অসঙ্গতভাবে লীগকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেওয়ায় শিখ ও হিন্দুরা মিলিত-ভাবে বাধা দিবার জন্ম দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইল।

লীগের প্রস্তাবিত মন্ত্রিসভা গঠনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিবার জন্ম ৪ঠা মার্চ লাহোরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের হিন্দু ও শিখ ছাত্ররা মিলিত হইয়া কয়েকটি শোভাযাত্রা বাহির করে। পুলিশ কিন্তু এই শোভাযাত্রার উপর গুলি ও লাঠি চালাইতে ছাড়িল না। ফলে প্রথমদিনেই শতাধিক ছাত্র হতাহত হইল। লীগ প্রায় একমাস ধরিয়া খিজির মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলেও তাহাদের উপরে কাঁদুনে গ্যাস ও মৃদুলাঠি চালনা ভিন্ন অন্য কিছুই হয় নাই। আর লীগের বিক্ষোভকালে হিন্দু বা শিখদের পক্ষ হইতে কোথাও কোনরূপ বাধাদানের চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু হিন্দু ও শিখ ছাত্রদের মিলিত অভিযানের প্রথম দিনেই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সম্মুখীন হইতে হইল।

পরদিন প্রত্যুষ হইতেই লাহোরে এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরও জটিল হইয়া পড়িল। সহরের নানাস্থানেই এই সংঘর্ষ গুরুতররূপে দেখা দিল। বহুস্থানে দুই পক্ষে খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কয়েকস্থানে দোকান প্রভৃতি জ্বালাইয়া দেওয়া হইল। সহরের ব্যবসা বাণিজ্য ও যানবাহন অচল হইয়া পড়িল। গবর্ণর বেগতিক দেখিয়া ভারত শাসনের ৯৩ ধারা অনুযায়ী দেশ শাসনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সহরে সারারাত্রিব্যাপী সান্ধ্য আইন জারী করিয়া দিলেন। পুলিশ অবস্থা আয়ত্তে আনিবার জন্ম স্থানে স্থানে গুলি করিতে লাগিল। ফলে ঐদিনও শতাধিক হতাহত হইল।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ক্রমে পাঞ্জাবের অন্যত্রও ছড়াইয়া পড়িল। অমৃতসহর, মুলতান, তক্ষশীলা, রাওলপিণ্ডি, ক্যাম্বেলপুর, ঝিলাম ও আটকে হাঙ্গামা গুরুতর আকার ধারণ করিল। সহর ছাড়াইয়া গ্রামাঞ্চলেও এই দাঙ্গা দাবাগ্নির মত ছুটিয়া চলিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তক্ষশিলা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। অমৃতসহরে ১১ই মার্চের মধ্যেই ৫ সহস্রাধিক দোকান ও বাসগৃহ ভস্মীভূত হইল। আটক ও রাওলপিণ্ডি জেলাতেই সর্বাধিক ক্ষতি হইল। সর্বত্রই লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তরিতকরণ, নারীহরণ ও হত্যা চলিতে লাগিল।

অন্তর্বর্তী গবর্ণমেন্টের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং ১২ই মার্চ বিমান যোগে রাওলপিণ্ডি অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া বলেন, পাঞ্জাবের ঘটনার নিকটে নোয়াখালির ঘটনা একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। রাওলপিণ্ডির চারিপাশে ১২।১৪ খানি গ্রামকে তিনি তখনও প্রজ্বলিত অবস্থায় দেখেন। ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলে একটি আশ্রয়-প্রার্থী শিবিরে ৫।৬ হাজার লোক সর্দার বলদেব সিংএর নিকটে কাঁদিতে কাঁদিতে জানান যে, তাঁহাদের সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের বহু আত্মীয় মারা গিয়াছে এবং বাড়ীর মেয়েদের দুর্বৃত্তরা জোরপূর্বক লইয়া গিয়াছে।

পাঞ্জাব প্রাদেশিক যুব কংগ্রেসের সভাপতি সর্দার হরভজন সিং

আফ্রওয়ালিয়া সেবাকার্যের জন্ত একজন স্বেচ্ছাসেবক লইয়া রাওলপিণ্ডি জেলায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেন। তিনি বলেন—রাওলপিণ্ডির একটি গ্রামও হাঙ্গামার হাত হইতে রেহাই পায় নাই। আটক ও ঝিলাম জেলার অবস্থাও ঐরূপ।

পণ্ডিত নেহরুও সদলে উত্তর এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের উপদ্রুত অঞ্চল তিনদিন ধরিয়া ভ্রমণ করেন। ভ্রমণের পর এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন—যে বীভৎস দৃশ্য আমি দেখিয়াছি এবং মানুষের যে আচরণের কথা আমি শুনিয়াছি, তাহাতে তাহারা পশুকেও হার মানাইয়া দিয়াছে। সমস্ত ঘটনাটি একটি রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত। কিন্তু রাজনীতিকে এইপথে চালিত করিলে, ইহা আর রাজনীতি থাকে না, বন্য-শ্বাপদের যুদ্ধে পরিণত হয় এবং মানুষের বাসভূমি মরুভূমিতে পরিণত হয়। যাহার সামান্তও বুদ্ধি রহিয়াছে সেই বুঝিতে পারিবে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ ইহা নহে।

পাঞ্জাবে এতবড় একটি সাম্প্রদায়িক ধ্বংসকার্য হইয়া গেল, কিন্তু জনাব জিন্না এতটুকুও টলিলেন না বা সহানুভূতি জানাইয়া একবার মুখও খুলিলেন না। পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন ধনেপ্রাণে বিপন্ন, জোরপূর্বক তাহাদের ধর্মান্তরিত করা হইতেছিল এবং নারীরা অপহৃতা হইতেছিল ঠিক সেই সময়ে মিঃ জিন্না বোম্বাইএ তাজমহল হোটেলে মুসলমান সাংবাদিক দলের এক ভোজ সভায় বক্তৃতা করিলেন। তাহাতে লক্ষ লক্ষ অত্যাচারিত নরনারীর দুঃখের কথা স্থান পাইল না, তাঁহার বক্তৃতা স্বসম্প্রদায়ের কাজে বরং ইন্ধনই যোগাইল। তিনি বলিলেন—আমাদের আদর্শ, লক্ষ্য ও নীতি হিন্দুদের রাজনীতি হইতে শুধু পৃথকই নহে—উহা পরস্পর বিরোধী, সুতরাং ইহা অতি স্পষ্ট যে উভয়ের আদর্শ একত্র মিলিত হইতে পারে না এবং উভয়ে সহযোগিতার সহিত কাজ করিতে পারে না।

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার খিজির হায়াৎ খাঁ পদত্যাগ করিলে মিঃ জিন্না আনন্দের সহিত তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন এবং সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেবকেও স্যার খিজিরের পন্থা অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মিঃ জিন্না আশা করিয়াছিলেন স্যার খিজির যখন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং পাঞ্জাব গবর্ণর যখন লীগনেতা মামদোতের খাঁকে আহ্বান করিয়াছেন, তখন সমগ্র পাঞ্জাবটা লীগের কবলে আসিয়া গিয়াছে। অতএব পাঞ্জাবে স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম পাকিস্থান প্রদেশ গঠনের সুযোগ আসিয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায় লীগের এই আশায় বাধা দিবার জন্য প্রাণপণে পাকিস্থান বিরোধে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পাঞ্জাবে মুসলমানের সংখ্যা ১ কোটী ৬২ লক্ষ, আর হিন্দু ও শিখের সংখ্যা ১ কোটী ২২ লক্ষ। এই সামান্য মেজরিটির জোরে লীগ হিন্দু ও শিখদের ঘাড়ে চিরকালের জন্য একটা সাম্প্রদায়িক শাসন ব্যবস্থা চাপাইয়া দিবার স্বপ্ন দেখিতেছে। লীগ যদি তাহার এই পাশবিক সংখ্যাধিক্যের জোরে পাকিস্থান স্বপ্নকে সফল করিতেই চায় তাহা হইলে হিন্দু ও শিখপ্রধান জলন্ধর ও আম্বালা বিভাগ ও এই অঞ্চলের শিখ দেশীয়রাজ্যগুলি সমগ্র পাঞ্জাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং ইহা কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যোগদান করিবে। লীগ তাহার পাকিস্থান নীতি বর্জন না করিলে হিন্দু ও শিখপ্রধান পাঞ্জাব বিচ্ছিন্ন হইবেই, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও পাঞ্জাব সম্পর্কে এই প্রস্তাবই গ্রহণ করিয়াছেন। ২০।৩।৪৭

কাঙ্গাল হরিনাথ

শ্রীসুরেশ বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিস্টার-এট্-ল

প্রেমের কাঙ্গাল সেবার কাঙ্গাল, হে কাঙ্গাল হরিনাথ,
কুমারখালীর হে বীরকুমার, লহ মোর প্রণিপাত।
সহজ মানুষ কত তেজ ধরে তুমিই দেখালে তাহা,
শৌর্য্যের সাথে সরলতা মিশে কি মধুর হ'ল, আহা!

বাংলারে তুমি ভালবেসেছিলে তাই তার পল্লীতে—
সাধনাকুঞ্জ গড়ে তুলেছিলে ছায়াঘন বল্লীতে।
উদার আকাশ, শ্যাম প্রান্তর, বিহগের কলগান,
তৃণে ছাওয়া ঘরে চাঁদের আলোয় জুড়াইত তব প্রাণ।

আজি হ'তে সে যে বহুদিন আগে তখনও জাগেনি দেশ,
তখনও মোছে নি দু' নয়ন হ'তে নিশীথ তন্দ্রাবেশ।
খ্যাতি অখ্যাতি ভ্রূক্ষেপ নাই নির্ভীক আনমনে,
কর্ম্মের মাঝে ডুবিয়া রয়েছ আপন স্বজন সনে।

জন কল্যাণে দেশের সেবায় কঠোর লেখনী ধরি'
যত অসত্য শঠতা ক্লৈব্য অনাচার দেশ ভরি'—
আগাছার মত বেড়ে চলেছিল, করিলে কুঠারাঘাত,
নব আদর্শে মাতাইলে দেশ কাঙ্গালের হরিনাথ।

হোক না সে ধনী, রাজার তক্তে থাকুক্ সে সমাসীন,
অত্যাচারীরে কর নাই দয়া সেথা তুমি ক্ষমাহীন।

"গ্রামবার্ত্তায়" রটালে বার্ত্তা "গরুচোর" জেলাপতি,
ধন্য সাহস উদাসী বাউল তব পায় করি নতি।

দীন দরিদ্র কাঙ্গালের ব্যথা মর্ম্মে মর্ম্মে সহি'
কাঙ্গাল নামেতে পরিচিত হ'লে চির দারিদ্র্য বহি'!
ফকিরের বেশে হে "ফিকিরচাঁদ" বাজাইলে একতারা,
বাউলের গানে মাতাইলে দেশ, বহালে প্রেমের ধারা।

ফিরে চলো আজি পল্লীর বুকে এই নবযুগ বাণী,
বহুদিন আগে তোমার কণ্ঠে ধ্বনিল এ সুরখানি।
নব ভারতের প্রথম বিহগ, হে কাঙ্গাল হরিনাথ,
অরুণোদয়ের স্বপন তোমার আনুক সুপ্রভাত।

গুলঞ্চ বা গুড়ূচী

কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

ফাল্গুনের ভারতবর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও কবিরাজ শ্রীযুত সতীশচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয় "গুলঞ্চ বা গুড়ূচী" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দেশীয় ভৈষজ সম্বন্ধে যত আলোচনা হইবে ততই নূতন নূতন বিষয় জানিতে পারা যাইবে। শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বয়ের প্রবন্ধে সাধারণের উপকার হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু "গুলঞ্চ" সম্বন্ধে আরো বহু বিষয় বলিবার আছে। সে কারণ এ সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলেন নাই এমন কয়েকটী বিষয় সাধারণের উপকারার্থে প্রদান করিতেছি।

গুলঞ্চ দুই প্রকার। গুড়ূচী ও কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী। গুড়ূচীকেই সাধারণ লতা গুলঞ্চ বলে এবং ইহাই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। কন্দোদ্ভবা গুড়ূচীকে পদ্মগুলঞ্চ বলে। ইহার পাতা দেখিতে বড় সুন্দর। মহর্ষি চরক কন্দোদ্ভবা গুড়ূচীকে রসায়ন বলিয়াছেন। কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী আমি শ্রীরামপুরে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণ গুলঞ্চ সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাইতেছে।

বৈজ্ঞানিকেরা গুলঞ্চের মধ্যে নিম্নলিখিত রাসায়নিক উপাদান বিদ্যমান আছে বলিয়াছেন। The root and stem contains starchy extract, bitter principle and a trace of berberine. পশ্চাত্য মতে জীবদেহের উপর গুলঞ্চর নিম্নলিখিত ক্রিয়া বলা হইয়াছে—পাচক (stomachic) তিক্তবল্য (bitter tonic) পরিবর্ত্তক (alterative), বৃষ্য (aphrodisiac) জ্বরনিবারক (antiperiodic) স্নিগ্ধ (demulcent) ও মূত্রকারক (diuretic)। ইহা বাত, বিবিধপ্রকার চর্ম্মরোগ, কুষ্ঠ ও কামলা রোগে বিশেষ উপকারী। আয়ুর্ব্বেদে ইহার গুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা ত্রিদোষ, আম, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, শ্বাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদ্রোগ নাশক।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি তৈল বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগ এমন কি কুষ্ঠে পর্য্যন্ত হিতকর। সাধারণেও "গুলঞ্চের তৈল" ঘরে প্রস্তুত করিয়া খোস, পাঁচড়া, চুলকানি দাদ প্রভৃতিতে ব্যবহার করিতে পারেন। এক সের কৃষ্ণ তিল তৈল লইয়া উনুনে চাপাইয়া যখন ফেনা মরিয়া যাইবে তখন উহাতে আধপোয়া কাঁচা হলুদ বাটিয়া প্রক্ষেপ দিবেন, তাহার পর এক সের কাঁচাগুলঞ্চ খেঁত করিয়া উহার সহিত এক সের জল মিশাইয়া পাক করিয়া যখন জল মরিয়া তেল অবশিষ্ট থাকিবে তখন নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবেন। ইহা শাস্ত্রীয় গুড়ূচ্যাদি তৈল না হইলেও সাধারণ চর্ম্মরোগে, এমন কি বাতরক্তে পর্য্যন্ত এই তৈল মালিশে উপকার হয়।

গুলঞ্চ হইতে এক প্রকার চিনি (starchy extract পাওয়া যায়। ইহাকে গুলঞ্চের চিনি বা গুলঞ্চের পালো বলে। ইহা আয়ুর্ব্বেদের বহু ঔষধে ব্যবহৃত হয়; এই গুলঞ্চের চিনি বা পালো সকলে ঘরে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ,—প্রথমে গুলঞ্চের গাঁটগুলি কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। তাহার পর গুলঞ্চগুলি খেঁত করিতে হইবে। এইবার খানিকটা জলে ঐ খেঁত করা গুলঞ্চগুলি দুই তিন ঘণ্টা ভিজাইয়া চটকাইয়া রাখিতে হইবে এবং উহা সেই জলেই পুরা একদিন ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পরদিন জলটা বেশ থিতাইলে ঐ জল আস্তে আস্তে উপর হইতে ঢালিয়া ফেলিতে হইবে। জল ফেলিয়া দেওয়ার পর তলায় যে কাদার মত পদার্থ পাওয়া যাইবে—উহাই গুলঞ্চের চিনি বা পালো। ঐ কাদার মত পদার্থ একটা পাত্রে ছড়াইয়া দিয়া শুকাইয়া লইলে ব্যবহারের মত হইয়া থাকে।

এই গুলঞ্চের চিনি বা পালোর বহু রোগ নাশিনী শক্তি আছে রক্তদুষ্টি, বাতরক্ত, জ্বর ও কামলা রোগে এই পালো দুই আনা হইতে চারি আনা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে—ইহা বহু ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়াছি। বহুদিন ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া শরীর দুর্ব্বল হইলেও কামলা দেখা দিলে একরতি ষড়গুণবলি জারিত মকরধ্বজের সহিত চারি আনা গুলঞ্চের পালো মিশাইয়া মধুর সহিত এক মাস সেবন করিলে জ্বরের পুনরাক্রমণ তো হয় না, জ্বরজনিত দুর্ব্বলতা দূর হইয়া থাকে এবং কামলা ভাল হইয়া থাকে। বাতরক্ত বা রক্তদুষ্টিতে বহুদিন ভুগিলে—এক রতি "মাণিক্যরস" নামক ঔষধের সহিত চারি আনা গুলঞ্চের পালো মিশাইয়া একটু মধু ও একতোলা কাঁচা হলুদের রস মিশাইয়া সেবন করিলে চমৎকার উপকার হইয়া থাকে ইহা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। গুলঞ্চের পালো শিশুদিগের জ্বরে ও কামলায় কালমেঘের পাতায় রসের সহিত সেবন করিতে দিলে জ্বর বন্ধ হইয়া থাকে ও শিশু যকৃত নামক Infentile liver ভাল হইয়া থাকে। শিশুদিগকে গুলঞ্চের পালো এক আনা মাত্রায় দিতে হয়। ইহা পুষ্টিকর (nutritious) পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও ইহা স্বীকার করেন। গুলঞ্চের পালো বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাজারের গুলঞ্চের পালো নির্ভরযোগ্য নহে। সেজন্য গুলঞ্চের পালো ঘরে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলেই সম্যক ফল পাওয়া যাইবে।

আয়ুর্ব্বেদে গুলঞ্চের বহু রোগ নাশিনী শক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মহর্ষি সুশ্রুত অর্শে গুলঞ্চ এইরূপভাবে প্রয়োগ করিতে বলিয়াছেন—গুলঞ্চ বাটিয়া একটী মৃৎ পাত্রের অভ্যন্তর ভাগ লেপন পূর্ব্বক ঐ পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া দধি প্রস্তুত করিয়া ঐ দধির তক্র অর্শ রোগীকে পান করিতে দিবে। এইরূপভাবে প্রস্তুত তক্র অর্শ রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। মহামতি ভাবমিশ্র বলেন যে, গুলঞ্চ পরম বল্য। তিনি ইহার মোদক প্রস্তুত করিয়া খাইতে বলিয়াছেন। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ,—গুলঞ্চের চূর্ণ একশত ভাগ, পুরাতন ইক্ষুগুড়, মধু ও গব্য ঘৃত প্রত্যেক ১৬ ভাগ এই সমুদয় দ্রব্য মোদকের মত পাক করিয়া লইতে হয়। এই মোদক সিকি তোলা মাত্রায় সেবন করিলে শরীরের বলাধান হইয়া থাকে। চক্রদত্ত বলেন, গুলঞ্চ শ্লীপদ (গোদ) নাশক। গুলঞ্চের রস তিল তৈল বা সরিষার তৈলের সহিত পান করিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়। বাগভটের মতে গুলঞ্চ মেহনাশক। মধুর সহিত গুলঞ্চের রস সেবন করিলে মেহ ভাল হয়। জ্বররোগীকে গুলঞ্চের পাতা শাকের মত সেবন করিতে চক্রদত্ত উপদেশ দিয়াছেন এবং কামলা রোগীকে গুলঞ্চের পাতার রস তক্রের সহিত পান করিতে ভাবমিশ্র বলিয়াছেন। গুলঞ্চ যে বাতরক্ত নাশক একথা চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি মহর্ষিগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন। আমরাও বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে গুলঞ্চের রস সেবন করিতে দিলে ও গুলঞ্চের তৈল মালিশ করিতে দিলে বাতরক্ত আরোগ্য হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত প্রস্তুতের বিধি অনুযায়ী গুলঞ্চের রস গব্যঘৃতের সহিত পাক করিয়া 'গুড়ূচ্যাদি ঘৃত' নামে আমরা বাত রক্ত ও রক্তদুষ্ট ব্যক্তিদিগকে খাইতে দিয়া থাকি। ইহাতে সুন্দর ফল দর্শিয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদীয় 'গুড়ূচ্যাদি লৌহ নামক ঔষধটীও বাতরক্তে ও রক্তদুষ্টিতে বিশেষ ফল প্রদ। বায়ু বৃদ্ধির জন্য বুক ধড়ফড়ানিতে গুড়ূচীর রস শুঠ চূর্ণ সহ গরম জলের সহিত সেবনে উপকার হয় একথা বঙ্গসেন বলিয়াছেন। চক্রদত্ত আবার এই যোগই আমবাতে উপকার, বলিয়াছেন।

আলো ছায়া

শ্রীচিন্তাহরণ মজুমদার

খৃষ্ট অব্দ উনিশ শত সাতচল্লিশ সালের ২৩এ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে আসিয়া দেখি, রাষ্ট্রাকাশে মেঘ ও রৌদ্রের বিচিত্র এক লুকোচুরী খেলা সুরু হইয়া গিয়াছে। ২০এ ফেব্রুয়ারী য়্যাটলী মহাশয় বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, "সময় হয়েছে নিকট এখন, বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" দিল্লীতে মহাসমারোহ ; বিষম কলরোল। আর তাহারই মাঝে অভিনব ঐ রাগরঙ্গ। পাহাড়ে রৌদ্র ও বৃষ্টির দ্বন্দ্ব-কলহ দেখিয়াছি ; সমতলভূমিতেও আলো ও ছায়ার চাতুরীও দেখা গিয়াছে ; তরুণের প্রেম যমুনায় জোয়ার ভাঁটার, হাসি কান্নার, মান ও মানভঞ্জনের বৈচিত্র্যও যে না দেখিয়াছি এমনও নহে ; কিন্তু নয়াদিল্লীর রাষ্ট্র গগনে প্রভাত সন্ধ্যার যে অপূর্ব্ব বর্ণবিলাস দেখিলাম, তাহা সকলগুলিকেই ছুয়ো করিয়া দিয়াছে।

ত্রিভুবনেশ্বর মহাদেব মহাশয় এক সময়ে পুণ্য বারাণসীর কৌলীন্য সংরক্ষণ মানসে কাশীধামটিকে স্বীয় ত্রিশূলের অগ্রে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। দীন, দরিদ্র, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য বৃটিশও সাধের রাজধানীটিকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মুঘল বাদসাহগণ বিলাসের সপিণ্ডকরণ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন, ইতিহাসে ইহা লিখিত আছে। বৃটিশ নিউদিল্লী রচনা করিয়া ইতিহাসের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে বিলাস ব্যসনে মুঘলগণ নিতান্তই নাবালক ছিলেন। মুঘল সম্রাটগণ কাজা করিয়া বাঁচিয়া গিয়াছেন, নতুবা নূতন দিল্লী দেখিয়া লজ্জায় মরিতে হইত। গ্রেটবৃটেনের রাজধানী লণ্ডন কি দিল্লীর পদনখের যোগ্য? বিশুদ্ধ যমুনাতটে বিলাসের এই যে অনন্ত তরঙ্গাভিঘাত, বৃটেন প্রান্ত-প্রবাহিনী টেমস কি বসন্তের কুসুমশয়নেও তাহা কল্পনাও করিতে পারে!

পার্লিয়ামেণ্ট—দিল্লী

বৃটিশের লজ্জা-সরমের বালাই নাই। নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, মহাপুরুষ। সে আপদ বালাই যদি তাহার রতিভোরও থাকিত, তাহা হইলে 'বেনাবনে মুক্তা ছড়াইত' না ; শত কোটী সহস্র কোটী মুদ্রা ব্যয়ে প্রাসাদ-উপবন সৃজন করিবার পূর্ব্বে যে শত শত কোটী নরনারী আশ্রয় অভাবে আমরণ ঈশ্বররচিত নক্ষত্রখচিত উদারনীল-চন্দ্রাতপতলে বসতি করে, তাহাদের কথা কি একবারও ভাবিত না? ইংলণ্ডের ভাস্কর, লণ্ডনের চিত্রকর, গ্রেট বৃটেনের নক্সাকার, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের স্থপতি-ঠিকাদার 'বিদারের' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ষোড়শোপচার আয়োজন করিবার আগে যে শত শত কোটী কোটী মানুষমানুষী আজন্ম আমৃত্যু অনশন, অর্দ্ধাশন অভ্যাস করিয়া জীবন্ত কঙ্কালশ্রেণীবৎ কীট পতঙ্গের মত বিচরণ করিতেছে, বৃটিশের চর্ম্মচক্ষুতে কি বারেকের তরেও ছায়াপাত করিতে পারিত না? পৃথিবীতে এত বড় অসামঞ্জস্য আর কোথাও আছে কি-না জানি না বটে, তবে নিঃসংশয়ে ইহা জানি যে এই আশমান-জমিন্ অসামঞ্জস্য ছিল বলিয়াই বৃটিশ বৃটিশ হইতে পারিয়াছিল। ভারতের শোণিতশোষণ করিয়াই বৃটিশ বিশ্বে বিশ্বরূপ প্রদর্শনে সক্ষম হইয়াছিল।

বৃটিশের হিমালয়ান দম্ভ দিল্লীর ধূলিকণাটিকেও রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। বৃটিশ যে বড় বড় কমিডিয়ান, চার্লি চ্যাপলিনকেও যে সে শোনপুরের গো-হাটায় গো-বৎস বলিয়া বেচিয়া দিয়া আসিতে পারে দিল্লীতেই তাহার প্রমাণ। দিল্লী ভারতের রাজধানী। রাজধানী যে রাজারাজড়াদেরই বিহার-বিচরণক্ষেত্র, ইসপ্ সাহেবের প্রত্যেকটি গল্পের পাদটীকায় মুদ্রিত নীতিকথার মত, দিল্লীর পথে প্রান্তরে, প্রাসাদে কান্তারে সেই কথাটি লিখিয়া লটকাইয়া দিবার সে কি অসামান্য যত্ন! পাছে ভারতবর্ষের হা-ভাতে হা-ঘরেগুলা নগ্নদেহে ধূলিধূসরিত পদে রাজধানীতে আসিয়া ভিড় জমায়, রাজধানীর আভিজাত্য লোপ করে। বাঙ্গলা ভাষায় রাজধানীর জাতি মারে, বৃটিশ রাজধানীতে একখানি ট্রাম ঢুকিতে দেয় নাই ; বাসেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়াছে। শুনিয়াছি

"আগার ফারদৌস বার্ রুয়ে
জমিন্ অস্ত্।
হামিন্ অস্ত্—ও—হামিন্-অস্ত্-
ও-হামিন্-অস্ত্।
মরতে স্বরগ যদি থাকে কোনওখানে
তবে সে এইখানে—এইখানে—এইখানে॥"

দিল্লীর গৃহবিরল ছায়াসুশীতল রাজপথগুলির পানে চাহিয়া দেখিলে, প্রাসাদের পর প্রাসাদ-তরঙ্গের পানে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়ন নিবদ্ধ করিলে, পার্লিয়ামেণ্ট হাউস, ইম্পিরিয়্যাল সেক্রেটারিয়েট, ইম্পিরিয়্যাল স্মৃতি-স্তম্ভ, রমিত বন-উপবন—কুঞ্জবন—মধুবনের পানে বিমুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, ঐ "হামিন্-অস্ত্ ও হামিন্-অস্ত্ ও হামিন্-অস্ত্"ই আবৃত্তি করিতে হইবে। জড় ও জীব, রথ ও পথ, প্রাসাদ ও প্রান্তর সকলে এক বাক্যে, কল কোলাহলে, ঐক্যতান বাদ্যে বলিবে "মরতে স্বরগ যদি থাকে কোনওখানে, সে এইখানে, ওগো সে এই-খানে।" স্বর্গরাজ্যে যাহাদের

তাহারা অপাংক্তেয়।

ঐ যে রাজপ্রাসাদখানি। জগদীশ্বরের নীলাকাশ আনমিত সম্ভ্রমে যাহার শীর্ষ স্পর্শ করিয়া ধন্য মানিতেছে; স্বর্গে যদি দেবরাজ ইন্দ্র নামে কোনও রাজা আজও থাকিয়া থাকেন এবং তাঁহার শচী নাম্নী একটি রাজ্ঞী থাকেন, দিল্লীর রাজভবনের মত একখানি বিলাস-নিকেতনের জন্য বাহানা লইয়া শচীর সঙ্গে রাজার 'কথাকথি' হইতে হাতাহাতি, চুলাচুলি, চাই কি 'লাঠালাঠি' পর্য্যন্ত হামেসাই হওয়া সম্ভব, সেই ভাইসরিগেল লজখানির কথাই ধরা যাক্। এই গৃহখানি এই দরিদ্রের দেশে যত বড় বেমানানই হোক না কেন, সে কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই গৃহ রাজার প্রাপ্য ভক্তি, রাজপুরুষের প্রাপ্য শ্রদ্ধা প্রীতি কামনা কি এক দণ্ডের তরেও কোনওদিন করিয়াছিল? দুই দশজন অতীব সৌভাগ্যবান অবুঝে সবুঝে ঐ প্রাসাদাভ্যন্তরে পাতা পাতিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাহা অবশ্যই স্বীকার করি; কিন্তু সেই দশ বিশ জনের বাহিরে যে বিশাল ভারতবর্ষ ও অগণিত ভারতবাসী, তাহার সম্মুখে উহা কি বিভীষিকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই দণ্ডায়মান নহে? ভারতবাসীর অর্থে ও ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় বিলাতে প্রস্তুত বিলাতী মাটীর সহিত ভারতবাসীর শোণিত সংমিশ্রণে ঐ গৃহের কংক্রিট জমাট বাঁধিয়াছে; ভারতবাসীর ভাঙ্গা বুকের পঞ্জর অস্থি সজ্জিত করিয়াই বিলাতী কারিগর ঐ পাষাণ কঠোর জল্লাল-মূর্ত্তির রূপ দান করিয়াছে। ভূতের গল্পের ভূত যেমন অতৃপ্ত আত্মার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়ায়, যাহার কাণ আছে, সে ঐ গৃহের চারিদিকে দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট, রোগে মৃত, অত্যাচারে লোকান্তরিত, বুট-বন্দুক-বেয়োনেটে পরমগতি-প্রাপ্ত ভারতের অশরীরী নরনারীর গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ধ্বনিত হইতে শুনিতে পায়।

দাসত্ব-অক্টোপাস ঐ গৃহ হইতে সহস্র বাহু বিস্তার করিয়াই কি ভারতের পৌরুষ নিঃশেষে শেষ করে নাই? মনুষ্যত্বের আমূল উৎসাদন কি ঐখানেই সূত্রপাত নহে? জাতীয়ত্ববোধের অবসান কি ঐ গৃহেই প্রেরণা লাভ করে নাই? পাঞ্জাবের ডায়ার ও'ডায়ারের পাশবমন্ত্রের দীক্ষা কি ঐ গৃহেই হয় নাই? জালিয়ানবালাবাগের অবর্ণনীয় অবদান কি ঐ গৃহাভ্যন্তরেই পরিকল্পিত নহে? ১৯৪২ খৃষ্ট অব্দে ঐ ভবন হইতেই না কংগ্রেস-ধ্বংস-স্কোয়াড্রন নির্গত হইয়া সারা ভারতবর্ষ

ইম্পিরিয়েল গোলামখানা—দিল্লী

প্রকম্পিত করিয়াছিল? এই বঙ্গদেশে যখন তণ্ডুলকণার অন্বেষণে অর্দ্ধ কোটী নরনারী দলে দলে কাতারে কাতারে শোভাযাত্রা করিয়া শমন-ভবনে প্রয়াণ করিয়াছিল তখন ঐ প্রাসাদ মধ্যে সুখাসীন রাজপুরুষ সাংখ্যের পুরুষের ভূমিকা অভিনয় করিয়া বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে "চার্চ্চিল ক্রশ" পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন না? যুক্তপ্রদেশে বালিয়া, বাঙ্গলায় মেদিনীপুর, পুণায় সাতারা, বিহারে ছাপরায় যে তাণ্ডব মারণ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই প্রলয়-যজ্ঞের ঋত্বিক কি এই গৃহেরই অধিবাসী ছিলেন না? রেল-লাইনে রেলের কুলী রেলের কাজ করিতেছে, অভাগারা বিদ্রোহের বর্ণ পরিচয়ও জানে না, রজ্জুতে অজগর ভ্রমি' পুষ্পকরথ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সশরীরে স্বর্গে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইয়া গেল, সে পুষ্পক এই প্রাসাদেই প্রসাদ লভে নাই কি? যে পাকিস্তানী নর্ত্তনে ভারত আজ ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ-রুধিরাক্তকলেবর, তাহারও উদ্ভব কি এইখানেই নহে?

২০এ ফেব্রুয়ারী বৃটিশ সচিবপ্রধান য়্যাটলী মহাশয় স্বর্গত 'লালচাঁদ, বড়ালের প্যারডি' গাহিয়াছেন,

"আমি যাইব যাইব সখী
নিশ্চয় যাইব।
আটচল্লিশের জুনের আগে
আমি নিশ্চয় যাইব।
সখীরে, আমি নিশ্চয় যাইব।"

কীর্ত্তনীয়া সুকণ্ঠ; ভাব সুমধুর; ভাষা মনোরম; কালিন্দীর জলে কদম্বের তলে প্রেম যমুনা উজান বহিল।

ইহারই তিনদিন পরে, ২৩এ তারিখে দিল্লী আসিয়া সুশোভন দিল্লীর পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'পোড়া বরাতে এত সুখ

সমর-স্মৃতি-স্তম্ভ—দিল্লী (১৯১৪-১৮)

সইলে হয়!' বিরাট বিশাল সম উপনিবেশ ভারতবর্ষের কথা থাক্, শুধু এই দিল্লীর কথাই ধরা যাক্। এই স্বর্গরাজ্য কি ছাড়িয়া যাইবার জন্ত গঠিত হইয়াছিল? তার উপর যখন শুনিলাম, সেই রাজপ্রাসাদটির রাজবেশ খুলিয়া রাখাল বেশ পরিধানের সঙ্কল্প প্রায় স্থির, তখন সত্য কহি, মনে পড়িল।

"ধন্ত তোমারে হে রাজমন্ত্রী
চরণপদ্মে নমস্কার।"

ছোট্ট একটি চড়ুই পক্ষী কিচ্ কিচ্ শব্দে কাণে কাণে কহিয়া গেল, দুই পণ্ডিতে নাকি ভারতের শিক্ষাসংস্কৃতিকৃষ্টিশিলাঐতিহ্যের তালিকা সঙ্কলনে ব্যস্ত। নারায়ণ বক্ষে যেমন কৌস্তুভরত্ন, দিল্লীর রাজপ্রাসাদে তেমনই ভারতীয় ঐতিহ্যের রত্নভাণ্ডার।

কিন্তু বৃটিশ কি সত্য সত্যই কুইট্ ইণ্ডিয়া করিবে? য়্যাটলী সাহেবের কীর্ত্তনের ফেরতা কলি শুনিলে পণ্ডিতেরও লাগে ধন্ধ।

"সখি, ভারতের স্বর্ণখনি
কারে দিয়ে বা যাব?
কারে দিয়ে বা যাব?"

দারুণ দুর্ভাবনা।

কিন্তু পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে, যাইবে কি আবার? উহারা ত চলিয়া গিয়াছে। গান্ধীজী বৃটিশের হাতে স্লিংগল্

মতি মসজেদ—দিল্লী

টিকিট দেখিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে পল্লী পরিক্রমায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। আমাদের 'মৌলানা সাহেব বলেন, উত চল্ রহে। সদাহাস্যানন রাজেন্দ্রবাবুকে প্রশ্ন করিলে শুনা যাইবে, যাইবে ত বটেই, তবে আমাদের খাদ্যসরবরাহে সহায়তাও করিবে। ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট বলিবেন, সল্ট ট্যাক্স য়্যাবলিস্ করিলাম, তবুও সন্দেহ! এই সল্ট ট্যাক্সের জন্তই ১৯৩০ সালে ডাণ্ডী মার্চ, আসমুদ্র ভারতে লাঠি চার্জ, কামান গর্জ্জন। সেই সল্ট ট্যাক্স বরবাদ, সুতরাং নিঃসন্দেহে বৃটিশ ও মুর্দাবাদ। বেশ, বন্ধু, বেশ।

কিন্তু, একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা যদি এইখানে বলি, আপনারা

ধরিত্রী তোলপাড় করিবে ; অর্থাৎ "যেখানে যা দিয়ে সাজায়েছ তুমি," আহা, যেমনটি আছে, তেমনই থাকিবে, পাণ হইতে চূণটুকু খসিবে না, তেড়ির একগাছি চুল নড়িবে না; আর ভারতবাসী আনন্দে আপ্লুত হইয়া নয়ন আসারে ভাসিয়া শ্রীখোল শ্রীকরতালের রবে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া অঙ্গে ব্রজরেণু মাখিয়া বলিব, স্বাধীনতা আ'সিয়া ! বাহবা স্বাধীনতা।

ভাবিলাম বলি, ধীরে অরুণা ধীরে। কিন্তু সাহসে ঠিক কুলাইল না। গভর্ণর, গভর্ণর জেনারেলকে ধরিয়া গারদে পুরিবে বলে ; আমি ত কৃষ্ণের জীব মাত্র। বলিলাম, সিভিল ওয়ার ঠেকাইবে কে ?

অরুণা বলিল, চল্লিশ কোটীর চার কোটী না-হয় গেল, ক্ষতি কি !

বাল্যকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একখানি নাটকের অভিনয় দেখিতে বসিয়া এক চারণীর তেজোদৃপ্ত বচনে দর্শকশুদ্ধ সচকিত হইয়া উঠিত। মুঘল আসিতেছে রাণার ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রাস করিতে ; রাণার সৈন্য সহায় সম্বল কিছুই নাই, তিনি সন্ধি করিতে উদ্যত ; পার্ষদগণ বাধা দিতেছেন, রাণা সদুঃখে বলিতেছেন, কিন্তু সৈন্য কোথায় ? গৈরিকবসনাবৃত চারণী উইংসের পাশ হইতে বলিয়া উঠিল, মাটী ফুঁড়ে উঠ্‌বে মহারাণা। শেষ পর্য্যন্ত তাহাই হইল, সৈন্য মাটী ফুঁড়িয়া উঠিল এবং সন্ধি করিতে হইল না, রাণা যুদ্ধে জয়লাভও করিলেন। আজ আমরা স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়াছি, দেড় বৎসরের মধ্যে দুইশত বৎসরের পরাধীন ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয়—দিল্লীর আলোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হয় স্বাধীনতা স্রোতের গতি রোধ করা পৃথিবীর কোন শক্তিরই সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা হইলেও বিমর্ষ হইবার কারণ রহিয়াছে। অত্যাসন্ন স্বাধীনতার রূপ কি, প্রকৃতি কি, স্বাধীনতার স্বাদ কিরূপ, সৌরভ কিরূপ, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের ভারতবাসীকে জানাইয়া দিবার বুঝাইয়া দিবার কোন্ আয়োজন কে কোথায় করিয়াছে ? গান্ধীজীর স্বপ্ন সফল, সাধনা সার্থক, তিনি ধন্য, আমরাও ধন্য তাহা মানি ; জওহরলাল বৃটিশের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, (মূর্খ চার্চ্চিল ! জওহরকে গালি দিতে গিয়া স্বীকার করিয়া বসিল ঐ একটি লোকই বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিৎ কাঁপাইয়া দিয়াছে !) বৃটিশের হাত হইতে ক্ষমতা গ্রহণে যোগ্যতার তাঁহার অভাব নাই, তাহাও মানিলাম, কিন্তু সেই কি সব ? চল্লিশ কোটী অন্ধকারে কূপমণ্ডুক হইয়া থাকিবে, আত্মকলহে, ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে, স্বজন হত্যায় আত্মীয়হননে লিপ্ত থাকিবে, স্বাধীনতা উৎসবের কোন সংবাদই তাহাদের গৃহদ্বারে অন্তরের তীরে জাগাইবার কি কেহ নাই ? স্বাধীনতার সূর্য্যালোক আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিতেছে, দ্বার খুলিয়া আলোককে প্রত্যুদগমন করিবার কথা কেহ তাহাদের জানাইবে না ? স্বাধীনতার আবাহন গীতি কি অরণ্যে ঝঙ্কার করিয়াই শুদ্ধ হইবে ? স্বাধীনতার শারদোৎসবের সানাই কি নিদ্রিত পুরীর কানেই তাহার সুস্বরলহরী ঢালিয়া দিয়া নিরস্ত হইবে ?

তাই ত বলিতেছিলাম, বিমর্ষ হইবার কারণ আছে। তুচ্ছ ফুলবনে বসন্ত আসিলে পূর্ব্বাহ্নে সমীরণ তাহার আগমনী গাহে ; প্রজাপতির ব্যজনে, অলির গুঞ্জনে, কোকিলের কুহুস্বনে, ফুলের সৌরভে বিশ্বে সাড়া পড়ে ; আর ভারতে দুই শত বৎসরের নিগড় মোচন, শৃঙ্খলমুক্তি স্বাধীনতার মহামহোৎসব—স্বর্ণ মন্দিরে স্বর্ণপ্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠার উৎসব—ভারত নীরববরাববীণামুরজমুরলী। একান্তে নীরব ঔদাসীন্য, অপরান্তে দস্যুতাণ্ডব। পূর্ব্বাকাশের উষার পিঙ্গলবর্ণ তরুণ অরুণের আগমনে সূচিত করিতেছে, কোথায় তোমরা আজ রাজোয়ারার পিককণ্ঠ চারণচারণীগণ, এ নবারুণরাগরঞ্জিত ভারত জীবনপ্রভাতকে তোমাদের কলকণ্ঠে সম্বর্দ্ধিত করিতে বিরত কেন ? কোথায় আমাদের সর্ব্বোৎসবের অগ্রদূত ভারতের তরুণ-তরুণীসমাজ, বোধনের ধ্বনি শুনিয়াও নীরব নিশ্চল কেন ? কোথায় চারুকমলকরের আলিপনাশিল্প ? কোথায় মঙ্গল দীপ, শ্রীবরণডালা।

জয়হিন্দ

বন্দেমাতরম্।

আমাদের সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতি

অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পিএইচ্-ডি

বাঙলা-সাহিত্যের উত্তরোত্তর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের যথাযথ সমালোচনার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি পড়িতেছে এবং কিছু কিছু সমালোচনা গ্রন্থও লিখিত হইতেছে। কিন্তু আমরা যে-জাতীয় সাহিত্য সম্বন্ধেই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই না কেন, সাহিত্যের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে আমরা কোন সমালোচনাই ভালভাবে করিতে পারি না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আজ পর্যন্ত আমাদের বাঙলা-সাহিত্য মুখ্যতঃ পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়াই গড়িয়া উঠিতেছে, আমরা আধুনিককালের সমালোচকগণ তাই বাঙলা-সাহিত্যের সমালোচনার সময় প্রায় চোখ বুজিয়াই পাশ্চাত্য আদর্শ এবং বিচার-ভঙ্গিকেই গ্রহণ করিয়া থাকি।

আবার বহুদিন ধরিয়া সাহিত্য-বিচারের একটি ভারতীয় পদ্ধতি প্রচলিত আছে, আমরা সে-পদ্ধতির সহিত ভাল করিয়া পরিচিত নহি, অথচ আজকালকার দিনে দেশী পদ্ধতির সহিত আমাদের পরিচয় নাই, এ জিনিস স্বীকার করিতে আমরা কথঞ্চিৎ লজ্জিত। অতএব নানাপ্রকারের পাশ্চাত্য মতবাদ এবং গাল-ভরা ইংরেজী বুলির মাঝখানে

আমরা কিছু কিছু ভারতীয় মতবাদ ও বুদ্ধির ফোড়ন দিয়া লই। ফলে যে ব্যঞ্জন রচিত হয় তাহা পান করিয়া আমরা নিজেরা যতই আত্ম-প্রসাদ লাভ করি না কেন, সুধী ব্যক্তির নিকটে তাহা কখনই আস্বাদ্য হইয়া ওঠে না।

এইখানে হয়ত প্রশ্ন উঠিবে, সাহিত্যের ক্ষেত্র জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্র, সেখানে আবার প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সাম্প্রদায়িকতা কেন? অর্থাৎ সাহিত্যের যাহা আত্মা, তাহা ত দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ, অতএব সর্বজনীন এবং সর্বকালিক। এ-কথার উত্তরে আমাদের দু'একটি কথা বলিবার আছে।

সাহিত্যের বিদেহী আত্মা যতই সর্বজনীন এবং সর্বকালিক হোক-না-কেন, তাহার দেহবান্ এবং প্রাণবান্ আত্মা দেশ-কাল-পাত্রের উপাধিকে কিছুতেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে পারে না। সকল সর্বজনীনতা সত্ত্বেও প্রত্যেক সাহিত্যেরই একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, যেমন বৈশিষ্ট্য আছে প্রত্যেকটি আত্ম-সচেতন জাতির, তাহার সর্বজনীন এবং সর্বকালিক মানবতা সত্ত্বেও। আমরা যদি পাশ্চাত্য শিল্প এবং সাহিত্যের আদর্শেই আমাদের শিল্প ও সাহিত্যকে নির্বিচারে বিচার করিতে থাকি তাহা হইলে আমরা যে জিনিসটীকে সর্বপ্রথমেই হারাইয়া ফেলিব তাহা হইল আমাদের শিল্প ও সাহিত্যের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য।

কিন্তু বাঙলা-সাহিত্য যেমন হুবহু ইংরেজী সাহিত্য নয়, সে তেমনই সংস্কৃত সাহিত্য নয়, তাহার স্বাতন্ত্র্য আছে। সুতরাং সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাঁহাদের বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা এবং নৈয়ায়িক কঠোরতার জন্য যতই শ্রদ্ধেয় হোন না কেন, হুবহু তাঁহাদের মতবাদ মিলাইয়া মিলাইয়া তাঁহাদের বাঙলা-সাহিত্যকে বিচার করিবার প্রয়াসও সাধু নহে। শুধু যে সাধু নহে তাহাই নয়, তাহা সম্ভবই নয়।

তাহা হইলে কঃ পন্থা? সে পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের বাঙালীর যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহা যেমন আমাদের নিজস্ব অনেকখানি, তেমনি তাহার সহিত গভীরভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে একদিকে প্রাচীন 'সংস্কৃত' সভ্যতা ও সংস্কৃতি, অন্যদিকে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি। আমাদের সাহিত্যের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। আমাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে কোন্ পদ্ধতিতে প্রকাশ করিতে হইবে তাহাও যেমন চিন্তনীয়, তেমনই সংস্কৃত বিচার-পদ্ধতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য বিচার-পদ্ধতিকেও আমরা কিরূপে আমাদের সাহিত্যের বিচারে প্রয়োগ করিতে পারি তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

এই দৃষ্টি-ভঙ্গি লইয়া সম্প্রতি একখানি বড় বই লিখিত হইয়াছে, বাঙলা-সাহিত্যের বিচারের ক্ষেত্রে এই জাতীয় একখানি বইয়ের 'বড়' প্রয়োজন ছিল বলিয়াই আমরা বইখানিকে শ্রদ্ধা ও আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিতেছি। এ বইখানি হইল প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্, এ, পি-এইচ্-ডি লিখিত 'কাব্যালোক।'

সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রকে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দান করিয়া বাঙলা-সাহিত্যের বিচারে তাহার ব্যবহার করিবার আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে। তারপরে শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্য-বিচার' গ্রন্থে আমরা প্রাচীন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতামতের আলোচনা পাইয়াছি। তাহার পরে সুধীরবাবুর এই বিস্তৃত আলোচনার ফলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের চিন্তা-ভাণ্ডার আমাদের নিকটে অনেকখানি উন্মুক্ত হইল বলিতে পারি। সেই ভাণ্ডারকে বাঙলা-সাহিত্যের জিজ্ঞাসুগণের নিকটে সহজলভ্য করিয়া দিতে কঠিন সাধনার প্রয়োজন ছিল, অনেকখানি অধিকারেরও প্রশ্ন ছিল, অধ্যাপক ডক্টর দাশগুপ্ত তাঁহার উত্তম অধিকার লইয়া এই কঠিন সাধনায় হস্তক্ষেপ করিয়া এবং বিরল সাফল্য লাভ করিয়া বাঙলা সাহিত্যের জিজ্ঞাসুগণের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এই গ্রন্থ রচনা করিতে লেখক কেন প্রবৃত্ত হইয়াছেন সে কথা লেখক গ্রন্থের ভূমিকাতেই সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—"এখন আবশ্যক বাঙ্গালা-সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব পর্য্যালোচনা করিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের নিজস্ব রূপ উপলব্ধিপূর্বক বিশ্লেষণী ও সংগঠনী প্রতিভা লইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্বরূপ ও রূপ বিচার। বাঙ্গালার প্রতিভা পিতৃস্থানীয় সংস্কৃতের বিপুল অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে রিক্থ-স্বরূপ প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে, এবং সাধনা দ্বারা পাশ্চাত্য হইতেও অনেক বিত্ত আহরণ করিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন উপাদানে গঠিত ও বিভিন্ন রসে পুষ্ট হইলেও বাঙ্গালার সজীব মন একটি, বাঙ্গালার সজীব সাহিত্য-ধর্ম্ম একটি এবং তাহা কতকাংশে স্বতন্ত্র, উপাদান ও প্রভাবের বৈচিত্র্য তাহার মনের বিচিত্র পোষণ করিয়াছে মাত্র। সেই অখণ্ড বাঙ্গালা-সাহিত্যের অলঙ্কার-শাস্ত্র বা Poetics চাই।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত মতবাদ গ্রহণ করিয়া নিজের মননশীলতার যোগে বাঙ্গালা-সাহিত্যের জন্য এই নূতন অলঙ্কার-শাস্ত্র গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। এ কাজ করিতে হইলে সংস্কৃত এবং পাশ্চাত্য-সাহিত্য-বিচার-পদ্ধতির সহিত লেখকের ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ পরিচয়ের প্রয়োজন; কিন্তু শুধু তাহা হইলেই চলে না, সেই সঙ্গে আমাদের বাঙলা-সাহিত্যকে সমগ্রভাবে চোখের সম্মুখে রাখিয়া দেশী-বিদেশী প্রাচীন সকল মতের যুগোপযোগী ব্যাখ্যান এবং সম্প্রসারণের প্রয়োজন। এই উভয় দিক হইতেই গ্রন্থমধ্যে অধ্যাপক দাশগুপ্তের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

আমরা যে সংস্কৃত কাব্য বিচারকগণের মতামত খুব কম জানি তাহাই নহে, আমরা সাধারণতঃ যাহা জানি তাহাও ঠিক ভাবে জানি না। বাঙলা সাহিত্যের আলোচনায় রস, ধ্বনি, বক্রোক্তি, সাহিত্য, ঔচিত্য প্রভৃতি কথাগুলি আজকাল হরহামেশা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, আমরা আজকাল যে-অর্থে যে-সব স্থানে কথাগুলিকে ব্যবহার করিতেছি ঠিক সেই অর্থে সে-সব স্থানে শব্দগুলির প্রাচীন অর্থে ব্যবহার খুব স্পষ্ট নহে। আবার অনেক সময়ে আমরা এই শব্দগুলির অর্থ অনেকখানি সম্প্রসারিত

করিয়া অধিক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি, অথচ এই অর্থ সম্প্রসারণ সম্বন্ধে আমরা হয়ত সচেতন নই।

আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি। সাহিত্য সম্বন্ধে 'রসোত্তীর্ণ' হওয়া-না-হওয়ার কথা পথে ঘাটেই শুনা যায়। কিন্তু এই 'রসোত্তীর্ণ'হইবার তাৎপর্য কি? রস শব্দটি সংস্কৃত অলঙ্কারিকগণ একটি বিশেষ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। একটি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া যখন চিত্তগত একটি স্থায়িভাব জাগ্রত হইয়া একটা অলৌকিক আস্বাদ্যমানতা লাভ করে তখনই সে রস-পদবাচ্য হয়। আজকাল রস-শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করি তাহা একটি রম্যবোধ সংশ্লিষ্ট সাধারণ হ্লাদ-জনক-বৃত্তি। প্রাচীনদের পারিভাষিক অর্থের ভিতরেও রস-শব্দের একটি বিশেষ দ্যোতনা রহিয়াছে, সেই দ্যোতনার বিশ্লেষণ এবং পূর্ণ ব্যাখ্যানের প্রয়োজন। অধ্যাপক দাশগুপ্ত তাঁহার আলোচনার ভিতরে রস, ধ্বনি, সাহিত্য প্রভৃতি শব্দগুলির প্রাচীন পারিভাষিক অর্থেরও যেমন আনুপূর্ব্বিক সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন তেমনই আবার বর্ত্তমান বাঙলা-সাহিত্যের আলোচনায় তাহাদিগকে কি করিয়া সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই ইঙ্গিত দিতে গিয়া তাঁহাকে অনেকখানি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে হইয়াছে। তিনি প্রাচীনদের মতামতের বিবৃতিতে যেরূপ শাস্ত্র-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, এই সকল নূতন নির্দ্দেশদানে তেমনই সবল স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নিজে যে-সকল নূতন মতের ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহাকে তিনি একটা নৈয়ায়িক চিন্তালব্ধ 'বাদ'-মাত্রে পর্যবসিত রাখেন নাই, প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের বহু জাতীয় বাঙলা-সাহিত্যের উদ্ধৃতির দ্বারা তিনি তাঁহার মতামতের যাথার্থ্যকে ব্যবহারের দ্বারা স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কাজ করিতে গিয়া গ্রন্থমধ্যে লেখক যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তিনি নিজেই অতি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—"প্রাচীন এই সাহিত্যাচার্য্যগণের যে সকল সিদ্ধান্ত কালজয়ী, বিশ্বজনীন ও সকল-কাব্য-সাধারণ, বিশেষতঃ আমাদের বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে সমান ভাবে প্রযোজ্য, আমরা আলোচ্যগ্রন্থে যথাসম্ভব ঐতিহাসিক ক্রমানুযায়ী তাহাদের উপস্থিত করিয়াছি, তাহাদের মূল্য বিচার করিয়াছি, আবশ্যক স্থলে নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছি, এবং সমালোচনা প্রসঙ্গে দোষ-ত্রুটি যাহা আছে দেখাইয়া, আমাদের নিজস্ব অভিমত, সিদ্ধান্ত ও সূত্রদ্বারা তাহা পূর্ণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি; এবং এই উপলক্ষে যেখানেই আবশ্যক হইয়াছে, পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক নানা মনস্বী ও কবিগণের সুচিন্তিত অভিমতসমূহ উল্লেখ ও তাহাদের সহিত তুলনা-মূলক আলোচনা করিয়া সমগ্র ধারণাকে স্পষ্ট করিতে চাহিয়াছি।"

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই অধ্যাপক দাশগুপ্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক সংজ্ঞার আলোচনা করিয়া স্বাধীনভাবে একটি কাব্য-সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন এবং এই সংজ্ঞা নির্দেশের পরে তিনি কাব্যকে সাধারণ ভাবে দ্রুতি-কাব্য ও দীপ্তিকাব্য এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীন পদ্ধতিকে অস্বীকার না করিয়াও লেখক যে এই নূতন বিভাগ করিয়াছেন তাহার ভিতরে সাহস যথেষ্ট আছে। এই-রূপে রস, ধ্বনি, বস্তু এবং সাহিত্য-বিচারেও তিনি নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া নূতন অভিমত স্থাপন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই সকল সাহসিকতার কার্যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি হয়ত একমত না হইতে পারেন; কিন্তু সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে ঐকমত্যের দ্বারা মতবাদের মূল্য নিরূপিত হয় না, এ ক্ষেত্রে যিনি যাঁহার মতবাদের দ্বারা চিন্তাশীলগণকে ভাবাইতে পারিবেন সবচেয়ে বেশী তিনি বেশী কৃতী, এবং অধ্যাপক দাশগুপ্ত আলোচ্য গ্রন্থে সেই কৃতিত্বের ও অধিকারী।

এ বিষয়ে বক্তব্য যাহা কিছু সকলই অধ্যাপক দাশগুপ্ত নিঃশেষে বলিয়া দিয়াছেন, এবং অপর কাহারও আর এ-বিষয়ে কিছু করণীয় নাই আমরা এ-কথা বলিব না। অধ্যাপক দাশগুপ্ত তাঁহার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং মনস্বিতাপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থখানি দ্বারা আমাদের মনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। এই পথ শুধু পাণ্ডিত্যের পথ নহে, ইহা প্রাচীনের সহিত গভীর যোগে আমাদের দৃঢ় আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ, আর সর্বক্ষেত্রে সেই দৃঢ় আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনই এখন আমাদের সবচাইতে বেশী।

আমি

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

আমি লিখি এত শুধু ছন্দ আর কথা,
মূর্ত্তি ধরে তুচ্ছ দীন গানে;
যা লিখি না তা যে মোর অন্তরের ব্যথা,
দীপ্তি পায় হৃদিরক্ত দানে।
আমি ডাকি ছোট নাম মাধুরী ভরায়ে,
সে শুনিবে বিপুল পুলকে;

যা ডাকি না অচেনা ও অনন্ত ছড়ায়ে
জমা হয় নামহীন লোকে।
আমি কবি সবে জানে, সাধারণ ভীড়ে
এতটুকু ঠাঁই নাহি আশা;
মোর আমি যাহা শুধু সে মানুষটীরে
চিনে সে কি মিটাবে পিপাসা

শিলালিপি

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—চার—

তিরিশ সালের বন্যা। রঞ্জু ভোলেনি—রঞ্জু ভুলবে না। সেদিনকার আত্রাইয়ের সেই কূলভাঙা ক্ষ্যাপা স্রোতে অবিনাশবাবু হারিয়ে গিয়েছিলেন, হারিয়ে গিয়েছিলেন চিরদিনের মতো। সেদিন বকুলবনের নীচে ঘোলা জল থল থল করে খেলা করে গিয়েছিল, সেদিন কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে থই থই করা জল ভাসিয়ে নিয়েছিল মরা-কাকের ছানাটা, সেদিন কবিরাজের বাগানের ওপারে বিশ্‌লার মাঠ সমুদ্রের রূপ ধরেছিল—সেই সমুদ্র—যা রঞ্জু স্বপ্নে দেখেছে, যার দুধের মতো জলে সোনার কমল ভোরের রাঙা আলোয় একটার পর একটা ঝলমলে পাপড়ি মেলে দেয়।

কিন্তু সব কিছু স্বপ্ন—সব কিছু কল্পনার ওপর সেদিন প্রথম রূঢ় বাস্তবের কালো ছায়া পড়েছিল এসে। সে মৃত্যু—রঞ্জুর জীবনে মৃত্যু সম্পর্কে প্রথম অভিজ্ঞতা। যখন শুনেছিল অবিনাশবাবু মারা গেছেন, তখনকার অনুভূতি আজকে আর মনে পড়ে না। হয়তো মনে হয়েছিল রূপকথার রাজপুত্র যেমন করে গজমোতি আনবার জন্যে ক্ষীরের সায়রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, আর রূপবতী রাজকন্যা তার গলায় লক্ষেশ্বরী হার পরিয়ে তাকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকে—বন্যার ঘোলাজলের স্রোতে অবিনাশবাবু তেমনি করেই কোনো সাত রাজার ধন মাণিকের সন্ধানে যাত্রা করেছেন। তখন মৃত্যু কী সে জানত না—জীবন-মরণের মাঝখানে যে অপরিচয়ের কালো অন্ধকার থা-থা করছে—নিরালোক নির্নিরীক্ষ্য সেই রহস্যময়তা সম্পর্কে এতটুকু ধারণা ছিল না তার।

তারপর সেই সন্ধ্যা। অবিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, অথচ তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না; তিনি রঞ্জুকে ডেকেছিলেন, অথচ সে ডাকের কোনো স্বর ছিল না। আসন্ন অন্ধকারে আত্রাইয়ের ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ দিয়ে সে হেঁটে গিয়েছিল, ছাড়িয়ে গিয়েছিল মশানীর মন্দিরের ভাঙা-চুরো ইটের জাঙ্গাল—যেখানে মশানীর ডাকিনী-যোগিনীরা গোখরো সাপের মতো রুক্ষ কিলবিলে চুলের রাশ শুকিয়ে নেয় নদীর উদ্দাম বাতাসে পেরিয়ে গিয়েছিল লাখে লাখে জোনাক-জ্বালা বৈঁচির জঙ্গল, তার পর—

তার পর রঞ্জু প্রথম অনুভব করেছিল মৃত্যুকে। টের পেয়েছিল কেমন করে চোখের সামনে পৃথিবীটা সংকীর্ণ হতে হতে ক্রমে একটা আবছা আলোর বিন্দুর মতো মিলিয়ে আসে, কেমন করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা অবশ ঠাণ্ডা অনুভূতি সাপের মতো পাক দিয়ে দিয়ে জড়িয়ে ধরতে থাকে। একটা অদ্ভুত—অব্যক্ত ভয়ে সমস্ত বোধ শক্তি অসাড় হয়ে যায়, চীৎকার করে উঠলেও মুখ দিয়ে এতটুকু শব্দ বেরুতে চায় না। আর আচ্ছন্ন হয়ে আসা দৃষ্টির সামনে হাজার হাজার ছায়ামূর্তি যেন ঘুরে ঘুরে নাচে, তাদের অসংখ্য চোখ অজস্র সবুজ আলোর মতো চারদিকে জ্বল জ্বল করে জ্বলতে থাকে, তারা ডাকে, হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে ডাকে। অনিবাশবাবু যেমন করে তাকে ডেকেছিলেন, সেই নিঃশব্দ স্বরে তারা ডাকে—হু হু করা বাতাসে তাদের সেই ডাক দিক থেকে দিগন্তে ভেসে চলে যায়।

কোথায় ডাকে তারা, কেন ডাকে? সেই পাশাবতী কেশবতীর দেশে? যাদের ডাক শুনে অবিনাশবাবু বন্যার প্রবল স্রোতে ভেসে চলে গেলেন—সেই সেখানে?

কিন্তু সে তো মৃত্যুর ডাক। অবিনাশবাবু কি মৃত্যু চেয়েছিলেন? না, মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আনতে চেয়েছিলেন নতুন জীবনের আলোকে? তিনি কি রঞ্জুকে ওই ধন-কালো অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে যেতে বলেছিলেন, না আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ওই অন্ধকার ছাড়িয়ে সূর্যোদয়ের দিগন্তে গিয়ে পৌঁছুতে হবে তাকে? বাদুড়ের ডানার আর কালপ্যাঁচার আর্তনাদের শব্দে মুখরিত সেই

কালীদহ্যায় তাকে ভাঙা আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন কি শ্মশানের রূপ দেখবার জন্য, না ওই শ্মশানের ওপর নতুন জীবন প্রতিষ্ঠার জন্যে ?

এ প্রশ্নের জবাব রঞ্জু পেয়েছিল অনেকদিন পরে।

* * * *

এই সময়ে রঞ্জুর বিয়ে হল।

হাসির কথা নয়—সত্যিই বিয়ে। সাত বছরের ছেলের সঙ্গে ছ বছরের কনের। বিয়েটা জমেছিল ভালো, আয়োজন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয়নি কোথাও। এমন কি ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা পর্যন্ত হয়েছিল।

আর শুধু বিয়ে নয়—রীতিমত বিপ্লবাত্মক ব্যাপার। সাত বছরের ছেলে—বাপ মার মত নিলে না, বীরের মতো অসবর্ণ বিবাহ করে ফেলল। কিন্তু আশ্চর্য—সমাজে চাঞ্চল্য ঘটল না, খবরের কাগজে খেলালেখি হল না, বাপ মা বর কনেকে বাড়ি থেকে বিদায় করে দিলেন না। উল্লেখযোগ্য ঘটনা যেটুকু ঘটেছিল সেটুকু অশ্বিনীর কাঁধ থেকে কনের পতন, সবেগে ক্রন্দন এবং অশ্বিনীর খুড়ো রাইকিশোরবাবুর পথ দিয়ে যেতে যেতে ঘটনাটা দেখে সজোরে অশ্বিনীর কর্ণ মর্দন।

—ফেলেই যদি দিবি, তা হলে কাঁধে করতে গেলি কেন হতভাগা ?

—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—ধেড়ে ছেলে অশ্বিনী ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল। ছাত্রমহলে বীর বলে যার অসাধারণ খ্যাতি, নিহিলিস্টদের বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা করতে করতে যার চোখ দুটো উৎসাহে দপ দপ করে উঠত—এ হেন অশ্বিনী কিনা কাকার চড় খেয়ে কেঁদে ফেলল !

—অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি কী করব ! যা ছটফট করছিল—

—ছটফট করছিল তো কাঁধে তুললি কী বলে ? লেখা-পড়ায় একেবারে ধনুর্ধর—অথচ সবটাতে মাতব্বরী করা চাই। গাধা কোথাকার !

সশব্দে অশ্বিনীর গালে আর একটি চপেটাঘাত করে রাইকিশোরবাবু চলে গেলেন। কিন্তু বিপর্যয়ও ঘটিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গেই। শুভ-বিবাহের শোভাযাত্রাটা ভেঙে গেল। অবশ্য সেটা বড় কথা নয়—বৃহৎ ব্যাপারে অমন দু চারটে অঘটন ঘটেই থাকে।

কিন্তু বিয়েটা হয়েছিল—বেশ ঘটা হয়েছিল।

অবশ্য বিয়ের পেছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। দিনকয়েক আগে নামকরা মহাজন যজ্ঞনাথ কুণ্ডুর মেয়ের বিয়ে দেখেছিল ওরা। মস্ত বড় শোভাযাত্রা হয়েছিল, পিতলের গিল্‌টি করা মস্ত বড় খোলা পাল্‌কীতে গিয়েছিল টোপর-পরা বর—চেলির ঘোমটা-টানা কনে। আগে আগে চলেছিল বিরাট বাজনার দল, অভ্রের তৈরী হাজার ডালের ঝাড়-লণ্ঠন চারদিক আলো করে দিয়েছিল। এত বড় বিয়ে—এমন আয়োজন এদিককার লোক কেউ কখনো দেখেনি। সেই থেকেই প্রেরণাটা এসেছিল অশ্বিনীর মাথায়। কোত্থেকে চুরি করে আনা একখানা মস্ত পাটালী গুড় চাটতে চাটতে অশ্বিনী বলে বসল, এই, বিয়ে দিতে হবে।

সমস্বরে প্রশ্ন হল : কার ?

তাই তো। অশ্বিনী সেটা ভাবেনি। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে অশ্বিনীর চোখ পড়ল রঞ্জুর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহভরে লাফিয়ে উঠল সে। হাত থেকে পাটালী গুড়খানা পড়ে গেল।

—রঞ্জুর।

—আমার ?

—হ্যাঁ, তোর। তোরই চমৎকার হবে।

রঞ্জু রাজী হয়ে গেল। বিয়ে করতে হবে—এতে আর আপত্তিটা কোথায়।

—কিন্তু আমাকে পাল্‌কী করে নিয়ে যাবে তো ?

—নিশ্চয়।

—আলো জ্বলবে—বাজনা বাজবে ?

—আলবাৎ।

—মাথায় টোপর দেবে তো ?

—ঠিক দেব।

ব্যাস, সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। অশ্বিনী তখনি বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছিল, কিন্তু আর একটা মুস্কিল দেখা দিল। একজন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, তবে বউ কই ?

—এই তো—এ কথাটাও তো এতক্ষণ মনে হয়নি ! নাঃ, নিশ্চিন্তে পাটালী-গুড় চাটা, আর অশ্বিনীর কপালে নেই দেখা যাচ্ছে। অশ্বিনী বললে, ঠিক—বউ কই ?

রঞ্জু বললে, বউ না থাকলে আমি বিয়ে করব না।

—তাই তো, বিপদে পড়া গেল।—অশ্বিনী মাথা চুলকাতে লাগল। কিন্তু যাদের জীবনে রূপকথার সঙ্গে বাস্তবের ব্যবধান অত্যন্ত সংকীর্ণ—রূপকথার মতোই অতি সহজে তারা যা কিছু সংকট অতিক্রম করে চলে যায়। অতএব ঘটনাস্থলে কনের আবির্ভাব হল।

কনের খালি গা—ছোট একটি ইজের পরণে। একহাতে একটি সেলুলয়েডের পুতুল—অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে সেটি চর্বণ করায় তার নাক মুখগুলো সব চ্যাপ্টা মেরে গেছে। আর একহাতের আঙুলে একটুখানি আচার, কনে সেটা একটু একটু করে খাচ্ছিল—আর উস্ উস্ শব্দে মুখ চোখাচ্ছিল।

—বাঃ, বাঃ—ঠিক হয়েছে। এই তো বউ।—অশ্বিনীই একাধারে বরকর্তা আর কন্যাকর্তা। মেয়েটার হাতের আচারের দিকে একটা লোলুপ দৃষ্টি ফেলে অশ্বিনা বললে, এই উষি, বউ হবি?

উষি অর্থাৎ উষা অশ্বিনীর দৃষ্টি লক্ষ্য করে ততক্ষণে পেছনে লুকিয়ে ফেলেছে আচারশুদ্ধ হাতটা। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আমার আচার খেয়ে নেবে নাতো?

—না, কক্ষণো না। খানিকটা লালা গিলে নিয়ে অশ্বিনী বললে, বয়েই গেল তোর আচার খেতে। আমার কত বড় পাটালী রয়েছে দেখছিস না? বউ হবি?

—হব। কিন্তু একটুখানি পাটালী দেবে আমাকে?

শেষ কথাটায় কান দিলে না অশ্বিনী। ও সব কথা অশ্বিনী শুনতে পায় না, অন্তত সব দিক থেকে না শোনাটাই নিরাপদ। বললে, বউ হলে তোকে কাঁধে করব।

—আগে একটু পাটালী দাও তবে?

—আঃ—পাটালী পাটালী করছিস কেন? আগে বউ হয়েই ছাখ না—তার পর—

তার পর কনে আর বিশেষ আপত্তি করলে না। পাটালীর প্রতিশ্রুতি তো আছেই, তা ছাড়া কাঁধে চড়বার ব্যাপারটাও একেবারে কম প্রলোভনের জিনিস নয়। সুতরাং শুভ-বিবাহটা হয়ে গেল।

অশ্বিনীর মৌলিকতা আছে। বললে, বিয়ের ছাত্‌নাতলা চাই। নইলে বিয়েই হয় না যে।

ছাত্‌নাতলা! ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু বর কনে যখন জোগাড় হয়ে গেছে, তখন ছাত্‌নাতলার ব্যবস্থা হতেও দেরী হল না।

সত্যিই আদর্শ ছাত্‌নাতলা। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার পাশ থেকে কে যেন কবে মাটি কেটে নিয়ে গিয়েছিল, একটা মস্ত গর্ত সেখানে হা হা করছে। বর্ষার সময় জল জমে সেখানে, মাস ছয়েক ছোটখাটো একটা ডোবার মতো হয়ে থাকে গর্তটা। তারপর জলকাদা শুকিয়ে গেলে ভিজে-ভিজে নরম মাটির ওপর এলোমেলো আগাছার সঙ্গে গজায় কচুর বন। তাজা পরিপুষ্ট কচু—কাল্‌চে বেগুনী রঙের ডাঁটার ওপরে প্রসারিত নধর পাতাগুলির বুকে শিশিরের মুক্তো খেলা করে বেড়ায়, তার তলায় বাড়তে থাকে কট্‌কটে ব্যাং আর কেঁচোর সংসার। মাঝে মাঝে ঘুঁটে-কুড়ুনি কাঠ-কুড়ুনিরা শাক খাওয়ার জন্যে দুটো চারটে কচুর ডাঁটা কেটে নিয়ে যায়, কিন্তু নিবিড় ঘন-বিন্যস্ত কচুর জঙ্গল তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

অশ্বিনী বললে, ওই কচুর বনেই ছাত্‌নাতলা হবে।

হলও। চারদিকের কচুগাছ ভেঙে মাঝখানে একটুখানি জায়গা করা হল। বর কনে দাঁড়াল মুখোমুখি।

পৌরোহিত্যটাও করলে অশ্বিনীই। রঞ্জুর হাতে তুলে দিলে কনের আচার ও লালাসিক্ত হাতখানা। বললে, এইবার মন্তর পড়্!

—মন্তর!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মন্তর! নইলে বিয়ে হবে কী করে! আমি যা বলছি তাই বলে যা।

—একজন আইনঘটিত প্রশ্ন তুললে, কিন্তু তুমি তো বামুন নও।

—আরে ধ্যাৎ—রেখে দে বামুন।—অবজ্ঞাব্যঞ্জক একটা মুখবিকৃতি করলে অশ্বিনী: কেউ একজন পড়ালেই হল। আচ্ছা বল্ রঞ্জু—ওং বিবাহং নম—

—ওং বিবাহং নম—

—ওং উষিং নম—

এতক্ষণে রঞ্জু প্রতিবাদ করলে। বললে, দুর, তা বলব কেন? বউকে বুঝি কেউ প্রণাম করে?

—থাম্‌না, তুই ভারা তো বুঝিস!—যেন সব বোঝে এমন সবজান্তার মতো দরাজ গলায় অশ্বিনী বললে, যা বলছি তাই চুপটি করে আউড়ে যা—বুঝলি? বল্ উষিং নম—

অগত্যা বলতে হল। বিয়ে করতে বসে পুরুতের আদেশ অবহেলা করা যায় না। সুতরাং অশ্বিনীর নির্দেশে যথাযথ মন্ত্রপাঠ চলল কিছুক্ষণ। কিন্তু কচুর রসে সর্বাঙ্গ তিরবির করে জ্বলতে সুরু করেছে। রঞ্জু বললে, আর নয় ভাই, গা জ্বলছে ভয়ঙ্কর।

অশ্বিনী একটা উঁচুদরের হাসি হাসল।

—আরে, বিয়ে করতে গেলে অমন এক আধটু গা জ্বালা করেই। জ্বলুনির এখনি কী হয়েছে।

আজ বড় হয়ে বিস্মিত রঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ভাবে—অশ্বিনীর কণ্ঠে দৈববাণী আশ্রয় করেছিল নাকি সেদিন! নইলে অমন একটা নিদারুণ প্রত্যক্ষ সত্য সেদিন অমন অবলীলাক্রমে অশ্বিনী উচ্চারণ করেছিল কী করে!

বিয়ে মিটল, তারপরে শোভাযাত্রা।

দু তিনজন ছেলে মিলে রঞ্জুকে চ্যাং দোলা করে নিয়েছে, আর অশ্বিনী উষিকে তুলেছে কাঁধের ওপরে। সগৌরবে শোভাযাত্রা চলেছে। একজন মুখে মুখে ঢোলের বোল্ বাজাচ্ছে: টাক ডুম্ টাক ডুম্ টাক্ ডুমাডুম্। আর একজন একটা আমের আঁটির ভেঁপুতে প্যা-পোঁ প্যা-পোঁ করে সানাইয়ের আওয়াজ তুলছে। ঝাড়-লণ্ঠন নেই, তার অভাব পূরণ করতে একজন আগে আগে নিয়ে চলেছে একটা পাকুর গাছের ঝাঁকড়া ডাল। দৃশ্যটা একাধারে মনোরম এবং রোমাঞ্চকর।

এমন সময় বাগড়া দিলে নববধূ। কাঁধের ওপর সে উস্ খুস্ করতে লাগল: আমার গুড় কই, গুড়?

অশ্বিনী অস্থির হয়ে বললে, দাঁড়া না, দাঁড়া। আগে বিয়েটা হয়ে যাক, তারপরে তো? জানিসনে, বিয়ের দিনে বর কনেকে কিছু খেতে নেই?

কিন্তু উষা ভোলবার পাত্রী নয়।

—না, গুড় দাও আমাকে, পাটালী গুড়—

—আঃ, খেলে যা!—অশ্বিনী আরো বিব্রত হয়ে উঠল: কোথাকার রাক্ষুসী কনে রে এটা! খালি খাই খাই। বলছি বিয়েটা মিটে গেলেই দেব এখন—

—নাঃ, এখুনি দিতে হবে—

অশ্বিনীর ধৈর্য অসীম নয়। তা ছাড়া পাটালী গুড়ের প্রশ্নটা একেবারে তার মর্মস্থলে আঘাত করছিল। আশা ছিল বিয়ের নানা আয়োজন আড়ম্বরের ভেতরে পাটালীর কথাটা উষা বেমালুম ভুলে যাবে, কিন্তু তার স্মৃতি-শক্তির ওপরে অবিচার করেছিল সে। কাঁধের ওপর অস্থিরভাবে দুলতে দুলতে উষা তালে তালে বলতে লাগল: গুড় দাও—গুড় দাও—গুড় দাও—

—গুড় দাও—গুড় দাও!—এইবারে অশ্বিনী খেঁকিয়ে উঠল: ফের যদি ওরকম চ্যাচাবি তো একটা থাপ্পড় কষিয়ে একেবারে ড্রেণের ভেতরে ফেলে দেব।

এইবারে উষি বিদ্রোহ করে উঠল। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ। মিথ্যে কথা বলে বিয়ে দিলে, এখন দেবে থাবড়া। নামিয়ে দাও—নামিয়ে দাও আমাকে। উষার ধারালো নখের আঁচড়ে অশ্বিনীর গালের কপালের এক পর্দা চামড়া উঠে গেল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল অশ্বিনী।

পরে যা ঘটল সেটুকু বিয়োগান্তক। অশ্বিনী ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়েছিল কিনা কে জানে, তার কাঁধের ওপর থেকে একটা পাকা কাঁঠালের মতো ধপাৎ করে মাটিতে পড়ে গেল উষা। তারপরের কাহিনীটা আগেই বলে নেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে রাইকিশোরবাবুর প্রবেশ, অশ্বিনীকে কর্ণমর্দন এবং চপেটাঘাত, অতঃপর যবনিকা-পতন।

সজল অগ্নিময় চোখে অশ্বিনী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাইকিশোর বাবু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, উষা কাঁদতে কাঁদতে ছুটেছে নিজেদের বাড়ির দিকে। শোভাযাত্রীর দল শবযাত্রীদের মতো শোকে এবং বেদনায় মুহ্যমান। ঢোল বাজছে না, শানাইয়ের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। পাকুড় গাছের ঝাড়-লণ্ঠন অনাদৃত এবং অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সবাই বিমূঢ় আর বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, কারো মুখ দিয়ে একটা কথা ফুটছে না।

তারপর প্রথম কথা বললে অশ্বিনীই। বললে, শালা।

একজন জিজ্ঞাসা করলে, কে?

এতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকবার পরে ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো অশ্বিনী হঠাৎ নেচে উঠল। ভৈরব গর্জনে বললে, কাকা শালা। উষি শালা। তোরা সবাই শালা—

তারপরে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে সে।

আজ অশ্বিনীর কথা মনে পড়লে সহানুভূতি জাগে রঞ্জুর। সত্যিই সেদিন তার ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ ছিল। নিঃস্বার্থ

ভাবে যারা পরের উপকার করবার মহৎ সংকল্প করে, ওই চপেট-বর্ষণ এবং কর্ণ-তাড়নই তাদের চিরকালের পুরস্কার। বিয়ে হল রঞ্জু আর উষির—তাতে অশ্বিনীর কী লাভ? নিজে এত পরিশ্রম করে উদ্যোগ আয়োজন করলে, এতখানি পথ কাঁধে করে কনেকে টেনে নিয়ে বেড়াল, তার বিনিময়ে সে পেল এই! পৃথিবীটা এম্‌নি অকৃতজ্ঞই বটে। অশ্বিনীর উত্তেজনার অর্থ রঞ্জু বুঝতে পারে।

আর সেই কনে—সেই উষা?

তার স্মৃতি রঞ্জুর মন থেকে প্রায় মুছে গেছে—মুছে গেছে শ্লেটের লেখার মতো। তার জীবনের প্রথম নায়িকার ছবিটা অলস-কল্পনাকে স্বপ্নমন্থর করে তোলবার মতো নয়। একটুখানি ছোট্ট মেয়ে—ময়লা রং, পরণে ইজের, খালি গা, হাতে নাসিকা মুখ বিবর্জিত একটা সেলুলয়েডের পুতুল, আঙুলে আচারের লালাসিক্ত অবশেষ। সেদিনকার সেই রূপকথার রূপালি রং মেশানো আকাশে বাতাসে নদীর জলে যে নায়িকা রঞ্জুর জীবনে নেমে আসতে পারত—ভরা পূর্ণিমার স্নিগ্ধ কোমল জ্যোৎস্নার মতো তার বর্ণ, চৈতালি আকাশে ঘনিয়ে আসা নিবিড় নীল মেঘের মতো দিগন্ত বিস্তার তার কেশদাম, সূর্য-ডুবে আসা পশ্চিম আকাশের ময়ূরকণ্ঠী রঙা তার শাড়ীর আঁচল, পূর্বাচলে প্রথম অরুণোদয়ের মতো তার কপালে সিঁদুরের টীপ; তার কণ্ঠের মণিমালায় চুনি-পান্নার দীপ্তি,তার হাতে বিদ্যুতের কনক-কঙ্কন, তার স্থল-পদ্মের মতো দুটি অরুণ-চরণে হীরাখচিত রতনচক্র। কোনো এক অলস রাত্রে যখন বাইরের কৃষ্ণচূড়া গাছটার পাতায় মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি চলেছে, যখন অনেক দূরে—হয়তো কবিরাজের বাগানে পিউ কাঁহা পাখি ডাকছে অশ্রান্ত আকুল গলায়, যখন পাশের ওভারসিয়ারবাবুর বাগান থেকে আসছে রজনীগন্ধার হাল্‌কা গন্ধ, আর ঘুম ভাঙা চোখ মেলে রঞ্জু তাকিয়ে আছে অর্থহীন অলস-দৃষ্টিতে, তখন প্রজাপতির মতো পাখা মেলে নেমে আসতে পারত তার নায়িকা, তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারত হাল্‌কা হাল্‌কা মেঘের জগৎ ছাড়িয়ে, আকাশ-গঙ্গা পেরিয়ে,সাত ভাই চম্পার নিদ্‌মহলের পাশ দিয়ে—কোথায় কত দূরে—অত কি ভাবতে পারে রঞ্জু?

কিন্তু সে এল না—দেখা দিলে না আকাশচারিণী পরীর দেশের সেই রাজকন্যা। তার জায়গায় এল পৃথিবীর মেয়ে—মাটির মেয়ে। সে উন্মনা কল্পনার স্বপ্ন-কমল নয়, মাটিতে ফোটা ছোট একটি ভুঁই চাঁপা। কিন্তু আকাশচারী মন যার মাটির দিকে তাকাতে জানেনা, শূন্যের সন্ধানে যার মন সত্যসীমা ছাড়িয়ে দিক থেকে দিগন্তরে উড়ে চলেছে, পৃথিবীতে অনেক ঘাসের ফুল, অনেক ভুঁইচাঁপাকেই সে পায়ের নীচে দলে চলে যায়। আজ তেমনি করেই কল্প-জগতের ছায়া সঙ্গিনীরা উষিকে দৃষ্টির আড়ালে আড়ালে, স্মৃতির আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেছে রঞ্জুর। কোথায়, কোন্ মাটিতে সেই ছোট ফুলটি আজ তার সমস্ত দলগুলি মেলে দিয়েছে—রঞ্জুর আজ নতুন করে ভাবতে ইচ্ছে করে। তার গান্ধর্ব-বিবাহের সেই প্রথম নায়িকা কার ঘর করছে আজ?

কার ঘর? ভাবতে ইচ্ছে করে, কল্পনা করতে ভালো লাগে। একটি সাধারণ গৃহস্থের বাড়ি। মাটির দেওয়াল, মাটির দাওয়া। দেওয়ালের গায়ে বসুধারা আঁকা, আঁকা পদ্মলতা। এক পাশে লক্ষ্মীশ্রী লাগা ধানের জালা সাজানো, উঠোনে ঢেঁকি। আর একদিকে একটি ছোট মাচায় সীমের লতায় অজস্র ফলন হয়েছে—ফুলে ফলে চমৎকার একটা পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত। গোয়ালে শ্যামলী ধবলী। হেনার ঝাড়ের মধ্য দিয়ে একটি ফালি পথ আম-জামের ছায়ায় ঢাকা খিড়কীর পুকুরে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই ঘরের ঘরণী হয়েছে উষা। ছেলে-পুলের মা হয়েছে—স্বামী সোহাগিনী হয়েছে—সংসারের চারদিক উথ্‌লে উছ্‌লে পড়ছে।

আর রঞ্জু? সেই গান্ধর্ব-বিবাহ যদি উষার জীবনে সত্যি হয়ে উঠত, তাহলে কী হত আজকে?

কিন্তু পরের কথা আগে বলে লাভ নেই।

অতীতের দিকে তাকিয়ে রঞ্জুনের মনে হয়—তার জীবনের দুটো দিক কী আশ্চর্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল সেই শৈশব-বয়সে, চেতনার সেই প্রথম উন্মেষ পর্বে। দেশ আর প্রেম। অবিনাশবাবু আর উষা। আগামী দিনের প্রথম অরুণোদয়। পৃথিবীর দাবীর সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় তার।

(ক্রমশঃ)

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

২৫

আরক্তিম সূর্য্য অদূরের পাহাড়ের পারে ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে। শীতপাণ্ডুর ধূসর বিবর্ণ ঘাসের মাঝে মাঝে পৃথিবীর অস্থি কঙ্কালের মত মাঝে মাঝে পাথর বাহির হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের ম্লান আলোয় শীতার্ত্ত পৃথিবী যেন জড়সড় হইয়া গায় ধূলার প্রলেপে অঙ্গাবরণ দিয়াছে। বন্ধুর পথটির পাশে উচ্চাবচ ঢালু ভূমি—জীর্ণ বার্দ্ধক্যের বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম্মের মত অমসৃণ। সন্ধ্যার আলোয় একটা ক্লান্তির ছায়া তাহাকে অস্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে—

অমল লাঠি ভর দিয়া চলিতে চলিতে গুরুপরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কহিল—না, আর চলে না বৌমা। পা' দুটো আর চলতে পারে না। এস এখানে এই পাথরটায় বসা যাক্—

অপর্ণা অনুমোদন করিল—হ্যাঁ। আর হাঁটা যায় না।

নন্দিতা প্রতিবাদ করিল—আপনারা বসুন, আমরা আর একটু ঘুরে আসি। চাকরকে দেখাইয়া পুনরায় কহিল—ও ত সঙ্গেই থাক্‌বে—

অমল কহিল—আচ্ছা যাও—

অপর্ণা মনে করিয়া দিল—বেশী দেরী ক'রো না বৌমা, ঠাণ্ডা লাগ্‌লে তোমার শ্বশুরের বাতটা আবার বাড়বে শেষে—বধূদ্বয় চলিয়া গেল। অমল পাথরটার উপর বসিয়া, অপর্ণাকে ইঙ্গিতে পাশে বসাইয়া দূরের পানে শূন্য দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া পরিশেষে কহিল—আজ হাসি পায়, না?

প্রসঙ্গটা বুঝিতে না পারিয়া অপর্ণা কহিল—কি সে?

—পুরাতন দিনের কথা মনে ক'রে। তুমি আমার অনুরোধে নীল শাড়ী প'রে এসেছিলে। আমাকে ডেকে নিয়ে পার্কে গিয়ে একদিন কত কথা ব'লেছিলে—

অপর্ণা কথাটায় কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কহিল—এ বয়সে সে সব ছেলেমানুষীর পুনরুল্লেখ ক'রে আর কি হবে—কি হাস্যকর সব ঘটনা ঘটেছে—

—যথা?

—তোমার সঙ্গে আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা আছে দেখাবার জন্যে ইচ্ছে ক'রে সমিতির মাঝে তোমার উপর হুকুম ক'রতাম। তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতাম।

অমল হাসিয়া কহিল—হায় হায়! এ কথাটা যদি তখন বুঝতাম। আমি ত তোমার জন্যে সর্ব্বদাই শঙ্কিত, কখন অভদ্রোচিত কি ক'রে ফেলি—ধর, সেই গড়ের মাঠে বসে শুকনো পাতা নিয়ে কি সে ভাবোচ্ছ্বাস!

অমল নিজে নিজেই হাসিয়া উঠিল।

অপর্ণা চুপ করিয়া রহিল। অমল কহিল—তুমি কিন্তু ঠিক তেমনি বুড়ো হওনি। চুল অবশ্য পেকেছে' কিন্তু মুখ চোখ আমার মত চুপসে যায় নি—

—যা হোক্, সুন্দরী দেখে একটা স্তবস্তুতি রচনা ক'রো না যেন?

অমল হাসিল, অপর্ণাও হাসিয়া উঠিল। অপর্ণাই কহিল—এ সব কথা এখন লোকে শুন্‌লে পাগল ব'লবে—তা হ'লে তোমার খোকার জন্যে যে সব কাণ্ড ক'রেছি তা' ত আরও হাস্যকর—

অমল প্রতিবাদ করিল—আমার জন্যেও কম কর নি। তোমার মোটরে তুলে নিয়ে যেদিন নাটকীয় ভাষায় বললে—তোমার জন্যে আজ সবই আমি দিতে পারি, সেদিন?

অপর্ণা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল—ছিঃ ছিঃ ওসব কথা ব'ল্‌তে নেই, আবার কেন? বুড়োকালে তোমার ভীমরতি হ'ল নাকি? তুমি খোকাকে আস্‌তে লিখে দাও, বড্ড দেখ্‌তে ইচ্ছে করে তাকে।

অমল কহিল—ভীমরতি নয়, এখনও তোমার জন্যে মাঝে মাঝে যেন কেমন মনে হয়। জীবনটা কি হ'তে পারতো, আর কি হ'ল—

—সে সাহস ত তোমার ছিল না—এখন সে হিসেব ক'রে আর কি হবে?

—না না, সাহস আমার ছিল যথেষ্টই, তোমার ছিল না। মা বারণ ক'রলেন, ব্যস্, সব বুদ্ধি সাহস অতলতলে ডুবে গেল! মেয়েমানুষ কি আর সাধে বলে! খোকার মা

যেমন, এত প্রেম এত ভালবাসা সব নিমেষে উবে গেল—যেদিন তুমি আমার সঙ্গে পরিচয় ক'রলে—

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল—থাক্, বীরত্ব দরকার নেই তোমার আর। তুমিও ত বাড়ী গিয়েই বিয়ে ক'রলে!

কিছুক্ষণ নীরবতার পরে অমল প্রশ্ন করিল—আচ্ছা যেদিন পরীক্ষার পরে ঝড়ো কাকের মত তোমাদের ওখানে উপস্থিত হ'লাম সেদিন কি ভেবেছিলে?

অপর্ণা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিল—কি আবার ভাববো, বিরহ-টিরহ একটা কিছু হবে, কিন্তু বৌমারা ত ফিরলো না।

—ফিরবে এখন। কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন সেদিন।

—আমি? একটা কিছু ভেবে নিশ্চয়ই খুব দুঃখিত হ'য়েছিলাম—হয়ত ভেবেছিলুম তোমার মত পুরুষরত্ন হারিয়ে জীবনটা ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

অমল একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—যাক্, আজ আর সে অনুশোচনা নেই ত?

অপর্ণা কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—থাক্ না থাক্, এ বয়সে আবার তোমার সঙ্গে প্রেম ক'রতে বল নাকি?

অমল হাসিয়া কহিল—ব'ললেই কি ক'রবে? আর অপ্রণয়ই বা কি আছে? কিন্তু ওরা ত ফিরলো না—রাস্তার উপর হইতে নন্দিতা ডাক দিল। অমল কহিল—এই যে এসেছ মা! এত দেরী ক'রতে হয়!

সেদিনের মত সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ হইয়া গেল।

খোকা আসিবে সংবাদ পাওয়া গেল।

আজকাল নিত্যই প্রাতঃকালীন এবং সান্ধ্য আড্ডা জমিয়া উঠে অপর্ণা রমলা অমল কখনও কখনও নন্দিতা ও অপর্ণার দেবর পুত্রবধূ। সকালে অমলের বাড়ীর রৌদ্র-তপ্ত বারাণ্ডায় চা সহযোগে আড্ডা জমে, বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে বা কোনও বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের উপরে বসিয়া।

রমলা সেদিন সকালে আসে নাই। অপর্ণা ও অমলই কথা বলিতেছিল। অমল সহসা কহিল—আজ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বারবার একটা কথা মনে হয়—

অপর্ণা আগ্রহে প্রশ্ন করিল—কি?

—হিসাব ক'রে দেখলে দেখা যায় জীবনটা যেন একটা বিস্তৃত নীলাকাশ—অনন্ত শূন্যতায় ভরা, মাঝে নানা রঙের স্মৃতির টুকরো মেঘে যেন ভেসে চলেছে। কখনও কালো মেঘে অন্তরাকাশ বিষাদ-করুণ হ'য়ে ওঠে, কখনও রক্তে রঙীণ মেঘের রঙে রঙীণ হয়—

অপর্ণা টিপ্পনি করিল—তোমার মিষ্টিক কাব্য ব্যাখ্যা না ক'রলে আমাদের মত অরসিকের পক্ষে বোঝা সম্ভবপর নয়।

অমল একটু উদাস কণ্ঠে কহিল—জীবনের দীর্ঘ এই ৫৪ বৎসর একঘেয়ে দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটনের শূন্যতায় ভরা, তার সবকিছু মিশে একপ্রকার হ'য়ে রয়েছে, পৃথক ক'রে দেখা যায় না। তার মাঝে তুমি, রমলা। খোকা গৌরী এরা—এদের স্মৃতি যেন টুকরো মেঘ। আকাশের শূন্যতাকে ভরে দিতে পারে নি। সবচেয়ে আজ রয়েছে কি? কর্ম্মক্লান্ত জীবনে স্মরণ ক'রবার মত পাশে শুধু কয়েকটি স্মৃতি—না?

অপর্ণা প্রশ্ন করিল—জীবনের সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনা মুছে যেয়ে রয়েছে শুধু স্মৃতি?

—তাই বই কি? তোমার পরিচয় আজ স্মৃতি মাত্র, তোমার যৌবন আমার যৌবনের অনুভূতি আজ ইতিহাস মাত্র। এই যে এখন গল্প ক'রছি, দশ মিনিট বাদে এ প্রত্যক্ষই হবে স্মৃতি এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাও চিরতরে মুছে যাবে।

—সম্ভব।

—যেদিন তোমার মোটরে বসে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম সেদিন হয়ত বুঝ্‌তে পার নি যে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেই নি—তোমার কাছে যা চাই তা পাওয়া যায় না জেনে তোমার ভগ্নাবশেষকে অপ্রয়োজন বোধে ত্যাগ করেছিলাম—যৌবনের প্রত্যক্ষ তখন হ'য়েছিল স্মৃতি মাত্র, কিন্তু স্মৃতিকে ত প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা যায় না—

—কিন্তু আজ?

—হ্যাঁ, আজ তাই সে পাওয়া চাওয়ার কাহিনী আমাদের কাছে হাস্যকর, লজ্জাকর মাত্র। কিন্তু ভেবে ভাখো সেদিন কি দুর্দ্দমনীয় ছিল আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আজ তুমিও যেমন এই পাকাচুল অমলকে চাওনা, আমিও বুড়ী অপর্ণাকে চাইনা। আজ তোমাকে নতুন ক'রে পেতে চাই অবসরের সাথীরূপে—

—কিন্তু এ ভেবে কি হবে!

—হবে না কিছুই, মানুষের স্বভাবই কৃপণের মত জীবনের নিষ্ফল সঞ্চয়কে বারবার গণে দেখা—তাই দু'জনে একবার গণে দেখছি মাত্র।

অপর্ণা কিছু কহিল না, উদাস দৃষ্টিতে মাত্র দূরের ধূসর রৌদ্রদীপ্ত পাহাড়টির পানে চাহিয়া রইল। অমল গড়গড়াটায় আর কয়েকটা টান দিয়া কহিল—ভাবছো আমরা যদি মিলিত হ'তাম তবে ত এই শূন্যতা থাকতো না, কেমন? কিন্তু তা থাকতো—তোমার এই জীর্ণ দেহে আমি খুঁজতাম যৌবন, তার অসংলগ্ন প্রলাপ ও প্রগলভতা—তুমি খুজতে আমায় যৌবনের কাব্যকে, কিন্তু না পেয়ে শেষে সমস্ত অন্তর এখনকার মত অমোঘ শূন্যতারই ভরে উঠতো। রমলা যেমন আমাকে ভালবাসতো—অথচ আজ আমাকে সে চায় না একান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে করে—

—গেট দরজার সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল এবং অমল সাগ্রহে উঠিয়া বসিয়া কহিল—বোধ হয় খোকা এসেছে—

অপর্ণা কহিল—খোকা?

অমল চাকরকে হাঁক ডাক দিয়া পাঠাইয়া দিল। খোকা বারান্দায় প্রতীক্ষারত পিতাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অপর্ণার পানে চাহিল।

অমল হাসিয়া কহিল—এই জগৎ, তুমি সাগ্রহে খোকাকে দেখতে চেয়েছ, অথচ ও তোমাকে চিনতে পারে নি। এই ব্যর্থতার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। এঁকে চিনলিনে খোকা? ক'লকাতা থাকতে কার মোটরে রোজ বেড়াতে যেতিস্ মনে পড়ে?

খোকা স্মরণ করিতে পারিল কিনা বলা যায় না, তবে আনত শিরে অপর্ণাকে প্রণাম করিল। অপর্ণা তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল—পথে কষ্ট হয়নি ত বাবা!

খোকা কহিল—না।

অপর্ণা পরিচয় দিল—তোমার রাজকন্যা পিসিমার কথা মনে আছে।

খোকা লজ্জিতকণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ, মনে আছে। আপনাকে এখানে দেখতে পাবো এ'ত আশা করতে পারি নি।

যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে খোকা চা খাইতে খাইতে প্রশ্ন করিল—বাবা, আপনার শরীর কেমন? একটু ভাল বোধ হয়?

অমল হাসিয়া কহিল—ভাল আর এ জীবনে বোধ হয় হবে না বাবা, তবে আপাততঃ খারাপ কিছু হয় নি।

অপর্ণার কুশল প্রশ্ন করিলে খোকার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া অপর্ণা কহিল—হ্যাঁ, তোমার বাবার মত অবুঝবু হই নি। কিন্তু দেখেছ অমল, খোকার চোখ দুটো ঠিক তেমনি চঞ্চল রয়েছে আজও। যেদিন ও প্রথম রাজকন্যা খুঁজতে আমার ঘরে যেয়ে উপস্থিত হয়েছিল, সেদিনও ঠিক এমনি সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল।

খোকা লজ্জায় মাথা নীচু করিল। অপর্ণা কহিল—শৈশবের সে সব কাহিনী শুনলে আজ বড্ডো লজ্জা হয়, না খোকা?

অমল কহিল—যেমন যৌবনের, প্রৌঢ়াবস্থার কথা স্মরণ ক'রে আমাদের হয়। কিন্তু সেটা যেন কত আদরের—সেই ভুল, সেই ছেলেমানুষীই যেন বার্দ্ধক্যের প্রজ্ঞা অপেক্ষা বেশী সত্য!

অপর্ণা অমলের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল—দেখেছ, খোকাকে ঠিক তোমার মতই দেখতে হ'য়েছে—কলেজে পড়ার সময় যেমনটি ছিলে—শুধু বর্ণটা হ'য়েছে ওর মার মত।

অমল ব্যঙ্গ করিল—ওর মাঝেই আমাকে পাবে, কিন্তু সাহিত্য-টাহিত্য লেখা না সুরু করে।

অপর্ণা তিরস্কারের সুরে কহিল—ও তোমার চেয়ে ভাল লিখতে পারবে জেনো।

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল,—পৃথিবীতে আমার চেয়ে বহু লোকে ভাল লেখে, তাতে আমার পরিতাপের কিছু নেই; আর আমার ছেলে যদি ভাল লেখে তবে সেটা ত আমারই আনন্দের কথা।

অমল অকারণেই বৌমাকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল। নন্দিতা ঈষৎ অবগুণ্ঠিত মুখে আসিয়া কহিল—আমাকে ডাকলেন বাবা?

—হ্যাঁ, খোকার একটু খাওয়ার বন্দোবস্ত কর, সারা রাত্রি ট্রেণে জেগেছে। খোকা সকাল সকালই চান ক'রে ফেল্—আর আমাদের আর একটু চা'এর বন্দোবস্ত কর।

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল—চা দিয়ে আবার কি হবে। আমি খেতে পারবো না এখন—

—না খেলে, আমিই খাবো বৌমা। তবে বৌমার হাতের চা না খেলে শেষে অনুশোচনা ক'রতে হবে। এমন চা আর কোথায়ও পাবে না।

খোকা কিছুক্ষণ উস্‌খুস্‌ করিয়া উঠিয়া গেল। অমল হাসিয়া কহিল—খোকার পেটে সাবানমাখা আর টবের জলে জলকেলি করা একটা রোগ ছিল। সেই খোকা এত বড় হ'য়েছে এ যেন প্রত্যয় হয় না।

অপর্ণা কহিল—আর তুমি এত বড়ো হ'য়েছ এই কি প্রত্যয় করা যায়?

সান্ধ্য ভ্রমণটা আজকাল হয় বটে, কিন্তু দলটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। অপর্ণা প্রায়ই খোকা ও বৌমাকে লইয়া চলিয়া যায়, রমলা ও তাহার মেয়ে হয়ত অমলের সহিত থাকিয়া যায়—কখনও বা অপর্ণা খোকা নন্দিতা সকলেই থাকে, রমলা চলিয়া যায়। আবার কখনও অমল তাহার বাত-পঙ্গু দেহটাকে বেশীক্ষণ বহন করিতে না পারিয়া একাকী চাকর সাথে ফিরিয়া আসে—

সেদিন কেমন করিয়া রমলা একাই যেন অমলের সহিত রহিয়া গেল। অমল ধীরপদক্ষেপ অকস্মাৎ সংযত করিয়া কহিল—আসুন এই পাথরটায় বসি। কেমন?

—বসুন।

—আপনার কন্যাটি বুঝি আজ ওই দলে গেল না?

—হ্যাঁ।

—অপর্ণা ত খোকা আর নন্দিতাকে নিয়ে মসগুল, খোকার মা বেঁচে থাকলেও হয়ত এমনি আমাকে ফেলে পালিয়ে যেত না?

—তা যাবে কেন?

—যেত। অমল হাসিয়া কহিল—অপর্ণা কি বলে জানেন? খোকা নাকি ঠিক আমারই মত, কলেজে আমি ঠিক যেমন ছিলাম—শুধু রংটা তার মা'র মত। অপর্ণার মেয়ে থাকলে আমি হয় ত ঐ কথাই বলতুম—

রমলা কহিল—নেই, বেঁচে গেছেন। তার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ত।

অমল রক্তিম দিগন্তের পানে চাহিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত আর্তকণ্ঠে কহিল—আমাদেরও ত সন্ধ্যা হ'য়ে এল—

—হ্যাঁ, তা বৈ কি?

অমল থামিয়া থামিয়া কহিল—এই পৃথিবীতে কতক-গুলি লোক আছে যাদের কাছে সোজাসুজি সমস্ত কথা বলা চলে; আবার অনেকে এমন আছে যাদের কাছে ঘুরিয়ে ছাড়া কথা বলা যায় না—প্রথম পরিচয় থেকেই আমার কিন্তু মনে হয় আপনার কাছে খুলে সব বলা যায়—

—যায়, কেন কি ব'লতে চান?

—আমার উপর আপনার খুব রাগ হয় না?

—কেন?

—যেদিন আপনাদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম সেদিন হয়ত' মনে মনে ভেবেছিলেন কি নিষ্ঠুর আমি—আপনার কোন মূল্য দিলাম না—

রমলা হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—সেই কথা! এত দিন পরে তার হিসাব ক'রে আর কি হবে!

—হবে না কিছু, কিন্তু হিসাব করাটাই বয়সের ধর্ম্ম। সেদিন হয় ত আপনি জান্‌তেন না নিজের অক্ষমতা ও দৈন্যের প্রতি কি বিজাতীয় ঘৃণা ও অভিমানে আমি জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছিলাম। তা জান্‌লে আপনি হয় ত আমাকে ক্ষমা ক'রতেন—

রমলা শান্তকণ্ঠে কহিল—ক্ষমা ক'রবার কথা ওঠে না, আর রাগও সেদিন হয় নি আমার। নিজের প্রতি ধিক্কারেই যেন ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়লাম। কি দুঃসহ নির্লজ্জতায় আমি আপনার কাছে আমাকে ব্যক্ত ক'রে-ছিলাম। মনে ক'রলে আজও লজ্জিত হই—

অমল কহিল—তাই। আজ জীবনটা কেবল লজ্জা, দুঃখ ও পরিতাপেই যেন পূর্ণ। দুষ্কর্ম্মের অনুশোচনাকেই বসে বসে আমরা সঞ্চয় ক'রেছি। এই নির্জ্জন সন্ধ্যায় আপনাকে পাশে পেয়ে যেন বারবার মনে হয়—সেই উন্মুখ যৌবন যদি ক্ষণিকের তরে ফিরে পেতাম তবে অনুশোচনাকে নিঃশেষে মুছে ফেলতাম।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমলা কহিল—কেমন ক'রে? জগতে যা চেয়েছিলাম তা আজ নেই, যা পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মত পড়ে আছে তা'কে ত চাই নি।

আজ আমাকে ক্ষমা ক'রেছেন নিশ্চয়ই।

রমলা হাতটাকে ছাড়াইতে চেষ্টা না করিয়াই কহিল—ক্ষমা না করা আর করার মাঝে আজ তফাৎ কতটুকু!

—হ্যাঁ, সত্যিই তাই। কোন তফাৎ নেই। আজকার এই পাকাচুল নিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কোন মূল্য নেই।

—কথাটা বলিতে বলিতে সহসা দুইজনেই থামিয়া গেল। নির্জ্জন সন্ধ্যার প্রতি রোমকূপে যেন শীতল ঘর্ম্ম চারিপাশে বার্দ্ধক্যের একটা শিথিল স্থবিরতা পাণ্ডুর ধূসর মাঠের উপর যেন দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে—দূরে গ্রামান্তরে সন্ধ্যার কুয়াশা ধীরে ধীরে অস্বচ্ছ মেঘাকারে জমিয়া উঠিয়াছে।

রমলা অমলের হাতখানি আকর্ষণ করিয়া কহিল—চলুন সন্ধ্যা হ'ল। ঠাণ্ডা লাগবে আবার—

অমল কহিল—চলুন—

(ক্রমশঃ)

বাজিৎপুর সেবাশ্রম ও জনসেবা

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

২৫ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। ১৯২২ সালে বাঙ্গালা দেশ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে পরিপূর্ণ। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতি হইয়াও চরকা ও খদ্দরের বাণী গ্রহণ করিয়া প্রচার করিতেছেন। একদিকে চরকা ও খদ্দর প্রচার, আর একদিকে খুলনার দুর্ভিক্ষে সাহায্য দান—উভয় কার্য্য একসঙ্গে চলিতেছে। লেখক তখন দৈনিক বসুমতীর সহকারী সম্পাদক। ১৯২০ সালে দৈনিক বসুমতীর কার্য্যে যোগদানের পর হইতেই আচার্য্য রায়ের সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। আচার্য্য দৈনিক বসুমতীর মধ্য দিয়া চরকা ও খদ্দরের বাণী প্রচার করিতেছেন—বসুমতী তখন প্রায় একমাত্র বাংলা দৈনিক; বাঙ্গালী, নায়ক, হিন্দুস্থান প্রভৃতি থাকিলেও তাহাদের প্রচার ও প্রভাব কম ছিল। আচার্য্য রায় মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি শিল্পপ্রধান দেশ দেখিয়া ফিরিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও তিনি চরকা প্রচারে ব্রতী হওয়ায় দেশ স্তম্ভিত—বিস্ময়ান্বিত। আচার্য্যের কথা শুনিবার জন্য লোক ব্যগ্র ও উৎসুক। প্রায় প্রত্যহ সকাল ৯টায় আমাকে আচার্য্যের নিকট যাইতে হয়—তিনি তাঁহার গবেষণাগারের টুলে বসিয়াই অন্য কাজের সহিত কথা বলিয়া যান ও আমি তাহা লিখিয়া লইয়া পরদিনের কাগজে প্রবন্ধাকারে তাঁহার নামে প্রকাশ করি। একসঙ্গে বিলাতভ্রমণকাহিনী, দুর্ভিক্ষ সাহায্যের বিবরণ ও চরকার বাণী প্রচারিত হইতেছিল। আচার্য্য প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় তাঁহার প্রিয় ছাত্র দৈনিক বসুমতী সম্পাদক মহাশয়ের অফিস ঘরে গমন করেন—তাঁহার সান্ধ্যভ্রমণের পথে উহা তাঁহার প্রায় দৈনন্দিন কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। সে সময়ে পরদিনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া যাইতেন। গবেষণাগারের টুলে বসিয়া এক সঙ্গে আচার্য্যকে কত প্রকার কাজ করিতে দেখিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। সংবাদপত্র পাঠ চলিতেছে—তাঁহার নামে প্রত্যহ বহুসংখ্যক চিঠি ও সাময়িক পত্র আসিত, সেগুলি খুলিয়া ঐ সময়ে তাঁহাকে দেখান ও পড়িয়া শুনানো হইত। গবেষক ছাত্রগণ তাঁহাদের গবেষণার খাতা লইয়া উপস্থিত হইতেন, আচার্য্য তাহা দেখিয়া তাঁহাদের কার্য্যের উপদেশ দিতেন। বহুদিন ঐ সময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতিকে তথায় বেঙ্গল কেমিকেলের পরিচালনা বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইতে দেখিয়াছি। ডক্টর মেঘনাদ সাহা, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র প্রভৃতিকে নানা কাজে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে দেখিতাম।

একজন শীর্ণকায়, ছেঁড়া লুঙ্গীপরা হাফ-সার্ট-গায়ে-দেওয়া বৃদ্ধ কি করিয়া এত বড় বড় লোকের সহিত বড় বড় জটিল বিষয়ে আলোচনা করিতেন, তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম। কোন কোন দিন আমাকে ২।৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে হইত—কারণ লোকের ভিড় বেশী থাকিলে আমার সহিত তাঁহার কথা কম হইত। আচার্য্যের সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা প্রণালী দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। কর্ম্মীর দল, ছাত্রের দল, বৈজ্ঞানিকের দল, শিল্পপতির দল, ধনীর দল, বৈদেশিকের দল—সকলেই সমানভাবে গৃহীত হইত—অবারিত দ্বার—কাহারও প্রার্থনা শুনিতে তিনি কাতর ছিলেন না। কত লোককে যে প্রত্যহ পরিচয়পত্র বা প্রশংসাপত্র লিখিয়া দিতেন, তাহার সংখ্যা ছিল না। এরূপ প্রভাবশালী, সর্ব্বজনমান্য ও সর্ব্বস্তরের লোকের প্রিয় নেতা খুব কমই দেখা গিয়াছে। প্রার্থী তাঁহার নিকট অর্থ পাইত, নিরাশ্রয় তাঁহার বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইত। আচার্য্য রায়ের নিজস্ব বাসগৃহ ছিল না। জীবনের শেষ ২৫ বৎসরেরও অধিককাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ গৃহেই তিনি বাস করিতেন। একখানি ঘর তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল বটে, কিন্তু তিনি ১২ মাসের ১০ মাসই বোধ হয় খোলা বারান্দায় কাটাইয়া দিতেন। সাধারণ দড়ির একটা ছোট খাটিয়া ও তাহার উপর একটা তোষক, একটা খদ্দরের

চাদর ও ২টা ছোট মাথার বালিশ—ইহাই ছিল আচার্য্যদেবের শয্যা। বিলাসিতার উপকরণ কোন দিন তাঁহার নিকটে যাইতে সাহস করে নাই। শিষ্য, ভক্ত, ও বন্ধুবর্গ অনেক সময় তাঁহার ব্যবহারের জন্য অনেক ভাল জিনিষ দিয়া যাইতেন, কিন্তু তিনি নিজে কিছুই ব্যবহার করিতেন না—যাহাকে ভালবাসিতেন, তাহাকেই দিতেন। তাঁহার লুঙ্গি, সার্ট ও চটিজুতা দেখিলে মনে হইত, ইনি বুঝি মাসে ১৫ টাকার অধিক উপার্জ্জন করেন না।

এই ভাবে যখন আচার্য্যদেবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেছিলাম, সেই সময়ে এক তরুণ ব্রহ্মচারী কর্ম্মীর সহিত তিনি আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। তরুণ ব্রহ্মচারীর নাম বিনোদ দাস—বাড়ী ফরিদপুর জেলার মাদারী-পুরের নিকটস্থ বাজিতপুর গ্রামে। খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় ব্রহ্মচারী বিনোদ একদল সহকর্ম্মী লইয়া সেবা-কার্য্য করিতে যান—খুলনা আচার্য্য-দেবের পৈতৃক জেলা—আচার্য্য ব্রহ্মচারী বিনোদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হন এবং বসুমতীর মারফত তাঁহাদের প্রচার কার্য্যে সাহায্যদানের জন্য একদিন সকালে বিজ্ঞান কলেজ-গৃহে ব্রহ্মচারী বিনোদের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। বিনোদ ব্রহ্মচারী আমার অপেক্ষা মাত্র ২।৩ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ—তাঁহার উজ্জ্বল, সতেজ, সৌম্য ও সুন্দর দেহ ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বে আমি প্রথম দিনই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং তিনিও কাজের খাতিরে তাহার পর হইতেই প্রায়ই অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট বসুমতী কার্য্যালয়ে গমন করিতেন। আমি তাঁহাদের কার্য্যে সাহায্যদান করিতে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। আমি শুধু বসুমতীতে তাঁহাদের সেবা কার্য্যের কথা প্রকাশ করিতাম না, অন্যান্য কাগজেও যাহাতে ঐ সকল সংবাদ প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতাম। সে জন্য ব্রহ্মচারী বিনোদের সহিত অল্পকালের মধ্যেই আমার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল; যে সময়ে তিনি কলিকাতার বাহিরে থাকিতেন, সে সময়ে ব্রহ্মচারীজীর সহকর্ম্মী (ভারত সেবাশ্রম সংঘের বর্ত্তমান সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দজী) আমার নিকট আসিতেন। এই ব্রহ্মচারী বিনোদই পরবর্ত্তী কালে ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বামী প্রণবানন্দজী নামে সমগ্র ভারতে পরিচিত হইয়াছিলেন।
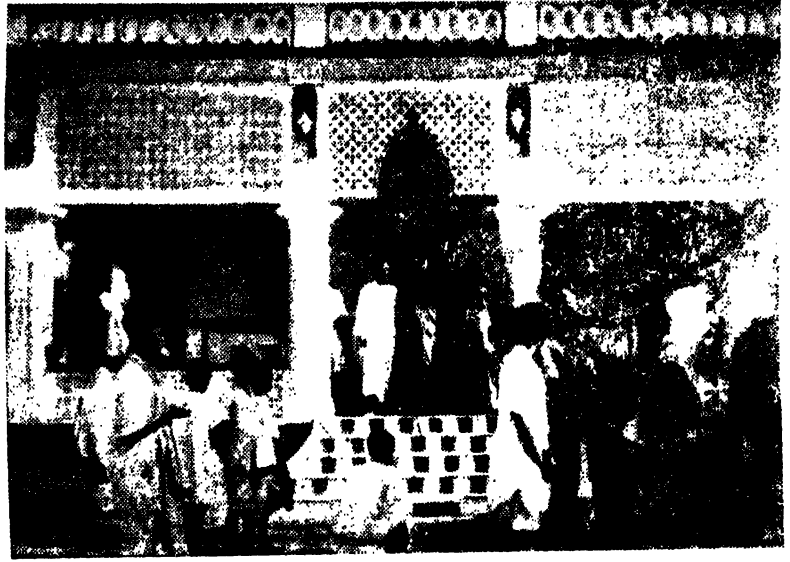
ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিব-মন্দির

রক্ষিদলের ক্রীড়াদর্শন

কয়েকটি মাত্র প্রায় সমবয়স্ক যুবক লইয়া প্রণবানন্দ এই সংঘ গঠন করিয়াছিলেন—যুবকের দল পথে পথে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিতেন ও সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারা দরিদ্র, বিপন্ন জনগণের সাহায্য করিতেন। পরিচয়ের পর কয় বৎসরের মধ্যেই গয়ায় যাইয়া তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। গয়ার চানচৌড়ায় আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুত হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (ইনি চিরকুমার এবং খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এল-এ মহাশয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতা) দরিদ্র ও বিপন্ন বাঙ্গালী যাত্রীদিগকে স্বগৃহে স্থান দিয়া সাহায্য করিতেন। তাঁহার গৃহে বসিয়া তাঁহার নিকট গয়ায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মীদের কার্য্যের প্রশংসা শুনিয়া প্রথম তাঁহাদের কাজ দেখিতে গিয়াছিলাম। বাঙ্গালী যাত্রীদিগকে পাণ্ডাদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বামী প্রণবানন্দ গয়ায় প্রথম যে কার্য্য আরম্ভ করেন, তাহা তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। অবশ্য পরে তাঁহারা কাশী, পুরী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থেও যাত্রীনিবাস ও যাত্রী সাহায্য ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয় ও ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্ম্মীরা মেলায় সমাগত যাত্রীদিগকে সাহায্য দান করিতে গমন করেন। আমার কয়েকজন আত্মীয় সেই কুম্ভমেলায় গমন করিলে আমি তাঁহাদের ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীদের নামে পত্র দিই এবং তাঁহারা মেলার মধ্যে সন্ন্যাসীদের অসাধারণ ত্যাগ ও সেবাকার্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হরিদ্বারের শীতে সংঘের কর্ম্মীরা সকালে উঠিয়া শুধু লবণ দিয়া পান্তা ভাত খাইয়া কাজে বাহির হইতেন ও সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরিয়া ভাত খাইতেন। তাঁহাদের এই কৃচ্ছ্র সাধনায় সকলেই তাঁহাদের অনুরাগী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী যাত্রীরা, বিশেষ করিয়া অশিক্ষিত নরনারীর দল বাঙ্গালার বাইরে বহু তীর্থক্ষেত্র ও মেলায় যাইয়া নানাভাবে বিপন্ন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। স্বামী প্রণবানন্দ তাঁহাদের এই দুঃখ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই ; সেজন্য তিনি সকল মেলায় ও তীর্থে সংঘের কর্ম্মীদিগকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন। এইভাবে সংঘ বাঙ্গালী জনগণের কি প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করা যায় না। তাঁহারই আন্দোলনের ফলে গয়ায় গয়ালী পাণ্ডাদের অত্যাচার কমিয়াছে ও পুরীতে উড়িয়া পাণ্ডাদের দ্বারা লোক আর বিব্রত হয় না। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় গয়া বা পুরীর যাত্রীনিবাস পর্য্যাপ্ত নহে—বাঙ্গালী ধনী মাত্রেরই এই কার্য্যে সংঘের সহায়ক হওয়া কর্ত্তব্য।

স্বামী প্রণবানন্দ প্রথমে কলিকাতার নানা স্থানে বাড়ী ভাড়া করিয়া কর্ম্মীর দল লইয়া বাস করিতেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে ও বহুবাজার ষ্ট্রীটে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্রে বহুবার আমার যাওয়ার সুযোগ হইয়াছিল এবং সে সকল স্থানে যাইয়া তাঁহাদের বিভিন্ন রকমের কর্ম্মধারার সহিত পরিচিত হইতাম। হিন্দু মিশনের স্বামী সত্যানন্দও পূর্ব্বে স্বামী প্রণবানন্দের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং পরে পৃথকভাবে কাজ করিয়া তিনি বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের যে উপকার করিয়াছেন, আজ আমরা তাহার ফল বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতেছি। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান কেন্দ্র স্বামীজী নিজ বাসভূমি বাজিতপুর গ্রামেই স্থাপিত করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন! ফরিদপুর জেলায় তপশীলী ও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক—কাজেই সকলের মধ্যে মিলন প্রতিষ্ঠা বিষয়ে স্বামীজি যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য আজ ফরিদপুরবাসী প্রত্যেকেই নিজেকে উপকৃত মনে করিতেছে। স্বামীজির কর্ম্মস্থল কোন জেলা বা প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। মাত্র কয়েক বৎসর তিনি এই কার্য্যের মধ্যে ছিলেন বটে, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালার সকল জেলায় ও ভারতের সকল প্রদেশে কাজের বিস্তৃতি দানে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই আজ প্রত্যেক ভারতবাসী ও বিশেষ করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী স্বামী প্রণবানন্দ ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া থাকেন।

বাজিতপুর ধর্ম্ম সম্মেলনে সভাপতি, ভারত সেবাশ্রম সংঘের সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী (দক্ষিণে) এবং সহ-সম্পাদক স্বামী অদ্বৈতানন্দজী (বামে)

এবার গত মাঘী পূর্ণিমায় বাজিতপুরে স্বামী প্রণবানন্দের জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। পূর্ব্বে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি সভাপতিরূপে তথায় গমন করিয়াছিলেন ; ভারত সেবাশ্রম সংঘের ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ গত ২০শে মাঘ কলিকাতা হইতে আমাকে সঙ্গে করিয়া তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জারে গোয়ালন্দ যাইয়া সেখান হইতে আমরা ষ্টীমারে ভাগ্যকুলে গিয়া নামিলাম—ভাগ্যকুল হইতে মাদারীপুরগামী ষ্টীমারে চড়িয়া চরমুগুরিয়া যাইতে হইল। চরমুগুরিয়া হইতে নৌকাযোগে বাজিতপুর—কুমার নদের জল শুকাইয়া গিয়াছে—কাজেই অতি কষ্টে মাঝি জলে নামিয়া নৌকা ঠেলিয়া লইয়া গেল—খালে জল নাই—কাজেই সেখানে নামিয়া রাত্রি ১০টার পর প্রায় ২।৩ মাইল পদব্রজে যাইয়া রাত্রি ১১টায় আমরা বাজিতপুর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বাজিতপুর মাদারীপুর হইতে বেশী দূরে নহে—ঐ স্থানে যাওয়ার অন্য একটি পথও আছে। খুলনা হইতে যে ষ্টীমার মাদারীপুর যায়, তাহাতেও বাজিতপুর যাওয়া যায়। সে পথেও নদী মজিয়া গিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ষ্টীমার মধ্যপথে আটকাইয়া যায়, কাজেই আমরা সে পথে যাই নাই। চরমুগুরিয়াতে ষ্টীমার হইতে নামিবার জন্য জেটি আছে—কিন্তু ভাগ্যকুলে ষ্টীমার হইতে উঠা নামা করা এক কঠিন ব্যাপার…নৌকাযোগে তীর হইতে আসিয়া ষ্টীমারে উঠিতে হয়। ভাগ্যকুলে বহু লোককে উঠানামা করিতে হয়, সেখানে বাঙ্গালার এক বিখ্যাত ধনী পরিবারের বাস—অথচ তথায় কেন জেটির ব্যবস্থা নাই, তাহা বুঝিলাম না।

বাজিতপুর সেবাশ্রম এক প্রকাণ্ড জমির উপর অবস্থিত। মধ্য দিয়া

এক খাল গিয়াছে—আসিবার সময় খালে জল ছিল···কাজেই আশ্রম প্রাঙ্গণ হইতেই নৌকায় চড়িয়া খাল ও নদী পথে চরমুগুরিয়ায় আসিয়াছিলাম। খালের উপর মেলার জন্য কয়েকটি বাঁশের পুল করা হইয়াছিল—তাহার উপর দিয়া প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক খাল পার হইয়াছে। তিনদিন ধরিয়া মেলা চলে। মেলায় বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে দোকান আসে—প্রত্যহ কম পক্ষে ৫০ হাজার লোককে মেলায় সমবেত হইতে দেখিয়াছি। লোকজনের সঙ্গে কথা বলিয়া দেখিলাম, অনেকে ৩০।৪০ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া মেলায় আসিয়াছে। মেলার এক পারে অতিথিশালা—প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহ—তাহার পাশে মাঠে বিরাট এক সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। তথায় পূর্ণিমার দিন ও পরদিন ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতায় বসিয়া আমরা বাঙ্গালার মফঃস্বলে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গার কথা পড়ি। কিন্তু মেলায় দেখিলাম, হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে মেলা দেখিতে আসিয়াছে, মেলায় একত্র ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে—আশ্রমের বহু মুসলমান ভক্তকে

প্রণবমঠ—বাজিতপুর

আশ্রমের নানা কার্য্যে সাহায্য দান করিতে দেখিলাম—তাহাদের আশ্রমে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণেও কোন আপত্তি দেখিলাম না।

ফরিদপুর জেলার ঐ অঞ্চলে তপশীলভুক্ত জাতির বাস অধিক। তাহারা দলে দলে মেলায় যোগদান করিয়াছিল। তাহাদের আপন করিয়া পাইবার জন্য মেলায় একদিন ঐকত্রিক ভোজের ব্যবস্থা ছিল। তাহাতে গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদারগণও সানন্দে ও সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। খালের অপর পারে আশ্রমের বহু গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। চমৎকার এক পাকা শিব মন্দির দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। স্বামী প্রণবানন্দের মন্দিরগৃহও সুবৃহৎ ও সুনির্ম্মিত। সন্ন্যাসীদের বাসের জন্য আরও বহু গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। টিনের এক প্রকাণ্ড নাট মন্দিরে ছোটখাট সভা হইয়া থাকে। তথায় পূর্ণিমার পর দিন বিরাট যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল। সমবেত ৫।৬ হাজার লোক-জাতি ধর্ম্ম বর্ণ নির্ব্বিশেষে যজ্ঞে আহুতি দান করিলেন, সংঘের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বেদানন্দজী মাইক্রোফোনের সাহায্যে সকলকে সংস্কৃত মন্ত্রপাঠ করাইলেন। সে দিন বিরাট ভোজের ব্যবস্থা ছিল। ৬০ মণ চাউল রন্ধন করা হইয়াছিল। পূর্ব্ব দিনও ২০ মণ চাউল পাক করা হইয়াছিল। চাউলের পরিমাণ হইতে আশ্রমে ২ দিনে কত লোক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছে তাহা বুঝা যায়। তাহা ছাড়া বহু লোক গ্রামের মধ্যে যাইয়া আত্মীয় বাড়ীতে খাইয়াছে এবং বহু লোক নিজেরা রন্ধন করিয়া খাইয়াছে। এত খাদ্যদ্রব্য সন্ন্যাসীরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। সংঘের সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দ, সহ-সভাপতি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ প্রভৃতি সেথায় উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে-ছিলেন। প্রায় দুই শত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী মেলায় সমবেত ছিলেন। পূর্ণিমার দিন কয়েকজন নূতন কর্ম্মীকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী করিয়া দীক্ষা দান করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া শত শত গৃহী ভক্ত আশ্রমের কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে কয়দিন নিজেদের নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। মাদারীপুর হইতে বহু উকীল, সরকারী কর্ম্মচারী, শিক্ষক প্রভৃতি মেলায় আসিয়া ৩ দিন বাস করিয়াছিলেন। বাজিতপুর গ্রাম ক্ষুদ্র নহে, তথায় এখনও বহু

প্রসাদ-বিতরণ

ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস—তাঁহাদের সকলকে সোৎসাহে মেলায় যোগদান করিতে ও মেলার কার্য্যে সাহায্য দান করিতে দেখিয়াছিলাম। নিকটে বহু বড় বড় গ্রাম হইতেও কর্ম্মীরা মেলায় আসিয়াছিলেন। বাজিতপুরে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় বর্ত্তমান। সেখানকার শিক্ষক ও ছাত্রের দল মেলায় কাজ করিয়াছিল। মঙ্গলবার রাত্রিতে পৌঁছিয়া শুক্রবার বেলা ৪টায় আশ্রম ত্যাগ করি—এই কয়েক দিনের স্মৃতি জীবনে বিস্মৃত হইবার নহে। নিঃস্বার্থভাবে দেশসেবা ও জনসেবা করিলে সকলকে যে 'আপনার জন' করা যায়, তাহা সন্ন্যাসীদের কার্য্যের দ্বারা প্রমাণিত হইতে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সন্ন্যাসীরা কি ভাবে অহোরাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সকলেই কর্ম্মব্যস্ত—নিজ নিজ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করার জন্য কাহারও পরিশ্রম বা উৎসাহের অভাব ছিল না। ভোর ৬টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সমান ভাবে কাজ চলিয়াছিল।

আশ্রমের চারিদিকে বহু কৃষিক্ষেত্র বর্ত্তমান। সন্ন্যাসীরা তথায় ধান, কলাই, শাকসব্জী প্রভৃতির চাষের ব্যবস্থা করেন। সেই সকল ক্ষেত্রের

সন্ধ্যা খাবার উৎসবে সমাগত সকলকে তৃপ্ত করা হয়। গ্রামে বহু বড় বড় পুকরিণী আছে। তাহা ছাড়াও কয়েকটি নলকূপের দ্বারা মেলায় সমাগত সকলকে জল সরবরাহ করা হইয়াছিল।

ফিরিবার পথে মোত্তাকাপুর গ্রামে 'পর্ব্বত' উপাধিধারী এক পুরাতন বন্ধুর গৃহে যাইতে হইয়াছিল। বন্ধুবরের অগ্রজ অবসর গ্রহণের পর সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ গ্রামে ব্যয় করিয়াছেন। তিনি তথায় প্রকাণ্ড বাসগৃহ, কয়েকটি দেবমন্দির, কয়েকটি পুষ্করিণী প্রভৃতি করিয়াছেন, তাহা সকলের দর্শনীয়। যে যুগে প্রায় সকল লোক সহরমুখী, সে যুগে বাঙ্গালার নিভৃত পল্লীতে সহর হইতে বহু দূরে নিজ বাসগ্রামে পর্ব্বত মহাশয়কে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাসগৃহ ও কৃষিক্ষেত্র করিতে দেখিয়া সত্যই আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। শুক্রবার সন্ধ্যায় চরমুগুরিয়ায় ষ্টীমার ধরিয়া পরদিন সকালে আবার ভাগ্যকুলে ফিরি আসিলাম। সেখানে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া গোয়ালন্দ হইয়া শনিবা রাত্রিতে চট্টগ্রাম মেলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। ভার সেবাশ্রম / সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর জন্মস্থান, কর্ম্মক্ষেত্র পরবর্ত্তী যুগে তাহার বিভূতির বিরাটত্ব আমাকে সংঘের প্রতি ও সংঘে কর্ম্মীদের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান করিতে সমর্থ হইয়াছে। সং বাঙ্গালী জাতির পক্ষে সত্যই আজ গৌরবের বস্তু হইয়াছে। ইহ বাঙ্গালীর এই দুর্দ্দিনে বাঙ্গালীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে—এই বিশ্বা আমাদের হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়াছে।

আনোয়ারা

জসীমউদ্দীন

আনোয়ারা নামে চাষীর মেয়েটি, দেখা হ'ল তার সনে
হাসির রেখাটি ঈষৎ প্রকাশি মিলিছে অধর কোণে।
দুটি রাঙা ঠোঁটে জড়ায়ে পড়িয়া যত মিঠে কথা হায়
দন্তকুসুমে ভোমর হইয়া উড়িছে হাসির বায়।

হলুদের মত ভুগু ভুগু রঙ ঝরিছে অঙ্গ ভরি
সরিষার খেত হইতে কে চাষী কুড়ায়ে এনেছে পরী।

ছেঁড়া শাড়ীখানি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আধেক উঠেছে শিরে
যেন জীবন্ত কাঁদিছে অভাব আজকে তাহারে ঘিরে।
গরীবের ঘরে কি ক'রে সে এলো! তার বাপ বুঝি হায়,
কুসুম-ফুলের খেত করেছিল ওই দূর মেঠো গাঁয়।

পরীদের মেয়ে বেড়াতে বেড়াতে হয়ত আকাশ হ'তে
রঙিণ ফুলের রঙেতে ভুলিয়া নেমে এলো এই পথে।
অঙ্গ ভরিয়া কুসুম ফুলের মাখিতে পরাগগুলি
জানিতে পারেনি কখন গিয়াছে পূর্ব্ব জনম ভুলি।

সেই যে ফুলের খেত নিড়াইতে গুচ্ছ ফুলের সনে
পিতা বুঝি তার সঙ্গে করিয়া এনেছিল এই কণে।
গরীবের ঘরে আনিয়াই তারে পরাইল হীন বেশ,
কি দিবে খাইতে অভাবের ঘরে দুঃখের নাহি শেষ।
ঠির ঠির করে কাঁপিতে কাঁপিতে দারুণ শীতের প্রাতে,
ক্ষুধার অন্ন জুগাইতে ফেরে ভিক্ষা পাত্র হাতে।

এই হীন বেশ, এত যে অভাব তবু হাসি মুখপানে
চেয়ে মনে হয় পথ ভুলে ও যে আসিয়াছে এইখানে।
আরেক দেশের মানুষ ও যেন, একখানা লাল শাড়ী,
কে আনিতে পার পরাইয়া দিতে সোনার অঙ্গে তারি।
পাখীর আহার দুইটি অন্ন যে পার তাহারে দিতে,
আকাশের পরী দেখিতে পাইবে মাটির এ ধরণীতে।
তাজমহলের কীর্ত্তি গড়িতে কারো যদি সাধ থাকে
এইখানে এসে খনেক দাঁড়াও এই গেঁয়ো পথ বাঁকে।
পাষাণে তোমরা গড়িয়াছ তাজ, নহে তাহা অক্ষয়
কাল-নটেশের চরণের ঘায়ে কোনোদিন পাবে লয়।

এ মানুষ-তাজ কে গড়িবে ভাই, একটু জ্ঞানের আলো,
একটু বুকের আদর ভরিয়া এর বুকে তুমি ঢালো।
এ কুসুম ফুল শতদল মেলি এমনি পাইবে শোভা
স্বরগে মরতে যত রূপ আছে সবচেয়ে মনোলোভা।
এ ম্লান মুখের এ হাসি সেদিন নবীন উষার পারা
মেঘে আর মেঘে লোক হ'তে লোকে ছড়াবে আলোর ধারা।
ও রাঙা অধর হইতে সেদিন ব্যথার কুসুম ফুটে
টুটিয়া লুটিয়া ছড়ায়ে পড়িবে দেশ হ'তে দেশে ছুটে।

দিল্লীতে এশিয়া সম্মিলন—

২৩শে মার্চ্চ রবিবার বিকাল ৫টার সময় দিল্লীর পুরাণো কিল্লা গৃহে এশিয়া সম্মিলন আরম্ভ হয়। ৩০এর অধিক দেশ হইতে ২৩০ জন প্রতিনিধি তাহাতে যোগদান করেন। দর্শক প্রভৃতি লইয়া মোট ১০ হাজার লোক সম্মিলন মণ্ডপে সমবেত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সার শ্রীরাম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্মিলনের উদ্বোধন করেন ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সম্মিলনে পৌরোহিত্য করেন। মুসলেম লীগ সম্মিলন বর্জ্জন করিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতির দর্শকগণ, জঙ্গীলাট লর্ড অচিনলেক, পাতিয়ালা, বিকানীর প্রভৃতির নৃপতিবর্গ সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। বহু প্রাদেশিক মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি কৃপালনী প্রভৃতিও যোগদান করেন। পণ্ডিত জহরলাল প্রথমে ১০ মিনিট হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা করেন ও তাহার পর ইংরাজিতে লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাক্তার আবদুল মজিদ খাঁ আফগান প্রতিনিধিদলের নেতারূপে আসিয়াছিলেন। রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ মিঃ কাইওয়াসিণ্ট ব্রহ্ম প্রতিনিধিদের নেতারূপে আসিয়াছিলেন। ভুটান প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ ডোরজী, চীন প্রতিনিধিদের দলের নেতা মিঃ চেংইন ফান, সিংহল প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ সায়ার্ড বান্দারাম ইকি, আজার-বাইজেন প্রতিনিধিদলের নেতা, আর্ম্মানিয়াস্থ সোভিয়েট গণতন্ত্রের প্রতিনিধিদলের নেতা, মিশর প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ মোস্তায়ন মোসেন প্রভৃতি প্রথম দিনের সভায় নিজ নিজ দেশের ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সম্মিলনের শুভকামনা করিয়াছিলেন। ২রা এপ্রিল পর্য্যন্ত দিল্লীতে এশিয়া সম্মিলন চলিয়াছে। প্রতিনিধিগণ ৫টি দলে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত ৫টি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন— (১) জাতীয় আন্দোলন (২) বিদেশ গমন ও বর্ণসমস্যা (৩) অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সেবাকার্য্য (৪) সংস্কৃতি বিনিময় (৫) নারী সমস্যা।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও গান্ধীজি—

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রেরিত ভারতীয় প্রতিনিধি ডাঃ ওয়াই-এম-দাদু ও মিঃ জি-এম-নাইকার গত ২০শে মার্চ্চ পাটনা জেলার মাসাউরীতে যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত-বাসীদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা তাঁহারা গান্ধীজিকে জানাইয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইউরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র শতকরা ২০ জন—বাকী ৮০ জন আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের দাবী সমর্থন করেন। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয়গণ দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহাদের অধিকার লাভে সমর্থ হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন। ডাঃ দাদু ও মিঃ নাইকার এখন কিছু-দিন ভারতে থাকিয়া বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থার কথা জানাইবেন।

বিলাতে ভারত কথা—

বিলাতে প্রধান মন্ত্রী আগামী ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব করায় গত ৫ই ও ৬ই মার্চ্চ বিলাতের কমন্স মহাসভায় সে বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। প্রধান মন্ত্রীর ঐ কার্য্যের জন্য মিঃ চার্চ্চিল প্রমুখ ভারত-বিরোধীগণ প্রধান মন্ত্রীর নিন্দা করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ৩৩৭—১৮৫ ভোটে মিঃ চার্চ্চিলের দল পরাজিত হন। দেশরক্ষাসচিব মিঃ আলেকজাণ্ডার মিঃ চার্চ্চিলের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করেন ও বলেন—মিঃ চার্চ্চিলের মত লোকদের জন্য ভারতের সমস্যার সমাধান হইতেছে না। পণ্ডিত নেহরু ও তাঁহার সহকর্ম্মিদের অপর দলগুলির সহিত সহযোগিতার যথাযোগ্য সুযোগ দেওয়া হইলে তাঁহারা ভারতকে বিপদের আবর্ত্ত হইতে বাহিরে আনিয়া ভারতকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও শক্তির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। বৃটিশ জনগণ ভারতীয়দের সহিত স্থায়ী বন্ধুত্বই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে। মিঃ চার্চ্চিলের মত একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে ভারতীয় নেতাদের সম্বন্ধে অন্যায় উক্তি করা মারাত্মক।

বাঙ্গালা ও কেন্দ্রীয় সাহায্য—

গত ২৪শে মার্চ্চ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেটের আলোচনার সময় পণ্ডিত শ্রীযুত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র প্রস্তাব করেন—কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে যে সকল সাহায্য দান করেন, তাহা যথাযথভাবে ব্যয় করা হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কারণ গত দুর্ভিক্ষের সময় কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালা সরকারকে যে ৩ কোটি টাকা সাহায্য দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে মাত্র ৬৪ লক্ষ টাকা বাঙ্গালা সরকার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগকে সাহায্য দানের জন্য ব্যয় করেন—বাকী টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। পুলিস বাহিনী গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালাকে যে সাহায্য দিয়াছে, সেই অর্থে বাঙ্গালার লীগ সচিবসংঘ পাঞ্জাব হইতে ৬ শত মুসলমানকে বাঙ্গালায় আমদানী করিয়াছেন।

অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাহারা মুক্তি পাইয়াছে ও বাকী ১৭৯ জন জেল হাজতে আটক আছে। কবে তাহাদের বিচার হইবে, কে জানে?

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের সেতু বিশারদ মিঃ সেক্তেজ

কয়লা উত্তোলন সমস্যা—

গত ২৯শে মার্চ ধানবাদে ভারতীয় খনি মালিক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করিয়া অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্য শ্রীযুত সি-এচ-ভাবা বলিয়াছেন—কয়লা উত্তোলনের উন্নততর ব্যবস্থা করা না হইলে ভারতের শিল্পোন্নতি সাধন সম্ভব হইবে না। খনিজ মালিকদের সহিত শ্রমিকদের বিরোধের ফলে কয়লা উত্তোলন প্রায়ই বন্ধ থাকে। শ্রমিকদের সহিত মালিকদের অচিরে একটি ১০ বৎসর স্থায়ী চুক্তি সম্পাদিত হইলে এই সমস্যার সমাধান হইবে।

শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলির দান—

শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলি তাঁহার দিল্লীর দরিয়াগঞ্জে অবস্থিত গৃহটি ভারতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের দিল্লী প্রাদেশিক কমিটীকে দান করিয়াছেন।

অথচ যাহারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদেরই পাইকারী জরিমানা দিতে হইবে। এই ব্যবস্থা বুঝা কঠিন!

মাদ্রাজে নূতন সচিব সংঘ—

মাদ্রাজে শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ এতদিন প্রধান মন্ত্রী হইয়া শাসন কা পরিচালনা করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতি বিশ্বাস না থাকায় সম্প্রা শ্রীযুত ও-পি-রামস্বামী রেডিয়ারের নেতৃত্বে নূতন সচিব সংঘ গঠি হইয়াছে। নিম্নলিখিত ১২ জন মন্ত্রী শ্রীযুত রেডিয়ারের সচিব সং কাজ করিবেন—(১) ডাঃ পি-সুব্বারায়ন (২) ডাঃ টি-এস-রা (৩) এস ভক্তবৎসলম্ (৪) গোপাল রেড্ডি (৫) ডেনিয়েল টম (৬) এচ সীতারাম রেড্ডি (৭) কে চন্দ্র মৌলী (৮) টি অবনাশলিঙ্গম্ চেট্টিয়ার (৯) মাধব মেনন (১০) কাল বেঙ্কট রা (১১) এ বি চেট্টি (১২) ভি-কুর্মায়া।

ট্রাম ধর্মঘটের জন্য বাসের অবস্থা ফটো—শ্রীপান্না সেন

নোবেল পুরস্কার ও গান্ধীজি—

নোবেল পুরস্কারের পারমাণ বর্দ্ধিত করিয়া ৮৬৮০ পাউণ্ডের স্থলে ১০৫৩৬ পাউণ্ড করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে শান্তি পুরস্কারের জন্য পোপ, মহাত্মা গান্ধী ও সার জন বয়েডরের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। আগামী নভেম্বর মাসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইবে।

বিহারে পুলিশ ধর্মঘট—

বিহার প্রদেশের কয়েকটি জেলায় পুলিস ধর্মঘট করায় বিহারের অবস্থা কয়েকদিন ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল। শান্তি স্থাপনের জন্য

অভিযোগ ছিল না—দল বিশেষের প্ররোচনায় তাঁহারা কাল্পনিক অভিযোগ উপস্থিত করিয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছিল।

গণপরিষদের অধিবেশন—

আগামী ২৮শে এপ্রিল নয়া দিল্লীতে গণপরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। ইতিমধ্যে পরিষদের বিভিন্ন সাব-কমিটীর সদস্যগণ নিজ নিজ কাজ করিয়া যাইতেছেন। সাধারণ অধিবেশনে সাব-কমিটীগুলির রিপোর্ট দাখিল করা হইবে।

ভারতে আন্তর্জাতিক বিশ্ব যুব সম্মেলনে য়ুরোপীয় প্রতিনিধিবৃন্দ
ফটো—শ্রীপান্না সেন

শিক্ষাব্রতীর দান—

কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত জিতেন্দ্র মোহন সেন সম্প্রতি তাঁহার কলিকাতাস্থ যাবতীয় সম্পত্তি (মূল্য প্রায় ৮০ হাজার টাকা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। ইহার আয় হইতে ট্রেনিং শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে ৭৫ টাকা করিয়া তিনটি মাসিক বৃত্তি দেওয়া হইবে—তন্মধ্যে একটি বৃত্তি শিক্ষয়িত্রীদের জন্য সংরক্ষিত। শ্রীযুত সেন শিক্ষাব্রতী ও দেশপ্রেমিক।

কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—

গত ২৫শে মার্চ্চ মঙ্গলবার হইতে কলিকাতায় আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিদিন নানাস্থানে খুন জখম, অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে। ধর্ম্মঘটের জন্য ট্রাম বন্ধ ছিল—দাঙ্গার জন্য বাস, ট্যাক্সি, গাড়ী প্রভৃতি চলাচলও প্রায়বন্ধ থাকে। মঙ্গলবারেই প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী ও কিরণশঙ্কর রায় পুলিশ কমিশনারকে সঙ্গে লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া লোককে শান্ত থাকিতে উপদেশ দেন—কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।

ইন্দোনেশিয়া সংগ্রামের শেষ—

ইন্দোনেসিয়ার স্বাধীনতা লইয়া গত কয়েক মাস যাবৎ ইন্দোনেসিয়ার গণতন্ত্রবাদীদিগের সহিত ওলন্দাজ সৈন্যদের যুদ্ধ হইতেছিল। গত ২৫শে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর্ত্তমানে ওলন্দাজ সৈন্যরা যে সকল স্থান দখল করিয়া আছে, সে স্থানগুলিও ক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন হইবে।

বাঙ্গলার পল্লীতে ডাকাতি—

বাঙ্গালার বহু পল্লীগ্রাম হইতে ডাকাতির সংবাদ আসিতেছে। গত ২০শে মার্চ্চ খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার আসাসুনী থানার একটি গ্রামে শ্রীযুত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া ডাকাতেরা তিন লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি লইয়া গিয়াছে। এক দিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ—অন্য দিকে অরাজকতা—আমরা কোথায় আছি জানি না।
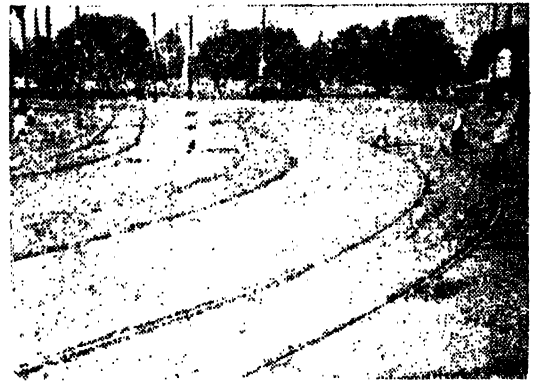
ট্রাম বাস ও অন্যান্য যান বন্ধে কলিকাতার রাজপথ
ফটো—শ্রীপান্না সেন

বাণীচিত্রে নেতাজী বসু—

শ্রীযুত নাথেলাল পারেখ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবনকাহিনী লইয়া যে ৮ হাজার ফিট বাণীচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা গত ৫ই মার্চ্চ দিল্লীতে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল প্রভৃতিকে দেখান হইয়াছে। হরিপুরা কংগ্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিপুরী কংগ্রেস, ভারত হইতে পলায়ন, বার্লিনে বাস, সিঙ্গাপুর গমন, আই-এন-এ প্যারেড, সাংহাই, টোকিও, আন্দামান, ইম্ফল প্রভৃতিতে কার্য্যাবলী দেখান হইয়াছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়ায় চিত্রগুলি গৃহীত হইয়াছে। সর্দ্দার বল্লভভাই ঐ বাণীচিত্র সাধারণে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতেছেন।

যুদ্ধের সময় গৃহীত সম্পত্তি—

কলিকাতা এলাকায় গত মহাযুদ্ধের সময় গভর্ণমেণ্ট যে সকল সম্পত্তি দখল করিয়াছিল, সেগুলি ফেরত পাইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লেখা প্রয়োজন—কলিকাতা, ফোর্ট উইলিয়ম, রয়াল

ষ্যায়াকে এডভাইসরী বোর্ডের সেক্রেটারী মেজর বার্নেসের নিকট। ঐ সম্বন্ধে অভিযোগগুলি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রেরিত হইবে—(১) খাজা খাজিমুদ্দীন এম-এল-এ, নয়াদিল্লী (২) সার জ্যোৎস্না ঘোষাল—রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য, নয়াদিল্লী (৩) শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর সান্যাল—এম-এল-এ, নয়াদিল্লী।

পরলোকে যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ফেলো ও হাইকোর্টের এডভোকেট রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ৩রা মার্চ্চ ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সার চন্দ্রমাধব ঘোষের পুত্র। আজীবন তিনি শিক্ষার উন্নতি বিধানে অবহিত ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীকে বিদেশে পাঠাইয়া শিল্প শিক্ষাদানের জন্য যে সমিতি গঠন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা বহু বাঙ্গালী যুবক উপকৃত হইয়াছে। দুইবার তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন ও বহু বৎসর ধরিয়া কলিকাতার সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন।

মালতী ও সুচেতা—

উড়িষ্যা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী শ্রীমতী মালতী চৌধুরী ও রাষ্ট্রপতির সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী নোয়াখালিতে কয়েক মাস বাস করিয়া তথায় দুর্গতদের সাহায্য দান করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই প্রবাসী বাঙ্গালী। শ্রীমতী মালতী ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত নোয়াখালিতে ছিলেন। তাঁহাদের উপস্থিতি ও সেবা দ্বারা নোয়াখালিবাসী সকলই উপকৃত হইয়াছেন।

কর্পোরেশনের নূতন কর্ম্মকর্ত্তা—

গত ৬ই মার্চ্চ কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় শ্রীযুত ভাস্কর মুখোপাধ্যায়কে ১৬শত টাকা মাসিক বেতনে ১১ই মার্চ্চ হইতে ৩ বৎসরের জন্য কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ডেপুটী কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। ভাস্করবাবু রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জামাতা। তাঁহার স্থানে মিঃ আবদুস সত্তার ১২২০ টাকা মাসিক বেতনে ১১ই মার্চ্চ হইতে ৩ বৎসরের জন্য ১নং ডেপুটী কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। অস্থায়ী কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এস-এম ইয়াকুব ঐ দিন হইতে অবসর গ্রহণ করায় তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করা হইয়াছে।

১৯৪৬ সালে স্পেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনে ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধি

লর্ড ওয়াভেলের ভারত ত্যাগ—

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল গত ২৩শে মার্চ্চ ভারত ত্যাগ করিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছেন—১৩ বৎসর তাঁহাকে ভারতে বাস করিতে হইয়াছিল। শৈশবের আড়াই বৎসর তিনি নীলগিরি পাহাড়ে অতিবাহিত করেন। তাহার পর ৫ বৎসর সাধারণ সৈনিকরূপে কাটান। শেষ জীবনে তিনি জঙ্গীলাটরূপে ২ বৎসর ও বড়লাটরূপে সাড়ে তিন বৎসর ভারতে কাজ করিয়াছেন।

স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ—

ফ্রান্সে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ কলিকাতায় আসিলে গত ৮ই মার্চ্চ তাঁহাকে ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। তিনি ১৯২০ সালে ২২ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হন। তাঁহার পিতা কোচিন রাজ্যে যুবরাজ ছিলেন। ১৯৩৭ সাল হইতে তিনি ফ্রান্সে বাস করিয়া ঠাকুরের কথা প্রচার করিতেছেন। যুদ্ধের সময় বহুবার তাঁহাকে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইলেও তিনি প্রচার কার্য্য বন্ধ করেন নাই। তিনি ফরাসী ভাষায় বহু পুস্তক লিখিয়া ভারতীয় দর্শনের প্রচার করিয়াছেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে তথায় নিয়মিত ক্লাস করিবার জন্য আহ্বান করেন।

রকফেলারের দান—

জন-ডি-রকফেলার (তৃতীয়) মার্কিনের ধনী ব্যবসায়ী। তিনি সম্প্রতি নিউইয়র্কে বিশ্ব রাষ্ট্রসংঘের গৃহের জমী ক্রয়ের জন্য সংঘকে ৮৫ লক্ষ ডলার দান করিয়াছেন।

আসামে লীগে ভাঙ্গন—

বাঙ্গালার মুসলেম লীগ আসামে মুসলমান প্রেরণের চেষ্টা দ্বারা তথায় গণ্ডগোল সৃষ্টি করায় শিলং জেলা মুসলেম লীগের সভাপতি মৌলবী

সইদুর রহমন লীগের সভাপতি পদ ত্যাগ করিয়াছেন। মৌলবী রহমন গাহুল্লা মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

তিন লক্ষ টাকা দান—

ব্যারিষ্টার শ্রীযুত স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য চৌধুরী সম্প্রতি কলিকাতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ক্যান্সার হাসপাতালে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকায় মূল্যবান এক্‌স্‌রে যন্ত্রাদি ক্রয় করা হইবে।

১৯৩৫ ও ২৯১, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে—৩৬৯৬, হাওড়া ফোরশোর রোডে—২২৮৯, মেদিনীপুর শালবনী ও ডিভিশনে—৪৯০০ ও ১০০০, নদীয়ায় ১৪, মুর্শিদাবাদে—৭৭৩, জলপাইগুড়ীতে ৭৫, বীরভূমে—৩৩৯, রাজসাহীতে—৩৭৩ ও খুলনায়—৪০০ শত রাখা হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় কেন্দুয়ালিয়া, ৫৫৫১, মাধাইগঞ্জ ৩২২১, ময়রা—৩২২২, নাংঘা—৩৪৪ চান্দা—১৫৫৩, বোগরা—১৩৭৪, নিমডাঙ্গা—১২১৪, শ্রীপুর ৯৩৮, নবাবনগর—৫০০০,

ভারত সেবাশ্রম সংঘ কর্তৃক নোয়াখালীর দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সংস্কার

বাঙ্গালায় বিহারী মুসলমান—

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাঙ্গালার লীগ গভর্ণমেণ্ট বিহার হইতে ৯৩ হাজার ৩ শত ৪২ জন মুসলমান বাঙ্গালায় আনিয়া তাহাদের আশ্রয় দিয়াছেন। বিহারে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জন্য ইহা করা হইয়াছে। তাহাদের জন্য এ পর্য্যন্ত ২৫ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩৩২১ জনকে কলিকাতার নিম্নলিখিত স্থানে রাখা হইয়াছে—আলিপুরে—১৮১৪, লোয়ার চিৎপুর রোডে—১৮৬১, বলাই দত্ত ষ্ট্রীটে—১১৪৮, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে—১২৭২, লিণ্টন ষ্ট্রীটে—১২৪০, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে—৮৯২, নীকাশিপাড়ায়—৯১২, প্রিন্সেপ ষ্ট্রীটে—৪২৮, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে—৬২৬, বেলগেছিয়ায়—৬৫৭, মার্কাস স্কোয়ারে—৬৪৩, সন্তোষপুরে—৫৯৪, হেষ্টিংসে—২৩৫ ও বালমুকুন্দ শক্কর রোডে—১০০০ জন। তাহা ছাড়া দিনাজপুরে—৬০৪১, হুগলীর পাণ্ডুয়া ও ব্যাণ্ডেলে—

কাশীপুর—৩০০০ ও শালকুনি—২০০০ মুসলমান আসিয়াছে। ৮২৭৭২৪ জনকে অন্যান্য বহু স্থানে রাখা হইয়াছে।

উত্তর মৈমনসিংহে অনাচার—

উত্তর মৈমনসিংহের শাসন-বহির্ভূত অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন দমন করিতে যাইয়া পুলিস ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সে অঞ্চলে যে ভীষণ চণ্ডনীতি চালাইয়াছেন, তাহাতে দেশবাসী ক্ষুব্ধ ও চঞ্চল হইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগে উহা ঘটিয়াছিল। পুলিসের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার জুলুমের অভিযোগ হইয়াছে। এ বিষয়ে এখনও বিস্তৃত সংবাদ জানা যায় নাই। দেশবাসী লীগ মন্ত্রিসভার অনাচারে ব্যতিব্যস্ত—তাহার পর নূতন সমস্যার কথা চিন্তা বা আলোচনার সময় পায় না। এ বিষয়ে এক দিকে যেমন স্বাধীন তদন্তের দ্বারা প্রকৃত ঘটনাবলী প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, অন্যদিকে সরকারী তদন্তের পর অনাচারীর শাস্তি বিধানের ব্যবস্থাও দরকার।

নূতন বড়লাটের নূতন নীতি—

নূতন বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন গত ২৮শে মার্চ্চ নয়াদিল্লীতে লাটপ্রাসাদে এসিয়া সম্মিলনের প্রতিনিধিদিগকে এক প্রীতি সম্মিলনে আপ্যায়িত করিয়াছেন। মুসলেম লীগ এসিয়া সম্মিলন বর্জ্জন করার পরও বড়লাটের এই কাজ দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি লর্ড ওয়াভেলের মত লীগের কথায় চলিবেন না। লর্ড ওয়াভেল গণপরিষদ পরিদর্শনের মত প্রকাশ করিয়াও পরে লীগের অনুরোধে সে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। নূতন বড়লাট কার্য্যভার গ্রহণের পর অতি দ্রুততা ও তৎপরতার সহিত কাজ করিতেছেন। মনে হয়, মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাতের পর তিনি ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিবেন।

মেদিনীপুর জিলার লাক্ষ্যা গ্রামে হিন্দু সম্মিলনের অধিবেশন

বৃটেনে ভারতবন্ধু কমিটী—

বৃটীশ ও ভারতীয়দের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের জন্য নিযুক্ত লণ্ডনস্থ অফিসার শ্রীযুত সুধীর ঘোষ কয়েকজন বৃটীশ জননায়ক ও রাজনীতিককে লইয়া লণ্ডনে একটি ভারতবন্ধু কমিটি গঠন করিয়াছেন। মিঃ এচ এন্-ব্রেলস্‌ফোর্ড, আর্লি অফ্ মুনষ্টার, সার জর্জ্জ সুষ্টার ও মিঃ গ্রেহাম হোয়াইট উক্ত কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীযুত ঘোষ ঐ কমিটীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

বাঙ্গালায় খাদ্যাভাব—

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র যে সকল স্থানে রেশন ব্যবস্থা নাই—চাউলের দাম খুব বেশী বাড়িয়াছে। কোন কোন জেলায় চাউলের দাম মণ প্রতি ৩৫ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছে। ২৫ টাকা মণের কমে কোথাও চাউল পাওয়া যাইতেছে না। যে সকল স্থানে রেশন ব্যবস্থা আছে, সে সকল স্থানেও নিয়মিত চাউল পাওয়া যায় না—যাহা পাওয়া যায়, তাহা আবার গ্রহণের অযোগ্য। এজন্য লোকের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। সরিষার তৈলের দর ৪ টাকা সের হইয়াছিল—কণ্ট্রোল তুলিয়া লওয়ায় তাহার দাম ক্রমে কমিতেছে। চাউল সম্বন্ধে ঐ ব্যবস্থা করিলে হয় ত চাউলের দামও কমিয়া যাইবে। গত প্রায় দুই বৎসর যাবৎ বাঙ্গালা দেশে আটা পাওয়া যায় না। যে আটা রেশনের দোকানে বিক্রীত হয়, তাহা গ্রহণের অযোগ্য। তাহাও সর্ব্বদা বা উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না। চিনির অবস্থাও ক্রমে সঙ্গীন হইতেছে। সরকারী অব্যবস্থার ফলে বাঙ্গালা দেশে ডাল ৪০ টাকা মণ হইয়াছে। কয়লা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য—এত কাল ধরিয়াও গভর্ণমেণ্ট নিয়মিতভাবে কলিকাতায় কয়লা সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই। খাদ্যাভাবে অখাদ্য খাইয়া বাঙ্গালার লোক মৃত্যুপথযাত্রী—লীগ মন্ত্রিসভা দাঙ্গা লইয়া ব্যস্ত—কাজেই জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশার দিকে দেখিবার কেহ নাই।

অধ্যাপক আবদুল বারি নিহত—

গত ২৮শে মার্চ্চ বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি অধ্যাপক আবদুর বারি জেমসেদপুর হইতে মোটরে পাটনা ফিরিবার পথে পাটনা হইতে ১২ মাইল দূরে ফতোয়ার নিকট বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছেন। চোরাই মালের ব্যবসায়ীদিগকে ধরিবার জন্য নিযুক্ত স্পেশাল পুলিস (পূর্ব্বে ইনি আজাদ-হিন্দ-ফৌজে ছিলেন) ভুল ক্রমে অধ্যাপক বারিকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিয়াছে। অধ্যাপক বারি খ্যাতনামা শ্রমিক নেতা ছিলেন। টাটানগরের শ্রমিক সংঘেরও তিনি সভাপতি ছিলেন।

আসামের সাহায্যে সৈন্যদল—

বাঙ্গালা হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান বলপূর্ব্বক আসামে প্রবেশ করিয়া পতিত ও গোচারণ জমীগুলি দখল করার চেষ্টা করিতেছে। আসামের সচিব সংঘ তাহাদের সেই কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে বাধা প্রদান করিতেছেন। আসাম সরকারের বাধাদান কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের সৈন্যদিগকে নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন। মুসলেম লীগে আসামে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বাড়াইবার জন্য বাঙ্গালা হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে বলপূর্ব্বক আসামে প্রবেশ করিতে উত্তেজিত করিতেছে।

দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী—

বড়লাট কর্ত্তৃক আহূত হইয়া মহাত্মা গান্ধী গত ৩০শে মার্চ্চ রবিবার ট্রেণে পাটনা ত্যাগ করিয়া সোমবার দিল্লীতে পৌঁছেন। তথায় বিকাল ৫টা হইতে ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট বড়লাটের সহিত তাঁহার আলাপ আলোচনা হয়। তৎপূর্ব্বে পণ্ডিত নেহরু, মৌলনা আজাদ, সর্দ্দার প্যাটেল ও আচার্য্য কৃপালনীর সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। ১লা এপ্রিল মঙ্গলবারও সকাল সাড়ে ৯টা হইতে দুই ঘণ্টা কাল তিনি বড়লাটের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় গান্ধীজি এসিয়া সম্মিলনে যাইয়া কয়েক মিনিট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এসিয়ার ২২টি দেশের প্রতিনিধিরা সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতায় গান্ধীজি বলেন—"অখণ্ড বিশ্ব যদি গঠিত না হয়, তাহা হইলে আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না। আমারই জীবদ্দশায় এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইতে দেখিতে চাই। এসিয়ার বিভিন্ন দেশ হইতে আপনারা এখানে প্রতিনিধি

স্বরূপ আসিয়াছেন—আপনারা সঙ্কল্প সাধনে যদি একমন ও একাগ্র-চিত্ত হন, তাহা হইলে আপনারা নিঃসন্দেহে আপনাদের জীবিতকালের মধ্যেই এই স্বপ্ন সফল করিতে পারিবেন।" দিল্লী ত্যাগের পূর্ব্বে বড়লাটের সহিত গান্ধীজির এবার ৬ বার দেখা হইয়াছিল।

বাঙ্গালায় সাহায্য দান বন্ধ—

বাঙ্গালার লীগ গভর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট ৯ কোটি টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ জানাইয়াছেন, যে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য দান করা হইবে না। বলা বাহুল্য, ঐ টাকা লইয়া বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সম্প্রদায় বিশেষের উন্নতি বিধানের ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাবে ৯৩ ধারার শাসন—

পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট সচিব সংঘ পদত্যাগ করায় গভর্ণর মুসলেম লীগকে দিয়া সচিবসংঘ গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। লীগ সচিবসংঘ গঠনে অসমর্থ হওয়ায় গভর্ণর ৯৩ ধারা বহাল করিয়া পাঞ্জাবের শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছেন। গত ৩রা এপ্রিল কেন্দ্রীয় পরিষদের ১২জন পাঞ্জাবী (হিন্দু ও শিখ) সদস্য মিলিতভাবে পণ্ডিত নেহরুকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন—পাঞ্জাব বিভাগই বর্ত্তমান অচল অবস্থার একমাত্র সমাধান। অবিলম্বে এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করা উচিত। পত্রখানি বড়লাটকে ও বৃটীশ গভর্ণমেণ্টকে পাঠাইতেও অনুরোধ করা হইয়াছে।

আজাদ-হিন্দ-ফৌজের মুক্তি—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে খাঁ আবদুল গণি খাঁ আজাদ-হিন্দ-ফৌজের যে সকল সদস্য এখনও আটক আছেন, তাঁহাদের মুক্তির দাবী করেন। পণ্ডিত নেহরু জানাইয়াছেন—জঙ্গীলাট সকল বন্দীর মুক্তিদানে সম্মত হন নাই—কাজেই বিষয়টি ফেডারেল আদালতের রায়ের জন্য প্রেরণ করা হইবে।

এশিয়া মৈত্রী সংঘ—

গত ২রা এপ্রিল দিল্লীতে এসিয়া সম্মিলনের অধিবেশনের শেষ দিনে 'এসিয়া মৈত্রী সংঘ' নামে একটি পরিষদ গঠিত হইয়াছে। যে সকল দেশের প্রতিনিধি সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশের ২জন করিয়া প্রতিনিধিকে সংঘের সদস্য করা হইয়াছে। প্রত্যেক দেশে

সংঘের একটি করিয়া শাখা কার্য্যালয় থাকিবে। এসিয়ার দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করাই সংঘের উদ্দেশ্য। এসিয়া সম্মিলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন ১৯৪৯ সালে চীনে অনুষ্ঠিত হইবে। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও রাণী রাজওয়াড়ে সংঘের ভারতীয় প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রের নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল মার্শালের সহিত করমর্দনরত প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান

হইয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে, পণ্ডিত নেহরু, সংঘের সভাপতি এবং ভারতের মিঃ বি-শিবরাও ও চীনের মিঃ হাম-লু-উ সংঘের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ২রা এপ্রিল তারিখেও মহাত্মা গান্ধী এসিয়া সম্মিলনে যাইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"সত্য ও প্রেমের বাণী দিয়া প্রাচী প্রতীচীকে জয় করিবে।" শেষ দিনের অধিবেশনে সভানেত্রী নাইডু ও পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

একটি গ্রামে এক লক্ষ টাকা জরিমানা—

পাঞ্জাব প্রদেশের গিরগাঁও জেলার হোদান গ্রামে গত ২৫শে মার্চ্চ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হওয়ায় ২রা এপ্রিল গ্রামবাসীদের উপর এক লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে। দাঙ্গায় ক্ষতির পরিমাণ মাত্র ২১৩ হাজার টাকা। কাজেই এই জরিমানা অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

ভারতে সৈন্যবাহিনী গঠন—

গত ১লা এপ্রিল হইতে ভারত রক্ষার সমস্ত ভার ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত হইয়াছে; ফলে নিম্নোক্তভাবে দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে—বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন (সভাপতি), দেশরক্ষা সচিব সর্দ্দার বলদেব সিং (সহ-সভাপতি), পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ, শ্রীজগজীবনরাম, ডাক্তার জন মাথাই, মিঃ আবদার রব নিস্তার ও জঙ্গীলাট সদস্য। দেশরক্ষার

জে। সঙ্গে বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীও থাকিবে।

দক্ষীণে ডাক্তার সারিয়ার—

ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার সুলতান সারীয়ার এসিয়া সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্ত দিল্লীতে আসিয়া শেষ ২ দিনের সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বেতার বক্তৃতায় বলেন—"এসিয়ার সকল দেশের প্রতিনিধিগণ এইবার প্রথম একত্র হইলেন। আসুন, আমরা মনুষ্য সমাজের মঙ্গলবিধানের জন্ত প্রকৃত নিষ্ঠার সহিত একযোগে কার্য্য আরম্ভ করি। আমরা সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ নূতন পৃথিবী গড়িয়া তুলিব।"

গত ৩১শে মার্চ্চ মাদ্রিদ হইতে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ঘোষণা করিয়াছেন—স্পেনে রাজতন্ত্র ঘোষণা করা হইবে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো রাষ্ট্রনায়ক হইবেন এবং শাসন কার্য্যে সহায়তার জন্ত একটি প্রতিনিধি পরিষদ গঠিত হইবে। নূতন ব্যবস্থার জন্ত শীঘ্রই স্পেনে নূতন আইন ঘোষণা করা হইবে।

গ্রীসের রাজার মৃত্যু—

গ্রীসের রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জ গত ১লা এপ্রিল ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। রাজা জর্জ্জ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বংশধর। তিনি ১৯২২ সালে রাজা হন—কিন্তু ১ বৎসর পরেই নির্ব্বাসিত হন। ১৯৩৫ সালে ফিরিয়া আসিয়া আবার রাজা হন ও ৬ বৎসর পরে জার্মান আক্রমণের সময় পলাইয়া যান। সাড়ে ৫ বৎসর পরে গত সেপ্টেম্বর মাসে ফিরিয়া তিনি আবার রাজা হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার ভ্রাতা প্রিন্স পল রাজা হইলেন। পলের বয়স ৪৬ বৎসর।

প্রাগে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ছাত্র-কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলী

বড়লাটের কার্য্য-ভার গ্রহণ—

গত ২৪শে মার্চ্চ দিল্লীতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন নূতন বড়লাটের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সে সময়ে তিনি বলিয়াছেন—সকলকে একত্র হইয়া এখন এমনভাবে কাজ করিতে হইবে, যেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতের শাসনভার ভারতীয়দের উপর দান করিতে পারে। এ সময়ে কোনরূপ বিবাদ কাহারও অভিপ্রেত হওয়া উচিত নহে।

কলিকাতায় পরামর্শ কমিটি—

কলিকাতার দাঙ্গার অবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণের জন্ত প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দী নিম্নলিখিত নেতাদের লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন—শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত কুমার বসু, অমর কৃষ্ণ ঘোষ, ডবলিউ-সি-ওয়ার্ডসওয়ার্থ, এন-পেন্টনি, আর-গোমেস, মহম্মদ রফিক, কে-নুরুদ্দীন, এস-এম-তৌফিক, ডাঃ মালেক, এম-ডি-ইউসুফ ও কে-নসরুল্লা।

আনন্দবাজার পত্রিকার দণ্ড—

"চাপাই নবাবগঞ্জে দুইটি ধর্ম্মস্থান অপবিত্র" শীর্ষক সংবাদ প্রকাশ করায় কলিকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে গত ৩১শে মার্চ্চ বঙ্গীয় স্পেশাল অর্ডিনান্সে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের ২শত টাকা অর্থদণ্ড ও মুদ্রাকর শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ৫০ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। সংবাদপত্র পরিচালকদিগকে সর্ব্বদা এরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া কাজ করিতে হয়।

মিঃ ডি-এন-সেন—

বেঙ্গল পটারিজ, শ্রীগোবিন্দ গ্লাস ওয়ার্কস, নিউ ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কস প্রভৃতির পরিচালক খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মিঃ ডি-এন-সেন গত ৩১শে মার্চ্চ বেঙ্গল ন্যাশানাল চেম্বার অফ কমার্সের (বাঙ্গালী বণিক সমিতি) ৬০ তম বার্ষিক সভায় চেম্বারের ১৯৪৭ সালের নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ সেন স্বর্গত এডভোকেট হেমেন্দ্র নাথ সেন মহাশয়ের পুত্র।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন—

গত ৩১শে মার্চ্চ চীনে ভারতীয় প্রথম রাষ্ট্রদূত শ্রীযুত কৃষ্ণ মেনন কার্য্যভার গ্রহণ করিলে জেনারেলিসিমো চিয়াং-কাই-সেক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন কালে বলিয়াছেন—"গত ৩০ বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীরা পূর্ণস্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্ত যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদের

সেই সাধনা আজ সার্থক হইতে চলিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি চীনের চিরদিনই সহানুভূতি আছে।"

সীমান্তে লীগ-পন্থীদের জুলুম—

পেশোয়ার হইতে ২৫শে মার্চ্চ শ্রীযুত মদনলাল মেহতা জানাইয়াছেন —সীমান্ত প্রদেশের মফঃস্বল অঞ্চলে মুসলেম লীগের লোকগণ সেখানকার হিন্দু ও শিখগণকে ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে এই সর্ত্তে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করিতেছে যে সীমান্তের কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি তাহাদের আস্থা নাই এবং তাহারা পাকিস্থানই সমর্থন করে। যদিও সীমান্তে শিখ ও হিন্দুগণ এই ভীতি প্রদর্শনের নিকট নতি স্বীকার করিবে না, তথাপি গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

পরলোকে ডাঃ প্রবোধহরি চট্টোপাধ্যায়—

ডক্টর প্রবোধহরি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পাশ করিয়া তিনি বিলাত যান ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য শব্দ বিষয়ের মনস্তত্ত্ববিদ্যায় পি এচ্-ডি উপাধি লইয়া আসেন।

ডাক্তার প্রবোধহরি চট্টোপাধ্যায়

তিনি ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের কাজে যোগদান করিয়া শীঘ্রই মেজর হইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির বাঙ্গালা পুস্তক পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯৪২-৪৩ সালে তিনি লণ্ডন হইতে প্রতি শনিবার বেতারে বাংলায় সংবাদ প্রচার করিতেন।

এশিয়া মহাযজ্ঞ—

বহু রাজসূয় যজ্ঞের যজ্ঞভূমি পুরাণ-কথিত, ইতিহাস-বিখ্যাত দিল্লীতে এশিয়া মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হইল। ইহাকে সভা বলিলে গুরুত্ব [illegible] তাহা হইবে ; বা মামুলী আসর নাম দিলে ইহার মর্য্যাদার হানি ঘটিবে ; আবার অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রনৈতিক চক্রান্তের ষড়যন্ত্রাগার বলিলে ইহার অপমান হইবে। এক কথায় ইহার সহিত তুলনা করিবার কোন দৃষ্টান্ত উপকরণই আমাদের কাহারও চক্ষুতে বা মনে নাই। একটা দিগ্বিজয়া সম্মেলন বলিলে কি হয় তাহাই ভাবিতেছি।

জাপান ব্যতিরেকে এসিয়ার সমস্ত বড়, মাঝারি ও ছোট দেশ আসিয়াছিলেন। সাধ্য থাকিলে হয়ত জাপানও আসিত। ভাগ্যদোষে ও অবস্থাবৈগুণ্যে জাপান আজ একঘরে। যজ্ঞস্থলে এ দুঃখ অনুভূত হয় নাই এমন একটি অন্তরও ছিল কি না সন্দেহ। আজ যাঁহারা জাপানের ভাগ্যনিয়ন্তা, কেন যে তাঁহারা এমন একটা জাতি সম্মিলনে জাপানকে আসিতে দেন নাই, কে জানে! সুদূর অতীতে ভারতবর্ষ অখিল-এসিয়ায় তাহার নৈতিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রাগ্-ইতিহাসের স্মৃতিতে এবং ইতিহাসের পুঁথিতে সে মহিমোজ্জ্বল কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তারপর ভারত পৃথিবী হইতে ছিন্ন এবং আপন স্বজনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দুর্গতির অতল তলে শায়িত হইয়াছিল। কে জানিত, এক বৎসর পূর্ব্বেও কে কল্পনা করিতে পারিত যে বৃটিশের নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাইবার পূর্ব্বেই ভারত ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত তাহার জ্ঞাতি-গোত্র আত্মীয় স্বজনগণকে এমন উদাত্ত আহ্বান দিতে পারিবে? আর সমস্ত এসিয়া সৌভ্রাত্রের সম্মান রক্ষার্থ এত শীঘ্র ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিতে হইবে, ইহাও কি কল্পনারও বহির্ভূত ছিল না?

কিন্তু ইহাই ভারতবর্ষ; ইহাই ভারতের যোগ্য! ভারত-বিধাতা ভারতের ললাটে নেতৃত্বের জয়টীকা দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন—অতীতেও ছিল তাহার নেতৃত্ব, অদূর ভবিষ্যতেও প্রতীচ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ভারতের নেতৃত্ব। এসিয়াগত সুধীসমাজ ভারতের গলে নেতৃত্বের সেই বরমাল্য অর্পণ করিলেন, হস্তিনার পুরাণো কিল্লায়। আজিকার দিনে এমন নিঃশঙ্ক, এমন নিঃসন্দেহ, এমন অকুণ্ঠ ও এমন অকৃপণ করে কেহ কাহারও বরণ করে না। মস্কৌতে পাশ্চাত্যের চতুঃশক্তির সম্মিলন ঠিক ঐ সময়েই ঘটিতেছিল। বেভিন যে পথে চলেন, মার্সাল সে পথে অপদেবতা দেখিয়া থাকেন, মলোটোভকে মামদো বোধে সকলেই সত্বর সত্বর শঙ্কে সরিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এখানে সে ভয় নাই। শোষণ লুণ্ঠন, পরস্বাপহরণ দ্বারা অতীতেও ভারত তাহার অধিকার বিস্তার করে নাই, ভবিষ্যতেও ভারত তাহা করিবে না। জ্ঞান ও বিজ্ঞান, দান ও প্রতিদানের পথেই ভারতবর্ষ পৃথিবীর সহিত মিলিত হইয়াছিল, আবার সেই লুপ্ত স্বর্ণসূত্র পুনরুদ্ধার করিয়াই সৌহার্দ্দ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবে। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে ও নির্ব্বিকার মনে এসিয়া ভারতে আসিয়া ভারতের প্রসাদ গ্রহণ করিল।

ভারত এসিয়াকে কোন্ সম্পদ দান করিয়াছিল তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই, ইতিহাসের সম্পত্তিরূপে আজও তাহা পরিগণিত হইতেছে। এবারে, রাজসূয় যজ্ঞস্থলে দাঁড়াইয়া ভারত এসিয়াকে কি

সামগ্রী দিল পৃথিবীর জহুরীরা তাহা জানিতে উদ্গ্রীব হইয়াছিল। প্রভূত বিত্তশালী, ধনজনে গরীয়ান আমেরিকা যাহা পারে নাই, কূট-কৌশলী ইংলণ্ড যাহা পারে নাই, দিগ্বিজয়ী রাসিয়াও বুঝি তাহা কল্পনা করিতে পারে না, ভারত তাহাকে সেই অমূল্য সম্পদই দিয়াছে। ভারতও বলিয়াছে—দেশ জয় করিতে হইবে, পাশ্চাত্য মহাদেশ জয় করিতে হইবে, দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ করিতে হইবে। কিন্তু এ্যাটম বম্ব দ্বারা নয়, বম্বার দ্বারাও নয়—প্রেম ও সত্যের মন্ত্রেই বিশ্ববিজয় করিতে হইবে। এই মহামন্ত্র লাভের আশাতেই উন্মুখ হইয়া এসিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, জীবিত বুদ্ধের নিকট সেই মহামন্ত্রে দীক্ষা লইয়াই এসিয়া এসিয়ায় প্রত্যাগমন করিয়াছে।

কলিকাতায় এশিয়াটিক শিল্প ও কৃষ্টি সম্মিলন—

সম্প্রতি কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে সর্ব্ব-এশিয়ার শিল্প ও কৃষ্টি সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সিংহলের শিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর কাউনান

এসিয়াটিক শিল্প সম্মেলনে সমবেত সুধীবৃন্দ

গারা উহাতে সভাপতিত্ব করেন এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের শিক্ষা সচিব মিঃ সি-রাজাগোপালাচারী সম্মিলনের উদ্বোধন করেন। সম্মিলনে বহু দেশের বহু শিক্ষাব্রতী সমবেত হইয়াছিলেন। কলিকাতা আর্ট সোসাইটী সম্মিলনের উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিলেন।

প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী—

আগামী ৫ই মে বৈশাখী পূর্ণিমায় খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার ঈশ্বরীপুর গ্রামে প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী উৎসব হইবে। বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে প্রতাপাদিত্যের কথা স্মরণ করা প্রত্যেক বাঙ্গালীর একান্ত কর্ত্তব্য। এই উৎসব যেন সে বিষয়ে বাঙ্গালীকে উৎসাহিত করে।

শ্রীঅনিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের বাহিরে স্বাধীন-ভারত-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই স্বাধীন-ভারত-রাষ্ট্র বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে বৃটিশকে পরাস্ত করিয়া স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। সাময়িকভাবে হইলেও, এই বিজয় অভিযান আজ ইতিহাসের অবদান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং দুই শতাব্দীর পরাধীনতার গ্লানিরও যে অনেকখানি নিরসন করিয়াছে তাহাও আগামী কালের ইতিহাসে লিখিত হইবে। এই ঐতিহাসিক কার্য্যে যে-সকল ভারতীয় নেতাজীর সহযোগী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থান সকলের পুরোভাগে। নেতাজী মেজর-জেনেরাল চ্যাটার্জ্জিকে বৃটিশ-অধিকারবিমুক্ত স্বাধীন একটি দেশের গভর্ণর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বৃটিশের আন্দামান—নিকোবর দ্বীপাবলী "শহীদ দ্বীপপুঞ্জ" নাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার উপরে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়িয়াছিল এবং বাঙ্গালী চাটার্জ্জি তাহার শাসন কর্তৃত্ব পাইয়াছিলেন। বৃটিশ এই দ্বীপপুঞ্জে বহু বাঙ্গালী স্বদেশ-সাধকের সাধনার সমাধি রচনা করিয়াছিল; "রাজদ্রোহের" অপরাধে এইখানেই দ্বীপান্তরিত করিত। নেতাজী কর্তৃক ইহার শহীদ দ্বীপপুঞ্জ নামকরণ যে কত অর্থপূর্ণ ও সার্থক তাহা আশা করি বাঙ্গালীকে না বলিলেও চলিবে।

চাটার্জ্জি যুদ্ধপূর্ব্বকালে বাঙ্গালাদেশে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের বড় চাকরীতে নিযুক্ত ছিলেন। যুদ্ধকালে বৃটিশের ভাগ্য বিপর্য্যয়ে জাপানী হস্তে বন্দী হ'ন এবং পরে নেতাজী গঠিত ফৌজে ও রাষ্ট্রে যোগদান করিয়া চাকরী জীবনের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করেন।

অনিলচন্দ্র লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার প্রতুলচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র। অনিলচন্দ্ররা পাঁচ ভাই—সকলেই বৃটিশ আদর্শে কৃতী ও পদস্থ; কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রে নেতাজীর সহকর্ম্মীহিসাবে তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত স্মরণীয় থাকিবে। সুখের বিষয় অনিলচন্দ্র আজও সুস্থ শরীরে আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। ভরসা করি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া স্বাধীন পশ্চিম বাঙ্গালা গঠন করিয়া বাঙ্গালীর আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিবেন। বৈশাখের ভারতবর্ষে আমরা অনিল চন্দ্রের ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশ করিলাম।

বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন—

গত ৪ঠা এপ্রিল কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির এক সভায় "জাতীয়তাবাদী বাঙ্গালীর জন্য স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবী" করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ঐ সভায় বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মাখনলাল সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, কুমার দেবেন্দ্রলাল খান ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিনই দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাঙ্গালী হিন্দু সদস্যদের পক্ষ হইতে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ঐরূপ এক দাবী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জ্ঞাপন করিয়াছেন—বড়লাট, মহাত্মা গান্ধী, আচার্য্য কৃপালানী, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যবৃন্দ। ঐ ৪ঠা এপ্রিল তারিখে তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে সভাপতিরূপে খ্যাতনামা হিন্দু নেতা ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও বলিয়াছেন—বাঙ্গালায় হিন্দুর রাষ্ট্রতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়—বঙ্গে হিন্দুর পৃথক রাষ্ট্র স্থাপন।

পরলোকে গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী—

মোহিনী মিলসের ম্যানেজিং এজেন্ট গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ৭১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি ব্যবসায়ে যোগদান করেন ও ১৯০৭ সালে মোহিনী মিলের

৺গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

কাজ সুরু করেন। ১৯৩৭ সালে ২নং মোহিনী মিল স্থাপিত হয় ও মাত্র ২ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অন্নপূর্ণা কটন মিল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বেঙ্গল মিল-ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি ও ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটীর সদস্য ছিলেন। তাঁহার ৫ পুত্র ও ২ কন্যা বর্ত্তমান।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—

গত ৫ই এপ্রিল হইতে ৭ই এপ্রিল পর্য্যন্ত কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্ব্বিংশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা করেন। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত, সম্মেলনে মহিলা শাখার সভানেত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা ঠাকুর, বৃহত্তর বঙ্গ-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু, সাহিত্য শাখার সভাপতি ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডাঃ পঞ্চানন নিয়োগী, শিল্পকলা শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী বক্তৃতা করেন। লেডী রাণু মুখার্জ্জী, শ্রীযুক্ত অতুল বসু, ডাঃ হিমাংশুকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যথাক্রমে মহিলা, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য শাখার উদ্বোধন করেন। ৭ই প্রাতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রতিনিধি আসিয়া সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতের নানাস্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবারের প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন কলিকাতায় অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও সাফল্যলাভ করিয়াছে।

পরলোকে বিশিষ্ট বাঙ্গালী বৈমানিক—

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এক বিমান দুর্ঘটনার ফলে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সদস্য ভবদেব মুখোপাধ্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি তাঁহার নিজস্ব বিমানে করিয়া ঐদিন প্রাতে কলিকাতা হইতে ৭৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র সৈকতে অবস্থিত কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত দীঘায় জনৈক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

৺ভবদেব মুখোপাধ্যায়

সেখান হইতে বিমানখানি আকাশে উড়িবার কালে দুর্ঘটনা ঘটে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য তাঁহার মৃতদেহ বিমানযোগে কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। ভবদেববাবু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র। তিনি ১৮৮৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সাল হইতে তিনি বিমান চালনায় লাইসেন্স পান। তিনি বহু প্রতিযোগিতা-

মূলক বিমান চালনায় যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট পাট ব্যবসায়ীও ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে এক পুত্র, এক কন্যা ও স্ত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।

পরলোকে আজিজল হক—

গত ২২শে মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭টার সময় ডাঃ আজিজল হক মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার লাউডন ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মাত্র ১ দিন পূর্ব্বে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। তিনি ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সরকারের মন্ত্রী, তাহার পর ৫ বৎসর কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ছিলেন। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪২

আজিজুল হক্

ফটো—শ্রীরবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন ও ১৯৪২ সালে লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ২ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন—অন্তবর্তী সরকার গঠিত হইলে তিনি সে পদ ত্যাগ করেন। নদীয়া জেলার শান্তিপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি—তিনি প্রথম জীবনে কৃষ্ণনগরের উকীল ছিলেন। তিনি সার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ও শেষে মুসলেম লীগের নির্দ্দেশে তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁ অমায়িক, সহজ ও সরল ব্যবহারের জন্য তিনি সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।

পরলোকে রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়-

দক্ষিণ কলিকাতার খ্যাতনামা অধিবাসী রায় বাহাদুর রামতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১লা এপ্রিল ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোক গ করিয়াছেন। তিনি ৪০ বৎসরেরও অধিককাল কলিকাতা কর্পোরেশ কাউন্সিলার ছিলেন, ১৮৯০ সাল হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত এই ক্ষে তাঁহার কার্য্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সাবাস আটাশের একা
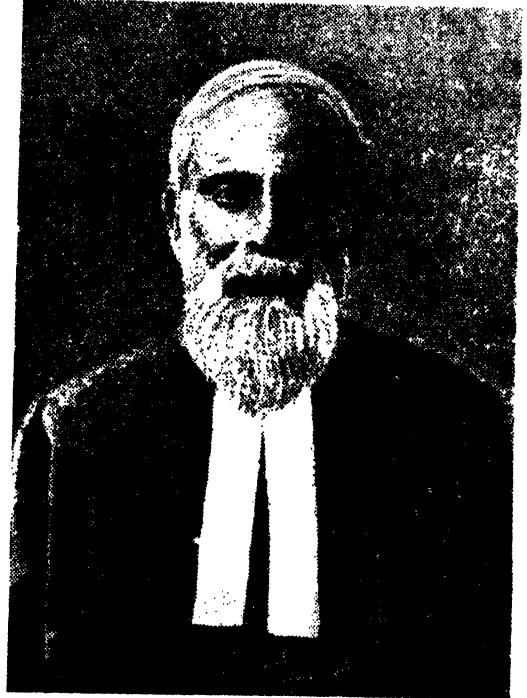
রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হইয়া তিনি ম্যাকেঞ্জী আইনের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন ও পরে আবার নির্ব্বাচিত হন। তিনি ১৯১৫ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি আলিপুরে ৬০ বৎসরকাল সুখ্যাতির সহিত ওকালতী করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী হিন্দুর নিজস্ব রাষ্ট্র

ডাক্তার শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় এম-বি

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে লিখিয়াছেন :—"কোন্ দেশের মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায় ? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বৌ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই···ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল—এখন যে প্রাণ যায়।" ইহা যেন বর্ত্তমান বাংলার অবিকল চিত্র। বাংলাদেশে আজ মানুষের ধনপ্রাণ, মানমর্য্যাদা বিপন্ন ; বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরীকরণ ও নারীহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার এবং প্রদেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বাংলার বাহির হইতে মুসলমান আনাইয়া হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিতে বসাইবার আয়োজন চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে যে সকল জমি দখল করা হইবে তাহার মূল্য দেওয়া হইবে বিঘা প্রতি এক টাকা সওয়া পাঁচ আনা! সশস্ত্র পাঞ্জাবী মুসলমান সৈনিকে পুলিশ বিভাগ ছাইয়া গেল। পঁচিশ লক্ষ মুসলিম ন্যাশনাল্ গার্ড তৈয়ারী হইতেছে। এইতো গেল বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা। বাঙ্গালীর গর্ব্বের ও আদরের জিনিস বাংলা ভাষা ; তাহাকেও জবাই করিবার চেষ্টার ত্রুটি নাই। বাংলার রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাবাগত উন্নতির জন্য ইহার প্রতিকার আবশ্যক। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্য যাহাদের কাছে কিছুই নাই, তাহাদের হইতে পৃথক হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় আর কি আছে ? বাঙ্গালী হিন্দুই বংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে এবং বাংলার যে অংশ হিন্দুপ্রধান সেই অংশকে লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে একটি প্রদেশ গঠন করিলে বাঙ্গালী হিন্দু আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের অবকাশ ও সুযোগ লাভ করিবে।

অনেকে পৃথক প্রদেশ গঠনের কল্পনাকেও জাতীয়তা বিরোধী বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত যে ভারতীয় জাতির স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহার অস্তিত্ব বাস্তব জগতে কোথায় ? আমরা—হিন্দুরা—বলিতেছি বটে যে, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান। কিন্তু মুসলমান সমাজের নেতা মিঃ জিন্না কয়েকদিন পূর্ব্বে পর্য্যন্ত (১লা মার্চ, ১৯৪৭) বলিয়াছেন—"আমাদের উদ্দেশ্য ও মূলনীতি হিন্দুদের হইতে শুধু যে পৃথক তাহাই নয়—সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন। সুতরাং এই দুইটি সম্প্রদায় কখনই একত্রে থাকিতে বা সহযোগিতা করিতে পারে না।" ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট কথা আর কি হইতে পারে ? একপক্ষ বলিতেছে—আমরা তোমাদের কেহ নই—ভারতীয় নই, আমরা পাকিস্থানী জাতি ; আর আমরা তাহাদের পিছনে ছুটিয়া বলিতেছি—না, তোমরা আমাদের ভাই, আমরা এক মায়ের সন্তান। এই চিত্র কি হাস্যকর ও লজ্জাজনক নয় ? বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান এখনো একই প্রদেশে পাশাপাশি বাস করে সত্য, কিন্তু ভৌগোলিক উপায়ে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত না হইলেও পৃথক নির্ব্বাচন পদ্ধতি এবং লীগের দ্বি-জাতিবাদ ও হিন্দু-বিদ্বেষ প্রচারের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিভেদের এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি হইয়াছে।

অনেকের ধারণা যে, মুসলমানদের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব সাময়িকমাত্র এবং একদিন তাহাদের সুবুদ্ধির উদয় হইবে। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা যে ভুল, ইতিহাস তাহার প্রমাণ দিবে। যাঁহারা যুক্তনির্ব্বাচন প্রভৃতি পুনঃপ্রবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখিতেছেন তাঁহারা হয় আত্মপ্রবঞ্চনা করিতেছেন, নয় দিবা স্বপ্নে বিভোর রহিয়াছেন। মুসলমান সম্প্রদায় রাজি না হইলে পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা কখনই উঠিবে না এবং উহাদের রাজি হইবার কোন লক্ষণই আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। মুসলীম লীগের মনোভাব পরিবর্ত্তনের আশায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে আগামী বৎসর সমগ্র বাংলায় পাকিস্থান নিশ্চিত।

পশ্চিম বঙ্গে পৃথক প্রদেশ গঠিত হইলে উহা পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর সহায় হইবে। সামান্য ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্য ছিল বলিয়াই ১৯৪১ সালের ঢাকা দাঙ্গায় এবং গতবৎসরের নোয়াখালী ও ত্রিপুরার নরমেধযজ্ঞে বিপন্ন হিন্দু পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। পাশেই শক্তিশালী বাঙ্গালী হিন্দুর নিজস্ব প্রদেশ থাকিলে উহা যে শুধু আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয় ও সাহায্য দিবে তাহা নয়। প্রয়োজন হইলে অর্থনৈতিক চাপ ও অন্য উপায়ও অবলম্বন করিতে পারিবে। নিজের হাতে গভর্ণমেণ্ট না থাকিলে যে কিছু করা যায় না, তাহার প্রমাণ হায়দারাবাদ রাজ্য—সেখানে হিন্দুরা সংখ্যায় শতকরা ৯০ জন হইলেও আজও অসহায় ও অত্যাচারিত। আমি 'হিন্দুর বাংলা' পুস্তকে লিখিয়াছিলাম—পূর্ববঙ্গের হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গেই বাস করিবে ; কিন্তু নূতন বঙ্গ প্রদেশেও তাহাদের সকল বিষয়ে সমান অধিকার দিতে হইবে। আনন্দের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সম্মেলনের প্রস্তাবে আমার এই অভিমত গৃহীত হইয়াছে।

জন-বিনিময়ের উপর মিঃ জিন্না সেদিনও জোর দিয়াছেন। পাকিস্থান হইতে হিন্দুদের চলিয়া যাইতে হইবে। আমরা যদি সমগ্র বঙ্গদেশকে পাকিস্থানে পরিণত হইতে দিই, তাহা হইলে বাঙ্গালী হিন্দুকে দেশের ও কলিকাতা শহরের ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি, ব্যবসায়-বাণিজ্য সব ছাড়িয়া দেশত্যাগ করিতে হইবে।

একদিন এইভাবে পারসীরা ভারতে পলাইয়া আসিয়াছিল। আবার এইভাবেই একদিন মুসলমানদের অত্যাচারে বাধ্য হইয়া ইহুদীরা প্যালেষ্টাইন ছাড়িয়া গিয়াছিল ; আজও তাহারা গৃহহারা। বাঙ্গালী হিন্দু নিশ্চয়ই চাহে না যে, তাহারা স্বেচ্ছায় মুসলমানদের হস্তে বঙ্গদেশ সমর্পণ করিয়া ইহুদীদের দুরবস্থা বরণ করিয়া লইবে।

বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি ঘোষণা করিয়াছেন যে, যদি কোন

প্রদেশ বা অঞ্চল গণপরিষদের পরিকল্পিত কেন্দ্রীয় শাসনের মধ্যে থাকিতে অনিচ্ছুক হয়, তাহা হইলে সেই প্রদেশ বা অঞ্চলের হস্তে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট স্বতন্ত্রভাবে শাসন কর্তৃত্ব আগামী বৎসর জুন মাসেই সমর্পণ করিবেন। মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগদান করে নাই এবং বঙ্গদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের উদ্যোগপর্ব্ব ইতিমধ্যেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মিঃ সুরাবর্দি বলিয়াছেন —"বাংলায় পাকিস্থান আসিতেছে এবং বাংলাদেশ ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের অধীনে থাকিবে না।"

সংখ্যাধিক্যের যুক্তির বলে মুসলিম লীগ বাংলা প্রদেশকে পাকিস্থান করিতে চাহিতেছে। সমস্ত বাংলা দেশের জনসংখ্যা ধরিলে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য হয় বটে, কিন্তু পশ্চিম বাংলার হিন্দুর সংখ্যা বেশী। যে যুক্তিবলে মুসলমানরা পাকিস্থান দাবী করে, সেই যুক্তি অনুসারেই পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে অস্বীকার করিতে পারে। মিঃ এটলির ঘোষণায় 'অঞ্চল' কথাটি স্পষ্টই বলা হইয়াছে।

'নূতন বঙ্গ' ভারতের একটি প্রদেশ হইবে; আর পাকিস্থানী পূর্ব্ববঙ্গ হইবে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। 'হিন্দু-বঙ্গ গঠনকে বঙ্গচ্ছেদ বলিয়া অনেকে ভুল করিতেছেন। এখানে প্রশ্ন বঙ্গচ্ছেদের নয়—ভারতের অঙ্গচ্ছেদের। অনেকদিন আগে একটি রোগীর হাতে পচ্ ধরে এবং হাতটি কাটিয়া ফেলিবার প্রয়োজন হয়। সে আমাকে বলে—ডাক্তারবাবু, পুরা হাতটি না কাটিয়া, কনুই পর্যান্ত বাদ দেওয়া যায় না কি? এখানেও প্রশ্ন অনেকটা সেই রকম। সমগ্র বঙ্গদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন পাকিস্থান রাজ্য হইতে দেওয়া হইবে; অথবা, কেবলমাত্র পূর্ব্ববঙ্গ বাদ হইবে? হিন্দুর আপত্তি সত্ত্বেও যদি ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ একান্তই হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গকে বিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

নূতন বঙ্গ প্রদেশের পরিকল্পনা

নূতন বঙ্গ প্রদেশের তিনটি পরিকল্পনা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, শ্রীরাজাগোপালাচারীর পরিকল্পনা। ১৯৪২ সালে গান্ধীজীর "সম্মতি অনুসারে" তিনি যে জেলা-গত (District wise) ভাগের পরিকল্পনা করেন তাহাতে বর্দ্ধমান বিভাগ, কলিকাতা, ২৪পরগণা, খুলনা, দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা হিন্দু বঙ্গে পড়ে।

আর একটি পরিকল্পনা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বর্ত্তমান বিভাগগুলিকে ভাগের ভিত্তি ধরা হইয়াছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগে হিন্দুর সংখ্যা বেশী; যদিও ইহার অন্তর্গত মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও যশোহর জেলা মুসলমান-প্রধান। বিভাগকে ইউনিট ধরিলে মুসলিম-প্রধান কোন বিভাগের হিন্দু প্রধান জেলা দাবী করা চলে না। কিন্তু ইহারা একই সঙ্গে মুসলমান-প্রধান রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাও চাহিয়াছেন। হিন্দু-প্রধান বলিয়া এই দুটি জেলা দাবী করিলে, প্রেসিডেন্সি বিভাগের নদীয়া প্রভৃতির উপর দাবী দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। তাহার উপর এই পরিকল্পনার অসুবিধা এই যে, উত্তর ও দক্ষিণ অংশ পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ

লেখক 'হিন্দুর বাংলা' পুস্তকে যে পরিকল্পনা দিয়াছেন, তাহাতে এই অসুবিধাগুলি নাই। দিনাজপুর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার সাধারণতঃ পূর্ব্বাংশে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। এই অংশগুলি ঐসকল জেলা হইতে অনায়াসে বাদ দেওয়া যায়। বর্ত্তমান অনেক জেলার সীমা এইভাবে বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হিন্দুপ্রধান সব-ডিভিসন-গুলিকে ভাগের ভিত্তি করিতে হইবে; এবং যে-সকল হিন্দু-প্রধান থানা এইরূপ সবডিভিসনের পাশেই ও উহার সহিত সংলগ্ন থাকিবে, উহাদেরও পার্শ্ববর্ত্তী ঐ সবডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এইভাবে ভাগ করিলে হিন্দু-বঙ্গের মধ্যে কোন্ কোন্ স্থান পড়িবে তাহা এইবার দেখিব।

উত্তরে রাজশাহী বিভাগের দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবে। দিনাজপুর জেলার পূর্ব্বাংশ হইতে যদি পার্ব্বতীপুর, চিরির বন্দর, ঘোড়াঘাট ও নবাবগঞ্জ থানা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে, ঐ জেলায় হিন্দুর সংখ্যাধিক্য (শতকরা ৫৩ জন) হইবে। মালদহ জেলা হইতে শিবগঞ্জ ও চাপাই নবাবগঞ্জ থানা বাদ দিলে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৫৪ জন হয়।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে কেবলমাত্র ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলা হিন্দু প্রধান। মুর্শিদাবাদ জেলার ভিতর যদি কান্দি সবডিভিসনের সহিত বহরমপুর থানা, বেলডাঙ্গা, আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, নবগ্রাম ও সাগরদীঘি থানা সংযুক্ত করা যায় এবং অন্যান্য অংশ বাদ দেওয়া হয় তাহা হইলে এই পরিবর্ত্তিত জেলায় হিন্দুর সংখ্যা হইবে শতকরা ৫৮ জন। নদীয়া জেলার মধ্যে শুধু কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট সবডিভিসন হিন্দু-প্রধান; এবং এই দুইটি সবডিভিসনে গঠিত জেলায় হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৬৪ জন হইবে। যশোহর জেলায় কেবলমাত্র নড়াইল, অভয়নগর, শালিখা ও কালিয়া থানা হিন্দু-প্রধান এবং এই অংশে হিন্দু সংখ্যায় শতকরা ৫৪ জন।

ফরিদপুর জেলার মধ্যে গোপালগঞ্জ সবডিভিসনে শতকরা ৫৭ জন হিন্দু এবং এই অংশ নূতন এক প্রদেশে আসিবে।

বর্দ্ধমান বিভাগের সকল জেলার সকল সবডিভিসনেই হিন্দুর সংখ্যা বেশী। কলিকাতায় মুসলমান শতকরা ২৪ জন মাত্র।

এই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত নূতন বঙ্গ উত্তরে দার্জ্জিলিং হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক অবিচ্ছিন্ন প্রদেশ হইবে। এই প্রদেশের মধ্যে যাতায়াত, সৈন্য চলাচল প্রভৃতির জন্য পাকিস্থান বা বিহারের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইবে না। অধিকন্তু এই প্রদেশের কোনো অঞ্চলে সংখ্যাধিক মুসলমানের সমস্যা থাকিবে না।

বাংলার যে অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকিতে চাহে সেখানে জনমত সংগ্রহ ও সীমানির্দ্ধারণের ব্যবস্থা গণপরিষদ করিতে পারিবেন।

নবগঠিত প্রদেশের নাম 'হিন্দু-বঙ্গ' দেওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে অনেকে এখনো হিন্দু নাম ব্যবহারে অনিচ্ছুক। এরূপ অবস্থায় আমি মনে করি যে 'নূতন বাংলা' বা নব বঙ্গ নাম দেওয়া যাইতে পারে। এইভাবেই নিউইয়র্ক, নিউ সাউথ্ ওয়েলস্, প্রভৃতির নামকরণ হইয়াছিল।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

রঞ্জি ট্রফি ঃ

হোলকার ঃ ২০২ ও ১৭৩

বরোদা ঃ ৭৮৪

রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে বরোদা এক ইনিংস ও ৪০৯ রাণে শোচনীয়ভাবে হোলকার দলকে পরাজিত করেছে।

৭ই মার্চ্চ বরোদায় রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে হোলকার টসে জয় লাভ করে মুস্তাক আলী এবং জগদলকে ব্যাট করতে পাঠালো। সূচনা ভাল হ'ল না। লাঞ্চের সময় অর্দ্ধেক খেলোয়াড় আউট হয়ে ৭৮ রাণ উঠলো। দলের মোট ৪৪ রাণে ভাল ভাল ৬টা উইকেট পড়ে যায়। হোলকার দলের প্রথম ইনিংস ২০২ রাণে শেষ হয়ে যায়। সি টি সারভাতে দলের সব থেকে বেশী ৯৪ রাণ করে নট আউট থাকেন। ভি এস হাজারী ৮৫ রাণে ৬টা উইকেট পান। আমীর ইলাহি ৪৭ রাণে ৩টে উইকেট পান।

বরোদা প্রথম ইনিংস আরম্ভ করলো এবং প্রথম দিনের খেলার শেষে কোন উইকেট না হারিয়ে তাদের ১৬ রাণ উঠলো।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে বরোদার ৩ উইকেটে ২৮৩ রাণ উঠে। গুলমহম্মদ এবং ভি এস হাজারী যথাক্রমে ১১৭ এবং ৬৭ রাণ ক'রে নট আউট থাকেন। চতুর্থ উইকেটের জুটীতে গুলমহম্মদ এবং হাজারী ১৯২ রাণ তুলেন। তৃতীয় দিনের খেলাতেও পূর্ব্ব দিনের নট আউট খেলোয়াড় গুলমহম্মদ এবং হাজারীর চতুর্থ উইকেটের জুটী ভাঙ্গল না। উভয়ের জুটিতে ৪৮৩ রাণ উঠলো। উভয়ই ডবল সেঞ্চুরী করলেন। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বরোদা দলের ৩ উইকেটে রাণ উঠল ৫৭৪ গুলমহম্মদ এবং হাজারী যথাক্রমে ২৬৯ এবং ২০০ রা করে নট্ আউট রইলেন। চতুর্থ দিনের খেলাতে বরো দলের প্রথম ইনিংস ৭৮৪ রাণে শেষ হ'ল। গুলমহম্ম 'ট্রিপল' সেঞ্চুরী করলেন। গুলমহম্মদ ৩১৯ এবং হাজারী ২৮ রাণ করেছিলেন। উভয়ের চতুর্থ উইকেটের জুটীতে ৫৭ রাণ পৃথিবীর রেকর্ড রাণ হ'ল। কর্ণেল সি কে নাইডু ১৭ রাণে ৩টে এবং গাইকোয়াদ ১৩৪ রাণে ৩ উইকেট পেলেন

হোলকার ৫৮২ রাণ পিছনে পড়ে থেকে দ্বিতী ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলো। এক উইকেটে ২৩ রা উঠলে পর চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হয়ে গেল।

পঞ্চমদিনে হোলকার দলের দ্বিতীয় ইংনিস চায়ের ১ মিনিট পূর্ব্বে ১৭৩ রাণে শেষ হ'লে বরোদা এক ইনিং এবং ৪০৯ রাণে রঞ্জিট্রফি বিজয়ী হল। বরোদা দলে দ্বিতীয় ইনিংসে দলের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৮৭ রাণ করলে নিম্বলকার। আমির ইলাহী ৩৩ ওভার বলে ১১টা মেডে নিয়ে এবং ৬২ রাণ দিয়ে ৬টা উইকেট পান। হাজারী ৫২ রাণে ২টি উইকেট পেলেন।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব বিজয়ী ঃ

অল্ ইণ্ডিয়া ফুটবল টুর্ণামেণ্টের ফাইনালে ক'লকাতার খ্যাতনামা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৩-০ গোলে দিল্লীর ইউনিয়ন ক্লাবকে পরাজিত ক'রে নিজ দলের সুনাম প্রতিষ্ঠা করেছে।

আগা খাঁ হকি ঃ

আগা খাঁ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে রাওয়ালপিণ্ডি স্পার্টাদল ২-১ গোলে টাইমস অফ্ ইণ্ডিয়া দলকে পরাজিত করেছে।

শ্রীমান ভাস্কর রায়চৌধুরী—

শ্রীমান ভাস্কর রায়চৌধুরী খ্যাতনামা শিল্পী বর্তমানে মাদ্রাজবাসী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। ভাস্করের বয়স ১৭ বৎসর—কলেজে পড়ে। সে মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তী ও নৃত্যকলায় দক্ষ। ছেলেবেলায় ভাস্কর অত্যন্ত কৃশকায় ছিল—নিজ চেষ্টায় সে চমৎকার শরীর তৈয়ারী করেছে। আমরা তার সাফল্যময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।
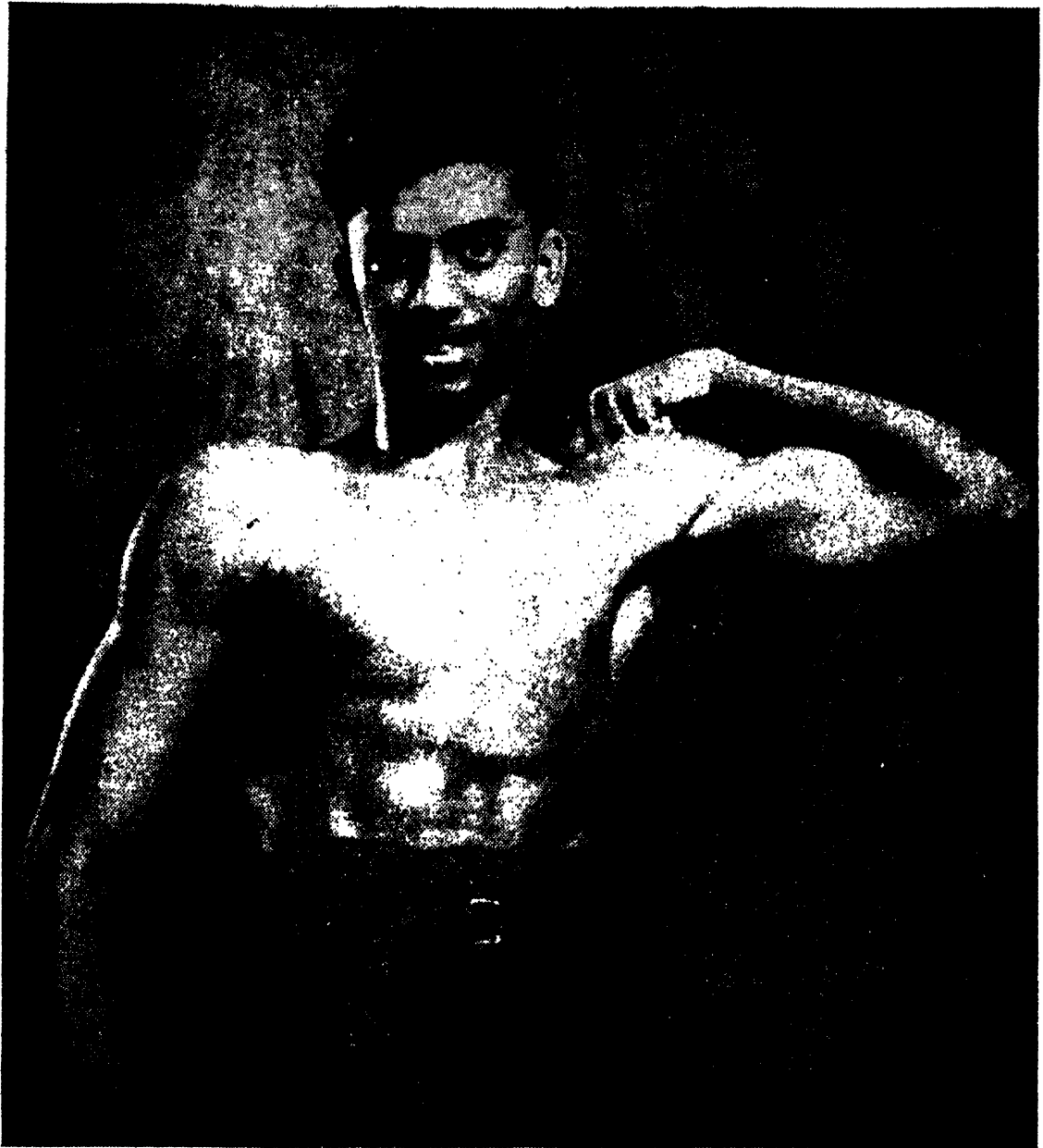
ন্যাশনাল হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

বোম্বাইতে ন্যাশনাল হকি চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাঞ্জাব ২-১ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। বোম্বাই ৪-১ গোলে মধ্যভারতকে প্রতিযোগিতায় সেমি-ফাইনালে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠে। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে পাঞ্জাব দিল্লীর সঙ্গে দু'দিন খেলা ড্র রেখে তৃতীয়

শ্রীমান ভাস্কর রায়চৌধুরী

দিনের খেলায় সৌভাগ্যক্রমে একগোলে দিল্লীকে পরাজিত ক'রে ফাইনালে উঠে। পাঞ্জাবের এই গোল সম্বন্ধে মাঠে যথেষ্ট মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

ভারতবর্ষের 'দি বোর্ড অফ্ কণ্ট্রোল ফর ক্রিকেট' কর্তৃক নিম্নলিখিত ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ অষ্ট্রেলিয়াতে ক্রিকেট খেলার জন্য মনোনীত হয়েছেন।

(১) ভি এম মার্চেন্ট (বোম্বাই)-ক্যাপটেন (২) এস অমরনাথ (দক্ষিণ পাঞ্জাব) ভাইস-ক্যাপটেন, (৩) এস মুস্তাক আলি, (৪) সি এস নাইডু (হোলকার); (৫) ভি এস হাজারী, (৬) গুলমহম্মদ, (৭) আমির ইলাহী, (৮) এইচ আর অধিকারী (বরোদা); (৯) আর এস মোদী, (১০) ডি জি ফাদকার, (১১) কে এম রঙ্গনেকার (বোম্বাই); (১২) জে কে ইরাণী, (১৩) জি কিষণচাঁদ (সিন্ধু); (১৪) এস ডবলউ সোহনী (মহারাষ্ট্র); (১৫) পি সেন (বাঙ্গলা); (১৬) কজল মামুদ (এন আই সি এ) এবং (১৭) ভি মানকাদ (ডবলউ আই এস সি এ)।

বোম্বাই ও বরোদা থেকে ৪ জন এবং হোলকার ও সিন্ধু দেশ থেকে ২ জন ক'রে খেলোয়াড় এই দলে স্থান পেয়েছেন। বাকি দেশ থেকে ১ জন ক'রে আছেন।

বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ ঃ

দার্জ্জিলিংয়ে অনুষ্ঠিত ব্যাডমিণ্টন খেলার ফাইনাল ফলাফল :

পুরুষদের সিঙ্গলসে সুনীল বসু (অমৃতবাজার পত্রিকা) ১৫-৫ ও ১৫-১১ পয়েণ্টে মনোজ গুহকে (ঐ) পরাজিত করেছেন।

পুরুষদের ডবলসে প্রফুল্লকান্তি ঘোষ ও সুনীল বসু (পত্রিকা) ১৫-১১, ১৩-১৮ এবং ১৫-১৩ পয়েণ্টে মনোজ গুহ এবং বিশু ব্যানার্জিকে (ঐ) পরাজিত করেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে মিসেস শিলা বর্ম্মা (পার্ব্বতিপুর) ১১-১ ও ১১-৩ পয়েণ্টে কুমারী কণা বসুকে (দার্জ্জিলিং) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডবলসে কুমারী পূরবী বসু ও কণা বসু ১৫-২, ৯-১৫ ও ১৭-১৪ পয়েণ্টে মিসেস বর্ম্মা এবং লীলা চক্রবর্ত্তীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডবলসে মনোজ গুহ এবং মিসেস বর্ম্মা ১৫-৬ ও ১৫-১ পয়েণ্টে পূরবী বসু ও রঞ্জিৎ ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিঙ্গলসে কুমারী লীনা বসু ১১-২ ও ১১-১ পয়েণ্টে কুমারী রাধারাণীকে পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলসে দিলীপ চ্যাটার্জি ১৫-২ ও ১৫-৪ পয়েণ্টে তারাপদ বসুকে পরাজিত করেন।

পরলোকে জো হার্ডষ্টাফ ঃ

এম সি সি দলের ক্রিকেট খেলোয়াড় জো হার্ডষ্টাফ (সিনিয়ার) অষ্ট্রেলিয়া থেকে ইংলণ্ড ফেরার পথে ৬৬ বছর বয়সে হঠাৎ মারা যান। হার্ডষ্টাফ ১৯০২-১৯২১ সাল পর্য্যন্ত নটিংহামের একজন খেলোয়াড় ছিলেন; পরে একজন প্রথম শ্রেণীর আম্পায়ার হিসাবে সুনাম অর্জ্জন করেন। ১৯০৭ সালে তিনি প্রথম অষ্ট্রেলিয়াতে খেলতে যান এবং চমৎকার ফিল্ডিংয়ের জন্য 'Hot Stuff Hardstaff' এই নামে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। জো হার্ডষ্টাফ এবং তাঁর পুত্র জুনিয়ার হার্ডষ্টাফ ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলেছিলেন। একই দেশের প্রতিনিধি হিসাবে পিতা-পুত্রের এইরূপ সহযোগিতা ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে রেকর্ড হয়ে আছে।

ফুটবল খেলা ঃ

এ বছর প্রতিযোগিতামূলক কোন ফুটবল খেলা হবে কি না তা এখনও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। গত আগষ্ট মাসের কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং তার পুনরাবৃত্তির ফলে কোন সুস্থমস্তিষ্কের লোক এ বছরের ফুটবল প্রতিযোগিতার কথা উপস্থিত ভাবতেই পারে না। দাঙ্গাহাঙ্গামায় নিরীহ পথচারী কিরূপ নির্দ্দয়ভাবে আহত এবং নিহত হয়েছে তার কথা ভাবলে আমাদের আনন্দের উৎস শুকিয়ে যায়। গত কয়েক বছর ধরে ফুটবল খেলার মাঠে খেলা পরিচালনার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং দর্শকদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক নিয়ে অনেক অপ্রিয় ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। সুতরাং এই পরিস্থিতির মধ্যে ফুটবল খেলা দর্শক এবং

[illegible] কেন, কোন রকম ফুটবল খেলাই এবার [illegible] নয় বিশেষত যে সব জায়গায় বিপদের সম্ভাবনা বেশী আছে। দুষ্ট প্রকৃতির লোক সামান্য তুচ্ছ কারণ পেলেই তর্ক-বিতর্কের সুযোগ পায়; 'ফ্রেণ্ডলি' ফুটবল খেলার মধ্যে কেবল তুচ্ছ কারণ কেন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধাবার অনেক কারণই খুঁজে পাওয়া যাবে। এই অবস্থায় খেলার মাঠে গিয়ে খেলোয়াড় এবং দর্শকদের দুঃশ্চিন্তার আর অবধি থাকবে না। সর্ব্বদাই একটা বিপদের আশঙ্কা নিয়ে খেলা কিম্বা খেলার আনন্দ উপভোগ করা যায় না। সুতরাং জনসাধারণের উপর যদি ফুটবল খেলা পরিচালক-এই অবস্থা মাঝে মাঝে চলতে থাকলে কোন [illegible] পক্ষে মাঠে গিয়ে খেলা কিম্বা খেলা দেখার [illegible] নেওয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে।

* * * * *

অন্যান্য বছরের মত এবার খেলোয়াড়দের ক্লাব পরিবর্ত্তন করবার খুব বেশী আগ্রহ নেই। ক্লাব পরিবর্ত্তনের ছাড়পত্র দাখিলের শেষ দিনে দেখা গেল, মাত্র ৭২টি ছাড়পত্র আই এফ এ অফিসে জমা পড়েছে। ক'লকাতার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে খেলোয়াড়দেরও ফুটবল খেলার উপর উৎসাহ অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত কর্ত্তৃক নাটকাকারে রূপান্তরিত "কাশীনাথ"—২৲

সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত দর্শন-গ্রন্থ "পারায়ণ"—১৷৹

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "হৃদয়ের চাঁদ"—৩৷৹

শ্রীঅতুলচন্দ্র লাহিড়ী পরিকল্পিত "সুভাষ আলেখ্য"—২৷৹

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত "জয় হিন্দে অ আ ক খ"—৷৵৹

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন প্রণীত উপন্যাস "কুরপালা"—৩৷৹

শ্রীশান্তি দেবী প্রণীত উপন্যাস "অপমানিতা মানবী"—৩৲

শ্রীমোহিতমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সব্যসাচী"—২৷৹

শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ প্রণীত উপন্যাস "হে নারী, রহস্যময়ী"—২৷৹

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "অলঙ্কার-চন্দ্রিকা"—২৷৹

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মন্ত্রীমিশন ও পরবর্ত্তী অধ্যায়"—২৲

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত শিশু-উপন্যাস "ভোলানাথ"—১৲

শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত "ছোটদের আবৃত্তি-গান-অভিনয়"—২৲

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত শিশুদের "ব্যাং-ব্যাং"—১৷৹

শ্রীপ্রভাতকুমার বসু প্রণীত "জগতের সেরা মানুষ"—৷৷৹

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় প্রণীত "মন্ত্রীমিশন ও ভারতবর্ষ"—৷৷৹

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত শিশু-উপন্যাস "তোমাদেরই একজন"—১৲

শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী প্রণীত "শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ-পূজা ও কথা"—৵১৹, "শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও কথা"—৵১

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত "হিন্দুর বাংলা"—৷৹

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "রামমোহন প্রসঙ্গ"—১৷৹

শ্রীযোগানন্দ দাস প্রণীত "বাংলার জাতীয় ইতিহাসের মূল ভূমিকা বা রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন"—৪

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত "বিনা চশমায় ক্ষীণদৃষ্টির প্রতিকার"—১৷৹

শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী প্রণীত "মহাযুদ্ধের দান"—৷৵৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত মণি গঙ্গোপাধ্যায় অর্ঘ্য ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৪

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুস্ত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

পুরুষোত্তম যোগ

রায় বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

সকলেই জানেন যে, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অধ্যায়গুলি বিশেষ বিশেষ যোগের নামে নামাঙ্কিত হইয়াছে—যেমন তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ, চতুর্থ অধ্যায়ের নাম জ্ঞানযোগ, দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ ইত্যাদি। এইরূপ পঞ্চদশ অধ্যায়ের নাম "পুরুষোত্তম" যোগ।

এই পুরুষোত্তম যোগে শ্রীভগবান্ অনাসক্তিরূপ খড়্গের দ্বারা সংসার রূপ বৃক্ষকে ছেদন করিয়া কিরূপে পরম পদ পাওয়া যায় তাহাই উপদেশ করিয়াছেন। বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইলে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

এখানে দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। প্রথম জটিল সংসার-জালের প্রতি; দ্বিতীয় মানুষের চরম লক্ষ্যের প্রতি। সংসার-প্রপঞ্চের দুরবচ্ছিন্ন জটিলতা বুঝাইবার জন্ত একটি উপমা দিয়াছেন—সংসার একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ স্বরূপ। কিন্তু ইহা এক পরম অদ্ভুত রহস্যময় বৃক্ষ। বৃক্ষের মূল থাকে নিম্নদেশে, শাখাপ্রশাখা ঊর্দ্ধে। কিন্তু এই বৃক্ষের মূল ঊর্দ্ধে এবং শাখাপ্রশাখা নিম্নে।

ঊর্দ্ধমূলধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।

এই উপমাটি সংসারের জটিল ও রহস্যময় প্রপঞ্চ বুঝাইবার জন্তই কল্পিত হইয়াছে। 'অশ্বত্থ' নামটির মধ্যেও ইহার নশ্বরত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। শ্বঃ অর্থাৎ প্রভাত পর্যন্তও যাহা থাকিবে কিনা স্থির নাই, তাহার নাম অশ্বত্থ। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই রহস্যপূর্ণ উপমাটি বুঝিবার জন্ত পণ্ডিতেরা নানা প্রকার জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন। সে সকল আলোচনার মধ্যে না গিয়া, সহজ বুদ্ধিতে যদি ইহার তাৎপর্য গ্রহণ করা যায়, সেই চেষ্টা করা যাক্।

সংসার ক্ষণভঙ্গুর, তথাপি তাহাকে অব্যয় বলা হইল কেন? সংসারের কিছুই চিরস্থির নহে সত্য, কিন্তু সংসার-

প্রবাহ চিরন্তন। এই সংসার প্রবাহের আদি নাই, অন্ত নাই। সুতরাং প্রবাহরূপে সংসার-প্রপঞ্চ অব্যয়, অক্ষর।

এই যে অনন্ত সংসার-প্রবাহ, ইহাকে মায়াই বলা হউক বা অনিত্যই বলা হউক—ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহার মূল কোথায়? মূল-ভগবান্। সংসার বৃক্ষের মূল সুতরাং মর্ত্ত্যলোকে নহে। স্বয়ং ভগবান্ পুরুষোত্তম। সেই নারায়ণ হইতেই সংসার রূপ বৃক্ষের উৎপত্তি। তিনি সকলের উপরে নিত্যধামে বাস করেন, এই জন্য সংসার বৃক্ষের মূল উর্দ্ধে স্থিত বলা হইয়াছে।

এই অশ্বত্থের শাখা প্রশাখা অনন্ত। প্রথম মুখ্য শাখা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। বৃক্ষের শাখা হইতে যেমন পত্রের উদ্ভব হয়, তেমনি ব্রহ্মা হইতে বেদসমূহ উদ্‌গত হইয়াছে। বেদ সকল কর্মকাণ্ড উপদেশ করিয়াছে, যজ্ঞ ও ধর্মাধর্ম প্রতিপাদন করিয়াছে। এই কর্মকাণ্ডের দ্বারাই সংসার বিধৃত। সেই জন্য বেদকে বলা হইয়াছে সংসার-বৃক্ষের পত্র। ইহার ছায়ায় জীবগণ আশ্রয় লাভ করে। মনে করে কর্মফলের দ্বারাই তাহার জীবনের চরিতার্থতা সাধিত হইবে। বস্তুতঃ এই সংসার রূপ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূল যিনি, যিনি পুরুষোত্তম নারায়ণ, তাঁহাকে না জানিলে বেদের মর্ম জানা হয় না। তাই বলিয়াছেন 'যস্তং বেদ স বেদবিৎ।' মূল না জানিয়া শাখা কাণ্ড জানিলে, বৃক্ষকে জানা হয় না।

শ্রীভগবান্ এখানে যে তত্ত্বটি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা অতি গম্ভীর এবং দুরবগাহ। সংসার এত বিরাট্ যে, ইহার স্বরূপ সহজে উপলব্ধি করা যায় না, সেই জন্যই বিশাল অশ্বত্থবৃক্ষের সহিত ইহার তুলনা করিয়া রূপকালঙ্কারের দ্বারা বুঝাইতে চাহিতেছেন। প্রথমতঃ এই বিশ্বজগৎ নানা দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গে পরিপূর্ণ। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই এবং সম্প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিরত্ব নাই। সুতরাং এই জগৎ-প্রপঞ্চের রূপ ধারণা করা কঠিন। বস্তুতঃ ইহার সেই উর্দ্ধস্থ মূলের সন্ধান যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ এই জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যেই জড়াইয়া পড়িতে হয়। সেই জন্য সুদৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রের দ্বারা ইহাকে ছেদন করিয়া উহার মূল যে বৈষ্ণবপদ (তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং) তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

আমার সে স্বরূপ (ধাম) সূর্য চন্দ্র অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ সূর্য কেবল রূপকে প্রকাশ করিতে সক্ষম, কিন্তু আমার ধাম রূপাতীত; চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু আমি যে মনের অতীত; অগ্নি বাক্যকেই ব্যক্ত করিতে সমর্থ, কিন্তু বিষ্ণুর সেই পরমপদ বাক্যের অতীত। আমার স্বরূপ সূর্য, চন্দ্র বা অনল প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু আমি তাহাদের প্রকাশ করি। উহাদের মধ্যে যে তেজ দেখিতে পাও যাহার দ্বারা সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত উহা আমারই তেজ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বম্—শ্রুতিঃ।

ভগবান্ যে সকলের মধ্যে থাকিয়াও সকলের অতীত, তাহাই সুব্যক্ত করা হইয়াছে। তিনি অচিন্ত্যশক্তিমান পুরুষ। সমস্ত সৃষ্টিবর্গকে চেতন ও অচেতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, তাহার অতীত যে নিয়ন্তা স্বরূপে বিরাজমান পরমেশ্বর তাঁহাকে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

যেহেতু আমি নিত্যমুক্ত রূপে জড়বর্গকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছি এবং নিয়ন্তা রূপে অক্ষর অর্থাৎ চৈতন্যবর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু লোকে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রুতি বলেন

'স বা অয়মাত্মা সর্বস্য বশী সর্বস্য ঈশানঃ সর্বস্য অধিপতিঃ সর্বং ইদং প্রশাস্তি।'

এইজন্য সংসারের মূলাধিষ্ঠিত দেবতা পুরুষোত্তম বা শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে সাংখ্য পুরুষের সহিত এই পুরুষোত্তমের তুলনা মনে হওয়া স্বাভাবিক। সাংখ্যের পুরুষ সর্বতোভাবে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু পুরুষোত্তম সকল ক্রিয়ার মূলাধার রূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি জড়চেতনাময়ী প্রকৃতির বশ নহেন, তিনি সর্বস্য বশী। সমস্ত জগৎকে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সমন্বয়-দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, গীতার উপদেশ সাংখ্যমতের বিরোধী রূপেই স্থাপিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, গীতার মতে ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন এবং তাঁহারই মায়ায় সমস্ত ভূতবর্গ যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় চালিত হইতেছে। দক্ষিণ দেশে রামানুজাচার্যও এই মতের অনুবর্তন

করিয়াছেন। এই হৃদয়বিহারী ভগবানের শরণাপন্ন হইতেই গীতা সকলকে আহ্বান করিতেছেন। তমেব শরণং গচ্ছ।

বৌদ্ধেরা ঘোষণা করিলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি। কিন্তু গীতা অত্যন্ত সরলভাবে বলিলেন, অর্জ্জুন, তোমার হৃদয়ে যে ভগবান আছেন তাঁহারই শরণ লও। আর কোথায় কাহার শরণ লইবে?

এখন কথা হইল এই যে, অশ্বত্থবৃক্ষের সহিত সংসারের উপমা দিয়া তাহার উপরে 'পুরুষোত্তম'কে স্থাপন করিয়া গীতা কি সংকেত দিতে চাহিতেছেন? সংসার জটিল, ইহার প্রবাহ নিত্য এবং এই সংসারের মধ্যে দুঃসহ কষ্টে আত্মা ঘুরিয়া মরিতেছে। এ সত্য ত চিরপরিচিত; শ্রুতিও বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ।

সুতরাং এই অশ্বত্থের উপমা নূতন নহে। কিন্তু গীতার Mysticism এই উপমায় বড় বেশী ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। উপমাটিকে সর্বাংশে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারিলে অনেক সত্যের সন্ধান ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। বিষয়ের মধ্যে যাহার মন ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার মুক্তির আশা কোথায়? যাহারা মুক্তিকে ভুলিয়া গিয়াছে, আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যাহারা উদাসীন, তাহারা কর্মকাণ্ড লইয়াই বিব্রত থাকে, রূপ রস গন্ধ লইয়াই তাহারা ইহজন্মের লক্ষ্য সম্বন্ধে অন্ধই রহিয়া যায়! সংসারের মোহে আবদ্ধ যাহারা, তাহাদের কি কোনও উপায়ই নাই? তাই গীতা আশার বাণী শুনাইয়া বলিলেন, বৈরাগ্যের দ্বারা সংসার বৃক্ষের শাখাগুলি কাটিয়া ফেলিতে পারিলে যে আলোক পাওয়া যায় তাহার দ্বারা বিষ্ণুর সেই পরমপদ দেখা যায়।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃদিবিব চক্ষুরাততম্।

সেই বিষ্ণুর পরম স্থান বুধগণ সর্বদা দেখিতে পান—চক্ষু মেলিলেই যেমন বিস্তৃত আকাশ দর্শন করা যায়, তেমনই প্রত্যক্ষ করেন।

বিষ্ণুর সেই পরমধাম দর্শন করাই সমস্ত সাধনার শেষ। ইহা হিন্দুরা যেমন উপনিষদের যুগে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য জগতেও কোনও কোনও দার্শনিক সম্প্রদায় ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। নব-প্লেটনিক দার্শনিকেরা বলিয়াছেন:

"The soul will see this intelligible Beauty by becoming conformed thereto, just as the eye only sees the sun if it takes on its luminous form."

"and now we see the soul, cast, above all the forms of thought, face to face with the Good, with God."

বিশুদ্ধ অর্থাৎ আত্মা ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করে। চক্ষু যেমন সূর্যকে উজ্জ্বল অবস্থায় দেখে। ইহাই নিওপ্লেটনিক Mysticism.

সংসাররূপ অশ্বত্থের ডালপালা ভেদ করিয়া উহার মূলকে দর্শন করিতে হইলে চাই বৈরাগ্য। বৈরাগ্য সাধনার দ্বারা ব্যতীত অন্য উপায়ে লাভ করা যায় না। হিন্দুদর্শন সর্বত্র এই বৈরাগ্যের উপদেশ করিয়াছেন—কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়া সংসারের আপাতরমণীয় বিষয়কে সারসত্য বলিয়া মনে করিয়াছি এবং তাহাতেই জড়াইয়া পড়িয়াছি। পাশ্চাত্য দর্শনে বৈরাগ্য asceticism এখন 'একঘরে' হইয়া রহিয়াছে এবং আমরা আমাদের ঘরের হীরক ফেলিয়া পরের কাচের পশ্চাতে ছুটিয়াছি। সংসার মূলতঃ দোষের নয়, মানুষের সাধারণতঃ যে সকল কর্ত্তব্য, যে সকল দায়িত্ব আছে, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। যাহার মূলে স্বয়ং পুরুষোত্তম বিরাজ করেন, তাহা কখনও একান্ত-ভাবে পরিত্যজ্য বা বর্জ্জনীয় হইতে পারে না। তবে উহাকেই চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না, সুতরাং ঔদাসীন্য বা Escapism গীতায় উপদিষ্ট হয় নাই। অভ্যাসের ফলে, ঐকান্তিক সাধনার ফলে, সংসাররূপ অক্টোপাসের বন্ধনকে বৈরাগ্যরূপ অস্ত্র দ্বারা যিনি খণ্ড খণ্ড করিয়া সেই অপার্থিব আলোকরাজ্য বিষ্ণুপদ দেখিতে পান, তিনিই মুক্তির অধিকারী। পুরুষোত্তমযোগে আমার মনে হয় এই কথাই বলা হইয়াছে।

ভীমপলশ্রী

বনফুল

৭

অনীতা প্রথমটা বিব্রত হয়ে পড়লেও শেষ পর্য্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পেরেছিল। চেন টানবার কথা একবার মনে হয়েছিল অবশ্য, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা জরিমানার কথাটা চোখে পড়াতে সে চেষ্টা আর করে নি সে। তাছাড়া ট্রেণ থামিয়েই বা কি হবে। সুশোভনকে তুলে নেবার জন্মে গার্ড ট্রেণ ব্যাক করে' নিয়ে যাবে না নিশ্চয়। তাছাড়া সুশোভনই কি স্টেশনে থাকবে? বিশেষত একটা মেয়ের সঙ্গ পেয়েছে যখন। সমস্ত ছাপিয়ে ওই একটা কথাই মনে কাঁটার মতো খচখচ করছিল। আঃ—।

ট্রেণ চলতে লাগল। বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে' বসে' রইল অনীতা। কঠিন সংযম-সহকারে বসে' রইল, বসে' বসে' তেজ সংগ্রহ করতে লাগল। সাধারণ যে কোনও মেয়ে হয় চেন টানত, না হয় চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে নাববার চেষ্টা করত, কিন্তু স্বয়ম্প্রভার কন্যা কোন রকম আত্মসম্মান-হানিকর ইৎরামির মধ্যে গেল না। নীরবে বসে' বসে' শক্তি সংগ্রহ করতে লাগল কেবল। যদিও সে এই কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত একজন উৎসাহী 'কমরেড' ছিল, সোভিয়েট রাশিয়ার বন্ধন-বিদ্রোহী বিবাহের যুক্তিগুলো এখনও কণ্ঠস্থ আছে তার, কিন্তু বিবাহের তিনমাস পরেই তার স্বামী যে আর একজনের পাল্লায় পড়ে' বেহাত হয়ে যাবে স্বাধীনতা-নামধেয় এ যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেবে না সে কিছুতেই। অতটা আলট্রা মডার্ণ হবার প্রবৃত্তি নেই তার। পরের স্টেশনে নেমেই সুশোভনকে টেলিগ্রাম করতে হবে যে, সে ফিরে যাচ্ছে। টেলিগ্রামটা পেয়ে আর কিছু না করুক—মেয়েটাকে অন্তত সরিয়ে রাখবে সে। বাড়ি ফিরে গিয়ে যদি দেখতে হয় যে আর একটি সুন্দরী মেয়ে তার টেবিলে বসে' চা খাচ্ছে, আর সুশোভন হেসে হেসে গল্প করছে তার সঙ্গে—উঃ, তার চেয়ে মরণ ভাল। তাছাড়া সুশোভনকে একলা নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে পেলেই যা খুশি করা সম্ভব। আর একজনের সামনে কি বলবে সে! সুশোভনের বক্তব্যটা ধীরভাবে শুনবে সে প্রথমে, তারপর যথাকর্ত্তব্য করবে। দরকার হলে মা-কেও খবর দিতে হবে। হ্যাঁ, মাকে খবর দিতে হবে বই কি। নিজের শক্তি-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সোজা হয়ে বসল সে।

পরদিন সন্ধ্যায় ট্যাক্সি থেকে নেমে অনীতা দেখলে বাড়িতে কেউ নেই। এমন কি চাকরাণিটা পর্য্যন্ত অনুপস্থিত। ড্রাইভারের সাহায্যে জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত ঠায় বসে' রইল সে সিঁড়ির উপর। ঘরে তালা বন্ধ। চাবি চাকরাণির কাছে। ঘরদোর পরিষ্কার করবে বলে' চাবিটা তার কাছে রেখে যেতে হয়েছিল। মায়ের কাছে গেল না, কারণ সুশোভনের মুখ থেকে সব কথা শোনবার আগে মাকে সে কিছু জানাবে না। সুশোভনের উপর কোনও অবিচার করবে না সে। খুব ক্ষিধে পেয়েছিল, খুব ক্লান্ত লাগছিল, সমস্ত দেহমন ভেঙে পড়ছিল তার যেন। একটুও ভালবাসে না সুশোভন তাকে—একটুও না। এই তো সবে তিনমাস বিয়ে হয়েছে...এর মধ্যেই সে...। ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি অভিমান সত্বেও সে বারবার আবৃত্তি করছিল মনে মনে—না, না,

আমারই ভুল হচ্ছে হয় তো, সুশোভনের দেখা পেলেই বোঝা যাবে কেন সে অমন করে' ছুটে চলে গেল—মেয়েটি কে··· এখনও আসছে না কেন—সুশোভন···কোথা গেল। পরিচিত পদশব্দের আশায় উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল সে। গাল বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। মশা ছেঁকে ধরল। অন্ধকার ঘনিয়ে এল চতুর্দ্দিকে।

···সুশোভন কিন্তু এল না। অশ্রু শুষ্ক হল। হৃদয়ও শুষ্ক হতে লাগল ক্রমশ। সে যা সন্দেহ করেছে তাহলে তাই ঠিক। চাকরাণিটা ফিরে এল এগারোটার সময় এবং দিদিমণিকে তদবস্থ দেখে অবাক হয়ে গেল।

নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হল।

"উনি কখন গেলেন ?"

"বেলা আড়াইটের সময়"

"একাই গেছেন ?"

হাসি গোপন করে' চাকরাণি বললে, "না সঙ্গে আর একজন ছিলেন"

"একটি মেয়ে কি ?"

"হ্যাঁ"

"ফরসা গোছের ?"

"হ্যাঁ। একটা কুকুরও ছিল তার সঙ্গে। আমি কুকুরটাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে চাই নি, কিন্তু জামাইবাবু মানলেন না—সব একাক্কার করেছে"

"মেয়েটির সঙ্গে জিনিসপত্র ছিল ?"

"অনেক। সব বোঝাই করে' নিয়ে গেছে মোটরে"

"নিজেদের মোটর ?"

"না, ট্যাক্সি। শার্দ্দুল সিং না কে পাঠিয়েছিল বললে"

"কপাট খোল। আমার টেলিগ্রামটা লেটার বক্সে রয়েছে দেখছি"

"একটু চা কর দিকি। মীট সেফে কয়েকটা ডিম ছিল ভাজ সেগুলো। বিস্কুটগুলো বার কর। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে"

"ঘরে কিছু নেই। সব ওনারা খেয়ে গেছেন।

অনীতার সমস্ত মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

"বাজার থেকে কিছু খাবার আন তাহলে। এত রাত্রে পাওয়া যাবে কি কিছু"

"মোড়ের দোকানটা খোলা আছে"

চাকরাণি কপাট খুলে খাবার আনতে গেল। অনীতার মনে সন্দেহের আর কোন অবকাশ রইল না। মেয়েটাকে নিয়ে এইখানে এসেছিল! আমার শোবার ঘরে! লজ্জা করল না একটু।···তিনকাপ চা, গোটা চারেক রসগোল্লা, ছ'টা সিঙাড়া এবং গোটা পাঁচেক হিংয়ের কচুরি খাবার পর অনীতার ম্রিয়মাণ হৃদয় কথঞ্চিত সঞ্জীবিত হল। মনে হল আর কালবিলম্ব করা উচিত নয়। অবিলম্বে কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত।

মাকে ফোন করল সে।

অনেকক্ষণ বকবক করে' স্বয়ম্প্রভা দেবী সবে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। জিতুবাবু তাঁর পাশে চোখ বুজে পড়েছিলেন এবং আশা করছিলেন যে এইবার ঘুমুল বোধ হয়! তাঁরও একটু তন্দ্রা আসছিল। কিন্তু হঠাৎ পেটে কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে তড়াক করে উঠে বসতে হল আবার তাঁকে।

"কি"

"ফোন শুনতে পাচ্ছ না ?"

"ফোন ?"

আবার বেজে উঠল ফোনটা। বিছানা ছেড়ে উঠলেন জিতুবাবু। ফোন নীচের ঘরে।

"ফোনে তোমাকে ডাকছে"

জিতুবাবু ফিরে এসে বললেন। প্রতিহিংসার একটা চাপা হাসি তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে মনে হল।

"আমাকে ? এত রাত্রে কে ডাকছে আমাকে"

"অনীতা"

"অনীতা! সে তো দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে গেছে"

"হয় তো সেখান থেকেই ফোন করছে"

"তাই বললে ?"

"না, জিগ্যেস করি নি"

"যাও জিগ্যেস করে' এস। আমি ততক্ষণ গায়ে একটা জড়িয়ে নি কিছু"

"তুমিই যা জিগ্যেস করবার কর না গিয়ে। তোমাকেই চাইছে সে"

"বেশ আমিই যাচ্ছি। কিন্তু তুমি শুয়ো না যেন"

"আমি কি করব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে"

"তোমাকেও দরকার হতে পারে হয় তো"

"আমাকে এত রাত্রে কি দরকার হতে পারে"

"কেন ফোন করছে জানি না তো। নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছে। তা না হলে এত রাত্রে ফোন করবে কেন। শুয়ো না তুমি"

"ছি ছি কাপড়টা ভাল করে' পর। চাকররা দেখতে পেলে ভাববে কি"

"চাকররা ঘুমিয়েছে। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত শুয়ো না"

স্বয়ম্প্রভা দেবী চলে গেলেন। ফিরলেন বেশ কিছুক্ষণ পরে এবং জিতুবাবুর দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বললেন "আমি জানতাম"

"এই শীতে মেজেতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না কি"

বিছানার ভিতর থেকে করুণ কণ্ঠে বললেন জিতুবাবু।

"সে কথা বলছি না। এ আমি গোড়া থেকেই জানতাম। যাও তাড়াতাড়ি কাপড়জামা পরে নাও, আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করা চলবে না। করছ কি তুমি, ওঠ না। এ রকমটা যে হবে, গোড়া থেকেই বুঝেছিলাম আমি"

"কি বুঝেছিলে? কি হবে? কাপড়জামা পরব, মানে! ব্যাপারটা কি খুলেই বল না"

স্বয়ম্প্রভা গায়ের র‍্যাপারটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে আলনা থেকে একটা গরম ব্লাউস তুলে নিলেন এবং তার সরু লম্বা হাতায় নিজের বলিষ্ঠ বাহুটি প্রবেশ করাতে করাতে বললেন—"অনীতাকে হাওড়া স্টেশনে ফেলে তার স্বামী পালিয়েছে। আগেই আমি জানতাম। উঠছ না এখনও? হাওড়া স্টেশনে! ছি—ছি! করছ কি শুয়ে তুমি? উঠে তাড়াতাড়ি ওভার কোটটা পরে' নাও, বেশী কিছু পরবার দরকার নেই এখন। সময়ও নেই। ওঠ, ওঠ, ওঠ না—শুয়ে থাকতে পারছও তো এসব শোনবার পর"

"কবে পালিয়েছে"

"আজ। উঠবে, না শুয়েই থাকবে লেপের তলায়"

"কোথায় পালিয়েছে"

"বললাম না, হাওড়া ষ্টেশনে। আমার হয়ে গেছে—নাও তুমি"

"অনীতা কোথায়? দিগ্বিজয়বাবুর ওখানে?"

"রসিকতা করছ না কি"

নিজেই তিনি জিতুবাবুর ওভারকোটটা এনে দিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে যে অবস্থায় তাঁরা গিয়ে কন্যাকে দেখলেন তাতে অতি-আধুনিকতার কোন চিহ্নই ছিল না। সেই সনাতন আলুলায়িত কেশ, দর-বিগলিত অশ্রু, বুক-ফাটা হা-হুতাশ। হৃদয়বিদারক লজ্জাকর কাহিনাটা বিবৃত করতে করতে কণ্ঠস্বরও অবরুদ্ধ হয়ে আসছিল অনীতার মাঝে মাঝে। ওষ্ঠাধর দৃঢ় নিবদ্ধ করে' স্বয়ম্প্রভা দেবী নীরবে সব শুনে যাচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে যা প্রকাশ করতে চাইছিলেন তার সরল অর্থ—ঠিক এই আমি ভেবেছিলাম।

"কুসুম আর কি কি বললে"

কুসুম চাকরাণিটার নাম।

রুমাল দিয়ে চোখ মুছে অনীতা বললে, "সবই তো বললুম"

"ট্যাক্সির নম্বরটা দেখেছিলে?"

"না। সার্দ্দুল সিং ট্যাক্সি দিয়েছিল শুনলাম"

"শার্দ্দুল সিং? সে তো আমাদের চেনা লোক। দিন সাতেক আগে মনে হচ্ছে তারই একটা ভাঙা মোটরের লোহাগুলো আমরা কিনলাম। শার্দ্দুল সিংই তার নাম, না?"

স্বয়ম্প্রভা দেবী জিতুবাবুর দিকে চাইতেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন তিনি। নেড়েই অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্বয়ম্প্রভা রেহাই দিলেন না।

"কি করছ এখন"

"কি"

"হ্যাঁ—কি—কি"

"কি মুসকিল! আমি কি—"

"এক কথা বার বার আউড়ে লাভ হবে না কোন। অনীতা যা বললে শুনলে তো। এখন কি করতে চাও"

"চাইব? চেয়েই তো আছি"

সত্যি জিতুবাবুর ঘুমের ঘোর কাটেনি তখনও।

"তুমি মানুষ না পাথর? এ সব শুনেও কিছু করবে না?" হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন স্বয়ম্প্রভা দেবী।

"কি করব বল। তাই তো জানতে চাইছি—কি করব"

"পুলিশে খবর দাও"

"পুলিশে! মাথা খারাপ না কি। এই রাত্রে পুলিশ! পুলিশ কি বস্তু তা চেন?"

"যেমন করে' হোক ওকে ধরতে হবে। যেমন করে' হোক। এ অপমান কিছুতেই সহ্য করব না আমি"

জিতুবাবু তাঁর কেশবিরল মস্তকে ধীরে ধীরে হস্ত-সঞ্চালন করছিলেন। ঈষৎ কেসে তিনি বললেন; "কিন্তু তার অপরাধের অকাট্য কোনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি না আমি এখনও"

মাতা-পুত্রী উভয়েই সমস্বরে বলে উঠল, "এখনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছ না!"

আর একটু কেসে জিতুবাবু উত্তর দিলেন, "ট্রেণ ধরতে না পেয়ে সে বাড়ি ফিরে এসেছিল, ফিরে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে তো মনে হয় অনীতার উদ্দেশ্যেই গেছে"

অনীতা ক্রোধভরে ঘাড়টা ফিরিয়ে নিলে। বাবার সরলতা সীমা অতিক্রম করছে যেন!

স্বয়ম্প্রভা দেবী জিতুবাবুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে হাত নেড়ে বললেন, "আহা, কি বুদ্ধি! মরি মরি"

"আর একটি মেয়ের কথা যা বলছ, তারও হয়তো ওই পথে যাওয়ার দরকার ছিল, হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে হয়তো ষ্টেশনে—কিম্বা—"

"তুমি থাম বাবা"—অভিমান-অনুযোগ-ভরা কণ্ঠে অনীতা বললে।

স্বয়ম্প্রভা বললেন, "লোহার কারবার ছেড়ে ব্যারিষ্টারি কর গে যাও তুমি। সেই তোমার মানাবে ভাল"

"আমি বাজি রাখতে পারি"—হঠাৎ চটে গিয়ে জিতুবাবু বলে উঠলেন—"আমি বাজি রাখতে পারি, সুশোভন এতক্ষণে দিগিন্দ্র না দিকপাল সেই ভদ্রলোকের ওখানে পৌঁছে গেছে, আর অনীতাকে সেখানে দেখতে না পেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে। সকালেই আমি টেলিগ্রাম করব সেখানে"

স্বয়ম্প্রভা বললেন, "তাহলে তো সোণায় সোহাগা হবে। টি টি পড়ে যাবে চারদিকে"

"যাই হোক সমস্ত রাত এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ হবে না এখন। বাড়ি চল। আমি পা-জামা পরেই চলে এসেছি। আমার বিশ্বাস সকাল নাগাদ সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর এখন করবারই বা কি আছে"

"আমি অনীতার কাছে থাকব"

"বেশ থাক। ভালই তো"

"না, মা তুমি যাও। আমার কোনও কষ্ট হবে না"

"কেন, থাকি না"

"না"

জিতুবাবু অধীর হয়ে উঠলেন।

"আঃ, যা হয় ঠিক করে' ফেল একটা। ঘুম পাচ্ছে আমার"—তারপর অনীতার দিকে ফিরে বললেন, "মিছি মিছি ভাবছিস, কিছু হয় নি। তাছাড়া আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত আমাদের। সুশোভন ঠিক আমাদের মতো নয় তো, সে যে সমাজে মানুষ সে সমাজে স্ত্রীলোক নিয়ে অত শুচিবাই নেই, কারও সঙ্গে একবার ট্যাক্সিতে উঠলেই যে চারদিকে টি টি পড়ে যাবে এ কথা ভাবতেই পারে না সে হয়তো"

"এই ঘুমের জন্যে অস্থির হচ্ছিলে, আবার বক্তৃতা সুরু করলে কেন। কত রঙ্গই যে জান—"

"কাল সকালেই টেলিগ্রাফ করব আমি। রায় বাহাদুর দিগিন্দ্রমোহন?"

"দিগ্বিজয় সিংহ রায়—মুচুকুন্দ-কুণ্ডলেশ্বরী"

"আচ্ছা। টুকে দে আমায় একটা কাগজে, ভুলে যেতে পারি"

উভয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। ফিরে এসেই স্বয়ম্প্রভা দেবী ফোন ডাইরেকটারী খুঁজে শার্দ্দুল সিংকে ফোন করলেন। কোন জবাব পেলেন না। সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হল তাঁকে। না, সে ট্যাক্সি এখনও ফেরে নি। কোনও খবরও আসে নি এখনও। না, কোথায় গেছে তা জানেন না তাঁরা ঠিক। সুশোভনবাবু শুধু বলেছিলেন অনেক দূর যেতে হবে, সুশোভনবাবু চেনাশোনা লোক, তাই তাঁরা নির্ভয়ে তাঁর হাতে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিলেন—বিশেষ খোঁজ খবর করেন নি। ড্রাইভারের নাম গণেশ, যদিও নূতন লোক কিন্তু নির্ভরযোগ্য। গণেশ ফিরে এলে তাকে মিসেস সোমের কাছে পাঠিয়ে দেবে তারা।

জিতুবাবু আপিসে পৌঁছে টেলিগ্রাম ফর্ম চাইলেন এবং বেশ কায়দা করে' চেয়ার টেনে বসলেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখতে আটকায় না তাঁর, কিন্তু এ ধরণের সূক্ষ্ম সামাজিক লিপিকুশলতা তাঁর ধাতে নেই। ব্যাপারটা একটু

ঘোরাগো গোছেরও। টেলিগ্রাফিক ভাষায় সংক্ষেপে লিখতে হবে! উপর্য্যুপরি গোটা ছয়েক ফর্ম নষ্ট করবার পর ভ্রূকুঞ্চিত করে' বসে রইলেন তিনি কিছুক্ষণ। অনুচ্চ-কণ্ঠে একবার বললেন "বেশ বেগ দেবে দেখছি।" বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন।

প্রথমত জানা দরকার সুশোভন সেখানে গেছে কি না। দ্বিতীয়ত জানানো দরকার অনীতা কেন যায় নি, তৃতীয়ত সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা সংক্ষিপ্ত অথচ ভদ্র চেহারা দিতে হবে। ভদ্র চেহারা দিতেই হবে, কারণ ওই দিকপাল ভদ্র-বনেদী ঘরের ছেলে—দারুণ হয়ে—। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিতে এটা জানানও দরকার যে অনীতা সামান্য একটু চিন্তিত হয়েছে বটে কিন্তু আতঙ্কিত হয় নি।

পেন্সিল দিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে মুখবিকৃতি-সহকারে তিনি মনে মনে ভাঁজতে লাগলেন—ক্যান ইউ কাইণ্ডলি সেন্ড্ নিউজ সুশোভন থিঙ্ক সাম মিস্টেক—mistake ওয়াইফ্ কুট্ ট্রেণ হি মিস্ড্ সো রিটার্ণড। পছন্দ হল না। আবার ভাঁজতে লাগলেন—ইজ সুশোভন উইথ্ ইউ ওয়াইফ্ মিস্ড্ হিম্ ষ্টার্টেড্ টু কাম বাট্ মিস্ড্ হিম্ সো রিটার্ণড্ হোম্ বাট্ মিস্ড্—

তাঁর আপিস ঘরের বাইরে কয়েকজন কর্ম্মচারী জরুরি ফাইলপত্র নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং অধীরতাসূচক যে সব শব্দ করছিল তাতে আরও গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল যেন সব। অবশেষে বিরক্তিভরে অর্দ্ধলিখিত আর একগোছা টেলিগ্রাম ফর্ম ছিঁড়ে কুঁচোকুঁচি করে' ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন। দুপুর পর্য্যন্ত যদি কোন খবর না আসে তখন দেখা যাবে।

"আসুন আপনারা—" ক্রমশঃ

হরীতকী

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এস-সি ও কবিরাজ শ্রীসতীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য ভিষগ্‌রত্ন

আয়ুর্ব্বেদে হরীতকীর স্থান অতি উচ্চে। ইহা অতি সুলভ ও সহজপ্রাপ্য বস্তু। বেনে দোকানে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এক আনা দু' আনা সের দর ছিল। এখন পাঁচ আনা ছ' আনা দর। দুইটি কি তিনটি হরীতকী বাটিয়া বা চূর্ণ করিয়া খাইলে উত্তম বিরেচন বা জোলাপ হয়। উহার মূল্য আধ পয়সা মাত্র। অন্য কোনও ডাক্তারী জোলাপের মূল্য ৮ হইতে ১৬ গুণ বেশী।

বমন ও বিরেচন এই দুই প্রকারের চিকিৎসা শুধু যে মানুষের মধ্যে চলিত এমন নহে। পশুদের মধ্যেও উহা চলিত আছে। কুকুর বা বিড়ালের অসুখ হইলে উহারা লম্বা লম্বা ঘাস কামড়াইয়া খায়। ঘাসের আঁশগুলি গলায় লাগিয়া অনেক স্থলে বমন হয়—বদ হজমের শূল বেদনাকর খাদ্য বমি হইয়া বাহির হইয়া যায়। বমন না হইলে সেই আঁশগুলি পাক যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া কর্কশাংশের (roughage) এর কাজ করে। আমাদের খাদ্যের কর্কশ অংশ—শাকের আঁশ, কোঁড়নের মশলা, কিসমিস ও কুলের খোসা প্রভৃতি পাক যন্ত্রের গাত্রে প্রহার *করিয়া বিরেচন করে, কোষ্ঠ সাফ হয়।*

বিরেচক হরীতকীর সর্ব্বপ্রধান প্রয়োগ কিন্তু অতিসার, উদরাময়— diarrhoea*র চিকিৎসার প্রথম অবস্থায়।* কুজীর্ণ খাদ্য যখন যন্ত্রণা দিতেছে তখন উহাকে যত শীঘ্র বাহির করিয়া দেওয়া যায় ততই ভাল। গলায় আঙুল দিয়া, পানের বোঁটা দিয়া বা রবারের নল দিয়া বমন করিলে অতি শীঘ্র যাতনার উপশম হয়। নচেৎ বিরেচন দিতে হইবে। বিচক্ষণ ডাক্তার এরূপ স্থলে castor oil ব্যবহার করেন। বিচক্ষণ কবিরাজ হরীতকী ব্যবহার করেন। চরক শুশ্রুত ও বাগভট সকলেই এই ব্যবস্থা করেন। হরীতকীর আর গুণ এই যে, উহা প্রথম মল প্রবর্ত্তিত করিয়া পরে মল রোধ করে। উদরাময় নিবৃত্ত হয়।

চরকের রসায়নাধ্যায়ে হরীতকীর এইরূপ গুণ বর্ণনা আছে। হরীতকী পঞ্চ রস (মধুর, কষায়, কটু, তিক্ত ও অম্ল) যুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অলবণ, দোষের অনুলোমন, লঘু, দীপন (অগ্নিবৃদ্ধিকর) পাচন (খাদ্য পাক-কারক) আয়ুবর্দ্ধক, পুষ্টিকর রসায়ন (বয়স্থাপক), সর্ব্বরোগ প্রশমন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বলপ্রদ। ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম, উদাবর্ত্ত, শোথ, পাণ্ডুরোগ, মদরোগ, অর্শ, গ্রহণীদোষ, পুরাণজ্বর, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, অতিসার, অরুচি, কাস, প্রমেহ, আনাহ, প্লীহা, নূতন উদররোগ, কফাধিক্য, বিস্বরতা, কামলা, ক্রিমি, শোথ, শ্বাস, ক্লৈব্য প্রভৃতি বিবিধ রোগ নাশ করে। (চরক রসায়নাধ্যায়—১৭—১৮ শ্লোক)।

তবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ হরীতকী ব্যবহার করিবে না।—অজীর্ণ-*রোগগ্রস্ত, রুক্ষভাবাপন্ন এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর ব্যক্তি।*

চ্যবনপ্রাশ নামক প্রসিদ্ধ রসায়ন ঔষধের প্রধান উপকরণ আমলকী। বাগভটোক্ত ব্রাহ্ম রসায়ন পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন। উহার প্রধান উপকরণ প্রায় সম পরিমিত হরীতকী ও আমলকী। ভৃষ্ট হরীতকী ও অগও

হরীতকী বিশিষ্ট রসায়নের প্রধান উপকরণ। কথিত আছে, ঋষিগণ ঐ সকল রসায়ন সেবন করিয়া নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হইতেন।

আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ "নিত্য এক রসাভ্যাস" নিষেধ করেন। অর্থাৎ খাদ্যে ছটি রসই যথাযথ মাত্রায় থাকা প্রয়োজন। সাধারণ বাঙ্গালী মিষ্ট (ইহার মধ্যে চাল, ডাল, মাছ, মাংসও পড়ে), কটু (ঝাল—লঙ্কা, মরিচ, আদা, পিপুল) ও লবণ রস ব্যবহার করে। অনেকে অম্লরসও (তেঁতুল, কুল, আম, আমড়া প্রভৃতিও) কিছু ব্যবহার করে। কিছু লোক তিক্ত রস (উচ্ছে, পলতা, নিম প্রভৃতি) ব্যবহার করে। কেহ কেহ কষায় রস (হরীতকী, আমলকী) খাদ্যের জন্য ব্যবহার করে। প্রাচীন ভারতে ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। হিন্দুস্থানীরা এই রস কতক পরিমাণ ব্যবহার করে। খাদ্যে ষড় রসের সম্যক ব্যবহার হইলে দেহরক্ষক সকল উপকরণগুলিই (প্রোটীন, কার্ব্বোহাইড্রেট, স্নেহ, ভিটামিন ও বিবিধ লবণ, এবং হর্ম্মন (hormone) জাতীয় পদার্থ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব বাঙ্গালীর খাদ্যে ঐ সকল রসই যথাযথ মাত্রায় ব্যবহৃত হউক—জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে।

আমলকী ও হরীতকী পশ্চিমের লোকে মোরব্বারূপে ব্যবহার করে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী অতি সহজ। হরীতকী আমলকীগুলিকে ভাপে (steam bath) বা অল্প জলে সিদ্ধ করিয়া গুড় বা চিনির সহিত পাক করিয়া লইলেই মোরব্বা হইল। রুচি অনুসারে উহার সহিত কিছু দারুচিনি ও এলাচের গুড়া মিশাইলে সুগন্ধ হইবে। এক ফোঁটা গোলাপী আতর দিয়াও সুবাসিত করা যাইতে পারে। কিছু ত্রিকটুর (পিপুল, মরিচ ও শুঁটের সব কটির বা একটির) চূর্ণ মিশাইয়া উহাতে রুচি অনুযায়ী ঝাল আস্বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

হরীতকীর নিম্নলিখিত যোগ (prescription formula) আমরা গৃহস্থের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী দেখিয়াছি। হরীতকী ১২ ভাগ, সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, যোয়ান ৫ ভাগ, শুঁঠ বা পিপুল বা উভয়ে মিলিত ৫ ভাগ উত্তমরূপে গুঁড়াইয়া মিশাইয়া লইতে হইবে। একত্রে গুড়ান যাইতে পারে। কাপড় বা তারের চালুনি দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। মোটা ছাঁকনিতে ক্ষতি নাই। মোটা দানা কর্কশাংশের (roughage) এর কার্য্য করিবে। ইহা অধিকাংশ রোগের প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপকারী। আহারের পর দুই এক চিমটি খাইলে সহজে হজম হয়। ভোজনের পূর্ব্বে অক্ষুধা থাকিলে ঐরূপ খাইলে ক্ষুধার উদ্রেক হয়। হঠাৎ পেটের অসুখ হইলে ৩।৪ চিমটি গরম জলের সহিত সেবন করিলে উদরাময় আর বাড়িতে পারে না! কোষ্ঠবদ্ধ হইলে আধ বা এক চায়ের চামচ মাত্রায় খাইয়া গরম জল খাইলে কোষ্ঠ সাফ হয়। সর্দ্দি কাশির প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপযোগী। কাশির বেগ কম হয়; সর্দ্দি কমিয়া যায়। বক্তৃতার পূর্ব্বে গলা ধরিয়া যাইলে গলা বেশ সারিয়া যায়। ইহাই আয়ুর্ব্বেদের প্রসিদ্ধ বৈশ্বানর চূর্ণ।

হরীতকীর আর একটি প্রয়োগ :—

(১) দন্তমঞ্জন :—যাহাদের দাঁত দিয়া সহজে রক্ত পড়ে, বা দাঁত নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের হরীতকীর চূর্ণযুক্ত দন্তমঞ্জনে বিশেষ উপকার হয়। রক্ত পড়া বন্ধ হয়। দাঁত নড়া বন্ধ হয় বা কমিয়া যায়; দাঁতের মাড়ি বেশ শক্ত হয়। রোগের তীব্রতা অনুসারে ১ভাগ হরীতকী চূর্ণ ও ১-৪ ভাগ খড়ি চূর্ণ (precipitated chalk হইলে ভাল হয়) দ্বারা প্রস্তুত মাজন ব্যবহার করা যাইতে পারে। উহার সহ কিছু শুঁঠ চূর্ণ মিশাইলে কষায় ভাব কিছু কমিয়া যায়।

(২) হরীতকীর মলম :—১ ভাগ হরীতকী চূর্ণ ও ১-৪ ভাগ ঘৃত মিশাইয়া এই মলম প্রস্তুত হয়। রক্তার্শে উপকারী। রক্তাক্ত স্থানের উপর লাগাইলে রক্ত রোধ হয়।

(৩) হরীতকীর পাতলা জল দুএক ফোঁটা চোখে দিলে নূতন চোখ উঠা ভাল হয়।

(৪) কোন স্থান পুড়িয়া গেলে হরীতকীর গুঁড়া সিদ্ধ জল ঠাণ্ডা করিয়া দগ্ধ স্থানের উপর পুন পুন প্রয়োগ করিবে। হরীতকীর ট্যানিক অ্যাসিড দগ্ধ স্থানের উপকার করে। হরীতকীর বদলে চায়ের ঘন জল (strong tea infusion) ব্যবহারেও ঐ ফল হইবে। আজকাল অনেক বাটিতে হরীতকী অপেক্ষা চাই সহজপ্রাপ্য বস্তু।

কালীয়-দমন

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

কালীয়-দমন করিছে কৃষ্ণ—
নোয়াখালীর ওই কালীয়-হ্রদে,
দেখা যাবে তার কেরামতি কত
সাম্প্রদায়িক সর্প-বধে।
ভীম-অজগর ফণা বিস্তারি'
মাথা তুলেছিল, বিষ উদ্‌গারি'—
ত্রাসে ছুটেছিল যত নর-নারী
আয় সবে ফিরে আয়!
ঝাঁপ, দেছে আজি কৃষ্ণ আমার
বিষ-বারি কালীয়ায়।

বিহারেতে তার লেজ নড়িতেছে
নোয়াখালীতেই মাথা,
মাথার উপরে নাচিছে কৃষ্ণ!
গাহিছে প্রেমের গাথা।
এ যুগে কি তাহা সম্ভব হবে?
পৃথিবী মেতেছে হিংসোৎসবে
পশ্চিম হতে জোগাইবে যবে
আত্মঘাতের বুদ্ধি......
কিরূপে করিবে কৃষ্ণ আমার
পূর্ব্বাঞ্চলে শুদ্ধি?

সংশয় জাগে; তবু ভাবি মনে—
কৃষ্ণ মেতেছে মরণের পণে!
নোয়াখালী নয়, বিশ্ব-বিজয়
—করিবে সে এই বার,
হিংসা-সাপুড়ে লোভী-চার্চ্চিল
মর্ম্ম বুঝিছে তার।
এ-নাচনে যদি কৃষ্ণ আমার
পা ভাঙিয়া প'ড়ে যায়?
জগতের আর নাই নিস্তার
ছাই হবে হিংসায়।

দেবদত্ত

শ্রীপুরাপ্রিয় রায়ের অনুবাদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমারের সঙ্কলন

১৪

সন্ধ্যার প্রাত্যহিক মাঙ্গলিক গ্রহণের পর প্রজ্ঞা ও আমি প্রথম যামের প্রারম্ভে সংঘারামের উদ্দেশে পদব্রজে বাহির হইলাম। যখন আমরা সংঘারামে উপস্থিত হইলাম তখন আর্য্য মহাস্থবির বিহারের আরত্রিকাদি নিত্য সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া আমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। তখন সম্মেলন আরম্ভ হইতে অনেক বিলম্ব ছিল। মহাস্থবির পরামর্শ সভার নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসিবার জন্য আমাদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

আমরা উভয়ে তাঁহার সম্মুখে গিয়া পাদবন্দনা করিলাম। তিনি আমাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। আমরা বসিলাম। অল্পক্ষণ পরে শেখর ও ত্রাণসংঘের অপর একজন নায়ক ধনদাস আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে সুকৃতিবর্দ্ধন, মঞ্জুকান্তি, পুষ্টপাল, বীরভদ্র, অমরকেতন, ভীমবর্ম্মা ও শত্রুঞ্জয় নামক নায়কগণ জুটিল। মহাস্থবির আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চৈত্যগৃহের নিম্নে গর্ভগৃহে চলিলেন। তথায় অবতরণ করিয়া মহাস্থবিরের নির্দ্দেশ ক্রমে আমরা সকলে আসন গ্রহণ করিলাম। সকলের পুরোভাগে, একটি স্বতন্ত্র বিশেষ আসনে—মিলিত নায়কগণের দিকে মুখ ফিরাইয়া আমি উপবেশন করিলাম। আমার দক্ষিণ পার্শ্বে নায়কগণের সম্মুখীন হইয়া মহাস্থবির বসিলেন। আমাদিগের পরামর্শ সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

সকল নায়কের নিকট হইতে সংবাদ গ্রহণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইল। এই সকল সংবাদ আমাদের ত্রাণসংঘের সদস্যগণের দ্বারা অনেক অনুসন্ধানপূর্ব্বক সংগৃহীত হইয়াছে। গত বারে ইউয়েচিগণের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার সকল সর্ত্ত বাহ্লিক গন্ধার সাম্রাজ্য পালন করিতে এ পর্য্যন্ত অবহিত হয় নাই এবং কয়েকটি প্রধান সর্ত্ত ভঙ্গ করিতেও পশ্চাদপদ হয় নাই। ইউয়েচিগণ এই অছিলায় পুনর্ব্বার বাহ্লিক-গান্ধার রাজ্যের সীমান্তে আবির্ভূত হইয়াছে।

আমি সম্মেলনে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যাহা আমার বিবেচনায় বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সমীচীন কর্ম্মপন্থা বলিয়া মনে হয়। সাম্রাজ্যের বিপদ সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। আমাদিগের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে এখন আর নিশ্চেষ্ট থাকিলে বা ব্যক্তিবিশেষের উপর যবনের অত্যাচার ও অবিচারের নিরাকরণ ভার দিয়া কর্ত্তব্য শেষ করিলে চলিবে না। এ সম্বন্ধে সেই পরামর্শ সভায় কাহারও মতভেদ ছিল না। আমি যেরূপ ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম সভায় তাহা জানাইলাম। প্রজ্ঞা ও শেখর আমার সহিত একমত হইল। আর্য্য মহাস্থবির কিছুক্ষণ মৌন রহিলেন, পরে সভায় উপস্থিত সকলের নিকট হইতে তাহাদের সংগৃহীত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিলেন এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সংঘের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সকলের মতবাদ একত্র গ্রথিত করিয়া সম্যক্ আলোচনার জন্য এই সভায় উপস্থাপিত করিলেন। সভায় আলোচনার পর স্থির হইল যে, সংঘের কার্য্য প্রসারিত করিতে হইবে। আমাদের প্রেরণা বাহ্লিক-গন্ধারের সর্ব্বত্র যাহাতে ব্যাপ্ত হইতে পারে—যবন ভিন্ন সকল উৎপীড়িত জনসাধারণ আমাদের এই অভিনব আদর্শ যাহাতে গ্রহণ করিয়া জাগিয়া উঠে—তাহাদের প্রাণে যাহাতে এক নূতন আশার সঞ্চার করে—সাম্রাজ্যের সীমান্ত হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত একটা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে—যাহাতে যবন তাহার সকল অনাচার, অবিচার ও অত্যাচারের সহিত দগ্ধ হইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হয়—সংঘকে এখন সেই পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে।

আর্য্য মহাস্থবির আমাদিগের কথা এতক্ষণ মৌন হইয়া

শুনিতেছিলেন। আমাদিগের কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "বেশ, ইহাতে আমার কোনও মতভেদ নাই, কিন্তু কার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে কি ভাবে কোথায় তাহা আরব্ধ হইবে তাহার আলোচনার প্রয়োজন। সে বিষয়ে সকলের মত একে একে বলিলে বিবেচনার ও কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বনের সুবিধা হইবে।"

প্রথমে নায়কগণ সকলে একে একে তাহাদের মত জ্ঞাপন করিল। কেহ বলিল, গন্ধার হইতে আমাদিগের কার্য্য আরম্ভ করিলে সুবিধা হইবে। কেহ মত প্রকাশ করিল, প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়া যবনকে বিপর্য্যস্ত ও দুর্ব্বল করা যুক্তিসঙ্গত হইবে। কাহারও মত হইল, ইউয়েচিদিগের সহিত যোগ দিয়া যবনকে বিধ্বস্ত করতঃ তাহাদিগকে তাহাদিগের আকাঙ্খিত ধন ও উৎকোচাদি প্রদান করিয়া বিদায় করা এবং আমাদের সীমান্ত দৃঢ়তররূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, যাহাতে আর কখনও কোনও বর্ব্বর জাতির পক্ষে তাহা ভেদ করা অসম্ভব হইবে। কেহ বলিল, ইউয়েচিদিগের সহিত সংযোগ স্থাপন পূর্ব্বক এ সম্বন্ধে আলোচনার কার্য্য তাহাদিগকে লইয়া করিতে হইবে এবং আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তাহারা কি লইয়া সন্তুষ্ট হইবে ও আমাদের দেশের শাসন সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া আমাদের দেশ আমাদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক চলিয়া যাইতে স্বীকৃত হইবে কিনা, তাহাও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে জানিতে হইবে। এইরূপ অনেক কথা নায়কগণ বলিল—অনেকে অনেক মত প্রকাশ করিল—কিন্তু সকলেরই মতের সারাংশ হইতেছে, আক্রমণকারী বর্ব্বর শত্রুর সহিত সংযোগ স্থাপন এবং তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রজ্ঞা, শেখর ও আমি এ পর্য্যন্ত মত প্রকাশ করি নাই। আমরা ইহাদিগের মতবাদ মনোযোগের সহিত শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম। সকলের বক্তব্য শেষ হইলে আর্য্য মহাস্থবির আমাদিগের মতবাদ জানিতে চাহিলেন। প্রজ্ঞা ও শেখর বলিল যে, তাহারা আমার সহিত এ বিষয়ের সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়াছে এবং এ সম্বন্ধে এক মত হইয়া আমরা যে কর্ম্মপন্থা সমীচীন বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহা আমি সভায় বিচার-বিবেচনার জন্য বিজ্ঞাপিত করিব।

আর্য্য মহাস্থবির আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'তবে, দেবদত্ত, এখন তোমাদের মত সভায় জ্ঞাপন কর! সকলের মত ত শুনিলে; সে সকল মতবাদের উপর তোমার যুক্তিযুক্ত আলোচনা শুনিবার জন্য আমরা উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম।"

পরামর্শ সভায় আসিবার পূর্ব্বে প্রজ্ঞা, শেখর ও আমি একত্রে আলোচনাপূর্ব্বক আমাদের কর্ম্মপন্থা যেরূপ হওয়া আবশ্যক সে বিষয়ে যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা আমি সভায় জ্ঞাপন করিলাম। আরও জানাইলাম যে, এই প্রস্তাবিত কর্ম্মপন্থা প্রজ্ঞা, শেখর এবং আমি একত্রে আলোচনা পূর্ব্বক উদ্ভাবন করিয়াছি। অতএব এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের তিনজনের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই এবং থাকিতেও পারে না।

আর্য্য অর্হৎপাদ মহাস্থবির আমার বক্তব্য স্থিরচিত্তে শুনিলেন এবং পরে বলিলেন, "হাঁ, তোমাদিগের এই নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা সুচিন্তিত বটে; কিন্তু সাম্রাজ্যের শাসন কিংবা সৈন্য বিভাগে প্রবেশলাভের জন্য কিরূপ সুবিধা করিতে পারিবে এবং কি উপায় অবলম্বন করিবে তাহা ভাবিয়াছ কি?"

আমি বলিলাম, "না, এখনও সে বিষয়ের চিন্তা করি নাই। আমাদের প্রস্তাব সভা অনুমোদন করিলে উপায় চিন্তার অবকাশ হইবে।"

—আমার মনে হয় যে সৈন্য বিভাগে প্রবেশলাভ এখন সহজে হইতে পারে। কিন্তু গন্ধারে সৈন্য বিভাগে প্রবেশলাভ করিলে, বিশেষতঃ গন্ধারবাসীগণের পক্ষে উচ্চ পদলাভ করা বড় সহজ হইবে না।

—আমরা—অর্থাৎ আমাদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন বাহ্লিকে গিয়া সেখানে সৈন্য বিভাগে বা শাসন বিভাগে প্রবেশলাভের চেষ্টা করিব এইরূপ মনস্থ করিয়াছি।

—সেখানে গিয়াও এদেশবাসীদিগের উচ্চপদলাভ করা বোধ হয় সহজসাধ্য হইবে না।

—কিরূপে তাহা সহজসাধ্য হইবে, আর্য্য?

—বাহ্লিক যবন বলিয়া পরিচিত হইলে ও যাবনিক ভাবে থাকিলে শাসন এবং সৈন্য বিভাগে প্রবেশলাভ ও উচ্চপদপ্রাপ্তি বিশেষ কষ্টের হইবে না। বাহ্লিকের অনেক যবনই বৌদ্ধ। বাহ্লিক গন্ধারের মহামাত্য মহাবলাধিকৃত

ফিলোষ্ট্রাটস্ একজন ধার্ম্মিক বৌদ্ধ এবং তিনি আমাকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তোমাদের যবন নামে পরিচয় দিয়া সেখানে গমনবার্ত্তা পূর্ব্বেই পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইয়া দিব। তোমরা আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিও। কিঞ্চিৎ পণ্যসম্ভার লইয়া গমন করিবে এবং পুরুষপুরে সর্ব্বত্র প্রচার করা যাইবে যে, তোমরা বাণিজ্যসম্ভার লইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য পাশ্চাত্য দেশে—তার্শীশ্ নগরে*—গমন করিতেছ এবং তথা হইতে প্রত্যাগমনে তোমাদের বিলম্ব হইবে। তোমরা শ্রেষ্ঠী—বংশপরম্পরায় তোমরা এই কার্য্য করিয়া সমগ্র সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধ ও শ্রীসম্পন্ন করিতেছ, তোমাদের উপর কেহ কোনওরূপ সন্দেহ করিবে না—কোনও গণ্ডগোলেরও সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই—যাত্রার প্রারম্ভে বা অভিযানে বাধা পাইবে না।

—কিন্তু বাণিজ্যসম্ভার লইয়া বৃথা পথে ভারাক্রান্ত হইয়া যাওয়া সুবিধাজনক বলিয়া আমার মনে হয় না। তাহা অপেক্ষা আমার মনে হয় যে কোনও এক সার্থবাহী-দলের অভিযানে মিশ্রিত হইয়া যাত্রা করা ভাল।

—না, বিপদ কিরূপভাবে এবং কোথায় দেখা দেয়, তাহার পর সীমান্তে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত—এখন যবন অত্যন্ত সাবধান হইয়াছে—গুপ্তচরের দল সাম্রাজ্যের সকলের গতিবিধি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত।

—আপনার যেরূপ উপদেশ। তাহা হইলে দুই-চারিজন লোকও সঙ্গে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে। আপনি কিরূপ আদেশ করেন?

—হাঁ—আমার বিবেচনায় তাহা হইলে সন্দেহ করিবার সমধিক কারণ থাকিবে না।

সভা আমাদের প্রস্তাব ও তৎসহ আর্য্য মহাস্থবিরের উপদেশবাণী সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিল। এখন কে কে যাইবে তাহা লইয়া এবং এই যাত্রা সংক্রান্ত অপর ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল।

ত্রাণসংঘের সকল নায়কই যাত্রা করিতে প্রস্তুত, কাহারও কোনও আপত্তি বা বাধা-বিঘ্ন নাই।

মহাস্থবির বলিলেন, "আচ্ছা, আমি স্থির করিয়া দিতেছি কে কোথায় যাইবে। আমার প্রস্তাব তোমরা সকলে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতে পার।"

মহাস্থবির প্রস্তাব করিলেন, "প্রজ্ঞা ও আমি বাহ্লিকে গমন করিব; শেখর পুরুষপুর নগরে থাকিবে এবং ত্রাণ-বাহিনীর অধিনায়কত্ব করিবে। অমরকেতন ও ভীমবর্ম্মা আপাততঃ বাহ্লিক গন্ধারের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিয়া রাজ্যের সকল ব্যবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিবে। আর সকলেই—নায়ক ও সদস্যগণ মিলিয়া ত্রাণসংঘের সংপ্রসারণ সম্বন্ধে অবহিত হইবে। প্রয়োজনীয় অর্থ সংঘের সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হইবে। এই অর্থব্যয়ের জন্য আমার ও সভার অনুমতি প্রয়োজন।"

আর্য্য মহাস্থবিরের এই বিনীত অনুমতি প্রার্থনায় আমরা হাসিলাম। আমি বলিলাম, "আর্য্য, আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সঞ্চিত অর্থ আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে ব্যয়িত হইবে। আবার নূতন করিয়া সভার অনুমতি গ্রহণের আবশ্যক আছে কি?"

আর্য মহাস্থবির বলিলেন, "নিশ্চয়ই আছে। জনসাধারণের হিতের জন্য, দেশ, ধর্ম্ম ও সংঘের কল্যাণ কল্পে, যে অর্থ সঞ্চিত ও সংগৃহীত আছে তাহার যথাযথ ব্যয়ের জন্য সংঘের পরামর্শ ও অনুমতি লইতেই হইবে, সে সম্বন্ধে কি কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে? এই অর্থ দেশের, জনসাধারণের, ধর্ম্ম ও সংঘের কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হইবে, এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত ও সঞ্চিত হইয়াছে এবং এতদিন পুরুষপুরের কপোতিকা সংঘারামের মহাস্থবির পরম্পরায় ন্যস্ত হইয়া এখন আমার হস্তে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি এখন এই ন্যাস দেবদত্ত ও ধর্ম্ম, সংঘ ও জনসাধারণের কল্যাণ-ব্রতে ব্রতীদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম এবং বুঝিলাম যে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে—এতদিন পরে সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যয় হইবে এইরূপ আশা হয়।"

—কপোতিকা সংঘারামের ন্যস্ত অর্থব্যয়ের জন্য স্থবির, ভিক্ষু ও শ্রমণ সংঘের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে ত?

—না—সংঘারামের মহাস্থবির তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে অনুমতি দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। অতএব তাঁহাদিগের পক্ষ হইতে আমি যাহা করিব তাহাই সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইবে। সে ক্ষমতা সংঘারামের ভারপ্রাপ্ত মহাস্থবিরের

* এই সময়ে এই নগর প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল।

থাকে—সেজন্য আর নূতন করিয়া ভিক্ষুসংঘের অনুমোদনের বা অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নাই।

—পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীগণ যবনের দ্বারা মাঝে মাঝে নির্য্যাতিত হইয়া থাকে, সেখানে আমাদিগের মন্ত্র প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। আরও এই পার্ব্বত্যজাতিগণ যাহাতে ইউরেচিগণের সহিত মিলিত না হয় এবং বাহ্লিক-গন্ধারে প্রবেশের পার্ব্বত্য পথ সুগম করিয়া না দেয় তাহারও জন্য আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে।

—তজ্জন্য পুষ্টশাল ও বীরভদ্র কয়েকজন বাহিনী-সদস্যকে লইয়া পশ্চিমের গিরিপথ দিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে গমন করুক! দুই-তিনজন ভিক্ষুককেও এই অভিযানের সহিত পাঠাইতেছি, তাহারা তথায় তথাগত ভগবান্ সম্যক্ সম্বুদ্ধের করুণা ও দশ-শিক্ষাপদ* প্রচার করিবে।

—আমাদের ত্রাণসংঘ ও বাহিনীর সংপ্রসারণের চেষ্টা গন্ধারেও আরও অধিক যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে আমাদিগের প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

—হাঁ, তৎসম্বন্ধে কোনও ত্রুটি নাই। গন্ধারে ত্রাণ-সংঘের সদস্যদিগের সংখ্যা এখন পঞ্চশতের অধিক এবং দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

—তক্ষশিলাতেও আমাদের মন্ত্র প্রচারের আবশ্যক বলিয়া মনে হয়।

—সেখানে সুকৃতিবর্দ্ধন ও মঞ্জুকান্তি বাহিনীর কয়েকজন সদস্য লইয়া গমন করিবে। তক্ষশিলা-বিহারের মহাস্থবির আমাদের ত্রাণসংঘের মন্ত্র প্রচারের জন্য সম্যক্ চেষ্টা করিবেন—তিনি আমাকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

অন্যান্য কয়েকটি সাধারণ বিষয়ের বিচার বিবেচনার পর স্থির হইল যে, প্রচার ও সংপ্রসারণ কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংঘের ভাণ্ডার হইতে আর্য্য মহাস্থবির বিবেচনামত বণ্টন করিবেন।

অতঃপর পরামর্শ সভার কার্য্য আপাততঃ সমাপ্ত হইল। আর্য্য মহাস্থবিরের সহিত আমরা সকলে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলাম এবং বাহিনা-পরীক্ষা-প্রাঙ্গণে গমনের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

আমরা চারিজন—মহাস্থবির, প্রজ্ঞা, শেখর ও আমি—গৃহকোণে রক্ষিত মশাল হইতে চারিটি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত করিয়া লইলাম। আর্য্য মহাস্থবির জ্বলন্ত মশাল হস্তে আমাদের অগ্রে চলিলেন। গৃহকোণে মশালগুলির সহিত স্ফুলিঙ্গ প্রস্তর ও লৌহশলাকাও রক্ষিত ছিল, সুতরাং মশালগুলি প্রজ্বলনের বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় নাই।

আমরা মশাল হস্তে ভূগর্ভ পথের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কপিষাতীরের ক্ষুদ্র চৈত্যের গর্ভগৃহের দিকে অগ্রসর হইলাম। সংঘারামের গর্ভগৃহের উভয়দিকের দ্বার আর্য্য মহাস্থবির ও আমি বন্ধ করিলাম। গর্ভগৃহে যে দীপমালা জ্বলিতেছিল তাহা আর নির্ব্বাপিত করা হইল না। আমাদের প্রত্যাগমন পথ আলোকিত করিবার জন্য এই সকল দীপালোকের পুনর্ব্বার আবশ্যক হইবে।

আমরা সুড়ঙ্গপথ বাহিয়া, অপর প্রান্তে বহির্গমনের দ্বারের নিকট উপনীত হইলাম এবং কীলক সাহায্যে উহা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক চৈত্যের গর্ভগৃহে সকলে সমবেত হইলাম। গর্ভগৃহের অপর প্রান্তের দ্বার আর্য্য মহাস্থবির উন্মুক্ত করিলেন এবং আমরা সকলে একে একে সোপানশ্রেণী আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। গর্ভগৃহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমরা—আর্য্য মহাস্থবির ও আমি—উভয়দিকের দ্বার রুদ্ধ করিলাম। এই গর্ভগৃহেও পূর্ব্ব হইতে যে সকল দীপ জ্বলিতেছিল সেগুলি আর নির্ব্বাপিত করা হইল না, কারণ আমাদিগকে এই পথ দিয়া, লোক-চক্ষুর অগোচরে—বিশেষতঃ ক্ষত্রপের গুপ্তচরগণের মন্ত্রভেদ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া—গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইবে।

সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরের দেবায়তনে আমরা সকলে একত্রিত হইলাম। গর্ভগৃহের অবতরণ পথ রুদ্ধ করা হইল এবং দেবায়তনের দ্বার খুলিয়া আমরা সকলে বাহিরের উন্মুক্ত আকাশতলে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন রজনী প্রথম যামের শেষপাদে উপনীত হইয়াছে। পূর্ব্ব চক্রবালে তখন বিলম্বিত জ্যোৎস্নার ম্লান আভা ধীরে ধীরে প্রস্ফুট হইতেছিল—বিগতযৌবনার প্রসাধনের মত—দুঃখের পীড়নের মধ্যে অতীত সুখস্মৃতির মত।

চৈত্যগৃহ হইতে বাহির হইয়া আমরা মশাল হস্তে সন্নিকটস্থ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিলাম এবং সঙ্কীর্ণ

* বৌদ্ধধর্ম্মের দশটি মূলশিক্ষা।

বনপথ দিয়া ধীরে ধীরে নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনের পর আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘন অরণ্যানীবেষ্টিত প্রশস্ত মুক্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপনীত হইলাম। নায়ক কীর্ত্তিবর্ম্মণ অরণ্য প্রান্তের সেই ভগ্ন দুর্গের বা প্রাচীন অট্টালিকার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আমাদিগের সম্মুখে সামরিক প্রথায় দণ্ডায়মান হইল এবং আমাদিগকে যথাবিধি অভিবাদন করিল। আমরাও তাহাকে প্রত্যাভিবাদন করিলাম।

যথারীতি অভিবাদন-প্রত্যভিবাদনের পর আমি কীর্ত্তি-বর্ম্মণকে পরামর্শ সভায় তাহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। কীর্ত্তিবর্ম্মণ বলিল যে, আমি অস্ত্রাগারে আসিলেই তাহার সভায় অনুপস্থিতির কারণ জানিতে পারিব এবং সেখানে আরও অন্য ব্যাপার আছে যাহার জন্য তথায় আমার গমন অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমরা সকলে আমাদের গতিরোধ করিলাম। আমাদের সম্মুখ পংক্তিতে মহাস্থবির ও আমি ছিলাম। আমাদের পশ্চাতে প্রজ্ঞা-শেখর-প্রমুখ নায়কগণ ছিল। আমাদের সহিত সকলেই দণ্ডায়মান হইল।

আমি আমার পার্শ্বস্থ মহাস্থবিরকে বলিলাম, "চলুন, আর্য্য, অস্ত্রাগারে—সেখানে গিয়া দেখা যাউক ব্যাপারটা কি।"

মহাস্থবির বলিলেন, "তাহাই হউক! চল! সকলে অস্ত্রাগারে প্রথমে গিয়া দেখি সেখানে আমাদের কোন কর্ত্তব্য অননুষ্ঠিত আছে, কিংবা কোন অভিনব অনুষ্ঠান আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে।"

আমরা সকলেই বনপ্রান্তে সেই প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপের দিকে অগ্রসর হইলাম।

ইতি দেবদত্তের আত্মচরিতে মন্ত্রণা-
নামক চতুর্দ্দশ বিবৃতি।

যুদ্ধোত্তর ভারত

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

জার্ম্মানীকে শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিতেই হইল। Hitler সম্ভব বার্লিনের ধ্বংসস্তূপের নীচে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। বার্লিন রক্ষার উপায় ছিল না। যে জাতি—সারা জগতের উপর প্রভুত্ব করার দাবী করিয়াছিল শক্তির অহমিকাতে, আজ তার অপমান ও দুর্দ্দশার সীমা নাই। এখন জার্ম্মানী লইয়া কি করা হইবে মিত্রশক্তি তাহা স্থির করুন। ভবিষ্যতে জার্ম্মানীর এই শক্তি-লোলুপতার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, তার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হইবে বলিয়া মনে হয়। যদি জার্ম্মানী নষ্ট হয়, যদি তার শক্তি হইতে তার জীবনযাত্রাকে আলাদা করা হয়, তবে শুধু যে জার্ম্মানীর ক্ষতি তাহা নহে, কিছু-দিন ধরিয়া সমস্ত পৃথিবীকেই সে ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। যাক্, সে ভাবনা আমাদের নয়! আমরা করিলাম, সরকারী খরচে V-dayর উৎসব। কিন্তু শত্রুর বিনাশে এই জয়োল্লাসটা কি আদিমকালের বর্ব্বরতার অবশেষ নয়?

কিন্তু যুদ্ধারম্ভে যে উত্তেজনা হইয়াছিল, যুদ্ধ সমাপ্তিতে সেই রকম স্বস্তি বা তৃপ্তি নাই। যে সম্ভাবনার উদ্বেগ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ছিল তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। নূতন সম্ভাবনা কিছু নাই। এইবার অবশ্য জাপানের বিনাশ হইবে। সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে জাপান যে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না তাহা সকলেই মনে মনে বুঝিতেছিল। জাপানের সে দম্ভ, আত্মপ্রত্যয় আর ছিল না।

একখানা ইংরাজি পুস্তক পড়িতেছিলাম, তাহাতে জাপানের এই দুরাকাঙ্ক্ষার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। লেখাটা মন্দ নয়। মুন্সিয়ানা আছে। জাপানের এই দুরাকাঙ্ক্ষা যে capitalist industrialist হইতে প্রসূত, ধনতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত, তাহাই দেখান হইয়াছে। ধনতন্ত্র যদি colour সমস্যা ও অন্যান্য আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে মিলিত হয় তবে তাহার পরিণতি এইরূপই হয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। দুর্দ্ধর্ষ শক্তির লোভ, ধনের লোভ, ইহাকে পরিমিতির মধ্যে রাখা যায় না। জাপানের ইতিহাস হয় তো একটু অদ্ভুত রকমের। এখনো হয় তো মধ্যযুগীয় clan ও feudalism লইয়াই ইহার ব্যাপার। কিন্তু তবু লোভটা যে জাপানের খুব বেশীই হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তবুও মনে হয় white-এর superiority complexটা এই সমস্ত confusionকে বাড়াইয়া দিয়াছে। race কথাটা একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু তাহা হইতে এই সব জাতিদের আপনাদের মধ্যে এত বিদ্বেষ বিরোধভাব

কেন আসিবে? বড় শক্তিমান Race ছোট ও শক্তিহীন Raceকে যদি সাহায্য না করে, তবে Raceএর গৌরব কি হীনতা লইয়া? এত মাথাব্যথা কি শুধু অত্যাচার ও অবিচারের জন্য? আর যদি সভ্য জগতেই এই ব্যাপার—যাহার রূপ য়ুরোপে দেখা গেল—তাহা হইলে যাহা সভ্যতার বাহিরে, জীবনকে এপনো ভালো করিয়া যারা বিচার বিশ্লেষণ করিতে পারে না, তাহারা কি করিবে?

চার

দয়াল আসিয়া বলিল, "জ্যাঠামশায়, টাকা চাই এইবার। কারখানা এইবার দাঁড় করাতে বেগ পেতে হবে। যে সমস্ত, কন্‌ট্রাক্‌ট-এর উপর চল্‌ছিল, তা সব যেতে সুরু হোয়েছে। তা' ছাড়া একজায়গায় অনেকগুলো টাকা আট্‌কে গেছে।"

বলিলাম, "বেশ তো! কিন্তু সরকারী contractএর উপর ভরসা কোরেছিলেই বা কেন? সেটা ছাড়াও অন্য কিছুও চাই। যাক, এইবার সেটা ঠিক কোরে নাও।"

দয়াল জানাইল, "বাজারের অবস্থাটা কি-রকম দাঁড়াবে বুঝতে পারি না। যুদ্ধশেষে slump একটা আসবেই। তবে সেটার গুরুত্ব কতদূর হবে আন্দাজ কোরতে পারছি না। আর ঠিক সেটা কোন সময়ে ঘটবে তাও জানি না। সব জিনিসের চাহিদাও একেবারে পড়বে না। দর দামও এই রকম থাকবে কিছুদিন। কিন্তু তারপর হয়তো এমন পড়বে যে তাকে টেনে তোলা যাবে না।" একটু থামিয়া বলিল, "এই control-এর ঠেলাতেই সব গেল। কিছুই কোরতে দেবে না Government। যতদিন যুদ্ধ ছিল—না হয় বুঝা যেতো যে যুদ্ধের জন্যই control। এখনও সেটা কতদিন চল্‌বে কে জানে! কিন্তু ব্যবসা, শিক্ষা, সমস্ত গেল।"

কহিলাম, "কি জানি। কর্ত্তার ইচ্ছাতে কর্ম্ম। যখন যা' ঢেউ আসে। control-এর ঢেউ এখন এসেছে। যেন তা না হোলে আর কিছুই চল্‌বে না। এখন কতরকমে ও কত দিকে যে এটা প্রসারিত হবে তা ভেবেও পাওয়া যায় না। অথচ এতে কি উপকার হোচ্ছে তা বিচার করার কোনো পথ নেই। তা' ছাড়া প্রথমে লোকের দুর্দমনীয় লোভ উত্তেজিত কোরে, শেষে control করার সার্থকতা কি?"

দয়াল মাথা চুলকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকাটা?"

আমি উঠিয়া গিয়া তাহা আনিয়া দিলাম। বলিলাম, "দয়াল, এইবার আসছে তোমার ব্যবসাবুদ্ধির পরীক্ষা। যতদূর বুঝছি, জাপানী যুদ্ধটা বেশী দিন চল্‌বে না। তারপরই সুরু হবে শান্তির ব্যবস্থাপনা। সে ব্যবস্থাপনা ঠিকমত না হোলে ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই হবে না কোনোদেশে।"

দয়াল উঠিতে উঠিতে বলিল' "শান্তি? সেটা যে যুদ্ধের চেয়েও কঠিন ব্যাপার। কতকগুলো ট্যাঙ্ক, উড়োজাহাজ, কামান, বন্দুক, বোমা গড়তে পারলে বা ঠিকমত ব্যবহার কোরতে জানলেই শান্তি হবে না। এই যুদ্ধটা থেকে যে সমস্ত শক্তির সৃষ্টি হোয়েছে, তাদের জের সামলাতেই এখন কিছু কাল লাগবে।"

বলিলাম "সম্ভব। একটা অতি কঠিন সমস্যাতে পড়া গেছে। শান্তি না হোলে ঠিক পুনর্গঠন হবে না; পুনর্গঠন না হোলে শান্তি আনা মুস্কিল হবে। এ দেশেই দেখ না। National Government না হোলে Industrialisation হবে না; Industrialisation না হোলে national Government টিক্‌বে না। এইরূপে মানুষ নিজের সমস্যা সৃজন কোরে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে। এ যেন সেই বেদান্তের মায়াজাল। স্রেফ নিজের অনাসক্ত শক্তির ব্যবহার ছাড়া, এ জাল থেকে মুক্তি নেই।"

দয়াল দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "গেছি তা হোলে!" বলিয়াই বাহির হইয়া গেল।

দয়ালের জন্য চিন্তিত নই। সে তাহার পথ বাছিয়া লইবে। তাহার উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা রাখা চলে। তাহার কারখানা যদি একান্তই যায়, তবে অপরিহার্য্য কারণেই যাইবে। আর অপরিহার্য্য কারণটা এই যে, এখানে শিল্প-প্রতিষ্ঠান নাই। যদি অনেকগুলি একরকমের প্রতিষ্ঠান থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে পরস্পরকে রক্ষা করার একটা শক্তি দেখা দেয়। কিন্তু একটা আধটা প্রতিষ্ঠান আপনাকে বাঁচাইবার শক্তি পায় না। খণ্ড খণ্ড শক্তিগুলো ছোট হইতে বড় হোতে পারে না। বড় ধাক্কা সামলাইবার মত শক্তি তাহাদের হয় না। এ কথা আমরা এখনো বুঝি না। অবশ্য অনেক কিছুই বুঝি না—শুধু সব-জান্‌তা হইয়া বসিয়া আছি। আমার একজন ধনী ব্যবসায়ী আত্মীয় আছেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিলেন, "নির্ভরযোগ্য লোক কোথায় যে ব্যবসা শেখাবো বা কোরবো?"

শুনিয়া একটু রাগ হইল, বলিলাম, "এই ৫.৬ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে লোক যদি খুঁজে না পাও তবে তোমার চোখের দোষ হোয়েছে। যদি সত্যি লোক না পাওয়া যায়, তবে তার জন্য দায়ী তোমরা। তোমরা কাউকে উপযুক্ত হবার সুযোগ দাও না। তুমি নিজেই জন্মাবধি কিছু ব্যবসাদার ছিলে না। পরে ব্যবসা কোরতে কোরতে শিখেছো। তেমনি অপরকেও সুযোগ দাও শিক্ষার। ভুলভ্রান্তি যদি শিখ্‌তে শিখ্‌তে করেই, তাতে দোষ কি?"

আত্মীয়টি বলিলেন, "তা নেই। তবুও ফাঁকি দেয় বড্ড। তা ছাড়া সব বি-এ, এম-এ পাশ কোরে এসে একখানা ইংরাজি চিঠিও নির্ভুল লিখ্‌তে পারে না। একটু আল্‌গা দিলেই, সব বিশৃঙ্খল কোরে বোস্‌বে। কারো দায়িত্বজ্ঞান থাকে না। আপনি যাই বলুন, ব্যবসাদার চায় সুদক্ষ লোক! কাঁচা লোক নিয়ে ব্যবসা করা চলে না।"

কহিলাম, "সুদক্ষ লোক শেষে পাবে না—এই হবে এই ব্যবসাদারির পরিণতি। শুনতে পাও না চারিদিকে যে আমাদের শ্রমশক্তির অভাব; আমাদের expert নেই; technical men নেই; labour নেই; ধনবিজ্ঞানের মাথা নেই; কিছু নেই। কেন এই অভাব—এই এত বড় দেশে? কখনও কেউ এই অভাব দূর করার ব্যবস্থা কোরেছে? তোমরা নির্ভরযোগ্য লোক নিতে ব্যস্ত, কিন্তু নির্ভরশীল হোতে চেষ্টা

কোরেছো কোনো দিন? ব্যবসাদারিটা তোমাদের নগদ লাভের। তোমাদের দূরদৃষ্টি নেই। অথচ এই নগদ লাভের মোহেই হাতের পাঁচও একদিন যাবে।"

আত্মীয়টি উত্তর দিলেন না। কিন্তু একটু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন তা বুঝিলাম। কিন্তু আজ যুদ্ধের জন্য যে এত তাড়াতাড়ি technician, manager, organiserএর খোঁজ পড়িয়াছে ও চেষ্টা হইতেছে, সেটা যদি আগে শান্তির জন্য ও দুঃখ নিবারণের জন্য হইত তা হইলে আজ দেশ কতটা আগাইয়া যাইত। মনে মনে ভাবি এবং আত্মীয়টিকে বলি, বিলাত থেকে, মার্কিন থেকে সব পড়াশোনা কোরে আসছে ছেলেরা, কে তাদের বিদ্যাবুদ্ধির সদ্ব্যবহার কোরেছে বা কোরতে চেয়েছে? বিজ্ঞানের পণ্ডিত অনেক আছে—কে তাদের দেশের কাজের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্রতী কোরেছে? কেউ না। এখন অভিযোগ তোমাদের কিছু নাই, উপযুক্ত লোক কৈ? এ দেশের দুঃখ ঘুচবে কি করে? অথচ বড় বড় plan হচ্ছে; বড় বড় কথা উঠছে—এটা কোরবো, ওটা কোরবো; লোকের standard of livingকে আরো উঁচু করবো; এই সব। হাসি পায়। লিখতে পড়তে, বক্তৃতা করতে সমস্ত উত্তেজনা ও শক্তি ব্যয়িত হয়ে যায়, কাজের জন্য কিছু বাকী থাকে না। আমার সারাজীবনে এইরূপে কত চমৎকার বুদ্ধিমান ছেলে কর্ম্মের অভাবে যে নষ্ট হতে দেখেছি তা বলা যায় না। যে দেশে wasted talent এত অধিক, সে দেশের মঙ্গল নাই।

লর্ড ওয়াভেল বিলাত হইতে সুদীর্ঘ মন্ত্রণা করিয়া জানাইলেন, "এইবার কেন্দ্রে জাতীয় শাসনতন্ত্রের ভিত্তি গড়িতে হইবে। যদি ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলগুলি একটা আপোষ করিতে পারে, তবে এই কেন্দ্রীয় শাসন-মণ্ডলীকে All parties cabinet করা যাইবে।" সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী নেতাদের দিলেন মুক্তি। আর সব দলকেই বিশেষ করিয়া কংগ্রেস ও লীগকে সিমলাতে ডাকিলেন, এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য।

কংগ্রেস নেতারা প্রস্তুত ছিলেন। লীগনেতারাও যাইতে অসম্মত হইলেন না। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বেও তাঁহারা জানাইলেন যে, কোন অবস্থাতেই লীগের দাবী তাঁহারা ছাড়িবেন না। দাবী এই যে, কেন্দ্রীয় শাসন-মণ্ডলীতে হিন্দু-মুসলমান সমান সংখ্যাতে থাকিবেন; আর পাকিস্থান ভবিষ্যতে হইবেই, এই আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া চাই। সিমলাতে মাথা ঠাণ্ডা করিয়া দুইটি দল একটা আপোষের চেষ্টা যথাসাধ্য করিলেন—কিন্তু কোনো বিশেষ ফল হইল না। যখন কিছু হইল না, তখন লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করিলেন, "হতাশ হইবার কারণ নাই। Approach ঠিক মতই হইয়াছে। এই Approach বজায় থাকিলে, ভবিষ্যতে কিছু না কিছু হইবেই।"

কংগ্রেস নেতারা বলিলেন, "কিছু যে হইল না, তার জন্য দায়ী লীগ।" লীগ বলিলেন, "এই যে দুর্ঘটনা ঘটিল, ইহার জন্য দায়ী কংগ্রেস।"

আমার জানাশোনা সকলেই শুনিয়া হাসিল। হরনাথ আসিয়াছিল, বলিল, পুরাণো tactics হে। কিন্তু Congress গেল কেন সিমলাতে দৌড়ে, বুঝতে পারছি না এখনো।

বন্ধুবর মিত্রজা বলিলেন, "কিন্তু Congress নিজেকে Muslim Leagueএর প্রতিদ্বন্দ্বী না কোর্লেই আপনার মানটা রাখ্‌তে পারতো। বোল্‌লেই পারতেন গোড়ায়, যে আমরা হিন্দু-মুসলীম সমস্যাতে নেই। আমরা জাতীয় প্রতিষ্ঠান। যদি Leagueএর সহিত রফা করতে হয়, তবে হিন্দুসভাকে ডাকো, খৃষ্টান, পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়কে ডাকো। আমরা সাম্প্রদায়িক নই। একটা সম্প্রদায়ও নই। কিন্তু শক্তি ও শাসনের লোভ বা ঝোঁক এত বেশী যে, এই নিজের মান অপমানের খেয়ালটাও রইল না।"

সত্যই তো। এমনি Congress আর League যত কিছু শলা-পরামর্শই করুক, non-officially, তাতে দোষ নাই। কিন্তু এইরূপ একটা প্রকাশ্য ব্যাপারে Congress আপনাকে নীচু নাই বা করিত।

হরনাথ কহিল, "আজ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কার্য্যধারার কোনোও হদিস আমি পাই নি বাবু। ও নিয়ে আর আলোচনাও কোরতে পারি না। আলোচনার একটা consistent বিষয়-বস্তু থাকা চাই। সেটা এক্ষেত্রে খুঁজে পাই না।"

মিত্রজা বলিলেন, "না পাওয়াটাই যে সব চেয়ে বিব্রত কোরেছে আমাদের। ভালো হোক্ মন্দ হোক্, দেশের লোকের মনকে বেশীর ভাগই কংগ্রেস নানা কৌশলে অধিকার কোরেছে। দুই চারটে বড় বড় ও গরম গরম কথাতে ছেলেমেয়েদের চট্ কোরে উত্তেজিত কোরে তুল্‌তে পারে। কংগ্রেসের কর্ম্মী না থাকুক, উৎসাহী লোক অনেক আছে। তাই কংগ্রেস যদি ঠিক কি চায়—তা না জানাতে পারে, ও তার কার্য্যপদ্ধতির সহিত তার লক্ষ্যের আপাতদৃষ্ট একটা সামঞ্জস্য ও সম্বন্ধ না থাকে, তবে লোকের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস-সেবাটা হবে tragic ব্যাপার।"

মনে পড়িল, এই কয় বৎসর তাহাই হইতেছে। একটা ট্রাজেডিই চলিয়াছে দেশবাসীকে মত্ত করিয়া। কত ভালো ছেলে, উৎসাহী কর্ম্মী এই কয় বৎসরে নষ্ট হইয়াছে, তাহার হিসাব কি রাখিয়াছেন নেতারা? বলিলাম, তাঁরা হয় তো বোল্‌বেন, স্বাধীনতা হবেই—তা' ঠিক স্থির হোয়ে গেছে? কবে হবে? স্বাধীনতা পেলেই বা কি হবে? স্বাধীনতা লাভের পর কি এ পথেই চল্‌তে হবে, না পথ বদ্‌লাবে? কিছুই জানা নাই। তবু একটা ভাবের স্রোতে দেশটা চলেছে। প্রত্যয় হয় তো আছে—একটা উদ্দেশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্য বিষয়ে জ্ঞানের অভাবটা অত্যন্ত বেশী।"

উমা আসিয়া বলিল "জ্যাঠামশাই, হয় অন্য আলোচনা করুন, না হয় চলুন কোথাও বেড়াতে। না হয় সিনেমাতে।" হরনাথ কহিল, "উত্তম প্রস্তাব।"

দয়ালও আসিয়াছিল; বলিল, "সিনেমাতে? ছবি দেখতে?

উদয়ের পথে না অস্তের অপথে? কি যেন দেখ তোমরা ছবিতে—তা' বুঝতেই পারি না।"

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? তুমি দেখ না?"

দয়াল মাথা নাড়িয়া জানাইল, "একদম না। শুধু ট্রাম বাসে যাবার সময় দেওয়ালে লেখা বই ও তার নাম, আর আঁকা ছবিগুলো দেখি। তাই যথেষ্ট।"

উমা মন্তব্য করিল, "রং-এর দালালের পক্ষে যথেষ্ট বটে।"

দয়াল বলিল, "ছেলেবেলাতে স্কুলে প্রবন্ধ লিখতে দিত, সিনেমার ফল কি? এখন হোলে লিখতে পারতুম।"

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কি লিখতে?"

দয়াল উমার দিকে চাহিয়া কহিল, "কাননবালা সি্পার; কাননবালা টিপ; মানে-না-মানা সাড়ি; যমুনা-ব্লাউজ; স্নেহপ্রভা পাউডার; এই রকম, একটা মস্তবড় list কোরে দিতুম। আর কিছু লেখবার প্রয়োজন হোতো না।"

প্যালেষ্টাইন সমস্যা

শ্রীনগেন্দ্র দত্ত

প্যালেষ্টাইনকে লইয়া যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাহা ক্রমশঃই জটিল হইয়া উঠিয়াছে। বেভিন সাহেব একদম নাজেহাল হইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দরজায় ধর্ণা দিবেন স্থির করিয়াছেন। ভাবটা এই যে, সমস্যাটা ওখানে গেলেই সমাধান হইবে। বিশ্ববাসীকেও বুঝানো গেল যে, প্যালেষ্টাইন সমস্যা আমাদের ঘরোয়া সমস্যা আর রহিল না, যাহা কিছু ঠেলিয়া সম্মিলিত রাষ্ট্রের দরবারে ফেলিয়া দিলাম এবার বুঝিয়া নাও। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ কূটনীতির হাত হইতে কোন বস্তু বুঝিয়া লওয়া কি এতই সহজ? ব্রিটিশ জাতি কূটনীতি পরিচালনা করিয়া ও অন্যের পরিচালিত কূটনীতির সার মর্ম্ম বুঝিয়া অভ্যস্ত। এই অভ্যস্ত পাকা মন লইয়া যে সমস্যা সে সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে। বেচারী ইহুদী এই ব্রিটিশ জাতির কথায় আস্থা রাখিয়া প্যালেষ্টাইনে জাতীয় ঘর বাঁধিতে ছুটিয়াছে। অবস্থা যখন জটিল হইয়া উঠিয়াছে তখন আবার ব্রিটিশ জাতিই বৃহত্তর আরবরাষ্ট্র গঠন করিবার পরিকল্পনা আরব জাতির মনে উস্কাইয়া দিয়া ভাল মানুষ সাজিবার চেষ্টা করিয়াছে। কথা উঠিতে পারে, মধ্যপ্রাচ্যে অটোমান সাম্রাজ্য বিভাগ করিবার পর হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের এছাড়া অন্য কোন নীতি অবলম্বন করিবার মত ছিল না। গত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে জিতিয়া অবধি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিপদ হইয়াছে, তাহারা ভাগ করিয়া যাহা পাইয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে গিয়া ইতালীর সহিত ফরাসীর মনোমালিন্য ঘটিল। মনে হয় ইতালী সেই রাগেই মুসোলিনীর মত নেতাকে বাছিয়া লইয়া জাতক্রোধ সামলাইতে না পারিয়া পররাজ্য দখলে ব্রতী হইল। ফরাসী অবশ্য সিরিয়ার উপর দিয়া মনের আক্রোশ মিটাইল এবং মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশের চক্ষুশূল হইয়া রহিল। গত প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর গোটা মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা হইল একটা বৃহৎ জীর্ণ পরিবারের মত; পরিজনেরা নিজেরা যখন ভাগ-বাঁটোয়ারা ছাড়া মীমাংসা নাই স্থির করিল তখন বাইরের লোক ডাকিল ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য। বাইরের লোকও ভাগটা যেন শতধা হয় তার জন্য যত্নসহকারে চেষ্টা করিল। বাইরের লোকের চেষ্টা যে সফল হইল তার প্রমাণ সৌদি-আরব, ইরাক, ট্রান্সজোর্ডান, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া ইত্যাদি সব ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠিত হইল। ইহা মনে করিলে ইতিহাসের অপব্যাখ্যা হইবে, যদি কেউ মনে করেন যে এই সমস্ত রাষ্ট্রের অধিকাংশ অধিবাসীরা ইসলামধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাদের মধ্যে একতা ছিল। কিম্বা ইসলাম বিপন্ন বলিয়া একে অন্যের সাহায্যে সব কিছুই অকাতরে দান করিত। মরুভূমির দেশে শক্তিমানরা প্রথম অগণিত গণসাধারণের ওপর প্রভুত্ব সুরু করিল, শক্তিমানদের উপর প্রভুত্ব করিল—সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে; এই বুদ্ধি ও কৌশলের শৃঙ্খল গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে এতদিন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। মূলতঃ প্যালেষ্টাইন সমস্যা সেই কূটনীতি-প্রসূত ব্যাপক বন্ধনের একটি অংশ মাত্র। আজিকার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার বিচার করিতে গেলে বিষয়টির প্রতি পুরাপুরি সুবিচার হইবে না।

প্যালেষ্টাইনের বর্ত্তমান সমস্যা গোড়া পত্তন হইয়াছে গত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়। ব্যালফোর সাহেব ঘোষণা করিয়া ইহুদীদের নূতন বাড়ির ব্যবস্থা করিলেন বটে, কিন্তু সে বাড়ীতে ইতিমধ্যেই যাহারা বাস করিতেছে তাহাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা হইল না। যেহেতু তাহারা অর্থাৎ আরবেরা জাতি হিসাবে অনুন্নত, সেই হেতুই হয়ত ব্যালফোর সাহেব ঐদিকটা ভাবিতে রাজি হন নাই। কিন্তু যুদ্ধ ত শুধু শক্তিরই নব নব বিকাশ নহে, পরন্তু মনেরও বিকাশ বটে। গত প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর হইতে আবার জাতির মধ্যে সাড়া জাগিল, কিন্তু তাহারা সহসা সংহত হইতে পারিল না। এদিকে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদীরা খণ্ড ছিন্ন আরব রাষ্ট্রকে একটা আরব যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য অগ্রহশীল হইলেন; তার কারণ বোধ হয় দুই হইতে পারে। (১) আরব সংহতির পিছনে যদি ব্রিটিশ নীতি খুব সক্রিয় হয় তবে তুর্কীর পক্ষে নূতন করিয়া শুধু ধর্ম্মের নামে পুনর্গঠন সম্ভব হইবে না। (২) আবার সেই আরব সংহতি হয়ত ফরাসীর পক্ষেও মধ্যপ্রাচ্যে বাধাস্বরূপ হইতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এক পক্ষে মাত্র বাধা সৃষ্টি করিতে

সক্ষম হইয়াছিল। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত (Imperial Air Route) অর্থাৎ সাম্রাজ্যিক বিমান পথটি নিখুঁত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং ফরাসীকেও বহু দূরে ঠেলিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর হইতে নূতন সমস্যা দেখা দিল। যে আরব যুক্তরাষ্ট্রচনা ব্রিটিশ কূটনীতির একটি অঙ্গ বলিয়া মধ্যপ্রাচ্যে বিবেচিত হইত তাহা যুদ্ধের ঘূর্ণীতে পড়িয়া অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে এক বিরাট সংহতি শুধু আরব জাতিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। তাহাতে ধর্ম্মও ইন্ধন যোগাইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, তুর্কী আরব যুক্তরাষ্ট্র আন্দোলন সমর্থন করিতেছে। ফলে আরবদের শক্তি দামা বাঁধিতেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ফরাসী বড় সমস্যা নহে, যদি সত্যিই তুর্কী আরব সংহতি আন্দোলনকে পুরাপুরি সমর্থন করে তবে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি নূতন খাতে চলিতে সুরু করিবে। সেখানে ধর্ম্মের বন্ধন ছাড়া অন্য কোন বন্ধন নাই, তুর্কীরা ও আরবরা দুই ভিন্ন গোষ্ঠী। গোষ্ঠী তত্ত্বের বিচারে তাহারা যতই বিভিন্ন হউক্ না কেন, ধর্ম্ম এখানে সেতুর মত কাজ করিবে এবং দুয়ের মিলন ঘটাইবার চেষ্টা করিবে। গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়িয়া আজ একটি ইসলাম সংহতির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। কোন কোন দুঃসাহসিক এইরূপও চিন্তা করিয়া থাকেন যে, কনস্তান্তিনোপল হইতে সুরু করিয়া গোটা মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার একটা বিশেষ অংশ, ভারতের একটি অংশ ও ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি লইয়া এক বিরাট ইসলাম সাম্রাজ্য গঠন করা যাইতে পারে। যদি ইসলাম আজ নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে তবে অদূর ভবিষ্যতে তাহার কাছে পাশ্চাত্যের বহু বাধা, বাধা বলিয়াই মনে হইবে না। ইহা অবশ্য এক শ্রেণীর লোক মনে করে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কি ঘটিতেছে? মধ্যপ্রাচ্য হইতে ফরাসী হাত গুটাইবার পরই মার্কিণরা এক-পা দু-পা করিয়া আগাইতেছে। মার্কিণরা তাদের ধনবল মধ্যপ্রাচ্যে প্রয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এবং সেই সিদ্ধান্তানুযায়ী তাহারা প্যালেষ্টাইন সমস্যা একটি বিশেষ রূপ দিয়া দেখিতে শিখিয়াছে। আমেরিকায় অবশ্য অনেক ঝানু 'জাওনিষ্ট' (Zionist) আন্দোলনের কর্ত্তা আছেন। তাহারা মার্কিণ সরকারের বড়কর্ত্তাদের আভ্যন্তরীণ মহলের কিছু না কিছু খবর রাখেন এবং তাহারা স্পষ্টই বুঝিতেছেন যে মার্কিণ সরকারের প্যালেষ্টাইন নীতি ইহুদীদের জাতীয় আবাস-ভূমি সৃষ্টি করিবার জন্য তেমন ব্যাকুল নহে, তবে কি কারণে এই দরদের অভিব্যক্তি ঘটিতেছে? দুষ্ট লোকেরা খবর যোগাইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ও ইবন সৌদের মধ্যে পত্রালাপ চলিতেছে। এই পত্রালাপের উদ্দেশ্য কি, তাহা জাওনিষ্ট আন্দোলনের নেতারা আজ অনেকটা ঠাহর করিতে পারিয়াছেন। চোরকে চুরি করিতে শিখাইয়া এবং গৃহস্থকে সজাগ থাকিবার উপদেশ দিয়া মার্কিণরা মধ্যপ্রাচ্য ও প্যালেষ্টাইন সমস্যায় হাত দিয়াছে। মার্কিনদের এই নীতি গ্রহণ করিবার প্রথম কারণ হইল, মধ্যপ্রাচ্যে তৈল সম্পদ। দ্বিতীয় কারণ, রুশ প্রভাবকে মধ্যপ্রাচ্যে বাধা দিতে হইলে, এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি অনুরূপ করিতে পারে যে আপৎকালে মার্কিণরা তাহাদের সাহায্যে আসিবে। সেই আশায় কিছু কিছু ঋণ দান মার্কিণ মধ্যপ্রাচ্যে করিয়াছে। ইবন সৌদ ঋণ গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বাঁধা পড়িবে দেশের তৈল সম্পদ। এ অবস্থায় মার্কিণরা প্যালেষ্টাইন সমস্যা লইয়া বিশেষ অত্যাধিক নাও করিতে পারে। কেননা তাহাতে সেই আরব সংহতি ও ধর্ম্ম দুই-ই সমস্যারূপে দেখা দিবে। প্যালেষ্টাইন সমস্যা যদিও সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তবুও সমস্যার আশু সমাধান যে সেখানে হইবে এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে একটি বিষয় ভাবিবার আছে, সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে সমস্যা পেশ করিবার পর রুশরা হয়ত একটা মতামত দিবার সুযোগ পাইবে এবং সেই সুযোগে তাহাদের মনের যত ক্রোধ আছে তাহা ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিবর্গের ঘাড়ে চাপাইবে। এমন কূটনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হইতে পারে, যাতে রুশরাও শেষ পর্য্যন্ত নিজ স্বার্থ বুঝিয়া চুপ করিয়া যাইবে। কেমনা, মার্কিণ ঋণের জন্য রুশদেরও কিছু কিছু আগ্রহ আছে, এমন জনশ্রুতি আছে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে প্যালেষ্টাইন সমস্যা জটিল হওয়া ছাড়া আর কিছু হইবেনা, এ অবস্থায় আরব ও ইহুদীরা যদি একবার নিজেদের বিষয়টা ভাবিত, দেখিত, তবে অনেক সুরাহা হইত।

মস্কো সম্মেলন

মস্কো সম্মেলন একটু সাধারণ পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন হইতে অন্য প্রকৃতির। কারণ ইহা মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির একটি নূতন অধ্যায় রচনা করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। কার্ডেল হাল হইতে সুরু করিয়া বার্নে'স পর্য্যন্ত যে পররাষ্ট্রনীতি মার্কিণরা পরিচালনা করিয়া আসিতেছিল তাহা আজ অনাবশ্যক বিধায় পরিত্যক্ত হইতেছে ইহা মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির নূতন দিক। সাধারণতন্ত্র ও গণতন্ত্রবাদীরা এতদিন একে অন্যের রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া আসিয়াছে, এবং বহুদিন যাবৎ একে অন্যের প্রতি সহজ দৃষ্টি লইয়া তাকাইতে পর্য্যন্ত পারে নাই। আজ সবারই মনে এই প্রশ্ন উদয় হইবে, কেমন করিয়া পরস্পর অসহযোগী মত একটা কার্যকরী মত হিসাবে উভয়েই গ্রহণ করিল? আমরা বলিব, অবশ্যই ইহা ঘটে। ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের কোন হাত নাই। পারিপার্শ্বিক ঘটনাই আজ মার্কিণ জাতিকে বিনাবাধায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনিবার্য্য অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। মার্কিণ জাতি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক সেই দুর্জ্জয়ের জয়মালা পরিধান করিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে, ইহাতে তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। বরং অনেকটা লাভ-ই হইয়াছে, গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র দুইয়ে মিলিয়া দ্বি-পক্ষ ধারালো নীতি গ্রহণ করিয়াছে। বেচারী ওয়েলেস্-ই এই নীতির অবশ্যম্ভাবী দুষ্ট প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে আসল সমস্যার কোন অংশও স্পর্শ করে নাই বা কোন ব্যাপক প্রতিক্রিয়াও মার্কিণ জাতির মধ্যে দেখা দেয় নাই।

এমন কথা উঠিতে পারে, এই দুই [illegible]গুলো বিশেষ পররাষ্ট্র নীতি কি? আজিকার যুদ্ধোত্তর বিশ্বে [illegible] পররাষ্ট্র নীতির এমন কি নূতন পরিবর্তন দেখা দিল যাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবার কারণ ঘটিয়াছে। সাধারণতন্ত্রীরা বরাবরই পররাষ্ট্রনীতিতে নিঃসঙ্গবাদী। লাতিন আমেরিকা ছাড়া তাহারা বড় কোথায় একটা সংবাদ হয় তাহা পছন্দ করিতেন না। পক্ষান্তরে লাতিন আমেরিকার ওপর আবার বাইরের কাহারও প্রভুত্ব যাড়ে তাহাও পছন্দ করিতেন না। ফলে উভয় পক্ষেই একটা সন্দেহবাদ, তাহাদের পরিচালিত পররাষ্ট্রনীতিতে বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য যে, গণতন্ত্রবাদীরা এতটা নিঃসঙ্গবাদী ছিলেন না। সে যাহাই হউক, মার্কিণ জাতির ধনপতিরা সাধারণতন্ত্রীদের মাসতুতো ভাই, ধনের কারণেই তাহারা সাধারণতন্ত্রীদের ওপর চাপ দিতেছে। এবার হইতে নিঃসঙ্গবাদ পররাষ্ট্রনীতির আদর্শ হইবে না। যদি হয় তবে সঞ্চিত অর্থের চাপে মারা পড়িবার সম্ভাবনা আছে। অতএব ভগ্নাবশেষ য়ুরোপকে গড়িতে হইবে, নব্য য়ুরোপের ইমারৎ গড়িবার পক্ষে যে মালমশলার প্রয়োজন তাহা মার্কিনদের হাতে। সাধারণতন্ত্রীরা আজ আগোল ভাঙ্গিয়া নূতন ধনের বিনিয়োগ করিতে ছুটিয়াছে য়ুরোপ ও এশিয়া, তাহার সঙ্গে একটা ঘরোয়া আপোষ করিয়া গণতন্ত্রবাদীদেরও টানিয়া লইয়াছে। বেচারী মার্কিণ জাতির গণতন্ত্র ভারি ফাঁসাদে পড়িয়াছে। ভাবিল, দেশে যখন শ্রমিক আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে তখন আর রক্ষা নাই; গণতন্ত্রের আসল রূপ ধরা পড়িয়াছে। তার চাইতে ক্ষাত্রশক্তির নিরাপদ ছায়ায় গণতন্ত্রের মহৎ বুলি য়ুরোপও এশিয়ায় আওড়াইব। কিন্তু রাশিয়ার ভয় দেখাইয়া দিয়াছে সাধারণতন্ত্রবাদীরা। তাই আজ মার্কিনজাতির গণতন্ত্রবাদীরা দ্বিধাবিভক্তকণ্ঠে পূর্ব ও পশ্চিমী গণতন্ত্র বলিয়া দুইটা রূপ গণতন্ত্রের ধার্য্য করিয়াছে। কার্য্যত এই দুই রূপবিশিষ্ট গণতন্ত্রের সন্ধান আজ য়ুরোপে মিলিতেছে।

সোভিয়েট অধ্যুষিত অঞ্চল এক জাতীয় গণতন্ত্রের স্বাদ পাইয়াছে। ইঙ্গ-মার্কিণ অধ্যুষিত অঞ্চল আর এক জাতীয় গণতন্ত্রের স্বাদ পাইয়াছে। মার্কিনরা ব্রিটেনের হাঁড়ির খবর রাখে। একটি ঋণ দিয়া ব্রিটেনের অতিবড় প্রগতিমূলক কথাবার্তা বা চিন্তাধারার ওপর রাহুর ছায়া ফেলিয়াছে। ব্রিটেন আত্মরক্ষার দায়ে ঋণ গ্রহণ করিয়া সবংশে মজিয়াছে। যাক সে অন্য কথা, আমরা ধরিয়া লইতে পারি ইঙ্গ-মার্কিণ অঞ্চলকে একজাতীয় গণতন্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। সেখানে জার্মাণীর অতি দুর্ধর্ষ জাঙ্কারদের স্থান আছে।

মস্কো সম্মেলনকে আসলে সম্মেলন না বলিয়া শক্তিবর্গের অপকর্মের বিচারশালা বলাই ভাল। ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে সম্মেলনে জার্মাণী বা অষ্ট্রিয়ার ভাগ্যে যাহা থাকুক তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না; কিন্তু অন্তর্বিরোধ ক্রমশই সীমাবদ্ধ গণ্ডী পার হইয়া তাহার বক্ষ বিস্তার করিতেছে। কে জানে এই বিরোধকে ঠেকাইবার জন্যই মস্কো সম্মেলন, না বিরোধকে থিতাইয়া রাখিবার জন্য এই সম্মেলন! তবে একটি বিষয় ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—সোভিয়েট ও ইঙ্গ-মার্কিণ সঙ্কটকালীন সহৃদয়তা আজ আর নাই। সম্ভবত চেষ্টা করিলেও আর ফিরাইয়া আনা সম্ভব কিনা বলা মুস্কিল। আণুবিক বোমার আবির্ভাব মিত্রপক্ষের মৈত্রীর কাল হইয়াছে।

রূপান্তরিতা

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ক্লান্ত মধ্যাহ্ন! দুর্গাপূজা চলে গিয়েছে দিনকয়েক হ'ল! সারা আকাশ বাতাসে…সজল ধরণীর বুকে বাজছে তখনও বিজয়ার এক করুণ সুর! খিড়কীর পুকুরটায় অনেকগুলো শাপুক ফুল ফুটে রয়েছে …ওপাড়াটায় কয়েকটা হাঁস একপায়ে দাঁড়িয়ে…চোখবুজে দিবানিদ্রা দিচ্ছে!

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ…সবুজ বাঁশবনটার ভেতর থেকে একটা ঘুঘু করুণ একটানা সুরে ডেকে উদাস মধ্যাহ্নকে করে তুলেছে ব্যথাতুর।

মা মেজের উপর শুয়ে আছেন—ঘুম তখনও আসেনি।

"ওরে প্রতিমা…মহীন আবার কবে আসবে টাসবে বলে গ্যাছে কিছু?"

দাদার রুমালটায় সুতো তুলতে তুলতে প্রতিমা জবাব দেয়—"আমি কি জানি! কে কবে আসবে না আসবে!"

মা বিরক্তি ভরে ওপাশ ফিরে শোয়! কিছুক্ষণ পর সুরু হয় নাসিকা-গর্জন মৃদু মন্দ স্বরে!

একলা মন টেঁকে না প্রতিমার! উপরে দাদার ঘরে যাচ্ছে…কার কণ্ঠস্বর শুনে সিঁড়িতেই দাঁড়াল! দেখে সে ঘরে দাদা শুয়ে রয়েছে, আর বাইরে জানলার ঠিক সামনা সামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে রমা। চাপাকণ্ঠে সে বলে চলেছে…

—"তুমি ত চিঠিই দাও না—গাঁ থেকে গেলেই আমার কথা ভুলে যাও!"

ধীরেন বলে ওঠে—"তোকে চিঠি দিয়ে কি বিপদে পড়ব! কার হাতে না কার হাতে পড়বে শেষকালে—! আমি কি আর ভুলতে

পারি রে তোর কথা ! হ্যাঁ শুনলাম নাকি তোর বিয়ে হচ্ছে ! সত্যি কথা ?"

ডাগর চোখ দুটো রমার টল টল করে ওঠে—এক অজানা ব্যথাভারে, গরীবের মেয়ে—বিনা পণে কে নেবে ! তবুও ধীরেন তাকে খোঁচা দিয়ে একটু তৃপ্তি অনুভব করতে ছাড়ে না ! চুপ করে থাকে রমা !

—"এই দেখ—কেঁদে ফেললে—দূর, এত ছেলেমানুষ তুই !"

দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদের সুরে রমা বলে ওঠে—"সত্যি কথা ! দেখতে এসেছিল সেদিন হরিরামপুর থেকে।"

—"যাচ্ছিস কেন, শোন শোন ! এই রমা !"

রমা তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে আসে।

প্রতিমাও নীচে নামতে থাকে…কিন্তু পারে না. সিঁড়িতেই রমার সঙ্গে দেখা হয় ! সে আমতা আমতা করতে থাকে…বিনয়কে খুঁজতে এসেছিলাম…তা তুই ত নীচে কাকিমার কাছে ঘুমুচ্ছিলি…তাই…"

হাত ধরে টানতে টানতে প্রতিমা বলে…"চল, পাড়া বিন্তী খেলা যাক্ গে ! বাসরে দুপুরটা কাটতেই চায় না !"

প্রতিমার কণ্ঠস্বর শুনে ধীরেন সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়—যেন গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন।

কাদাসোলের খুড়ি পা মেলে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন—"বুঝেছ ধীরেনের মা…কলকাতায় যুদ্ধ লেগেছে কিনা…জিনিষপত্তরের দাম আগুন ! আমার ভোবনের শাশুড়ী বলেছে কি জান…বেয়ান ঠাকরুণকে বলো—এবার যেন খরচা করে শীতের তত্ত্ব আর না করে—জিনিষপত্তর যে মাগ্যি ! ধানের দর টাকায় ৭ পাই ! কি করেই বা দিন চলে ! তা ধীরেনের বলতে নাই মাইনে অনেকগুলি…বেশ তত্ত্ব করেছে !"

প্রতিমা বসে ছিল একধারে। ঘুরে ফিরে সেই তত্ত্বের কথা উঠতে সে চলে যায়। খুড়ির রোগা ছেলেটা বিকট শব্দে কেঁদে চলেছে।

খুড়ি সান্ত্বনার সুরে বলেন—"কি—লেবু লিবি ! ঐযে দিদি দিচ্ছে ! দে'ত প্রতিমা এককোয়া লেবু—রোগা ছেলেটা মুখের খোয়াদ ত ভাল নাই !"

পদ্মপিসী—লক্ষ্মীদিদি—খুড়ি আরও অনেকে তত্ত্ব দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

"বেশ দিয়েছে ধীরেন। শাল পাঞ্জাবীর দামই ত অনেক—তাছাড়া অন্য জিনিষও আছে…তাও ধর…" হিসাব করতে থাকেন তাঁরা।

"মহীনের শ্বশুর বাড়ীর তত্ত্ব গো"—

বাড়ীর মেয়ে—বৌ-রা তত্ত্ব দেখলেন।…ছোটবৌ সাত ভরির আড়াই প্যাঁচটাকে বারকতক পাকদিয়ে বলবিছে হারগাছটা ঠিক করে নিয়ে বলে ওঠেন…

"ঐ হয়েছে একরকম…যেমন ছিরি ! শালটা থ্যাস্ থ্যাস্ করছে। পাঞ্জাবীটারও রং তেমন ভাল নয় ! কাপড়ও অনেক পুরু !"

কালো বাগ্দী সাহসে ভর করে বলে ওঠে—"আমাদের বউমা কেমন আছেন গো—"

ক্ষ্যান্তা-ঝি বলে ওঠে…"বড়মায়ের জ্বর এই পাঁচদিন…খুব জ্বর। তা নইলে তোমাদের এ কেচ্ছা দেখতেন বৈকি !"

কালো চুপ করে যায়।

লাঠি ঠুকতে ঠুকতে মেজবাবু ঢোকেন !…বৌরা আড়ালে চলে যায়। রুদ্রাক্ষের মালাটা গলায় ঝুলছে…বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গিয়েছেন। কালোর প্রণাম করতে বলে উঠলেন—"সব ভাল ত রে ! সেবার ত বেয়ান ঠাকরুণ সস্তায় কিস্তিমাৎ করেছেন, দেখি এবার কি খেল এনেছ !"…

…তারপর !…তারপর আর না বলাই ভাল !

মা চোখের জল মোছেন। পাড়ার মেয়ে-মহলে হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছে। "আমারই পোড়া বরাত ধীরু ! ছোট মেয়ের তত্ত্ব…কর্তা থাকলে কি ফেরৎ আসত ?"

ধীরু বলে ওঠে—"জমিদার ! বড় চাল দেখান হয় ! ফেরৎ দিয়েছে বয়ে গ্যাছে।"

কালো বলে চলেছে—"মাঠাকরুণ আপনার বেয়ানের জ্বর…তিনি এ কথা জানেন না গো—সেই দাড়িয়াল বুড়োই ত বলে যা তোরা তত্ত্ব ফিরিয়ে নিয়ে যা—"

ক্রমশঃ বেলা পড়ে আসছে। উঠানে মেয়েদের ভিড় কমে আসে—মা চোখ মুছতে থাকেন।

"তেলে জলে কখনও মিশ খায়না মা ! তখনই বলেছিলাম ওদের ঘরে—"

বাধা দিয়ে মা বলে ওঠেন…"ধীরু তুই আর শিখোস না আমাকে ! ঐ বুড়োই ত যত নষ্টের গোড়া,নইলে আমার বেয়ান ঠাকরুণ মাটির মানুষ !"

—"ঐ আশাতেই থাক আর কি ! সব সমান ! তত্ত্ব ফেরৎ পাঠিয়ে অপমান করার কি দরকার ছিল ? ওদের বাড়ীর তত্ত্ব এলে ঠিক এমনি করে ফেরৎ দোব !…এমন কিছু খোসামুদি করবার দরকার নাই।"

…"তারা প্রতিমাকে নিয়ে যাবে লিখেছে"…

ধীরেন বলে চলে…"তাদের বৌ নিয়ে যাবে তারা…পাঠাতে হবে বৈ কি !"…

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে পল্লীর বুকে…ঘরে ঘরে জ্বলছে সন্ধ্যাদীপ…পক্ষ নির্ম্মল…সুনীল আকাশের গায়ে ফুটে উঠেছে তারকা-রাজি…বিষাদমাখা নয়নে তারা চেয়ে আছে গ্রামের দিকে…মাতাপুত্রের মনে পড়ে বিগত দিনের কথা—মায়ের বুক দীর্ণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

…বার হয়ে আসছে ধীরেন…বাধা পায় সদর দরজার কাছে।…

"ধীরুদা…ছোটখোকার জ্বর…রমণ ডাক্তারের ভিজিট…আর ওষুধের দাম …পাঁচটাকা—হাতে খুচরো"—

পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে ধীরু রমার হাতে তুলে দ্যায়।

…"একি ! সব নিয়ে আমি কি করব ?"

"সিকি আধুলী আছে…দেখে নিয়ে—বাকীটা কাল ফেরৎ দিবি…" গম্ভীর মূর্ত্তি দেখে রমা কথা বাড়াতে সাহস করে না।

…দিন ঘনিয়ে আসে ! প্রতিমার গোপালনগর যাবার দিন ! বিনয় পেঁপে গাছটায় আঁকশি লাগিয়ে টানাটানি করে…বেশ বড় একটা পেঁপে সবে লাল রং ধরেছে…পাড়তে পারছে না কিছুতেই !

—"ও ছোড়দি দেনা ভাই ! নাগাল পাচ্ছি না !"

প্রতিমা কথাই কয় না ! একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তার দিকে ! চঞ্চল ছোট ভাইটী…মা…বিনয়…রমা…দাদা…চাঁপা…এদিকে ছেড়ে কোথায় যাবে—কাউকে সেখানে চেনে না।…বিনয় বিরক্ত হয়ে যায় ! ডেকে ডেকে সাড়া পায় না।

"দিদিটা যেন কি ! শ্বশুর বাড়ী যাবে কিনা…গরবে পা পড়ে না"…মনে মনে গজরাতে থাকে বিনয় !…"এই ছোড়দি…" দুবার ধাক্কা দিতেও ছোড়দি আগেকার মত মারামারি করতে যায় না। বিনয় একটু অবাক হয়ে যায়।

…"ভাল ভাবে থাকবি বাছা…শাশুড়ী খুড়শাশুড়ীরা যা বলবে মন দিয়ে শুনবি…বুঝেছিস। তবেই ত ভাল বলবে…"

সাদা বিড়ালটা পায়ের কাছে বসে আছে। অন্যদিন তাকে কোলে তুলে নিয়ে কত আদর করত প্রতিমা…আজ জোরে এক লাথি মারতে…প্রতিমার দিকে একবার চেয়ে সে পালিয়ে যায় !

"ওরে চিঁড়ে ভিজে খেতে হয় মা…চাট্টি লক্ষণ করে মুখে দে"…চোখের জলে…ঠোঁট ফুলে উঠেছে।…"ছি কাঁদতে আছে ?"

"ধীরু আবার শীঘ্র গিয়ে আনবে।"

"শীঘ্র আনবে মা, ওখানে থাকতে পারব না বেশী দিন।"

তার চোখের জল বাধা মানে না…বাবার ফটোখানার সামনে প্রণাম করতে গিয়ে…মাও কেঁদে ফেলেন…ধীরু তাড়াতাড়ি বাহির হয়ে যায় ঘর থেকে…তার চোখও স্বর্গগত পিতার স্মৃতিভারে অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

বাগানটা…তালবনের তালগাছগুলো…লাল মাটীর ডাঙ্গাটার উপর গ্রামখানা…উঁচু বাঁশগাছটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঐ ছাতিম গাছটার তলায়, চাঁপা…রমা…শান্তির সঙ্গে সে কত খেলা করেছে—ঐ বটগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে বিনয় বোধহয়।…চোখের জল অঝোরে ঝরে পড়ে তার গণ্ডদেশ বয়ে—গ্রামখানা…খেলার সাথীরা—বিনয়—ঐ ষষ্ঠীবটগাছটা—তাকে শত বাহু মিলে টানছে তার উদার বক্ষের দিকে…সে আজ নির্ব্বাসিতা এখানে কবে ফিরবে জানে না।…ফুলে ফুলে কেঁদে ওঠে সে।…

"বৌমা…ও বৌমা…তোমার মা কি বাছা আঁতুড়ে চোখে কাজল দেয়নি ? চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়েচ—অহীন তোমার সামনে দিয়ে চলে গেল…আর তুমি বাছা ভাসুরকে দেখে মাথায় কাপড় দিলে না—ভ্যালা আক্কেল তোমার ?"

—সেজ শাশুড়ী ধমকে উঠেন—

প্রতিমা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে।

"আমি জানতাম না জ্যেঠিমা।"

ক্যান্তঝির ডাকে প্রতিমা পিছু ফিরল।

"সেজমার ছেলেটাকে একটু সামলাও বৌদি—কিছুতেই বাগ মানছে না।…তোমার কাছে বেশ থাকে।…তোমার নামে সেজমা কত কি লাগাচ্ছিল বৌদি—ঐ সেজবাবুর কাছে…বলছিল তুমি নাকি।…

…সেজমাকে আসতে দেখে…ক্যান্ত চলে গেল। সেজ শাশুড়ীর মেয়ে সুরমা এসে বসল পাশে।

"বৌদি—চল উপরে দেখবে—কাছারী-বাড়ীতে আজ লাঠি খেলা হবে—আমাদের ঐ ঘর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। তুমি—আমি—শৈলদি, ব্যাস আর কেউ না।"

…সেজশ্বশুরের নজরে এড়ায় না…কাছারীর উঠান থেকে বাড়ীর মেয়েছেলেদের জানালায় দেখে তিনি ত রেগে অগ্নিশর্ম্মা…

"বুঝেছ বড়বৌ…তোমাদের ঐ গেঁয়োগাঁয়ের বৌমাকে বলে দিও যে এটা তার বাপের বাড়ী নয়—গোপালনগরের চাটুয্যেদের বাড়ী…লোকের সামনে নিজেকে জাহির করা এখানে থেকে চলবেনা।

মহিনের মা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে "ঠাকুরপো…আমি বলে দিয়েছি ওকে…আর ছোট মেয়ে…বয়স হলে সব বুঝবে…"

…প্রতিমা সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে, নিজেকে সামলাতে পারে না। মায়ের মুখ মনে পড়তে সে আরও বিচলিত হয়ে যায়।…

বৌমা…অত সাঁতার কাটা কি ভাল বাছা !…কেউ দেখতে পাবে। পাঁচিল ঘেরা খিড়কীর পুকুরঘাটে প্রতিমা স্নান করতে যায়। সেজশাশুড়ীর মেয়ে সুরমা, শৈলী আর সে বেশ পুরোদমে স্নান করে চলেছে…

শৈলী বুড়ো মেয়ের মত বলে ওঠে…"বৌদি তুমি ওঠ, নইলে আমি চললাম গিয়ে মাকে বলছি…"

গিয়ে বলতে আর হ'ল না। মেজ-শাশুড়ী স্বয়ং কি করতে ঘাটে আসছিলেন।…"বৌমা তোমার লাজলজ্জা কিছুই নাই কি ? উপরের ঘরে কেউ থাকতে পারে ত। আচ্ছা হাবাতের ঘরের মেয়ে এনেছি যাহোক বাবা…রীতকরণ কিছুই জানে না।…ওঠ।"

মুখ নামিয়ে প্রতিমা উঠে যায়…ধীরে ধীরে। বেশ হয়েছে বৌদি যেমন। শৈলীর হাসি আর ধরে না।

দুপুর বেলা সঙ্গী সাথী কেউ নেই। সুরমা, শৈলী, নেপু, রাঙ্গা পিসিমা, ভালমা দক্ষিণের ঘরে আড্ডা জমিয়েছে।…বড়জা নিজের ঘরে নিদ্রামগ্ন, তাছাড়া ওদের সঙ্গেও মিশতে পারে না প্রতিমা। মুখ চোরা হাসি—প্যাঁচান প্যাঁচান কথা—প্রতিমার সহ্য হয় না।

…জানালা থেকে চেয়ে থাকে গ্রামখানার দিকে…ঐ মাঠ আর বনটার দিকে।

দুপুরের খর রোদ ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামখানার উপর। নূতন পুকুরের বিশাল জলাভূমির বুকে···সূর্য্যকিরণ ঝকমক করছে···ঢেউএর মাথায় চেয়ে থাকতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দূরে ঐ লাল প্রান্তরটার পরেই ঘননীল শালবন।···মনে পড়ে এই নিরালা দুপুরে বাড়ীর কথা··· সেই ছায়াময় ষষ্ঠিবটতলা···ভট্টচার্য্যপুকুর, রমা—চাঁপা—বিনয়—সকলের মুখ তার মনের দর্পণে এসে প্রতিফলিত হয়—চোখ হয়ে ওঠে অশ্রু সজল।

সহসা চমকে ওঠে···"কে? কে?"···

চুপ-চুপ ওরে বাব্বা! যেন বাড়ীতে চোর পড়েছে—কি ভাবছিলে?

জানালা বন্ধ করে দিয়ে প্রতিমা এসে বিছানায় বসে।

তোমাকে মেজমা চানকরার জন্যে নাকি খুব বকেছে?

মহীনের কথায় প্রতিমা ঘাড়নেড়ে বলে ওঠে···কই না, বকবে কেন? এমনি উঠতে বলেছিল।···

···বকা ওর স্বভাব···সব তাতেই সর্দ্দারি!···শোন্···শোন··· প্রতিমাকে কাছে টেনে নেয়।

···আঃ ছাড়, কেউ দেখতে পাবে! মা গো কি দস্যি তুমি! প্রতিমা স্বামীর বুকে ঢলে পড়ে! দুঃখ কষ্ট···তিরস্কারের সব জ্বালা ভুলে যায়।

···মহীনের উত্তপ্ত অধর নেমে আসে তার রক্তিম অধরের উপর! তার তপ্ত নিঃশ্বাস প্রতিমার শিরায় শিরায় জাগায় কোন অপরূপ শিহরণ, চোখ দুটো বুজে আসে···! আঃ এত দুষ্টু তুমি! যাও···কথা তার আর বার হয় না···মহীনের অধর তার সব কথা বন্ধ করে দায়।

বাড়ীটা খাঁ খাঁ করে। ছেলেপুলে বাড়ীতে নাই!···প্রতিমা কতদিন হ'ল গোপালনগরে চলে গ্যাছে···মা একলা থাকতে পারেন না।··· ধীরু এইবার আমাকে রেহাই দাও বাবা—আমি বাবা বিশ্বনাথের চরণে জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে কাটাই।

—রাগ করে কি করবে বল মা! বিয়ে করে শুধু শুধু অভাব বাড়ান—তা ছাড়া—

মা বাধা দিয়ে ওঠেন, থাম বাপু—বেশী পাকামী করিস না—পটু বাউরী যার রোজগায় দিন গেলে আট আনা···সে যদি বিয়ে করে··· তবে আর সকলের করলে দোষ কি?

এমন অকাট্য যুক্তির সামনে দাঁড়ান বড়ই সুকঠিন। ছেলে তবু বোঝে না। মা অগত্যা বলেন—যা ইচ্ছে করগে! আমার যেমন বরাত! একটা মেয়ে···তাও মেয়ে জামাই নিয়ে সাধ আহ্লাদ করতে পেলাম না···ছেলে আবার তার চেয়েও বড় শত্রু! যাক্‌গে আমার আর ক'দিন!

···কয়েক বছর পরের কথা! চাটুয্যেদের বাড়ীতে সরিকান ভাগ হয়ে গিয়েছে। কেউ বলে বাঁচলাম! কেউ বলে অমন সংসারটা ভেঙ্গে নয়ছয় হয়ে গ্যাল···মেজবাবুই দায়ী, জিভ ছাড়া পাক লাগাবে, আর কাজে অকাযে সর্দ্দারী···! ঠিক হয়েছে!

কি যে ঠিক তা কেউ বলতে পারে না।

···অনেকদিন পর ধীরেনকে আবার যেতে হয় বাধ্য হয়ে গোপালনগরে।

···এস বাবা ধীরু—থাক্-থাক্ বেঁচে থাক বাবা!

চারিদিক দেখে সে অনেক পরিবর্ত্তন খুঁজে পায়! সে কোলাহল মুখরিত বাড়ী আর নাই···চাকর বাকর ঝি-দের গোলমাল কমে এসেছে···! উঠোনে ধানের গোলায় ভর্ত্তি···চারিদিকে একটা শান্তির ছায়া···একটা লক্ষ্মীশ্রী।

প্রতিমা এসে প্রণাম করে—দাদা আমাকে ভুলেই গেছ না! প্রতিমা আগেকার চেয়ে অনেক বড় হয়েছে···রংটাও আর হয়েছে ফর্সা। সারাটা দেহে এসেছে একটা ঔজ্জ্বল্য।

···মা বিনয় ভাল আছে! সেই বড় গাইটা দুধ দেয়, কি বাছুর হয়েছে? পেঁপে গাছটা আছে···চাঁপা কোথায়—গোলগাঁয়ে, না শ্বশুর বাড়ীতে!···মুখ দিয়ে যেন খই ফুটছে!

···পাগলী কোথাকার, শাশুড়ী হাসতে থাকেন, দাদা এল, জল টল খেতে দে···চাকরবাকরকে পা ধোবার জল দিতে বল···একটু জিরোক··· তা না খবর!

···সে ব্যবস্থাও করে এসেছি মা! বামুন পিসী এইখানেই নিয়ে এস···এই দরদালানে—গোবর্দ্ধন যা বাবা চা-টা নিয়ে আয় তো! এই যে দাদা···বস! আসন পেতে দ্যায়।

বাবা ধীরু—আগেতে সংসারে থাকতাম নিজের সাধ আহ্লাদ কিছুই করিনি···একটিমাত্র ছেলে তার কুটুমবাড়ীতে যে ব্যবহার করেছিলেন আমার ঠাকুরপোরা···

বাধা দিয়ে ওঠে ধীরু "আপনি কিছু মনে করবেন না মাউইমা··· অন্যায় আমাদেরই হয়েছিল—এমন ঘরে···"

"দূর পাগল ছেলে···বৌমা আমার লক্ষ্মী···আচ্ছা বাবা তুমি বস আমি আসছি।" তিনি চলে যান।

"ও হবে না দাদা···বালুসাহী আমি নিজে করেছি···বাড়ীর ক্ষীরের মোয়া···উহুঁ বাগানের আম পাতে পড়ে থাকলে চলবে না, খেতেই হবে" ···একতালে বকে চলেছে!

···দাদা, মা কিছু বলছে না তোমার জন্য!

বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ধীরেন···আমার জন্য! আমার আবার কি হ'ল!

···"দাদা যেন কি! মায়ের কষ্ট হচ্ছে ত···বিয়ে-থা করে সংসারী হও!"

"···এখন কি সন্ন্যেসী আছি?"

"যাও তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল?"

চারিদিকে গোলমাল হৈ চৈ। হরি খুড়ো কড়িবাঁধা খেলো হুকোটা হাতে নিয়ে কাপড় সামলে তদারক করে চলেছেন "ওহে

মরুরার গো…দেখো বাপু…সন্দেশ যেন কাষ্ঠ কেলাশ হয়…গোলগাঁয়ের নামজাদের সন্দেশ! রসগোল্লাটা হয়ে গ্যাছে হে রমণী!"…হাঁকতে হাঁকতে ময়রাইটার আড়ালে চলে যান।

ফণি ভটচায হেঁকে ওঠে—"সেরে কত করে ময়েন দেবে কর্ত্তা…বেশ খাস্তা হতে হবে কিন্তু!"…

রমু চৌধুরীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর…গোলমাল ভেদ করে কানে আসে, তিনি বাইরে পাল সামিয়ানা খাটাইতেই ব্যস্ত!…হাতের হুঁকোটা টানা হচ্ছে না…এদিক ওদিক ছুটোছুটী করছেন কাপড়টাকে ভুঁড়ির উপর বাঁ হাতে ধরে "ওরে শালা বাপ্পী…কাঁচি মদ মারলে কি আর জোর হয়—? টান…টেনে বাঁধ…ক'সে…নইলে লোকে খেতে বসবে আর পটাং, ব্যস পালচাপা…! টান" হাত দুটোই জোড়া…নইলে একবার টানটা দেখাতেন বোধ হয়।

ধীরেনের পণ শেষ পর্য্যন্ত টিকলো না—সাধারণতঃ টেঁকেও না! তাকে বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হ'ল মায়ের জেদাজেদিতে…অন্ততঃ সে ত তাই বলছে!

হ্যাঁরে ধীরু, প্রতিমা যে এখনও এল না…চিঠি পৌঁচেছে…কালো গেল!

ধীরু কাপড়গুলো হিসেব করতে করতে জবাব দেয়…আসছে তারা পথে…এলো বলে!…রান্নাঘর থেকে ডাকাডাকিতে মা চলে যান…"একদণ্ড সময় নাই বাবা, যে দিকটা না দেখব সেই দিকটা ভেসে যাবে।"

…প্রতিমা ঝড়ের বেগে একরকম ছুটতে ছুটতে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে! "উঃ কতদিন পরে দেখা! মা তুমি অনেক রোগা হয়ে গিয়েছ! চুল পেকে গ্যাছে সব…ইস্‌!…এই বিনে হতভাগা—!"

বিনয় দিদির পায়ের কাছে ঠক্‌ করে একটা প্রণাম করে পাশে দাঁড়ায়—নিতান্ত ভাল ছেলের মত!

…কচিখুকীর মত আবদার-ভরা কণ্ঠে প্রতিমা বলে ওঠে—"আচ্ছা মা, তোমাদের আক্কেলটা কি রকম বল দেখি! কোথায় বিয়ে হচ্ছে কার মেয়ের সঙ্গে…কিছুই লেখোনি…কি ব্যাপার কি!'

মা হাসি চাপতে চাপতে জবাব দেন…তোর দাদাকেই জিজ্ঞেস করগে যা না! যে বিয়ে করছে…।

বিয়ের হাঙ্গামা চুকে গিয়েছে। আনন্দ কোলাহল থেমে আসে ধীরে ধীরে…। বৌ সকলেরই পছন্দ হয়েছে—না হবার কিছুই নাই!…

প্রতিমা আড়ালে রমাকে বলে…বৌদি, এতদিনে বুঝেছি দাদার সঙ্গে উপরে ঘরে…এখানে সেখানে কি কথা হত? ভালবাসা না হলে তোমাদের আজকাল বিয়েই করা হয় না! পেটে পেটে এত?

রমা লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে…কানের ডগা…কপোল তার রক্তবর্ণ হয়ে যায়—!…যাঃ তোর যত সব…

—আবার লজ্জা কি! এইবার দাদাটিকে গ্রাস করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার কর…আর লুকোচুরী খেলতে হবে না…

মা আর ধীরেনকে আসতে দেখে ঘোমটা টেনে দেয়—রমা! প্রতিমা হাসতে থাকে—ও বাবা, ঢং দেখে বাঁচিনা! বুঝেছ মা…বৌ নিয়ে এইবার সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না কর—আর কাশী যেতে হবে না।

হাসি চেপে মা বলে ওঠেন…হ্যাঁরে প্রতিমা—মহীন যে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, এই ত সবে এলি এদ্দিন পর, এখুনি যাবার ··

বাধা দিয়ে উঠল প্রতিমা…না মা শাশুড়ী সেখানে একলা আছেন, আমাদের যেতেই হবে কাল। সারাটা সংসার তিনি কত দেখবেন? আর বুঝছোই ত, একার ঘর, থাকলেই কি আর আমার চলে! তুমি আর অমত করোনা…

মা অবাক হয়ে যান…তার পরিবর্ত্তন দেখে! আশ্চর্য্য না হয়ে পারেন না…!

পরিবর্ত্তন

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় এম-এ

স্বপ্না—ষ্টেশন মাষ্টারের মেয়ে।

ই-আই-রেলের নিউকর্ড লাইনের বেগমপুর একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর ষ্টেশন। মহিমবাবু এখানকার অন্যতম ষ্টেশন মাষ্টার। স্বপ্না তাঁরই মেয়ে।

মাসখানেক হ'ল মহিমবাবু এসেছেন হরিপাল থেকে বদলী হ'য়ে বেগমপুরে। সংসারে তিনি, তাঁর স্ত্রী, আর ছ' বছরের মেয়ে স্বপ্না।

মহিমবাবুর রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর মেয়ের নাম রাখায়। স্বপ্না—সত্যই স্বপ্না! অনিন্দ্যসুন্দরী মেয়ে! দুধে-আলতায় তার রং—ভাসা ভাসা টানা দুটী চোখ—ঘনকৃষ্ণ চক্ষুমণি ও পল্লবঘন চোখের পাতা—উন্নত নাসিকা—স্কন্ধবিলম্বিত কুঞ্চিত কালো চুল—গায়ে তার লাল রংয়ের ফ্রক! স্বপনপুরের রাজকুমারী স্বপ্না।

মাঝে মাঝে দিনের মধ্যে দু'চার বার স্বপ্না আসে বাবার কাছে ষ্টেশনে। অচেনা লোকেরা তার হাত ধ'রে জিগেস করে "তোমার নাম কি মা?" উত্তর আসে "স্বপ্না"

বাবার কানে কানে কি কথা ব'লে স্বপ্না দৌড়ে পালায় বাড়ীর দিকে।

স্বপ্নার ভালো লাগে গাড়ী দেখা। সে তার ঘরের জানলায় ব'সে ব'সে লক্ষ্য করে, কখন কোনদিকে পাখা প'ড়ল। পাখা পড়া দেখে সে আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। আপনার মনে ব'লে ওঠে 'এইবার মেল আসবে।' মা আসে ঘরে জিনিষ নিতে, বলে "স্বপন কি দেখছ মা?"

"মেলগাড়ী আসছে মা, পাখা পড়ে গেছে" বলে স্বপন আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। মুখে তার হাসি ধরে না। মা চেয়ে থাকে তার হাসির দিকে। স্বপ্নাও হাসে—রূপকথার রাজকন্যার হাসি—হাসিতে মুক্তো ঝরে।

'একটী চুমো দাও ত মা'—মা এগিয়ে আসে। স্বপ্না এগিয়ে দেয় তার গাল। মা নিজের গালে মেয়ের গালটা চেপে ধরে স্নেহাতিশয্যে। স্বপ্নার গালটা গোলাপী হ'য়ে ওঠে।

কালবোশেখীর ঝড়ের মত বিরাট অজগর মেলখানা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মের ধূলো উড়িয়ে বেপরোয়াভাবে এক নিশ্বেসে চ'লে যায়। মেলের বেগে কেঁপে ওঠে স্বপ্নার জানালাটাও। স্বপ্না অবাক হয়ে চেয়ে থাকে গাড়ীটার দিকে। অস্পষ্ট লোকগুলো বায়স্কোপের ছবির মত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগ্‌নল পেরিয়ে গেলে স্বপ্না চোখ ফেরায়।

স্বপ্নার সবচেয়ে ভালো লাগে মালগাড়ী দেখতে। মালগাড়ীতে গাড়ী থাকে অনেক। এক একটা ষ্টেশন পার হ'তে অনেক সময় নেয়। স্বপ্না গাড়ী গোণে—এক—দুই—চার—আট—আশী—একশো—পাঁশ্‌শো। গাড়ীতে কত গরু, ভেড়া, ছাগল। কোন গাড়ীটা বড়, কোনটা নীচু, কোনটা উঁচু। মালগাড়ী চলে ঢিমেতালে—ঝিগ্‌ ঝিগ্‌—ঝগড়্‌ঝগ্‌—ঘটাং ঘট্‌। স্বপ্না নিজের মনে বলে—"দিদি কোথা, দাদা কোথা······"। আমেরিকান ইঞ্জিনের সহসা কর্ণভেদী চীৎকারে স্বপ্না চমকে ওঠে। গাড়ীর শব্দে অকস্মাৎ ষ্টেশনটা হয়ে ওঠে জাগ্রত। গাড়া চলে যাওয়ায় ষ্টেশনটা স্বস্তি বোধ করে—হাল্কা হ'য়ে ওঠে। স্বপ্নার মনটাও নিঃসঙ্গ হ'য়ে পড়ে।

স্বপ্না খেতে বসে বাবার সঙ্গে। মা থাকে কাছে ব'সে, স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে বিনতি দেবী বলে—দেখ স্বপ্নার বিয়ে দিও ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে, খুব গাড়ী দেখবে। মেয়ের গাড়ী দেখা যে কী ঝোঁক তা ব'লতে পারি না। স্বপ্না বলে "হুস্‌ অসব্ব"। স্বপ্না দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকায়।

"হয়েছে, আর লজ্জার দরকার নেই, এখন খেয়ে নাও"—মা সহাস্যে মেয়েকে বলে।

বিকেলে আসে পাঁচটার গাড়ী। প্ল্যাটফরমে নামে তিন চারশ' কেরাণী। সারি বেঁধে সকলেই চলে বাড়ীর পথে। কেউ বা কোটপ্যাণ্টপরা সাহেব, কেউ বা ধুতি-পাঞ্জাবীপরা বাঙালীবাবু। কারো জামা কাপড় ময়লা ছেঁড়া, পায়ে কেটস্‌ সু—অল্প মাইনের কেরাণী। সকলেই ব্যস্ত। যেন বিজয়ী প্রবাসী সেনার স্বদেশে আপন গৃহে যাত্রা। প্রত্যেকেরই পদক্ষেপ স্বাভাবিক অপেক্ষা দীর্ঘ। মুখে লাগে তাদের রক্তিম সূর্য্যের সোনালী আলো। স্বপ্না দেখে, শুধু দেখে—বেশ লাগে তার। কারও হাতে মাছ, কারো হাতে বাজার। ছোকরার দল বুড়োদের পেছনে রেখে এগিয়ে চলে। তাদের মুখে এখন সকালের সজীবতা নেই, সকালের তাম্বুলরঞ্জিত ঠোঁট বিকালে রৌদ্রপীড়িত জবাফুলের মত শুকিয়ে গেছে।

স্বপ্না অবাক হয়ে দেখে—কত ছোট ছেলেমেয়ে নামে, তাদের বাবা থাকে এগিয়ে, মা থাকে পেছনে। স্বপ্না তা'র মাকে ডেকে নিয়ে আসে, "মা, মা, বৌ দেখবে এসো।"

বিয়ের মরশুমে কত বর-বৌ নামে। স্বপ্নার ভারী আমোদ হয় বর-বৌ দেখতে। স্বপ্না মাকে জিগেস্‌ করে, "বৌটা ফরসা নয় মা? বরটা কিন্তু কাল, কি বল মা?"

মা বলে "তোর ঐ রকম একটা কাল বর ক'রে দেবো।"

"হুস্‌ অসব্ব" বলে স্বপ্না মা'র গায়ে মৃদু ঠেলা দেয়। লজ্জায় তার মুখ চোখ অকারণে লাল হয়ে ওঠে।

দিন যায়। মহিমবাবু দশটী বছর কাটিয়ে দিলেন একই ষ্টেশনে। সেদিনের ছ'বছরের স্বপ্না আজ ষোড়শী। স্বপ্না জানালার ধারে বসে সূচীশিল্পে মন দেয়। আজও সে দেখে—মালগাড়ী—মেল—প্যাসেঞ্জার ট্রেণ। স্বপ্নার কাছে ট্রেণ নিয়ে আসে আনন্দের বার্ত্তা।

স্বপ্নার বিয়ের ঠিক হ'য়েছে। ছেলে গ্রাজুয়েট, সরকারী অফিসের চাকুরে। নাম—অনিমেষ বসু।

দেশের বাড়ী রাণাঘাট থেকে মেয়ের বিয়ে দেবেন মহিমবাবু।

অঘ্রাণের শুক্লা পঞ্চমীর দিনে হিমেল জ্যোৎস্না যখন পৃথিবীর বুকে লজ্জাবনত বধূর মত চেয়ে আছে, তারকার দল ধরণীর আলোছায়ার স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে ঘুমুচ্ছে, সারা প্রকৃতি ধূসর পরিবেশের মাঝে নীরব অনুভূতি নিয়ে দিগন্তের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কচ্ছে—অনিমেষ স্বপ্না—দুহুঁ দোঁহার সাথী হ'য়ে গেল।

ফুলশয্যার দিন রাত্রে নানা কথার মধ্যে স্বপ্না অনিমেষকে ব'লেছিল—"আমার ভালো লাগে দেখতে ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের, যখন তারা সার বেঁধে বাসায়-ফেরা পাখীর মত ষ্টেশনের গেট পেরিয়ে মাঠের পথে চলে যায়। বাবার কোয়ার্টারের জানলায় ব'সে আমি এখনও দেখি। এতদিন দেখতুম অপ্রয়োজনের আনন্দে—আর এবার দেখব প্রয়োজনের আনন্দে। প্যাসেঞ্জারের ভীড় থেকে তোমায় খুঁজে বার ক'রব এবার। অনিমেষ স্বপ্নাকে বুকে টেনে নেয়। সরমরাঙা মুখের দিকে অনিমেষ চেয়ে থাকে— স্বপ্নার চোখ দুটী কী সুন্দর। শরতের জ্যোৎস্নামাখা শতদল! স্বপ্না অনিমেষের বুকের স্পন্দন অনুভব করে।

অনিমেষ বাসা বেঁধেছে কলকাতার এক প্রশস্ত রাজপথে দ্বিতল ফ্ল্যাটে। অনিমেষ যায় আপিসে। স্বপ্না থাকে ঘরে, দেখে মোটর, বাস, লরী, ট্রাম, রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী। এখানে ট্রেণ নেই—স্বপ্নার দিনকতক ভালো লাগেনি। স্বপ্না অনিমেষকে বলে "তুমি ষ্টেশন-মাষ্টার হ'লে না কেন?"

"তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে জানলে অবশ্যই হতুম" স্বপ্না হেসে ওঠে। স্বপ্নার রক্তিম কপোলের পানে অনিমেষ চেয়ে থাকে।

দেশব্যাপী জাগলো আগষ্ট আন্দোলন। কলকাতার বুকে সে আন্দোলনের এল আঘাত। ট্রাম, বাস, লরী পুড়তে লাগল, ট্রামলাইনের তার কাটা পড়ল। পুলিশ হার মানলে শান্তিরক্ষায়। মিলিটারী বেপরোয়া চালালো গুলী। কত নিরীহ পথচারী, কত নির্বিরোধী নরনারী অকালে মারা গেল। কলকাতার রাজপথে স্থানে স্থানে মানুষের রক্তে লেখা রইল আগষ্ট আন্দোলনের জলন্ত ইতিহাস।

একদিন একটা হল্লা জাগলো অনিমেষের বাসার সামনেই। ট্রাম পুড়তে লাগল। মিলিটারী চালালো গুলী। দোকানপাট সব বন্ধ হ'য়ে গেল! অনিমেষ দেখছিল খড়খড়ি খুলে। হঠাৎ একটা গুলী এসে লাগল কপালে। স্বপ্না শিউরে চীৎকার ক'রে উঠলো।

তারপর?……

স্বপ্না ফিরে এল বাবার কাছে। মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে বুক ফাটা কান্না কেঁদে ওঠে।

সেই পুরাতন ষ্টেশন। কিশোরী স্বপ্নার স্বপ্নজড়িত সেই পুরাতন পরিবেশ। সেই ট্রেন আসা যাওয়া। স্বপ্নার বিশ্রামস্থল সেই বাতায়ন। স্বপ্নার চোখ পড়ে দূরে— বহুদূরে যেখানে মাঠ শেষ হ'য়ে গেছে—আকাশ নেমে এসেছে—তার কোলে জেগে আছে অস্পষ্ট বনভূমির নীল রেখা।

দূরে চরে গরু—আলের পথে পথচারী রাখাল—সঙ্গীহীন বটগাছ—দিগন্তের আলো কাঁপে—শান্ত বাতাস স্বপ্নার মুখে চোখে ব'য়ে যায়।

পাঁচটার গাড়ী আসবার সময় হয়। স্বপ্নার মন উদ্বেল হ'য়ে ওঠে স্মৃতিতে।

অনিমেষ এসেছিল এই সেদিন।

গাড়ীটা ষ্টেশনে ইন্ করার সঙ্গে সঙ্গে জানলা বন্ধ ক'রে দেয়। সে দেখবে না—সে দেখবে না প্যাসেঞ্জারের মিছিল।

বেরিয়ে আসে অল্পপরিসর আঙিনায়। সামনের দরজা দিয়ে দেখা যায় অস্তগামী সূর্য্য—সোনালী আলোয় সারা পৃথিবী আলোকিত। নীড়ে ফেরা পাখীর ডানায় সেই আলো লাগে। দূরের ঝাউগাছটা ঝলমল ক'রে ওঠে—পশ্চিমাকাশের বুকে সেটা যেন একটা ছবি—অপূর্ব্ব —অপার্থিব। লঘু টুকরো শুভ্র মেঘগুলো ভেসে বেড়ায়— নিতান্ত অবহেলায়; নীল আকাশের বুকে আলোকোদ্ভাসিত শ্বেত শতদল। ধীরে ধীরে নেমে যায় সূর্য্য—বিরহের গানে ভ'রে যায় আকাশ, বাতাস। উদাসিনী গোধূলি আস্তে আস্তে তার গৈরিক বসন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দেয়। উদাসিনী স্বপ্না—সন্ন্যাসিনী গোধূলি। স্বপ্নার বুকে গোধূলি! স্বপ্নার ভালো লাগে গোধূলির পাণ্ডুর রূপ। মা ডাকে— জলভরা চোখদুটী নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় স্বপ্না।

বসন্ত

(ঋতুসংহার)

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

দ্বিরেফ-মালায় বিলসিত যার ধনুর্গুণ,
ফুল্ল রসাল মুকুল-শায়কে পূর্ণ যাহার পিঠের তূণ,
কামীদের হৃদি বিদ্ধ করিতে শীতের শেষে,
আসিল কান্তে সেই বসন্ত যোদ্ধ্‌বেশে।

হের সুদন্তী, এই বসন্তে রম্য সবি
দ্রুম-কুসুমিত, বাপী-কমলিত, স্নিগ্ধ মলয়ানিল সুরভি,
পরম রম্য দিবস সৌম্য সন্ধ্যা আজিকে অতি মধুরা
পুরবাসিনীরা মদনাতুরা।

আজি বসন্ত করে শ্রীমন্ত দীর্ঘিকারে
নব বিকসিত কুমুদহারে
ইন্দুকান্তি সুন্দরীদের মণি মেখলার গুঞ্জরণে
শোভায় শোভন মুকুলে রসাল কুঞ্জবনে।

স্ফুট কুসুম্ভ রাগে অরুণিত চারু দুকূল,
বিলাসিনীদের নিতম্বতটে শোভা অতুল
করেছে সৃজন, তাদের বুকে
নবীনকান্তি, কুঙ্কুমরাগ রঞ্জিত নব চীনাংশুকে।

প্রমদাজনের কর্ণে শোভিছে কর্ণিকার,
বিলোল অলকে নব মল্লিকা অশোক হার।

সিত চন্দনে চর্চ্চিত মালা উরঃস্থলে,
বলয়াঙ্গদে ভুজতটে মণি মুকুতা জ্বলে
জাগে নবশ্রী জঘন ধামে
কাঞ্চী দামে।

পত্র লেখায় মণ্ডিত হেম কমল সম
বিলাসিনীদের বদনে হয়েছে মদনের তাপে স্বেদোদ্‌গম
মনে ভায় যেন মণি রত্নের পংক্তি মাঝে
থরে থরে চারু মুকুতা রাজে।

প্রিয় পাশে তবু, ললনার বুকে আজি কি ব্যথা
উচ্ছ্বসি' উঠে? শ্লথ হয় কেন অঙ্গলতা?
স্মরবিচলিতা বরাঙ্গনা,
আজি বসন্ত করে কি তাহারে অন্যমনা?
গণ্ড তাহার আজিকে পাণ্ডু বরণ ধরে
কৃশ তনু তার আলসে লালসে এলায়ে পড়ে,
ঘন ঘন শুধু জৃম্ভণ উঠে মুখাম্বুজে,
তার লাবণ্য মুখবায়ে যেন স্মরেরে পূজে।

মদালস আঁখে হইয়া বিলোল কঠিন হইয়া স্তন যুগলে,
পাণ্ডু হইয়া গণ্ডের তটে আনত হইয়া নাভিস্থলে,
পীনতা লভিয়া জঘন শ্রীতে জাগাইয়া যুব জনের ক্ষুধা
আজি অনঙ্গ অঙ্গনাঙ্গে জাগে বহুধা।

আজিকে মদন প্রমদাজনের অঙ্গেরে করে নিদ্রালস
বচনেরে করে মদবিবশ,
কণ্ঠে আসিয়া জড়িমাভার,
ভ্রূলীলা বিলাসে কুটিল করেছে চাহনি তার।

অঙ্গনাগণ প্রিয়ঙ্গুরেণ্‌ কুঙ্কুমাক্ত পীবর স্তনে,
রঞ্জিত করে চন্দনময় কস্তুরিকার অনুলেপনে।
ঐ হের তারা গুরু বাস ত্যজি' উরুর 'পরে
কালাগুরু ধূপে বাসিত সুসিত বসন ধরে।

চূতমঞ্জরী মদিরা হৃষ্ট পিক পল্লব কুঞ্জাগারে
চুম্বন করে বল্লভারে।
ভ্রমরীর সাথে ভ্রমর বসিয়া পদ্মাসনে
প্রিয়ারে তুষিছে গুঞ্জরণে।

তাম্রপ্রবালে নম্র শোভন আম্রশাখী
পুষ্পিত চারু শাখাপল্লবে অঙ্গ ঢাকি'
কম্পিত হয় পবন ভরে
অঙ্গনা হৃদে অনঙ্গ দেবে বোধন করে।

বিদ্রুম রাগ তাম্র কুসুম আমূল সর্ব্ব অঙ্গে ধরি'
অশোকদ্রুম পল্লব দলে গিয়াছে ভরি'
অশোকের পানে চাহিয়া আজিকে বিরহিণীর
সশোক হৃদয় গলিয়া ঝরিবে নয়ন-নীর।

মত্তদ্বিরেফ পরিচুম্বিত পুষ্পিত চূতপাদপচয়
মন্দমলয়া কুলিত যাহার প্রবালচয়,
কামিমন করে সমুৎসুক
বিরহি জনের পুড়ায় বুক।

কান্তা বদন কান্তি সদৃশ নব কুরবক মঞ্জরীর
সুষমা হেরিয়া কোন সহৃদয় পুরুষচিত্ত রহিবে স্থির?
ঢাকিয়া ফেলেছে বায়ুকম্পিত রক্ত পলাশ কুসুমমালা
বনশ্রী তায় রক্তাম্বর পরিহিতা যেন নবোঢ়া বালা।
শুকমুখসম কিংশুক কলি চঞ্চু দিয়া
তরুণ চিত্ত শতধাদীর্ণ করিতেছে আজি হেরলো প্রিয়া।

অনলের মত শিখা বিস্তারি কর্ণিকার
করিছে তাহারে ভস্ম সার।
পিককণ্ঠের স্বর-শর কেন তাহার পরে ?
মৃত যেবা সে কি আবার মরে ?
কোকিল কূজনে মধুপকুলের গুঞ্জরণে
জাগে চাপল্য লজ্জাবিনীতা কুলবালাদের সরল মনে।
নীহারমুক্ত সমীরণ সুখস্পর্শ আজি
কম্পিত করি কুসুমিত শাখা প্রশাখা রাজি,
বিস্তার করি কোকিলের স্বর দিগ্‌বিদিকে,
হরণ করিছে তরুণ জনের হৃদয়টিরে।
নবোঢ়া বধূর বিলাস মধুর হাস্যসম,
অমল ধবল কুন্দকুসুমে উপবন রাজি মানস রম।
বাসনামুক্ত মুনির মানস করে মোহিত
লালসারক্ত বিলাসাসক্ত তরুণের মন আগেই হৃত।
কন্দর্পের নিদয় দর্পে দলনাহত
তরুণীগণের তনুলতা আজ অবশ শ্লথ,
দুলে শিথিলতা কাঞ্চীদামে
অলসসক্ত স্তনহার ঘন উরোজ ধামে।
পিককুহরণে অলিগুঞ্জনে তরুণীগণ
আজি মধুমাসে তরুণগণের হরিছে মন।
নানা মঞ্জুল কুসুমে আকুল তরুলতায়,
কোকিল কুলের কল মুখরিত সানু শোভায়
শিলাজতু ধূলি সুরভিত শিলা সমুচ্চয়ে
অচল ভূধরো চলে যেন আজ হৃদয় জয়ে।

কান্তা বিরহবিধুর জনের কি দশা আজি !
নয়ন মুদিছে হেরি সে রসাল মুকুল রাজি।
শুধু আঁখি নয়, নাসিকার পথও গাত্র বাসে
করিছে বন্ধ যদি বা গন্ধ নাসায় আসে।
মুদিত আঁখির পত্রের ফাঁকে অশ্রু ঝরে
ক্ষুভিত হৃদয়ে বিলাপ করে।
মানের গরব রাখিতে পারে না
বুঝি আর বামা মানিনী বধূ।
মত্ত মধুপ পিককলনাদে রম্য মধু
পুষ্পিতচূত কর্ণিকারে
শাণিত শায়কে বিঁধিছে তারে।
করিছে মথিত চপল ব্যথিত মানিনীগণে
হৃদয় শাণিত রতিদয়িতের উদ্বোধনে।

আম্র মুকুল শায়কে যাহার পূর্ণ তূণ
অলিমালা যার ধনুর্গুণ
নব কিংশুক কুসুমে রচিত ধনু যে ধরে
সিতাতপত্র নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্ক যার মৌলি পরে,
নান্দীগায়ক বন্দী যাহার কলকোকিল
গজযূথ যার মলয়ানিল
অঙ্গে যাহার মধু-বিরচিত রম্য সাজ
ত্রিলোকবিজয়ী সেই অনঙ্গ রাজাধিরাজ
করি প্রসন্ন দৃষ্টি দান,
করুক তোমার শুভ বিধান।

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে যুদ্ধ, বিপ্লব ও অশান্তির বীজ রহিয়াছে। যতদিন সর্ব্বত্র এই কাঠামো চূর্ণ না হইতেছে, ততদিন বিশ্বে স্থায়ী শান্তি অসম্ভব। মুসোলিনি মরিয়াছেন, হয়ত হিটলারও জীবিত নাই ; কিন্তু হিটলার-মুসোলিনি-বাদ ধনতান্ত্রিক কাঠামোর শীতল ছায়ায় পুষ্টিলাভ করিতেছে। সমগ্র বিশ্বকে অর্থনৈতিক প্রভুত্বের নূতন রেশম রজ্জু পরাইবার জন্য নূতনভাবে গভীর ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

এংলো-স্যাকশন "নেতৃত্ব"

হিটলার-মুসোলিনির অন্যতম প্রধান শত্রু মিঃ চার্চ্চিল যুদ্ধোত্তর জগতে এংলো-স্যাক্‌শন জাতির নেতৃত্বের কথা খোলাখুলিভাবেই বলিয়া থাকেন। শান্তি ও গণতন্ত্রের অছি সাজিয়া এই নেতৃত্বের দাবী জগতকে ইঙ্গ-মার্কিণ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের ফাঁস পরাইবার কৌশল মাত্র। বৃটেন আজ সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে দুর্ব্বল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে একাকী এই "নেতৃত্ব" গ্রহণ আর সম্ভব নহে। তাই, আটলান্টিকের দুই পারের অধিবাসীর ধমনীতে প্রবাহিত একই এংলো-স্যাক্‌শন শোণিতের কথা উঠিয়াছে।

যুদ্ধের পর বৃটেন ও আমেরিকা কতকটা একই ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। এই সমস্যার সমাধান করিয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধনতান্ত্রিক রূপ অপরিবর্ত্তিত রাখিতে হইলে এবং ধনিকদের মুনাফার অঙ্ক বজায় রাখিতে হইলে বৃটেন ও আমেরিকার তৈয়ারী পণ্যের জন্য নূতন বাজার চাই।

বহু কাল হইতে বৃটেন প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল আমদানী করিয়া আসিতেছে; কিন্তু তৈয়ারী মাল বিক্রয়ে, বিদেশে লগ্নী মূলধনের মুনাফায় ও বৃটিশ জাহাজের ভাড়ায় তাহার আয় ছিল বিরাট। এই আয়ের জন্যই স্বদেশে খাদ্য উৎপন্ন না করিয়াও বৃটিশ জাতি "দুধে ক্ষীরে" খাইতে পাইয়াছে। গত যুদ্ধের সময় বৃটেনের বিদেশে লগ্নী মূলধনের পরিমাণ ৪ শত কোটী পাউণ্ড হইতে কমিয়া ২ শত কোটী পাউণ্ড দাঁড়াইয়াছে; ফলে মুনাফা বাবদ আয়ও দাঁড়াইয়াছে অর্দ্ধেক। বহু মালবাহী জাহাজ সমুদ্রগর্ভে যাওয়ায় জাহাজভাড়া বাবদ আয়ও বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। সর্ব্বোপরি তৈয়ারী মাল বেচিবার বাজার এখন সঙ্কুচিত। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ পণ্যের অর্দ্ধেক পণ্য বিক্রয় হইত বৃটিশ সাম্রাজ্যে, শতকরা ৩৩শ ভাগ যাইত ইউরোপীয় দেশগুলিতে এবং অবশিষ্টাংশ এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। যুদ্ধের পর ইউরোপীয় বাজারের ক্রয়শক্তি এখন নিঃশেষ। বৃটেনকে এখন প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে তাহার সাম্রাজ্যের বাজারে।

যুদ্ধের সময় আমেরিকার উৎপাদন-ক্ষমতা আড়াই গুণ বাড়িয়াছে। কাজেই যুদ্ধের পর পণ্য বিক্রয়ের বাজার প্রসারিত না হইলে আমেরিকায় অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বেকার সমস্যা অনিবার্য। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার শতকরা ৪৩ ভাগ পণ্য বিক্রয় হইত ইউরোপের বাজারে; শতকরা ৩৪ ভাগ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং অবশিষ্টাংশ এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায়। মার্কিণ পণ্যের প্রধান বাজার ইউরোপ আজ নিঃস্ব। তাই মার্কিণ শিল্পপতিরা আজ নূতন বাজার হাত করিবার জন্য পাগল। তাহাদের দৃষ্টি আজ চীন, মধ্য প্রাচ্য ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির প্রতি নিবদ্ধ।

যুদ্ধের পর রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিণ সহযোগিতা এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত ইহাদের বিরোধের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে দুইটি দেশের যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির এই অবস্থার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

প্রধান বিজয়ী দেশগুলির মধ্যে সোভিয়েট রুশিয়ার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার অর্থনৈতিক অবস্থায় মুনাফাভোগী ধনিকের মালিকানা নাই; কোনও শ্রেণী মুনাফার আশায় সেখানে শ্রমশিল্প গড়ে না; মুনাফাকে ভিত্তি করিয়া সেখানকার শ্রমশিল্প চলে না। সমগ্রভাবে জাতি সেখানে শ্রমশিল্পের মালিক; জাতির প্রয়োজনে জাতির প্রতিনিধিদের দ্বারা এই শ্রমশিল্প পরিচালিত। যুদ্ধের পরে শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদনের উপযোগী করা এবং দেশের উৎপাদন-শক্তি আরও বৃদ্ধি করা তাহার সমস্যা। যুদ্ধের সময় জাতি দারুণ কষ্ট সহিয়াছে; এখন তাহার কিছু সুখের ব্যবস্থা করা, রণবিক্ষত অঞ্চলগুলিকে পুনর্গঠিত করা এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত পুনরায় সম্ভাবিত শক্তিপরীক্ষার জন্য সামরিক শক্তি অটুট রাখা ও তাহা বৃদ্ধি করাই সোভিয়েট রুশিয়ার সমস্যা। পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশের বাজার তাহার প্রয়োজন নাই; স্বদেশের বাজারে চাহিদা মেটানই তাহার পক্ষে দুষ্কর। বেকার সমস্যা দূরের কথা—লোকাভাবই সোভিয়েট রুশিয়ার সমস্যা। সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে অন্য দেশে প্রভুত্ব বিস্তারের যে অভিযোগ করা হইয়া থাকে তাহা অর্থনৈতিক প্রভুত্ব অথবা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক প্রভুত্ব নহে। উহা নিছক আদর্শগত প্রভুত্ব। তাহার এই আদর্শগত প্রভুত্বের ক্ষেত্র যত বেশী প্রসারিত হইবে, ইঙ্গ-মার্কিণ অর্থনৈতিক আধিপত্যের ক্ষেত্র তত বেশী সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। এই জন্যই ইঙ্গ-মার্কিণ ব্লকের সহিত সোভিয়েট রুশিয়ার বিরোধ; এই কারণেই সোভিয়েট রুশিয়া সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ মুখপাত্র ও মুখপাত্রদের এত বেশী অপপ্রচার।

চীন

মার্কিণ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দৃষ্টি চীনের প্রতি। মার্কিণ রাজনীতিকরা ভণ্ডামী করিয়া বলিয়া থাকেন যে, চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ; কম্যুনিষ্টদের সহিত কুয়োমিণ্টাঙ্ দলের একটা মীমাংসা হইয়া চীনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহাই কেবল তাহাদের নিষ্কাম বাসনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনের অভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগে সেখানে অর্থনৈতিক প্রভুত্ববিস্তৃতিই মার্কিণ ধনিকদের উদ্দেশ্য; চিয়াং-কাই-শেককে বিপুলভাবে সাহায্য করিয়া তাহারা এই ব্যক্তিকে কম্যুনিষ্ট নিধনে উৎসাহ দিতেছেন।

গত ১০শে মার্চ্চ (১৯৪৭) অস্থায়ী মার্কিণ পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ডীন্ এচেসন্ প্রতিনিধি সভার পররাষ্ট্রীয় কমিটিকে গ্রীস ও তুরস্ককে সাহায্য দান সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিবার সময় প্রসঙ্গতঃ বলেন—"মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টকে প্রচুর উদ্বৃত্ত মালপত্র, ঋণ হিসাবে বিপুল অর্থ ও অন্যপ্রকার সাহায্য দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। তাহারা কখন কম্যুনিষ্টদিগকে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করিতে বলেন নাই; আরও প্রতিনিধিমূলক ও যোগ্য গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।" মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চীনকে প্রদত্ত সাহায্যের বহরটা একবার লক্ষ্য করা যাক্। একমাত্র চীনকে ঋণ ও ইজারার ব্যবস্থা অনুযায়ী সাহায্য দান এখনও বন্ধ হয় নাই। জাপান আত্মসমর্পণ করিবার পরও ২৬ ডিভিসন্ কুয়োমিণ্টাং সৈন্য (পূর্ব্বে ১৯ ডিভিসন) মার্কিণ অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আমেরিকা চীনকে ২৭১ খানা জাহাজ এবং সামরিক বিভাগের উদ্বৃত্ত ৮৪ কোটী ডলার মূল্যের জীপ গাড়ী, বিমান ও অন্যান্য সরঞ্জাম প্রদান করিয়াছে। চিয়াং-কাই-সেক আমেরিকার নিকট হইতে মোট প্রায় ৩ শত কোটী ডলার মূল্যের জিনিসপত্র পাইয়াছেন। বর্ত্তমানে চিয়াংকে আরও ৫০ কোটী ডলার ঋণ দেওয়ার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কম্যুনিষ্ট নেতা চৌ-এন্-লাইএর অভিযোগ—কম্যুনিষ্ট-কুয়োমিণ্টাং আলোচনায় যখনই সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তখনই চিয়াংকে আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া মার্কিণ রাজনীতিকরা আলোচনা ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

চিয়াং-কাই-সেক্‌কে কম্যুনিষ্ট বিনাশে লিপ্ত রাখিয়া আমেরিকা ধীরে ধীরে চীনে তাহার অর্থনৈতিক আধিপত্য সুদৃঢ় করিতেছে।

চীন মার্কিণ বাণিজ্য-চুক্তির সুযোগে মার্কিণ মূলধনে ও মার্কিণ যন্ত্রপাতিতে চীনে নূতন নূতন কারখানা বসিতেছে, চীনের বাজার মার্কিণ তৈয়ারী পণ্যে ভরিয়া যাইতেছে। ১৯৪৬ সালে সাংহাইয়ের বহু কারখানা বন্ধ হইয়াছে। স্বেচুয়ান প্রদেশের (চুং কিং এই প্রদেশে অবস্থিত) প্রায় ১৩ শত ছোট বড় শিল্পপতিকে কারবার গুটাইতে হইয়াছে। চীনের আর্থিক অবস্থা এখন শোচনীয়; মুদ্রাস্ফীতির ফলে চীনের জনসাধারণের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। ১৯৩৭ সালে জাপানের সহিত চীনের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় চীনে যে পরিমাণ নোট প্রচলিত ছিল, তাহা এখন ৫ হাজার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অর্থনৈতিক অব্যবস্থার কোনরূপ সুরাহা অসম্ভব বুঝিয়া কুয়োমিণ্টাং দলের সর্ব্বপ্রধান অর্থনীতিবিশারদ ডাঃ টি, ভি, সুং সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগকালে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন—গৃহ-যুদ্ধই চীনের অর্থ-নৈতিক দুর্গতির কারণ; এই যুদ্ধ না মিটিলে দুর্গতি দূর হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। মার্শাল চিয়াংএর কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নাই; কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষে তিনি অন্ধ। এক সময়ে এই বিদ্বেষের বশে তিনি চীনকে জাপানের হাতে তুলিয়া দিতেছিলেন; এখন আবার চীনকে সেই বিদ্বেষেই আমেরিকার অর্থ-নৈতিক শৃঙ্খল পরাইতেছেন।

সম্প্রতি (২০শে মার্চ্চ) ঢক্কানিনাদে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কম্যুনিষ্টদের ১৩ বৎসরের রাজধানী য়েনান্ কুয়োমিণ্টাং বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চীনের অন্তর্দ্বন্দ্বে বর্ত্তমান সামরিক পরিস্থিতি কুয়োমিণ্টাং দলের অনুকূল নহে। গত কয়েক মাসে সরকার পক্ষের কতকগুলি ব্যর্থতার অপমান চাপা দিবার উদ্দেশ্যে মার্শাল চিয়াং য়েনানের প্রতি তাঁহার সকল মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। মার্কিণ মুরুব্বিদিগকে তিনি বুঝাইতে চাহেন যে, সামরিক শক্তিতে কম্যুনিষ্টদিগকে স্ববশে আনিতে আর বিলম্ব নাই। বিশেষতঃ এই সময় মস্কোয় চীনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে; এই প্রসঙ্গ সেখানে আলোচিত না হইলেও এই সম্পর্কে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইবে। কাজেই, সরকারপক্ষের অন্ততঃ একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখানো দরকার হইয়াছিল।

সরকার পক্ষের য়েনান অধিকার প্রকৃতপক্ষে উল্লেখযোগ্য সাফল্য নহে। কম্যুনিষ্টদের এই প্রধান কেন্দ্র একটি শিবিরের মত; তাহারা ইহার রক্ষার জন্য শক্তিক্ষয় না করিয়া পূর্ব্বেই সরিয়া গিয়াছিল। পরে সরকার পক্ষ জায়গাটি অধিকার করিয়াছে। ঠিক এই সময় উত্তর চীনের ৬টি প্রদেশে—স্যাণ্টুং, হোনান, হোপী, সান্সী, সীয়ুয়ান্ ও মাঞ্চুরিয়ায় কম্যুনিষ্টরা পূর্ব্বের ন্যায় প্রবলভাবে যুদ্ধ করিতেছে এবং অন্ততঃ দুইটি প্রদেশে তাহারা সাফল্যলাভ করিয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ সম্প্রতি চীনের সামরিক পরিস্থিতি সরকার পক্ষের বেশ প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯৪৬ সালের শেষ তিন মাসে এবং ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে কম্যুনিষ্টরা কুয়োমিণ্টাং সেনাবাহিনীর নিকট হইতে ৫৪টি শহর ছিনাইয়া লয়; ঐ সময় সরকার পক্ষ ৫৫টি নগর অধিকারে সমর্থ হইয়াছে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে কম্যুনিষ্টরা ম্যাঞ্চুরিয়ার রাজধানী চ্যাংচুন অভিমুখে প্রবলভাবে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়াও সংবাদ পাওয়া যায়। স্যাণ্টুং প্রদেশে সরকারপক্ষের ২টি সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন হয় বলিয়াও শোনা গিয়াছিল।

মধ্য প্রাচ্য

মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কেও আমেরিকার আগ্রহ এখন বেশী। এই অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সে এখন বৃটেনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। মিশর সংক্রান্ত ব্যাপারটি বৃটেনের একেবারেই নিজস্ব; তাই, এখানে আমেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ কম। ঝুনা সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন মিশর হইতে সেনাবাহিনী সরাইয়া সুয়েজের পূর্ব্ব তীরে লইতে সম্মত হইয়াছে; প্রয়োজন হইলে এখান হইতে অবিলম্বে মিশরে প্রবেশের ব্যবস্থা ঠিক রাখিতেছে। কিন্তু সুদানকে বৃটিশের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করা সম্পর্কে তাহার মনোভাব সম্পূর্ণ অনমনীয়। ইঙ্গ-মিশরীয় প্রশ্ন জাতি সঙ্ঘে উত্থাপিত হইবে, স্থির হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে আমেরিকা প্রত্যক্ষভাবেই হস্তক্ষেপ করিতেছে। এখানকার সমস্যা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের অরাজনীতিকোচিত উক্তিতে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন পর্য্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, প্যালেষ্টাইন প্রসঙ্গও জাতি-সঙ্ঘে উত্থাপিত হইবে। গ্রীসে ও তুরস্কের উপর প্রভাব বিস্তৃতির এক নূতন চাল চালিয়া আমেরিকা এখন পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের সমগ্র উপকূলে তাহার দৃঢ়মুষ্টি স্থাপন করিতে সচেষ্ট।

গত বৎসর বৃটিশ সঙ্গীণের সাহায্যে গ্রীসে রাজতন্ত্রানুরাগীদিগকে ক্ষমতার আসনে বসান হইয়াছিল। এই গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী ম্যাক্সিমো হিটলারের সহযোগী। ইহার অন্য দুই জন সদস্য—সলোকগলু ও রালি যুদ্ধের সময় গ্রীসের ফ্যাসিস্ত তাঁবেদার সরকারের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বৃটিশ সামরিক শক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত এই রাজতন্ত্রানুরাগী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গ্রীসে প্রবল গণ-আন্দোলন ও গেরিলা তৎপরতা চলিতেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের ঢাকগুলি ইহাকে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র যুগোশ্লেভিয়াও আলবেনিয়ার এবং বুলগেরিয়ার সাহায্যপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বলিয়া মিথ্যা প্রচার করিয়া থাকে। সম্প্রতি বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য জর্জ্জ টমাস্ (ইনি কম্যুনিষ্ট নহেন) গেরিলা নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, "স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চলিতেছে; বৃটেনে যদি এইরূপ স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে বৃটিশ জাতিকেও পাহাড় অঞ্চলে যাইয়া গেরিলা তৎপরতা চালাইতে হইত।" গ্রীসের এই আন্দোলনের সহিত যুগোশ্লেভিয়া, আলবেনিয়া ও বুলগেরিয়ার সত্যই সম্পর্ক আছে কিনা, সে সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘের একটি কমিশন এখন অনুসন্ধান করিতেছেন।

নিঃস্বপ্রায় বৃটেনের পক্ষে গ্রীক জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রীসে রাজতন্ত্রী হাতী পোষা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য এখন এই মহৎ কার্য্যের ভার লইতেছে আমেরিকা। সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান্ মার্কিণ কংগ্রেসকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন—তাহারা যেন গ্রীসকে ৩০ কোটী

ডলার ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া এবং সেখানে সামরিক ও বেসামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠাইয়া সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করেন। এই অর্থের যাহা ধনোৎপাদনের জন্য ব্যয়িত হইবে না, তাহা পরিশোধ করিবার দায়িত্ব গ্রীসের থাকিবে না।

সঙ্গে সঙ্গে তুরস্ককেও এইভাবে ১০ কোটী ডলার অস্ত্রশস্ত্র এবং সামরিক ও বেসামরিক বিশেষজ্ঞ দিয়া সাহায্য করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। গ্রীস ও তুরস্কের বাছা বাছা লোকদিগকে মার্কিণ বিশেষজ্ঞের দ্বারা সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইবে।

তুরস্কের বর্ত্তমান কর্ণধাররা যুদ্ধের সময় ইঙ্গ-ফরাসী-তুর্কি চুক্তির সর্ত্ত পালন করেন নাই; অর্থ-নৈতিক ব্যাপারে জার্ম্মানীকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছেন। দার্দানেলিজ প্রণালীর মধ্য দিয়া তাহারা ইতালীয় জাহাজকে কৃষ্ণসাগরে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন বলিয়াও অভিযোগ শোনা গিয়াছে। এ হেন তুরস্ক যুদ্ধের অবস্থা মিত্রপক্ষের অনুকূল হইবামাত্রই এই দিকে ঢলে এবং শেষ মুহূর্ত্তে কাগজপত্রে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্য হইবার অধিকারও অর্জ্জন করে। স্বভাবতঃ বর্ত্তমান তুরস্ক সোভিয়েট ছোঁয়াচ এড়াইয়া চলিতে চাহে; অথচ, সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত মিত্রতাই ছিল নবীন তুরস্কের জন্মদাতা মুস্তাফা কামালের পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা।

যুদ্ধের সময় দার্দানেলিজের রক্ষক তুরস্কের আচরণ সন্দেহের অতীত না হওয়ায় সোভিয়েট রুশিয়া কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া দার্দানেলিজ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিল। তুরস্ক ইহাতে আপত্তি করে; তাহার এই আপত্তিতে সায় দেয় বৃটেন ও আমেরিকা। এখন দার্দানেলিজে সোভিয়েট প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আমেরিকা উহার দুই তীরে—গ্রীসে ও তুরস্কে জাঁকাইয়া বসিতেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে তথা পূর্ব্ব ভূমধ্য সাগর সম্পর্কে আমেরিকার এই আগ্রহের কারণ— এই অঞ্চলে মার্কিণ তেল ব্যবসায়ীদের স্বার্থ এখন বিশেষভাবে প্রসারিত হইতেছে। ইবন্ সৌদের রাজ্যের (সৌদী আরবের) সমগ্র পূর্ব্ব অঞ্চলে তৈল শোষণের অধিকার মার্কিণ ধনিকরা লাভ করিয়াছে। বাহেরীণ দ্বীপে তৈল আহরণের ইজারা একটি মার্কিণ কোম্পানীর হাতে। সীরিয়া, প্যালেষ্টাইন, এবং পারস্যোপসাগরের পশ্চিম উপকূলে কাটার, মস্কৎ, ওমান্ ও এডেন অঞ্চলে তৈল নিষ্কাষণের অধিকার পাইয়াছে বৃটিশ ও মার্কিণ ব্যবসায়ীরা। বৃটেন বহুকাল হইতেই এই অঞ্চলে তৈল ব্যবসায়ে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। ১৯০৯ সাল হইতে ইঙ্গ-পারস্য অয়েল কোম্পানী নামক একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান পারস্যে তৈল আহরণের একচ্ছত্র অধিকার উপভোগ করিতেছে। ইহারই শাখা প্রতিষ্ঠান খানাখিন্ অয়েল কোম্পানী ইরাকের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে তৈল আহরণ করে। এখানকার মসুল ও বাসরা অয়েল কোম্পানীর শতকরা ৯৫টি শেয়ারের মালিক বৃটিশ, ফরাসী, ওলন্দাজ ও মার্কিণ বণিক। কিউয়েট্ প্রদেশে তৈল নিষ্কাশণ করে একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান।

মধ্যপ্রাচ্যে এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র।

মস্কো সম্মিলন

মার্চ্চ মাস হইতে মস্কোয় বৃটিশ, ফরাসী, মার্কিণ ও রুশ পররাষ্ট্র সচিবের সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মানী সম্পর্কে সন্ধি-চুক্তির বিষয় এই সম্মেলনে আলোচিত হইতেছে।

১৯৪৫ সালে পোটস্‌ডাম্ সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে জার্ম্মানীতে নাৎসীবাদের সমর্থক ধনতান্ত্রিক ট্রাষ্টগুলি এবং জমিদারীগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে; সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে নাৎসী প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সোভিয়েট প্রভাবাধীন পূর্ব্ব অঞ্চলে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া ৫ লক্ষ কৃষকের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, বড় বড় ট্রাষ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে, অস্ত্রের কারখানা বন্ধ করিয়া ব্যবহারোপযোগী পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে; সকল ক্ষেত্রে নাৎসী প্রভাব দূর করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, বৃটিশ অঞ্চলে রেণিশ ওয়েষ্টফেলিয়ান কোল সিণ্ডিকেট, মার্কিণ অঞ্চলে ওপেন্ মোটর্স প্রভৃতি বৃহৎ ট্রাষ্টগুলি এখনও অটুট। এই অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থাও নাৎসী প্রথায় চলিতেছে। এই কারণে পূর্ব্ব অঞ্চল এখন সমৃদ্ধ, অথচ পশ্চিম অঞ্চল রক্ষার জন্য বৃটেন ও আমেরিকাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে; বৃটিশ করদাতাদের পক্ষে এই ব্যয়ভার বহন করা সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছে। মস্কো সম্মেলনে জার্ম্মানীর দুইটি অঞ্চল সম্পর্কে কিভাবে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যবস্থা হয়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, সুদূর প্রাচ্যে, মধ্য প্রাচ্যে ও পশ্চিম ইউরোপে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিপত্তির একটা সামরিক গুরুত্ব আছে। অদূর ভবিষ্যতে সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সংঘর্ষ শক্তি পরীক্ষার সম্ভাবনা স্মরণ করিয়াই চীনে, গ্রীসে, তুরস্কে ও মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে এবং পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকা ঘাঁটী স্থাপন করিতেছে।

ইন্দো-চীন

ইন্দো চীনের স্বায়ত্তশাসনাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়া গত বৎসর ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সহিত ইন্দো-চীনের (ভিয়েৎনাম) নেতাদের এক চুক্তি করিয়াছিলেন। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ইন্দো-চীনস্থিত চাঁইদের ইহা অসহ্য হওয়ায় তাহারা এই চুক্তিভঙ্গের সুযোগ খুঁজিতে থাকে। হাইফঙ্গে কাষ্টমস্ অফিস স্থাপনে তাহারা আপত্তি তোলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সহরের যে এলেকায় দেশীয়দের বাস, সেখানে গোলা বর্ষণ করে। অতঃপর, ফরাসী সৈন্য উত্তর ইন্দো-চীনে ল্যাংসন্ অধিকার করে এবং ডসন্ আক্রমণ করে। ডিসেম্বর মাসে ফরাসীসৈন্য ইন্দো-চীনে আসিয়া অবতরণ করিতে থাকে। ইহার পর হইতে ভিয়েৎনামের জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ হো চি মীনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনামীদের সহিত ফরাসী সৈন্যের যুদ্ধ চলিতেছে। এই কয় মাস প্রবলভাবে যুদ্ধ করিয়া

ফরাসী সৈন্য উত্তর ইন্দো-চীনের কয়েকটি নগর ছাড়া আর কিছু অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। দক্ষিণে কোচিন-চীনে ফরাসীদের মুষ্টি শিথিল হইয়াছে; এই অঞ্চলে প্রচণ্ড গেরিলা তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। ফরাসীদের এই ব্যর্থতার জন্য শাসনকর্তা ড আর্জাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে এমিল এদুয়ার্দ বুলার্ডকে নিয়োগ করা হইয়াছে। ডাঃ হো চি মীন্ বৃথা রক্তপাত বন্ধ করিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য ফ্রান্সের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। বর্ত্তমানে ইন্দো-চীনের ব্যাপার লইয়া ফরাসী মন্ত্রিমণ্ডলে গোলযোগ চলিতেছে। ফরাসী কম্যুনিষ্টরা অবিলম্বে ইন্দো-চীনের সহিত মীমাংসা করিবার পক্ষপাতী। গত ২০শে মার্চ্চ জাতীয় পরিষদে সামরিক ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনার সময় কম্যুনিষ্ট নেতা ডুক্লো বলেন যে, ডাঃ হো চি মীনের গভর্ণমেণ্টই ভিয়েৎনামের প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক গভর্ণমেণ্ট; এই গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিতেই হইবে। ফ্রান্সের রামাদিয়ার মন্ত্রিসভা কম্যুনিষ্টদের এই দৃঢ়তা উপেক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

ইন্দোনেশিয়া

বহুকাল আলোচনা চলিবার পর গত অক্টোবর মাসে চেরিবনে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ইন্দোনেশিয়ার নেতাদের এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তিতে ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ ইন্দোনেশীয় রিপাবলিকের বাস্তব (de facto) সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এক জটিল শাসনতন্ত্রের দ্বারা ওলন্দাজ ইন্দোনেশীয় ইউনিয়ন গঠনের ব্যবস্থা হয়।

এই চারি মাসের মধ্যে ওলন্দাজ ইন্দোনেশীয় চুক্তি অনুমোদিত হয় নাই। এদিকে ওলন্দাজ সৈন্য ইন্দোনেশিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর নানা উপায়ে জাতীয়তাবাদীদের সহিত বিরোধিতা আরম্ভ করিয়াছে। কৌশলে চেরিবন্ চুক্তির অনুমোদন বন্ধ করাই ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। চেরিবন্ চুক্তি অনুসারে ইন্দোনেশীয়ায় ওলন্দাজ সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ এই সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধিই পাইতেছে। ২৩।৩।৪৭

দেহ ও দেহাতীত

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

২০

কয়েক দিন পরে সকালের দিকে একদিন সকলেই অমলের ওখানে সমবেত হইল—চা পান করিতে করিতে রমলা কহিল—অমলবাবু পরোয়ানা এসে গেছে, আজই যেতে হবে।

পরোয়ানা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং তাহার মালিক কে তাহা উহ্য থাকিলেও বুঝিতে কোন অসুবিধা হইল না। অমল কহিল—আজই? এমন জমাট বার্দ্ধক্যের ক্লাব ছেড়ে চলে যাবেন?

রমলা কহিল—উপায় কি? আর এখানে বসে থাকলেই ত চলে না—

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল—এখন ত আর নবোঢ়া বধূটি নও, লিখে দাও না যে কিছু দিন পরে যাবে—

—তাঁরই শরীর খারাপ, নইলে গরজ ছিল না। না গেলে মনে ক'রবে বুড়োকালে ত্যাগ ক'রলাম।

অপর্ণা পুনরায় কহিল—ত্যাগ করা আর থাকা ত প্রায় সমানই এখন—মেয়েকে পাঠিয়ে দাও সেবা-যত্ন ক'রবে। তোমার চেয়ে ভাল পারবে সে—

—তারও ত যেতে হবে, জামাই লিখেছেন—

অমল ও অপর্ণা হাসিয়া উঠিল। অমল প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে কহিল—বৌমা, আর একটু চা দাও রমলা দেবী ত চলেই যাবেন—

চা সহযোগে নানা আলোচনা চলিয়া রমলার বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আসি তা হ'লে অমলবাবু, অপর্ণাদি—

অমলের অন্তরের মাঝে হঠাৎ যেন কেমন করিয়া উঠিল—রমলা চলিয়া যাইতেছে, হয়ত আর কোনদিন দেখা হইবে না। সে যদি ইতিমধ্যে এখানেই দেহরক্ষা করে তবে এই শেষ বিদায়। অমল আর্ত্ত কণ্ঠে কহিল—হাঁ, জীবনের এই বোধ হয় শেষ বিদায়—আর একবার দেখা হওয়ার মত আয়ু বোধ হয় আর অবশিষ্ট নেই।

রমলা সাশ্রুনেত্রে অমলের শীর্ণ লোল মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—সম্ভবতঃ তাই। এখানে আবার কতকাল পরে আসবো কে জানে? এই কটা দিন জীবনে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে—

অমল কহিল—হ্যাঁ স্মরণীয়ই হ'য়ে রইল। কে আশা করেছিল রুগ্ন বার্দ্ধক্যে আপনাদের দেখা পাবো। নিষ্ফল যৌবনকে বার্দ্ধক্যে যেন হাতের মুঠোয় পেয়েছিলাম—কিন্তু বার্দ্ধক্য তাকে ক্ষমা ক'রলে না।

রমলা নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। সামনের উঠানটা পার হইয়া ভাবিল—এইখানেই শেষ—পূর্ণচ্ছেদ। আর হয়ত কোনদিন অমলের সঙ্গে দেখা হইবে না—একদিন তার মৃত্যু সংবাদ সংবাদপত্র মারফতে জানিবে! অমল রহিবে না, রহিবে তাহার স্মৃতি। যৌবনের সেই বিদায়ের দিন যেমন করিয়া সারাজীবন একটা স্মরণীয় স্মৃতি হইয়া রহিয়াছে। সেই আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভিমান পরিতাপ চিরতরে নীরব হইয়া যাইবে। এই অমল পৃথিবীর উপরে বাস্তব থাকিয়াও যেমন মরীচিকার মত অবাস্তব ছিল, তাহাকে একাকী রাখিয়া সরিয়া গিয়াছিল মৃত্যুর পরেও তেমনিই রহিয়া যাইবে—সেই বিদায়, সেই অনুশোচনা আজ তাহার জীবনে চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে, মৃত্যুর পরেও থাকিবে। মানবজীবন এমনি একক, এমনি দুঃখবিলাসী—

গেট দরজাটা ঠেলিয়া রাস্তায় পা দিয়া রমলা পিছন ফিরিয়া চাহিল। অপর্ণা ও অমল রৌদ্রতপ্ত বারান্দায় তেমনি করিয়াই বসিয়া আছে—মুখোমুখি। টেবিলের ব্যবধানে ব্যাহত—অমলের শুভ্র কেশ রৌদ্রে চিকমিক্ করিতেছে।

রমলার অন্তরে কি যেন একটা অজ্ঞাত বেদনা অকস্মাৎ সুপ্তোত্থিত অজগরের মত মোড়ামুড়ি ছাড়িয়া জাগিয়া উঠিল। চোখ দুইটি জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া গেল—তাহার ভিতর দিয়া স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না—পৃথিবীটা অকস্মাৎ যেন ঝাপ্‌সা হইয়া কুয়াসাবৃত হইয়া গিয়াছে। রমলা মনে মনে কহিল—এই শেষ বিদায়—অন্ততঃ এ-জীবনের মত। একদিন এমনি করিয়াই সে অপর্ণা ও অমলের নিকট হইতে একাকী বিদায় লইয়াছিল—সেদিন এমনি দুঃখে পরিতাপে একাকীরে তাহার চোখ দুইটি অশ্রুপ্লুত হইয়া গিয়াছিল আজও ঠিক তেমনি, একাকী একান্ত একাকী বিদায় লইয়া যাইতেছে—কেহ জানিল না, কি বেদনায় কি দুঃখে সে চলিয়া গেল—কোন অনুযোগ করিল না, অভিযোগ করিল না—

ঝাপ্‌সা চোখের দৃষ্টিকে আর একবার সে পিছন পানে ন্যস্ত করিল—এখনও দেখা যায় অস্পষ্ট অমল ও অপর্ণা নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে। রমলা মনে মনে আর একবার বিদায় নমস্কার জানাইয়া কহিল—বিদায়, এই পৃথিবীর ধূলায় এই শেষ বিদায়—আর দেখা হইবে না—জীর্ণ নেত্র আর অশ্রুপ্লুত হইবে না—অমল আর আসিবে না—

অমলের বাত-ব্যাধিটা আজ কয়েকদিন বেশ বাড়িয়াছে—দুইটা হাঁটু ফুলিয়া বেদনা হইয়াছে। উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্বরও হইতেছে। সে লাঠির ভর দিয়া কোনমতে এধর ওধর করে। নন্দিতার সেবা যত্নের ত্রুটি নাই, খোকাও চিকিৎসার ত্রুটি রাখে নাই—কিন্তু অমলের বিকল দেহযন্ত্র কিছুতেই যেন আর সচল হইতে চাহিতেছে না।

অপর্ণা তাহার নিরুদ্ধ জীবনের একাকীত্ব দূর করিতে সকাল বিকাল আসে কোন কোনদিন নন্দিতার হেফাজতে তাহাকে রাখিয়া বেড়াইতে যায়। অমল কোন কোনদিন একান্ত একাকী সন্ধ্যাটা অতিক্রম করে। বার বার রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখে অপর্ণা সদলে ফিরিল কিনা। অত্যন্ত আগ্রহে অপর্ণার ফিরিবার আশা করে—শরীরটা তাহার যতই অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে, মনটা যেন ততই অপর্ণার সঙ্গকে চাহিতেছে। তাহার মনে হয় অপর্ণাকে কিছুই বলা হইল না, কিন্তু সামনে আসিলে কি বলিবে তাহা সবই ভুলিয়া যায়। অপর্ণা কোন কোন-দিন আসে না, অমল একাকী বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। খোকা আর তার রাজকন্যা পিশিমা বেড়াইতে যাইয়া অত্যন্ত বিলম্বে ফেরে। অমলের নিঃসঙ্গ জীবনে একটা নিরাশা ও অভিমান তাহাকে পীড়িত করে—

সেদিন একটা আরাম কেদারায় বসিয়া অমল বাহিরের পানে চাহিয়া ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীখানি জনহীন, কলরবহীন নিঝুম। দূর দিগন্তে, সামনের বাড়ীর ছাতে রংএর মেলা বসিয়াছে—ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। ধীরে, অতি ধীরে, সন্তর্পণে, হালকা অন্ধকার অস্বচ্ছ কালো ডানা মেলিয়া পৃথিবীকে দীর্ঘশ্বাসের বেদনায় ঘিরিয়া ফেলিতেছে। পরিদৃশ্যমান জগতের

রঙীণ ছবি ধীরে ধীরে মৃত্যুর গাঢ় কালো অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চারিপাশে বিরহীর অশ্রুকণা যেন কালো কুয়াশার মত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। নিশীথ রজনীর বুক চিরিয়া কে যেন বুককাটা আর্ত্তনাদে চারিদিক ভরিয়া দিয়াছে—দূরাগত কলরবে যেন তাহারই করুণ সুর।

নন্দিতা কি কারণে তাহার কক্ষে আসিয়াছিল, অমল প্রশ্ন করিল—বৌমা, অপর্ণা আর খোকা কি এল?

—না, তাঁরা ত ফেরেন নি।

—একটা খবর দাও না।

ভৃত্য ক্ষণকাল পরে সংবাদ দিল, তাহাদের সন্ধান মিলিল না। অমল অকারণে কয়েকবার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সদর দরজার দিকে চাহিল কিন্তু অপর্ণা আসিল না। নিশ্চিন্ত আলস্যে কেদারায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া অমল গড়গড়া টানিতে লাগিল।

ভাবিল—এই হয়ত' তাহার জীবনের শেষ রোগশয্যা। এই জগত তাহার সমস্ত রূপ রস গন্ধ লইয়া চিরতরে চোখের উপর হইতে মুছিয়া যাইবে—সেই সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণাও হয়ত ভারাক্রান্ত মনের কোণ হইতে বিদায় লইয়া চির বিস্মৃতির মাঝে আত্মগোপন করিবে—খোকা যাইবে, নন্দিতা যাইবে—অনন্ত শূন্যে অনন্ত বিস্মৃতির মাঝে, অনন্ত অন্ধকারে সে চলিবে একান্ত একাকী—সেখানে পথের দিক নাই, পথ নাই—চলার বিরাম নাই। পথহীন, আলোহীন অনন্ত অসামঞ্জস্যময় এই পৃথিবীর উপরেও ঠিক এমনি অনির্দ্দিষ্ট পদক্ষেপে সে দীর্ঘ ৫৫ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে—জীবনের কোন সঞ্চয় নাই। নিষ্ফল সাধনার হতাশায় একটা গভীর একাকীত্ব তাহার জীবনকে অশ্রুর প্রণালী দ্বারা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে—

অনাগত মৃত্যুর ছায়ায় অনন্ত শূন্যতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া অমলের অন্তর হাহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—হায় হায়, সকলই রহিবে সে শুধু চলিবে একাকী দীর্ঘ পথ—যেমন একাকী সে জীবনের দীর্ঘ অর্দ্ধশতক চলিয়াছে—

আজ মনে হয়—উন্মুখ যৌবনের প্রারম্ভে ওই অপর্ণাকে ঘিরিয়া তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবশ কল্পনা স্বপ্নের তুলি দিয়া জীবনপট রাঙাইয়া তুলিয়াছিল—রঙীণ আশার উন্মাদনায় সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। উন্মত্ত কোলাহলের মাঝে জীবনের সাফল্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে। তারপর একদিন বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যায়, বিদায়কালে তাহার একক জীবনের গাঢ় দীর্ঘশ্বাসে চির-বিদায়-ক্ষণ ঘোষণা করিয়া দিল—ব্যথিত বেদনার্ত্ত করুণ দৃষ্টি নিস্তব্ধ বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গে অশ্রুর প্রলেপ মাখাইয়া তাহাকে সুগন্ধী করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। অন্ধকার আকাশের পটে বাড়ীর উন্মুক্ত গবাক্ষ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার শোকার্ত্ত অন্তর অপর্ণার দুই বিন্দু অশ্রুসম্পাতে বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ আকাশের ঘন অন্ধকারে চির অপসৃত হইয়া গেল—তাহার পর অবিরল বারিসিঞ্চনে সে কেবল এই পৃথিবীর তৃণশষ্পকে আপনার রক্তাক্ত হৃদয়ের অর্ঘ দিয়া সবুজ করিয়া রাখিয়াছে। সেদিন ওই নিষ্ঠুর বধির নারীর অন্তর একবিন্দু সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠে নাই—

যখন সে আসিয়াছে তাহার অসম দেহের অর্ঘ্য লইয়া, তখন দেবতা বিদায় লইয়াছেন। ছিন্নবৃন্ত ফুলের মত সে রাজপুত্রের রথচক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া গিয়াছে—রাজপুত্র চলিয়াছে উদ্দাম রথে তাহারই যৌবন-কুসুম চয়নে। মানুষের চাহিবার যাহা ছিল তাহা ত সেদিন তাহার সাধ্যাতীত—

বিবাহিত জীবনের মাঝে এমনি রোগশয্যায় শুইয়াই যেন একান্ত একাকী সে বার বার দরজার পানে চাহিয়াছে—প্রতিটি মুহূর্ত্ত ব্যাকুল আগ্রহে কাটিয়াছে কিন্তু গৌরী আসে নাই, অপর্ণাও আসে নাই। খোকার চারিপাশ শীতল অঞ্চলে ঘিরিতে যাইয়া তাহারা তাহাকে উন্মুক্ত করিয়া হিমশীতল প্রকৃতির মাঝে ঠেলিয়া দিয়াছে। স্বপ্নের মাঝে তাহাদের পাওয়া যায় নাই—কখনও যাইবে না, অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের মাঝে অযাচিত ব্যবহারিক জীবনের সামগ্রীর মত তাহারা যেন একান্তই অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক।

অন্তর তাহার চলিয়াছিল দূর সুদুর্গম পথে আপনার স্বপ্নের বোঝায় নিপীড়িত ভারবাহী পশুর মত—সমগ্র জীবন নির্ব্বাসিত যক্ষের মত সে কেবল অলকা উজ্জয়িনীর ধূপগন্ধামোদিত কেশস্তবকস্নাত, লোধ্ররেণুপরিপ্লুত মানসী মূর্ত্তির স্বপ্নেই দীর্ঘ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে, কুবেরের অভিশাপ তাহার পুরুষ অন্তরে চিরন্তন হইয়া রহিয়া গিয়াছে। সুদূর শতাব্দীর কুঙ্কুমপত্রলেখাবৃত বক্ষের

নীবিবন্ধ স্বপ্নের মাঝে একটিবারও শিথিল হইয়া তাহাকে আহ্বান করে নাই—কেবলমাত্র বারবার বিদায় ঘোষণা করিয়া তাহাকে শোকার্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। যে নিঠুরা বধিরা উর্ব্বশী চির অস্তমিত—পরশপাথরহারা ধূলামলিন সন্ন্যাসী পুরাতন দীর্ঘ পথে নিষ্ফল অনুসন্ধানে চলিয়াছে মাত্র, আর তাহার অন্তরের দিকবলয় আর্ত্তনাদে বিদীর্ণ করিয়া আজ দিকে দিকে ক্রন্দসী রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। সমস্ত আকাশ ভরিয়া সে কাঁদিয়া উঠিতেছে—মিথ্যা—মিথ্যা স্বপ্ন, নিষ্ফল তাহার জীবন-সাধনা।

যৌবনের স্বপ্ন—জীবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া আর একবার প্রতারণা করিয়া গিয়াছে। সারাজীবনের কর্ম্মাবসানে, দীর্ঘ যুদ্ধে বার বার আহত ক্লান্ত সৈনিকের মত শিথিল স্থবির দেহের মাঝে শরবিদ্ধ রক্তাক্ত অন্তর আজ বেদনার্ত্তকণ্ঠে বার বার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—আসিল না, আর আসিবে না। জড় সুপ্ত বধির বাস্তবের দ্বারে অন্তরের শোকার্ত্ত করাঘাত নিষ্ফল—একান্তই নিষ্ফল।

অমলের জ্যোতিহীন নিষ্প্রভ চোখ দুইটি আর একবার জলে ভরিয়া উঠিল। নন্দিতা কখন যেন আলো লইয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অমলের আর্দ্র চোখের পানে চাহিয়া কহিল—বেদনা কি খুব বেড়েছে বাবা? কি ক'রবো—

অমল সস্নেহে তাহাকে চেয়ারের হাতলটার উপর বসাইয়া কহিল—না মা, এ বেদনা ত যাবার নয়—

—মালিশটা দিলে ক'মবে, তাই দেব।

—থাক্। সস্নেহে নন্দিতার মাথাটাকে আপনার বুকের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া অমল রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—এ বেদনা দূর করা তোমার মালিশের সাধ্যাতীত মা। যা পাওয়া যায় না তার জন্যে যারা কাঁদে তাদের কান্নার ত শেষ নেই। তুমি কেমন ক'রে তা দেবে—তা আস্‌বে না, এ জীবনে আর আস্‌বে না—

অমলের আর্দ্র চোখ দুইটি হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরঝর করিয়া বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত নন্দিতার কুঞ্চিত কেশাকুল মাথাটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অমল থামিয়া থামিয়া কহিল—তোমরা সুখী হ'য়ো—খোকা আর তুমি—

নন্দিতা শুনিল, অমলের শুষ্ক বক্ষের মাঝে দীর্ঘদিনের শ্রমক্লান্ত হৃদপিণ্ডটা তখনও চলিতেছে—ধুক্ ধুক্—

সমাপ্ত

বৈচিত্র্য

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ সান্যাল এম-এ

দুঃখ-সুখ, মন্দ-ভালো, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আলোক-আঁধার
সব নিয়ে অপরূপ লাগে মোর এ বিশ্বসংসার!
বৃথা হেথা কিছু নয়—একটিও অণু-পরমাণু—
ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছ হ'তে আকাশের দীপ্ত শশিভানু।
রোগ-শোক, দুঃখ-দৈন্য, ব্যথা-জ্বালা, মর্ম্মের দহন
যুগে যুগে সাধিতেছে যেন কোন্ মহাপ্রয়োজন।
উদ্যত বজ্রের মত যারে দেখি' মনে জাগে ভয়,
অদৃশ্য মঙ্গল যেন তারো মাঝে লুকাইয়া রয়।
পাপী ব'লে যারে দেখি' ঘৃণাভরে ফিরাইনু মুখ,
সহে তার পদভর নিরন্তর ধরণীর বুক!
যদি না থাকিত পাপ—কে করিত পুণ্যের আদর?
না থাকিলে অমারাতি ম্লান হ'ত জোছনার থর!
ক্রুশ-বিদ্ধ না হইত খৃষ্ট যদি দুর্জ্জনের হাতে—
ভরিত কি ক্ষিতিতল ক্ষমার ভাস্বর মহিমাতে?
ভালো সে হ'য়েছে ভালো—মন্দ তার পাশে আছে তাই,
পলান্নের পাশাপাশি দরিদ্রের শাকান্নও চাই।
লালসা-লোলুপ ঘৃণ্য কলুষিত পণ্যস্ত্রীর দল
সতীত্বের মহিমারে এ জগতে ক'রেছে উজ্জ্বল!
শুভ্র কলহংস থাক্—চাই কালো কোকিলের গান—
শিশিরের শেষে যাহে উলসিবে বনানীর প্রাণ।
মাঘের হিমানী কেবা চিরদিন চাহে ধরামাঝ—
হাসিছে পশ্চাতে তার ফুলশর হাতে ঋতুরাজ।
অতসী কুসুম আভা দিত শুধু আঁখি ঝলসিয়া—
স্নিগ্ধ শ্যামরূপ যদি না মিলিত ভুবন খুঁজিয়া!
এ জীবনে বিজড়িত নিশিদিন কান্না আর হাসি,
মরণের নদীকূলে বাজিতেছে জীবনের বাঁশি।
প্রেমে যে বিরহ জাগে তাও নয় ধাতার খেয়াল
মিষ্টসনে অম্লরস আম্রফলে ক'রেছে রসাল!
অনন্ত বৈচিত্র্যময় তাই বিশ্ব হ'য়েছে সুন্দর,
সপ্তবর্ণ-সমাবেশে ইন্দ্রধনু এত মনোহর।
তুচ্ছ নয়—ব্যর্থ নয় কিছু হেথা, কহে মোর প্রাণ
অমৃতের পাশে তাই গরল পেয়েছে হেথা স্থান!
ওরে কবি, দুঃখ-ব্যথা যত তোর তাও বৃথা নয়,
মধুর কাব্যের ছন্দে পেয়েছে সে মূরতি বাঙ্ময়!

রাজপুতের দেশে

নরেন্দ্র দেব

চারখানা রিক্‌শ 'বুক' করা হল। কারণ একখানিতে একজনের বেশী নেবার হুকুম নেই। আমার সঙ্গের দু'টি মহিলার মধ্যে কেউই 'শক্তি' হিসাবে একেবারেই শক্ত পদাতিক নন। কন্যাটি নাবালিকা, আমি নিজে বৃদ্ধ। একমাত্র বন্ধুপুত্রটি পদসঞ্চালনে সুপটু! নিজেদের ঘরের মোটর গাড়ী এবং পথে ট্রাম ট্যাক্সী বাস প্রভৃতি যান বাহন যথেষ্ট থাকতেও বাবাজী কোনটাতেই চড়েন না। পথশ্রমের কৃচ্ছ্রসাধনায় তিনি অভ্যস্ত। বালীগঞ্জ থেকে বৌবাজারে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই নয়। তবু, তাঁর জন্যও একখানা রিকশ রাখা হ'ল। এক যাত্রায় পৃথক ফল ঠিক নয়। একখানায় যাবেন জননী সমভি-ব্যবহারে নবনীতা, কারণ শিশুদের ফাউ হিসাবে নাকি নেওয়া চলে। আর একখানিতে তার মাসিমা, বাকী দু'খানিতে আমরা দুই বীরপুরুষ।

বেলা চারটের সময় রিকশ আনতে বলা হ'ল। স্থির হল মধ্যাহ্ন ভোজনের পর একটু বিশ্রামান্তে বেরুনো যাবে—'সান-সেট-পয়েণ্টে' সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনের জন্য। ফেরবার মুখে মেয়েদের নিয়ে একটু বাজার বেড়িয়ে আসা যাবে। রিক্‌শ ভাড়া ঠিক হল তিন ঘণ্টার জন্য প্রতি রিক্‌শ মাত্র ২৲ টাকা। এখানে পাহাড়ের পথে রিকশ টানতে প্রতি রিক্‌শ পিছু চারজন করে কুলি লাগে। সে হিসাবে ভাড়া খুব সস্তা মনে হ'ল।

অপরাহ্নের ব্যবস্থা পাকা ক'রে আমরা প্রসন্নমনে একটু কাছাকাছি পদব্রজে ঘুরে আসতে গেলুম। পণ্ডিতজী বলে দিলেন, নখীহ্রদ ও রঘুনাথজীর মন্দির এখান থেকে খুবই কাছে। ১০ মিনিটের পথ। আপনারা অনায়াসে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসতে পারবেন।

কিন্তু, আমরা তো পথ চিনিনা! নবনীতা বললে, আমি চিনি। কালই তো ঘোড়ায় চড়ে আমি নখী লেকের চারপাশে ঘুরে এসেছি।

পথ চেনা সম্বন্ধে নবনীতার উপর নির্ভর করা চলে। এ বিষয়ে তার কুকুরের মতো একটা স্বাভাবিক দিঙ্‌ নির্ণয়-প্রবণতা আছে। একবার যে-পথে সে ঘুরে আসে—সে পথ আর সহজে ভোলেনা।

চলেছি আমরা নখীহ্রদের দিকে। পথে দেখা হ'ল একদল বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে।

দীর্ঘ সুকান্ত একটি যুবক, সঙ্গে তরুণী স্ত্রী, দু'টি সুকুমার শিশু এবং বৃদ্ধা মাতা। যুবকের পরিধানে য়ুরোপীয় বেশ, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও জননী না থাকলে হয়ত আমরা তাঁকে বাঙালী বলে বুঝতেই পারতুম না। কারণ এদেশীয় অনেক লোকই স্যুট পরে বেড়ান।

মাউণ্ট আবুতে এসে এই প্রথম বাঙালীদের সঙ্গে দেখা হল। নবনীতার মাধ্যমে আলাপ হয়ে গেল। শোনা গেল তাঁরা আমেদাবাদ থেকে দেওয়ালীর ছুটিটা কাটাতে

এখানে বেড়াতে এসেছেন। নিকটেই একটি ধর্ম্মশালায় উঠেছেন। ভদ্রলোক আমেদাবাদের কোনও একটি টেক্স্‌টাইল মিলে কাজ করেন।

দুধের অভাবে ছেলেদের কষ্ট হ'চ্ছে শুনে আমরা তাঁকে অভয় দিয়ে বললুম,কাল সকালে আমাদের বাসায় আসবেন। খাঁটি দুধ আট আনা সের যতটা চাই আনিয়ে দেব।

আমরা আজ বিকেলে 'সান্‌-সেট্‌-পয়েন্টে' যাবো সূর্য্যাস্তের শোভা দেখতে—একথা শুনে তাঁরাও আমাদের সঙ্গে যাবেন বললেন।

আমরা গেলুম, তাঁদের বাড়ী দেখে আসতে!

প্রায় নখীহ্রদের ধারেই তাঁদের বাড়ী। সেকেণ্ড রো'তে হ'লেও দ্বিতলের চাতালে বসে চা খেতে খেতে নখীহ্রদের অপূর্ব্ব দৃশ্য ও অসাধারণ সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়।

নখীহ্রদে বোট ভাড়া পাওয়া যায়। বহু লোক সকালে ও বিকেলে এই বোটে চড়ে লেকে বিহার করেন। ভাড়া জনাপিছু মাত্র ছ' আনা। লেকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। ভাড়াটা সাধ্যের অতিরিক্ত নয় জেনে লেক-বিহারের বাসনা দুর্নিবার হয়ে উঠলো। একখানা বোট নিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লুম।

মিঃ ও মিসেস্‌ গুপ্ত, তাঁদের মা ও ছেলে দুটিকে নিয়ে আগেরদিন বিকেলে নখীহ্রদে নৌকা বিহার করে এসেছেন ব'লে আজ আর তাঁরা গেলেন না।

নখীহ্রদের চতুর্দ্দিক উচ্চ পর্ব্বত বেষ্টিত, কেবল উত্তর পশ্চিম দিকটি খোলা। একমাত্র পূর্ব্বদিকে ছাড়া অন্য সব দিকেই জল বেশ গভীর। বৃষ্টির জল পাহাড় ঠেলে বেরুতে না পেরে এই হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে।

এই হ্রদটির সম্বন্ধে এখানে পৌরাণিক কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে যে একদা স্বর্গচ্যুত তেত্রিশ কোটী দেবতা নাকি অসুর নির্য্যাতনের অসহ্য পীড়ন হ'তে আত্মরক্ষার আশায় এই পর্ব্বতে এসে আশ্রয় নেন এবং তাঁরাই জলের প্রয়োজনে নিজেদের পাঁচ আঙুলের নখের দ্বারা পাহাড়ের বুক চিরে এই হ্রদ খনন করেছিলেন। সেই জন্যই এর নাম 'নখীহ্রদ' এবং হিন্দুরা এটিকে পবিত্র সরোবর বলে মনে করে। এই হ্রদের তীরেই প্রসিদ্ধ রঘুনাথজীর মন্দির। অনুমান চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সাধু রামানন্দজী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর, ধীরে ধীরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে নানা ভক্তের দানে এই মন্দির ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে। আজ মন্দিরের কর্তৃপক্ষ দেবতার সঞ্চিত অর্থে একটি বৃহৎ মর্ম্মর দেউল নির্ম্মাণ করেছেন প্রাচীন মন্দিরের প্রাঙ্গণে। এটি আধুনিক মন্দির-স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

রঘুনাথজীর মন্দির ছাড়া মহাবীর মন্দির প্রভৃতি আরও কয়েকটি ছোট বড় মন্দির ও সাধু সন্ন্যাসীদের আশ্রম ও গুহা আছে—এই পবিত্র হ্রদের তীরভূমি বেষ্টন করে।

বেলা ১২টা হয়ে গেল আমাদের বাড়ী ফিরতে। কারণ, ফেরবার পথে আমরা 'বিশ্রাম-ভবন' এবং আরও কয়েকটি অতিথিশালা দেখে এলুম। রঘুনাথজীর মন্দির সংলগ্ন একটি ভাল অতিথিশালা আছে। দুলেশ্বর মন্দির সংলগ্নও একটি অতিথিশালা আছে। এগুলিতে সব ইলেকট্রিক লাইট ও কলের জলের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু মলশোধক শৌচাগার নেই। 'বিশ্রাম-ভবনে' ১৭খানি ঘর ও সংলগ্ন রান্নাঘর আছে। দৈনিক নামমাত্র ভাড়া দিতে হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন শ্রেণীর ঘর। প্রথম শ্রেণীর ঘরগুলি একটু বড়। ভাড়া দৈনিক ১৷৵৹ মাত্র! যাত্রীদের প্রয়োজনীয় সবরকম আসবাব ও তৈজসপত্র বিনামূল্যে সরবরাহ করে। মন্দিরসংলগ্ন অতিথিশালাগুলিতে ভাড়া নেয় না। কিন্তু মাছ মাংস রান্না করা নিষেধ। "শান্তি বিজয় গুরু সেবা সদনেও" এই ব্যবস্থা। তবে সমস্ত অতিথিশালাগুলির মধ্যে এইটিই সব চেয়ে ভালো মনে হল। কম্পাউণ্ড ও বাগান সমেত প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী। প্রতি ঘরের ভাড়া দৈনিক ৷৵৹ মাত্র! বাজার হাট, পোষ্ট অফিস, মোটর স্টেশন কাছাকাছি।

আমরা বাড়ী ফিরে দেখি বান্ধবী মধ্যাহ্ন ভোজন প্রস্তুত করে বসে আছেন। রান্নাঘরের ভার আর কারুর হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে সাহস করেননি। শ্রীমান ভোলানাথকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন ও মাছ-মাংস রান্না করে রেখেছেন। আবু পাহাড়ে অভাব যদি কিছু থাকে তবে সে এই মাছের। সবদিন পাওয়া যায় না। চালানের উপর নির্ভর করে। 'তালাও'গুলি যদিও মাছে ভরা, পার্ব্বত্য ঝরণাতেও বড় বড় মাছ খেলে বেড়াচ্ছে দেখেছি। কিন্তু খাওয়া ত' দূরের কথা, একটিও ধ'রে তোলবার হুকুম নেই। সমগ্র রাজপুতানায়

জৈনধর্মের প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। সমস্ত রাজপুত জাতটাই প্রায় নিরামিষাশী।

স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম ক'রতে না করতেই চারটে বেজে গেল। মেয়েরা কাপড় বদলে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন, কিন্তু রিক্‌শর দেখা নেই! সাড়ে চারটে হ'ল দেখে ম্যানেজারকে তাড়া দিতে গেলুম। কিন্তু তিনি নেই। সহকারী ম্যানেজার অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ ক'রে বললেন, মাপ করবেন। আমরা অনেক চেষ্টা করেও কুলি যোগাড় করতে পারলুম না। সমস্ত 'রিক্‌শা-পুলার' দেওয়ালীর উৎসবে মেতে আছে। আজ কেউ কাজে লাগতে চাইচে না। একটা দিন অপেক্ষা করুন। আজ হ'লেই দেওয়ালীর পরব ওদের শেষ হবে। কাল নিশ্চয় যেতে পারবেন! কাল আর কুলির অভাব হবে না।

অগত্যা অত্যন্ত নিরুৎসাহ হয়ে নিরুপায়ের মতো আমরা বাজারের দিকে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। বন্ধুপুত্রকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আমেদাবাদের মিঃ ও মিসেস গুপ্তকে এই দুঃসংবাদটা দেবার জন্য। বাবাজী ওদের খবর দিয়ে আমাদের সঙ্গে বাজারে এসে মিলিত হবেন স্থির হ'ল। কিন্তু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত বাজারে ঘুরেও বাবাজীর দেখা পেলুম না; আমরা তখন অনেক কিছু দুর্লভ জিনিস সংগ্রহ করে বাসায় ফিরলুম।

যুদ্ধের সুদীর্ঘ ছ' বছর কলকাতায় যে সব জিনিসের চিহ্নমাত্র ছিল না, এখানে এখনও সে সবের প্রচুর সমাবেশ দেখে বিস্মিত হলুম। শোনা গেল বোম্বাই থেকে এ সব জিনিসের চালান আসে এখানে। যেমন ধরুন—কোবরা বুট পালিশ, নেস্‌লস্ কণ্ডেন্সড্ মিল্ক, পোলসনস্ বাটার, পণ্ডস্ ক্রীম, কুইঙ্ক্ কালি ইত্যাদি। পার্কার পেন, থার্মোস্ ফ্লাস্ক, উৎকৃষ্ট পোর্সিলেন টি-সেট ও ক্রকারি যে কোনও দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। সরেশ কম্বল, বিলিতি উলেন মোজা, গেঞ্জি ও গরম কাপড়ও যথেষ্ট দেখলুম। দাম খুব বেশী নয়। ফুড কণ্ট্রোলের কৃপায় একমাত্র আহার্য্য বস্তুরই চোরাবাজার চালু আছে এখানে।

রাত্রি আটটা বাজে। বাবাজী তখনও বাসায় ফেরেননি দেখে চিন্তিত হ'য়ে পড়লুম। মিঃ গুপ্তর বাসায় খবর নিতে যাবো কিনা ভাবছি—এমন সময় হারানিধি এসে হাজির! ব্যাপার কি?

"গুপ্তরা ধ'রে নিয়ে গেলেন। তাঁদের সঙ্গে হেঁটেই 'সান্-সেট-পয়েণ্টে' গিয়ে সূর্য্যাস্ত দেখে এলুম! হ্যাঁ, অনেক দূর পথ। প্রায় আড়াই মাইল হবে। সবটা আবার টারম্যাকাডাম করা নয়। শেষের মাইলটাক পথ যেতে ভারি কষ্ট হয়েছে। কাঁচা রাস্তা। কাঁকর বালি আর পাথর কুচিভরা। কিন্তু, সব কষ্ট জুড়িয়ে গেল সেখানে পৌঁছে, চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আর সূর্য্যাস্তের সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে। সূর্য্যাস্তের শোভা এত ভাল লাগলো যে একখানা ছবি তুলে নেবার লোভ সামলাতে পারলুম না। আমার ক্যামেরায় অস্তগামী সূর্য্যের রূপটি ধরা পড়বে কিনা সন্দেহ ছিল। তবু নিলুম একটা!"

বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে সব আলোকচিত্র প্রকাশিত হ'চ্ছে তার পনেরো আনাই বাবাজীর তুলে আনা ছবি।

শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী গুপ্ত একটি শিশুকে বহন করে অনায়াসে পায়ে হেঁটে 'সান্-সেট-পয়েণ্ট' ঘুরে আসতে পেরেছেন জেনে একটু আশা হ'ল যে, কালও যদি রিক্‌শ না পাই, তাহ'লে আমরাও হেঁটে যেতে পারবো।

পরদিন সকালে দুধ নেবার জন্য মিঃ ও মিসেস্ গুপ্ত আমাদের বাসায় এসে হাজির। সঙ্গে মা ও ছেলে দুটিও ছিল। তাঁদের আসতে একটু বেলা হ'য়ে গিয়েছিল। বেলায় কিন্তু এখানে আর দুধ পাওয়া যায় না। এই জন্য ভোরেই ভোলানাথকে পাঠিয়ে তাঁদের জন্য দুধ এক সের সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল।

আমাদের প্রাতরাশের চা জলখাবার বান্ধবীর কল্যাণে আগেই একপ্রস্থ হ'য়ে গেছে। এঁরা আসতে আবার একবার হ'ল। তার পর চললো নানা বিষয়ের আলাপ আলোচনা। কথায় কথায় জানা গেল যে জলাবাড়ীর বিশ্বাস পরিবারের সঙ্গে শ্রীযুক্ত গুপ্তর মায়ের একটা কি যেন কি নিকট সম্বন্ধ আছে। আমাদের বান্ধবী সেই পরিবারের বধূ, অতএব তাঁর আপনজন! সুতরাং পরদিন ওঁদের বাড়ীতে বান্ধবীর নিমন্ত্রণ হয়ে গেল।

গুপ্তদের ছেলে দুটিকে নিয়ে নবনীতা উধাও হয়েছিল। বিস্কুট, লজেঞ্জেস্, চকোলেট ও খেলনা ঘুস দিয়ে নবনীতা তাদের সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিল। এঁদের ওঠবার সময় হ'তে তাদের খুঁজে বার করা হ'ল ম্যানেজারের কোয়ার্টার

থেকে। ম্যানেজারের মেয়ে তারা নবনীতার সমবয়সী। তারা এবং তারার বন্ধুবর্গ যারা, ভগবতী প্রভৃতি কয়েকটি রাজপুত মেয়ের সঙ্গে নবনীতার ইতিমধ্যেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সারা দুপুর 'তারা' সকলে মিলে খেলা ক'রতো। কী ক'রে যে তাদের মধ্যে এই বন্ধুত্ব সম্ভব হয়েছিল সেটা আজও আমাদের কাছে একটা অদ্ভুত রহস্য হয়ে আছে; কেন না, সে মেয়েগুলির মধ্যে একজনও একটিও বাংলা শব্দ বোঝে না এবং নবনীতাও এমন কিছু হিন্দী শেখেনি এখনও, যাতে আরাবল্লী উপত্যকার এই রাজপুতকুমারীদের সঙ্গে সে সামান্য কিছু আলাপ আলোচনাও চালাতে পারে। অথচ, প্রতিদিন নিস্তব্ধ দুপুরে কানে আসতো—তাদের বারান্দায় পাতা খেলাঘর থেকে হিন্দী বাংলা মিশ্রিত অবিরাম কলরব।

জগতের সমস্ত শিশুরাই যে এক জাত, এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। হয়ত' তাদের ভাষাও এক, যে ভাষার সঙ্গে আমাদের কোনও পরিচয় নেই, নইলে এ কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে? ওয়ান ওয়ার্লডের স্বপ্ন বোধ হয় নিছাৎ কল্পনা-বিলাস নয়।

বেলা ৪টে নাগাদ ম্যানেজার খবর পাঠালেন—"মাত্র দু'খানি রিকশ নিয়ে যাবার মতো কুলি সংগ্রহ করতে পারা গেছে। আজ কমিশনার সাহেব নীচে নামবেন বলে আমাদের মোটর স্টেশনের কুলিদের পর্য্যন্ত কমিশনারের বাংলোয় ধ'রে নিয়ে গেছে।" ইংরাজ রাজত্ব! অপ্রতিহত প্রতাপ ওদের! রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তা শোভা পায়!

দু'খানা দুখানাই সই। একটাতে নবনীতাকে নিয়ে তার মা উঠলেন। অন্যটিতে বান্ধবীকে তুলে দিয়ে, আমি চললুম তাদের সঙ্গে পদব্রজে। বন্ধুপুত্রটি কাল 'সান্-সেট্-পয়েন্ট' ঘুরে এসেছেন ব'লে আজ আর অতখানি পথ হাঁটবার পরিশ্রম স্বীকার করতে রাজী হলেন না। আমাকে বার বার সাবধান করলেন—কাকাবাবু, আপনি যাবেন না। আপনার কষ্ট হবে, বুড়ো মানুষ অতটা পাহাড়ী পথ হেঁটে যেতে পারবেন না।

আমিও একটু ইতস্ততঃ করছিলুম। কারণ আমার দুর্ব্বলতা কোথায় আমি জানি। বেশীদূর হেঁটে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদিও আমি খঞ্জ নই, বাতগ্রস্তও নই; দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও সুস্থ একজোড়া পা ভগবান আমাকে দিয়েছেন, কিন্তু দীর্ঘকাল তা পথ চলায় অনভ্যস্ত বলে এই ভারী দেহটাকে বেশীদূর তারা বহন ক'রে নিয়ে যেতে পারে না। অল্প দূর গিয়েই ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে।

পত্নী বললেন—তুমি না গেলে আমিও যাবো না। চলো, পালা ক'রে হাঁটা যাবো। খানিক আমি চড়বো তুমি হাঁটবে, খানিক আমি হাঁটবো, তুমি রিকশায় আসবে। একেই বলে পতিব্রতা স্ত্রী! বান্ধবী বললেন—আমিও কিছুটা পথ হেঁটে যেতে পারবো। নবনীতার মা সেই সময় আমার রিক্শায় উঠে পড়বেন।

সুতরাং নিশ্চিন্ত মনেই যাত্রা করা গেল। পথটি ভারী সুন্দর। দু'ধারে গহন গিরি-অরণ্য, মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী প্রবাহিত হ'চ্ছে। ভারী মধুর ও মনোরম শৈলভাস্বর এই অস্তাচলাভিমুখী পথ। চলে যেতে বিশেষ কিছু কষ্ট অনুভব করছিলুম না। শ্রীমতী অনেকবার পথে রিক্শা থামিয়ে আমায় গাড়ীতে উঠতে বললেন। প্রয়োজন হ'লেই উঠবো ব'লে তাঁকে প্রতিবার নিরস্ত করছিলুম। কিন্তু আর তাঁকে বাধা দেওয়া গেল না। আমি মন্থর পদে হেঁটে চলেছিলুম বলে বরাবরই পিছিয়ে ছিলুম। এবার একখানি রিকশা নিয়ে কুলিরা এসে বললে—হুজুর আইয়ে। মাজী ভেজা।

—মাজী কাঁহা?

—আগে পাঁয়দলমে চলরঁহী—

—উনকো সাথ যো বাচ্চী থি।

—দুসরি গাড়ীপর গৈয়ি।

আমি তখন প্রায় 'সান্-সেট্-পয়েণ্টের' কাছে এসে পড়েছি। ভাবছিলুম—এইটুকুর জন্যে আর হেঁটে যাওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হই কেন? কিন্তু, পাছে শ্রীমতী ক্ষুণ্ণ হন এই মনে ক'রে গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। মিনিট পনেরো পরেই সকলে 'সান্-সেট্-পয়েণ্টে' গিয়ে হাজির হলুম। আমাদের আগে মাত্র দু' একজন সূর্য্যাস্ত-দর্শনকামী সেখানে উপস্থিত হয়েছেন দেখলুম।

তখন ঘড়ীতে দেখা গেল সময় মাত্র ৫৷৷টা। সূর্য্য অস্ত যাবেন ৬টা বেজে ১৫ মিনিটের সময়। সুতরাং ৪৫ মিনিট আগে আমরা এসে পড়েছি। পাহাড়ের কোলে পাথর কেটে দর্শকদের বসবার কয়েকটি আসন এবং

প্ল্যাটফর্ম্ম তৈরি করা আছে। কিন্তু সে এত অল্পসংখ্যক যে তাতে সকল দর্শকের স্থান সংকুলান হয় না! নিত্য এত লোক প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে ছুটে আসে এখানে বিদায়োন্মুখ দিনমণির অস্তরাগ-রঞ্জিত রূপ দেখে ধন্য হবার লোভে, যে পাহাড়ের এই প্রসারিত পশ্চিম প্রান্তে নানা দিক্‌দেশাগত নর-নারীর রীতিমত ভীড় লেগে যায়!

পাছে সামনের জায়গাটুকু এর পর বেদখল হয়ে যায় এই ভয়ে আমরা সবাই সেখানে বেশ করে হাত পা ছড়িয়ে বসে গেলুম! কিন্তু বিদায়ীসূর্য্যের তিরোভাব প্রতীক্ষায় পশ্চিম আকাশের দিকে চেয়ে সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাল চক্ষু সজল হ'য়ে না-ওঠা পর্য্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়নি!

প্রতিক্ষণেই নব নব দর্শক সমাগম হচ্ছিল সেখানে। আমরা তাদেরই মুগ্ধ হয়ে দেখছিলুম। দেখতে দেখতে সেই 'অস্তাচল বিন্দু' জনতামুখর হ'য়ে উঠলো।

"—এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে!"

দেশ বিদেশের কত বিভিন্ন জাতিধর্ম্মের বালক বৃদ্ধ, তরুণ তরুণী, স্নিগ্ধ হাস্যোজ্জ্বল মুখে, প্রাণচঞ্চল এমন একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস নিয়ে সেখানে এসে দাঁড়াচ্ছিল, যে, তাদের সেই উৎসাহের ছোঁয়া লেগে আমাদের মধ্যেও যেন একটা চপল নবীনতা জেগে উঠছিল!

মাথার উপরে ও সামনে যতদূর দৃষ্টি যায়—দিগন্ত ছোঁয়া অনন্ত উদার নীলাকাশ। ডাইনে বাঁয়ে—শ্যামল ঘন অরণ্য-আকীর্ণ স্তব্ধ জনহীন পর্ব্বতমালা—যেন কোন অসীমের উদ্দেশে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে চলেছে এরা। পদতলে—বহু নিম্নে—যেন প্রায় পাতালভূমে—প্রসারিত ধূলি-ধূসর বিশাল উপত্যকা। তার বুক চিরে চলেছে এঁকে বেঁকে ক্ষীণ রজত রেখার মতো এক গিরি-নির্ঝরিণীর শুভ্রোজ্জ্বল জল-ধারা। নয়নাভিরাম সে দৃশ্য—বুক ভ'রে-ওঠা সে পরিবেশ! কখন যে ৪৫ মিনিট পার হয়ে গেছে টের পাই নি। প্রদীপ্ত পার্ব্বত্য ভানুর প্রখর তেজের দিকে চাওয়া যাচ্ছিল না এতক্ষণ! সহসা দেখি বিদায় ব্যথায় বেপথু দিবাকর তাঁর সহস্র রশ্মি সংবরণ করে নিয়েছেন! অপস্রিয়মাণ এক বিরাট স্বর্ণ গোলক ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে আমাদের দৃষ্টি পথ থেকে! (ক্রমশঃ)

প্রগতিবাদী হিন্দুধর্ম্ম

শ্রীপ্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

নবীনেরা বলেন, বহুযুগের পুরোণো হয়েছে সমাজটা, বহুযুগের ঝড়ঝাপটায় ঘুন ধরেছে ধর্ম্মে। তাই বাহনই যদি জীর্ণ হয়, জাতি চলবে কিসে, জগৎসভায় দেশ যাবে কেমন কোরে? হিন্দুর ধর্ম্ম নাকি এত রক্ষণশীল, হিন্দুর সমাজকর্ত্তারা এত প্রাচীনপন্থী যে নবীনের আদর হয় না কোনও দিন।

প্রাচীনের বিরুদ্ধে নবীনের এত অভিযোগ আছে যে একখানা পুরাণ হোয়ে যায়। অভিযোগ থাকবারই কথা। খাতায় কলমে সমাজ চতুর্ব্বর্ণ হোলেও আসলে হাজার বর্ণে দাঁড়িয়েছে। চারিবর্ণে ছন্দ ছিল তবু, আর আজ হাজার বর্ণ ছন্দহারা বেতালা। কর্ত্তা বেঁচে থাকতে চার ছেলে যদি চারটে হাঁড়ি করে, তবু কর্ত্তার মাহাত্ম্যে হাঁড়ির মধ্যে প্রীতি কিছু থাকে। ষোলটা যদি নাতি আসে ভাগ্যে, ষোলটা হবে হাঁড়ি, আর সবাই বলবে—দোষ যত সব ঠাকুর্দ্দার। ঠাকুর্দ্দা বলেন—এত হাঁড়ি করলে কেরে? আমি, না গুণের ছেলে ও নাতিরা? আর হাঁড়িই যে পাঁচীল তুলবে এত, তা কে জানত? হাঁড়ির এ কাণ্ড তো আমার নয়, নাতিদেরই।

সূর্য্যের আলোয় যখন ভেদ ফুটে ওঠে, যখন শুভ্রতায় ফুটে ওঠে লাল নীল হরিৎ···তখন এইটুকু স্বীকার করি যে, লাল নীলেরা সাত রঙে মিলেমিশে একই গোত্রের পরিচয় দিক; কিন্তু গোত্র পরিচয়ে তাদের আপনাপন মৌলিকত্ব বা রঙ্‌ যেন না লুপ্ত হয়। তাতে আমাদের লোকসান। প্রতি রঙের বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা কেন বঞ্চিত থাকব? সমাজ একই মূলের পরিচয় দিক, হোক না কেন সনাতন গোত্র, বলুক আমিই শুভ্রচ্ছটা, তবু রঙের ভেদে প্রতিভা যদি কোথাও ফোটাতে চায়, ফোটাক না কেন? হরিৎ যদি ফুটে উঠতে চায় শ্যামে বনানীতে—তাকে কি অভ্যর্থনা জানাব না, বলব—'শুধু শুভ্রেই তোমার স্থান, তুমি সেথায় ফিরে যাও'—! সমাজদেহের এক প্রতিভা যদি বলতে চায় সে ফুটবে মাটীর সেবায়, তাকে বাধা দিলে সে প্রতিভা সে রঙ যে মাটি হবে। নীল যদি বলে সে ফুটবে আকাশে, ফুটুক না। সে তো আরও লাভ। আলোর শুভ্রে নীল রইল, কিন্তু সে তো সাধারণভাবে, লোকে জানল নীল শুভ্রপরিবারেরই একজন। সমাজ দেহের কোনও প্রতিভা যদি বলে—সে থাকবে আকাশ চেয়ে,

সকলকে এনে দেবে জ্ঞানের সুধা, ভালোই তো। তাই সমাজে যে চারটে রঙ ফুটেছিল তাতে রঙের খেলার মহিমা ছিল। কে জানতো যে রঙের খেলায় লুকোচুরি, বাজীকরণ শেষে দাঁড়াবে প্রতারণায়? প্রতিভা তো আরেক প্রতিভাকে প্রতারণা কর্ত্তে পারে না। তবে যেদিন থেকে নামতে লাগল ধাপে ধাপে তখনই তার বাইরেও পাঁচিল তোলা সুরু হোল। সনাতনের রঙ চাররঙের ভেদে মিলে সুন্দরই ছিল। চার রঙকে হাজার রঙে লক্ষ রঙে ভেঙে রঙের মহিমা তো বুচলই, মূলের যে ছটা ছিল তাকেও হারাল।

নবীনেরা বলবেন—কেন ব্রাহ্মণ হোল উত্তমাঙ্গ, আর শূদ্র অধমাঙ্গ? রঙের ভেদকে কেন পক্ষপাতিত্ব করে আদর অনাদর করা?

গল্প আছে দেহের অবয়বেরা জীবিকার জন্য রোজই খাটত খুটত, একদিন হঠাৎ হিসেব কোরে দেখল—এত খাটুনীর রোজগারেতে ফুলছেন শুধু উদরটি! অবয়বেরা ধর্ম্মঘট করল। কেন তারা উদরকে পোষণ কর্ব্বে? ফল হোল কি, হাড়গিলে হাত, হাড়গিলে পা, শিরফোটা মাথা…। তারা বুঝল তখন প্রত্যেকেরই সমান দরকার দেহস্বরূপ যৌথ কারবারে। পা চলেছে মাটীতে আর মাথা চলেছে আকাশে—দুই-ই প্রয়োজনের অঙ্কে। পা না থাকলে মাথার পতন, আর মাথা বিহনে পায়ের অক্ষমতা। আকাশ উত্তম আর মাটি অধম এই বা কেমন হিসেবে? আর মাটীর সেবাই বা অধম কেন, আর আকাশসেবীই বা উত্তম কেন? পাকে কে বলল নীচু, আর মাথাকে বলল উঁচু। উদর বলবে তার কাছেতে সবই সমান, সমান কাছে—সমান দূরে। উঁচু নীচুর কোনও বোধই তার নেই। সমাজপুষ্টির কাছে উঁচু নীচুর হিসেব নেইকো।

পা ফেললেও ছন্দ ফোটে, মুখে চোখেও ছন্দ ফোটে, হয়ত সে ছন্দের রূপ ভিন্ন—কিন্তু দুই-ই সুন্দর, দুই-ই আদরের।

সনাতনের ভাষ্য করল যারা তারাই করল মাটি। তারা বলল, পা নীচুতে মাথা উঁচুতে। তাই ভাষ্য ভুলে মূলকে বুঝতে হবে। তাই গড়তে হবে সনাতনের নব সংস্করণ বর্ত্তমানের ভাষায়।

কেন, মৎসকন্যা চন্দ্রবংশের মহারাণীর গৌরব পান নি? মিথিলা-রাজচরণে তপোবন-গৌরবেরা জ্ঞানপ্রার্থী হন নি?

ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ উপনিষদ সাক্ষী আছে, ক্ষত্রিয়চরণে ব্রাহ্মণও তিরস্কৃত হয়েছে জ্ঞানাহরণে। প্রাচীনপন্থী ও নবীনধর্ম্মী ব'লে পরিচয় দেন যাঁরা, তাঁদেরকে অনুরোধ করি মহাভারত ও ভাগবত পড়তে, যেখানে ভীষ্ম ধর্ম্মবক্তা, আর যেখানে যশোদা দুলাল-চরণে ব্রাহ্মণীরা লুটালেন ভক্তিভরে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজ পরিচয়ে ও বাসুদেব মহিমায় অতীত ও অনাগতকালকে কোনও সংশয়ে রাখে নি।

এখনও তো নীলের বা গাজনের সন্ন্যাসদের পা ধুইয়ে দেন অব্রাহ্মণ সমাজের সকল বর্ণের মেয়েরা। এই সন্ন্যাসীরা সমাজের কোন্ শ্রেণীর তা সকলেই জানে। কোন্ ব্রাহ্মণ আজ বলতে পারেন পরমহংসের সেই বিদ্রোহী শিষ্য স্বামীজীকে শ্রদ্ধা করেন না? তবে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈশ্য শূদ্রের ভেদ কোথায়?

ব্রাহ্মণ যদি বলতে পারেন, তিনি সত্যিকারের শিক্ষাব্রতী ও চিন্তাশীল, ক্ষত্রিয় যদি বলতে পারেন তিনি সত্যিকারের বলী, বৈশ্য যদি বলেন তিনিই সমাজপোষণ করবেন কৃষি ও বাণিজ্য রক্ষার দ্বারা, আর শূদ্র সত্যিকারের শিল্প ও স্থাপত্যে, পরস্পরের সামনে আপন আপন প্রতিভার শক্তি পরিচয়ে যদি তাঁরা দাঁড়াতে পারেন, তবে প্রতিভার পারস্পরিক সমাদরে ঘুচে যাবে দ্বন্দ্ব, উঠে যাবে পাঁচিল। এমন দিন কি ছিল না যেদিন ব্রাহ্মণ বলেছেন—শূদ্র তুমিই ধন্য, তুমি যে শিল্পপ্রতিভায় শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী। শূদ্র, বলেছিলেন—ব্রাহ্মণ, তুমিই ধন্য, জ্ঞানবিতরণে তুমিই শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী?

তন্ত্র যেদিন গড়ে উঠল, তন্ত্রমত বললে সবাই শক্তিসেবক, সবাই মায়ের ছেলে, কোথায় ভেদ, কিসের ভেদ? বৌদ্ধেরা বললেন—আমরা সঙ্ঘারামের সেবক, পুরুষ নারী জাতিধর্ম্মে কিসের ভেদ? শ্রীচৈতন্যও সেই কথাই কি বলেন নি? সেদিনও স্বামীজী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন—বল অদ্বিজ চণ্ডাল তোমার ভাই। সনাতন ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন। জাতি ও ধর্ম্মের ভেদ সেখানে নেই। শাস্ত্রকার তা চান নি। যুগশ্রেষ্ঠরা তা চান নি। তবু কেন এত পাঁচিল উঠল?

নবীনের কর্ত্তব্য স্বামীজীর বাণী প্রতিধ্বনিত করা—সমাজের প্রতি কোঠায় কোঠায়, প্রতি অলিন্দে রন্ধ্রে।

এখন প্রধান প্রশ্ন এই, হিন্দুর মূল শাস্ত্র কোন্টা? নবীনেরা প্রায়ই বলে থাকেন, তাঁরা যদি একশাস্ত্রে কোনও যুবধর্ম্মী বিধান দেখতে পান্ তবে প্রাচীন পন্থীরা তখনি আরেক শাস্ত্র থেকে তার 'কাটান' বার করেন। এ এক আশ্চর্য্য সমস্যা। একই সঙ্গে একই বিষয়ে পাশাপাশি বিধান ও কাটান কেমন কোরে থাকে? তরুণেরা জানেন, অভিভাবকেরা সকলেই একমতাবলম্বী নন্. কেউ নরম, কেউ বা কঠিন। কেউ বলেন, খোল পারেই পিতাপুত্রে মিত্রতা চলতে পারে বহু বিষয়ে। অপরে বলবেন তখনি—'মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইবে কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! যা বলব মাথা পেতে নেবে।' শাস্ত্র ত ঠিক সমাজের অভিভাবকস্থানীয়। সব অভিভাবক এক নন্। কেউ উদারনীতিক, কেউ বা কঠিনপন্থী, কেউ চরমে, কেউ বা নরমে চলেন। কেউ বা যুবধর্ম্মী, মানুষকে তার সমাজে এগিয়ে দেবার কথাই শুধু ভাবেন। তাই দুই শাস্ত্রের বিধান একই বিষয়ে কখনও এক নাও হোতে পারে। ছেলে যদি খাঁটি হয় অভিভাবকের মন গলাতে কতক্ষণ? কঠোর কঠিনকেও গলতে হয় সে ক্ষেত্রে। আমরা যদি খাঁটি হই, সমাজকে যদি সত্যিই গড়তে ও বাঁধতে চাই, কঠোর ও চরম শাস্ত্রও গলে যাবে।

ভারতের মূল শাস্ত্র হোল তপোবন, কোনও একখানি বিশেষ গ্রন্থ নহে। সকাল সায়াহ্নের অরুণ রাগে ভারতের তপোবন ফুটে উঠেছে। আজ সকালের আকাশ সায়াহ্নের সহিত এক হোতে পারে না। কাল সকালের আকাশ আজকের সকালের সহিতও এক নয়। যুগ-প্রভাত ও যুগসন্ধ্যার রঙে অরুণাভার মাঝেও ভিন্ন মনের প্রভাব। সময় যে এগিয়ে চলে, চলার পথে কখনও ছন্দে নামে অবসাদ—কখনও যৌবন। ভারতের তপোবন সে ছন্দ চিনেছিল, তাই ছন্দ হিসাবে সুর দিয়েছে যুগে যুগে। এখন তাই তো বাঁধা লাগে, এত বিভিন্ন সুরে কথা,

এর কোনটিকে মানব, কোন্‌টিকে দূরে রাখব। হয়তো প্রয়োজন এসেছে এখন নূতন কোরে সুর বাঁধবার।

বৈজ্ঞানিক নবীনকে তাই বলি, আমাদের শাস্ত্র যত আছে তাদের প্রত্যেকে এক একটি যুগের মানযন্ত্র। আমাদের সংস্কৃতি-ধর্ম্ম হোল—বিরাট একটা অব্‌জারভেটরী'। তাতে আকাশ বাতাসের গতি হিসেব করা যায়। এমন বহু যুগের হিসেব বাঁধা আছে সেখানের মানযন্ত্রের আঁকে। সেই আঁকের পাশে বর্ত্তমানকে মেলালেই তুলনামূলক গবেষণায় ধরা যাবে কোথায় ভেসে চলেছে যুগের বাতাস, কত গতিবেগ, ঝড় ঝাপ্টা উঠ্‌তে পারে কিনা। এই সনাতন 'অব্‌জারভেটরীর' নির্দ্দেশ মান্‌লেই জানা যাবে—কোথায় সাবধানতা অবলম্বন কর্ত্তে হবে, কোথায় চলাফেরা পরিবর্ত্তন কর্ত্তে হবে, কোথায় বাঁধতে হবে, কোথায় ভাংতে হবে ঘর। আজ কি ঘোষিত হয় নি এমনই কোন নির্দ্দেশ ?

প্রাচীন বলে উড়িয়ে দিতে পারি না। অভিধান কি প্রাচীন হয় কখনও ? অনেক কথা, নতুন যুগের চলার পথের ভাষা যদি না দেওয়া থাকে তাতে, তবে দরকার একটা নতুন সংস্করণের। যদি বলি, পুরানো অভিধান সব ভুল লেখে, তাতে যত অচল মানে দেওয়া আছে, তবে তার পাশে একটা কোরে সচল মানে লিখে দিলেই হয় ! কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে অভিধান খাঁটি তাতে বেশীর ভাগ কথার মানেই অকাটা, কোনও দিন বদলাবে না, শুধু কতকগুলি নতুন কথা নেই এই যা। তাই অভিধানের পরিবর্ত্তনের চেয়ে পরিবর্দ্ধনের বেশী প্রয়োজন। যাঁরা দমকা হাওয়ায় উড়ে যেতে চান সব পুরানোকে ফেলে রেখে, তাঁদের জানা ভাল, অভিধানের পাতাগুলোকে ছিঁড়লেন যখন রাগে, তখন খেয়াল থাকে না সেই ছেঁড়াপাতার দল দমকা হাওয়ায় তাঁদের সাথে তাঁদের ঘিরেই উড়বে আকাশে। সেই পাতার ভারেই শেষকালেতে ফিরতে হবে।

যা কিছু আগেকার সবই পরিবর্ত্তনযোগ্য, এ চিন্তা ভ্রান্ত। যারা জানাল এটা বর্ত্তমান, বোঝাল তুমি যৌবনভরা, শেখাল এটা যুগ ধর্ম্ম—যৌবনধর্ম্ম, তাদেরকে অস্বীকার করা অসম্ভব। সনাতনের পুঁথিটিতে বর্ত্তমানকে শুধু লিখতে হবে—এসে দেখলুম আকাশ ছিল ভারী, বুড়োর মত, নড়ে চড়ে না, বাক্য সরে না। তাই তাকে রাঙিয়ে দিলুম, হাসিয়ে দিলুম খানিক।

যদি বলেন এতো হলো ডাইরি লিখে চলা, বলব—মন্দ কি ! নিত্য নতুন যুগের রঙে যুবধর্ম্মের লেখা !

বর্ত্তমানের যুবধর্ম্মকে ভারতের সংস্কৃতিতে নিষ্ঠাবান হোতে বলি। না হোলে তরুণমর্ম্মীরা বুঝতে পারবেন না ভারতের আকাশ কত উদার। মানুষের বহু প্রাচীন ইতিহাস বলে—মধ্যধরণীসাগরের উপকূল থেকে এক মানুষের বন্যাস্রোত ভারতের উপকূল ভাসিয়ে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত দ্বীপে দ্বীপান্তরে ছড়াল। এই যে বন্যা বহে গেল ভারতের উপর দিয়ে, তাতে কি কিছু বিপর্য্যয় সম্ভব ছিল না ? কিন্তু সনাতনে মিলিয়ে গেল। যারা এল তারা দান করল যা ছিল তাদের, মিল সনাতনের ধর্ম্ম। সনাতন তো গোঁড়া গৃহস্থ নহে যে অতিথির উপহার নেবে না। অতিথি যা এনেছিল সঙ্গে—তার ধর্ম্ম তার সংস্কার সনাতনকে উপহার দিল আতিথ্যের বিনীত বিনিময়ে। হিমালয় পার হোয়ে বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত বারে বারে যে মানুষের বন্যা এল তারাও সনাতনের গোত্র নিল। শুধু দিনে দিনে সনাতনের পুঁথিখানিতে নতুন পাতার সংযোগ হোল।

তাই শুধু বেদেই আমাদের পরিচয় নয়। সনাতন পুঁথিখানিতে বেদ একটি পাতা মাত্র, হয়তো প্রথম পাতা। কিন্তু তারপরেতে নব নব সূত্রে দর্শনে সংহিতায় পুরানো সনাতনের অঙ্গপুষ্টি হয়েছে। বেদসংহিতায় বহু সংস্কৃতির মিলনের আভাষ আছে, পুরাণগুলিও এক একটি মহাসাগর। বেদ সম্বন্ধে 'হয়তো প্রথম' বল্লুম এই কারণে যে, বেদে যাদের পরিচয় আছে, তাঁরা ছাড়া বা তাঁদের ধর্ম্মীরা বা স্বজাতিরা ছাড়াও এই ভারতেই আরও প্রাচীন আদিবাসীরা ছিল—মুক্ত আকাশের পাখীর মতন। সেই আদি ভারতবাসীর ধর্ম্ম ও সংস্কারকে পুরাণগুলি কিছু নিয়েছে মেনে, কিছু করেছে হত্যা।

যুগে যুগে জোয়ার এসেছে ভারতে। স্নান করেছে তাতে কত নতুন রক্ত, কত নতুন ধর্ম্ম, কত মর্ম্ম, কত সংস্কার। তাই এক এক জোয়ারের দেবতা সনাতনের কুষ্ঠীতে আপন নামটি লিখে গেছেন। বেদের দেবতা ইন্দ্র অগ্নি বরুণ হলেন প্রথম পাতায়, কিন্তু পরে এসে শিব ঠাকুরটি নিলেন বড় আসন। এলেন শিবানী। তিনি নিলেন বাকি লোককে টেনে। মহাভারতের মহামানব আরেক যুগের বিশ্বরূপে ডুবিয়ে দিলেন। মিলিয়ে দিলেন যতকিছু। জাতিধর্ম্ম ইতিহাস ভাস্‌লো একেবারে। বুদ্ধ এলেন, শঙ্কর এলেন। রামানুজ, পার্শ্বনাথ, চৈতন্য, নানক···কত প্রতিভা যুগে যুগে এসে নতুন রেখায় নতুন রঙে লিখে গেলেন সনাতনের পাতা।

ধর্ম্ম আমাদের কোথায় প্রাচীন ? কোথায় জীর্ণ ? যেমনই বুঝেছে তার ক্লান্তি তখনই দিয়েছে নিজকে নবযুগের কাছে বিলিয়ে। বহু বন্যাস্নানে বহু যুগমিলনে ধন্য আমরা, ধনী আমরা। তবু নবীনদের সন্দেহ ঘোচে না প্রাচীনের রক্ষণশীলতার সম্বন্ধে। সনাতনের পুঁথিখানিকে ফেলে দিলে তাঁরা খুশী হন। কিন্তু এই যে পুঁথি এতো ইচ্ছা করলে তবুও কিছু পড়তে পারা যাবে, কিছু তার বোঝাও যাবে ; কারণ এ পুঁথি এই চেনা আকাশেরই তো মর্ম্ম। আর এ পুঁথিকে একেবারে বর্জ্জন করলে আবার যে পাঠশালাতে যেতে হবে দেশকে—যদি জগৎসভায় দাঁড়াবার আশা থাকে ; বিদেশের পাঠশালাতে পড়তে হবে তখন। তাদের পুঁথি তাদের গুরুপণ্য এই মাটিতে সইবে কেন ?

যাঁরা এখনও কিছু প্রাচীনপন্থী তাঁদেরও বোঝা উচিত নদের-চাঁদের বাঙলাতে রঘুনন্দন সফলকাম হোতে পারেন নি। ফলে, নিতাই যখন আচণ্ডালে কোল বাড়ালেন, যখন 'দেবতার লীলা' ঘটল যত বণিক শ্রেষ্ঠীর ঘরে ; যখন শিবঠাকুর শূদ্র মাঝে আপন মহিমা প্রকাশ করলেন, সেই সহজিয়ার দিনে সেই মঙ্গলকাব্য ও শিবায়নের যুগে সেই নামসাগরে রঘুনন্দনের নবসংস্কৃতি শুধু বাঁধা রইল আভিজাত্যের ঘরে। সারা বাঙলায় প্রতি মানুষের ঘরে ঘরে সন্ধান করলে এমন একজনও মেলা শক্ত, যিনি 'স্মৃতি'-পথে সঠিক চলতে পারেন। বাঙলার সমাজ-ইতিহাস পাঠ করলে দুঃখ এখন

রঘুনন্দনের জন্ত হয় না, দুঃখ হয় কোথায় গেল সেই মঙ্গলকাব্য রসসিক্ত দিন, সেই কীর্ত্তনমগ্ন সায়াহ্ন, সেই রামায়ণ মহাভারত পূর্ণ জীবন। আজ বাঙলার দিনগুলি শূন্ত ও রিক্ত।

রঘুনন্দনের হয়তো প্রয়োজন ছিল কিছু। হয়তো কেন, রঘুনন্দনই বাঙলাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন সমাজ বন্ধন, তিনি যে দেখেছিলেন—সহজিয়ার উচ্ছৃঙ্খল গতিপথে সমাজ চলেছে ধ্বংসোন্মুখী। কিন্তু বাঙলার অধিকাংশ মর্মকেন্দ্রেই তাঁকে ঠিকভাবে পড়তে পারল না; ফলে শত সহস্র সমাজবন্ধনী গড়ে উঠল, পাঁচীল তুলল পরস্পরের মাঝে। এক চরম উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে সমাজ ফিরল আর এক চরম সঙ্কীর্ণতায়।

দৈনন্দিন বাঙলায় কত কলহ ঘটছে বলে শোনা যায়। সমাজ বলে—এর প্রতিকার হয় আত্মহত্যা, নয় বিধর্ম্মীর আশ্রয় গ্রহণ। প্রশ্ন করি সমাজকর্ত্তাদের, কেন সিভিল বিবাহ আইন সনাতন পন্থীর সন্তানকে গ্রহণ কর্ত্তে হয়? মনু কি অনুলোম প্রতিলোম স্বীকার করেন নি? তিনি তিরস্কার করেছেন এ দুই বিধিকেই, কিন্তু সমাজ থেকে ফেলে দিতে পারেন নি, বরং পূর্ণ সম্মানই দিয়েছেন। সুন্দরভাবে দেখান যায় যে, অনুলোম প্রতিলোমও এ দুইয়েরই ক্রমমিশ্রণে জাতি হয়েছে বর্ত্তমানের প্রায় ত্রিচতুর্থাংশ সমাজ। যাঁরা আজ পাঁচীল তুলে কৌলিন্ত রাখতে চান, নৃতত্ত্বের সন্ধান করলে, রক্তের গবেষণা করলে হয়তো এই মীমাংসাই স্থির হবে তাঁদের সম্বন্ধেও। ভারতের কোনও প্রদেশের কোনও জাতির কোন বর্ণেরই রক্তের কৌলিন্ত গর্ব্ব করা চলে না।

ইতিহাস জানে নৃতত্ত্ব জানে আমাদের বর্ণকৌলিন্ত কতদূর খাঁটি। জানে আমাদের রক্তের রাসায়নিক মিশ্রণের কথা। যখন অর্থের কৌলিন্ত নিয়ে নবীনেরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, বলছেন এ বৈশ্য কৌলিন্ত ত্যাগ কর্ত্তে হবে, নবীনেরা ঘোষণা ক'চ্ছেন শিক্ষাকৌলিন্ত কারোর একার দাবী নয়, শ্রেষ্ঠ স্থপতি ও শিল্পী হোয়ে ব্রাহ্মণ শূদ্রকৌলিন্ত হরণ কর্চ্ছেন, যখন দেশ চাইছে সকলকেই ক্ষত্রধর্ম্মী করতে; তখনও কেন এ সমাজ মালিন্ত?

সমাজ কেন আবার অভিভাবক হোতে পার্ব্বে না? অভিভাবকের মত ভ্রূকুঞ্চন করলেই চলবে না, উদারতা ও স্নেহ, শক্তি ও সামর্থ্যই আগে চাই। সমাজ যষ্টি তুলুক মাথা পেতে নোব, কিন্তু সে যষ্টি কি বিদ্যাসাগর তৈরী কর্ত্তে পার্ব্বেন? সনাতনের পুঁথিতে বহু মূল্যবান্ জিনিষ আছে, আজকের পাতাটাকে উল্টিয়ে দুচার অধ্যায় দেখে নতুন পাতা একটা লিখতে হবে তাতে—চলতি যুগের ছন্দে রঙে।

তন্ত্রগ্রন্থে যেদিন মাতৃমন্ত্র ঢুকল সেদিন থেকে নেশা একটা জাগল শিরায়। সমাজ পানে চাইলে মনে হয়, সমাজ বুঝি বহুধর্ম্মী, কিন্তু ভিতর দিয়ে তলিয়ে দেখি—সবই এক নাড়ীতে বাঁধা।

তাই আজ সমাজকে গড়তে হবে, ঘরে ঘরে বঙ্কিমের সেই দেবীরাণী যে হৃতা হোলেও দগবে নাকো, গড়বে সৈন্তদল, যে প্রফুল্ল ফিরে এলে ঘরে, অভিভাবক চাইবে নাকো শাস্ত্রশুদ্ধি অগ্নিপরীক্ষা।

তাই আজ সমাজকে ঘোষণা কর্ত্তে হবে, আনন্দমঠে জাতি বর্ণ শ্রেণী ও ধর্ম্মের কোনও প্রশ্ন নেই, শুধু এক পরিচয় আছে—মায়ের সন্তান।

হিসেব-নিকেশ

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২০

বিনোদ মেয়েদের গাড়ীতে পিসির সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসতেই যুধিষ্ঠির বললে—"নিন, আর একটা সিগারেট ধরুন—টানতে টানতে শুনুন।"

"বেশ-দাও। কিন্তু না শুনলেই কি নয়? থাক না।"

"একটু দরকার আছে সেটা আমার দিক দিয়ে। আমি বিস্তারিত বলব না। অন্তে যে কাজে এগোয় না, সত্বর উন্নতির আশায় আমি সেই সব ভীষণ ও কঠিন কাজ স্বেচ্ছায় করতুম। তাই দলের মধ্যে আমার খ্যাতি বাড়তে বিলম্ব হয় নি, আর সেই কারণেই আপনার—ডাক্তার বিনোদের সর্ব্বনাশ করার ভারটাও আমার ওপরই পড়ে।"

"আমার সর্ব্বনাশ—তুমি করবে!"—বিনোদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়—কিছুই বুঝতে পারে না—

"শুনুন না, ও হারটি যে চোরাই মাল এবং তা ডাক্তারই করেছেন বা করিয়েছেন তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্তেই হারছড়াটা আমি দিয়েছিলুম। দলের কর্ত্তা আমাকে বলেছেন—কিছু শক্ত কাজ নয়, সেখানে সবাই আমাদের আপনার লোক—সহজেই তা ডায়েরি হয়েও থাকবে,—ওটা এক সম্ভ্রান্ত বেগমের হার। তিনিও সাক্ষ্য দেবেন। তুমি কোন লোক দেখান অনুসন্ধান চালাবার ব্যবস্থা করবে, লোক বুঝে টাকা খাওয়াবে। ডাক্তারকে না ফাঁসালেই নয়, লোকটি ভারি ধূর্ত্ত, বোর্ডের চেয়ারম্যানের অনিষ্ট খুঁজছে। তিনি আমার বিশেষ দরকারি বন্ধু, যতদিন আছেন ও-অঞ্চলটা আমাদের মুঠোর মধ্যে থাকবে। তাঁকে ওখানে রাখতেই হবে—সুতরাং দরকার হয় ডাক্তারকে—বুঝেছো?—ইত্যাদি। সেই জন্তেই এখানে আপনাকে পাঠান হয়েছিল।"

বিনোদ এতক্ষণে বললে—"এ যে কিছুই বুঝতে পারছি না যুধিষ্ঠির!"

যুধিষ্ঠির বললে—"সবটা পারবেনও না। বুঝে আপনার কোনো লাভও নেই। শুধু একটা কথা জেনে রাখুন। কিছুদিন আগে মিলের কর্ম্মীরা (মাণিকরা) আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্তে যাওয়া আসা করত—না? তাদের দু'চারখানা দরখাস্তও আপনি লিখে দিয়েছিলেন।"

বিনোদ—"তা দিয়েছিলুম। ওদের ওপর বড় অন্তায় জুলুম হচ্ছিল যে যুধিষ্ঠির! কিন্তু তাতে চেয়ারম্যানের—"

"হ্যাঁ—তাতে বড় বড় স্বার্থপর মালিকদের স্বার্থে আঘাত লেগেছে, সেই সঙ্গে আপনার চেয়ারম্যানেরও। তাই তাঁদের চোখে আপনি একটি বিপদজনক বাধা, যা এখনই সরিয়ে ফেলা দরকার। আমাকেই সে ভার দিয়ে পাঠান হয়েছিল। এখন খানিকটা বুঝলেন ?

* * * *

মিলের মালিক, বেগমের হারচুরি, আর ইচ্ছামত ডায়েরি করানোর কথা শুনে পর্য্যন্ত বিনোদের সিগারেট হাতেই পুড়ছিল, টানবার কথা মনেও ছিল না। ভাবছিল—রেহাই আর নেই। যা হবার আমার হোক্‌, গরীব মাণিক বেচারা না মারা যায়। পাপ হয়েছে বই কি, তাতে সন্দেহ নেই—টাকা এসে ঘরে ঢুকেছে। সে আর কিসের টাকা, —কাকে উদ্দেশ করে দেওয়া ? আমাকেই তো !—মাণিক যেন রক্ষা পায় মা !

যুধিষ্ঠির কথা কইতেই—বিনোদ চমকে উঠলো—"হাঁ কি বলছো ?"

"বলছি—অত ভাবছেন কি—কেনো ?"

বিনোদ ঈষৎ দুঃখের হাসি টেনে বললে—"ভাববো আর কি, ভাববার আছেই বা কি ? অপরাধ করলে সাজা নিতেই হয়। জেল তো নিশ্চয়ই। ভাবছি মাণিক বেচারার কথা। আমার সঙ্গে থেকে, সে না বিপদে পড়ে !" বিনোদের দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

যুধিষ্ঠির বাধা দিলে,—"কিছু হবে না, আপনি দেখে নেবেন। আপনার এ দাসও একটু আদটু বুদ্ধি ধরে। যদি ও নিয়ে মামলাই হয়—তখন দেখে নেবেন।"

"তখন আমাকে মিথ্যা কথা বলতে বলবে তো ?"

"একটিও নয়। আচ্ছা তার এখন অনেক বিলম্ব আছে।"

বিলম্বের কথা শুনে বিনোদ বললে—"বিলম্ব না থাকলেই ভাল ছিল, Suspense-এ—অনিশ্চিত চিন্তায় থাকা যে আরও কষ্টকর।" একটু থেমে—না যুধিষ্ঠির আর নয়। যত সত্বর হয় ততই ভালো। যদি সম্ভব হয়, আমি আর এখানে থাকতে চাই না—পারবোও না। এ দেশেও নয়, তুমি দেখে নিও।"

যুধিষ্ঠির সবিনয়ে বললে—"সেটা এখন করবেন না, যা করবেন—তা মামলা জিতের পর করবেন।"

"আমি জিত চাই না যুধিষ্ঠির, আমি অব্যাহতিই চাই।"

"তা জানি, কিন্তু যে বদনামটা বাঁচাতে চান, তাতে সেটা যে বাইরের লোকের কাছে—সত্য আর পাকা দাঁড়িয়ে যাবে। তাতে শত্রুদের সাহায্যই করা হবে না কি ?"

বিনোদ চঞ্চল ও অশান্তভাবে বললে—"যুধিষ্ঠির, আমি দেখছি পাগল হয়ে যাবো"—

যুধিষ্ঠির ধীর ভাবে বললে—"কিছু হতে হবে না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—কিছু হতে হবে না, কেবল উপস্থিত থাকবেন। দয়া করে বিশ্বাস করুন—যা করবার এই দাসই করবে। আর দুটো ষ্টেশন পরেই আমাকে মোকামায় নেবে যেতে হবে। পোষাকটা বদলে নি। আপনি একটা সিগারেট ধরান।"

"না, ওটাও আর খাব না ভাবছি, সেখানে আর কে আমাকে" বলতে বলতে হাসলেন। "না থাক্‌।"

"না—ও কথা কবেন না। যেমন ছিলেন—ঠিক সেই সহজ ভাবেই থাকা চাই। কেনো, কি হয়েছে কি ? সহজ লোকের মত গিয়ে সরাসরি বাসায় ঢুকবেন। আমি দুদিন পরে হাজির হবো।"

"পিসিমাকে পৌঁছে দিয়ে ফিরতে, আমারো তো দুতিন দিন লাগতে পারে।"

"ভালই হয়েছে, আমার মাকেও দেখে আসবেন।"

"কিন্তু ফিরে যদি মাণিককে না পাই, সে না এসে থাকে ! আমি আর ভাবতে পারি না যুধিষ্ঠির।"

"দরকার কি, ভাবনাই বা কিসের ? গোলাম থাকবে তো। লুচি আর ভাজাভুজি নিয়মিত পৌঁছুবে। আমার রাঁধুনি বামুন আছে।"

"কি অপদার্থ হয়েই ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলুম, রান্নাটাও আসে না। ভগবানের কৃপা আর তোমাদের পাঁচজনের"—

"ভুল করছেন কেনো ? ব্রাহ্মণ রাঁধতে জন্মায় কি ? তিনি আশীর্ব্বাদ করবেন—সৎপরামর্শ দেবেন। থাক, আমার হয়েছে—"

যুধিষ্ঠির 'ল্যাভেটরি' থেকে পোষাক বদলে বেরুলো। আবার সেই পাঞ্জাবী।—"কোন' চিন্তা রাখবেন না, সব ভালই হবে" বলে যুধিষ্ঠির পায়ের ধূলো নিলে।—বেরিয়ে পড়লো।

বিনোদ দুর্গা দুর্গা বলতে বলতে—"একি, তার দেয়াশলাইটে যে ফেলে গেছে। থাক্‌—আর পিছু ডাকবো না। পিসিমাকেই দেখে আসি—বলেও আসি—ঘুমবার একটু চেষ্টা করি গে।"

পিসি বল্লেন—"তাই করগে বাবা। ঘুম ভাঙ্গে তো বর্দ্ধমান থেকে কিছু মিষ্টি নিও। যাও—শুয়ে পড়গে।"

ফিরে এসে বিনোদ শুয়ে পড়লো। কোথায় ঘুম, আর কেই বা ঘুমোয়।—"যুধিষ্ঠির কিসব বকে গেল—কিছুই বুঝলাম না ! সম্রান্ত বেগমের সাক্ষ্যের ওপর আর কারো কথা থাকে নাকি ? পেছনে আবার মালিকদের টাকা। তার ওপর ও আমাকে বাঁচাবার সান্ত্বনা শোনায় —পাগল নাকি ? আমি তো এখনো পাগল হইনি ! যাক্‌—যা হবার হবে, ঘুমনো যাক্‌।"—"ঘুম এখানে আসবে কেনো ? তার তরে—জেলে যে কম্বল পাতা আছে।" মুখে একটু হাসি ফুটলো।—"দূর করো, মায়ের নামই করা যাক্‌।"—মুখে এলো—মাণিকের নাম ! মাণিককে পেলে যে হয়, তাকেই দরকার। পাপ—হাফ্‌ প্যাণ্টের হিসেবটা মিটেই আছে—ও সব তার। সে না আবার গোলমাল করে, যুধিষ্ঠিরও ফেরৎ নেবে না।—অপরাধ নিয়ে খেলাও করতে নেই—তাতে না স্বস্তি, না শান্তি। একি—আলো দেখা দিয়েছে যে। কাণে গেল—বর্দ্ধমান। কিছু মিষ্টি নেবার ফরমাস আছে যে।

প্ল্যাটফর্ম্মে নামতেই দুটো লোকের লাল পাগড়ি দেখে—বুকটা কেমন করে উঠলো। সামনে এগুলেন। কয়েকটি ভদ্রলোক খাবার

কিনছিলেন। বিনোদ "সীতাভোগ" চাইতেই, একজন হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—"পশ্চিমে থাকেন বুঝি? ওগুলো নামেই সীতাভোগ, ওতে দ্বাপরের সীতার সম্পর্ক নেই, কেবল ক্রেতার ভোগটা আছে। বরং মিহিদানা নিন্।" বিনোদ মিহিদানাই নিলে।

দেখে পিসি খুশি হয়ে বললেন—"ঠিক্ করেছ বাবা। গেরস্তর বাড়ী শুধু হাতে যেতে নেই—এইটি আমাদের চিরকেলে প্রথা। বাড়ীতে ছেলেপুলে তো থাকেই, হাতে একটা কিছু দিলে কতো আনন্দই পায়। কিছু হাতে করে যাওয়াটা এখন সব অভদ্রতা ভাবেন। প্রাচীনেরা বিনা কারণে কিছু করে যান্‌নি।"

বিনোদের মন তখন অন্যত্র। শুনে বোধহয় ভাবলে—"শুধু হাতে যাবো কেনো—হাতকড়া থাকবে!" তার মাথায় ওই চিন্তাই সর্ব্বক্ষণ।

পিসিমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে, রাণীর সঙ্গে দেখা করলে। কাশী থেকে ছোট চাকরটির জন্যে একটি বাঁশী এনেছিল—দিলে। সকলকেই বললে—"সময়টা খারাপ, সাবধানে থেকো। অপরিচিত কেউ ডাকলে দোর খুলে যেন না দেওয়া হয়। 'বয়' যেন বলে "পুরুষেরা বাড়ী নেই।" সেখানে গিয়ে আমাকে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কাটাতে হবে। পত্রাদি পেতে বিলম্ব হলে ভেবনা।—যা জানাবার তা আমাকে জানিও।" বলে হাসলে। তার হাসিটা রাণীকে আনন্দ দেয়নি, একটু দমিয়েই দেয়। তিনি না বলে থাকতে পারেন নি—"হাসলে যে বড়ো? বুঝতে পারলুম না—"

"ভাবনার কোন কারণ নেই গো।"

শুনে রাণী অশ্রুছলছল চোখে, গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করায়—বিনোদ বললে—"আমিও যে এটা বুঝতে পারলুম না।"

এবার রাণী হাসলেন—বললেন—"ওটা তোমাকে নয় গো—তোমাকে নয়। যাঁর ওপরে দুজনের বোঝাবুঝির ভার গিয়ে পড়লো, আমি তাঁকেই প্রণাম করেছি," বলেই মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছলেন।

"তবে আমাদের এই final রইলো।"

বিনোদ আর দাঁড়ালে না।

মাণিক ভিন্ন বিনোদের মনে কি মাথায় আর কোনো কথাই ছিল না। "যদি সে না এসে থাকে? নিজের ষ্টেশনে নেবে, কাকেও জিজ্ঞাসা করবার সাহসও পেলে না। নিশ্চয়ই এসে থাকবে—মা এ অক্ষম ছেলের কথা ভেবেই থাকবেন।"

কোনো দিকে না চেয়ে, বাসার দিকেই দ্রুত পা চালালে। নির্ম্মলা পিসিকে মনে পড়লো—"তাঁর বাসা আমার স্বর্গ ছিল!"

"দাঁড়ান্—দাঁড়ান্, পায়ের ধুলোটা নি" বলে মাণিক—পথেই বিনোদের পায়ে মাথা ঠ্যাকালে। বিনোদের চোখে জল এসে গেল।

"অতো ভাবছেন কি? ঠিক্ সময়েই এসেছেন, আমি ভাতের জল চড়িয়ে বেগুন আর নুন কিনতে যাচ্ছিলুম"—

বিনোদ বললেন—"কই, আমি তো তোমার কথা ছাড়া কিছুই ভাবছিলুম না! পেটের চিন্তা বা খাবার কথাই ভাবছিলুম। ছেলেরা বলে—কান টানলে মাথা আসে। আমার তেমনি পেট টানলে মাণিক আসে! দয়াময়ী তোমাকেই আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে আর কি বলবো"...

"বলাবলির সময় রাত্রে, যত ইচ্ছা বলবেন, এখন বাসায় চলুন। কেনার কাজ পরে দেখা যাবে।"

"না না, তোমার বেগুন পোড়ার প্রোগ্রাম নষ্ট কোর না। ভারী মুখরোচক—বেশ হবে। তুমি কাজে যাও, আমি বাসা চিনে নিতে পারবো!"

"চিনবেন না কেনো, সে বাসা যে একবার দেখেছে সে কি এ জন্মে তা আর ভুলতে পারে Sir—আমার Selection—আপনার—Confirmation—চলুন—হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছাড়বেন চলুন। আমি আপনাকে চা খাইয়ে তারপর যা হয় করবো।" মাণিক বাসার পথ ধরলে। বিনোদের একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো—"সাধে কি আর মাণিক মাণিক করি?"

বিনোদ মাণিককে অনুসরণ করতে করতে বলে উঠলো, "খুব বড় কথাটা বলেছ মাণিক—"বলাবলির সময়টা রাত্রে যত ইচ্ছা বলবেন।" খুব ঠিক কথা। ওটা আমাদের দাস জাতের জন্যে—যাদের দিন নেই, রাতই আছে। বেশ কথা!"

"আমি অত ভেবে বলিনি Sir—"

"ভাল মন্দ উভয়েই অন্তরঙ্গ, ওরা একা একা থাকে না—মিশিয়ে থাকে। বেশ ছিলুম—আনন্দে ছিলুম। কাশীতে এমন একটি পিসি লাভ করে এসেছি যাঁর তুলনা হয় না। আবার তাঁরি কাছে কাশীবাসিনী বিধবাদের এমন সব কথাও শুনে এলুম, কিছু কিছু দেখেও এসেছি যা মনে পড়লে—এ জীবনে আর সুখও পাব না।"

"আমাদের অসুখের কথার অভাব নেই, তা আর বাড়াবেন না—শোনাবেন না, ও থাক Sir। যা আছে তাই আগে সামলানো যাক্। আপনি ভালো করে চা খান।"

"সেই ভালো। তুমি বেগুনপোড়ার ব্যবস্থা করতে যাও।"

মাণিক বেরুলো, কিন্তু চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলো। সঙ্গে একটা দোয়া মোছা—ফোঁটাকাটা লোক। হাতে ধবধবে তোয়ালেতে বাঁধা থালা। মাণিক বললে—"লোকটাকে আমি পূর্ব্বে দেখেছি। কি জিজ্ঞাসা করবেন করুন।"

বিনোদ লোকটার প্রতি—"বলতো ভাই—কোথা থেকে আসছ—কার কাছ থেকে? তোয়ালেতে বাঁধা ওসব কি?"

"আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ, যুধিষ্ঠিরবাবুর রাঁধুনী। তিনি ডাক্তারবাবুর জন্যে কিছু লুচি, তরকারি, বেগুনভাজা আর মিষ্টি—দিয়ে আসতে বললেন। আজ্ঞা করলে দুধ্ দিয়ে যাব।"

তাঁকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বোলো—আমি এইমাত্র আসছি, বড় খুশী হলুম। আর কিছু পাঠাতে হবে না—মাণিকবাবু এসে গেছেন। দুধের দরকার নেই। আচ্ছা বাবা, তোমাদের থালা আর—তোয়ালে

নিয়ে যাও। মাণিক ওসব খাবার জিনিস রেখে—আজাড় করে দাও।" ব্রাহ্মণকে নমস্কার করলেন,। সে থালা তোয়ালে নিয়ে চলে গেল।

মাণিক অবাক্! "ব্যাপার কি মশাই, ইষ্টেশনে দেখা হয়েছিল নাকি?"

হাসতে হাসতে বিনোদ বললেন—"না আজকের দেখা নয়। সে অনেক কথা,—পরে শুনো। কিন্তু যুধিষ্ঠির কি ঠিক্ ঠিক্ খবর রাখে? অদ্ভুত লোকের হাতে পড়েছি মাণিক! যাক্—এ পোড়াকপালে আজ আর বেগুনপোড়া নেই।"

মাণিক বললে—"তাই বটে। ভাজাভুজি, তরকারি অনেক দেখছি। বলেন তো রাত্রে হবে।"

"না আজ যখন বাধা পড়েছে থাক্। হ্যাঁ, সাহেবের কিছু খবর পেলে? তিনি কোথায়?—থাকগে, আর দেখা করাই বা কেনো—"

সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ বরাবরই বিনোদের থাকে, যেন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার মতই। আজ সে ভাবের পরিবর্ত্তন দেখে মাণিক চিন্তিত হ'ল। কারণ কি? আবার নূতন কিছু ঘটলো নাকি? বললে—"অমন ভাবে কথা কইলেন যে?"

বিনোদ হেসে বললে—"মন্দটা শুনতে কেউ এগিয়ে যায় কি—না কারো তাড়া থাকে? যিনি আমার ভালো চান, তাঁকে মন্দটা শোনাতে বাধ্য করি কেন?"

"কেবল মন্দ মন্দই করছেন। আর ভাবাবেন না, দয়া করে খুলে বলুন। কখনই মন্দ হবে না—দেখে নেবেন—"

"বেশ তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি—ও অপয়া হার যদি কোনো বেগমের হয় ও তা চুরি গিয়ে থাকে এবং তিনি ওটাকে তাঁর হার বলে নিজে সাক্ষ্য দেন, তার ওপর আর প্রমাণের প্রশ্ন থাকে কি? অবশ্য প্রমাণ চাও, তারও অভাব হবেনা। এ মামলায় হাকিমের রায়টা কি রকম হবে মনে হয়?" বলে আবার হাসলে।

মাণিকের মুখ শুকিয়ে আসছিল, তবু বললে—"এতবড়ো মিথ্যা ট্যাঁকে না। গড়ার সময় প্রতিদিন আমি নিজে যে দেখেছি Sir—"

"তা বেশ করেছ, কিন্তু তুমি কে, কোর্টে তোমাকে পোঁছে কে? সম্ভ্রান্ত লোকে মিথ্যা কথা কন্ নাকি? এমন কথা কোনো দেবতাও যে বলতে পারেন না হে? তুমি বললে—একজনের জায়গায় কেবল দু'জন হবে।"

"তাতে মাণিক খুশীই হবে। কিন্তু এ বাজে কথা কেনো—আনলেন? মিছে মন খারাপ করা। তার চেয়ে (এদিক ওদিক চেয়ে) তাইতো—তাই বা কোথায়? যুধিষ্ঠির খাবার পাঠালে, এমন ভুল করলে কেনো? সামলাবার···আমি এলুম বলে Sir—" মাণিক উঠে দাঁড়াতেই—বিনোদ বাধা দিলে—"দাঁড়াও দাঁড়াও। আমার পকেটে রয়েছে যে" বলে হাসতে হাসতে সিগারেটের টিনটা বার করলে। বললে—গোটা পাঁচ সাত কেবল নষ্ট করেছি, নাও রাখো।"

মাণিক সবিস্ময়ে দেখছিল, বললে—"ও আবার কোথা থেকে এলো? আপনাকে তো কখনো সঙ্গে রাখতে দেখিনি, কে দিলে?"

বিনোদ হাসিমুখেই বললেন—"অক্ষমদের পেছনে পেছনে যিনি সর্ব্বক্ষণই আছেন। আহারাদির পর সব শুনো—সে অনেক কথা।"

"তবে স্নানটা সেরে ফেলুন। তার আগে একটা তো ধরান" বলে একটা দিলে। বিনোদও পকেটে হাত দিয়ে দিয়াশলাই বার করলে। দেখে মাণিক হতভম্ব।—"এসব তো কোনদিন দেখিনি—স্বপ্ন দেখছি নাকি!"

"এর ওপরেও আছে—সব সেই 'ক্ষ্যাপা মাগীর খেলা' হে!"

"আমি জল ঠিক করতে চললুম।"—মাণিক চলে গেল। তার মন—ঠিকানা ছাড়িয়ে গেছে। চিন্তার সঙ্গে দুর্ভাবনাও যোগ দিয়েছে।

ডাক্তার বিনোদের আহারাদি ভাল করেই হ'ল। মাণিক কিন্তু কি যে খেলে তারও খোঁজ রাখেনি। আস্বাদের ভাল মন্দও পায়নি। বিনোদের কথায় হাঁ হুঁ-ই দিয়েছে। বিনোদ সেটা বুঝলেও কোনো কথা কয়নি।

আহারের পর মাণিক নিজের কাজ সেরে দশ মিনিটের মধ্যেই উপস্থিত। "এইবার আপনি শুয়ে শুয়েই বলুন—আমি শুনি।"

"শোব না মাণিক, আমি বসে বসেই বলছি।" "কেনো" বলে প্রশ্ন করে মাণিক উত্তর পেলে না; ডাক্তার তখন আরম্ভ করে দিয়েছেন। কাশী পৌঁছনো থেকে নির্ম্মলা পিসির বাসা, সেবাশ্রমে ও গঙ্গার ঘাটের কথা, বিধবা কাশীবাসিনীদের অবস্থার কথা, বিদায় ও ফিরতি ট্রেণে বসা পর্য্যন্ত কিছু বাদ দিলে না।"

মাণিক বললে—"আমি যে 'অসাধারণের' অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।"

বিনোদ বললেন—"আমি তো শেষ করিনি—শোন। ট্রেণ তার কাজ করে চলেছে। একটা ছোট ষ্টেশনে একজন "পান বিড়ি সিগারেট" হাঁকতে হাঁকতে ছুটে চলে গেল। অভ্যাস কি পাজি জিনিস, তার শেষ কথাটা কানে যেতেই সিগারেট খাবার ইচ্ছা আমাকে দোরের কাছে টেনে নিয়ে গেল। সামনেই দেখি প্লাটফর্মে একজন ভদ্রবেশী পেল্লায় পাঞ্জাবী! চোখোচোখি হতেই হাসিমুখে নমস্কার করে বললেন—"এটা ছোট ষ্টেশন, সময় আর নেই। তাকে আর পাবেন না। আগের ষ্টেশন—দিলদারনগর, সেখানে অনেকক্ষণ থামে, যা দরকার নেবেন।" বলতে বলতেই গাড়ি মোশন দিলে, তিনিও ছুটে গিয়ে নিজের গাড়ীতে উঠলেন! আমি অবাক। পাঞ্জাবীর মুখে কি সুন্দর বাংলা কথা—শুনলুম, কোথাও একটু আড় পর্য্যন্ত নেই!—

দিলদারনগরে গাড়ি পৌঁছতেই পাঞ্জাবী ছুটে এসে বললেন—"যা পিসির সঙ্গে দেখা করে আসুন। এই ট্রাঙ্ক আর বেডিংটা কেবল আপনার, না?—আমি পাশের 'কুপে' আছি, আর কেউ নেই, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। এ দুটো আমি নিয়ে চললুম। 'কুপে' আমার একলার।" কথা কইতে দিলেন না—চলে গেলেন। অগত্যা আমি পিসির খবর নিতে গেলুম। কিন্তু পাঞ্জাবী "পিসির কথা জানলেন কি করে?" ফিরে গিয়ে তাঁর কুপেই উঠলুম। তিনি পকেট থেকে gold flakeএর টিন্ বার করে দিলেন। ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখতে না পেলে আমার আহারাদির ব্যবস্থার ভার তিনিই নিয়েছিলেন। এখন সব বুঝেছ বোধহয়—তিনিই আমাদের পরম হিতৈষী যুধিষ্ঠির! আমার পশ্চাতে কাশী কাশী ধাওয়া করে ফিরছিলেন। এখন বোধহয় সব বুঝেছ?"

দুনিয়ার অর্থনীতি

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

নিকেলের টাকা

ভারতবর্ষের ধাতু মুদ্রার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ধাতুর চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার ফলে ভারতসরকার বাধ্য হইয়া টাকা আধুলি প্রভৃতি মুদ্রায় রৌপ্যের পরিমাণ কমাইতে সুরু করেন; যুদ্ধাবসানের পর অবস্থার উন্নতি আশা করা গেলেও উন্নতি কিন্তু কিছুই হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে রৌপ্যাভাবের জন্য ভারত সরকার বাজার হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এর্ডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ্জ মার্কা রূপার টাকা সরাইয়া লন এবং বাজারে চলিতে থাকে অতি সামান্য রৌপ্যমিশ্রিত ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা টাকা। এখন সঞ্চিত রূপার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়ায় ভারত সরকার এদেশে পুরোপুরি নিকেলের টাকা চালাইতে মনস্থ করিয়াছেন। অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলি খান রৌপ্যমুদ্রার পরিবর্ত্তে নিকেলের টাকা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বিল উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, পরিষদে তাহা গৃহীত হইয়াছে! এই ভাবে বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা হইল, তাহাতে ভারতে আর রৌপ্যমুদ্রার অস্তিত্ব থাকিবে না। আগে ভারতে স্বর্ণমুদ্রা চলিত, তারপর রৌপ্যমুদ্রার যুগ প্রচলিত হইলে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রাই পাশাপাশি চলিতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন সর্ব্বভারতীয় মুদ্রা হিসাবে টাকার প্রচলন করেন, তখন প্রতি টাকার ওজন স্থির হয় ১৮০ গ্রেণ এবং ইহার মধ্যে ১৬৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য থাকিত। ভারতবর্ষে রৌপ্যের পূর্ণাঙ্গ খনি নাই, ইতিমধ্যে দেশে অভাব বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে বহুবার, কিন্তু ভারত সরকার মাঝে মাঝে নিরুপায় হইয়া মুদ্রা মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দিলেও মুদ্রার এভাবে ধাতুমূল্য হ্রাস কখনো করেন নাই।

কথাটা হইতেছে, মুদ্রার ধাতুমূল্য না থাকিলে সেই মুদ্রার প্রতি জনসাধারণের আস্থা থাকে না। মুদ্রার উপর জনসাধারণের আস্থার অভাব মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কুফল সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে এখন মুদ্রাসঙ্কোচনের যুগ আসিয়াছে, এ সময় মুদ্রার ধাতুমূল্য এভাবে একেবারে কমাইয়া দিবার ফলে সাধারণ ভারতবাসীর মনে নিঃসন্দেহে গভীর অস্বস্তির সঞ্চার হইবে। এই ভাবে মুদ্রার সম্ভ্রম নষ্ট হইলে পণ্যাদির মূল্য-রেখা উপরের দিকে থাকাই স্বাভাবিক। যুদ্ধের সময় যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট যেখানে যেখানে কাগজী মুদ্রার বহুল প্রচার হইয়াছিল, সেই সকল স্থানে টাকার মালিকেরা মুদ্রা হিসাবে নোটের প্রতি যেটুকু মমতা দেখানো উচিত, প্রকৃতপক্ষে তাহা দেখায় নাই এবং তজ্জন্য স্থানীয় বাজারে পণ্যাদির মূল্য অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক মোটের উপর অন্তর্ব্বর্ত্তী জাতীয় সরকার যখন এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতেছেন, তখন দেশবাসীকে অবশ্যই সহানুভূতির সহিত সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করিতে হইবে।' আগেই বলা হইয়াছে, ভারত সরকারের হাতে এখন রৌপ্য নাই বলিলেই চলে, অথচ যুদ্ধের সময় ভারত সরকার মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে ২২ কোটি ৬০ লক্ষ আউন্স রূপা ধার করিয়াছিলেন, তাহা এখন প্রত্যর্পণ করিবার সময় হইয়াছে। এই বিরাট পরিমাণ রৌপ্য পরিশোধের যখন বাধ্যবাধকতা আছে, তখন সরকার অন্যদিক হইতে রূপার খরচ না বাঁচাইয়া পারেন না। এই জন্যই তাঁহারা উপস্থিত রৌপ্যহীন নিকেলের মুদ্রা বাজারে চালাইতে এবং বর্ত্তমানে চলতি টাকায় যে সামান্য পরিমাণ রূপা আছে তাহা গলাইয়া বাহির করিয়া লইতে মনস্থ করিয়াছেন। অর্থ-সদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলি ও স্বীকার করিয়াছেন যে, এই ভাবে সম্ভ্রমহীন মুদ্রা বাজারে চালু করা ভারত সরকারের নিরুপায় অবস্থারই পরিচায়ক।

ভারতবর্ষে এখন গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যুদ্ধের চাপে ভগ্নপ্রায় আর্থিক বনিয়াদের উপর এই পরিবর্ত্তনের প্রভাব অবশ্যই কম হইবে না। তবে বর্ত্তমানে যাহাদের হাতে ভারতের শাসন ভার ন্যস্ত হইয়াছে, পারতপক্ষে তাঁহারা যে সব দিক হইতে দেশবাসীর স্বার্থরক্ষা করিয়াই কাজ করিবেন, একথা দেশের লোকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সেক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভারত সরকারকে আজ যে বাধ্য হইয়া নিকেলের টাকার প্রচলন করিতেছেন, দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া এবং সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের অসহায়তা উপলব্ধি করিয়া, দেশবাসী তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবেন না বলিয়াই আমরা আশা করি। বলা নিষ্প্রয়োজন, মুদ্রা জনসাধারণের সরকারের উপর আস্থার নিদর্শনী, মুদ্রার ধাতুশুদ্ধ মুদ্রামূল্যের চেয়ে অধিকাংশক্ষেত্রেই কম হয়; সুতরাং আশা করা যায় এ ক্ষেত্রেও জাতীয় সরকারের উপর জনসাধারণের নির্ভরশীলতা বজায় থাকার জন্য হীন মুদ্রার প্রবর্ত্তন সত্ত্বেও ভারতের পণ্য বাজারে অপ্রত্যাশিত কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে না।

বাজেট সমস্যার সমাধান

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকত আলি খান যখন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট উপস্থাপিত করেন পরিষদের সদস্যদের অধিকাংশ এবং উপস্থিত জনসাধারণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ২৯শে তারিখের সংবাদপত্রগুলিও এই বাজেট সম্পর্কে মোটামুটি সন্তোষপ্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে লবণকর উঠাইয়া দিয়া, আয়করের নিম্নতম পরিমাণ ২ হাজার টাকা হইতে আড়াই হাজার টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া এবং সামরিক বিভাগের

ব্যয় গত বৎসরের তুলনায় প্রায় ৬০ কোটি টাকা কমাইয়া ১৮৮ কোটি ৪২ লক্ষ টাকায় নামাইয়া আনিয়া মিঃ লিয়াকৎ আলি যে ভাবে বাজেট পেশ করেন তাহাতে এই বাজেটকে স্বভাবতঃই জনকল্যাণকর ও জাতীয়তামূলক বাজেট বলিয়া মনে হইয়াছিল। পরোক্ষ করভার অত্যন্ত ক্ষতিকর, এইরূপ কর দেশবাসীর অজ্ঞাতে তাহাদিগকে শোষণ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ফেলে। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতসরকার অর্থাভাব মিটাইতে এইরূপ পরোক্ষ করভার বৃদ্ধির প্রতিই অধিকতর মনোযোগ দেন। এবার আধুনিক ইউরোপীয় করনীতি অনুসারে আয়করাদি প্রত্যক্ষ করের উপর অধিক জোর দিয়া অর্থসদস্য দেশবাসীর ও গভর্ণমেন্টের আর্থিক স্বার্থকে খোলাখুলিভাবে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়াছেন। চায়ের উপর পাউণ্ড পিছু দুআনার স্থলে ৪ আনা রপ্তানি কর বসানো হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই পরোক্ষকর ভারতবাসীকে মোটেই স্পর্শ করিবে না। তাছাড়া অর্থসদস্য আশ্বাস দিয়াছেন যে, এই করবৃদ্ধির ফলে চায়ের রপ্তানী বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে মনে করিলে তিনি ইহা বাতিল করিবার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

কিন্তু বাজেট উপস্থাপিত হইবার দিন দুয়েকের মধ্যেই বাজেট প্রস্তাবিত আয়করের ব্যাপার লইয়া সারা দেশে তুমুল গণ্ডগোল সুরু হইয়া গেল। অর্থসদস্য ব্যবসারে অর্জ্জিত একলক্ষ টাকার অতিরিক্ত মুনাফার উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাছাড়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে তিনি মূলধনের মূল্যবৃদ্ধি (Capital gains) সংক্রান্ত আর একটি কর বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবানুসারে যে সব কলকারখানার বা সম্পত্তির যুদ্ধের মধ্যে দর অনেক চড়িয়া গিয়াছে, সেগুলি বিক্রয়ের সময় নিয়োজিত প্রকৃত মূলধনের তুলনায় ৫ হাজার টাকার বেশী লাভের অঙ্কের উপর কর বসাইবার ব্যবস্থা হয়। বলা বাহুল্য, এই করনীতি ধনীদের স্বার্থসংরক্ষক নয় এবং দেখিতে দেখিতে সারা ভারতের ব্যবসাদার, দোকানদার ও ধনিকশ্রেণী ইহার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন সুরু করিলেন। ইয়োরোপীয় ধনিক সম্প্রদায়ও নিজস্বার্থে এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। অর্থসদস্যের প্রস্তাবের প্রতিবাদ স্বরূপ কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজার পর্য্যন্ত অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ম বন্ধ হইয়া গেল। অতিরিক্ত কর বসিবার ফলে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতি একেবারে প্রতিরুদ্ধ হইয়া যাইবে,—ইহাই হইল এই আন্দোলনের মূলকথা। কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেসী সদস্যদের একাংশও উপরিউক্ত অর্থবিল সংশোধনের দাবী উত্থাপন করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বিলটি বিবেচনার জন্ম সিলেক্ট কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। এই বিলের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এত বেশী মতবিরোধ দেখা যায় যে, মনে হইয়াছিল বুঝি বা এই অচল অবস্থা প্রচণ্ড শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটে পর্য্যবসিত হইবে। যাহা হউক অবশেষে এই সঙ্কটের অবসান হইয়াছে এবং একরূপ জোড়াতালির ভিতর দিয়া অর্থবিলের ব্যাপারে কংগ্রেস ও লীগ সদস্যদের মধ্যে মতৈক্য ঘটিয়াছে। এই গণ্ডগোল পাকাইয়া ভারতীয় শিল্পপতিগণই শেষ অবধি লাভবান হইয়াছেন, কারণ আগে যে হারে কর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এখন তাহা লক্ষণীয়ভাবে সংশোধিত হইয়াছে। অর্থসদস্যের করনীতি সংক্রান্ত সংশোধিত বিলটি—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইয়াছে। সংশোধিত ব্যবস্থা অনুসারে এখন প্রাইভেট ও পাবলিক যৌথ কোম্পানীগুলির মুনাফার হিসাবে মূলধনের শতকরা ৬ ভাগ অথবা ১ লক্ষ টাকা—যেটি বেশী হইবে তাহা বাদ দিয়া বাকী টাকার উপর কর দিতে হইবে এবং পূর্ব্বে স্থিরীকৃত শতকরা ২৫ ভাগের পরিবর্ত্তে এখন শতকরা ১৬½ ভাগ কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মূলধনের মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত করের বেলা আগে ৫ হাজার টাকা বাদ দিবার কথা ছিল, সিলেক্ট কমিটী বাদ দিবার এই অঙ্ককে ১৫ হাজার টাকা করিবার সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ গৃহীত হইয়াছে, এবং আরও স্থির হইয়াছে যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Personal effects) এই করের আওতায় আসিবে না।

আগেই বলা হইয়াছে, এইভাবে কর হার সংশোধিত হওয়ার ফলে ধনী ও ব্যবসাদার সম্প্রদায়ের জয় হইয়াছে। এখন একথা পরিষ্কার প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতের শাসনযন্ত্রের উপর ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বাজেট উত্থাপনের সময় উল্লিখিত হারে কর বসাইলে ভারতের শিল্পবাণিজ্য হয়তো কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হইত, কিন্তু যন্ত্রাদি আমদানীর ব্যাপারে এখন যে সব গোলমাল দেখা যাইতেছে তাহাতে এই সাময়িক ব্যবস্থায় ক্ষতি একেবারে নিশ্চিত ছিল না। পক্ষান্তরে মুদ্রাসঙ্কোচন নীতির অনুপূরক বলিয়া এই ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত নরনারী লাভবান হইত। পণ্যবাজারের উপর ধনিক সম্প্রদায়ের বাড়তি টাকার প্রতিক্রিয়াশীল চাপ আজ আর অস্বীকার করিবার বিষয় নয়।

ভারতসরকারের টাকার প্রয়োজন এখন অত্যধিক। বাজেট উপস্থাপিত করিবার সময় অর্থসদস্য মিঃ লিয়াকৎ আলি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুসারে সরকার যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা ব্যয় করা সত্যই তাঁহাদের পক্ষে কঠিন। এ অবস্থায় করহার সংশোধনের ফলে যে ১৬।১৭ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে তাহা পূরণ হইবে কি উপায়ে? যুদ্ধোত্তর দ্বিতীয় বৎসরের বাজেট হওয়া সত্বেও এবারের বাজেটেও সর্ব্বসমেত ৫৬ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ঘাটতি অনুমান করা হইয়াছে, এই ১৬।১৭ কোটি টাকা ইহার সহিত যুক্ত হইলে ঘাটতির অঙ্ক অবশ্যই আতঙ্কজনক হইবে। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ভারতের ভগ্নপ্রায় আর্থিক বনিয়াদ যথাসম্ভব পুনর্গঠন করিবেন, ইহাই ভারতবাসী আশা করে; যাঁহাদের স্কন্ধে এখনই সর্ব্বসমেত প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা দেনা, তাঁহাদের বাজেটে এখনও যদি এইভাবে ৭০।৭৫ কোটি টাকা ঘাটতি হয়, ভারতের আর্থিক স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আর কেমন করিয়া ভরসা রাখা যাইবে?

ধনীদের সুবিধার জন্ম করহার সংশোধিত হইয়াছে; যে যুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া এই সংশোধন হইয়াছে তাহা কার্যকরী হইলে, অর্থাৎ

ইহার ফলে শিল্পবাণিজ্য সম্প্রসারিত হইলে সকলেই খুশী হইবে। কিন্তু ধনীদের সুবিধাদানের এই ব্যবস্থার বিপরীত দিকে দরিদ্র ও মধ্যবিত্তদের জন্ত বাজেটে যে যৎসামান্ত ব্যবস্থা হইয়াছে তাহারও প্রসার হওয়া অবশ্য উচিত ছিল। বাজেট-বক্তৃতায় জনকল্যাণ সম্বন্ধে অর্থসদস্য অনেকগুলি ভাল ভাল কথা উচ্চারণ করিয়াছেন, কিন্তু লবণ কর তুলিয়া দিবার অতি অকিঞ্চিৎকর সুবিধাদান ছাড়া গরীবদের মঙ্গলজনক আর কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা তিনি করেন নাই। তাছাড়া লবণ কর উঠিয়া যাইবার জন্ত গরীবেরা যেটুকু উপকৃত হইয়াছে, রেলগাড়ীর ভাড়া টাকায় এক আনা হিসাবে বৃদ্ধি পাইবার ফলে সে তুলনায় তাহারা অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যুদ্ধের আগের হিসাবে ভারতবাসীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয় এখনও তিনগুণ রহিয়াছে, এ অবস্থায় আয়কর হইতে রেহাই পাইবার নিম্নতম অঙ্ক ২ হাজারের স্থলে আড়াই হাজার টাকা হওয়ায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এমন কি উপকার হইল? এই অঙ্ক অন্ততঃ ৫ হাজার টাকা হইলে তবেই তাহা যুক্তিসঙ্গত হইত বলিয়া আমরা মনে করি।

নিয়ন্ত্রণনীতি বাতিলের আবশ্যকতা

যুদ্ধের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী চাহিদা যখন অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং আমদানী বন্ধের দরুণ বাজারে যখন প্রচণ্ড পণ্যাভাব দেখা দেয় তখন সমরপ্রচেষ্টা অবাধ করিতে এবং দেশবাসীকে বিশেষক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে নিম্নতম পরিমাণ পণ্য যোগাইতে ভারত সরকার নিয়ন্ত্রণনীতি চালু করেন। যুদ্ধের সময় এই নীতির প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট এবং নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উত্থিত হয় নাই। তারপর যুদ্ধ থামিয়াছে এবং যুদ্ধের পর এখন দেড় বৎসরের বেশী সময় অতিবাহিত হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইলেও যুদ্ধকালীন অর্থব্যবস্থা এখনও বজায় আছে বলিয়া এবং নিয়ন্ত্রণনীতি আগের মত এখনও চালু আছে বলিয়া জনসাধারণের দুর্গতির আর শেষ নাই। যুদ্ধোত্তর কালে এখন নানাবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন বাড়িয়া গিয়াছে, অথচ নিয়ন্ত্রণনীতির ফলে বাজারে নির্দ্দিষ্টমূল্যে দরকার মত সেই সব জিনিষ পাওয়া সম্ভব নয়। দেশবাসীর এই প্রয়োজনের সুবিধা লইয়া একশ্রেণীর ব্যবসাদার এখন পূর্ণোদ্যমে চোরাকারবার চালাইতেছে। এখন সামরিক বিভাগের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, যুদ্ধকালীন পণ্যউৎপাদনের হার একটু কমিলেও ভারতীয় শিল্পাদি যুদ্ধের আগের তুলনায় কম পণ্য উৎপাদন করিতেছে না, সর্ব্বোপরি যুদ্ধাবসানের ফলে এখন বিদেশ হইতে যথেষ্ট পণ্যসামগ্রী আমদানী হইতেছে। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বাতিল হইলে প্রয়োজনানুসারে জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া ভারতবাসী তাহাদের জীবনযাত্রা সহজ করিয়া তুলিতে পারে—ইহাই এদেশের অধিকাংশ লোকের মত। কণ্ট্রোল উঠিয়া গেলে হয়তো সাময়িক ভাবে জিনিষের দাম বাড়িয়া যাইবে। অভাব মিটিবে বলিয়া প্রথমতঃ লোকে এইসব পণ্যের জন্ত একটু বেশী দাম দিতে কাতর হইবে না, আর দ্বিতীয়তঃ বিদেশ হওতে পণ্য আমদানী হইতে থাকিবে বলিয়া খোলাবাজারে পণ্যাদির বর্দ্ধিত মূল্য স্থায়ী হইতে পারিবে না। এইভাবে চোরাবাজারের জুলুম হইতে দেশবাসী রক্ষা পাইবে।

প্রকৃতপক্ষে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যে আর জনস্বার্থের পক্ষে অনুকূল নয়, ইহা সরিষার তৈলের ব্যাপারেই প্রমাণিত হইয়াছে। গত কয়েকমাস যাবৎ নিয়ন্ত্রণ চালু ছিল বলিয়া কলিকাতার বাজারে সরিষার তৈল সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল এবং চোরাবাজারে তৈলের জন্ত সেরপিছু অন্ততঃ তিন টাকা হিসাবে মূল্য দিতে হইতেছিল। নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যাওয়ার পর এখন কিন্তু কলিকাতায় যথেষ্ট পরিমাণ সরিষার তৈল পাওয়া যাইতেছে এবং এই তেলের দাম যদিও নিয়ন্ত্রিত মূল্যের তুলনায় একটু বেশী, তবু আগের চোরাবাজারের হিসাবে ইহাকে সুলভ বলিতে হইবে। আশা করা যায়, কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় সরিষার তৈলের দাম আরও কমিয়া যাইবে।

সরিষার তৈল সম্পর্কে যাহা সত্য, কাপড়, লৌহ ও ইস্পাত, চিনি, সিমেণ্ট, কেরোসিন তৈল প্রভৃতির সম্বন্ধেও সে কথা মিথ্যা নয়। এইসব অত্যাবশ্যক পণ্য এখনও নিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে বলিয়া দেশবাসীকে এইগুলি সংগ্রহ করিতে বহু দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইতেছে। এজন্ত যে কষ্ট তাহারা পাইতেছে তাহার বিনিময়ে খোলাবাজারে কিছু বেশী দাম দিয়া পণ্যসংগ্রহে তাহাদের কোনই আপত্তি নাই। কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আর চালু রাখা যে নিরর্থক তাহা বোম্বায়ের কাপড়ের কলগুলির মজুত মালের হিসাব করিয়া বোম্বাই সরকারই ঘোষণা করিয়াছেন। বোম্বাই সরকার এই প্রসঙ্গে ভারতসরকারকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, কাপড়ের উপর নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া গেলেও মজুত কাপড়েই দেশবাসীর চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটানো যাইবে।

দরিদ্র ভারতবাসীর কোনরূপ অসুবিধা না করিয়া নিয়ন্ত্রণনীতি ধীরে ধীরে বাতিল করিতে ভারতসরকারও যে অনিচ্ছুক নন, ইহা অন্তর্ব্বর্তী সরকারের সরবরাহ সদস্য শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী প্রকাশ্যেই স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, পরীক্ষামূলকভাবে চিনি, তামা পিতলের বাসনপত্র ও কেরোসিনের উপর শীঘ্রই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এইভাবে পরীক্ষার ব্যবস্থাই ভাল এবং একসঙ্গে সব নিয়ন্ত্রণ না তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণনীতি বাতিল হইলে পণ্যের বাজারে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের কংগ্রেস ও লীগ সদস্যদের অধিকাংশ যখন এইবার ধীরে ধীরে কণ্ট্রোল তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী, তখন অনতিবিলম্বে অধিকাংশ ভোগ্যপণ্যের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বাতিল হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই ব্যবস্থার অনুপূরক হিসাবে দেশে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির আয়োজন করা দরকার এবং এবিষয়ে সরকারের আগ্রহ যে অত্যাবশ্যক, তাহা না বলিলেও চলিবে। পণ্য না বাড়িলে নিয়ন্ত্রণনীতি বন্ধের পর যোগান ও চাহিদার দারুণ

অসামঞ্জস্য ঘটিয়া পণ্যমূল্য অসম্ভব রকম বাড়িয়া যাইতে পারে। বিদেশ হইতে পণ্য আমদানীর পথ খোলা থাকিলে সাময়িকভাবে অতিরিক্ত দাম লইয়া চোরাকারবারীরা অবশ্যই ব্যবসা পারাপ করিয়া ফেলিতে সাহস করিবে না।

ভারতবর্ষের খাদ্য পরিস্থিতি এখনও শোচনীয়। প্রকাশ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দেও ভারতে ৪০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি হইবে। অত্যাবশ্যক যেসব জিনিষের অনটন এত বেশী তাহাদের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এখনি তুলিয়া লওয়া অবশ্যই সুবিবেচনার কাজ হইবে না। তবে যে সব জিনিষের চাহিদা অনুযায়ী যোগানের সম্ভাবনা আছে এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য যাহাদের অভাবে দেশের লোক অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, সেগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ অবিলম্বে বাতিল হওয়া আবশ্যক। দেশের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিকে শান্তিকালীন পরিস্থিতিতে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইলেও যথাসত্বর এবং যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করা দরকার।

অভিনয়

শ্রীকানাই বসু

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অবনীবাবুর দ্বিতলের বৈঠকখানা

ক্ষণকাল পরে অন্তঃপুর হইতে সুমিত্রা প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও না দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, পরে মজুমদারকে দেখিয়া কাছে আসিল। মজুমদার সিগারেট ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুমিত্রা। আপনি আছেন এখানে?

মজুমদার। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলুন।

সুমিত্রা। খোকা এসেছে শুনলুম, রতন বল্লে।

মজুমদার। হ্যাঁ, ওপরে গেছে।

সুমিত্রা। মিষ্টার মজুমদার।

মজুমদার। আজ্ঞে হ্যাঁ?

সুমিত্রা। আপনার কথা উনি শোনেন। আপনি একবার ওঁকে বলবেন?

মজুমদার। নিশ্চয় বলব। এখনই বলছি গিয়ে। হ্যাঁ, কী বলব বলুন তো?

সুমিত্রা। খোকাকে আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। উনি তো সারা দিন আর আদ্দেকটা রাত মক্কেল, কোর্ট আর পার্টি মিটিং নিয়ে আছেন। আর কোনও দিকে ফিরে চাইবার ওঁর খেয়ালও নেই, অবসরও নেই। খোকা যে কী করে, কোথায় ঘোরে, কী এমন কাজে ব্যস্ত যে নাওয়া খাওয়ার, চুল আঁচড়াবার সময় পায় না—রাত্তিরে কখন ফেরে, বিছানায় শোয় কি না শোয়—এ সব কথা আমি কাকে বলি। সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারি না—

মজুমদার। না, না। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অতি সুশীল ছেলে, ওর দ্বারা হীন বা অন্যায় কাজ কিছু হতে পারে না। আপনার আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।

সুমিত্রা। অন্যায় ও করবে না, তা জানি।

মজুমদার। তবে? এত দুশ্চিন্তার কী আছে?

সুমিত্রা। কী জানি, আমার কেবলই মনে হয় খোকা যেন আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সামনে বসে হাসে গল্প করে যখন, তখনও মনে হয় যেন কত দূর থেকে কথা কইছে। কী রকম মনে হয়—সে আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। এই যেমন ট্রেণে বসে কেউ কথা কইছে—আর আমি ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, মিনিটে মিনিটে দূরত্ব বাড়ছে, কিছু করতে পারছি না। এই রকম মনে হয়, আর বুকের মধ্যে যেন হাঁপিয়ে উঠি।

মজুমদার। না, না, ওসব আপনার মাতৃস্নেহের ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক, আপনার ইচ্ছে কী বলুন। অবনীকে কী বলতে আদেশ করছেন?

সুমিত্রা। আর কিছু নয়, খোকার একটি বিয়ে দিয়ে দিন। মেয়ের সন্ধান আমি পেয়েছি। আপনি আপনার বন্ধুকে বুঝিয়ে বলুন, কেন বিয়ে করে কি দেশের কাজ, স্বদেশীর কাজ হয় না? কেবল বিবেকানন্দের আদর্শই কি আদর্শ? মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, এঁদের—

মজুমদার। দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, মহাত্মাজী, মতিলাল, জওহরলাল, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ—কার আদর্শ কম? আমি কারুকে বাদ দেব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সুমিত্রা। আপনি বলবেন। একমাত্র আপনাকেই উনি মানেন। আমি যাই। খোকার জলখাবার দিই গে। আপনার জন্যে কি চা পাঠিয়ে দেব?

মজুমদার। আবার কেন কষ্ট করবেন? থাক।

সুমিত্রা। কষ্ট কিছুই নয়। তা ছাড়া খোকার জন্যে তো চা

করছিই, সারা দিন এই আসছে এই আসছে করে চায়ের জল চড়িয়েই রেখেছি। কাল সকালে দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে, আর আজ এই সন্ধ্যে হতে চলেছে। প্রস্থান।

মজুমদার বসিয়া আর একটি সিগারেট ধরাইল। এক ভৃত্য আসিয়া ইতস্ততঃ দেখিয়া মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিল—

ভৃত্য। দাদাবাবু আসছেন নাকি বাবু?

মজুমদার। কেন?

ভৃত্য। রাস্তায় একটি বাবু খোঁজ করতিছেন।

মজুমদার। রাস্তায়?

ভৃত্য। আজ্ঞে হাঁ, ঐ যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন।

মজুমদার জানালার ধারে গিয়া বাহিরে পথে দেখিল। পরে আসনে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

মজুমদার। খালি দাদাবাবুকে খোঁজ করলে? না আর কারও কথা জিজ্ঞেস করছিল?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ, বলছিল আর কে আছে বাড়ীতে? আমি কইলাম, অপিস ঘরে কর্ত্তাবাবু আছেন, ওপরে মজুমদার সাহেব আছেন।

মজুমদার। আচ্ছা, বল গে যাও, দাদাবাবু এখন স্নান করছেন, তার পর খাওয়া দাওয়া করে জিরিয়ে তবে নীচে নামবেন। ঘণ্টা দুই পরে এলে দেখা হবে।

ভৃত্য। দুই ঘণ্টা পরে? আচ্ছা। প্রস্থান।

কনকের প্রবেশ।

কনক। মিষ্টার মজুমদার এখনও আছেন? ভালোই হয়েছে।

মজুমদার। তাই তো দেখছি, এখনও আছি। কেন যে আছি কে জানে। তবে তুমি যখন বলছ মা, তখন ভালোই হবে কিছু নিশ্চয়।

কনক। কী করছিলেন?

মজুমদার। কিছুই তো করতে পারছি না মা, তাই কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে কাগজ পড়ছি অকেজো লোকের মত।

কনক। আচ্ছা, কাগজে কী এত পড়েন আপনারা? যত সব বাজে খবর।

মজুমদার। ঠিক ধরেছ মা। বাজে খবর সব কেবল—সন্দেহ নেই। সেই আজিকালের খবর, তাই নাম ধাম বদলে পুনরাবৃত্তি করে চলেছে। সেই জার্মানী, জাপান আর রাশিয়া। সেই চুরি, ডাকাতি আর খুন। এই দেখ না, কত দিনের পুরোনো ঘটনা, কালকে ঘটেছে, তাই আবার লিখেছে। "কাল রাত্রে লাউডন ষ্ট্রীটে এক সাহেবকে কে বা কাহারা গুরুতর জখম করিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, টাকা কড়ি কিছু লইতে পারে নাই, কিন্তু সাহেবের রিভলভারটি পাওয়া যাইতেছে না। সন্দেহক্রমে সাহেবের খানসামাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে এবং আশা করিতেছে শীঘ্রই আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হইবে।"

কনক। ছাই হইবে। কক্ষণো গ্রেপ্তার করতে পারবে না, আমি বাজি রাখতে পারি। আর যদি বা চাকরি বজায় রাখবার জন্যে ধরে কারুকে—তো ধরবে এক নিরীহ নির্দোষ লোককে।

মজুমদার। অমন করে বোলো না মা। নিরীহ নির্দোষ বলে আমার একটা গর্ব আছে মনে মনে, তোমার কথায় গর্বের স্থানে ভয় এসে জমছে।

কনক। (হাসিতে হাসিতে) আপনার ভয় নেই, আপনাকে ধরে ওরা সময় নষ্ট করবে না। আপনি আর একটু বসুন। মাসীমা খেতে ডাকছেন, খেয়ে এসে অনেক কথা আছে। মেসোমশায়ের সঙ্গে প্রচুর ঝগড়া করে এসেছি, তাতে খিদেও বেড়ে গেছে প্রচুর।

হাসিতে হাসিতে ভিতরে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে উপর হইতে নামিয়া আসিল জয়ন্ত। গোঁফ দাড়ী কামাইয়াছে, চুল ফিরাইয়াছে ও নিখুঁত বিলাতী বেশ পরিয়াছে। এই নূতন রূপে প্রথমটা তাহাকে দেখিয়া যেন চেনা যায় না। তাহার হাতে একটি ক্ষুদ্র সুটকেশ।

জয়ন্ত। আমি চললুম মিষ্টার মজুমদার। আপনি আমাকে মাপ করেছেন, কিন্তু আমি আজকের দিনটির কথা কোন দিন ভুলব না। যদি কখনও কোনও মানুষকে চিনেছি বলে গর্ব আসে মনে, আজকের কথা মনে করে নিজেকে সাবধান করে দেব।

মজুমদার। কতদূর যাবে? খুব দূরে কি?

জয়ন্ত। দূরে মনে করলেই দূরে। নয় তো, এইটুকু তো পৃথিবী। নট এ ভেরি বিগ্ প্ল্যানেট, ইউ নো।

মজুমদার। টাকার চেষ্টায় তো? মিনিট দুয়েক বসলে কি খুব বেশি অসুবিধে হবার সম্ভাবনা?

জয়ন্ত। হ্যাঁ, প্রথম কাজ টাকার জোগাড় বটে। তার পর—

চুপ করিয়া গেল

মজুমদার। তার পর অনেক কাজ, অনেক কথা। সে সব যদি আমাকে না বল, আমি দুঃখিত হব না।

জয়ন্ত। আপনাকে বলে কিছু ক্ষতি হবে না তা জানি, কিন্তু বলতে পারছি না, মাপ করবেন। যদি ফিরে আসি তখন বলব।

মজুমদার। যদি ফিরে আসি।

জয়ন্ত। নমস্কার।

জয়ন্ত সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া ফিরিয়া জানালার ধারে গেল ও অতি সাবধানে নীচে পথের দিকে একবার চাহিয়াই চকিতে সরিয়া আসিল, অল্প ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—

জয়ন্ত। মিষ্টার মজুমদার! (মজুমদার চোখ তুলিয়া চাহিল) একটা সাহায্য করবেন? (মজুমদার নীরবে চাহিয়া রহিল) এই ব্যাগ্‌টা মনে করছি আপনার কাছে রেখে যাই। ঘণ্টাখানেক পরে যে এসে চাইবে, অমরে—অমরে লাউডন, তাকে দিয়ে দেবেন।

মজুমদার। এখনও বাইরে দিনের আলো রয়েছে, না? রাস্তার ওপারে পানের দোকানে সেই লোকটা এখনও দোকানদারের সঙ্গে গল্প করছে বুঝি?

জয়ন্ত। (অতি বিস্মিত হইয়া) আপনি কী করে জানলেন?

মজুমদার। ও খেলা যে অতি পুরোণো খেলা বাবা। তা বেশ, তোমার ব্যাগ থাক। লাউডন্ ইজ দি ওয়ার্ড। তা দেখ, বুড়ো মানুষ ও বিদেশী কথা যদি ভুলে যাই, আর কথাটা বড় লাউড শোনাচ্ছে। তার চেয়ে মনে কর যদি—যদি গৌরাঙ্গ বলা যায়, কী বল? প্রেমের অবতার গৌর অঙ্গ?

জয়ন্ত। বেশ। গৌরাঙ্গই ভাল। ব্যাগ্‌টা তবে রইল।

মজুমদার। ব্যাগের ভার যখন দিলে, তখন আমার একটা ভার নিতে হবে তোমাকে।

জয়ন্ত। বলুন?

মজুমদার। বলি।

মজুমদার গায়ের ওভারকোটটি খুলিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল
এবং বার কয়েক জানালার বাহিরে ওভার কোটটি ঝাড়িয়া
লইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া সেটি পরিল। তার পর
টুপি মাথায় দিয়া জানালার দিকে পিঠ করিয়া
দাঁড়াইয়া বার দুই দেশলাই জ্বালিয়া
সিগারেট ধরাইল ও জোরে জোরে
কয়েকটি টান দিয়া ফিরিয়া
আসিয়া ওভারকোট
খুলিয়া আসনে
বসিল।

মজুমদার। ব্যাগ আর ওভার কোট, দুটোর ভার বইতে পারবো না বাবা। এটি তুমি গায়ে দিয়ে নাও। আর এই টুপিটাও।

জয়ন্ত। সে কী? আপনার গায়ের ওভারকোট। আর তাছাড়া আমি কবে ফিরবো কি না ফিরবো—

মজুমদার। ফেরৎ পাবার জন্তে আমার তাড়া নেই। উপস্থিত এটা তুমি পরে বেরোলে আমার বোঝাটা হাল্‌কা হয়।

জয়ন্ত। (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) আচ্ছা দিন, আমি বুঝেচি।

মজুমদার। বুঝবে বই কি। বুড়ো মানুষ, ওভারকোটটা বিষম ভারি—

জয়ন্ত। আপনার ওভারকোট কি দেখেছে ও লোকটা?

মজুমদার। কদিন দেখছে। তা ছাড়া বড় ধুলো হয়েছে, অনেক বার ঝাড়তে হল তাই।

জয়ন্ত। (মৃদু হাসিয়া) সমস্ত ধুলোটা ও বেচারার চোখেই পড়ল বোধ হয়। চোখের ওপর এখনও ওভার কোটটা নড়ছে।

মজুমদার। সম্ভব।

জয়ন্ত ওভার কোট পরিয়া লইল।

মজুমদার। একটু বসো। আমাদের শাস্ত্রে বলে, জয়ের মধ্যে গোধূলি লগ্নই প্রশস্ত। এখনও একটু আলো রয়েছে বাইরে।

জয়ন্ত বসিল।

মজুমদার। এর ভেতর কী আছে, আমাকে দেখাতে আপত্তি আছে জয়ন্ত?

জয়ন্ত। আপত্তি একটু—, মানে ভেতরে সব আমার জিনিস নয়—

মজুমদার। ট্রাষ্ট, বিগেট্স্ ট্রাষ্ট। একটা স্টকেসের গল্প বলি শোনো। বছর তিরিশ আগে একটি ছোকরা কলকাতায় কলেজে পড়তো। মানে, পড়ার নাম করে বাপের পয়সার ভার লাঘব করতো। এমনই দৈবের ফের, একদিন কেমন করে তারই কানের কাছে কিনা দুঃখিনী ভারতমাতার চরণের শৃঙ্খল প্রবল ভাবে বেজে উঠল। তখন রইল তার শেলী কালিদাস, ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস, রইল পড়ে উইলসন হোটেল, নিউ এম্পায়ার। সেই শৃঙ্খল ভাঙ্গতে কোমর বাঁধলে ছোকরা। কিন্তু জান তো আমাদের কবি বলেছেন, 'মনের মধ্যে নিরবধি শেকল গড়ার কারখানা?'

জয়ন্ত। 'একটা শেকল ভাঙ্গ্‌ল যদি, গড়ে ওঠে চারখানা।'

মজুমদার। ভাঙ্গবার ত্বর সয় না, ভাঙ্গবার আগেই নতুন শেকল গড়ে ওঠে। মেসের পাশের বাড়ীতে গরীব ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে আর হয় না। স্বজাত, স্বঘর। ভারতমাতার সেই সুসন্তান পরোপকারায়,—নিছক পরোপকারায় নয়, স্বার্থ ছিল কিছু হৃদয়-ঘটিত—নিজের ব্রতে জলাঞ্জলি দিতে গেল। কিন্তু ভারতমাতা তা দিতে দেবেন কেন? পাকাদেখার দিন সকালে এই রকম একটা ব্যাগ হাতে করে ছোকরা বেরোলো এক জরুরী কাজে, শৃঙ্খল-মোচনের মালমশলা ফিরিয়ে দিতে। এক ঘণ্টা পরে পাকা-দেখা। কারুকে বলে নি, নিজেই পাত্রী আশীর্ব্বাদ করবে, তার জন্তে আংটি ও কিনেছে। বেরোলো সকালে, ফিরতে লেগে গেল আঠারো বছর।

জয়ন্ত। (সবিস্ময়ে) আঠারো বছর?

মজুমদার। আঠারো বছর। এমন এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, যিনি অনেক দিন খুঁজছিলেন, হাতে হাতে কিছু জিনিসপত্র সুদ্ধ পেয়ে আর ছাড়লেন না।

জয়ন্ত। কোথায় ছিল?

মজুমদার। ছিল ভালোই। সমুদ্রের হাওয়ায় আর নিয়মিত ব্যায়াম ও নিয়মিত আহারে দেহ মনের উন্নতিই হল। লোহার মত দেহ এবং পাথরের মত মন নিয়ে ফিরল।

জয়ন্ত। সেই মেয়েটি?

মজুমদার। মেয়েটি কোথায় হারিয়ে গেল। তাকে আজও খুঁজে পায়নি। একদিন হয় তো পাবে খুঁজে, এখানে, না হয় ওখানে। কে জানে! (অল্পক্ষণ নীরব থাকিয়া) আজও ভারতমাতার চরণের শৃঙ্খল ভাঙা যায় নি। আজও পট্‌কা ছুঁড়তে গিয়ে মায়ের সোনার চাঁদ ছেলেরা আত্মবলি দিয়ে চলেছে।

জয়ন্ত। আপনার ইচ্ছে হয় যদি, ব্যাগ খুলে দেখবেন। ট্রাষ্ট, বিগেট্স্ ট্রাষ্ট। আমি চলি এইবার।

মজুমদার। সাহেব যখন সেজেছ, তখন টুপিটা পরে নাও জয়ন্ত। (নিজের টুপি জয়ন্তকে দিল)

জয়ন্ত। যদি ফিরে আসি, অনেক কথা আছে।

মজুমদার। বন্ ভয়েজ, মাই ফ্রেণ্ড। (নিবিড় বন্ধনে উভয়ের করতল মিলিল) জয়ন্তর প্রস্থান।

মজুমদার সুটকেসটি খুলিল। কতকগুলি কাগজ পত্রের নীচে হইতে কাপড়ে মোড়া একটি কঠিন বস্তু বাহির হইল। আবরণ না খুলিয়া স্পর্শদ্বারা মজুমদার যেন তাহার স্বরূপ চিনিল। সেই সময়ে বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া চকিত হইয়া বস্তুটি সার্টের বোতাম খুলিয়া বুকের মধ্যে লুকাইয়া সুটকেস বন্ধ করিল।

প্রবেশ করিল কনক

কনক। এইবার আপনার সঙ্গে গভীর ষড়যন্ত্র মিষ্টার—এ কী? এ সুটকেস কেন এখানে? কী আছে—

মজুমদার। আহা, থাক, থাক। ও আমার সুটকেস।

কনক। আপনার কী রকম? এ ছোড়দার সুটকেস আমি চিনি না?

কথা কহিতে কহিতে সে ভিতর হইতে একখানি মাউণ্ট্ করা ফোটোগ্রাফ বাহির করিয়া ফেলিয়াছে।

আরে, এ ফোটো কার গো? য়্যাঁ? ও-মা! এ যে সেই পোড়ার-মুখীর ছবি গো। (ছবি দেখিতে লাগিল)

মজুমদার। আহা রেখে দাও কনক। ছিঃ, ডোণ্ট বি এ নটি গার্ল। পরের জিনিস—

কনক। পরের জিনিস? রয়েছে আমার দাদার বাক্সে, জিনিসটা আমারই বন্ধুর ছবি, পরের কোনখানটায় হল মিষ্টার মজুমদার? দাঁড়াও মাসীমাকে দেখাচ্ছি, তাঁর ছেলের কীর্ত্তি। যাই বলি, মুখপুড়ি ছবিটা তুলিয়েছে ভালো, দেখুন না মিষ্টার মজুমদার। কী সুন্দর মুখখানা নয়?

(ছবি মজুমদারের সামনে ধরিল, মজুমদার মুখ ফিরাইয়া লইল)

মজুমদার। দেখতে চাই না। তুমি রেখে দাও যেখানে ছিল, এও বি এ গুড্ গার্ল।

কনক। এই যে রাখছি ভাল করে, ভাল জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করছি। আগে মাসীমাকে দেখাই একবার, দাঁড়ান না।

বলিতে বলিতে ছবি লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

মজুমদার। হাউ ইটারন্যাল ওম্যান!

মজুমদার সেই কঠিন বস্তুটি বাহির করিয়া সুটকেসে রাখিয়া সুট-কেস বন্ধ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত চোখ বুঁজিয়া সিগারেটে ঘন ঘন টান দিয়া মজুমদার আপন মনে বলিল—

মজুমদার। এমন নিশ্চিহ্ন হয়ে হারিয়ে গেল কী করে? একটা নিদর্শনও রেখে গেল না? একবার স্বপ্নেও দেখা দিতে পার না?

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে পুনরায় নীরবে সিগারেট টানিতে লাগিল।

ঘরের মধ্যে ঘনায়মান অন্ধকার ও নিবিড় স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কাহার চঞ্চল পদক্ষেপ শুনা গেল। নীচের সিঁড়ি বাহিয়া একটি তরুণী মেয়ে উত্তেজিত দ্রুত পদে উঠিয়া আসিল। তাহার মুখে চোখে ত্রস্ত উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার ছাপ।

সেই মুহূর্ত্তে মজুমদার চোখ মেলিল ও মেয়েটিকে দেখিল। তখন সন্ধ্যা নামিয়াছে, উপরন্তু অবিরাম সিগারেটের ধূমে ঘরের ক্ষীণ আলো ঢাকা পড়িয়াছে।

বিস্ময়, আনন্দ ও উত্তেজনায় কম্পিতকণ্ঠে মজুমদার ডাকিল—

মজুমদার। নীলা!

মেয়েটি এই অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া প্রথমে মজুমদারকে দেখিতে পায় নাই। কণ্ঠ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে অনুরাধা।

অনুরাধা। কে আপনি? আপনি কি—

মজুমদার। নীলা, সত্যিই তুমি এলে?

মজুমদার বিকৃত-মস্তিষ্ক হয় নাই। একদিকে নিজের চক্ষুকে সে অবিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, অপরদিকে যুক্তি ও বুদ্ধি বলিতেছে ইহা সম্ভব নয়। অনুরাধাও একমুহূর্ত্ত কথা কহিতে পারিল না। মজুমদার একাগ্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া সে চক্ষু নত করিয়া বলিল—

অনুরাধা। আমার নাম অনুরাধা। আমাদের বাড়ীতে বড় বিপদ। এই বাড়ীতে জয়ন্তবাবু থাকেন তো?

ততক্ষণে মজুমদার আত্মস্থ হইয়াছে। প্রাণপণশক্তিতে সহজ সুরে কথা কহিবার চেষ্টা করিল।

মজুমদার। জয়ন্ত? হ্যাঁ, কী হয়েছে?

অনুরাধা। এইটে জয়ন্তবাবুর বাড়ী তো? তিনি কি বাড়ী আছেন, একবার ডেকে দিন না।

মজুমদার। দিচ্ছি। না, না জয়ন্ত বাড়ী নেই।

অনুরাধা। (হতাশ হইয়া) বাড়ী নেই? (সে একখানি চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইল) তবে কী হবে? কোথায় যাই?

মজুমদার। কী বিপদ আমাকে বল মা। কী তোমার নাম বলে?

অনুরাধা। অনুরাধা।

মজুমদার। তুমি আমার কথা শুনে ভয় পেয়েছিলে বোধহয়। আমার মাথাটা এক এক সময় গুলিয়ে যায়।

অনুরাধা। না, ভয় পাইনি। তবে চমকে উঠেছিলুম। আমার মায়ের নাম নীলা ছিল কি না।

মজুমদার। (অস্ফুটস্বরে)—য়্যাঁ?

মজুমদারের চোখের দৃষ্টি পুনরায় উগ্র হইয়া উঠিল। সে চোখ বুঁজিয়া দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া আত্মসংবরণ করিবার প্রয়াস পাইল। ক্ষণকাল পরে—

মজুমদার। তোমার মায়ের নাম—নীলাম?

(অনুরাধা ঘাড় নাড়িল।)

ছিল, ছিল বলছ কেন মা?

অনুরাধা। মা নেই।

মজুমদার। (একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া) অনুরাধা, আলোটা জ্বেলে দাও তো মা।

অনুরাধা আলো জ্বালিতে গেল।

মজুমদার। ও দিকে নয়। ঐ যে তোমার পিছনে সুইচ।

অনুরাধা দেয়ালের দিকে অগ্রসর হইল। কথা কহিতে কহিতে সুমিত্রা ও কনক প্রবেশ করিল।

কনক। এবার একদিন তোমাদের নিয়ে গিয়ে আসল মানুষটাকে দেখিয়ে দিতে—

এই সময় আলো জ্বলিয়া উঠিল। কনক ও সুমিত্রা বিস্মিত হইয়া ঘরের অন্তদিকে চাহিল। অনুরাধা আলো জ্বালিয়া ফিরিতে কনককে দেখিল।

অনুরাধা। কনা?

কনক। (বিস্মিত আনন্দে) ও—মা—গো! তুই নিজেই এসে গেলি? আর দেরি সইল না?

অনুরাধা। কনা ভাই—

কনক। কার সঙ্গে এলি? ছোড়দার সঙ্গে বুঝি? কী বেহায়া মেয়েরে তুই!

অনুরাধা। জয়ন্তবাবুকে খুঁজতে এসেছি। কনা, আমাদের বড় বিপদ।

কনক। (পরিহাস ভুলিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) কী বিপদ? তোর বাবা ভাল আছেন তো?

অনুরাধা। বাবা বুঝি আর নেই এতক্ষণ।

(বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।)

বাড়ীতে আর কেউ নেই। দিদি একলা, বাবাকে কোলে করে বসে আছে। তাই জয়ন্তদাকে ডাকতে—

কনক। কেন তোদের সেই নীরুবাবু না কে—

অনুরাধা। বাবা কদিন বেশ ভালো আছেন দেখে তিনি কাল দেশে গেছেন। হঠাৎ আজ বিকেলে—

আর বলিতে পারিল না, আঁচল টানিয়া মুখে পুরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুমিত্রা আগাইয়া আসিল।

কনক। অনু, ইনি আমার মাসীমা। জয়ন্তদার মা।

অনুরাধা প্রণাম করিতে গিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। সুমিত্রা তাহাকে উঠাইয়া বুকের মধ্যে গ্রহণ করিয়া নিজের আঁচলে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল। তারপর নিজের চোখ মুছিয়া বলিল—

সুমিত্রা। আর কে আছেন মা বাড়ীতে?

অনুরাধা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আমাদের আর কেউ নেই, কোথাও কেউ নেই। বাবা চলে গেলে আর কেউ থাকবে না আমাদের।

সুমিত্রা। কেউ নেই নয় মা, আমি আছি যে। আমি তো রয়েছি। ভয় কী? বাবা ভালো হয়ে যাবেন, আমি এখুনি ডাক্তার নিয়ে যাচ্ছি। কোনো ভয় নেই মা। তুমি এসো।

সুমিত্রা, অনুরাধা ও কনক প্রস্থান করিল।

মজুমদার। (উঠিয়া পদচারণা করিতে করিতে) হোয়াট ইটারন্যাল ওম্যান। নীলা, অনুরাধা,—নীলা—নীলা—　　(ক্রমশঃ)

মহামানবের সাগরতীরে

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৭ সালের মার্চ্চ মাসে বহু শতাব্দীর বন্ধনমুক্ত ভারতের রাজধানী দিল্লীনগরীকে নবচেতনায় চঞ্চল দেখা গেল। "মহামানবের সাগরতীরে" নবজাগ্রত এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অখিল এশিয়ার এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। দিল্লীর আকাশ বাতাস এক নূতন আশার বাণীতে প্রাণবন্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নবযুগের সূচনা। দীর্ঘ সুষুপ্তির পর প্রাচ্যের নবজাগরণের সাড়া পাওয়া গেল দিল্লীনগরীতে। ভারতকে মধ্যমণির মত কেন্দ্রস্থলে রেখে এশিয়ার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে এশিয়াবাসীদের মুখপাত্রগণ তাদের মর্ম্মবাণী শুনিয়ে গেলেন এই মহামিলন ক্ষেত্রে। মহান ঐক্যের নিমন্ত্রণে সঞ্জীবিত হয়ে এশিয়ার একত্রিশটি জাতি ভারতের মাটিতে এঁকে গেল আগামী যুগের বিরাট সম্ভাবনার এক মহিমময় চিত্র। তারা সকলেই মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন যে এশিয়ার জাতিগুলির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের বাঁচতে হলে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হবে। সকলেরই মুখে একই বাণী প্রতিধ্বনিত হল যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতের ব্যবধান, দুস্তর সমুদ্রের তরঙ্গ এশিয়াকে বিভক্ত করতে পারে নি। যুগ যুগ ধরে এশিয়া সমগ্র জগৎকে প্রেম ও মৈত্রীর প্রেরণা দিয়েই এসেছে। দ্বিতীয় মহাসমরের ধ্বংসযজ্ঞের অবসানে এশিয়ার চিন্তানায়কগণ এখনও সেই মৈত্রীর বাণীই ঘোষণা করলেন। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জর্জ্জরিত হয়েও এশিয়ার কোন জাতির কণ্ঠ হইতেই এই মহাসম্মেলনে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ

উদ্গীরণ হয় নি। অতীতের গ্লানিকে তাঁরা ঔদার্য্যের সঙ্গে ক্ষমা করেছেন—প্রাচ্যের শাশ্বত আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা বিশ্বের সকল মানবের প্রতি বাড়িয়ে দিয়েছেন মিলনের হস্ত। এই মহাপ্রাণতা ভারত ও নবজাগ্রত এশিয়ার বিরাট সম্ভাবনারই দ্যোতক।

দিল্লীর পুরাণ-কিল্লার বিরাট প্রাঙ্গণে এই সম্মেলন ২৩শে মার্চ্চ থেকে আরম্ভ হয়ে শেষ হয় ২রা এপ্রিল তারিখে। এই পুরাণ-কিল্লার এবং যে-স্থানে এই কিল্লাটি অবস্থিত তারও একটা ইতিহাস আছে। মোগল সম্রাট হুমায়ুন এই দুর্গটি নির্ম্মাণ করেন এবং পরে আফগানরাজ শের-শাহ সুরী ইহার সম্প্রসারণ সাধন করেন। পুরাণ কিল্লার সীমানার মধ্যে দুইটি ঐতিহাসিক ভবন দেখা যায়—শের মসজিদ ও শের-মণ্ডল। শের-মণ্ডলের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েই সম্রাট হুমায়ুনের জীবনান্ত ঘটে।

এই পুরাণ কেল্লার সংলগ্ন ভূখণ্ড প্রাচীন ভারতের এক মহাশক্তিশালী হিন্দুরাজের রাজধানী বক্ষে ধারণ করে ধন্য হয়েছিল। মহাভারতের পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির এইখানেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী নির্ম্মাণ করে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই ইন্দ্রপ্রস্থেই মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁর আহ্বানে ইন্দ্রপ্রস্থের দ্যূতিময় প্রাঙ্গণে একদিন প্রাচ্যের রাজন্যবর্গের যে বিরাট সভা বসেছিল নবজাগ্রত ভারতের কর্ণধার পণ্ডিত নেহরুর আমন্ত্রণে পুরাণ কিল্লার সভামণ্ডপে আমরা কি তাহারই পুনরনুষ্ঠান দেখলাম? না—এই মহাসম্মেলনের গুরুত্ব ততোধিক। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের চিন্তানায়কগণের উপস্থিতি এই সম্মেলনকে যে গৌরব ও মর্য্যাদা দান করেছে, তার কাছে বিক্রমাদিত্য, অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, আকবর ও সাজাহানের রাজসভাও ম্লান হয়ে গেছে, আফগানিস্থান, সিংহল, মিশর, ইরাণ, মঙ্গোলিয়া, শ্যাম, ভিয়েৎনাম, ইরাক, সিরিয়া, ব্রহ্ম, চীন, ইন্দোনেশিয়া, লেবানন, ফিলিপাইন, তুরস্ক, সৌদীআরব, টান্সজর্ডন, ইয়েমেন, আর্ম্মেনিয়া, ভুটান, আজারবাইজান, নেপাল, কোচীন, চীন, উজারিস্তান, মালয়, উজ্বাকিস্তান, তিব্বত, কোরিয়া ও ফিলিপাইনের প্রতিনিধির উপস্থিতি সম্মেলনকে এক মহান আন্তর্জ্জাতিক মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এশিয়া মহাদেশের এতগুলি জাতি আর কোনদিন এমন মিলনের সুযোগ পায় নাই। এশিয়ার মন কোনদিন এমনভাবে এক সুরে বাঁধা হয় নাই। প্রবলের অত্যাচারের অবসানে আজ এশিয়ার যুগ-যুগান্তের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। যে এশিয়ার মাটিতে মানুষের প্রথম সভ্যতার শিশু জন্মলাভ করেছিল—কবি, দার্শনিক ও ধর্ম্মবেত্তাগণ যে মহাদেশকে শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে সমুজ্জ্বল করেছিল আজ নিশান্তের অন্ধকার ভেদ করে সেই মহাদেশের পূর্ব্বদিগন্তে নূতন সূর্য্যের উদয় হচ্ছে। প্রভাত অরুণের কনক কিরণে এশিয়া-জননীর দীপ্ত ললাট ভাস্বর হয়ে দেখা দিয়েছে। বুদ্ধ, খৃষ্ট ও মহম্মদের মতই এক মহাপুরুষের কণ্ঠে তাই আমরা পুনরায় অভয় বাণী শুনতে পাচ্ছি। বিশ্ব আজ একথা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে এশিয়া আবার পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের পথপ্রদর্শক হবে। দিল্লীর এই সম্মেলনে সেই পথের সন্ধান দিয়েছে।

এশিয়ার দাসত্বের যুগ শেষ হয়ে এলো। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের পাষাণ-বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল;তার বুকে বৃটেন ভারত ব্রহ্ম ও দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়ার এক বিরাট অংশের উপর তার প্রভুত্ব বিস্তার করে। ডাচশক্তি পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ গ্রাস করে এবং ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোচীনে ঘাঁটী পাতে। চীনে ইউরোপের সমস্ত শোষকশক্তির উৎসব ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইরাণ বাহ্যতঃ স্বাধীন হলেও বৃটীশ শক্তির প্রভাব সেখানে বিশেষ কার্য্যকরী হয়। এশিয়ার আত্মার উপর এক দানব শক্তি তার প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয় মহাসমর এই দানবকে এক প্রচণ্ড আঘাত করেছে। এশিয়ার বিপ্লবের বহ্নিশিখা উঠেছে জ্বলে। ভারতে, ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়, মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদ পাততাড়ি গুটাতে সুরু করেছে। এশিয়ার মুক্তি সমাগত। অখিল এশিয়া সম্মেলন সেই মুক্তিপথের অগ্রদূত হয়ে রইল।

সমগ্র বিশ্ব যে সম্মেলনের প্রতি বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্লর্ড একেয়ার্স সেই সম্মেলনের অনুষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠানটি একটী বে-সরকারী ও রাজনীতিসংস্রবশূন্য প্রতিষ্ঠান। ভারতীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কিত ঘটনাবলীর অনুশীলন ও উন্নতি সাধন এর উদ্দেশ্য। ভারতের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের এবং সর্ব্বশ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এর সদস্য। স্যর তেজ বাহাদুর সাপ্রু প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। অখিল এশিয়া সম্মেলনও বে-সরকারী ও রাজনীতিসংস্রবশূন্য সম্মেলন। এশিয়ার দেশ সমূহের বৈষয়িক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর আলোচনাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

কাউন্সিলের কার্য্যকরী পরিষদের এক সভায় এইরূপ একটি সম্মেলন আহ্বানের কথা উঠে। অবশ্য তার থেকেই কার্য্যকরী সমিতির সদস্যদের সঙ্গে দেশের চিন্তানায়কদের এ নিয়ে মত-বিনিময় হয়। ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাইতে কার্য্যকরী সমিতির এক সভায় সম্মেলন আহ্বানের উপযোগিতা সম্পর্কে বিশেষ জোর দেন এবং তাঁরই চেষ্টায় সম্মেলনের উদ্যোগ আয়োজন চলতে থাকে। ১৯৪৬ সালের ৩১শে আগষ্ট তারিখে ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক সংগঠক সমিতি গঠিত হয়। সংগঠক সমিতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি করে এক পরিচালক সমিতি নিযুক্ত করেন। পণ্ডিতজী সেপ্টেম্বর মাসে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের ভার গ্রহণ করবার পর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু পরিচালক সমিতির সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হন। অবশ্য পণ্ডিতজী অনারারি সভাপতি থেকে যান।

অতঃপর দিকে দিকে গেল ভারতের আমন্ত্রণলিপি। এশিয়ার প্রাচীন দেশকে নূতন যুগের এই নব রাজসূয় যজ্ঞে আহুতি দিতে ডাকা হল। সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের এশিয়ান দেশগুলি, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ার সমস্ত দেশও মিশর প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিকে প্রীতির আহ্বান জানান হল। একমাত্র জাপান ব্যতিরেকে এশিয়ার সমস্ত দেশই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এই বিরাট সম্মেলনে এশিয়ার সমুদয় রাষ্ট্র একত্র হয়ে পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্য প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করেন। সম্মেলনে প্রধানতঃ (১) এশিয়ার মুক্তিকল্পে

জাতীয় আন্দোলন, (২) জাতীয় সমস্যা—বিশেষভাবে জাতীয় বিরোধের সমস্যা, (৩) এশিয়ার একদেশ থেকে আর একদেশে বসবাস—এইরূপ বহিরাগতদের সামাজিক মর্য্যাদা ও তাদের প্রতি ব্যবহার, (৪) ঔপনিবেশিক আর্থিক ব্যবস্থার জাতীয়করণ (৫) এশিয়ার দেশসমূহে কৃষির উন্নতিসাধন ও শিল্প বিস্তার (৬) এশিয়ার মজুর সমস্যা ও সমাজ-সেবা (৭) এশিয়ার সংস্কৃতি সমস্যা—বিশেষভাবে শিক্ষা, শিল্প, ভাস্কর্য্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাহিত্য সমস্যা, (৮) এশিয়ায় নারীজাতির মর্য্যাদা ও নারী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

সম্মেলনে অখিল এশিয়া প্রতিষ্ঠান নামে একটী স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্থির হয় যে প্রতি দেশেই একটি করে জাতীয় ইউনিট থাকবে। ঐ সকল ইউনিট কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের একটা সাধারণ পরিষদ গঠন করা হবে—প্রতি দেশের (অবশ্য সদস্যপদভুক্ত) সদস্য নিয়ে। ভারতের পক্ষ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও গোয়ালিয়ারের রাণী লক্ষ্মীবাঈ রাজওয়াড়ী অস্থায়ী পরিষদের সদস্য হন এবং পণ্ডিত নেহরু সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন ভারতের প্রতিনিধি ডাঃ শিবরাও এবং চীন দেশের প্রতিনিধি মিঃ হান লিউ।

অখিল এশিয়া প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয়েছে—(ক) সমস্ত এশিয়ার বা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ, (খ) এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের মধ্যে এবং এশিয়াবাসী ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন, (গ) এশিয়া-বাসীর সমধিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধন এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। সম্মেলনে আরও স্থির হয় যে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চীন দেশে সম্মেলনের পরবর্ত্তী অধিবেশন হবে। এর মাঝখানে যদি বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে সাধারণ পরিষদ বিশেষ অধিবেশন বা আঞ্চলিক অধিবেশন ডাকতে পারেন।

সম্মেলনের অপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হচ্ছে—এশিয়ার মুক্তি আন্দোলন সংক্রান্ত প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে এশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি সম্ভাব্য সকল উপায়ে পরাধীন রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করবে। কি ভাবে এই সাহায্য দেওয়া হবে তা অখিল এশিয়া প্রতিষ্ঠানে বিশদভাবে আলোচনার পর নির্ণীত হবে। এই সিদ্ধান্তকে বর্ত্তমান সম্মেলনের চরম সাফল্য বলা যেতে পারে। কারণ এতকাল এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি অপরাপর রাষ্ট্রের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি মিলিত সহানুভূতি মাত্র দেখাতে পারতেন। এখন মুক্তি-সংগ্রামরত এশিয়ার যে কোন দেশ অন্যান্য দেশের কার্য্যকরী সাহায্যের আশা করতে পারেন। বর্ত্তমানে এশিয়ার যে সকল দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত, সেই সকল দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হচ্ছে। তারা মনে করেন যে এই সিদ্ধান্তের ফলেই এশিয়ার ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হবে।

পুরাণ কিল্লার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ১৯৪৭ সালের নব বসন্তে জ্ঞানের উৎসবে আমরাও এক নূতন যুগের সন্ধান পাই। বিশ্ব-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন দিল্লীতে রূপ নিয়েছে। নিপীড়িত জাতির মুক্তি-পিপাসু নরনারী সত্য এক বিরাট যজ্ঞ সমাধান করেছেন। বর্ত্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী তাতে পূর্ণাহুতি দিয়ে বলেছেন "সত্য ও প্রেমের বাণী দ্বারাই প্রাচ্য একদিন প্রতীচ্যকে জয় করবে।" সভামণ্ডপে বিশ সহস্র নরনারী পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে আজ এই সঙ্কল্পই গ্রহণ করেছে। পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর কণ্ঠেও সেই মর্ম্মবাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আফগানিস্তান থেকে আরম্ভ করে উজবেকিস্তান পর্য্যন্ত এশিয়ার সকল দেশের প্রতিনিধির কণ্ঠেও সেই মিলনের সুর। তাই মনে হয় আবার এশিয়ার স্বর্ণময় যুগ ফিরে এসেছে—আবার যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ"। এশিয়ার জয় অনিবার্য্য।

বাসক শয্যা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-টি

পেয়েছো কি পদধ্বনি তার? যার লাগি
জিথিল ধরণী যেন ফুলরাণী সাজি
লক্ষ বর্ষা বসন্তেতে পরে নব বেশ?

বৃথা কি বাসক শয্যা? দরদের লেশ
নাহি কি মনেতে তার? কোন চন্দ্রাবলী
ধরার দয়িতে আজি কোন ছলে ছলি
ধরার নিকুঞ্জ হ'তে রেখেছে সরায়ে?

দুখিনী ধরণী মায়ের উত্তরী বায়ে
যুগে যুগে ফেলে তাই শ্বাস; অভিমানে
পত্র-পুষ্প আভরণ ফেলে কোন খানে।
পুনঃ সে সাজায় শয্যা, পরে ফুলসাজ
ভাবে মনে "প্রাণকৃষ্ণ আসে যদি আজ"!

মিথ্যা আশা, আসিবে না দেবতা ধরায়
ভ্রাতৃ রক্তে ধূলি এর কলুষিত হায়।

৫

সত্যিই স্মৃতির পাতার হিসেবটা এলোমেলো। কত বড় বড় ঘটনা, কত বিস্ময়কর ব্যাপার সে অবলীলাক্রমে জলের লেখার মতো মুছে ফেলে—সাধারণ চোখে যাকে পৃথিবীর একটা অসাধারণ অঘটন বলে মনে হয়, তার কাছে হয়তো তার এতটুকু দাম থাকে না। একটা অতি তুচ্ছ মুহূর্ত, রাশীকৃত ঘটনার আকার অবয়বহীন কালো পটভূমির ওপরে সমুজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের মতো দীপ্তি পায়।

রঞ্জুর মনে পড়ে পদ্মার ভাঙনের একটা দৃশ্য দেখেছিল একবার। রাক্ষসী নদী পদ্মা—রাক্ষসীর মতো তার ক্ষুধা। তার কুটিল হিংসার অশ্রান্ত আঘাতে মুহূর্তে গ্রাস করে নেয় নগর, অরণ্য, জনপদ। লক্ষ কোটি কীর্তিকে বিনাশ করেই কীর্তিনাশার আনন্দ।

সেই ভাঙনের আনন্দে মেতে ওঠা নদীর একটা বিচিত্র খেয়াল চোখে পড়েছিল রঞ্জুর। ভরা বর্ষায় মাতাল নদী তার মাতলামি সুরু করেছে, পাক-খাওয়া ঘোলা জলের আঘাতে এদিকের প্রায় আধখানা পাড়ি নেমে গেছে নদীর অতল গর্ভে। অথচ কী আশ্চর্য—প্রায় নদীর মাঝামাঝি জায়গায় যেন কী একটা অদ্ভুত মন্ত্রবলে একফালি ডাঙ্গা ছোট্ট একটা গোলাকার দ্বীপের মতো মাথা তুলে রয়েছে। চারদিক থেকে নদী ভেঙে নিয়েছে, ওই দ্বীপখণ্ডটুকুকে ঘিরে ঘিরে ক্ষ্যাপা জল নেচে বেড়াচ্ছে ফেনায়িত উদ্বেল আনন্দে—অথচ একটুখানি সবুজ মাটির বুকে তিন চারটি কলাগাছ আর একখানা মেটে ঘর অবিচলিত গৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মার অকারণ খুশির খেয়াল।

মনের মধ্যে সেই খেয়ালী প্রখর পদ্মার স্রোত বইছে অবিরাম ছন্দে। ভাঙছে উঁচু পাড়ি, ঝরে পড়ছে, গলে যাচ্ছে, ঢেউ জাগিয়ে, একরাশ বুদ্বুদের দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে নিশ্চিহ্নতায়। কিন্তু একটি আশ্চর্য মুহূর্ত, একটি অতি তুচ্ছ ঘটনা, সেই প্রবল ভয়ঙ্কর কীর্তিনাশা স্রোতকে উপেক্ষা করে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। আজ রঞ্জুর মনে হয়, জীবনের বাঁধা উঁচু ডাঙ্গাগুলোর চাইতে স্মৃতির ওই দ্বীপখণ্ড সমষ্টির মধ্যে কোথায় যেন অনেক বড় সত্য, অনেক গভীর কোনো তাৎপর্য নিহিত রয়ে গেছে।

এমনি একটা ব্যাপার।

ইস্কুলের কথা মনে পড়ে। পাড়াগাঁয়ের এম-ই স্কুল—প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতিনীতিতে শিক্ষাদীক্ষার বন্দোবস্ত। সাড়ে সাত থেকে সাড়ে বত্রিশ টাকা পর্যন্ত শিক্ষকদের বেতনের পরিধি! তাই মাইনে আদায় করতে না পারলে তাঁরা ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে কলাটা মুলোটা যা পারেন সংগ্রহ করেন। তাতেও যখন পেট ভরে না, তখন বঞ্চিত জীবন সম্পর্কে তাঁদের যা কিছু অভিযোগ এবং বিদ্বেষ, তার পুরোপুরি শোধ তোলবার চেষ্টা করে থাকেন ততোধিক দুর্ভাগ্য ছাত্রদের ওপর দিয়ে।

"Spare the rod and spoil the child"—এই মহান মূলমন্ত্রটি কোন্ ইংরেজ শিক্ষক কবে আবিষ্কার করে অমরত্ব লাভ করেছেন কে জানে। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করবার সদুপদেশ দিয়ে গেছেন ভারতীয় মনীষীরা। নাজীপুর এম-ই ইস্কুলের মাস্টার মশাইদের কাছে সুবল মিত্রের বাংলা অভিধান আর অক্সফোর্ডের ইংরেজী ডিক্সনারীর মতো এই মন্ত্র দুটিও অবিস্মরণীয় এবং অঙ্গাঙ্গী।

পাঠশালার পণ্ডিতদের ঐতিহ্য তাঁরা অখণ্ড বিশ্বাসে ইস্কুলেও বজায় রেখেছিলেন। দু-খানা থান ইঁট হাতে করিয়ে ঠাটা-পড়া রোদ্দুরে সাত আট বছরের ছেলেদের দিয়ে সূর্য-সাধনা করানো, গাধার টুপি মাথায় চড়িয়ে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা, পরস্পরের কান ধরিয়ে শোভাযাত্রা করানো, দু আঙুলের ফাঁকে পেন্সিল পুরে দিয়ে চাপ দেওয়া, বিছুটির চাবুক মারা, হাফ-ডাউন করানো এবং তৈলপক্ক জোড়া বেতের ঘায়ে হাত ফাটিয়ে একেবারে রক্তারক্তি করে দেওয়া—এ তাঁদের নিত্য কর্মপদ্ধতি ছিল।

মঞ্জুর মনে আছে কতগুলি বাঁধা-ধরা ছেলের বরাতেই এ শাস্তিগুলো বিশেষভাবে মুলতুবী ছিল। তাদের মধ্যে বেশির ভাগেরই ময়লা ছেঁড়া কাপড়, ঘোলা ঘষা কাচের মতো চোখ, রুক্ষ লালচে ধুলোভরা চুল, ছেঁড়া বই আর ছেঁড়া খাতা তাদের সম্বল। তারা পড়া পারত না, বছর বছর একই ক্লাসে তারা ফেল করত, তারপর একদিন মা সরস্বতীর গঙ্গাজলী করে কেউবা গঞ্জের হাটে বসত তামাক কিংবা মরিচ নিয়ে, কেউবা সোজাসুজি ক্ষেতে নামত হাল-বলদ নিয়ে চাষ-বাস করতে। তারা গরীবের ছেলে, চাষার ছেলে।

তারা পড়া পারত না। আজ মঞ্জু জানে, কেন তারা পড়তে পারত না, কেন বছর বছর একই ক্লাসে অমন ভাবে ফেল করে বসত। যখন পেটের ভাত জোগাড় করবার জন্তে তাদের ক্ষেতে ক্ষেতে তামাক আর মরিচ তুলতে হত, কিংবা চাষী বাপের নাস্তা দিয়ে আসবার জন্তে মাঠে ছুটতে হত—তখন পড়াশুনোর বিলাসিতাকে তার চাইতে বেশি প্রয়োজনের বলে তারা মনে করতে পারত না। তবুও গরীব বাপ আধপেটা খেয়ে, চেয়ে চিন্তে তাদের ইস্কুলের মাইনে জুগিয়ে যেতো বছরের পর বছর। লেখাপড়া শিখবে ছেলে, মানুষ হবে, হাকিম অথবা দারোগা হবে, গরীব বাপমায়ের পেটের জ্বালা নিবারণ করবে।

কিন্তু আকাশ-স্বপ্ন চিরকাল আকাশেই থাকে, মাটিতে নেমে আসে না কখনো। তাদের ক্ষেত্রেও এই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি কোনোদিন।

আর, ছেলেগুলো ঠ্যাঙানি খেত। শুধু ঠ্যাঙানি নয়, যাকে গো-বেড়েন বলে, তাই ছিল তাদের দৈনন্দিন প্রাপ্তি। এখন মঞ্জু বুঝতে পারে কী কারণে ইস্কুলের মাস্টারেরা তাকে এত সমাদর করতেন, হেডমাস্টার আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রাইজের বই বেছে নিতে বলতেন। আর ধেড়ে ছেলে অশ্বিনী হাজার অপরাধ করলেও কেন দু চারটে কানমলার ওপর দিয়েই সমস্ত অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পেতো।

দুর্ভাগাদের মধ্যে যে সব চেয়ে দুর্ভাগা ছিল তার নাম নিশিকান্ত। অদ্ভুত রকমের নির্বোধ ছিল নিশিকান্তের চেহারা। গোরুর মতো বড় বড় চোখ দুটোয় না ছিল তারা, না ছিল সুখ-দুঃখ বোধের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত। পড়া জিজ্ঞাসা করলে অনিচ্ছুক ভাবে উঠে দাঁড়াত, মনে হত শরীর নয়, যেন গুরুভার একটা কিছুকে সে ওপরে টেনে তুলছে। তারপর স্থির, নিরাসক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকত।

পড়ার জবাব? হ্যাঁ—জবাব একটা দিতো নিশ্চয়ই। কিন্তু সে জবাব কেউ শুনতে পেতো না। মনে হত যেন বিড় বিড় করে সাপের মন্ত্র পড়ছে—ঠোঁট দুটো অল্প অল্প নড়তে থাকত। আর হাল-টানা বলদের মতো বড় বড় শান্ত চোখ মেলে তাকিয়ে থাকত—দৃষ্টিতে পলক পড়ত না; যেন সমাধিস্থ হয়ে গেছে, তার দৃষ্টি বাইরের জগৎ ছাড়িয়ে অন্তরের গভীরে কী একটা পরমার্থের সন্ধান করে ফিরছে।

তার পরেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। গাধার টুপি, নীল ডাউন, বেত, বিছুটি, কানমলা। একটু প্রতিবাদ করত না নিশিকান্ত, কেঁদে ককিয়ে উঠত না, সমাধিস্থ যোগী ঋষির মতো হজম করে যেত নির্বিকল্প মুখে। মার খাওয়া তার প্রতিদিনের নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই সহজ হয়ে গিয়েছিল।

আর রাগটা ছিল ধনঞ্জয় পণ্ডিতেরই সব চাইতে বেশি।

কোলকুঁজো তামাটে রঙের লোক—প্রকাণ্ড একখানা মুখ থেকে শুয়োরের দাঁতের মতো পানে রঙানো দুটো গজদন্ত বেরিয়ে থাকত। কপালে বিরাজ করত চন্দনের ফোঁটা, টিকিতে বিজয়-পতাকার মতো শোভা পেতো টকটকে রাঙা একটা জবাফুল। একটা মোটা তেল-চিটচিটে ছাল্‌টি কাপড় আর ময়লা নিমা গায়ে চড়িয়ে খড়ম পায়ে তিনি ইস্কুলে আসতেন, বারান্দায় তাঁর খড়মের শব্দ ক্লাসে যেন মৃত্যুদূতের পরোয়ানা বহন করে আনত।

পড়াতেন ব্যাকরণ, কিন্তু তদ্ধিত-প্রকরণের চাইতে প্রহার-প্রকরণেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যটা ছিল বেশি। তিনি বিশ্বাস করতেন শুধু পেটালেই গাধাকে ঘোড়া তৈরী করা যায়, পড়ানোটা অবান্তর। এ হেন সর্বংসহ নিশিকান্তও ধনঞ্জয় পণ্ডিতের ক্লাসে স্পষ্ট একটা অস্বস্তি বোধ করত।

মুখ ভেংচে ধনঞ্জয় বলতেন, বাছার আমার নাম কি? না—নিশিকান্ত। একেবারে প্রাণকান্ত!

রসিকতার তাৎপর্যটা ছেলেরা ধরতে পারত না, নিশিকান্ত তো নয়ই। পণ্ডিতের পণ্ডিতী-রসবোধ আরো উগ্র হয়ে উঠত, গজদন্ত দুটোকে মাড়ি অবধি উদ্ঘাটিত করে দিয়ে ধনঞ্জয় বিকট বীভৎস মুখে ছড়া কাটতেন:

নিশিকান্ত, প্রাণকান্ত,

পরাণ আমার করহ শান্ত!—নামের তো বাহার আছে খুব, কিন্তু পড়া জিজ্ঞেস করলেই তো বেরিয়ে যায় আক্কেল দন্ত! আর আমি ভাবছি, কবে তোমার নেবে কৃতান্ত!

ধনঞ্জয় পণ্ডিত নাকি জারি গানের ছড়া রচনা করতেন।

কিন্তু এমন অনুপ্রাস-সমৃদ্ধ কাব্যচর্চাও যখন অরসিকদের কাছে মাঠে মারা পড়ত, তখন ধনঞ্জয় পণ্ডিত একেবারে ক্ষেপে যেতেন। বলতেন, বল্ হারামজাদা বল্, নিশিকান্ত মানে কী?

একমণী পাথরের মতো শরীরটাকে টেনে তুলে নির্ভুল নিয়মে দাঁড়িয়ে যেতো নিশিকান্ত। তারপরে তেমনি চিরাচরিত মন্ত্রপাঠ, আর চিরন্তন নির্বিকল্প সমাধির ব্যাপার।

—ওরে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চোদ্দসিকে। নিস্ শি-খান্ত!—ধনঞ্জয় পণ্ডিতের গজদন্ত দুটো যেন কামড়াবার জন্যে তেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইত: কান্ত না তোর বাপ-বাপান্ত! ওরে হারামজাদা, তুই নিশিকান্ত নোস্, একেবারে নিশি, বুঝলি, অমাবস্যার নিশি!

নিশিকান্ত মন্ত্রপাঠ করে যেত। যেন এ কথাটাতেও তার কিছু বক্তব্য আছে এবং স্মৃতির অতল সাগর মন্থন করে সেই বক্তব্যটাকে সে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে।

এইবার প্রহারের জন্যে তৈরী হতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত। হাতের মধ্যে আঁকড়ে ধরতেন তেল পাকানো বাদামী রঙের লিকলিকে বেতজোড়া। তার পর মেঘমন্দ্র স্বরে বলতেন, হুঁ। বল্, পীতাম্বর কোন্ সমাস?

যথাপূর্বং যথাপরম্। বজ্রগর্ভ মেঘের মতন ধনঞ্জয় পণ্ডিত তেপায়া চেয়ারটাকে ঠেলে উঠে দাঁড়াতেন। টিকিতে জবাফুলটা দুলে উঠত, দুটো খুদে খুদে চোখে দেখা দিত অমানুষিক হিংসা। গজদন্তে আর ঠোঁটের পাশে পানের রঙ যেন রক্ত বলে সন্দেহ হত।

তারপর প্রহার। সাঁই সাঁই করে বেতের শব্দ উঠত, নিশিকান্তের হাতে পিঠে ঘাড়ে নির্মমভাবে বেত পড়ত। উন্মাদের মতো মারতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত—মনে হত সম্ভব হলে একদিন নিশিকান্তকে তিনি খুন করে ফেলবেন। রঘু কখন কাউকে নরহত্যা করতে দেখেনি, কিন্তু নরঘাতকের মুখের ভঙ্গিও যে ধনঞ্জয়ের চাইতে বীভৎস হয়ে ওঠে না, এ কথা সে নিশ্চিন্তভাবেই বলতে পারে।

কেন এমন করে মারতেন ধনঞ্জয় পণ্ডিত? আজকে তার উত্তর পাওয়া কঠিন নয়। জীবনের যা কিছু যন্ত্রণায় বিরুদ্ধে, সমাজের কাছে, মানুষের কাছে, আর হয়তো ঈশ্বরের কাছে এ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের প্রতিবাদ। প্রতীকার-বিহীন নিরুপায়তায় আরো বেশি নিরুপায়ের ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া—দুঃখ দুর্গত জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের অপরাধ ছিল না। আর তারই পরিচয় পেয়েছিল রঘু—দু বছর বাদে তাঁর মৃত্যুর পরে, যখন তাঁর তিন চারটি নাবালক ছেলেমেয়েকে খাওয়াবার জন্যে তাঁর স্ত্রী মহাজন যজ্ঞনাথ কুণ্ডুর বাড়িতে রাঁধুনির চাকরী নিয়েছিলেন!

নিশিকান্তকে মারতে মারতে শেষে ধনঞ্জয় ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। খোলা কাছাটা গুঁজতে গুঁজতে আবার ফিরে আসতেন তাঁর তেপায়া চেয়ারটায়, হাঁপাতে হাঁপাতে বলতেন, তোকে মারা যা—একটা গোরুকে ঠ্যাঙানোও তাই। কোনো লাভ হবে না, অকারণ খানিকটা পরিশ্রম মাত্র।

সার সত্যটা বুঝেছিলেন ধনঞ্জয়—কিন্তু মনে রাখতে পারতেন না।

নির্বোধ, নির্বিকল্প নিশিকান্ত। কিন্তু তারও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল একদিন। পাথরের ভেতর থেকে একটুখানি ফুলকি ছিটকে বেরুল অকস্মাৎ। অগ্নিকাণ্ড ঘটল না—পাথরই গুঁড়ো হয়ে গেল।

পাড়াগাঁয়ের এম-ই ইস্কুল। দরজা জানালাগুলোর কব্জা-ভাঙা পাল্লা আছে বটে, কিন্তু প্রতিরোধের শক্তি নেই তাদের। একটু জোরে বাতাস বইলে পাল্লা খুলে যায়—ছাগল ঢুকে রাত্রিবাস করে, গোরু এসে রোমন্থন করে যায়। গোরুর মতো বুদ্ধি নিশিকান্তের, গোরুর পথই সে নিলে।

পরদিন ইস্কুলে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড!

দেওয়ালে দেওয়ালে চক-খড়ি দিয়ে কাঁচা কাঁচা অক্ষরে শিলালিপি: 'পণ্ডিতকে মারিব', 'পণ্ডিত আমার শা—', 'পণ্ডিত মরিলে হরির লুট দিব'—ইত্যাদি। সমস্ত ইস্কুল একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'মিথিলিস্ট'দের বোমার মতো ফেটে পড়লেন হেড্-মাষ্টার বিপিনবিহারী সাহা। সন্দেহজনক ছেলেদের ধরে

ধরে বোর্ডে কথাগুলো লেখানো হতে লাগল। এবং হস্তলিপি পরীক্ষার ফলাফলও আশাতীত কিছু হলনা, ধনঞ্জয় পণ্ডিত ক্ষ্যাপা শুয়োরের মতো ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে রায় দিলেন : এ ওই হারামজাদা নিশিকান্তের কাজ!

অনেকটা তাঁর কথাতেই কিনা কে জানে, শেষকালে নিশিকান্তই অপরাধী সাব্যস্ত হল।

তারপরের দৃশ্যটা ছবির মতো ভাসছে চোখের সম্মুখে। অপরাধের গুরুত্ব এত বেশি যে শুধু বেত্রাঘাতই যথেষ্ট বলে মনে হল না—হেড্‌মাষ্টার বিপিনবিহারী সাহার কাছে। জোড়া বেতে আপাদমস্তক জর্জরিত করে ইস্কুলের মাঠে গাধার টুপি মাথায় পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল নিশিকান্তকে। তারপর ধনঞ্জয় পণ্ডিত নিজেই গিয়ে ইস্কুলের সমস্ত ছেলেকে ডেকে আনলেন।

ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। হেড্‌মাষ্টার জলদ-গম্ভীর স্বরে বললে, এক একজন করে এগিয়ে যাও, তারপর দু'হাতে আচ্ছা করে ওর কান মলে দাও। খুব জোরে, কেউ কোনো মায়া করবে না। এই হল ওর উচিত শাস্তি।

ছেলেদের আনন্দের সীমা নেই। পরমানন্দে এক একজন গিয়ে নিশিকান্তের কান মলতে লাগল। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল নিশিকান্ত—একটু নড়লে না, এক বিন্দু প্রতিবাদ করলে না। মুখের একটি রেখা পর্যন্ত কাঁপলনা তার, মাটির দিকে দৃষ্টি নামিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে। লজ্জা, অপমান, বেদনাবোধ—সমস্ত কিছুই তার কাছে শূন্য, আর অর্থহীন হয়ে গেছে।

রঞ্জুর পালা এল। উল্লাসে এগিয়ে গেল রঞ্জু। লম্বায় অনেকটা উঁচু নিশিকান্ত, তার কান দুটোকে পাওয়ার জন্যে ওপরের দিকে হাত তুলে দাঁড়াতে হল তাকে।

আর সেই মুহূর্তেই রঞ্জুর দৃষ্টি পড়ল নিশিকান্তের চোখের দিকে।

আশ্চর্য সেই চোখ। মানুষের চোখে এমন করে যে ভাষা ফুটতে পারে, এমন করে জেগে উঠতে পারে অপমানিত মনুষ্যত্বের মর্মান্তিক লাঞ্ছনাবোধ—এ সত্য বোধ হয় অর্থহীন একটা অস্বস্তির মতো রঞ্জুর কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল সেই প্রথম। নিশিকান্তের চোখ দুটো শুকনো, তাতে এক বিন্দু অশ্রুর আভাস পর্যন্ত নেই। সে চোখ টকটকে লাল, যেন শরীরের সমস্ত রক্ত ওর চোখে গিয়ে জমা হয়েছে। সে চোখ অস্বাভাবিক—সে চোখ মানুষের নয়।

আলগাভাবেই নিশিকান্তের কানে হাত ছোঁয়াতেই রঞ্জু শিউরে উঠল, একটা অসহ্য উত্তাপে যেন আঙুলগুলো জ্বালা করে উঠল তার। নিশিকান্তের কান দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। ওর শরীরটা আর শরীর নয়—একটা মশালের মতো জ্বলে যাচ্ছে সেটা—জ্বলে যাচ্ছে অতি তীব্র, অতি প্রখর অগ্নিশিখার মতো।

সরে এল রঞ্জু, পালিয়ে এল সেখান থেকে।

ইস্কুল ছুটি হয়ে গেছে—মস্ত বড় মাঠটার ভেতর দিয়ে একা বাড়ী ফিরছে রঞ্জু। ফসল কাটা শেষ হয়ে গেছে, ছোট আল্‌পথের পাশে পাশে কাটা ধানের গোড়াগুলো ছড়িয়ে আছে, ছুটোছুটি করে ফিরছে মেঠো ইঁদুর, বসে বসে জাবর কাটছে গোটা তিনেক গোরু—আর একজন গো-বক ওদের গায়ে উঠে ঠুকরে ঠুকরে এঁটুলি খাচ্ছে। বকারি পাখির ঝাঁক উড়ে পড়ছে এদিকে ওদিকে, একটা বাব্‌লা গাছে বসে লেজ নাচাচ্ছে হলদে পাখি।

কোনোদিকে মন নেই রঞ্জুর, দৃষ্টি নেই কোনোদিকে। ইঁদুরগুলোকে তাড়া দিতে ইচ্ছে করলো না, ঢিল মেরে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করলো না গো-বকগুলোকে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিহ্বল চোখ মেলে দেখতে ভালো লাগল না ওই বকারির ঝাঁক আর হলদে পাখির নাচকে। রঞ্জু অন্যমনস্ক হয়ে গেছে।

কেন অমন করে তাকিয়েছিল নিশিকান্ত? কেন তার চোখ দুটো অমন রক্তের মতো রাঙা হয়ে উঠেছিল? দিনের পর দিন যে নিশিকান্ত ক্লাসে পড়া বলতে পারে না, দাঁড়িয়ে থাকে নির্বোধ একটা অসহায় জানোয়ারের মতো, আর মার খায়—তার ঘোলা চোখ কেন অমন করে রক্তাক্ত হয়ে উঠল?

মনের কাছে অস্পষ্টভাবে উত্তর এল তার। প্রথম শৈশবের অনুভূতি রাজ্যে—প্রথম দেশাত্মবোধ, প্রথম প্রেম, প্রথম মৃত্যুচেতনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নতুন চৈতন্য অঙ্কুরিত হল। এ অপমান—মানুষের প্রতি মানুষের

অপমানের প্রথম উজ্জল প্রতিচ্ছবি। অভাব আর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যারা প্রত্যেক দিন পৃথিবীতে হার মেনে যাচ্ছে, তাদের সেই পরাজয়কে নিষ্ঠুর নির্মম অপমান। নিশিকান্ত একক নয়, বিচ্ছিন্ন নয় নিশিকান্ত। তার চোখে আরো অনেকের কথা—আরো অনেক পরাজিত মানুষের অসহায় অপমানের একটা রক্তাক্ত প্রতিবাদ।

সেই প্রথম বুঝতে পেরেছিল রঞ্জু, তারপর আরো বড় হয়ে সম্পূর্ণ করে বুঝতে পেরেছিল—নিশিকান্তের কান থেকে আগ্নের জ্বালাটার মর্মনিহিত তাৎপর্য। শুধু কান নয়—নিশিকান্তদের সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠেছে অগ্নিশিখায়, চারদিকের কোটি কোটি মানুষ আজ আর মানুষ নেই—তারা অগ্নিপুত্তলি। সেই অগ্নিপুত্তলিকার দল অপেক্ষা করে আছে, প্রতীক্ষা করে আছে—একদিন সমস্ত পৃথিবীতে তারা আগুন জ্বালিয়ে দেবে। সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সমস্ত—কেউ বাঁচবে না, কিছুই না।···

তার পরদিন থেকে আর ইস্কুলে এলনা নিশিকান্ত। তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, রাস্টিকেট্ করা হয়েছে তাকে। কেউ তার জন্যে ক্ষুণ্ণ হল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে না কেউ। অমন শয়তান ছেলেকে যে বস্তায় পুরে পাথর বেঁধে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়নি, এই ওর সাত-পুরুষের ভাগ্য। বহুব্রীহি সমাস পড়াতে পড়াতে আর কেরোসিন কাঠের টেবিলে জোড়া বেত আছড়াতে আছড়াতে ধনঞ্জয় পণ্ডিত বললেন,আইনে না আটকালে তাই করা হত।

এর কিছুদিন পরের কথা।

ঠিক কতদিন—রঞ্জুর ভালো মনে পড়ে না। শৈশবের হিসাব-নিকাশ সন-তারিখের মুখ চেয়ে থাকে না, তার সব কিছু এলোমেলো, পরেরটা আগে, আগেরটা পরে এসে পড়ে। কিন্তু সময়টা মনে না থাকলেও ঘটনাটাকে ভোলবার উপায় নেই।

সকালে পড়াতে এসেছেন নবদ্বীপ মাস্টার, একটা শুণ অঙ্ক নিয়ে রঞ্জু হিমসিম খাচ্ছে। এমন সময় থানা থেকে কনেষ্টবল প্রিয়নাথ এল। বললে, ছোটদাদা, বড়বাবু তোমায় ডাকছেন।

—বাবা ?

—হ্যাঁ—এক্ষুণি একবার থানায় আসতে বললেন।

ভয়ে রঞ্জুর গলা শুকিয়ে উঠল। বাবা ডেকে পাঠিয়েছেন তার মানে, যমরাজের পরোয়ানা। তবে ভরসা এই, থানায় যখন ডেকে পাঠিয়েছেন তখন আর যাই হোক, শাসন-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার নয়।

—কেন ?

—একটা খুব মজা হয়েছে। দেখবে এসো—

এবারে রঞ্জু উল্লাসে লাফিয়ে উঠল : যাই মাস্টারমশাই?

—যাবে বই কি, নিশ্চয় যাবে। বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, এর মধ্যে আবার বলবার কী আছে ?—বিগলিত বাধিত হাসিতে নবদ্বীপ মাস্টার বললেন, এক্ষুণি যাও—

প্রিয়নাথের সঙ্গে রঞ্জু রওনা হল থানার দিকে। আগ্রহভরে প্রশ্ন করলে : কী হয়েছে থানাতে ? কিসের মজা প্রিয়নাথদাদা ?

প্রিয়নাথ বললেন, চলোই না, নিজেই দেখবে এখন।

থানার সামনে ভয়ানক ভিড়। বহু লোক জমেছে, চেঁচামেচি হচ্ছে। নিশ্চয় গুরুতর কাণ্ড কিছু ঘটেছে ওখানে।

বাবা ডাকলেন, রঞ্জু দেখবে এসো। তোমাদের বন্ধু নিশিকান্তের কীর্তি।

কীর্তিই করেছে বটে নিশিকান্ত। সেদিন চোখ যে রঞ্জু দেখেছিল, তার চাইতে অনেক ভয়ঙ্কর, অনেক বীভৎস তার আজকের চোখ। আজ রক্ত শুধু তার চোখে ছড়িয়ে নেই—ছড়িয়ে গেছে সর্বাঙ্গে, হাতে রক্ত, কাপড়ে রক্ত, জামায় চাপ চাপ রক্ত। নিশিকান্ত যেন দোল খেলে এসেছে।

বাবা বললেন, জমিতে ধান কাটা নিয়ে খুড়োর গলায় দায়ের কোপ বসিয়েছে—

বাকী কথাগুলো রঞ্জুর কানে গেল না। অত রক্ত—অমন অজস্র রক্ত! নিশিকান্তের চোখদুটো ছিঁড়ে যেন রক্তের ধারা নেমে আসবার উপক্রম করছে। রঞ্জুর মাথার মধ্যে সব এলোমেলো হ'য়ে গেল, কান ঝিঁ ঝিঁ করতে লাগল, মনে হল গলার ভেতর থেকে বমির মতো কী একটা ঠেলে উঠছে। দম আটকে আসছে তার, তার মাথা ঘুরছে। দৃষ্টির সামনে শুধু রক্ত দুলছে, রাশি রাশি রক্ত, চাপ চাপ রক্ত—পৃথিবীময় রক্ত, দুটো জলন্ত চোখে রক্তের আগুন—

যাও, এখুনি বাইরে নিয়ে যাও। আমারি ভুল হয়েছিল—এত রক্ত ও সইতে পারবে কেন?

খুড়োর গলায় দায়ের কোপ বসিয়েছে নিশিকান্ত, হয়তো খুন করেছে তাকে। সেই নিশিকান্ত—যে হাজার ঘা বেত খেয়েও কখনো টুঁ শব্দ করেনি—দেড়শো ছেলের হাতে কানমলা খাওয়ার মতো অপমানও যে নির্বিবাদে সহ্য করে যেতে পেরেছে, এমন ক্ষিপ্ত, এমন ভয়ঙ্কর সে হয়ে উঠল কেমন করে?

সেদিন মানুষকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছিল তাকে, শিখিয়েছিল মানুষকে আঘাত করবার হিংসামন্ত্র। কিন্তু আঘাত করা আর আত্মহত্যা করা এ দুটোর পার্থক্য তার কাছে স্পষ্ট ছিলনা বলেই বোধ হয় শেষেরটা বেছে নিয়েছিল নিশিকান্ত।

রক্ত—রক্ত—সমস্ত পৃথিবীময় চাপ চাপ রক্ত। কিন্তু শত্রুহত্যার রক্তে নয়—আত্মহত্যার খুন-খারাপী রঙেই পৃথিবীর ধুলো-মাটি রক্তাক্ত হয়ে গেছে। (ক্রমশঃ)

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

(জ্যোতিষের চোখে)

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি

সন ১৩০৩ সালের ১১ই মাঘ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি শনিবার বেলা ১২টা ১৫ মিনিটের সময় নেতাজী কটকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম-কালে গ্রহসংস্থান ছিল এই রকম

ম ১৯।৩০ র ২৫।২৬ বং ক্র ১৯।২৭ বং	লং ২৩।১	শু ২৬।২০
কে ২৩।৩৪		র ১১।১১ বৃ ৯।৩৭ বং রা ২৩।৩৪
বু ১৬।৩২ বং চ ৭।২৮		প্র ৩।৫৯ শ ৬।৪০

১০ম ৯।১১।৫২
১১শ ১০।১০।৫২
১২শ ১১।১৫।৫২
লং ০।২৩।১
২য় ১।২১।২১
৩য় ২।১৬।৪৪

তাঁর জন্ম সময় কেন ১২টা ১৫ মিনিট ঠিক করেছি, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। সম্প্রতি ফাল্গুনের ভারতবর্ষে শ্রীযুত অশোক শাস্ত্রী মহাশয়ও দেখলুম এ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং জ্যোতির্বিদদের মতামত আহ্বান করেছেন। নেতাজীর জন্মকুণ্ডলীর গণিতাংশ আমি প্রথম গণনা করি ১৯২৮ সালে। সে সময় কার কাছে সময়টি পেয়েছিলুম তা আমার ম[illegible] নেই। তবে সে সময়টিও যা পেয়েছিলুম তা শাস্ত্রী মশায়ের উদ্[illegible] জানকীবাবুর নোট বুকের অবিকল প্রতিলিপি।

A few minutes after 12, between 12 and 1 P. m.

অর্থাৎ বেলা ১২টার কয়েক মিনিট পরে, ১২টা ও ১টার মধ্যে।

সময়টি যে স্থানীয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। সে সময়ে ভারতবর্ষে ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় ব'লে কিছু ছিল না। ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় ১৯০৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ভারতে চলিত হয়। সেকালে বড় শহরগুলিতে সর্বত্র স্থানীয় সময় থাকত, কেবল রেলওয়ে ষ্টেশনগুলিতে মাদ্রাজ টাইমের চলন ছিল।

নোট-বুকে যখন লেখা হয়েছে বেলা বারটার কয়েক মিনিট পরে, তখন আমরা ধ'রে নিতে পারি যে তা ১টার চেয়ে ১২টার বেশী কাছে! সময়টি বারটা থেকে সাড়ে বারটার মধ্যে ধ'রে নিলে দেখা যায় যে, কটকে সে সময় মেষ-লগ্নই ছিল। বস্তুতঃ, কটকে প্রায় বেলা ১২টা ৪২ মিঃ (কলকাতা সময় ১২টা ৫২ মিঃ) পর্যন্ত সেদিন লগ্ন ছিল মেষ। অতএব নেতাজীর লগ্ন যে মেষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখন, ১২টা থেকে ১২টা ৪২ মিনিটের মধ্যে যে কোন সময় যদি মেষ লগ্ন হয়, তাহ'লে ১২টা ১৫ মিনিটকেই নেতাজীর জন্ম সময় মনে করবার হেতু কী? অনেকের ধারণা যে লগ্ন ও গ্রহসংস্থান যদি একই হয়, তাহ'লে কোষ্ঠীর ফল একই হ'য়ে থাকে, কিন্তু তা মোটেই ঠিক নয়। লগ্ন এবং গ্রহসংস্থান এক হ'লেও গ্রহস্ফুট ও ভাবস্ফুটের তারতম্যে ফলের তারতম্য হয়। প্রত্যেক জাতকের একটি ক'রে গ্রহ ভাগ্যনিয়ন্তা থাকে। ইংরাজিতে যাকে বলে Ruling Planet.

এই ভাগ্যনিয়ন্তার সূচিত ফলের দ্বারা কোষ্ঠীর সমস্ত গ্রহের ফলাফল নিয়ন্ত্রিত হয়। নেতাজীর কোষ্ঠীর ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়া উচিত বৃহস্পতি (অন্ততঃ আমার মতে) এবং যেহেতু ১২টা ১৫ মিনিটে জন্ম না হ'লে বৃহস্পতি ভাগ্যনিয়ন্তা হয় না, তাই ঐ সময়টিকেই আমি তাঁর জন্মসময় ব'লে গ্রহণ করেছিলুম।

তাঁর ১২টা ১৫ মিনিট জন্ম সময় এবং বৃহস্পতি ভাগ্যনিয়ন্তা ধ'রে মৎ-সম্পাদিত বিধিলিপি মাসিক পত্রিকায় (আশ্বিন ১৩৪০, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) একটু আলোচনাও করেছিলুম, তার খানিকটা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি, এ আলোচনা করেছিলুম দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের কোষ্ঠীর সঙ্গে নেতাজীর তুলনা ক'রে।

"দেশপ্রিয়ের কুণ্ডলীতে বুধ আত্মকারক হ'য়ে শুক্রযুক্ত এবং শনির মিত্রপ্রেক্ষা দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ায় তাঁর মধ্যে যে শান্ত ও সমাহিত ভাব পাওয়া যেত, সুভাষ-চন্দ্রের কুণ্ডলীতে অগ্নিরাশিস্থ বৃহস্পতি আত্মকারক হওয়ায় তাঁর মধ্যে সে ভাব মোটে নেই। তাঁর প্রকৃতির প্রধান কথা হচ্ছে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সব রকম বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। দেশপ্রিয়ের মধ্যে যে একনিষ্ঠতার আনুগত্য ছিল সুভাষচন্দ্রের মধ্যে তা নেই। স্বাধীনতার জন্যে তিনি সব আনুগত্যের বা সব স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করতে পারেন। সুভাষচন্দ্রকে আজীবন বিদ্রোহই করতে হবে।"

সুভাষচন্দ্রের কুণ্ডলীতে দ্বাদশপতি বৃহস্পতির সঙ্গে লগ্নপতি মঙ্গলের অশুভপ্রেক্ষা আছে। তার ফল প্রখ্যাত ইংরেজ জ্যোতির্বিদ্ Alan Leo'র গ্রন্থ থেকে একটু তুলেও দিয়েছিলুম—

"There is a liability to feverish ... of the blood and blood-vessels. He is often himself the cause, indirectly perhaps, of the misfortunes that befall him. There is some danger of death by drowning or on a voyage, or while absent from home or in a distant Country......There is danger of death during restraint, imprisonment, or in a charitable institution."

বৃহস্পতিকে ভাগ্যনিয়ন্তা ব'লে না স্বীকার করলে, সুভাষচন্দ্রের চিরকৌমার্য, তাঁর আদর্শপ্রিয়তা, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ প্রভৃতি কোন কিছুরই সন্ধান পাওয়া যায় না। পরে একথা তাঁর জন্মচক্রের বিশ্লেষণ থেকে বিশদীকৃত হবে। সুতরাং জন্ম সময় যে ১২টা ১৫ মিনিট সে সম্বন্ধে আমার অন্ততঃ কোন সন্দেহ নেই।

কুণ্ডলী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তাঁর লগ্ন ও একটি মাত্র গ্রহ (বৃহস্পতি) অগ্নিরাশিতে, একটি গ্রহ বায়ুরাশিতে, তিনটি গ্রহ জলরাশিতে এবং বাকি সকল গ্রহই পৃথ্বীরাশিতে। তেমনি লগ্ন ও চারটি গ্রহ চর রাশিতে, একমাত্র চন্দ্র দ্ব্যাত্মক রাশিতে, বাকি সকল গ্রহই স্থির রাশিতে। সুতরাং তাঁর প্রকৃতিতে এবং জীবনের সকল কর্মে পৃথ্বী ও স্থির রাশির প্রভাব অভিব্যক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় এই প্রভাব একটু বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

স্থির-পৃথ্বী রাশির প্রভাব সাধারণতঃ নিছক ও স্থূল বাস্তবতাকে নির্দেশ করে, কিন্তু বৃহস্পতি নির্দেশ করে জ্ঞানময় আদর্শবাদ। সুতরাং নেতাজী বাস্তবতা কোনদিনই ছাড়বেন না, একটা ভুয়া বা অবাস্তব আদর্শবাদের মূল্য তাঁর কাছে কিছু নয়, কিন্তু তেমনি আবার সঙ্কীর্ণ আত্মকেন্দ্রিক বাস্তবতার স্থানও তাঁর মধ্যে নেই। বাস্তবকে ভিত্তি ক'রে একটা উচ্চতর আদর্শের প্রকাশ, এই হচ্ছে তাঁর প্রকৃতির মূলমন্ত্র। স্থির-পৃথ্বীর প্রভাব একদিকে যেমন বাস্তবতা নির্দেশ করে, অপরদিকে তা তেমনি স্থিরতা ও দৃঢ়তাও নির্দেশ করে। বিশেষতঃ ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ বৃহস্পতি স্থির রাশিতে থাকায় তাঁর মধ্যে দৃঢ়তা ও অপরিবর্তনীয়তা খুব সুস্পষ্টভাবে প্রকট হবে। তাঁর লগ্ন চররাশিতে হওয়ার এবং চন্দ্র দ্ব্যাত্মক রাশিতে থাকায় তাঁর পরিবেশের মধ্যে বহু পরিবর্তন লক্ষিত হবে, কিন্তু কোন পরিবর্তনই তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট বা আদর্শচ্যুত করতে পারবে না।

বৃহস্পতি ভাগ্যনিয়ন্তা হ'লে আর একটা ফল এই হয় যে, জাতক সম্প্রদায় গঠন ক'রে সে সম্প্রদায়ের নেতা হ'য়ে থাকেন। জৈমিনি যাকে বলেছেন "গুরু-সম্বন্ধেন সম্প্রদায়-সিদ্ধিঃ।" যাঁর বৃহস্পতি ভাগ্যনিয়ন্তা, একটা নতুন দল গ'ড়ে তার নেতা তাঁকে হ'তেই হবে, সে দল ছোট হবে কি বড় হবে এবং তার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হবে কি প্রশস্ত হবে, তা নির্ভর করবে জাতকের কুণ্ডলীর গ্রহসংস্থানের উপর।

নেতাজীর কুণ্ডলীর গ্রহসংস্থান অপূর্ব। লগ্ন মেষ, পঞ্চমপতি রবি

লগ্নে থেকে দশম পতি শনির সঙ্গে সম্বন্ধ করেছে এবং লগ্নপতি মঙ্গলও দশমপতি শনির সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট। মেষ লগ্নের যে দু'টি শ্রেষ্ঠ রাজ-যোগ শনি-মঙ্গলের যোগ এবং রবি-শনির যোগ সে দু'টিই নেতাজীর কোষ্ঠিতে আছে। এই যোগ থাকাতে এবং বৃহস্পতি ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ার ফলে, সুভাষচন্দ্র আজ জগদ্বিখ্যাত। ভারতে নেতার অভাব নেই, কিন্তু আজ নেতাজী বলতে একমাত্র সুভাষচন্দ্রকেই বুঝায়।

নেতাজীর কুণ্ডলীতে কেতু চতুর্থে এবং চতুর্থপতি চন্দ্র ষষ্ঠে। চন্দ্রের চতুর্থপতি বৃহস্পতিও চন্দ্রের দ্বাদশে শনি, মঙ্গল ও শুক্র দৃষ্ট। এতে বোঝায় পারিবারিক সুখ বা গার্হস্থ্য সুখ তাঁর অদৃষ্টে নেই। অবশ্য চতুর্থপতি চন্দ্র দশমস্থ রবি ও দশমপতি শনির শুভপ্রেক্ষায় অনুগৃহীত হওয়ায়, প্রখ্যাত বংশে জন্ম সূচনা করে; কিন্তু পারিবারিক ও গার্হস্থ্য সুখের সকল উপকরণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, তা তাঁর ভোগে আসবে না। চতুর্থে কেতু থাকলে, জাতকের বাসস্থান সম্বন্ধে নানা রকম কষ্ট উপস্থিত হয়। জীবনের কোন না কোন সময়ে তাঁকে দুর্গম ও বিপদ-সঙ্কুল স্থানে বাস করতে হয়, কোন রকম বন্ধনের মধ্যে থাকাও সম্ভব। সময় সময় নীচ, ম্লেচ্ছ, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা ইত্যাদির সংশ্রবে বাস করাও বিচিত্র নয়। এই যোগে নিজ-গৃহ থাকা সত্ত্বেও পরগৃহে বাস করতে হয় এবং বাসস্থানের ব্যাপারে নানারকম দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হ'য়ে থাকে।

নেতাজীর ভাগ্যনিয়ন্তা বৃহস্পতি তাঁর কুণ্ডলীতে নবম ও দ্বাদশ ভাবের অধিপতি, তা শুক্রের সপ্তমস্থ হ'য়ে শনি ও মঙ্গল দৃষ্ট হওয়ায় বিবাহে বাধা সূচনা করে। এর উপর শুক্রের সপ্তমপতি রবি শুক্রের দ্বাদশস্থ হ'য়ে পাপ পীড়িত হওয়ায় এবং বৃহস্পতি নিজে চন্দ্রের সপ্তমপতি হ'য়ে চন্দ্রের দ্বাদশে বক্রী ও পাপপীড়িত হওয়ায় তাঁহার চিরকৌমার্য সূচনা করে।

নেতাজীর লগ্ন মেষ। এই মেষ লগ্নের ফল আমার লেখা "লগ্নফল" থেকে একটু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। জাতক সরল, উদার ও স্পষ্টবক্তা। তাঁর আচরণ ও কথাবার্তায় একটা তেজস্বিতা ও শক্তির ভাব লক্ষিত হবে। তিনি সাহসী ও উৎসাহী প্রকৃতির লোক. খোলাখুলি এবং নির্ভীকভাবে কাজ করা তিনি ভালবাসেন। তাঁর মধ্যে ধর্মভাব প্রবল। যে ধর্ম বা নীতিকে তিনি সত্য বলে মনে করেন তার ব্যাপারে তাঁর অতিমাত্রায় গোঁড়ামি ও উৎসাহ প্রকাশ পায়। ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী—কাজেই, প্রচলিত রীতি-নীতি, সমাজ অথবা ধর্মের প্রকাশ্যভাবে বিপক্ষতাচরণ করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। তিনি নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে কখনই পিছপাও নন। মেষের জাতক আদর্শবাদী। সব বিষয়েই তিনি মনে মনে একটা আদর্শ খাড়া করেন এবং যে জিনিষ বা যে ব্যাপার তাঁর মতে যা হওয়া উচিত, অনেক সময় বাস্তবক্ষেত্রে সেই হিসাবে কাজ করতে গিয়ে তাঁর বিফলতাকে বরণ করতে হয়।

তাঁর ভাগ্য পরিবর্তনশীল। এক কর্মে লেগে থাকা তাঁর প্রায়ই ঘটে ওঠে না। তিনি বেশ প্রতিষ্ঠাশালী হ'য়ে থাকেন এবং তাঁর উচ্চপদ ও সম্মান লাভ হ'য়ে থাকে, কিন্তু উচ্চপদ পেয়ে আবার ফিরে পতন হ'তে পারে।

তাঁকে বাস পরিবর্তন করতে হয় অনেকবার। পারিবারিক অবস্থার জন্য, শারীরিক অস্বাস্থ্যের জন্য, কিম্বা আকস্মিক বিপদের জন্য তাঁর ভ্রমণ হ'তে পারে। তাঁর সমুদ্রভ্রমণের সুযোগ উপস্থিত হয় এবং কর্মোপলক্ষে, তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে কিম্বা শিক্ষার জন্য বিদেশযাত্রা অসম্ভব নয়। জন্মভূমি ছেড়ে বিদেশে বাস করা তাঁর পক্ষে খুবই সম্ভব। বাধ্য হ'য়ে বিদেশে নির্জনবাস অথবা বিদেশে নির্বাসিত হওয়ার আশঙ্কাও আছে। শত্রুর ভয়ে অথবা গুপ্তশত্রুর দ্বারা পীড়িত হ'য়ে তিনি স্থানান্তরিত হ'তে পারেন।

বিবাহ নিয়ে অথবা বিবাহিত জীবন নিয়ে তাঁর বহু ঝঞ্ঝাট হ'তে পারে। বিবাহে বাধা উপস্থিত হয়। জাতক চিরকুমার থাকতে পারেন।

তাঁর অনেক বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুচর থাকা সম্ভব, কিন্তু বিদেশী বা বিদেশবাসী কোন কোন শত্রুদ্বারা বিশেষ পীড়িত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

তিনি নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হ'তে পারেন। কোন বড় ব্যাপারে শহীদ্ হবার আকাঙ্ক্ষা অথবা 'আত্মবিসর্জন ক'রে বিখ্যাত হব' এই রকম একটা সংকল্প তাঁর মনে থাকা অসম্ভব নয়।

মেষ লগ্নের এই ফল নেতাজীর জীবনের ঘটনার সঙ্গে এত বেশী মেলে যে, তাঁর জন্য কোন লগ্ন কল্পনাও করা চলে না। তা ছাড়া মেষ লগ্ন ও বৃহস্পতি ভাগ্য-নিয়ন্তা না হ'লে, তাঁর অসাধারণত্ব এবং সহস্র দুঃখকষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যেও আশাবাদী মনোভাবের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

বৃহস্পতি মেষলগ্নের দ্বাদশপতি—দ্বাদশ বা ব্যয়ভাব নির্দেশ ক'রে ত্যাগ বা আত্মবিসর্জন। এই দ্বাদশপতি পঞ্চমে (মন্ত্রস্থানে) থাকায় তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হ'বে আত্মত্যাগ। ভোগে তাঁর আনন্দ নেই, তাঁর যা কিছু আনন্দ ত্যাগে। তাঁর আদর্শ বা মন্ত্রের সিদ্ধির জন্য তিনি সব সময়ে সব রকমের স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত।

নেতাজীর কুণ্ডলীতে দ্বিতীয়ে মঙ্গল, বরুণ ও রুদ্র—

তার ফলে অর্থ ও উপার্জনের ব্যাপারে একটা অনিশ্চয়তা সূচনা করে। বিচিত্রভাবে তাঁর অর্থপ্রাপ্তি ও অর্থহানি ঘটবে। তাঁর আয়-ব্যয়ের শৃঙ্খলা থাকবে না। উদারতার জন্য এবং বিচিত্র পরিস্থিতির জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থহানি ও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া চুরি, প্রতারণা, রাজকোষ ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় ক্ষতি সম্ভব। তেমনি উপার্জনও অনেক সময় বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিতভাবে হবে। দ্বিতীয়ে মঙ্গল বাগ্মিতাও সূচনা করে।

চতুর্থে কেতুর ফল আগেই লেখা হয়েছে।

পঞ্চমস্থ বৃহস্পতির ফল—

মানসিকতা শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর। জ্ঞান ও বিবেকের দ্বারা প্রবৃত্তি সংযত করার শক্তি। তাঁর মধ্যে ভক্তি, স্নেহ ও প্রীতি প্রবল, কিন্তু তা কখনও বৈধ সীমা অতিক্রম করে না। বিদ্যার যোগ উত্তম, কিন্তু সন্তান সম্বন্ধে অশুভ।

ষষ্ঠস্থ চন্দ্রের ফল—

স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল যোগ নয়। নানা কারণে স্বাস্থ্যহানি ও দেহ-সুখের অভাব ঘটে। পরিবেশের প্রতিকুলতা ও মানসিক কষ্ট স্বাস্থ্যহানির কারণ হ'তে পারে। কর্মের ব্যাপারে অনেক পরিবর্তন ঘটে। সাধারণের সংস্রবে তাঁকে কাজ করতে হয়। পারিবারিক ব্যাপারে কিছু না কিছু ঝঞ্ঝাট থাকেই। আহার-বিহারে তাঁর রুচি পরিবর্তনশীল হয়। জলীয় দ্রব্য ও মিষ্টপদার্থের দিকে তাঁর আকর্ষণ থাকা সম্ভব।

অষ্টমস্থ শনি ও প্রজাপতির ফল—

এই শনি ও প্রজাপতি মঙ্গল দৃষ্ট কিন্তু রবি, চন্দ্র ও বুধের সঙ্গে এদের শুভপ্রেক্ষা আছে। বৃশ্চিক রাশি প্রজাপতির উচ্চস্থান এবং শনি দশমপতি হ'য়ে অষ্টমস্থ, সুতরাং এ যোগ সম্মানজনক মৃত্যু নির্দেশ করে। অষ্টমস্থ শনি সাধারণতঃ দীর্ঘায়ু সূচনা করে, কিন্তু অষ্টমস্থ প্রজাপতি সহসা মৃত্যু নির্দেশ করে। তাঁর মৃত্যুর মধ্যে অসাধারণত্ব থাকতে পারে। প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশ্য ভাবে মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। নিজের হঠকারিতা তাঁর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হ'তে পারে।

দশমে রবি, বুধ ও রাহুর ফল—

রবি একদিকে যেমন শনি, প্রজাপতি ও চন্দ্রের দ্বারা অনুগৃহীত, তেমনি বুধ, রাহু, শুক্র ও বরুণের দ্বারা পীড়িত। রবি রাহু দ্বারা এবং শনির দ্বারা পীড়িত হ'লেও, শনি ও রাহুর সঙ্গে তার এই সম্বন্ধ রাজযোগ কারক অর্থাৎ এই দুটি গ্রহের যোগে যে সকল কষ্টকর অভিজ্ঞতা হবে, তার ফলে জাতক সম্মান, প্রতিষ্ঠা ও সাফল্য লাভ করবেন। দশমস্থ বুধ কিন্তু রবি ও শনির সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রাজযোগ ভঙ্গ করেছে, তারও ঠিক রবির মতই শুভ ও অশুভ প্রেক্ষা আছে। উপরন্তু তা বক্রী ও অস্তগত। দশমস্থ রাহু পীড়িত শনি, রবি, বুধ ও চন্দ্রের দ্বারা এবং অনুগৃহীত মঙ্গল, রুদ্র ও বরুণের দ্বারা। এর ফলাফল আমার লেখা 'কোষ্ঠী-দেখা' গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি—

দশমে রবির সাধারণ ফল—মান-সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে শ্রেষ্ঠ যোগ। উচ্চপদ ও গৌরবলাভ নিশ্চয় হয় এবং রাজদ্বারে সম্মান প্রাপ্তি ঘটে। জীবনের মধ্যভাগে ও শেষে বিশেষ প্রতিষ্ঠা। দায়িত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ পদলাভ।

রবি অনুগৃহীত হ'লে—সদ্বংশে জন্ম, উচ্চ কার্যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। তাঁর অধীনে বহু ব্যক্তি কাজ করে, তাঁর মধ্যে প্রভুত্ব ও সংগঠন শক্তি বিশেষ ভাবে অভিব্যক্ত হয়। রবি পীড়িত হ'লে—প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির শত্রুতা, রাজদ্বারে অপমান প্রভৃতি অশুভ ফল। শনি, রাহু, প্রজাপতি অথবা বরুণের দ্বারা পীড়িত হ'লে—রাজদ্বারে অভিযুক্ত ও কারারুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা। উচ্চপদ থেকে অবনতি।

দশমে বুধের সাধারণ ফল—কর্ম ও সাফল্যের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। কার্যসিদ্ধির জন্য কূটবুদ্ধির পরিচয় দিতে হয়। পীড়িত হ'লে কার্যসিদ্ধির জন্য নানা রকম দুশ্চিন্তা চলে এবং তাঁর নামে প্রকাশ্যে ও সংবাদ-পত্রাদিতে অপবাদ ও নিন্দা প্রচারিত হয়, তা সে সত্যই হোক্ বা মিথ্যাই হোক্।

অনুগৃহীত হ'লে—সাহিত্য, বাণিজ্য, রাজনীতি, প্রভৃতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। শিক্ষার ব্যাপারে সম্মান বা প্রতিষ্ঠা। বৃহস্পতি, শনি বা প্রজাপতি দ্বারা অনুগৃহীত হ'লে—লেখাপড়ায় বা রাজনীতিতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা।

দশমে রাহুর সাধারণ ফল—কর্ম স্থানে নানা বিশৃঙ্খল ব্যাপার ও গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। সাফল্যে বহু বাধা বিঘ্ন—পূর্ণ সাফল্যলাভ অসম্ভব। বিদেশে বা দুর্গমস্থানে কর্ম। কর্মের জন্য ভ্রমণ। কর্ম থেকে অনিশ্চিত উপার্জন। মধ্যে মধ্যে কর্ম হীনতা। অযথা নিন্দা ও অপবাদ।

পীড়িত হ'লে—কর্মের ব্যাপারে কখনই নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন না। কর্মের জন্য দূর দুরান্তরে ভ্রমণ, কর্ম স্থানে অদ্ভুত গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা। সহযোগী বা ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় বা ষড়যন্ত্রে কর্মহানি।

অনুগৃহীত হ'লে—পরিবর্তনের দ্বারা উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা। কর্তৃত্বপূর্ণ পদলাভ। বিদেশে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা।

একাদশে শুক্রের ফল—

একাদশে শুক্র শ্রেষ্ঠ বন্ধুভাগ্য দেয়। জাতক এত জনপ্রিয় হন যে, পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই তাঁর মঙ্গলকামনা ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করে। জাতক বন্ধুদের দ্বারা নানা রকমে উপকৃত হন। তাঁর বান্ধবীরাও তাঁর উন্নতির সাহায্য ক'রে থাকেন। পেশাজীবীদের মধ্যেও তাঁর অনেক বন্ধু থাকে এবং বন্ধু সাহচর্যে তিনি যথেষ্ট আনন্দ পেয়ে থাকেন।

এই ফলগুলি নেতাজীর জীবনের সঙ্গে যত মেলে, অন্য কোন লগ্ন ধরলে তা মেলা সম্ভব নয় এবং এই মেষ লগ্নেই বৃহস্পতি ছাড়া অন্য কোন গ্রহকে যদি ভাগ্য নিয়ন্তা কল্পনা করা যায়, তাহলে নেতাজীর জীবনে এগুলি যে ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, তা না হ'য়ে অন্যভাবে ও অন্য আকারে তা অভিব্যক্ত হ'ত।

এইবার দেখা যাক্, বৃহস্পতি যদি ভাগ্যনিয়ন্তা হয়, তাহ'লে তাঁর আয়ু বা জীবনী শক্তি সম্বন্ধে কী নির্দেশ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিচারের সকল খুঁটিনাটি দেওয়ার কোন সার্থকতা নেই, কেন-না বিশেষজ্ঞ ছাড়া অপরের কাছে তা শুষ্ক ও অর্থহীন ঠেকবে। আয়ুবিচারের আসল কথাটা শুধু গোড়াতে ব'লে নিতে চাই।

জন্মকুণ্ডলীতে আয়ুর্বিচারের তিনটি প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে—লগ্ন, রবি ও চন্দ্র। রবি নির্দেশ করে জীবনী-শক্তির অর্জন, চন্দ্র নির্দেশ করে তার সংরক্ষণ এবং লগ্ন নির্দেশ করে দেহের অবস্থা অর্থাৎ এই অর্জিত ও সঞ্চিত জীবনীশক্তি ধারণ করার ক্ষমতা বা উপযোগিতা দেহের কতখানি আছে। লগ্ন থেকে বিচারের সময় তার ষষ্ঠ ও অষ্টম ভাবও যেমন দেখতে হয়, রবি ও চন্দ্র থেকে বিচারের সময়েও তেমনি তাদের ষষ্ঠ ও অষ্টমরাশি লক্ষ্য করতে হয়।

লগ্ন থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, নেতাজীর ভাগ্যনিয়ন্তা বৃহস্পতির লগ্নের উপর পূর্ণ দৃষ্টি আছে, কিন্তু লগ্ন-অষ্টমপতি মঙ্গলকে বৃহস্পতি অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত করছে। লগ্নের ষষ্ঠে আছে চন্দ্র এবং তা রবি, বুধ ও অষ্টমস্থ শনি ও প্রজাপতির শুভ প্রেক্ষায় অনুগৃহীত

কিন্তু রাহু-কেতু দ্বারা পীড়িত। ষষ্ঠপতি বুধ বক্রী ও অস্তগত কিন্তু চন্দ্র, শনি ও প্রজাপতি দ্বারা অনুগৃহীত ষষ্ঠভাব বা ষষ্ঠপতির সঙ্গে ভাগ্যনিয়ন্তার কোনই সম্বন্ধ নেই। অষ্টমস্থ শনি ও প্রজাপতি লগ্ন-অষ্টমপতি মঙ্গলের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছে এবং রবি, বুধ ও চন্দ্রের শুভ প্রেক্ষায় তারা অনুগৃহীত, কোন গ্রহের অশুভপ্রেক্ষা তাদের উপর নেই, কিন্তু ভাগ্যনিয়ন্তা বৃহস্পতির সঙ্গেও তাদের কোন সম্বন্ধ হয় নি। অষ্টমপতি মঙ্গল কিন্তু রুদ্র ও বরুণযুক্ত হ'য়ে রাহু দৃষ্ট এবং ভাগ্যনিয়ন্তা বৃহস্পতির অশুভপ্রেক্ষায় পীড়িত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে নেতাজীর জীবনীশক্তি প্রবল হবে বটে, কিন্তু রুদ্র-মঙ্গল-বৃহস্পতির অশুভ প্রভাবের জন্য মধ্যে মধ্যে জীবন সংশয় হওয়ার আশঙ্কা আছে, তা অতিক্রান্ত হ'লে ৭৩ হ'তে ৭৮ বর্ষের মধ্যে তাঁর দেহান্ত হবে।

নেতাজীর বিংশোত্তরী রবির দশায় জন্ম এবং তা ভোগ হয়েছে ১ বৎসর ১ মাস ১৮ দিন। এই হিসাবে তাঁর ৪৭।৮।১৮ থেকে ৪৮।৯।১৮ পর্য্যন্ত বৃহস্পতির দশায় চন্দ্রের অন্তর্দশা ছিল এবং তারপর মঙ্গলের অন্তর্দশা ৪৯।৮।২৪ পর্যন্ত ও রাহুর অন্তর ৫২।১।১৮ পর্যন্ত। নেতাজীর কুণ্ডলীতে এই তিনটি অন্তর্দশাই রিষ্টকারক। এই সময় ভৃগুর মতে ৪৮।৯।২ পর্যন্ত ছিল চন্দ্রের দশা এবং তার পর ৫২।৯।২ পর্যন্ত মঙ্গল। ৪৯ থেকে ৫২ বর্ষ পর্যন্ত নৈসর্গিক দশা ছিল চন্দ্র ও রবির। এগুলিও রিষ্টকারক। সুতরাং ৪৯ থেকে ৫২ বর্ষের মধ্যে নেতাজীর একাধিকবার জীবন সংশয় হওয়ার আশঙ্কা আছে।

১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালের বেলা ২ টার সময়কার গ্রহসংস্থান নিচে দেওয়া গেল।

প্র ২৩।৪৯ ম ২৪।১১ রা ১৫।১৮ শু ২২।৪০ শ ২৬।৩৫		
রু ১৭।১২		
র ১।৫৪ বু ৬।৭ বং বৃ ৫।৩২ ব ১১।৩৫		কে ১৫।১৯ চ ২৭।৩৩

এই গোচরের গ্রহসংস্থান নেতাজীর জন্মকুণ্ডলীর উপর যে প্রভাব স্থাপন করছে তাতে তাঁর ষষ্ঠ ও অষ্টমভাব দুটি বিশেষ বিরুদ্ধ হয়েছে। জন্মকালে বুধের যে অনিষ্টকর প্রভাব সূচিত হয়েছিল তা এই গোচরে খুব প্রবলভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। গোচরে এই যোগগুলি বিরুদ্ধ ছিল।

১। জন্মকালে ষষ্ঠস্থ চন্দ্র গোচরে অষ্টমস্থ হ'য়ে মঙ্গল ও প্রজাপতির দ্বারা পীড়িত এবং জন্মকালের বরুণের সঙ্গে অপোজিশন।

২। ষষ্ঠপতি বুধ গোচরে পঞ্চমস্থ হ'য়ে বক্রী ও অস্তগত এবং শনি, শুক্র ও মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত। জন্মকালীন অষ্টমস্থ শনি ও প্রজাপতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ শুভপ্রেক্ষা। বুধের এই গোচরের বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেন-না, বুধ ৭ই আগষ্ট সিংহের ১১ অংশ ৪৩ কলায় বক্রী হয়, তার আগে ২৮শে জুলাই সে ঐ প্রজাপতি-শনির সঙ্গে প্রথম শক্রপ্রেক্ষা করে এবং পুনরায় বক্রী হ'য়ে ১৮ই আগষ্ট সেই একই প্রেক্ষা করে। গোচরের শনির সঙ্গেও তার এই ভাবে দুবার শক্রপ্রেক্ষা হয়।

৩। রবি পঞ্চমে বুধযুক্ত ও শনি-মঙ্গল দৃষ্ট। গোচর রাহুর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সেমি-স্কোয়ার প্রেক্ষা আছে এবং জন্মকালীন শনি ও প্রজাপতির সঙ্গে রবি ও শক্রপ্রেক্ষা করেছে।

৪। জন্মস্থ চন্দ্রের উপর গোচরে বৃহস্পতি ও বরুণ।

৫। মঙ্গল নিজের স্থানে ফিরে আসায় জন্মকালে মঙ্গল-বৃহস্পতির অশুভ ফলের সম্ভাবনীয়তা সূচনা করে। তা ছাড়া লগ্ন-অষ্টমপতি মঙ্গল গোচরে জন্মস্থ রবি, বুধ ও বরুণকে ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত করছে। প্রজাপতিও মঙ্গলের মতই প্রেক্ষা করছে।

বস্তুত এই গোচরে মঙ্গল ও বুধের বিশেষ অনিষ্টকর প্রভাব লক্ষিত হয়। এই মঙ্গল বুধের প্রভাবে রক্তপাত, আঘাত প্রভৃতি দুর্ঘটনা সূচনা করে, সুতরাং সেদিন নেতাজীর যে একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল, তার কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন এই যে, সে দুর্ঘটনায় তাঁর জীবনহানি হয়েছে, না তিনি জীবিত আছেন ?

এর উত্তর জ্যোতির্বিদ্ দিতে পারেন না। তার কারণ গ্রহের শক্তিই পৃথিবীর একমাত্র শক্তি নয়। জ্যোতির্বিদ্ শুধু এইটুকু বলতে পারেন যে, এই সময় তাঁর একটা রিষ্টযোগ ছিল, যাতে গুরুতর কোন দুর্ঘটনা হ'তে পারে। যদি সে রিষ্ট এবং তারপরে ৫১ বর্ষে তার আর একটা যে রিষ্ট আছে তা অতিক্রান্ত হয়, তাহ'লে তিনি দীর্ঘজীবী হবেন।

আশা করি, সকলের সমবেত প্রার্থনা গ্রহরিষ্টকে দুর্বল ক'রে নেতাজীকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করবে।

আধুনিক কৃষি ও আমাদের সমস্যা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপদ্ধতির কথা বলিতে হইলেই রসায়নশাস্ত্রের অবদানের কথা না তুলিয়া উপায় নাই। কৃষিকার্য্যে সার ব্যবহারের জন্ত রসায়নী-বিদ্যার উৎকর্ষ প্রতিপদে অনুভূত হইতেছে। বর্ত্তমান জগতে কৃষিজাত-দ্রব্য উৎপন্নবৃদ্ধির গোড়ায় রসায়নই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আধুনিক যে সকল রসায়নী-পণ্য সার হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদিগকে সাধারণতঃ তিন রকম মৌলিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

প্রথমতঃ নাইট্রোজেনঘটিত সার :—এ্যামন সালফেট, এ্যামন নাইট্রেট, সোডা নাইট্রেট, ইউরিয়া নাইট্রেট, ইউরিয়া, সাইনামাইড ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ ফসফেটঘটিত সার :—সুপার ফসফেট, বেসিক্‌স্লাগ (BASIC SLAG), বেসিক্ সুপার ফস্‌ফেট ইত্যাদি।

তৃতীয়তঃ যবক্ষারঘটিত সার :—ক্ষারজ লবণ (muriate of Potash), পটাশ নাইট্রেট (সোরা), পটাস সালফেট ইত্যাদি।

নিখিল পৃথিবী সার মহাসভা (FERTILISERS' Congress) প্রদত্ত হিসাব হইতে দেশ বিদেশে বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহারের পরিমাণ পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য ভারতের স্থান এই তালিকার সর্ব্বনিম্নে, অতি নগণ্য সংখ্যার ভিতরে ভারতের অস্তিত্ব এখানে প্রকাশিত। জমির প্রয়োজন বুঝিয়া বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সার ব্যবহারে উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ যে অনেক বাড়িতে পারে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ্চ কাউন্সিল দেখাইয়াছেন যে অজৈব সার ব্যবহারে গড়পড়তা উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। একমাত্র ধানের উৎপন্ন পরিমাণ শতকরা ১০০ ভাগ বাড়াইতে পারিলে ভারতীয় কৃষকের বাৎসরিক ৩০০ কোটী টাকা আয় বাড়িতে পারে। কৃষিগবেষণাগারে এ্যামন সালফেট ও সুপার ফসফেট মিশ্রিত সারে শতকরা ৫০ হইতে ১০০ ভাগ পর্য্যন্ত ধান্ত বেশী উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে অন্তান্ত কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন ও বৃদ্ধি সম্ভব। কিন্তু রসায়নীবিদ্যা সম্যক প্রয়োগ না করিয়া অর্থাৎ জমির অভাব পরীক্ষা না করিয়া ইতস্ততঃ সার প্রয়োগে স্থান বিশেষে আপাততঃ লাভ বেশী হইলেও অবশেষে হাতুড়ে চিকিৎসার দারুণ ক্ষতি হইতে পারে। গোয়ালারা যেমন "ফুকো" প্রথায় অধিক দুগ্ধ পাইতে গিয়া গোজাতির সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে তেমনি প্রয়োজনাতিরিক্ত সার দিয়া ধরিত্রীদেবীকে অন্তঃসার-শূন্ত করিয়া একসঙ্গে অধিক ফসল লাভ করিবার বাসনা অনেকের মনে উদিত হওয়া সম্ভব। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় ক্রমাগতঃ অম্লজাতীয় সার ব্যবহারে জমি একেবারে অনুর্ব্বর মরুভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আমেরিকার দক্ষিণ পশ্চিমে কোন কোনও স্থানে ধূলিঝড়ের প্রাদুর্ভাব অনুসন্ধান করিতে গিয়া ক্রমাগতঃ অতিরিক্ত এ্যামন সালফেট (Ammon Sulphate) ব্যবহার অন্ততম কারণ বলিয়া জানা গিয়াছে। মাটীর অভ্যন্তরে নিহিত "ব্যাক্টেরিয়া"র (BACTERIA) সাহায্যে উদ্ভিদ্ জলীয় সারের অন্তর্ভুক্ত নাইট্রোজেন কিম্বা ফসফেট গ্রহণ করিয়া থাকে। অতিরিক্ত অম্লপ্রধান Ammon Sulphate ক্রমাগত ব্যবহারে জমিতে অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় "ব্যাক্টেরিয়ার" জীবনান্ত হয় এবং জমির আঁশ হালকা হওয়ায় ধূলিঝড়ের প্রাদুর্ভাব হয়।

ভারতে কয়লার খনি অঞ্চলে কোন কোন কারখানায় কয়লা অন্তর্ধূম-পাতন (Destructive distillation) এর সময় যে বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা গন্ধক দ্রাবকের ফোয়ারার মধ্য দিয়া পরিস্রুত হইবার কালে চিনির মতন যে দানাদার জিনিষ উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায় তাহাই Ammon Sulphate। বর্ত্তমানে মহীশূরে নৈসর্গিক জল ও হাওয়া হইতে Ammon Sulphate প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি ত্রিবাঙ্কুরেও এইরূপ একটী কারখানা স্থাপিত হইতেছে। ঝরিয়া কয়লা-কেন্দ্রের সন্নিহিত সিন্ত্রি নামক স্থানে ভারত গবর্ণমেন্ট বৃহৎ আকারে জৈব উপাদান হইতে Ammon Sulphate তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করিতেছেন। ভারতসরকারের এই প্রচেষ্টা কতটা আন্তরিক এবং সুচিন্তিত ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সুপরিস্ফুট হইবে। পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত হইয়াছে যে একমাত্র নাইট্রোজেন ঘটিত সারে সকল রকম উদ্ভিজ্জ জগতের সারের কাজ চলিতে পারে না। কেবল-মাত্র ধান চাষ সম্পর্কেই ১৯৪০ সালে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এর রিপোর্টেও প্রকাশ যে এ্যামন সালফেট (Ammon Sulphate) সার প্রয়োগ করিলে ফসল বৃদ্ধি পায় ইহা সত্য, কিন্তু ফসফেট এবং এ্যামন সালফেট মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে ফসল শতকরা ১০০ ভাগ পর্য্যন্ত বাড়ান যাইতে পারে। World Congress of Fertilisersএর মন্তব্যও অনুরূপ। নিম্নে য়ুরোপ ও আমেরিকায় ১৯৩৩-৩৭ এই পাঁচ বছরের উদ্ভিজ্জ খাদ্য হিসাবে মিশ্রিত সারের গড়পড়তা হিসাব দেওয়া হইল, এই হিসাব ঐ সময়ের যথাযথ খরচের উপরে দাঁড় করান হইয়াছে।

দেশের নাম	পাঃ একর প্রতি চাষযোগ্য জমির উপরে উদ্ভিজ্জ খাদ্যের গড়-পড়তা হিসাব। হিসাবে স্থায়ী গাছপালা ও পশুচারণ ক্ষেত্রের অস্তিত্ব ধরা হইয়াছে।	উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মিশ্রিত সারের সমতা ন—ফস—য ন—নাইট্রোজেন, য—যবক্ষার ফস—ফসফরাস অক্সাইড
নেদারল্যাণ্ডস্	১২৯	১—১'৬—২'৭
জার্মানী	৬৭	১—১'০—১'৭
য়ুনাইটেড্ কিংডম	১৪	১—১'০—১'৭
নরওয়ে	৩২	১—১'৭—০'৩
ফ্রান্স	৩২	১—২'০—২'১
ইতালী	২১	১—২'৩—১'৭
ফিনল্যাণ্ড	১৭	১—১'৯—০'১
অষ্ট্রীয়া	১৪	১—২'৭—১'৭
য়ুনাইটেড ষ্টেটস্	৪'২	১—৬'৯—১'০
হাঙ্গেরী	১	১—২'৮—১'১
রুমানিয়া	২	১—৩'৮—০'৪
রাশিয়া	৬	১—২'৫—১'৭
ভারতবর্ষ	০'২	১—১'৯—১'০

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত হইত ৩০,০০০ হাজার টনের নিকটে। যুদ্ধের প্রয়োজনে অতিরিক্ত যে সকল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা সুচারুরূপে চলিতে আরম্ভ করিলে উৎপন্ন দ্রাবকের পরিমাণ একলক্ষ টনের বেশী হইবে। যুদ্ধের মধ্যে যে সকল কারণে দ্রাবকের বাজারে ঘাটতি পড়িয়াছিল তাহাও বন্ধ হইবে, অথচ এই প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রাবক কি হইবে? ভারতে এতদিন পর্য্যন্ত (Bone phosphate) জৈব ফসফেট তৈয়ারীর চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও সর্ব্বোপরি রাজ্যের সর্ব্বাধিনায়ক-বর্গের প্রচেষ্টার অভাবে ফসফেট জাতীয় সারের কোন আন্দোলনই হয় নাই; অথচ হাড় ও হাড়ের গুঁড়া প্রতিবৎসর প্রায় ১লক্ষ টন বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। উপরে বর্ণিত যে পরিমাণ গন্ধকদ্রাবক উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা তাহাতে এই লক্ষটন হাড় ও হাড়জাতীয় দ্রব্যে প্রায় ২ লক্ষ টন সুপার ফসফেট তৈয়ার সম্ভব হইতে পারে। ভারতের বর্ত্তমান চাহিদায় এই ২ লক্ষ টনই যথেষ্ট। হাড়জাত দ্রব্য হইতে ফসফেট তৈয়ারী সম্ভব হইলে আরও কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপজাত দ্রব্য—যথা, জিলেটীন আমদানী বন্ধ হইতে পারিত। ভারতে ত্রিচি ও সিংভূমে যে অজৈব ফসফেট প্রস্তর আছে তাহা ফ্লোরীনদুষ্ট বলিয়া কোন কাজই এ যাবৎ হয় নাই, সম্প্রতি জিওলজিকাল বিভাগের সার্ভে রিপোর্টে প্রকাশ, ডেরাডুনে ভাল ফসফেট পাথরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ফসফেট তৈয়ারীর উপরে দেশের নজর পড়িলে স্বতঃসিদ্ধভাবে শস্তার গন্ধক দ্রাবক তৈয়ারী করিতে হইবে, উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই সাধারণ নিয়মে উৎপন্ন জিনিষের দাম কমিবে এবং ফসফেট ব্যতীত গন্ধক দ্রাবকের উপর নির্ভরশীল অপরাপর হেভী কেমিক্যাল শিল্পেরও দাম কমিয়া যাইবে।

বস্তুতঃ যাবতীয় সাধারণ বিষয়ের ন্যায় সার-তৈয়ারী ব্যাপারেও স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদের সৃষ্টি হওয়া দরকার। আমাদের বিদেশী রাজশক্তির যুক্তির পিছনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভূত এখনও ঝাঁকিয়া আছে, কাজেই যে সকল কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানী হইতেছে তাহা বন্ধ না করিয়া বিদেশী কোম্পানীর সহযোগিতার জন্য এত লোলুপতা কেন? সিন্দ্রিতেও দেখি কারখানা তৈয়ারী ও চালু করে হইবে স্থিরতা নাই, কিন্তু সাধারণের লক্ষ লক্ষ টাকা এই কয় বছরে নক্সা ছকিতেই উড়িয়া গিয়াছে, সরকারী সকল কাজের পিছনেই আছে ঐ ভূতের খেলা। এখানেও কোন ইম্পিরিয়াল প্রতিষ্ঠানের কবন্ধ ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল হইবে না। সম্প্রতি সেণ্ট্রাল এসেম্বলীর প্রশ্নোত্তরেই ভিতরের খবর অনেকটা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

বিদেশে রপ্তানী হাড় ও হাড়চূর্ণ

	কারখানার জন্য হাড়		চাষের জন্য হাড়চূর্ণ	
সন	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১৯৩৪-৩৫	৫২,৩৭৮ টন	৩১,৯৫,৫৩৫্	৩৬,৪৭৪ টন	২০,২৩,৬১৬্
১৯৩৫-৩৬	৫৩,১৯৩ টন	৩২,১৯,৪৮৪্	৪২,৮৯৪ টন	২৩,৯৯,৪৪৪্
১৯৩৬-৩৭	৭৪,২৭৯ টন	৪৬,৪৫,৪৩৭্	৫৭,২৪৭ টন	৩৬,১৬,৯৫০্
১৯৩৭-৩৮	৬১,২৫৩ টন	৪৩,৮২,৫৫৮্	৬৮,৮৩০ টন	৫১,৯৬,৮৮২্
১৯৩৮-৩৯	৩১,১৮৭ টন	২৩,৭১,২৯৫্	৪০,৪৯৬ টন	২৬,৭০,২৩৭্

কৃষির আলোচনা প্রসঙ্গে রাশিয়া কিম্বা আমেরিকার যৌথ কৃষি-কার্য্যের ফলে গ্রামগুলির যে রূপান্তর হইয়াছে কিম্বা হইতেছে, তাহাও আমাদের বিবেচ্য। বিশেষতঃ রাশিয়ার সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ সহর ও গ্রামের ভিতর সচরাচর যে আকাশ পাতাল বৈষম্য থাকে তাহা বিদুরিত করা; এই জন্য এখানে কৃষিকে শিল্পেরই অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করা হইতেছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এশিয়া ভূখণ্ডে জারের যে সাম্রাজ্য ছিল সেখানে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বরং জার-তন্ত্রের অনুসৃত নীতির ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিপ্লবী রাষ্ট্র নায়কগণের অভূতপূর্ব্ব পরিশ্রমে অনতিকাল মধ্যে এই বৈষম্যের অবসান ঘটিল। নানাবিধ সভ্য ও অর্দ্ধ-সভ্য জাতির মধ্যে শিক্ষার আলো এক অভাবনীয় নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টি করিল। "অন্ধজনে দেহ আলো" এই বাণী রাশিয়ার সমতল ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া সাইবেরিয়া, তাতার ও তুর্কমেনিস্থানের পাহাড়পর্ব্বত গিরিগুহা ভেদ করিয়া আলোকে আলোময় করিয়া ফেলিল, চারিদিকে রেল লাইন স্থাপিত হইল। বড় বড় হ্রদগুলি জলসেচ প্রণালীতে গ্রথিত হইয়া সারাদেশের হৃদপিণ্ড স্বরূপ দাঁড়াইল। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদের রোগ নির্ণয় ও নিরাপত্তার উপায় আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানশালার কীট-

তত্ত্ববিদের অধীনে পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইল। কৃষিকে শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠার জন্য নূতন নূতন শিল্পশালা, যন্ত্রপাতির কারখানা, বৈদ্যুতিক কারখানা, খনিজ দ্রব্য উত্তোলন, নিষ্কাষণ এবং ভূমিজ তৈল আবিষ্কার প্রভৃতি বিরাট শত বৎসরের কাজ এক যুগের মধ্যেই সম্পন্ন হইল, কয়-বছর পূর্ব্বে যে দেশে কলের কাপড় একটা বিস্ময়ের বস্তু ছিল সেই দেশেই দেশীয় কার্পাসে কাপড় প্রস্তুতের জন্য বিশাল সুত্র নির্ম্মাণ ও বয়নশালা প্রতিষ্ঠিত হইল, সমস্ত ব্যাপারই এক বিরাট অভ্যুদয়, পর পর এমন-ভাবে চলিতে লাগিল যে বিরাট দেশের অর্থনৈতিক চেহারাই একদম বদ্‌লাইয়া গেল। প্রাক্ বিপ্লবযুগে যে দেশকে বলা হইত অর্দ্ধসভ্য, যাযাবর, বুনো ও খুনী দ্বীপান্তরিত কয়েদীদের বাসভূমি, আজ সেখানে গণ-পরিষদ সগৌরবে অধিষ্ঠিত, প্রাক্ বিপ্লবযুগে উজবেকীস্থান কাজাকস্থান ও আজারবাইজানের খনিজ সম্পদ কোনও কাজে আসিত না, সেখান-কার খনিজ সম্পদ গত মহাযুদ্ধের স্নায়ুকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। যে দেশে নিত্য আমীরে উজীরে মারামারি কাটাকাটি হইত, যেখানে বুদ্ধিজীবী বলিতে মোল্লা ও কাজী ব্যতীত কাহাকেও বুঝাইত না, সেখানে হাজার হাজার বুদ্ধিজীবী নরনারীর সৃষ্টি হইল, যেখানকার সামাজিক ব্যবস্থায় নারী বিক্রয় ও নারী হরণ ছিল প্রতিদিনের ঘটনা, অপরিচিত পুরুষের মুখদর্শন যেখানে নারীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইত সেখানে আজ রাজনৈতিক কর্ম্মী, চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার, বিমান পরি-চালিকা, শিক্ষাব্রতী ও কৃষি বিশেষজ্ঞা নারী অবাধে অবগুণ্ঠনবিহীনভাবে রাস্তায়, পদব্রজে, ঘোড়ায়, বৈদ্যুতিক যানে যাতায়াত করিতেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে য়ুক্রেনের কৃষিক্ষেত্রে ৮৮০০০ কলের লাঙ্গল, বায়লো-রুশিয়ায় যৌথ ও সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ৮:০০ কলের লাঙ্গল, ৪০০০ শস্য কাটাইবার কল, ৪০০০ ট্রাক, ১২০০ শস্য তুলিবার কল ব্যবহৃত হইত। ঐ একই বৎসরে আজারবাইজান, কিরগিজিয়া ও তারতারিয়ার কৃষিক্ষেত্রে ৫৫৬২টী, ৩৬৯৪টী, এবং ৬৮৮৫টী কলের লাঙ্গল চলিত। রাশিয়ার যান্ত্রিক কৃষি শিল্পের এই ব্যবস্থা যুদ্ধের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে। কেবলমাত্র কুবান, য়ুক্রেন ও বাইলোরাশিয়ায় প্রায় ৩০০০ লাঙ্গলের ষ্টেশন ধ্বংস হয়, যুদ্ধের পরে সোভিয়েট তাহার নিদারুণ ক্ষয় ক্ষতির ধাক্কা সামলাইবার জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় পশ্চিম রাশিয়ায় এবং জার্ম্মানীর দখলীকৃত স্থানে ব্যক্তিগত কৃষিও অনুমোদিত হইয়াছে এবং যে সকল স্থানে পূর্ব্বে যৌথ কৃষিউদ্যান ছিল সেখানেও নূতন উদ্যমে উদ্যানসমূহ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ায় ১ কোটী ৭০ লক্ষের বেশী নরনারী যুদ্ধে হতাহত হইয়াছে, যৌথ কৃষি উদ্যানসমূহের শতকরা ৪০ ভাগ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের ⅓ ভাগ, লৌহ কারখানা সমূহের ½ ভাগ, ধাতুদ্রব্যের কারখানায় ⅔ ভাগ, এবং সমস্ত রেল লাইনের অর্দ্ধেক নষ্ট হইয়াছে, সত্বরেই যাহাতে এই বিরাট ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হয় তজ্জন্য সোভিয়েটের আদর্শ কথঞ্চিৎ হানি করিয়াও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়াছে। রাষ্ট্রনায়ক ষ্টালিনের গত সেপ্টেম্বরের ঘোষণায় এই খবর প্রকাশিত হইয়াছে।

সোভিয়েটের এই বিরাট গণবিপ্লবে সমাজের সকল ক্ষেত্রেই বিপুল পরিবর্ত্তনের সূচনা আরম্ভ হয়। এমন কি এসিয়ার সোভিয়েট শাসিত গণতন্ত্রে, গণ আন্দোলনের ঢেউএ বাদশাহ, আমীর, উজীর এবং কাজীর শাসন তাসের ঘরের মতন শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে। আমেরিকার টেনেসীভ্যালীর কথা কিম্বা রাশিয়ার বিরাট গণজাগরণ দুইই আমাদের মনে হরিষে বিষাদ উপস্থিত করে। সোনার বাংলার এক অংশে বিপ্লবী গণজাগরণের উন্মেষ হইলেও অপর অংশ বিপ্লবপূর্ব্ব তাতার, উজবেকীস্থানের অন্ধ সংস্কারের গহন অরণ্যে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাধারণের কোটী কোটী টাকা চুরি ও লক্ষ লক্ষ স্বজাতিনিধনের কারণ হইয়াও ধর্ম্মের বেসাতীতে বাজার এখানে সরগরম। অথচ এই দেশেরই অপর প্রদেশ বোম্বাইএর সদ্যগঠিত জাতীয় মন্ত্রিসভার কৃষিমন্ত্রী শ্রীযুক্ত এম, এ, পাতিলের ভাষণ শুনিলে বুকে বল ভরসা আসে। তাঁহার ভাষণে প্রকাশ দুই বৎসরের মধ্যেই কৃষি ব্যবস্থার রূপ যাহাতে বদ্‌লাইয়া যায় তাহার যথেষ্ট বলীয়ান্ পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পাহাড় পর্ব্বত সঙ্কুল স্থানে খাল খনন কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলিয়া ষাটহাজার কূপ খননের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে চীনা বাদামের খইল ও স্বল্পমূল্যে এ্যামন সালফেট ও অস্থিসারচূর্ণ বিতরণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। কৃষকের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভারবাহী পশুর সংখ্যা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সুপ্রজনন কেন্দ্র ও ডেয়ারী ফারমিং প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কীট পতঙ্গাদির আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে উদ্ভিদকে রক্ষার জন্য কীট-তত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত হইতেছে। মিউনিসিপ্যালিটীর যাবতীয় আবর্জ্জনা সারে রূপান্তরিত করিয়া অল্পমূল্যে কৃষককে দেওয়ার জন্য চল্লিশটী মিউনিসিপ্যালিটীতে কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আদর্শ কৃষি কলেজ ও কর্ম্মিদের শিক্ষার জন্য ট্রেণিং শিক্ষালয় স্থাপিত হইতেছে। এক কথায় দুই বৎসরের মধ্যেই দেশের চেহারা যাহাতে বদ্‌লাইয়া দেওয়া যায় তাহার আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ, কর্ত্তব্য কেবলমাত্র এসেম্বলী হাউসে ভোটদানে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া নিজ নিজ কেন্দ্র পরিদর্শন এবং উন্নত পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। এই সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের জয় যাত্রার কাহিনীও বিবেচ্য। বিহার, ইউ-পি, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার মত ক্ষুদ্র প্রদেশেও নদী শাসন, জল সেচ প্রণালী, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নানা রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পত্তন হইতেছে। কিন্তু হতভাগ্য বাংলা দেশ! একদিন ছিল যখন বাংলা দেশকেই সকলে অনুসরণ করিত। এখানেও পরিকল্পনা আছে প্রচুর, কিন্তু মাৎসন্যায় পরিপূর্ণ এই দেশ, ক্ষুধায় কাতর, অন্নাভাব ভীষণ, অথচ ৪৯০ লক্ষ একর কৃষি-যোগ্য জমি এখানে পতিত। ৮৪ হাজার গ্রাম সর্ব্বহারায় পরিপূর্ণ, গত দুর্ভিক্ষের জের না কাটিতেই আকাল তাহার দংষ্ট্রা বিকাশ করিয়া আসিতেছে। এক দুর্ভিক্ষেই ৩০।৪০ লক্ষ লোক করালগ্রাসে পতিত, ঠিক এই সংখ্যক লোক বৃত্তিচ্যুত দিনমজুর, ইহার মধ্যে কারুশিল্পী ও মৎসজীবীদের অবস্থা একেবারে চরমে

তিত। * গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার ন্যায় সমস্ত জাতি আত্ম-কলহে উন্মত্ত। তাই বলিতেছিলাম পরিকল্পনা আছে প্রচুর, কিন্তু সকলই অপচয়ে পরিণত। সত্যিকার উন্নতিমূলক নীতি কোথাও দেখা যাইতেছে না। ফসল সংরক্ষণে অমিতাচার ও শ্বেত পিপীলিকার দৌরাত্ম্য। "ফসল ফলাও" আন্দোলন তথৈবচ। সরকারী বাগান বিরাট ব্যয়ে কয়েকটী বিলাতী বেগুনে পরিতৃপ্ত। ঠকঠকি তাঁত বসিয়ে খানকয়েক সতরঞ্চী বুনতেই, কিম্বা কয়েকটী ছাতার বাঁট বানাইতে এখানে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয়। নৌকাপর্ব্ব ও চাউল সরাইবার বেদনাময় কাহিনীর উল্লেখ না করাই ভাল। গোমহিষাদি বিক্রয়ের পরিহাস এবং চাষীদিগের কৃষিযন্ত্র ও বীজ সরবরাহের ব্যাপারে অভিযোগ এখানে প্রত্যহ। এই মাৎস্যন্যায়ের শেষ কোথায় এবং কবে? কর্ম্মচারীদের প্রধান কাজ এখানে চাকুরী বজায় রাখা এবং সুবিধা করিতে পারিলে উপ্‌রি রোজগারের ফন্দী বাহির করা। আর দেখাও যায়, কৌশলী লোকদের বর্ম্ম হইয়াছে ধর্ম্ম, কারণ এই পন্থার খেয়ায় পদোন্নতি ও অর্থ প্রাপ্তির মাহেন্দ্রযোগ বর্ত্তমান। তাই মনে হয় T. V. A. কিম্বা রাশিয়ার যৌথ প্রতিষ্ঠান দুইই আমাদের কাছে utopia অর্থাৎ গন্ধর্ব্বপুরী, † এই পুরী কি চিরদিনই মনাকাশে ঝুলিতে থাকিবে? যুধিষ্ঠিরের রথের মতন কখনও মাটী স্পর্শ করিবে না, কিম্বা আমাদের প্রত্যক্ষ হইবে না? কিন্তু যিনি ধ্যানে অন্ততঃ একবার সেই মর্ম্মর প্রাচীর, মণিময় তোরণ, রজতসৌধ কনকচূড়ার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, তিনি আকাশ রাজ্য হইতে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। এক কথায় তিনি ভারতবর্ষের একতার দিবাস্বপ্ন দেখেন, আর এই একতার দিবা স্বপ্নকে বাস্তব জগতে আনয়ন করিতে হইলে চাই সুদূরপ্রসারী গণ প্লাবন এবং এই গণ-প্লাবনের বিজয় পতাকায় লিখিতে হইবে অমর কবির বাণী:

> অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই
> চাই মুক্ত বায়ু; চাই স্বাস্থ্য, চাই বল
> আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু; সাহস বিস্তৃত বক্ষপট···

সুখের বিষয় সাম্রাজ্যবাদীর বাঁধান রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া কণ্টকাকীর্ণ উষর পথে যাঁরা যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন এতদিন তাঁদের স্থান হয়েছিল কারাগারে, আজ তাঁরাই রাষ্ট্র তরণীর কর্ণধারের পদে বৃত হয়েছেন, কাজেই হেষ্টিংসের আমল থেকে দেশের স্বার্থ বলি দেওয়ায় যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদের মাতামাতির চরম বলির মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত হয়েছে। ধীরে, ধীরে হইলেও আজ সকলে বুঝিতে পারিতেছেন যে দেশ মাটীতে তৈরী হয় না, মানুষেই দেশকে তৈরী করে।

> মহা বিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
> নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা
> মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।

* Reference from "A Plan for Rehabilitation in Bengal" by Statistical Publishing Society, Calcutta.

† পরলোকগত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের utopia শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

লীগের আসাম অভিযান

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

এখন হইতে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে আসাম প্রদেশে সর্বপ্রথম 'বহিরাগতের' সুরু হয়। তখন ময়মনসিংহ জেলা হইতে কয়েকদল মুসলমান আসামের গোয়ালপাড়া ও নওগাঁ জেলার পতিত জমিতে গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। আসাম গবর্ণমেণ্ট প্রদেশের রাজস্ব বৃদ্ধির যুক্তিতে সেই সময়ে উহা সমর্থন করিয়াছিলেন। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল এই বহিরাগতের দলও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তাহারা পতিত জমি দখল করিতে করিতে প্রদেশের খাস অধিবাসীদের নিকটবর্তী হইয়া পড়িল। পরে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ সাদুল্লার নেতৃত্বে আসামে লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে, আসামকে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করার জন্য বাঙলা হইতে এই মুসলমান আমদানীর কাজ আরও জোর চলিতে থাকিল, এই সময়ে লীগনেতারা পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীদের আসামে গিয়া বাস করিবার জন্য পূর্ববঙ্গে গিয়া জোর প্রচার চালাইতে লাগিলেন। এদিকে অথচ আসামের ভূমিহীন চাষীরা পতিত জমি পাইবার জন্য আবেদন করিলে, লীগ মন্ত্রিসভা তাহাদের আবেদনে কান দিলেন না। ফলে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং ১৯৪০ সালে লীগ মন্ত্রিসভার পতন হইল ও প্রদেশে ৯৩ ধারা প্রবর্তিত হইল। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে কংগ্রেস নেতারা কারাবরণ করিলে, আসামে পুনরায় লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইল। লীগ মন্ত্রিত্বের গদি পাইয়াই পুনরায় আসামে মুসলমান আমদানীর কাজে মন দিলেন।

যুদ্ধের কল্যাণে এই সময়ে আসামের লীগ মন্ত্রিসভা একটা সুযোগও পাইয়া গেলেন। "অধিক শস্য উৎপন্ন কর" আন্দোলনের নামে আসামের সংরক্ষিত চারণভূমিগুলিতে দলে দলে বাঙলা হইতে লোক আমদানি করিতে লাগিলেন। লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী আসামের জমিহীন হিন্দু মুসলমান ও পাহাড়ীদের বঞ্চিত করিয়া অধিক শস্য উৎপন্ন কর

আন্দোলনের নাম করিয়া বহিরাগতদের এই সময়েই ১৬০০০০ বিঘা জমি দান করিলেন। ইহা ছাড়া মুসলিম লীগের উস্কানিতে আরও লোক দলে দলে গিয়া আসাম সরকারের সংরক্ষিত ভূমিগুলিতে গিয়া জোরপূর্বক প্রবেশ করিতে লাগিল। এইভাবে গত কয়েক বৎসরেই প্রায় ১৫ লক্ষ লোক জোরপূর্বক গিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়া দিল।

আসামে যদিও স্বাভাবিক ভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং জমির উপর চাপ পড়িতেছে, তাহা হইলেও আসামবাসীরা এই সকল সংরক্ষিত ভূমিকে পবিত্র জ্ঞান করে। এই সংরক্ষিত চারণভূমিগুলিতে পেশাদার পশুপালকরা গরু-মহিষ চরাইয়া থাকে এবং প্রতি গরু বা মহিষ বাবদ ৩৲ টাকা করিয়া শুল্ক দিয়া থাকে। এই সকল গবাদি পশুই আসামে দুধ সরবরাহ ও কৃষিকার্যের সহায়তা করে। কারণ আসামে গবাদি পশুকে গৃহে রাখিয়া খাওয়ানর রীতি নাই।

বাহির হইতে লোক গিয়া জোরপূর্বক আসামের সংরক্ষিত ভূমিতে বসবাস করায় আসামের জনসাধারণ বহুদিন হইতেই ইহাতে আপত্তি করিয়া আসিতেছিলেন। এই সকল বহিরাগতদের জুলুম ও হিংস্র কার্যকলাপে আসামের খাস অধিবাসীদের জীবনযাত্রা বিপন্ন হইতেছিল।

এই সময়ে আসামের বন্যায় অনেকেই ঘরবাড়ী হারাইয়া এই সকল স্থানে বসবাস করিবার জন্য সরকারের নিকটে আবেদন করিল। ফলে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ সাদুল্লা, বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলুই ও পরিষদের বিভিন্ন দলের সদস্যদের এক চুক্তি হইল এবং ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে তাঁহাদের গৃহীত প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। এই চুক্তি অনুসারে সংরক্ষিত গোচারণ ভূমি বাসিন্দামুক্ত করা হইবে স্থির হয় এবং আরও ঠিক হয় যে উদ্বৃত্ত কর্ষণযোগ্য পতিত জমি ভূমিহীন আসামীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া ১৯৩৮ সালের পূর্বের বহিরাগতদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

এই প্রস্তাব অনুযায়ী সাদুল্লা মন্ত্রিসভা কামরূপ জেলার সংরক্ষিত স্থানগুলির কয়েক স্থানে বহিরাগত উচ্ছেদের কাজে হাত দেন। কিন্তু নির্বাচন ও বর্ষাকাল আসিয়া পড়ায় অন্যত্র উচ্ছেদ কার্য চালান সম্ভব হইয়া উঠে নাই। ১৯৪৬ সালে আসামে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে তাঁহারা সাদুল্লা মন্ত্রিসভার সেই আরব্ধ কাজে হাত দিলেন। সাদুল্লা মন্ত্রিমণ্ডলীর গৃহীত প্রস্তাব তাঁহারা কোনরূপ সংশোধন বা পরিবর্তন করিলেন না। এই উচ্ছেদ কার্য আরম্ভ করিবার ঠিক পূর্বে বড়দলুই মন্ত্রিসভার পক্ষ হইতে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম মেধি লীগের সহযোগিতা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু লীগ ইহাতে কোনও সাড়া দিল না। লীগের সাড়া না পাইলেও বড়দলুই মন্ত্রিসভা তাঁহাদের কাজ চালাইয়া যাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। অবশ্য আপোষমূলক ভাবেই এই উৎখাত কাজ চলিতে থাকে। ১৯৩৮ সালের পূর্বের বসবাসকারীদের অন্যত্র বাস করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। মোট ৩ হাজার উৎখাত পরিবারের মধ্যে ৭ শত গবর্ণমেণ্টের রক্ষণাধীন। বড়পেটা মহকুমায় ১৫ হাজার বিঘা খাস জমি, মঙ্গলদৈ মহকুমায় ১ হাজার বিঘা জমি ও গৌহাটির বড় বড় অঞ্চলে ইঁহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়।

এই উচ্ছেদ চলিতে থাকা কালে আসামের লীগদল তাঁহাদের পূর্বের চুক্তি ছাড়িয়া আন্দোলন সুরু করিয়া দিল। লীগকর্মীরা উৎখাত ব্যক্তিদের জমি পুনরধিকার করিতে এবং গবর্ণমেণ্টের সর্ত অস্বীকার করিয়া আইন অমান্য আন্দোলন করিতে প্ররোচনা দিতে লাগিল। বাঙলার মুসলিম লীগও স্থির থাকিল না, আসামের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া গেল, এবং লীগের বঙ্গাসাম যুক্ত কর্মপরিষদ গঠিত হইল।

১০ই মার্চ লীগের এই বঙ্গাসাম যুক্ত কর্মপরিষদের আহ্বানে আসাম সরকারের বহিরাগত উচ্ছেদনীতির প্রতিবাদে আসামে "আসাম দিবস" পালিত হইল। আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আব্দুল হামিদ খানের উপর দরং জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিলেও তিনি দরং জেলায় প্রবেশ করিয়া টাউনহল ময়দানে বক্তৃতা করিলেন। আইন অমান্য করায় আসাম গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। এই সময়ে লীগের এই যুক্তকর্মপরিষদ আসাম গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার জন্য মিঃ মহম্মদ সাদুল্লা, মিঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী ও মনোয়ার আলির নেতৃত্বে এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর তালিকা প্রস্তুত করিল এবং মুসলিম ন্যাসনাল গার্ডগণ কর্তৃক আসাম অভিযানের সিদ্ধান্ত করা হইল। তদনুযায়ী বাঙলা ও আসামের সীমান্তে রংপুর জেলায় মানকাচরের নিকটে একটি ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর ও পূর্ব সীমানায় দুইটি লীগের বঙ্গাসাম যুক্তকর্মপরিষদ "পূর্বপাকিস্থান কেল্লা" নামে শিবির স্থাপন করিল। সেখানে হাজার হাজার মুসলিম ন্যাসনাল গার্ড স্থাপন করা হইল এবং তাহাদিগকে উপদ্রব সৃষ্টি করিবার জন্য নানা কৌশল শেখান হইতে লাগিল। ইহারা ছাড়া দলে দলে আরও লোক গিয়া জোরপূর্বক আসাম সীমান্তে প্রবেশ করিতে থাকিল। এই স্থানের সংখ্যালঘু অমুসলমান জনসাধারণ তাঁহাদের ভয়ে ভীত হইয়া অনেকেই গারো পাহাড়ে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ২১শে মার্চ তারিখে বড়পেটা হইতে ৮ মাইল দূরে গোবিন্দপুরের সংরক্ষিত গোচারণ ভূমিতে ৬০০০ বহিরাগত মুসলমান বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া পুলিশের তাঁবু ঘেরাও করে। পুলিশ প্রথমে তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলে; কিন্তু অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া পড়ায় ক্ষুদ্র রক্ষীবাহিনী আত্মরক্ষার জন্য গুলি করিতে বাধ্য হয়, ফলে ১২ জন আক্রমণকারী নিহত হয় এবং সৈনিকদের মধ্যে একজন আক্রমণকারীদের দ্বারা বল্লম বিদ্ধ হয়।

৩০শে মার্চ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এক সভায় আসামের সর্বত্রই আইন অমান্য আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিখিলভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চৌধুরী খালিকুজ্জমান এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অস্থায়ী সম্পাদক মিঃ হবিবুল্লা বাহারও বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। আসাম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে আসামের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন, ঘুষও দুর্নীতি এবং বহিরাগত উচ্ছেদ নীতির সম্বন্ধে অভিযোগ করা হয়, এবং প্রাদেশিক লীগের পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হয়

যে, ৯ই এপ্রিল হইতে তাহাদের এই আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হইবে।

লীগের এই আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষিত হইবার পর প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলুই এক বিবৃতিতে বলেন যে, লীগ কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অমূলক অভিযোগ করিয়া যে আইন অমান্য আন্দোলনের মনস্থ করিয়াছে, কোন গবর্ণমেণ্টই তাহা এড়াইয়া যাইতে পারেন না। এই ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট কোনও ভীতি প্রদর্শনের নিকটে নতি স্বীকার করিবেন না, অধিকন্তু তাঁহাদের পূর্বসঙ্কল্পে আরও দৃঢ় থাকিবেন। একদা সকল দলের মধ্যে মীমাংসা হইয়া যে নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল বর্তমান আসাম গবর্ণমেণ্ট তাহার দায়িত্ব হইতে বিচ্যুত না হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আসাম গবর্ণমেণ্ট বঙ্গাসাম সীমান্তে উপদ্রব দমন করিবার জন্য সৈন্য সমাবেশ করিতে লাগিলেন এবং দেশের অশান্তি দূর করিবার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও সৈন্য সাহায্য চাহিলেন। কংগ্রেসের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে আসামের অবস্থা জানাইবার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেআসামের স্পীকার প্রমুখ কয়েকজন সদস্যও নয়াদিল্লী গমন করিলেন।

এই সকল দেখিয়া আসামের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী এবং বর্তমান আসাম মুসলিম লীগ কর্ম পরিষদের চেয়ারম্যান মিঃ মহম্মদ সাদুল্লা লীগপন্থীদের জানাইলেন যে, তিনি উচ্ছেদ নীতি সম্পর্কে একটী সম্মানজনকভাবে মিটমাটের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বড়দলুই এর সহিত আলোচনা করিতেছেন, অতএব আইন আমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখা উচিত এবং যাহাতে আলোচনার পথ বন্ধ হইয়া যায় এমন কিছু না করা কর্ত্তব্য।

মিঃ সাদুল্লার এই বিবৃতি সত্ত্বেও নানাস্থানে লীগের বে-আইনী আন্দোলন চলিতে থাকিল। আসাম সরকারের সদস্য, কর্মচারী ও অ-লীগ মুসলমানদের উপর আক্রমণ চলিতে লাগিল। মানকাচরের পূর্ব পাকিস্থানের কেল্লায় মুসলিম ন্যাসনাল গার্ডগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে লীগ তহবিলের জন্য অর্থ আদায় করিতে আরম্ভ করিল। হিন্দু জমিদারদের খাজনা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। হিন্দুদের উপর "জিজিয়া" কর ধার্য করিয়া তাহা আদায় করিবার জন্য জুলুম চলিতে থাকিল। এই সময়ে আসামের রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত মেধী এক বিবৃতিতে বলিলেন যে আসাম গবর্ণমেণ্টকে অসুবিধায় ফেলিবার জন্যই মিঃ সাদুল্লা ভাঁওতা দিয়া বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ লীগের আন্দোলন চলিতেছে। তিনি বাঙলা সরকারের বিরুদ্ধেও এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন, বাঙলা সরকার আসাম সীমান্তের মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের রেশন দিয়া সাহায্য করিতেছেন।

এদিকে লীগ নেতাদের সহিত মন্ত্রি সভার যে আলোচনার কথা মিঃ সাদুল্লা ঘোষণা করিয়াছিলেন, এপ্রিলের শেষ দিকে দুইদিন ধরিয়া সেই আলোচনা চলিবার পর তাহা ফাঁসিয়া গেল। এই ব্যর্থতার জন্য লীগ কংগ্রেস মন্ত্রী মণ্ডলীর মনোভাব অপরিবর্তিত বলিয়া অভিযোগ করিল, অপরপক্ষে রাজস্ব সচিব মিঃ মেধী মুসলিম লীগ কর্ম পরিষদের সদস্যদের মনোভাবের পরিবর্তন হইল না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি এক বিবৃতিতে জানাইলেন যে, লীগের এই আন্দোলন পূর্ব হইতেই হিংসাত্মক কার্যে পরিণত হইয়াছে। ১০ই এপ্রিল তারিখে লীগপন্থীরা করিমগঞ্জের ডাকঘর, স্কুল, ছাত্রাবাস, বসতবাড়ী, ও দোকানপাট আক্রমণ করে এবং পুলিশ বাহিনীর উপরও আক্রমণ চালায়। ১৮ই তারিখে শ্রীহট্টে আর একটি লীগদল উত্তেজক ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা বাহির করে এবং জেল প্রহরীকে আক্রমন করিয়া জেলের উপরে লীগ পতাকা উত্তোলন করে। ২২শে এপ্রিল মানকাচরে কয়েকজন সৈন্যের উপরে এবং ২৪শে তারিখে শ্রীহট্টে একটি পুলিশ বাহিনীর উপরেও লীগ-পন্থীরা আক্রমণ চালায় ও ইট্ পাটকেল ছুঁড়িতে থাকে।

মিঃ মেধী এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কোন গবর্ণ-মেণ্টই এইরূপ অরাজকতা বরদাস্ত করিতে পারেন না এবং এ সম্পর্কে তাহাদের কর্তব্যে উদাসীন থাকিতেও পারেন না। প্রদেশের জন সাধারণের মঙ্গলের জন্য শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন।

আসামে লীগের আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে, এবং দেখা যাইতেছে এই আসাম অভিযানে বাঙলার লীগদলও একটা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, বরং অসমিয়া মুসলমানদের অপেক্ষা তাহাদেরই আগ্রহ অধিক বলিয়া মনে হইতেছে। বাঙলার প্রাদেশিক লীগ এই অভিযানে নাকি দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছে। বাঙলা সরকার, আসাম সীমান্তে এই বিরাট লীগচমূকে রেশন দিয়া সাহায্য করিতেছেন বলিয়াও শুনা যাইতেছে। আসাম অভিযানের জন্য পূর্ব বাঙলা হইতে হাজারে হাজারে লোক সংগৃহীত হইতেছে, এবং প্রতিবেশী প্রদেশের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য বাঙলা সীমান্তে একাধিক ঘাঁটি করিয়া সহিংস কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আসামের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বড়দলুই এ বিষয়ে বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীকে এক পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ সুরাবর্দী ইহার উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বাংলা সরকারের এই মৌন সমর্থন পাইয়া লীগচমূরা আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে।

ইহা অতি স্পষ্ট যে এই অভিযানের সহিত লীগের রাজনীতি বিশেষ-ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। লীগ আশা করিতেছে, আগামী বৎসর বৃটিশ যদি ভারত ত্যাগ করে, তবে তাহারা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ-গুলি লইয়া পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা করিবেই এবং গণপরিষদে যোগ না দিয়া নিজেরা আলাদা একটি পাকিস্থানী গণ-পরিষদ গঠন করিবে। আসাম মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নয় বটে, কিন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে কিছু মুসলমান আসামে চালান করিতে পারিলেই ত ইহার সমাধান হইয়া যায়। তাই লীগের আসাম অভিযানে এতখানি উৎসাহ ও আগ্রহ।

কিন্তু এই অভিযানকে প্রতিহত করিবার জন্য আসামের বর্তমান গবর্ণমেণ্টের উৎসাহও কম নহে। তাঁহারা সকল প্রকারে বাধা দানের জন্য দৃঢ়তার সহিত প্রস্তুত হইয়াছেন ও হইতেছেন। লীগের ভীতি প্রদর্শনে তাঁহারা আদৌ ভীত নহেন, এমন কি এই অন্যায় অভিযানকারীদের সমুচিত শিক্ষা দানের জন্যও তাঁহারা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ৩০।৩।৪৭
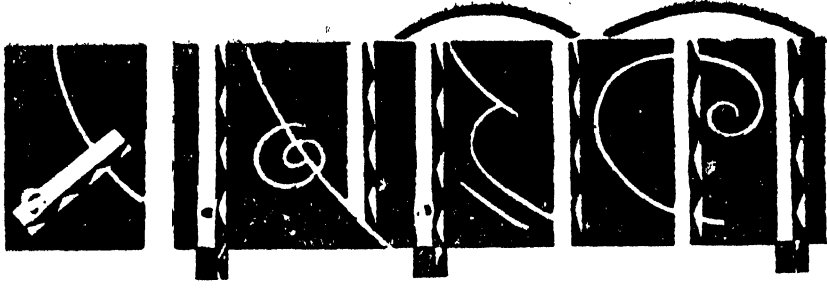
স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল—

সন ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাধনোচিত ধামে মহাপ্রয়াণ করেন—সেই বৎসরই আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে 'ভারতবর্ষ' জন্মলাভ করে—তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাহার পর একে একে ৩৪টি বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, আজ সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া আমরা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রণাম জ্ঞাপন করিতেছি। সন ১২৭০ সালের ৪ঠা শ্রাবণ দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হইয়াছিল—কাজেই মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫০ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। তিনি এই অল্প-পরিসর জীবনে বিলাত হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া সুদীর্ঘ ৩৪ বৎসর কাল তিনি শুধু সরকারী চাকরী করেন নাই (১৮৮৬ হইতে ১৯২০), তিনি মাতৃ ভাষার সেবা করিয়া দেশকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, দেশ কখনই তাহা বিস্মৃত হইতে পারে না। তাঁর পরলোকগমনের কয়দিন মাত্র পরে কবি করুণানিধান যে কবিতায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, আমরা আজ তাহাই পুনরায় উদ্ধৃত করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি—

যৌবনের কুঞ্জবনে, উৎসবের অশোক মঞ্জরা,
হিন্দোলাতে যার সাথে মদালসা কবিতা-অপ্সরী
সম্ভাষিয়া হাসিমুখে, দিত দোল ভাব চন্দ্রিকায়
সে আজি তাহারে লয়ে উত্তরিল নবীন বেলায়।
সন্ধ্যার সীমন্ত মেঘে ঢাকি নীল কজ্জল অলকে
সে আজি বাসর জাগে সাথে তার কোন্ কল্পলোকে?
পূর্ণ দধি সমুদ্রের উর্ম্মি-শঙ্খ বাজে সুগম্ভীর,
অমরী ভাসায় তরী এলোচুলে লুকায় তিমির।
প্রেম চন্দ্রকান্তপ্রভা বক্ষে তব নির্ম্মিল দেউল,
শক্তিমান পুরোহিত—মন্ত্র চিন্তা গৌরবে অতুল
রঙ্গ হাস্য অশ্রু উৎস, করুণায় সুমধুর প্রাণ—
আজি শুনিতেছ দেব, অমরায় চিরন্তন গান।
আরাধনা করে গেছ মানবের জীবন মরণ—
কল্পনার ফুল্লপক্ষে সঞ্চরিছ পেলব গুণ্ঠন
রহস্য রাজ্যের মাঝে—মৃত্যু দেছে দ্বার উদ্‌ঘাটিয়া,
নব জাগরণ লভি বেলাহীন নীলাম্বু চুম্বিয়া,
কোথা যাও? পিছে তব গঙ্গোত্তরী, সমবেদনার
হিমশিলা গলি গলি ঢলি পড়ে রচি পারাবার।

*　　*　　*　　*

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—

এখন হইতে ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পর সুদীর্ঘ ৬৫ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া তিনি বাঙ্গালীকে, ভারতবাসীকে, সারা পৃথিবীকে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন, আজ আর তাহা নূতন করিয়া বলিবার বিষয় নহে। তাঁহার দানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসী ২৫শে বৈশাখ তারিখটি এক জাতীয় উৎসবে পরিণত করিয়াছে—ঐ দিন দেশের সর্ব্বত্র ক্ষুদ্র বৃহৎ সভাসমিতি ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া লোক রবীন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করে ও তাহা দ্বারা নিজেরা উপকৃত হয়। মাত্র কয় বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন, এখনও তাঁহার সাহিত্য বিচারের সময় আসে নাই। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও তাঁহার দান আমাদের জীবনকে কি ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, আমরা আজ শুধু সে কথা চিন্তা করিয়াই অভিভূত হই। আমরা রবীন্দ্র-জন্ম দিবসে দেশবাসীর এই অনুষ্ঠান পালনে উৎসাহ দেখিয়া আশান্বিত এবং তাঁহাদের সকলের সহিত একযোগে রবীন্দ্রনাথের অলোক-সামান্য প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

প্রতাপাদিত্য জয়ন্তী—

গত ১৯শে বৈশাখ শনিবার কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউট হলে শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে এক সভায় বাঙ্গালার বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের স্মৃতি-পূজা হইয়াছিল। কুমার শ্রীযুত বিমলচন্দ্র সিংহ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুত সজনীকান্ত দাস উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং শ্রীযুত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুত মাখনলাল সেন, হেমন্তকুমার বসু, মন্মথমোহন বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উৎসবে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দেশ বীরপূজা করিতে শিখিয়াছে, কাজেই জাতির ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ।

আন্তঃএসিয়া সম্মেলনে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ও অন্যান্য প্রতিনিধিগণের যোগদানার্থ গমন

৯৩ ধারা ও সীমান্ত প্রদেশ—

বড়লাট সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া নাকি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সীমান্তে মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া তথায় ৯৩ ধারার শাসন বহাল করা হইবে ও সীমান্তে নূতন নির্ব্বাচনের দ্বারা ব্যবস্থা পরিষদ গঠন করা হইবে। মাত্র এক বৎসর পূর্ব্বে সীমান্তে নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে—তাহাতে কংগ্রেস অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে। তাহার পর হঠাৎ নূতন নির্ব্বাচনের প্রস্তাবে সকলে স্তম্ভিত হইয়াছেন। সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খাঁ সাহেব ও সীমান্ত-গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ বড়লাটের এই কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন ও সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার বিরোধিতা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বড়লাট মিঃ জিন্নার সন্তোষের জন্য সীমান্তে এই অব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের উদ্যোগী। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া এই ব্যাপারের বিরোধিতার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর কলিকাতা আগমন—

৭ই মে সন্ধ্যায় দিল্লী ত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধী ট্রেণযোগে গত ৯ই মে সকালে কলিকাতায় আসেন ও সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে বাস করেন। পাটনা হইতে ডাঃ সৈয়দ মামুদও তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় ছয় দিন অবস্থান করিয়া ১৪ই মে সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধী পাটনা রওনা হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে গান্ধীজী বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দের সহিত বাঙ্গালার সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন ও কলিকাতার সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করেন।

দিল্লীর লাটপ্রাসাদে লেডি মাউন্টব্যাটেনের সহিত আলাপন-রতা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

গণপরিষদের নূতন কমিটী—

গণপরিষদের সভাপতি ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার নিয়ম স্থির করিবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া এক কমিটী গঠন করিয়াছেন—(১) পণ্ডিত জহরলাল নেহরু (২) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (৩) পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ (৪) শ্রীযুত জগজীবন রাম (৫) ডাঃ বি-আর-আম্বেদকর (৬) সার আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার (৭) কে-এম-মুন্সী (৮) অধ্যাপক কে-টি

(৯) ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১০) সার ভি-টি-কৃষ্ণমাচারী (১১) সর্দ্দার কে-এম-পানিক্কর (১২) সার এন-গোপালস্বামী আয়েঙ্গার। তিনি আদর্শ প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য একটি দ্বিতীয় কমিটী গঠন করিয়াছেন—তাহার সদস্য হইয়াছেন—(১) সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল (২) ডাঃ সুব্বারায়ান (৩) ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়া (৪) বি-জি-খের (৫) ব্রিজলাল বিয়ানী (৬) ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু (৭) হরেকৃষ্ণ মহাতাব (৮) কিরণশঙ্কর রায় (৯) ফুকনপ্রসাদ বর্ম্মা (১০) রোহিণীকুমার চৌধুরী (১১) জয়রামদাস দৌলতরাম (১২) সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং (১৩) দেওয়ান চমনলাল (১৪) সত্যনারায়ণ সিংহ (১৫) বালুচা (১৬) ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন (১৭) রাধানাথ দাস (১৮) রফি আমেদ কিদওয়াই (১৯) শ্রীযুক্তা হংস মেটা (২০) রাজকুমারী অমৃত কাউর (২১) ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রথম কমিটীতে ৩জন ও দ্বিতীয় কমিটীতে ৪জন নূতন সদস্য পরে গ্রহণ করা হইবে।

দিল্লীতে প্রেস আইন তদন্ত কমিটীর বৈঠক—
বামে শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ

সীমান্ত গভর্ণরের অপসারণ—

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী আচার্য্য যুগলকিশোর ও দেওয়ান চমনলাল সীমান্ত প্রদেশ দেখিয়া আসিয়া জানাইয়াছেন—মুসলিম লীগের লোকেরা সীমান্তে নিরীহ নরনারী ও শিশুদের আক্রমণ করিতেছে ও সকলের ধন সম্পত্তি নষ্ট করিতেছে। বর্ত্তমান গভর্ণর তাহাদের বাধাপ্রদান করিয়া লোকের শান্তিরক্ষা করিতে অসমর্থ। কাজেই বর্ত্তমান গভর্ণরকে সরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সীমান্তে লীগের ধ্বংস কার্য্য সমর্থন করায় তথায় দারুণ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

খাদ্য-দপ্তরে নূতন ব্যবস্থা—

বিদেশ হইতে ভারতে যে খাদ্যশস্য আমদানী হইত এতদিন ভারত গভর্ণমেন্টের খাদ্য দপ্তর তাহার ব্যবস্থার ভার রেলী ব্রাদার্স, ভলকার্ট ব্রাদার্স প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের উপর দিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি খাদ্য দপ্তরের কর্ত্তৃপক্ষ দুইটি ভারতীয় ব্যবসায়ী সংঘের উপর খাদ্য আমদানীর ভার প্রদান করিয়াছেন।

ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শারীয়ারের ওলন্দাজ পত্নী বেগম শারীয়ার

নূতন শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠান—

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামক শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠান নানা কারণে দেশের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারাইতেছিল। সে জন্য কংগ্রেসের কর্ম্মীদিগের দ্বারা গঠিত হিন্দুস্থান মজদুর সেবক সংঘের উদ্যোগে গত ৪ঠা মে দিল্লীতে 'ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' নামে এক নূতন শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। প্রথম দিনের সভায় সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল সভাপতিত্ব করিয়াছেন ও রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনী সভার উদ্বোধন করিয়াছেন। ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি, শ্রীযুত কে-কে-দেশাইকে সম্পাদক করিয়া ও ১২ জন সদস্য লইয়া এক কার্য্যকরী সমিতিও গঠিত হইয়াছে। সকল প্রদেশের ও বহু দেশীয় রাজ্যের খ্যাতনামা শ্রমিক নেতারা ঐ সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন।

গণপরিষদ ও বড়লাট—

গত ৩রা মে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন গণপরিষদের সদস্যদিগকে লাটপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া এক অপরাহ্ন-ভোজে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। ঐদিন বাঙ্গালার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায়ও বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৪৫ মিনিটকাল তাঁহার সহিত বাঙ্গালার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

আসামে মিঃ জিন্নার স্থান নাই। আসাম মিঃ জিন্নার গোঁড়ামির নিকট নতি স্বীকার করিবে না!

শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ—

খ্যাতনামা সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গত ৭ই মে হায়দ্রাবাদে যাইলে পরদিন সকালে তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিয়া বিমানযোগে বোম্বায়ে প্রেরণ করা হইয়াছে। ৭ই সন্ধ্যায় সেকেন্দ্রাবাদে তিনি এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

দিল্লীতে প্রাদেশিক গভর্ণরদের সম্মেলন—মধ্যস্থলে লর্ড ও লেডি মাউণ্টব্যাটেন

গান্ধী-জিন্না আলোচনা—

গত ৬ই মে তারিখে মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে মিঃ জিন্নার [বা]সভবনে যাইয়া বিকাল সাড়ে ৫টা হইতে রাত্রি সওয়া [আ]টা পর্য্যন্ত প্রায় পৌনে তিন ঘণ্টা কাল হিন্দু মুসলমান [মি]লনের পথ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বড়লাটের [অ]ভিপ্রায় অনুসারে এই মিলন হইয়াছিল। মিঃ জিন্না [ভা]রত বিভাগের প্রস্তাব ত্যাগ করিবেন না—কাজেই [উ]ভয়ে কোন বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই।

আসাম ও মিঃ জিন্না—

আসামে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র শতকরা [..]ই জন। তাহা সত্ত্বেও মিঃ জিন্না আসামে পাকিস্তান [প্র]তিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন। সে জন্য আসাম প্রাদেশিক [ক]ংগ্রেস কমিটীর সভাপতি মৌলনা মহম্মদ তায়েবুল্লা গত [..]রা মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে—

সিন্ধুতে বিভাগ দাবী—

সিন্ধু দেশে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৩০ জন। কাজেই সেখানে মুসলিম লীগ নেতারা মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া এমন ভাবে দেশশাসন করিতেছেন যে তথায় হিন্দুদের বাস অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অথচ সিন্ধুর ২৬টি মিউনিসিপাল সহরের মধ্যে ২৩টিতে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা অধিক। সকল মিউনিসিপাল সহরের হিন্দুরা সমবেতভাবে বড়লাট, রাষ্ট্রপতি প্রভৃতিকে জানাইয়াছেন যে নূতন ভারতীয় রাষ্ট্র সংঘে যেন তাহাদের গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়। কি ভাবে তাহা সম্ভব তাহাও তাঁহারা জানাইয়াছেন।

কুমারখালিতে কাঙ্গাল হরিনাথ স্মৃতি উৎসব—

গত ৯ই বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রামে কাঙ্গাল কুটীরে খ্যাতনামা সাহিত্যিক, সাধক ও সাংবাদিক কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের মৃত্যুর ৫২তম স্মৃতি উৎসব হইয়া গিয়াছে। সভায় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন এবং কলিকাতার অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন, পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী, কবি শ্রীসুনীতিভূষণ সেন, রাণাঘাটের শ্রীবিনয়কৃষ্ণ তরফদার, বাটীকামারার শ্রীঅশ্বিনীকুমার গোস্বামী, জানিপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের ব্রহ্মচারী শঙ্কর মহাবার চৈতন্য প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। সভায় স্থানীয় তরুণগণের দ্বারা বহু সঙ্গীত গীত হয়। সারাদিন দলে দলে কীর্ত্তনীয়ারা কাঙ্গাল কুটীরে সমবেত হইয়া স্থানটি মুখরিত করেন ও সকলকে মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণের পর সন্ধ্যায় সভা হয়। ঐ উপলক্ষে স্থানীয় জনগণের উৎসাহ ও উদ্যম প্রশংসনীয়। কাঙ্গালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় তিনি রায় বাহাদুর জলধর সেন, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র, পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রভৃতির মত বহু শিষ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কুমারখালি গ্রাম হইতে যে সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেন, তাহা জেলার সকলকে শাসন করিত। তাঁহার গ্রামবার্ত্তা পত্রে সে সময় বাঙ্গালা দেশের গ্রামবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা প্রকাশিত হইত। হরিনাথ বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির প্রকাশ ও প্রচার এ যুগে বিশেষ প্রয়োজন। দেশবাসীকে কাঙ্গাল হরিনাথ ও তাঁহার দানের কথা জানাইবার জন্য দেশের সুধীবৃন্দের উদ্যোগী হওয়া উচিত। তাহা দ্বারা দেশ ও জাতি উপকৃত হইবে।

আসামে লীগের পাকিস্থানী অভিযানের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

মেদিনীপুর হোড়খালিতে হিন্দু সম্মেলন—

গত ১২ই ও ১৩ই বৈশাখ শনিবার ও রবিবার মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার অন্তর্গত হোড়খালি গ্রামে ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীদিগের উদ্যোগে এক বিরাট হিন্দু সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সংঘের কর্ম্মীরা গত মেদিনীপুর বন্যার পর ঐ অঞ্চলে সাহায্য দান করিতে যাইয়া এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন—আশ্রমে মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয়, অবৈতনিক শিক্ষালয় প্রভৃতি চলিতেছে। স্থানীয় উৎসাহী কর্ম্মীদের উদ্যোগে হিন্দু সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল এবং দুই দিনে প্রায় ২০ হাজার সমাগত ব্যক্তিকে ভোজে তৃপ্ত করা হয়। বিরাট মণ্ডপে হিন্দু সম্মিলন হয় ও তাহার নিকটস্থ প্রকাণ্ড মাঠে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞে সর্ব্বসাধারণকে আহুতি প্রদান করিতে দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ও নিকটবর্ত্তী স্থানের বহু নেতা সমবেত হইয়া সভায় বক্তৃতা করেন। সংঘের কর্ম্মীদের গ্রামসংগঠন, হিন্দু মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠার দ্বারা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন ও রক্ষীদল গঠনের দ্বারা শরীর চর্চ্চা বিধান ব্যবস্থা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। মেদিনীপুরের ঐ অঞ্চলে

শীলভুক্ত ও অন্যান্য অনুন্নত জাতির লোকের সংখ্যাই বেশী। ভারত সেবাশ্রম সংঘের কর্মীরা তাহাদের মধ্যে সংগঠনের দ্বারা তাহাদের অবস্থার সর্ববিধ উন্নতির ব্যবস্থা করিয়াছেন ও এতদিন তাহারা যে সকল অধিকারে বঞ্চিত ছিল তাহাদের সে সকল অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করিতেছেন। সংঘের সভাপতি স্বামী সচ্চিদানন্দ সম্মেলন উপলক্ষে কয়দিন ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া সকলকে ধর্ম্ম-শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রজিৎ সেন—

মেসার্স সি-কে-সেন এণ্ড কোং লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ সেন লণ্ডনে বৃটীশ সাম্রাজ্যের শিল্প-মেলায় যোগদান করিবার জন্য গত ৩রা মে বিমানযোগে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রসাধন প্রস্তুতের কারখানাগুলিও দেখিয়া আসিবেন। তিনি স্বর্গত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনের পৌত্র ও ৺বলাইচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

দিল্লীতে সরকারী শাসনবিভাগের শিক্ষার্থীদের ট্রেণিং স্কুল উদ্বোধন—শিক্ষার্থীদের সহিত আলাপনরত স্বরাষ্ট্র সচিব সর্দার প্যাটেল

বাঙ্গলায় সংবাদ পত্র দলন—

গত ১৯শে ও ২১শে এপ্রিল দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কলিকাতার ইংরাজি দৈনিক সংবাদ পত্র 'ন্যাশানালিষ্ট'-এর দুই হাজার টাকা জামীন বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং নূতন ১০ হাজার টাকা জামীন তলব করা হইয়াছে। ৭ই এপ্রিল তারিখে এক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কলিকাতার দৈনিক সংবাদপত্র 'ভারতে'র দুই হাজার টাকা জামীন বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে ও নূতন ৫ হাজার টাকা জামীন তলব করা হইয়াছে। ২২শে ডিসেম্বর দৈনিক হিন্দুস্থানে এক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তাহার সম্পাদক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে এবং ১৪ই ডিসেম্বর দৈনিক স্বাধীনতায় এক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য তাহার সম্পাদক রমণীমোহন সরকার ও মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে স্পেশাল অর্ডিনান্সের অভিযোগে মামলা চলিতেছে। ১০ই এপ্রিল এক সংবাদ প্রকাশ করায় কলিকাতার ইংরাজি দৈনিক 'জয় হিন্দে'র ২ হাজার টাকা জামীন বাজেয়াপ্ত করিয়া ৫ হাজার টাকা করিয়া দুইটি নূতন জামীন তলব করা হইয়াছে। গত ১লা মে যুগান্তরে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের

তারকেশ্বরে হিন্দুমহাসভা সম্মেলনের তোরণ　ফটো—তারক দাস
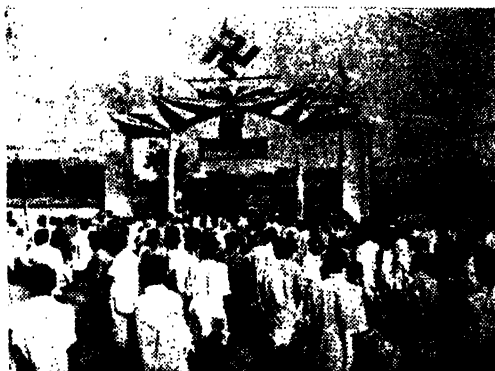
জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা প্রেসের ১ হাজার টাকা জামীন বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে ও ৫ হাজার টাকার নূতন জামীন তলব করা হইয়াছে। বাঙ্গালা সরকার আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের মোট ৭ হাজার টাকা জামীন বাজেয়াপ্ত করায় গত ৬ই মে উক্ত পত্রদ্বয়ের পক্ষ হইতে আবার নূতন ১৭ হাজার টাকা জামীন দেওয়া হইয়াছে। 'দেশ' পত্রিকা সম্পর্কেও বাঙ্গালা সরকার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসকে নূতন জামীন জমা দিতে বলায় সে বিষয়ে মামলা চলিতেছে। ১২ই এপ্রিল অমৃতবাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় ৩রা মে বাংলা গভর্ণমেণ্ট পত্রিকার ৫ হাজার টাকা জামানতের মধ্যে ৪ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন ও ১০ দিনের মধ্যে নূতন ৭ হাজার টাকা জামানত দিতে বলিয়াছেন। ২০শে এপ্রিল 'কৃষক' পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় বাঙ্গলা সরকার

৩য়া যে কৃষকের ৫শত টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন ও তাহাদের নূতন ২ হাজার টাকা জামানত তলব করিয়াছেন।

সীমান্তে নুতন দল গঠন—

সীমান্তে এক নূতন স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হইয়াছে—উহার সদস্যগণ সকলেই লালকোর্ত্তা পরিধান করিবেন বটে, কিন্তু সঙ্গে পিস্তল রাখিবেন। সীমান্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি খাঁ আমীর মহম্মদ খাঁ এই নূতন দল গঠন করিতেছেন।

তারকেশ্বরে হিন্দুমহাসভা অভিমুখে সদলে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ

ফটো—তারক দাস

কলিকাতা কর্পোরেশনের নুতন ব্যবস্থা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের অব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া নূতন ব্যবস্থা করিবার জন্য কর্পোরেশনের গত ৬ই মে তারিখের এক সভায় নিম্নলিখিত ৬ জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে—(১) মেয়র (২) মিঃ হল্যাণ্ড (৩) ওয়াইজ (৪) দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (৫) ডাঃ এস সিংহ ও (৬) রাজা বি-এন রায় চৌধুরী। মুসলীম লীগ সদস্যগণ এই কমিটীতে যোগদান করিতে সম্মত হন নাই।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় ধ্বংসলীলা—

গত ১লা মে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নোত্তরকালে স্বরাষ্ট্র সচিবের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিম্নলিখিত ক্ষতির হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন—গত অক্টোবর হাঙ্গামায় নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় ৪৪৩৬টি গৃহ লুণ্ঠিত ও ২৫৯৯টি গৃহ ভস্মীভূত হয়। তাহা ছাড়াও ত্রিপুরা জেলায় ৬৫২০টি কুটীর ভস্মীভূত হয়। ঐ দুইটি জেলায় মোট ২৮৫ জন মারা যায়—পুলিস ও মিলিটারীর গুলীতে ৬৭ জন মারা যায়। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হাঙ্গামায় যথাক্রমে ১৭৮ ও ৪০ জন মারা যায়। নোয়াখালিতে কত লোককে বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত করা হইয়াছে—সম্ভবত কয়েক হাজার হইবে—তাহার সঠিক সংখ্যা জানা যায় নাই। ত্রিপুরায় মোট ৯৮৯৫ জনকে ধর্ম্মান্তরিত করা হইয়াছে। নোয়াখালিতে ঐ সম্পর্কে ১০৬১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ৯০৯ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রিপুরায় ১১৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া ৯১২ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।
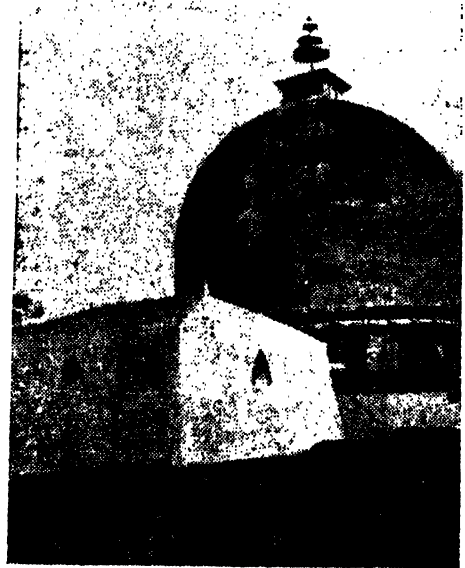
বুদ্ধের সমাধি মন্দির ফটো—সুবলচন্দ্র সরকার

খাদ্য সরবরাহে অব্যবস্থা—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ২১ জন সদস্য এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা দেশে খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অব্যবস্থার কাহিনী প্রচার করিয়াছেন। এক দিকে খাদ্যাভাব, অন্য দিকে সরকারের চরম অব্যবস্থায় বাঙ্গালা দেশে দারুণ খাদ্যসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত সদস্যগণ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন—ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র মাল, গুণদাপ্রসাদ মণ্ডল, সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কুবিহারী মণ্ডল, কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল, চারুচন্দ্র মহান্তি, সুকুমার দত্ত, নিশাপতি মাঝি, রজনীকান্ত প্রামাণিক, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, কমলকৃষ্ণ রায়, কানাইলাল দে, অরবিন্দ গায়েন, মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মল্লিক, রাধানাথ দাস, নিকুঞ্জবিহারী মাইতি ও চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী।

চীনে রাষ্ট্রদূত—

শ্রীযুক্ত কে-পি-এস মেনন চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন—তিনি ভারত সরকারের সেক্রেটারী হইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্থানে রফি আমেদ কিদোয়াই চীনে রাষ্ট্রদূত হইয়া যাইবেন। মিঃ কিদোয়াই বর্ত্তমানে যুক্ত প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী—তিনি আজীবন দেশ সেবক ও বহুপ্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন।

শ্বেত-মর্মরে বৌদ্ধমূর্ত্তি ফটো—সুবলচন্দ্র সরকার

পার্শ্বেল ট্রেণ থামাইয়া মাল লুঠ—

গত ১০ই মে আসাম বেঙ্গল রেলের ঈশ্বরদি-সিরাজগঞ্জ লাইনে ঈশ্বরদি ও মুলাডুলি ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে ভোর রাত্রিতে একদল সশস্ত্র ডাকাত একখানি পার্শেল ট্রেণ থামাইয়া কয়েকখানি মাল গাড়ীর সকল জিনিষ লুঠ করিয়াছে। তাহারা লাইনের উপর গাছ ফেলিয়া ট্রেণ থামাইয়া দেয়। ট্রেণে বহু গাঁট কাপড় ছিল। দেশে এই প্রকার অরাজকতা দেখা দিয়াছে, অথচ প্রতীকারের কোন চেষ্টা নাই।

কলিকাতায় ট্রাম ধর্ম্মঘট—

২১শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতার ট্রাম-কর্ম্মীরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ৮২ দিন ধর্ম্মঘটের পর গত ১৫ই এপ্রিল ধর্ম্মঘটের অবসান হয় ও তাহার কয়েক দিন পর হইতেই ট্রাম চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকরাই শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করিয়াছে।

দীর্ঘ তিন মাস ধর্ম্মঘটের পর ধর্ম্মঘটীদের বিরাট শোভাযাত্রার মধ্যে রাজপথে পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত প্রথম ট্রাম ফটো—তারক দাস

চিনি ও আটা সরবরাহ বন্ধ—

গত ৯ই মে তারিখে বাঙ্গলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ ঘোষণা করেন যে, ১২ই মে সোমবার হইতে খাবার, লজেন্স, বিস্কুট প্রভৃতির দোকানে চিনি বা আটা সরবরাহ করা হইবে না। শুধু জনপ্রতি সপ্তাহে আধপোয়া চিনি ও তিন পোয়া আটা দেওয়া হইবে। সরবৎ, চা, বাতাসা, মিছরী প্রভৃতির দোকানও চিনি পাইবে না। কতদিন এই ব্যবস্থা চলিবে কে জানে?

গান্ধী-সুরাবর্দ্দী সাক্ষাৎকার—

১১ই মে রবিবার প্রথম বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এচ-এস-সুরাবর্দ্দী সোদপুর আশ্রমে যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন—সে দিন ৯০ মিনিট উভয়ে বঙ্গভঙ্গ

সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তাহার পর আরও কয়েকদিন উভয়ে আলোচনা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী—

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ভারতীয় রেল তদন্ত কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এককালীন ২০ হাজার টাকা, যতদিন কাজ করিবেন ততদিন মাসিক ১৫ শত টাকা বেতন ও কাজের জন্য যে সময়ে দিল্লীর বাহিরে থাকিবেন সে সময় দৈনিক ১৫ টাকা ভাতা পাইবেন। নিয়োগী মহাশয় অর্থনীতিতে সুপণ্ডিত—তাঁহার এই নিয়োগে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন। তিনি বাঙ্গালী, সে জন্য বাঙ্গালার লোক গৌরবান্বিত।

দিল্লীতে কলেজের ছাত্রীদের স্বাক্ষর সংগ্রহের খাতায় স্বাক্ষর রত ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শারীয়ার

ভারতে গোলটেবিল বৈঠক—

১০ই মে তারিখে সিমলা হইতে বড়লাট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ১৭ই মে বড়লাট ভারতে এক সর্ব্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকিয়া ভারতীয় সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু পরদিনই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ২রা জুন সেই বৈঠক বসিবে। পার্লামেন্টের ছুটী থাকায় ১৭ই মে বৈঠক ডাকা সম্ভব হইবে না।

জাতীয় বঙ্গ মহাসম্মেলন—

গত ১০ই ও ১১ই মে শনিবার ও রবিবার কলিকাতা বালীগঞ্জ সিংহী পার্কে জাতীয় বঙ্গ মহাসম্মেলনে সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রের অধীন পৃথক বঙ্গদেশ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। মহাসম্মেলনে প্রেসিডেন্সি বিভাগ ও কলিকাতার ৫ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ সম্মেলনের অধিবেশনের পূর্ব্বে তথায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া কোন প্রকার সর্ত্তের উপর নির্ভর না করিয়া সর্ব্বাবস্থাতেই স্বতন্ত্র প্রদেশের দাবী জানাইতে সকলকে অনুরোধ করেন। রবিবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে বহু প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, মেয়র শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী, জাতীয়তাবাদী মুসলমান মিঃ মুবারক মজহুর প্রভৃতি সভার কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মিঃ জিন্নার হতাশা—

মিঃ জিন্না মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি পাঞ্জাবের সম্মিলিত মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া তথায় লীগ-শাসিত মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার সে আশা ত পূর্ণ হইলই না, অধিকন্তু পাঞ্জাব দুই ভাগে বিভক্ত করা হইবে। মিঃ জিন্নার পাকিস্থান গঠন প্রস্তাব সম্ভব হইবে না। দ্বিতীয়ত তিনি সীমান্ত প্রদেশে যে নূতন নির্ব্বাচন ব্যবস্থার উদ্যোগী হইয়াছিলেন কংগ্রেসের বিরোধিতায় তাহাও সম্ভব হইবে না। বাঙ্গালা দেশ দুই ভাবে বিভক্ত হইলে মুসলেম লীগের ভাগে যে অংশ পড়িবে, তাহা স্বতন্ত্র পাকিস্থান গঠন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না

এখন মুসলমানগণও বিশ্বাস করিতেছেন। আসামে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা যে ভাবে লীগের আন্দোলন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে, তাহাতে আসামে সংখ্যালঘিষ্ঠ লীগের পক্ষে আর কোন আন্দোলনে অগ্রসর হওয়া সুবিধাজনক হইবে না। এইভাবে সর্ব্বত্র নিজ ইষ্ট সাধনে অসমর্থ হইয়া মিঃ জিন্না ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িতেছেন। বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর সহিত মতানৈক্যও তাঁহার হতাশার অন্যতম কারণ।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—

বড়লাট সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পরিদর্শন করিয়া আসিয়া তথায় নূতন নির্ব্বাচন করিয়া নূতন ব্যবস্থা পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করায় সে কথা দিল্লীতে ৭ই মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় আলোচিত হইয়াছে। মাত্র একবৎসর পূর্ব্বে সীমান্ত প্রদেশে নির্ব্বাচন হইয়া-গিয়াছে ও দেশবাসী কংগ্রেস কর্ম্মীদের অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত করায় তথায় কংগ্রেস দল কর্ত্তৃক মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। সীমান্তে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক—কাজেই মিঃ জিন্না তথায় লীগ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। সে জন্য ভাড়াটিয়া লোক দ্বারা তথায় অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৭ই মে তারিখেও মিঃ জিন্না দিল্লীতে প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে সীমান্তে লীগের আন্দোলন (বে আইনি ও নরহত্যামূলক) বন্ধ করা হইবে না। সে জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষও দৃঢ়তার সহিত সে আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যদি সত্যই সীমান্তে নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হয়, কংগ্রেস সর্ব্বতোভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন।

সীমান্তে ক্ষতির পরিমাণ—

শুধু রাওলপিণ্ডি জেলায় গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ৪৪ জন নিহত, ৮৩ জন আহত ও ১৩টি স্থানে অগ্নিপ্রদান ও লুণ্ঠন করা হইয়াছে। একজন দায়রা জজ ঐ সকল হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত ও বিচারের ভার পাইয়াছেন। সমগ্র রাওলপিণ্ডি জেলায় (শুধু রাওলপিণ্ডি মিউনিসিপ্যালিটী ও ক্যান্টনমেণ্ট এবং গুজারখান মিউনিসিপাল এলাকা ছাড়া) মোট ৩০ লক্ষ টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে। ডেরা ইসমাইল খান সহরে গত ১৫ই হইতে ২৫শে এপ্রিল ১১ দিনের মধ্যে ৯৬০টি দোকান ও বাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। ট্যাঙ্ক মহকুমায় ৪ শত ও কুলাচিতে ১৬৭টি বাড়ী ও দোকান পুড়াইয়া দেওয়া বা লুঠ করা হইয়াছে। সর্ব্বত্রই বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের করমর্দ্দন—পার্শ্বে মিঃ লিয়াকত আলি দণ্ডায়মান

টাঙ্গাইলে লীগের পরাজয়—

গত ৪ঠা মে মৈমনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইলে জেলা বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচনে লীগ দলের প্রার্থী মিঃ আবদুল হামিদ খাঁ চৌধুরীকে (ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (উচ্চতর পরিষদের) ডেপুটী সভাপতি) পরাজিত করিয়া স্বতন্ত্র দলের ডাক্তার নিজামুদ্দ ইসলাম জয়লাভ করিয়াছেন। ইহাতেই বাঙ্গালা দেশের লীগের অবস্থা বুঝিতে পারা যায়।

ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ—

নূতন যে হিন্দু প্রধান বঙ্গদেশ গঠিত হইবে, যাহাতে তাহার মধ্যে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা ও মাদারীপুর মহকুমার কোন কোন অংশ এবং বাখরগঞ্জ জেলার সদর মহকুমা গৃহীত হয় সে জন্য বাঙ্গালার তপশীলী নেতা শ্রীযুক্ত পি-আর-ঠাকুর দাবী জানাইয়াছেন। ঐ অঞ্চলগুলি হিন্দু প্রধান—তথায় ৩ লক্ষ ৫২ হাজার তপশীলী বাস করে। তাহাদের পাকিস্থানের মধ্যে দিলে তাহারা একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে।

লর্ড ও লেডি মাউণ্টব্যাটেনসহ মহাত্মা গান্ধী

শিক্ষাব্রতীদিগের দাবী—

সার যদুনাথ সরকার, অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক শিশির মিত্র ও অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একযোগে পশ্চিম বাঙ্গালা ও উত্তর বাঙ্গালার অংশ বিশেষ লইয়া পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবী জানাইয়া বিলাতে ভারত সচিব লর্ড লিষ্টোয়েলের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন।

ভারতে খাদ্যাভাব—

গত ১৫ই মে বাঙ্গালোরে এক সাংবাদিক সভায় অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্যসচিব ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন—এবার ভারতে গম হয় নাই—বিদেশ হইতেও পর্য্যাপ্ত খাদ্য আসিতেছে না। গত ৬ মাসে ৪ লক্ষ টন চাউল বিদেশ হইতে আসার কথা ছিল—তন্মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ৮২ হাজার টন চাউল আসিয়াছে। কাজেই জুলাই হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ৫ মাস ভারতে দারুণ খাদ্যাভাব হইবে। ঐ দিনই ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য-সেক্রেটারী মিঃ কে-এল-পাঞ্জাবী করাচীতে বলিয়াছেন—ভারত হইতে উপযুক্ত পাট ও কাপড় রপ্তানী করিতে পারিলে অধিক চাল আমদানী করা যাইত—তাহাও সম্ভব হয় নাই। কাজেই এদেশে এখন রেশনিং প্রথা বজায় রাখিতে হইবে এবং অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য আন্দোলন করিতে হইবে।

সিমলায় পণ্ডিত নেহরু—

সরকারের সহ-সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু গত ৮ই মে হইতে ৪ দিন সিমলায় যাইয়া বড়লাটের প্রাসাদে তাঁহার অতিথিরূপে বাস করিয়া আসিয়াছেন। ঐ সময়ে পাঞ্জাবের গভর্ণর এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদও সিমলায় ছিলেন। পণ্ডিতজী সকলের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়াছেন।

কস্তুরবা স্মৃতি ট্রাষ্ট—

কস্তুরবা গান্ধী স্মৃতি জাতীয় ট্রাষ্টের অধীনে—বয়স্কদের শিক্ষা দান, গ্রাম্যশিল্প শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান, সাধারণ চিকিৎসা শিক্ষা প্রভৃতির জন্য সারা ভারতে ৮০টি গ্রামে কেন্দ্র হইয়াছে। ট্রাষ্টে সংগৃহীত অর্থ ১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। বিহারে ২৫, বাঙ্গালায় ১৫, মহারাষ্ট্রে ৮, গুজরাট, মহীশূর রাজ্য ও কর্ণাটক প্রত্যেক স্থানে ৫, পাঞ্জাব ও অন্ধ্রে ৩টি করিয়া এবং দিল্লী, রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাদ প্রত্যেক স্থানে ২টি করিয়া কেন্দ্র হইয়াছে। ১২টি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রও খোলা হইয়াছে। বৎসরে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। ট্রাষ্টের সহ-সভাপতি মিঃ মঙ্গলদাস (কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি) ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঠক্কর সকল ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। ১৪টি গ্রাম-সেবিকা

...ন্দ্রালয়ে ৪৫০ জন মহিলা কর্মী শিক্ষালাভ করিতেছেন। ...এমনভাবে কেন্দ্রগুলিতে কাজ চালান হয় যে, শীঘ্রই কেন্দ্রগুলি ...প্রতিষ্ঠিত হইবে—তথায় আর অর্থসাহায্য দানের প্রয়োজন হইবে না।

কলিকাতা বন্দর-কর্মীদের ধর্মঘট—

কলিকাতা বন্দরের কর্মীরা ৮৭ দিন ধর্মঘটের পর গত ...রা মে কাজে যোগদান করিয়াছেন। কলিকাতা পোর্ট ...কমিশনার্সের নূতন চেয়ারম্যান মিঃ আয়ার এই আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ধর্মঘটে শেষ পর্য্যন্ত ...শ্রমিকপক্ষই জয়লাভ করিয়াছেন! কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ...প্রায় সকল দাবীই মানিয়া লইয়াছেন।

দিল্লীতে বাঙ্গালার আবেদন—

বাঙ্গালায় নূতন প্রদেশ গঠনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে একখানি আবেদন দিল্লীর কর্তৃপক্ষের নিকট গত ১লা ...র তারিখে পেশ করা হইয়াছে। নূতন প্রস্তাবিত প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা হইবে শতকরা ৭৭জন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিরোধী-দলের ৮৪জন সদস্যের মধ্যে ...৪জন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৩জন কংগ্রেসী সদস্যের মধ্যে ১২ জন গণপরিষদের বাঙ্গালার ২৪জন অমুসলমান সদস্যের মধ্যে ২০জন ঐ আবেদনে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আবেদনের ...নকল বড়লাটকেও দেওয়া হইয়াছে।

স্যর আকবর হায়দারী—

আসামের নূতন গভর্ণর স্যর আকবর হায়দারী ৪ঠা মে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ১৮৯৪ সালের ১২ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পরলোকগত স্যর আকবর হায়দারীর পুত্র—পিতার মত তিনিও বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। আই-সি-এস পাশ করিয়া তিনি এক সুইডিশ মহিলাকে বিবাহ করেন। তিনি কিছুকাল ভারত সরকারের সেক্রেটারীর কাজও করিয়াছেন।

জিন্না-গান্ধী আবেদন—

বড়লাটের চেষ্টায় গত ১৫ই এপ্রিল দিল্লী হইতে মহাত্মা গান্ধী ও মিঃ জিন্নার স্বাক্ষরিত এক সংযুক্ত আবেদন প্রচারিত হয়। তাহাতে বলা হয়—"আমরা সাম্প্রতিক অরাজকতা ও হিংসামূলক কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিতেছি। যাহারাই আক্রমণকারী বা আক্রান্ত হউক না কেন, ইহা ভারতের সুনামে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে এবং নির্দ্দোষ জনসাধারণকে যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে। আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য

ডাঃ শারীয়ার ও পণ্ডিত নেহরু

বলপ্রয়োগের সর্ব্বদাই নিন্দা করি। সর্ব্বপ্রকার হিংসামূলক কার্য্যকলাপ হইতে নিরস্ত হইতে ও এই সকল কার্য্যকলাপে প্ররোচনা দেয় এমন কোন প্রবন্ধ বা বক্তৃতা প্রকাশ না করিতে আমরা ভারতের সকল সম্প্রদায়কে আহ্বান করিতেছি।" কিন্তু এই বিবৃতি প্রকাশের পরও দেশে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। কাজেই এই বিবৃতি প্রচারে আন্তরিকতার যে অভাব ছিল, তাহা এখন বুঝা যাইতেছে।

পরলোকে অমিয়নাথ সেন—

গত ১৫ই এপ্রিল কলিকাতার খ্যাতনামা সলিসিটার অমিয়নাথ সেন মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন

করিয়াছেন। তিনি খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের একমাত্র কন্যা তরলিকা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার শ্বশুরের গঠনমূলক কার্য্যে সাহায্য করিতেন।

প্রধান মন্ত্রীর নূতন প্রস্তাব—

এতদিন ধরিয়া বাঙ্গালায় লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর যে শাসন চলিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে বাঙ্গালায় বাস করা অসম্ভব হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের ও রাজনীতিক দলের হিন্দুরা সমবেত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে বাঙ্গালা দেশকে বিভক্ত করিয়া হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলি লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছে। তাহার ফলে এতদিনে প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দ্দীর টনক নড়িয়াছে ও গত ৭ই মে প্রধান মন্ত্রী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা-বিভাগের বিপক্ষে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে প্রধান উদ্যোগী হওয়ায় তিনি ডক্টর মুখোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করিয়াই বেশী কথা বলিয়াছেন। যাহাই হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালা বিভাগ করা ছাড়া বাঙ্গালী হিন্দুর বাঁচিবার অন্য উপায় নাই। কাজেই আজ দায়ে পড়িয়া যিনি যাহাই বলুন না কেন, বাঙ্গালী হিন্দু যেন কোন কথায় কর্ণপাত না করেন।

কলিকাতায় অশান্তি—

গত ২৫শে মার্চ্চ কলিকাতায় যে নবপর্য্যায়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে তাহা আজও (২১শে মে) থামে নাই। সহরবাসীর অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। প্রত্যহ কোন না কোন এলাকায় সান্ধ্য আইন জারি থাকে—তাহার ফলে ৩৬ ঘণ্টা বা ৪৮ ঘণ্টা লোক গৃহের বাহিরে যাইতে পারে না। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া গিয়াছে—ব্যবসা বাণিজ্য অচল হইয়াছে। ইহার অবসান কবে হইবে, কেহ বলিতে পারে না। আমরা নাকি সুসভ্য শাসনে বাস করিতেছি—ইহাই তাহার পরিচয়।

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীসমীরণ চট্টোপাধ্যায়

সারা দেশব্যাপী জ্বেলেছে আগুন
হিন্দু-মুসলমান,
ভুলে গেছে তারা এই ভারতের
এক জাতি এক প্রাণ।
হিন্দুর অসি ঝলসিয়া উঠে
মুসলমানের তরে,
মুসলমানের ছুরির আঘাতে
হিন্দু-রক্ত ঝরে।
'জয় হিন্দ' হাঁকি হিন্দুস্থান
প্রসারিছে দুই কর,
পাকিস্থানের ছুরিকা চলিছে—
'আল্লা-হো-আকবর।'
নিরীহ জীবের রক্তে হয়েছে
রঞ্জিত রাজপথ,
তাহার উপর চলিয়াছে ছুটে
গুণ্ডার রাজরথ।
রক্ত পাগল, মত্ত পিশাচ
শাণিত অস্ত্র করে,
নিরীহ পথিক-বক্ষ বিদারী
হাসিছে অট্ট স্বরে।

নারীর লজ্জা, নারীর মান—
পুরুষের ধন-প্রাণ,
লাঞ্ছিত আজি গুণ্ডার হাতে
সহি শত অপমান।
ভায়ের রক্তে রাঙাতে হস্ত
লাজ নাই কারো মনে,
সভ্য সমাজে চলেছে আইন—
চলিত যা আগে বনে!
স্বাধীন জাতি হইতে গেলে কি
পশু হতে হয় আগে?'
এই সে বিরাট প্রশ্ন আজিকে
শত বুক প্রাণে জাগে।
শত শত প্রাণ উঠে আকুলিয়া
ফেলিতে সহজ শ্বাস,
ঊর্দ্ধ আকাশে চাহিয়া বলিছে
'আজো কি মেটেনি আশ?'
বহু বরষের কলঙ্ক ছাপ
ললাটে রয়েছে লিখা,
একদিনে কভু মুছিবে না তাহা
জ্বলিবে অগ্নি শিখা।

মিথ্যা গর্ব্বে হীন অহঙ্কারে
তুচ্ছ করেছ ধরা,
যুগ যুগ ধরি সঞ্চিত পাপে
নিখিল ভুবন ভরা।
নীচ জাতি বলি দূরে রাখিয়াছ
আপনার ভাই-বোনে,
নির্ম্মম করে ঠেলিয়া রেখেছ
সমাজের এক কোণে।
সংস্কারের নাগপাশে ঘিরি
দূরে বাঁধিয়াছ ঘর,
বিভেদের ঘোর বেড়াজালে তুমি
আপনে করেছ পর।
সে মহাপাপের, সে অপরাধের
শাস্তি হয়েছে সুরু,
বহিতে হবে তা আনত শিরে
হোক না সে যত গুরু।
ভয় কিবা তাতে, হও আগুয়ান
সত্য পথের যাত্রী,
নূতন যুগের সূর্য্য উদিছে
ঘুচিবে আঁধার রাত্রি।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক্যালকাটা হকি ঃ

দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য ক'লকাতার হকি লীগ খেলা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। ১৮৯০ সাল থেকে হকি লীগ খেলা আরম্ভ হয়েছে কিন্তু এ রকম ভাবে খেলা আরম্ভ হয়ে মাঝ পথে বন্ধ হয় নি। প্রথম বিভাগের হকি লীগ তালিকায় মোহনবাগান ১১টা খেলে ১৬ পয়েন্ট করে এতাবৎ শীর্ষ স্থান অধিকার ক'রেছিল। তার থেকে কম খেলে বি-জি প্রেস ৯টা খেলায় ১৩ পয়েন্ট করে। এই ভাবে খেলা বন্ধ হওয়ার ফলে শেষ পর্য্যন্ত কোন দল লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেত তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেও আজ কারও আর আগ্রহ নেই। অনুরূপ কারণে বাইটন কাপ আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতাও এ বছর আর হ'ল না।

মেয়েদের টেনিস খেলায় হুইটম্যান কাপ

রাশিয়ান কুস্তিবীরের সাফল্য ঃ

এ বছরও রাশিয়ান কুস্তিবীর জে কোটকাস বিজয়ী হয়ে পর্য্যায়ক্রমে তিনবার 'ইউরোপীয় হেভি ওয়েট' কুস্তি প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করলেন। তুরস্কের মুস্তাফা ম্যাকস্তাক এবং ফিনল্যাণ্ডের পাউলি রুবম্যাকি যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

১৯০০ সালে প্রথম ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকা দল

যো ষ্টুইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার অধিকার লাভ করেছেন।

ক্রিকেট ঃ

ইংলণ্ড অবস্থানকালে ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় লালা অমরনাথ পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে 'বার্ণলে কাউন্টি' দলের পক্ষে খেলবেন বলে এক চুক্তিপত্রে সাক্ষর ক'রেছিলেন; কিন্তু পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য তিনি উক্ত দলে যোগদান করতে পারবেন না বলে উক্ত ক্লাবের চেয়ারম্যানের কাছে দুঃখপ্রকাশ ক'রে এক চিঠি দিয়েছেন।

* * * *

মারাত্মক বোলিংয়ের রেকর্ড ক'রেছিলেন ১৯১৭ সালে ক্রান্সে ক্যানেডিয়ান বোলার জে লিক। তিনি মোট ১২টি বলে ১২ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেন। সম্প্রতি

আন্তর্জাতিক টেনিস খেলায় ডেভিস কাপ

খেলার রেকর্ড স্থাপন করেছেন। প্রথম ওভার বলে তিনি ৬ জনকে আউট করেন, দ্বিতীয় ওভারে বাকি চারজন আউট হয়।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "যুগের যাত্রী"—২৷৹
শ্রীআশুতোষ ধর সম্পাদিত "বলাকী শিশুসাথী ১৩৫৩"—৪৲
শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন সম্পাদিত ডিটেকটিভ উপন্যাস "চতুর অর্ম্মাণ"—১৷৹
শ্রীনীলমণি সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "জীবন দোলায়"—১৸৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩৷১৷১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত